ী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৩১৮

(বৈশাখ—চৈত্র)

১৩১৮ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী

সূচী

১৩১৮ সালের

বর্ণানুক্রমিক চিত্র সূচী

হরপার্ব্বতী

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক। | কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১৮ [১ম সংখ্যা

নব-বর্ষ।

Ring out the old, ring in the new.

Tennyson

পুরাতন বর্ষ শেষ, আইল নবীন,
স্মৃতিলীন হল হায় পুরাণো সে দিন !
ছিলে যে সাথের সাথী, বঁধু হে বিদায়। —
নবীন অতিথি এস, স্বাগত তোমায় !

২

গেছে কত ব্যথা ক্লেশ, অতৃপ্ত কামনা,
সুখ-আশা গেছে ভেঙ্গে, অসিদ্ধ সাধনা।
নববর্ষে ধর আজি উদ্যম নূতন,
নবোৎসাহে গড় পুন নূতন জীবন।

৩

ঘুচুক অভাব দৈন্য, দুঃখ পাপ ভাব,
অবিশ্বাস, ভ্রান্তিপাশ, সংশয়-আঁধার ;
নিবে যাক্ শোকানল চিরদিন তরে
কালের ইন্ধনে যাহা জ্বলে ঘরে ঘরে।

৪

খর্ব্ব হোক্ বৃথা গর্ব্ব মান অভিমান,
জাতিকুল ভেদাভেদ বিচ্ছেদ-নিদান ;
বাঁধুক জগতজনে মৈত্রের বন্ধন,
এক প্রাণ রাজা প্রজা, সধন নির্ধন।

আলস্য প্রমাদ লোভ, যাক্ এ জঞ্জাল,
ক্ষমা দয়া প্রীতি হৃদি থাক্ চিরকাল ;
অনাচার অত্যাচার হোক্ নিবারিত,
হউক্ সত্যের জয়, মিথ্যা পরাজিত।

৬

আধিব্যাধি অমঙ্গল যাক্ দূরে যাক্,
স্বাস্থ্য কান্তি মকরন্দে জীবন জুড়াক্ ;
যুদ্ধ বিগ্রহের হোক্, হোক্ অবসান,
উড়ুক্ ধরণীমাঝে শান্তির নিশান।

৭

দুর্জ্জয় বিষয়তৃষ্ণা যাক্ থেমে যাক্,
বিবেক বৈরাগ্য দুই থাক্ কাছে থাক্ ;
শকতি অপরাজিত, দেবভক্তি মাথে,
পথের সম্বল চির থাক্ সাথে সাথে।

৮

গিয়াছে কতই বাত্যা বুকে বজ্রহানি,
সমুখে কি আছে দেব কিছুই না জানি ;
সুখ দুখ যাই দেও, সুধা বা গরল,
মানি লব, ইচ্ছা তব হউক্ সফল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষ-বরণ।

এস তুমি এস নূতন অতিথি!
উষার রতন-প্রদীপ জ্বালি';
রৌদ্র এখনো হয়নি অসহ
এখনো তাতেনি পথের বালি।
মধু যামিনীর মোতিহার ছিঁড়ে
ছড়ায়ে পড়েছে মহুয়া ফুল,
তোতার তুতিয়া রঙের নেশায়
বনভূমি আজ কী মশ্‌গুল!
রেশ্‌মী সবুজে সাজে দেবদারু,
পশ্‌মী সবুজে রসাল সাজে,
আবৃত ধরার কিশোর-গরব
সবুজের মখ্‌মলের মাঝে।
কত ফুল আজি পড়িছে ঝরিয়া,—
পড়ুক ঝরিয়া নাহিক ক্ষতি;
হাল্‌কা হাওয়ার দিন সে ফুরাল,
উদিল জীবনে তপের জ্যোতি।
বসন্ত আজ মাগে অবসর
যৌবন শোভা পড়িছে ঝরি;
চির-নবীনের ওগো নব দূত!
তোমারে আজিকে বরণ করি
এস গো মৌন! মর্ত্ত্যভুবনে
নীরব চরণে এস গো চ'লে,
তন্দ্রা-তরল স্বচ্ছ আঁধার
উঠিছে দুলিয়া হাওয়ার দোলে
ওগো পুরনারী ভরি' হেম ঝারি
চন্দন বারি ঢালো গো ঢালো।
শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
আকাশে বিছায় উষার আলো।
এস গো নূতন! রাজার মতন
এস আলোকের চতুর্দ্দোলে,
অশোকের ফুলে বুলে মধুকর
আমের কুঞ্জে কোকিল ভোলে।
আদি প্রভাতের প্রসন্ন প্রভা
পরাণে আবার মিলাও আনি'
ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন
পুরাণোর 'পরে পর্দ্দা টানি'।
বাসি স্বপনের কজ্জল-লেখা
হয়তো নয়নে রয়েছে লাগি'
তাম্বুল-রাগ রয়েছে অধরে
সে ত্রুটির ক্ষমা নীববে মাগি।
মঙ্গলারতি করিছে পাখীরা
চামেলি বরিষে লাজাঞ্জলি,
পুণ্যাহ! ফিরে এস গো জীবনে
প্রভায় ভুবন সমুজ্জ্বলি'।
উঁচু সুরে বেঁধে তুলেছি সেতার
বাজাও তাহারে যেমন খুসী,
দীপকে বাহারে মেঘে মল্লারে
কখনো হাসিয়া কখনো রুষি'।
চন্দন-লেখা দ্বারে দ্বারে আজি
বন্দন-মালা দুলিছে বায়ে,
পেয়ারা ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই
ছড়ায়ে পড়িছে দখিণে বাঁয়ে।
উৎসব-সুরে বাঁশী বাজে পুরে
অতিথি আলয়ে এস হে তবে,
সাক্ষী দেবতা, তোমায় আমায়
সপ্তপদীর অধিক হ'বে।
রৌদ্র তখন রহিবে না মৃদু,
তাতিয়া উঠিবে পথের বালি,
তবু এস তুমি, অজানা পথিক!
আশার রতন-প্রদীপ জ্বালি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবাহ। (গল্প)

অদ্য রবিবারে তাহার আয়ুর্বৃদ্ধান্ন, আগামী রবিবারে বিবাহ। বি এ পরীক্ষার পর গৃহে আসিয়া মাসাবধি কাল হইতে সুকুমার এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব রজনী তাহার জাগরণে কাটিয়াছে বলিলেই হয়। একটা অনির্দ্দিষ্ট আনন্দ উত্তেজনায় তাহার মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম শিরা বিশিরা—এমন কি প্রত্যেক অ-পরমাণুটি পর্য্যন্ত যেন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ভোরবেলায় সামান্য তন্দ্রা আসিতে না আসিতে উৎসব বাঁশরীর ভৈরবীতানে—একটা দুঃস্বপ্ন লইয়া সে সহসা জাগিয়া উঠিল। তন্দ্রাবেশে সুকুমার স্বপ্ন দেখিতেছিল—যেন তাহার চাবি হারাইয়া গিয়াছে।

ছেলেবেলায়—যখন তাহার বয়স সাত আট বৎসর, তখন একবার তাহার একটি চাবি হারাইয়া গিয়াছিল। তাহার মামা বাড়ী আসিবার সময় কলিকাতা হইতে তাহাকে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র জাপানী বাক্স আনিয়া দিয়াছিলেন। বাক্সটি পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। বাক্সের চাবিটি দেখিতে ছিল ঠিক রূপার মতন। সুকুমার দিনের মধ্যে কতবার যে বাক্সটি খুলিত, বন্ধ করিত, আবার সন্তর্পণে চাবিটি লুকাইয়া রাখিত তাহার ঠিক নাই। এইরূপ অতি সাবধানতা বশতই বোধ হয়—একদিন তাহার সেই সাত রাজার ধন এক মানিক চাবিটি হারাইয়া গেল। চাবির দুঃখে সে একান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িল। এতদিন সকলে ভাবিত, বাক্সটিই তাহার প্রিয়সামগ্রী, এখন বুঝিল চাবির জন্যই বাক্সের আদর।

তখন মা বাঁচিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে আর একটি জাপানী বাক্স আনাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে সুকুমারের পূর্ব্ব চাবির বিরহদুঃখ ঘুচিল না। তাহার মনে হইল—ইহা ত পুরাতনটির ন্যায় সুন্দর নহে। দু-একদিন নাড়াচাড়া করিয়াই সে—তাহারই নামধেয় প্রিয় বয়স্য আর এক সুকুমারকে সেটি দান করিয়া ফেলিল। এই বন্ধু-সুকুমার বয়সে কিছু বড় বলিয়া আমাদের সুকুমার ইহাকে সুখ্‌দা বলিয়া ডাকিত। পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আমরাও সময় সময় ইহাকে সুখনামেই অভিহিত করিব।

সুখ বন্ধুদত্ত বাক্সটি আনন্দে গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে পকেট হইতে সেই হারান চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল। মুহূর্ত্তকাল, সুকুমারের মূর্ত্তি আনন্দদীপ্ত হইয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধস্বরে কহিল; "আমার চাবি! তুমি নিয়েছ! আর আমাকে দাওনি!"

সুখ বলিল—"এইনে। আজ ত দিলুম। না দিলে ত তুই আজও পেতিস নে।"

বালক ভাবিল—তাহাত ঠিক! সে তখন কৃতজ্ঞচিত্তে চাবিটি গ্রহণ করিল।

আজ আনন্দপ্রভাতে সুকুমার সেই চাবি হারানর স্বপ্নই দেখিতেছিল। তফাতের মধ্যে স্বপ্নের চাবিটি রূপার নহে সোনার, আর বাল্যকালের হারান চাবিটি পরে সে ফিরিয়া পাইয়াছিল—স্বপ্নের চাবিটা খুঁজিয়া না মিলিতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া সে যখন বুঝিল ইহা সত্য নহে স্বপ্ন মাত্র,—তখন খুব একটা আরাম বোধ করিল। তথাপি গত রজনীর কল্পনানন্দ ফুল্লপ্রভাতে

একটা বিষাদময় ভাবে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। উৎসব বাশরীর মধুর ভৈরবীরাগ সুরতরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া হৃদয়ে কেমন একটা করুণ তানই জাগাইয়া তুলিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার নয়নপাতে দুইবিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে, উন্মুক্ত-দ্বারের মধ্য দিয়া তাহার অশ্রুবিম্বিত নয়নপটে অপ্রত্যাশিত আনন্দবিস্ময় ফুটাইয়া তুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল আসিয়া ও কে? তাহার বাল্যবন্ধু সুখদা! সূর্য্যকিরণে যেমন নিমেষে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়—সুকুমারের বিষাদম্লান হৃদয়ও সেইরূপ মুহূর্ত্তে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সে বলিল—"একি সুখদা যে আজ সত্যই সুপ্রভাত।"

২

সুকুমারের বয়স বেশী নহে, আঠার মাত্র। ইহারি মধ্যে সে বি-এ দিয়াছে। ইহাতেই পাঠক বুঝিবেন, সুকুমার বুদ্ধিমান। তথাপি সাংসারিক লোকে সম্ভবতঃ তাহাকে নির্ব্বোধই বলিবেন। কেননা এখনো সে বালকের ন্যায় সরলবুদ্ধি, কপটতা-অনভিজ্ঞ বিশ্বস্ত-হৃদয়। তাহার কল্যাণবিশ্বাসময় মধুর হাসিতে, হৃদয়ের স্বচ্ছরূপ দর্পণের ন্যায় বিভাসিত। তাহার হাসিতে, মূর্ত্তিতে, ভাবে, কথায় শুভ্র বিশুদ্ধ মঙ্গলভাব প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই শতদলে বিকাশিত।

সুকুমারের সহিত তাহার বন্ধুর অনেক দিন হইতেই ছাড়াছাড়ি। সুকুমার এণ্টেন্স-ক্লাসে উঠিয়া পড়িতে গেল কৃষ্ণনগরে—আর সুখ তাহার একবৎসর পূর্ব্বেই বাস করিতে চলিয়া যায় কলিকাতায়। বনগ্রাম তাহার মামার বাড়ী—শৈশবে মাতৃহীন হওয়াতে মাতামহী তাহাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, মাতামহীর মৃত্যু হইবামাত্র তাহার পিতা তাহাকে কলিকাতায় আপনার নিকট লইয়া গেলেন।

ইহাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বড় একটা ছিল না। সুকুমার মধ্যে মধ্যে বন্ধুকে লিখিত—এবং দশ খানার উত্তরে কদাচিৎ একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইলেই সৌভাগ্য বিবেচনা করিত এবং সম্ভবত এইরূপ উপেক্ষাই সুকুমারের বাল্য মিত্রতাকে সুদৃঢ় বন্ধনে এখনো তাহার স্মৃতিবিজড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। বিবাহের খবর সে সর্ব্বাগ্রে সুখদাকেই দিয়াছিল—এবং উৎসবে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেও যে ত্রুটি করে নাই তাহা বলা বাহুল্য।

সুকুমার বিছানা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি মশারিটা তুলিয়া, সুখদাকে টানিয়া লইয়া আবার বিছানার উপর বসিল। কিছুক্ষণ কোন কথা না কহিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসি নীরব হইলেও মধুর আনন্দ সঙ্গীত-পূর্ণ। সুখ বলিয়া উঠিল "তুই ভারী ছেলে-মানুষ।"

"কেন?"

"বিয়েতে এত আনন্দ তোর!"

এ কথায় সুকুমারের আনন্দভাব কিছুমাত্র কমিল না, বিনা প্রতিবাদে নীরব হাসিতে এই অপবাদ সে শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সুখ বলিল—"মেয়ে দেখেছিস?"

"দেখেছি বইকি! তুমিও ত দেখেছ। সত্যবালাকে মনে নেই?

"সেই চার পাঁচ বছরের নোলক-নাকে

কাঁদন-চোখো মেয়েটা?" কাঠের পুতুল হাতে করে চৌধুরীদের পুকুরধারে বসে থাকত—আর পুতুলটা কেড়ে নিতে গেলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ত সেই নাকি? রামঃ!"

সুকুমারের সহাস্যসুন্দর মুখশ্রী এই কথায় কৌতুকপূর্ণ হইয়া আরও মনোহর ভাব ধারণ করিল—সে হাসিয়া কহিল—"এখন আর রামঃ নয়—সুখদা; এখন তাকে সীতাদেবী বলাই সাজে!

"গেছি যে! একেবারে মাথা জল—হাবুডুবু! তোরা যে দেখছি লয়না মজনু হয়ে জন্মেছিস! ভূমিষ্ঠ না হতেই দুজনের প্রেম দাঁড়িয়েছে। ছেলেবেলায় যদি তাকে একটা তাড়া দিয়েছি—অমনি আহা উহু!"

"ছেলে মানুষকে তুমি যে জ্বালাতন করতে সুখদা! আমার ভাবী মায়া হোত! যাহক্ এখন আর সে চার পাঁচ বছরের মেয়েটি নেই—এখন যদি একবার দেখ!"

"সেটা বোধ হয় অদৃষ্টে ঘটছে না,—আমাকে আজই যেতে হবে। তুই বিশেষ অনুরোধ করেছিলি তাই একবার বলে যেতে এলুম।"

সুকুমারের প্রফুল্ল মুখশ্রী সহসা মলিন হইয়া পড়িল। সকাতর অনুরোধে সে কহিল—"না সুখদা তা হবে না। এ হপ্তাটা তোমার থেকে যেতেই হবে। এত কি কাজ—এখন ত ছুটি।"

"আমার ত বিয়ে করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়! তার চেয়ে ঢের মহত্তর কাজে আমি ব্রতী হয়েছি।"

"কি কাজ?"

"দেশের কাজ।

"স্বদেশী হয়েছ? আমিও ত স্বদেশী।"

"নামে স্বদেশী হলে ত হবে না—কাজ করা চাই।"

"আইন পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমিও কাজ করব। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।"

"মনে মনে ঠিক করলে ত হবে না; যে কাজই কর—আগে থাকতে ত প্রস্তুত হতে হবে—"

"আমি ভেবেছি দেশে একটা শিল্প স্কুল করব—চাষাদের জন্যে—"

"হাইহো! আবার ছেলেমানষি! তোর দ্বারা সংসারে দেখছি কিছু হবে না! টাকা আসবে কোথা থেকে?"

"কেন উপার্জ্জন করব! চাঁদা তুলব—আর আমার যা সম্পত্তি আছে—তা—"

"তবেই হয়েছে! তোর সম্পত্তি আর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করলেই দেশোদ্ধার হবে বটে! এদেশে দেশের কাজে চাঁদা কেউ দেবেনা—দিতে যারা ইচ্ছা করবে ভয়ে তারাও পারবে না। এখানে টাকা তোলার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে—"

"কি?

"ডাকাতি। ঘাড় ধরে আদায় করা গবর্ণমেণ্টও ত আসলে তাই করে। দেশের কাজে আমরাই বা তা না করব কেন?"

সুকুমারের প্রত্যেক শিরা ঘৃণা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—"নিশ্চয়ই তুমি ঠাট্টা করছ সুখদা! সত্যি যে তুমি এ রকম মনে কর—কিছুতেই আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনে। অত্যাচারে কখনও মঙ্গল হতে পারে? দেশানুরাগ শিক্ষা দিতে হলে, ন্যায়ানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, একতা এ সব

আগে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অধর্ম্মে, অত্যাচারে কেবল যে সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেবে—তা নয়—একতার মূলেই আঘাত পড়বে—”

“তোমার আর লেকচার দিতে হবে না। ওসব বাঁধা বুলি সব জানা আছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবই অবস্থানুসারে;—ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন—

‘মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে,—’

পড়ে দেখ।” পকেট হইতে একখানা গীতা বাহির করিয়া সে সুকুমারের হাতে দিল। এই সময় একজন চাকর আসিয়া বলিল, “দাদাবাবু, বেলা হয়েছে উঠুন। মঙ্গল স্নান করতে হবে—মাঠাকরুণরা ডাকছেন।”

সুকুমার বলিল—“আচ্ছা যাচ্ছি তুই এগো”। সে চলিয়া গেলে বন্ধুনির্দ্দিষ্ট খোলা-পাতায় চোখ বুলাইয়া সুকুমার কহিল—“দ্বিতীয় অধ্যায়। আচ্ছা সুখদা, এখন থাক্, বিকালে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে, দুজনে মিলে পড়ব এখন।” বলিয়া বইখানা সে বিছানায় রাখিল। সুখ বলিল,—“বিকাল পর্য্যন্ত আমি ত থাকতে পারব না—একটার ট্রেণে আমাকে যেতেই হবে।”

বিবাহ পর্য্যন্ত কয়েকটা দিন থাকিবার জন্য তাহাকে সুকুমার অনেক উপরোধ অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই টলাইতে না পারিয়া অবশেষে কহিল—“আচ্ছা আজ তবে যাও—বিয়ের দিন কিন্তু ভাই আসতেই হবে, কথা দাও।

“দেখব,—তবে ঠিক বলতে পারিনে।”

আবার ভৃত্য আসিয়া ডাকিল, দাদাবাবু এস। মাঠাকরুণরা ডাকাডাকি করছেন—, শুভ সময় বয়ে যায়।”

উভয়ে তখন ভৃত্যের অনুবর্ত্তী হইল।

(৩)

গায়ে-হলুদ, স্নানোৎসব, ভোজ সকলি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চন্দন চর্চ্চিত, রক্তবস্ত্রপরিহিত সুকুমার সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, বিশ্রাম মানসে অপরাহ্ণে পালঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার বন্ধু সুকুমার আহারান্তে একটার গাড়ীতেই চলিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া গীতাখানা হাতে লইয়া খুলিতেই এই শ্লোকটি তাহার চোখে পড়িল—

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়
সর্ব্বভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

নিবিষ্ট চিত্তে ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সুকুমার মনে মনে কহিল—“কি সুন্দর উপদেশ। আর সুখদা আমাকে কি যে বোঝাচ্ছিলেন!”

এই সময় বাহিরে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উঠিল;, সুকুমার তাড়াতাড়ি বিছানার উপর গীতাখান ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল পুলিসের লোকে উঠান-পূর্ণ। একজন তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “আপনার নাম সুকুমার?” উত্তর হইল,—“হ্যাঁ”। তখন বিনাবাক্যব্যয়ে তাহারা বাটীর সর্ব্বত্র প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা ভয়বিকম্পিতা হরিণীর ন্যায় ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুইজন পুলিসের লোক সুকুমারের শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। বিছানার উপর গীতাখানা দেখিতে পাইয়া একজন তাহা উঠাইয়া লইয়া সহর্ষে

চীৎকার করিয়া উঠিল—"গীতা গীতা"! যেন আর্কিমিডিসের ন্যায় সেও একটা কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সহসা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন আর একজন সাগ্রহে তাহার হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং দুই বন্ধুতে মিলিয়া তখন গীতার পাতাগুলি মথিত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। স্থানে স্থানে শ্লোকের নীচে যে সকল অস্পষ্ট ইঙ্গিত মন্তব্য টীকাটিপ্পনি ছিল পুলিসের অণুবীক্ষণ নেত্রালোকে তাহা সুস্পষ্ট বিদ্রোহিতারূপে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এমন কি, ডাকাতির তারিখটি পর্য্যন্ত তাহার প্রচ্ছন্ন আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া পড়িল। এই জ্বলন্ত অকাট্য প্রমাণ হস্তে ধরিয়া তাহারা আর অধিক জিজ্ঞাসাবাদের কোন আবশ্যক দেখিল না, স্বাধিকারভুক্ত সম্পত্তির ন্যায় বিনাবাক্য ব্যয়ে তখন সেই পুলিস পুঙ্গব দুইটি সুকুমারকে দখল করিয়া ফেলিল।—বাড়ীতে কাতর ক্রন্দনরোল উঠিল, নিমন্ত্রণ আনন্দ জনতা মুহূর্ত্তে শোক বাত্যায় যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধরালুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে সুকুমারের মা নাই, পিতা উন্মত্ত আকুলকণ্ঠে বলিলেন—"ওকে কোথায় নিয়ে যাও? আগে আমাকে মেরে ফেল,—নিয়ে যেতে হয়—তারপর নিয়ে যেও—" এই বলিয়া তিনি একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিষণ্ণ গম্ভীর বন্দী সুকুমার একান্ত বিশ্বস্তচিত্তে কহিল—"বাবা আপনি ভাববেন না, আমি নিশ্চয় ফিরব, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ন্যায়বিচারের প্রতি সন্দেহ করবেন না,—আমাকে যেতে দিন।" চারিদিকের ক্রন্দন রোলের মধ্যে—কন্যার পিতামহ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁদিয়া কহিলেন,—"ছেড়ে দাও বাবা, সুকুমারকে ছেড়ে দাও, আগামী রবিবারে বিবাহ, আজ গায়ে হলুদ পড়ে গেছে। হিন্দুর সন্তান হয়ে বাবা তোমরা অধর্ম্ম করোনা। আমাদের জাত যাবে—জাত যাবে—ওকে ছেড়ে দাও, ব্রাহ্মণের দোহাই—তোমাদের,—ওকে ছেড়ে দাও বাবারা!" একজন পুলিস ইন্‌স্পেকটার যে সবে মাত্র পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে—এ রকম কার্য্যে এই তাহার হাতে খড়ি, ইহাদের আর্ত্তনাদে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইন্‌স্পেকটার সাব হাসিয়া বলিলেন—"ভাবনা কি মশায়! হিন্দু হয়ে কি আমরা হিন্দুর জাতধর্ম্ম মারতে পারি? কিছু চিন্তা করবেন না—আমরা ঠিক সময়েই এঁকে ফিরিয়ে আনব।" পিতা কহিলেন, নিয়ে যেও না বাবারা—ওকে নিয়ে যেও না;—ও গেলে এ ব্রাহ্মণ বাঁচবে না, তোমাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে—"

সুকুমার সজলনেত্রে অথচ ধীরকণ্ঠে কহিল—"বাবা ভাববেন না, ধৈর্য্য ধরুন,—নিশ্চয় ফিরব,—আমি ত দোষী নই।" ইন্‌স্পেকটার সাহেব সহাস্যে কহিলেন "তাহলে নিশ্চয়ই ভাবনার কোন কারণ নেই। তবুও যদি না ফেরে—ঠাকুর মশায়—তাহলে কিন্তু আমাদের দায় দোষ নেই,—শাপটাপ দেবেন না,—তাহলে বুঝে নেবেন ছেলেই দোষী—অধর্ম্মের কি কখনো জয় হয়!"

দারুণ হৃদয় বেদনা—আর্ত্তনাদ হাহাকারের মধ্যে পুলিস সুকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল।

ক্রমশঃ

কালোর আলো।

সঙ্গীতের প্রকাশ সুরে এবং বাণীতে, কাব্যের প্রকাশ ভাষায় ও ছন্দে, শিল্পের প্রকাশ তেমনি রেখার বর্ণে এবং গঠনে, কিন্তু এগুলা সমস্তই শিল্পের বহিরঙ্গিন পদার্থ, যেন মন ভুলাইবার সুন্দর ঝুমঝুমি! কবির মনোবীণায় যে সুর বাজিতেছে, যে ছন্দ যে কথা জাগিতেছে, শিল্পীর মনে যে বিচিত্র ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে সেইগুলাকে সাধারণের চক্ষুকর্ণের গোচর করিবার জন্যই কবিতা ছন্দ রেখা বর্ণ ইত্যাদি; সুতরাং এই বহিরঙ্গিন পদার্থগুলাকেই আসল বলিয়া ভ্রম করিও না। ঘুমপাড়ানো গান ঘুম আনিবার উপায় মাত্র, রঙ্গিন ঝুমঝুমিটা কান্না ভুলাইবার জন্য মাতৃস্নেহের একটা —নাই মামার চেয়ে কাণা মামা গোছের —প্রতিচ্ছায়া।

সকল সঙ্গীতের সঙ্গে একটা অনাহত সুর, সকল কবিতার ভিতরে একটা অলিখিত কাব্য এবং সকল শিল্পের অন্তরে একটা প্রচ্ছন্নরূপ বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই অলিখিত অনাহত অপ্রকাশিতকে প্রকাশিত করিবার প্রকাশিত দেখিবার ইচ্ছা ও চেষ্টাতে তোমারই বল বা তোমার শিল্পের সঙ্গীতের আর কাব্যেরই বল চরিতার্থতা।

মায়ের যেমন স্নেহ-কণ্ঠ ঘুমপাড়ানো গানের বিচিত্র সুরের নানা কথার ভিতরে ভিতরে বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত গানটাকে একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রদান করে, তেমনি যথার্থ শিল্পের অন্তরে অন্তরে—গাছের পাতায় পাতায় ফুলে ফলে, শাখায় প্রশাখায় জীবনী রসের মত—একটা অনির্ব্বচনীয় শ্রী বহিরঙ্গিন গঠন বর্ণন ইত্যাদিকে সজীবতা দান করিয়া বিদ্যমান থাকে। নবরসের নয় মূর্ত্তি অতি সূক্ষ্ম অতি অনুপম এই অমৃত মূর্ত্তিরই স্থূল আবরণ, আর রেখা বর্ণ ইত্যাদি—এই নবরসকে সাজাইবার বহির্বাস। ঠিক যেন সূত্রাত্মাকে ঘেরিয়া পঞ্চভূতের সমষ্টি, তাহার উপরে নানা বর্ণের নানা ঢঙ্গের নানা বেশ!

মানুষের আত্মা ও মানুষের দৈহিক সৌকুমার্য্য এবং বৈকল্যের মধ্যে যতটা পার্থক্য এবং যেটুকু সংযোগ, শিল্পের গোচর অংশটার সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত সার পদার্থটির তেমনি যোগাযোগ।

কুম্ভ যেমন বারিকে ধারণ করিয়া সার্থক হয়, শিল্প সামগ্রীও তেমনি এই অমৃতরসকে ধারণ করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে; নচেৎ তাহা শূন্য নিরর্থক। নিরর্থক এবং সার্থক এই দুই প্রকার শিল্পের প্রভেদ বোঝার নাম শিল্প জ্ঞান এবং এই জ্ঞানলাভের উদ্দেশেই শিল্পচর্চ্চা।

"বিশ্বজগতের নব নব বিচিত্রতার মধ্যে একেকে পাইবার জন্য যোগীর প্রয়াস আর শিল্পীর সমস্ত চেষ্টা নবরসের বিচিত্র রূপের ভিতরে সেই অমৃতরূপকে পাইবার জন্য। স্থিরচিত্ত যোগী, মরণের ভীষণতায়, জীবনের নবীনতায়, দিবসের আলোকে, রাত্রির অন্ধকারে, ভয়ের মধ্যে যিনি, মরণে জীবনে যিনি, আঁধারে আলোকে যিনি এক অথচ বিচিত্র তাঁহার সন্ধান পাইয়া বলিলেন 'বেদাহমেতম্' বলিয়াই মনে হইল—আহা যাঁহাকে জানিলাম তিনি কে খুলিয়া বলি 'বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্'—ওগো আমি

যাঁহাকে জানিয়াছি তিনি মহান পুরুষ, এমন করিয়া তাঁহার কথা বলিয়াও মন উঠিল না,—বলিতে হইল ওগো শোনো তাঁর রূপের কথা—'আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ' তাঁর অপরূপ রূপের অরুণ আভা ওই দেখ অন্ধকারের পরপারে দেখা যাইতেছে! চিরসুন্দর যিনি তিনি ভাষা ও ছন্দের বিচিত্রতার ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিলেন এবং এই চিরসুন্দরকে ধারণ করিয়া অলঙ্কার আড়ম্বরহীন ওই গুটিকতক সরল বাণী চিরদিনের জন্য সার্থক হইয়া রহিল।

শিল্পীও যখন করুণ রৌদ্র অদ্ভুত বীভৎস শান্ত প্রভৃতি নব নব রসের অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় রসমূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চিত্র রচনা বা মূর্ত্তি গঠন করেন তখন তিনি যোগীর ন্যায় সেই এককে নানার মধ্যেই ধরিতে চাহেন। তাবৎ শিল্পের মধ্যে কোনটা সার কোনটা বা অসার এটা ধরিবার একমাত্র উপায় সেই অন্তরের বস্তুর নিগূঢ় রসের অনাহত সঙ্গীত এবং প্রচ্ছন্ন রূপের আভাষ পাওয়া, "নান্যঃ পন্থা' অন্য উপায় নাই, এই জন্যই এদেশের পণ্ডিতগণ শিল্পী যোগী কাব্যকার এবং সঙ্গীতবেত্তার জন্য এক ধ্যানের পথই নির্দ্দেশ করিয়া গেছেন।

শৈশবের চপলতা যৌবনের কর্ম্মঠতা বার্দ্ধক্যের প্রশান্ততার ভিতর দিয়া অন্তরের মানুষটির একটা সুস্পষ্ট ছাপ আমার মুখে চক্ষে ক্রমশঃ যখন সুগোচর হইয়া উঠে তখন আর আমাকে চিনিতে সাধারণের বিলম্ব হয় না, তেমতি সার কি অসার শিল্প চিনিতে তিলমাত্র আমাদের বিলম্ব ঘটে না, যখনি কোন শিল্পে অন্তরের ছবির একটা আভাষ বা তাহার অভাব সামগ্রীটার বাহিরের গঠনে আমরা অনুভব করি।

এই আভ্যন্তরীণকে বাহিরে সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়া অসম্ভব, সে প্রকাশিতও থাকে প্রচ্ছন্নও থাকে। ঠিক যেন ফলের মধুরস, সে নিজে প্রচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাহার প্রকাশ ফলটির সুডৌল গঠনে, সুন্দর বর্ণে, সুমিষ্ট ঘ্রাণে। শিশুর নিকটে ফলের সুডৌল গঠন, সুরঙ্গ সুষমাই যথেষ্ট খেলিবার যেন চমৎকার ভাঁটা! রসিকের পক্ষে সেটি অত্যাশ্চর্য্য রসের কুম্ভ দেবতাকে ভোগ দিবার, দেখিবার, দেখাইবার, আস্বাদ লইবার, আস্বাদ গ্রহণ করাইবার সামগ্রী; শিল্পও তেমনি কাহারও কাছে রঙ্গিন খেলা; কাহারও কাছে এক অতি বিচিত্র লীলা।

এই প্রচ্ছন্ন রসের সন্ধান পাইয়া কি শিল্পী, কি কবি, কি যোগী কেহই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের বলিতেই হয় 'শৃন্বন্তু বিশ্বে'—ওগো তোমরা শোনো, তোমরা দেখো'—এই প্রচ্ছন্নকে শুনাইবার, দেখাইবার, শুনিবার, দেখিবার জন্য কত না আয়োজন, কত বর্ণ কত রেখা কত গঠন কত গান!

শাস্ত্রেরও এ কথা শিল্পেরও সেই কথা 'এতজ্জ্ঞেয়ং' জানিবার সামগ্রী তিনি। শাস্ত্রেরও যেখানে শেষ শিল্পেরও সেইখানে শেষ 'নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ' সেই অবিদিত অনাহতকে জানা ছাড়া শোনা ছাড়া আর কিছুই নাই।

তাজমহলের শুভ্র মর্ম্মরে বিচিত্র রত্নের

আভায় বিকশিত হইয়া মৃত্যুর স্তব্ধ অন্ধকারের পরপার হইতে যে অনাহত সুর, অপরূপ আলো আসিতেছে তাহাই দেখ।

তিমির সাঁঝকো গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন তনমে
পশ্চিম্ দিশ্ কী খিড়কি খোলো
ডুবহু প্রেম গগন মে
চেত-কংবল-দল রস পিয়োরে
লহর লেহু যা তনমেঁ
সংখ ঘণ্ট সহনাই বাজৈ
শোভা সিন্ধু মহল মে
কহৈঁ কবীর শুনো ভাই সাধো
অমর সাহব লখ ঘটমে

সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন প্রেমার্ত্ত সাজাহান রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দুয়ার খুলিয়া তাজ-মহলের দিকে চাহিয়া তনুমনকে প্রেমসাগরে ডুবাইয়া দিত তখন যে অনাহত সঙ্গীত যে অপ্রকাশিত রূপ লক্ষ্য করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া যাইত তাহাই তাজমহলের যথার্থ শোভা এবং তেমনি করিয়া শিল্পকে দেখাই যথার্থ দেখা। মনে করিও না তাজমহলটি মহার্ঘ মণি দিয়া সুসজ্জিত বলিয়া এত সুন্দর, মনে করিও না তাহার গঠন নিখুঁত সেইজন্য তাহার আর জোড়া নাই! স্থাপত্য শাস্ত্রানুসারে দেখিলে তাজমহলে সহস্র দোষ বাহির হয়, অলঙ্কার শিল্পের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহার সাজ-সজ্জায় মণিমাণিক্যের বাহুল্যের দর বেশি নয়, ভারতে সহস্র সহস্র মন্দির আছে যাহা বাদশাহি ওই খেলেনাটি অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, অথচ তাজমহল আমাদের নিকট অতুলনীয় সামগ্রী! যমুনাতীরে এই মণিমাণিক্য মণ্ডিত বীণায় যে বিরহের গাথা চিরদিন ধরিয়া বাজিতেছে তাহার বিচিত্র মূর্চ্ছনার ভিতরে ভিতরে এক বিশ্বব্যাপী অথচ গোপন ক্রন্দন কি জানি কেমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে! এই যে মহাসঙ্গীত ইহারই মূল্যে তাজমহলের মর্ম্মর ভিত্তি চারিখানা অমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ছবির মূল্য যেমন গিল্টির ফ্রেম বা রঙ্গের পোঁচড়া দিয়া নয় তাজমহলের মূল্যও তেমনি তাহার বাহিরের খোলাখানি দিয়া নয়। পাখী না থাকিলে সোনার খাঁচার যে মূল্য, শিল্পের ভিতরে ওই অমৃতরস না থাকিলে তাহারও সেই একই মূল্য। সোনার খাঁচা অথচ পাখী নাই কোথায় তাহার আদর, কাঠের খাঁচা অথচ পাখীটি ধরা আছে তাহারও যে দর সোনা দিয়া স্থির হয়। এই অমৃতরস কেবলমাত্র যে সুগঠনের ভিতরেই বর্ত্তমান থাকিবে এমন কোন কথা নাই। বিশ্বজগতের ষোল আনার এক আনা মাত্র মানুষ সুন্দর বলিয়া পরিচিত তাই বলিয়া কোমলতাই বল মনুষ্যত্বই বল কেবল যে ওই এক আনার ভিতরে নাই, সে যে সুন্দরে যেমন কালোতেও তেমনি সমভাবে বিদ্যমান! সাধারণে যে কেবল চাক্ষুস এবং বহিঃসৌন্দর্য্যের বাটখারা দিয়া শিল্পের গুণাগুণ বিচার করিতে বসেন সেটা আগাগোড়া ভুল, যেন মুক্তার বিচার শুক্তির বহিরাংশটা দেখিয়া।

কবীর বলেন 'সবহি মুরতবীচ অমূরত, মূরত কি বলিহারি—কি ভালো কি কালো সকল মূর্ত্তির মধ্যে অমূর্ত্ত, বলিহারি যাই সকল মূর্ত্তির!

নারিকেল ফলের বাহিরটা খোলা ও ছোবড়া কিন্তু কে তাহার অনাদর করিবে,

তাহাতে যে জল আছে সুধা আছে। মাকাল ফলে রঙ আছে রস নাই তাহার আদর কেনই বা কর না?

শিল্পের যে মূর্ত্তির ভিতরে অমৃত নাই সে সুগঠিত হইলেও কুরূপ আর যাহাতে অমৃত আছেন অথচ সুগঠিত নয় সেও আমাদের কাছে সুরূপ।

কেবল নিজের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিরই ছাপটা শিল্পিগণ যদি নিজের নিজের হাতের কাজে রাখিয়া দেয় এবং আমরাও আপন আপন সৌন্দর্য্য বুদ্ধিটুকু লইয়াই কেবল যদি শিল্প চর্চ্চাটা করিতে চলি তবে উভয় দিকেই কি বিষম গোলযোগ না বাধিয়া উঠে।

এটাতো প্রতিদিনই দেখিতেছি শিল্পী যেটা সুন্দর বলিয়া গড়িতেছে সাধারণে সেটাকে কুৎসিত বলিয়া বসিয়া আছে। দশ জনে একটা চিত্র বলিল ভাল আর পচিশ জনে বলিয়া উঠিল মন্দ। বাহিরের সৌন্দর্য্যে শিল্পের প্রতিষ্ঠা এটা যতদিন আমাদের বিশ্বাস থাকিবে, যতদিন আমরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে শিল্পকে দেখিতে চলিব, ততদিন ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে।

বহিঃসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া আমরা লোকরঞ্জন বা পয়সা আহরণ করিবার উপায় স্বরূপ বাজারে যে শিল্পটা কাটতি হয় তাহার একটা মোটামুটি দর স্থির করিতে পারি কিন্তু যখনই আমরা একটা যথার্থ শিল্পের সম্মুখে উপনীত হই তখনই দেখি যে হালে আর পানি পাই না; দেখি সেখানে সু যে কু যে, বড় প্রভেদ নাই, দুয়েরই সমান আসন সমান আদর। মনে হয় শিল্পী কেবল খেলা করিয়া গেছে রঙ্গে বেরঙ্গে একটা জট পাকাইয়া রাখিয়া গেছে, শিল্পী যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিয়া রেখাগুলা টানিয়াছে এমন মনে হয় না—তাহার যে কোনকালে সৌন্দর্য্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে মনও আমাদের কঠিন হইয়া উক্ত প্রকার শিল্প হইতে বিমুখ হয়! কেবলমাত্র বহিঃ সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া শিল্পকে দেখায় এই বিপদ। কিন্তু তাহা না করিয়া খোলাটা বাড়ার ভাগ বলিয়া উপরের অংশটা অন্তরের বস্তুকে প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র জানিয়া যদি আমরা শিল্পচর্চ্চা করিতে চাল তবে আমরা দেখি—আহা শিল্পী কি খেলাই খেলিয়াছে!

'ফুল তৈল মিল ভয়ো ফুলেল'

একদিকে তেল ছিল আর একদিকে ছিল ফুল, শিল্পী দুইকে এক করিয়া ফুলেল প্রস্তুত করিল। ফলের উপরটা দেখিয়া ফলের আস্বাদ গ্রহণ করা চলে না, তর্ক চলে বটে।

রাঙ্গা হইলে সুডৌল হইলেই ফল যে মিষ্ট হয় তাহা নয় পাহাড়ি আতা গঠনে কদর্য্য কিন্তু অপূর্ব্ব তাহার মিষ্টতা! আবার যেমন সুরঙ্গ যেমন সুডৌল তেমনি মিষ্ট এমন ফলও প্রায়ই দেখা যায়! সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে কি সুডৌল কি বেডৌল সকলেই মধুরস থাকিতে পারে।

ফলের অন্তর বাহির বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার নাম যেমন সেটি চাখা নয় তেমনি কোন চিত্রের বা কোন মূর্ত্তির অন্তর বাহির পৃথক করিয়া দেখার নাম দেখাই নয়—

বিছুড় নহি মিলিহো
জো তরবর ছোড় বনধামরী—

তরুকে ছাড়িয়া বন, বনকে ছাড়িয়া তরু মিলিবে কোথায়?

দিবসে রাত্রে, আলোকে আঁধারে কালের যেমন অধিষ্ঠান, শিল্পেরও অধিষ্ঠান তেমনি শোভন এবং অশোভন এই দুই পাদপীঠে—

'বাহর ভিতর সকল নিরন্তর
চিত্ত অচিত দউ পীঠা লো।'

ঋষিগণ বলেন 'মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' সত্যকে অপ্রিয়বেশে ধরিতে নাই, শিল্পীর অন্তরে যে সত্য প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে যথাসাধ্য প্রিয় এবং মনোহর বেশে সাজাইয়া লোকের সম্মুখে ধরাই শিল্পীর কায; ক্ষমতার তারতম্য হিসাবে কাহারও সাজ ভাল হয়, কাহারও সাজ ভাল হয় না; কিন্তু অপ্রিয়বেশে দেখা দিলেও সত্য যেমন সত্যই, সুদৃশ্য না হইলেও শিল্পের যথার্থ অংশটা চিরদিনই তেমনি মনোহর। স্বর্গীয় লালাবাবুর নিকটে সত্যটা কুৎসিতা মৎসবিক্রয়েত্রীর মুখ হইতে যে মার্জ্জিত ভাষায় সুন্দর আকারে দেখা দিয়াছিল তাহা নয় কিন্তু সেজন্ত তাহার মনোহারিত্বের কিছু যে লাঘব হইয়াছিল এমন তো মনে হয় না।

সকল শিল্পে অন্তর্নিহিত যে রূপ সে চিরদিনই সুন্দর। অলঙ্কারে সাজাইলে তাহার মূল্য বাড়ে না, নিরালঙ্কারে রাখিলেও তাহার মর্য্যাদার হানি হয় না। সুন্দরে অসুন্দরে কঠোরে কোমলে, ঐশ্বর্য্যে হীনতায় সর্ব্বত্র তাহার প্রকাশ সম্ভব। মনে করিতেছ খুব একটা জটিল সমস্যার ভিতরে তোমাদের লইতেছি। শিল্পের ভাল মন্দ বিচার করা ক্রমশই গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। কোথায় শিল্পের অপ্রকাশিতরূপ বর্ত্তমান আর কোথায় বা তাহার অভাব তাহা জানিবার উপায় কি?

বল দেখি কেমন করিয়া আমরা দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারি এ বাড়িতে গৃহস্থ বাস করিতেছে, ওটাতে ঘুঘু চরিয়াছে? খোলার ঘরেও গৃহস্থ থাকিলে তাহার এক শ্রী আর স্বর্ণ অট্টালিকায় লোক না থাকিলে তাহার এক শ্রী। এটা যেমন আমরা চক্ষে দেখিতে পাই, তেমনি যে শিল্প রসস্বরূপকে ধারণ করে আর যে সেটা না করে তাহাদের উভয়ের পার্থক্য বাহ্য লক্ষণেই প্রকাশ পায়; সুতরাং আসলে নকলে প্রভেদ শূন্যে ও পূর্ণে প্রভেদ বোঝা কিছুই দুষ্কর নয়।

যে শিল্পী সত্যই রসিক সে এই রসস্বরূপের সন্ধানেই নিজের ক্ষমতা এবং অক্ষমতাকে নিয়োগ করে, আর যে কেবল মাত্র চতুর সে নানা বর্ণে নানা ছন্দে নিজের চাতুর্য্যই প্রকাশ করিতে গিয়া এ কথা ভুলিয়া যায় যে এত বর্ণ এত রেখা এত শিল্পকৌশল সমস্তই সেই এক অপ্রতিষ্ঠিতকে বহু বিচিত্রতার ভিতর প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ও দেখাইবার জন্য! যে শিল্পের ভিতরে রসের সন্ধান করে তাহার কাছে স্বর্গও নাই নরকও নাই, সে দেখে সুন্দরে অসুন্দরে এক মহা সুন্দর বর্ত্তমান।

"অনজানেকো স্বর্গ নরক হৈ হরি জানেকো নাহি।" কথায় বলে "শ্যামসুন্দর। শ্যাম বর্ণটা বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু সেটা শ্যাম হইয়াও সুন্দর হয় যাহার গুণে তাহাকেই পাইবার চেষ্টা কর, একদিকে শ্যাম একদিকে সুন্দর দুয়ের ভিতর দিয়াই এক যিনি তিনি প্রকাশিত হইতে চাহেন। সেই যথার্থ শিল্পী যথার্থ

সাধক যথার্থ কবি যে দ্বৈতের অন্তরে অদ্বৈতের গঠিতের ভিতরে অগঠিতের স্থাপনা করে।

বাণ সহজেই সুন্দর সহজে হৃদয় বিদ্ধকারি, ধনুতে সে যখন আরোপিত তখন সে ধনুর্গুণের কাঠিন্য এবং কোমলতা দুয়েতেই প্রতিষ্ঠিত, তেমনি শিল্পের অবিদিত রস সহজেই মনোহর এবং নব রসের কটু তিক্ত মধু প্রভৃতি বিচিত্রতার উপরে তাহার প্রতিষ্ঠা।

শিল্পের এই অপ্রকটিত মূর্ত্তিকে ধরিতে হইলে মনোযোগ করিয়া বসিতে হইবে। এই মনোযোগের আর এক নাম ধ্যান। হিন্দুস্থানীরা বলিয়া থাকে 'ধ্যানসে পড়ো, ধ্যান সে দেখো, ধ্যান সে বনাও'। মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখ যথার্থ অর্থটা ধরা পড়িবে। পুস্তকে যেটা অক্ষর ছন্দ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে ধরা থাকে, সেই বস্তুই শিল্পে, গঠন বর্ণ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। অমনোযোগে পাঠকের অর্থ গ্রহণ যেমন দুষ্কর, বিনা ধ্যানে শিল্পে রস পাওয়া তেমনি কঠিন। অমনোযোগে বইখানাই পড় বা চিত্রই দেখ দেখিবে সবটাই হিজি বিজি পোছ পাঁছ।

যদি সঙ্গীতের ভিতরে অনাহতকে, শিল্পের ভিতর অলিখিতকে, প্রকাশের ভিতর অপ্রকাশিতকে, প্রকটের ভিতর অপ্রকট এবং বিচিত্রতার মধ্যে এক অবিকৃতকে পাইতে চাও তবে—'ক্যা তুম শোবত মোহ নীঁদমে' কেন মোহনিদ্রায় শুইয়া আছ?

'চিত সে শব্দ শুনো'—মন দিয়া একবার শ্রবণ কর

'সর্ব্বন দে উঠত ধূণ রাগরী'

সকল দেহে, সকল গঠনে, সুরে, কুয়ে, কদয্যে সৌন্দর্য্যে কি মধুর রাগিণী উঠিয়াছে, কি রূপের আভাই ফুটিয়া পড়িতেছে!

'কহ রাগ তো লেখা ন জাই
মাত্রা লগে ন কামা'

সেই বর্ণনাতীত বর্ণ তো চোখে দেখা যায় না, সেই অনাহত মাত্রা তো শ্রবণে শ্রুত হয় না!

'ঘুংঘট খোল'—বহির্ব্বাসের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেল ধ্যানসে দেখো, ধ্যান দেকে শুনো' বড় দুঃখে কবীর গাহিতেছেন—

'অনগড়িয়া দেবা কোন করে' তেরী সেবা' হায়রে গঠনের সেবাই সকলে করে কিন্তু সকল গঠনেই যে অগঠিত-বিদ্যমান তাহাকে কয় জন চায়?

স্পর্শ মণির স্পর্শে লৌহ যেমন সু-বর্ণ লাভ করে তেমনি যেমনই গড়া যাক অগঠিত দেবতাকে নিবেদন করিলে তাঁহার চরণ স্পর্শে সেটি একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রসে অভিসিক্ত হয়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পোষ্যপুত্র।

বাড়িতে যথানিয়মিত ক্রিয়াকলাপ কাজ কর্ম্ম সমস্তই চলিতেছে। তথাপি বাঁশি এক হইলেও ভিন্ন সুরে যেমন আনন্দ ও বিষাদ ধ্বনিত হয় সেইরূপ শান্তি না থাকায় লক্ষ্মীপুরে দেবসেবা অতিথি সেবা প্রভৃতি সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যেও কি একটা অভাব, শূন্যতা, শ্রীহীন অবসাদে জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে সিদ্ধেশ্বরীর

হঠাৎ মৃত্যুতে সংসারের সমুদয় ভারই এক সঙ্গে শিবানীর ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে হঠাৎ জাগাইয়া তুলিল। এত বড় সংসার তাহারি দিকে তাহার অসহায় বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া তাহারি বক্ষলীন ক্ষুদ্র শিশুর মত ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। এখন আর তাহার এমন করিয়া নিজের মর্ম্মবেদনায় বিদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত এখানে সেখানে লুটাইয়া লুটাইয়া বেড়াইলে হইবে কেন? সম্মুখে যে সুবিস্তৃত কর্ম্মভূমি তাহার কর্ত্তব্যসাধনের জন্য অলক্ষ্য অঙ্গুলি হেলাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে তাহার অপরিবর্ত্তিত আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহার আছে। নিজেকে নিজের প্রেয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কার্য্যক্ষেত্র উত্তীর্ণ করিবার জন্য মনের মধ্যে বল ও সাহস সঞ্চয় করিবার জন্য তাই সে প্রথমবার নিজের মনের সহিত যুক্তি বিচারের দ্বারা আপোষে মিটাইয়া লইতে চাহিল। যুক্তি দিয়া চিত্তকে বুঝাইতে চাহিল, ঈশ্বর যাহাকে যেখানে দিয়াছেন সেইখানকার সকল কার্য্য সকল কর্ত্তব্য প্রফুল্লান্তঃকরণে যদি সমাধা করা যায় এ জীবন উদ্দেশ্য-বিহীন কেন হবে? এতে কি তাঁকে পাওয়া হয় না? যিনি আজ তাহার মধ্যে সম্মিলিত, একীভূত? শিবানী এই প্রথমবার জোর করিয়া মনে করিল সে বিধবা। ছিঃ সত্যকে পৃথা ভাণের দ্বারা চাপিয়া রাখা মনকে কি সান্ত্বনা দেওয়া না আঁখিঠারা? ঈশ্বরের দেওয়া দণ্ড সহিষ্ণুতার সহিত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই মনুষ্যত্ব। হাহাকার করিয়া মাথা কুটিয়া কর্ম্মবন্ধন যখন খুলিবার নয় তখন তাহাতে জড়াইয়াই বা কি লাভ আছে! শিবানী মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা জোর করিয়া ত্যাগ করিয়া নিজের রুদ্ধ গৃহের দ্বার খুলিয়া হঠাৎ একদিন বাহিরের তপ্ত রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও কিছু বলিল না, চুপি চুপি স্নানের পর সাদা থান পরিয়া হাতের গহনাখানা খুলিয়া ফেলিল।

শ্যামাকান্ত শিবানীর বিধবাবেশ দেখিয়া প্রথমটা তাহাকে চিনিতে পারেন নাই তারপর চিনিয়াই "মা তারা!" বলিয়া ঈষৎ শিহরিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন; বুকের মধ্যে অত্যন্ত অতর্কিতভাবে ভীষণ একটা আঘাত হাতুড়ির ঘায়ের মত সজোরে আঘাত পড়িল। অল্পক্ষণ পরে যেন একটুখানি দম লইয়া আর্ত্তভাবে বলিলেন, বৌমা "আমায় আর সবাই মিলে হত্যা করোনা। কেমন করে তোমার এ মূর্ত্তি আমি চোখে দেখব?" শিবানী এই ভৎসনার জন্য বর্ম্মাচ্ছাদিত যোদ্ধার মতই প্রস্তুত হইয়া সমরাঙ্গনে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে অকুণ্ঠিত সাহসে মুখ তুলিয়া পরিষ্কার স্বরে কহিল "আমায় আর মিথ্যায় কাযে প্রশ্রয় দেবেন না। যা করতেই হবে তার জন্যে প্রস্তুত হওয়াই ভাল।"

শ্যামাকান্ত কাতর ধ্বনি করিয়া বাণাহত বিহঙ্গের মত চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। আকুলকণ্ঠে কহিলেন "তবু যে আশা ছাড়তে পারিনে রে, এখনও যে তাকে ফিরে পাব মনে করতে বড্ড ইচ্ছা করে।"

এদিকে কাশী যাত্রার সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত! সেখানে দেওয়ানজী নিজে গিয়া বাড়ি ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। পুরাতন বাড়ি কয় মাসে মেরামত করিয়া বদলাইয়া বাসোপযোগী সুন্দর করিয়া তোলা

হইয়াছে। এখানেও সব বন্দোবস্ত ঠিক। বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত, ঘর বাড়ির ব্যবস্থা সবই যথাসম্ভব করা হইয়াছে; শুধু তাহার শরীরটা একটুখানি সুস্থ হইলেই যাওয়া হয়। শিবানীও লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করিতে পারিবে ভাবিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সম্মুখাগত সেই সমাজ বন্ধনের বাহিরে জনবিরল কুটিরের শান্তিপূর্ণ স্বাধীন জীবন মনে মনে তপঃপূত শুদ্ধ করিয়া গঠিত করিতেছিল। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় ছাড়িলে আঃ কি অনাবিল অপরিমেয় শান্তি! বনের হরিণী যেন জালবদ্ধ হইয়াছিল। কেবল অতুলকুমারই এ বন্দোবস্তে বড় সুখী হইতে পারিতেছিল না। সে মধ্যে মধ্যে পিতামহকে আসিয়া প্রশ্ন করিতেছিল "সেখানে গাড়ি আছে? পুতুল আছে? কমলা নেবু আছে? আলো কি আছে?"

সেদিন সবে কয়দিন পরে রোদ উঠিয়াছে; রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের বেদনাও অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্যামাকান্ত পাজি দেখাইয়া কাশী যাত্রার দিন স্থির করাইলেন। আগামী বুধবার যাত্রার দিন শুভ। শ্যামাকান্ত মনে মনে বলিলেন "মাগো, যেন শাস্ত্রশাস্ত্র মুক্তি পাই মা। আর কিছুই শুভ আমার নেই; শুধু এখন তোর পাদপদ্মে একটুখানি স্থান!"

শিবানী সমস্ত দিন ধরিয়া বাসনকোসন গোছাইয়া আবশ্যক বস্তু সকল একত্র করিল, যাহা যেখানে রাখিবার রাখিতে তুলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে এমন রোরুদ্যমানা মোক্ষদাদাসী আসিয়া ডাকিল "বড় মা কর্ত্তাবাবু তোমায় শাগগির একবার ডাকচেন"। কি যেন একটা অজানিত ভয়ে শিবানীর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল; কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন জানিস?" ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে মোক্ষদা কহিল "ছোটমার বড্ড ব্যারাম গো—বাবুর কাছে তার এয়েচে—বাঁচে কি না বাঁচে?" শিবানীর হাত পায়ের তলা যেন হিম হইয়া আসিল। শ্যামাকান্ত বধূকে দেখিয়া অসম্বরণীয় হৃদয়াবেগে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "আমার মৃত্যু নেই এই অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় কেবল ঐসব চোখে দেখবার জন্যই শুধু বেঁচে থাকলাম বইতো না। নিজে যে ছুটে একবার গিয়ে দেখবো সে শক্তিও নেই"—মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তের স্বরকে আবার একটু স্পষ্ট করিয়া লইলেন, বলিলেন "তুমি যাও মা কিছু টাকা নিয়ে যাও; যেন বিনা চিকিৎসায় মাকে আমার মেরে ফেলে না। তোমায় আর কি বলে দেবো—আমার ভাগ্যে অনেক দুঃখই আছে, অনেক সহ্য করচি আরও অনেক সইতেও হবে। প্রাক্তনে যা লেখা আছে কে খণ্ডাবে? তুমি যাও মা ভোরের ট্রেনেই যাও এখন তো আর ট্রেন নেই কবিরাজ মশাই বিপিন আর দাসীদের দুএকটাকে সঙ্গে নিও। এই দলিলখানা হেমুকে দিও যদি তার অতেও একটু দয়া হয়! আর একটি কাজ কর বিপিনকে ডেকে পাঠাও; রজনীকে একটা তার করুক,—সে বোধ হয় কিছুই জানে না, তারা মা ব্রহ্মময়ি! আমায় তোর চরণে একটু স্থান দে মা; আর যে আমি পারচিনে।"

শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া

গেল। আজ আবার অনেক দিন পরে তাহার শুষ্কনেত্রে জল পড়িল।

শিবানী যখন দারুণ উৎকণ্ঠা ও নিরাশা বহিয়া লইয়া গাড়োয়ানের নির্দ্দিষ্ট বাড়িখানার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন চারিদিকের গাছপালার উপর দিয়া সন্ধ্যার ঘনান্ধকার সেই ক্ষুদ্র পল্লীখানিকে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। অল্প অল্প কোয়াসা ও মেঘে আকাশে তারকাচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চলন্ত তরল মেঘের আবরণের মধ্য দিয়া বিকারের রোগীর নিষ্প্রভ ঘোলা চক্ষের ন্যায় ম্লান চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আবার মেঘান্তরে আচ্ছাদনে লুকাইয়া পড়িতেছে। ঝোপঝাপ গাছপালার মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঝিকিমিকি জোনাকির পুচ্ছ শত শত স্তিমিত আলোকগুলি জ্বালাইয়াও সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে পরাভূত করিতে না পারিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে কেন্দ্রচ্যুত উল্কাখণ্ডের মতন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

প্রবেশ দ্বারের ঠিক সম্মুখেই একটা ঘরের সম্মুখের বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, এবং কে এক ব্যক্তি সেই আলোর সামনে বসিয়া একখানা ক্ষুদ্র নোটবুকে পেনসিল দিয়া নিবিষ্ট মনে কি লিখিতে ছিল। তাহার নত মুখের উপরে ললাটের উপর হইতে অসন্নিবেশিত দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া শিবানী তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। তথাপি হেমেন্দ্র বলিয়াই সে তাহাকে অনুমান করিয়া লইল এবং সেই বিশ্বাসেই অগ্রসর হইয়া গিয়া ভয় বিহ্বল ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল "ঠাকুরপো!"

সে ব্যক্তি চমকিয়া মুখ তুলিল, আলোকের উজ্জ্বল রশ্মি পরিষ্কাররূপে তাহার মুখের উপরে পতিত হইয়াছিল, শিবানী দেখিল সেব্যক্তি হেমেন্দ্র নয়, —কে? একবার মাত্র সেই সম্মুখস্থ মুখখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই শিবানীর আপাদমস্তক বায়ুস্রোত তাড়িত কাশকুসুমের মত কম্পিত হইয়া উঠিল। সে তাহার বিস্ফারিত বিস্মিত দৃষ্টি সেখানে সংবদ্ধ রাখিতেও পারিতেছিল না; আবার ফিরাইয়া লইবার শক্তিও তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

কোন মহা ঐন্দ্রজালিকের এ গৃহ! যেখানে অসম্ভব অনায়াস সম্ভব হইয়া উঠে? যেখানে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ শরীরে দেখা দিয়া রুদ্ধ আশা স্রোতে সবেগে আঘাত করে! একি মায়ার রাজ্যে সে আজ সহসা আসিয়া পড়িল! একমুহূর্ত্তমাত্র সে ব্যক্তি, জড়ের মতনই নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। কিন্তু তার পর এও কি ইন্দ্রজাল! হঠাৎ সে পেনসিল ও খাতাখানা জামার পকেটের মধ্যে ফেলিয়া শিবানীরই নিকটে এত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল যে, তাহার তপ্ত নিশ্বাস শিবানীর গণ্ডস্পর্শ করিতে লাগিল। শিবানীর বক্ষের দ্রুত কম্পনও বুঝি তাহার কণে অনুভূত হইয়া উঠিল। একমুহূর্ত্ত কেহ কোন কথাই বলিল না দুজনেই নিস্পন্দ হইয়া পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল।

বিরাট পুরুষের সমাধি মূর্ত্তির ন্যায় সমস্ত চরাচর তখন ধ্যানমগ্নবৎ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে! কেবল ঝিল্লির সমতান সেই যোগমগ্ন বিশ্বের অন্তরকেন্দ্রের মধ্যে প্রণয়ের গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র শান্ত স্তব্ধ কুয়াসাময় শীতের রাত্রি নিঃশব্দে মন্দির দ্বারের প্রহরীর মত প্রহর-

বেত্র হস্তে তর্জ্জনী তুলিয়া জাগিয়া ছিল! শিবানীর হাতপায়ের তলা অসাড় হিমবৎ হইয়া আসিতে লাগিল।

নীরদকুমার আর একটু নিকটে আসিয়া শিবানীর একটা হাত ধরিল। মৃদু অথচ অকম্পিত সহজকণ্ঠে বলিল "শিবানী, ভয় পেয়েছ আমায় চিনতে পারলে না?"

সদ্যজাত একটা দমকা হাওয়ায় আলোটা নিবিয়া গিয়া ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইয়া গেল। * * * *

দ্বিতীয় মূর্চ্ছাটার পর হইতেই রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। ভাল করিয়া আর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই, প্রলাপও আরম্ভ হইয়াছিল। হেম শান্তির বিছানা ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। রোগী অল্পক্ষণ মাত্র একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, নীরদ সন্তর্পণে কাছে আসিয়া তাহার কানের কাছে নত হইয়া চুপি চুপি বলিল "তোমার বৌদি এসেছে একটা আলো নিয়ে যাও।" বলিয়াই হেমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; হেমেন্দ্র দ্বিধা না করিয়া ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে শিবানী একা দাঁড়াইয়াছিল, হেম আসিয়া তাহার পা দুখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাহার পায়ের উপরে মাথা রাখিল "বৌদি! তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি বলেই আমার এ শাস্তি, তুমি ক্ষমা করো বৌদি, না হলে আমি জন্মের মত গেলাম।"

শিবানীর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল, অবলম্ব পা দুখানা তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, সে অতি কষ্টে শরীর মনের শক্তি সংগ্রহ করিয়া স্নেহময়ী সর্ব্বংসহ জননীর ন্যায় লজ্জাঅনুশোচনাপ্রপীড়িত দেবরকে ধরিয়া তুলিতে গেল! সান্ত্বনা দিয়া বলিল "এত কাতর হয়ো না ঠাকুরপো, শান্তি আমাদের ভাল হবে বৈকি।"

হেম তথাপি তাহার পা ছাড়িল না, উন্মাদের মত জোর করিয়া দুই হস্তে পা ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে যে শান্তি বাঁচবে না বৌদি; বলো তুমি আমার কুব্যবহার কি ভুলতে পারবে?"

শিবানীর গণ্ড বহিয়া আনন্দ মিশ্রিত বেদনার জলধারা গড়াইয়া পড়িল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সে কহিল—

"স্থির হও ঠাকুরপো অত কাতর হয়ো না; নিশ্চয়ই শান্তি আমাদের ভাল হবে, ভয় কি!"

হেমেন্দ্র নত হইয়া আবার হৃদয়ের সহিত তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল; ঈষৎ লঘুচিত্তে কহিল "তোমার আশীর্ব্বাদে আবার আমার আশা হচ্ছে।"

৪৪

নীরদের টেলিগ্রামখানা রজনীনাথ যখন পাইলেন তখন তিনি মক্কেলদের বিদায় করিয়া নিজের পাঠাগারে সুকুমারকে লইয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একখানা খোলা বই পড়িয়া ছিল বটে কিন্তু সুকু তাঁহাকে সে দিকে মন দিতেই দিতেছিল না। একটুখানি চিত্ত সংযত করিয়া একটি প্যারা না পড়িয়া উঠিতে উঠিতেই সুকু অসহিষ্ণু হইয়া পিতার বাহু আকর্ষণ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিতেছে,—"ঠিক এইখানটাই আপনি

শুনলেন না। বিস্কুটের টিন কেটে তো চাকা হলো, পাতলা কাঠির ছিলকে দিয়ে পাখা ছুটি হবে—কিন্তু এইবার পেট্রোল না হলে তো চলবে না। সোফার আমায় দেয় না—তুমি যদি বাবা তাকে একটু দিতে বলে দাও তাহলেই দেখবে আমার এয়ারোপ্লেন হুযহুষ করে আকাশে উঠতে থাকবে। ঐ আবার তুমি বই পড়চো—!" সুকুর অভিমানকে আজ কাল রজনীনাথ অত্যন্ত ভয় করেন, তাই তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া বলিলেন "না রে একটু দেখে নিলুম, আচ্ছা থাক্।"

সুপ্রকাশ খুসী হইয়া কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, বিব্রতভাবে কোলে মাথাটা রাখিয়া দুই হাতে গলাটা জড়াইয়া ধরিল "আচ্ছা বাবা সব্বার চাইতে আগে কোন দেশের লোকেরা উন্নত হয়েছিল?" এ প্রশ্ন নূতন নয়; রজনীনাথ স্নেহের সহিত হাসিলেন "আমাদের দেশ।" সুকুও হাসিল। এমন সময় বলাই আসিয়া বলিল, "আরজেণ্ট টেলিগ্রাম একটা এসেছে।" শুনিয়াই কে জানে কেন হঠাৎ রজনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন, তিনি রসিদটা সই করিতে লাগিলেন সুকু উঠিয়া বসিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহা হইতে স্লিং-টি সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ইহাতে দিদি পুতুলের বালা করিত। ক্ষুদ্র বুকখানা আলোড়িত হইয়া উঠিল। পাছে বাবা তাহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া কাতর হন সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রজনীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "বুঝতে পারছিস?" সুপ্রকাশ অকস্মাৎ সর্পদষ্টের মতন চমকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও বাবা, একি লিখেছে—দিদির অসুখ—সিরিয়স্,—মানেতো খুব বেশি?" ঘরের মধ্যেকার সমস্ত বায়ুবেগ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়া রজনীনাথের নিশ্বাস রোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। শান্তির কঠিন পীড়া! সুকুর হাত হইতে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামখানা লইয়া রজনীনাথ পড়িলেন। কি পড়িলেন যেন বুঝিলেন না—নিস্তব্ধে কাগজ খানার প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

সুপ্রকাশ, সভয়ে ডাকিল "বাবা!" রজনীনাথ মুখ তুলিলেন প্রাণহীনের মতন বর্ণবিহীন ও ম্লান সে মুখের দিকে চাহিয়া ভীত সুকু আরও শিহরিয়া উঠিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া সে আবার বলিল "বাবা"? "কি?" "যাবেন না আপনি দিদির কাছে? দেরি হয়ে যাচ্চে যে"।

রজনীনাথ স্বপ্নোত্থিতের মতন চমকিয়া উঠিয়া অধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "যাবো না সুকু,—যাবো বই কি! সে যে আমায় ডেকেচে!" সুপ্রকাশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার লইয়া ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিবার সময় হঠাৎ নজর পড়িল সুকুও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। রজনীনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ধীর ও সংযত ভাব দেখিয়া কেহ মনে করিতেও পারিল না যে তিনিই এই শঙ্কটাপন্ন রোগীর পিতা। হেমেন্দ্র মনে

করিল "এখনও, আমাদের ক্ষমা করেননি, কি কঠিন মন!" নীরদ আশ্চর্য্যে মনে মনে বলিল "অসাধারণ ধৈর্য্য! ইনিই প্রকৃতজ্ঞানী।" ডাক্তারেরা পরস্পর বলাবলি করিলেন, "মেয়েটি ভাল না হলে বেচারা হয়ত পাগল হয়ে যাবে। কি ভয়ানক আত্মদমন প্রয়াস।" শিবানী আসিবার কিছুক্ষণ পরে ভোরের সময় শান্তি একবার ভাল করিয়া চোখ চাহিল, ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার একখানা হাত ধরিল "দিদি?"

শিবানী তাহার মুখের উপর নত হইয়া সস্নেহে তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল "আমরা যে তোমার কাছে এসেছি দিদি!"

দুর্ব্বল রোগী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল "আর জ্যেঠা মশাই?" "তিনি কাল পরশুর মধ্যে আসবেন, তাঁর পায়ে ব্যথা হয়েচে তাই আসতে পারেন নি। অমূকেও আনবেন।"

শান্তির মুখে ঘোর নৈরাশ্য প্রকাশিত হইল। "দিদি!"

রজনীনাথ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাছে সরিয়া আসিয়া কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন "শান্তি আমার!"

"বাবা!" রোগীর ক্লিষ্ট মুখে আনন্দের গভীর উচ্ছ্বাসউজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, ক্লান্ত মস্তক ঈষৎ ফিরাইয়া সে পূর্ণ চক্ষে চাহিল, "ক্ষমা করেছ কি বাবা? আমার অপরাধ, ক্ষমা তবে করেছ কি?"

রজনীনাথের অনিশ্বসিত বক্ষ অবরুদ্ধ বেদনায় ফাটিতে লাগিল, কষ্টে কহিলেন "ক্ষমা তো অনেকদিনই করা উচিত ছিল মা, সন্তান ভুল করলেও তো পিতার রাগ কর্‌বার কোন অধিকার নাই।"

হেমেন্দ্র সহসা রজনীনাথের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল "শান্তি আপনার আসবার খপরও পায় নি; সবি আমার দুর্ব্বুদ্ধি! যোগেশ ও আমি মিলে মিথ্যা কথা বলে আপনাকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলুম বাবা! সন্তানকে ক্ষমা করুন।"

শুনিয়া রজনীনাথ রোষপ্রদীপ্তনেত্রে জামাতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; শান্তি ধীরে ধীরে আবার ক্লান্তভাবে চোখ মুদ্রিত করিল।

সেদিনটাও কাটিয়া গেল। ডাক্তারেরা বলিলেন, আজ আমাবস্যা, আজই একটা ক্রাইসিস্, আজই যে কতকটা মানুষ চিনতে পারচে একটা বড় সুলক্ষণ। তবে রোগী বড় দুর্ব্বল হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটিয়া যায়—" সমস্ত দিন সশঙ্কপ্রাণী কয়টি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রোগীর ক্রমশ পরিবর্ত্তিত মুখের দিকে চাহিয়া কাটাইল। অন্য কাহারও দিকে চাহিতে যেন তাহারা সাহস করিতেছিল না।

অপরাহ্নের দিকে একবার সে সজাগ হইয়া সুপ্রকাশকে দেখিতে চাহিল। সুকু দিদির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিতে যাইতেছিল। পিতার ইঙ্গিতে উদ্গত অশ্রুপ্রবাহ, চোখের মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

রজনীনাথ নীরদের কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েচে না?" শিবানীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "ওষুধ দেবার আগে একটু দুধ খাওয়াতে হবে বুঝি ?" শিবানী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনান্তরালে চাহিয়া দেখিল,—মিঃ রায় ঔষধের গ্লাশ লইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সে কম্পিত বক্ষে অবসন্ন পাদুখানাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দুধ গরম করিয়া আনিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তাহার নবজীবনের আশা উৎসাহ আলোকে ও পুলকে প্রথম অরুণকিরণসংস্পর্শে নির্ম্মল নীহারবিন্দুর মতই ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল। যদিও মাথার উপর নীল নীরদমালা আসন্ন ঝটিকার বিপুল উদ্যমে সংহার মূর্ত্তিতে সাজিয়া উঠিয়াছে, বীচিমালাসংক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্র উত্তাল হইয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে তথাপি সেই মৃত্যুর সুরে আজ জীবনের রাগিণী মিলনের মহান্ সঙ্গীতই গাহিতেছিল।

বহুদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত শিবানীর ক্ষিন্ন চিত্ত, সহসা যে যাদুকরের স্মিতহাস্যমণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় আলোকে নবীন জগতের হরিৎ শোভাযুক্ত নূতন দৃশ্যের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল সেখানে জরামৃত্যুক্ষয় ও মিথ্যার আক্রমণকে হঠাৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে যেন কোনমতেই পারিতেছিল না। তাই এই আসন্ন ঝড়ের মুখেও সে শান্ত সংযত অটল ভাবে বিপদকে মরীচিকার মত দিকপ্রান্তের অন্তরালে বিলীয়মান অসত্যরূপে ধরিয়া লইয়া চিত্তকে আশাপূর্ণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রাত্রে রোগী যেন একটু শান্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। রজনীনাথের বিশ্বাসী কলিকাতার দুইজন ডাক্তার কদিনই সেখানে উপস্থিত, আজ আবার আর একজন সাহেব ডাক্তারকেও আনা হইয়াছিল, বিশেষ ভয়ের সময়টা কাটিলে যেন বাঁচা যায়। বসুমতী সেখানে জীবন্মৃত হইয়া আছেন, তাঁহাকে একটু ভাল বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তিনিও বিপিনের সহিতই চলিয়া আসিবার জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়াছিলেন।

যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন জানালার চারিধার দিয়া নীল পর্দ্দার অন্তরাল হইতে প্রভাত সূর্য্যের নবীন রশ্মি সশঙ্কিত রোগী গৃহে, শঙ্কাহীন নির্ম্মল শুভ্রতনু শিশুর অকুণ্ঠিত সরল হাস্যমণ্ডিত নেত্রপাতের মত দ্বিধাশূন্য হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল! রাত্রের অন্ধকারে গতদিবসের কর্ম্মক্লান্তি ও অবসাদের কালিমাকে মিলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ সুন্দর প্রশান্ত প্রভাত নবজাগ্রত জীববৃন্দকে নবীন শক্তি ও কর্ম্ম উদ্দীপনা দান করিয়া আবার কর্ম্মসংঘাতের মাঝখানে নামাইয়া দিতে আসিয়াছে। এখনও সেখানে তৃষ্ণাক্ষুধার কাতরক্রন্দন ও ঘাতপ্রতিঘাতের বিরোধ, উদ্বেগের তীব্র চীৎকার জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। জগৎ এখনও সদ্যোজাত শিশুর মতই নির্ব্বিরোধী, বিদ্রোহ বিবাদের সূচনার তখনও বিলম্ব ছিল। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ভুলভ্রান্তি, সমস্ত পাপতাপ প্রতিদিনই এমনি করিয়া বিগত ক্লেশ ও সুস্থ শান্ত হইয়াই স্নেহময়ীমায়ের শূন্য অঙ্কে শিশুর মতই দেখা দেয়। যুগ যুগান্ত হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। তবু যেন আজিকার প্রভাত নবীন আনন্দ লইয়া এই গৃহেই আজ প্রথম জাগিয়া উঠিল।

শান্তিকে জাগিতে দেখিয়া ডাক্তার

আসিয়া নাড়ি. দেখিলেন, মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিল, রজনীনাথ গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। শান্তি তাহাদের ভাব বুঝিয়া ক্লান্তিহীন নেত্রে সম্মুখে উপবিষ্ট হেমেন্দ্রের উৎসুক মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু করুণার হাসি হাসিল, হেমও ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ম্লানভাবে হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া ফেলিল। তবে তাহার পাপ প্রায়শ্চিত্তবিহীন নয়!

একটু বেলা হইলে শিবানী একখানা কাগজ হেমের হাতে দিয়া বলিল "বাবা আসবার সময় এই কাগজখানা তোমায় দিতে দিয়েছিলেন। কদিন আর দিতে পারিনি, ঠাকুরপো এই নাও।"

"কি এখানা!" বলিয়া হেম সেখানা খুলিয়া একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিল; "ও সব অমূল্যয়, আমি নিজে উপার্জ্জন করব! আমার সে তৃষ্ণাই. যখন আর নেই তখন আর কেন বৌদিদি।" রজনীনাথ শ্যামাকান্তের দানপত্রখানা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিলেন, হেমেন্দ্র ও শান্তি তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী, এই কথাই তাহাতে লেখা ছিল। রজনীনাথের সাহায্য না পাইয়া জেলা কোর্টের উকীলের দ্বারা বৃদ্ধ একটু কৌশলের সহিত এই দানপত্রখানি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধ পৌত্রকে এবং অর্দ্ধাংশ বিধবা পুত্রবধূ শিবানীকে দান করিলেন, এই মর্ম্মে এই উইল লেখাপড়া করা হয় এবং শিবানীও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুদয় সম্পত্তি তাহার দেবর ও দেবর পত্নীকে দান পত্রে লিখিয়া দিয়াছিল। রজনী নাথ দানপত্র পড়িয়া একটু হাসিয়া শিবানীর দিকে ফিরিলেন "বিষয় ত তোমার নয় মা, তুমি দান করচো কেমন করে? তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি তোমার স্বামীই দান কর্ব্বার প্রকৃত অধিকারী।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিকটস্থ ক্ষুদ্র টেবিলের উপরকার শিশিপত্র গুছাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত মিঃ রায়ের দিকে ফিরিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সংযত কণ্ঠে ডাকিলেন "বিনোদ!" নীরদ ফিরিয়া দাঁড়াইল। রজনী-নাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,"তোমার বাবাকে ষ্টেসন থেকে নিয়ে আসতে চল্লুম। তোমার স্ত্রীকে এ অসিদ্ধ দানপত্র ফিরিয়ে দিও—"

সহসা সেই ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও এর চেয়ে কেহ স্তম্ভিত হইত না! হেমেন্দ্র উঠিয়া গিয়া নিঃশব্দে নীরদকুমারের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া লজ্জাপীড়িত রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "দাদা!"

বিনোদ তাহাকে ধরিয়া তুলিল, সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া প্রশান্ত স্বরে কহিল "ও সব কথায় আমাদের কাজ কি হেম?" বাবা আসচেন এসো আমরা একসঙ্গে দু ভায়ে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাই, আমরা দুজনেই যে তাঁর কাছে অপরাধী!" শান্তির রক্তহীন মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। দিদি বলিয়া সে শিবানীর সাগ্রহ বাহুর মধ্যে পরিতৃপ্তচিত্ত শান্ত শিশুটির মত নিজেকে অর্পণ করিয়া স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত মুখের উপর ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরেই দ্বারের নিকট হইতে শ্যামাকান্ত ডাকিয়া বলিলেন "কই আমার মা, আমার মা কই গো।" শ্রীঅনুরূপা দেবী।

সমাপ্ত।

প্রার্থনা।

তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখ হে রাখ ধরে
তারে দিয়োনা কভু ছুটি।
তব আদেশ দিয়ে রজনী দিন দাও হে দাও ভরে
প্রভু আমার দুহু মুঠি।
তব পলকহারা আলোকদিঠি মরম পরে রাখ,
যত সরমে মোর সরম দিয়ে নীরবে চেয়ে থাক,
প্রভু সকলভরা ক্ষমায় তব রাখ আবৃত করে
মোর যেখানে যত ত্রুটি।
মোরে দিয়োনা দিন সুখের আশে করিতে দিন গত
শুধু শয়নপরে লুটি।
আমি চাইনি যাহা তাই দিয়েছে আপন ইচ্ছামত
আমার ভরিয়া দুই মুঠি।
মোর যতই তৃষা ততই কৃপাবরষা এস নেমে,
মোর যত গভীর দৈন্য তত ভরিয়া তোল প্রেমে,
মোর যত কঠিন গর্ব্ব তারে হান ততই বলে
তাহা পড়ুক পায়ে টুটি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশ।

এবার গ্রীষ্মের বন্ধে আমি কি কার্য্য করিয়াছি এবং এ স্থানের ছাত্রেরা সে সময় সাধারণতঃ কি রকম কাজ করে তাহাই আজ কিছু লিখিব। কেন না সম্ভবতঃ তাহাতে আমাদের দেশীয় যুবকগণের কিছু উপকার হইতে পারে। এখানে গ্রীষ্মাবকাশে আমাদিগকে মাঠে কার্য্য করিতে হয়। এদেশের ছাত্রেরা যতই ধনী হউক না কেন, গ্রীষ্মাবকাশে শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকে। এ সময়ে ছাত্রগণের মুক্তক্ষেত্রে (open air) কাজ করাই বিধি, এবং সকলেই প্রধানত নিজ নিজ শিক্ষানুযায়ী কার্য্য সংগ্রহ করে।

আমাদের কলেজ বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কলেজ হইতে কাজ সংগ্রহ করিয়া আমরা বীস জন ছাত্র এখান হইতে প্রায়

৮০ মাইল দূরে (Lewiston) লুইস্‌টন্‌ নামক স্থানে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে কখনও এমন কার্য্যে বাহির না হওয়ায়, এসম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন, তাহার তালিকার জন্য, একজন বন্ধুর শরণাপন্ন হইতে হইল এবং তাঁহার পরামর্শ মত জিনিষপত্র প্যাক করিয়া লইলাম। জিনিষ প্যাক করার মধ্যেও, বেশ একটু চাতুর্য্য আছে, যত সুন্দররূপে এবং ছোট করিয়া প্যাক করিতে পার ততই তোমার বাহাদুরী। কারণ এই সমস্ত জিনিষ কয়েক মাইল আমাদের আপনাদিগকেই বহন করিতে হইবে। জিনিষ পত্রাদি প্যাক হইলে, চামড়ার ব্যাগ হাতে ও বিছানার মোট স্কন্ধে করিয়া, আমরা বার জন ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম, ষ্টেশনে পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই গাড়ি পাওয়া গেল, এবং রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় আমাদের গাড়ি লুইসটন সহরে পৌঁছিল।

আমাদের কার্য্যস্থল সহর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে পাহাড়ের উপর। এই আট মাইল হাঁটিয়া কিম্বা মালগাড়ী (Wagon) করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে; রাত্রি হওয়ায় সেদিন আর ঐ আট মাইল অতিক্রমের প্রয়াস না করিয়া, একটা হোটেলে স্থান লওয়া গেল। হোটেলে আহারাদির পর বিশ্রাম ঘরে বসিয়াছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম এখানে (Ringling Brothers). রিংলিং ব্রাদার্সের সুবিখ্যাত সারকাস্‌ এক রজনীর জন্য তামাসা দেখাইতেছে; লুইস্‌টন্‌ ক্ষুদ্র সহর প্রতি বৎসরে এখানে সার্কাস আসে না, তাই সকলেই এই সুযোগে সার্কাস দেখিতে ছুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্‌ ইণ্ডিয়ানগণের সংখ্যা কম নহে। তামাসা দেখিবার ইহাদের বড়ই সখ। আমি পূর্ব্বে কখনও দুই তিন শত আদিম অধিবাসী একত্র দেখি নাই, তাই আমিও ইহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম।

সার্কাসে যাইবার আমার বড় ইচ্ছা নাই অনেকবার সার্কাশ দেখিয়াছি, আর গেলেই টাকা খরচ; তাই আমরা কয়েকজন বাহিরে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রক্তবর্ণ পোষাকপরিহিত প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী কয়েকটি শিখকে দেখিতে পাইলাম; অনেকদিন পরে দেশের লোকের মুখ দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ হইল; এবং এই সার্কাসে ইহারা কি কাজ করে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম, তাই অগ্রসর হইয়া হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহারা কি হিন্দুস্থানের লোক? তাহারাও দেশীয় লোক দেখিয়া আমাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল, এবং অবশেষে আমাদিগকে সার্কাশ দেখাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে বিনা পয়সায় আমাদের সার্কাশ দেখা হইয়া গেল। ইহারা এই সার্কাশের পার্শ্বে নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নিয়া এমন একটা বিপর্য্যয় গোলযোগ করে, যে তাহার তাল মান সুর কিছুই থাকে না; সার্কাস কোম্পানি ইহাকে হিন্দু ব্যাণ্ড বলে। এই হিন্দুব্যাণ্ড শুনিবার জন্য অজস্র লোক ১০ সেণ্ট (পাঁচ আনা) খরচ করিতেছে।

ইহারা এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেকে মাসিক একশত আশি টাকা (৫০ ডলার) বেতন ও খোরাক পাইয়া থাকে। এই ধরণের হিন্দুব্যাণ্ড শুনিয়া আমাদের বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের প্রতি এদেশের লোকের কিরূপ ধারণা জন্মে তাহা সহজেই বোধগম্য।

তাড়াতাড়ি সার্কাস দেখা শেষ করিয়া হোটেলে গেলাম, পরদিন অতি প্রত্যূষে ছয়টায় একটী ওয়েগন গাড়ীতে করিয়া কার্য্যস্থল অভিমুখে রওনা হইতে হইবে। ভোর ছটায় ছাড়িয়া, নানা প্রকারের শস্যক্ষেত্র ও ফলের বাগান অতিক্রম করিয়া প্রায় সাড়ে নয়টার সময়, আমাদের আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া দেখি যে যতগুলি তাম্বু ছিল, সমস্তই অন্যান্য শ্রমজীবী দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। কোথাও আমরা ১২ জনে একত্রে একটী তাম্বু পাইলাম না। কোম্পানীকে জানাইলাম, আমরা ১২ জনে একত্রে বিভিন্ন তাম্বুতে বাস করিতে চাই। আমরা সাধারণ শ্রমজীবিদের সঙ্গে থাকিতে না চাহার কারণ এদেশে শ্রমজীবিরা সাধারণতঃ বড় মাতাল এবং তাহাদের অনেকেরই নানা প্রকারের দূষণীয় ব্যারাম পীড়া থাকে। সমস্ত শ্রমজীবিই যে এই প্রকারের তাহা নহে, ভাল লোকও বিস্তর আছে। তবে শুনিয়াছিলাম যে অধিক দিন অস্নাত থাকার জন্য ইহাদের সকলেরই প্রায় শরীরে এক প্রকারের উকুন জন্মিয়া থাকে, এবং উহা একজনের অঙ্গ হইতে অপরের অঙ্গে অতি সহজেই চলাফেরা করে এবং ইহা একবার জন্মিলে তাহা হইতে ছাড়ান পাওয়া বড় কষ্টকর, সমস্ত বিছানা পত্র পোড়ানো ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। দেশে থাকিতে শুনিতাম কাবুলিদের গাত্রে একরূপ পোকা আছে, কিন্তু তাহা তখন বিশ্বাস করিতাম না, এখানে আসিয়া 'গায়পোকা' প্রত্যক্ষ করিলাম। যাহা হউক অবশেষে আমাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র তাম্বু ঠিক হইল। কিন্তু সে রাত্রির জন্য কোম্পানি আমাদিগকে স্বতন্ত্র তাম্বু দিতে পারিবে না বলায়, আমরা বাহিরে তৃণশয্যায় রাত্রি যাপন করিলাম।

আমরা কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।

পরদিন কোম্পানীর তাম্বু আসিল, আমরা নিজেরাই তাহা খাটাইয়া লইলাম। আমাদের সঙ্গে অধিক বিছানা নাই,—তাই তাম্বুগৃহতলে পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া তদুপরি কম্বল পাতিয়া বেশ নরম বিছানা তৈয়ার করা গেল। এই প্রকারের বিছানায় আড়াই মাস কাল কাটাইয়াছি। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে আমরা কাজের জন্য প্রস্তুত হইলাম; আমাদের গাছ ছাঁটা (pruning) কাজ করিতে হইবে। এখানে আট হাজার একার জমিতে—আপেল পিচ কুল (plum) চেরি ও পেয়ার ফলের চারা লাগান হইয়াছে; এই সমস্ত বৃক্ষ এক হইতে চার বৎসর বয়স্ক; এখনও ভালরূপ ফলধারণ করে না; কোন কোন গাছে দুই চারিটা করিয়া মাত্র ফল ফলিতেছে।

এদেশের চাষারা পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি জানে। শিশুকে যেমন সুশিক্ষার জন্য বাল্যাবস্থা হইতেই যত্ন আয়াস করা প্রয়োজন, বৃক্ষ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা। বৃক্ষদিগকেও ঠিক চারা অবস্থা হইতে উপযুক্ত পরিমাণের ফল ধারণে অভ্যস্ত করান হইয়া থাকে, এই জন্যই গাছগুলিকে ছাঁটিবার প্রয়োজন হয়; এবং এই জন্যই গাছ ছাঁটিবার পূর্ব্বে ইহার বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমস্ত বৃক্ষই একপ্রকার বৃদ্ধি পায় না বা শাখা বিস্তার করে না; মনুষ্য জাতির ন্যায় বৃক্ষাদিও নিজ নিজ জাতি অনুযায়ী বৃদ্ধিলাভ করে। যেমন মোগল জাতির আকার অবয়ব একবার দেখিলেই তাহাকে মোগল বলিয়া জানা যায়; কিম্বা আর্য্য জাতিকে দেখিলেই আর্য্য বলিয়া বুঝি; সেইরূপ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌গণও একবার দেখিয়াই এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষের প্রভেদ বলিয়া দিতে পারেন। সমস্ত আম্র বৃক্ষই আমাদের নিকট এক প্রকারের বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আসলে তাহা নহে, ফজলি আম্রের বৃক্ষ এক প্রকারে শাখা বিস্তার করে এবং লেঙ্গড়া আম অন্য প্রকারে। বৃক্ষ জীবনের এই সমস্ত রহস্য তত্ত্ব অবগত থাকিলে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী বৃক্ষগুলির ব্যবস্থা করা যায়; আপন ইচ্ছানুযায়ী ফল ধরান যায়। এই জন্যই গাছ ছাঁটার প্রয়োজন; গাছকে ফল ধরাইবার জন্য অভ্যস্ত করাইতে হইলে ইহার ডাল, পাতা ও কাঠের বৃদ্ধি সময় মত বন্ধ করাইয়া, সেই খাদ্য ও রসটুকু ফল ও ফুলের বৃদ্ধিতে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গাছ ছাঁটার প্রধান উদ্দেশ্যই গাছকে ইচ্ছানুযায়ী করিয়া তোলা। গাছ ছাঁটিবার অপর উদ্দেশ্য এই যে গাছকে চতুর্দ্দিকে সমভাবে বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে সহায়তা প্রদান করা ও তাহার জাতি অনুযায়ী গাছের অবয়ব বৃদ্ধি করা।

এতদ্দেশীয় আধুনিক ও প্রাচীন ফলবৃক্ষের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আধুনিক বৃক্ষ প্রাচীন বৃক্ষ হইতে, অবয়বে অনেক ছোট। ইহার কারণ এই যে, ফলবৃক্ষ ছোট হইলে ফল পাড়িতে অনেক সুবিধা; ফল দূর দেশে প্রেরণ করিতে হইলে ফল অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পাড়িতে হয়, ফলে কোনরূপ একটু সামান্য আঘাত লাগিলেও, তাহা দূরদেশে প্রেরণ করার উপযোগী থাকে না, একটী ফল পচিতে আরম্ভ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত ফলই প্রায় নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ফল

পচান এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর (Bacterea or Fungus) কার্য্য, এই উদ্ভিদাণু সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্বদা বাতাসে ভাসমান অবস্থায় আছে; ইহারা ইহাদের সুবিধা মত আহার ও স্থান পাইলেই সে স্থানে, সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে; ইহারা জৈব পদার্থের উপর জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ফলে কোন প্রকারের আঘাত লাগিলে সে স্থান নরম হইয়া পড়ায় উহাদের আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা হয়। বাতাসের দ্বারা নীত হইয়া, উহারা তখন ঐ স্থানে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়; একবার একটী ফলে প্রবেশ করিতে পারিলেই সেই ফল হইতে অন্য ফলে অতি সহজেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষ ছোট হইলে ফলের পোকা নিবারণের পক্ষেও অনেক সুবিধা। বৃহৎ বৃক্ষ হইতে পোকা মারা বিশেষ ব্যয় ও আয়াস সাধ্য। ফলের গাছ বড় হইলে পোকাও সহজে বৃদ্ধি পায় কারণ ইহারা লুকাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। পিচকারী বা পম্পযোগে কোন প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক আরক সিঞ্চনের দ্বারা গাছের ফলের পোকা নষ্ট করা হয়। বৃক্ষ বড় হইলে ঔষধ সিঞ্চনেরও অসুবিধা। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই ফলের গাছ এমনভাবে বাড়িতে দেওয়া হয় যে, যাহাতে অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক ফল হস্তের সাহায্যে,—এক চতুর্থাংশ কোন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া,—এবং অপর চতুর্থাংশ মইএর সাহায্যে পাড়া যায়। এ প্রসঙ্গে গাছ ছাঁটা সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়াই আমি নিবৃত্ত হইলাম; কারণ বিষয়টি একটী বিশেষ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; অল্প পরিসর প্রবন্ধে তাহার স্থানসঙ্কুলান একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদেশীয় ছাত্র দেখিতে পাই; তাঁহাদের সঙ্গে একত্র আমরা অধ্যয়ন করিতেছি; কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা অন্যান্য বিদেশীয় ছাত্র অপেক্ষা ভাল ইংরেজী জানে বলিয়া এখানে তাহাদের বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। অপর দেশীয় ছাত্রগণ যদিও ইংরেজি তেমন ভাল জানে না; কিন্তু তথাপি ইহারা সকলেই প্রায় ভারতীয় ছাত্রাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ বিদ্যালয় (high school) হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসে; কিন্তু High School Chemistry Physics Botany প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশীয় ডিগ্রীধারী ছাত্র অপেক্ষাও ইহাদের প্রকৃষ্টতর জ্ঞান থাকে; ইহারা ল্যাবরেটরির কার্য্য শিক্ষকের বিনা সাহায্যেই করিতে পারে; আমরা কিন্তু পরীক্ষা মন্দিরে কোন প্রকারের যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে প্রতি পদেই শিক্ষককে বিরক্ত করিয়া তুলি।

জাপান ও আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রেরা অনেকেই আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা লিখিয়া দেশের পত্রিকাদিতে প্রকাশার্থ পাঠান। লিখিয়া পাঠান যে, তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং এত নম্বর পাইয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকল উক্তি একেবারে ভিত্তিহীন; কারণ এখানে পরীক্ষার কোন শ্রেণী বিভাগ নাই; শুধুই প্রথম বিভাগ আছে। এখানে অনেক ছাত্রই পুরা নম্বর

পাইয়া থাকে; কোন বিষয়ে পাশ করিতে হইলে শত করা আশি (৮০) নম্বর পাইতেই হইবে। এখানে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে কোন মেধাবী ছাত্র

একজন বাঙ্গালী ছাত্র।

একটু চেষ্টা করিলেই শত করা ৮০ নম্বর রাখিতে পারে।

"ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত"! আবার কখন লিখিবার সুবিধা হইবে তাহা জানি না, তাই কথাটার উল্লেখ করিলাম।

কার্য্য স্থানে কিরূপ ছিলাম ও কেমন আমোদ প্রমোদ হইত, সে বিষয়েও একটু আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেই আমাদের বিছানা পত্র ও বাসস্থানের বিবরণ লিখিয়াছি। উক্ত প্রকারে তাম্বুতে খড়ের বিছানায় শুইতে কোন রূপ কষ্টই হইত না; বরঞ্চ বারজনে একত্রে বেশ গল্পে ও নানা-প্রকারের আমোদ প্রমোদে সময় কাটিত; দিনের বেলায় আমাদের তাম্বুর সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকিত না, প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় কার্য্যে চলিয়া যাইতাম, এবং বিকাল ছয়টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইত।

প্রত্যহ ভোর সাড়ে পাঁচটায় নিদ্রা ভঙ্গের ঘণ্টা পড়িত, সেই ঘণ্টার সঙ্গেই সকলকে উঠিতে হইত; পৌনে ছয়টায় প্রাত-র্ভোজন। যিনি তখন উপস্থিত হইতে না পারিতেন তাঁর ভাগ্যে প্রাতরন্নটা সেদিনকার মত বন্ধ। প্রথমটা আমাদের আহারের বড় কষ্ট হইয়াছিল, কারণ পাচকের বন্দোবস্ত ভাল ছিল না, রান্না যেমন বিস্বাদ তেমনই অপরিস্কার। ঐ প্রকার আহার্য্যের জন্য আমাদিগের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলেই আমরা কার্য্য ত্যাগ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগকে কোম্পানি অপর ছাউনিতে বদলি করিয়া দিল, সেখানে আহারের বন্দোবস্ত ভাল ছিল; এক কৃষক পরিবার আমাদের আহার প্রস্তুত করিতেন; দিব্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আহার প্রস্তুত হইত, এখানে আমরা বেশ সুখে ছিলাম। আহারের বিষয় বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই, অনেক সময়ই হিন্দুসমাজনিষিদ্ধ

আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইত। খাওয়া ও থাকা সম্বন্ধে বেশই সুবিধা হইয়া গেল, কিন্তু স্নানের অসুবিধা ঘুচিল না। স্নান করিবার জন্য ৮ মাইল পথ চলিয়া সহরে যাইতে হইত, অন্ততঃ সপ্তাহে একদিনও ত স্নান করা প্রয়োজন! সাধারণতঃ এদেশীয় লোকে তাহাই করিয়া থাকে। জলাভাবে আমাদের স্নানের ব্যাঘাত হইত তাহা নহে। মাঠে জল সেচনের (Irrigation) জন্য এখানে সর্ব্ব স্থানেই জলের কল বর্ত্তমান; কিন্তু গা খুলিয়া কলের নীচে বসিয়া স্নান করা দেশের রীতি ও আইন বিরুদ্ধ। অথচ মজা এই, স্নানাগারে বা নদীতে কিম্বা ঝরণায় সকলে একত্র উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করা দোষের নহে; কলেজে ব্যায়াম মন্দিরে কলের জলের ঝরণায় (shower bath) নীচে সকলে একত্র উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিয়া থাকে। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা। প্রত্যেক মেয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্নানাগার আছে, মেয়েরা কেহই ছেলেদের মত এক সঙ্গে স্নান করে না।

আমরা কলেজের ছাত্র—সেজন্য আমাদের
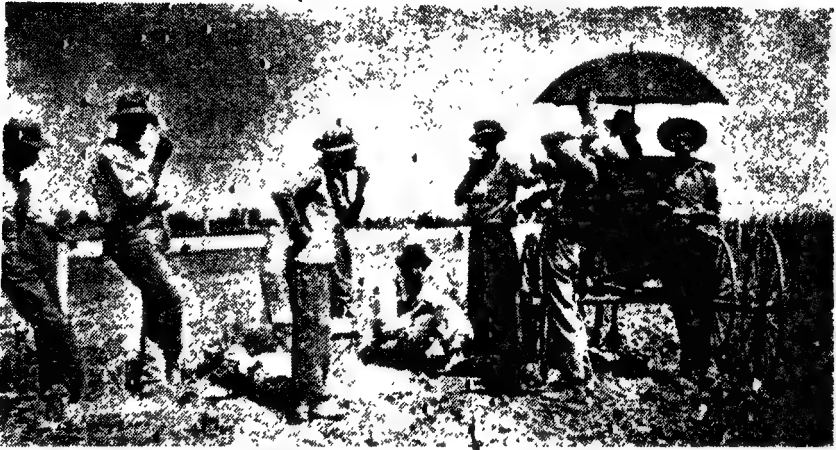
বাগানে কেহ কেহ স্যাণ্ডউইচ খাইতেছেন, কেহ বা জলের জালা হইতে জল তুলিয়া জল পান করিতেছেন।

একটু অহঙ্কারও আছে; আমাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে একটু ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমাদের স্নানের জন্য কোন একটা সুবিধা করিতেই হইবে; চিন্তা করিয়া, আমরা একটা কলের সঙ্গে একটা লম্বা রবারের নল সংযুক্ত করিয়া একটি উচ্চ খুঁটির সঙ্গে অপর ভাগ সংযুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে একটি কেরোসিন তৈলের টিনের এক পার্শে চালুনির ন্যায় ছিদ্র করিয়া একটি 'সাউয়ার বাথ' প্রস্তুত করিলাম। এ দেশে আসিয়া অবধি ঠাণ্ডা জলে বড় স্নান করি নাই, আর এখানে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাটা যে বড় উপভোগ্য তাহাও নহে। এ স্থানে দিনে স্নান করা সুবিধাজনক নহে ও আমাদেরও সময় নাই, তাই প্রত্যহ রাত্রে স্নান করিতাম।

প্রথম প্রথম কাজ করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম; দুই তিন সপ্তাহ কাজ

করিবার পর আর তেমন ক্লান্তি বোধ হইত না; ভালোই লাগিত। নানাবিধ আমোদ প্রমোদেরও অভাব ছিল না, অপর্য্যাপ্ত ফল যত ইচ্ছা আহার করিতাম, কেবল যে এদেশীয় পিচ আপেল প্রভৃতি ফল তাহাই নহে যথেষ্ট পরিমাণে তরমুজাদিও খাইতাম; এ সমস্ত ফল এত জন্মিয়াছে যে ইহারা বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, গাছেই প্রায় পচিতেছে। আঙ্গুর ফলের ত অভাবই নাই যত ইচ্ছা খাইতাম!

কাজ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে তরমুজ ভক্ষণ।

প্রথমে আমরা বৃক্ষ ছেদনের কার্য্য করিতাম। যখন গাছ ছাঁটার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অর্থাৎ যে সময়ের পরে গাছ ছাঁটিলে সুফল অপেক্ষা কুফলই সম্ভাবনা,—তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন; যে কয়জন আমরা অবশিষ্ট ছিলাম, তাহাদিগকে পরিদর্শনের (Inspector) কার্য্য করিতে হইত। এ কার্য্যে আমরা প্রত্যেকে একটি করিয়া ঘোড়া পাইয়াছিলাম, ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদিগকে বৃক্ষাদি পরিদর্শন করিতে হইত। কোন গাছে, কোন অনিষ্টকর পোকা আছে কি না, কোন ব্যারাম, পীড়ার লক্ষণ দেখা যায় কিনা ইত্যাদি। প্রত্যহ কার্য্যান্তে আমাদিগকে পরিদর্শনের রিপোর্ট দিতে হইত। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল না তদুপরি ভোর সাড়ে ছয়টা হইতে বিকাল ছটা পর্য্যন্ত ঘোড়ার উপর থাকিতে হইত তাই প্রথম সপ্তাহে শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল। ক্রমশ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া আসিলাম।

এই পত্র পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন আমি এখানে কলেজে উদ্ভিদ্বিদ্যা এবং কৃষি-বিদ্যা (Horteculture এবং Agriculture) শিখিতেছি, তদুপরি যথাসম্ভব মাঠে যাইয়া কৃষকদের সঙ্গেও কার্য্য করিতেছি। আমার ইচ্ছা দেশে যাইয়া কোন প্রকারের চাকুরির চেষ্টা না করিয়া, নিজেই কিছু জমী সংগ্রহ করিয়া, কার্য্য করিব। কৃতকার্য্য হইলে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে অনেকেই অগ্রসর হইবেন। জানি না দেশে জমী পাইব কি না, শুনিয়াছি, এখনো দেশে অনেক পতিত জমী আছে, যদি আমাকে কেহ জমী সংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করেন, তাঁহার নিকট চির বাধিত হইব।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

যোগাযোগ।

একটি ভক্তবাণী শুনিলাম

বিশ্বমাঝে যোগে যেথায় বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

শুনিয়া অবধি মন অনুসন্ধান করিতে লাগিল সে যোগটি কোথায়? খুঁজিয়া পাইলাম তাহা কর্ম্মে। সৎসঙ্গ সভা সমিতি পরিষদ বা যে কোন প্রকার সদনুষ্ঠান হৌক্ না কেন তাহাই কর্ম্মযোগে পরস্পরের সহিত এবং ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ। আজ আমরা যে কয়টী নারী এই সভাগমনরূপ সৎসঙ্গরূপ কর্ম্মযোগে এখানে মিলিত হইয়াছি কোন্ জাতির কন্যা আমরা? কোন্ গৃহের ভগ্নী? কোন্ মহাদেশের পুত্রী? হিন্দুর কন্যা আমরা, ভারতের পুত্রী, কলিকাতা নগরীর লক্ষ লক্ষ অজানিত, অদৃষ্ট, অজ্ঞাতনামধেয় ভাইভগ্নীদিগের গুটী কত ভগ্নী আমরা। একটি সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়াছি, পরস্পরে সংযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু মনে রাখা উচিত—এই বিপুল ভারত পরিবারের একমুঠিভরা কন্যা আমরা। আমাদের ন্যায় কোটি কোটি কন্যা ভারতের লক্ষে রহিয়াছেন। হয়ত আরও কোথাও কোথাও বা এমনি এক একটি গুচ্ছ কখন কখন বাঁধিয়া উঠিয়াছে। যে ভাব আমাদের প্রাণে আঘাত করে নাই, হয়ত সে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আর একটি ভগ্নী-সমষ্টি কোথাও স্থায়ীভাবে সংযুক্ত হইয়াছেন। যে কাজ আমাদের সাধ্যাতীত সে কাজের বোঝা হয়ত আর কোন পল্লীতে আর কোন ভারত কন্যারা নিজেদের স্কন্ধে বহন করিতেছেন। জানিতে কৌতূহল হয় না কি আপনাদেরই মত ভারতের মেয়েরা আজ কোথায় কি করিতেছেন? পরিবারের যজ্ঞশালায় হয়ত পোলাওটার ভার আজ আপনাদের উপর, কিন্তু ভাতডালটার ভার কোন্ বহিনদের উপর, ভাঁড়ারের চাবি কাহার হাতে, পাত সাজাইতেছেন কারা—এসব জানিতে মন চায় না কি? সাধ ত যায় আমিই সবটা করি, কিন্তু সাধ্যে যখন কুলায় না তখন আমিই যেন স্নেহের দ্বারা প্রীতির দ্বারা বিস্তৃত হইয়া অন্যে প্রসারিত হইয়া পড়ি। যে কাজটা আমি পারিলাম না সে যদি আর কেহ করেন তবে সে ত প্রকারান্তরে আমারই করা হইল—কারণ করিলেন যিনি তিনি ভগ্নী ত আমারই। সেইজন্য উদ্দাম আগ্রহযুক্ত হইয়া জানিবার ঔৎসুক্য রাখা চাই আমাদেরই গৃহে, আমাদেরই দেশে, আমাদেরই রক্তের আর আর ভগ্নীরা কি কি করিতেছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল নামে যে মহাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই। আপনাদের পরস্পরের কাজের সম্বাদ পরস্পরের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে।

কত পর্ব্বত, কত প্রান্তর, কত দেশ অতিক্রম করিয়া কত নদী সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে বলিয়া। সমুদ্রের মহাবক্ষ সকলের মিলনের স্থান। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী, তাপ্তী সকলেই আপনাপন বৈচিত্র্য-

* বিভিন্ন মহিলাগোষ্ঠিতে বিভিন্নরূপে উক্ত কথার সারাংশ।

ময় জীবনকাহিনী দিয়া সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীত রচনা করিতেছে। রাগরাগিণীর অভিনব মূর্চ্ছনার মধ্যে 'স ঋ গ ম প ধ ন' এই সাতটা সুরেরই লীলা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু গান যদি না থাকিত কোথায় এই সুর কটি মিলিত হইত? মহার্ণব যদি না থাকিত কোথায় প্রাচী ও প্রতীচী ধারা সকল সংযুক্ত হইত? আপনাদের সহিত অপরের সেই যোগাযোগসাধনের জন্য স্ত্রী-মহামণ্ডল সচেষ্ট। যুক্ত হইবেন কি? পরস্পরের সহিত পরিচয় ও পরস্পরের সহিত সহানুভূতির চর্চ্চা করিবেন কি? ইহার পন্থা এই: প্রথমতঃ স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকাকে নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া জানাইতে হইবে যে আপনি সংযুক্ত হইতে ইচ্ছুক। যদি কোন সমিতি হয় তবে সমিতি নিজের নাম, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর একটি বিবরণী মহামণ্ডলের নিকট প্রেরণ করিবে। তারপরে স্ব স্ব কার্য্যের মাসিক ষান্মাসিক বা বার্ষিক রিপোর্ট মহামণ্ডলের নিকট প্রেরণ করিতে থাকিবে। বৎসরান্তে বহু সমিতির বা অনুষ্ঠানের রিপোর্ট মহামণ্ডলের নিকট একত্রিত হইবে। যখন মহামণ্ডলের বাৎসরিক পরিষদে ভারত-মহাবর্ষের দেশবিদেশ হইতে মহিলাগণ সমবেত হইবেন, ভিন্ন ভিন্ন সমিতির প্রতিনিধিগণ একত্র হইবেন, তখন উপস্থিত সকলের সম্মুখে ভারতের স্ত্রীগণ-পরিচালিত সমস্ত সমিতি বা সদনুষ্ঠানের বিবরণী একে একে পঠিত হইবে। যেন সকলে পরস্পরের চেষ্টা, কৃতকার্য্যতা, বাধা, উদ্যম, বিঘ্ন ও অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উৎসাহিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সহানুভূতির দ্বারা পূরিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়া দ্বিগুণবলে আপনাপন কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। যেন বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্য দিয়াও আমরা পরস্পরের সহিত যোগের গ্রন্থি বাঁধিতে পারি। কর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত আমাদের যোগসাধন করিতে হইবে। তাঁহার উপাসনা মানেই তাঁহার প্রিয়কর্ম্মের সাধনা। ধ্যান, ধারণা, তপস্যা, পরসেবা, পরোপকার এ সকলই কর্ম্ম। এই কর্ম্মের দ্বার দিয়াই তাঁহার নিকট পৌছিতে হইবে—আর পথ নাই। ছোট ছোট কর্ম্মের দ্বারাই পরস্পরের নিকটও পৌছিতে হইবে। আমার আমার কর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম এক জায়গায় সংযুক্ত করিয়া সকলের সহিত যোগসাধন করিতে হইবে। সেই তোমার আমার এর ওর তার সকলের কর্ম্মের সংযোজক স্ত্রী-মহামণ্ডল।

সমুদ্র যেমন বহুনদীর মিলনে গঠিত হইয়া শুধু মিলনক্ষেত্রেই পর্য্যবসিত হয় না,—তাহা এক মহাদেশকে আর এক মহাদেশের সহিত সংযুক্ত করিবার রাজপথ হয়, তাহার বারিবিন্দু-সকল সূর্য্যরশ্মি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া মেঘাকারে ধরণীতে শীতলতা ও শস্যশালিতা বর্ষণ করে, তাহার অতলগর্ভ মণিমাণিক্য ও অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থান হয়—তেমনি ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল শুধুই বহুমণ্ডলীর মিলন কেন্দ্র মাত্র হইয়া আপনার জন্ম চরিতার্থ মনে করিবে না। মহার্ণবের ন্যায় তাহাও ভারতের এক প্রান্তকে আর এক প্রান্তের সহিত সংযুক্ত করিবে, বহুপ্রাণীকে বক্ষে ধারণ করিবে, জাতিধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারত মহিলা এই মহাসমিতির সভ্য

হইবেন। মহামণ্ডল শব্দেই বুঝিতে পারিতেছেন সমস্ত ভারতবর্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা একটি মহাসভা। ইহার চন্দ্রাতপতলে সকলেরই জন্য আসন বিস্তীর্ণ আছে। বাঙ্গালিনী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারিনী মরাঠিনী, মন্দ্রাজিনী পঞ্জাবিনী সকলেই ইহাতে নিমন্ত্রিত। আবার য়ুরোপ, আমেরিকা ইয়ান, জাপান, বা আর যে কোন দেশীয় যে কোন স্ত্রী ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, ভারতের মেয়েদের উন্নতি চাহেন, তাহাদের সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, তাহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে চাহেন তিনিই ইহার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। সঞ্চিত লোকবল ও অর্থবলের দ্বারা মহামণ্ডল ভারতের অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে শিক্ষাবারি বর্ষণ করিবে, নিঃস্ব পুরনারীদিগের নির্ব্বাহের উপায় করিবে, আর্ত্ত ভারতনারীর চিকিৎসার পথ সুগম করিবে ও প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবে। ইহার মধ্যে যে কোন একটি কার্য্যের ভার যে কোন ক্ষুদ্র সমিতি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াও মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন। মহামণ্ডল সাধ্যমত সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য বা লোক সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে।

দেখ ইয়ং উইমেন্‌স্ ক্রীশ্চান এসোসিয়েশন কি না করিতেছেন। প্রথমে একটি স্কচ মহিলার মনে একটি ভাবের উদ্রেক হয়। তাহার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি আরও কয়েকটি মহিলাকে তাঁরই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। সেই মহিলাদের পরস্পরের সংযোগে যখন মনের মধ্যে চালক শক্তি আর একটু পুষ্টভাব ধারণ করিল, তাঁরা স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ইয়োরোপ, আমেরিকা, এসিয়া সকল দেশের মহিলাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন, এখন সর্ব্বদেশের মহিলাদের মধ্যে তাঁহারা কত শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

এত কার্য্য করিবার বল ইংরাজমহিলাতে আসে, আমাদের মধ্যে আসে না কেন? শুধু যোগাযোগের, মেশামিশির অভাবে। ভারতীয় স্ত্রী-মহামণ্ডল সেই যোগাযোগ সাধনের একটি যন্ত্রস্বরূপ।

এই যন্ত্রবলে আমরা অন্তঃপুর শিক্ষার রেলগাড়ী চালাইবার উচ্চাভিলাস পোষণ করিব। নিঃস্বপুরনারীগণের নির্ব্বাহের একটা উপায় খুলিয়া দেওয়ার লক্ষ্য রাখিব। আর্ত্ত নারীগণের চিকিৎসার পথ সুগম করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায় ধরিব। প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিব।

যতদিন য়ুরোপের সহিত এসিয়ার সংযোগ হইয়াছে প্রায় ততদিন হইতেই বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিসনরী সম্প্রদায় ভারতের অন্তঃপুর শিক্ষার ভার স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করিতেছেন। স্কচ, ইংলিশ, আইরিস, ফরাসী, রসিয়ান, পর্ত্তুগীজ, ডানিজ, সুইজ, জর্ম্মণ, আমেরিকান কেহই পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি। তবে এখনও কি সময় আসে নাই যে আমাদের নিজেদের শিক্ষার বোঝা আমরা নিজেরা বহন করি? বিশেষতঃ মিসনরীদের অদম্য উৎসাহ সত্ত্বেও ধর্ম্মবিপ্লবের ভয়ে ভারতের অধিকাংশ পরিবারই তাঁহাদের প্রতি বিমুখ, তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত। আমাদের সেই সকল গৃহে শিক্ষার দীপ হস্তে আমরা নিজেরাই কি এখন যাইব

না?. আর কতদিন—আর কতদিন এমন নিরুদ্যমে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিবে? সাত সমুদ্র উনপঞ্চাশ নদী পার হইয়া আসিয়া বিদেশিনীরা এত করিতেছেন—আমরা এখনও কি অপরের কার্য্যকলাপের প্রশংসায় শুধু হতভম্ব হইয়া বসিয়া থাকিব? তাঁহাদের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্মশীলতার অনুকরণ করিব না, তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা নিজেদের মধ্যে সঞ্চার করিব না? খ্রীষ্টীয় রমণীদের এক একটির জীবন চরিত অনুসন্ধান করিয়া দেখ কি স্বার্থত্যাগ, কি কৃচ্ছ্রস্বীকার, কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কি অক্লান্ত-অধ্যবসায়—কি মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই পণের উদ্‌যাপনে তাহা পূর্ণ। এসব গুণ কি আমাদের মধ্যে নাই? এ সব কি আমরা পারি না? কেন পারিব না? তাঁহাদের মত কৃচ্ছ্রসাধন কর, তপস্যা কর, প্রতিজ্ঞা লও, ব্রতনিয়ম রাখ এবং পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা কর।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এক পাড়ার মেয়েদের সহিত আর এক পাড়ার মেয়েদের সংযোগ করিয়া দিবে, এক সহরের স্ত্রীদের সহিত আর এক সহরের স্ত্রীগণকে সংযুক্ত করিবে,—এক প্রদেশের মহিলাদের সহিত আর এক প্রদেশের মহিলাগণের সম্মিলন করিয়া দিবে এবং ভারতমহাদেশের নারীগণের সহিত অন্যান্য মহাদেশের নারীগণের আধ্যাত্মিক মিলন সংঘটন করিবে। শুনিয়া প্রীত হইবেন ইংলণ্ড সহর হইতে একটি প্রবাসিনী হিন্দু রমণীর চিঠি আসিয়াছে, তিনি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভ্য হইতে অভিলাষিণী এবং ইংলণ্ডে তাঁহার ইংরেজ সখিগণকে লইয়া ইহার একটি শাখা স্থাপনের অনুমতিপ্রার্থিনী।

বিশাল নগরীর পাড়ায় পাড়ায় শাখা স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরশিক্ষা ও নিঃস্বনারীগণের নির্ব্বাহের জন্য ভাণ্ডার খোলার বন্দোবস্ত আপনারা করিতে পারেন। আপনাদের মধ্যে যে কেহ কখন মফস্বলে যাইবেন সেখানেই মহিলাদের একত্র করিয়া উদ্দেশ্য বুঝাইয়া শাখা স্থাপন করিয়া দিয়া কার্য্য চালাইয়া আসিতে পারেন। সর্ব্বদা লক্ষ্যটি মনের সামনে ধরিয়া রাখিতে হইবে। শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ননদ প্রভৃতি পরিবারের সকলের সেবায় রত থাকিলেও সতী স্ত্রীর হৃদয়পট হইতে পতির মূর্ত্তি যেমন একমুহূর্ত্তের জন্যও তিরোহিত হয় না, তেমনি আমাদের সকলের মনে সকল গৃহকার্য্য, সকল সামাজিক উৎসব আমোদ প্রমোদের মধ্যে এই কর্ত্তব্যভাবটি বরাবর ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে যে আমরা আমাদের ভগ্নীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সদনুষ্ঠান করিতে থাকিব। কষ্টে দিনপাত হয় অথচ কিছু বিদ্যা আছে পাড়ায় পাড়ায় এমন রমণীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সেই পাড়ায় শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করাইব। শিক্ষিতাদের বারব্রত দেওয়াইব যে যাঁহার যে বিষয়ে যেটুকু জানা আছে তিনি ততটুকুই নিয়মপূর্ব্বক অন্যদের দান করিবেন।

ইংরেজ মেয়েরা রিডিং ক্লব করেন। তাহার মেম্বরেরা নিজেদের অনেক সময় এইরূপ নিয়মে আবদ্ধ করেন যে প্রতিদিন এক ঘণ্টা একটু গম্ভীর বিষয়ক কিছু পাঠ করিবেন—শুধুই নভেল নাটক নহে। যিনি যেদিন নিয়ম ভঙ্গ করেন আপনার দৈনিক লিপিতে তাহা টুকিয়া রাখিয়া নিয়মভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সভাকে অর্থদণ্ড দেন। মনে করুন

আপনারা রিডিং ক্লবের স্থানে টিচিং ক্লব করিয়া তাহার মেম্বর হইলেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব অবসর ও কষ্টসহিষ্ণুতার মাত্রানুসারে প্রতিদিন কিম্বা প্রতিসপ্তাহে এক ঘণ্টা কাহাকেও কিছু শিখাইবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। যদি বৃহৎ পরিবারভুক্ত হন তবে নিয়মিত সময় বৌঝিদের লইয়া বসিলেন। বাঙ্গলা জানেন ত কিছু বাঙ্গলা পড়াইলেন, ইংরাজী জানেন ত ইংরাজী শিখাইলেন, গান বাজনা, সেলাই বা আলিপনা বা যা কিছু জানেন তাহাই অন্যকে দান করিলেন। যদি বাড়ীতে শিক্ষাপাত্রী না থাকে পাড়াপড়শীর মেয়েদের বলিয়া রাখিবেন, তাহাদের জড় করিয়া শিখাইবেন। যদি কাছাকাছি পল্লী না থাকে তবে নিজের গৃহের ঝিচাকরের মেয়েকে ডাকিয়া শিক্ষাদান করিবেন। মোট কথা এই, দানের সংকল্প থাকিলে পাত্রীর অভাব হইবে না। ব্রত পালনের দৈনিক লিপি লিখিতে হইবে। যদি কখন নিয়মভঙ্গ হয়, ব্রত স্খলন হয়, তবে দৈনিকলিপিতে টুকিয়া রাখিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহামণ্ডলকে অর্থদণ্ড পাঠাইয়া দিবেন। এই বৈশাখ মাস আসিতেছে। ভারতবর্ষময় কত সহস্র ভারতনারী ১লা বৈশাখ হইতে কত শতবিধ ব্রত গ্রহণ করিবেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নব্য আলোক প্রাপ্ত তাঁহারাও একবার সকলের সঙ্গে এক মনপ্রাণ হউন, নূতন বৈশাখে নূতন ব্রত লউন। এই ভারতের মাটিতে আমাদের সকলের শরীরই গঠিত, এই মাটির গুণে যে সংযম-শিক্ষা অন্যেরা চর্চ্চা করিতেছে আমরা তাহা হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখি কেন? আর পুরাতন খেয়ালের ভগিনীগণ তোমাদের দশটি ব্রতের মধ্যে দেশকালের প্রয়োজন অনুসারে আর একটি ব্রতের স্থান কর। বিদ্যাদানও যে একটি পুণ্যকাজ, তাহাও যে নিত্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত করা উচিত তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপলব্ধি করাও, নিজেরা বিদ্যা দানের ব্রত লও, এবং অপরকে লওয়াও। ব্রতের লাভ দুয়েতে স্পর্শে। ইহা দ্বারা আত্মোপকার ও পরোপকার দুইই সাধিত হয়। যিনি ব্রত লয়েন সংযম ও নিয়মের দ্বারা তাঁর আত্মোন্নতি সাধন হয়, জড় বা পাশব ভাব হইতে তিনি ক্রমে মনুষ্যত্বের ভাবে উঠিতে শেখেন, এবং ব্রতজনিত দানের দ্বারা পরের উপকার হয়।

ইহাছাড়া স্ত্রী-মহামণ্ডল হইতে কারুকার্য্য-কুশলা নারীদিগের হাতের কাজ একত্র করিয়া পাড়ায় পাড়ায় আমরা বিক্রয়ের ভাণ্ডার খুলিয়া দিব। হয়ত তাহাতে কোন দুঃখিনীর ছেলেটির জলখাবারেরও উপায় হইবে, হয়ত কাহারও শীতের বস্ত্র জুটিবে, কাহারও বা স্কুলের মাহিয়ানাটা আসিবে। আমাদের দেশের মেয়েদের বুক ফাটে ত মুখ ফুটেনা তাই যদি এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায় যে ভাণ্ডারিণী ছাড়া আর কেহই অবগত হইবেন না যে কে কোন্ জিনিষটি পাঠাইলেন তবে অনেকেই জিনিষপত্র পাঠাইয়া নিজেদের নির্ব্বাহের একটা উপায় করিতে উৎসাহিত হইবেন।

কেবল একজনের আন্তরিক চেষ্টায় কত দুঃসাধ্য মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে সংসাধিত হয়—আর সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রী-মহামণ্ডলের সমবেত চেষ্টায় কি না হইতে পারে?

কর্ম্মের বন্ধনের ন্যায় এমন কাছে-টানা

অথচ দৃঢ় বন্ধন আর কিছু নাই। যেখানে এক কর্ম্ম এক লক্ষ্য সেইখানেই একহৃদয় ও প্রীতি। স্ত্রী-মহামণ্ডলের সূত্রে বিভিন্ন প্রদেশের নারীগণের পরস্পরের সহিত কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমরা প্রীতির গ্রন্থি বাঁধিব। কর্ম্মের সেতু দিয়াই ভারতমহিলাগণ পরস্পরের নিকট পৌঁছিতে পারেন—নতুবা রাস্তা নাই। স্ত্রী-মহামণ্ডল সেই সংযোজক সেতুবন্ধ।

এই মহামণ্ডলের বল পুষ্ট করিতে হইবে প্রত্যেকে ইহার মেম্বর হইয়া। এ কথা বলিবেন না—আমি না-ই বা হইলাম, অনেকেই ত আছেন, আমি একা না হলে কি বা এসে গেল? একজন রাজা তাঁর রাজধানীতে একটা প্রকাণ্ড খদ খনন করাইয়া রাজ্যের সকল গোয়ালাকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন আজ রাতারাতিই প্রত্যেকে যেন উহাতে এক ঘটি মাত্র দুধ ঢালিয়া দিয়া যায়, পরদিন প্রভাতে তিনি ক্ষীরসমুদ্র দেখিতে চান। সূর্য্যোদয়ে রাজা যখন বড় আগ্রহে মন্ত্রীবর্গের সহিত ক্ষীরাশয় দেখিতে আসিলেন—দেখিলেন ক্ষীরাশয় কোথায়—সুমুখে মহা জলাশয় বিস্তৃত, দুধের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। নিকটস্থ একজন গোয়ালাকে তলব হইল। সে আসিলেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই বেটা জল ঢেলে গেছিস, দুধ দিসনি?" সে ভয়ে কম্পমান হইয়া ভাবিল মহারাজা কেমন করিয়া টের পাইলেন না জানি। যাহোক যখন ধরা পড়িয়াছি স্বীকার করাই ভাল। সে আঁকুবাঁকু করিয়া বলিল—"মহারাজ অপরাধ মাপ করোক! ঠাকুরে ছিনু হাজার হাজার গোপের পো দুধ ঢেলে যাবেন তার মধ্যে মুই গরীব না হয় এক ঘটি জলই দিনু, তাতে ক্ষীর-সমুদ্রের কোনই হানি হবেন না।"

দ্বিতীয় গোপপুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা গেল সেও ঐ উত্তর দিল। তৃতীয় গোপনন্দনও সেই কথাই বলিল। একে একে সকলের কৈফিয়ৎ তলব হইল, সকলেরই একই উক্তি। প্রত্যেকেই বঞ্চনার যুক্তি করিয়াছিল, প্রত্যেকেই স্বীয় কর্ত্তব্যের অংশটুকু পালনে ত্রুটী করিয়াছিল তাই জলাশয়মাত্র হইল, যদি প্রত্যেকেই আপনাপন কর্ত্তব্যটুকু পালন করিত তবে ক্ষীরাশয় হইত।

যদি শিক্ষিতা ভারত স্ত্রী মাত্রে আপনার কর্ত্তব্যটুকু পালন করেন, প্রথমতঃ ইহাতে সম্মিলিত হইয়া, দ্বিতীয়তঃ ইহার উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টা ও সহায়তা করিয়া তবে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল ক্ষীরাশয় হইবে, নতুবা জলাশয় দেখা দিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেকে এক ঘটি মাত্র দুধ যোগাইয়া যদি ক্ষীরসাগর করিতে পারা যায় তবে সেটুকু যোগানর কৃচ্ছ সাধন কি আমরা করিব না? যদি না করি তবে বঞ্চনা কাকে করা হইবে? নিজেদেরই। অপর দেশের নারীদের নহে।

"এ কথা না ভুলে রও
তুমি শুধু তুমি নও
দশের মাঝারে একজন
দেশের দশের মানে সম্মান আপন।"

শ্রীসরলা দেবী।

অকৃতজ্ঞ।

করালীপাড়ার চক্রবর্ত্তীদিগের প্রকাণ্ড পরিবার যখন জ্ঞাতি-সুলভ মামলা-মোকদ্দমায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় দুই শরিক তারাশঙ্কর ও মুরারিমোহন আপনাদিগের অংশগুলি জ্ঞাতিবর্গের হস্তে তুলিয়া দিয়া আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া কাশীবাসের জন্য দেশত্যাগ করিল।

এই মহানুভবতা ও ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া গ্রামের প্রবীণগণ যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, উকিলগণ ঠিক সেই পরিমাণে এই উভয় পরিবারের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন!

তারাশঙ্কর নির্ব্বিরোধ প্রকৃতির লোক,—আদালতে আমলাবর্গের অত্যধিক অর্থলালসা দেখিয়া ও উকিলগণের নানাবিধ জেরা ও জুলুমের মধ্যে পড়িয়া সে বেচারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মুরারিমোহন আমোদ প্রবণ—আইনের কূট রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়িত,—তাই প্রকাণ্ড পরিবারের এই দুইটি শরিক মামলা মিটাইয়া, এজামালিত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কাশীতে দশাশ্বমেধের ঘাটের নিকট বাসা লইল।

পাশাপাশি দুইটি ছোট বাড়িতে নূতন করিয়া সংসার পাতা হইল। সরিকগণের কলহের তুমুল কোলাহল, আদালতের রুদ্র শাসন, উকিলের উৎপীড়ন সব ছাড়িয়া প্রণষ্ট শান্তিসুখ ফিরিয়া পাইয়া উভয় পরিবারই যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! কিন্তু গঙ্গার ঘাটে বায়ু-সেবন ও মন্দিরে দেবতা-দর্শন করিলে মনে শান্তি মিলিলেও সংসারের অভাব তাহাতে ঘুচে না! দেশে থাকিতে ক্ষেত্রের চাউল, পুষ্করিণীর মৎস্য ও বাগানের তরীতরকারী যেমন অনায়াসলভ্য ছিল, এখন আর তেমনটি নাই! এখানে চাকুরির অবলম্বন নহিলে অন্ন মেলা দায়।

এদিকে চক্রবর্ত্তী বংশে কাহারও নামের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ত কোন কালে ছিলই না, উপরন্তু বিদ্যালয়ের সহিতও বড় একটা সম্পর্ক রাখিবার কখনও প্রয়োজন মনে হয় নাই—কাজেই নানা চেষ্টায় সামান্য চাকুরিমাত্র জুটিল!

তারাশঙ্কর আসিয়া ডাকিল, "মুরারি!"

মুরারি বলিল, "দাদা, এ দেশে এসে অন্যায় করেছ, দেখছি। অল্প খরচে এখানে চলে ভাবতাম, তা এ যে দেখছি সহরের মতই সব হয়ে পড়েছে—"

তারাশঙ্কর বলিল, "কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল?—দেশের জমি জমাটা এমন করে ছেড়ে আসা ভাল হয়নি, মনে হচ্ছে—"

মুরারি বলিল, "ছেড়ে এসেছি বলেই দু পয়সা তবু যাহোক্ হাতে ঠেকেছে—না হলে এ মোকদ্দমায় তুমি কি মনে কর কিছু বাকি থাকবে! উকিল পেয়াদা মিলে সমস্ত বিষয়টুকু,—আর পাড়াগায় তার দামই বা কি—খেয়ে বসবে! দেখো এর পর আর সকলের অবস্থাটা!"

তারাশঙ্কর বলিল, "ছেলেপিলেগুলো যে পেট পুরে খেতে পায় না—"

মুরারি বলিল, "আধপেটা যে জুটছে এটাই ভাগ্য বলে মেনো!"

রোদ পড়িয়া আসিলে, ছেলে-মেয়েরা যখন প্রাণ ভরিয়া খেলা করিত, তাহাদের সে উল্লাস চীৎকারে তারাশঙ্করের চোখ ছল-ছল করিয়া আসিত। সে ভাবিত, "হা রে অভাগারা—"

২

মনসাখালির জমিদার হরকান্ত চৌধুরী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পত্নীকে লইয়া নানা তীর্থ ঘুরিয়া শেষে কাশীবাস করিতেছিলেন। গৃহে ফিরিবার দিকে তাঁহার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না। বিষয়-কর্ম্মে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া কর্ম্মচারীবর্গ ও গুরুদেব তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইলেন, শেষে শাস্ত্রকথা পাড়িয়া বসিলেন, এ ভবসংসারে শোক পায় নাই এমন লোক বিরল, সংসারীর নানা কর্ত্তব্য আছে, কাতর হইলে চলিবে না! এবং গৃহিণীঠাকুরাণীর কঠিন পীড়াবশতঃ পুত্রমুখ দর্শনের আশা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পোষ্যপুত্র লইলে বংশলোপের আশঙ্কা নাই ইত্যাদি।

কথাটা হরকান্তের মন্দ লাগিল না—নানা মন্ত্র ও ঔষধ-মাদুলির ব্যবস্থা করিয়া যে পুত্র তিনি পাইয়াছিলেন, সে ত রহিলই না! বিপুল বিষয় ও প্রাচীন বংশটা রক্ষা করিতে হইলে পোষ্যপুত্র লওয়া ভিন্ন এখন আর উপায়ই বা কি? কিন্তু তেমন একটি পুত্রই বা মিলে কোথায়?

একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "দশাশ্বমেধের কাছে একটি লোক আছেন, নাম তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে—অবস্থা খারাপ—ছোট ছেলেটি দেখতেও যেন কার্ত্তিক, পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স—"

৩

বাড়ীর সম্মুখে রোয়াকে বসিয়া তারাশঙ্কর তামাকু টানিতেছিল, এমন সময় হরকান্তের দেওয়ান আসিয়া প্রণাম করিল। দেওয়ান আগমনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে, তারাশঙ্কর অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

দেওয়ান কহিল, "তা হলে মশায়ের ইচ্ছা নাই, বোধ হয়—তবে আসি—মাপ করবেন!"

তারাশঙ্করের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল, "বসুন, আমি আসছি।"

তারাশঙ্কর আসিয়া স্ত্রীর নিকট ব্যাপার খুলিয়া বলিল। শুনিয়া স্ত্রী বলিল, "পোড়া কপাল! পেটের ছেলে বিক্রী করব—গলায় দড়ি জোটে না?"

তারাশঙ্কর হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কহিল, "কিন্তু তুমি বুঝছ না, ছেলেটা খেয়ে বাঁচবে—ভবিষ্যতে কত বড় সম্পত্তির সে মালিক হবে—সকলের ভাল হবে—"

স্ত্রী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "অমন ভালর মুখে আগুন!"

তারাশঙ্কর বলিল, "বলছে এখন পাঁচশ টাকা নগদ দেবে—তারপর যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, ততদিন পনেরো টাকা করে মাসহারা দেবে—"

স্ত্রী বলিল, "অমন টাকায় কাজ নেই, আমার পেটে স্থান দিছি যখন, একমুঠো খেতেও দিতে পারব—"

স্ত্রী গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল। তারাশঙ্কর নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে মহা-

সমস্যায় পড়িয়াছিল। পুত্র-বিক্রয়! কথাটা তীরের মত তাহার প্রাণে বিঁধিতেছিল, কিন্তু আর একটা দিক সে বড় উজ্জ্বল দেখিতেছিল —এই সব সংসারের দৈন্য, আফিসের কষ্ট একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে পাপই বা কি? পুত্রের ভালর জন্যই ত সে এ ব্যবস্থা করিতেছে! ইহা অপেক্ষা ছেলেটা না খাইয়া মরিবে, তাহা হইলেই কি কীর্ত্তির ধ্বজা উড়িতে থাকিবে!

স্ত্রী ফিরিলে, সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "ওগো—শুনছ?"

স্ত্রী তীব্রস্বরে উত্তর দিল, "কি?"

"তা হলে কি বলব? লোক বসে রয়েছে—ছেলেটার ভাল হত—তাই বলছি, একটু বিবেচনা কর—পাগলামি করো না—"

স্ত্রী একবার ভাবিয়া লইয়াছিল—এই যে তাহার স্বামী এতটা মহত্ত্ব দেখাইয়া দেশের বিষয় ছাড়িয়া আসিয়াছে, কৈ, ভগবান ত মুখ তুলিয়া চাহিলেন না! এ ত্যাগের মূল্য তিনি বুঝিলেন না! একটা ভাল চাকুরিও তাহার স্বামীর অদৃষ্টে জুটিল না! তবে—! আর পুত্রকে বা বিক্রয়ই কেন? এ'ত পুত্রের সুখের জন্য তাহারা ত্যাগ স্বীকার করিতেছে! এমন সময় পুত্র আসিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মা—ওদের বিশু আমাকে মেরেছে মা—"

মাতৃহৃদয় নিমেষে অমনি স্নেহের রসে ভরিয়া উঠিল—পুত্রকে বুকে তুলিয়া সুন্দর ছোট মুখখানিতে চুম্বন করিয়া, মা বলিলেন, "কেঁদো না মাণিক—আমি তাকে মারবো"—

তারাশঙ্কর কহিল, "তা হলে কি বলব?"

স্ত্রী কহিল—"তা আবার জিজ্ঞাসা করছ! বলোগে ছেলে বিক্রী করা আমাদের ব্যবসা নয়—"

তারাশঙ্কর সে মাতৃমূর্ত্তির নিকট একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। যন্ত্র-চালিতের মত সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সেইদিন অপরাহ্নে সংবাদ পাওয়া গেল, মুরারির কনিষ্ঠ পুত্রটিকে মনসাখালির জমিদার হরকান্ত চৌধুরী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে, কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে,—কাশীতেই মহা ধুমধামে অনুষ্ঠানক্রিয়া সম্পাদিত হইবে!

শুনিয়া পাড়ার লোক কেহ বলিল, "একেই বলে বরাত!" কেহ বা আবার পুত্রের জনক-জননীর উদ্দেশ্যে বলিল, "মুখে আগুন অমন বাপ-মার!"

৪

তাহার পর প্রায় বার-তের বৎসর অতীত হইয়াছে। নানা দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া তারাশঙ্করের কত দুর্বৎসর কাটিয়া গিয়াছে! কনিষ্ঠটি ব্যতীত তাহার অপর পুত্রগুলি একে একে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে—এবং সেটিও অত্যধিক আদরে বিগড়াইয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধ পিতা চাকুরি করিয়া যে কয়টি মুদ্রা আনিয়া দেয়, তাহাতেই সংসার চলে। অপদার্থ পুত্র প্রিয়শঙ্কর অমির বাবুদিগের সখের থিয়েটারে নায়িকা সাজিয়া আসর মাতাইয়া তুলে, বাবুদের বৈঠকখানাতেই তাহার সময় কাটিয়া যায়—সংসারের ভাবনায় মাথা ঘামানো তাহার কাজ নয়!

এমন সময় বৃদ্ধ তারাশঙ্কর নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত একদিন ইহজগতের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বসিল। প্রিয়শঙ্কর

অগত্যা চক্ষুলজ্জার খাতিরে সংসারের ভার গ্রহণ করিল।

মুরারির দুইটি পুত্রের মধ্যে বড়টি লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিতেছিল—ছোটটি কাশীতে কচিৎ আসিত, আসিলে মুরারির বাড়ীতেই সে অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিত!

সেদিন বাবুদের বাড়ী থিয়েটারের জন্য প্রিয়শঙ্কর অফিস হইতে সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছিল। বাবুদের বাড়ী সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহে নূতন নাটক "আশা-প্রদীপের" অভিনয় হইবে, তাহাতে সে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিবে!

বাবুদের দেওয়া মলিন ধূলি-ধূসরিত পাম্পসু ঝাড়িয়া মুছিয়া, গিলা-করা পঞ্জাবির উপর কুঞ্চিত চাদর উড়াইয়া প্রিয়শঙ্কর বাহির হইবে, এমন সময় পুষ্পসারের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া এক তরুণ সুশ্রী যুবক মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল—প্রিয়কে দেখিয়া যুবক ডাকিল, "প্রিয়দা থিয়েটারে যাচ্ছ, বুঝি?"

প্রিয় প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদ বলিল, "একে চিনতে পাচ্ছনা, প্রিয়? আমাদের মোহিনী যে—"

মোহিনী! প্রিয়র চোখের সম্মুখ হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল—বার বৎসর পূর্ব্বেকার এক অতীত দৃশ্য তাহার সম্মুখে ছবির মত ফুটিয়া উঠিল! সেই শীর্ণকায়, কুশ্রী কদাকার এক দরিদ্র বালক—আজ—! নিরাশায় ক্ষোভে প্রিয়শঙ্করের অন্তরখানা জ্বলিয়া উঠিল! তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

বিনোদ কহিল, "খুড়িমা কোথায়?"

মোহিনী কহিল, "এখন থাক্—এসেই দেখা করব'খন, দাদা—সিঙ্গিদের ওখানে আগে চল বরং—তাদের থিয়েটারে আজ আমাকে যেতেই হবে, না হলে ভারী দুঃখিত হবে, তারা! অনেক করে বলে এসেছে। প্রিয়দা তুমি ত ওখানেই যাচ্ছ—"

প্রিয় বলিল, "না!"

বিনোদ কহিল, "সে কি? তুমি না heroineএর পার্ট নিয়েছ?"

এমন সময় প্রিয়শঙ্করের জননী আসিয়া কহিল, "বিনোদ, উটি কে—আমাদের মোহিনী বুঝি,—আহা দিব্যি হয়েছে ত—যেন রাজপুত্তুর—, তা বস মোহিনী—"

মোহিনী প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, খুড়িমা, এখন ভারী ব্যস্ত আছি—শুধু প্রিয়দাকে একসঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে এসে-ছিলুম, আমার গাড়ী তৈরি আছে—"

প্রিয় কহিল, "তোমরা যাও, আমার একটু দেরী হবে—কাজ আছে।"

বিনোদ কহিল, "হেঁটে যাবে কেন? গাড়ী ত রয়েছে মোহিনীর—"

প্রিয় কহিল, "চিরকাল হেঁটেই কেটে যাচ্চে যখন"—

মোহিনী কহিল, "তা হলে শীঘ্র এসো, প্রিয়দা—"

বিনোদ ও মোহিনী চলিয়া গেল।

প্রিয় মাতার পানে চাহিয়া ডাকিল, "মা—"

"কেন, প্রিয়?"

"আমার এই সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার মূল, তুমি—এ কথা আমি কখনো ভুলব না, কখনো না!"

"কি বলছিস্, প্রিয় ?"

"কি বলছি ? এই মোহিনী—এ কি ছিল—কিন্তু আজ—! অথচ এ সব আমারই প্রাপ্য ! জমিদার হরকান্ত আমাকে পোষ্যপুত্র নিতে চেয়েছিল—মোহিনীকে নয় ! কিন্তু আমাকে ছেড়ে দাওনি তুমি ! চিরকাল এই দুঃখের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে আমার দিন কেটে গেল ! নিজের স্বার্থের জন্য ছেলের ভাল হতে দাওনি—এই কাঙ্গাল মোহিনী আমার ধনে ধনী হয়ে, আজ রাজপুত্রের মত চলেছে, আর আমি—"

প্রিয়শঙ্করের চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছিল।

মা বলিলেন, "ও কি বলছিস্ বাবা,—পয়সা নিয়ে ছেলে বিক্রী করব, এমন মা, আমি তোর ?" মা'র চোখে জল আসিল।

প্রিয় কহিল, "থাম, আর আদর দেখাতে হবে না ! অমন কান্না আমি ঢের দেখেছি। আমার জীবনটাকে তুমি একেবারে ভেঙ্গে চুরে দেছ—মনে করোনা ভগবান কখনও এ অপরাধ ক্ষমা করবেন—আমি চললাম—তোমার সংসার নিয়ে তুমি থাকো—আমি একবার জগতে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই—"

মা কথাটা ভাল বুঝিলেন না, চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ ?—থিয়েটারে ?"

"চুলোয়",—বলিয়া প্রিয়শঙ্কর চলিয়া গেল !

মাতার হৃদয়ে ব্যথাটা শেলের মত বিঁধিল ! হা রে অকৃতজ্ঞ পুত্র, মাতার দুঃখ তুই কি বুঝিবি ! স্বার্থের জন্য তোর ভাল হইতে দিলাম না ! বেশ, তাই যদি বুঝিয়া থাকিস্—ত বলিবার কিছু নাই, আর—শুধু ভগবান তোকে ক্ষমা করুন !

প্রিয়শঙ্কর যখন গলি পার হইয়া পথে পড়িল, তখন সদর্পে ধূলি উড়াইয়া মোড় বাঁকিয়া মোহিনীর জুড়ি দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া গেল !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাঙ্গলিক।

অতীব তুচ্ছ হই আমি যদি ;
হে জননি, তাহে নাহি কোন ক্ষতি !—
তুমি যদি শুধু মোরে লহ তুলি'
পদ মূল হ'তে ; কখনো বা ভুলি',
বারেকের তরে মম শিরোপরে
রাখিয়া তোমার কল্যাণ-করে,
স্নেহ-সকরুণ রাজীব নয়ন
মেলি' মোর পানে, অভয় বচন
কহ দয়াময়ি ;—তখনি পুলক
জাগিবে জীবনে ; ভুলি' দুঃখ শোক
তখনি ব্যর্থ জীবনে আমার,
ক্ষীণ হৃদি-তারে শত ঝঙ্কার
উঠিবে।

ভারতি, সে শুভ লগনে
হ'ব ত্রিতন্ত্রী তোমারি চরণে !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি।

অতি প্রাচীনকালে জাপানে আইনু নামক এক জাতীয় লোকের বাস ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষগণ উহাদিগকে পরাজিত করিয়া বসতি বিস্তার করিতে থাকে। আইনু জাতি ভারতীয় পরাজিত অনার্য্যের ন্যায় জঙ্গলে আশ্রয় লয়। অদ্যাবধি হোক্কাইদো দ্বীপের স্থানে স্থানে আইনুজাতির দুই একটি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ও আইনু জাতির ভেদাভেদ লোপ পাইতে বসিয়াছে। পরস্পর বিবাহাদি হইতেছে; আইনুদের ভিতর নব্যভাব প্রবেশ করিয়া উহাদিগকেও সভ্য জাপানীর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। আইনু পুরুষদের চেহারা অনেকটা প্রাচীন আর্য্য হিন্দু মুনিঋষিদের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। নাক, চোক, এবং কেশ অনেকটা ককেশিয়ান জাতির ন্যায়, দিব্য গোপ দাঁড়ি আছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট অথচ খর্ব্বাকৃতি নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে কামস্কাটকায় শিবমন্দির বাহির হওয়ার খবর পাইয়াছিলাম। কোন কালে যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ জাপান পর্য্যন্ত হিন্দুগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে আর বিচিত্র কি।

আইনু মেয়েরা আজকাল জাপানী মেয়েদের মতনই প্রায় হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের চাল চলন, হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই জাপানী মেয়েদের ন্যায়। আমাদের দেশের উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মেয়েরা এবং ইয়োরোপের নাবিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে যেরূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উলকির ছাপ ধারণ করে, আইনু-মেয়েরা তেমনি তাহাদের মুখে কালো রং লাগাইয়া স্থায়ী গোঁপের রেখা করিয়া লয়। নব্য মেয়েরা তেমন করে না, জাপানী মেয়েদের ন্যায় তাহারা উহা আজকাল অসভ্যতা বলিয়াই মনে করে।

আইনু স্ত্রী পুরুষ ৯

জাপানীরা হ্রস্বকায়, খর্ব্বাকৃতি। আমরা এক শ্রেণীতে ৫২টি ছাত্র ছিলাম। আমি উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করিলেও ওজনে এবং শক্তিতে এক জনের মাত্র উপরে ছিলাম। উহাদের চক্ষের মণি এবং কেশ ভারতবাসীর

ন্যায় কালো কিন্তু অধিকাংশেরই চক্ষু অতি ছোট। এমন কি হাসিবার সময় কাহারও কাহারও চক্ষু দুইটি একেবারেই বুজিয়া গিয়া কেবল লোমমাত্র নজরে পড়ে। আমাদের যেমন নাক দুটি চক্ষের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় উহাদের তেমন নহে। উঁহাদের নাক চেপটা বা খেন্দা, অনেকেরই যেন সমতল ক্ষেত্রে দুটি চক্ষু; কেবল নাসিকারন্ধ্রের জায়গা টুকু কথঞ্চিৎ উঁচু। দাঁতগুলি অনেকেরই অসমান এবং কিঞ্চিৎ সুবর্ণ সংযোগে আকার প্রাপ্ত। অধিকাংশেরই গোঁপ দাড়ি নাই। শরীরের রং বেশ পরিষ্কার; বিলাতী সাহেবদের রং লালাভ আর উহাদের শ্বেতাভ। ভারতবাসীকে দেখিয়া উঁহারা হাসি সম্বরণ করিতে পারেন না; অনেক সময় রাস্তা ঘাটে নিগ্রো বলিয়া ডাকে। আমাদের চক্ষু বড়, নাক উঁচু তাই অনেকের নিকট চক্ষু এবং নাক সম্বন্ধে বিদ্রূপ সূচক মন্তব্যও শুনিতে পাইয়াছি। উহাদের ভিতর যাহাদের চক্ষু এবং নাসিকা আর্য্যের ন্যায় তাহারা দেখিতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু এমন চেহারা শতকরা একটিও মিলে না। মিঃ হিরাই বৈদেশিক ভাষার অধ্যাপক তিনি একদিন বলিলেন যে জাপানিদের মধ্যে ককেশিয়ান এবং মঙ্গোলিয়ান দুই জাতির লোকই আছে। যেহেতু দুই চেহারার লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দুই জাতির মিশ্রণে মাঝামাঝি চেহারার লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইলেন তাঁহার নিজের চেহারা ককেশিয়ানের ন্যায়, স্ত্রীর চেহারা মঙ্গোলিয়ানের ন্যায় এবং ছেলে মেয়ের চেহারা মাঝামাঝি। প্রফেশর হিরাই কয়েকটী নিদর্শন দেখাইয়া জাপানী ভাষাকে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি আর্য্য ভাষা হইতে সম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এইরূপ আরও দুই একজনে নানাভাবে জাপানিদিগকে আর্য্যজাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। জনৈক মার্কিণ দেশীয় পণ্ডিতও গত যুদ্ধের পর এক গ্রন্থে জাপানিদিগকে আর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্যই হউক আর অনার্য্যই হউক উহাদের চেহারা স্বাধীনতার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল; অপরে আর্য্য না বলিবে বা কেন?

জাপানীদের পরিচ্ছদ ইউরোপীয়ানদের ন্যায় নহে; আমাদের ন্যায়ও নহে এমন কি চীনা পোষাকের সহিতও কোনরূপ সাদৃশ্য নাই; তবে ইউরোপীয় ভাব উহাদের ভিতর এত অধিক প্রবেশ করিয়াছে যে এখন স্কুল কলেজ আফিস, কৃষিক্ষেত্র সর্ব্বত্রই কোট পেণ্টলেনের ব্যবহার। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শাকুমা শোজান নামক এক ব্যক্তি কাযকমে ইউরোপীয় পোষাকের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিতে থাকেন। তিনি বলেন জাপানী পোষাক পরিধানে যেন লোককে অলস করিয়া তোলে; আর ইউরোপীয়ান পোষাকে সকলের সজীবতা বৃদ্ধি পায়। জাপানে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয়ানদের ন্যায় পোষাক পরিধান করেন। বিদেশী চাল চলনে নিরতিশয় নেশা দেখিয়া রাজপক্ষী কতিপয় সামুরাই উহাকে নিহত করে (১৮৬৬খৃঃ)। আজ সেই জাপানে সভা সমিতিতে ফ্রক্ কোটের ছড়াছড়ি। আজ মুটে মজুরও বলিয়া থাকে যে কোট পেণ্টলে

শরীরে বেশ লাগিয়া থাকে; এবং তাহা পরিয়া কাযকর্ম্ম করিবার সময় বেশ স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। আবার যখন যেমন তখন তেমন। যখনই আফিষ ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিল তখনি জাতীয় পোষাক পরিধান করিল। আমরা বৈদেশিক কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে কোট প্যাণ্ট হাওলাত করিবার জন্য এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই, আর জাপানীরা বৈদেশিককে অভ্যর্থনা করিতে অথবা বৈদেশিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোট প্যাণ্ট ছাড়িয়া জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। কাউণ্ট ওকুমাকে সম্মানীয় আগা খাঁ, এবং ধনকুবের তাতার ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাপানী কাপড় পরিধান করিয়া অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়াছি। ডাক্তার মোতোদা এবং হারাদা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন; ডাক্তার মোতোদা একদিন ইন্দোজাপানীসভায় বক্তৃতাকালে বলিলেন, ভারতবাসী ইউরোপীয়ানদের ভাল ভাল গুণের দিকে না তাকাইয়া, নিজেদের জাতীয়ত্ব ভুলিয়া কেবল সাহেবী বসন, সাহেবী ভূষণ, সাহেবী কথন এবং সম্ভবপর হইলে সাহেবী অশন অনুকরণ করিতে সিদ্ধ হস্ত।

আমরা যেমন বাড়ীতে থাকিবার বেলায় একখানা কাপড় এবং একটি গেঞ্জি কিম্বা সার্ট পরিয়া থাকি জাপানী স্ত্রী পুরুষ বাড়ীতে কোমর বন্ধের সাহায্যে আলখেল্লার ন্যায় পা পর্য্যন্ত একটি লম্বা কোট পরিধান করিয়া থাকে, উহার বোতাম নাই। সভাসমিতি কিম্বা কোন ভদ্রলোকের নিকট যাইতে আমরা যেমন জামা এবং চাদর ছাড়া বাহির হইনা উহারাও তেমনি ভদ্র-সমাজে যাইতে কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত একটা গাউন এবং শরীরের উপরিভাগে একটা ঢিলা কোট না পরিয়া বাহির হয় না। ঢিলা কোট অনেকটা আমাদের চোগার ন্যায়। এই চোগার পৃষ্ঠদেশে কিম্বা বাহুর উপরে, প্রত্যেক বংশের নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন (ব্যাজ্) অঙ্কিত থাকে। লতা, পাতা, এবং ফুলের চিত্রই সাধারণতঃ এক এক বংশের চিহ্ন। সম্রাট-বংশের চিহ্ন কিকু অর্থাৎ ক্রিমেন্ থামাস্ পুষ্প। খুব বিশিষ্ট সমাজে যাইতে বংশ চিহ্ন রহিত চোগাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পোষাক প্রায় একরূপই; তবে মেয়েদের পোষাক জাঁকাল ছিটের। ছিট ছাড়া সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ের পোষাক বড় দেখা যায় না, শীতের আলখেল্লা আমাদের বালা-পোষ বা রেজাইর ন্যায় তুলা পুরিয়া তৈয়ার করা হয়। আজ কাল বিলাতেও জাপানী আলখেল্লার (কিমোনোর) দোকান বসিয়াছে মেমেরাও সময় সময় কিমোনো পরিয়া থাকেন।

ছোট ছোট মেয়েগুলি এমনই জাঁকাল ছিটের পোষাক পরিধান করে যে রাস্তায় চলিলে তাঁহাদিগকে নানারঙে চিত্রিত বড় বড় চীনামাটীর পুতুলের ন্যায় বোধ হয়। পূর্ব্বে যে কোমর বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি স্ত্রীলোকের উহাই সবচেয়ে বাবুগিরির জিনিস। যে যত ধনী এবং সৌখীন তাহা ঐ কোমর বন্ধে প্রকাশ পায়। বাড়ীতে সর্ব্বদা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা সূতী আর কোন জায়গায় যাইতে যাহা ব্যবহার করে তাহা রেশমী কিম্বা পশমী, তাহার উপর সোনারূপার তারে নির্ম্মিত

নানারূপ লতা-পাতা, ফুল পাখী ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম ওবি। উহা

নূতন ফ্যাশানের চুল বাঁধা

দীর্ঘে সাধারণতঃ ১১।১২ ফুট, পাশে এক হইতে দেড় ফুট। কোমর বন্ধের পশ্চাতে ইহারা একটা তুলাভরা গদি পরে। পুরুষগণ ইউরোপীয়ানদের ন্যায় টুপী পরিয়া থাকে এবং কচিৎ দুই একজন মেয়েকেও মেমদের পোষাকে ভূষিতা দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানে রাস্তাঘাটে মাঠে, ভদ্র মুটে মজুর স্ত্রীপুরুষ সকলেই কোন না কোন রকম খড়ম, কিম্বা খড় ও কাপড় নির্ম্মিত জুতা পরিয়া থাকে।

অধিকাংশ মেয়েরাই চুলের উপর রেশমী রিবন, কৃত্রিম ফুল, চিরুণী এবং বৃদ্ধারা প্রায়ই বড় বড় দুই একটা পুঁতি ব্যবহার করে। জাপানী মেয়েদের চুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহারা চুলের বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। অনেকেরই হাঁটু পর্য্যন্ত চুল। এক পরিবারের মেয়েদের চুল মাটী স্পর্শ করিতে দেখিয়াছি। অনেক সংবাদ পত্রের লোক তাঁহাদের চুলের ফোটো লইতে যায়। জাপানী মেয়েদের ভিতর দুই প্রকার কেশ বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ফ্যাশান বৈদেশিকদের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক। আর আধুনিক মেয়েরা কয়েক বৎসর যাবৎ নব্য ফ্যাশানের

পুরাতন ফ্যাশানে চুল বাঁধা।

প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মেয়েরা গৃহকার্য্যের সময় চুলে ময়লা লাগিবার ভয়ে মাথায় একখানা রুমাল জড়াইয়া লয় এবং একগাছা ফিতের

সাহায্যে পরিধেয় বস্ত্র বেশ আঁটিয়া রাখে। জাপানে মেয়েরা আমাদের আলতার ন্যায় লাল তরল পদার্থে অধর রঙাইয়া থাকে।

গৃহকার্য্যে রতা জাপানকন্যা।

মেয়েরা সে দেশে অতি সামান্যই ধাতব অলঙ্কার ব্যবহার করে। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা সাধারণতঃ ঘড়ীর সঙ্গে একছড়া সোনার সরু চেন এবং স্বর্ণ নেকটাই-পিন পরে। যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহারা স্বর্ণের পরিবর্ত্তে পিত্তল চেন ও পিত্তল পিন ব্যবহার করে। ঐ পিনদ্বারা উহারা কম্ফর্টার কিম্বা কিমোনো গলার নীচে আঁটিয়া লয়। শীতের সময় উলের এবং গ্রীষ্মের সময় রেশমী কম্ফর্টার ব্যবহৃত হয়। আজকাল জাপানী অনেকে আংটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সৌখিন বাবু এবং মেয়েদের কাহারও কাহারও দুই হাতে ৫।৭টি আংটিও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের ভিতর আংটি ও চেনের প্রচলন কম। তবে মুটে মজুরের নিকটেও লোহার ঘড়ী ও চেন আছে। পরিচ্ছদের বাহার স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই বেশ দেখা যায়। কোথাও যাইতে হইলে যে কোন শ্রেণীর মেয়েই এত মূল্যবান্ পরিচ্ছদে ভূষিতা হয় যে উচ্চঃশ্রেণী নিম্নশ্রেণী বুঝিবার যো নাই। অনেক সময় ট্রামের ভিতরে জাঁকাল পরিচ্ছদ-ধারিণী চাকরাণী ও ইতর শ্রেণীর মেয়েদিগকে স্থান দিয়া অতি বিশিষ্ট ভদ্র লোককেও দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ট্রামে স্থানাভাব হইলে পুরুষ আরোহিগণ মেয়েদিগকে বসিতে দিয়া নিজেরা দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোকের ভিতর এই অভ্যাস বেশী দেখিতে পাইতাম। ক্রমেই জাপগণ উদ্ধত স্বভাব হওয়ায় পুর্ব্বাভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

বাহ্যিক চেহারা এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে, আজ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে দু চার কথা বলিব। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন জাপান সর্ব্বপ্রথম তাৎকালিক সুসভ্য ভারতের সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তখন ভারতের যাহা কিছু জাপানীদের নিকট আদর্শরূপে বিবেচিত হইত। উহারা ভারতকে তেন্‌জিকু (স্বর্গ) এবং ভারতবাসীকে তেন্‌-জিকু জিন (স্বর্গবাসী) বলিত। বেশীদিনের কথা নয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কমোডোর পেরি বাণিজ্য উপলক্ষে নৌবাহিনী লইয়া জাপানের তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন ; সেই সময় হইতে জাপানীদের ভিতর পাশ্চাত্যের সভ্যতা প্রবেশ করিতে থাকে। কুটনীতি

এখন প্রাচীন সরলতার স্থান দখল করিয়াছে।

ভারতীয় ছাত্রগণ জাপানে গিয়া প্রথম প্রথম তাহাদের বাহ্যিক ভদ্রব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়া আনন্দে আটখানা হয়। প্রথম বৎসর আমিও দেশে বন্ধুবান্ধবদের নিকট চিঠিপত্রে এবং সংবাদ পত্র স্তম্ভে, জাপানের যশোগীতি ছাড়া আর কিছু লিখিবার পাইতাম না। ক্রমে যখন উহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে উহাদের চরিত্রের দুইটি দিক আছে। উহাঁরা উহাদের নিজেদের ভিতর একরূপ আর বৈদেশিকদের নিকট অন্যরূপ। নিজেদের কাছে ভিতরে বাহিরে সমান, একমন একপ্রাণ,—আর বৈদেশিকদের সম্বন্ধে বাহিরে একরূপ আর ভিতরে অন্যরূপ।

উহাদের যাহা তাহা কোন বৈদেশিক কিছুতেই নিন্দা করিতে পারিবে না। কাচা কিম্বা পচা আহার্য্য হউক মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। উলঙ্গ হইয়া ১৫।২০ জন এক ঘরের ভিতর স্নান করুক সে রীতিরও প্রশংসা করিতেই হইবে। বারান্তরে উহাদের স্নানাগার বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। গীত উন্মাদের ক্রন্দনের ন্যায় শ্রুত হইলেও অতি মিষ্টি মিষ্টি (উম্মাই উম্মাই) বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে হইবে। Gladstone was a great politician এই কথা জাপানীরা উচ্চারণ করিবে,—"গুরাদোষ্টোনু ওয়াজু এ গুরেতো পোরিতেশিয়ানু"। তৎক্ষণাৎ বলিতে হইবে "মহাশয় আপনার ইংরাজী উচ্চারণ কি চমৎকার! আপনি অতি দক্ষ।" (নাকা নাকা জোজু)। যাহাদের নিজেদের কোন অক্ষর নাই এবং যাহারা চীনাদের বিশ হাজার অক্ষর হাওলাত করিয়া লইয়া কায চালাইতেছে তাহাদের সেই ভিত্তিহীন ভাষাকে অতি প্রাচীন সুসভ্য ভাষা বলিয়া প্রশংসা করিতে হইবে। স্থূল কথা তাহাদের যাহা কিছু সবই ভাল বলিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে যদি ঠিক মত প্রকাশ করিতে যাই তাহা হইলে উহারা অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে এবং এমন কি উহারা উহাদের দেশের শত্রু বলিয়া মনে করে। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক জাপানীরই প্রগাঢ় এবং অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ আছে বলিয়াই উহারা স্বদেশের কিছুই মন্দ দেখে না।

একদিন কোন বৈদেশিক ইংরাজী কাগজে "কোরিয়াতে জাপানীর অত্যাচার" শীর্ষক প্রবন্ধে জাপানের অনেক কথা প্রকাশিত হয়। চীনাগণ ছাড়া জাপান প্রবাসী অন্যান্য বৈদেশিক বিশ হাজার অক্ষর আয়ত্ত না করিয়া সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষার সংবাদ পত্রাদি পড়িয়া থাকে; আমিও তেমনি করিতাম। আমার সহাধ্যায়ী কয়েকজন আমি উক্ত প্রবন্ধটী অবগত আছি কিনা,—সে সম্বন্ধে আমার কি মত, জিজ্ঞাসা করিল। আমি অপ্রীতিকর মত প্রকাশ করিবার পরিবর্ত্তে এ কথা সে কথায় বিষয়টি চাপা দিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু উহারা ছাড়িবার পাত্র নহে। অগত্যা নিজের কোন মত প্রকাশ না করিয়া ইংলণ্ড, মার্কিণ এবং চীনের সংবাদ পত্রাদির এবং কোরিয়ান ছাত্রগণের মত এবং হেগ কন্‌ফারেন্সের দুই একটি কথা বলিলাম মাত্র। সকলেই রাগে লাল হইয়া উঠিল,—এবং একজন সক্রোধে বলিল, যে তাহাদের উন্নতি দেখিয়া পৃথিবীর

আর আর সকলেই ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে; তাই এরূপ কলঙ্কের আরোপ। বৈদেশিকগণ নীলবর্ণ চশমা চক্ষে দিয়া জাপান পানে তাকাইতেছে; ইত্যাদি।"

আমি যদিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলাম তথাপি নিষ্কৃতি পাইলাম না। ভারতবাসী কোন জাতির মধ্যেই গণ্য নহে—তাহাদের কথার মূল্যই বা কি? ইত্যাদি অনেক কথাই সে শুনাইয়া দিল। আমি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া লেবরেটরিতে কায করিতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় ঐ ঘটনার পর উহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়া থাকিবে,—পরদিন প্রাতে কলেজে যাওয়া মাত্রই সেই ছেলেটি আমাকে অভিবাদন করিয়া পূর্ব্বদিনের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বোধহয় সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছিল কারণ তারপর হইতে আমার সহিত বেশী মেশামিশি করিত; আমাদের তোকিওস্থ বাড়ীতে আসিত; এমন কি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাহার পত্র পাইয়াছি।

জাপানীদের বাড়ী গেলে জাপানীই কি আর বিদেশীই কি এমন ভাবে অভ্যর্থিত হইয়া থাকে যে আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন অতিথি সম্মান নাই। পরিবারস্থ যাবতীয় লোক আগন্তুকের মনস্তুষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

আত্মীয় কুটুম্বই হউক, পথিক বা ডাকপিয়নই হউক অপরের দ্বার দেশে গোমেন নাছাই বলিয়া উপস্থিত হয়। উহার অর্থ,—মাপ করুন। আগন্তুককে বাড়ীর কর্ত্রী পর্য্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন করিতে করিতে অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। প্রফেশরের বাড়ী গিয়াও দেখিয়াছি তাঁহাদের পত্নীগণ হাঁটু গাড়িয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

আত্মীয় স্বজন এবং বিশেষ পরিচিতের মধ্যে পরস্পর অভিবাদন কালে এতগুলি পদ উচ্চারিত হইয়া থাকে যে সকলগুলি উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে। তবে মোটামুটি এই কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য;—প্রাতঃকালীন, মাধ্যাহ্নিক কিম্বা সায়াহ্নিক অভিবাদনের পর ক্রমে নিম্নলিখিত অর্থবোধক পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "গত বারের সাক্ষাতে যে ত্রুটি হইয়াছে মাপ করুন" "সে বারের সদয় অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি," "আজ পরিষ্কার দিন কিম্বা বাদলের দিন," আপনি শারীরিক ভাল ত?" "বাড়ীর সকলের কুশল ত?" "আমার অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করুন," ইত্যাদি। দুই জনেই ঐ পদগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে; কেহ কাহারও উত্তরের অপেক্ষা করে না। বলা বাহুল্য প্রত্যেক পদের পরই পরস্পরের অভিবাদন চলিতে থাকে। ঘরের ভিতর অভিবাদনের সময় দুই পক্ষ মাদুর আঁটা গদি, অর্থাৎ কুশনের উপর হাঁটু গাড়িয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করে, মস্তক মাটিতে লাগে না কিঞ্চিৎ উপরে থাকে। আর রাস্তাঘাটে অভিবাদনের সময় উভয়ে দাঁড়াইয়া শরীরের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ কোমর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বক্রভাবে অবনত করে। ঘরের ভিতরই হউক আর বাহিরেই হউক এক সঙ্গে অনেকগুলি পরিচিত ব্যক্তি থাকিলে একে একে সকলকেই ঐ ভাবে অভিবাদন করিতে হয়। বলাবাহুল্য পাশ্চাত্য আদব

কায়দা এ দেশে ঢুকিয়াছে বলিয়া ক্রমেই প্রাচীন সরলতা এবং শিষ্টাচার লোকের ভিতর কমিয়া আসিতেছে। কাহারও নিকট কেহ পথ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে প্রথমে অভিবাদন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তারপর গন্তব্য পথের বিবরণ জানিয়া লয়। হউক মুটে মজুর অথবা কৃষক তাহার নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিবার সময় বিশিষ্ট ভদ্রলোকও শিষ্টাচারের ত্রুটি করেন না। এইরূপ প্রতি কথায় ধন্যবাদ এবং অভিবাদন একমাত্র জাপানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কি প্রধান মন্ত্রী, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট কি সাধারণ একজন ছাত্র অভিবাদন কালে পরস্পরে একইভাবে শিষ্টাচার পালন করেন। আমাদের ভারতের অধিকাংশ স্থলেই কিন্তু অন্যরূপ। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায় যে একব্যক্তি অপরের পায়ে পড়িয়া ধূলি লইতেছে অপর ব্যক্তি প্রত্যভিবাদনের পরিবর্ত্তে তাঁহার পদখানি উহার সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দিতেছেন। এমন কি, কেহ হয়ত কত মাঠ জঙ্গল বেড়াইয়া আসিয়া ব্যাসিলি এবং ব্যাক্‌টারিয়া বিজড়িত, ময়লা পদপ্রক্ষালিত চরণামৃত দানে অপরের স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন।

শিষ্টাচার দেখাইলে পদগৌরবের বৃদ্ধি হয় ভিন্ন লাঘব হয় না। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি বেড়াইতে বাহির হইয়া সাধারণ প্রজাদিগকেও অবনত মস্তকে প্রত্যভিবাদন করিতেন। জনৈক অমাত্যপুঙ্গব একদিন রাজাকে বলিলেন, প্রজাদিগকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত রাজার এতদূর কষ্ট স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। রাজা উত্তরে বলিলেন "দেখিতে হইবে প্রজাগণ শিষ্টাচারেও যেন রাজাকে অতিক্রম করিতে না পারে।"

অনেক ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানের নিকট সেই দেশেই শুনিয়াছি যে কথায় কথায় ধন্যবাদ, ক্ষমা প্রার্থনা, নমস্কার এবং অন্যান্য হাব ভাবে জাপানিদের ভিতর যতদূর শিষ্টাচার দেখা যায় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ভিতর তেমন দেখা যায় না। জাপানে কোন বাড়ীতে এক মুটে একটা কিছু জিনিস রাখিয়া মজুরি লইয়া যাইবার বেলায় কিম্বা কোন ফেরিওয়ালা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দাম লইয়া ফিরিবার বেলায় বাটীস্থ কেহ তাহাকে "গোকুরো ছামা" বলিয়া অভিবাদন করিবে। গোকুরো ছামার অর্থ মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। উহারাও "দোইতাসিমাস্‌তে" বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিবে। উহার অর্থ উল্লেখ "নিষ্প্রয়োজন"। এইরূপ যে কোন কাযে শিষ্টাচারের এক শেষ। মনে করুন জনৈক ছাত্র সিগারেট টানিতেছে এমন সময় তাহার একজন বন্ধু একটা সিগারেট মুখে বন্ধুর সিগারেট হইতে আগুন হাওলাত লইতে উপস্থিত। প্রথমে ক্ষমা চাহিয়া অবনত মস্তকে আপন সিগারেটে আগুন লাগাইয়া পুনরায় ধন্যবাদানন্তর অভিবাদন করিয়া বিদায় লয়েন। বিপরীত দিক হইতে চলিবার বেলায় রাস্তার দুই সহপাঠীর সাক্ষাৎ হইলে অভিবাদন কালে "সিকেশীমাস্তা" (মাপ করুন) অর্থাৎ "আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি সে জন্য মাপ করুন" এই বলা হয়। আমি একদিন পল্লীগ্রামে একটি চেনা রাস্তা অতিক্রম করিয়

যাইতেছিলাম, সম্মুখে একজন কৃষক একখানা গাড়ীতে শস্য টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি উহার পাশ কাটিয়া গেলাম। এমন সময় কৃষক গাড়ি থামাইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "ওজামা ইতাসিমান্তে" অর্থাৎ আমার গাড়ির দরুণ যে প্রতিবন্ধকটুকু অনুভব করিয়াছেন তজ্জন্ত ক্ষমা করুন। আমিও প্রত্যভিবাদন করিলাম। এইরূপ কত বিষয়ে তাহাদের বাহ্যিক শিষ্টাচার

চয়ন।

আমার জুল্-কাকা।

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক—সাদা দাড়ী—আমার নিকট ভিক্ষা চাহিল। আমার সঙ্গী জোসেফ্ দাভ্রাঁশ্ তাহাকে ২৲ টাকা দিলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন :

এই হতভাগ্য ব্যক্তির মুখে, তার জীবনের যে ইতিহাস আমি শুনেছি, তা আমার স্মৃতি থেকে কিছুতেই যায় না,—ক্রমাগত আমার মনে পড়ে। সেই ইতিহাসটা তোমাকে বল্‌চি শোনো :—

আমার পিতামাতার আদি নিবাস—হাবর্। তাঁরা ধনী ছিলেন না। কোন প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত—এই-মাত্র। আমার পিতা আফিসে কাজ করিতেন। আফিস্ হইতে দেরী করিয়া আসিতেন। বেশী-কিছু রোজকার ছিল না। আমার দুইটি ভগিনী ছিল।

আমাদের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া মায়ের বড় কষ্ট হইত। আমার পিতাকে তিনি অনেক কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন, ঠারে-ঠোরে ঘাতে ঘা দিতে ছাড়িতেন না। সেই সময়ে পিতার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হইত। কপালে ঘাম নাই অথচ যেন ঘাম হইয়াছে—এই ভাবে কপালে হাতটা বুলাইতেন। কোন জবাব করিতেন না।

তাঁর অক্ষমতা-জনিত কষ্ট আমি বেশ অনুভব করিতে পারিতাম।

সকল বিষয়েই খরচ কমাইবার চেষ্টা হইত; কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করিলে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইত না,—পাছে ফিরে আবার তাকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। দোকানের অবশিষ্ট অযত্ন জিনিসগুলা সস্তাদামে কেনা হইত। আমার ভগিনীরা আপনাদের পরিচ্ছদ আপনারাই তৈয়ারী করিতেন, কোন জরীর পাড়ের দাম গজ-পিছু আট আনা হইলে, সেই মূল্য লইয়া তাহাদের অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক চলিত। একটা গাঢ়-রকমের সূপ, আর যা'-তা' চাট্‌নী মিশাইয়া একটা মাংসের রান্না—এই আমাদের নিত্য-আহারের ব্যবস্থা। হয়ত, এইরূপ আহারই স্বাস্থ্য-জনক ও বলপ্রদ; কিন্তু আমার রুচি ভিন্ন

রকমের। তাছাড়া, লোক-সমাজে বোতাম-হীন জামা ও ছেঁড়া পেণ্টলুনের জন্য অনেক সময় আমায় লজ্জা পাইতে হইত।

কিন্তু প্রতি রবিবারে, আমরা খুব ফিট্-ফাট্ কাপড় পরিয়া জেটিতে বেড়াইতে যাইতাম। উৎসব-দিনে জাহাজগুলা যেরূপ পতাকাদিতে বিভূষিত হয়, সেইরূপ লম্বা-কোর্ত্তা, ধুচ্নী-টুপী ও দস্তানায় সুসজ্জিত হইয়া আমার পিতা, মাকে তাঁর বাহু-অবলম্বন প্রদান করিতেন। সকলের আগে আমার ভগিনী দুটি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন; এবং আগ্রহের সহিত যাত্রার কাল-প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। কিন্তু শেষ-মুহূর্ত্তে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন,—বাড়ীর কর্ত্তার লম্বা-কোর্ত্তার গায়ে একটা দাগ আছে,—অমনি "বেঞ্জিন্"—তেলে একটা ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া সেই দাগ উঠাইতে বসিতেন।

আমার পিতা, মাথায় সেই ধুচ্নী টুপীটা পরিয়া,—খালি কামিজ গায়ে, যতক্ষণ না সেই দাগ-ওঠানো ব্যাপারটা চুকিয়া যাইত, ততক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এদিকে আমার মা, তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টির চস্মাটা নাকের উপর ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া বসাইয়া, এবং পাছে খারাপ হয় এই ভয়ে দস্তানাটা, হাত হইতে খুলিয়া; যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেন।

তারপর, খুব কেতা-দুরস্ত-ভাবে আড়ম্বরের সহিত যাত্রা আরম্ভ হইত। আমার ভগিনীরা বাহু ধরাধরী করিয়া আগে আগে চলিত; তাহাদের বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তাই, যাহাতে তাহারা লোক-দৃষ্টির গোচরে আইসে এই জন্য তাহাদিগকে এক একবার সহরে বাহির করা হইত;—আমি মায়ের বাঁ-দিকে থাকিতাম, আর পিতা ডান দিকে থাকিতেন। আমার মনে পড়ে—আমার দরিদ্র পিতা মাতা কিরূপ ঘটা করিয়া সেই রবিবারের ভ্রমণে বাহির হইতেন—মনে পড়ে তাঁহাদের সেই কঠোর মুখভঙ্গী, তাঁহাদের সেই কেতা-দুরস্ত ফিট্‌ফাট পরিচ্ছদ। তাঁহারা, শরীর খাড়া করিয়া, আড়ষ্টভাবে পা ফেলিয়া, গম্ভীর চালে চলিতেন, যেন, এইরূপ চালের উপর কি-একটা গুরুতর ব্যাপার নির্ভর করিতেছে।

এবং প্রতি রবিবারে, যখন কোন অজ্ঞাত দূর-দেশ হইতে কোন বড় জাহাজকে আসিতে দেখিতেন, তখন এই একই কথা প্রতিবারেই বলিতেন:—

—"এই জাহাজের মধ্যে যদি জুল্ থাকে ত কি মজাই হয়—অ্যা ?"

আমার জুল্-কাকা, আমার পিতার আপনার ভাই, আমাদের পরিবারের একমাত্র ভরসা-স্থল—পরে তিনিই আবার পরিবারের ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি ছেলে-বেলা হইতেই তাঁর কথা শুনিয়া আসিতেছি; আমার মনে হইত, আমি তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতেই চিনিতে পারিব—এতই তাঁর সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা আমার পরিচিত ছিল। যে দিন তিনি আমেরিকায় যাত্রা করিলেন সে পর্য্যন্ত তাঁর জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত খুঁটিনাটিই আমি জানিতাম;—যদিও শেষ দিক্‌কার ঘটনাগুলির কথা আমার পিতা আপনাদের মধ্যে খুব মৃদুস্বরে বলাবলি করিতেন।

বোধ হয়, জুল্ কাকা একটা খারাপ কাজ

করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কতকগুলা টাকা তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন ;—দরিদ্র পরিবারে, সে একটা মস্ত অপরাধ। ধনী-পরিবারে, যে লোক আমোদ-প্রমোদে টাকা ওড়ায়, সে একটা "বদ-খেয়ালি" করে মাত্র। তার সম্বন্ধে লোকেরা হাসি-মুখে বলে,—"লোকটা বড় সৌখীন"। কিন্তু গরিবের ঘরে, যে ছেলে তার বাপ মায়ের টাকা নষ্ট করে, সে হতভাগা, লক্ষী-ছাড়া, সে বদ্‌মায়েস!

এই পার্থক্যটা অন্যায় নহে—যদিও কাজটা একই ; কেন না, কাজের পরিণাম অনুসারেই কাজের গুরু-লঘুতা নিদ্ধারিত হইয়া থাকে।

যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন বলিয়া আমার পিতা আশা করিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি নষ্ট করিয়া জুল্‌-কাকা অনেকটা কমাইয়া ফেলিলেন ; নিজের অংশটাও শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিলেন।

যখন এইরূপ অবস্থা হইল, তখন জুল্‌-কাকাকে একটা সওদাগরী জাহাজে করিয়া নিউ-ইয়র্কে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নিউ-ইয়র্কে গিয়াই, জুল্‌-কাকা সেখানে একজন দোকান্‌দার হইয়া বসিলেন। কিসের দোকান খুলিলেন তাহা জানি না। পত্র লিখিলেন, তিনি অল্পস্বল্প অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমার পিতার যে অর্থ তিনি নষ্ট করিয়াছেন, সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিবেন এইরূপ আশা করিতেছেন। এই পত্রখানি পাওয়ায়, পরিবারের মধ্যে একটা গভীর স্নেহের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জুল্‌—যে একেবারে লক্ষীছাড়া হইয়া গিয়াছিল সে হঠাৎ খাঁটি লোক হইয়া দাড়াইয়াছে, সহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, দাভ্রাঁশ্‌-বংশের প্রকৃত বংশধর হইয়াছে, বংশের অনুরূপ কাজ করিয়াছে।

তাছাড়া জাহাজের একজন কাপ্তেনের নিকটে আমরা জানিলাম, জুল্‌ সেখানে একটা বড় দোকান ভাড়া করিয়া, একটা বড়-রকমের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে।

দুই বৎসর পরে, জুল্‌-কাকা আবার লিখিলেন :——

"প্রিয় ফিলিপ্‌, আমার স্বাস্থ্যের জন্য তুমি উদ্বিগ্ন না হও,—এই জন্য তোমাকে লিখিতেছি, আমি এখানে ভাল আছি। কাজকর্ম্মও বেশ চলিতেছে। আগামী কল্য আমি দক্ষিণ-আমেরিকায় যাত্রা করিব। দীর্ঘ সমুদ্র-পথ। বোধ হয় কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার কোন সংবাদ তোমাকে দিতে পারিব না। যদি পত্র না লিখি ত উদ্বিগ্ন হইও না। যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে পারিলে তবে দেশে ফিরিব। আশা করি শীঘ্রই তাহা করিতে পারিব। তখন আমরা দুই ভাই একত্রে সুখসচ্ছন্দে জীবন যাপন করিব…"

এই পত্রখানি, পরিবারের মধ্যে, দ্বিতীয় বাইবেল-গ্রন্থ হইয়া দাড়াইল। যখন-তখন ইহা পাঠ করা হইত, যাকে-তাকে ইহা দেখান হইত।

ফলতঃ, দশ বৎসরকাল, জুল্‌-কাকা কোন পত্র লিখিলেন না। কিন্তু যতই কালবিলম্ব হইতে লাগিল পিতার আশাও সেই পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমার মা-ও প্রায়ই বলিতেন :—

—জুল্‌ দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছিলেই, আমাদের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে! এ একটা

লোকের মত লোক বটে; জুল্ জানে কেমন করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়।

এবং প্রতি রবিবারে আমার পিতা যখন দেখিতেন, দিগন্ত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ঘন বাষ্পরাশি উঠাইয়া ধূমের সর্পগুলা আকাশের উপর ধূম বমন করিতেছে, তখন তিনি তাঁর সেই চিরকেলে বুলিটি বলিতেন :—

—"যদি জুল্ ঐ জাহাজের মধ্যে থাকে তাহলে কি মজা হয়, অ্যাঁ?"

এমন কি, তিনি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, কখন্ জুল্ রুমাল নাড়িয়া তাঁর নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিবে :—

—ওঃ ফিলিপ্!

জুল্ নিশ্চয়ই প্রত্যাগমন করিবে এইরূপ মনে করিয়া, তাঁরা কত মৎলবই আঁটিতেন। এমন কি, জুল্-কাকার অর্থে, অনতি-দূরে একটা বাগান-বাড়ী-ও ক্রয় করিবেন, স্থির করিলেন। ইহা খরিদ করিবার জন্য দর-দস্তরের কথাবার্ত্তা চালাচলি এরই-মধ্যে যে আরম্ভ হয় নাই একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

আমার বড় ভগিনীটির বয়স ২৮ এবং অন্যটির বয়স ২৬ বৎসর। এখনও তাহাদের বিবাহ হয় নাই। এইজন্য সকলেরই মনে একটা কষ্ট ছিল।

অবশেষে দ্বিতীয়টির জন্য একটি বর জুটিল। বরটি আফিসে কাজ করে, ধনবান্ নহে কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, জুল্-কাকার সেই পত্রখানি তাকে দেখাইলেই, সে আর ইতস্তত করিবে না। ফলেও তাহাই হইল।

পত্রখানি দেখিবামাত্র সে বিবাহের প্রস্তাবটা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল; এবং এইরূপ স্থির হইল, বিবাহের অনুষ্ঠানটা হইয়া গেলেই সকলে একসঙ্গে জর্সি-দ্বীপে বেড়াইতে যাইবেন। জর্সি বেশী দূর নহে। একটা ছোট ডাক্ জাহাজে করিয়া সমুদ্র দিয়া সেই বিদেশ-ভূমিতে পৌছান যাইবে—সে দ্বীপটা ইংরাজদিগের। দুই ঘণ্টার মধ্যেই একজন ফরাসী, কোন এক প্রতিবেশী-জাতির দেশে গিয়া তাহাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার (অতি জঘন্য হইলেও) অনুশীলন করিতে পারিবে—এ একটা কম সুবিধা নহে। শুনা যায় নাকি, সে দ্বীপটা ব্রিটানীয় ধ্বজা-পতাকায় আচ্ছন্ন।

এখন এই জর্সি ভ্রমণটাই আমাদের এক মাত্র চিন্তা, একমাত্র কথোপকথনের বিষয়, একমাত্র সাধের স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইল। অষ্টপ্রহর ঐ কথা লইয়াই আমরা ব্যাপৃত থাকিতাম। অবশেষে যাত্রা করা গেল। মনে হয় যেন কল্যকার কথা। গ্রাঁভিয়ের জাহাজ-ঘাটে ডাক্-জাহাজখানা ধূমোদ্গার করিতেছে; আমাদের তিন্টা পেট্রা জাহাজে উঠানো হইতেছে—আমার পিতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার তদারক করিতেছেন; আমার মা, ত্রস্তভাবে আমার অবিবাহিতা ভগিনীটির বাহু ধরিয়াছেন;—এই বড় ভগিনীর বিবাহ হইয়া যাওয়ায়, এক নীড়ে পালিত দুটি পক্ষী-শাবকের একটি চলিয়া যাইবার মত, আমার ছোট বোন্টি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আর আমাদের পশ্চাতে, নবদম্পতি—তাহারা বরাবর পশ্চাতেই থাকিয়া যাইতেছে।

এইবার জাহাজের শিটি দিল। আমরা জাহাজে উঠিয়া পড়িলাম। জেটি ছাড়িয়

জাহাজখানা দূর-সমুদ্রে গিয়া পড়িল। সমুদ্রটি সবুজ মার্ব্বেল-টেবিলের মত দিব্য সমতল। আমাদের চোখের সাম্‌নে দিয়া উপকূল-ভূমি যেন পলায়ন করিতে লাগিল, যাহারা বড়-একটা ভ্রমণ করে না—তাহাদেরই মত আমরা মনে মনে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম।

দাগ-উঠানো সেই লম্বা কোর্ত্তাটার ভিতর হইতে আমার পিতার উদরটি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—আর সেই "বেঞ্জিন্"-তৈলের গন্ধটা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে; আমার তখন সেই রবিবার-গুলার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে হঠাৎ আমার পিতার নজরে পড়িল,—পরিপাটী পরিচ্ছদ-পরিহিতা দুইটি মহিলাকে, দুইজন ভদ্রলোক সমুদ্র-গুগ্‌লী (oyster)* দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত একজন বৃদ্ধ নাবিক, ছুরির এক-ঘায়ে গুগ্‌লীর খোলাগুলার মুখ খুলিয়া দিয়া সেই ভদ্রলোক দুইটির নিকট আনিয়া ধরিল—পরে তাঁহারা সেই গুগ্‌লিগুলা মহিলাদের দিলেন। মহিলাদ্বয়, একটা পাত্‌লা রুমালের উপর খোলাগুলা রাখিয়া, এবং পাছে 'গাউনে' দাগ লাগে এইজন্য মুখ বাড়াইয়া অতি সন্তর্পণে তাহা আহার করিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি তাহার জলটুকু পান করিয়া, খোলাগুলা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

আমার পিতা বোধ হয়, চলন্ত জাহাজের উপর, বিশিষ্ট লোকদের ধরণে এইরূপ গুগ্‌লী আহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি এই আহারে, এতই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়—মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, তিনি আমার মা ও ভগিনীদিগের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

—তোমাদের কিছু গুগ্‌লী দিব কি?

অর্থব্যয়ের ভয়ে মা ইতস্তত করিতেছিলেন; কিন্তু আমার ভগিনী দুইটি তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। মা বলিলেন:—

—আমার ভয় হয়, পাছে আমার পেটের অসুখ করে। শুধু মেয়েদের দেও, কিন্তু বেশী না,—বেশী খেলে অসুখ করবে। পরে আমার দিকে ফিরিয়া, আরও এই কথা বলিলেন:—

—আর জোসেফকে আদপেই দিও না—ওতে ছেলেদের বিগ্‌ড়ে দেওয়া হয়।

আমি মায়ের পাশে বসিয়াছিলাম; ছেলেমেয়ের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য করাটা আমার অন্যায় বলিয়া মনে হইল। আমি দেখিতে লাগিলাম—পিতা কি করেন। পিতা, কেতা দুরস্তভাবে তাঁর দুই মেয়েকে ও জামাইকে, সেই জীর্ণ-বস্ত্র বৃদ্ধ নাবিকের নিকট লইয়া গেলেন।

সেই মহিলা দুইটি চলিয়া গেলে, আমার পিতা, আমার ভগিনীদিগকে বলিয়া দিলেন—গুগ্‌লী কি রকম করিয়া খাইতে হয়। জল গড়াইয়া পড়িবে না, অথচ খাইতে হইবে। এমন কি, তিনি নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, খপ্‌ করিয়া একটা গুগ্‌লি হাতে করিয়া লইলেন। এবং সেই মহিলাদ্বয়ের

* কাঁচা সমুদ্র-গুগ্‌লী ধনী য়ুরোপীয়দিগের একটা প্রিয় খাদ্য; বেশী দাম বলিয়া দরিদ্রেরা ইহা খাইতে পায় না।

অনুকরণ করিতে গিয়া, গুগ্‌লীর ভিতরকার সমস্ত জলটুকু তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই লম্বা কোর্ত্তার উপর উল্টাইয়া ফেলিলেন। শুনিতে পাইলাম, মা গুন্ গুন্ করিয়া বলিতেছেন :—

—দেখাতে না গেলেই ভাল হ'ত।

কিন্তু আমার মনে হইল, হঠাৎ পিতা যেন ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কয়েক পা দূরে সরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার সমস্ত পরিবার সেই গুগ্‌লীওয়ালাকে ঘিরিয়া আছে,—তিনি তাহাই একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন : তাহার পর, তাড়াতাড়ি আমাদের নিকটে আসিলেন। দেখিলাম, তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, আর, কি-এক-রকম চোখের চাহনী। মৃদুস্বরে আমার মাকে বলিলেন :—

—ভারী আশ্চর্য্য, যে লোকটা গুগ্‌লী ভেঙ্গে দেয়, তাকে দেখ্‌তে অনেকটা জুলের মত। মা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কোন্ জুলের কথা বল্‌চ ?

—আবার কে.....আমার ভাই...... আমেরিকায় তার এখন ভাল অবস্থা হয়েছে, আমি যদি না জান্‌তুম, তাহলে ওকেই 'জুল্ বলে' বিশ্বাস করতুম।

আমার মা হতবুদ্ধি হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন :—

—তুমি বড় নির্ব্বোধ ! যখন তুমি ঠিক জান ও জুল্ নয়,—তবে আবার এইসব পাগ্‌লামী-কথা বল্‌চ কেন ?

কিন্তু আমার পিতা, তবুও বলিতে লাগিলেন :—

—তবে তুমি একবার দেখে এসো, ক্লারিসা ; আমার ইচ্ছে তুমি নিজের চোখে দেখে যা হয় একটা হেস্ত-নেস্ত কর।

মা তার আসন হইতে উঠিয়া মেয়েদের নিকট আসিয়া আবার মিলিত হইলেন। আমিও সেই লোকটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, লোকটা বৃদ্ধ, অতিশয় অপরিষ্কার, মুখ বলি রেখায় আচ্ছন্ন, এবং তাহার নিজের কাজ ছাড়া আর কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই।

মা আবার ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম, তিনি কাঁপিতেছেন। তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন :—

—জুলই বটে। আচ্ছা তবে, কাপ্তেনের কাছে গিয়ে আরও কিছু খোজখবর নেও। কিন্তু দেখো সাবধান, আবার যেন ও আমাদের ঘাড়ে না এসে পড়ে।

পিতা একটু দূরে চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। কি জানি যেন আমার মনটা কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্যাপ্তেনটি লম্বা, পাতলা, গণ্ডদেশে দীর্ঘ গুল্‌ফি ; যেন তিনি বৃহৎ ভারত-ডাক জাহাজের কম্যাণ্ডার, এইরূপ একটা গুরুগম্ভীরভাব ধারণ করিয়া সরু ডেকের উপর পায়চালি করিতেছেন।

আমার পিতা দস্তুরমত তাঁকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার কাপ্তেনী-কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহারও প্রশংসা করিলেন :—

—জর্সি কিসের জন্য বিখ্যাত ? কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয় ? লোকসংখ্যা কত ? আচার-ব্যবহার কিরূপ ? পোষাক-পরিচ্ছদ

কিরূপ? ভূমির প্রকৃতি কিরূপ,—ইত্যাদি, নানা কথা।

আমার বিশ্বাস ছিল, পিতা আমেরিকার কথাটাই আগে পাড়িবেন। কিন্তু তিনি ত সে দিক্‌ দিয়াই গেলেন না।

তারপর যে জাহাজে আমাদের ডাক আইসে সেই জাহাজের কথা পাড়িলেন; তারপর জাহাজের সরঞ্জামের কথা। অবশেষে আমার পিতা কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

—আপনার ঐ বৃদ্ধ খালাসিটি বেশ ত—শুগলীর খোলা-ভাঙ্গা যার কাজ। ঐ লোকটার বিবরণ আপনি কি কিছু জানেন?

কাপ্তেন একটু চটিয়া রুক্ষভাবে উত্তর করিলেন :—

—ও একটা বুড়ো ফরাসী ভিক্ষুক, গত বৎসর ওকে আমেরিকায় দেখেছিলুম, ওকে আবার দেশে ফিরিয়ে এনেছি। বোধ হয়, হাবার্ নগরে ওর আত্মীয়স্বজন আছে, কিন্তু ও তাদের কাছে ফিরে যেতে চায় না—কেন না, তাদের কিছু টাকা ধারে। ওর নাম—জুল্‌...... কি দার্ভাস—ঐ রকম একটা কিছু; লোকটা এক সময়ে ধনী ছিল—কিন্তু দেখ না এখন ওর কিরূপ দুর্দ্দশা।

আমার পিতার মুখ নীল হইয়া গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

আ! বেশ—ভাল...খুব ভাল...হবারই কথা—আমি এতে একটুও আশ্চর্য্য হইনি... ধন্যবাদ কাপ্তেন।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পিতা, আমার মা-র কাছে আবার ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার বিকৃত মুখশ্রী দেখিয়া মা বলিলেন :—

—বোসো বোসো,—তোমার কি একটা হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। তিনি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন ও গদগদ স্বরে এই কথা বলিলেন :—

—সে-ই বটে, সেই বটে!

তার পর, তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—এখন কি করা যায়?

মা বলিলেন :—মেয়েদের একটু দূরে সরিয়ে দিতে হবে। জোসেফ্‌ যখন সব কথাই জানে—ওই গিয়ে মেয়েদের খুঁজে নিয়ে আসুক। আর, বিশেষ সাবধান হতে হবে, যাতে জামাইয়ের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না হয়।

আমার পিতা ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন :—

—কি ভয়ানক বিপদ!

মা সহসা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—

—আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল—ও জুয়াচোরটা কিছুই করবে না—আবার ও আমাদের ঘাড়ে চাপ্‌বে! দাভ্রাঁশবংশের লোকের কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়!...

আর আমার পিতা,—স্ত্রী ভর্ৎসনা করিলে বরাবর যাহা করিয়া থাকেন—কপালে একবার হাতটা বুলাইলেন।

মা আরও বলিলেন :—

—জোসেফকে কিছু পয়সা দেও, আপা-

তত ও গুগ্‌লীর দামটা দিয়ে আসুক। ভিক্ষুকটা জোসেফকে নিশ্চয়ই চিনে ফেলবে। তাহলে জাহাজের উপর একটা বেশ কাণ্ড হবে। এসো আমরা জাহাজের আর এক প্রান্তে চলে যাই ; ঐ লোকটা যেন আমাদের কাছে না আস্‌তে পারে!

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন ; এবং আমাকে একটা টাকা দিয়া দূরে, সরিয়া গেলেন।

আমার ভগিনীরা বিস্মিত হইয়া, পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি বলিলাম; সমুদ্র পীড়ায় মা একটু কাতর আছেন। তার পর, গুগ্‌লীর খোলা ভাঙ্গিবার লোকটাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

—তোমার কত পাওনা?

তাকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল।

সে উত্তর করিল :—

—আট আনা।

আমি একটা টাকা তাকে দিলাম, সে আট আনা লইয়া বাকি আট আনা ফেরৎ দিল।

আমি তার হাতটা দেখিতেছিলাম ;—নাবিকের মত হাতের উপর কতকগুলি গভীর রেখার ভাঁজ-পড়িয়াছে। মুখ দেখিয়া মনে হইল, বুড়ীর মুখ,—অতি কুৎসিত, বিষণ্ণ, চিন্তাভারাক্রান্ত।

তখন মনে মনে বলিলাম :—

—ইনিই আমার কাকা, আমার পিতার আপনার ভাই—আমার কাকা! তাকে চারি আনা বক্‌সিস্ দিলাম। সে আমাকে ধন্যবাদ করিল।

—বাবা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

এই কথা সে ভিক্ষুকদের স্বরে বলিল। আমার তখন মনে হইল, অ্যামেরিকায় বোধ হয় ভিক্ষা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

আমার দানশীলতা দেখিয়া, আমার ভগিনীরা অবাক হইয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। বাকী চারি আনা যখন পিতাকে ফেরৎ দিলাম, আমার মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

ঐ ক-টি গুগ্‌লীর দাম বারো আনা?... অসম্ভব।

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম :—

আমি চারি আনা বক্‌সিস্ দিয়াছি।

আমার মা লাফাইয়া উঠিলেন এবং আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন :—

—তুই ভারী বোকা! ঐ লোকটাকে,—ঐ হতভাগাটাকে চার আনা বক্‌সিস্!...

পিতা, জামাতাকে দেখাইয়া চোখের ইসারা করায়, মা থামিয়া গেলেন।

তার পর, সব চুপচাপ।

আমাদের সম্মুখ ভাগে, দিগন্তের দিকে,—সমুদ্রের মধ্য হইতে যেন একটা বেগনী রঙের ছায়া নির্গত হইল। উহাই জর্সি।

আমরা যখন জেটির কাছাকাছি হইলাম আমার বড়ই ইচ্ছা হইল, আর একবা আমার জুলু কাকাকে দেখি, তাঁহার নিকট যাই, কিছু সান্ত্বনার কথা, কিছু ভালবাসা কথা তাঁকে বলি।

কিন্তু, গুগ্‌লী খাবার লোক আর কে নাই দেখিয়াই তিনি পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয় ছিলেন। বোধ হয় জাহাজের খোলের মধ

সতীর সহমরণ যাত্রা

পার্কস মেমের চিত্র হইতে

নামিয়া গিয়াছেন। সেই খোলই বেচারার বাসস্থান।

আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আর কখন তাঁকে দেখিতে পাইব না। আমার মা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

তার পর, আমার পিতার ভায়ের সঙ্গে আর কখন দেখা হয় নাই।

তুমি যে কখন কখন ভিক্ষুকদের দুই এক টাকা দিতে আমাকে দেখিতে পাও—ইহাই তাহার কারণ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

চতুর্থ খণ্ড।

১। সেকিয়া (তক্ক) রাজ্য।

এই রাজ্য প্রায় ১০,০০০ লি বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বে পিপোচি (বিপাসা নদী; পশ্চিমে সিন্ধুনদ। রাজধানী প্রায় ২০লি বিস্তৃত। ভূমি ধান্য উৎপাদনের জন্য প্রশস্ত। দেশে স্বর্ণ রৌপ্য, তাম্র ও টীন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দেশে প্রায়ই ঝড় হয়। অধিবাসীরা চতুর এবং ক্রোধভাবাপন্ন। ইহারা কৌষেয় পরিধান করে। দেশে দশটী সঙ্ঘারাম এবং শতাধিক মন্দির আছে। অল্প সংখ্যক লোকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বে এই দেশে যথেষ্ট পুণ্যশালা ছিল; এই সকল পুণ্যশালায় পীড়িত ও আতুর বাস করিত। ঔষধ, পথ্য, বস্ত্র ও আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদিই সরবরাহ করা হইত। এইজন্য পথিকগণ কোন কষ্ট ভোগ করিত না।

রাজধানীর ১৪।১৫লি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন শাকল নগরে পৌঁছি। নগরের প্রাচীরগুলি পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু ভিত্তিগুলি এখনও শক্ত আছে। ইহার পরিধি প্রায় ২০লি। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটা নগর স্থাপিত হইয়াছে। অধিবাসীরা ধনী এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন। এই স্থানেই বহুপূর্ব্বে রাজধানী ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে মহিরকুল নামে এক নরপতি রাজধানী স্থাপনা করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ও সাহসী ছিলেন। নিকটবর্ত্তী সকল রাজ্যই তিনি জয় করিয়াছিলেন। অবসর মত তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নিয়মাদি পর্য্যালোচনা করিতেন এবং একদিন প্রধান কোন যতিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কোন যতিই তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। যাঁহারা অভাবশূন্য ও স্বীয় স্বীয় অবস্থায় তৃপ্ত ছিলেন তাঁহারা রাজদত্তসম্মানের জন্য ইচ্ছুক ছিলেন না। যাঁহারা বহুদর্শী ছিলেন তাঁহারা রাজবদান্যতা তাচ্ছল্য করিতেন। এই সময়ে রাজপরিবারে এক বৃদ্ধ ভৃত্য বাস করিতেন। এই ভৃত্য অনেককাল পূর্ব্বে কৌষেয় ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি বহুদর্শী, বিজ্ঞ, ও বক্তা ছিলেন। যতিগণ রাজাদেশ পালনার্থ ইহাকেই রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজা বলিলেন "আমি বৌদ্ধধর্ম্মপদ্ধতিকে সম্মান করি এবং সেইজন্য দেশদেশান্তর হইতে আমি সুবিখ্যাত যতি আহ্বান করিয়াছিলাম; কিন্তু এইক্ষণ আমার সহিত তর্কের জন্য ধর্ম্মমণ্ডলী এক ভৃত্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে যতিগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি আছেন কিন্তু অদ্য যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার পক্ষে যতিগণকে সম্মান প্রদর্শনের আর সম্ভাবনা নাই।" পরে তিনি

পঞ্চভারতে বৌদ্ধধর্ম্মবিনাশের জন্য সকল যতির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন।

মগধরাজ বালাদিত্যরাজ বৌদ্ধধর্ম্মকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং প্রজানুরক্ত ছিলেন। যখন তিনি মহিরকুলের আদেশ ও পীড়নের সংবাদ অবগত হইলেন তখন তিনি সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিয়া রাজকরপ্রদানে অস্বীকার করিলেন; মহিরকুল বিদ্রোহ নিবারণার্থ সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। বলাদিত্যরাজ মহিরকুলের প্রতাপ অবগত থাকাতে তাঁহার মন্ত্রীগণকে বলিলেন "আমি শুনিলাম যে চোরগণ আমার রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের সহিত যুদ্ধকরা আমার সাধ্য নাই; সুতরাং মন্ত্রীগণের অনুমতি লইয়া আমি জলাভূমিস্থ ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিব।"

এই বলিয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে ও মরুভূমিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকায়, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রস্থ দ্বীপে আশ্রয় লইল। মহিরকুলরাজ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সৈন্যাধ্যক্ষ রাখিয়া জলপথে বলাদিত্যকে আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন বলাদিত্য কৌশলে মহিরকুলকে বন্দী করিলেন। মহিরকুল লজ্জায় নিজ বসনে বদন আবৃত করিয়া রহিলেন। সিংহাসনোপবিষ্ট মন্ত্রীপরিবৃত বলাদিত্য তাঁহার একজন মন্ত্রীকে মহিরকুলের আবরণ উন্মুক্ত করিবার অনুমতি করিলেন।

মহিরকুল উত্তর করিলেন "প্রভুভৃত্যে এইক্ষণ স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে; শত্রুর মুখদর্শন অনাবশ্যক; বিশেষতঃ কথাবার্ত্তার সময় মুখ দেখিবার আবশ্যক কি?" বলাদিত্যের আদেশ মহিরকুল তিনবার অমান্য করিলে বলাদিত্য বলিলেন যে, মহিরকুল ত্রিরত্ন বিনষ্ট করিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

বলাদিত্যের মাতা বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং কোষ্ঠী প্রণয়নে সুদক্ষা ছিলেন। মহিরকুলের প্রাণদণ্ড হইবে জানিতে পারিয়া বলাদিত্যরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "আমি শুনিতে পাইলাম যে মহিরকুল বিজ্ঞ এবং সুশ্রী। সুতরাং আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে চাই।" বলাদিত্য মিহিরকুলকে তথায় আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মহিরকুলকে দেখিয়া রাজমাতা বলিলেন, "মহিরকুল লজ্জিত হইও না। সংসারে সকলই অনিত্য, সুখ ও দুঃখ ঘটনাচক্রে ঘটিয়া থাকে। তুমি আমাকে তোমার মাতার ন্যায় বিবেচনা করিবে এবং আমিও তোমাকে সন্তানের ন্যায় দেখিব। তোমার মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া আমার সঙ্গে কথা বল।"

মহিরকুল উত্তর করিলেন "কিছুদিন পূর্ব্বে আমি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলাম। কিন্তু এইক্ষণ আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। আমি আমার রাজ্য হারাইয়াছি এবং এইক্ষণ আমি ধর্ম্মাচরণেও অশক্ত। আমার পূর্ব্বপুরুষ ও প্রজার নিকট আমি হেয় হইয়াছি। বস্তুতঃ পৃথিবীর বা স্বর্গের সকলের নিকটই আমি ঘৃণিত। এইজন্য আমি নিজ বসনে বদন আবৃত করিয়াছি।" রাজমাতা উত্তর করিলেন, "জয় পরাজয় ঘটনার উপর নির্ভর করে। সুখ দুঃখ ক্রমান্বয়ে আইসে। তোমার আবরণ উন্মুক্ত কর; আমি তোমার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিব।"

মহিরকুল রাজমাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "রাজশাসনে অনুপযুক্ত হইয়াও আমি বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলাম এবং আমি সেইজন্য রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া শাস্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু এইক্ষণ যদিও আমি বন্দী তত্রাপি একদিনের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেও আমি সুখী হইব। এইজন্য আপনি যে আমার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিবেন এই আশ্বাসে আমি আমার আবরণ উন্মোচন করিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" মহিরকুল এই বলিয়া মুখের আবরণ উন্মোচন করিলেন। রাজমাতা মহিরকুলকে পুত্র সম্বোধনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর যথেষ্ট দেরী আছে। পরে তিনি বলাদিত্যকে বলিলেন যে পূর্ব্বতন, নিয়মানুযায়ী দোষ মার্জ্জনা করাই উচিত। যদিও মিহিরকুল যথেষ্ট পাপ করিয়াছেন তত্রাপি তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত

পুণ্য শেষ হয় নাই। যদি তুমি মহিরকুলের প্রাণদণ্ড কর, তবে দ্বাদশবৎসরকাল তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিতে হইবে। আমি দেখিতে পাইতেছি যে মহিরকুল ক্ষুদ্ররাজ্যের অধিপতি হইবেন; সুতরাং উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্ররাজ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত কর।"

বলাদিত্যরাজ রাজমাতার আদেশে রাজ্যচ্যুত রাজার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার বিবাহ দিয়া যথেষ্ট সম্মানের সহিত সৈন্যসহ দ্বীপ হইতে রওনা করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহিরকুলরাজের ভ্রাতা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। মহিরকুল অনেকদিন দ্বীপ ও মরুভূমিতে যত্রতত্র ভ্রমণ করিয়া কাশ্মীর গমন করিলেন। কাশ্মীররাজ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া দয়াপরবশ হইয়া শাসনের জন্য ক্ষুদ্র রাজ্য ও নগর প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ নগরের অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়া কাশ্মীররাজকে হত্যা করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ ও সঙ্গে সঙ্গে সুযশ লাভ করিয়া তিনি পশ্চিমাংশে গমন করিয়া গান্ধার রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তিনি কতকগুলি সৈন্যকে গোপনে লুকায়িত রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। তিনি রাজবংশ ও প্রধান মন্ত্রীকে সমূলে বিনাশ করেন এবং ১৬০০ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস করেন। তাঁহার সৈন্যগণ অনেক লোককে হত্যা করে। তদ্ব্যতীত তিনি নয় লক্ষ লোকের হত্যার আয়োজন করেন। এই সময়ে সকল মন্ত্রী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহারাজ। আপনার বীরত্বে জয়লাভ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে আমাদের সৈন্যেরা যুদ্ধ হইতে বিরত আছে। আপনি এইরূপ দেশাধিপতিকে শাসন করিয়াছেন; কিন্তু অধিবাসীদের কি দোষ? তাহাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ করুন।"

রাজা তদুত্তরে বলিলেন "তোমরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং উক্ত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বকে সম্মান কর। তোমরা বুদ্ধপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কর এবং সেইজন্য পরে আমার দোষ উল্লেখ করিবে। এইরূপ তোমরা তোমাদের স্বস্থানে প্রস্থান কর। এ সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই।"

পরে তিনি সিন্ধুতীরে প্রথম শ্রেণীর তিন অযুত লোককে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া হত্যা করিলেন এবং তিন অযুত ব্যক্তিকে দাসরূপে তাঁহার সৈন্যমধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে পরাজিত দেশের অর্থসংগ্রহ করিয়া স্বকীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে বজ্রপাত ও ঝটিকা হইয়াছিল এবং সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবী টলায়মান হইয়াছিল। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া সিদ্ধপুরুষগণ বলিতে লাগিলেন যে অসংখ্য নির্দ্দোষ প্রাণীহত্যার জন্য মহিরকুলকে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন নরকে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে।

সাকাল গ্রামস্থ সঙ্ঘারামে হীনযানমতাবলম্বী ১০০ শত যতি আছেন। পূর্ব্বকালে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব এইস্থানে পরমার্থসত্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মঠের পার্শ্বেই ২০০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এইস্থানে পূর্ব্বতন চারিজন বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং এইস্থানে অদ্যাপিও তাঁহাদের ভ্রমণের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্ঘারামের ৫।৬ লি উত্তর-পশ্চিমে অশোকরাজ নির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানেও পূর্ব্বতন ৪ জন বুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন।

নূতন রাজধানীর ১০।১৫ উত্তরপূর্ব্বে অশোক নির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। তথাগত উত্তরাঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাইবার সময় এইস্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্তূপে বুদ্ধদেবের অনেক স্মরণ-চিহ্ন আছে।

এইস্থান হইতে ৫০০লি পূর্ব্বদিকে যাইয়া আমরা চীনাপটী রাজ্যে পৌঁছি।

চীনাপটী।

এই প্রদেশ প্রায় দুই সহস্র লি বিস্তৃত। রাজধানী ১৪।১৫লি। দেশে প্রচুর শস্য পাওয়া যায় কিন্তু

ফলের গাছ কম। অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় এবং অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে। দেশ সমৃদ্ধিশালী। জল বায়ু উষ্ণ, অধিবাসীরা ভীত ও কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় প্রকারেরই লোক আছে। দেশে ১০টী সঙ্ঘারাম ও ৮টী দেবমন্দির আছে।

যখন কনিষ্করাজ সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার খ্যাতি নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। পীত নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ করদরাজগণ তাঁহার নিকট প্রতিভূ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কনিষ্করাজ এই সকল প্রতিভূগণকে বিশেষ সমাদর করিতেন। বৎসরের তিন ঋতুতে তিনি তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন আবাসে স্থান দিতেন এবং আবাসস্থল রক্ষণের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। প্রতিভূগণ শীতকালে এই দেশে বাস করিতেন। এই জন্য এই দেশকে চীনাপতী বলা হইয়া থাকে।

এই দেশে পূর্ব্বে পেয়ার বা পীচ জন্মিত না। বস্তুতঃ, চীনদেশ হইতে প্রেরিত প্রতিভূগণ কর্ত্তৃক এই সকল ফল বৃক্ষ রোপণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কুত্রাপি এই সকল ফল জন্মিত না। এই জন্য পীচকে চীনানি এবং পেয়ারকে চীনারজিপুত্র বলে। এই জন্য এতদ্দেশবাসী লোকে পূর্ব্বাঞ্চলের লোকদিগকে বিশেষ সম্মান করে। আমার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া এতদ্দেশ বাসীরা বলে যে "এই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্বতন শাসন কর্ত্তার দেশ হইতে আসিয়াছেন।"

রাজধানীর ৫০০ শত লি দক্ষিণ পূর্ব্বে আমরা তমসাবন নামক মঠে উপস্থিত হই। এই স্থানে প্রায় ৩০০ যতি বাস করেন। তাঁহারা সর্ব্বাস্তিবাদসম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং সাধু। ইহারা মহাযানমতাবলম্বী। ভদ্রকল্পস্থ এক সহস্র বুদ্ধ এই দেশে দেবতাগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে কাত্যায়ন এই স্থলে অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তমসাবনের মঠে রাজা অশোক নির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। ইহার পার্শ্বে পূর্ব্বতন ৪ জন বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন আছে। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ ও প্রস্তর গৃহ আছে। কল্পারম্ভ হইতে যে সকল ঋষি অর্হৎপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই স্থানেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাদের সংখ্যা উল্লেখ করা অসম্ভব। ইহাদের দন্ত ও অস্থি অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ২০ লি লইয়া কেবলই মঠ। বুদ্ধদেবের স্মরণ চিহ্ন সম্বলিত স্তূপের ইয়ত্তা নাই।

এই স্থান হইতে ১৪০।১৫০ লি উত্তর পূর্ব্বে যাইয়া আমরা জালন্ধর পৌছি।

জালন্ধর।

এই রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে এক সহস্র লি এবং উত্তর দক্ষিণে আটশত লি। রাজধানী ১২।১৩ লি লইয়া বিস্তৃত। দেশে শাক সবজী ও চাউল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। এই দেশে যথেষ্ট পরিমাণ ফুল ও ফল পাওয়া যায়। জল বায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র। অধিবাসীরা সাহসী এবং ক্রোধশালী কিন্তু দেখিতে বর্ব্বর। গৃহগুলি আসবাব পূর্ণ। প্রায় ৫০টী মঠে দুই সহস্র যতি বাস করে। হীন ও মহাযান উভয় মতাবলম্বী ব্যক্তিই দেখা যায়। ৩টী দেব মন্দিরে ৫০০ শত অবিশ্বাসী আছে। ইহারা সকলেই শৈব।

পুরাকালে এতদ্দেশীয় এক রাজা অবিশ্বাসীগণকে অত্যন্ত পক্ষপাত দেখাইতেন কিন্তু পরে এক অর্হতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাবান হয়েন। সেই জন্য মধ্যভারতের রাজা তাঁহাকে পঞ্চভারতের ত্রিরত্ন পর্য্যবেক্ষণের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। পক্ষপাত শূন্য হইয়া তিনি যতিগণের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেন। ধার্ম্মিককে সম্মান ও অসাধুকে শাস্তি দিতেন। যে স্থানে বুদ্ধদেবের কোন চিহ্ন পাইতেন সেই স্থলেই তিনি স্তূপ কি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিতেন এবং ভারতবর্ষের সকল স্থানেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া আমরা পার্ব্বত্য পথ, সমতল ক্ষেত্র এবং অনেক গিরিসঙ্কট মধ্য দিয়া কুলুটদেশে পৌছি।

কুলুট

এই দেশ প্রায় তিন সহস্র লি বিস্তৃত; ইহার চতুষ্পার্শ্বেই পর্ব্বত। রাজধানী ১৪।১৫ লি। ভূমি উর্ব্বর এবং প্রচুর শস্য জন্মে। যথেষ্ট ফুলফল ও ভেষজলতা পাওয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র স্ফটিক ও টীন যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেশ অত্যন্ত শৈত্যপ্রধান এবং অনবরত শিল ও বরফপাত হয়। অধিবাসীরা দেখিতে বর্ব্বরের ন্যায় এবং ইহাদের স্বভাবে ক্রোধক। প্রায় ২০টা সঙ্ঘারাম ও এক সহস্র যতি আছে। ইহারা অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী, অন্যান্য সম্প্রদায় ভুক্ত লোকও আছে। পনরটী দেবমন্দির আছে; নানাসম্প্রদায়স্থ লোক এ স্থানে বাস করে।

পর্ব্বত মধ্যে গুহায় অর্হৎগণ বাস করেন। ঋষিগণও এই স্থানে থাকেন। দেশ মধ্যে অশোক নির্ম্মিত একটা স্তূপ আছে। পুরাকালে তথাগত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া এই দেশে ধর্ম্মপ্রচার ও মনুষ্যের উদ্ধারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। এই স্তূপ তাঁহারই স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এ স্থান হইতে ১৮০০।১৯০০ শত লি উত্তরে যাইয়া আমরা লাহুল দেশে পৌঁছি। লাহুল হইতে ২০০০ লি উত্তরে আমরা মোলাসো দেশে পৌঁছি। পরে ৭০০লি দাক্ষিণে যাইয়া আমরা শতদ্রু দেশে পৌঁছি।

শতদ্রু

এই দেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে ২০০ লি এবং বৃহৎ নদীর সান্নকট। রাজধানী ১৭।১৮ লি বিস্তৃত। দেশে প্রচুর শাক সবজী এবং ফল পাওয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরও যথেষ্ট। অধিবাসীরা উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করে। বসনাদি মূল্যবান। দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র। ইহারা শিক্ষিত ও ভদ্র। সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। রাজধানীর পার্শ্বে দশটী সঙ্ঘারাম কিন্তু এইক্ষণ এই সকল স্থান জন শূন্য। নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে অশোকরাজ নির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ। ইহার পার্শ্বে পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন আছে। এই স্থান হইতে ৮০০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে পার্য্যাত্রদেশে পৌঁছি। এই দেশ ৩০০০ লি বিস্তৃত এবং রাজধানীর পরিধি ১৪।১৫ লি। যথেষ্ট শস্য জন্মে। একপ্রকার অদ্ভুত চাউল পাওয়া যায়; উহা ৬০ দিনে পক্ক হয়। প্রচুর গরু ও মেষ পাওয়া যায় কিন্তু ফুল ও ফল কম। দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র। অধিবাসীরা নিষ্ঠুর। ইহারা অশিক্ষিত ও অবিশ্বাসী। রাজা জাতিতে বৈশ্য; তিনি সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। জনশূন্য ৮টী সঙ্ঘারাম আছে। কয়েকজন মাত্র যতি বাস করে, ইহারা হীনযান মতাবলম্বী। দেবতাদিগের দশটী মন্দির আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত এক সহস্র ব্যক্তি এই সকল মন্দিরে বাস করে।

মথুরা

মথুরা রাজ্য ৫০০০ লি বিস্তৃত, রাজধানীর পরিধি ২০লি। ভূমি উর্ব্বরা এবং শস্যোৎপাদনের জন্য প্রশস্ত। অধিবাসীরা বৃক্ষোৎপাদনে যত্নশীল। এই সকল বৃক্ষ দুই জাতীয়। ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষের ফল প্রথমে সবুজ বর্ণ থাকে কিন্তু পরিশেষে পীত বর্ণ হয়। বৃহদাকার গাছগুলির ফল বরাবরই সবুজবর্ণবিশিষ্ট। দেশে সুন্দর কাপাস ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। দেশটি উষ্ণপ্রধান; অধিবাসীরা নম্র ও শিষ্ট। ইহারা ধার্ম্মিক ও শিক্ষাপ্রবণ।

প্রায় ২০০০ যতি বিশিষ্ট ২০টী সঙ্ঘারাম আছে। ইহারা হীন ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত। দেবতাদিগের ৫টী মন্দির আছে। অশোক নির্ম্মিত ৩টা স্তূপ আছে। পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের অনেক চিহ্ন এই দেশে পাওয়া যায়। শাক্য তথাগতের শিষ্যগণের স্মরণার্থ অনেক স্তূপ আছে। যথা সারীপুত্র, মুদ্গল্যপুত্র, পূর্ণমৈত্রায়নিপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী এবং অন্যান্য বোধিসত্ত্বের স্মরণার্থ স্তূপ আছে। উপবাসকালীন সকল যতি এইস্থানে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করেন ও নানাপ্রকার উপহার আনয়ন করেন। যাহারা অভিধর্ম্মপীটক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সারীপুত্রকে সম্মান করেন। যাহারা ধ্যানপর তাঁহারা মুদ্গলপুত্রকে, যাঁহারা

সূত্র পাঠ করেন তাঁহারা পূর্ণমৈত্রজ্ঞানিপুত্রকে, যাহারা বিনয় শিক্ষা করেন তাঁহারা উপালকে সম্মান করেন। ভিক্ষুণীগণ আনন্দকে সম্মান করেন এবং শ্রমণগণ রাহুলকে পূজা করেন। যাহারা মহাযান মতাবলম্বী তাঁহারা বোধিসত্ত্ব পূজা করেন। এই সময়ে তাঁহারা স্তূপে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করেন। তাঁহারা নিজ নিজ মণিময় পতাকা দ্বারা স্থান সুশোভিত করেন; চাঁদোয়া দ্বারা স্থান সজ্জিত করেন; ধূপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করেন। দেশের রাজা ও মন্ত্রীগণ উৎসাহের সহিত এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন।

নগরের ৫।৬ লি পূর্ব্বে আমরা একটী পার্ব্বত্য সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গুহায় যতিগণ বাস করেন। সমতল ক্ষেত্র দিয়া এই সকলে স্থানে প্রবেশ করিতে হয়। মাননীয় উপগুপ্ত এই সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একটা স্তূপে তথাগতের নখের অবশিষ্ট আছে।

সঙ্ঘারামের উত্তরে গুহাভ্যন্তরে ২০ ফুট উচ্চ এবং ৩০ ফুট বিস্তৃত একটী প্রস্তরগৃহ আছে। ইহার মধ্যে ৪ইঞ্চি লম্বা অনেকগুলি কাষ্ঠখণ্ড আছে। এইস্থানে মাননীয় উপগুপ্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারে যখন কোন দম্পতি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখনই তিনি এই গৃহে ১ খানি কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতিভুক্ত ব্যক্তির অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির, তিনি কোন নিদর্শন রাখেন নাই।

প্রস্তরগৃহের ২৪।২৫লি দক্ষিণপূর্ব্বে জলাভূমির স্তূপ আছে। পুরাকালে তথাগত এই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক বানর তাঁহাকে এক পাত্র মধু উপহার দিয়াছিল। বুদ্ধ এই মধু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণার্থ আদেশ দিয়াছিলেন। আহ্লাদে আপ্লুত হইয়া বানর গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার এই পুণ্যফলে পরজন্মে সে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়।

ইহার কিছুদূরেই পূর্ব্বতন চারি জন বুদ্ধের ইতস্ততঃ ভ্রমণের চিহ্ন আছে। নিকটে যথায় সারীপুত্র মুদ্গাল্যপুত্র এবং অন্যান্য ১২৫০ অর্হৎ সমাধি অভ্যাস করিয়াছিলেন তথায় স্তূপ আছে। তথাগত এইস্থানে অনেকবার ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে চিহ্ন আছে।

৫০০ লি উত্তরপূর্ব্ব দিকে যাইয়া আমরা স্থানেশ্বর পৌঁছি।

(ক্রমশঃ)

মানবের ভবিষ্যৎ।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এক আশ্চর্য্যতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিতব্যক্তিবৃন্দকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেই তত্ত্বটি এই:—বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলে অম্লজান বাষ্পের পরিমাণ বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ভূপৃষ্ঠ হইতে সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী অরণ্যানী সমূহের বিনাশবশতঃ এবং রাশি রাশি অঙ্গারাম্ল বাষ্প বায়ুমণ্ডলে স্থানলাভ করায়, অম্লজান বাষ্পের পরিমাণ দিন দিন স্বল্পতর হইয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে যে প্রাণস্বরূপ অম্লজান বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া, বায়ুমণ্ডলস্থ অঙ্গারাম্ল-বাষ্পীয়-উপাদানের ক্রমবৃদ্ধি হইতে থাকিলে, মানবের অদৃষ্টে কি হইবে?

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন

যে বায়ুরাশির প্রধান উপাদান দুইটী—অম্লজান ও যবক্ষারজান। ইহাদের মধ্যে অম্লজান বায়ু জীবন-রক্ষক, জীবনের পরিপোষক। অপরটী জীবন রক্ষণে অক্ষম, এমন কি জীবনের পরিপন্থী। কিন্তু অম্লজান বায়ু জীবন-রক্ষক হইয়াও তীব্রতাবশতঃ হলাহলের ন্যায় জীবননাশী; আর যবক্ষারজান জীবনরক্ষণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াও অম্লজানের তীব্রতানাশক বলিয়া জীবনের অনুকূল। রুচিবিরুদ্ধ না হইলে বলিতে পারি যে অম্লজান তীব্রসুরা, আর যবক্ষারজান বারি। অম্লজান ও যবক্ষারজান কেহই নিরপেক্ষভাবে আমাদের জীবনরক্ষণে সমর্থ নহে। কিন্তু ইহাদের সংমিশ্রণে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই আমাদের জীবনোপযোগী—আমাদের প্রাণস্বরূপ বায়ু।

বায়ুমণ্ডলের এই উপাদানদ্বয়ের উপর আমাদের জীবন এরূপ নির্ভর করিতেছে যে, আজ যদি বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানবাষ্প একেবারে অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ এই কোটী কোটী জীব, বারিহীন মীনকুলের ন্যায়, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আর যদি অম্লজানবাষ্পরাশির পরিমাণ কোনও অভাবনীয় কারণে প্রভূতরূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্বাস গ্রহণোপযোগী বায়ু উন্মাদকর হইয়া উঠিবে; আমাদের দেহস্থ শোণিতরাশি দ্রবধাতুবৎ ধমনী ও শিরা সমূহের মধ্যে তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া আমাদের সুগঠিত দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া দিবে; মস্তিষ্ক ও দেহের কার্য্য বিদ্যুৎবেগে চলিতে থাকিবে; এবং সমগ্র মানব সমাজ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া ভূমণ্ডলকে 'পাগলাগারদে' পরিণত করিবে। শক্তি স্ফুরণ এমনই হইবে যে, জীবন-ব্যাপী সাধনার কার্য্য চকিত মধ্যে সম্পন্ন হইবে। আজ যাহারা অল্পবুদ্ধি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা প্রতিভাশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু হায়! এই প্রচণ্ড শক্তির বেগধারণে অসমর্থ হইয়া আমাদের এই দেহযন্ত্র স্ফোটনোন্মুখ এঞ্জিনের ন্যায় নিমেষ মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে, বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজান বাষ্পের স্বল্পতা ঘটিলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিনিচয় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইবে। মানবজাতি তাহার সমুদায় জীবনীশক্তি হারাইয়া জড়ভাব ধারণ করিবে। এত দিন ধরিয়া ক্রমোন্নতি নিবন্ধন যে বিচিত্র সভ্যতা মানব সমাজে দেখা দিয়াছিল তাহা নিমেষ মধ্যে যেন কোন কুহক প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া যাইবে; এবং ভূমণ্ডল দুর্ব্বল ও নগণ্য জীবকুলের ঘৃণিত আবাসে পরিণত হইবে।

ফলকথা, ভূপৃষ্ঠ হইতে মানবজাতির বিলোপসাধন যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাঁহার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্নিসংযোগে পৃথ্বী ভস্মীভূত করিবার আবশ্যক নাই, কিংবা তুহিনপাতে ভূমণ্ডলকে হিমমণ্ডিত করিয়া মানববাসের অযোগ্য করিবারও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না; কেবলমাত্র বায়ুবাশস্থ উপাদান সমূহ হইতে অম্লজানবাষ্পের কিয়দংশ তুলিয়া লইলেই তাঁহার অভীষ্ট সাধন পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

অতএব বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানবাষ্পের হ্রাসপ্রাপ্তির সংবাদ কখনই আশাপ্রদ নহে। মানবের বর্ত্তমান দেহমন যুগযুগান্তরব্যাপী

অভিব্যক্তির ফল। যে অনুকূল ঘটনাপরম্পরার সমবায় ফলে আজ মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থা, বিপরীত ঘটনায় তাহার সমূহ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুদূর ভবিষ্যতে বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানবাষ্পের অল্পতা নিবন্ধন মনুষ্যের শারীরিক গঠন কিরূপ হইবে Science Siftings নামক বৈজ্ঞানিক পত্র তাহার এক বর্ণনা দিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

ভূমিতলের সন্নিকটবর্ত্তী লুপ্তাবশেষ অম্লজান বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য মানবকে প্রথমতঃ চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় হস্তপদাদির উপর ভর দিয়া বিচরণ করিতে হইবে; অম্লজান-বায়ুর ন্যূনতাবশতঃ বায়ুমণ্ডলীতে জলীয় বাষ্পের অভাব হওয়ায় উত্তাপাধিক্যনিবন্ধন মনুষ্যের দেহচর্ম্ম বৃক্ষত্বচের ন্যায় স্থূল ও কঠিন হইবে; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমকূপগুলি শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায় সহায়তা করিতে গিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইবে; বর্দ্ধিত কর্ণদ্বয় ফণাকৃতি ধারণ করিয়া মণ্ডলাকারস্বরূপ হইবে এবং নাসিকা লতাতন্তুর ন্যায় শুণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হইবে; ক্রমে মনুষ্য সরীসৃপভাবাপন্ন হইয়া যতই ভূতল-অবলম্বী হইবে ততই তাহার পদদ্বয় অকর্ম্মণ্য ও অনাবশ্যক হইয়া উঠিবে; পরিশেষে আত্মরক্ষার্থ তাহার শরীরস্থ রোমাবলী সজারুর ন্যায় কণ্টকে পরিণত হইবে।

সুদূর ভবিষ্যতে মানবদেহের এই অত্যদ্ভুত ভাবী পরিণতি আপাততঃ আমাদের বিস্ময় ও অবিশ্বাসের কারণ হইলেও, বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানবাষ্পের পরিমাণ যে দিন দিন হ্রাস পাইতেছে তাহা বিবিধপ্রকারে প্রমাণিকৃত হইয়াছে।

ব্যোমযান-সহযোগে বিমানারোহণ করিলে দেখা যায় যে সমুদ্রতল হইতে যতই ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হওয়া যায়, অম্লজানবায়ুর অপ্রাচুর্য্য ততই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। দশ বার হাজার ফুট উপরে অম্লজানবায়ুর অল্পতা এতই অনুভূত হয় যে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং তদূর্দ্ধে আরোহণ করিলে জীবনীশক্তির লোপ হইয়া আকস্মিক মৃত্যু ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দাঁড়ায়। ফলতঃ, এই যে সুবিস্তৃত বায়ুমণ্ডলে আমরা বাস করিতেছি, ইহার ঊর্দ্ধদেশ যবক্ষারজানবহুল এবং তলদেশ অম্লজানবাষ্পঘন। গুরুত্ব-নিবন্ধন অম্লজানের গতি নিম্নাভিমুখে এবং অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া যবক্ষারজান ঊর্দ্ধগামী। সুতরাং অম্লজান-বাষ্পের পরিমাণ সত্য সত্যই যদি হ্রাস পাইয়া থাকে, তবে তাহা নভোদেশেই সর্ব্বপ্রথমে লক্ষিত হইবার কথা। এবং বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাই প্রকৃত অবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সভ্যজগতে গগনপর্য্যটনের যে বিপুল প্রয়াস দেখা দিয়াছে—ব্যোমযানাদির উন্নতি-সাধন, বৈজ্ঞানিক অভিযানাদির দ্বারা পর্ব্বত শিখরে উপনিবেশ সংস্থাপন, বিবিধ উড্ডীয়মান যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতি বিচিত্র চেষ্টার ফলে ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে অধুনা পর্ব্বত শিখরে শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্টসাধ্য।

অধিকন্তু, বায়ুমণ্ডলস্থ উপাদান নিচয়ের পরিবর্ত্তন ব্যাপার আমরা অন্য এক কারণে

বিশেষরূপে বুঝিতে পারি। তাহা এই যে মানুষের জীবনীশক্তি প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সভ্যতার বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া দিগন্তব্যাপিনী উন্নতির জয়ধ্বনি তুলিয়া ভূপৃষ্ঠে সগর্ব্বে বিচরণ করিলেও, ইহা নিশ্চিত যে অধিকাংশ মানবই, বিশেষতঃ নাগরিকবৃন্দ, তাহাদের জীবনীশক্তি পূর্ব্বপুরুষাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হারাইয়াছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, অরণ্যানী সমূহের বিলোপসাধন, এবং কৃত্রিম উদ্ভাবন জনিত প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের বিপর্য্যয় বশতঃ জড়জগতে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, বায়ুমণ্ডলস্থ উপাদান সমূহের পরিবর্ত্তনব্যাপারে আমরা তাহারই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইতেছি।

অম্লজানবাষ্পের এই ক্রমবিলোপের সঠিক পরিমাণ যদিও অঙ্কপাত করিয়া আপাততঃ দেখান সম্ভব নহে, কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বায়ুমণ্ডলে অম্লজানের প্রাচুর্য্য আমরা চিরকাল আশা করিতে পারি না। পৃথিবীর ন্যায় শীতায়মান কোন গ্রহই অম্লজানবাষ্প চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না; ভূপৃষ্ঠ যতই শীতল হইবে, শিলামৃত্তিকা-সংগঠনে অম্লজানবাষ্প ততই ব্যয়িত হইবে। যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া এই প্রক্রিয়া জড়জগতে চলিয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানবাষ্পের এই অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় পূরণ জন্য, মহাকাশ হইতে অম্লজানবাষ্প পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই আমাদের এই অত্যাবশ্যক বাষ্পের উৎপত্তিস্থান এবং কিরূপেই বা ইহা পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানবাষ্প উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে প্রাপ্ত হই বলিয়াই আমরা জানি। অতএব ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ভূপৃষ্ঠস্থ অরণ্যানী সমূহের সংরক্ষণ আমাদের জীবন ধারণোদ্দেশ্যে কিরূপ প্রয়োজনীয়। যদি ভূমণ্ডলস্থ কতকটা নির্দ্দিষ্ট বিশালক্ষেত্র উদ্ভিদ্-উপাদানের জন্য রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনরক্ষার একটি প্রধান সহায়ের উৎপত্তিমূলে কুঠারাঘাত করিব।

আর একটী পদার্থ আমাদের বায়ুমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইতেছে—তাহা অঙ্গারাম্লজান। ইহাও শীতায়মান পৃথ্বীপৃষ্ঠ কর্ত্তৃক শোষিত হইতেছে। শিলামৃত্তিকা-সংগঠনে অম্লজানবাষ্পের ন্যায় অঙ্গারাম্লবাষ্পও ব্যয়িত হইতেছে। অম্লজানবায়ু জীবজগতের পক্ষে যেরূপ অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ জীবনের পক্ষে অঙ্গরাম্লবায়ুও সেইরূপ। অতএব যদি অঙ্গারাম্ল বাষ্পের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ্গণ বাঁচিতে পারে না; আর উদ্ভিদ্ বিনষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অম্লজান প্রাপ্তির একটী মূল প্রস্রবণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

অতএব দুইটী কঠিন সমস্যা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। অম্লজানবায়ুর পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে অব্যাহত রাখিতে হইলে উদ্ভিদ্-জগতের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য এবং উদ্ভিদ্-জীবন রক্ষায় অঙ্গারাম্লজান-বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অনতিক্রমণীয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শীতায়মান পৃথিবীপৃষ্ঠে যে শক্তি অবিরত

কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রভাবে উদ্ভিদ্ ও জীবজগতের প্রাণস্বরূপ অঙ্গারাম্লজান ও অম্লজান বাষ্পদ্বয় ক্রমশই স্বল্পতা প্রাপ্ত হইতেছে।

এ কথাও সত্য যে মনুষ্যের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী অঙ্গারাম্লবাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। প্রত্যেক কলকারখানার চিমনী নির্গত ধূমরাশি ও সভ্যতাসুলভ বিবিধ কৃত্রিম উপায়োৎপন্ন প্রভূত অঙ্গারাম্ল-বাষ্প প্রতিনিয়ত আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত করিতেছে; এবং পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াযোগেও অঙ্গারাম্লবাষ্প প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মানবের প্রাণস্বরূপ অম্লজানবাষ্পের ক্রমবিলোপ দৃষ্ট হইলেও উদ্ভিদ্ জীবনোপযোগী অঙ্গারাম্ল-বাষ্পরাশির পরিমাণ অনেকটা অব্যাহত রহিতেছে। সুতরাং পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সুদূর ভবিষ্যতে ভূপৃষ্ঠ প্রাণিজীবন অপেক্ষা উদ্ভিদ্ জীবনেরই অধিক অনুকূল হইবে এবং এইরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, প্রথম অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করিবে। ভূতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, উদ্ভিদ্‌নিচয়ই পৃথিবীর আদিম অধিবাসী; মানবের আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অধুনাতন। অভিব্যক্তির চরম ফলস্বরূপ যাহারা সর্ব্বশেষে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল, বিধাতার বিচিত্রবিধানে তাহারাই মহাযাত্রার প্রথম পথিক হইয়া সর্ব্বাগ্রে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অম্লজান বাষ্পের ক্রমিক অপচয় যদি প্রাণিজীবননাশের আশঙ্কার কারণ হয় তাহা হইলে মনুষ্যসাধ্য কোনও উপায়ে ইহার নিরাকরণ হইতে পারে কি না? এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ অম্লজানবাষ্পের উৎপাদনে সমর্থ হন নাই; কিন্তু দিন দিন বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুত উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, ভবিষ্যৎ রসায়ন-তত্ত্ববিদগণ প্রচুর পরিমাণে অম্লজান বাষ্প উৎপাদনের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া মনুষ্যের এই ধ্বংসোন্মুখ গতি রোধ করিতে সমর্থ হইবেন!

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

মাতৃঋণ।

(উপন্যাস)

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতা-পুত্র।

তখন শীতের কুয়াশা ঠেলিয়া সূর্য্য আকাশের অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। একখানি সুদৃশ্য ব্রুহাম আসিয়া প্রকাণ্ড স্কুল বাড়ীর ফটকে লাগিল। একটি বালকের হাত ধরিয়া এক সুন্দরী গাড়ী হইতে নামিল। বালকটি ঈষৎ কৃশাঙ্গ, দেখিতে দিব্য সুশ্রী, পরিচ্ছদেও একটা পারিপাট্য ছিল। বয়স সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না।

রমণীর তন্বী দেহলতা বহুমূল্য কৃষ্ণ পরিচ্ছদে ভূষিতা। কণ্ঠের লোমশ বেষ্টনী ও মাথার টুপি এবং গাড়ী-ঘোড়া দেখিলে তাহাকে রীতিমত বিলাসিনী বলিয়া বুঝিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। সুন্দর কোমল মুখের চারিধারে সোণালী কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছে—রমণী সুডৌল বাহু দ্বারা কুন্তলগুচ্ছ ঈষৎ সরাইয়া দিতেছিল। সদা-প্রফুল্ল হাস্যময় ওষ্ঠদ্বয়, উজ্জ্বল নীল চক্ষু, গতিতে একটা সুন্দর লীলা ভঙ্গী, ক্ষুদ্র ললাটে চিন্তার রেখাটি অবধি পড়ে নাই, অপূর্ব্ব সুন্দরী এই রমণী—পুত্রের হাত ধরিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিল।

স্কুলের অধ্যক্ষের সহিত রমণীর কথাবার্ত্তা হইল। বালকটিকে স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিবার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত হইলে মোটা খাতা টানিয়া অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির নাম কি?"

"জ্যাক!"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "জ্যাক—! পদবী?"

রমণী কহিল, "ঐ জ্যাক, শুধু জ্যাক! এর ধর্ম্মপিতা ছিলেন ইংরাজ, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজ করতেন! ভারী বিখ্যাত লোক, নাম লর্ড পিমবক্! বোধ হয় শুনে থাকবেন! খুব সম্ভ্রান্ত বংশ! তেমনি নাচতেও পারতেন! এই ক'বছর হল ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরে মারা গেছেন! রাজার সঙ্গে তিনি বাঘ শিকার করতে গেছলেন! সিঙ্গাপুরের রাজা মস্ত রাজা, খুব বীরপুরুষ! নামটা—আহা ভুলে যাচ্ছি—বেশ মনে ছিল, এই যে, —রাম্মা—কি,—রাণা"—

অধ্যক্ষ কহিলেন, "ক্ষমা করবেন, জ্যাকের পদবীটা—?"

রমণী একবার বালকের মুখের দিকে চাহিল! জ্যাকের চোখ ছল-ছল করিতেছিল! 'মা' ছাড়া বালক কাহাকেও জানে না—মার সঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য সে কখনও ত্যাগ করে নাই! সে জানে, তাহাকে বোর্ডিংএ রাখিবার জন্য মা আজ আসিয়াছে! বাড়ীতে কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে সে কত মিনতি ক'রয়াছে, স্কুলে মাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না, মাকে দেখিয়া সে একমুহূর্ত্ত বাঁচিবে না—কিন্তু হায়, মা সে কথায় কান দেয় নাই! শেষে স্কুলে আসিবার সময় মা আশা দিয়াছেন, ছুটি হইলেই জ্যাক বাড়ী আসিবে,—মাও মধ্যে মধ্যে স্কুলে তাহাকে দেখিতে আসিবে—কিন্তু কাঁদিলে মা অত্যন্ত রাগ করিবে! তাই জ্যাক অনেক কষ্টে চোখের জলটুকু সামলাইয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বুড়া অধ্যক্ষের চোখে ধূলি দেওয়া সহজ নহে। এই স্কুলের কাজে তাঁহার মাথার কেশ শুভ্র হইয়াছে! আরো পারি সহরে সমাজ বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসের স্রোতে নরনারী গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে ভাল-মন্দ খুঁজিয়া পাওয়া দায়!

রমণীর বেশভূষা ও বাচালতা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে কেমন একটা সংশয় জাগিতেছিল। অধ্যক্ষ রমণীকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার মুখের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন, "তা হলে নামটা কি লিখব?"

বৃদ্ধের সহিত দৃষ্টি মিলিলে রমণী একান্ত সঙ্কুচিত হইল! তাহার গোলাপের মত গণ্ডদ্বয় গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। নিম্নদৃষ্টিতে

সে কহিল, "মাপ করবেন—পরিচয়টা দিতে ভুলে গেছলাম।" পকেট হইতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত কার্ড-কেস্ বাহির করিয়া তাহা হইতে একখানি সুন্দর কার্ড লইয়া রমণী অধ্যক্ষের হাতে দিল! তাহাতে পারিষ্কার ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল,—

"ইদা দে বার্ঁাস।"

অধ্যক্ষ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "নাম তা-হলে জ্যাক দে বার্ঁাসি?" বক্তার সুরে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মিশানো ছিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া রমণী কহিল, "নিশ্চয়!"

অধ্যক্ষ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তাই বলছি!"

কথাটা বলিয়া অধ্যক্ষ কার্ড হস্তে লইয়া উঠিলেন! সম্মুখের সাশি খুলিলেন। বাহিরে গাছপালাগুলার উপর তখন সূর্য্যের রশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সাশির পশ্চাতে একজন তরুণ শিক্ষক আসিয়া দেখা দিল।

অধ্যক্ষ কহিলেন, "দুকে, এই ছেলেটিকে একবার ওধারে নিয়ে যাও—চারিধার দেখিয়ে আনো।"

জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, মাতার সঙ্গ ত্যাগ করাইবার জন্য এ একটা ছল মাত্র। হতাশভাবে সে মার মুখের পানে চাহিল—তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল!

অধ্যক্ষ বুঝিলেন, মিষ্টস্বরে কহিলেন, "যাও জ্যাক, ভয় কি? তোমার মা ত এখনই যাচ্ছেন না—ঘুরে এস—ইনি এখানেই এখন আছেন!"

জ্যাক তবু নড়িতে চাহিল না—মার পানে চাহিয়া মার নিকট সে সরিয়া আসিল! মা বলিল, "যাও—জ্যাক, ছিঃ, লক্ষ্মী ছেলে, তুমি যে!"

কোন কথা না বলিয়া জ্যাক শিক্ষকের সহিত চলিয়া গেল! জ্যাক চলিয়া যাইলে কক্ষমধ্যে কাহারও মুখে অনেকক্ষণ কথা ফুটিল না। বাহিরে ছাত্রের দল খেলা করিতে-ছিল। তাহাদের উল্লাস-চীৎকার কক্ষমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল—দুই একটা পাখী ডাকিতেছিল, দূরে কে কাঠ কাটিতেছিল, সেই শব্দ এবং পিয়ানোর ঝঙ্কার সমস্ত মিলিয়া এক সুমধুর মিশ্র রাগিণীর সঞ্চার করিয়াছিল! এই শীতের যন্ত্রণাকাতর মুমূর্ষু মলিন রুদ্ধ দিন-গুলার মধ্যে ব্যগ্র জীবনের একটা স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইতেছিল!

অধ্যক্ষ প্রথমেই কথা কহিলেন—জ্যাকের শান্ত মধুর ভাবে তাঁহার হৃদয়ে মায়া পড়িয়া-ছিল—তিনি কহিলেন, "ছেলেটি আপনাকে বড্ড ভালবাসে!"

মাদাম বার্ঁাসির যেন চমক ভাঙ্গিল, কহিল,"তা আর হবে না! এত বড় পৃথিবীতে মা ছাড়া ওর কেউ নেই! আহা, বেচারা জ্যাক!"

"আপনি বিধবা?"

"হাঁ মশায়! আমার স্বামী দশ বৎসর হল মারা গেছেন! সে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু! যাঁরা উপন্যাস লেখেন তাঁরা কল্পনার চোখে কত দুঃখ-যন্ত্রণা দেখেন—কিন্তু তাঁরা জানেন না, আমাদের এই সাদা-সিধা জীবনে কি সব অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা থেকে তাঁদের দশখানা উপন্যাসের খোরাক জোগান যেতে পারে। আমার নিজের জীবনই তার এক কি ভীষণ পরিচয়! আমার

স্বামী কাউন্ত দে বার্সাসি তুঁরের এক কত বড় বংশের—”

অধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিলেন! কাউন্ত দে বার্সাসি! আশ্চর্য্য! অসম্ভব! তাঁহার সংশয় বাড়িল—মনের ভাব চাপিয়া তিনি কহিলেন, “তবে এই অল্প বয়সেই ছেলেটিকে স্কুলে দিচ্ছেন কেন? এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, তা ছাড়া আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারে না সে! এ বিচ্ছেদ ওর সহ্য হবে কি?”

রমণী কহিল, “আপনি ভুল কচ্ছেন, মশায়! জ্যাক এ দিকে তেমন অবুঝ নয়; তা ছাড়া ওর শরীর ভাল, অসুখ-বিসুখ নাই বললেই হয়! একটু রোগা—তা এ পারি সহরের বদ্ধ বায়ুতে সেটা শোধরান অসম্ভব!”

অধ্যক্ষ কহিলেন, “আরো তা ছাড়া আমাদের বোর্ডিংএ এখন এত ছেলে রয়েছে যে, নূতন ছেলে নেওয়া সম্ভব নয়! আর বছর সুবিধা হতে পারে—কিন্তু তার জন্যও আমি এখন থেকে কথা দিয়ে রাখতে পারি না অবশ্য!”

রমণী ইঙ্গিতটি অল্প বুঝিল। কহিল, “তা হলে আমার ছেলেকে আপনারা রাখবেন না! তার কারণ শুনতে পারি কি?”

অধ্যক্ষ বাহিরের দিকে একবার চাহিলেন—পরে স্থির অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, “দেখুন, কারণটা না বললেই ভাল হত—তবু যখন শুনতে চাচ্ছেন, তখন বলতে পারি, কিন্তু না শুনলেই ভাল হয়, কারণ শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন ছাড়া—”

রমণীর মুখ ক্ষোভে রোষে লাল হইয়া উঠিল! অধ্যক্ষের মুখের দিকে সতেজে সে চাহিল। অধ্যক্ষ বলিতে লাগিলেন,—কথাগুলা শুনিয়া রমণী একান্ত কাতর হইয়া পড়িল—লজ্জায় দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিল! হতভাগিনী! সত্যই সে হতভাগিনী! কেহ জানে না, এই দুর্ভাগা পুত্রের জন্য সে কি দুঃখই না সহ্য করিয়াছে!

হাঁ, সত্য! এ কথা খুবই সত্য! সত্যই বালকের কোন পদবী নাই! পিতা নাই,—ছিল না! কিন্তু এ কি তাহার পাপ? পিতামাতার পাপের ভার মাথায় বহিয়া—সারা জীবন তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিবে, সে এমনই দুর্ভাগ্য! রমণী কাঁদিয়া কহিল, “মশায়, দয়া করুন—বেচারাকে একটু দয়া করুন! নিষ্ঠুর হবেন না!” সে স্বরে কি গভীর নিরাশা, কি মর্ম্মভেদী অনুতাপ!

অধ্যক্ষ ব্যথিত চিত্তে কহিলেন, “শান্ত হন আপনি!”

কিন্তু কথাটা চাপা দিবার নহে! অধ্যক্ষ জানিতেন, তুঁরের এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশ কি কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত! সে এক সুগভীর পাপের দীর্ঘ ইতিহাস! দে বার্সাসি পরিবারের প্রতিবেশী এই অধ্যক্ষের সব কথা আজ নূতন করিয়া মনে পড়িয়াছিল! তিনি উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন!

রমণীকে সান্ত্বনা দিবারও কোন কথা নাই! তবু তিনি কহিলেন, “এ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আছে! আপনি সন্তানের মাতা—গৃহটিকে পবিত্র করুন—জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতা ত্যাগ করে নূতন মানুষ হতে চেষ্টা করুন—এ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিছু না! কিছু না! ছেলেকে মানুষ করুন!”

রুমালে চোখের জল মুছিয়া রমণী কহিল, "আমার জীবনের ব্রতই তাই, মশায়! জ্যাক এখন বড় হয়েছে—বেচারা এ সব কিছু জানে না, তাই আমি ওকে দূরে রাখতে চাই! আপনাদের সঙ্গে থেকে, আপনাদের কাছে শিক্ষা পেয়ে ও মানুষ হয়, এই আমার ইচ্ছা! আজ আপনারা যদি ওকে স্থান না দেন, নানা ছলে তাড়িয়ে দেন, তবে কোথায় ওর স্থান—কোথায় ওর মানুষ হবার সম্ভাবনা থাকে?"

অধ্যক্ষ সে কথাটাও ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন! হতভাগা বালক! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, বিকচোন্মুখ পুষ্পের মত অমল শুভ্র তাহার এই নবীন জীবন বিধাতার এই অমূল্য দান অনাদরে অবজ্ঞায় ধূলায় লুটাইবে!

তিনি কহিলেন, "আমি ছেলেটিকে নিতে রাজী আছি, কিন্তু দুটি সর্ত্ত আছে!"

আশায় উৎফুল্লা রমণী কহিল, "কি, বলুন?"

"প্রথম, যতদিন আপনার জীবনের গতি না শোধরায়, ততদিন জ্যাক আপনার বাড়ীতে যেতে পাবে না—ছুটির সময়ও সে এখানে আমাদের সঙ্গে থাকবে।"

"কিন্তু আমাকে না দেখে ও যে মরে যাবে! আহা জ্যাক—ও যে আমাকে ছেড়ে কখনো কোথাও থাকেনি—এই প্রথম—"

"আপনি এখানে মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে পারেন—কিন্তু আমার ঘরে আমার সামনে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে—অন্য কোন ঘরে নয়, আর কারো সামনে নয়!"

রমণী শিহরিয়া উঠিল! যখন ছুটির সময় অপর পিতা-মাতা আসিয়া পুত্রগণকে আদর করিবে, তাহাদিগের সহিত কত কথা কহিবে—সে তখন আসিতে পাইবে না—আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া অপরের ঈর্ষা উদ্রেক করিবে না! জ্যাকই বা কি মনে করিবে? কি সে লজ্জা—কি সে অপমান! ইদা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সারা প্যারির সম্ভ্রান্ত নরনারীর চিত্তে আপনার ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখাইয়া যে ঈর্ষা জাগাইতে পারিবে না—এ দুঃখ একান্ত অসহ্য!

রমণী কহিল, "এ যে বড় নিষ্ঠুর সর্ত্ত! এ আমি কি করে সহ্য করব—বিশেষতঃ নারী আমি, মা আমি! আমার ছেলেই বা কি মনে করবে?"

সেই সময় খোলা সার্শির পশ্চাতে পুত্রকে দেখিয়া ইদা চুপ করিল; পুত্রকে কক্ষে আসিতে ইঙ্গিত করিল। জ্যাক নিকটে আসিল। হাসিয়া মার অঙ্গ ঘেঁসিয়া সে কহিল, "বাঃ, তুমি এখনো আছ, মা! ওরা বলছিল তবু কিন্তু আমি মনে করেছিলুম তুমি চলে গেছ!"

জ্যাকের ছোট হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পুত্রের অধরে চুম্বন করিয়া ইদা কহিল, "না বাবা—চল আমরা বাড়ী যাই! এঁরা আমাদের এখানে রাখবেন না!" কথাটা বলিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল! পিঞ্জরের পাখীকে মুক্ত করিয়া দিলে সে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই স্নেহহীন পরুষ কঠিন স্কুলগৃহে থাকিতে হইবে না জানিয়া জ্যাকের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তেমনই আনন্দে ভরিয়া উঠিল! এত আনন্দের মধ্যেও অধ্যক্ষ যখন ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে কহিলেন,

"আহা, বেচারা ছেলেটি," তখন জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল!

বেচারা! সে বেচারা! কেন?

কথাটা তাহার অন্তরের মাঝখানে একটা দাগ কালীর রেখা গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিল।

অধ্যক্ষ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন!

এই মাদাম দে কাউন্তেস দে বার্গাসি সত্যই এক ছদ্ম নাম! এই রমণী মাদাম বার্গাসি নহে—ইদাও তাহার প্রকৃত নাম নয়! কে তবে এই রমণী? কি গভীর রহস্যের জাল এই রমণীর চারিধারে বিস্তারিত রহিয়াছে। কেহ তাহার পরিচয় জানে না। বিলাসিনী চরিত্রহীনা এই রমণীর দুর্ভেদ্য অতীত রহস্যের এ পর্য্যন্ত কেহ কোনরূপ একটা মীমাংসা করিতে পারে নাই! এক একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট উল্কাপিণ্ড যেমন অন্ধকারের মধ্যে সহসা দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে জ্বলিয়া পৃথিবীর অঙ্গে ঝরিয়া পড়ে, এ যেন তাহাদেরই মত সহসা পারি সহরের বুকের মধ্যে কোথা হইতে ঠিকরাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে!

গাড়ীতে মাতাপুত্রে অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না! সহসা জ্যাক ডাকিল, "মা!"

ইদা কহিল, "কেন, জ্যাক?"

"কথা কচ্ছনা কেন, তুমি?"

ইদা কহিল, "জ্যাক, জ্যাক, তোর জন্য আমার কি কষ্ট, তা তুই জানিস্ না! যেদিন থেকে তুই এসেছিস্, সেদিন থেকে কি যাতনা পাচ্ছি. আমি—।" ইদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল! জ্যাকের মুখে বিষাদের কালো ছায়া পড়িল—সে মুখ তুলিয়া কহিল, "আমি ত কিচ্ছু করিনি, মা।"

জগতে জ্যাক শুধু এক জনকে জানে, এক জনকে ভালবাসে—সে এক জন আর কেহই নহে, তাহার মা! সেই মার মনে সে ব্যথা দিয়াছে! জ্যাকের বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল—সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! মাতার প্রাণ এ দুঃখে স্থির রহিল না। ইদা বলিল, "ছিঃ, দুষ্টু ছেলের মত কাঁদে কি? আমি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিলুম যে! ছিঃ, চুপ কর—সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার! তোমাকে পেয়ে আমি বড় সুখে আছি! আর কে আমার আছে জ্যাক? আমারই দোষ—তুমি কিছু জানো না—ফুলের মত সুন্দর পবিত্র তুমি!"

জ্যাককে বুকের মধ্যে টানিয়া ইদা বার বার তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিল। অত্যধিক আদরে জ্যাকের সকল কষ্ট, সকল দুঃখ, নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল! জ্যাক মার বুকে মুখ রাখিয়া আনন্দ-গদ্গদ স্বরে ডাকিল, "মা—মা!"

গাড়ী আসিয়া বাটীর দ্বারে লাগিল। দাসী কন্স্তা ছুটিয়া আসিল। জ্যাককে দেখিয়াই সে তীব্রস্বরে কহিল, "এ কি তুমি ফিরে এসেছ! ভারী দুষ্ট হচ্ছ, তুমি! পাহারালা দিয়ে তোমাকে স্কুলে পাঠাতে হবে। আর মাও ত কিছু বলবে না, খালি আদর দেবে"।

ইদা কহিল, "না, না কন্স্তা, ওর দোষ নেই! তারা ওকে নিলে না, বুঝতে পাচ্ছ কথাটা! এতদূর অপমান করতে স্পর্দ্ধা হল তাদের!"

ইদার চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

সে মনে মনে ভাবিল, "আমি কি অপরাধ করেছি, ভগবান, যে এত দুঃখ দিচ্ছ!"

কঁস্তা জ্যাককে বুকের কছে টানিয়া কহিল, "ওঃ—স্কুলে নিলে না, তাতে কি? আরও স্কুল ত আছে! আস্কারা দেখনা, একবার! এই ড়িক বলছিল, ও আগে যেখানে কাজ করত, সেদিন সেখান কারমনিবদের ছেলে একটা স্কুলে পড়ে,—খাসা স্কুল, মাহিনাও কম নেয়! সেই স্কুলের খোঁজ নিচ্ছি আমি, দাঁড়াও ত!"

ইদা বলিল, "সে দেখা যাবে, কাল ভেবে! এখন খাবার দাও; জ্যাকের খিদে পেয়েছে; অনেকক্ষণ খায়নি, আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে। জ্যাক!"

"মা" বলিয়া জ্যাক মার নিকট আসিল। মা জ্যাকের মুখে চুম্বন করিয়া আবার ডাকিল, "জ্যাক!"

"কেন, মা?"

"জ্যাক! বাবা—"

ইদা দুই হাতে জ্যাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার মুখে কথা ফুটিল না! সে ভাবিতেছিল, পাপ কি এমনই গুরুতর যে ইহজগতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই! আর এই সুন্দর অবোধ বালক, সে কেন অপরের জন্য কষ্ট পায়! সে ত নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, তবু এমনই মানুষের বিচার, এমনই তাহার ন্যায়ের তৌলদণ্ড! জ্যাক মার দেহের উপর ভর দিয়াছিল—সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল— অল্প তন্দ্রাও আসিতেছিল, তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল, মিষ্ট শান্ত স্বরে কে বলিতেছে, "আহা বেচারা—বেচারা ছেলেটি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন স্কুল।

পারি সহরের এক প্রান্তে কতকগুলা জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকার পশ্চাতে একটা সরু গলি বাকিয়া গিয়াছে। সেই গলির মধ্যে কুটিরগুলিতে কুলি, সহিস, কর্ম্মান্বেষী ভৃত্য সম্প্রদায়, দরজী ও শ্রমজীবিগণের বাস। সকালে সন্ধ্যায় কুশ্রী কদাকার বালকগুলার খেলার দাপটে ভদ্রলোকের পক্ষে সে পথে চলা দায় হইয়া উঠে। বড় গাড়ী সে গলির পথে চলিতে পারে না, এবং এ পথে আসিবার প্রয়োজনও কখনো ঘটিয়া উঠে না।

এমনই গলির মধ্যে 'মরোভাঁ জিমনেজ' স্কুলগৃহ। বাটীটি যেমন জীর্ণ, অধিবাসীগণের জীবনেও তেমনই একটা বিকট জীর্ণতা বিরাজ করিত। প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় যখন নানাবেশধারী শীর্ণকায় কুৎসিত বালকের দল তাড়াইয়া স্কুলের অধ্যক্ষ গৃহে ফিরিতেন, তখন তাঁহাদের চালচলনে দর্পের যথেষ্ট আবরণ থাকিলেও ভিতরকার দৈন্যটুকু কিছুতে ঢাকা পড়িত না। কিন্তু পল্লীর মধ্যে সে দৈন্য বুঝিবার লোক ছিল না, ইহাই ছিল সুখের কথা! মাদাম বারাঁসি যদি স্বয়ং আসিয়া এ স্কুলগৃহ প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে বেচারা জ্যাক এই অন্ধকার গহ্বরে কখনও নিক্ষিপ্ত হইত না! কিন্তু জ্যাককে লইয়া ইদা এখানে আসে নাই, জ্যাকের সঙ্গে আসিয়াছিল, দাসী কঁস্তা!

বহির্দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল! সহসা দিবা দ্বিপ্রহরে সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া অধ্যক্ষ মরোভাঁ বিস্মিত হইয়া গেল! সে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইল! "এ কি স্বপ্ন! কিন্তু না, ঐ

যে দ্বারে আবার কে করাঘাত করে! চাবির গোছা লইয়া মরোভাঁ দ্রুত দ্বারের অভিমুখে চলিল!

দ্বার মুক্ত হইলে কঁস্তাঁ ও জ্যাক ভিতরে প্রবেশ করিল।

নদীতে জোয়ার আসিলে ভিতরকার জল যেমন স্রোতের বেগে ফুঁপিয়া ফুলিয়া উঠে সারা স্কুল গৃহ তেমনই একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। "ড্রয়িং রুমে আগুন আনো" শব্দে স্তব্ধ স্কুলগৃহ কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক ও কঁস্তাঁকে মরোভাঁ ড্রয়িং রুমে আনিয়া বসাইল! একটি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি বালক আসিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল!

দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল! বহুদিন পরে জীর্ণ গৃহের সংস্কার হইলে চারিধারে যেমন একটা নূতন শ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সকলের মুখে তেমনই একটা আনন্দের উজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল।

কঁস্তাঁর সহিত মরোভাঁর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল! 'জিমনেজ্ মরোভাঁ'র নাম শুনিয়া ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয়, এই ভরসায় জ্যাককে মরোভাঁর তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্যই তাহার আগমন হইয়াছে!

ইদা কহিল, "চল, আমরা বাড়ী যাই।" (৭০ পৃঃ)

মাদাম মরোভাঁ অত্যধিক আত্মীয়তা দেখাইবার লোভে বলিয়া উঠিল, "ছেলেটির চোখদুটি ঠিক মার মত হয়েছে।"

জ্যাক একটা তিরস্কার-পূর্ণ দৃষ্টি মাদামের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "না, ও আমার মা নয়—ও ঝী!"

মাদাম মরোভাঁ নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, একটু সরিয়া গেল!

তখন দরদস্তর চলিল। মরোভাঁ কহিল, "এখানে বেশী ছেলে নেওয়া হয় না। সংখ্যা বাড়িলে তদ্বির হয় না—শিক্ষার

ব্যাঘাত হয়! এখানে মন ও শরীর দুয়েরই শিক্ষা দেওয়া হয়! সে জন্য দরটাও কম নেওয়া কঠিন—বছরে একশ' কুড়ি পাউণ্ড দিতে হয়,—তা ছাড়া কাপড়-চোপড় যা লাগে!"

তার পর স্কুলের অপূর্ব্ব পরিচয়ও দেওয়া হইল। উচ্চারণ দুরস্ত এবং আদব-কায়দা শিখাইবার জন্য এমন স্কুল আর দুইটি নাই! আর স্নেহ-যত্ন, ছাত্রেরা স্কুল গৃহটিকে বাড়ীর মতই মনে করে! মরোভাঁ কহিল, "এক রাজপুত্র এখানে পড়ছে!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কঁস্তাঁ কহিল, "রাজপুত্র?"

মরোভাঁ কহিল, "হাঁ, রাজপুত্র! বুঝলে জ্যাক, রাজার ছেলের সঙ্গে তুমি পড়বে এখানে! দাহমির রাজপুত্র! যাহ যখন সে রাজ্যের রাজা হবে, তখন এখানকার শিক্ষার জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে!"

কথাটা শুনিয়া জ্যাক একটু আনন্দিত হইল! রাজপুত্র! মার কাছে সে কত পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছে। রাজপুত্রকে দেখিবার জন্য তাহার কত ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু কখনও দেখা মিলে নাই, এখানে সেই রাজপুত্রের সহিত সে একত্র পড়িবে! না জানি, কোন্ পরীকন্যার স্নিগ্ধ সরস প্রেমের সুন্দর নির্ম্মল ধারায় অভিষিক্ত এই রাজপুত্রের হৃদয়টুকু!

কঁস্তাঁ বলিল, "তা হলেও মশায়, একটি ছোট ছেলের জন্য বছরে এত পাউণ্ড!"

মরোভাঁ বাধা দিয়া বলিল, "তার জন্য তাড়া কি? বছরে দু খেপে দিলেই হবে!"

কিন্তু তাড়া যথার্থই ছিল!

সমস্ত বাটিটি এক করুণ সুরে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল। ভগ্ন টেবিল-চেয়ার, জীর্ণ দেওয়াল, ছিন্ন, মলিন কার্পেট, মরোভাঁর দারিদ্র্যজীর্ণ বিশ্রী পোষাক, অর্দ্ধপূর্ণ প্লেট, দারুণ দুঃখে আশ্রয় মাগিতেছিল। এ দৈন্য ঘুচিবার উপায়ও ছিল না! যেমন করিয়া হউক, যেখান হইতে হউক, চাই, চাই, সাহায্য চাই, ভিক্ষা চাই!

এই জীর্ণ গৃহ, শিক্ষকগণের দীন মলিন বেশ, চারিধারে এই বিষম নিরানন্দ ভাব দেখিয়া জ্যাকের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল! তাহার বারবার মনে পড়িতেছিল, সেই স্কুলবাড়ীর কথা—যেখানে মার সহিত সে দিন সে গিয়াছিল! শিক্ষকগণের প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখ, সুন্দর সজ্জিত বাড়ীখানি, সঙ্গী-ছাত্রগণের মুক্ত স্বচ্ছ আনন্দকোলাহল, সে কি মধুর! সে কেন সেখানে রহিল না?

মরোভাঁ তখন বাঁধানো মোটা খাতা লইয়া লিখিতেছিল। কঁস্তাঁ পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে জ্যাকের দিকে চাহিতেছিল। মাদাম মরোভাঁ কঁস্তাঁর কথা শুনিতে শুনিতে বলিতেছিল, "আহা বেচারা, বেচারা ছেলেটি!"

"বেচারা ছেলেটি!" ইহারাও বলে, সেই কথা! সে কি করিয়াছে যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর নিকট সে এত করুণার্হ হইয়া পড়িয়াছে! এ অযাচিত করুণা, এ অনাহুত সহানুভূতি জ্যাক চাহে নাই! তবু কেন এ বিড়ম্বনা?

কঁস্তাঁ পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া মরোভাঁর হাতে দিল। চারিধারে শিক্ষকগণের চক্ষু হইতে একটা আগ্রহের

অধীর দৃষ্টি নোটগুলার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। কঁস্তাঁর সহিত শিক্ষকগণের পরে আলাপ হইল! আচর্য্য লাবাদ্যাঁদ্র সঙ্গীত-শিক্ষক! ডাক্তার হার্শ সঙ্গীত এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—মুখখানা কুকুরের মত দীর্ঘ, কুশ্রী ক্ষুদ্র চক্ষু চশমার আবরণে মণ্ডিত, শীর্ণ দেহ! আর্জেন্ত ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি, নিভৃতে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—সাহিত্যের অধ্যাপক!

দলের মধ্যে যদি দেখিতে কেহ সুশ্রী থাকে, তবে সে এই আর্জেন্ত! কিন্তু ইহাকে দেখিয়া জ্যাকের বুক যেন কাঁপিয়া উঠিল! আর্জেন্তর চোখের ভিতর যেন হিংসার একটা তরল প্রবাহ বহিতেছে,—জ্যাকের মনে হইল, যেন এ কোন্ ভীষণ শত্রুর সম্মুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে!

হায়! জীবনের কত দুর্দ্দিনে তাহাকে এই আর্জেন্তর চোখের বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে—সুদূর ভবিষ্যৎ যেন একটি বিদ্যুৎ-চমকের মত জ্যাকের সমস্ত অন্তর চিরিয়া ছুটিয়া বহিয়া গেল!

জীবনকে মনের বাতায়ন বলিয়া কবিরা কল্পনা করেন, কিন্তু আর্জেন্তর এই রুদ্ধ বাতায়নের অন্তরালে হৃদয় নামক পদার্থ টার কোন সন্ধানই পাওয়া যাইত না!

মরোন্তাঁ জ্যাকের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিলেন, "তাহলে এসো, জ্যাক!"

কঁস্তাঁ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া জ্যাকের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল! কঁস্তাঁর প্রতি তাহার এতটুকু অনুরাগ ছিল না, কিন্তু তবু জ্যাকের মনে হইতেছিল, কঁস্তাঁ বাড়ী যাইবে,—সেই বাড়ী,—যেখানে তাহার মা আছে, কত আদর স্নেহের সম্ভার লইয়া মা বসিয়া আছে, কঁস্তাঁ সেই মার কাছে ফিরিয়া যাইবে—কিন্তু মার কাছে যাইবার তাহার আজ কোন উপায় নাই! সে স্নেহ-ভরা ভবনের দ্বার তাহার সম্মুখে আজ রুদ্ধ! সে আনন্দ উল্লাসের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ফুরাইয়াছে! সে যদি জ্যাক না হইয়া কঁস্তাঁ হইত! আহা! এখানে মিষ্ট কথা বলিতে কেহ নাই, আদর করিতে কেহ নাই! বিচারকের অপ্রসন্ন অকরুণ মুখ এখানে! ভালবাসা নাই, স্নেহ নাই!

জ্যাক কঁস্তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, "কঁস্তাঁ, মাকে আসতে বলো"—

"তা বলবো—মা আসবেন, কিন্তু তাই বলে তুমি কেঁদোনা, জ্যাক!"

জ্যাকের চোখে বাণ ডাকিয়াছিল—কিন্তু এতগুলা লোক ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ইহাদের বিদ্রূপ ও হীন কৌতুকের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিবে, এ কথা মনে হইতেই সে আপনাকে সামলাইয়া লইল। কঁস্তাঁ চলিয়া গেল।

বাহিরে তখন অবিশ্রাম তুষার-বর্ষণ হইতেছিল।

মরোন্তাঁ আইন পাশ করিয়াছিল। নিত্যই সে আদালতে যাইত, কিন্তু মক্কেলের সহিত তাহার কখনও সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়া উঠিত না! একদিন সহসা এক মক্কেল আসিয়া মরোন্তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কাগজপত্র ও বক্তব্য ঠিক করিয়া হাকিমের সম্মুখে উঠিয়া সে যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিল, তখন

হাকিম ও সহযোগী উকিলেরা মিলিয়া অদ্ভুত-পূর্ব্ব কৌতুকে হাসিয়া এমনই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরদিন হইতে আদালতের ভূমি স্পর্শ করিতে বেচারা মরোভাঁর সাহসে কুলায় নাই! তার পর সে সহসা একদিন সাহিত্যিক হইয়া উঠিল! কিন্তু পারিতে সাহিত্যসেবা দ্বারা নাম বা অর্থ উপার্জ্জন করা নিতান্তই কঠিন দেখিয়া সে পথও বিষম দুঃখে বেচারা ত্যাগ করিল! তখন একটা ছোট স্কুলে শিক্ষকতা জুটিল!

একদিন সে ডিকষ্টার বংশের তিন ভগ্নীর পরিচালিত এক স্কুলে আসিয়া শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিল এবং কনিষ্ঠটির প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিল। বিবাহের পর অপর দুইটি ভগ্নী স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করিলে মরোভাঁ ও মাদাম মরোভাঁই স্কুলের সত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইল। স্কুলের নাম হইল, জিমনেজ্ মরোভাঁ। ক্রমে তাহারা জীর্ণ দেওয়ালে রঙ ফিরাইয়া, বিজ্ঞাপনের জমক লাগাইয়া স্কুলের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিল। মরোভাঁর কয়েকটি পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু—কবি বৈজ্ঞানিকের দল আসিয়া যোগ দিল। জানজিবার, মরক্কো, প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণ বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া জিমনেজে আসিতে লাগল! কিন্তু জিমনেজের পরিচয় যখন একটু প্রসারিত হইল, তখন ছাত্রের দল আবার কমিতে লাগিল। কমিয়া শেষে আটটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। এই আটটি ছাত্র লইয়া স্কুল যখন আর চলিতে চাহে না, এমনই দুর্দ্দিনে জ্যাক আসিয়া মুমূর্ষু স্কুলে নবজীবনের সঞ্চার করিল!

মরোভাঁ কহিল, "নূতন ছেলের খাতিরে আজ ছুটি! রাত্রে ভোজ!" করতালি ও আনন্দধ্বনির সহিত সকলে নূতন ছাত্রের শুভ কামনা করিল!

সে রাত্রে আলোকের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল্য ও আহারের প্রাচুর্য্য ঘটায় স্কুলগৃহে যে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল, তাহার স্পর্শে বহুদিন সঞ্চিত দৈন্যের কালিমা নিমেষে ঝরিয়া গেল! জিমনেজ-বাসী বহুদিন এমন আহার, এমন আনন্দের স্বাদ পায় নাই! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারত ও বিলাত।

(বিলাত-প্রবাসীর পত্র।)

১৮। সভ্যতা ও অসভ্যতা।

যতদিন না মানব সমাজের একটা সার্ব্বভৌমিক ইতিহাস রচিত হইতেছে, ততদিন আমরা কিছুতেই সাচ্চা সভ্যতা বা অসভ্যতার একটা সঠিক মাপকাটি তৈয়ার করিতে পারিব না। ফলতঃ আজি পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই সভ্যতা বলিতে প্রত্যেক জাতি বা সমাজ আপনার বিশেষ সাধনা, বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য, বিশেষ রীতি নীতি, এ সকলই বুঝিয়া থাকেন। বিলাতী সভ্যতা বলিতে

বিলাতের নিজস্ব যে সাধনাটুকু তাই সকলে বুঝিয়া থাকেন; আর বিলাতের লোকেরা যখন অপর কোনো দেশের লোকদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলিয়া থাকেন, তখন তাঁরা এই নিজেদের বিশেষ সাধনাটুকুর দ্বারাই সেই সকল দেশের লোকের সাধনাদির ওজন করেন। ইংরেজ যখন আমাদিগকে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বলেন বা ভাবেন, তখন মূলতঃ তিনি কেবল এই মাত্রই সপ্রমাণ করিয়া থাকেন যে আমরা ইংরেজ নহি। য়ুরোপ যখন আসিয়াকে অসভ্য বলে, তখনো কেবল আসিয়া যে য়ুরোপ নয়, য়ুরোপের মত চলে বলে না, কেবল ইহাই প্রমাণ করে। তাই যখনই আমরা ইংরেজের মত চলিতে বলিতে আরম্ভ করি, ধুতি চাদর ছাড়িয়া যেদিন আমরা কোট প্যাণ্টালুন পরিতে আরম্ভ করি, আসন মাদুর দূর করিয়া যখন কোচ কেদারা ব্যবহার করিতে শিখি, ইংরেজের মত টেবিলে বসিয়া কাটা চামচ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করি,—নিজেরা সাহেব সাজি, মেয়েদের বিবি সাজাই—তখনই ইংরেজ আমাদের সভ্যতার দাবিটা সম্পূর্ণরূপে না হউক, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া লইতে রাজি হন। জাপান এতদিন সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। আর সে বেশি দিনেরো কথা নয়। কিন্তু আজ য়ুরোপীয় লোকেরা জাপানকে আপনাদের সভ্যসমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহার কারণ এই যে জাপান আপনার চাল-চলন, ধরণ ধারণ, পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকটা য়ুরোপীয়ের মত করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এমনো কথা উঠিয়াছিল যে জাপান প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্মকে আপনার রাষ্ট্রধর্ম্ম বা ষ্টেট রিলিজান State religion করিবে কি না! এ সমস্যার মীমাংসায়ও নিযুক্ত হইয়াছিল। দশ পনেরো বৎসর পূর্ব্বে জাপানের নেতৃবৃন্দ খৃষ্টধর্ম্মের দিকে একান্তভাবেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, এমনো শোনা যায়। সে ভাবটা অনেক পরিমাণে বোধ হয় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অপরাপর বিষয়ে জাপান যে য়ুরোপীয়ের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াই, আপনার সভ্যতার দাবিটি পাকাইয়া তুলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। জাপান যাঁদের নিকট একদিন সভ্যতার ক, খ, শিখিয়াছিল, যাঁরা জাপানকে ধর্ম্ম দিয়াছে, কর্ম্ম দিয়াছে, রীতি দিয়াছে, নীতি দিয়াছে, ভাব দিয়াছে, লিপি দিয়াছে, তাদের সভ্যতার দাবি যে য়ুরোপ ও আমেরিকা কিছুতেই মানিতে রাজি নহে, সেই য়ুরোপ ও আমেরিকাই আজ মুক্তকণ্ঠে জাপানের সভ্যতাকে স্বীকার করিতেছে ও জাপানের সঙ্গে কেবল ব্যবসায় বাণিজ্যে নহে, শিল্পসাধনাতেও মুক্তভাবে আদান প্রদানের সম্বন্ধ পাতাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপান য়ুরোপের মত হইয়া, য়ুরোপীয় সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকা আপনার বিশেষ সাধনাটুকুকেই, আপনার রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার, আপনার শিল্পসাহিত্যটুকুকেই, সভ্যতার একমাত্র মাপকাটি বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

কেবল য়ুরোপই যে আজ এরূপ করিতেছে তাহা নহে। প্রাচীন কাল হইতেই এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে। গ্রীসীয় ও রোমকেরা আপনাদিগকেই জগতে একমাত্র সাচ্চা সভ্যতার অধিকারী বলিয়া ভাবিত,

অপর সকল জাতি তাদের চক্ষে অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল। ইহুদিরা আবার সেইরূপ আপনাদিগকেই জগতের একমাত্র আভিজাত-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ভাবিত, গ্রীসীয় ও রোমক পর্য্যন্ত তাহার চক্ষে হীন ও বর্ব্বর ছিল। গ্রীসীয়েরা অপর জাতিকে বর্ব্বর বলিত, ইহুদীরা তাহাদিগকে জেণ্টাইল বলিত। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা বোধ হয়, গ্রীসীয়, রোমক বা ইহুদ অপেক্ষা অনেকটা অধিক উদার ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উদার দৃষ্টিতেও আর্য্য ও অনার্য্য, হিন্দু ও ম্লেচ্ছের ভেদ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। গ্রীসীয়েরা যেমন তাঁহাদের সমাজের বহির্ভূত লোককে বর্ব্বর বলিত, ইহুদিরাও যেমন অপর সমাজের লোকদিগকে জেণ্টাইল বলিত, হিন্দুরাও সেইরূপ অহিন্দুদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেন। বর্ব্বর জেণ্টাইল, ম্লেচ্ছ, এ সকলই অবজ্ঞাসূচক শব্দ। আমরা আজিকালি যে অর্থে অসভ্য শব্দ ব্যবহার করি, প্রাচীনকালে এই সকল প্রাচীন সমাজের লোকেরা ঠিক সেই অর্থেই বর্ব্বর, জেণ্টাইল, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। আর প্রাচীনকালে যেমন লোকেরা যারা ঠিক তাদের মত নহে, যারা বর্ণে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, রীতিতে, নীতিতে, তাদের নিজেদের চাইতে ভিন্ন ছিল, তাহাদিগকে অসভ্য, বর্ব্বর, হীন ও হেয় বলিয়া ভাবিত, আজ আমরাও ঠিক সেই প্রাচীন পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি এবং আমাদের মত যারা নয়, তাহাদিগকে অসভ্য, বর্ব্বর, হীন ও হেয় বলিয়া ভাবিয়া থাকি। ইহা সভ্যতার সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়।

আর এই কথাটা যখন একটু তলাইয়া দেখি, তখন য়ুরোপ আমাকে যখন অসভ্য বা বর্ব্বর বলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে, তাহাতে আমি নিজে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। য়ুরোপ যখন আমাকে বর্ব্বর বা অসভ্য বলে, তখন আমি তার মত নই, কেবল এই সত্যটাই সে ব্যক্ত করে; ইহাতে আমার মাথা হেঁট করিবার তো কোনোই কারণ নাই। বরঞ্চ আমি যা আছি, তা না থাকিয়া, যদি আমার এই নিজস্ব প্রকৃতিকে য়ুরোপের পোষাক দিয়া ঢাকিয়, য়ুরোপের প্রকৃতির অনুরূপ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতাম, সে মিথ্যা চার্জ্জ আমার পক্ষে দুর্ব্বিষহ লজ্জা ও ধিক্কারের কারণ হইত। আমি যদি সত্য সত্যই য়ুরোপ অপেক্ষা ছোট হই, তাহাতেও কোনো লজ্জার কারণ নাই। এই ছোটত্বই আমার নিজস্ব, এই ছোটত্বেরই ভিতর আমার মহত্বকে পূর্ণ মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আমার স্বধর্ম। শকুনের মত বিপুল পক্ষ নাই বলিয়া কি দয়েল বা পাপিয়ার কোনো ক্ষোভের কারণ আছে? ছোট জুঁইফুল বড় স্থলপদ্ম নয় বলিয়া কি মরমে মরিয়া থাকে? জুঁইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব, তার জুঁইয়েত্বেই। স্থলপদ্মের শ্রেষ্ঠত্ব, স্থলপদ্মত্বে। দয়েল বা পাপিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব দয়েলত্বে বা পাপিয়াত্বে, শকুনিত্বে বা অন্য কোনো পাখীর নিজত্বে নহে। মনুষ্যের পক্ষেও তাই। জাতির পক্ষেও তাই। প্রত্যেক জাতির সাধনা ও সভ্যতা তার ভিতরকার প্রকৃতি হইতে ফুটিয়া উঠে। অপর জাতির সাধনা ও সভ্যতার সংস্পর্শে তার নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এই পরিপুষ্ট বস্তুটা ভিতরকার, বাহিরের নহে। মানুষ প্রতিনিয়তই বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে। সে ফলমূলাদিও আহার করিতেছে, পশুপক্ষীর মাংসাদিও ভক্ষণ করিতেছে। কিন্তু উদ্ভিদের রসে মানুষের রক্তমাংসই পরিপুষ্ট হয়, তার ভিতর হইতে অদ্ভুত উদ্ভিদত্ব ফুটিয়া বাহির হয় না, আর পশুপক্ষীর মাংস ভোজনে মানুষ কখনো বৃষভত্ব বা ছাগত্ব বা হংসত্ব কি কুক্কুটত্ব লাভ করে না। বাহির হইতে যা কিছু খাদ্যাদি আমরা গ্রহণ করি, সে সকলই আমাদের রক্তমাংসে পরিণত হইয়া যায়, যা রক্তমাংসাদিতে পরিণত হয় না, তাহা মূত্র-পুরীষাদিরূপে বর্জ্জিত ও বহিষ্কৃত হইয়া যায়। জাতীয় সভ্যতা বা সাধন সম্বন্ধেও সেই কথা। এক জাতি অপর জাতির সংস্পর্শে আসিলে, তাহাদের মধ্যে ভাব ও চিন্তা, জ্ঞান ও রসের আদানপ্রদান অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ আদানপ্রদানের দ্বারাই জগতের সভ্যতা ও সাধনা যুগে-যুগে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এরূপ আদানপ্রদানে যে সমাজ বা যে জাতি রাজি হয় না, তার সভ্যতা ও সাধনা ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও হীনবল হইবেই হইবে। ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী অনশন যেরূপ বল ও আয়ুক্ষয়ের কারণ হয়, জাতির পক্ষে এই আদানপ্রদানে ব্যাঘাতদানও ঠিক সেইরূপ জাতীয় শক্তির আয়ুক্ষয়ের হেতু হইয়া থাকে। জাতীয়তার নামে এইরূপ অনশনের ব্যবস্থা করিলে চলিবে কেন? কিন্তু আহারের সার্থকতা যেমন পরিপাকে, আর পরিপাকের সামর্থ্য যেমন জীবনী শক্তির উপর নির্ভর করে, সেইরূপ জাতীয় জীবনে এইরূপ আদানপ্রদানের সার্থকতাও আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিপাকে। এই পরিপাকের সামর্থ্যও জাতির জীবনীশক্তির উপর নির্ভর করে। আর এই জীবনীশক্তি তার নিজস্ব বস্তু, ভিতর হইতে ইহাকে ফুটাইয়া তোলা যায়, বাহির হইতে কখনো দেওয়া যায় না। যেমন আমি ফল খাই, মূল খাই, মাছ খাই, মাংস খাই, যা কিছু খাই না কেন, তাতে আমার পেশী, আমার অস্থি, আমার মজ্জা, আমার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যই ফুটিয়া ওঠে; এ সকলে আমার বিশেষত্বকে ফুটায়, কিন্তু নষ্ট করে না। সেইরূপ জাতীয় জীবনের আদান-প্রদানেও জাতির সাধনার ও সভ্যতার বিশেষত্বটুকুই ফুটাইয়া তুলিবে, তাহাকে নষ্ট করিবে না।

আর আমার সভ্যতা ও সাধনার একটা বিশেষত্ব আছে, আমি আর কারো মত নই, আমার জাতিও অপর কোনো জাতির মত নহে; আমি ছোট হই, বড় হই,—আমি আমি, আমার ছোটত্ব, বড়ত্ব, লঘুত্ব, ভারিত্ব সকলই আমার, এই জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিয়াই, তুমি আমাকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলিলে আমার গায়ে লাগে না। আমি আমাকে জানিয়াছি, আমি আত্মাকে পাইয়াছি, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়াছি, আমার ভালো ও আমার মন্দ, আমার বল ও আমার দুর্ব্বলতা, আমার আদর্শ ও আমার আয়ত্ত, উভয়ই আমার চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তোমার ওজনে আমি আর আমার নিজের মাপ করিতে চাই না। তাই বলিয়া য়ুরোপ যখন আমাকে বর্ব্বর বলে, তাহাতে আমার লজ্জা হয় না, ক্রোধেরও সঞ্চার হয় না। সত্য

অভিযোগেই কেবল লজ্জার কারণ হয়; আর লোকসমাজে ধিকৃত হইতেছি বলিয়াই সে লজ্জা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। মূলে যখন তোমার বিচারের মাপকাঠীই মানিতে রাজি নই, তখন তোমার অভিযোগ বা নিন্দাবাদ আমার গায়ে লাগিবে কেন?

১৯। সভ্যতার লক্ষণ।

তবে কি সভ্যতা ও অসভ্যতা এই কথা দুটার কোনো মানে নাই? এ কি কেবল গজকচ্ছপের কলহ! এমন কি কোনো সাধারণ লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা কে সভ্য কে অসভ্য ইহার বিচার করা যাইতে পারে? আছে বৈ কি? সে লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাসের আলোচনা করা আবশ্যক। অতি আদিম কাল হইতে কিরূপে মানুষ ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে, পশুত্ব ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখা চাই। এই ভাবে যখন সভ্যতার একটা সাধারণ ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারিব, তখনই এই সভ্যতা কাকে বলে, ইহার সাধারণ লক্ষণ কি, ইহার মূল প্রকৃতি ও চরমতম লক্ষ্যই বা কি, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব হইবে। আর তখনই কেবল আমরা মানবীয় সভ্যতার সত্যকার মাপকাঠীটা খুঁজিয়া পাইব।

মানুষ আজ যেমন আছে, এক দিন তেমনটি ছিল না। আজ সে ঘর বাড়ী বাঁধিয়া, গ্রাম নগর পাতিয়া বাস করিতেছে। একদিন এ সকলের কিছুই তার ছিল না। তখন তার বাসস্থান ছিল শ্বাপদসঙ্কুল বনজঙ্গল, তার ঘর বাড়ী ছিল বৃক্ষকোটর বা পর্ব্বত গহ্বর। খাদ্য ছিল অপক্ক ফলমূল কিম্বা আম মাংস। তখন সে পশুর মত চলিত ফিরিত, পশুর মত শীকার করিয়া বেড়াইত। পশুর মত যূথবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হইয়া, প্রকৃতির আশ্রয়ে বাস করিত। সে অবস্থা মানুষ বহুদিন ছাড়াইয়া আসিয়াছে। আর এই যে মানুষ ক্রমে পশুত্বের ভূমি ছাড়াইয়া, আমরা আজ যাহাকে মনুষ্যত্বের ভূমি বলিতেছি তাহাতে আসিয়া উঠিয়াছি, ইহাই তার উন্নতির, তার বিকাশের, তার সভ্যতার ও সাধনার ইতিহাস। সুতরাং এই ইতিহাসের দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে, সভ্যতারই ইতিহাস আর মনুষ্যত্বের ইতিহাস একই হইয়া যায়।

মানুষ একদিন পশুর মত ছিল, পশুরই মত চলিত ফিরিত। সে অবস্থায় তাহাকে সুসভ্য বলা যাইত না। এখনো যারা পশুর মতই আছে, পশুর মতই চলে ফিরে, তারা মানুষ হইলেও, সভ্যতার দাবি করিতে পারে না। কিন্তু পশুতে আর মানুষে পার্থক্য কোথায়? পশুর শরীর আছে, মানুষেরো শরীর আছে; শারীর ধর্ম্মও অনেকটা সমান। ক্ষুধাতৃষ্ণা ও জননেচ্ছা, এ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি মানুষে ও পশুতে সমান। সভ্য সমাজেও যারা একান্তভাবে এই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া চলে, তাহাদিগকে লোকে পশু বলিয়া গালি দিয়া থাকে। যারা এ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বশে আনিয়াছেন, মানুষ তাঁহাদিগকেই বিশেষভাবে ও বিশেষ অর্থে মনুষ্যত্বের অধিকারী বলিয়া মনে করে। প্রকৃতিকে বশে আনাই—মনুষ্যত্বের চিহ্ন। পশু প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলি,

কৃতি তাহাকে আপন ইচ্ছামত ঘুরাইয়া
কে। ইহাই পশুর পশুত্ব। পশু প্রকৃতির
। আর মানুষ প্রকৃতির এই দাসত্ব
টাইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তার মনুষ্যত্ব।
র যে পরিমাণে মানুষ প্রকৃতিকে আপনার
ন আনিয়াছে, সেই পরিমাণে তার মনুষ্যত্ব
টিয়া উঠিয়াছে, সেই পরিমাণে তার সভ্যতা
কাশ পাইয়াছে। যে দিন মানুষ বৃক্ষকোটর
পর্ব্বতগুহা ছাড়িয়া, আপনার ইচ্ছামত
দ্বার বাঁধিয়া আপনাকে ও আপনার
ন্তানসন্ততিকে শীতাতপাদি হইতে রক্ষা
বিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে দিনই সে
কৃতির নিগড় ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল।
ই দিন তার সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের আরম্ভ
। সেদিন হইতে যতই সে আপনাকে
কৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে
রিতেছে, ততই তার সভ্যতা বাড়িয়া
ঠিতেছে। ইহাই সভ্যতার সাধারণ লক্ষণ।

যুরোপীয়েরা এই লক্ষণ দ্বারাই
পনাদের শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার দাবিটা
সিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন।
বা নিসর্গের শক্তি সজ্যকে নিয়তই
পনাদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া, আপনাদের
ন্দিত সাধনে নিযুক্ত করিতেছেন; আমরা
বিষয়ে এখনো এতটা কৃতিত্ব লাভ করিতে
রি নাই। আমরা আমাদের খাদ্য
ৎপাদনের জন্য প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া
কি। বরুণ বারিবর্ষণ করিবেন, সূর্য্য
প সম্বরণ করিবেন, পতঙ্গাদি আমাদের
কশস্যের উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহা
ষ্ট করিয়া দিবে না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি
ইতে আমাদের কৃষি রক্ষিত হইবে,—
সকলের উপর আমাদের জীবিকা নির্ভর
করিতেছে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিকে উপেক্ষা
করিয়া কিরূপে প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন
করিতে পারিব, সে তথ্য আমরা শিখি নাই।
এইজন্য, প্রকৃতিকে আমরা বশীভূত করিতে
পারি নাই বলিয়া, আমরা অসভ্য। যুরোপ
রসায়ণ সাহায্যে এমন কৃষিকৌশল আবিষ্কার
করিয়াছে যে তাহাকে আর প্রকৃতির
খেয়ালের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না,
স্বেচ্ছামত, প্রয়োজনমত, আত্মচেষ্টায়, প্রতিকূল
প্রকৃতির নিকট হইতেও জোর করিয়া সে
আপনার খাদ্য কাড়িয়া লইতে পারে। এইজন্য
সে সভ্য। নিসর্গের শক্তি সমূহের উপরে,
বাহিরের প্রকৃতির উপরে; যুরোপ যে
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, তারই
বলে সে আসিয়ার প্রাচীন সাধনা ও সভ্যতার
অপেক্ষা আপনার আধুনিক সভ্যতা ও সাধনাকে
শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।
আপাতদৃষ্টিতে যুরোপের এ ছবিটাকে
একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও যায় না।

২০। প্রকৃতির প্রভুত্ব—
আসিয়া ও য়ুরোপ।

প্রকৃতির প্রভুত্ব হইতে মানবকে মুক্ত
করাই মানবীয় সাধনা ও সভ্যতার উদ্দেশ্য।
ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। যতদিন
মানুষ আপনাকে না প্রকৃতির হাত হইতে
ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন তার
সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের সূচনাই হয় না,—
ইহা মানিতেই হইবে; এ কথাও স্বীকার
করি। আর মানুষের এই স্বাধীনতার মাত্রার
দ্বারাই তার সভ্যতার মাপ করিতে হইবে,
ইহাও মানি। কিন্তু প্রকৃতির বশ্যতা হইতে
মুক্তিলাভ করিবার জন্য, যুরোপ যে পথটা

এমন তর করিয়া আজ ধরিয়াছে তা ছাড়া যে আর অপর পথ নাই, এই কথাটাই হঠাৎ মানিতে রাজি নই।

ফলতঃ য়ুরোপীয় সভ্যতা সত্য সত্যই কি মানুষকে মুক্ত করিতেছে? বর্ত্তমানে য়ুরোপ জড়বিজ্ঞানের যে অত্যদ্ভুত উন্নতি করিয়াছে, য়ুরোপীয় মনীষীগণ জড়জগতের নিগূঢ় নিয়মাদির যেরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, ও এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও নবাবিষ্কৃত শক্তি সকলকে যেভাবে আপনাদের ঈপ্সিতলাভার্থে নিয়োজিত করিতেছেন, য়ুরোপের এই সভ্যতার দাবির মূলে ইহাই রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল তত্ত্বের আবিষ্কারে, মানবের আর যতই কল্যাণ হউক না কেন তাহার দ্বারা যে সে প্রকৃতির আধিপত্য হইতে বিন্দু পরিমাণেও মুক্তিলাভ করিতেছে, ইহা বলা যায় কি না, সন্দেহের কথা। জড়তত্ত্বের আবিষ্কারে মানবীয় সভ্যতা বিকাশের সাহায্য করে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এই সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, য়ুরোপ মানবকে বহুল পরিমাণে অশেষপ্রকারের আধি-ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য এসকল অত্যাবশ্যক ইহা মানি। এসকল পন্থাকে বর্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষ আপনার পূর্ণতালাভে প্রচুর ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করি। কিন্তু এসকল জানিয়া শুনিয়া, এসকল পূর্ণমাত্রায় মানিয়া লইয়াও, এই প্রশ্ন করিতে চাই,—য়ুরোপ এই যে জড়বিজ্ঞানের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, ইহাতে সত্যভাবে, পূর্ণভাবে, মানুষকে প্রকৃতির আধিপত্য হইতে মুক্ত করিতেছে কি না? ও পথে এ মুক্তিলাভ আদৌ সম্ভব কি না? বিজ্ঞানের বলে য়ুরোপ প্রকৃতির উপরে, যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করে, তাহা ফলে আধিপত্য না দাসত্ব?

ভারত ও বিলাতের সভ্যতা ও সাধনার তুলনায় সমালোচনার সূচনাতেই আমি এই মূল প্রশ্নটাই তুলিতে চাই। ইহারই উপরে এ বিষয়ের সমুদয় সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে।

আজ প্রশ্নটা তুলিয়া রাখিলাম—বারান্তরে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মানবদেহের ক্রমবিকাশ।

ডারুউইনের ক্রমবিকাশবাদ আজ সমস্ত সভ্যজগতের বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেবল যে অনুমোদন করেন তাহা নহে বরং ঐ মত যে ধ্রুব সত্য সে বিষয়ে কোন সংশয়ও মনে স্থান দেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা সমধিক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি থাকিতে পারে? অস্ত্রচিকিৎসার অসাধারণ অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একদল তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা মানব ও অন্যান্য প্রাণীর শরীর, কঙ্কাল ভ্রূণ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অস্ত্র দ্বারা সুচারুরূপে বিচ্ছেদসাধন করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্রমবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিতর্ক ও মীমাংসা অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। তাঁহাদেরই পরি-

শ্রমের ফলে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিয়াছি।

১ম। মানবের শরীর ক্রমবিকাশের অতি নিম্নস্তর হইতে আধুনিক উন্নত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

২য়। এক শ্রেণীর জীব যে অবস্থায় স্বভাবতঃ থাকে, সেই প্রাকৃতিক অবস্থার কোন নৈসর্গিক কারণে যদি স্থায়ী পরিবর্তন হয়, তবে সেই জীব পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী জীবন ধারণ ও বংশোৎপাদন করিবার চেষ্টা পায়। প্রকৃতি বলবতী হইলে জীবদেহের ধ্বংস হইয়া যায় ও সেই শ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ হয়। যদি দেহ প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ধ্বংস না হয়, যদি দেহই বলবান হয়, তাহা হইলে ঐ জীবের অস্তিত্ব বজায় থাকে; কিন্তু অবস্থান্তরে তাহার দেহ গঠনেরও ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটে। যোগ্যতম প্রাণীই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া দেহের কার্য্য স্থূলতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী শরীর পায়। ইহাকেই Law of Adaptation বলে।

৩য়। যে সকল পরিবর্তন জন্মের অঙ্গে আসে না, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া অভ্যস্ত হইলে সেই বিকৃতি জ্রূণের শরীরেও আসিয়া পড়ে। তখন উহা ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক জীবেরই শরীরে লক্ষিত হইয়া থাকে ও সন্ততি-পর্য্যায়ক্রমে পরিচালিত হয়। ইহাকেই Law of Habit ও Law of Heredity বলে।

৪র্থ। মানবভ্রূণ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জঠরে গঠিত হয় সেই পরিবর্তনগুলি একে একে জীবস্তরের নিম্নতম প্রাণী হইতে নরাকৃতি বানর পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীর ভ্রূণের অবিকল অনুরূপ। পূর্ব্বজন্মার্জিত দেহ-সংস্কার ধারাবাহিকক্রমে ভ্রূণের গঠনে পরিলক্ষিত হয়।

৫ম। মানবদেহে কতকগুলি অবয়ব ও যন্ত্র দৃষ্ট হয় যাহার কোন কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। ঐ সকল প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের শরীরে বিশেষ আবশ্যক ছিল, কালক্রমে (যুগযুগান্তরের পরিবর্তনে) বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পড়ায় ঐ সকল যন্ত্র ও অবয়বের কার্য্য অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং অব্যবহারের অভ্যাস বা ব্যবহারের নিত্য অনভ্যাস বশতঃ উহাদের বিকৃতি ঘটে। অদ্যাপিও ঐ সকল অকর্ম্মণ্য যন্ত্র সেই পূর্ব্ব জন্মের সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া অকর্ম্মণ্য ভাবেই দেহে রহিয়া গিয়াছে।

উপরি উক্ত পঞ্চতত্ত্ব পরীক্ষালব্ধ। আমরা যখন ইচ্ছা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহার জন্য শারীরবিজ্ঞান (Physiology) এবং অস্থিবিজ্ঞান ও শবচ্ছেদের জ্ঞান (Anatomy) আবশ্যক। এই পঞ্চ সত্যের সমষ্টিই ক্রমবিকাশবাদ। (Theory of Evolution) প্রত্যহ ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া ক্রমশঃ এই ক্রমবাদের ভিত্তি দৃঢ় হইতেছে। সমস্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ ও অখণ্ডনীয়। একে একে ঐ পাঁচটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

১ম। মানব শরীরের অভ্যুদয়। অদ্যাবধি এ বিষয় যতদূর জানা গিয়াছে তাহা এই,— প্রথমে কোন এক অজ্ঞাত মূল উৎস হইতে Protyl নামক এক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব

অনুমিত হইয়াছে। কালসহকারে ঐ প্রোটাইল্ হইতে উহার জড়ত্ব ও গতি উৎপন্ন হইল। ঐ বস্তুও তাহার গতি (আণবিক ও পারমাণবিক গতি) মিশিয়া আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সহযোগে রাসায়ণিক ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়া প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রোটাপ্লাজম্কেই মহাত্মা হাক্স্লি (Huxley) জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়াছেন (Physical Basis of Life)। সমস্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণির দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মকোষে (Cells) গঠিত। ঐ Protoplasm পদার্থই প্রত্যেক সজীব সূক্ষ্মকোষের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবের সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে। বহিঃস্থ বস্তু লইয়া পুষ্টিসাধন ও বহুভাগে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র সত্তার অভিব্যক্তি উহার আছে। এক বিন্দুমাত্র প্রোটোপ্লাজম্ লইয়া জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে। উহা হইতে ক্লোরোফিল্ (Chloro phyll) নামক বস্তু প্রস্তুত হয়। সমগ্র উদ্ভিদ্ ও খনিজ পদার্থের মূল ঐ ক্লোরোফিল্। উহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেচেতার ন্যায় (Fungus) পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অনতিকাল পরে এমিবা (Amaeba) নামক প্রাণীর উদ্ভব হয়। ঐ এমিবাই প্রাণিস্তরের সর্ব্বনিম্ন জীব। উহা একটি ক্ষুদ্র কীটাণুবৎ। উহার হস্ত পদাদি প্রত্যঙ্গ বা অস্থি, মাংস, মুখ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। কেবল একটি গোলাকার সূক্ষ্ম কোষ, প্রোটোপ্লাজমে ভরা। কোন কোনটির একদিকে একটি অতি সূক্ষ্ম কেশ দেখা যায় (Cellia)। উহাদের কেবল ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার ক্ষমতা মাত্র থাকে, ওায় জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী এই দুই শ্রেণীর সংযোগ্ স্থলে ঐ এমিবাই লক্ষিত হয়। উহাকে (Connecting Link) সংযোগকারী বলে।

এক কোষ বিশিষ্ট এমিবা হইতে ক্রমে বহুকোষ বিশিষ্ট (Synamaeba) সিন্ এমিবার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের শরীরে বহু সূক্ষ্মকোষের সমাবেশে অনুভূতি ও খাদ্য পরিপাক করিবার যন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয় থাকে কিন্তু স্বতন্ত্র মুখ গহ্বর দৃষ্ট হয় না। একমাত্র অবয়বে সকল কার্য্য-সমাধা হইয়া থাকে। ইহাদের পর জীবের তৃতীয় স্তর Gastrula (গ্যাস্ট্রুলা) নামক জীব শ্রেণী। ইহাদের মুখগহ্বর স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভূত হয়। পরে চতুর্থ স্তরে Hydra বা Polyp—স্বতন্ত্র দুই একটি ইন্দ্রিয় ও তদুপযুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি লক্ষিত হয়। পঞ্চম স্তরে Medusa জাতীয় জীবের সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডল ও মাংসপেশী প্রথম দেখা দেয়। এখনও মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের উদ্ভব হয় নাই। ৬ষ্ঠ স্তর কীট (worm) ও ৭ম স্তর কীটান্তর্গত Himatega নামক এক জাতীয় প্রাণীদের শরীরাভ্যন্তরে প্রথম মেরুদণ্ড আদিম অবস্থায় দৃষ্ট হয়। এই অবধি মেরু দণ্ডহীন জীব-পরে মেরুদণ্ড যুক্ত জীব (Vertebrata) পোকা মাকড় হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীব। সরীসৃপ স্তন্যপায়ী নহে, ডিম্ব প্রসব করে। একেবারে স্তন্যপায়ীর উদ্ভব সরীসৃপ হইতে পারে না। Monotremata নামক এক জাতীয় অর্দ্ধ সরীসৃপ অর্দ্ধ স্তন্যপায়ী জীব উভয় শ্রেণীর সংযোজক Connecting Link। তাহার পর Lemur জাতীয় জীব, পরে বানর জাতি। ইহার পর কিন্তু মানব

একটা পৃথক জীব। তাই বানর ও মানব এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী একটি সংযোগকারী জীব কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপিও তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। উহার নাম Missing Link দেওয়া হইয়াছে। ঐ জাতির প্রাণী বানর অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান ও কম লোমশ হওয়া চাই। পদাঙ্গুলির গঠনও প্রায় মানবের ন্যায় হওয়া আবশ্যক এবং একটু ধর্ম্মজ্ঞান থাকা উচিত। Alali নামক এক শ্রেণীর বানর অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা মানবের সমধিক নিকটবর্ত্তী। উহাকেই কেহ কেহ Missing Link বলেন।

উপরি উক্ত প্রাণিস্তরের যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ক্রমোন্নতি সহকারে এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদির উদ্ভব হইয়া এক এক শ্রেণীর জীব গঠিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর জীবের দেহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল স্তরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে এমন অনেক চিহ্ন আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

২য়। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের স্থায়িত্ব। এ বিষয়ে বহুলোক বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। অবস্থা ভেদে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহের গঠনে ও কার্য্যকারিতা শক্তির যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় তাহা আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই। উদ্ভিদের এইরূপ পরিবর্ত্তন অল্পসময়সাপেক্ষ সুতরাং উহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। প্রাণিদেহের স্থায়ী পরিবর্ত্তন সমধিক মন্থর গতিতে সম্পন্ন হয়—অনেক সময়ে আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। পারাবত, হংস প্রভৃতি পক্ষী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর বন্য অবস্থা হইতে গৃহপালিত অবস্থা যে অতি বিভিন্ন তাহা সহজেই পরীক্ষিত হইতে পারে। বন্য অবস্থায় যে সকল প্রত্যঙ্গই সমধিক বলবান্, তাহার কারণ ঐ সকলের ব্যবহার ও আবশ্যকতা বেশি। এই নিয়মকে Adaptation "অবস্থানুরূপ উপযোগী করণ" কহে। যদি প্রাকৃতিক অবস্থান্তরে কোন জন্তুর শরীরের বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে, এমন কি তাহাতে যদি ঐ জন্তুর আভ্যন্তরিক (হৃদয় প্রভৃতি) যন্ত্রাদি সেই দেহকে ঐ অবস্থান্তরের যোগ্য করিতে সক্ষম না হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই জাতীয় জন্তু ক্রমশঃ হীনবল হইয়া শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ম্যামথ (Mammoth) নামক এক জাতীয় অতিকায় হস্তীর বংশ অপেক্ষাকৃত অল্প কালে লুপ্ত হইয়াছে। উহাদের কঙ্কাল অদ্যাপিও কোন কোন প্রদেশে পাওয়া যায়। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অসীম অতীত কালকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন (Zoological ages)। এক যুগের জীববংশ যুগান্তরে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছে—তাহাদের দেহাবশিষ্ট কঙ্কাল বা প্রস্তরীভূত শরীরাংশ মাত্র পড়িয়া আছে—যোগ্যতমেরা পরিবর্ত্তিত শরীর হইয়া বাহ্যতঃ বিভিন্নাকৃতি জীবরূপে বাঁচিয়া আছে ও বংশবিস্তার করিতেছে। এই রূপেই প্রথমোক্ত বিংশতি প্রকার জীবস্তরের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ উহারা বিবিধ অবস্থাপন্ন এক মৌলিক জীবেরই বিভিন্ন শরীরগঠন-ভেদেই উদ্ভূত হইয়াছে।

৩য়। অভ্যাসের প্রভাব ও পুরুষানুক্রমে পরিচালন। এ বিষয় আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত

"ক্রমবিকাশে অভ্যাসের প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই স্থানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বহুযুগের অভ্যাসের ফলে, ব্যক্তিগত শারীরিক গঠনভেদ ভ্রূণের শরীর দিয়া সন্তানে বিকশিত হয়। রে ল্যাঙ্ক্যাষ্টর্ (Ray Lankaster) প্রমুখ বিখ্যাত ভ্রূণতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, যে পরিবর্ত্তন ভ্রূণে অশায় না তাহা কখনও ভাবিষ্য প্রাণীতে দেখা যায় না। বহু যুগের অভ্যাসই কেবল ভ্রূণে অর্শায়।

৪র্থ। মানব ভ্রূণের ক্রমবিকাশ। মানব ভ্রূণাবস্থায় ও ক্রমবাদ সম্মত পরিবর্ত্তনের মধ্যে বৰ্দ্ধিত হয়। অধ্যাপক হিকেল্ (Profesor Haeckl) তাঁহার Evolution of Man নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে বহু পরীক্ষার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত করিয়াছেন যে গর্ভসঞ্চারিত ভ্রূণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তরের সকল জাতির ভ্রূণের অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথমে একটি এমিবা র (amaeba) ন্যায়, পরে gastrula Medusa' কীট, মৎস্য, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি ক্রমবিকশিত প্রাণীর ভ্রূণ যেরূপ, মানব ভ্রূণের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা অবিকল সেইরূপ। মানবভ্রূণ পরিপক্ক অবস্থায় পুচ্ছ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে—পরে পুচ্ছ "খসিয়া" গিয়া স্থানে খান কয়েক খণ্ড অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে নিম্নতি প্রাণিস্তরের আকৃতি ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মানবের আকার ধারণ করে। ক্রমবিকাশের ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকিতে পারে?

অধ্যাপক হাক্স্লে (Huxley) তাঁহার Man's Place in Nature নামক প্রবন্ধে প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন যে বানরীর গর্ভস্থ ভ্রূণের সহিত মানবভ্রূণের সাদৃশ্য অতি নিকট। ভ্রূণের শেষাবস্থায় এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ও বহুদিন যাবৎ উহা বর্ত্তমান থাকে। অঙ্গের সর্ব্বত্র লোমের সমভাবে উৎপত্তি, ক্ষুদ্র পুচ্ছ, পদাঙ্গুলির ক্ষমতা, কর্ণ স্পন্দিত করিবার ক্ষমতা মানবভ্রূণেরও যেমন থাকে বানরভ্রূণেরও অবিকল তদনুরূপ। আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, অবস্থিতি ও আপেক্ষিক প্রসার উভয়েরই এক প্রকার। সুতরাং মানব যে বানর জাতির মধ্য দিয়া উদ্ভূত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন নরাকৃতি বানরের মধ্যে পরস্পর যতদূর পার্থক্য লক্ষিত হয়, মানব ও আসল বানরের মধ্যে তত পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। অপিচ ভ্রূণাবস্থায় ঐ সাদৃশ্য এত অধিক যে ভ্রূণাবস্থায় বানরে ও মানবে প্রভেদ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৫ম। মানবদেহে অকর্ম্মণ্য যন্ত্রাদি। অধ্যাপক ওয়াইডারশীয়েম্ (Weidershiem) তাঁহার The Human Frame as a witness to its past" নামক গ্রন্থে মানবদেহে বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার কোনও কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের শরীরের সর্ব্বস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমরাজির আবশ্যকতা কি? হস্ত পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্ম লোম দেহের কোন কাজে লাগে না, অথচ উহারা আমাদের কতক রক্ত শোষণ করে। শরীরের

মধ্যে নানাস্থানে নানারূপ গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতি দৃষ্ট হয় যাহা আমাদের কোন উপকারে আসে না। যথা বৃহৎ অন্ত্রের পরিশেষে কুণ্ডলাকৃতি অন্ত্রাংশ (Vermicular appendix) ইত্যাদি। এই সকল আবর্জ্জনা-স্বরূপ প্রত্যঙ্গাদি বিধাতা যে কি উদ্দেশে আমাদের শরীরের মধ্যে সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা লইয়া বহু বাদানুবাদ সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা কোন সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। বিধাতা যে উদ্দেশ্যহীন কার্য্য করেন এ কথা বলিলে বিধাতার উপর দোষারোপ করা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় কি? এইরূপ অন্ধ নাস্তিকতা বড় ভয়ানক অবস্থা। ক্রমবিকাশে যদিও ঈশ্বরের কার্য্য ক্রমশঃ পিছাইয়া এক প্রোটাইল (Protyle) ও তাহার জড়ত্ব ও গতির সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে সত্য, যদিও আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যে, আমাদের জন্মে, পূর্ব্বজন্মে, বহু পূর্ব্বকালের গঠনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকর্তৃত্ব দূরে অপসৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু আদিম সূক্ষ্মকোষ ও প্রোটোপ্লাজমের গঠন যে মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে স্বতঃই মন যায়। সুতরাং ক্রমবিকাশে যে নাস্তিকতার প্রশ্রয় দেয় এ সর্বৈব মিথ্যা। যদি ঈশ্বর আমাদের কলেবর এককালে সৃষ্টি করিয়া মাতৃগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লই তাহা হইলে ঐ শরীরের ভিতর কতকগুলি অকর্ম্মণ্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়া শরীরের ভার ও হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রাদির পোষণকার্য্য অনর্থক বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইল? ইহার উত্তর নাই। ক্রমবিকাশবাদ ইহার উত্তর সহজে দেয়। যে সকল অকর্ম্মণ্য অংশ আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে, তাহা বহু শতাব্দী, এমন কি যুগযুগান্তর পূর্ব্বে শরীরের আবশ্যক যন্ত্রাদি ছিল, তাহা হইতে সে সময়ে শরীরের কার্য্য সাধিত হইত; কিন্তু ক্রমশঃ জীবদেহ পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পতিত হওয়ায় ঐ সকল যন্ত্রের আবশ্যকতা রহিল না। ক্রমশঃ অব্যবহারে উহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। আমাদের কর্ণের বহিঃসংগঠনের (বাহির কানের) কোন কার্য্য দেখা যায় না। উহা পূর্ব্বজন্মস্থ গোকর্ণ ও বানরকর্ণের অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র। ঐ জন্তুরা কর্ণ বিভিন্ন ভাবে বক্র করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে আগত শব্দের অনুসরণ করিতে পারে; আমরা সেই স্থানে ঘাড় বাঁকাইলেই সফল হই, কর্ণ নাড়িবার সুতরাং আবশ্যক হয় না। গো অথবা কুকুর যেমন কান পাতিতে পারে, বানর তদপেক্ষা কম; আবার মানবে দেখি ঐ ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গো অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের গাত্রচর্ম্মের নিম্নে এক প্রকার মাংসপেশী আছে যাহার দ্বারা উহারা চর্ম্ম কুঞ্চিত করিতে পারে; আমাদেরও ঐরূপ স্থানে পেশী দৃষ্ট হয়। ললাট মুখ ইত্যাদি দুই এক স্থানের চর্ম্ম আমরা ইচ্ছামত ঐ পেশীর সাহায্যে কুঞ্চিত করিতে পারি। উক্ত জন্তুদের ঐরূপ চর্ম্মকুঞ্চন গাত্রের সর্ব্বত্রই আবশ্যক হয়; উহার দ্বারা তাহারা মক্ষিকা মশক প্রভৃতি দংশকের অবস্থান নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ঐ সকল পেশীর কার্য্য কেবল কতকগুলি মানসিক ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাও আবার

সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অথচ উহারা আজিও শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া রক্ত প্রভৃতি জীবনী-রস শোষণ করে। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে ঐ সকল অকর্ম্মণ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্বের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না; এক্ষণে ডারউইনমতের আশ্রয়ে ঐ সকল দুরূহ সমস্যা পরিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল অকর্ম্মণ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাক্ষীস্বরূপ দেহের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে এবং সন্ততিক্রমে পর্য্যায়গত হইতেছে। ক্রমশঃ উহার একেবারে বিলুপ্ত হইবে।

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফল। উহাতে মানবদেহ ও তাহার গঠন বেশ বুঝা গেল। আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে মানবের দেহ যেমন ক্রমশঃ নিম্নস্তর হইতে ক্রমোদ্ভূত হইয়াছে, তাহার মন, বুদ্ধি, এমন কি আত্মাও সেইরূপ স্তরে স্তরে ক্রমবিকশিত হইয়া আসিয়াছে। মানবাত্মার ক্রমবিকাশ বারান্তরে আলোচিত হইবে।

আমরা বানর হইতে উদ্ভূত এই কথা হয়ত অনেকের ভাল না লাগিতে পারে। অনেকে ডারউইনের মতকে পাগলের খেয়াল বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; মানবমনের দৌর্ব্বল্যই ইহার অন্যতম কারণ। আমরা বানরশরীরের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিক দৌর্ব্বল্যেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। কিন্তু উপায় নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ৯ই চৈত্র মনস্বী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে একজন প্রতিভাবান্ লেখকের স্থান শূন্য হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী পাণ্ডু গ্রামে মাতুলালয়ে ইন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। ছাত্রজীবনে ইন্দ্রনাথ বিশেষ অধ্যয়নশীল ছিলেন না তবে তখন হইতেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়। ভাগলপুর হইতে তিনি বৃত্তির সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বি,এল পাশ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া বর্দ্ধমানে আসেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিস্ফুরণ হইয়াছিল। তিনি একজন শক্তিশালী ব্যবহারজীবী ছিলেন। ওকালতী করিয়া তিনি প্রভূত প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সরস ব্যঙ্গরচনাই তাঁহাকে বঙ্গবাসীর নিকট সমধিক পরিচিত করিয়াছে। রসজ্ঞতায় ও পরিহাসপটুতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মর্ম্মস্পর্শী অথচ মার্জ্জিত ভাষায় শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া কেহই এত কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার রচিত "কল্পতরু" "ভারতোদ্ধার" প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে অপূর্ব্ব রত্ন—ইহারা তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয় চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। "পঞ্চানন্দ" নামক রঙ্গরস ও বিদ্রূপাত্মক মাসিকপত্র প্রকাশও ইন্দ্রনাথের আর এক বিশেষ কীর্ত্তি। এই শ্রেণীর মাসিকপত্র বাঙ্গলায় আর দেখা যায় নাই।

ইন্দ্রনাথ রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গের সমাজ সংস্কার চেষ্টায় তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু তিনি যে একজন সমাজ-হিতৈষী ও স্বদেশভক্ত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। ইন্দ্রনাথ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন

এবং ব্রাহ্মণ সমাজের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রসন্নচিত্ত ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইল তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায

রাজকন্যা।

প্রথম দৃশ্য।

নৃত্যগীত ঐক্যতান বাদনের মহলা।

শিক্ষয়িনী, গায়িকা, বাদিকা ও নৃত্যকারিণীগণ।

গান

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

রজনী রজত মধুরা,
গাহগো রঙ্গে, বাজাও সঙ্গে,
রুনুঝুনু নাচি আমরা,

বাজাও সেতারাবীণ, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিন,
ধীরে থমকি, দ্রুত চমকি,
তারে তারে ধীরে ঝঙ্কারে অধীরা—
রুনুঝুনু নাচি আমরা।
বাজাও শারঙ্গ, নীরতরঙ্গ, তালে তালে তালে,
মঞ্জুল বোলে মন্দিরা।
রুনুঝুনু নাচি আমরা।
সঙ্গীত গানে, ঐক্যবাদনে, বিধুরা –
মত্তচরণ, রুনুঝুন ঝন—নূপুর গুঞ্জন মুখরা।
স্পর্শে হর্ষে শিহরে মেদিনী
বিমানে বিহরে—পুলকরাগিণী
সুখ কম্পিত বিহ্বল বাদিনী—
স্তব্ধ মুগ্ধ অপ্সরা!
মনোসাধে নাচি আমরা।

(একবার নৃত্য গীতের পর)

শিক্ষ। বেশ বেশ, ঠিক হয়েছে। কেবল বাজন্দারণীদের বসার ভঙ্গীটা একটু বদলাতে হবে। ওগো—সেতারণি তুমি সেতারের দিকে মাথাটা আর একটু হেলিয়ে রাখ,—আর তুমি মৃদঙ্গিনি, একটুখানি আরো সরে বস দেখি—বীণা ও সেতারার ঠিক পিছনে—বুঝলে?

তাহারা। আচ্ছা আচ্ছা—অধিকারী মশায়—হোলত?

(হাস্য করিতে করিতে তথাকরণ)

মন্দিরা-ওয়ালী।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমার জায়গা ত মৃতঙ্গিনী দখল করলে—আমি তবে যাই কোথা?

শিক্ষ। মন্দিরা—তুমি শারঙ্গের কাছে, দাঁড়াও—বসলে হবে না।

অত কাছে না, এই রকম একটু তফাতে, গাছের কাছে, একটু আড়ালে; ঠিক হয়েছে, বাঃ যেন ছবির মত দেখাচ্ছে!

তাহারা। বাঁচা গেল, আর ত ভঙ্গী বদলাতে হবে না?

(কাহারো ঘাড়টা বাঁকাইয়া, কাহারো হাতটা হেলাইয়া, কাহারো মুখ ঈষৎ তুলিয়া, কাহাকেও একটু পাশে সরাইয়া—পুনঃপুনঃ সকলকে অবলোকন করিতে করিতে)

শি। না আর বদলাতে হবে না,—এবার ঠিক হয়েছে,—চমৎকার! কিন্তু দেখো সময় কালে ভুলে যেন গোলমাল কবে ব'স না।

তাহারা। তা করব না, তা করব না, এখন হয়েছে ত?

অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি ত?

শি। বাঃ এখনি যে সেতারণীর ঘাড়টা সোজা হয়ে গেল। বীণার হাতটা নীচু হয়ে পড়লো! আঃ পারি না আর তোদের সঙ্গে।

(সচকিতে ভঙ্গী ঠিক করিয়া লইয়া)

উভয়ে। আর হবে না, আর হবে না নিশ্চয় বলছি, প্রতিজ্ঞা।

নৃত্যকারিণীগণ। আমাদের হাব ভাব কিছু বদল করতে হবে না ত অধিকারী ঠাকরুণ?

শি। না তোদের কায়দা ঠিক আছে,—এবার আরম্ভ কর।

(পুনরায় নৃত্যগীত বাদন।)

কিবা রজনী রঞ্জিত মধুরা।
গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে,
রুনুঝুনু নাচি আমরা।
ইত্যাদি—

গান সমাপনে প্রথমা।—সন্ধ্যার গানে ত

হোল; সজ্জার গানটা একবার গেয়ে নেওয়া যাক,

সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে
সুকোমল সুন্দর মণি ভূষণে!
কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে
কুসুম সুবাসিত চারু বসনে—

শি। থাম থাম, হস্তিনী আসছে—

(সহসা গীত বাদ্যাদি বন্ধ করিয়া)

সকলে। সত্যি নাকি সত্যি নাকি! আঃ নাম শুনলেই আতঙ্কে অঙ্গ শিউরে উঠে।

১ একজন। জয় জয় মাতঙ্গিনী দিদির জয়—

অন্য একজন। জয় জয় ভাণ্ডারিণীর জয়—

সকলে। জয় জয় প্রসাদদায়িনীর জয়!

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মা। মঙ্গলা দেওয়া হোল? তৃতীয় প্রহরের বিস্তর ত আর বিলম্ব নেই—এখনো তোদের এখানে মজলিস চলছে!

১। আমার আবেদনটা মাতঙ্গিনীদিদি—

২। আমার নিবেদনটা কর্ত্তাঠাকরুণ—

মা। তোদের নিবেদন আবেদনের জ্বালায় আমার দেখছি টিকনো ভার!

৩। চুপে চুপে। ডালির কথাটা বল,— খালি কথায় কি চিঁড়ে ভেজে লো!

১। এই রত্নহার আপনার পূজার জন্য এনেছি আমার চৌতলা বাড়ীটি যাতে শীঘ্র হয়ে যায়—

(হার সমর্পণ)

২। এই আমার অর্ঘ্যদান—আপনার অনুগ্রহ হলেই আমার ভায়ের চাকরীটি হবে।

(হস্তের বলয় খুলিয়া প্রদান)

৩। এই আমার বেণীবন্ধ আপনার চরণে অর্পণ করছি—আপনার কৃপার উপর আমার স্বামীর পদোন্নতি নির্ভর করছে।

মা। (হাস্যমুখে) হবে হবে—সবই হবে।

(একজন দরিদ্র রমণীর প্রবেশ)

মা। এ আবার কে?

র। আপনার নাম শুনে বড় আশা করে এসেছি। আপনি মহারাণীকে বলে বাবাকে যদি কারা থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। তাঁর কিচ্ছু দোষ নেই গো—কিচ্ছু দোষ নেই।

১। (চুপে চুপে) ভেট কিছু এনেছিস কি? নইলে শুধুই মাথা হেট, বুঝলি লো?

র। আমার ধন রত্ন কিছুই নেই! যা ছিল সব গেছে—সব গেছে। এই যা আছে, কেবল হাতের বালা দুগাছি—তাই চরণে সমর্পণ করছি—আর আমার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতায় আজীবন আপনার কেনা দাসী হয়ে থাকব।

মাতঙ্গিনী (বালা হস্তে লইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্বগত)

এ কি সোনা! ঠিক ও পিতল। তায় আবার ফাঁপা যেন সোহাগার খই। এই নিয়ে কি না আমায় ভেট দিতে এসেছে! মাগীর আস্পদ্ধা দেখ! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠছে।

(প্রকাশ্যে) দেখ আমি রাজাও নই—রাণীও নই যে দণ্ড পুরস্কারে রাজ্য ওলট পালট করে দেব। এ রকম অনুরোধ করাই আমাকে অপমান করা।

র। বড় আশা করে এসেছি, মাগো—ফেরাবেন না, তাড়াবেন না, একবার মহারাণীকে বলুন—রক্ষা করুন গরীবকে, অনাথকে, ভগবান আপনার ভাল করবেন।

(চরণে পতন)

মা। এ ত ভাল জ্বালায় পড়েছি। এ সব বেয়ানা লোকই বা অন্তঃপুরে আসে কেন? এঁ কি রাজকন্তার মহল পেয়েছে—নাকি? পা ছাড় বলছি,—(পা টানিয়া লইয়া)

চোখের জলে হাহুতাশে—আর ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে দরবার জমাতে চাও ত সেখানে যাও বাছা,—আমরা ওসব সহ্যি করতে পারব না—তার কথাও নেই। দ্বাররক্ষিকা, প্রতিহারিণি!

র। (ভূমিতে পড়িয়া) মা রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

দ্বার-রক্ষিকার প্রবেশ

মা। একি রকম কাণ্ড! রাস্তার লোক এসে ধাঁ করে পায়ে পড়বে, এ ত দেখছি বড় বাড়াবাড়ি!

দ্বা। বাইরের লোক নাকি! তাত জানিনে! আমি ভেবেছিলাম ললিতার কোন আত্মীয়া—মাপ করবেন!

মা। মাপ মাপ—মাপ করবার আমি কে? বেজায় সব বেয়াড়া হয়ে উঠেছ। সরাও একে এখন এখান থেকে।

রমণী—(কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া) মাগো সংসারে কি আর ধর্ম্ম বিচার নেই! ভগবান কোথায় তুমি।

মা। কথায় কথায় ভগবান দেখান। ভগবান শীঘ্র তোমায় মুক্তি দিন। যা এখান থেকে ওকে নিয়ে যা। আর যেন কাজে এ রকম গাফেলি না হয়!

দ্বা। চল, মরতে কি আর জায়গা ছিল না তোমার। (তাহাকে লইয়া দ্বাররক্ষিকার প্রস্থান।)

মা। তোমরাও সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও—আমি ফুল আনতে চল্লুম! (প্রস্থান)

১। মাগী যেন রাক্ষসী, দেখলে গায়ে জ্বর আসে।

২। আহা মেয়েটি স্নানের ঘাটে আমাকে ধরে পড়েছিল—তাতেই আমি এ সময় তাকে এখানে আসতে বলি। কে জানে সত্যিই বাঘিনীটা ওকে গিলে ফেলার উদ্যোগ করবে।

৩। ওটা না মরলে রাজ্যের লক্ষ্মীশ্রী নেই।

সকলে। (আঙ্গুল মটকাইয়া) মরুক—মরুক।

১। তাহলে হরির লুট দেব।

২। তাহলে সিন্নি দেব।

৩। কালীর কাছে পাটা মানাছ।

৪। শিবের চরণে বিল্বপত্র।

সকলে। মরেছে সে মরেছে নিশ্চয়, হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল।

শিক্ষ। আরে থাম, তোরা যে হাসিটা কান্না করে তুল্লি!

১। তাইত দুনিয়ার নিয়ম—প্রথমে হাসি তার পর কান্না!

২। আজ শিশু কাল বৃদ্ধ!

৩। যারই জন্ম—তারই মৃত্যু!

সকলে। তবে আবার বল ভাই, হরিবোল হরিবোল। (নেপথ্যে দুন্দুভি বাদন।)

শিক্ষ। থাম থাম, ঐ বাজনা বেজেছে হরিবোল রাখ— মধুরে শেষ কর,—গান গাইতে গাইতে চল— যাওয়া যাক।

রজনী রজত মধুরা
গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে
ঝুণু ঝুণু নাচি আমরা।
(গান গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

চীন ভ্রমণ।

(ইংরাজী হইতে)

১

আমরা হোনি লোসং নগর পরিত্যাগ করিয়া ২৫ ক্রোশ রাস্তা চলিয়া অবশেষে সাটাও সহরে পৌঁছিলাম। এই সুন্দর নগরটি একটি ছোট পর্ব্বতের নিকে অবস্থিত। ইহারই সন্নিকটে চীনের বিখ্যাত ইষ্টকনির্ম্মিত তৃতীয় প্রাচীর। অতি প্রত্যূষে আমরা সেখানে পৌঁছিয়া নগরের তোরণের নিকট বাসা লইলাম। পদব্রজে নগর দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। ৮০ হাত প্রস্থ দুর্গপ্রাচীরের (Rampart) উপর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। চক্রবিহীন দুটি পুরাতন অব্যবহৃত পিত্তলের কামান আমাদের নয়ন গোচর হইল।

আমাদের মধ্যে একজন অন্যমনস্কভাবে প্রাচীর হইতে নীচে একটা ঢিল ছুড়িয়া ছিলেন। দৈবাৎ উহা একটী কুকুরের গায়ে লাগে। তাহাতে উহার স্বামী মহা ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডগোল বাধাইবার উদ্যোগ করিলেন। আমরা বিদেশী লোক আমাদিগকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে একটা জনতা আমাদের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল ও আমরাও প্রাণভয়ে দৌড়িয়া সরাইয়ে গিয়া আশ্রয় লইলাম। কিন্তু তাহারাও তথায় গিয়া উপস্থিত। সেখানে নানাপ্রকার অনুনয় করিয়া তোষামোদ ও সান্ত্বনায় অবশেষে ক্ষিপ্ত চীনেদের ক্রোধ শান্তি হইল। এই ব্যাপারের পর সেখানে থাকা আর যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করিয়া পরদিন প্রত্যূষে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

এইবার পাল্কী ত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে হইল। এক ঘণ্টা চলিয়াই বিখ্যাত নান্‌কাউ পাশের (Nang-kao pass) মুখে আসিলাম। এই pass এর প্রবেশ পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও বক্র। এইখানে বিরাট প্রাচীরের চতুর্থ দেওয়াল। উহা পার হইয়া ক্রমে পঞ্চম দেওয়ালও লঙ্ঘন করিলাম। শেষ পথটি (pass) চল্লিশ হইতে বত্রিশ হস্ত প্রশস্ত। শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য এই স্থানটাকে বিশেষ সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এই স্থানের মনোহর স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল হইলাম। পাহাড় ভেদ করিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত। উহার উভয় পার্শ্বের পাহাড় পরস্পর এত সংলগ্ন যে স্থানে স্থানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। উহার উপরে চীনদেশীয় একটী বিশ হস্ত পরিমিত প্যাগোডা মন্দির। পাহাড় কাটিয়া মন্দিরের সিঁড়ি তৈয়ার হইয়াছে। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারটী অতীব সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত স্বর্ণ রঙ্গে রঞ্জিত। চতুর্দ্দিকে চীনে লণ্ঠন ঝুলিতেছে। দেখিলে নয়ন মন মুগ্ধ ও অন্তরে পবিত্র ভাবের উদয় হইল। যথার্থই এমন হৃদয়োন্মত্তকারী দৃশ্য ও স্থান কুত্রাপি দেখি নাই।

উহার পর পর্য্যায়ক্রমে অবশিষ্ট দুইটী চীন প্রাচীর অতিক্রম করিয়া নাংকো (Nang kao) সহরে প্রবেশ করিলাম। ভিন্ন দেশীয় দূতগণ প্রায় সর্ব্বদাই এই স্থানে গতিবিধি করেন বলিয়া এই স্থানের অধিবাসীগণ অনেকেই ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা বুঝিতে পারে। এই স্থানের এক নূতন আদবকায়দা দেখিলাম। মনুষ্যবাহনের স্কন্ধে (Sedan) মোড়া চৌকিতে চাপিবার অধিকার এখানে মন্ত্রী (Mandarin) ব্যতীত আর কাহারও নাই। তবে অন্যপ্রকার পাল্কিতে সর্ব্বসাধারণে যাইতে পারে। আমাদের বাসার প্রাঙ্গণে পাল্কী করিয়া একটী মহিলা উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম লোহার ফিতার দ্বারা পা ছোট করিয়া তিনি এখন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছেন। সঙ্গীরা না ধরিলে এক পা চলিবার শক্তি তাঁহার নাই। সুন্দরীর যে পা দুইখানি আছে তাহা দেখিলে সহজে অনুমান হয় না। ঠিক যেন পুতুলের পা। আশ্চর্য্য চীনের সৌন্দর্য্যবোধ! শুনিলাম যে সম্প্রতি তাঁহার বিবাহ হইয়াছে ও স্বামীর সহিত বেড়াইতে চলিয়াছেন। অব্যবহিত পরেই দেখি যে একটী সুন্দর বেশ পরিয়া এক তরুণ যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত। বুঝিলাম ইনিই সুন্দরীর স্বামী।

পিকিনের ফাটক

門陽正京北
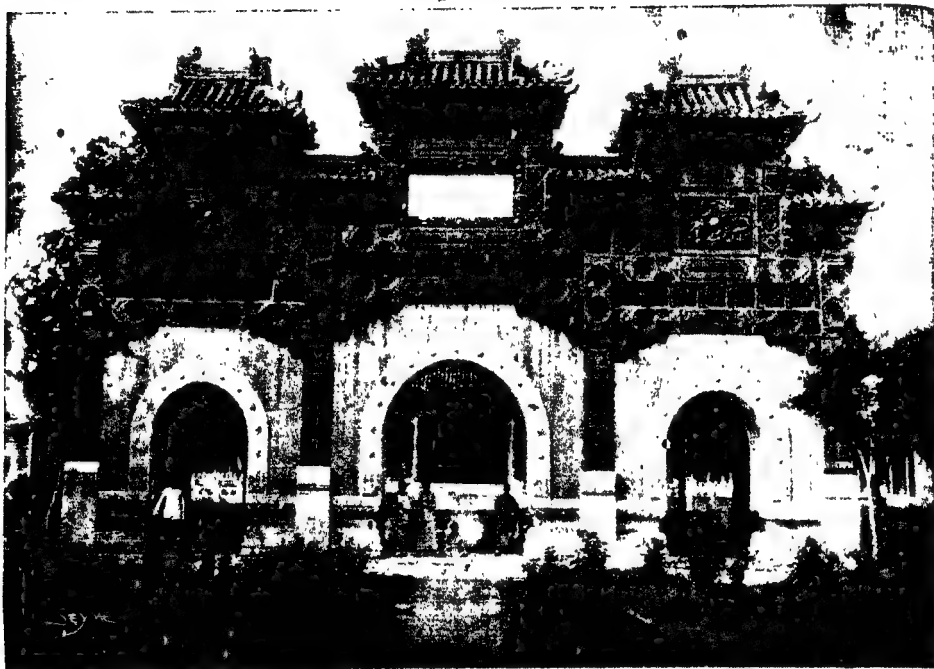
পিকিনের অপর ফাটক।

চীন দেশে কর আদায়ের প্রথা বড়ই অভিনব। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর সম্রাট নির্দ্দিষ্ট কর আদায়ের হুকুমজারি করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের অধীনস্থের প্রতি উহার দ্বিগুণ আদায়ের হুকুম দিল। তাহারা আবার তাহাদের নিম্নতর কর্ম্মচারীদিগের উপর উহার দ্বিগুণ আদায়ের আজ্ঞা দিলেন। এইরূপে করের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অবশেষে বেচারা প্রজাগণকে বাধ্য হইয়া সম্রাটের প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক মুদ্রা কর প্রদান করিতে হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে দেশীয়দিগের ধনশালিতার আভাস পাওয়া যায়। পিকিন ব্যতীত সমস্ত চীন সাম্রাজ্য ভ্রমণ করিয়া মোট আট দশটীর অধিক ভিক্ষুক দেখিতে পাই নাই। হায় রে, আমাদের সোণার ভারতবর্ষে, দুই বেলা পেট ভরিয়া কয়টা লোক খাইতে পায়?

মহানগর পিকিন বিরাট চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইহার জনসংখ্যা এত অধিক যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়—প্রায় চল্লিশ কোটি। এত অধিক জনসংখ্যা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পিকিনে চীনদেশীয় প্রধান প্রধান সাহেব Mandarin লইয়া মন্ত্রীসভার অধিবেশন হয়। রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত। সম্রাট সর্ব্বদা রাজধানীতে বাস করেন। চীনদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য এখানে আগমন করেন। এই মহানগর চারিভাগে বিভক্ত:—১ম চীনসহর, ২য় তাতারসহর, ৩য় রাজকীয় (Imperial) সহর, ও ৪র্থ নিষিদ্ধ (Forbidden) সহর। শেষোক্ত তিনটি সহরই বত্রিশফুট উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রাচীরের উপরিভাগে উচ্চ দুর্গ আছে। উহারা কেবল নামে মাত্র দুর্গ, কোনও কার্য্যকরী নহে। নিষিদ্ধ সহরের পশ্চাৎভাগে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। সাত শতাব্দী হইল যখন ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য মিলিত হইয়া এই নগর আক্রমণ করে, তখন ফরাসীরা রাজপ্রাসাদ হইতে বহুমূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। উক্ত দ্রব্য এখন লণ্ডন ও পারির মিউজিয়মের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা এইবার ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য সেনানী উদরসাৎ করিয়াছে সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

চীনদেশের অভিবাদন প্রথা নূতন রকমের। সাহেবেরা যেরূপ করমর্দ্দন করেন, আমরা যেরূপ নমস্কার করি, মুসলমানরা যেরূপ সেলাম করেন, উঁহারা সেরূপ না করিয়া নিজের যুক্তবাহু বক্ষের সম্মুখে উত্তোলন করে। আজকাল কলিকাতায় আমাদের নমস্কার প্রথা এইরূপ ভাবের অনুকরণে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পিকিনের রাস্তায় পুলিশ প্রহরী নাই। রাস্তায় যেমন ধূলা তেমনি ভিক্ষুকের উৎপাত। বুঝি সাম্রাজ্যের সমস্ত ভিক্ষুক এই এক সহরে আসিয়া বাস করে। শুনিতে পাই পিকিনে আশি হাজার ভিক্ষুকের বাস। কিন্তু তাহাদের দলপতি রাজদ্বারে সম্মানিত। সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ইহাদের মত গ্রহণ করা হয়। রাস্তায় নর্দ্দামা নাই, চতুর্দ্দিকে ময়লার স্তূপ, তাহার পূতিগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন। সহরের বড় রাস্তার দুইপার্শ্বে প্রশস্ত ফুটপাথ, তাহা কেবল গায়ক বাজীকর ঔষধবিক্রেতা, লেখক, নাপিত ও পুরাতন বস্ত্রবিক্রেতায় পরিপূর্ণ। তাহারা চীৎকার করিয়া নিজেদের ব্যবসায় ও দ্রব্যের গুণকীর্ত্তন করিতেছে।

চীনেদের সৎকারপ্রথা অনেকটা ইয়ুরোপীদের মত। শববহন করিয়া লইবার সময় সঙ্গে অনেক লোক যায়। তন্মধ্যে বাজনদারেরা বাঁশী প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে যায় ও বৌদ্ধ পুরোহিতেরা মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি পোড়াইতে পোড়াইতে যায়। ঐ সঙ্গে কতকগুলি ভাড়া করা শোকপ্রকাশক থাকে। তাহারা মৃতের জন্য কতই না কাল্পনিক শোকপ্রকাশ করে। এইরূপে জনতা বহুলোকপূর্ণ হয়। তৎসঙ্গে মৃতের পরিত্যক্ত বসনাদি একটি গাড়ী করিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং আত্মীয়েরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। সর্ব্বশেষে শববাহকের স্কন্ধে বৃহৎ বাক্সের

চীনের পুলিশ

পিকিনের লামা মন্দির
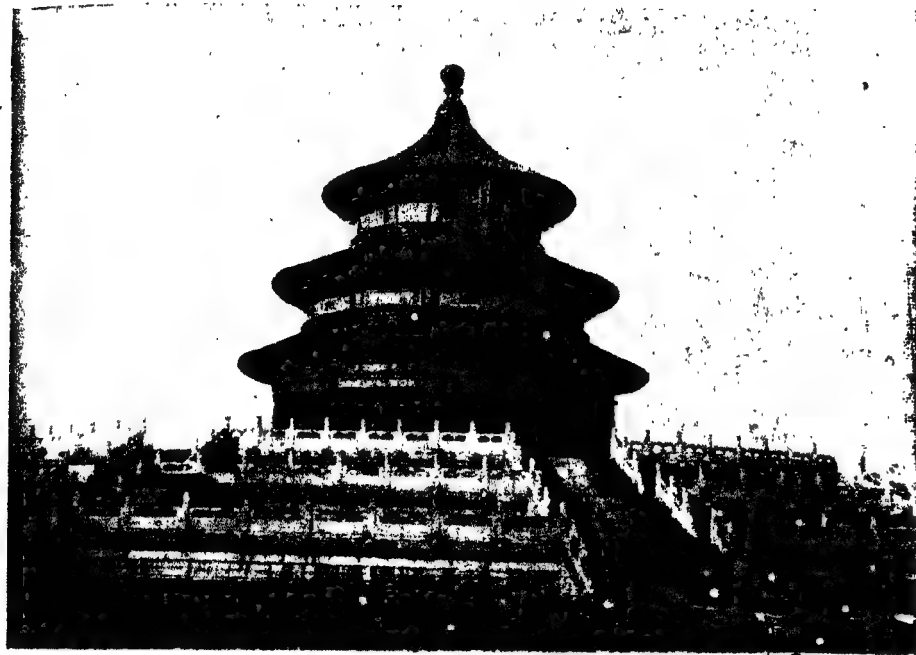
পিকিনের প্রার্থনা মন্দির
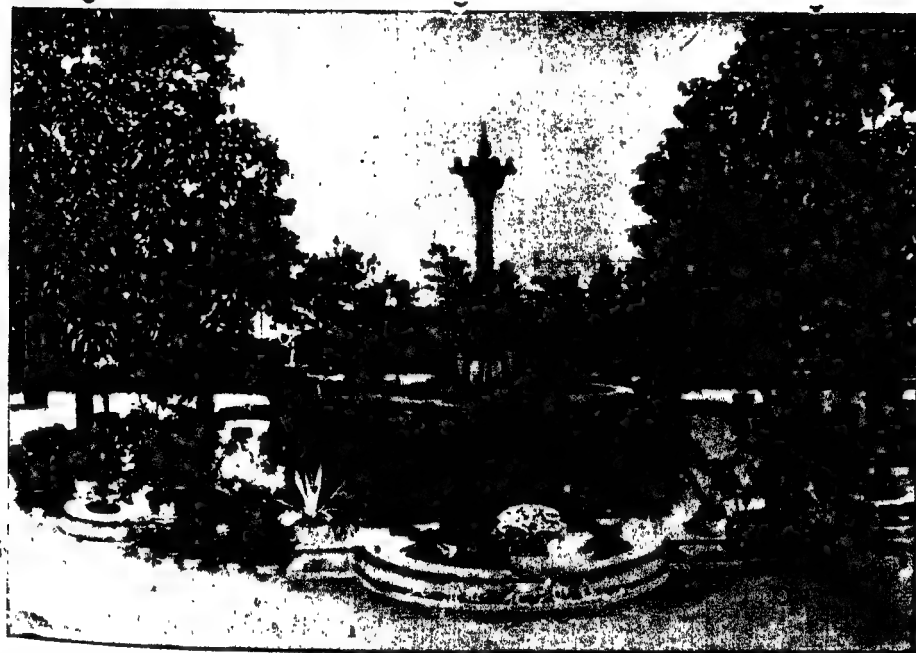
চিংফু মহল উদ্যান

মধ্যে শব লইয়া যাওয়া হয়। বোধ হয় কলিকাতায় অনেকে এরূপ শোভাযাত্রা দেখিয়া থাকিবেন। বেলিয়াঘাটার খালপারে চীনেদের গোরস্থান আছে।

বিশেষ জাঁকের বিবাহে বধূকে মাথায় লাল ছাতা ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই সঙ্গে নিশান ও আলোর ঘটা করা হয়।

পিকিনে দেখিবার উপযুক্ত একটী মর্ম্মর সেতু আছে। উহা একটী বিস্তৃত দীর্ঘিকার উপর প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সম্রাটের প্রমোদোদ্যান। এই স্থানের দৃশ্য অমরাবতীর তুল্য। ঐ জলাশয় নানা প্রকার সুন্দর জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মের সময় উহাতে নানাজাতীয় পুষ্প মুকুলিত হয়। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট টিলাগুলি যেন ঢেউ খেলিতেছে বোধ হয়। ঐ সকল টিলার উপর নানাজাতীয় দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য বৃক্ষ আছে এবং ঐ স্থানে অনেকগুলি প্যাগোডা বা ভজনালয় আছে। জলের মধ্য হইতে কতকগুলি উচ্চ স্তম্ভ উঠিয়াছে। সেগুলি বিশ্রামস্থান, সেখানে বসিবার আসন আছে। উক্ত দীর্ঘিকার চারিদিকে পাহাড়গুলি তৃণাবৃত, বেশ পরিস্কার ও মসৃণ, ঠিক যেন মখমলমণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। ঐ সকল পাহাড়ের উপর নানাপ্রকার লতাগুল্মাদি বর্দ্ধিত হইয়া জলের উপর ঝুঁকিয়া আছে। এই স্থানটী যথার্থ বিলাস উদ্যান, দেখিলে নয়ন মন চরিতার্থ হয়। যতই দেখা যায় আকাঙ্ক্ষা আর মেটে না, স্থানটী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। নির্ম্মাণ কর্ত্তার শিল্পকৌশল এবং কবিত্বের উহা জীবন্ত উদাহরণ।

পিকিনের সন্নিকটে কতকগুলি ফরাসী পাদরী বাস করিতেছে। তাহাদের বেশ ও পরিচ্ছদ ঠিক চীনেদের মত। মাথার বেণীটী পর্য্যন্ত রাখিতে ভুলে নাই। এই সকল পাদরীই চীনের অধঃপতনের কারণ।

চীনদেশ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট করিবার জন্য এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমরা কয়েকখানি চিত্র সংযোজিত করিলাম। চিত্রে যে প্রার্থনা মন্দির দেওয়া হইয়াছে সেটি বহু পুরাতন; এইখানে সম্রাট প্রতি বৎসর একদিন আসিয়া প্রার্থনা করেন—রাজ্যে কোনোরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেও তিনি এইখানে আসিয়া প্রার্থনা করেন। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল এমন চমৎকার যে ইহার ছিদ্র পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া দিবারাত বাজনার মতো শব্দ তুলিতেছে। চিং-মহল উদ্যানটিও চমৎকার—এখানে চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

সমালোচনা।

রচনা-প্রণালী। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ প্রণীত। লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার মহাশয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বাঙ্গালী ছাত্রের বাঙ্গালা ভাষায় অজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া * * বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মাবলীপূর্ণ" এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। প্রাঞ্জলতা ও বিশুদ্ধি সাধনোদ্দেশ্যে তিনি উদাহরণসমেত কতকগুলি প্রয়োজনীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সূত্রগুলি হইতে তাঁহার গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই। সূত্রগুলি শিক্ষার্থী ও শিক্ষানবীশগণের বিশেষ উপকারে ত লাগিবেই, অধিকন্তু মাসিক পত্রিকাদির বহু লেখক ও গ্রন্থকার এই গ্রন্থপাঠে রচনার ভ্রম সংশোধনের অবসর পাইবেন। তবে সূত্রগুলির ভাষা স্থানে স্থানে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—অর্থবোধ একটু কষ্টসাধ্য—সূত্রের ভাষা রীতিমত সরল হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার মহাশয়কে ব্যাকরণের প্রতি কিছু অতিরিক্ত মনোযোগী দেখিলাম—বঙ্গভাষা উন্নতির পথে চলিয়াছে, এখন যদি নানা সূত্র-শৃঙ্খলে তাহাকে চাপিয়া ধরা হয়, তবে গতিতে বাধা পড়িবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, "সৌন্দর্য্য শিক্ষার

পূর্ব্বে স্পষ্টতা সরলতা ও বিশুদ্ধি যে শিক্ষণীয় তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই"—একথা খুব ঠিক। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বহু বাঙ্গালা শব্দের প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সহিত সর্ব্বত্র আমরা একমত না হইলেও, গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদিগের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসতারত শর্ম্মা।

আত্ম-বোধ।—শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ইহা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহাতে বেদান্তের মূল-তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সমস্তই 'আপেক্ষিক'; সুতরাং, এই জ্ঞান হইতে আমরা কোনও অনপেক্ষ চিরন্তন বাহ্যজগতের পরিচয় পাইতে পারি না। আমি বা আমার আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই; সুতরাং "আমিই এই সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই (তটস্থ) ব্রহ্মা—(স্বরূপস্থ) ব্রহ্ম"। গ্রন্থকার কেবলমাত্র মায়াবাদেরই বিশ্লেষণ করিয়াছেন, অন্য কোনও মত লইয়া তাহার খণ্ডনের প্রয়াস পান নাই। দার্শনিক গ্রন্থে দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিপাদন করিতে হইলে প্রতিপাদ্য বিষয়টী একটী সূত্র বা প্রতিজ্ঞার আকারে নির্দ্দেশ করিয়া, বা কেবল তৎসংক্রান্ত বিশেষ তথ্যগুলির বিশ্লেষণ করিয়াই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; অপর পক্ষের মতগুলি গ্রহণ করিয়া একে একে তাহাদের সমালোচনা করিয়া, দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের খণ্ডন করিয়া, স্ব-মতে উপনীত হইবার চেষ্টা করাই উচিত। গ্রন্থকার অন্ততঃ 'ন্যায়-দর্শন' ও 'বৌদ্ধ দর্শনের' মতের আলোচনা করিলে তাঁহার পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইত।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি-সম্বর্দ্ধনা।

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবিবার কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্দ্ধনা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটী হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটীর সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য্য করিবেন।

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কল্পে কোন স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়; যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদ পত্রে স্বীকৃত হইবে। সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩ নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।

সমিতির সদস্যগণ

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
„ জগদীশচন্দ্র বসু।
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
„ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
„ সারদাচরণ মিত্র।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
(সমিতির সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
(সমিতির ধনরক্ষক)।
ইত্যাদি। ইত্যাদি।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

মহাভারত লিখন

শ্রীশঙ্কর ভেঙ্কটাপ্পা অঙ্কিত চিত্র হইতে
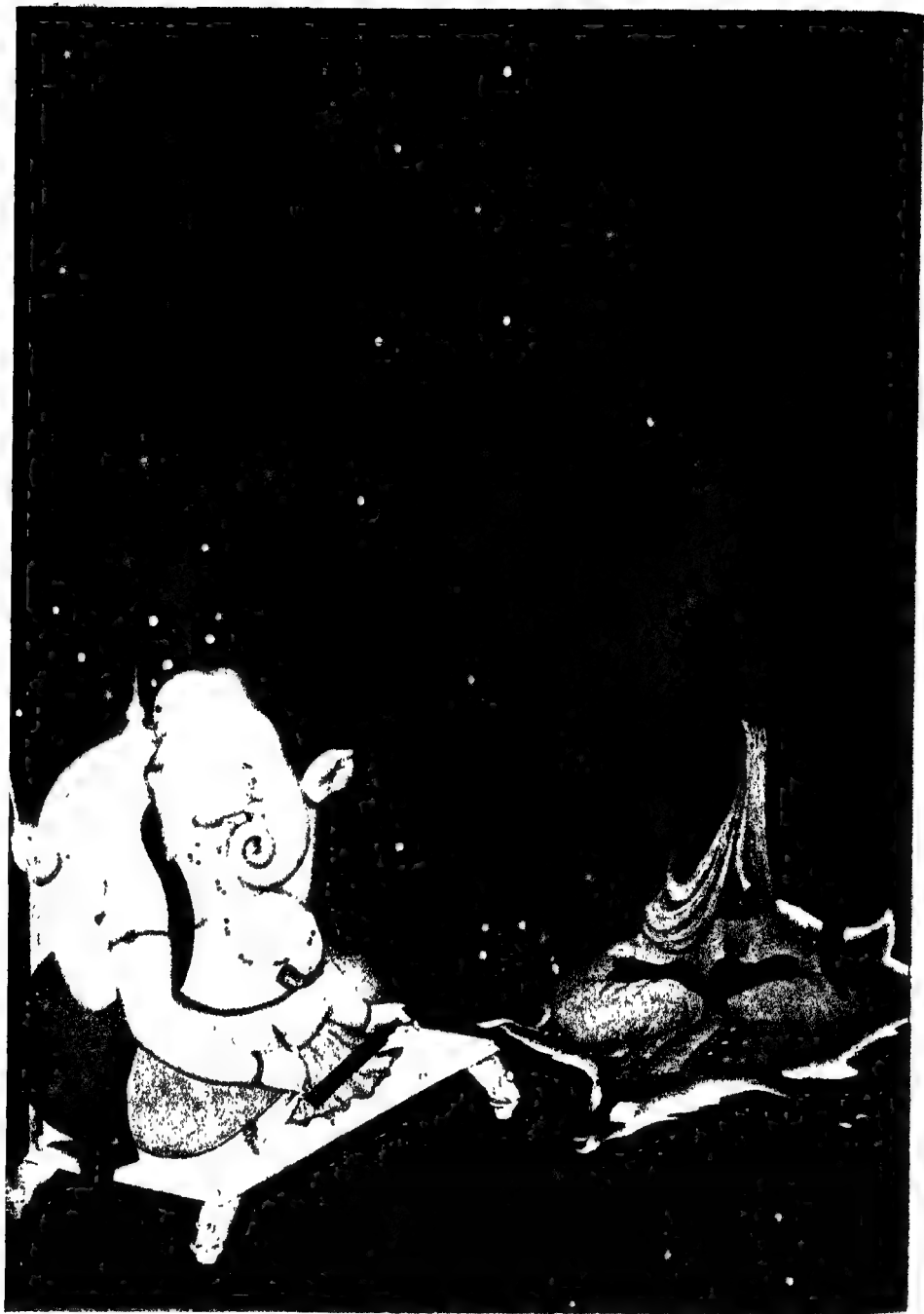
কে. ভি. সেন কর্ত্তৃক ব্লক | | কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ [২য় সংখ্যা

বিবাহ। (বৈশাখের অনুবৃত্তি)

(৪)

কন্যার পিতা নাই। পিতামহ গদাধর ভট্টাচার্য্যের ঘরবার করিয়া দিন কাটিতেছে। তাঁহাদের বাড়ীর বাহির হইতে রেলের গাড়ী দেখা যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সেইদিকেই চাহিয়া আছেন,—স্নানাহারের সময় গৃহে গমন করেন মাত্র,—আবার মালা জপ করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। এমনি করিয়া নিমেষমুহূর্ত্ত যায়, দিনও কাটে, সপ্তাহও প্রায় কাটিতে চলিল—তবু সুকুমারের বা তাহার পিতার দেখা নাই। তাহার পিতাও মকদ্দামার তদ্বির করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছেন।

কন্যার মাতা ভটচায মহাশয়ের পুত্রবধূ—শ্বশুরকে কিছু বলেন না, ভগবানকে ডাকিয়া, তাঁহার উপর একান্ত-প্রাণে নির্ভর করিয়া নীরবে ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন। কিন্তু কন্যার পিতৃস্বসা, ভটচায মহাশয়ের বিধবা কন্যা পিতাকে অন্য পাত্রের সন্ধানে তৎপর না দেখিয়া প্রতিদিনই তাঁহাকে অনুযোগ করেন। যে সকল আত্মীয়স্বজন বিবাহ নিমন্ত্রণে আসিয়া এখনো এখানে রহিয়া গেছেন তাঁহারাও অন্যান্য আমোদ আহ্লাদের অবসর সময়টুকু কর্ত্তাকে উত্যক্ত করিবার সুখ উপভোগে ত্রুটি করেন না। ভটচায মহাশয়ের কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস সুকুমার নির্দ্দোষ, অতএব সে ফিরিবেই, যথাসময়ে ফিরিবে,—তিনি সকল অভিযোগ অনুযোগ ভগবানের নাম জপিতে জপিতে নীরবে সহ্য করেন।

তাঁহার এ বিশ্বাস সত্বেও কিন্তু সাতদিন কাটিয়া গেল—সুকুমার আসিল না; এমন কি, সুকুমারের পিতাকে তিনি আকুল আগ্রহভরে যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার একখানিরও উত্তর পর্য্যন্ত এখনও পাইলেন না।

রবিবার প্রাতঃকালে তাঁহার বিধবা কন্যা শুষ্ক মলিনমুখে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল—"বাবা জাতকুল যে যায়! আজ মেয়ের বিয়ের দিন, আজ পাত্র ঠিক না করলে আর কবে হবে! তার আশা ছেড়ে দাও।"

বাহির বাটীর সম্মুখে পাথর বাঁধান নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে একখানা মাদুরের উপর বসিয়া কয়েকজন আত্মীয়স্বজন পাশা খেলিতেছেন, আর কেহ কেহ নিকটে বসিয়া খেলা দেখিতেছেন। ভটচায

মহাশয় তাঁহাদেরই পাশে রেল অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া মালা জপিতেছিলেন, এমন সময় কন্যার আবির্ভাবে এবং তাহার মুখের এই কঠোর সত্য কথায় নৈরাশ্য বেদনায় তীব্র সচঞ্চল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"সে কি হয় মা—সে যে নির্দ্দোষ।"

পাশা খেলার একজন দর্শক নিধিরাম চক্রবর্ত্তী হাতের হুঁকাটি বৈঠকে রাখিতে রাখিতে এই কথাগুলি শুনিলেন, শুনিয়া খেলা দেখার লোভ সম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চানন্দলাভের আশায় অবিলম্বে নিকটে আসিয়া উত্তরস্বরূপ কহিলেন—"ভটচায মহাশয় অনেক সময় নির্দ্দোষ লোককেও ত দোষী হতে দেখা যায়"। ভটচায মহাশয় যুবাকালে ন্যায়শাস্ত্র কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সেসব এখন প্রায় কিছুই মনে ছিল না—তথাপি নিধিরামের যুক্তিটা তাঁহার মনে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যে নির্দ্দোষ সে আবার দোষী হইবে কিরূপে? তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"হতেই পারে না,—সে যে বড় ভালমানুষ।"

"জানেন ভটচায মহাশয়—ভালমানুষ বলেই আরও ভয়! ভালমানুষ লোকই আজকাল দেশ দেশ করে পাগল, ভালমানুষ লোকেই দুষ্টুরা যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছে। দেশের নামে—খুন ডাকাতি"—

শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে ভটচায মহাশয়ের ধৈর্য্য রহিল না। তিনি অবিশ্বাসসূচক মাথা নাড়িয়া কহিলেন—ছোটবেলা থেকে জানি যে তাকে,—সে তা নয়।"

"কিন্তু আরও একটা কথা ত ভাবতে হবে। দোষী হোক নির্দ্দোষ হোক হাজতে ত রয়েছে—সকল জাতের ছোঁয়া নাড়া ত খাচ্ছে, জাত ইজ্জত ত আর রইল না—দাগীত বটে!"

ভটচায মহাশয়ের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল—দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"তবে তোমরা যা ভাল বোঝ তাই করো। কিন্তু—কিন্তু সৎপাত্রই বা কই?" তাঁহার কন্যা কহিলেন "সে আমরা ঠিক করেছি, শ্রীমন্ত বিয়ে করতে রাজি।" ভটচায মহাশয় আকুল মর্ম্ম বাঁধা বাক্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"শ্রীমন্ত! তার ছেলে, বৌ নাতি নাতনী—সে যে আমার নগেনের চেয়েও বড়। হা ভগবান—নগেনকে তুমি ডেকে নিলে—আর এই দুগ্ধপোষ্য সন্তানটিকে আমার কাছে রাখলে কি আমার হাত দিয়ে তাকে বলিদান নেবে বলে! মা ওকথা বলোনা মা,—আমি তা পারব না।"

"কি করবে বাবা—সবই বরাত! আমাকে ত ছেলেমানুষ বরের হাতেই দিয়েছিলে। আমার কপাল পুড়লো কেন বলো! যদি অদৃষ্টে থাকে এতেই সে সুখী হবে। আর দোজবরে বর আদরযত্ন খুব করবে—পয়সা কড়িরও দুঃখ নেই।"

নিধিরাম চক্রবর্ত্তী তাহার মতে সায় দিয়া গেলেন,—"তা বই কি সবই ত কপালের কথা। আর এখন পাঁচটা দেখা শোনারই বা সময় কোথা—মেয়েকে ত আজই পাত্রস্থ করতে হবে, নইলে জাতরক্ষা হয় কই?" বৃদ্ধের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে গভীর আনিষ্টাময় আতঙ্ক ঘূর্ণিপ্রবাহে আলোড়িত হইয়া উঠিল—কিন্তু তিনি বুঝিলেন,

সেই ঘূর্ণিপাকে আজীবন তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকিবে; তথাপি কন্যাকে তিনি অবিবাহিত রাখিতে পারিবেন না।

অনেকক্ষণ হইতেই রেলগাড়ীর শব্দ হইতেছিল,—এই সময় শব্দটা বাড়িয়া উঠিল, প্রবল শব্দে বাঁশিও বাজিয়া উঠিল। তিনি শেষবার আকুল প্রার্থনা করিয়া সুকুমারের আগমন প্রতীক্ষায় গাড়ীর দিকে চাহিলেন। গাড়ী থামিল, যাহারা নামিবার তাহারা নামিয়া পড়িল, আবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল; ভস্‌ভস্ শব্দে গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিবর্ণ মুখে জ্যোতি নির্গত হইল। একজন দ্রুতবেগে এইদিকেই আসিতেছে দেখিলেন। কিন্তু সে যখন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধের ঔৎসুক্যপূর্ণ উজ্জ্বল মুখ মুহূর্ত্তে নিরাশমলিন হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি সুকুমার! আমাদের সুকুমার কোথা? আসছে কি না জান?"

সুকুমারের বাড়ী যাইতে পথের ধারে ইহাদিগকে সমবেত দেখিয়া বন্ধু সুকুমার তখনি এইখানেই আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রশ্নে সবিস্ময়ে উত্তর করিল—"কেন সে কোথা? আজ যে তার বিয়ে।" তখন নিধিরাম এবং ভটচায মহাশয়ের কণ্ঠ উভয়ে মিলিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা ইনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, সে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল!

কথা শেষ হইলে নিধিরাম বলিলেন "এ বিপদে সুকুমার তুমি যদি রক্ষা কর তবেই বৃদ্ধ দায়মুক্ত হন। জানত হিন্দুর মেয়ে—তার গায়ে হলুদ পড়েছে—সুকুমার আসুক বা নাই আসুক আজ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—তুমি বিবাহ করলেই জাতকুল বজায় থাকে।"

সুকুমারকে কে যেন সহসা অতলসমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিল। অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া সে যন্ত্রবৎ বলিল—"সে যে আমার বন্ধু"।

"তুমি বিবাহ করলে বন্ধুতার কাজই হবে। ভেবে দেখ তুমি যদি বিয়ে না করত বিয়ে বন্ধ থাকবে না,—আজই কন্যার বিয়ে দিতেই হবে, শ্রীনন্তের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে।"

সুকুমারের হৃদয়ে একটা করুণ শিহরণ উঠিল। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"সুকুমার, বাবা বাঁচাও—অমত কোরো না। আমি এখনি তোমার মামাকেও ধরে পড়ছি।"

বিধাতাও সুপ্রসন্ন—এই সময় রায় মহাশয় পাশায় জিতিয়া সহাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ভট্টাচার্য মহাশয়ের করুণ অনুরোধ বৃথা হইল না,—তখনই দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। তাঁহাকে এই দায় হইতে মুক্ত করা সুকুমারের মামা বন্ধুত্ব ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিলেন! সুকুমার বন্দী হইল।

* * * *

বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ, আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া চলিয়াছে, নীলাম্বরে মেঘকণা নাই, দিক্ বিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্লাবিত; দিগন্ত বেলায় আঘাত করিয়া দক্ষিণানিল সুখতরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোকিল পাপিয়া দ্যুলোক ভূলোক মাতাইয়া কুহুকুহু পিউ পিউ তান তুলিয়াছে। বনগ্রামের দুঃখের কথা এখানে যেন আর কাহারও মনে

নাই, তাহার অন্তরে বাহিরে দীপ্তি মধুরতা শত ধারায় আজি উচ্ছ্বসিত। এই আনন্দ পূর্ণিমায় শুভক্ষণে শুভলগ্নে বর সভায় আসিয়া বসিল। এও সুকুমার—কেবল সে দুর্ভাগ্য সুকুমার নহে। হায়! ক্ষণ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—যে তাহাকে ধরিতে পারে, সেই সৌভাগ্যবান, যে পারে না---সে হতভাগা সকলেরই অবজ্ঞাভাজন, তাহার দুঃখ অধিকক্ষণ কাহারও মনে স্থান পায় না! পরিবর্ত্ত সুকুমার যখন বর বেশে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিল, তখন সমানই আনন্দে হুলুধ্বনি উত্থিত হইল, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, পুরবালাগণ সমানই আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে জামাইকে সমাদর করিয়া লইলেন।

জামাতাবরণ, স্ত্রী আচার, অঙ্গুরিবিনিময়, মাল্য বদল—শুভদৃষ্টি, সকলের মধ্যেই আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল, প্রশান্ত লঘুচিত্ত হইয়া প্রফুল্ল ভাবে ভটচায মহাশয় কন্যাসম্প্রদান করিলেন।

বিবাহ মন্ত্র শেষ হইয়া গেলে বরকন্যা অন্তঃপুরে যাইবেন বলিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেই সময় সভাতলে একটা অস্ফুট কানাকানি পড়িয়া গেল। "একি? এই যে সুকুমার! এখন—এত বিলম্বে?" সুকুমার মলিন বিবর্ণ মুখে ছায়াখানির ন্যায় স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া বর কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল;—তাঁহারা গ্রন্থি-বন্ধনে এক হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন,—সুকুমারের সেই স্বপ্ন মনে জাগিয়া উঠিল। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল:—"স্বপ্ন না সত্য? সত্যই কি আমার চাবি হারাইয়া গেল!"

সমাপ্ত।

কোম্পানীর দেওয়ানী

মুতক্ষরীণকার বলিয়া গিয়াছেন যে একটী গর্দ্দভ বিক্রয়ে যে সময় অতিবাহিত হয়, তদপেক্ষা অল্প সময়েও কোম্পানী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। সত্যই ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্না হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। প্রবল প্রতাপান্বিত সাহানসা দিল্লীর বাদসাহগণের উত্তরাধিকারী—হতভাগ্য সা আলম আজি গৃহশত্রুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের ভৃত্য লর্ড ক্লাইবের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। সেই জন্যই ১৭৬৫ সনের ১২ই আগষ্ট তারিখে ক্লাইবের ছাউনিতে ইংরাজ সৈন্যগণের আহার্য্যগ্রহণের টেবিলের উপরে সিংহাসনের পরিবর্ত্তে আরাম কেদারা স্থাপন করিয়া দিল্লীর বাদসাহ নামধারী সা আলম বা পৃথিবী-পতি ইংরাজ কোম্পানীকে দেওয়ানী সনন্দ দিয়া নিজেকে নিরাপদ ও কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। জীবন সংগ্রামে যে যোগ্যতমের জয় এই ঘটনা তাহারই অন্যতম প্রমাণ। কাংস্য পাত্রের সহিত মৃৎপাত্রের সংঘর্ষণ হইলে মৃৎপাত্রেরই চূর্ণ হইবার কথা। তাই ভারতের ভাবীরাজা ইংরাজের সহিত সা আলমের সংঘর্ষণে যোগ্যতমেরই জয় হইল।

দিল্লীর বাদসাহের অবস্থা তখন একান্ত শোচনীয়। গৃহবিবাদ, সিংহাসনের জন্য অনবরত যুদ্ধ, সীমান্তপ্রদেশ অধিকার

চ্যুত হওয়া, এবং নাদির, সাহ আহম্মদ সাহ মহারাষ্ট্র আক্রমণে সাম্রাজ্য বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহার মন্ত্রী বা উজীর গাজী উদ্দীন খাঁর ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি গোহর (যিনি ভবিষ্যতে সা আলম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) উজীরের কবল হইতে কোন প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বুন্দেল খন্দে পলায়ন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মোগল প্রতাপ শূন্য হইলেও মোগল নামে তখন কিছু মাহাত্ম্য ছিল। বিশেষতঃ সাজাদা বঙ্গাধিকার করিলে সাহায্য-কারীগণ যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিশ্রমের মূল্য আদায় করিতে পারিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। এই কারণে আলাহাবাদের নবাব মহম্মদ কুলী খাঁ, কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ, বিহারের জমিদার সুন্দর সিংহ এবং পালোয়ান সিংহ ও ত্রিহুতের নবাব কামগার খাঁ প্রভৃতি সকলেই স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সাজাদার পক্ষাবলম্বন করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও এই অভিযানে যোগদান করিলেন। পিতা কর্ত্তৃক বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া আলিগোহার শীঘ্রই আটহাজার সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ১৭৫৯ সনের প্রারম্ভেই কাশীধাম পৌছিলেন।

সাজাদার আগমন সংবাদে মুর্শিদাবাদ দরবার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। দ্বিতীয় আলমগীর নামে মাত্র বাদসাহ হইলেও তিনি যে তাঁহার পুত্রকে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতে পারেন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে মিরজাফর কি করিবেন? বাঙ্গালার মসনদে থাকিতে হইলে ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত যুদ্ধ নতুবা বাঙ্গলার মসনদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে মসনদে বসাইয়া কুর্ণিশ করিয়া নজর দিতে হয়! যুদ্ধের জন্য মিরজাফর আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। পাটনার নবাব রাজা রামনারায়ণ কোন পক্ষে যোগদান করিবেন তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। কোষাগার অর্থশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৈন্যগণ রীতিমত বেতন না পাইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া ক্লাইবের আদেশ না পাইলে কুচ করিবে না এইরূপ স্থির করিয়াছিল। এই অবস্থায় মিরজাফর সাজাদাকে নগদ কয়েক লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মিরজাফরের দুর্ভাগ্যবশতঃ শেটভ্রাতৃদ্বয় এই সময় পরেশনাথ দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাছে তাঁহারা সাহাজাদার সহিত যোগদান করেন এই আশঙ্কায় নবাব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মহারাট্টাগণের সাহায্য গ্রহণ, সাহাজাদাকে অর্থদানে পরিতুষ্টি ও অবশেষে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন।

অর্থদানে সাজাদাকে পরিতুষ্টি করা হইবে এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব নবাবকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে, কোন প্রকারেই যেন তিনি তাহা না করেন। নবাব যদি একবার এই পথাবলম্বন করেন, তবে সুজা উদ্দোলা, মহারাট্টারা এবং অন্যান্য অনেকেই এই প্রকার সহজ লভ্য রজতখণ্ডের লোভে ইচ্ছানুসারে এবং স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী মির্জাফরের রাজ্য আক্রমণ করিবে। আর

৬০ হাজার সৈন্যের অধিপতি প্রবল প্রতাপান্বিত জাফরআলি যদি সৈন্য সামন্তহীন বালককে কর বা উৎকোচ প্রদান করেন, তাহা হইলে লোকেই বা তাঁহাকে কি মনে করিবে? সাহাজাদার ৩০ সহস্র সৈন্য থাকুক্ না কেন ইচ্ছা করিলে অত্যল্প সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ও কয়েক সহস্র সিপাহী দ্বারা ক্লাইব সাজাদাকে দূরীভূত করিতে পারিবেন। এই আশ্বাসে মিরজাফর নিশ্চিন্ত হইলেন।

এ দিকে সাজাদাও ইংরাজের অনুগ্রহ লাভের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই প্রবলপ্রতাপান্বিত শালাবৎজঙ্গের নিকট অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষায় সাজাদা অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। "পৃথিবী হইতে কণ্টক উদ্ধার করিলে যেরূপ পুষ্পবৃক্ষের উন্নতি হয়' তদ্রূপ তিনি দুষ্কৃতকে শাসন করিয়া সুকৃতকে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব বাদসাহের ওমারহ তজ্জন্য তিনি ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং কণ্টকোদ্ধারে সাহায্য করিলে সাজাদা ক্লাইবকে ও কোম্পানীকে তাঁহাদেরই ইচ্ছানুযায়ী পুরস্কৃত করিবেন এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এতদুত্তরে ক্লাইব সাজাদার অনুচরগণকে পুনরায় তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন এবং আদেশ অমান্য করিয়া যদি তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আইসে তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন এইরূপ বলিয়া দিলেন। সাজাদাকে জানাইলেন যে সম্রাট যদিও তাঁহাকে ৬ হাজারী মনসবদারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সে জন্য যদিও তিনি সম্রাটের আদেশ পালনে বাধ্য কিন্তু সাজাদার শুভাগমন সংবাদ যখন বাদশাহ বা উজীর কেহই তাঁহাকে জানান নাই তখন তিনি সাজাদার সহিত যোগ দান করিতে তাঁহার আদেশ পালনে অক্ষম।

সাজাদার আদেশ প্রতিপালন না করিব অন্য কারণও ছিল। ইতিমধ্যে মিরজাফ দিল্লি হইতে সম্রাটের এক আদেশ প্রা হইলেন, "সাজাদা কুলোকের পরাম পূর্ব্বাঞ্চলে আক্রমণ করিতে যাইতে ছেন। ইহাতে রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হই এবং সেই জন্য মীরজাফর যেন পত্রপা পাটনায় যাইয়া সাজাদাকে বন্দী করেন এ সাজাদার সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাগণে শাসন করেন।" অবশ্য এ আদেশ পৌঁছিলেও ক্লাইব যে সাজাদার পক্ষাবলম্ব করিতেন না ইহা নিশ্চিত। তবে মিরজাফরে ইহাতে সুবিধা হইল। বাদশাহের পত্রখানি যদিও উজীরের লিখিত কিন্তু তত্রাপি আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মিরজাফর সাজাদাকে আক্রমণ করিতে আর কোনও দ্বিধাবো করিলেন না। সাজাদাও ক্লাইবের অসম্মতি সূচক পত্র পাইয়া ফরাশী মীর লকে তাঁহা পক্ষাবলম্বনে অনুরোধ করিলেন। ল তখ বুন্দেল খণ্ডের রাজার অধীনে কার্য্য করিতে ছিলেন।

১৭৫৯ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪৫০ শত গোরা ও ২৫০০ সিপাহী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়া মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগেই মুর্শিদাবাদ পৌঁছিল। তথায় নবাবকে আশ্বাস প্রদান ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া ক্লাইব ও ছোট নবাব ১৩ই মার্চ্চ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পৌঁছিল যে সাজাদা কর্ম্মনাশা পার হইয়া পাটনা

অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন এবং রাজা রামনারায়ণ সাজাদার সহিত যোগদান করিয়াছেন। এ সংবাদে ইংরাজ পক্ষ কিছু ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ক্লাইব তদ্দণ্ডেই রামনারায়ণকে তিরস্কার করিয়া পত্র দিলেন কিন্তু পত্রোত্তরে রামনারায়ণ জানাইলেন যে সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং প্রাণপণে তিনি পাটনা রক্ষা করিবেন ইহাই তাঁহার দৃঢ় পণ।

বস্তুতঃ রামনারায়ণ দুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সম্ভবতঃ রামনারায়ণ ক্লাইবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সময়াতিপাতের জন্য নানাছলে সাজাদার মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন মাত্র। রামনারায়ণের ইহা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পাটনা সুরক্ষিত ছিলনা; সৈন্যসংখ্যা অত্যল্প এবং রামনারায়ণ মুর্শিদাবাদ দরবার বা ইংরাজদিগের নিকট হইতেও কোন সংবাদ পান নাই। অনন্যোপায় হইয়া তিনি কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়ট সাহেবের মত চাওয়াতে আমিয়ট উত্তর দিলেন যে, যদি সাহায্য সময়মত পৌছে তবে তিনি কুঠীতে থাকিবেন নতুবা তিনি বঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। রামনারায়ণ যত দিন পারেন তত দিন সাজাদাকে প্রতারণা করিতে থাকুন এবং অবশেষে যাহা তিনি ভাল বোধ করেন তাহাই করিতে পারেন। রামনারায়ণ মিরজাফর ও ক্লাইবকে যতশীঘ্র সম্ভব পাটনা পৌছিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাজাদার নিকটে দূত প্রেরণ করিতেও ত্রুটি করিলেন না।

সাজাদা কর্ম্মনাশা পার হইয়াছেন এই সংবাদ পাটনা পৌছিবামাত্র আমিয়ট ও কুঠীর অন্যান্য সাহেবেরা পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া রামনারায়ণ সাজাদার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার যথোপযুক্ত আদরঅভ্যর্থনা হইল। তাঁহাকে খেলাৎ প্রদান করা হইল এবং সাজাদা তাঁহাকে বেহারের শাসনকর্ত্তার পদে বহাল রাখিলেন। চতুর রামনারায়ণ ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। শিবিরে অবস্থান কালীন সাজাদার সৈন্যাবলীর ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণে তাঁহার প্রতীয়মান হইল যে, সাজাদার পক্ষাবলম্বন কিছুতেই সমীচীন হইবে না। কয়েকদিন ছাউনিতে অতিবাহিত করিয়া তিনি পাটনায় প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সাজাদার সৈন্য পাটনার সম্মুখীন হইলেও তিনি নানা ছলে আরও কয়েক দিন কাটাইয়া দিলেন। নৌরোজ উৎসবের জন্যও সাজাদার কয়েক দিন বিলম্ব হইল। পরিশেষে রামনারায়ণ যখন ক্লাইব ও ছোট নবাবের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি প্রকাশ্য ভাবে সাজাদার শত্রুতা করিতে লাগিলেন। বাদসাহী সৈন্য নগর আক্রমণে বিফল মনোরথ হইয়া নগর অবরোধ করিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইতি মধ্যে কর্ণেল ক্লাইব প্রেরিত একদল সৈন্য পাটনায় পৌছিল; সাজাদা তখন পাটনা অবরোধ ও গ্রহণের আশা পরিত্যাগ করিয়া পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে সাজাদার সহিত ফরাসী বীর লর সাক্ষাৎ হওয়াতে ল সাজাদাকে পাটনা প্রত্যাগমনে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সাজাদার

সৈন্য মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ ঘটিয়া উঠিয়াছিল। মহম্মদকুলি খাঁর অনুপস্থিতিতে সুজাউদ্দৌলা, এলাহাবাদ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মহম্মদ কুলী খাঁ এই সংবাদে আলাহাবাদ পুনরধিকারের জন্য এখানে প্রত্যাগমনার্থ উৎসুক ছিলেন। ইত্যাদি কারণে কেহই সাজাদার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। কামগার খাঁ ও পালোয়ান সিং স্বস্ব জমিদারীতে প্রস্থান করিলেন; মহম্মদ কুলি খাঁ এলাহাবাদ অধিকারে বিফল মনোরথ হইয়া বন্দী হইয়া অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। সাজাদা এরূপ ক্ষেত্রে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিনীত ভাবে ক্লাইবের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দ্বিতীয় আলমগীর 'অবাধ্য পুত্রকে' বন্দী করিবার জন্য মিরজাফরের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্লাইব ইচ্ছা করিলেই এইক্ষণে আলি গোহারকে বন্দী করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি উহা সমীচীন বোধ করিলেন না। সত্য বটে, দিল্লীর বাদসাহের প্রতাপ বলিতে কিছুই নাই কিন্তু তত্রাপি মোগল নামের মহিমা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সেই জন্য ক্লাইব কয়েক সহস্র মুদ্রা সাজাদাকে প্রেরণ করিলেন। সাজাদাও ছত্রপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে সাজাদার প্রথম অভিযান ব্যাপার শেষ হইল।

সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হইলেও সাজাদার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা সম্ভব ছিল না। পরামর্শদাতারও অভাব ছিল না। কামগার খাঁ সাজাদাকে অনবরতই উৎসাহ দিতেছিলেন। এই সময় সাজাদা অপ্রত্যাশিত সাহায্যও প্রাপ্ত হইলেন। ছোট নবাব মীরণ কয়েকজন আফগান সেনাপতিকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আসালৎ খাঁ ও দিলীর খাঁ প্রতিহিংসা সাধন মানসে সাজাদার সহিত যোগদান করিলেন। সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া সাজাদা কর্ম্মনাশা পার হইলেন এবং এই সময়ে অন্য আর এক ঘটনায় তাঁহার অভিযানের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।

আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে দিল্লির তৎকালীন অবস্থার আভাস দিয়াছি। দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহার উজীরের হস্তে বন্দী ও ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। উজীর অযোধ্যার নবাবকে ও রোহিলাগণকে শাসন করিবার জন্য মহারাষ্ট্রসাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু উজীরের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দিল্লিতে সংবাদ পৌছিল যে দুরন্ত আবদালী পুনরায় ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সকল ঘটনায় ও সংবাদে নৃশংস উজীর হতভাগ্য আলমগীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিল। কর্ম্মনাশা নদীতীরে সাজাদার নিকট এই সংবাদ পৌছিল।

সংবাদ পৌছিবামাত্র সাজাদার পাত্রমিত্রগণ তাঁহাকে দিল্লির বাদসাহ বলিয়া অভিবাদন করিল। আলি গোহার সা আলম বা পৃথিবীপতি নাম ধারণ করিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে উজীরত্ব প্রদান করিলেন। সুজাউদ্দৌলা সসম্মানে এই অভিনব পদবী গ্রহণ করিয়া নবীন সম্রাটের নামে মুদ্রা

প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শাসন কর্ত্তাগণও বাদ পড়িলেন না। রোহিলাধ্যক্ষ নাজির উদ্দৌলাকে খেলাৎ ও আমির উল ওমরা উপাধি প্রেরিত হইল এবং অন্যান্য যে সকল সামন্ত সাআলমকে সাহায্য করিয়া ছিলেন বা করিতেছিলেন এবং যাহাদের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল সকলেই কিছু না কিছু উপাধি পাইলেন। আহাম্মদ শাহ আবদালীর নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা হইল।

প্রকৃত পক্ষে পলাতক 'অবাধ্য সন্তান' আলিগোহার ও বর্ত্তমান পৃথিবীপতি উপাধি-ধারী সাআলম একই ব্যক্তি হইলেও উভয়ে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে দিল্লীর তক্ত সাআলমেরই প্রাপ্য; পরাক্রান্ত অযোধ্যার নবাব প্রকাশ্য ভাবে সা আলম দত্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন করাতে ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অনেকেই সাআলমের পক্ষে যোগ দান করিতে লাগিলেন। কামগার খাঁ পাঁচহাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ সাআলমের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন।

১৭৬০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভেই বাদসাহী সৈন্য পাটনা পৌঁছিল। এদিকে ক্লাইব বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই কর্ণেল কেলডের অধীনে তিন শত গোরা সৈন্য, একদল গোলন্দাজ, ৬টী কামান, ও একহাজার সিপাহী মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ সনের ২৬শে ডিসেম্বর এই সৈন্যবাহিনী মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলে ক্লাইব আরও ২০০ শত গোরাকে কলিকাতা হইতে এই দলের সহিত যোগদানে আদেশ প্রদান করিলেন। ছোট নবাব মীরণের অধীনে নবাবী ফৌজ প্রেরণের ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। অর্থাভাববশতঃ কিছু অসুবিধা হইলেও শীঘ্রই পঞ্চদশ সহস্র নবাবী সৈন্য ও ২৫টী কামান, ১৭৬০ সনের ১৮ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইল।

নবাবী ও ইংরাজ সৈন্য পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই রামনারায়ণ প্রস্তুত হইতেছিলেন। নিকটবর্ত্তী জমীদারবর্গের সাহায্যে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং কাপ্তেন কোক্রেনের সৈন্য সহ তিনি সাআলমের গতি-রোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাআলমের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিরস্ত থাকিতে তিনি নবাবের উপদেশ পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করাতে রামনারায়ণের সাহস বৃদ্ধি হইল; তিনি বাদসাহী সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মুসিমপুর প্রান্তরের যুদ্ধে রামনারায়ণ জয়লাভ করিতে পারিলেন না। কামগার খাঁ, দিলীর খাঁ এবং আসালৎ খাঁ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন দিলীর ও তাঁহার ভ্রাতা আসালৎ প্রচণ্ড বিক্রমে রামনারায়নী সৈন্যকে হঠাইতেছিলেন, তখন পালোয়ান সিং ও মোরাদ খাঁ নবাবী পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহী পক্ষে যোগ দান করিল। ইহাই রামনারায়ণের পরাজয়ের প্রধান কারণ। কিন্তু তত্রাপি রামনারায়ণ ও তাঁহার সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন কোক্রেনের অধীনস্থ সৈন্যও রাম নারায়ণকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। দিলীর ও আসালত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের বাঞ্ছনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন

কিন্তু কামগার খাঁর আক্রমণে রহিম খাঁ ও মুরলীধর বন্দী হইলেন। অবশেষে রামনারায়ণ নিজেই আহত হইলেন। কোক্রেনের অধীনস্থ সৈন্যগণ রাজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট থাকিল তাহারা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সাআলম বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে হতব্যক্তিগণের গোরের আদেশ প্রদান করিলেন। এই ব্যাপারে অত্যধিক সময় অতিবাহিত হইল। যদি যুদ্ধ শেষে নবীন বাদসাহ সত্বর পাটনা আক্রমণ করিতেন তবে সহজেই পাটনা করতলগত হইত। এদিকে রামনারায়ণ আহতাবস্থাতেও নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্ববারের ন্যায় বাদসাহ সমীপে দূত প্রেরণ করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। বাদসাহ নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী কালিয়দ ও নবাবী সৈন্য পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল।

২২শে তারিখে কালিয়দ নিকটবর্ত্তী দুইটী গ্রাম অধিকার করিয়া তথায় এক এক দল সিপাহী রাখিলেন। বাদসাহী সৈন্য ঐগ্রামস্থ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলে কালিয়দ তথায় গোরাসৈন্য ও কামান প্রেরণ করিলেন। এই অবস্থায় বাদসাহী সৈন্য নবাবী সৈন্য আক্রমণ করিল। নবাবী সৈন্যের মধ্যস্থলে গোরা-সৈন্য ও উভয় পার্শ্বে সিপাহীসৈন্য সমাবেশ করা হইল। বাদসাহী সৈন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নবাবী সৈন্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীতে খাদির দাদখান তুরাণী এবং লক্ষ্মৌয়ের গোলামী সা অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণী কামগার খাঁর অধীনে এবং তৃতীয় শ্রেণী স্বয়ং বাদসাহের অধীনে ছিল।

মীরণের সৈন্য-সমাবেশ উত্তম হয় নাই। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রারম্ভেই মীরণের গোলন্দাজী সৈন্য কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইংরাজের প্রচণ্ড গোলাঘাতেও বিন্দুমাত্র কাতর না হইয়া বাদসাহী অশ্বারোহী মীরণের সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নবাবী সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উদ্যোগ করায় মেজর কালিয়দ বাদসাহী সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য বাদসাহী সৈন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহারা পলায়ন করিল। মাত্র চারি ঘণ্টা-ব্যাপী সেরপুরের যুদ্ধে সাআলম পরাজিত হইয়া আট ক্রোশ দূরে বেহার প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে মীরণ গলদেশে আহত হইয়াছিলেন বলিয়া নবাবী সৈন্য আর সা আলমের পশ্চাদ্ধাবনের অবকাশ পাইল না।

সাআলম পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপথে মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিলেন। এ সংবাদে সেখানে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বিশেষতঃ এই সময় পূর্ণিয়ার নবাব খাদেম হোসেন বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইলেন। তাঁহার সহিত মিটমাট হইবামাত্র নূতন এক শত্রু দেখা দিল। এক দল মহারাষ্ট্র সৈন্য শিবরতের অধীনে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা কুশল সিংকে পরাজিত করিয়া—তাহারা বাদসাহের সাহায্যার্থ উপস্থিত এইরূপ প্রচার করিল। বস্তুতঃ মারাট্টিগণ লুণ্ঠনের সুবিধার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। যাহা হউক কুশল

সিংহকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্রগণ হুগলি ও কলিকাতা আক্রমণ করিল, এবং বাদসাহ মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলে তাঁহার সহিত যোগদানের ব্যবস্থাও করিল।

কলিকাতা কৌন্সিল ও মুর্শিদাবাদের দরবার ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় সৈন্যের ব্যবস্থা হইতে লাগিল এবং বৰ্দ্ধমানে সৈন্য প্রেরিত হইল। নবাবী ও ইংরেজসৈন্যকে বহুপশ্চাতে রাখিয়া বাদসাহ শীঘ্রই মুর্শিদাবাদে পৌঁছিবেন এই সংবাদে নবাব কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাদসাহের নিকট নিজ বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধে কোনরূপ চেষ্টা করিবেন না এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন। নবাব এসংবাদ কলিকাতা কৌন্সিলকে জানাইলেন না বটে কিন্তু কৌন্সিলের আদেশে অবশেষে তাঁহাকে বৰ্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

এদিকে বাদসাহের পশ্চাতে পশ্চাতে নবাবী ও ইংরাজের ফৌজ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদসাহের ভুল বশতঃ কালিয়দের অধীনস্থ ইংরাজ ও নবাবী সৈন্য ও মিরজাফরের সৈন্য একত্রিত হইল। কালিয়দ সেই সময়ই বাদসাহকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন কিন্তু মিরজাফর ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বাদসাহ যদি সেই সময়ে নবাবী ফৌজ আক্রমণ করিতেন, তবে খুব সম্ভব জয়লাভ করিতে পারিতেন কেননা মিরজাফরের আদৌ বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাদসাহ ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না এবং দামোদর পার হইয়া তিনি পুনরায় পাটনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বাদশাহের প্রত্যাগমনের সংবাদ নবাবী ফৌজ কয়েকদিন অবগত হইতে পারে নাই কিন্তু কালিয়দ এই সংবাদ পাইবা মাত্র কাপ্তেন নক্সের অধীনে ১৬ই এপ্রিল একদল সৈন্য পাটনা রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন।

বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সহ বিহার পৌঁছিলে ফরাসী ল তাঁহার সৈন্যদল সহ বাদশাহের সহিত যোগদান করিলেন। পরে তাঁহারা পাটনা অবরোধ করিলেন। এবার অবরোধের ভার ল সাহেবের উপর অর্পিত হইল। দুর্গ মধ্যে রামনারায়ণ, শেতাভ রায় এবং ডাক্তার ফুলারটনের অধীনে কুঠীর সাহেব ও সিপাহীগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ল সাহেব প্রথমতঃ বিশেষ সুবিধা করিতে না পারায় এক সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক হইতে নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু জিয়ান উল আবাদ খাঁ নামক বাদসাহের এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এই আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন।

তত্রাপি রামনারায়ণ যে অধিক দিন আর দুর্গরক্ষা করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হইল না। সৌভাগ্য বশতঃ কালিয়দ কর্ত্তৃক প্রেরিত কাপ্তেন নক্স এই সময়ে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন নক্স ১৩ দিনে ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। এবং সৈন্যদের প্রোৎসাহিত করিবার জন্য নিজেও সমস্ত পথ পদব্রজে আসিয়াছিলেন। নদীপার হইয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত এই সৈন্যবাহিনী পাটনা পৌঁছিলে রামনারায়ণ ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল আশ্বস্ত হইল। রাত্রিকালেও অক্লান্ত কৰ্ম্মা নক্স অন্য দুই জন ইংরাজ সৈন্যের সহিত বাদশাহী সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে

লাগিলেন; এবং তৎপর দিন যখন বাদসাহী সৈন্য দ্বিপ্রহরে দিবনিদ্রার আরাম উপভোগ করিতেছিল তখন কামগার খাঁকে আক্রমণ করিলেন। কামগার খাঁ এই আকস্মিক বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। সুদক্ষ নক্স কামগার খাঁর পতাকা কামান ও সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যাদি সহজেই অধিকার করিয়া নগর প্রত্যাগমন করিলেন। এপ্রকার শত্রুর সন্নিকটে থাকা সমীচীন নয় বুঝিয়া কামগার খাঁ পাটনা হইতে দূরে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং সা আলমও পাটনা অবরোধের আশা পরিত্যাগ করিয়া গয়া মৌনপুরে পশ্চাদ্গমন করিলেন।

ইতি মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খাদেম হোসেন বাদসাহের সহিত যোগদান মানসে অগ্রসর হইতেছিলেন। নক্স এই সংবাদ অবগত হইয়া খাদেম হোসেনকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। রামনারায়ণ এ সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু শ্বেতাভ রায় নক্সের সহিত যোগদান করাতে তাঁহারা রাত্রি যোগে খাদেম হোসেনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পথভ্রষ্ট হইলেও নক্স ও শ্বেতাভ রায় সামান্য অষ্টাশত পদাতিক, তিন শত অশ্বারোহী ও ৫টী কামান সহ দশ সহস্র পদাতিক ছয় সহস্র অশ্বারোহী এবং ৩০টী কামানের অধিকারী খাদেম হোসেনকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হইলেন না। হোসেনী সৈন্য এই মুষ্টিমেয় সৈন্যগণকে ঘিরিয়া ফেলিল কিন্তু ছয় ঘণ্টার যুদ্ধেও তাহাদের কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে ৪০০ শত মৃতসৈন্য, ৩টী হস্তী এবং ৮টী কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজ পক্ষে ৯৬ জন গোরাসৈন্য ও ঐ সংখ্যক সিপাহী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ইংরাজ পক্ষীয় সিপাহীগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে অপরাজেয় তাহারই প্রমাণ দিয়াছিলেন।

নক্স খাদেম হোসেনের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কালিয়দ ও মীরণ আসিয়া পৌঁছিলেন। মীরণের তৎপরতার অভাবে ইংরাজ খাদেম হোসেন বা তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি আটক করিতে পারিলেন না। যাহা হউক ২রা জুলাই মীরণ বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইলেন। কয়েক দিন এ সংবাদ গোপন করিয়া রাখা হইল কিন্তু এরূপ অবস্থায় শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন সমীচীন নহে বলিয়া মেজর কালিয়দ সসৈন্যে পাটনা প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুদিন পরেই মীরজাফর পদচ্যুত হইলেন ও মীরকাসেম বাংলার মসনদে আসীন হইলেন।

সা আলম ইতি মধ্যে বিহারে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। দাউদনগর ও গয়ায় সৈন্যনিবাস স্থাপনা করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি নিজ বলবৃদ্ধি করিতেছিলেন। কামগার খাঁ, রাজা ভূনিয়াদ সিং এবং অন্যান্য কয়েক জন জমিদার তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ১৭৬১ সনের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে নবাবী সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া মহানী নদীর শাখা বানোরা নদীর তীরস্থ সুয়ান গ্রামে পৌছিল। নদীর অপর

পারে বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। ইংরাজ ও নবাবী সৈন্যের অধ্যক্ষ মেজর কার্ণাক বাদসাহী সৈন্য আক্রমণ করিলে, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বাদশাহের হস্তী আহত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মাহুতও এই সময়ে হত হয়; সুতরাং হস্তীকে দমন করিবার কোনই উপায় রহিল না। দলপতির এই দশায় বাদসাহী সৈন্য ভীত হইয়া, পলায়নপর হইল। কেবলমাত্র মেজর ল ও তাঁহার অধীনস্থ ১৩।১৪ জন সেনানী এবং পঞ্চাশ জন সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ইঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন। মেজর কার্ণাক, কাপ্তেন নক্স ও অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহাদের সাহসে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ল প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে প্রাণ থাকিতে তাঁহারা তরবারী পরিত্যাগ করিবেন না। মেজর কার্ণাক এই সকল বীরপুরুষের জীবন রক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় ইহাদিগকে বন্দী করিয়া সসম্ভ্রমে ছাউনিতে আনয়নপূর্ব্বক বন্ধু ভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেন।

বাদশাহ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় পাটনাভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুয়ানের যুদ্ধের পর কার্ণাক শ্বেতাভ রায়কে বাদসাহের শিবিরে সন্ধির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কামগার খাঁর চক্রান্তে শ্বেতাভ রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্বেতাভ রায় প্রস্থানের সময় সাআলমকে পরিষ্কারই বলিয়া আসিলেন 'যে বাদসাহের পক্ষে এইরূপ সন্ধিকরাই সমীচীন ছিল; পরে এরূপ সুবিধা মত সর্ত্ত তিনি পাইবেন না। ২৯ শে জানুয়ারী সম্রাট নিজ বক্সী ফয়জুল্লা খাঁকে মেজারের নিকট সন্ধির জন্য প্রেরণ করিলেন। কুচক্রী কামগার খাঁকে পদচ্যুত না করিলে মেজর কিছুই করিতে পারিবেন না এইরূপ বলিয়া পাঠাইলে সম্রাট ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সৈন্য ইতি মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা বাদশাহী সৈন্যকে আক্রমণ করিলে বাদসাহী সৈন্য পলায়ন করিল।

গত্যন্তর না দেখিয়া সাআলম কামগার খাঁকে পদচ্যুত করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী কার্ণাকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ৭ই তিনি ইংরাজ শিবিরে আসিয়া অভ্যর্থিত হইয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলেন এবং নিরাপদ হইবার জন্য ইংরাজ শিবিরের নিকট ছাউনি ফেলিলেন। কলিকাতা হইতে সংবাদ যতদিন না পৌছে ততদিন প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের বংশধর পৃথিবীপতি বলিয়া আখ্যাত বাদসাহ দৈনিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রা পাইবেন স্থিরীকৃত হইল। এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া কার্ণাক ও বাদসাহ ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় পৌছিলেন।

পাটনায় পৌছিবার পর বাদসাহ তাঁহার নামে মুদ্রা ও খোৎবা প্রচারের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বিনীতভাবে দৈনিক কিছু বেশী করিয়া টাকা প্রার্থনা করিলেন। কার্ণাক কলিকাতা হইতে না জানিয়া সম্রাটের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না বলিলেন; কিন্তু সম্রাটের কাতর নিবেদনে দৈনিক

বৃত্তির হার ৩০০ শত করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

মীরকাসেমখাঁর বাংলার মসনদ প্রাপ্তির কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মীরকাসেম আলি খাঁ প্রথমতঃ বাদসাহের সহিত সাক্ষাতে অভিলাষী ছিলেন না কিন্তু মেজর কার্ণাকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধে ১২ই মার্চ্চ তারিখে পাটনায় ইংরাজকুঠীতে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। বাদসাহ কুঠীর হলঘরে পৌঁছিলে মেজর কার্ণাক, ইংরাজকুঠীর অধ্যক্ষ ম্যাকগিয়ার সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ বাদসাহকে কুর্ণীস করিয়া নজর প্রদান করিলেন। নবাব মীরকাসেম আলিও উপস্থিত হইয়া বাদসাহকে ১০০১ মোহর এবং একশত এক পাত্র পূর্ণ মণি মুক্তা, সাল, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি উপহার দিলেন। বাদসাহের এক পার্শ্বে মেজর কার্ণাক ও ম্যাকগিয়ার সাহেব অন্যদিকে মীরকাসেম আসন গ্রহণ করিলেন। মীরকাসেম বাদসাহকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা করপ্রদানের অঙ্গীকার করিলে সাআলম মীরকাসেমকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দরবার ভঙ্গ হইল।

সাআলম এই সময় কোম্পানীকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রদানে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে এবং দিল্লি অধিকারে সাহায্য স্বীকার না করায় বাদসাহ সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতির পরামর্শে জুন মাসে পাটনা পরিত্যাগ করিলেন। মীরকাসেম বাদসাহকে যাইবার পূর্ব্বে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিলেন এবং মেজর কার্ণাক কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত তাঁহার সহগামী হইলেন। সুজাউদ্দৌলা কর্ম্মনাশার অপর পারে তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কয়েকদিন লক্ষ্ণৌ বাস করিয়া তিনি দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দুঃখের বিষয় সিংহাসনলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না; অধিকন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী উজীর দ্বিতীয় আলমগীরকে যেরূপ আবদ্ধ করিয়াছিলেন সুজাউদ্দৌলাও সাআলমের সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে পুনর্ব্বার সিংহাসন বিক্রয় হইয়া গেল। মীরকাসেম আলিখাঁ পদচ্যুত হইয়া অযোধ্যাপতি সুজাউদ্দৌলার সহিত একত্র হইয়া ইংরাজ দমনে বৃথা প্রয়াস করিলেন। বক্সার ক্ষেত্রে ইংরাজ জয়লাভ করিলেন।

বক্সার যুদ্ধের পর বাদসাহ ইংরাজের নিকট গৃহশত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি মেজর মনরো এবিষয়ে কলিকাতা কৌন্সিলের অনুমতি না পাইলে কিছুই করিতে পারিবেন না এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। সম্রাটের ২২শে নভেম্বরের (১৭৬৩) আবেদনের প্রত্যুত্তরে কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ ডিসেম্বর মাসে মেজর মনরোকে সম্মতিসূচক পত্র দিলেন। এই পত্রের মর্ম্মানুযায়ী ১৭৬৪ সনের ২৯ ডিসেম্বরে বাদসাহ বলবন্ত সিংহের জমিদারী ব্যতীত অযোধ্যার অন্যান্যাংশ সনন্দ দ্বারা ইংরাজ-কোম্পানীকে প্রদান করিলেন।

কিন্তু এ সনন্দ আবার পরিবর্ত্তন করিতে

কোম্পানীর দেওয়ানী।

হইল। মীরকাসেমের সহিত বিবাদের সংবাদ পাইয়াই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সনের ৩রা মে ক্লাইব কলিকাতা পৌঁছিয়া পূর্ব্বতন সন্ধি পরিবর্ত্তন করিতে মানস করিলেন। ক্লাইব বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বঙ্গবিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হইল। ক্লাইবের তাম্বুতে আরামকেদারায় উপবিষ্ট হইয়া আকবর আরংজীবের বংশধর বাৎসরিক ২৬ লক্ষ মুদ্রার জন্য সনন্দ দ্বারা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরাজকে প্রদান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ইংরাজই রাজা হইলেন।

বিধাতার আদেশ যে অরাজক দেশকে ইংরাজই শান্তি দিবেন তাই যে ইংরাজ বণিক একদিন বাংলায় আসিয়া সসম্মানে নতজানু হইয়া মোগলবাদসাহের নিকট বাণিজ্যাধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে মুষ্টিমেয় বণিকদল সদাসর্ব্বদা মোগলকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলবাদসাহের বংশধর কাতরকণ্ঠে সেই ইংরাজের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া গৃহশত্রুর হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিলেন।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* ইংরাজ ইতিহাসিক দৈনিক সহস্রমুদ্রা বৃত্তিভোগী সা আলমকে 'generous' আখ্যাপ্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। জেনারল কার্ণাক সা আলমের নিকট দুই লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। এলাহবাদস্থ কোম্পানীর এজেন্ট কর্ণেল স্মিথও (যাহাকে মুতক্ষরীণকার আসমাথ নামে আখ্যাত করিয়াছেন) ২ লক্ষ মুদ্রা 'টীপ' পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই স্মিথের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মুতক্ষরীণকার লিখিয়াছেন যে স্মিথ সামান্য এজেন্ট হইলেও সম্রাটের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। "The Emperor was obliged to remain within, where to conceal his shame he amused himself in finishing with brick and stone some buildings which he had heretofore commenced." কিন্তু ইহাতেও তিনি নিস্তার পান নাই। চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সিংহদরজার উপর প্রত্যহ নহবৎধ্বনি হইত কিন্তু স্মিথের অসুবিধার জন্য ইহাও স্মিথ বন্ধ করিলেন। মুতক্ষরীণ অনুবাদক রেণল এই ঘটনার উপর টীকা স্বরূপ লিখিয়াছেন যে "This was a much graver affront than an European could apprehend; for this music, which consisted of a variety of instruments and played 3 or 4 times a day, and once at night, is a mark of sovereingty and always of command."

এই প্রবন্ধ মুতক্ষরীণ, ক্রম ও পেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইল। ক্রমের বৃত্তান্ত অধিকাংশস্থলেই বিশ্বাসযোগ্য। মুতক্ষরীণকার প্রবন্ধ বর্ণিত অনেকগুলি ঘটনার সহিত নিজেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্তও বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি মুসলমানের Prestige রক্ষার জন্য অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছেন।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

১

জ্বলিছে পিঙ্গল জটা পূর্ব্বাকাশ শিরে
তেজঃপুঞ্জ মহাযোগী বসি যোগাসনে!
ধ্যানান্তে বিশাল নেত্র উন্মিলেন ধীরে,
সভয়ে দ্যুলোকবাসী নত শিরে নমে!
সম্মুখে সুস্নাতা—করে অক্ষ বীজ মালা,
ভূষিতা আরক্ত পদ্ম চম্পকের দলে,
পরিচর্য্যা তরে নম্রা ক্ষৌমবস্ত্রা বালা,
করবী মেখলা মুহু স্রস্ত পদতলে!
যোগীর সে ব্রহ্ম জ্যোতি হেরিয়া নয়নে
সহসা স্পন্দন এল নিমেষের তরে,
বালার সুলজ্জ নম্র রঞ্জিত বদনে,
মুগ্ধ দৃষ্টি স্তব্ধ স্থির ক্ষণেকের তরে!
জাগিল ললাট বহ্নি ঈষৎ কম্পনে
নিশ্চল অনঙ্গ দূরে তুলি শরাসনে!

২

হে রুদ্র হে ভয়ঙ্কর সংহর সংহর
প্রচণ্ড ললাট বহ্নি মহা বিশ্বনাশী,
লেলিহ উত্তপ্ত শ্বাস সম্বর সম্বর
নিমেষে অনঙ্গ ওই হ'ল ভস্মরাশি!
আর্ত্ত রতি বিলাপেতে বিশ্ব ভরি ওঠে,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে জাগিছে ক্রন্দন,
মূর্চ্ছিতা প্রকৃতি রুদ্রপদতলে লোটে,
স্তম্ভিত বিশ্বের বক্ষে নীরব স্পন্দন!
দিগন্ত বিস্তৃত বক্র ভীম জটা ভার,
ভালে দীপ্ত অগ্নি সূর্য্য করাল পিনাকী,
ব্যাপী শূন্য উড়ে ধূম—"মার" দগ্ধ ক্ষার,
বর্ষিছে অনল শিখা আরক্ত ত্রি আঁখি!
আর্ত্তনাদে অন্তরীক্ষ "বিরম বিরম",
হে কাল করাল বেশী!—নমো নমো নমঃ।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

ধাতব পদার্থের তাড়িত বিশ্লেষণ।

Electrolytic Dissociation.

"আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহাদের পদার্থ কহে।" পদার্থ দুইভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও যৌগিক। যে সকল পদার্থে একজাতীয় বস্তুই পাওয়া যায় তাহারা মৌলিক পদার্থ (Elements)। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। কোন একটি যৌগিক পদার্থে যে সকল মৌলিক উপাদান থাকে তাহাদের পরিমাণের অনুপাত অপরিবর্ত্তনীয়। জল একটি যৌগিক পদার্থ; দুইটি মৌলিক অনিলপদার্থের সম্মিশ্রণে উহার উৎপত্তি। উদজন (hydrogen) ও অম্লজন (oxygen)। বিশুদ্ধ জল যে ভাবেই, যেখানেই, যে সময়েই, বা যাহার দ্বারাই প্রস্তুত হউক না কেন, সর্ব্বদাই একভাগ উদজন ও আট ভাগ অম্লজন (মোট নয় ভাগ) এই অনুপাতে গঠিত। যেরূপেই হউক জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে, প্রতি নয় সের

জল হইতে এক সের উদজন এবং আট সের অম্লজন পাওয়া যায়। এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় পরিমাণই যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য। খড়ি যে পদার্থ মার্ব্বেল পাথরও সেই পদার্থ—উভয় পদার্থেই তিনটি মৌলিক পদার্থ আছে এবং ঐ মৌলিক উপাদানের পরিমাণও সমান।

ক্যালসিয়ম (calcium)—	৪০ ভাগ।
অঙ্গার (carbon)—	১২ ভাগ।
অম্লজন (oxygen)—	৪৮ ভাগ।
মোট—	১০০ ভাগ।

যদি এক শত মণ খড়ি বা মার্ব্বেল হইতে সমস্ত অঙ্গার বিশ্লিষ্ট করিয়া লওয়া যায় তবে সেই অঙ্গারের ওজন ১২ মণ হইবে। ঐ দ্বাদশ মণ অঙ্গার হইতে ৪৪ মণ অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রস্তুত হইতে পারে। খড়ি বা মার্ব্বেল কোন পাত্রে রাখিয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে সহজেই অঙ্গারাম্ল বাষ্প পাওয়া যায় এবং ক্যালসিয়ম ও অম্লজনের এক যৌগিক পদার্থ চূর্ণ পড়িয়া থাকে। প্রতি শত মণ খড়ি হইতে ৪৪ মন অঙ্গারাম্ল ও ৫৬ মণ চূণ পাওয়া যায়। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এই সত্যের ব্যত্যয় হয় না—ইহাই রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের বিশেষ লক্ষণ।

কতকগুলি মৌলিক পদার্থ কঠিন, দুইটি তরল ও কতকগুলি অনিল। ব্রোমীন ও পারদ এই দুইটি তরল। পারদ তরল ধাতু। তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুগুলিও মৌলিক পদার্থ। পিত্তল বা কাংস্য মিশ্রধাতু, কিন্তু যৌগিক নহে। কারণ পিত্তলের উপাদানের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। কাংস্য ও পিত্তল বহু প্রকারের প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উহাদের মূল উপাদান তাম্র ও দস্তা। এই দুই ধাতু যে কোনও পরিমাণে মিশ্রিত করিলে পিত্তল বা কাংস্য হয়।

গন্ধক, অঙ্গার প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আছে তাহারা ধাতু নহে। এ স্থলে ধাতুর বিশেষ লক্ষণ কি দেখা উচিত। দুই একটি ভিন্ন প্রায় সকল মৌলিক পদার্থই অম্লজনের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া সাম্লযৌগিক (oxide) উৎপন্ন করে। ধাতু ও অম্লজনের সংমিশ্রণে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় ক্ষার ধর্ম্ম সম্পন্ন (basic)। যে মৌলিক পদার্থগুলি ধাতু নহে তাহাদেরও অম্লজনের যৌগিক প্রায় অম্লগুণবিশিষ্ট (acid)। ক্ষার ও অম্ল পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। আস্বাদ বিভিন্ন ত বটেই কিন্তু উহাদের রাসায়নিক ক্রিয়াও সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ক্ষার ও অম্ল উভয়ের বিরোধ সহজে উপলক্ষিত হয়। অম্লে উদজনের (hydrogen) অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। অম্লজন (oxygen) না থাকিতে পারে, কিন্তু উদজন বিহীন অম্ল উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষার পদার্থে ধাতু বা ধাতব সংহতি (radical) থাকা আবশ্যক। যখন ক্ষার ও অম্ল একত্রীভূত করা যায়, ক্ষারের ধাতু অম্লের উদজনের স্থান অধিকার করিয়া সেই অম্লের অবশিষ্ট অংশ লইয়া একটি নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। উহাকে ঐ ধাতুর অয়স্কৃতি (salt) বলা যায়।* অম্লের উদজন ধাতুর

* "অয়স্কৃতি" এই নাম সুশ্রুতের দশম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Cf. Dr. P. C. Ray's Hindu Chemistry Vol. I page 48.

দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া ক্ষারের অবশিষ্ট অংশের (অম্লজন) সহিত জল উৎপাদন করে। সুতরাং দেখা গেল যে ক্ষার + অম্ল = জল + অম্লস্কৃতি। এই সমীকরণ আরও স্পষ্টরূপে লেখা যায়:—

ক্ষার = ধাতু + অম্লজন + জল
অম্ল = উদজন + অম্লশেষ (= অধাতু + অম্লজন)
ক্ষার + অম্ল = (ধাতু + অম্লশেষ =) অম্লস্কৃতি + (উদজন + অম্লজন =) জল
সুতরাং অম্লস্কৃতি = ধাতু + অম্লশেষ।

অতএব দেখা গেল যে যৌগিক পদার্থকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়:— ক্ষার, অম্ল ও অম্লস্কৃতি। অম্লের বিশেষ উপাদান উদজন; ক্ষার ও অম্লস্কৃতির প্রধান উপাদান ধাতু। অম্লে ধাতু নাই। যে সকল ক্ষার ও অম্ল জলে দ্রবণীয়, তাহাদের আরও একটা সহজ পরিচয় আছে। দ্রাব্য ক্ষার হস্তে লাগিলে সাবানের ন্যায় পিচ্ছিল বোধ হয়; লিট্‌মস্ (litmus) নামক নীলবর্ণ উদ্ভিদ রস ঐ ক্ষার যোগে নীলবর্ণই থাকে, নীলিমা একটু গাঢ় হয় মাত্র। অম্ল পদার্থ প্রায়ই টক্ আস্বাদন-যুক্ত এবং নীল লিট্‌মসের রং লাল করিয়া দেয়। লিট্‌মস্ রস অম্লযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করিলে ঐ "লাল লিট্‌মসে" যদি দ্রাব্যক্ষার মিশান যায় তাহা হইলে উহার নীলবর্ণ পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। সুতরাং অম্ল পদার্থ ক্ষারের ও ক্ষার পদার্থ অম্লের গুণ নাশ করে। অম্লস্কৃতির উৎপত্তিই এই পরস্পর গুণ নাশের অবান্তর কারণ। নিম্নে কতকগুলি সাধারণ ক্ষার ও অম্লের নাম ও উপাদান দেওয়া গেল:—

ক্ষার:—

১। যবক্ষার (Carbonate of Potassium) ধাতু = পোটাসিয়ম্।

২। সার্জ্জিকাক্ষার (Carbonate of Sodium) ধাতু — সোডিয়ম্ (সাজিমাটি বা সোডা)।

৩। চূণ (Calcium Hydrate); ধাতু — ক্যাল্‌সিয়ম্। ইত্যাদি।

অম্ল:—

১। গন্ধকাম্ল দ্রাবক (Sulphuric Acid); উদজন + গন্ধক + অম্লজন।

২। সোরা দ্রাবক (Nitric Acid); নাইট্রোজন + উদজন + অম্লজন।

৩। লবণ দ্রাবক (Hydrochloric Acid) উদজন + হরিতীন (chlorine) ইত্যাদি।

এক্ষণে দ্রবণীয় ক্ষার, অম্ল ও অম্লস্কৃতির একটি প্রধান গুণ আলোচ্য। ক্ষার ও অম্লস্কৃতি ধাতব পদার্থ। আধুনিক রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা উদ্‌জন বাষ্পকেও ধাতুর অন্তর্গত করিয়া লইতে চাহেন। ইহার কারণ ঐ তিন শ্রেণীর পদার্থের তাড়িৎ ধর্ম্ম। ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে স্থূলতঃ তাড়িৎ ও তাড়িৎকোষের বিবরণ জানা আবশ্যক। আমাদের যতটুকু আবশ্যক শুদ্ধ সেইটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

তাড়িৎকোষ যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাড়িৎ (বা বিদ্যুৎ) এক প্রকার মৌলিক পদার্থ। উহার দুইটি অবস্থাভেদ আছে। দুই প্রকার তাড়িৎ সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে অবস্থিতি করে। উহা অত্যন্ত লঘু; এমন কি অদ্যাবধি এমন কোনরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার দ্বারা তাড়িতের গুরুত্ব পরিমিত

হইতে পারে। স্থূলতঃ তাড়িৎকোষ তিনটি উপাদানে গঠিত হয়। একটি কাচপাত্রে কিছু গন্ধকাম্ল দ্রাবক (Sulphuric acid dilute) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় এবং একটি দস্তার পাত ও একটা তাম্রের পাত ঐ দ্রাবকে পৃথক ভাবে ডুবাইয়া রাখা হয়। দস্তা ও দ্রাবকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠান হয় এবং ঐ রাসায়নিক ক্রিয়াই তাড়িতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ফলতঃ দেখা যায় যে দস্তার অগ্রভাগে ও তাম্রের অগ্রভাগে তাড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায়ই দস্তার গাত্রে পাবদ লাগান থাকে, তাহাতে দস্তা অনর্থক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং তাড়িৎ সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পাতের সহিত একটু কুণ্ডলীকৃত তামার তার সংযুক্ত থাকে; সুতরাং ঐ তারের অগ্রভাগে তাড়িতের সমাবেশ হয়।
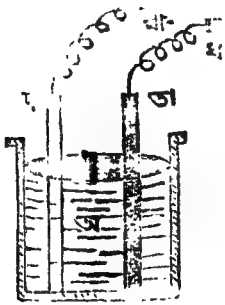
১ম চিত্র; তাড়িৎ কোষ।

দ দস্তার পাত।

তা তাম্রের পাত।

অ সজল গন্ধকাম্ল দ্রাবক।

ধ ধনপ্রান্ত; ঋ ঋণপ্রান্ত।

তামার পাতে যে তাড়িৎ থাকে তাহাকে ধন তাড়িৎ (positive electricity) ও দস্তার পাতে যে তড়িৎ থাকে তাহাকে ঋণ তাড়িৎ (negative electricity) বলা যাইতে পারে। কারণ এই দুই প্রকার তাড়িতের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আকর্ষণ ও বিকর্ষণই তাড়িতের প্রধান গুণ। সম-তাড়িৎ পরস্পর বিকর্ষণশীল; বিষম তাড়িৎ পরস্পর আকর্ষণশীল। "ধনে ঋণে আকর্ষণ, সমানেতে বিকর্ষণ", তাই উহাদের বিপরীত গুণবাচক নামকরণ হইয়াছে। তাম্রের সহিত যে তার সংলগ্ন আছে তাহার প্রান্তকে ধনপ্রান্ত এবং দস্তার তারের প্রান্তকে ঋণপ্রান্ত বলা যায়। ঐ ঐ প্রান্তে প্রায়ই এক এক খণ্ড প্ল্যাটিনাম্ ধাতুর (platinum) পাত সংযুক্ত থাকে; কারণ এই ধাতু সহজে বিকৃত হয় না। কদাচিৎ গ্র্যাফাইট্ নামক অঙ্গারের প্রান্তও ব্যবহৃত হয়। যতক্ষণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত না হয়, ততক্ষণ উহারা তাড়িৎযুক্ত থাকে। কিন্তু কোন ধাতুর (তারের) দ্বারা যদি ঐ প্রান্তদ্বয় যুক্ত করা যায় তাহা হইলে আকর্ষণের বশে ধন তাড়িৎ ঐ তারের মধ্য দিয়া তাম্রের পাতে ঋণ-তাড়িতের সহিত মিলিত হইবে, এবং ক্ষণেকের জন্য উভয় পাতই তাড়িৎশূন্য হইয়া পড়িবে। কারণ ধন ও ঋণ সম-পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া যদি একত্রিত হয় তাহা হইলে উহাদের যোগফল শূন্য হইবে। বস্তুতঃ তাড়িৎ বিনষ্ট হয় না,—উভয় তাড়িৎ যে অবস্থায় পূর্ব্বে ছিল, সেই অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায় বাহ্য ফল উহাদের বিলুপ্ত হইল মাত্র! তাড়িতের বাহ্যফল বিনষ্ট হওয়াকে তাড়িৎ বিনষ্ট হওয়া বলা যায়। কিন্তু কোষের মধ্যে ক্রমাগত রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়ায়

পরক্ষণেই আবার ধন ও ঋণ পৃথক হইবে ও সংযোজক তারের ভিতর দিয়া আবার একত্রীভূত হইয়া পড়িবে। এইরূপে অবিরাম একটা স্রোত ঐ সংযোজক তারের ভিতর বহিতে থাকিবে। ইহাই বৈদ্যুতিক স্রোত।

এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বকথিত অয়স্কৃতি দ্রবের বৈশিষ্ট্য কি দেখা যাউক। তাড়িৎ-কোষের দুই প্ল্যাটিনাম প্রান্ত যদি কোন অয়স্কৃতির জলীয় দ্রবে ডুবান যায়, দেখা যাইবে যে, তার সংযোগে যেমন বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হইত, এস্থলেও সেইরূপ স্রোত অনায়াসে প্রবাহিত হইতেছে।* কিন্তু তাড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দ্রবের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। প্রায়ই দ্রবণীয় বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে এবং বিশ্লিষ্ট অংশ তাড়িৎ-প্রান্তে বা উহার চতুঃপার্শ্বে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত লইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। তাম্র ও গন্ধকাম্ল সংযোগে এক প্রকার অয়স্কৃতি উৎপন্ন হয় উহাকে চলিত কথায় তুঁতে বলে। ঐ তুঁতে জলে গুলিলে ঈষৎ নীলবর্ণ দ্রব হয়। তাড়িৎ কোষের দুই প্রান্ত ঐ তুঁতের দ্রবে ডুবাইলে শীঘ্রই দেখা যাইবে যে ঋণপ্রান্তস্থিত প্ল্যাটিনামের উপর তাম্রবর্ণ প্রলেপের ন্যায় একটা আবরণ পড়িতেছে এবং ধন প্রান্ত হইতে অনিলের বুদ্বুদ উঠিতেছে। তুঁতের দ্রব হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া তাম্র ঋণপ্রান্তে ও অম্লজন ধনপ্রান্তে উদ্ভূত হইল। দ্রবের বর্ণও মন্দীভূত ও ম্লান হইয়া আইসে। এস্থলে দুইটি বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইল। প্রথমতঃ তুঁতে বিশ্লিষ্ট হইল ও দ্বিতীয়তঃ বিশ্লিষ্ট অংশ কেবল তাড়িৎপ্রান্তেই উদ্ভূত হইল; মধ্যস্থ দ্রব কেবলমাত্র বর্ণহীন হইতে লাগিল।

ধনপ্রান্তে তাড়িৎ আসিয়া দ্রবে প্রবেশ করিল। যদি তাড়িতের দ্বারা তুঁতের বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইল এমন হয়, তবে ঐ ধনপ্রান্তেই তাম্র ও অম্লজন একত্র উদ্ভূত হইল না কেন? কেবলমাত্র অম্লজনই ঐ স্থানে দেখা দিল, এবং তাহার উপযুক্ত তাম্র সমগ্র তুঁতের জলের ভিতর দিয়া গিয়া অপর প্রান্তে দেখা দিল। তাম্রের ঐ গতি ত দেখা গেল না—কেবল বোধ হইল তাম্র ঋণপ্রান্তেই সদ্য উদ্ভূত। অপিচ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ধনপ্রান্তের চতুঃপার্শ্বের দ্রবে গন্ধকাম্ল দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই বা কোথা হইতে আসিল? আরও এক কথা—যদি তাড়িৎ ঐ বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহা হইলে ত উহার পুনর্বিশ্লেষণ ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়

* বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিচয় চুম্বক সূচীর সাহায্যে অতি সহজে অনুভূত হয়। চুম্বক সূচী (একখণ্ড সূচ্যাকার চুম্বক কোন সূক্ষ্মাগ্র কীলকের মধ্যস্থলে স্থাপিত) সাধারণতঃ উত্তর দক্ষিণ লম্বরেখায় অধিষ্ঠিত থাকে। যদি বৈদ্যুতিক স্রোত ঐ সূচীর উপরিভাগে দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তের দিকে পরিচালিত হয় তবে সূচীর উত্তর প্রান্ত পশ্চিম দিকে প্রহত হইবে। সুতরাং সংযোজক তারের এক অংশ উত্তর দক্ষিণ লম্বমান করিয়া একটি চুম্বক সূচীর উপরিভাগে আনিলে বুঝা যাইবে যে ঐ তারে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে কিনা; আর যদি হইতেছে ত কোন দিক হইতে কোন দিকে।

যে ঐ তাড়িতের পরিমাণ বা গতিবেগ কিছুই কমিয়া যায় নাই। যতবার ইচ্ছা এরূপ বিশ্লেষণ করাইলেও তাড়িতের মাত্রা কিছুই কমে না। এস্থলে তাড়িৎপ্রবাহের দ্বারা কোনরূপ বিশিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই; তবে তুঁতে বিশ্লিষ্ট হইল কি প্রকারে ?

উক্ত প্রশ্নাবলির সন্তোষজনক উত্তর ১৮৮৭ সালে সুইডেন দেশীয় রাসায়নিক অধ্যাপক স্বান্তে আরহিনীয়াস্ (Svantc Arrhenius) দিয়াছেন। বহু পরীক্ষা ও ও গবেষণায় তিনি জলীয় দ্রবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে জগতে ঐ বিষয়ে অনেক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল।

কতকগুলি ধাতব পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইলে ঐ দ্রব তাড়িতের উত্তম পরিচালক হয় বটে কিন্তু দ্রাব্য পদার্থটি তাড়িৎযুক্ত প্রান্তদ্বয় সংযোগে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রায় সমস্ত অম্লস্কৃতির জলীয় দ্রব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শর্করা প্রভৃতি ধাতুবিহীন পদার্থের দ্রব আদৌ তাড়িৎ পরিচালন করে না। বিশুদ্ধ জলও তাড়িতের অপরিচালক। অধ্যাপক আরহিনিয়াসের মত এই যে, কোন অম্লস্কৃতি জলে দ্রবীভূত হইলেই উহা দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এক ভাগে প্রচুর ধন-তাড়িৎ ও অপর ভাগে সমান পরিমাণে ঋণ-তাড়িৎ সংযুক্ত থাকে। যে সকল ক্ষার ও অম্ল জলে দ্রাব্য সে সকলও অল্প বিস্তর ঐরূপে বিশ্লিষ্ট হয়। ঐ দুইটি বিশ্লিষ্ট অংশকে ভ্রামক (ions) বলা যায়। যে ভ্রামকে ধনতাড়িৎ থাকে তাহার নাম ধনভ্রামক (kation) এবং যে ভ্রামকে ঋণতাড়িৎ থাকে তাহাকে ঋণ-ভ্রামক (anion) বলে। *

মনে কর কিছু তুঁতে জলে গুলিয়া তাহাতে তাড়িৎকোষের দুইটি প্রান্ত ডুবান হইল। চুম্বক সূচীর দ্বারা পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে তাড়িৎ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা যায় যে ঋণপ্রান্তে তাম্র উদ্ভূত হইতেছে। তুঁতের দ্রবে, তুঁতে দুইটি ভ্রামকে বিশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। একটি তাম্র ও অপরটি তুঁতের অবশিষ্ট অম্লাংশ, (গন্ধক ও অম্লজনের সংহতি) উহার নাম "গন্ধকাম্ল সংহতি"। রসায়নের পুস্তকে তুঁতের গঠন বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা তাম্র ও গন্ধকাম্ল দ্রাবকের সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং তাম্রের অম্লস্কৃতি

২য় চিত্র। তাড়িৎ বিসংশ্লেষণ কোষ।
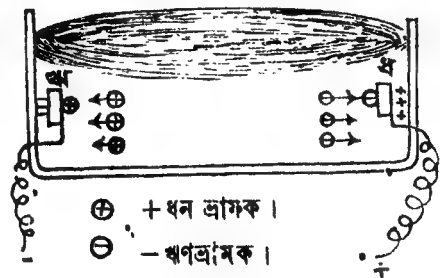
তাম্র-ভ্রামক ধনতাড়িৎযুক্ত ও গন্ধকাম্ল সংহতি ঋণতাড়িৎযুক্ত। দ্রবে ঐ দুইটি ভ্রামক

* এই অংশদ্বয়কে Michael Faraday ভ্রামক (ions) এই আখ্যা দেন, কারণ তাহারা দ্রবের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে ও এক স্থান হইতে তাড়িৎপ্রান্তেও ভ্রমণ করে।

পরস্পরের আকর্ষণ এবং জলকণার বিশ্লেষণ শক্তির প্রভাবে পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বিচরণ করে; প্রত্যেকের সহিত প্রচুর তাড়িৎ সংযুক্ত থাকায় উহারা সাধারণ জড়ের গুণ হারাইয়াছে, বস্তুত উহারা নূতন পদার্থ। ধনভ্রামক তাম্র সাধারণ তাম্র হইতে এত বিভিন্ন যে, দ্রবে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। ইহার কারণ উহার তাড়িৎ। যদি কোন প্রকারে ঐ ভ্রামক হইতে তাড়িৎ পৃথক করা যায়, তবেই তাম্র দেখা দিবে এবং সাধারণ তাম্রের গুণ প্রাপ্ত হইবে। ঋণপ্রান্তে যে ঋণতাড়িৎ থাকে তাহা ঐ তাম্রভ্রামকের ধনতাড়িৎ আকর্ষণ করিয়া পরিশেষে নিষ্কাষণ করিয়া ফেলে, তাই তাম্রভ্রামক ঋণপ্রান্তে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে তাড়িৎবিহীন হইয়া সাধারণ তাম্রের আকারে দৃষ্টি গোচর হয়। তাম্রভ্রামককে তাম্র ও ধনতাড়িতের একটা যৌগিক মনে করা উচিত। যৌগিকে মূল উপাদানের গুণ বিলুপ্ত হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। দ্রবের মধ্যে কোন ভ্রামকই দেখা যায় না বা উহাদের অস্তিত্ব কোন সাধারণ উপায়ে উপলব্ধি করা যায় না। কারণ উহারা প্রচুর তাড়িৎযুক্ত হইয়া সাধারণ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। ধনভ্রামক ঋণপ্রান্তে আকৃষ্ট হয়, ঋণভ্রামক ধনপ্রান্তে আকৃষ্ট হয়। ঐ আকর্ষণের বশে ঐ দুই বস্তু প্রান্তদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া তাড়িৎবিহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং উহারা ঐ ঐ প্রান্তেই উদ্ভূত হয়। প্রান্তদ্বয়ও সেইক্ষণে তাড়িৎশূন্য হইয়া পড়ে কিন্তু তাড়িৎ কোষে অবিরত রাসায়নিক ক্রিয়া সহযোগে আবার যথাযথ তাড়িৎযুক্ত হইয়া উঠে। পুনরায় কিছু বেশী ভ্রামক আকৃষ্ট হয় এবং এইরূপে যতক্ষণ না দ্রব ভ্রামকশূন্য হইয়া পড়ে ততক্ষণ উহার বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাড়িতের প্রবাহও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু দ্রবের মধ্যে তাড়িৎকোষের তাড়িত চালিত না হইয়া ভ্রামকদ্বয়ের তাড়িৎ পরিচালিত হয়—ফলে প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

একটি তাম্রভ্রামক যে ক্ষণে ঋণপ্রান্তে গিয়া তাড়িৎহীন হইতে থাকে সেই ক্ষণেই উহার সহচর গন্ধকাম্ল-ভ্রামকটি ধন প্রান্তে গিয়া পড়ে ও তাহার ঋণতাড়িৎ ঐ প্রান্তের ধন তাড়িতের দ্বারা বিনষ্ট হয়। দ্রবের মধ্যে ঐ দুইটি ভ্রামক পরস্পরের শক্তি দ্বারা যে ভাবে ছিল, একটি ভ্রামকের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইলে আর সে ভাবে অপরটি থাকিতে পারে না। সুতরাং একটি ছাড়িয়া অপরটি লাভ করিবার যো নাই। এক সময়ে দুইটিই দুই স্থানে পাওয়া যায়।

নিম্নে কতকগুলি অয়স্কৃতির ভ্রামক দ্বয়ের নাম ও গঠন দেওয়া গেল :—

অয়স্কৃতি।	ধন ভ্রামক।	ঋণ ভ্রামক।
(১) লবণ	সোডিয়ম্ (sodium)	হরিতীন (chlorine)
(২) সোরা	পোটাসিয়ম্	যবক্ষারজ ভ্রামক (নাইট্রোজন্—১ পরমাণু অম্লজন—৩ পরমাণু)
(৩) হিরাকস	লৌহ	গন্ধকাম্ল সংহতি (গন্ধক—১ পরমাণু অম্লজন—৪ পরমাণু)
(৪) তুঁতে	তাম্র	ঐ

(৫) নিশাদল	অ্যামোনিয়ম্ (নাইট্রোজন—১ পরমাণু, উদজন—৪ „)	হরিতীন (১)
(৬) যবক্ষার	পোটাসিয়ম্	হাইড্রক্সিল্ (অম্লজন—১ প৹ মাণু, উদজন—১ „)
(৭) সর্জ্জিকা	সোডিয়ম্	ঐ
(৮) কষ্টিক	রৌপ্য	যবক্ষারজ ভ্রামক (২)

সাধারণতঃ দেখা যায়, সকল অম্লস্কৃতির ধন ভ্রামক ধাতু। ক্ষার পদার্থেরও ধন ভ্রামক ধাতু। ঋণভ্রামক অম্লস্কৃতির অবশিষ্ট অংশ। প্রায়ই উহা দুই বা ততোধিক মৌলিকের "সংহতি।" এরূপ "সংহতির" অস্তিত্ব কেবল ভ্রামক অবস্থাতেই সম্ভব। ঋণ তাড়িৎ ঐ সংহতি হইতে চলিয়া যাইলে উহারা প্রায় সাধারণরূপে রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা অপর কোন ক্রিয়ার বশীভূত হইয়া থাকে।
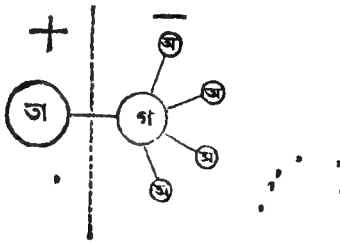
৩য় চিত্র, তুঁতের অণু।

তা তাম্রের এক পরমাণু, + ধনতাড়িৎ যুক্ত
গ গন্ধকের ঐ — ঋণতাড়িৎ যুক্ত
অ অম্লজনের ঐ

জলে দ্রবীভূত হইলে ভগ্নরেখা স্থানে বিশ্লেষণ হয়।

উপরি উক্ত তুঁতের উদাহরণে ঋণভ্রামক গন্ধকাম্ল সংহতি। ইহার গঠন এক পরমাণু গন্ধক ও চারি পরমাণু অম্লজন। ধনপ্রান্তে ঐ ভ্রামক প্রহৃত হইলে যখন উহার তাড়িৎ বিনষ্ট হয় অমনি উহা জলের উদজন লইয়া গন্ধকাম্ল দ্রাবক (sulphuric acid) নামক অম্ল উৎপাদন করে এবং ঐ প্রান্তে জলের অবশিষ্ট অম্লজন অনিলাকারে উদ্ভূত হয়। ঐ প্রান্তের চতুঃপার্শ্বে সুতরাং ঐ অম্ল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

অম্লস্কৃতির এইরূপ ভ্রামকদ্বয়ে বিশ্লেষণ যতক্ষণ জল সংযোগ থাকে ততক্ষণই সম্ভব। কোন উপায়ে যদি জল বাষ্পীভূত হইয়া বিদূরিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভ্রামকদ্বয় পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া পরস্পরের তাড়িৎ বিনষ্ট করিয়া সাধারণ অম্লস্কৃতি রূপে পরিণত হয়। বিশ্লেষকের অবিরত অস্তিত্বের উপর যে বিশ্লেষণ নির্ভর করে উহাকে "বিসংশ্লেষণ" (dissociation) বলা যাইতে পারে; কারণ বিশ্লেষক বিদূরিত হইলে বিশ্লিষ্ট অংশ পুনঃ সংশ্লিষ্ট হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ (decomposition) এরূপ নহে। উহাতে বিশ্লেষক বিদূরিত হইলে বিশ্লিষ্ট অংশ পুনঃ সংশ্লিষ্ট হয় না। যেমন তাপ সাহায্যে কাষ্ঠ বিশ্লিষ্ট হয় কিন্তু ঐ বিশ্লিষ্ট অংশ গুলির তাপ দূর করিলে পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ উৎপাদিত হয় না। ইহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ। তাপ সাহায্যে খড়ি বা মার্ব্বেল বিশ্লিষ্ট হইয়া চূণ এবং অঙ্গারাম্ল বাষ্পে পরিণত হয় কিন্তু সেই

তাপ বিদূরিত হইলে চূণ ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প পুনঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া খড়ি উৎপন্ন হয়। ইহাই "বিসংশ্লেষণ" বা dissociation.

এই বিশ্লেষণকে বৈদ্যুতিক বিসংশ্লেষণ বলা যায়। দ্রাব্য বস্তুতে যতগুলি অণু আছে সকলগুলিই যে বিশ্লেষিত হয় তাহা নহে। বিশ্লেষণের মাত্রা জল ও দ্রাব্য বস্তুর পরিমাণ ও উভয়ের উত্তাপের উপর নির্ভর করে। জল যত অধিক পরিমাণে থাকে ততই অধিক সংখ্যক অণু ভ্রামক অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপে যখন যথেষ্ট জল মিশ্রিত করা যায় তখন সমগ্র অণুই ঐরূপে বিশ্লেষিত হয়। ভ্রামকের সংখ্যা যত বেশী হইতে থাকে, দ্রবের তাড়িৎপরিচালন ক্ষমতাও তত বেশী হয়; পরিশেষে যখন দ্রাব্যের সকল অণুগুলিই ভ্রামকে বিভক্ত হইয়া যায় তখন ঐ অবস্থায় দ্রবের তাড়িৎ পরিচালন ক্ষমতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে কোন দ্রবের তাড়িৎ পরিচালন ক্ষমতা কত তাহা সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করা যায়; সুতরাং শতকরা কতগুলি অণু বিশ্লিষ্ট হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়।

জল ভিন্ন অন্য দ্রাবকে এরূপ বিসংশ্লেষণ দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ আজিও জানা যায় নাই। এ স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, আরহিনিয়াসের ভ্রামকতত্ব সম্পূর্ণরূপে কল্পনা প্রসূত। পরীক্ষা দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় সেই সমস্ত ঘটনার সুন্দর বোধগম্য হেতু নির্দ্দেশ ঐ মতের সাহায্যে করিতে পারা যায়, এবং যতদিন না উহার প্রতিকূল কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা পাওয়া যায় ততদিন ঐ মত সত্য বলিয়া মানিয়া রাখা ভাল। উহা ধ্রুব সত্য তত্ব কি না তাহা কালে প্রতিপন্ন হইতে পারে মাত্র—সকল বিষয়ের অকাট্য হেতু নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেই উহা মধ্যাকর্ষণ বাদ ইত্যাদির ন্যায় সত্য তত্ত্বে পরিণত হইবে।

পরিভাষা।

দ্রাবক—Solvent
দ্রব=Solution
দ্রাব্য—Solute
ক্ষার—Base, alkali
অম্ল—Acid
অম্লকৃতি—Salt
বিশ্লেষণ—Decomposition
বিসংশ্লেষণ—Dissociation
বৈদ্যুতিক স্রোত বা প্রবাহ—Electric current
ধন তাড়িত—Positive Electricity
ঋণ তাড়িত—Negative Electricity
ভ্রামক—Ions
অণু—Molecule
পরমাণু—Atom
তাড়িৎ পরিচালন—Electric Conductivity
ভ্রামকতত্ব—Ionic Theory
কঠিন—Solid
তরল—Liquid
অনিল—Gas
মৌলিক পদার্থ—Element
যৌগিক ঐ—Compound
সংমিশ্রণ—Combination
সংহতি—Radical
অম্লশেষ—Acid Radical
তাড়িৎ কোষ—Electric call
তাড়িৎপ্রান্ত—Electrode
ধনপ্রান্ত—Anode or Positive Electrode
ঋণপ্রান্ত—Kathode or negative Electrode
আকর্ষণ—Attraction
বিকর্ষণ—Repulsion
চুম্বক সূচী—Magnetic needle
ধনভ্রামক—Kation or positive ion
ঋণভ্রামক—Aniop or negative ion

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিয়ে বাড়ী।

সেই ভগ্ন ইষ্টক স্তূপের সম্মুখে গাড়ী থামিতেই একটু নূতন দৃশ্য চক্ষুকে আকৃষ্ট করিল। গেট ও দ্বারবানের গৃহের চিহ্নস্বরূপ সেই যথেচ্ছ পতিত ইটগুলা যথাসাধ্য সরাইয়া গুছাইয়া সেস্থানে দুটা কলাগাছ রোপিত হইয়াছে। বহিরঙ্গণটি যথাসাধ্য পরিষ্কৃত; কাটানটে আসশেওড়া প্রভৃতির জঙ্গলগুলা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ধূলাচ্ছন্ন অর্দ্ধভগ্ন পূজামণ্ডপটিতেও ঝাঁট দিয়া দুই খানা বড় বড় সতরঞ্চি পাতা হইয়াছে। অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা-মধ্যস্থ অঙ্গন হইতে ভগ্ন গৃহের ইষ্টক স্তূপের পার্শ্বে সামিয়ানা বাঁশ ও কাপড় দেখা যাইতেছে। বিস্তৃত মাঠের বুকে ঘন বনের মধ্যে বংশপুঞ্জে বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম খানি। গ্রামের একপ্রান্তে ততোধিক বিজন জঙ্গলে ভরা নষ্ট প্রায় ভগ্ন অট্টালিকা। দুই তিনটি বিধবা ভিন্ন বারমাস কেহই সেখানে বাস করেন না। অদ্য আমাদের এক জ্ঞাতি খুড়শ্বশুর পুত্রের বিবাহ দিতে দেশে আসিয়াছেন, তাই তাহার কগ্নদেহে রঙিন্ বস্ত্রের এ সাজ।

গাড়ী হইতে নামিতেই খুড় শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া "আগ বাড়াইয়া" লইলেন এবং স্নেহাদর পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "এমন কুটুম্বের মত কি আস্তে হয় মা! তোমাদের ভরসাতেই রমার দেশে বিয়ে দিতে আসা। দিদিরা স্বর্গে গিয়েছেন, তাঁরাই বিয়ে থাওয়া সব দিয়েছেন, আমি ত কিছুই জানিনা তোমাদের দেওরের বিয়ে, তোমরা আজ কুটুম্বের মত এলে?" কোন রকমে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এ স্নেহানুযোগ কাটাইয়া লইলাম। বাড়ীর ভিতরে তখন উলু পড়িতেছে, খুড়িমা বলিলেন "গায়ে হলুদ হচ্চে, আশীর্ব্বাদ কর্‌বে চল বাছা।"

বর অতি নিরীহ লোকটির মত পীঁড়ির উপর বসিয়া আছে, পরণে নূতন লালপেড়ে ধুতী, কাঁধে রঙিন গামছা। সধবা বধূ ও কন্যাগণ তাহার চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনৈক গৃহিণী বলিলেন যেন জোড়া হয় না, সাত কিম্বা নজনে হলুদ দিও।" "তাই হয়েছে, হরির বৌকে বাদ দেওয়া গেল।"

"কেন হরির বৌ বাদ্ কেন?" একজন চোখ টিপিয়া বলিল "ওযে দ্বিতীয় পক্ষে!"

"হ্যাঁগো খুড়িমা, ক'বার হলুদ ছোঁয়াতে হয়?"

"আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ বাছা, তোমরা ত সব জান? সাতবার বুঝি, না বড় বৌমা?" "বাজন্দেরে মিস্সেরা করছে কি? বাজাতে বল্‌না! নলিনী শাঁখ বাজা। সাতজন "এয়ো" হলুদ হাতে নিয়ে বরের কপালে ছুঁইয়ে দাও! উলু দাওনা সবাই! দেখিস্ লো কাপড়ের বাতাসে প্রদীপ যেন খবরদার নেবে না!" "মেজ বৌমা! তুমি সব কর বাছা, ওদেরও বলে বলে দাও, আমি রান্না বাড়ী চল্‌লাম, সেদিকের কতদূর গোছগাছ হল দেখি!"

"বারবেলা পড়বে বারবেলা পড়বে!" বাহির হইতে চীৎকার করিতে করিতে পরমাণিক ভিতরে প্রবেশ করিল। রসুনচৌকী তাহার "পোঁ ধরিল," বাঙলা বাদ্যি মহা সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। বালক বালি-

কারা গায়ে হলুদ দেখা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বাজন্দারদের নিকটে ছুটিয়া গিয়া অবাক্ ভাবে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল!

শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে পাত্রের গাত্র হরিদ্রা শেষ হইল। বড় দিদি ডাকিলেন, খুড়িমা তুমি আগে আশীর্ব্বাদ কর তবেত সবাই করবে।" "তোমরাই করনা বাছা তা হলেই সব হবে!" "না না তা কি হয়?" সকলের নির্ব্বন্ধে খুড়শাশুড়ী কুণ্ঠিত ভাবে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ধানদূর্ব্বার পাত্রখানা সকলের হাতের নিকটে ধরিতে লাগিলেন। আশীর্ব্বাদ ক্রিয়া শেষ হইলে খুড়িমা সকলের হাতে পান সুপারী সন্দেশ ও সধবাদের ললাটে সিন্দুর দিয়া দিলেন। ওদিকে বালিকামহলে রং মাখানর ধুম পড়িয়া গেল। শুধু বালিকারা নয়, শেষে সকলেই সে পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পরস্পরকে রঙে ডুবাইতে লাগিলেন। একজন বয়স্কা বধূ বরকে তৈল মাখাইতে লাগিল। পান সুপারী দেওয়া শেষ হইলে খুড়িমা বলিলেন "আর দেরী ক'রনা, সবাই তেল হলুদ মেখে নেয়ে এস। বড় বৌমা তোমরাও নাইতে যাও বাছা। তুমি ছোট বৌমা, গোপালের বৌকে নিয়ে নিরিমিষে যাও!" ওবাড়ীর মেজবৌমা নবৌমা• মুকুয্যেবৌমা তোমরা সব আঁষে যাও, আরও যাকে পাও জুটিয়ে নাও! তোমাদের জল বাটনা ঝিয়েরা দেবে। নলিনি, আইবড় ভাতের পরমান্ন রাঁধ্‌বি কি বলিস্?" "হ্যাঁ ছোট ঠাকুমা হ্যাঁ, আমি কাঙ্কার পায়েস রাঁধব!" "নে তবে আর রং খেলিস্‌নে! হলুদ মাখলিনে? একালের মেয়েরা হলুদ মাখেনা! আমরা সেকালে বিয়ে বাড়ীতে কত হলুদ মেখেছি,—না বড় বৌমা?" মেজদিদি সহাস্যে বলিলেন "দুঃখ করনা বাছা। তোমার ছেলের গায়ে তার শোধ তুলে দিয়েছে! অমনি করে কি হলুদ তার বরের গায়ে! স্বাথত অন্যায়! রমা ঠাকুরপো তুমিই বা কেমন? ছুঁড়ীগুলো যাখুসী করছে আর চুপ করে আছ?" সেজদিদি কলহাস্যে বলিলেন, চুপ ক'রে থাক্‌বেনা ত আজও তেরি মেরি করবে নাকি? পাঁচদিন চোরের একদিন সাধের!" মেজদিদি বলিলেন "আয় ভাই ঠাকুরপো নাইয়ে দি, নইলে ওরা আরও দুর্দ্দশা করবে!" পরামাণিক হাঁক দিল "আমায় তেল হলুদের বাটীটা দাওনা গো, কর্ত্তা ওদিকে বকাবকি করছেন, এখনি আমায় কনের বাড়ী রওনা হতে হবে। দুঘণ্টা আর সময় আছে তিন ক্রোশ হাঁটতে হবে!" রূপার বাটীতে বরের ব্যবহৃত তৈল ও হরিদ্রাবাটা কন্যার গাত্র হরিদ্রার জন্য পরামাণিকের হাতে দেওয়া হইল। এদেশে গায়হলুদের তত্ত্বের বৃষোৎসর্গ ব্যাপার চলিত নাই! বড়জোর এক ঘড়া তেল ও কিছু সন্দেশ, হরিদ্রার সঙ্গে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বালিকা ও বধূরা খুড়িমার নির্দ্দেশ মত হলুদ তেল তেমন না মাখিলেও রঙে আপাদমস্তক রঞ্জিত হইয়া সাবান্ গামছা ইত্যাদি লইয়া ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত গ্রাম্যপথ মুখরিত করিতে করিতে ঘাটে গিয়া পড়িল। দীর্ঘিকার স্থির কালোজল অনেক দিন পরে অধীর তরঙ্গে সচকিত, এবং বধূদের গাত্র ও বস্ত্রস্খলিত লাল রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যিনি নিরামিষে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি স্নানান্তে বলিলেন "দেখিস ভাই, সাবান ছোঁয়াস্‌নে, আমরা ঠাকুরভোগের ঘরে যাব!"

তারপরে সমস্ত দিনব্যাপী একটা হৈ হৈ ব্যাপার চলিতে লাগিল! এখন রান্না বাড়ীর দিকেই ধূম বেশী। বধূরা মাথায় কাপড় জড়াইয়া "আধা" নামক বৃহৎ হোমকুণ্ডে বড় বড় কড়া ডেকচি চড়াইয়া যজ্ঞের পূর্ণাহুতির ব্যাপার প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল। তরকারি কোটার ব্যাপার রাত্রেই শেষ করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে কাঁচা তরকারীর স্তূপ কমিয়া মাছের আমদানি আরম্ভ হইল। উঠানের একধারে বঁটী পাতিয়া ঝিয়েরা মাছ কুটিতেছে, কেহ বা ধুইয়া আনিয়া আমিষ-রান্নাঘরে ঢালিয়া দিতেছে। অগ্নির প্রবল উত্তাপে বধূদের মুখ ফুলের মত টকটকে হইয়া উঠিতেছে, তথাপি সহাস্যমুখে সানন্দে—"এতে হবেনা খুড়িমা, এক কড়া ছাঁচ্‌ড়ায় কি কুলুবে? এইটাই লোকে বেশী খাবে। আরও চাটি আলু বেগুন সিম কুটে দিতে বলুন, মাছের কাঁটা চোব্‌ড়া এখনো ঢের আছে। মুগের ডাল ও বোধ হচ্চে আর এক ডেক্‌ চাই! শুক্ত, শাক ও বোধহয় আর এক কড়া চড়াতে হবে! দু কড়াতে হবে ত? বুঝে দেখুন বাছা"।—ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের অশ্রান্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন এবং ফুটন্ত তৈলে মাছ ছাড়িয়া দিতেছেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাদের জন্য জল পান দধি ইত্যাদি লইয়া বারে বারে আসিতেছেন ও "বড় বৌমা, ছোট বৌমা, বাছারা আগুনের তাপে খুন হ'ল, ঠাকুর ভোগ হবে তবে বাছারা একটু জল মুখে দিতে পাবে" ইত্যাদি বাক্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন; অথচ নিজে এখনো স্নান করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পান্ নাই।

ঠাকুরভোগের পর বরের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির আরম্ভ হইল। একপাল বালকও বরের সঙ্গে পায়স ভক্ষণে বসিল। তখন আবার সকলকে পাকশালা হইতে হাত ধুইয়া পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতে হইল, নহিলে খুড়িমা ছাড়িবেন না। ব্যাচারা বর সেবার আশীর্ব্বাদিকাদিগকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, মাতা মনে করিয়া দিলে সে অপ্রস্তুত ভাবে ভ্রম সংশোধন করায় মেজ দিদি সহাস্যে বলিলেন "হ্যাঁ, আর ভুল হয় না যেন! এ ক'দিন প্রত্যেক কাজে বস্তিনাথের গরুর মত মাথা নাড়ার কসরৎ দেখানো চাই!"

আইবড় ভাতের ভোজ মিটিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। একজন জ্ঞাতি বরকে রাত্রিভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুইদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে করিতে বর ব্যাচারা ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল। সহরের মত এক থালা মিষ্টান্ন ও বস্ত্র পাঠাইয়া এখানে প্রতিবেশীরা নিষ্কৃতি লয় না। বরের সঙ্গে তাহার বাটীতে সমাগত আত্মীয়কুটুম্ব সন্তানগুলিও প্রত্যেকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে।

পরদিন অধিবাস! "এয়োদে"র ডাকাইয়া তাহাদের মধ্যে জনৈক গরিষ্ঠাকে প্রধান সধবার পদে বরণ করিয়া নূতন কাপড় পরাইয়া কামাইতে বসান হইল। নাপিত বধূও নূতন কাপড় পরিল। তখনও অল্প স্বল্প রঙের খেলা চলিল। একে একে সমাগতা সকল সধবা ও কুমারীদের আলতা পরাইয়া পান সুপারী সন্দেশ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। পুত্রের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি কামনায় গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের বাড়ী তৈল সন্দেশ পান সুপারী

বিতরিত হইতে লাগিল। মুচী আদি নীচ জাতিরা অধিবাসের দিন নিজেরা দলে দলে আসিয়া তৈল সন্দেশ মুড়ীমুড়্কী বস্ত্রাঞ্চল পুরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সন্দেশ এক একটী চিনির ঢিবি মাত্র, লুচী কচুরী ক্ষীর আদির ছড়াছড়ি; তথাপি দুটা মুড়ী মুড়কী লইতে তাহাদের কি আগ্রহ!

পরামাণিকের ব্যস্ততার সীমা নাই। সে সপুত্র গোটা কয়েক কলা গাছ আনিয়া ডাক হাঁক জুড়িয়া দিল "ন'কড়া কড়ি দাও, গিটে হলুদ সুপুরী দাও, ছান্‌লাটা বেঁধে দিয়ে যাই—আমার কি এক কাজ! মালী মাগী শুধু টাকা আর সিধে নিতে জানে! ছান্‌লার টাঙ্গাতে কদমফুল পাতিময়ুর দ্যায়নি? আপনারা ত কিছু বল্‌বেন না, দেশে না থেকে থেকে সবই ভুলে গিয়েছেন। হ'ত আমাদের বাড়ী ত টের পেত!" ইত্যাদি বকিতে বকিতে নরসুন্দর ছান্‌লা বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া গেল। খুড়িমা বলিলেন "একজন এয়োস্ত্রী" ছান্‌লা-তলা নিকোও, সেজবৌমা তুমি পিটুলি বাট, আজই পিঁড়েয় আল্‌পনা দিতে হবে! কাল্‌কে ভোরে জলসাধা নান্দীমুখের হাঙ্গাম আবার বরযাত্র সকালেই খেয়ে রওনা হবে,—কাল আর কখন কি হবে? নাপিত বৌ, পাড়ার বৌঝিদের ডেকে আন্, নান্দীমুখের চাল কাঁড়্‌তে হবে! রাঙ্গা দিদির বাড়ী "ছিরি" গড়্‌তে দেওয়া হয়েছে আন্‌তে হবে!" জনৈক বধূ বলিলেন "হাঁ গা কুলো ডালা সাজান হয়েছে ত? অধিবাসের ডালায় বাইশ রকম জিনিষ লাগে! কুলোয় চাট্টি ধান দিয়ে তার ওপরে 'ছোবা' চাপটে রাখ্‌তে হয়, "ছোবা'র ভেতরে হলুদ মেখে চাল কলাই কড়ি গিঁটে হলুদ দিয়ে একখানা চেলির কাপড়ে কুলো ঢাক্‌তে হয়! কুলো যে মাথায় কর্‌বে সে এক বচ্ছর কাসন্ কর্‌বে না, বড়ী দেবে না, ছাতু খাবে না, মাকেই কুলো মাথায় করতে হয়!"

"বড় বৌমা তার বৌকে দিয়ে কুলো ডালা সব গুছিয়ে দিইয়েছে!

পাড়ার সধবা কুমারী সকলেই বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া আসিয়া হাজির হইল।

তাহাদের নিজ গৃহকর্ম্ম আজ বিয়ে বাড়ীর মাঙ্গলিক কার্য্যের নিকটে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। "ওরে কেউ রমাকে ডাক্! আমি চালের ধামা নিই, হরির বৌ পান সুপুরীর থালা নিক্, নলিনী শাঁক বাজা, রাণীকে জলের ঘটী দে। মেজবৌমা রমাকে কোলে নাও, ওরা তো তোমাদের দেওর নয় বাছা, পেটের ছেলের চেয়েও ছোট!" মেজদিদি হাসিতে হাসিতে বরকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "শোন ভাই! আমরা আজ দেওর বলে তোমার মান্য কর্‌ব মনে কর্‌ছি কিন্তু খুড়িমা তা কর্‌তে দিচ্চেন না!" পান দিয়া বরের চোখ্ ধরিয়া মেজদিদি অগ্রসর হইলেন। "রাণী, নলিনী আগে চল্, গোটা দুই বাজন্‌দারকে সঙ্গে ডেকে নে; আমার ত ঢেঁকি নেই, কৈবর্ত্ত বাড়ী যেতে হবে। বড় বৌমা, ছোট বৌমা কুটনো ফেলে একবার উঠে চল বাছা, দেওরের বিয়ের সব কাজ দেখ্‌তে হয়!" বড় দিদি আপত্তি করিলেন "ওরাই যাক্,—আম্‌রা উঠলে এখনি কুটনো ফেলে এরাও দৌড় দেবে, আর ধর্‌তে পার্‌ব না!" খুড়শাশুড়ী না শুনিয়া হাত ধরায় অগত্যা আমাদের

উঠিতে হইল! কৈবর্ত্ত বাড়ীর অঙ্গন বিয়ে বাড়ীর এয়োয় ভরিয়া গেল। কৈবর্ত্ত গৃহিণী "এসো মা সকল এসো" বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। শাশুড়ী বলিলেন "আট দিন ঢেঁক পাড়্‌তে পাবি না ভাই! তোদের নিত্য ধান ভানা, ক্ষেতিতো হবে বড্ড!" "তাহোক্ ছোট্‌দিদি ঠাক্‌রুণ! কত ভাগ্যে তোমার রমার বিয়ে! কেন আনিত যশার মাকে বলেছি দিদি ঠাক্‌রুণকে আমার ঢেঁকি নিতে বলিস্! আহা সেকালে গিন্নিরা আমার ঢেকি ছাড়া আর কেউরি ঢেঁকি নিতেন না! বছরে তখন এবাড়ীতে দুটো তিনটে করে বিয়ে হ'ত! কোথায় গেল সে সব ধনেরা! গিন্নিরাই কোথায় গেল! তারা থাকলে কি আজ ওবাড়ীর অমন দশা হয়?"—কৈবর্ত্ত গৃহিণী চোখ মুছিতে লাগিল। আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে করুণ রাগিণী বাজিয়া ওঠায় সকলেরই নাসাপথ হইতে এক একটা নিশ্বাস বহির্গত হইল। বড় দিদি বলিলেন "আজ আর ওসব কথা কেন? শুভ কাজ! কই ঢেঁক নিকিয়ে রেখেছিস্ ত?" "আমি "আঁড়" মানুষ, আমি কি পারি? পেপ্‌লার বৌডোকে ধরে নিকিয়ে নিইছি!" "তোর সব বিট্‌কেল! ঢেঁকী নিকোব তাও দোষ?" "খুড়িমা! ঢেঁকীর মাথায় তেল সিঁদূর পান সুপুরী সন্দেশ দাও, ঢেঁকী বরণ করা? দাসিশাশুড়ী একটা বাটী আন্ বাছা, ঢেঁকির মাথার নীচে পাত্, নইলে তেলটা সব পড়ে নষ্ট হবে। নে তোরা ন'জন বা সাতজন ঢেঁকীতে ওঠ, আমি চাল্ দেওয়াই।" পান দিয়া বরের চক্ষু ঢাকিয়া, স্বর্ণরজ্জুতে (হারে) যুগল হস্ত আবদ্ধ করিয়া ঢেঁকির গড়ে চাল্ দেওয়াইতে দেওয়াইতে মেজ'দিদি বলিলেন "কনের নাম কি গো?" নলিনী, রাণী কলহাস্যে বলিল "মেজ জ্যেঠিমার" সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার ভার্য্যা?" কনের নাম জানেন না অথচ সব করান' চাই"। কি জানি বাছা আমি অত খোঁজ রাখতে পারি না। নে বল শীগ্‌গির, ব্যাচারা হাত বাঁধা কতক্ষণ থাকবে?"

"সুবর্ণ-লতা গো সুবর্ণ-লতা"! "বল ঠাকুর পো! সুবর্ণলতার চাল কাঁড়াচ্ছি! তিন বার চাল্ দিতে হবে। মন্তর বল্‌ছ ত মনে মনে?" "হ্যাঁ হ্যাঁ হল তো তোমাদের?" "ওকি উঠ্‌ছ কেন? কোলে চড়ে যেতে হবে আবার! শুধু বৌটি পাওয়া নয় গো, এতে অনেক ঝক্‌মারী। আর এই ত কলির সন্ধ্যে! বাসর ঘরের ধাক্কা সাম্‌লে এসো তবে বল্‌ব বীর পুরুষ! নেলো তোরা পাড় দে, সাত বারের বেশী হয় না যেন"। শঙ্খ হুলুধ্বনি ও পদালঙ্কারশিঞ্জিতের সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকী তালে তালে সাত বার উঠিল ও নামিল। কোথায় গেলেন কালিদাস! নীরস, শুষ্ককাষ্ঠও বোধ হয় তাঁহার বর্ণনায় এই দোহদে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিত! আবার সধবাদের হস্তে পানসুপারী ও ললাটে সিন্দুর দেওয়া হইল। আমাদের বালিকা বিধবাটি একপাশে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। খুড়িমা সস্নেহে তাহার হস্তেও পান সুপারী দিতে গেলেন, সে ছুটিয়া বড় দিদির নিকটে পলাইয়া আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। খুড়িমা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "নাও মা

পান সুপারী নাও"! বালিকা মাথা নাড়িয়া বলিল "না নিতে নেই যে"! "কেন নিতে থাক্‌বেনা, আমি হাতে করে দিচ্চি নাও তুমি!" খুড়িমার অনুরোধে অগত্যা লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে সে পান সুপারী লইল বটে কিন্তু দুই বিন্দু জল তাহার চোখে মুক্তার মত টল্ টল্ করিতেছিল। বয়োজ্যেষ্ঠারা সকলেই সকলের অজ্ঞাতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন! খুড়িমা সনিশ্বাসে বলিলেন "তোমরা জল ধারা দিয়ে বর বাড়ী নিয়ে যাও। 'আমি "ছিরি" বরণ করে নিয়ে আসি, সেজবৌমা "ছিরি"র সিধেটা এনেছ ত? রাণী, 'নলিনী তোরা কুলো ধর্, একা তুলতে নেই"! হুলুধ্বনির সঙ্গে খুড়িমার মস্তকে কুলা তুলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার বারাণসীর আঁচলে একখানা হলুদে রঙের ছোপান নূতন ন্যাকড়া-বাঁধা, সেটা মাটীতে লুটাইতেছে। ইহার নাম "সোয়াগ"! বরকন্যার যাহাতে পরস্পরের নিকট আদর বর্দ্ধিত হয় সেজন্য এ "তুক্"! বাহিরে আসিয়া বালিকা রাণী, তাহার সমবয়স্কা হরির বৌকে বলিল "তোমার পান সুপারী কই কনে দিদি?" হরির বৌ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "নেপলার বৌকে দিয়ে দিয়েছি! কি বারে ক্ষরে পান আর সুপারী হাতে নেওয়া, কাপড়ে সন্দেশের চট্‌চটে হাত দিতে হচ্চে"! কৈবর্ত্ত শাশুড়ী সগর্জ্জনে বলিল "কি বল্‌লি কনে বৌ? পান সন্দেশে কাপড় খারাপ হবে? "যত কিছু না বোন্ ভোবন্ সব ঐ ঘটের প্রসাদে,"— ঐ সিঁদুর কৌটাটি—ঐ পান সুপারীর কত মান্য তা জানিস্? এসব মঙ্গল কাজে ঐ তুচ্ছি জিনিষ হাতে পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা? এইত তোর বড়দি, ছোট্‌দি, ঐ কাঁচা বৌটা দেখছিস্ তো? তোদের বুকের পাটার বলিহারী! একালের মেয়েরাই অমনি"—থাম্ থাম্ করিয়া সকলে তাহাকে থামাইল। দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাহাকে বাদ্ দেওয়াতে বেচারা হরির বৌ বড় চটিয়া গিয়াছিল; সেও ত বালিকা বৈ নয়! এব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সেজ দিদি বলিলেন "হ্যাঁ মেজদি!" হাই আম্‌লা কাদের দিয়ে বাঁটানো যাবে? অধিবাসের ডালা সকালেই ত চাই"! "যাদের খুব ভাব এমন মেয়ে জামাই বা ছেলে বৌ ধরে বাঁটিয়ে নে"! "ও মেজদি তবে সে তোমাকেই বাঁট্‌তে হবে"! সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাবে সায় দিয়া গেল। মেজদিদি "দূর পাগল্‌রা সব।" বলিয়া কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বড়দিদি আসিয়া বসিলেন "তাই করতে হবে লো। ওসব ছেলে ছোক্‌রারা রাজী হবেনা, একেলের চ্যাটা সব। আর তোরা বাঁট্‌লেই বরকনের বেশী ভাব হবে। আমি ঠাকুরপোকে ডাকাচ্চি, হাতটা ছুঁইয়ে দিয়ে যাক্, শেষে তুই বেঁটে নে"!

তুমুল হুলুধ্বনি ও সন্দেশ ছড়াছড়ির মধ্যে "হাই আম্‌লা" বাঁটা শেষ হইল। যাঁহারা আম্‌লা বাঁটিবেন তাঁহারা এবং পার্শ্বচরেরা সকলেই কলহাস্যে পরস্পরকে সন্দেশ খাওয়াইয়া,—ছুড়িয়া মারিয়া উক্ত কর্ম্ম শেষ করিলেন।

প্রায় সমস্ত রাত্রি পান সাজিয়া কুটনা কুটিয়া কাটাইয়া শেষ রাত্রে আবার "দধি মঙ্গলের" ধুম। পরদিন উপবাস করিবে

বলিয়া বর ব্যাচারাকে সেই রাত্রে ক্ষীর চিঁড়া ভোজনের জন্য টানিয়া আনা হইল। তাহার পক্ষে যদিও ইহা নির্য্যাতন ভিন্ন অন্য কিছু নয় কিন্তু ইহা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অন্তর্ভূত, অতএব করিতেই হইবে। সধবা ও কুমারীগণ পাত পাতিয়া "দধি মঙ্গলের" নিয়ম রক্ষার্থ দুই চারিটা চিঁড়া মুখে দিলেন। খুড়িমা বলিলেন "এই শেষ রাতে কি খেতে পারে?" মেজ দিদি বলিলেন "তা বলে ফাঁকী দিলে চলবেনা বাছা! বেলা হোক্, তখন খেতে পারে না পারি বুঝিয়ে দেব"। একটি দেবর যোড় হস্তে বলিলেন "ঐ "ছাঁদা" বোঝাই চিঁড়ে এবং হাঁড়ী হাঁড়ী দই থাকল, মশায়রা যত পারেন খাবেন, কিন্তু এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু শীগ্‌গির করে উঠে আপনাদের দাড়ী মঙ্গল সরা মঙ্গল আর যা আছে সেরে ফেলুন; বর যাত্রীরা সকালেই খেয়ে বেরুবে, নান্দীমুখের অনেক গণ্ডগোল আছে, হেঁসেলে কাপড় ঢুক্‌বেন, অন্নপূর্ণাদের দোহাই"।

প্রতি প্রত্যূষে শঙ্খ হুলু ও বাদ্যশব্দে সমস্ত গ্রামকে জাগরিত করিয়া সধবারা "জল সাধতে" বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে আভাঙ্গা পুকুরের জল লইবার জন্য বংশপুঞ্জ বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গ্রামপথকে ভূষণঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিলেন। উষার পিঙ্গল আভা সে বনের মধ্যে তখনো প্রবেশ করিতে পায় নাই; শেষ রাত্রির সুমন্দ চন্দ্র-কিরণ বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া যথাসাধ্য অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল। একজন বলিলেন "সঙ্গে একটা আলো আন্‌লে ভাল হত।" "দূর, ঝোপ ঝাপ বলে এখনো এমন দেখাচ্চে, নইলে ভোর হয়ে গিয়েছে। এ ঘাটটা বড় ভাঙ্গা, গাছের শেকড় গুলো পায়ে বাধ্‌বে, ওপারের ঘাটটা বরং ভাল আছে ঐটাতেই যাওয়া যাক্।"

দীর্ঘিকার বুকে খণ্ড চন্দ্র হাসিতেছিল। আকাশ পাণ্ডুবর্ণে রঞ্জিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লঘু মেঘস্তরে কোথা হইতে ঈষৎ গোলাপি আভাষ আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রবিম্বিত পুকুরের স্থির কালোজল উষালোকে বিচিত্র শোভা ধরিয়াছে। 'পাড়ে'র চারিধারে আম্র কাঁটালের ঘন বন; নবপত্র ও আম্র-মঞ্জরীতে আমগাছগুলা ভূষিত, ভোরের বাতাস আমমুকুলের গন্ধে মাখামাখি হইতেছিল। কোকিল পাপিয়া দোয়েল মাছরাঙ্গা নানা ছন্দের রাগিণী আলাপ ধরিয়াছে। বালিকা রাণী চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিল "পাড়ের বাগানেও আজ বোধ হয় বিয়ে বাড়ী"।

সাত জন এয়ো হাতধরাধরি করিয়া হুলুধ্বনির সহিত মঙ্গল কলসে জল ভরিল। "চল,— সাত বাড়ী জল সাধ্‌লেই হবে। ওদিকে বেলা হচ্চে।" তাহাদের হুলুধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হইয়াই বোধ হয় পাপিয়া গ্রামের উপর গ্রামে তান চড়াইতে লাগিল! কোকিলও তাহার ভোরের স্নিগ্ধ "কুউ"স্বর পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিল।

জল সাধিয়া বাড়ী ফিরিয়া আস্তে ব্যস্তে বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া তাহারা রন্ধনের দিকে ছুটিল। পুরোহিত মহাশয় কলাগাছের "পেটো" লইয়া এবং পরামাণিক তাঁহার হুঁকা কলিকা লইয়া সমান ব্যস্ত। কর্ত্তার তাগাদায় অগত্যা পুরোহিত মহাশয় নান্দীমুখের অন্য সমস্ত দ্রব্য ঠিক্ করিয়া উভয়ে নান্দীমুখে

বসিয়া পড়িলেন। বরকেও স্নান করাইয়া "শুভ গন্ধাধিবাসে"র জন্য নিকটে বসান হইল।

বাহিরে ৮।১০ খানা গোশকট রঙিন্ সত-রঞ্চিতে "ছাপ্পোর" ঘিরিয়া, বাঁশের গায়ে ও গরু মহিষের শৃঙ্গে নানা বর্ণের দাগ কাটিয়া বর যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পাল্কীর বেহারারা নিরীহ গাড়োয়ানদের সাহঙ্কারে বলিতেছে "আরে তোমরা গিয়ে সেই গাঁয়ের কোণে পৌঁছিবার পরও যদি আমরা র'ওনা হই তো আগে গিয়ে পৌঁছুব। তোমরা তাগাদা করে বেরিয়ে পড়না"! তাহাদের গর্ব্বে ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া জনৈক যুবা গাড়োয়ান বলিল "যাবিত ভার কাঁধে ব'য়ে! কাঁধও যা মাথাও তাই!—মাথায় ব'য়ে সোয়ারি নিয়ে যাবি তার আবার এত রহঙ্কার"! আমরা তোফা নবাব পুত্তুরের মত ঘুমুতে ঘুমুতে আয়েস করে যাব। তোদের মত ত কাঁধে বইব না। জনৈক বেহারা উত্তর দিল "কাঁধে কে না বয়! এই গরু মোস, ওনারাও তো মানুষ! ওনারা কি কাঁধে বইবেন না?" এ অকাট্য প্রমাণে, গাড়োয়ান বেচারা আর প্রতিবাদের পথ পাইল না! রমূল্য "আমকেষ্ট" রতন প্রভৃতি যুবকেরা মাথায় টেরা সিঁথি কাটিয়া, গায়ে ইস্ত্রিকরা ডবল ব্রেষ্টের কামিজ এবং তদুপরি অর্দ্ধ মলিন "কোর্ত্তা" বা "উড়্নি" পরিয়া,—কোমর বাঁধিয়া সকলের উপর সর্দ্দারি এবং বরযাত্রার সকল বিষয়ের তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। "কেদার!—এই তামাকের সরঞ্জাম তোমার জিম্বা, রাস্তায় যেন তখন এটা কই—ওটা কই বলে, গোল বাধিওনা! তামুক চাইলেই যেন সবাই পান্! রং মশাল তুবড়ী হাউয়ের ঝুড়ি কড়া হরমুৎ ভাই তোমার জেম্বা, গাড়ীতে যেন ভাঙ্গেনা বা নষ্ট হয় না! সব গাড়ীতে বিছনা পাতা হ'য়েচে ত? দাদাঠাকুর!—গাড়োয়ান আর বেহারা-দের সব খাইয়ে দেন্, এরা তবে সব বাঁধা ছাঁদা করতে পারে। রায় বেঁশের দল যে এখনো এসে পৌঁছুলনা। থাকবে তানারা প'ড়ে। বাজন্দার ভাই সব খেয়ে লাও, এখনি "ছি আচার" আরম্ভ হবে, তোমরা তখন বাজাবে না গরাস্ তুলবে! আছিঃ দাদাঠাকুর এখনো আপনারা খেতে বস্‌লেন না? দোপর গড়িয়ে যায়! তিন ক্রোশ যেতে হবে, পারপারানি, ঝড় ঝ্যাওটার সময়! এসব শুভ কর্ম্মে একটু আগাম শুভ যাত্রা করাই ভাল!"

বরযাত্রী বালবৃদ্ধযুবারা আহারাদি সমাপনান্তে যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া গোযানারোহণ করিলেন। কেবল বর ও বরকর্ত্তার পাল্কী এবং রমূল্য প্রভৃতি "সেচ্ছা-সেবকে"রা কেহ কেহ বর লইয়া রওনা হইবার জন্য অপেক্ষায় রহিল। "ওগো আর দেরী ক'রনা, কি কি করবে ক'রে লাও না"! পরামাণিকের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া এয়োরা সব একত্র হইল। সেজদিদি বলিলেন "খুড়িমা আমরা হাতে সুতো বেঁধেছি, তুমি বাছা দশবার জপ করে একটু জল মুখে দিয়ে এস, নইলে বর রওনা করা হবে না।" বরকে একখানা ঝাঁপের উপর দাঁড় করাইয়া চারি দিকে সাতজন এয়ো দাঁড়াইল এবং নলীর সুতা খুলিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সাত প্রেই বেষ্টন করিয়া দিল। সধবারা সেই সূত্র হস্তে ধরিয়া সাতবার বরের পায়ে ও ললাটে ছোঁয়াইয়া

শেষে বরের পায়ের নীচে দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইয়া বরের দক্ষিণ হস্তে যথাসাধ্য জটিল গ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। বিবাহের পর, এই সূত্র কন্যার দ্বারা খোলাইতে হইবে। "খুড়িমা, এইবার এসে কুলো মাথায় করে পান দিয়ে বরের চোখ ঢেকে দাঁড়াও বাছা, আগুরিটা হ'লেই হয়! ধোবা দিদি, এগিয়ে আয়। তিনটে করে খড়ের মুড়ো এনেছিস, ত? ঐ খড় কটা দিয়ে আগুন জ্বাল, এক একটা করে তিনবার তিনটে মুড়ো নিয়ে পা বরণ কর। ঠাকুরপোর পরণের এ কাপড়াখানা ধোবারা পাবে।" বরণ সমাপনান্তে ধোপা বৌ খড়ের ছাই লইয়া জিহ্বাগ্রে তিনবার স্পর্শ করিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল "তেত' না মেটো?" ধোপা বৌ তিন বারই বলিল "মেটো"।

আগুরি সমাপ্ত হইলে বর অগ্নিস্পর্শ করিয়া এবং সে বস্ত্র ছাড়িয়া অন্য বস্ত্র পরিয়া "কামানে" বসিল। নরসুন্দর কার্য্য সমাপনান্তে নিজ প্রাপ্য বস্ত্র লইতে ভুলিল না। কপালে সাতবার হলুদ ছোঁয়াইয়া, ছাউনি হাঁড়ির জল মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া তখন সকলে বর সজ্জায় মন দিল। চন্দনে চর্চ্চিত, ফুলের গড়ে মালায় ভূষিত, ললাটে দধির ফোঁটা, মস্তকে টোপর; হস্তে দর্পণ ও বারাণসীর জোড়ে সজ্জিত বরকে তখন ছান্‌লাতলায় আনা হইল। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জননী নিজ পদধূলি লইয়া বামহস্তে পুত্রের মস্তকে দিলেন, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ঈষৎ দংশন করিয়া, বক্ষে থুৎকুড়ি দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "কোথায় যাচ্ছ বাবা?" পুত্র নত মস্তকে বলিল "তোমার দাসী আন্‌তে"। হুলু, বাদ্য ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বর শিবিকারোহণ করিল। নরসুন্দর ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বাঃ বরের রাত্রের জল খাবার পান নেওয়া হয়নি। আগে যে সেই জল খাবার বর খাবে, তার পরে তাদের বাড়ীর খাওয়া। শীগ্‌গির দেন, যা আমি মনে না করব তাত আর হবে না"!

অতঃপর মহা সোরগোলে বর ও বরকর্ত্তার পাল্কী চলিয়া গেল। পূজা অন্তে মণ্ডপের মত বিয়ে বাড়ী নিমিষে "ভোঁ ভোঁ হইয়া পড়িল। খুড়ি মা সজল চক্ষে দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিমর্ষ ভাবে বসিল।

সন্ধ্যাকালে একবার ছান্‌লাবরণ করিতে এয়োরা একত্র হইয়া, কুলা ডালা শ্রী ইত্যাদি লইয়া সকলে সাতবার ছান্‌লাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু "বিয়ে বেরিয়ে" যাওয়ার পর "বিয়ে বাড়ী"র কোন কার্য্যেই পূর্ব্বের মত উৎসাহের সুর মিলিলনা।

পরদিনও ঐরূপ "সিম্‌পানে" কাটাইয়া বৈকালে সকলে বর কনে আসার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ছান্‌লাতলায় জোড় পীঁড়ি পাতিয়া "কুলা-ডালা শ্রী" সব বাহির করিয়া রাখা হইল। সর্ব্ব কার্য্য সমাপনান্তে বধূগণ যেই নিজ সজ্জায় হাত' দিয়াছেন অমনি গ্রামের বাহিরে বাদ্যের শব্দ শোনা গেল! "বিয়ে এসে প'ল বিয়ে এসে প'ল" মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। গ্রামের বালক-বালিকা বৃদ্ধা যুবতীরা বিয়ে বাড়ী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মুখে উলু, হস্তে শঙ্খ, কেহবা অঞ্চলে খই কড়ি লইয়া সদর দরজাভিমুখে ছুটিল। বাদ্য শব্দের উপরও তিন গুণ "হেঁইও হুঁইও" শব্দ

করিতে করিতে বাহকগণ শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে "রায় বেঁশে"রা লাঠি ঘুরাইয়া পুরা দমে নাচ আরম্ভ করিয়াছে। পাল্কীর পার্শ্বে পার্শ্বে "সেচ্ছাসেবকে"রা মাল্‌কোচা মারা, রংয়ে চুবান ডবল ব্রেষ্টের সার্ট ও উড়ানিপরা, মুখে পান, চেরা-সীঁতি, আলুথালু চুল, ললাটে ঘর্ম্ম, জনসংঘের মধ্য দিয়া পাল্কীকে অগ্রসর করিয়া আনিতেছে। শিবিকা থামিতেই পাল্কীর উপর খই কড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি বর্ষিত হইল এবং বিবাহের মঙ্গল কামনায় শিবিকার তলায় এক ঘড়া জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ঘড়াটা বাহকেরা দখল করিল। দুইজন সধবা পাল্কীর দুই দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই থালা চাউল তদুপরি এক একটা মুদ্রা লইয়া পাল্কীর তলা এবং ভিতর দিয়া পরস্পরের হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ করার পর থালা ও মুদ্রা বাহকদের দখলে গেল। পুত্র ও বধূর মুখে খুড়িমা শিবিকার ভিতরেই মিষ্ট দিলেন এবং মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন। বর ও বধূকে * ক্রোড়ে করিয়া ছান্‌নাতলায় আনিয়া বধূকে দুধে-আল্‌তার পাত্রে, বরকে পীঁড়িতে দাঁড় করান হইল। বধূর কক্ষে মঙ্গলঝারি, হস্তে মৎস্য এবং মস্তকের উপর বরের বামহস্ত স্থাপনা করিয়া তাহার উপরে ধানের আড়ি সিন্দুর কৌটাসহ দেওয়া হইল। ঝারি ও ধানের আড়ি সধবা বালিকারা ধরিয়া রহিল, কেননা বরকন্তা বেচারারা তখন নিজেরাই অসম্বৃত! খুড়িমা ধান দূর্ব্বা পান প্রদীপ ইত্যাদি লইয়া পুত্র ও বধূকে বরণ করিতে লাগিলেন। মেছুনিরা মাছের ডালা আনিয়া বধূর সম্মুখে ধরিতে লাগিল কেননা যেমন তেমন মাছ দেখাইয়াও তাহারা টাকা ও বস্ত্র লাভ করিবে! বরণান্তে সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া জলধারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নববস্ত্রের উপর দিয়া বর বধূ গৃহ প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বধূর মস্তকস্থ ধান্য বর দর্পণ দ্বারা কাটিয়া চারিধারে বধূর পশ্চাতে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। ঘরে গিয়া বধূ বসাইয়া শাশুড়ী সর্ব্ব ভূষণের অগ্রে এক গাছি লোহা লইয়া বধূর বাম হস্তে পরাইয়া দিলেন। কড়ি খেলাইবার জন্য রহস্য সম্পর্কীয়াগণ চারিধারে ঘেরিয়া বসিল।

বধূকে "ভরা হেঁসেল" দেখাইয়া তবে সমাগত বরযাত্রীদের ভোজন করান হইল। পরদিন বৌভাত, গ্রামের সকলেই নিজের কাজ ভাবিয়া যার যথাসাধ্য করিতে লাগিল। দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত ভোজ চলিল। আহুত অনাহুত সকলেরই সমান আদর! উঠানে কলাপাতা পাতিয়া শাক শুক্ত ঘণ্ট চড়চড়ি ও শুভ্র অন্ন, লুচি সন্দেশ পোলাও কালিয়ার অপেক্ষা সকলে সাদরে ভোজন করিতেছে! কার্য্যগতিকে যে খাইতে আসিতে পারে নাই তাহার জন্য পর্য্যন্ত অন্ন পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। পাড়ার ছেলেরা দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত মাথায় করিয়া ভাত বহিতেছে, "জোল" কাটিয়া হাঁড়ী হাঁড়ী ভাত নামাইতেছে! তাহাতে তাহাদের লজ্জা অপমান বা আলস্য শ্রান্তি নাই। *

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

---

* এ প্রবন্ধে দেখিতেছি বর মেয়েদের কোলে চড়িয়া আনাগোনা করিতেছেন; বরটি বুঝি নিতান্তই কৃশকায় বালক? যুবাবর বা স্থূলকায় বালক হইলে এরূপ স্থলে কি হইত? ভাঃ সঃ

মহাশুচি।

পুণ্য কাশীধামে "মহাশুচি" নামে
নারী ছিল একজন,
তীর্থে বাঁধি ঘর নাহি মানি ডর
পাপে দিয়াছিল মন।
কত ধনী মানী আপনারে হানি
পূজা স'পেছিল তায়,
পরি নানা ফাঁসী বারাণসীবাসী
লুটে আসি তার পায়।
নাশি বহুজনে "মহা" ভাবে মনে
তার সমতুল নারী—
এই ধরা মাঝে কেহ নাহি আছে
অতুলন রূপ তারি।
আপন গরবে এইরূপে যবে
"মহাশুচি" ভুলি রয়,
পাপরাশি তার হোলো গুরুভার
ধরা আর নাহি সয়।
কত শত সতী হারাইয়া পতি
ফেলে নয়নের লোর,
তার যত পাপে তপ্ত অভিশাপে
করি তুলেছিল ঘোর।
একদিন রাতে শুয়ে বিছানাতে
"মহা" ঘুমাইছে সুখে;
দাসী তার রূপী আসি চুপি চুপি
বিষ দিল তার মুখে।
বহুদিন হতে রূপী নানা মতে
খুঁজিতেছে অবসর—
"মহারে" মারিয়া কেমন করিয়া
নিজে লবে তার ঘর।
তার মত সুখে হাসি ভরা মুখে
সবারে করিবে বশ,
তারি মত ধন তারি মত জন
তারি মত খ্যাতি যশ।
মনে বড় লোভ সেই মত ভোগ
আপনি করিবে রূপী,

রাত্রি দিন জলি শেষে গেল চলি
যেথা সাপুড়িয়া গুপি।
নানা কথা ছাঁদে ফেলি তারে ফাঁদে
আনি দিল তার পাশ;
হেন বিষ আছে, যাহে প্রাণ বাঁচে
শুধু বর্ণ করে' নাশ।
শুনিয়া উল্লাসে রূপী মহা হাসে
ভাবে, হোলো বড় ভালো;—
রূপ তার হরি দিব দাসী করি
মুখখানি হবে কালো।
কালো হলে দেহ না চিনিবে কেহ
না ভাবিবে মনে কিছু;
"মহা" যদি কোনো কথা তোলে হেন
বুঝে লব তবে পিছু।
এত ভাবি মনে রূপী গুপি সনে
করিয়া ফেলিল চুক্তি,
দুটি টাকা দিল, কিছু বিষ নিল
দেখাইয়া নানা যুক্তি।
গৃহে ফিরে এসে রূপী ভাবে শেষে
কখন হইবে রাত্র,—
বিষটুকু খালি মুখে তার ঢালি
জুড়াইব নিজ গাত্র।
রজনী গভীরে রূপী ধীরে ধীরে
মহাশুচি যেথা শুয়ে—
পাশে তারি গিয়া বিষ ঢালি দিয়া
দাঁড়াইয়া রহে ভুঁয়ে।
দণ্ড দুই পরে মসিবর্ণ ধরে
সেই কমনীয় কায়—
বিধাতার সৃষ্টি হেন রূপবৃষ্টি
মৃগ তৃষ্ণিকায় প্রায়।
"মহা" নাহি জানে আজি সাবধানে
বাঁচাইয়া রাখি প্রাণ,—
হরিলেন বিধি তার রূপ নিধি
দিতে তারে মহাত্রাণ।

রজনী প্রভাতে যবে আয়নাতে
হেরে "মহা" নিজ মুখ,
ক্ষণে কাঁপি ওঠে কাল ঘর্ম্ম ছোটে
শিহরিয়া ভাঙ্গে বুক।

ভয়ে বিস্ময়ে হতজ্ঞান হয়ে
কথা কিছু নাহি বলি,
না জানিতে কেহ ছাড়ি নিজ গেহ
"মহা" গেল দূরে চলি।

রাত্রি দিন চলে কথা নাহি বলে
নাহি বসে কোন ঠাঁই।
কিছু নাহি খায় ফিরে নাহি চায়
দেহে যেন প্রাণ নাই।

গেল দুই দিন অনাহারে ক্ষীণ
প্রাণহীন মত হয়ে,
জাহ্নবীর ক্রোড়ে আসি মূর্চ্ছি পড়ে
শীর্ণ দেহখানি লয়ে।

নদী পুণ্য তোয়া সদ্য স্রোতে ধোয়া
বক্ষে লয়ে দেহ তার—
চলিল উল্লসি ত্যজি বারাণসী
যুক্ত হতে পারাবার।

বিশ্ব স্নিগ্ধকারী পুণ্য নদী বারি
"মহাশুচি" করি পান,
বিধির বিধানে বাঁচি থাকে প্রাণে
নিতে তাঁর মহাদান।

দেহে বিষ থাকে, ভাসাইয়া রাখে,
হেন গুণ ছিল বিষে
জলে না ডুবিবে যে অবধি রবে
অঙ্গ সনে ইহা মিশে।

চারি দিন রাত্রি গঙ্গা বক্ষে যাত্রা
অবিশ্রাম চলে ভেসে,
সাগর সঙ্গমে পুণ্য দেবাশ্রমে
দেহ তার লাগে এসে।

রাত্রি সবে ভোর অন্ধকার ঘোর
তখনো রয়েছে মিশি,
সেই সন্ধিক্ষণে মহা যোগাসনে
বসেছেন "দেব" ঋষি।

নদী উপকূলে তাঁর পাদ মূলে
"মহাশুচি" দেহ ঠেকে।
ক্ষীণ চেতনায় হইয়া সকায়
আঁখি মেলি তবে দেখে।

ঋষি পুণ্য শ্লোকে তীর্থ মর্ত্ত্যলোকে
যাঁর পদরেণু মাখি,—
তাঁর পুণ্যাশ্রমে মহাভাগ্য ক্রমে
"মহাশুচি" মেলে আঁখি।

"দেব" নাম তাঁর করুণা আধার
তুলি "মহাশুচি" দেহ,
নিজ বস্ত্র দিয়া তারে আবরিয়া
লয়ে চলিলেন গেহ।

সদ্য দুগ্ধ পান মহৌষধি দান
দেবর্ষি "দেবের" সেবা,
বাঁচাইল তায় দেহে পুনরায়
দেখা দিল নবপ্রভা।

প্রাণ সে পাইল বরণ রহিল
সেই মত ঘোর কৃষ্ণ,
কিন্তু তাহে আর ক্ষতি নাহি তার
দেহ রাগে সে বিতৃষ্ণ।

ঋষি শুদ্ধ মতি তাঁর পুণ্য জ্যোতি
পশিল পরাণময়,
ব্যাকুল হৃদয় হেন পুণ্যোদয়
"মহা" ভাবে কিসে হয়!

নিজ চিত্ত ভার ঘন অন্ধকার
এবে সে দেখিতে পায়,
ঘুচি গিয়া শোক হেন পুণ্যালোক
কেমনে উদিবে তায়?

না জানে সন্ধান এই দীপ্তিমান
জ্যোতি প্রকাশিবে কিসে,
নষ্ট মহাপাপ চিত্তদাহ তাপ
যে আলোকে যাবে মিশে।

"মহা" অতঃপর জুড়ি দুই কর
ঋষি পদতলে পড়ি
বলে প্রভু স্বামি, মহাপাপী আমি
কেমনে এ পাপে তরি।

ঋষি ব্রহ্ম তুল্য নাহি যার মূল্য
আনুকূল্য করি তায়
করিলেন দান সেই ব্রহ্মজ্ঞান
জীব যাহে মুক্তি পায়।
বলিলেন শুন রাত্রি শেষে পুনঃ
ভাসে যে আলোকধার
সেই আলো মাঝে যে চেতনা রাজে
বিশ্বমাঝে তাহা সার।
চিত্ত মুক্ত করি এ আলোকোপরি
সঁপি দিলে প্রাণ মন,
পাবে হেন যোগ যাহে সব ভোগ
"একে" হবে সমাপন।
দেখিবে অভিন্ন সবি "একে" পূর্ণ
সকলি চৈতন্যময়,
না রহিবে আর চিত্তে কোনো ভার
অন্ধকার হবে লয়।
শুনি এই কথা পরম বারতা
শান্তি উপজিল প্রাণে,
চিত্ত গতি তার ছাড়ি এ সংসার
ধায় উর্দ্ধলোক পানে।
যেথা শুভ্রালোকে পূর্ণ মহাযোগে
নিজ বক্ষে লয়ে সবে,
বসি বিশ্বরাজ, তাঁরে দেখি আজ
"মহাশুচি" মুক্তি লভে।
সেই হতে তার করুণায় বার
পিয়ে নর নারী যত,
কালো দিয়া মুছি "মহা" হোলো শুচি
বিদি রুচি এই মত।

বর্ষশেষ।*

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণ-মনে যোগ দিতে পারবে? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক—তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ; শেষ বলতে যে কি বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না, বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করচে—আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করচে। তোমরা এই যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করচ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি—তোমরা কেবল নিচ্চ এবং খাচ্চ—আর আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আস্‌চি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করচি;—ঘরে যা সঞ্চয় করে বসেছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না—সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে; আজ কিছু যাচ্চে, কাল কিছু যাচ্চে—অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্ব্বাচলের যাত্রী, সূর্য্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ—সেইদিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করচেন তাঁকে তোমরা পূর্ব্ব মুখ করেই প্রণাম কর। আমরা পশ্চিম অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি—সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আস্‌চে—সেই আহ্বানও

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষে উপাসনায় কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্ব্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ—একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ—কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই—একদিকে যিনি শিশুর, আর একদিকে তিনিই বৃদ্ধের। একদিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্চেন, আর একদিকে তাঁর একরূপের দিকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্চেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত হয়েছে। কোনো শেষ যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না—ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়—বিরাম যে কেবল কর্ম্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায় এই কথাটি আজ এই চৈত্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্ত্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্চে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি জগতে যা-কিছু চলে যায় ক্ষয় হয়ে যায় তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্চেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্ব্বেই আমি বলেছি তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতি-দিন কেবল নূতন-নূতনকে পাচ্চ, আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্চেই! এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তাহলে কিজন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ঙ্কর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তাহলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরত না, আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্চি জীবনের সমস্ত পাওয়া কেবলি একটি পাওয়াতে এসে ঠেকচে—সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্চে সেখানে দেখচি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড় একটি আশ্চর্য্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া, তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই পাইনি পাইনি কান্নাটা থেকে যায়—অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুনতে পাইনে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুনতে দেয় না।

কিন্তু একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কি গভীর পাওয়া কি বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবামাত্র মৃত্যুভয় চলে যায়—তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে, যা-কিছু যাচ্চে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্চে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে—সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন নূতনকে পায় না—তখন তার দেবার পালা।

তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই ত পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলি আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিষ থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে সব ঘুচ্‌লেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেই জন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এই জন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে মৃত্যু আছে। যদি না থাকৃত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন অবকাশ দিয়ে আমরা দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম, সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলি মেঘের মত সরে যাচ্চে, কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্চে বলেই যিনি সরে যাচ্চেন না, মিলিয়ে যাচ্চেন না তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্চি।

তাই আমি বলচি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বদ্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখ। কিছুই থাকৃচে না, সবই চলেছে এইটিই লক্ষ্য কর। মন শান্ত করে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্চে এমন একটি থাকা স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগচ্চে ততই দেখতে পাচ্চি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে তার হিসাব রাখতে কে পারে, তা অনেক তা অসংখ্য, কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে সমস্ত দিয়ে যাঁকে পাচ্চি তিনি এক। গেছে গেছে এ কথাটা যতই কেঁদে বলি না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠ্‌চে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগচে সেখানে ভাল করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্চে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও—দেখ, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণু-পরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে, দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু একজায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে—কলশব্দ নেই চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সঙ্গীতে বিলীন হয়ে রয়েছে,—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে দিয়েছেন

এজন্যে আমি আমার মানব জীবনকে ধন্য মনে করচি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ যে কোল সেই বক্ষে সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করচি। একদিকে অনেককে হারিয়েও আরএকদিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাইনি, যা পেয়েছি এবং চাইনি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্য্যের মধ্যে যখন দেখতে পাচ্চি তখন তাদের দুঃখবেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠচে—কেননা, আমি যে দেখ্‌তে পাচ্চি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি—আমার যা কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্চে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি—একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন—এমন আনন্দ আর-কিছু নেই এমন অভয় আর কি হতে পারে!

আজ আমার মন তাঁকে বল্‌চে, বার বারে খেলা শেষ হয় কিন্তু হে আমার জীবন খেলার সাথী, তোমার ত শেষ হয় না। ধূলার ঘর ধূলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়, কিন্তু যে-তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে-তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ সেই তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে গেছে তখন তোমাকে ধরেছি তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বল্‌তে পেরেছি খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে; দেখতে পাচ্চি ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করচ,—সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করচি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তাহলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জ্জনার আঘাতে পদে পদে ধূলোর উপরে পড়্‌তে হয়—এবার সে সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়া-তাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠিনে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও! যত বিঘ্ন দূর কর, যত ভয় সরিয়ে দাও, যা কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্চে সব লয় করে দাও—হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজকন্যা।

দ্বিতীয় দৃশ্য। উদ্যান-ভূমি।

নানাপ্রকার ফুলরাশি ও ফুলের টুকরী সম্মুখে রাখিয়া মালিনী-কন্যা সুগন্ধা অলঙ্কার রচনা করিতেছে।

সু। (একগাছি সপ্তনর হাতে তুলিয়া ধরিয়া) এগাছি রাজকন্যাকে না পরালে তৃপ্তি নেই; এই ঝরা ফুলগুলোর মধ্যে হারটি লুকিয়ে রাখি—মাগী এসে পড়লে মুস্কিল হবে। কই মধুগন্ধা ত এখনো এলনা,—পদ্মফুল তুলতে গেছে—সে ত কখন?

মধুগন্ধার প্রবেশ।

এই যে পদ্ম পেয়েছিস দেখছি।

ম। অনেক খুঁজে একটি পেয়েছি দিদি। আজ কাল কি পদ্মের সময়—রাজকন্যা চেয়েছেন—তাই যেন তাঁকে আত্মদানের জন্যেই এটি অসময়ে ফুটেছিল!

সু। ভারি যে কবি হয়ে উঠলি? এই টুকরীর মধ্যে তবে ফুলটি লুকিয়ে রাখ,—মাগী এসে দেখলে আর রাজকন্যাকে দিতে পারব না, সে ফুল নিয়ে চলে গেলে তখন দিয়ে আসব। ঐ বুঝি আসছে—একটা যেন ছায়া দেখছি, নূপুরগুঞ্জন কানে বাজছে,—লুকো লুকো—

ম। (পদ্মফুল লুকাইতে লুকাইতে) আসতে আজ্ঞা হোক—

দুজনে। আসতে আজ্ঞা হোক, জয় মাতঙ্গিনী—রাণীসঙ্গিনীর জয়—জয় জয়—

হাসির প্রবেশ।

হা। বলি এত জয় জয়কার কি আমার অভ্যর্থনায় নাকি? বড় ত সৌভাগ্য!

সু। ওমা! এ যে হাসি!

ম। তাই ভাল, বাঁচলুম—আমাদের আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গিয়েছিল।

সু। আমরা ভাবলুম—বুঝি কুহকিনীটা এল—এইনে ভাই, সাতনর—

ম। এই নে ভাই পদ্মফুল, অনেক কষ্টে এটি যোগাড় করেছি। মহারাণীর জন্যে এতটা কষ্ট করতে ইচ্ছাই হোত না—কিন্তু আমাদের রাজকন্যা চেয়েছেন?

সু। মাগীকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে, ভয়ে ভয়ে এতক্ষণ সাতনরগাছি ঝরা ফুল গুলোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

হা। তবু ত তার জয়জয়কার ছাড়িসনে?

ম। বল না থাকলেই ছল ধরতে হয়, নইলে দীন হীন দুর্ব্বল, আমাদের উপায় কি ভাই!—রাজকন্যাকে ফুলগুলি দিয়ে ভাই আমাদের প্রণাম জানাস—।

হা। মহারাণীর জন্য কি অলঙ্কার তৈরি করেছিস—একবার দেখে যাই—রোজ ত আসতে পাই নে—।

সু। না ভাই, আর দেরী করিস নে—শীঘ্র যা—তার আসার সময় ঘনিয়ে এল—।

ম। তোর হাতে এ সব দেখলে আর রক্ষা থাকবে,না।

হা। তবে ত আমি ভয়ে মরে গেলুম!

সু। তুমি না মর—আমরা ত মরব।

হা। মাগীর যেন বাপকেলে ধন। সংসারে এমন অকৃতজ্ঞ লোক আর দেখেছিস?

রাজকন্যার মার খেয়ে পরে মানুষ আর তিনি মরতে না মরতে তাঁর সতীনের ঘরে ঢুকলো!

ম। তা ঠিকই হয়েছে,—রাহু রাজা—তস্য মন্ত্রী কেতু ত চাই। বড় রাণীর কাছে কিন্তু মাগীটার এ রকম মূর্ত্তি ছিল না, যেন কতই ভাল মানুষটি!

ম। তা গেছে ভালই করেছে, ও রকম লোক যাওয়াই ভাল।

হা। তা যাক্‌না, মরুক্‌ না; কিন্তু যার স্নেহে তুই মানুষ, কি করে তার মেয়ের সঙ্গে এমন করে বাদ সাধিস? মুখ দেখলে পাপ হয়!

সু। জানিসনে ভাই,—স্নেহ মমতা করুণার ঋণ—দু রকম করে শোধ দেওয়া যায়; এক কৃতজ্ঞতা দিয়ে, আর কৃতঘ্নতা দিয়ে—

ম। রাণী তাকে যে রকম অনুগ্রহ করতেন—কৃতজ্ঞতায় ত সে ধার শোধ হবার না—তাই মাগী অন্য পথ ধরেছে।

সু। যা হোক তুই ভাই পালা, আর একদিন ফুলের গহনা সব ভাল করে দেখাব—।

ম। হ্যাঁ ভাই—আর দেরী না—এখনি সরে পড়।

সু। ঐ আসছে ঐ আসছে—পালা।

হা। কোথা দিয়ে যাই—এই দিকে—ওমা ঐ যে! কোন দিকে ছুটি—!

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।

(এ পথে একবার ও পথে একবার পলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে হাসি ঠিক মাতঙ্গিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল)।

মা। এ কে! হাসি দেখছি যে! আহা কি নামই মাবাপ দিয়েছিল! কখনো ত মুখে এ পর্য্যন্ত হাসি দেখলুম না!

হা। পথ দাও গো; আমার এখনি যেতে হবে—।

(হাসির পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা,—মাতঙ্গিনীর তাহাতে বাধা-দান)

মা। ফুলে ফুলে যে চুবড়ি ভরা দেখছি। শুধু ফুল না—ফুলের গহনা—সাতনর—তার উপর আবার পদ্মফুল। বুঝেছি বুঝেছি—ষড়যন্ত্র বুঝেছি, এই জন্যই আমার মহারাণী একটা ভাল ফুল পান না।

সু। না দিদি, ও সাতনর আমরা গাঁথিনি—ও নিজে গেঁথে আমাদের দেখাতে এনেছিল।

ম। এ পদ্মফুলও আমরা দিই নি দিদি, ও কোথা থেকে তুলে এনেছে। আমরা সেই অবধি ওর কাছে ফুলটী চাচ্ছি—

সু। বলছি—অসময়ের ফুলটি আমাদের দে—মহারাণীকে দিলে ফুলটি সার্থক হবে—তা দিচ্ছে না।

ম। দে ভাই ফুলটি—মহারাণীর জন্য দে।

হা। কেন দেব! আমি ত নেমকহারাম নই। চিরদিন যাঁর অন্নে যাঁর স্নেহে পালিত—ধনের লোভে আজ তাঁকে ত্যাগ করব, এমন বংশে জন্মাইনি আমি!

মা। (স্বগত) উঃ অসহ্য। (প্রকাশ্যে) —যত বড় মুখ না তত বড় কথা—বেরো বলছি—এখান থেকে।

হা। কেন বেরোব—তোমার কিনা বাপের বাগান—

মা। উঃ দম্ভ দেখ! ওলো আঁধারচোখি, গোমসামুখি আমার বাপের বাগান না, তোর বাপের বাগান নাকি?

হা। আমার রাজকন্যার বাপের বাগান।

মা। রাক্ষসি, হতভাগি, এ আমার মহারাণীর বাগান! এ ফুল নিয়ে তুই যাস কি করে—তাই দেখব।

মাতঙ্গিনী টুকরী কাড়িতে উদ্যত হইলে হাসি সরিয়া দাঁড়াইয়া)

হা। খবরদার এ ফুলে হাত দিও না।

মা। সুগন্ধা, মধুগন্ধা ফুল কেড়ে নে বলছি—

হা। কেড়ে নেবে! কাড়ুক দেখি?

সু। দে ভাই দে,—কেন মিছে গোল করিস্।

হা। কক্ষণো না,—প্রাণ থাকতে না, ফাঁসি ত দেবে না—

মা। ফাঁসি দেব না শূলে দেব—

হা। দেবে দিও, ফুল দেব না, তোমার যা করবার কোরো—ভগবান আছেন।

প্রস্থান।

মা। লক্ষীছাড়ি, হতভাগি, ময়না, রাক্ষসি, গোমসামুখি, দেখব তোকে কে রক্ষা করে? তোর ভাই ভাইপো সব নির্ব্বংশ করব, ঘর দোরে ঘুঘু চরাব তবে আমার নাম মাতঙ্গিনী! প্রস্থান।

সু। সর্ব্বনাশ হোল দেখছি! এ কুহকিনীর অসাধ্য কিছুই নেই।

ম। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে উলু খড়ের প্রাণ যায়! আমাদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! কিন্তু মাগীটার বড় বাড় বেড়েছে!

(বলিতে বলিতে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-বাটিকায় রাজকন্যা বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন।

মধুর আকাশ মধুর ছবি,
মধুরূপময়ী ধরণী ছবি
মধুর মিলনে আলোকিত সবি,
দশদিকে প্রেম পুলক বয়।
লতা পাতা ফুল ঢালিছে সুগন্ধ,
বহিছে পবন শীতল সুমন্দ
নির্ঝর তটিনী গাহিছে আনন্দ,
তব নামে বিভু উঠিছে জয়!
এত সুখ ভরা এই নিকেতন;
দ্যুলোক ভূলোক সুখে অচেতন—
কেন পিতা তবে এ সন্তানগণ;
দীন দুখী শুধু তোমার ঘরে—।
এমন ধরণী—এত সুখালোক,
মেলিতে ফেলিতে পুলক-পলক
হের তাহাদের নিমীলিত চোখ,—
যাতনার অশ্রু সলিল ভরে!
এ মহা আঁধার প্রভুহে ঘুচাও,
এ সুখ প্রভাতে তাদেরও জাগাও
তব রাজ্য হতে দূর করে দাও,
শোক পাপ তাপ বিপদ লেশ।
দিলে যদি জ্ঞান, কেন তবে মোহ,
কেন ঈর্ষা দ্বেষ দিলে যদি স্নেহ,
এ আনন্দ রাজ্যে কেন প্রভু দেহ—
এত অমঙ্গল বেদনা ক্লেশ!

(একজন রমণীর ধীরে প্রবেশ এবং গান শেষ হইলে সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

রাজ। কে তুমি শান্তে?

রমণী। রাজকন্তে, আমি অভাগিনী, আপনার কাছে দুঃখ নিবেদন করতে এসেছি।

রাজ। কি দুঃখ বল ভগিনি, আমার ক্ষমতায় যদি তোমার দুঃখ নিবারণ হয়—তবে আমার সৌভাগ্য।

রমণী। সেনাপতির গরু আমাদের বাগানে ঢুকে শাকশবজি নষ্ট করছিল—তাই আমাদের চাকরটা—গরুটাকে বেঁধে রাখে। বাবা তখন দোকানে ছিলেন; তিনি এ সব কিছু জানেন না; তবুও আমাদের জিনিষপত্র সব বাজেয়াপ্ত—আর বাবাও বন্দী হয়েছেন।

রাজ। বৎসে—আমার যদি সাধ্য থাকত—এই মুহূর্ত্তে তোমার পিতাকে মুক্তি দিতেম—কিন্তু

রম। কিচ্ছু দোষ নেই—রাজকন্যে—কিচ্ছু দোষ নেই, আপনি যদি মুক্তি না দেন, দয়া না করেন—তবে এই দীন হীন দুর্ভাগ্যেরা কার দ্বারে দাঁড়াবে?

রা। (স্বগত) উঃ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে উঠছে! (প্রকাশ্যে) আমি তোমাদের চেয়েও অসহায় অনাথা, আমার প্রাণ দিলে যদি তোমাদের কষ্টের প্রশমন হোত, যদি রাজ্যে ন্যায় সত্য সুবিচার ফেরাতে পারতুম—ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করতুম না।

রম। আপনি একবার কেবল মহারাজকে বলুন—।

রাজ। ভদ্রে, তোমাদের চেয়েও আমি অভাগিনী। মাতৃহারা হয়ে পর্য্যন্ত পিতার চরণ দর্শনেও বঞ্চিত হয়েছি,—কিন্তু থাক্ ও কথায় আমাকে প্রবৃত্ত করো না।

রম। তবে আমাদের কি দশা হবে? বাবাই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়!—আমরা কোথায় দাঁড়াব তবে?

রাজ। বৎসে আমার এক মুষ্টি অন্ন যতদিন মিলবে—ততদিন সে চিন্তা কোরোনা, আমার এ ঘর যতদিন থাকবে—ততদিন তোমাদেরও আশ্রয় মিলবে। কিন্তু তাতে ত তোমার পিতার কারা-মুক্তি হবে না।

রম। মাগো, অকূল সাগরে তুমি যে আমাদের তরণী দেখালে? আমি কি তবে মাকে নিয়ে আসব?

রাজ। যাও বৎসে, নিয়ে এস!

প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

রাজ। এই সব অন্যায় অত্যাচার দেখলে—প্রাণ যে কি তীব্র বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে! মনে হয় অসুরমর্দ্দিনী হয়ে এ সব বিনাশ করে ফেলি। তখনি আবার মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার অক্ষমতা—দুর্ব্বলতা কি নিদারুণ ভাবেই অনুভব করি! হা বিধাতা! কেন তোমার রাজ্যে—এত নিপীড়ন, এমন অবিচার! মানুষ কি তোমার চেয়েও বড়, প্রভু! অন্যায় কি ন্যায়ের চেয়েও ক্ষমতাবান। নিষ্ঠুরতা কি করুণার চেয়েও শক্তিশালী?

(নেপথ্যে)—মাগো দয়া কর—

একজন কাঠুরিয়া রমণীর প্রবেশ—!

রাজ। কি চাও বাছা?

রমণী। আমার কাঠগুলা সব কেড়ে নিয়ে গেল মা! খাজনা নিতে এসেছিল, আমি বল্লুম—আজ না—আর একদিন আসিস্। তা শুনলে না কাঠগুলো নিয়ে গেল; ঘরে কিচ্ছু অন্ন নেই, ছেলেগুলো কাঁদছে মা—

রাজ। কেঁদনা বাছা, আমার ঘরে এখনো অন্ন আছে—ছেলেদের এখানে নিয়ে এসগে।

আর আমার বাগানে যতদিন গাছ থাকবে, ডাল কেটে নিয়ে যেও।

রম। মাগো—রাজরাণী হও, স্বয়ং অন্নপূর্ণা মা আমার, জয় হোক!—

(প্রস্থান—ও আর একজনের প্রবেশ।)

মাগো, রাজকন্যে!

রাজ। কি বাছা? মহারাণীর সেপাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—বাবা তা দেখেনি, রাস্তায় জল দিচ্ছিল বাবা,—দৈবাৎ জলের ছিটে সিপাইয়ের পায়ে লেগে গেল, আর অমনি বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে মা;—মাগো আমরা কোথায় দাঁড়াব, খাওয়াবার লোক কেউ আর নেই, রাজকন্যে!

রাজ। আমি ত বাছা তোমার বাবাকে রক্ষা করতে পারব না; তোমরা আমার কাছে এস—আশ্রয় দেব।

রম। তবে যাই মা—বোনগুলোকে নিয়ে আসি—?

রাজ। যাও বৎসে!

রম। শঙ্করী মা, তুমিই আমাদের কাণ্ডারী—! প্রস্থান।

আর একজনের প্রবেশ।

দয়াময়ি রাজকন্যে—বাঁচাও গো—

রাজ। কি হয়েছে, বাছা?

রম। আমার ছেলেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমাদের জিনিষপত্রও সব কেড়ে নিয়েছে।

রাজ। কেন গা বাছা?

রম। আমরা মা শূদ্র—নীচ মাহার জাত—

রাজ। সেটাত কোন দোষের কথা নয়—বাছা।

রম। দোষের কথা—বড়ই হয়েছে মা; ছেলেটার মতি-গতি, একেবারেই মন্দ হয়েছে—নইলে এমন দশা হয় রাজকন্যে?

রাজ। কেঁদনা বাছা—বল কি হয়েছে?

রম। সে একজন সাধুর চাকর হয়েছিল; সাধু তাকে পাঠ করতে শেখায়; বুঝলে মা?

রাজ। সে ত ভাল কথা বাছা—

রম। ভাল কথা মা? তুমি এত জ্ঞানী হয়ে মা এ কথা বল্লে! সাধু যতদিন বেঁচে-ছিলেন—সব চলছিল ভাল; তিনি মরতে ছেলেটা ঘরবাসী হয়েছে, এখানে এসেও কিনা—পুঁথি পড়বে মা!—এত বলি ও পাপ কার্য্য করিসনে, তাও শোনে না; শেসে রাজদ্বারে খবর উঠলো; যা ভেবেছিলুম তাই!—দুজন পণ্ডিত ঘরে এসে—মার-ধোর করে সব জিনিষ-পত্র কেড়ে নিয়ে গেছে—মা,—এখন কি করি বলনা—ছেলেটা ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, বলত চরণ দর্শনে নিয়ে আসি।

রাজ। (স্বগত) কি অত্যাচার—আর শুনতে পারিনে। (প্রকাশ্যে)—যাও বাছা—তাকে নিয়ে এস—আমার দেবী মন্দিরে তোমার ছেলে স্তোত্র পাঠ করবে।—

প্রস্থান। নেপথ্যে—মাগো রক্ষা কর মা।

একজন পুরুষের প্রবেশ।

রা। এস বাছা, কি হয়েছে?

পু। মাগো—আমরা ছোট জাত 'পারিয়া'—একটা ষাঁড় তাড়া করেছিল তাই ভবানী মন্দিরে ঢুকে পড়েছিলুম—তাইতে পুরুত ঠাকুর লাঠিতে আধমারা করে ফেলেছে, মা!—

রাজ। (স্বগত) উঃ কি ভয়ানক, প্রাণের রক্ত জল হয়ে যায়! দেব দেবীর দ্বারও

দুর্ভাগ্যের নিকট বদ্ধ! হে ব্রাহ্মণ, হে ক্ষত্রিয়, দুর্ব্বল-দলনেই কি আজ তোমাদের মহত্বের পরিচয়? হায়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? তোমার আমার বিনাশে শুধু না—তোমরা যে সমগ্র জাতির অধঃপতন আনয়ন করছ! (প্রকাশ্যে) বৎস, তোমার আর ভাবনা নেই—আজ থেকে আমার মন্দিরে তুমিই দেবতা পূজা করবে।

পু। মাগো দয়াময়ি—এমন পাপ কাজ আমাকে করতে বলোনা, এজন্মে পারিয়া হয়ে জন্মেছি, পরজন্মে আবার কুকুর হয়ে জন্মাব।

রাজ। বৎস, মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ রকম নিয়ম করেছে, দেবতার কাছে—ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নেই, বৎস। মনের শুদ্ধিই প্রকৃত শুদ্ধি। প্রকৃত শুদ্ধ মনের পূজা দেব দেবী সাদরে গ্রহণ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ এ রকম হীন কার্য্য করে—তারাই দেবতার চরণ-স্পর্শের অনধিকারী। তুমি পূজক হলে আমার মন্দির শুদ্ধ হবে। এতে তুমি কুণ্ঠা বোধ করনা; যাও বৎস, মন শুদ্ধ করে ফুল তুলে নিয়ে এস।

সু। মা যে আদেশ করেন। আমি মায়ের ভৃত্য। মূঢ় মূর্খ জন—আমরা আর কিছুই জানি না! প্রস্থান।

রা। আমার চোখের পরদা সহসা যেন খুলে গেছে—দিব্য দৃষ্টি হয়েছে। বিধাতাকে আমরা ধিক্কার দিই, অদৃষ্টকে আমরা নিন্দা করি—কিন্তু আত্মশক্তির সদ্ব্যবহারের আমরা ত কিছুই চেষ্টা করিনে! আমি অভিমানে নিষ্কর্ম্মা হয়ে এত দিন কেবল বিধাতাকে আর পিতাকে নিন্দাই করেছি,—কিন্তু অদৃষ্ট খণ্ডনের জন্য, অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছি কি? কিছু না কিছু না। আমার মধ্যে কতটা শক্তি কতটা সাধ্য নিহিত আছে তা বোঝবার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিনি। পিতার কাছে অযাচিতভাবে এ সকল দুঃখ জানাতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করেছি। তিনি হয়ত এসব অত্যাচার পীড়ন কিছুই জানেন না; তাঁকে জানালে এর একটা প্রতিকার অবশ্যই হতে পারে।

(অন্যমনে উর্দ্ধমুখে বীণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে কিছুক্ষণ পরে বীণা রাখিয়া)

আমার মনে আজ নবীন বল, নব আশার সঞ্চার হচ্ছে! এতদিন বৃথা কেঁদে, বৃথা দুঃখ ক'বে আমার অন্তর্নিহিত শক্তিরই অপলাপ করেছি। আজ বেশ বুঝতে পারছি,—ক্রন্দন, অবসাদ নিশ্চেষ্টতা মনুষ্যধর্ম্ম নয়—জড়তা অজ্ঞানতা মনুষ্যত্বলোপক হীনতা মাত্র। যার মধ্যে যতটুকু শুভ শক্তি আছে, তাহার সাধনাতেই মনুষ্যের জীবন জন্ম সার্থক,—কর্ম্মই পুণ্য, কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্মই উপাসনা। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা।

হে দেবতা! দ্যুলোক ভূলোকের মঙ্গলময় অধিপতি আজ হতে আমি সেই ব্রতই গ্রহণ করলেম। আজ হতে পুণ্য কর্ম্মদ্বারাই আমি তোমার পূজা করব। হে শুভ শক্তিদাতা বিধাতৃ পুরুষ তুমি আমাকে বর দাও, বল দাও, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে এই পুণ্য ব্রত সাধনে আমার সহায় হও—।

(হাসির প্রবেশ)

হা। রাজকন্যে, এই পদ্ম ফুল এনেছি,—আপনি এই ফুলে আজ দেবার্চ্চনা করতে চেয়েছিলেন।

রা। কিন্তু তোর মুখ ত আজ পদ্মের মত প্রফুল্ল দেখছিনা হাসি? কি হয়েছে বল দেখি? আমার সহস্র দুঃখ কষ্টও ত তুই হাসি দিয়ে ভোলাতে চাস,—আজ কেন তোর মুখে হাসি দেখ্‌চিনে?

হা। সেই মাগীটাকে মনে করে আর হাসি আসছে না। তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করে এসেছি। এই সাতনর আপনাকে দিয়ে সুগন্ধা প্রণাম জানিয়েছে।

রা। কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?

হা। সেই কুহকিনী কালকেতুটার সঙ্গে। এই সাতনর ও পদ্মফুলটি আমার হাতে দেখে—সে যেন রণরঙ্গে মেতে উঠ্‌লো। তবে সত্যি কথা বলি—আমিও তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

রা। ভাল করনি হাসি, এতে হয়ত অনেক বিপদ ঘটবে—তোমাকে কত সহ্য করতে হবে! আমার ফুলের কি দরকার সখি! আমি আজ বুঝেছি—ফুলেই ভগবানের পূজা হয় না—পুণ্য কার্য্যেই তাঁর যথার্থ পূজা। ন্যায় সত্য প্রচার,—অন্যায় দমন চেষ্টা—এই সকলই তাঁর প্রিয় কার্য্য—এরই সাধনা তাঁর উপাসনা। আজ থেকে সেই ব্রত আমি গ্রহণ করেছি। তুই পারবি হাসি আমার সহায় হতে?

হাসি। রাজকন্যে, আমি স্বর্গ নরক—পাপপুণ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনে. আমি শুধু তোমাকেই জানি। তুমি যেদিকে যাবে, সেই আমার পথ, তুমি যা করবে—তাই আমার কর্ম্ম; তুমি যা ধর্ম্ম বলে বোঝাবে, আমার মনে তাই সত্য, তাই পুণ্য, তাই ধর্ম্ম।

অন্যান্য রমণীগণের জয় জয়কার করিতে করিতে প্রবেশ।

(ক্রমশঃ

বিংশ শতাব্দী।

হে বিংশ শতাব্দি নিরমল!
চলিয়াছ বরষ বরষ,—
হয় না কি চরণ অবশ?

এখনো চলিবে কতখানি,
কোথায় চলিছ নাহি জানি,—
মূক তুমি, মোরা অন্ধ প্রাণী!

পূর্ণ হয়ে গেল বর্ষ দশ,
বিকশিত নূতন বরষ,—
এবে তোর কিশোর বয়স!

মোরা যবে মুদিব নয়ন,
হবে তোর সম্পূর্ণ যৌবন,—
কিসে তার বুঝিব লক্ষণ?

মানব কি খুঁজে পাবে পথ?
ভারত কি হবে সুমহৎ?
সফল হবে কি মনোরথ?

বৃথা প্রশ্ন! তুমি যে বধির,
কালস্রোতে ছুটেছ অধীর,
একটি তরঙ্গ জলধির!

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

প্রতিষ্ঠালাভ।

পল্লীগ্রামের প্রখ্যাতনামা যুবক মণীন্দ্র যে দিন সহরের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "বসুন্ধরা"তে তাহার রচনা পাঠাইয়া দিল, সেদিন সে মনে করিয়াছিল, লেখাটা নিশ্চয়ই বাহির হইবে।

"চন্দন তিলক" নামে ছোট গল্পটী; মণীন্দ্রের অনেক শিক্ষিত বন্ধুবান্ধব গল্পটী পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"বেশ হইয়াছে, কোনো মাসিকে পাঠাও, ছাপিবে।"

মণীন্দ্র যশঃপ্রার্থী নয়, একথা সে বলিত না—তবে সেই যশের আকাঙ্ক্ষাটীকে সে সঙ্কোচের মধ্যে, এমনি ভাবে গোপন রাখিয়াছিল, যে তাহার নিকটতম বন্ধুও সেটুকু কোনো দিন ধরিতে পারে নাই!

সহর হইতে উত্তর আসিল, একখানি তিন লাইনের ছোট চিঠি!

"আপনার লেখা ভালো, plot মন্দ নয়, সাধনা করিতে থাকুন সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন; গল্পটী 'বসুন্ধরায়' যে কোনো মাসে ছাপানো যাইবে।"

বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল; মণীন্দ্র দুখানা রিপ্লাই কার্ডে জানিতে চাহিল, কোন মাস নাগাদ লেখা প্রকাশিত হইতে পারে? প্রত্যেক বারেই 'বসুন্ধরার' সম্পাদক উত্তর দিলেন, "আপনার লেখা কবে প্রকাশিত হইবে বলা শক্ত, তবে বৎসরের মধ্যেই যাইবে!

বৎসর কাটিয়া গেল; চৈত্র সংখ্যা বসুন্ধরা পাইয়াই মণীন্দ্র আগ্রহের সহিত খুলিয়া ফেলিল। মণীন্দ্রের লেখার নাম গন্ধও নাই!

পরদিন "বসুন্ধরা" সম্পাদকের এক পত্র আসিল। প্রতি মাসেই ভাল গল্প বা নামজাদা লেখকের গল্প পাওয়া যাইতেছে—এজন্য আপনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে গল্প ফেরত লইয়া অন্য কাগজে প্রকাশ করিতে পারেন।"

এ কি চিঠি! ক্ষোভে, রোষে, মণীন্দ্রের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সুরেশ সঙ্গে ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে মণি, কার চিঠি?"

"ও কিছু নয়"—বলিয়া মণীন্দ্র চিঠি পকেটে ফেলিল। চিঠিখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবে, এমন সাহসটুকুও আর তাহার ছিল না—যেন কত অপরাধী সে!

সুরেশ ছাড়িবার পাত্র নহে; পত্র কাড়িয়া লইয়া দেখিল!

"একবৎসর লেখা রাখিয়া এই উত্তর! 'ভাল গল্প বা নামজাদা লেখকের গল্প!' "নামজাদা লেখকের গল্প" worthless হইলেও প্রকাশ্য, এই অর্থ নয় কি? অসহ্য। গল্প ফেরত পাঠাতে লিখে দাও।"

"আঃ সুরেশ থাম্, কি বলিস্ ঠিক নেই; কাগজের প্রতিষ্ঠার খাতির ত সর্ব্বাগ্রে চাই? ঠিকই লিখেছেন—এতে আর রাগলে"—

"নে নে বোঝা গেছে; শোন্ মণি, আমার মাথায় একটা plan এসেছে"—

'কি plan'—

"Plan কি, ঠিক তোর কাছে ভাঙ্গছি নে'। ছাখ্, তোর গল্পটা আনিয়ে আমায় দিস্! আর তোর সেই 'দৃষ্টিহারা' গল্পটী

আমায় দিবি চল্—যেটা আমার কাকাবাবু খুব প্রশংসা করেছিলেন"—

"কাজ নেই, আমি সব পুড়িয়ে ফেল্‌ব মনে কর্‌ছি"—মণীন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল।

"সে আমি দেখব—তুই চল্," বলিয়া সুরেশ মণীন্দ্রকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল!

(২)

'অরুণ' একটা নবপ্রকাশিত মাসিক;—'অরুণের' সম্পাদক চারু, সুরেশের সহপাঠী ছিলেন। বৈশাখ মাসের "অরুণে" মণীন্দ্রের 'দৃষ্টিহারা' বাহির হইল। সুরেশ সগর্ব্বে মণিকে দেখাইল;—যেন সে একটা যুদ্ধজয় করিয়া আসিয়াছে—এমনি একটা ভাব!

মণি বেশী কিছু বলিল না: সুরেশ বুঝিল মণি 'বসুন্ধরার' সম্পাদকের চিঠির কথা ভুলে নাই।

আষাঢ়ের 'অরুণে' ও "কল্যাণীতে" মণীন্দ্রের আর দুইটী গল্প বাহির হইল। 'কল্যাণীর' সম্পাদক বিনয়বাবু মণির লেখা ভারি পছন্দ করিয়াছিলেন।

সুরেশ যখন মণীন্দ্রকে তাহার প্রকাশিত গল্প দুইটী দেখাইল—তখন মণীন্দ্র রাগিয়া বলিল "তুই আমার খাতা ফিরিয়ে দে'!"

সুরেশ হাসিয়া বলিল "তা' দেব; আপাততঃ তোর নূতন গল্পের খাতাখানা আর ২০০৲ টাকা আমাকে হাওলাত দে ত! ছমাস পরে শোধ করব।"

মণি টাকা দিল—কিন্তু বুঝিতে পারিল না সুরেশ অতগুলি টাকা দিয়া কি করিবে। পিতৃহীন সুরেশ ও মণি উভয়েই প্রাপ্ত বয়স্ক; বিষয়ের ভার তাহাদেরই উপর ন্যস্ত।

তিন মাস পরে চারি পাঁচখানি মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন বাহির হইল—

"লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত নূতন গল্পের বহি "দুর্ব্বাদল!"—বাহির হইয়াছে! 'দুর্ব্বাদল' পুস্তক দুর্ব্বাদলেরই মত শ্যামল, স্নিগ্ধ, পবিত্র! স্নেহশীল ভ্রাতা ভগ্নীকে, স্বামী প্রেমময়ী পত্নীকে, বন্ধু বন্ধুকে এই পবিত্র 'দুর্ব্বাদল' উপহার দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন!"—ইত্যাদি ইত্যাদি!

বিজ্ঞাপনের চটকেই হউক্, বা লেখকের কৃতিত্বেই হউক্, ছয় মাসের মধ্যে দুর্ব্বাদলের প্রথম সংস্করণ কাটিয়া গেল।

সুরেশ মণীন্দ্রকে বলিল, "দেখ্‌লি তো মণি, নাম কিনতে কয়দিন লাগে! বাঙ্গালার পাঠকেরা পরের মুখে ঝাল খায়। বিজ্ঞাপনের চটক্ দেখেই বই কেনে!"

পূজা আসিয়াছে! পূজার সংখ্যা 'বসুন্ধরা' পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে। বিজ্ঞাপনে সহর ভরিয়া গিয়াছে। 'বসুন্ধরার' শারদীয়া সংখ্যার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সুরেশ পূজার 'সওগাদ' কিনিতে কলিকাতা গিয়াছে। কয়দিন বন্ধুর চিঠি না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মণীন্দ্র নিজেই পোষ্ট আফিসে আসিয়াছে।

কয়েকখানি চিঠি ও একটা বুক্ পোষ্ট! বুক্‌পোষ্টটা খুলিয়া ফেলিয়া মণীন্দ্র দেখিল 'বসুন্ধরার' শারদীয় সংখ্যা, একখানি রঙ্গিন্ বিজ্ঞাপন দিয়া জড়ানো! বিজ্ঞাপনখানি মণীন্দ্র পড়িয়া গেল—অন্যান্য কথার মধ্যে বড় বড় 'হরফে' রঙ্গিন্ কালীতে লেখা রহিয়াছে—"লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক মণীন্দ্রনাথের ছোট গল্প "চন্দন তিলক"!

সুন্দর ছোট গল্প! হীরকের মত উজ্জ্বল!! লেখার ভঙ্গী সঙ্কোচবিহীন—পুণ্য সম্ভ্রমময়!!!

বিস্মিত মণীন্দ্রনাথের চোখের কাছে লেখাগুলি সারি বাঁধিয়া নড়িয়া চড়িয়া ফিরিতে লাগিল!

মণি সুরেশের চিঠির খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পড়িল—শুধু এক লাইন, দ্রুতহস্তে মোটা-মোটা অক্ষরে নীল পেন্সিলের লেখা—

"দেখ্‌লি বাঙ্গাল্!!'

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কণপদ্ধতি।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা কে না অবগত আছে। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা বিলাতের মনীষিদের দ্বারা যতদিন সমাদৃত না হইয়াছে—ততদিন আমরা তাহার মর্য্যাদা বুঝি নাই। অবনীন্দ্রনাথকে তাঁহার এই প্রাচীন ভারত-শিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। যাঁহারা শিল্পের কোন ধারই ধারেন না এই অবকাশে তাঁহারাও অযথা ব্যঙ্গোক্তি করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যেমন সূর্য্যের কিরণ মেঘাবরণে অধিকক্ষণ ঢাকা থাকে না, তেমনি তাঁহার এই প্রতিভা-জ্যোতি শত সহস্র তীব্র সমালোচনার তিমিরপুঞ্জ ভেদ করিয়া অপ্রতিহতভাবে আপনার মহিমা স্বতঃ প্রকাশ করিয়াছে। এখন তাঁহার নিন্দাবাদ করিলে তাঁহার শিল্পগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় না,—যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহাদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ পায় মাত্র। তাঁহার মত একজন প্রতিভাশালী শিল্পী যে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এখন আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। পরন্তু তিনি যে কেবল আমাদের বঙ্গদেশেরই গৌরব স্বরূপ তাহা নহে সমগ্র শিল্পজগতে তিনি সুবিখ্যাত। কেবল বাক্য দ্বারা নহে—প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁহার মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের নিপুণতা জাপান, আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি জগতের কোন বিজ্ঞ সমাজে অবিদিত নাই!—যে কোন দেশের শিল্প-প্রিয় বিদেশী মহাজন ভারত ভ্রমণে আসেন, কলিকাতায় আসিলে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার চিত্রাবলী না দেখিয়া ফিরেন না।—ইহা কি তাঁহার অপরিসীম প্রতিভার প্রতি সম্যক্ সমাদর নহে? ধ্বংস ও সৃজন ধাতার নিয়ম। এক এক মহাপ্রলয়ের পর এক এক প্রতিভাবান ব্যক্তি ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরাইয়া আমাদিগের মধ্যে আবার নবীন জীবনী সঞ্চারিত করেন।—চিত্র-শিল্প বিষয়েও অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা আমরা ঠিক্ সেই একই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে দেখিতেছি!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিক পরিচয় আর কি দিব!

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে বংশের সন্তান সন্ততিরা আমাদের বাঙ্গালার এমন কি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য প্রভৃতির পথপ্রদর্শক;—ভারতীয় চিত্রাঙ্কণরীতির প্রবর্ত্তক অবনীন্দ্রনাথও সেই শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে আবাল্য অনুরাগ। তাঁহার বাল্যরচিত বহুচিত্র পূর্ব্বে ভারতী সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। সেই সকল পূর্ব্বতন চিত্র দেখিলে তাঁহার উচ্চভাবের ক্রমোন্নতি বিশেষরূপে অনুভূত হয়। শুনিয়াছি, প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা কোন সময়ে তাঁহাদের জোড়াসাঁকো ভবনে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসেন। সেই সময়ে বালক অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত রেখাঙ্কণ চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বালকের সাহস ত কম নয়?—এখন হইতেই এরূপ গুরুতর বিষয় আঁকিবার চেষ্টা!" রবিবর্ম্মা তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আঁকা "মৃত্যুশয্যায় বাদশাহ শাজাহানে"র একখানি একবর্ণে মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখিয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মোগল রাজ্যের অবসানে কিছুকাল আমাদের দেশের শিল্পচর্চ্চা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। অধুনা ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ দিন দিন বিলাতি চিত্ররীতিই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে অবনীন্দ্রনাথও একজন ইংরাজ শিল্পীর নিকট পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ধরণের শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সহিত একত্রে ইংরাজ শিক্ষকের কাছে শিক্ষিত। পরে ১৩০৫ সালে তিনি তাঁহার পিতামহের পুস্তকাগারে একখানি অতি প্রাচীন কোন মোগল বাদশাহের আমলের চিত্রপুস্তক দেখিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট হন। ফলে, তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্র-লেখা একেবারে পরিত্যাগ করেন; এবং সেই সময় উক্ত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কতকগুলি সুন্দর ছোট ছোট চিত্র অঙ্কিত করেন। এই সকল চিত্র দেখিয়া ডাক্তার কুমার স্বামী মুগ্ধ ভাবে সংবাদপত্রে এই চিত্রের অজস্র প্রশংসা প্রসঙ্গে এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে মনে হয় যেন বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছি।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের একজন সহকারী মিলিল। কলিকাতা গভর্মেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, ভি, হাভেল সাহেবও ঠিক সেই সময় ভারতের নানা প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জনের সাহায্যে ভারতে ভারতীয় শিল্পের প্রবর্ত্তন উদ্দেশ্যে শিল্পবিদ্যালয়ে এক নূতন ভারত-শিল্পের বিভাগ খোলেন। কর্জ্জন সাহেব এবিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভারতের শিল্পোন্নতির উপায় সম্বন্ধে তাঁহার দিল্লী দরবারে পঠিত বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"বিদেশীয় ভাবগ্রহণদ্বারা কখনই ভারত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারে না।"

শুনা যায়, নূতন ভারতশিল্পের বিভাগ

খুলিবার সময় শিল্পশিক্ষার্থী নির্ব্বোধ বালকেরা ভাবিয়াছিল, ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতী চারুশিল্প (fine art) শিক্ষা না দিবার ইহা এক অভিনব দুরভিসন্ধি। এই ভাবিয়া অবিলম্বে একটীমাত্র ছাত্র ভিন্ন বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া এককালে শিল্পবিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গেল।

যাহা হউক, হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পচর্চ্চার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উক্ত বিভাগের শিল্পগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একজন বিদেশীর পক্ষে আমাদের প্রতি এতদূর সহানুভূতি কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হ্যাভেল সাহেব একজন যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থান দান করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতশিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রশালার পক্ষে পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কণ রুচিবিকারক ভাবিয়া কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট চিত্রশালায় যে সমস্ত পাশ্চাত্য চিত্র ছিল গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা মোগল আমলের সুন্দর সুন্দর চারু চিত্রশিল্প সংগ্রহ

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ।

করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাহাতে শিল্পিশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভারতীয় চিত্র রীতিতে সম্যক মার্জ্জিত হইতে লাগিল। বিচক্ষণ হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের হাতে চিত্রের দোষগুণ বিচার করিয়া চিত্রশালার জন্য চিত্র ক্রয় করিবার ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে ভারত শিল্পবিদ্যালয়ের অঙ্কুরোদ্গম হইল। কিছুকাল পরে নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্রাবলী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কাছে গভর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ে ভারতীয়

চিত্রশিল্প শিখিতে আসেন। পরে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। এখন তাঁহার নিকট নানা স্থানের ছাত্র ভারতীয় রীতিতে চিত্রাঙ্কণ শিখিতেছেন। মহীশূরাধিপতি তাঁহার সভা-চিত্রকরের পুত্র ভেঙ্কাটেপ্পাকে মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিকট দেশীয় চিত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার ফলে বিলাতে ভারতীয় চিত্রশিল্প-প্রদর্শনীতে বিখ্যাত শিল্পীদের নিকট ভেঙ্কাটাপ্পা বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। হ্যাভেল সাহেব তাঁহার বিখ্যাত Indian sculpture and Painting নামক পুস্তকে,—ডাক্তার কুমারস্বামী তাঁহার Selected Examples of Indian art নামক পুস্তকে এবং বিলাতের The Studio নামক প্রসিদ্ধ শিল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের উদীয়মান ছাত্রগণের—তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপিসহ যথেষ্ট সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ যে কেবল শিষ্যদের রেখাপাত বর্ণাঙ্কণের গুরু তাহা নহে,—তিনি তাঁহাদের সর্ব্ব বিষয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও করিতেন। তাঁহারি প্রযত্নে এখানে Indian Society of Oriental art নামক একটী সমিতি হাইকোর্টের মাননীয় জজ উড্‌রফ, হোমউড্ প্রভৃতি শিল্পোৎসাহী মহাজনদের দ্বারা শিল্প শিক্ষার্থী ছাত্রদের উৎসাহবর্দ্ধন ও সাহায্যার্থে গঠিত হইয়াছে। বিলাতে India Society নামক উক্ত সমিতির একটী শাখা সেখানকার হ্যাভেল প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীগণ কর্ত্তৃক ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

অবনীন্দ্রনাথ যেমন সুকুমারকলার অনুশীলন করেন,—তাঁর মনও তেমনি সুকুমার! তাঁহার সহিত যে কেহ কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র আলাপ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন! তাঁহার চিত্রশিল্প ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের আধার! তিনি একবার আমাদের একটী নর্ত্তকীর পরিকল্পিত চিত্র দেখান। সেই চিত্রটীতে একটী নর্ত্তকী দেবমন্দিরের দ্বারে দেবতার সম্মুখে কোন একটী ভারতীয় নৃত্য-কলার বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের বিশেষ বিশেষ নৃত্যভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই সেই চিত্রলিখিত নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গীটী দেখিয়া চিত্রের ভাবগ্রহণে সমর্থ হইবেন। অবনীন্দ্রনাথ সহজে দর্শকের মনে সেই চিত্রলিখিত ভঙ্গীটীর তাৎপর্য্য বিশদভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নর্ত্তকীর সম্মুখে তাহার পদনিম্নে একটী অর্দ্ধ-শুষ্ক দলভ্রষ্ট পদ্মের দ্বারা জগৎ অনিত্য,—আর নর্ত্তকীর উর্দ্ধে হস্তোত্তোলিত ভঙ্গীতে জগৎ-পাতার কাছে মুক্তির জন্য অন্তরের সভক্তি নিবেদন জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি একটী সামান্য নর্ত্তকীর চিত্র আঁকিতে গিয়াও তাঁহার মহৎভাবকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অঙ্কিত সকল চিত্রই নিগূঢ় ভাবরাজ্যের প্রতিচ্ছবি!—সেইজন্য অনেক সময় ইহা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

তাঁহার চিত্রসম্বন্ধে হ্যাভেল সাহেব তাঁহার বিখ্যাত Indian Sculpture and Painting নামক পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"আধুনিক ভারতের কলালক্ষ্মী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার একজন উপযুক্ত মানসপুত্ররূপে পাইয়াছেন। তিনি বাস্তবিকই ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পগরিমার উদ্বোধনকল্পে স্থির-প্রতিজ্ঞ। আমি এই Indian Sculpture and Painting পুস্তকে তাঁর চিত্রের সঠিক্ প্রতিলিপি দিতে অসমর্থ কিন্তু স্থূলতঃ বুঝাইবার জন্য আমাদের এই পুস্তকে প্রকাশিত এই সামান্য কয়েকটী প্রতিলিপির দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে পারে যে, একজন প্রকৃত শিল্পী ভারতের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন শিল্পের পথপ্রদর্শকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। * * * তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ও ভগবদ্দত্ত এক অসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভবশক্তির প্রভাবে কালিদাস ওমারখৈয়াম প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন কবিদের কাব্যরসে অনুপ্রাণিত; সেইজন্য তিনি স্বভাবতই তাঁহার পূর্ব্বশিল্পী রবিবর্ম্মার মত মহাভারত প্রভৃতির আখ্যায়িকায় বর্ণিত নায়ক নায়িকাদের ছবি আঁকিতে গিয়া "খিত্‌মত্‌গারী" ভঙ্গীতে শ্রীরাধিকা কিম্বা অলোকসামান্যা সাধ্বী সীতা দেবীকে 'আয়া', আর রাক্ষসী চেড়ীবৃন্দের পরিবর্ত্তে কতকগুলি যৎকুৎসিত কুলী-কন্যার ছবি আঁকেন নাই;—অধিকন্তু অমূল্য সামগ্রী সেই আধ্যাত্মিক ভাব ও প্রাচ্যের চিরপ্রসিদ্ধ গভীর ভাবপূর্ণ কবিত্ব-রসেরই সমাবেশ করিয়াছেন।"

Essays in National Idealism" নামক পুস্তকে ডাক্তার কুমারস্বামীও রাজা রবিবর্ম্মার তুলনায় অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পজগতে অনেক উচ্চে স্থান দিয়াছেন। ভারত গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ইংরাজ ভাস্কর মিঃ লিওনার্ড জেনিংস্ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "আমরা বিলাত হইতে তোমাদের এই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত ভারতবর্ষে যখন পদার্পণ করি তখন এই ভারতের সুশ্যামল গিরিপ্রান্তর, কলবাহিনী স্রোতস্বিনী, স্বচ্ছ সুনীল গগন, নির্ম্মল চন্দ্রিমা, উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্যোতি প্রভৃতি আমাদের দেশের কচিৎ উপভোগ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে এক বর্ণবৈচিত্র্য, ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করি, তোমাদের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রে ব্যতীত আর কাহারও চিত্রে ঠিক সেই ভাব মাধুর্য্য বজায় থাকিতে দেখি না। তোমাদের আধুনিক শিল্পীরা যে সব পাশ্চাত্য ধরণের চিত্র আঁকিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন, আমাদের দেশে (অর্থাৎ ইউরোপে) ছোট ছোট বালিকারা সাধারণতঃ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চিত্র আঁকিয়া থাকে। আমার মনে হয়, অপর দেশের শিল্পীর চক্ষে নিজের দেশের শিল্প দেখার চেয়ে আর মূর্খতা কি আছে!" তিনি বোধ হয় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রাবলী দেখেন নাই।

বিলাত ও ভারতের বহু পত্রিকাদিতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত চিত্র-শিল্পের বহু প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আমরা সেই সকলের উল্লেখে প্রবন্ধ ভারগ্রস্ত করিতে চাহি না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 'পাইওনিয়ার' পত্রে এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনীতে

প্রদর্শিত অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদিগের শিল্পকলা-সম্বন্ধে যে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল আমরা এস্থলে তাহার একটি সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

A poet or a writer of romance ; the arts of design and of painting are only means of expression by which every cultivated mind knows how to give to his thought a more exact turn, a more delicate shade of meaning. And actuated by this impulse, with a profound reverence for their own classics and a delight in their own romantic history with a sound knowledge of all these, the new Indian art movement was brought into being, and on this broad foundation has taken its stand * * * * * * * * In other words, these individuals drawn instinctively together by the magnetising influences of their artistic inspirations have combined in the most natural manner to prevent the art of their motherland from being swamped by the great surging wave of occidentalism which has for some time threatened every national institution of India.

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা কেবল শিল্প-জ্ঞানেই পর্য্যবসিত নহে, সাহিত্যজগতেও তাঁহার অশেষ প্রতিষ্ঠা। চিত্র ও সাহিত্য উভয় রত্নে তাঁহার অমরসিংহাসন রচিত। তাঁহার ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তকে তিনি প্রাচীন কথকতার মত যে এক সরস ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, আজকাল অধিকাংশ শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি তাহারই অনুকরণে রচিত হইতেছে। একদিকে তিনি প্রাচীন ভারতশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অন্যদিকে বঙ্গসাহিত্যেও পুরাতন কথকথাভাষার পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন। ভারতী প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লিখিত ছোট ছোট গল্প ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা কর্ত্তৃক সাগ্রহে পঠিত হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধে দিবার জন্য আমরা তাঁহার জীবনীর একটু পরিচয় ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। এসম্বন্ধে তিনি যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

অবনীন্দ্রবাবুর পত্র

এ দেশের লোক বাঁচিয়া থাকিতে নিজের একটা সঠিক ফোটো উঠাইতে বড়ই নারাজ। সুতরাং উত্তর কালে লোকটির চেহারা লইয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপার ঘটিয়া উঠে বিশেষতঃ লোকটি কিছু public spirited হইলে। কিন্তু জীবনী ও প্রতিমূর্ত্তির হাত হইতে কলিকালে যখন কাহারও রক্ষা নাই তখন পূর্ব্ব হইতে নিজেই সেটার খসড়াটা দেখিয়া শুনিয়া একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাওয়াই সুবিবেচকের কার্য্য। সেকালে ইতিহাস জীবনী প্রভৃতির আচার ও চাট্নী প্রস্তুত করিয়া রক্ষা করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যাপার ছিল। সে এক প্রকার ছিল ভাল,—রাম জন্মিবার পূর্ব্বেই রামায়ণ লিখিয়া ঋষিও খালাস

রাজাও নিশ্চিন্ত। ঋষি যেমনটি লিখিয়া গেলেন রামও ঠিক তেমনটি করিয়া জীবনটি অতিবাহিত করিলেন। আর তোমার আমার মত লোক তো জীবনীর ধার দিয়াই যাইত না। সুতরাং তাহারা বেশ সুখে সচ্ছন্দে দান ধ্যান, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠাদি করিয়া ইহকাল পরকালের সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিত। এই দেখনা সে কালে 'মনসুর' 'বয়জীয়া' প্রভৃতি কত বড় বড় পেন্‌টার ছিলেন কিন্তু ছবির উপরে নামটি পর্য্যন্ত তাঁহাদের সই করিতে হইত না,—আর এখন আমাদের নাম ধাম গাঁই গোত্র,—কবে কি দিয়া ভাত খাইলাম, কবে কপাটি খেলিতে খেলিতে দাঁত ভাঙ্গিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি না লিখিয়া গেলে নিস্তার নাই; সুতরাং লেখাই যখন ধার্য্য তখন সেটা যত শীঘ্র পারা যায় শেষ করিয়া দেওয়াই ভাল।

দিন কতক নিষ্কর্ম্মা দিন কাটাইব বলিয়া সমুদ্র তীরে আসিয়াছি, জন্মপত্রিকা সঙ্গে আনা হয় নাই—বয়স তারিখ ইত্যাদির প্রত্যাশা করিও না। ভাল রং তুলিও আনা হয় নাই সুতরাং দুএকটা কালীর আঁচড়ে নিজের ছবিটা যতটা সম্ভব লিখিয়া পাঠাইলাম।

সেদিন মাথা গুণ্‌তির সময় বয়স লিখিয়াছি ৩৯ সুতরাং সেইটাই ঠিক বলিয়া ধর। অন্যপ্রকার লিখিলে সরকারি হিসাবে গোলযোগ বাধাইয়া দেওয়ার জন্য বিপদে পড়া আশ্চর্য্য নয়। তা ছাড়া আর এক কারণে বয়স ও জন্ম তারিখাদির হিসাব দিতে আমি প্রস্তুত নই, অঙ্কশাস্ত্রটাকে আমি চিরদিন বাঘ দেখি সেইজন্য অঙ্কবিদ্যার দিকও মাড়াইতে এখনও সাহস হয় না; কাযেই জীবনে আমার অঙ্কটা বাদ পড়িয়া গেল এবং বলিলে বিশ্বাস করিবে না অঙ্কনটা কিছু কিছু বোধগম্য হইল।

এই দেখনা কবে যে Entrance পড়িয়াছি (পাশ কাটাইয়াছি) তাহার সঠিক হিসাব আমার নাই তবে একটা সুস্পষ্ট ছবি মনে আছে—সে বৎসর দুরন্ত গরম, morning class হইতেছে,—Headmaster মহাশয়ের দাড়ি নড়িতেছে কি নড়িতেছে না,—আর আমি বেঞ্চে বসিয়া গোলদিঘির স্থির জলে চাহিয়া আছি, বইখানার দিকে নয়!

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে কবে পড়িলাম মনে নাই কিন্তু সে সময় একটা জুবিলি না কি হইয়াছিল আর সে উপলক্ষে যে একটা মেডেল কিনিয়া পরিয়াছিলাম তাহাতে কুইন ভিক্‌টোরিয়ার মুখটি আঁকা ছিল তাহা এখনও আমার বেশ মনে আছে।

এই মেডেল কিনিয়া পরার কথায় আর একটা কথা মনে পড়িল।

অঙ্কনপটুতার জন্য আমি মাষ্টারদিগের নিকট হইতে কোনদিন পুরস্কার পাই নাই অথচ পুরস্কারের দিন নিয়মিত স্কুলে হাজির হইতাম। তখন কি জানিতাম যে আমার সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের যে সম্বন্ধ স্কুল মাষ্টারদিগের সহিত অঙ্কন শাস্ত্রের ঠিক সেই একই রকম সম্বন্ধ! আমি বলিয়া এই একটিমাত্র মৃদু বাণ মাষ্টার মহাশয়দের উপরে নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম, অন্য লোক হইলে শরশয্যা রচনা করিয়া ফেলিত।

স্কুলে পুরস্কার নাস্তি বাটীতে তিরস্কার যথেষ্ট; এই একটা বাল্যজীবনের চুম্বক ছবি দেওয়া গেল।

উনচল্লিশ বৎসরের একটা হিসাব নিকাশ করিতে বসিয়া দেখি যে মাত্র বছর দশ বারো ছাড়া বাকী আর সমস্তটাই খেলায় কাটিয়াছে—রং তুলি গান বাজনা কবিতা প্রবন্ধ লইয়া খেলা করিয়া কাটাইয়াছি,—জীবনটা একবার এপথে একবার ওপথে।

২৫ বৎসরে আমার জীবনটা ধরা পড়িল এবং পাঁচ হিতৈষীতে মিলিয়া সেটা বিশ্বকর্ম্মার রথে জুড়িয়া দিলেন। প্রথমটা খুব আনন্দে রথ টানিতে লাগিলাম, ক্রমে পৃষ্ঠে কশাঘাত—আর মাঝে মাঝে উৎসাহসূচক চাপড় খাইতে খাইতে পৃষ্ঠে কড়া পড়িয়া গিয়া এখন মনটা অনেক পোষ মানিয়াছে। এখন পুরস্কারেও যেমন তিরস্কারেও তেমনি বেশ একটু মানসিক সুখ অনুভব করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে এপর্য্যন্ত। ভবিষ্যৎ বাণী করিতে আমার সাধ্য নাই তোমরা সেটা কোন সুলেখককে দিয়া গণাইয়া লইতে পার আমার আপত্তি নাই।

তোমরা জানিয়া রাখ আমার জীবনীর এটা দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতেছে। প্রথমবারের জীবনীটা ছাপা হইবার পূর্ব্বে পোষ্ট আফিস হইতেই হয় বিবাগী হইয়া গেছে—নয়তো অকালে ঝরা ফুলের ন্যায়—বুঝিলে তো! তোমরা আমার লেখাটা পড়িয়া ভাবিতেছ 'নাঃ! এ জীবনটা কিছু না!' আর আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া হাসিতেছি ও বলিতেছি কিছু না! কিছু না!' এ ছবিটা কেমন বল দেখি?

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

স্থানেশ্বর।

স্থানেশ্বর রাজ্য প্রায় ৭০০০ হাজার লি বিস্তৃত। রাজধানী প্রায় ২০ লি। ভূমি উর্ব্বরা এবং শস্যোৎপাদিকার পক্ষে প্রশস্ত; প্রচুর শস্য জন্মে। জলবায়ু উষ্ণ হইলেও উপভোগ্য। অধিবাসীরা কপট। ইহারা ধনী কিন্তু অত্যন্ত বিলাসী। ইহারা যাদুবিদ্যায় অনুরক্ত কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকেও যথেষ্ট সম্মান করে। অধিকাংশ লোকই সাংসারিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র। অধিবাসীদের কেহ কেহ কৃষিকার্য্যে রত থাকে। চতুর্দ্দিকের মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য পণ্যদ্রব্য এইখানে আমদানী হয়। তিনটী সঙ্ঘারামে ৭০০ যতি বাস করেন; ইহারা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। প্রায় শতাধিক দেবমন্দির আছে; অনেক গুলি সম্প্রদায়ও আছে।

রাজধানীর চতুর্দ্দিকে ২০০ শত লি স্থান লইয়া স্থানকে লোকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে। এ সম্বন্ধে প্রাচীন কিংবদন্তী এইরূপ:—পুরাকালে পঞ্চ ভারতে দুই জন রাজা ছিলেন। উভয়ের সহিত অনবরত যুদ্ধ হইত। অবশেষে উভয়ে এইরূপ স্থির করিলেন যে, উভয়ে প্রত্যেক পক্ষ হইতে সমসংখ্যক সৈন্য নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের যুদ্ধ করিতে দিবেন। কিন্তু জনসাধারণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহাতে স্থানেশ্বরের রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে জন সাধারণকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য। কেবল দৈবশক্তি

দ্বারা চালিত হইলেই তাহারা কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে।

উক্ত দেশে তখন একজন বিদ্বান ও প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজা গোপনে এই ব্রাহ্মণকে কয়েকখানি রেশমের কাগজ প্রেরণ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন অন্তঃপুর মধ্যে থাকিয়া একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পর্ব্বতগুহায় লুকায়িত করিয়া রাখেন। কিছুদিন পরে যখন গুহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিল, তখন রাজা তাঁহার মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া আমাকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন যে, অমুক পর্ব্বত গুহায় এক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে।"

ঐ পুস্তক অনুসন্ধানের জন্য রাজাদেশ প্রচারিত হইল এবং পর্ব্বতে বৃক্ষাদির মধ্যে ঐ পুস্তক পাওয়া গেল। রাজামাত্যগণ রাজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অধিবাসীগণ অত্যন্ত প্রীত হইল। রাজা পরে গ্রন্থের কথা দেশ বিদেশে প্রচার করিলেন। "জন্ম মৃত্যুর সীমা নাই। যে অন্ধকার গহ্বরে আমরা নিমগ্ন আছি তাহা হইতে উদ্ধার নাই। কিন্তু এইক্ষণ আমি এক অভিনব উপায়ে সকলকে যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারিব। এই রাজধানীর চতুর্দ্দিকে ২০০ লি লইয়া স্থানকে পুরাকালে সকলে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিত। এইক্ষণ আর সে চিহ্ন নাই। মনুষ্যগণের এইক্ষণ দুঃখের পারাবার নাই। এইক্ষণ কি করা কর্ত্তব্য? এইক্ষণ সকলকে আমি জানাইতেছি যে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিপক্ষের সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে তাহারা পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করিবে। যাহারা অনেক লোক নিহত করিবে, তাহারা স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিবে। যে সকল অনুগত পুত্র ও পৌত্র তাহাদের বৃদ্ধ পিতৃপুরুষগণকে সাহায্য করিবে তাহারাও অনন্তকাল সুখ ভোগ করিবে। সামান্য কার্য্যে প্রভূত পুরস্কার পাইবে। সুতরাং সকলেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হউন"।

রাজার এই কথা শুনিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, কেননা তাহারা মৃত্যুই মুক্তি এইরূপ মনে করিতে লাগিল। রাজা আদেশ প্রচার করিয়া তাঁহার সাহসী সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল এবং সেই সময় হইতে এই দেশ মৃত সৈন্যগণের অস্থিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই অস্থিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ। এই জন্য এ দেশকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে।

নগরের ৪।৫ লি উত্তর পশ্চিমে ৩০০ ফুট উচ্চ রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপের ইষ্টকগুলি রক্তপীতবর্ণ, ও উজ্জ্বল। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের স্মরণ চিহ্ন আছে। স্তূপ হইতে প্রায়ই উজ্জ্বল আলোক বহির্গত হয় এবং অনেক অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। নগরের দক্ষিণে ১০০ শত লি যাইয়া আমরা গোকন্থা মঠে উপস্থিত হই। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে; প্রাসাদ মধ্যস্থিত স্থান ভ্রমণোপযোগী। পুরোহিতগণ ধার্ম্মিক এবং সদাচারী। এই স্থান হইতে উত্তর পূর্ব্বে ৪০০ লি যাইয়া আমরা শ্রুঘ্ন দেশে পৌঁছি।

শ্রুঘ্ন

এই প্রদেশ প্রায় ১০০০ লি। ইহার পূর্ব্ব সীমায় গঙ্গা; উত্তরে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী। সীমান্ত প্রদেশে যমুনা প্রবাহিতা। রাজধানীর পরিধি ১০ লি; যমুনা রাজধানীর প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রাজধানী জনশূন্য কিন্তু ভিত্তিগুলি এখনও সুদৃঢ়। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য স্থানেশ্বরের ন্যায়। অধিবাসীরা সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র। ইহারা অবিশ্বাসী এবং বিদ্যাচর্চ্চায় অনুরক্ত।

সহস্রাধিক যতিপূর্ণ পাঁচটী সঙ্ঘারাম আছে; অধিকাংশ যতিই হীনযানমতাবলম্বী; অত্যল্প সংখ্যক যতিই অন্যান্য সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা সঙ্গত ন্যায়ে বিচার করেন। দেশ দেশান্তর হইতে লোক এই স্থানে আসিয়া নিজ নিজ সন্দেহ ভঞ্জন করে। প্রায় একশত দেবমন্দির আছে; অবিশ্বাসীগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

রাজধানীর দক্ষিণ পশ্চিমে এবং যমুনা নদীর পশ্চিমে একটী সঙ্ঘারাম আছে। সঙ্ঘারামের পূর্ব্ব

দ্বারের বহির্ভাগে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ আছে। তথাগত এই স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী অন্য একটা স্তূপে তথাগতের নখ ও চুল আছে। সারীপুত্র মুদ্গল্যায়নের ও অন্যান্য অর্হতের চুল ও নখ চিহ্ন বেষ্টন করিয়া চতুষ্পার্শে অনেকগুলি স্তূপ আছে।

তথাগতের নির্ব্বাণের পরে এই দেশে অবিশ্বাসীগণের প্রাদুর্ভাব হয়। ভক্তগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসী হইতে থাকে। বর্ত্তমানে যে যে স্থলে নানা দেশীয় বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রণয়নকারীগণ ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন তথায় ঐ সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছে। তর্কে জয়লাভের জন্য এই সকল স্থানে সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছে। যমুনার পূর্ব্বদিকে ৮০০ শত লি যাইয়া আমরা গঙ্গাতীরে পৌঁছি। গঙ্গার উৎপত্তি স্থল প্রায় ৩৪ লি বিস্তৃত। দক্ষিণ বাহিনী হইয়া গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে; সেইস্থানে ইহার বিস্তৃতি ১০ লি বা ততোধিক। গঙ্গার জল সমুদ্রের জলের ন্যায় নীলবর্ণ এবং ইহার ঢেউ সমুদ্রের ন্যায়। গঙ্গাগর্ভে অনেক হিংস্র জন্তু আছে কিন্তু উহারা মনুষ্যের ক্ষতি করে না। ইহার জল সুস্বাদু ও প্রীতিকর এবং তীরভূমি বালুকাপূর্ণ। দেশীয়ভাষায় গঙ্গাকে মহাভদ্রা বলে, কেন না, গঙ্গাজলে সকল পাপ ধৌত হয়। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে তাহার অস্থি এই নদীতে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহার আর নরকগামী হইতে হয় না। যাহারা জীবনে পাপাচারী হয়, তাহারা গঙ্গাগর্ভে প্রাণ ত্যাগ করিলে স্বর্গে স্থান পায়।

এক সময়ে সিংহল দ্বীপে দেব নামে এক বোধিসত্ত্ব ছিলেন। তিনি সত্য এবং ধর্ম্মের প্রভাব অবগত ছিলেন। মনুষ্যের অজ্ঞতায় বিচলিত হইয়া তিনি সকলকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য এই দেশে উপস্থিত হন। এই সময় সকল স্ত্রীপুরুষ গঙ্গাতীরে সমবেত হইয়াছিলেন। তখন দেব বোধিসত্ত্ব তাঁহার পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া মস্তক নত করিয়া পুনর্ব্বার অন্যদেহ ধারণ করিলেন। একজন অবিশ্বাসী এই দেখিয়া তাঁহাকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দেব বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন "আমার পিতা মাতা এবং আত্মীয়গণ সিংহলে বাস করেন। আমার ভয় হয় পাছে তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট পান; এই জন্য আমি দূরদেশ হইতে তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করি।" অবিশ্বাসী উত্তর করিল "বৎস, তুমি নিজেকে প্রতারণা করিতেছ। ইহা কিরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার দেশ অনেক দূরে এবং অনেক পর্ব্বত ও বৃহৎ বৃহৎ নদী উত্তীর্ণ না হইলে তথায় পৌঁছান যায় না। এই জল তুলিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ চেষ্টা,—সম্মুখে কোন দ্রব্য রাখিয়া উহার অনুসন্ধানে পশ্চাৎ যাওয়ার ন্যায় নিষ্ফল। এরূপ কথা পূর্ব্বে কোন দিন শুনি নাই।" দেব বোধিসত্ত্ব তখন উত্তর করিলেন যে "যাহারা পাপের জন্য নরক বাস করিতেছে তাহারা যদি এই জলে পাপমুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে যাহারা কেবলমাত্র নদনদী ও পর্ব্বতের ব্যবধানে আছেন, তাঁহারা এই জলে কেন না তৃষ্ণামুক্ত হইতে পারিবেন?"

এই কথাতে অবিশ্বাসীগণ নিজেদের দোষ স্বীকার পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। নিজ নিজ কদাচার পরিত্যাগ করিয়া তাহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। নদী পার হইয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা মতিপুরে উপস্থিত হইলাম।

মতিপুর

এদেশও প্রায় ৬০০০ হাজার লি বিস্তৃত; রাজধানী প্রায় ২০ লি। ভূমি শাক সবজী উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত এবং দেশে নানাপ্রকার ফুল ও ফল পাওয়া যায়। জল বায়ু মৃদু। অধিবাসীরা সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। ইহারা শিক্ষার সম্মান করে এবং যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। দেশে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় প্রকারের লোকই আছে। রাজা শূদ্রজাতীয়। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও উক্ত ধর্ম্মকে সম্মান করেন। ২০টী সঙ্ঘারামে প্রায় ৮০০ যতি বাস করেন। অধিকাংশই হীনযানমতাবলম্বী এবং সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত। এতদ্দেশে বিশটী দেবমন্দির আছে; অবিশ্বাসীরা নানা সম্প্রদায়ভুক্ত।

রাজধানীর ৪।৫ লি দক্ষিণে আমরা একটী ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামে পৌঁছি, ইহাতে প্রায় ৫০ জন পুরোহিত বাস করেন। পুরাকালে শাস্ত্রজ্ঞ গুণপ্রভা, তত্ত্ববিভঙ্গাদি প্রায় একশত শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। যৌবনকালেই ইনি নিজ প্রতিভাদ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; পরে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ছিল না। ইনি বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং দেশ দেশান্তরে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ইনি মহাযান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু কিছু দিন পরে বিভাগ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ইনি হীনযানধর্ম্মাবলম্বী হইয়া মহাযান মতের বিরুদ্ধে অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। অধিকন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধেও ইনি অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াও তিনি অনেক বিষয় সম্যক প্রণিধান করিতে পারেন নাই।

এই সময়ে দেবসেনা নামক এক অর্হৎ বাস করিতেন; ইনি ইচ্ছামত স্বর্গে গমনাগমন করিতে পারিতেন।" মৈত্রেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য গুণপ্রভা দেবসেনাকে অনুরোধ করিলেন। দেবসেনা নিজ দৈব বলে তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। গুণপ্রভা মৈত্রেয়কে দেখিয়া মস্তক নত করিলেন কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না। গুণপ্রভা কেন মৈত্রেয়কে প্রণাম করিলেন না দেবসেনা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "যদি মৈত্রেয়ের নিকট উপকার লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছ না কেন?"

গুণপ্রভা উত্তর করিলেন "মাননীয় মহাশয়, আপনি যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি ভিক্ষু এবং শিষ্যরূপে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু এই মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতেছেন এবং সেই জন্য সংসারত্যাগীর সহযোগী হইতে পারেন না। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু দেখিলাম উহা সঙ্গত হইবে না।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন যে এ ব্যক্তি আত্মমদে গর্ব্বিত এবং সেহেতু তিনি শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নহেন। এজন্য যদিও তিনি তিনবার স্বর্গে গমনাগমন করিয়াছিলেন তথাপি নিজ সন্দেহ ভঞ্জনে সক্ষম হন নাই। অবশেষে, তিনি পুনরায় তাঁহাকে স্বর্গে লইবার জন্য দেবসেনার স্তুতি করিলেন এবং তিনি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিতে প্রস্তুত আছেন, একথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু দেবসেনা আর এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। গুণপ্রভা নিজ মনোভিলাষ পূর্ণ না হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন একা মরুভূমিতে গমন করিয়া সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত থাকায় কোনই ফল পাইলেন না।

গুণপ্রভা সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি দূরে একটী বৃহৎ মঠে হীনযান মতাবলম্বী ২০০ শত শিষ্য থাকেন। এই স্থানে শাস্ত্রপ্রণয়নকারী সঙ্ঘভদ্র দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীরবাসী এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনকালে তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় ভুক্ত বিভাগ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব জীবিত ছিলেন। যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না তিনি সমাধি দ্বারা তাহাই জ্ঞাত করাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। বৈভাষিক সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিবার জন্য তিনি অভিধর্ম্মকোষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই শাস্ত্র সহজবোধ্য, সুন্দর ও উহার বিচার সূক্ষ্ম।

সঙ্ঘভদ্র এই পুস্তক পাঠ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। দ্বাদশ বৎসরপূর্ণ গবেষণায় তিনি কোষকারক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই শাস্ত্র ২৫,০০০ শ্লোক ও ৮ লক্ষ শব্দ দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। উহা গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ। শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন যে "যখন আমি দৃষ্টি বহির্ভূত হইব তখন আমার প্রধান শিষ্যগণ এই পুস্তক লইয়া বসুবন্ধুকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে যেন পরাস্ত করে।"

ইহাতে সঙ্ঘভদ্রের ৩।৪ জন প্রধান শিষ্য সঙ্ঘভদ্র প্রণীত পুস্তক লইয়া বসুবন্ধুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত

হইলেন। এই সময়ে বসুবন্ধু চেকাদেশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার খ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত হইতেছিল। সঙ্ঘভদ্রের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বসুবন্ধু তাঁহার শিষ্যগণকে ভ্রমণের পরিচ্ছদ দিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে বসুবন্ধুর শিষ্যগণ সন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের প্রভুর গুণরাশি পূর্ব্বতন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক এবং বর্ত্তমানে তাঁহার সুনাম সর্ব্বত্র ব্যাপৃত। এক্ষেত্রে তিনি সঙ্ঘভদ্রের নাম শুনিয়া এত ভীত হইয়াছেন কেন? ইহাতে তাঁহার শিষ্যদের যথেষ্ট লজ্জা করা হইতেছে।" বসুবন্ধু উত্তর করিলেন, "আমি এ ব্যক্তির ভয়ে দেশত্যাগ করিতেছি না কিন্তু এই দেশে এমন সূক্ষ্মদর্শী কোন ব্যক্তি নাই যিনি সঙ্ঘভদ্রের সূত্র অনুধাবন করিতে পারিবেন। তিনি কেবলমাত্র আমার বার্দ্ধক্যের নিন্দা করিবেন। এক কথায় আমি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারি। তাঁহাকে মধ্যভারতে লইয়া যাওয়া হউক; তথায় বিদ্বান ও প্রবীণ ব্যক্তিগণের সম্মুখে বিচারে সত্যমিথ্যা, জেতা বিজেতা নির্দ্ধারিত হউক।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে পুস্তকাদি লইয়া দূর দেশে যাইতে আদেশ দিলেন।

এই মঠে উপস্থিত হইবার পরদিবস শাস্ত্রজ্ঞ সঙ্ঘভদ্রের অকস্মাৎ যেন জীবনী শক্তি লোপ পাইতে লাগিল। ইহাতে তিনি বসুবন্ধুকে এইভাবে পত্র দিলেন, তথাগতের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া নিজ নিজ মতাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ মতের পোষকতা করিয়া অপরের মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আমি অজ্ঞ হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে এই রীতি শিক্ষা করিয়াছিলাম। আপনি বিভাষিক সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব পরাজয়ার্থ অভিধর্ম্ম কোষ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি পুস্তক পাঠ করিয়া নিজের ক্ষমতার বিচার না করিয়া অনেক বৎসর চেষ্টা করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। আমার ক্ষমতা সামান্য, উদ্দেশ্য মহৎ। আমার সময় সংক্ষেপ হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব বসুবন্ধু যদি দয়া প্রকাশে আমার এই কষ্টসাধ্য পুস্তকের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, তবে আমি আমার মৃত্যুতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইব না।"

পরে তাঁহার শিষ্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "আমি সামান্য বিদ্বান হইয়া একজন প্রবীণ বিজ্ঞকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমার মৃত্যুর পর তুমি এই পত্র ও গ্রন্থসহ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং আমার অনুতাপের কথা বলিবে।" এই কথা বলিয়া অকস্মাৎ তিনি নিস্তব্ধ হইলেন; পরে একজন বলিল "তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

শিষ্য পত্র ও গ্রন্থসহ বসুবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন "আমার প্রভু সঙ্ঘভদ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার শেষ কথাগুলি এই পত্রে লিখিত আছে, তাঁহার অপরাধের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার সুনাম নষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।" বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব পত্র ও পুস্তকের কতকাংশ পাঠ করিয়া কিছুদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিষ্যকে বলিলেন "শাস্ত্রজ্ঞ সঙ্ঘভদ্র চতুর ও উদ্ভাবনক্ষম ছিলেন। তাঁহার বিচার শক্তি প্রখর ছিল না কিন্তু তাঁহার রচনারীতি মন্দ নহে। সঙ্ঘভদ্রের শাস্ত্র ইচ্ছা করিলেই আমি এই ক্ষণই পরাভূত করিতে পারি। তাঁহার মৃত্যুকালীন অনুরোধ আমার রক্ষা করিবার বিশেষ কারণ আছে; কেননা এই শাস্ত্র আমার সম্প্রদায়েরই মত ব্যক্ত করে। এই জন্য আমি কেবলমাত্র শাস্ত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম ন্যায়ানুসার শাস্ত্র রাখিব।"

শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "সঙ্ঘভদ্রের মৃত্যুর পর বসুবন্ধু তাঁহার ভয়ে দেশান্তরী হইয়াছিলেন; কিন্তু এইক্ষণ শাস্ত্র হস্তগত হওয়াতে তিনি উহার নাম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা কি প্রকারে এই অপমান সহ্য করিব।" বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলিলেন যে, "পশুরাজ যদিও শূকর দেখিয়া পলায়ন করে তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়ের

বলের পার্থক্য জানেন।" সঙ্ঘভদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ দাহন করিয়া তাঁহার অস্থি সংগ্রহ করিয়া আম্রবনে এক স্তূপ নির্ম্মিত হইল। বর্ত্তমানেও ঐ সকল অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়।

আম্রবনের নিকটেই অন্য একটী স্তূপে শাস্ত্র প্রণয়নকারী বিমল মিত্রের শরীর চিহ্ন আছে। শাস্ত্রজ্ঞ বিমল মিত্র কাশ্মীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। তিনি অনেক সূত্র পাঠ এবং অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চভারত ভ্রমণ ও ত্রিপিটকে পারদর্শী হইয়াছিলেন। স্বকার্য্য সাধন করিয়া তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনে উদ্যত হইয়া সঙ্ঘভদ্রের স্তূপের সন্নিকটে যাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তূপের উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন "সঙ্ঘভদ্র প্রকৃত জ্ঞানী ছিলেন। চতুর্দ্দিকে নিজ সুনাম প্রচার করিয়া তিনি অপর সম্প্রদায়কে পরাজয়ে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নাম অবিনশ্বর হইবে না কেন? আমি মূর্খ হইলেও অনেক সময় তাঁহার প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। বসুবন্ধু মৃত হইলেও তাঁহার সম্প্রদায় জীবিত আছে। আমি যাহা জানি তাহাও রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য আমি এইরূপ শাস্ত্র প্রণয়ন করিব যে জম্বুদ্বীপ হইতে মহাযানের নাম বিলুপ্ত হয়। এই গ্রন্থ অবিনশ্বর হইবে এবং আমার বহুদিন সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ হইবে।" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইল; তাঁহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল এবং উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তিনি অনুতাপসূচক নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন" বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত মহাযানেই সারতত্ত্ব নিহিত আছে। ইহার সুনাম হ্রাস হইতে পারে কিন্তু ইহার বিচার শক্তি দুর্জ্জেয়। আমি অজ্ঞতাবশতঃ ইহার প্রধান শিক্ষকদিগকে পরাস্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। ইহার পুরস্কার সকলেই দেখিতেছেন। এই জন্যই আমার প্রাণত্যাগ হইতেছে। আমার দৃষ্টান্ত হইতে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি শিক্ষালাভ করুন।" তাঁহার মৃত্যুকালে ভূমিকম্প হইয়াছিল। যে স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন তথায় এক গভীর গর্ত্ত হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়া অস্থি সংগ্রহ পূর্ব্বক তথায় এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিল।

এই সময়ে একজন অর্হৎ বাস করিতেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "কি দুঃখ! কি পরিতাপ! অদ্য এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মহাযানকে নিন্দা করিয়া গভীর নরকগামী হইলেন।"

এই প্রদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গানদীর পূর্ব্বতীরে মযূলো (হরিদ্বার) নগর; ইহার পরিধি প্রায় ২০ লি। নগর জনপূর্ণ। নগরের চতুষ্পার্শ্বেই স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিতা; নগরে তাম্র, স্বচ্ছ কাচ ও মূল্যবান পাত্র পাওয়া যায়। নগরের নিকটেই গঙ্গাতীরে দেবমন্দিরে নানা প্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হয়। নগরের মধ্যস্থলে পুষ্করিণী আছে; ইহার পার্শ্বদেশ প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার মধ্য দিয়া কৃত্রিম খাল মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। পঞ্চভারতের লোকে ইহাকে গঙ্গাদ্বার। এই স্থানে পুণ্য সঞ্চয় ও পাপক্ষয় হয়। নানা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া এই স্থানে পুণ্যশালা স্থাপন করিয়াছেন। বিধবা ও আতুরগণকে ঔষধ ও উত্তম উত্তম খাদ্যাদি দিবার জন্য যথেষ্ট গচ্ছিত অর্থ আছে। এই স্থান হইতে ৩০০ লি যাইয়া আমরা ব্রহ্মপুর দেশে পৌঁছি।

ব্রহ্মপুর।

এই রাজ্য প্রায় ৪০০০ লি; ইহার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত। রাজধানীর পরিধি প্রায় ২০ লি। অধিবাসীরা ধনী। জমী উর্ব্বরা এবং প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। দেশে তাম্র ও পার্ব্বতীয় স্ফটিক পাওয়া যায়। জলবায়ু সুশীতল; অধিবাসীরা অশিক্ষিত এবং কষ্টসহিষ্ণু। অল্পলোকেই বিদ্যাভ্যাস করে, অধিকাংশই বাণিজ্যে নিযুক্ত। এই প্রদেশের উত্তরে তুষার পর্ব্বত; উহার মধ্যস্থলে সুবর্ণগোত্র দেশ। এই দেশে এক প্রকার উচ্চশ্রেণীর সুবর্ণ পাওয়া যায় এবং সেই জন্য দেশের নাম সুবর্ণ গোত্র। বহুদিন হইতেই এই দেশে স্ত্রীলোকে রাজত্ব করিতেছেন এবং সেই জন্য এই দেশকে "স্ত্রীলোকের রাজ্য" বলে। রাজ্ঞীর

স্বামীকে রাজা বলা হয় কিন্তু রাজকার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সংস্রবই নাই। পুরুষগণ যুদ্ধ ও চাষ করে মাত্র। দেশে গম প্রচুর পাওয়া যায়। অধিবাসীরা উগ্র প্রকৃতির। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ৪০০ শত লি যাইয়া আমরা গোবিসনা দেশে পৌঁছি।

এই রাজ্য প্রায় ২০০০ লি এবং রাজধানী ১৪।১৫ লি। এই দেশ স্বভাবতঃই সুরক্ষিত। কেননা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী। জনসংখ্যা অত্যধিক। চতুর্দ্দিকে পুষ্পকুঞ্জবন এবং পুষ্করিণী। জলবায়ু এবং উৎপন্ন দ্রব্য মতিপুরের ন্যায়। অধিবাসীরা সচ্চরিত্র ও শান্ত। ইহারা বিদ্যাভ্যাসে ও সৎকার্য্যে রত; অনেক অবিশ্বাসী আছে। দুইটী সঙ্ঘারামে ১০০ শত যতি আছে; ইহাদের অধিকাংশই হীনযান মতাবলম্বী। ৩০টী দেবমন্দির আছে; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ান্তর্গত অনেক লোক বাস করে। রাজধানীর নিকটেই প্রাচীন সঙ্ঘারামে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ আছে। ইহা প্রায় ২০০ শত ফুট উচ্চ। বুদ্ধদেব এই স্থানে প্রচার করিয়া ছিলেন। নিকটেই একটী স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বৌদ্ধের চিহ্ন আছে; তাঁহারা এই স্থানে ভ্রমণ ও উপবেশন করিতেন। নিকটেই ক্ষুদ্র দুইটী স্তূপে তথাগতের চুল ও নখ আছে। এই দুইটী স্তূপ প্রায় ১০ ফুট করিয়া উচ্চ। ৪০০ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে যাইয়া আমরা অহিক্ষেত্র দেশে উপস্থিত হই।

অহিক্ষেত্র।

এই দেশ প্রায় ৩০০০ লি এবং রাজধানী ১৭।১৮ লি। ইহারও চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত। এদেশে গম উৎপাদিত হয়; অনেক বন ও ঝরণা আছে। জলবায়ু মৃদু ও প্রীতিপদ এবং অধিবাসীরা সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র। ইহারা ধার্ম্মিক ও বিদ্যাচর্চ্চায় রত। অধিবাসীরা চতুর। হীনযানমতাবলম্বী সহস্রাধিক যতি ১০টী সঙ্ঘারামে বাস করেন। ৯টী দেবমন্দির আছে। ইহারা পাশুপত শ্রেণীভুক্ত এবং ঈশ্বরের নিকট বলিদান করে। নগর বহির্ভাগে নাগ পুষ্করিণীর নিকটে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপ আছে। এই স্থানে তথাগত নাগরাজের জন্য সাত দিবস ধরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটেই ৪টী স্তূপ আছে; এই স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন; অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। এই স্থান হইতে ২৬০ কি ২৭০ লি দক্ষিণে যাইয়া এবং গঙ্গানদী পার হইয়া আমরা বীরসেন দেশে পৌঁছি।

বীরসেন।

এই দেশ প্রায় ২০০০ লি; রাজধানী ১০ লি। অধিবাসীরা ক্রোধশীল। ইহারা অধ্যয়ন ও সুকুমার বিদ্যায় অনুরক্ত; অধিকাংশই অবিশ্বাসী; কেবল কয়েকজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ৩০০ যতি দুটী সঙ্ঘারামে বাস করেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত উপাসকদিগের ৫টী দেবমন্দির আছে। নগরের মধ্যভাগে প্রাচীন সঙ্ঘারামে ২০০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে; ইহা অশোক নির্ম্মিত। প্রাচীনকালে তথাগত সাত দিবস স্কন্ধ ধাতু উপাখ্যান সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটে চারিজন বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ২০০ শত লি যাইয়া আমরা কপিথ দেশে পৌঁছি।

কপিথ।

কপিথ দেশ প্রায় ২০০০০ লি, রাজধানী ২০ লি। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য বীরসেন দেশের ন্যায়। অধিবাসীরা কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং শিষ্টাচারী। ইহারা অধ্যয়নানুরক্ত। হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত এক সহস্র যতি ৪টী সঙ্ঘারামে বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ান্তর্গত অবিশ্বাসীগণের ১০টী দেবমন্দির আছে। ইহারা সকলেই মহেশ্বরকে পূজা করে। নগরের ২০ লি পূর্ব্বে সুগঠিত সঙ্ঘারাম আছে। বুদ্ধদেবের অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। প্রায় এক শত যতি আছেন। নিকটবর্ত্তী মঠে অনেক ধার্ম্মিক বাস করেন। সঙ্ঘারামের মধ্যস্থলে তিনটী মূল্যবান সিঁড়ি আছে। তথাগত ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে এই সিঁড়ি দিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পুরাকালে তথাগত জেতবান বন হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়া স্বধর্ম্ম গৃহে বাস করিয়া তাঁহার মাতার জন্য প্রচার করিয়াছিলেন। তিন মাস অতিবাহিত হইলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য

দেবরাজ শক্র নিজ ঐশ্বরিক শক্তিবলে এই সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মধ্যবর্ত্তী সিঁড়ি পীতবর্ণ স্বর্ণনির্ম্মিত। বামেরটী কাচ ও দক্ষিণেরটী শুভ্র রৌপ্য নির্ম্মিত।

তথাগত স্বধর্ম্মগৃহ হইয়া দেবতাগণ সমভিব্যাহারে মধ্য সিঁড়ি দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ শুভ্র চামর হস্তে দক্ষিণ সিঁড়ি দিয়া ও দেবরাজ শক্র মূল্যবান ছত্র ধরিয়া বামের সিঁড়ি দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি ও তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন। অনেক শতাব্দী ধরিয়া সিঁড়িগুলি স্বস্থানে ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী রাজগণ সিঁড়ি না দেখিতে পাইয়া দুঃখিত চিত্তে মণিমুক্তা শোভিত ইষ্টক ও কারুকার্য্যসমন্বিত প্রস্তর দ্বারা ৭০ ফুট উচ্চ তিনটী সিঁড়ি গাঁথিয়াছে। ইহার উপরে তাহারা এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি রাখিয়াছে এবং উভয় পার্শ্বে ব্রহ্ম ও শক্রের মূর্ত্তি দুটী সিঁড়িতে স্থাপন করিয়াছে।

বিহারের বহির্ভাগে রাজা অশোক নির্ম্মিত ৭০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। ইহা বেগুনে রংয়ের এবং উজ্জ্বল। ইহা অত্যন্ত শক্ত। ইহার উপরে সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট এক সিংহমূর্ত্তি আছে। স্তম্ভের চতুষ্পার্শে খোদিত মূর্ত্তি আছে। নিকটবর্ত্তী জন সাধারণ ধার্ম্মিক হইলে মূর্ত্তিগুলি দেখা যায়; কুকর্ম্মপরায়ণ হইলে তাহারা অদৃশ্য হয়।' নিকটেই পূর্ব্বতন ৪ জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন বর্ত্তমানেও দেখা যায়। নিকটেই অন্য একটী স্তূপ। এই স্থানে তথাগত স্নান করিতেছিলেন। নিকটস্থ এক বিহারে তথাগত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিহারের নিকট ৫০ হস্ত দীর্ঘ ও ৭ ফুট উচ্চ একটী প্রাচীর আছে; এইস্থানে তথাগত ব্যায়াম করিতেন। যে যে স্থানে তিনি ভ্রমণ করিতেন, তথায় পদ্মপুষ্পের চিহ্ন আছে। প্রাচীরের দক্ষিণ ও বামে ব্রহ্মরাজ ও শক্র নির্ম্মিত ২টী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে।

শক্র ও ব্রহ্মরাজের স্তূপের সম্মুখে উৎপলবর্ণ ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিবার জন্য চক্রবর্ত্তিণী রাজ্ঞীরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সৌভূতি নিজ গুহায় বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—"বুদ্ধদেব এইক্ষণ মনুষ্যের সহিত বাস করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করিতেছেন। দেবদূতগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। এইক্ষণ আমি কি জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব! তাঁহার নিকট কি আমি শুনি নাই যে, কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব নাই; যখন সকল দ্রব্যেরই এই অবস্থা তখন আমি স্বচক্ষেই বুদ্ধের অশরীরী দেহ দেখিয়াছি। এই ভাবিয়া যে স্থানে বুদ্ধদেব ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুণীরূপ ধারণ করিলে, বুদ্ধ তাহাকে কহিলেন যে, সৌভূতি সংসারে সকলই অনিত্য জানিতে পারিয়া সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধকেই দেখিয়াছেন।

• এই স্থান হইতে প্রায় দুই শত লি যাইয়া কান্যকুব্জে পৌঁছি।

(চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত) ক্রমশঃ

জন্ম-মৃত্যু।

(সার উইলিয়ম জোন্সের অনুকরণে)

মা'র কোলে সদ্যজাত শিশুটি যখন
কাঁদিল অজানা দুঃখে—নয়ন মেলিয়া;
চৌদিকে ঘিরিয়া তারে পরিজন সবে
বাজায় মঙ্গল শঙ্খ আনন্দে মাতিয়া!

সুখে দুঃখে কতদিন কেটে গেল ধীরে;
নিয়তি-ঘনায়ে এল! শব দেহ ঘিরে
আছাড়ি পড়িল সবে হানি কর বুকে,
—সৌম্যহাসি ফুটে শুষ্ক ধ্যানমগ্ন মুখে!

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

লীনার কাহিনী।

(A. Kaempfen-এর ফরাসী হইতে)

লীনা, বেত্তিনার প্রতি।

ব..., ২৬ নভেম্বর ১৮৭০

আমাদের বাড়ীতে নূতন লোক আসিয়াছে। গত রবিবারে, মেৎস্ (Metz) সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ১৫ জন বন্দী এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহারা সকলেই সেনা-নায়ক। আমাদের এই ক্ষুদ্র নগরের তিনটি পান্থশালাই ফরাসী সৈনিকে ভরিয়া গিয়াছে, কেবল ফরাসী সেনা-নায়কদিগকে বাসিন্দাদিগের গৃহে স্থান দেওয়া হইতেছে। আমার কাকা একটা পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে:—তুমি কাপ্তেন গার্নিয়েকে তোমার একটা কাম্‌রায় রাখিবে, এবং সরকারী খরচে তাহার আহারাদির ব্যবস্থা করিবে। আমার কাকা একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু 'না' বলিবার জো নাই—সরকারের হুকুম। অপরাহ্ণ সময়ে কাপ্তেন আমাদের এখানে আসিলেন। লোকটার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, বেশ লম্বা, খোলা-খালা মুখের ভাব, সুশ্রী না হইলেও প্রিয়দর্শন। সাহসী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; চ'খের দৃষ্টি খুব মৃদু হইলেও, তাহাতে সংকল্পের দৃঢ়তা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত বিষণ্ণ; আমার মনে হয়, এ বিষণ্ণতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, স্বদেশের দুর্দ্দশা, নিজের বন্দী-অবস্থা, এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার কোন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু—এই সমস্তই বোধ হয় ইহার কারণ। আমাদের ঝি লুইসা-বুড়ী আর আমি—আমরা এই ফরাসী কাপ্তেনের জন্য, আমাদের নীলরঙের কাম্‌রাটা সজ্জিত করিয়া রাখিলাম। এই কাম্‌রাটি হইতে নদী ও বৃহৎ ময়দানের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমার কাকার ইচ্ছা ছিল—রাস্তার ধারের কাম্‌রাটা ইঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু সে কাম্‌রাটা 'অন্ধকেরে' ও রাস্তাটাও পথিক-শূন্য। এই কাম্‌রায় থাকিলে বেচারা কাপ্তেনের বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ফরাসীদিগের প্রতি কাকার অত্যন্ত বিদ্বেষ থাকিলেও, তাঁহার অন্তঃকরণটা দয়ালু; তাই এই কথাটা তিনি সহজেই বুঝিলেন; এবং আমাদের ইচ্ছামত আমরা কাপ্তেনের জন্য কাম্‌রা নির্দ্দিষ্ট করিলাম। কাপ্তেন কাম্‌রায় আসিয়াই, তাড়াতাড়ি কাম্‌রার চারিদিকটা এক-নজরে দেখিয়া লইলেন এবং আমাদিগকে ধন্যবাদ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, একাকীই আহার করিতে পারেন। তিনি উত্তর করিলেন;—"আমি আপনাদিগকে কিছুমাত্র কষ্ট দিতে চাহি না; তবে যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমি আপনাদের সহিত একসঙ্গে সায়াহ্ন-ভোজন ও নৈশ-ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। তাহার পর, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন; আবার নৈশ-ভোজনের সময় ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের সহিত এই তাঁহার প্রথম আহার; আহারটা নিস্তব্ধভাবেই সম্পন্ন হইল। আমাদের অতিথির সঙ্গে আমাদের সামান্যরকমের দুইচারিটা কথা হইল মাত্র। ভোজন শেষ হইবামাত্র তিনি

পড়িলেন এবং আমাদের প্রতি শুভ-রাত্রির শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইয়া, আপনার কাম্‌রায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন, তার পরদিন, এই ভাবেই কাটিয়া গেল। আমার ভয় ছিল পাছে আমার কাকা, যুদ্ধের ঘটনাদি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন; আমার বিশ্বাস, এই সব কথা উত্থাপন করিবার তাঁহার যে একটু ইচ্ছা না ছিল এরূপ নহে! কিন্তু, কি ভাগ্য, এ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করেন নাই।

গত-কল্য, সায়াহ্ন-ভোজনের সময়, লুইসা-বুড়ী কাপ্তেনের হাতে একখানি পত্র আনিয়া দিল। এই পত্রখানি Mayence-নগর হইতে আসিতেছে। বন্দীদিগের প্রস্থান করিবার পরে, এই পত্র সেইখানে পৌঁছিয়াছিল। তাড়াতাড়ি পত্রের শিরোনামার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও আমাদের নিকট পত্রপাঠের অনুমতি লইয়া, তিনি আমাদের বলিলেন "আমার মায়ের চিঠি"। আমার কাকা বলিলেন "কাপ্তেন মহাশয়, পত্রখানি পাঠ করুন"। তিনি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রের প্রথম কথাগুলি পড়িয়াই তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেন তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। তিনি পত্রখানি দুইবার করিয়া পাঠ করিলেন; প্রথমবার অপেক্ষা দ্বিতীয়বারে আরও ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন। তাঁকে সুখী দেখিয়া আমরাও সুখী হইলাম। আমার কাকাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"ডাক্তার-মহাশয়! আমাকে মার্জ্জনা করিবেন,—আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম..."

কাকা বলিলেন:—"কাপ্তেন, কিসের জন্য মার্জ্জনা? মার্জ্জনা করিবার ত কিছুই নাই। সব খবর ভাল ত?"

গার্ণিয়ে উত্তর করিলেন—"এতটা ভাল খবর পাব বলে' আশা করিনি।"

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিনের মত, আজ আহারের সময়, কাপ্তেন ততটা চুপ্-চাপ্ ছিলেন না। নৈশ-ভোজনের সময় তিনি আমাদিগকে বলিলেন;—তাঁহার মাতা পল্লীগ্রামে বাস করেন, এবং তাঁহার দুইটি ভগিনী তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং তাহাদিগকে তিনি যার পর নাই ভালবাসেন। কাপ্তেন চলিয়া গেলে, আমার কাকা বলিলেন:—"ভাবি আশ্চর্য্য, নিজ পরিবারের উপর যুবকটির বাস্তবিকই একটা টান্ আছে দেখছি।" আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য কিসের জন্য? মানব-হৃদয়ের যে ভাবগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক, সেই ভাবগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে, এই ফরাসী জাতিই কি ব্যতিক্রম-স্থল যে আশ্চর্য্য হইতে হইবে? শত্রুদের সম্বন্ধেও ন্যায়বিচার করা উচিত; এইরূপ ন্যায়বিচার করিতে কোন আয়াস নাই; আমার মনে হয়, এইরূপ না করিলে, একটা সুমধুর ও বিশুদ্ধ সুখের সম্ভোগ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা হয়।

১১ ডিসেম্বর

কিছুদিন হইল, জর্ম্মান-সৈন্যের একটী ক্ষুদ্র দল, আমাদের নগরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। এই সকল সৈনিক, ফ্রান্সে আহত হয়; আপনাদের পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে, এই জন্য সরকারের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া, নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

তাহারা অপরাহ্নে এখান দিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এখানকার লোকে তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহারা যাহা বর্ণনা করিল তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর; গ্রাম-সমূহের দাহন, গৃহের লুটপাট, অসহায় বালবৃদ্ধ বনিতাদিগের নৃশংস হত্যা। এই সকল ভীষণ কাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়া অনেকে আবার গর্ব্ব করিতেছিল। প্রত্যেকেই বলিতেছিল, তাহারা এক-একটা দামী লুটের জিনিস পাইয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি যুবক ছিল,—তাহারা নারী-পরিচ্ছদ, রত্নালঙ্কার, জেব্‌ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ গর্ব্বের সহিত সকলকে দেখাইতেছিল—এই সব জিনিস তাহারা তাহাদের বাগ্‌দত্তা প্রেয়সীদিগকে উপহার দিবে। লুইসা-বুড়ী, তাহাদের বলিল "এই সব চোরাই মাল্ দিয়া তোমাদের প্রেয়সী-দিগের অঙ্গ সাজাইবে—ইহাতে তোমাদের লজ্জা হয় না ?"—সৈন্যদলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক সেই এই কথা বলিয়া উঠিল।—"বুড়ীটা বলে কি ?—চোরাই মাল!" "ও সব জিনিস তো ন্যায্যতঃ আমাদেরই; যুদ্ধলব্ধ অধিকারসূত্রেই ঐ সকল জিনিস আমরা পেয়েছি।" সেই সময়ে সেইখানে যাহারা উপস্থিত ছিল—সৈনিক, গ্রামালোক, এমন কি রমণী—সকলেই এই কথায় সায় দিয়া একবাক্যে বলিল:—"হাঁ, তা ঠিক্—ও সমস্ত যুদ্ধের অধিকার বটে।" হায়! কি সর্ব্বনেশে কথা! কে বিশ্বাস করিতে পারিত, খৃষ্টানেরা এই সকল নিষ্ঠুর ব্যাপারকে এত সহজ ভাবে গ্রহণ করিবে! তবেই দেখ, পুরাতন ধর্ম্মপ্রাণ জর্ম্মাণ এখন কিরূপ হইয়াছে! অন্য দেশের লোক এখন আমাদিগকে কি ভাবিবে? যে সময়ে সৈনিকেরা আসিয়াছিল, ভাগ্যিস্ সেই সময়ে ফরাসী কাপ্তেন তাঁহার কাম্‌রায় ছিলেন এবং তাহারা প্রস্থান করিলে পর, তাঁহার কাম্‌রা হইতে বাহির হইয়াছিলেন; যদি তিনি তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেন, তাহা হইলে আমি ভারী লজ্জিত হইতাম। কেননা, তিনি জর্ম্মাণ ভাষা বুঝেন, এবং জর্ম্মাণ ভাষায় একটু কথাও কহিতে পারেন।

গত শনিবারে সংবাদপত্রাদিতে জানা গেল, সম্প্রতি আবার আমরা জিতিয়াছি। প্যারিসের সৈন্যমণ্ডলী প্যারিস হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; এবং দুই দিন যুদ্ধ করিয়া, শেষে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক হাইডেন্‌মাউয়ার আমাদের সহিত সায়াহ্নে ভোজন করিয়াছিলেন। প্রথমে, আমার কাকা ও অধ্যাপক, এই জয়ের কথা উত্থাপন করেন নাই, এবং আমাদের অতিথির সম্মুখে তাঁহাদের আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ভোজনের শেষ-ভাগে, আমার কাকা, স্পেনদেশীয় মদিরাপূর্ণ একটা পাত্র ওষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া, অধ্যাপককে একটু ইঙ্গিত করিলেন, অধ্যাপকও একটু চোখ্ টিপিয়া, একটা মদিরাপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। এইরূপ কিছু একটা কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া সন্দেহ থাকায়, কাপ্তেন গার্ণিয়ে মদিরা আদৌ গ্রহণ করেন নাই। একটু পরে, অধ্যাপক আর বাক্‌ সংযম করিতে পারিলেন না। ফরাসী সৈন্যের ব্যর্থ-চেষ্টার সম্বন্ধে একটা উল্লেখ করিলেন। তখন কাপ্তেন উঠিয়া পড়িলেন, এবং চিঠি লিখিতে হইবে এই ছুতা করিয়া আমাদের অনুমতি লইয়া নিজের কাম্‌রায়

চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর, আমার কাকা ও অধ্যাপক পরস্পরের সহিত গরল-পূর্ণ একটা স্মিতহাস্যের বিনিময় করিলেন এবং ফ্রান্স সম্বন্ধে এমন অবজ্ঞাসূচক ও নিষ্ঠুর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি আর থাকিতে পারিলাম না,—আমি বলিলাম, অন্য দেশীয় লোকের সম্বন্ধে, বিশেষত একটা বিজিত দেশের লোক সম্বন্ধে কেন এত বিদ্বেষ পোষণ করা হয় আমি বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ হাঁ, এই উদ্ধত ও নীতিভ্রষ্ট জাতি পরাজিত হইয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে, উহারা একেবারে ধ্বংস হইলেই ভাল হয়।—"ধ্বংস! অধ্যাপক মহাশয়, তবে কি আপনার বিশ্বাস, আমাদের জিসু মহাপ্রভু এই ইচ্ছার অনুমোদন করেন?"—"হাঁ, নিশ্চয়ই। যে জাতি স্পষ্টই দেখা যাচ্চে অভিশাপগ্রস্ত এবং বিশ্বজগতের নিন্দার ভাজন, সে জাতির সম্বন্ধে এই ইচ্ছা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে?" কিন্তু আমি খুব তেজের সহিত উত্তর করিলাম,—"কিন্তু, যদি এই ফরাসী জাতি এতই খারাপ হইয়া গিয়াছে যে উহার ধ্বংস হওয়াই উচিত, তবে আমরা উহাদের ভাষা শিক্ষা করি কেন, উহাদের গ্রন্থ পাঠ করি কেন, এবং নানা বিষয়ে উহাদের অনুকরণ করি কেন? আমাদের মধ্যে যাহারা সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত তাহারা উহাদের রীতিনীতি, উহাদের রুচি, উহাদের ধাঁচা, উহাদের কেতা অবলম্বন করে কেন?..."—আমার কাকা, আমার কথা শেষ না হইতেই, বলিয়া উঠিলেন—"তোর এই সব "কেন"র কোন মানে-মোদ্দা নেই। এখন তুই যা, আজ রাত্রে একটা দেওয়ালী উৎসব করতে হবে, লুইসার সঙ্গে একত্রে তারই আয়োজন করগে।"

দুই ঘণ্টা পরে, কাপ্তেন বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই ঘরের মধ্য দিয়া, যখন তিনি রাস্তার দিকের দরজার নিকট আসিতেছিলেন, আমি তখন জানলার বাহিরে রঙ্গিন লণ্ঠন সাজাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। বৈঠকখানা-ঘরের অগ্নি-রক্ষণীর নিকটে আসিয়া তিনি একটু থামিলেন, এবং আমি কি করিতেছি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া উঠিল; তাহার পর, একটি কথা না কহিয়া, দরজার অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার মনে কি হইতেছিল, আমি বেশ অনুমান করিতে পারিলাম; আমি লজ্জিত হইলাম, শুধু লজ্জিত না, তাঁহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া ব্যথিতও হইলাম। আমার হাতে যে লণ্ঠনটি ছিল তাহা মাটির উপর রাখিয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"কাপ্তেন-মহাশয়, আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আজ রাত্রে আপনার কাম্‌রার জান্‌লায় আমি কোন লণ্ঠন ঝুলাইব না।" একটু গদগদস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "আপনার অত্যন্ত দয়া, হৃদয়ের অন্তস্তল হতে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

আমার কাকা, একজন রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ৬টার সময় ফিরিয়া আসিলেন; এবং দীপাবলীর কিরূপ শোভা হইয়াছে, দেখিবার জন্য বাড়ীর চারিদিকটা

একবার ঘুরিয়া আসিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"নীল রঙের কাম্‌রার জান্‌লায় কোন লণ্ঠন নাই কেন?" আমি উত্তর করিলাম—"তার কারণ,—ঐ নীল কামরায় ফরাসী কাপ্তেন থাকেন।"—"তাতে কি এল-গেল? আমার ইচ্ছা, অন্য কাম্‌রাগুলির ন্যায় ঐ কাম্‌রাটাও আলোকিত হয়।"—আমি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম (মনে করিয়া আপনিই এখন বিস্মিত হইতেছি)—"মনে করুন যদি আমরাই যুদ্ধে পরাজিত হইতাম, আর আপনি যদি কোন ফরাসী নগরে বন্দীভাবে থাকিতেন, তা হইলে আমি আমাদের অতিথির খাতিরে যা করচি, তারা যদি আপনার প্রতি সেরূপ খাতির না করিত, তাহা হইলে আপনার কিরূপ মনে হইত?" —"আ! আ! যদি আমরা পরাজিত হইতাম সে কাল আর নাই, সে সব দিন অতীত হইয়াছে।" হাত ঘসিতে ঘসিতে আমার কাকা এইরূপ উত্তর করিলেন। যাই হোক্, ঐ জান্‌লায় আলো দিবার সম্বন্ধে তিনি আর বড় জেদ্ করিলেন না। আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন। আজ রাত্রে কাপ্তেন আমাদের গৃহে নৈশ ভোজন করেন নাই।

১৩ ডিসেম্বর।

প্যারিসের অদম্য প্রতিরোধিতা দেখিয়া, এখানকার লোকদিগের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। যে সব লোককে আমি দয়ালু ও কোমল-হৃদয় বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদের মধ্যেও অনেকে বলিতে লাগিল, এই উদ্ধত নগরের প্রতি একটু বেশী মাত্রায় দয়া প্রদর্শন করা হইতেছে, বহু পূর্ব্বেই নগরটাকে বোমার দ্বারা চূর্ণ করা উচিত ছিল, উহার ইমারৎ-সমূহের একখণ্ড ইটও অবশিষ্ট রাখা উচিত ছিল না। ভাই বেত্তিনা, তোমাদের ওখানেও বোধ হয় লোকে এই রকম ভাষা ব্যবহার করিতেছে, আর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি তুমি তাতে কতটা মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হইতেছ। আমার আত্মীয়া বের্থা, গত রবিবারে, অপরাহ্ণটা আমাদের এইখানেই কাটাইলেন। আমাদের একটু গান-বাজনা হইল। আমি যখন গান গাইতেছিলাম, সেই সময় কাপ্তেন গাণিয়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে অবধি আমাদের এখানে আছেন, তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমি পিয়ানো বাজাইতে বসি না; যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁর ফিরিবার কথা, তাঁহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি গান-বাজনা বন্ধ করিয়া দিই; আমার মনে হয়, গান-বাজনা শুনিয়া পাছে তাঁহার বিষণ্ণ ভাবটা আরও বাড়িয়া উঠে। যখন মনটা ভাল থাকে না, তখন আমি গান-বাজনায় একটু সান্ত্বনা পাই; কিন্তু একজনের যাহা ভাল লাগে, কখন-কখন তাহাই আর একজনের খারাপ লাগিতে পারে। রবিবারে, সময়টা যেন শীঘ্র কাটিয়া গেল; কত সময় হইয়াছে আমার কিছুই মনে ছিল না। আমাদের সহিত একটি কথাও না কহিয়া, কাপ্তেন তাঁহার নিজ কাম্‌রায় চলিয়া গেলেন। সায়াহ্নে, কাপ্তেন আমাকে বলিলেন:—"আমার দরুণ কি আপনি ভোজনের পর গান গাইতে ক্ষান্ত হইলেন?" আমি কোন উত্তর করিলাম না। তিনি আবার বলিলেন,—"আমার নিশ্চয় মনে

হয়, আপনি গান বাজনার আমোদ পান, কিন্তু আমি থাকলেই আপনি সে সুখ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করেন। আজ আমি এই প্রথম আপনার গান শুনিলাম। আমার জন্য আপনার যদি কিছুমাত্র বাধা মনে হয়, তাহলে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হব। আমি আপনাকে অনুনয় করছি, যখন ইচ্ছা আপনি গানবাজনা করিবেন, আমার জন্য কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না।" ঐ দিন হইতে, যখনই আমার খেয়াল চাপে, আমি পিয়ানো বাজাইতে বসি। কেবল, কাপ্তেন যখন তাঁর কামরায় থাকেন, তখন আমি জর্ম্মাণ ভাষায় কোন গান গাই না! ফরাসী ভাষায় গান গাই। কিন্তু ফরাসী উচ্চারণ আমার বড়ই খারাপ, তাতে ফরাসীর কানে ব্যথা দিতে পারে; তাই আমি বাছিয়া বাছিয়া, পুরাতন ইতালীয় ওস্তাদদিগের সুর বাজাই, এবং বেশীর ভাগ ধর্ম্মের গান ও সাধারণ ভাবের মর্ম্মস্পর্শী গান গাইয়া থাকি।

১৫ ডিসেম্বর

ভয়ানক দুর্দ্দিন। আট দিন ধরিয়া বাদ্‌লা চলিতেছে। ধূসর আকাশের উপর দিয়া কালো মেঘ ধীরে ধীরে চলিতেছে—পশ্চিমের বাতাস মেঘগুলাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে—অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ এমনই কুয়াসাচ্ছন্ন, যে আমাদের বাড়ী হইতে নদীর রেখা আর দেখা যাইতেছে না, যদিও নদী ও আমাদের বাড়ীর মধ্যে, একটি ক্ষুদ্র উদ্যানের ব্যবধান মাত্র। মধ্যে মধ্যে, আবিল জলের উপর দিয়া, এক একটি মৌন নৌকা মন্থর করিয়া চলিয়া যাইতেছে, বিষণ্ণ কল্পনার নিকট এই নৌকাগুলি স্বভাবতই শবাধার বলিয়া মনে হয়। কখন কখন মনে হয়, সূর্য্য বুঝি আকাশ হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল; শস্যশ্যামলক্ষেত্র লইয়া, হরিৎ শাখা পল্লব লইয়া, বিচিত্র কুসুমস্তবক লইয়া হাস্যময় বসন্তের আর বুঝি আবির্ভাব হইবে না। আমার অন্তঃকরণের উপর যেন একটা পাষাণ-ভার চাপিয়া রহিয়াছে...এবং এই বাহ্য প্রকৃতির বিষণ্ণতার মধ্যে, এই শোক-চ্ছায়ার মধ্যে,—যুদ্ধবিগ্রহের কথা—কাটাকাটির কথা ছাড়া আর কিছুই শুনা যায় না!...

গত কল্য, একজন ফরাসী সেনা-নায়ক, হাসপাতালে জ্বররোগে মারা গেল। ইনি একজন সব্‌-লেফটেনেণ্ট ছিলেন—বয়স ২০ বৎসর মাত্র। যাহারা তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই বলে, লোকটি বড় ভাল, অত্যন্ত ধীর ও মধুরপ্রকৃতি। জ্বরের প্রলাপে, কেবলই তার মাকে ডাকিতেছিল; মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে তাহার মস্তিষ্ক শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, সে আর বাঁচিবে না। সে একটা কাঁচি চাহিয়া লইল এবং তাহার কম্পমান হস্তের দ্বারা, একগুচ্ছ মাথার চুল কাটিয়া, পীড়ার আরম্ভে যে পুস্তকখানি কখন কখন পড়িত, সেই পুস্তকের দুইটি পাতার মধ্যে ঐ কেশগুচ্ছ রাখিয়া দিল। পরে তাহার শয্যার পাশে তাহার যে সৈনিক সঙ্গীটি বসিয়াছিল তাহাকে এইরূপ বলিল:—"সেখানে যখন তুমি ফিরিয়া যাইবে, তখন এই পত্রখানি আমার মাকে দিবে।" আজ প্রাতে তাকে কবরস্থ করা হইয়াছে। শব লইয়া অনুযাত্রিগণ আমাদের দরজার সম্মুখ দিয়া গেল। শবাধারের পশ্চাতে কালো কাপড়ে ঢাকা শবাধার চারিজন সৈনিক

বহন করিতেছে—এবং তাহার পশ্চাতে, আমাদের নগরস্থ সমস্ত বন্দী ফরাসী সেনানায়ক অনাবৃত মস্তকে চলিয়াছে। কেহ কেহ কাঁদিতেছিল।

আকাশ মেঘে অন্ধকার, ধীরে ধীরে বৃষ্টি পড়িতেছে। এরূপ শোকাবহ ব্যাপার আমি আর কখন দেখি নাই। তার পর, যখন বেচারীর মায়ের কথা ভাবিলাম, আমার বুক যেন ফাটিয়া গেল, আমার চোখে জল আসিল।

সায়াহ্নে যখন আমরা আহারের টেবিলে আসিয়া বসিলাম, আমার কাকা যে রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাহার রোগ বৃদ্ধি হওয়ায়, আমার কাকাকে তাহারা ডাকিতে আসিয়াছিল। "তোমরা আহার করিও, আমার জন্য অপেক্ষা করিও না" এই বলিয়া তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একলা কাপ্তেনের সহিত রহিলাম—লুইসা-বুড়ী পরিবেষণ করিতে লাগিল। কাপ্তেনের বিকৃত মুখের ভাব, মুখে একটি কথা নাই, প্রায় কিছুই আহার করিতেছেন না। আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম; "যে যুবকটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আজ আপনারা সম্পন্ন করিলেন, সেই বেচারীর কথা বুঝি আপনি ভাব্‌চেন?"—"হাঁ,তারই কথা ভাব্‌চি। আত্মীয় স্বজন হতে দূরে, একজন সৈনিক কি না জ্বরে মারা গেল—কি ভয়ানক! আরও না জানি কত লোকের অদৃষ্টে এইরূপ মৃত্যু আছে!" আমি বলিলাম;—"এই যুদ্ধটা শীঘ্রই শেষ হইবে। আমি তখন ভাবি নাই, এই কথাটা গার্ণিয়ের কিরূপ লাগিবে।—তিনি একটু কষ্ট-চাপা হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন; "আপনি যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই—ফ্রান্সের সৈন্য-বল নিঃশেষ হইয়াছে, এবং তাহার চূড়ান্ত অপমানের সময় আসিয়াছে।" কাপ্তেনের মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এই কথা বলিয়া আপনাকে কষ্ট দিলাম—কিন্তু সে অভিপ্রায়ে আমি বলি নাই।"—"তা আমি নিশ্চয় জানি,—আমিই আপনার ক্ষমার পাত্র, আমার বুঝা উচিত ছিল, আপনি ভাল উদ্দেশ্যেই বলিয়াছিলেন।" এই কথাটা এমন মিষ্টভাবে তিনি বলিলেন, যে আমার আত্মার অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইল। আরও তিনি বলিলেন:—"আর কি উপায় আছে, দুর্ভাগ্যদের জন্য একটু মমতা করা উচিত।" আমি একটু চুপ্ করিয়া রহিলাম, পরে তাঁহাকে বলিলাম:—"কাপ্তেন মহাশয়,যদিও আমি আমার দেশকে ভালবাসি, কিন্তু এ বেশ জান্‌বেন, আপনার দেশের উপর আমার কোন বিদ্বেষ নাই; আপনাদের দুর্দ্দশার জন্য আমি সহানুভূতি করি; এবং সহানুভূতি করি বলিয়া আমি নিজেকে একজন খারাপ জর্ম্মান-রমণী বলিয়া মনে করি না। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, ফরাসী ও জর্ম্মাণ এই দুই জাতি সদ্ভাবে একত্র বাস করে; আমার বিশ্বাস, এই দুই জাতি একত্র মিলিলে, অনেক ভাল কাজ করিতে পারে। কিন্তু হায়! এখন সে মিলন কি সম্ভব?" প্রথমে কাপ্তেন কোন উত্তর করিলেন না; কিন্তু তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার চ'খে এমন একটা আগুন জলিয়া উঠিল যে তাহাতে তাঁহার মনোভাব বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া

তাঁহারা চোখের দৃষ্টিতে আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল আবার শান্তভাব ধারণ করিল। আমাকে তিনি বলিলেন, "আপনার হৃদয়ের উচ্চতা ও উদারতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনার হৃদয়ের ভাবগুলিকে আপনার অন্তরে যে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, এবং আপনার সম্বন্ধে আমি কি ভাবি, না ভাবি, সে বিষয়ে যে আপনি উদাসীন নন, ইহাতেই প্রমাণ হয় আমার উপর আপনার একটু শ্রদ্ধা আছে; আর এই শ্রদ্ধা আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। আপনি এরূপও হয়তো মনে করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের উপর যে দেশের বিষম বিদ্বেষ, সেই দেশে থাকিয়া ফ্রান্স সম্বন্ধে একটা সহানুভূতির কথা বলিলে, আমার বড়ই মিষ্ট লাগিবে;—সে ভুল করিবেন না। কিন্তু আপনার প্রতি আমার হৃদয় যে কৃতজ্ঞতা পোষণ করিয়া রাখিবে, তাহা কস্মিন্‌কালেও অপনীত হইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, এবং "শুভরাত্রি" সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা যখন একলা হইলাম, লুইসা বলিল, "যুবকটি বেশ তেজস্বী; কিন্তু জাতিতে ফরাসী এই আক্ষেপ!" আমি বলিলাম:—"তুইও এইরকম মনে করিস, ফ্রান্সে তেজস্বী লোক থাক্‌তে পারে না?" সে বলিল:—"না না, আমি তা বল্‌ছিনে।" আমি বলিলাম!—"তবে ও কথা বলবার মানে কি?"—"মানে কিছুই না।" আর একটি বাক্যব্যয় না করিয়া লুইসা, আহারের পাত্রাদি, টেবিল হইতে উঠাইতে লাগিল।

১৬ই ডিসেম্বর

প্রাণের সখি বেত্তিনা, আমার সম্বন্ধে কি ভাব্‌চ বল দেখি? যাই ভাবনা কেন, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি তোমার কাছে কিছুই লুকোবো না। তুমি কি আমার পরম বন্ধু নও, আর বরাবর তুমি আমার কাছে তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কি খুলে দেখাও নি? তাঁর সেই বিশুদ্ধ ও সরল হৃদয়ে এমন কোন কথা নাই যা তিনি গর্ব্বের সহিত সকলের কাছে প্রকাশ করতে না পারেন, কিন্তু আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর…যাই হোক, আমার কোন দোষ নাই, নিজেকে আমার তিরস্কার করবার কিছুই নাই। এক সপ্তাহ হতে আমার মন বড়ই বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয়ে রয়েছে। কখন কখন আমার মনে হয়, তাঁকে দেখ্‌তে পেলে তাঁর কথা শুন্‌তে পেলে আমি বড়ই সুখী হই; আর যখন তিনি না থাকেন, মনে হয় কখন তিনি আসবেন। দেখবার জন্য যেন অধীর হইয়া উঠি। তবু আমার হৃদয়ের ভাব তখনও স্পষ্ট বুঝতে পারিনি—হৃদয়টাকে তলিয়ে দেখতেও সাহস করিনি। কিন্তু কাল থেকে, আমার আর কোন সন্দেহ নাই।

আমার কাকা কখন কখন আমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর বন্ধু অধ্যাপক হাইডেন মাউয়ারের ভাইপো জ্যাকব স্মিথ্‌কে যদি আমি বিবাহ করি তা হলে তিনি খুসী হন। জ্যাকব একজন তেজস্বী ও সুবাধ্য যুবক। যদিও তার উপর আমার ভালবাসা পড়েনি, তবু মনে হয় যদি সে কোন্‌দিন আমার পাণিগ্রহণের জন্য

আমার কাছে প্রার্থনা করে, আমি তার প্রতি বিমুখ না হয়ে তার প্রার্থনা গ্রাহ্য করি। কাল অপরাহ্ণে আমাদের পুস্তকাগারের কতকগুলি বই সাজিয়ে রাখছিলুম, এমন সময় কাকা সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে বল্লেন,—"অধ্যাপক, তাঁর ভাইপো স্মিথের কাছ থেকে একটা সংবাদ পেয়েছেন।" ঐ নাম শুনিবামাত্র আমার মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হল। যাই হোক, আমার মনকে কোন প্রকারে দমন করে, কাকাকে বল্লুম ;—"ভরসা করি স্মিথ ভাল আছেন?"—"হাঁ ভাল আছে, আর তার পত্রে তোর কথা উল্লেখ করেছে"। —"কাকা, আমার কথা?"—"হাঁ, তোর কথা—আর খুব ভালবাসার সহিত উল্লেখ করেছে। শীঘ্রই সে এখানে আসবে; কেন না, সেই এক গুঁয়ে পারিসের লোকেরা আর কতদিন পেরে উঠবে। দশ ১৫ দিনের ব্যাপার, তার পরেই সে ফিরে আসবে; তখন আমার পুরাতন বন্ধু হাইদেন, মাউয়ার আমার কাছে একটা প্রস্তাব করবেন, সেই বিষয়ে তোর সঙ্গে আমার পরামর্শ করতে হবে; আর আমি নিশ্চয় জানি, সে প্রস্তাবটা তোর খারাপ লাগবে না।"—"কিন্তু,কাকা..." —"থাক্ থাক্ আজ সে বিষয়ে তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করচিনে, কিন্তু তুই ত জানিস্ জ্যাকব স্মিথ বেশ তেজস্বী, সচ্চরিত্র, কোমলহৃদয়, কাজকর্ম্ম করতে খুব ভালবাসে; সেদিন ডিমেল্ আমাকে বল্‌ছিলেন, আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্মিথ একজন ভাল বাস্তুশিল্পী হয়ে উঠবে; তবেই দেখ্ তার ভবিষ্যৎটা বেশ আশাজনক, সে যে মেয়েকে বিবাহ করবে সে নিশ্চয়ই সুখী হবে। তুই খুব সুবোধ মেয়ে, আমি যখন সে কথা তোর কাছে পাড়ব, তখন তুই যা উত্তর দিবি তা আমি বেশ জানি। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া কাকা বৈঠকখানা-ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষণেকের জন্য আমি হত-চৈতন্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। গভীর নিস্তব্ধ নৈশ-অন্ধকারে যেন আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল।

তারপর যখন চৈতন্য হইল, গভীর বিষাদে আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, যেন আমার সুখসৌভাগ্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। জ্যাকব স্মিথের মূর্ত্তি আমার মনে ক্রমাগত উদয় হইয়া যেন একটা আতঙ্ক সঞ্চার করিল। তখন আমি বুঝিলাম, আমি আর একজনকে ভালবাসিয়াছি। কে সে আর-এক-জন তা তুমি বুঝতেই পারচ। হাঁ, আমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তাঁকে ভালবাসিয়াছি। কিন্তু কখনই তাঁর কাছে আমার ভালবাসা জানাতে পারব না, কখনই তাঁর পাণিগ্রহণের আশা করতে পারব না। অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া গেল। কি মর্ম্মভেদী সেই অশ্রুজল। প্রাণের সখি বেত্তিনা, সেরূপ চোখের জল তোর যেন কখন ফেল্‌তে না হয়। ভগবান তাহতে তোকে রক্ষা করুন।

সেই শোচনীয় দিনের অবশিষ্ট সময়,—যাতে আমার মনের কথা কাকা না টের পান, লুইসা-বুড়ি না টের পায়, তিনি না টের পান, তার জন্য কত করে' আপনাকে সাম্‌লে চল্‌তে হয়েছিল। হায়! তাঁকে আজ

বড্ডটা ভাল মনে হল, ভালবাসার যোগ্যপাত্র বলে মনে হল, এমন আর কোন দিন হয়নি। কি মিষ্টি মিষ্টি কথাই আজ তাঁর মুখে শুনলুম—এমন ত কখন শুনিনি।—কখন কখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে, তাঁর চাহনীতে মনে হচ্ছিল যেন…হায়! তা কি কখন সম্ভব? আমার এ কি বাতুলতা! আঃ! বেতিনা! বেতিনা! আমি অত্যন্ত কৃপাপাত্র হয়ে পড়েছি। সখি, তুমি আমাকে ভালবেসো; তোমার ভালবাসাই আমার এখন একমাত্র সান্ত্বনা। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃঋণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগ্যচক্র।

প্রকাণ্ড একতালা বাড়ী—কোথাও একটি জানালা নাই,—উপরে কাঁচের সার্শি-ঘেরা আলোক-পথ—এইটিই, ছিল "জিমনেজ্ মরো-ভাঁর" ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের পার্শ্বে এক-ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার আস্তাবল—তথায় দিবারাত্রি ঘোড়ার পায়ের শব্দ হইতেছে—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। মধ্যে মধ্যে বায়ুর সহিত একটা উৎকট দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসে। ঘরটা পূর্ব্বে এক ফোটোগ্রাফার ভাড়া লইয়াছিল, এখন "জিমনেজ মরোভাঁর" অধ্যক্ষগণের হাতে পড়িয়া ইহা এক অপূর্ব্ব শিক্ষা-নিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তেজ, শীতের রাত্রে হিমের উৎপাত কোনটা হইতেই পরিত্রাণ ছিল না! ছাত্রের দলকে এই দুইটা অসুবিধাই ভোগ করিতে হইত, উপায়ান্তর ছিল না!

এই ঘরে কুড়িখানি খাটিয়া, কিন্তু দশটিতে বিছানার সারি পড়িয়াছে। দ্বারের নিকট একখণ্ড জীর্ণ কার্পেট বিছানো! মরোভাঁ ভাবিত, ইহার অধিক ব্যবস্থা ঠিক হইবে না,—ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই কর্ত্তব্য!

কিন্তু এতখানি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বালকগণের সহ্য হইত না—স্যাঁতসেঁতে ঘরে পোকা-মাকড়েরও প্রাচুর্য্য ছিল—এবং হিম ও রৌদ্রের নিরবচ্ছিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। বাত, কাশী, জ্বর ত লাগিয়াই ছিল—তাহার উপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সুনিদ্রারও ব্যাঘাত হইত! হায়, অসহায় শিশুজীবনের সরল অনাড়ম্বরতা!

প্রথম রাত্রে জ্যাকের চক্ষে ঘুম আসিল না। বাড়ীতে তাহার সেই শীতাতপিত সু-উষ্ণ আলোকোজ্জ্বল সজ্জিত ছোট ঘর! তাহার তুলনায়, এ ত এক অন্ধকারময় ভীষণ গহ্বর!

বালকের দল শয়ন করিলে এক কাফ্রী বালক আসিয়া কক্ষের আলোক লইয়া গেল। সকলে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু জ্যাকের চক্ষে নিদ্রা আসিল না!

তুষারাবৃত কাচের মধ্য দিয়া যেটুকু ক্ষীণ আলোক আসিতেছিল, তাহারই সাহায্যে জ্যাক দেখিল, পাশাপাশি খাটিয়াতে কতক গুলা যেন কম্বলের পুঁটুলি পড়িয়া রহিয়াছে!

তাহার মধ্য হইতে নিশ্বাস ও নাসিকার ধ্বনি এবং কাশির শব্দে জীবনের এক করুণ কাহিনী অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

জ্যাকের শীত লাগিতেছিল—এই অনভ্যস্ত জীবনের প্রবেশ-দ্বারে সে এক বিচিত্র কৌতূহল লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিনের ঘটনাগুলা তাহার স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। মরোভার সাদা টাই, হারজের প্রকাণ্ড চশমা এবং মলিন জামা, সর্ব্বোপরি 'শক্রের' গর্ব্বিত বিদৃষ্টি—জ্যাকের প্রাণ ত্রাসিত হইয়া উঠিতেছিল! মার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। মা এখন কি করিতেছে? দূরের ঘড়িতে এগারোটা বাজিল! মা তবে এখন নিশ্চয় থিয়েটারে, না হয়, বলে! এখনই ফিরিয়া আসিবে—গলায় ফারের বেষ্টনী, মাথার টুপিতে লেসের ঝালর উড়িতেছে!

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া মা জ্যাকের বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ডাকিত, "জ্যাক, ঘুমিয়েছ ত!" কি মিষ্ট মধুর, সে স্বর! নিদ্রাতেও জ্যাক মার উপস্থিতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিত! মার স্পর্শে তাহার দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত—এবং স্বপ্নজাগরণে মার মহিমাময়ী সুন্দরমূর্ত্তি তাহার চক্ষুর অগোচর রহিত না। যেন একটা দীপ্ত উজ্জ্বলা, যেন বালসূর্য্যের একটা স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবী নামিয়া আসিয়াছেন! কিন্তু এখন?

দিনের বেলা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবর্গের অতিরিক্ত মনোযোগ ও অভ্যর্থনায় বাড়ীর অভাবটা জ্যাককে তত কাতর করিতে পারে নাই। তাহার উপর নূতন সহচরগণের সহিত খেলা-ধূলায় সময়টুকু বেশই কাটিয়া গিয়াছিল!

একটা কথা জ্যাকের মনে পড়িল। রাজপুত্র কোথায়? দাহমির রাজপুত্র? ছুটিতে কি সে বাড়ী গিয়াছে? রাজপুত্রের সহিত একবার সাক্ষাৎ হইলে জ্যাক তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবেই—বন্ধুত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আপনাকে সে ধরা দিবেই। বিছানায় শুইয়া জ্যাক কেবলই ভাবিতেছিল, কোথায় রাজপুত্র!

সহসা রুদ্ধ বাটির অপর কক্ষ হইতে তখন বাদ্যের ঝঙ্কার উঠিতেছিল,—লাবাস্যাদ্র অর্গিণ বাজাইতেছিল—পার্শ্বে অশ্বের ক্ষুরোত্থিত শব্দে ঘরের দেওয়াল অবধি কাঁপিয়া উঠিতেছিল—জ্যাক শুইয়া তাহাই শুনিতেছিল—ক্রমে চারিধার নিস্তব্ধ হইয়া আসিল।

এমন সময় সেই কাফরি বালক লণ্ঠন-হস্তে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। জ্যাক মাথা তুলিয়া দেখিতেই, কাফরি বালক কহিল,—"একি ঘুমোও নি, তুমি?"

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যাক বলিল, "ঘুম আসছে না!"

বিজ্ঞের মত সুর করিয়া কাফরি বালক কহিল, "নিশ্বাস ফেললে অনেকটা দুঃখ কমে বটে! গরীব লোক যদি এই নিশ্বাসটুকু না ফেলতে পারত, তা হলে দুঃখে কবে তাদের বুক ফেটে যেত!"

লণ্ঠন রাখিয়া কাফরি বালক জ্যাকের শয্যার পার্শ্বে একটা কম্বল বিছাইল—বসিয়া কহিল, "উঃ, বাহিরে কি ভয়ঙ্কর বরফ পড়ছে!"

জ্যাক কহিল, "তুমি কি এখানে শোবে? শুধু কম্বলের উপর? চাদর নেই?"

কাফরি বালক উত্তর দিল, "না—আমি, কালো মানুষ, চাদরের দরকার কি?"

কথাটা বলিয়া কাফরি বালক মৃদু হাসিল। পরে বুকের মধ্য হইতে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত একটি ছোট কৌটা বাহির করিয়া সসম্ভ্রমে সেটিতে চুম্বন করিয়া শুইয়া পড়িল।

জ্যাক কহিল, "বাঃ—মেডেলটা ত ভারি মজার দেখতে!"

কাফরি বালক কহিল, "এ ত মেডেল নয়—আমার গ্রিগ্রি।"

"গ্রিগ্রি"র অর্থ জ্যাকের ঠিক বোধগম্য হইল না। সে ভাবিল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিবার জন্য এটি বুঝি কোন মন্ত্রঃপূত মাদুলি!

মাদুলিটি স্বদেশত্যাগ করিবার সময় পিসী কারিকা বালকের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে! পিসী কারিকা—যাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড সে থাকিতে পারিত না—যে কারিকা মাতৃহীন কাফরি বালককে একান্ত স্নেহে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিল—এবং আবার একদিন বিদ্যা শিখিয়া যে কারিকার কাছে সে ফিরিয়া যাইবে!

জ্যাক কহিল, "আমিও মার কাছে যাব।"

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে নিস্তব্ধ হইল—উভয়েই কারিকার কথা ভাবিতেছিল! কি স্নেহশীলা এই নারীটি—তিনি এখন কোথায়, কি করিতেছেন? প্রবাসী বালকের কুশল মাগিতেছেন!

জ্যাক বলিল, "তোমার বাড়ী বুঝি বেশ ভাল দেশে? সে কতদূর এখান থেকে? সে দেশের নাম কি?"

কাফরি বালক উত্তর দিল, "দাহমি!"

জ্যাক বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, সাগ্রহে কহিল, "ও-তাহলে—তাহলে তুমি নিশ্চয় তাকে জান! তা'র সঙ্গেই ফ্রান্সে তুমি বুঝি এসেছ?"

"কার সঙ্গে?"

"রাজা—দাহমির রাজপুত্রের সঙ্গে!"

"আমিই ত সে" বলিয়া কাফরি বালক আবার হাসিল।

জ্যাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! রাজা! রাজপুত্র! যাহাকে সে সারাদিন নানা ফরমাস খাটিতে দেখিয়াছে, ঝাঁটা লইয়া যে চারিধার পরিষ্কার করিয়াছে, টেবিলে আহার্য্য পরিবেষন করিয়াছে, প্লেট গ্লাস সাফ্ করিয়াছে, সেই ভৃত্য—এই কাল কাফরি বালক—দাহমির রাজপুত্র! আশ্চর্য্য! কিন্তু কথাটায় তামাসাও ত নাই! বালকের চোখে মুখে কেমন কোমল একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে বুঝি কোন্ সুদূর দেশের সুন্দর অতীতের সুখের দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল!

জ্যাক বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সে কি রকম?"

কাফরি বালক বলিল, "এই রকম!" বলিয়াই সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া আলোটা নিভাইয়া দিল—কহিল, "সারারাত আলো জ্বললে কাল মার খেতে হবে আবার।" তারপর নিজের বিছানা জ্যাকের বিছানার নিকট টানিয়া বলিল, "তুমি ঘুমোবে

না? দাদামির কথা মনে পড়লে আমার ত ঘুম পায় না—আজ আর ঘুম আসবে না! দাদামির গল্প শুনবে, তুমি?"

"শুনব!"

সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সুনিবিড় অন্ধকারে কাফরি বালক তাহার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল—উৎসাহে তাহার চোখ হইতে যেন একটা আনন্দের দীপ্তি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শ্রোতার প্রাণও আগ্রহে পূর্ণ হইয়াছিল!

বালকের নাম মাদু। বিখ্যাত যোদ্ধা রাক-মাদু গেজোর সে একমাত্র পুত্র!

রাক-মাদু-গেজোর বীরত্বের কথায় চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। সুবৃহৎ অসংখ্য কামান, অগণ্য বীরসৈন্য, তীর-ধনুকাদি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, সুশিক্ষিত রণহস্তী, বাদ্যকর, পুরোহিত, নর্ত্তকী, দুই শত স্ত্রী—রাক-মাদুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের চূড়ান্ত পরিচায়ক! উচ্চ প্রাসাদ—শাণিত বর্ষায় সুরক্ষিত, বিচিত্র শঙ্খরত্নে খচিত, অসংখ্য নরকপালে সজ্জিত। এই প্রাসাদে মাদুর জন্ম হয়—সূর্য্যের কিরণে তখন চারিধার ঝলমল করিতেছিল—প্রাসাদ-চূড়ায় পতাকাশ্রেণী অধীর পবনে মৃদুমন্দ দুলিতেছিল। শৈশবেই মাদুর মা তাহাকে ছাড়িয়া গেল পিসী কারিকা ছোট মাদুকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল! মাদু যেন মাকে আবার ফিরিয়া পাইল। কারিকার হৃদয়ে যেমন স্নেহ, বাহুতে তেমনই শক্তি! হস্ত-পদে তবলকীর মালা আঁটিয়া মুক্তকেশী কারিকা মস্তকে হরিণের শৃঙ্গরচিত মুকুট লাগাইয়া যখন রণক্ষেত্রে নামিত, তখন বলবান শত্রুর হৃদয়েও ত্রাসের সঞ্চার হইত। সেই কারিকার আদরে লালিত মাদু যখন একটু বড় হইল, তখন তাহার বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দেশে সে সুবিধা নাই—কাজেই বিদেশে আসিতে হইল।

দেশে সে কি সুখেই দিন কাটিত! বনে কারিকার সহিত মাদু শিকারে বাহির হইত—সে কি নিবিড় জঙ্গল—গাছের পাতায় কোথাও ফাঁক নাই, কোথাও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না—উপরে আগাগোড়া কে যেন পত্র রচিত সুবিস্তৃত চাঁদোয়া খাটাইয়া রাখিয়াছে—কথা কহিলে প্রতিধ্বনি গম্ভীর স্বরে রণিত হইয়া উঠে। ফলফুলেরও অন্ত নাই—বর্ণ-গন্ধের কি বিচিত্র লীলা! কোথাও পায়ের কাছ দিয়া নিরীহ সাপ সরিয়া যাইতেছে, কখনও কাহাকে আঘাত করে না! পাখীর দল নানা-ছন্দে গান গাহিতেছে, বানরগুলা এগাছ-ওগাছ লাফাইয়া বেড়াইতেছে, ফুলগাছের ধারে ভ্রমরের দল ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কোথাও বা সুদীর্ঘ পুষ্করিণী—আকাশের এতটুকু ছায়া তাহার বক্ষে প্রতিফলিত হয় না, যেন বনদেবীর সুবৃহৎ দর্পণের মত পড়িয়া রহিয়াছে,—ঘন সবুজ রঙের একটা প্রকাণ্ড কাচখণ্ড।"

জ্যাক বলিল, "বাঃ, বেশ ত!"

"হ্যাঁ, সুন্দর!"

তারপর মাদু শৈশবের কথা বলিতে লাগিল—অতিরঞ্জনের ফলে কাহিনীটি পরীর দেশের কাহিনীর মতই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল—গল্প বলিতে বলিতে মাদু অতীতের দিনগুলি এক নূতন চক্ষে দেখিতে-ছিল—অতসী কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে

হয়, অতীতের দুঃখটুকু তেমনই বিচিত্র মধুর হইয়া উঠিয়াছিল!

দল বাঁধিয়া সকলে শিকারে বাহির হইত। বনের মধ্যে আপনাদিগের চারিধারে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই মধ্যে বসিয়া দুর্দ্দান্ত পশুর হস্ত হইতে সকলে আত্মরক্ষা করিত। কি সুখ, সে কি আনন্দ! তাই মাহুকে এ সব ছাড়িয়া যেদিন ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বনফিলের স্কুলে আনা হইল, তাহার প্রাণটা সেদিন হাহাকার করিয়া উঠিল! কোথায় সে স্বাধীনতার অপূর্ব্ব আনন্দ, কোথায়ই বা সরল সঙ্গীবর্গের সে আন্তরিক উল্লাস-চীৎকার!

এখানে বাঁধা নিয়মে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়াশুনা করিতে হয়! এক সঙ্গে বসিয়া পরিমিত আহার, ভ্রমণ, খেলা—দুই দিনেই অসহ্য হইয়া উঠিল! শেষে মাহু একদিন সকলের অজ্ঞাতে স্কুল ছাড়িয়া পলায়ন করিল!

কিন্তু বেচারার ভাগ্য অপ্রসন্ন—তাই সে ধরা পড়িল! এবার কড়া পাহারা বসিল। সে নিত্য সেই বই খুলিয়া বি, এ—বে, বি আই—বাই করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, পড়ার চেয়ে মৃত্যুও বুঝি ভাল! মাহু নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই আকাশ কি তাহার দেশেও এমনটি! পাখী উড়িয়া যাইতেছে, দেখিয়া মাহু ভাবিত পাখীটি হয়ত, দাহমিতে চলিয়াছে, সে যদি মাহু না হইয়া পাখী হইত ত, কঠিন দেয়ালের আড়ালে বসিয়া এমন ভাবে দুঃখে মরিতে হইত না—কবে সে পিসী কারিকার কাছে উড়িয়া যাইত!

একদিন সকলে মিলিয়া সমুদ্রের তীরে জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। জাহাজে উঠিয়া মাহুর মনে হইতেছিল, একদিন এই সুবৃহৎ জলের পাখীটা পিঠে বসাইয়া তাহাকে এখানে বহিয়া আনিয়াছে—আজ আবার ফিরাইয়া লইয়া যাইবে না! সকলের চোখ এড়াইয়া সে জাহাজের খোলে বসিয়া রহিল। তারপর জাহাজ যখন বহুদূর ভাসিয়া চলিয়াছে, তখন ক্ষুধায় কাতর মাহু আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না! জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কারের লোভে মাহুকে আনিয়া বনফিলের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল! বনফিল তখন আপনার নিকট রাখা সুবিধার নহে ভাবিয়া মাহুকে জিমনেজ মরোভাঁর ভর্ত্তি করিয়া দিল।

তখন প্রথম-প্রথম এখানে সে কি আদর, কি অভ্যর্থনা! জ্যাকের আদর অভ্যর্থনার চেয়েও অনেক বেশী! রাজপুত্র আসিয়াছে! চারিধারে একটা ধূম পড়িয়া গেল! মরোভার সহিত এক টেবিলে বসিয়া মাহু আহার করিত, অপর বালকের দল ঈর্ষার সহিত চাহিয়া দেখিত! মরোভাঁ প্রায়ই বলিত, "মাহু যখন রাজা হবে, তখন স্কুলটা দাহমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাব, সরকারী বৃত্তিতে কোন দুঃখকষ্ট থাকবে না—মনের মত করে লেখাপড়া শিখিয়ে দাহমিকে শিক্ষিত করে তুলব।"

হার্জ চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রতিভা খেলাইতে পারিবে! নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া পরখের ত এখানে সুবিধা নাই—ঔষধ খাইয়া কেহ যদি মরিয়া যায় ত পুলিশের টানাটানিতে প্রাণ যাইবার উপক্রম! মাহুর রাজ্যে সে নিত্য নূতন ঔষধের পরীক্ষা চালাইবে, পুলিশ তখন কিছু করিতে পারিবে না!

লাবাস্যাদ্‌ব্‌ দাহমির বর্ব্বর সঙ্গীতশাস্ত্র সমুন্নত করিবে। সকলেই ভবিষ্যতের আশায় মাত্রকে আদর করিত, সম্মান করিত। সকলেই আশা করিয়া বসিয়া ছিল, মাত্র একবার রাজা হইলে হয়—চক্ষের পলকে দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে, এখন যেমন তাহাদিগের প্রতিভার আলোক লোকের অন্যায় দ্বেষের ভস্মে প্রচ্ছন্ন আছে, তখন অনুকূল পবনে সে ভস্মের রাশি উড়াইয়া ছড়াইয়া কি তীব্র তেজে প্রতিভার অনল জ্বলিয়া উঠিবে। এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল, আশান্থিরা দাহমি অধিকার করিয়াছে, মাত্রর পিতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, পিসী কারিকা নিরুদ্দিষ্টা—শুধু লোক-মুখে পিসী একটা সংবাদ পাঠাইয়াছিল, মাত্র যেন মাতুলিটি সযত্নে রক্ষা করে, তাহারই সাহায্যে নষ্ট রাজ্য আবার ফিরিয়া পাইবে, দৈবজ্ঞের দল এ কথাটা বিশেষ করিয়াই বলিয়া দিয়াছে!

এ সংবাদের পর মাত্রর আদর একটু কমিলেও তেমন কিছু অসুবিধা হইল না—কিন্তু যখন এক বৎসর দুই বৎসর,—কেহ মাত্রর হইয়া অর্থ দিল না, তখন স্কুলের ভৃত্যটিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল—ভৃত্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ করা রীতিমত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল—এবং ভৃত্যের স্থান অধিকার করিল, রাজপুত্র মাত্র! মাত্রকে একেবারে বিদায় দেওয়া হইল না—কারণ "রাজপুত্র এখানে পড়িতেছে" বলিয়া তাহা হইলে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না ত!

"ভোরে উঠিয়া মাত্র বাজারে যায়।"

মাত্র এ অপমানে সায় দিল না। নানা ভাবে সে বুঝাইতে লাগিল, যে এতটা হীনতা সে সহ্য করিবে না!—কিন্তু বেতের ঘায় নিত্য জর্জ্জরিত হইয়া একদিন সে দাসত্বে নামিয়া পড়িল! কোথায় রহিল, তখন অত আদর, অত যত্ন!

এখন ভোরে উঠিয়া মাত্র বাজার করিতে

যায়, ঘর পরিষ্কার করে, অর্থাৎ ভৃত্যের ও পাচকের কাজ তাহার দ্বারাই সারিয়া লওয়া হয়।

হায় কারিকা—পিসী কারিকা—কোথায়, তুমি? তোমার কত সাধের, কত আদরের মাহু—আজ ভৃত্য হইয়া দিন কাটাইতেছে! একবার যদি সে রাজ্য ফিরাইয়া পায় ত, মনের মত কিছু আক্রোশ—কিন্তু না, খুব মিষ্টকথায় আদর-অভ্যর্থনার সহিত জিমনাজের দলকে সে দাহমিতে লইয়া যায়! তার পর এই মরোভাঁ হারজের দলকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া সর্পের গ্রাসে নিক্ষেপ করে!

দারুণ অপমানে থাকিয়া থাকিয়া মাহুর বুকখানা যেন জ্বলিয়া উঠে! এই আগুনে মরোভাঁর দলকে যদি সে পুড়াইয়া মারিতে পারে, তবেই মনের ঝাল মিটে, চূড়ান্ত প্রতিশোধ লওয়া হয়. ভগবান কি সে দিন দিবেন না?

মাহুর চোখ দুইটা বাঘের মত জ্বলিতেছিল!

জ্যাকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! মাহুর কাহিনী শুনিয়া তাহার দুঃখ হইতেছিল—আহা, রাজপুত্র মাহু—আজ সামান্য চাকরের মত সে খাটিয়া সারা হইতেছে!

মাহু কহিল, "তোমার মা বেশ বড় লোক, না? অনেক টাকা আছে, তাঁর?" জ্যাক কহিল, "হ্যাঁ!"

মাহু কহিল, "তাই এরা তোমাকে এত আদর করছে! টাকা না থাকলে এরা বড় অত্যাচার করে। দেখছ ত, আমাকে!"

জ্যাক কিছু বলিল না। তখন দুই নূতন বন্ধুতে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। স্বপ্নের ঘোরে জ্যাকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন সে মাহুকে লইয়া মার কাছে ফিরিয়া গিয়াছে, মাহুকেও মা কত আদর করিতেছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পরেও আণবিক জীবন।

এতদিন জানিতাম মরিলেই সব ফুরাইল, জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হইল। আজ বিজ্ঞানগর্ব্বিত বিংশ শতাব্দী আমাদের সে চিরাগত বিশ্বাস বিজ্ঞানের কুঠারাঘাতে নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছে। এতদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও বলিতেন যে, যে মুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবের মৃত্যু। সেই মুহূর্ত্ত হইতে জীবদেহের কার্য্যকরী শক্তির বিলোপ হইয়া ঐ দেহ পঞ্চভূতে মিশিতে আরম্ভ হয়। এখন শুনিতেছি আর এক অদ্ভুত কথা। হৃৎপিণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া গেল, ধমনীতে শোণিত প্রবাহ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল, আমি মরিলাম—কিন্তু আমার সূক্ষ্ম শরীরটা নাকি তখনো মরে নাই। দেহ নাকি বলিতেছে "আমায় পচিতে দিও না, বাহ্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে আমায় রক্ষা কর, উপযুক্ত খাদ্য দাও—আমি মরিব না; মরিব না!" এ আবার কি? তবে কি যখন ডাক্তার জবাব দিয়া গেল, দাহ করিবার জন্য লোক ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল, দুই একজন হয়ত উচ্চৈঃস্বরে কেহ বা নীরবে কাঁদিতে লাগিল—তখন আমার শরীরটা অসাড় হইয়া পড়িয়া মজা দেখিতে থাকে? মার্কিণের দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপক, ক্যারেল্ ও বরোজ, অনেক পরীক্ষার পর নাকি এইরূপই সাব্যস্ত করিয়াছেন।

তাঁহারা দুইপ্রকার জীবনের কথা বলেন। প্রথম,

বাহ্য সাধারণ ক্রিয়াশীল জীবন, যাহার বলে দেহীর কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে যাহা লইয়া বাহ্য জগৎ চলিতেছে। দ্বিতীয়, এক প্রচ্ছন্ন জীবন (latent life) সকল দেহতন্তুর ও মাংসপেশীরই ঐ দুই জীবন আছে। প্রথমটির দরুণ তন্তু সকল সমগ্র দেহের অংশীভূত হইয়া কার্য্য করে, এবং দ্বিতীয়, প্রচ্ছন্ন জীবনের দরুণ ঐ তন্তু সকল নিজ সত্তা বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং স্বস্থানে বর্দ্ধিত হয়। এই প্রচ্ছন্ন জীবনই এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, আমরা নাড়ি স্থির হইলেই মরিতাম। এখন জানিলাম যে বাহ্য জীবন শেষ হইলেও দেহতন্তুর এই প্রচ্ছন্ন জীবন অনেকক্ষণ থাকে।

বায়ুর সহিত সর্ব্বদা অনেক প্রকার জীবাণু (Bacteria) ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাদের অবয়ব এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা বহু শতগুণ বর্দ্ধিতায়তন হইলে তবে উহারা দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের আকৃতিও যেমন বিভিন্ন, ক্রিয়াও তেমনি বিভিন্ন। বায়ুতে যে কতপ্রকার জীবাণু আছে তাহা আজিও নিঃশেষে নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইহাদের সকলেরই বংশবৃদ্ধি প্রায় এক প্রণালীতে হইয়া থাকে। উপযুক্ত খাদ্যের মধ্যে একটী জীবাণু ছাড়িয়া দিলে অতি অল্প সময় মধ্যে উহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। পরে উহার গোল শরীর ধীরে ধীরে দুই সমান ভাবে বিভক্ত হইয়া দুইটি ক্ষুদ্র জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ঐ দুইটি হইতে উক্ত প্রণালী মতে অতি শীঘ্রই দুই দুইটি করিয়া অসংখ্য জীবাণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধির জন্য অতি অল্প সময়ই লাগে। এক একটি জীবাণু বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। দুই সহস্র বৎসরের ঈজিপ্ট দেশীয় এক "মামী"র মধ্যে সেই সময়ের জীবাণু জীবিতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য খাদ্যাভাবে উহারা মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট থাকে কিন্তু এক বিন্দু উপযুক্ত রস পাইলে তাহাতেই ভীষণবেগে বর্দ্ধিত হয়। একটি সূচিকার অগ্রভাগে যতটুকু জলবিন্দু দুলিতে পারে সেইটুকুতে অনুবীক্ষণ যোগে ৯৮ কোটি পর্য্যন্ত জীবাণুর অবস্থিতি দেখা গিয়াছে।

এই জীবাণু স্থূলতঃ দুই দলে বিভক্ত। এক শ্রেণীর জীবাণু রোগোৎপাদক—যথা বিসূচিকা, মসূরিকা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু। মানব অথবা যে কোন প্রাণীর দেহেই উহাদের ক্রিয়া সবিশেষ লক্ষিত হয়। প্রাণহীন জীবদেহ বা উদ্ভিদে উহাদের কোনরূপ বিশেষ আধিপত্য নাই। প্রায় সমস্ত ব্যাধিই এই জীবাণুর দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ সংক্রামক রোগ। ঐ জীবাণু প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং সেই রক্ত প্রবাহের দ্বারা হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহে উপস্থিত হইয়া উহাদের বিকৃতি সম্পাদন করে, দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দেহের রক্তই উহাদের খাদ্য, কিন্তু দুই এক জাতীয় জীবাণু আছে তাহারা পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যেই বর্দ্ধিত হয় ও অনিষ্ট করে। বিসূচিকা এই জাতির রোগ। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবে বায়ু দূষিত হয় না—উহার বীজ উদরে না প্রবেশ করিলে রোগ হইবার আশঙ্কা নাই। বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু বায়ু দূষিত করে—নিঃশ্বাসের সহিত শরীরের মধ্যে গিয়া রক্তের সহিত মিশে, ধমনীর মধ্যে, হৃৎপিণ্ডে ও তাবৎ রক্তাধারের মধ্যে উহাদের ভীষণ বংশবৃদ্ধি হইয়া ত্বরায় সমস্ত রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে। জীবাণু শরীরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রোগ প্রকাশিত হয় না; উহাদের অনিষ্টকারিতা কতকটা নিবারণ করিবার জন্য আমাদের প্রকৃতিগত একটা স্বতঃ চেষ্টা হইয়া থাকে। যাহাতে জীবাণুবংশ বাড়িতে না পারে, রক্ত প্রথমতঃ সেই চেষ্টাই করে। অবশেষে যখন রক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখনই ঐ রোগ জন্মায়। অনেকে দূষিত বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও বেশ সুস্থ থাকেন ইহার কারণ তাঁহাদের "রক্তের জোর" বেশি—জীবাণুর বৃদ্ধি সহজে হইতে দেয় না। জীবাণুর দেহে প্রবেশকাল হইতে উহা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া এবং সম্যক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রোগের প্রকাশ পাইতে সাধারণতঃ যে সময় লাগে তাহাকে Period of incubation বলে। ঐ সময়ের মধ্যে যদি উপযুক্ত নিদানজ্ঞ চিকিৎসক জীবাণুর আক্রমণ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে রোগ নিবারক (Prophylactic) ঔষধাদির সাহায্যে উহার

বংশবৃদ্ধি নিবারণে রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ চিকিৎসক বিরল। এই শ্রেণীর জীবাণুকে রোগোৎপাদক (pathogenic) কহে।

অপর শ্রেণীর জীবাণু দেহের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। উহারা রোগোৎপাদক নহে—কেবল পচন-প্রবর্ত্তক (ferment) মাত্র। দুগ্ধ মাংসাদি প্রাণিজ এবং উদ্ভিদ রস ইত্যাদি পচনশীল বস্তুতে উহারা সমধিক পুষ্ট হইয়া ঐ সকল দ্রব্য পচাইয়া ফেলে। শর্করা স্বভাবত মাদক নহে, কিন্তু yeast নামক একপ্রকার জীবাণু দ্বারা উহা হইতে সুরা উৎপন্ন হয়। ঐ জীবাণু শর্করা খায় এবং উদর মধ্যে ঐ শর্করাকে দুইটি বিভিন্ন বস্তুতে বিশ্লিষ্ট করে। একটি অঙ্গারায় অনিল (Corbon dionide gas) ও অপরটি সুরাসার (alcohol)। এই বিশ্লেষণই ঐ জীবাণুর জীবনী ক্রিয়া। উহারা এই রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারাই জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। সচরাচর তালের রসে (তাড়ি) ঐ জীবাণু প্রচুর জন্মে; ময়দা বা সুজীতে শ্বেতসার (starch) নামক এক যৌগিক পদার্থ আছে, উহা শর্করা জাতীয় দ্রব্য এবং উহাও ঐ জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐ দুই দ্রব্যে বিশ্লিষ্ট হয়। পাঁউরুটিতে তাড়ি মিশাইবার কারণ এই যে তাপ সাহায্যে ঐ অঙ্গারায় সমধিক বর্দ্ধিতায়তন হইয়া রুটি ফাঁপাইয়া তোলে। সঙ্গে সঙ্গে সুরাসারও ঐ রুটিতে থাকে কিন্তু বাসি হইলে অথবা শুষ্ক পাত্রে ভাজা হইলে ঐ সুরাসার বাষ্পীভূত হইয়া যায়। টাটকা পাঁউরুটি না ভাজিয়া খাওয়া উচিত নহে। উহাতে ঐ জীবাণুর দেহাবশেষ থাকে—হয়ত অনেক জীবাণু বাঁচিয়াও থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই কারণ ঐ জীবাণু মানব শরীরে কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। শর্করার এই রূপান্তরকে Alcoholic Fermentation বা সুরা-পচন বলা যাইতে পারে।

ঐরূপে অপর এক জাতীয় জীবাণু দুগ্ধ আশ্রয় করিয়া থাকে। দুগ্ধকে ল্যাকটিক্ অম্লে পরিণত করে বলিয়া ঐ ক্রিয়ার নাম Lactic Fefmentation দুগ্ধনাশী পচন ক্রিয়া। সিরকাও এইরূপ পচন ক্রিয়ার ফল। উহাকে Acetic Fermentation কহে। সকলের জীবাণু বিভিন্ন। প্রায় সমস্ত প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থই কোন না কোন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পচিয়া যায়। উপযুক্ত খাদ্য ও তাপ আবশ্যক। বেশী উত্তাপে জীবাণু মরিয়া যায় সুতরাং পচনও নিবারিত হয়। প্রবল শৈত্যেও জীবাণু বিনষ্ট হয়। সাধারণতঃ বরফ ও ফুটন্ত জলের উত্তাপে প্রায় সমস্ত জীবাণুর ধ্বংস হইয়া থাকে।

যদি কোন সহজ পচনীয় বস্তু এরূপভাবে রাখা যায় যে উহাতে কখনও কোনরূপ জীবাণু প্রবেশলাভ না করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বস্তু বহুদিন অবিকৃত থাকিতে পারে। যথেষ্ট উত্তপ্ত করিয়া প্রথমে ঐ বস্তুর জীবাণু নষ্ট করিয়া পরে জীবাণুনাশকারী কোন তরল বা অনিল পদার্থে রাখা হয়। লবণ ও সর্ষপতৈল উৎকৃষ্ট জীবাণুনাশক। "নোনা মাছ" তেলের আচার প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। আইওডোফর্ম, কর্পূর, ইত্যাদি কঠিন,—কার্ব্বলিক এসিড, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি তরল—আর গন্ধকাম্ল, ক্লোরীন প্রভৃতি অনিলও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ু নিষ্কাসন যন্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে বায়ু বাহির করিয়া ফেলিলে বায়ুহীন রুদ্ধপাত্রে আর জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে গাঢ়দুগ্ধ মৎস্যাদি ও ফল প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বহুদূর হইতে বহুদিন ধরিয়া আনীত ও রক্ষিত হয়।

এক্ষণে আমাদের অধ্যাপক বসু কিরূপ অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন বুঝা যাইবে। সদ্যোমৃত জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অংশ কাটিয়া লইয়া তাহা কোন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন তরল পদার্থে ডুবাইয়া রাখিয়া তাঁহারা কিছুদিন কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না; পরে দেখা গেল যে ঐ অংশগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে! প্রাণীর দেহে সূক্ষ্মকোষ (cell) গুলি যেমন ক্রম বিভক্ত হইয়া একটি হইতে বহুসংখ্যক নূতন সূক্ষ্ম কোষের সৃষ্টি করে ও সেই সেই প্রত্যঙ্গ যেমন বাড়িতে থাকে, উপযুক্ত আধারে, উপযুক্ত উত্তাপে যথোপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্যের মধ্যে রাখিয়া বহিঃস্থ জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলে

ঠিক সেইরূপ ভাবে পুরাতন দেহতন্তু হইতে নূতন তন্তু উৎপন্ন হয়। জীবন্ত অবস্থায় রক্ত প্রভৃতি জীবনী রসের সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে যেরূপ নূতন সূক্ষ্মকোষের সৃষ্টি হয়, মৃত দেহের কোন অংশ মৃত্যুর অনতিবিলম্বে যদি উপযুক্ত কৃত্রিম রসে স্থাপিত করা যায় তাহা হইলে ঐ অংশের প্রচ্ছন্ন জীবনের নিদর্শনও অক্ষুণ্ণ থাকে। এতদিন ধরিয়া উক্ত অধ্যাপকেরা কেবল উপযুক্ত পোষক রসের (Plasma) আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। এক্ষণে নাকি তাঁহারা এক প্রকার তরল পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার এরূপ গুণ পাওয়া গিয়াছে। জীবন্ত দেহে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্দ্ধিত হয়, এ তরল পদার্থের মধ্যেও ঐ তন্তুগুলি অবিকল সেইরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ফুস্‌ফুসের তন্তু হইতে ফুস্‌ফুসেরই তন্তু সৃষ্ট হয়, যকৃৎ হইতে যকৃতের তন্তু, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ হইতে সেই জাতির তন্তুই সৃষ্ট হয় ও ঐ ক্ষুদ্র অংশটিকে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এমন কি যদি কিছুকাল পরে ঐ অংশটিকে জীবন্ত দেহের যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা শীঘ্র ঐ দেহে যুক্ত হইয়া আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। ফলে ঐ অংশ যে, অপর একটা দেহের—তাহার কোন চিহ্নই থাকে না।

মনে কর কোন যুবার যক্ষ্মা রোগে ফুস্‌ফুসের একটা স্থান পচিতে আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তারের ঘরে সেইরূপ ফুস্‌ফুসের অংশ পূর্ব্ব হইতেই "জীওয়ান" আছে। যন্ত্র দ্বারা পুরাতন পচা ফুস্‌ফুস্ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে এ ফুস্‌ফুস্ বসাইয়া দেওয়া হইল, রোগী শীঘ্রই সারিয়া উঠিল। এইরূপ দেহাংশ 'জীয়াইয়া' রাখিবার উপায় সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এইরূপে আমাদের জরাজীর্ণ মরণোন্মুখ যন্ত্রাদি কাটিয়া বাদ দিয়া তাহার স্থানে নূতন তেজীয়ান্ বর্দ্ধনশীল যন্ত্র বসাইলেই দেহ আবার নূতন উপাদানে গঠিত হইল—বার্দ্ধক্য দূরে অপসৃত হইল। অমরত্ব হস্তগত করতলগত! কিন্তু উপাদান কিরূপে সংগ্রহ হইবে? কোন এক জাতির জীবের সদ্য মরণ আবশ্যক। মানবের জন্য স্তন্যপায়ী জীবের আবশ্যক—পক্ষী বা সরীসৃপ হইলে চলিবে না। ছাগ, মেষ, বানর প্রভৃতি কোন একটা জীবের দেহাংশ আবশ্যক, এবং তাহাদের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে ঐ অংশ লইয়া রাখা উচিত। উত্তাপ সমভাবে থাকা চাই। প্রাসাদ ঢের! শক্তির পূজায় বলিদান আবশ্যক!

শুনা যায়, অনেকে মৃত্যুর পর হঠাৎ বাঁচিয়া উঠে। এ জীবন প্রচ্ছন্ন জীবন নহে। সমগ্র দেহটার বাস্তবিক মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু যে সকল যোগাযোগে দেহ ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয় সেই ঘটনা এখনও ঘটে নাই এইরূপ অবস্থাই এই প্রচ্ছন্ন জীবনের অর্থ। মৃত্যু হইলে তাহার কিছুক্ষণ পরে আণবিক মৃত্যু—অর্থাৎ দেহতন্তুর মৃত্যু (Molecular death) ঘটে। প্রথমটিকে বাহ্যমৃত্যু বলা যায়—অপরটিকে আভ্যন্তরিক মৃত্যু—বাস্তব ধ্বংস বলা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সেই আভ্যন্তরিক মৃত্যু নিবারণ হইতে পারে ইহা তাহারই সূচনা।

অধ্যাপক Carrel ও Burrows চিকিৎসাজগতে যোগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। শ, ভ।

প্রাচীন নগর ভারহাট।

এলাহাবাদ হইতে বহু দূরে অবস্থিত হইলেও ভারহাট এক সময় কৌশাম্বীর চক্রবর্ত্তীরাজগণের রাজ্য ছিল। প্রয়াগ ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমুদায় প্রদেশ তাঁহারাই শাসন করিতেন। উদয়ন, অশোক, শ্রীহর্ষ ও জয়চন্দ্র প্রভৃতি উক্ত কৌশাম্বী-চক্রবর্ত্তীরাজগণকে ভারহাটের রাজা কর দান করিতেন। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর অভিমুখে যে রেলওয়ে লাইন গিয়াছে তাহার একটি ষ্টেসনের নাম উচ্‌হারা, সেখান হইতে

ভারহাট ছয় মাইল; এলাহাবাদ হইতে একশত কুড়ি মাইল। ভারহাট নাগোর রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার প্রাচীন নাম বরদাবতী।

এক সময় ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে ইহা একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। হিউয়েন্‌সাঙ শ্রমণরাজে বিস্তার এক সহস্র মাইল বলিয়াছেন। ভা হাটের স্থানে স্থানে, বিস্তর শিলালিপি, তাম্র ও মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে কতকগু
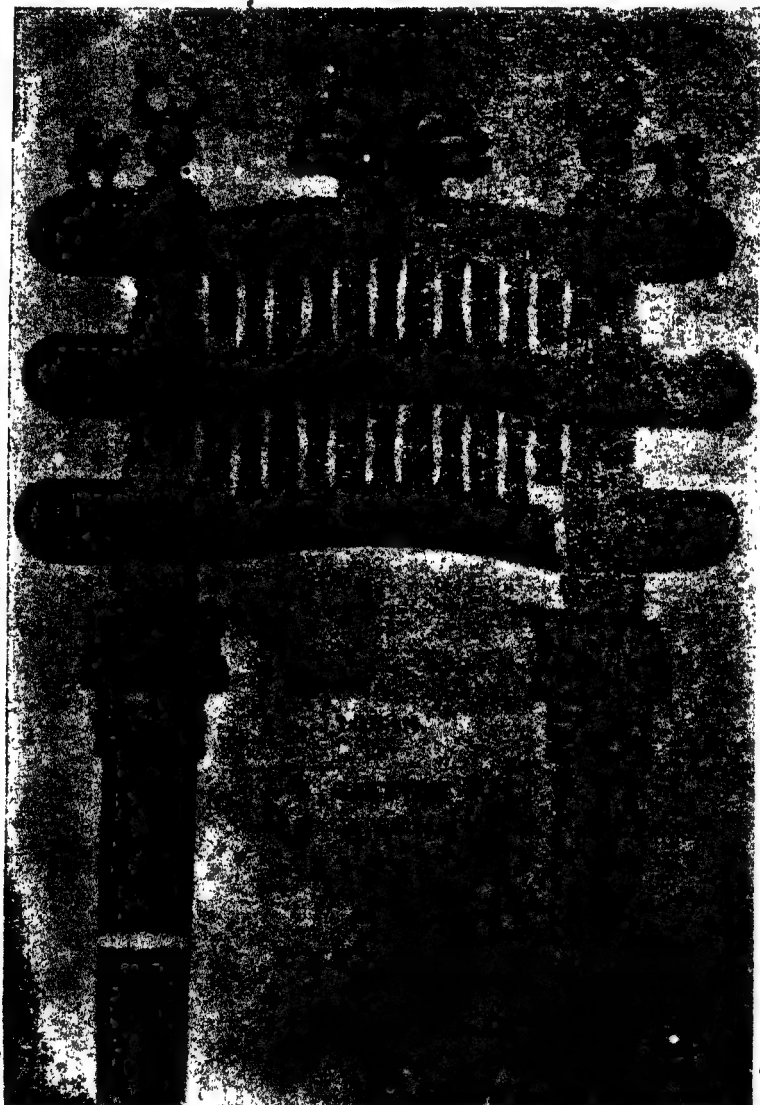
প্রায় দেড় সহস্র বৎসরের পুরাতন। কতকগুলিকে, ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়; অতএব স্থানটি যে অতি পুরাতন সে সম্বন্ধে কোন ভুল নাই।

অশোকের সময় একটা রাজপথ উজ্জয়নী ভিল্‌সা, রূপনাথ, ভাঁরহাট, ও কৌশাম্বী পর্য্যন্ত ছিল। প্রয়াগ হইতে একটি শাখা শ্রাবস্তি, ও

একটি শাখা পাটলীপুত্র অবধি বিস্তৃত এবং এই প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ পথগুলি রক্ষার জন্য যথেষ্ট সুবন্দোবস্তও ছিল। এই পথের উপর কত বড় বড় নগর, উপনগর ও বাজার প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহার মধ্যে রূপনাথ, কৌশাম্বী, ও ভিল্‌সার নিকটবর্ত্তী সাঁচি নামক স্থানের মাহাত্ম্য অনেক দিন হইতে বুধমণ্ডলী

ভারহাট স্তূপে দেবমূর্ত্তি।

অবগত আছেন। কিন্তু ভারহাটের অস্তিত্ব মাত্র বহুকাল পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। অল্প দিন মাত্র উহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ভারহাটের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া একরূপ অসম্ভব। আশি বৎসর পূর্ব্বাবধিও ইহার ধ্বংসাবশেষ লোক চক্ষুর অগোচরে,—একটি সুনিবিড়

জঙ্গলের মধ্যে, লুক্কায়িত ছিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র প্রাণিগণ তখন এই স্থানে মনের আনন্দে বিচরণ করিত। নাগোর রাজার অধিকারভুক্ত হইবার পর তখন সকলে জানিতে পারিল যে এই জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন মন্দির আছে, যাহা হইতে হাজার হাজার ইমারতাদি প্রস্তুত করিবার জন্য

ভারহাট স্তূপে যক্ষ-যক্ষিণী।

ইট্, পাথর ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পাওয়া যাইতে পারে; তখন সকলে উহা লুট করিতে আরম্ভ করিল। যে যত পারিল গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণাদি লুটিয়া আনিল। প্রাচীন ভারহাট স্তূপ ও বিহারের ইষ্টকাদির দ্বারা দুই তিন শত ইমারত প্রস্তুত হইয়াছিল।

এইরূপ লুট সত্ত্বেও ভারহাট স্তূপে, এখনো অনেক

সুবৃহৎ, সুন্দর খোদিত মূর্ত্তি ও অন্যান্য দৃশ্যাবলী বিরাজমান আছে। অনেকগুলি সুদীর্ঘ চত্বর, প্রাচীর, ইঁদারার নিকট স্নান করিবার সুদৃশ্য প্রস্তর বেদিকা, এমন কি রজকগণের বস্ত্রাদি কাচিবার জন্য ব্যবহৃত সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডাদির প্রচুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

ভারহাট স্তূপে প্রাপ্ত চিত্রাঙ্কিত ধ্বজা।
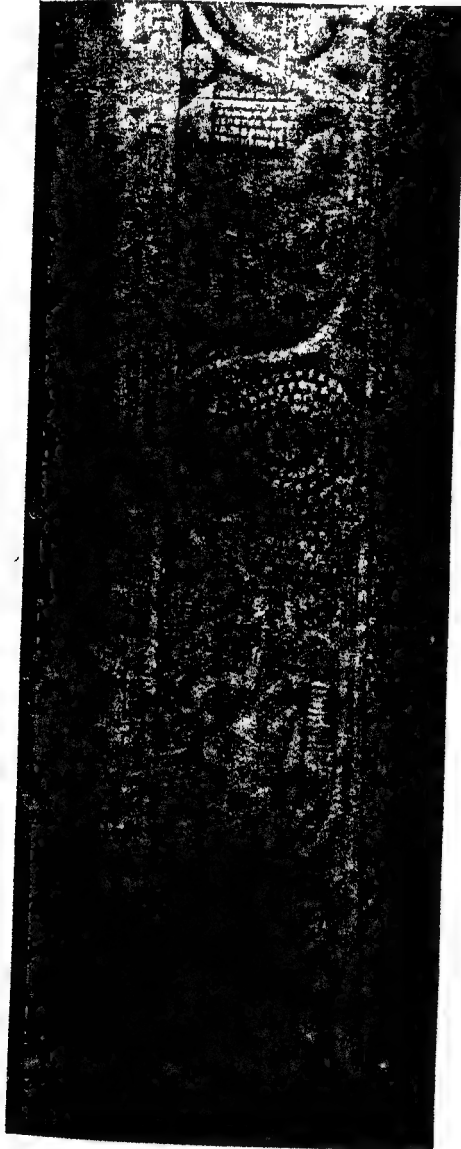
কিছু কালের জন্য ভারহাট গ্রাম একটী ব্রাহ্মণকে জায়গীর দেওয়া হয়, তখন হইতে লুটপাট বন্ধ হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কনিংহাম নাগোর রাজ্য দিয়া গমন কালে পথে প্রাচীন ভারহাটের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়া, সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। হায়! এই বিশাল গরিমাময় স্থানের একি দুর্দ্দশা! তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

পরীক্ষার পর তিনি জানিতে পারিলেন, যে সেখানে একটী পুরাতন স্তূপ ও বিহার ছিল। দুই তিনবার তিনি এই স্তূপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ খনন করাইয়াছিলেন। খননের পর অনেক মূর্ত্তি অনেক উৎকীর্ণ শিলাখণ্ড, স্তম্ভ ও তোরণাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান। পালি ভাষায় খোদিত, কত শত শিলালিপি; অনেক গৃহাদি, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, দিক্‌দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ জ্যোতিষিক যন্ত্র; পশু, পক্ষী, ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ, গহনা তৈজসপত্রাদির শত শত প্রতিরূপ, এবং গৌতম বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধেও বহু দৃশ্য খোদিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল দেখিলে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নিয়মাদির একটা সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

খননের পর সিদ্ধান্ত হইল, যে ইহার ব্যাস ৬৮ ফুট, ও পরিধি ২১৩ ফুট। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান কার্য্য সকল মূর্ত্তিরূপে তোরণে ও স্তম্ভ সকলের উপর খোদিত আছে। খননের পর অনেক যক্ষ, যক্ষিনী দেবতা, নাগরাজ ও মায়াদেবীর বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কনিংহাম সাহেব এই সকল দ্রব্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, উহা এখন যাদুঘরের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি হইতে কনিংহাম সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ভারহাটের স্তূপ ন্যূনাধিক ২১৫০ বৎসরের পুরাতন। তিনি এ সম্বন্ধে এক সচিত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় ভারহাটের নিকট শুঙ্গ দেশের রাজধানী শুঙ্গনামক নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল অধুনা যমুনা তীরে একটী ক্ষুদ্র পল্লীরূপে তাহা

অবস্থিত। এখানে অনেক পুরাতন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে। শুঙ্গের রাজা ধনভূতির একখানি লিপি ভারহাট স্তূপের এক তোরণের উপর খোদিত আছে। এই রাজা ২৪০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অতএব ভারহাটের স্তূপ ২১০০ কিম্বা ২২০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ধনভূতি রাজার খোদিত লিপি ভিন্ন ভারহাট স্তূপের ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তরের উপর শত শত বৌদ্ধযাত্রিদের লিপি পালি ভাষায় খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্তূপের যে অংশ যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে নির্ম্মাণ কর্ত্তার নাম আছে। এবং যে সকল ব্যক্তি সেখানে গিয়াছেন, তাহারা সকলেই আপন আপন স্মৃতি রক্ষার জন্য কিছু না কিছু মন্তব্য স্তূপ গাত্রে খোদিত করিয়া আসিয়াছেন।
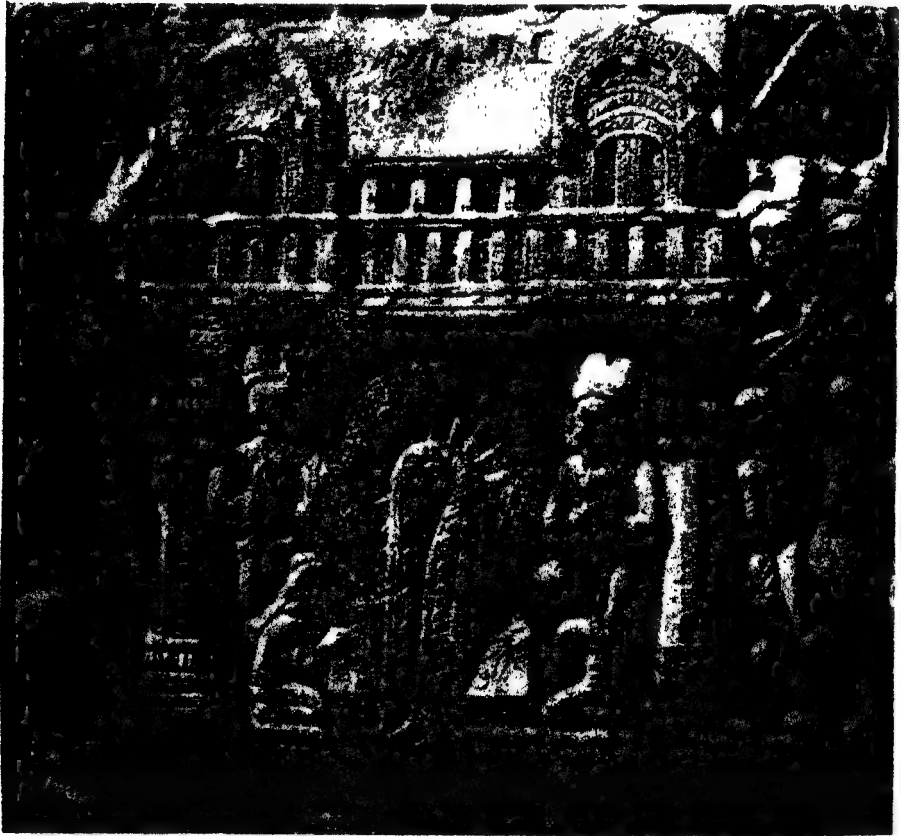
স্তূপগাত্রে খোদিত ধর্ম্মচক্র।

ভারহাটে যে কেবল একটি স্তূপমাত্র ছিল, তাহা নহে,—অনেক বিহারও ছিল। সহরটি সুবিস্তৃত ও বাণিজ্যপ্রধান ছিল। বহু সমুচ্চ অট্টালিকা উহার শোভা সম্পাদন করিত। অনেক ধনী অভিজাতবর্গ এখানে বাস করিতেন। ইহার চতুঃপার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাট্টালিকাসকল এখনো ইহার প্রাচীন বৈভব স্মরণ করাইয়া দেয়। এক সময় ইহা জয় পতাকা বক্ষে লইয়া ভারতে গৌরব জয়ডঙ্কা

বাজাইয়াছে—হায় এখন তাহা শুধু স্বপ্ন। কালের অতীতের স্মৃতিটুকু বক্ষে লইয়া ক্ষুদ্র ভারহাট ঝঞ্ঝাবাতে সমস্তই ছারখার হইয়া গিয়াছে—শুধু দূরে এখনও মরণের মধ্যে কোন-রূপে টি'কিয়া আছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।
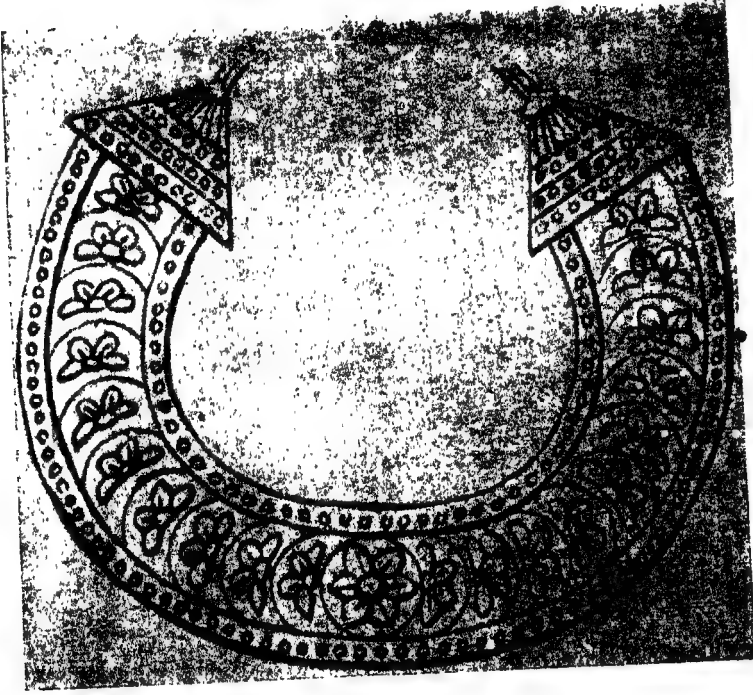
স্তূপ গাত্রে খোদিত প্রাচীন কণ্ঠভূষণ চিত্র।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়

ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুইর লোকান্তর গমন কালে তাঁহার পুত্র জীবিত না থাকায় তাঁহার পৌত্র ষোড়শ লুই নাম ধারণ পূর্ব্বক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি জার্ম্মাণ সম্রাট-দুহিতা মেরি অন্তয়নেতের পাণিগ্রহণ করেন। মেরি অন্তয়নেতের অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া ইংলণ্ড দেশীয় মহানুভব বার্ক ইহাকে "প্রভাতী তারা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (১) কিন্তু দুর্ভাগ্য-

---

(1) "I saw her just above the horizon, decorating and cheering the elevated Sphere She had just begun to move in, glittering like the morning star, full of life and splendor and joy" Burk's Reflections on the french Revolution.

ক্রমে ইনি বিশাল ফরাসী রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া ফরাসী জাতিকে ভিন্ন দেশীয় লোক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তাহাদের রীতি, নীতি, প্রথা পদ্ধতি তাঁহার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অযথা ঘৃণা উৎপাদন করিল। (২) তিনি ফরাসী জাতির নব অঙ্কুরিত জাতীয় জীবনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাদের উন্নতি মার্গের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন। কতিপয় অনুগ্রহভাজন নগণ্য ব্যক্তির অসার যুক্তি গ্রহণে তিনি দুর্ব্বলচিত্ত নৃপতিকে করতলগ্রস্ত করিয়া রাজনৈতিক সর্ব্ববিষয়ে হস্তার্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ষোড়শ লুই যথেচ্ছাচার নীতিপরায়ণ হইলেও প্রজাপুঞ্জের অহিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি প্রবুদ্ধ ফরাসী জাতির স্বায়ত্ত শাসনলালসা পরিতৃপ্ত করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাহাদের দুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে বিমোচন করিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞীর প্ররোচনায় তাঁহার সর্ব্ব যত্নই বিফল হইল; রাজ্ঞীর প্রতি প্রজাবর্গের বিদ্বেষ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল।

ষোড়শ লুই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মরেপা প্রধান মন্ত্রীত্বে এবং টার্গট রাজস্ব সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মরেপা প্রধান মন্ত্রীপদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও, টার্গটের অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা নিবন্ধন রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। টার্গট রাজস্ব সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে আয় অপেক্ষা ৪০০০০০০০ পাউণ্ড পরিমাণে ব্যয় অধিক, সুতরাং অচিরে তৎসম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে রাজার রাজসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাজস্ব বিভাগে ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিলে বহুদর্শী মন্ত্রীগণেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; কিন্তু টার্গট রাজকর প্রপীড়িত প্রজাগণের শিরে পুনর্ব্বার গুরুভার অর্পণ না করিয়া মিতব্যয়িতা অবলম্বনে রাজস্ব বিভাগে শৃঙ্খলতা সংস্থাপন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজস্বসচিব পদে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিলেন না। রাজস্ব সংক্রান্ত কয়েকটি কু-প্রথা নিবারণে প্রয়াসী হইয়া তিনি পার্লিয়ামেণ্ট, ভূস্বামী ও ধর্ম্মযাজকগণের কোপানলে পতিত হইলেন। সুতরাং রাজা তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। (২৭৭৩ খৃঃ এপ্রিল) টার্গটের স্থলে ক্যালনি রাজস্বসচিবপদে নিযুক্ত হইলেন? কিন্তু ক্যালনির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর নেকারের হস্তে রাজস্বসংক্রান্ত সমগ্র ভার অর্পিত হইল।

নেকার টার্গটের ন্যায় উদার নীতিপরায়ণ ছিলেন। রাজনীতি অর্থনীতি ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তত্তুল্য চরিত্রবানপুরুষ সংসারে অতি বিরল। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনে শান্তি ও পবিত্রতা নিরন্তর সমভাবে বিরাজ করিত। ধর্ম্ম বিহীন ফরাসী রাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। বাণিজ্যের সাহায্যে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধন উপার্জ্জন করিয়া ধনী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, দীনহীন দরিদ্রব্যক্তিগণকে মুক্তহস্তে

(2) Encyclopedia Brittannica 9th Edition p. 593.

দান করিয়া তিনি সেই ধনের সদ্ব্যবহার করিতেন। ফরাসী জাতির জাতীয় উন্নতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল; তিনি সেই জাতীয় জীবনের শক্তি বর্দ্ধন কল্পে পারশ্রমিক স্বরূপ কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে রাজস্বসংক্রান্ত দুরূহ কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। (৩)

ঘটনা ক্রমে এই সময়ে আমেরিকাবাসীগণ স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে ফরাসী জাতি আমেরিকাবাসীগণকে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। ফরাসি-গবর্ণমেণ্ট মার্কিন জাতির সাহায্যার্থে সৈন্য অর্থ ও রণতরী প্রেরণ করেন এই ইচ্ছা দেশের সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজস্ব-সচিব মহামতি নেকার দেখিলেন যে, মার্কিন জাতির সাহায্য কল্পে অর্ণব সহায়ে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন; অর্থহীন ফরাসি-রাজ কিপ্রকারে সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রীবর আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ফরাসী জাতি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। ফ্রান্স নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বাধীনতা প্রয়াসী মার্কিন জাতির পরাভব দৃষ্টি করিবে এই চিন্তায় সর্ব্বসম্প্রদায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অচিরে রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভূস্বামীগণের ও সৈনিক বিভাগস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে সেই আন্দোলন ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। অনন্যোপায় হইয়া ষোড়শ লুই জাতীয় ইচ্ছা পূরণকল্পে আমেরিকা সমরে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন।

ভগবদিচ্ছায় ফরাসী জাতির সাহায্যে আমেরিকা জয়লাভ করিল। স্বাধীনতা প্রয়াসী মার্কিন জাতি বীরদর্পে জগতে মহিমাধ্বজা উত্তোলন করিল। সাম্য ও স্বাধীনতার সুখোজ্জ্বল দৃষ্টে সাম্য ও স্বাধীনতা-বাদীগণ ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইল। সুদূর আমেরিকা হইতে ফ্রান্স-বাসীগণ যশোভূষিত শিরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জয় জয় নাদে দিগদিগন্তর নিনাদিত করিল। ফরাসীজাতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু মার্কিনের জয়লাভ আসন্ন ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণে পরিণত হইল। মার্কিনের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইয়া ফরাসিজাতি আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের শক্তি সামর্থ্য, উৎসাহ, উদ্যম চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। মার্কিনের আদর্শে তাহাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত হইল। সুতরাং মার্কিনসমরই ধ্রুব ফরাসিবিপ্লবের অন্যতম কারণ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহা হউক মার্কিন সমরে যোগদান নিবন্ধন, ফরাসি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ঋণ বৃদ্ধি

(3) He refused the whole emoluments of office ; an example of disinterestedness which excited the Jealosy, as it was beyond the power of imitation of the courtiers."

Alisons History of Europe vol 1 p. 262.

হইল। নেকার অনন্যোপায় হইয়া মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিলেন। সুতরাং মহামহোপাধ্যায় বংশসম্ভূত বৃত্তিভোগী মহোদয়গণের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। ধর্ম্মযাজকবৃন্দ ও ভূস্বামীগণ নেফারের ধ্বংসসাধন কল্পে সম্মিলিত হইলেন। মন্ত্রীবর স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কোপানলে পতিত হইয়া পদত্যাগপূর্ব্বক অব্যাহতি লাভ করিলেন (১৭৮৭ খৃঃ)।

নেফার পদত্যাগ করিলে শাসন সংক্রান্ত সর্ব্ব বিষয়ে রাজ্ঞী অবাধে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রণাক্রমে পর্য্যায়ক্রমে ফ্লুরি, অরমেছন, কলন প্রভৃতি নগণ্য ব্যক্তিগণ রাজস্ব সচিবপদে নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব বিভাগে ঘোরতর বিশৃঙ্খল উৎপাদন করিলেন। অরমেছন রাজকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ১৪০০০০০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াও কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইয়া পদত্যাগ করিলেন। অরমেছনের পদত্যাগ-কালে দৃষ্ট হইল যে রাজকোষে মোট ১৪৪০০ পাউণ্ড মাত্র বিরাজ করিতেছে। কলন রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হইয়া অর্থসমাগম অথবা ব্যয় নির্ব্বাহ সংক্রান্ত সর্ব্বচিন্তা পরিহার পূর্ব্বক বিলাসপরায়ণা রাজ্ঞীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। সুতরাং রাজকার্য্যসংক্রান্ত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত অর্থাভাব হইলেও, রাজ্ঞীর বিলাস পরিচর্য্যার নিমিত্ত অর্থাভাব হইল না। এইরূপে আয় অপেক্ষা ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং অত্যল্প কালের মধ্যেই রাজকোষ এককালে নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রীবর রাজকরের সাহায্য গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু রাজকরের সাহায্য গ্রহণও সহজ ব্যাপার নহে। ভূস্বামীগণ ও ধর্ম্মযাজকবৃন্দ সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে মুক্ত কিন্তু রাজকরের গুরুভারে প্রপীড়িত জনসাধারণের শিরে অতিরিক্ত ভারার্পণ সম্ভবপর নহে। আবার পক্ষান্তরে ধর্ম্মযাজকগণের ও ভূস্বামীবৃন্দের শিরে করভার অর্পণ আদৌ অসম্ভব। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া মন্ত্রীবর উচ্চবংশীয়, ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন (১৭৮৭)। সর্ব্বসম্প্রদায়ের শিরে সমভাবে করভার অর্পণের নিমিত্ত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কয়েকটি কুপ্রথা নিবারণ কল্পে এই সভা আহুত হইল। কিন্তু অভিজাতগণ রাজার কোন প্রস্তাবেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। উপায়ান্তর দৃষ্টি না করিয়া কলন পদত্যাগ করিলেন। (৪)

কলন্ পদত্যাগ করিলে, ব্রাইন রাজস্ব সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস অগ্রে প্রধান মন্ত্রীবর পরলোকগত হইলে ভার্জিনিছ্ প্রধান মন্ত্রীত্বে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্ব বিভাগের অভিনব ব্যক্তিগণের সমাগমে, রাজকার্য্য অভিনব প্রকারে পরিচালিত হইতে লাগিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ফরাসি রাজ্যের মহারাণী মেরি অন্তয়নেত্তের বিচিত্র লীলা জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিল। একদিকে অন্নাভাবে ক্ষুৎপীড়িত মানবগণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, অপরদিকে সেই সুন্দরীকুল দর্প-

(4) Encyclopedia Britannica 9th Edition.

হারিণী অষ্ট্রীয়া নন্দিনীর অযথা বিলাসপরিচর্য্যা ফরাসি চিত্তে অপরিসীম ঘৃণা উৎপাদন করিল।

প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব অভিযোগ সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তির প্রতি সমভাবে ঔদাসিন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তয়নেৎ অনন্ত বেশভুষায় অহরহ বরবপুর শোভা সম্পাদন করিতেছেন। ভার্সেলিস্ ও ত্রিয়ানন্ ভবনে অহর্নিশি নৃত্যগীত, সান্ধ্য সম্মিলন, বন্ধু সম্মিলন প্রভৃতি আমোদ উৎসব চলিতেছে। মহামহোপাধ্যায় বংশসম্ভূত নরবৃষগণ রাজভবনের সেই সম্মিলনে সেই আমোদ উৎসবে যোগদান করিতেছেন। কাউন্ট ডি আর্ত্তয় প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ সহ রাজ্ঞী রাজার অবিদ্যমানে গভীর নিশীথে প্রাসাদ শিখরে নিদাঘ সমীর সেবনে চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিতেছেন। প্যারিসবাসীগণ সেই সমস্ত আমোদ উৎসবের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া রাজপরিবারবর্গের অশেষবিধ কুৎসা রটনা এবং পথে ঘাটে প্রতিগৃহে প্রতি স্থানে সহস্র বদনে সহস্র প্রকারে সেই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে বিধির বিড়ম্বনায় রাজ্ঞীর দুর্ভাগ্য বশত ঘটনাক্রমে একটি হীরক হার প্রসঙ্গীয় অদ্ভুত রহস্যে সমগ্র প্যারিস্-নগরী আলোড়িত হইয়া উঠিল। যদিও পরিশেষে পার্লিয়ামেণ্টে বিচার সমিতি হীরক-হার বিষয়ক ঘটনাবলীতে রাজ্ঞীর নির্দ্দোষিতা অবধারণ করিলেন, তথাপি উন্মত্ত ফরাসী জাতি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে হীরকহার প্রসঙ্গীয় ব্যাপারটি লীলাময়ী অন্তয়নেতের অনন্ত-লীলার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। ঘটনাটী এই:—

বোহেমার নামক প্যারিস নগরের সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার বিক্রেতা রাজপরিবারবর্গের যাবতীয় অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি বহু পরিশ্রমে ও অশেষ যত্নে একটি অপূর্ব্ব হীরকহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিক্রয়ার্থে রাজ্ঞীর সমীপে আনয়ন করিলেন। রাজ্ঞী মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "৬৪০০০ পাউণ্ড"। মূল্য শুনিয়া রাজ্ঞী হার ক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বোহেমার হার বিক্রয়ের নিমিত্ত দেশদেশান্তরে গমন করিলেন কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইলেন না। কিয়দ্দিবস পরে মথি নাম্নী সম্ভ্রান্তবংশীয়া কোন মহিলা বোহেমার সন্নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন "রাজ্ঞী অনেক চিন্তার পর আপনার সেই হীরক হারটি ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন; একথা আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।" এই বলিয়া মথি রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত একখানি লিপি বোহেমারের হস্তে অর্পণ করিলেন। পত্রখানি প্রকৃতপক্ষে রাজ্ঞী-কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত অথবা প্রবঞ্চনাময়ী মথির দুরভিসন্ধি প্রসূত তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বোহেমার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। মথি বলিলেন "আপনার সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আমি রাজভবনস্থ জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীকে সত্বরই আপনার নিকট প্রেরণ করিব। তিনিই ক্রয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।" কিয়ৎকাল পরেই কার্ডিনাল রোহান্ নামক রাজ্ঞীর দাতব্য বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী মথি সমভিব্যাহারে বোহেমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক ৫৬০০০ পাউণ্ড মূল্য অবধারণে রাজ্ঞীর নামে সেই হার ক্রয় করিলেন। কর্ম্মচারী প্রবরের নির্দ্দেশ

ক্রমে বিক্রীত হারটি মথির হস্তে প্রদত্ত হইল। মথি বোহেমারের হস্তে রাজ্ঞীর নামাঙ্কিত লিপি প্রদান পূর্ব্বক হার লইয়া প্রস্থান করিলেন। মূল্য সম্বন্ধে এইরূপ কথা স্থির হইল যে, বোহেমার সমগ্র মূল্য এককালে প্রাপ্ত হইবেন না, আংশিকরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজ্ঞী ঋণ পরিশোধ করিবেন। মূল্যের প্রথমাংশ প্রদানের নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হইলে বোহেমার রাজ্ঞীর কোষাধ্যক্ষ সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কোষাধ্যক্ষ মূল্য প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। বোহেমার বিক্রীত হারের বিনিময়ে অঙ্গীকৃত মুদ্রা প্রাপ্ত না হইয়া রাজ ভবনস্থ জনৈক মহিলার নিকট অভিযোগ করিলেন। রাজা তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোহানকে ভৎসনা করায়,—রোহান্ উত্তর করিলেন, "মথি আমাকে যে পত্র দেখাইয়াছিলেন তাহা আমি রাজ্ঞী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সেইজন্য আমি হার ক্রয় কালে উপস্থিত ছিলাম।" রাজা বিরক্তি সহকারে বলিলেন "আপনি রাজভবনের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী, ফরাসিরাজ্ঞী কি প্রকারে নাম স্বাক্ষর করেন তাহা অল্প আয়াসেই অবগত হইতে পারিতেন"। ইহার কিয়ৎকাল পরেই রোহান্ এবং মথি ধৃত হইয়া বিচারার্থে প্যারিস পার্লিয়ামেণ্টে প্রেরিত হইলেন।

হীরকহার প্রসঙ্গীয় অদ্ভূত ব্যাপারে সমগ্র ফরাসিভূমি আলোড়িত হইয়া উঠিল। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্যারিসের আবাল বৃদ্ধ, বনিতা বিচার কালের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর বিচারকালে এক অদ্ভূত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। হীরকহার ক্রয়ের অব্যবহিত পরে মথি রোহান্‌কে বলেন "হীরক হার ক্রয় প্রসঙ্গে আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য রাজ্ঞী আপনাকে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত ছদ্মবেশে রজনীযোগে আপনার সহিত ত্রিযানন্ উদ্যানে সাক্ষাৎ করিবেন।" রজনীযোগে নিভৃতে রাজ্ঞী দর্শন লাভ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া রোহান্ মহানন্দে ত্রিযানন্ উদ্যানে গমন করেন; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে মেরি অন্তয়নেৎ সদৃশী অপূর্ব্বরূপলাবণ্যসম্পন্না মহিলা ছদ্মবেশে তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। মহিলা বচনসুধা বর্ষণে রোহানের কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে একটি গোলাপ কুসুম দান করিলেন। রোহান্ ক্ষণকালের নিমিত্ত স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া অপার আনন্দ উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সেই ছদ্মবেশধারিণী, কুঞ্জবিহারিণী, মধুরভাষিণী রমণী কে? ইনি কি সেই অনিন্দ্যরূপিণী অষ্ট্রীয়ানন্দিনী, ফরাসী মহারাণী মেরি অন্তয়নেৎ? ইনি কি যথার্থই হীরকহার ক্রয় করিয়া রোহানকে গুপ্তভাবে ধন্যবাদ প্রদানের নিমিত্ত ছদ্মবেশে নিশাকালে নিভৃতে ত্রিযানন উদ্যানে আগমন করিয়াছিলেন? রোহানের তৎকালে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইনিই সেই জার্ম্মাণনন্দিনী ফরাসী রাজ্ঞী। জনসাধারণের ধ্রুব বিশ্বাস যে তিনিই সেই মহারাণী অন্তনয়েৎ। যাহা হউক পার্লিয়ামেণ্টে বিচারসমিতি প্রমাণের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সেই ত্রিযানন্ উদ্যানবিহারিণী মহিলা মহারাণী অন্তয়নেৎ

নহেন; ইনি কুলধর্ম্মত্যাগিনী প্যারিস নগরের জনৈক মহিলা। মথি স্বীয় দুরভিসন্ধিক্রমে রোহানের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ইঁহাকে ত্রিষানন উদ্যানে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পালিয়ামেণ্ট রোহানকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন এবং মথির স্কন্ধ উত্তপ্ত লৌহ শলাকায় চিহ্নিত করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত করিলেন। কিন্তু প্যারিস নগরের জনসাধারণ পালিয়ামেণ্ট মহাসমিতির বিচার দৃষ্টে পরিতৃপ্ত হইল না। তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে মহারাণী মেরি অন্তয়নেৎই সর্ব্ব অনর্থের মূলীভূত কারণ। দুর্দ্দমনীয় লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি স্বীয় বিলাস পরিচর্য্যার নিমিত্ত রোহান্ ও মথি উভয়ের সাহায্যে হীরক হার ক্রয় করেন; তিনিই নিশাযোগে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক নিকৃষ্টা রমণীর ন্যায় ত্রিষানন উদ্যানে নিভৃতে মধুর বচনে রোহানকে আপ্যায়িত করেন, পরিশেষে বোহেমার মূল্য প্রার্থী হইলে, তিনিই শঠতা-পূর্ব্বক ক্রয়সংক্রান্ত সর্ব্ববৃত্তান্ত অস্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্তু প্যারিসের উন্মত্ত ইতর সাধারণ বিচারশক্তি বিবর্জ্জিত। (ক্রমশ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মৈমনসিংহে সাহিত্য সম্মিলন। এবারে নববর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে মৈমনসিংহে সাহিত্য সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। —বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া এ গৌরবের পদ যে যোগ্য পাত্রেই ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। বিজ্ঞান আলোচনা যে সাহিত্যক্ষেত্রের বহির্ভূত বিষয় নয় তাহা তিনি কবির ন্যায় সুন্দর ভাষায় এবং বিজ্ঞানাচার্য্যের ন্যায় প্রাঞ্জল সুযুক্তির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন "সাহিত্য সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাঙ্গলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায়" বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীর ভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে।" * * * "আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কারমাত্র নহে,—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। "সেই জন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের সকলকেই এই সাহিত্যসম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে। এই কারণে—যদিও জীবনের অধিকাংশকাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি তথাপি সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য লাভের সহিত সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে?

"কবি বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপদেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাবে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব

সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমানবাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে দিনরাত কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।" "বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি, অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।" বিজ্ঞানাচার্য্য সাহিত্যের যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আকাশের ন্যায় দিগন্তপ্রসারিত; তাহাতে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিচারে বাস করিয়া পৃথিবীকে সুন্দর উজ্জল ও অনন্তের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। এখানে ভেদ বুদ্ধির ক্ষুদ্র গণ্ডী ক্ষুদ্র সীমানা নিস্ফল। আমাদের দেশের সাহিত্য—আকাশের ন্যায় অবারিত প্রসারিত অনন্ত হউক এবং তাহারি চন্দ্রাতপ তলে দেশের সত্য সাধকগণ ধ্যাননিরতচিত্তে দেশ-মাতার অর্ঘ্য সম্ভার রচনা করিতে থাকুন,—সাহিত্য সম্মিলনী আমাদের একতার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া জাতীয় জীবনকে বৎসরে বৎসরে আরো উন্নতিশীল এবং উদার করুন ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

আবর বিদ্রোহ। আসামের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তে যে সকল অসভ্যজাতি বাস করে, আবর তাহাদের অন্যতম। ইহারা অত্যন্ত কলহপ্রিয় এবং সহজেই উত্তেজিত হইলে নরহত্যা করে। অনেকদিন হইতেই তাহাদের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বল্পাধিক সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আসাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সীমান্ত প্রদেশের পাদিয়া নামক স্থানে রাজনৈতিক কর্ম্মচারী কর্ণেল নোয়েল উইলিয়াম-সন সদলবলে তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। প্রথমে এ সংবাদ কেহই বিশ্বাস যোগ্য মনে করেন নাই; কিন্তু এখন এমন সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে অবিশ্বাস করিবার আর পথ নাই। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহাদিগকে দমনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ঐ বৎসর আবর ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে আসিয়া অত্যাচার করাতে তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয় তাহার ফলে কয়েক বৎসর আর কোন উপদ্রব ছিল না। ১৮৫০ সালে যখন সিপাহী বিপ্লব শান্ত করিতে রাজপুরুষগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন সেই সময় আবার ইহারা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ডিব্রুগড়ের তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী সেন গাজন গ্রামের যাবতীয় অধিবাসীদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছিল—তাহাদিগের শাসনের জন্য এবারে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল তাহারা শাসন করা দূরে থাক্ নিজেরাই নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া ডিব্রুগড়ে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। গবর্ণমেণ্ট তখন কামান ইত্যাদি সঙ্গে বহুসৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। বীর আবরগণ অসমসাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিয়া পরিশেষে লোকবল অভাবে পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবরগণ পুনরায় ব্রিটিশ অধিকারে উৎপাত করে; তখন রাজপুরুষগণ চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে শাসনাধীন করিবার চেষ্টায় সীমান্ত প্রদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। অনেকগুলি গিরিদুর্গ নির্ম্মিত হইলে আবরগণ কিছুদিনের জন্য শান্তভাব ধারণ করিল, এবং বলিল ইংরাজ যদি তাহাদিগকে নিয়মমত প্রতি বৎসর লবণ, অহিফেণ তাম্রকূট প্রভৃতি যোগাইতে পারেন তবে তাহারা আর কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। ভারত গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

আবরগণ বাহিরে শান্তভাব ধারণ করিল বটে কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া রাখিল,—তাই ইহার প্রায় দশ বার বৎসর পরে যখন একদল রাজপুরুষ আসামের সীমান্ত প্রদেশ জরীপ করিতে গেলেন এবং এই সূত্রে যখন তাহাদিগকে আবরবসতিতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইতে হইল তখন তাহারা ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিল, কাজেই রাজপুরুষগণ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৮৪—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

আবরগণ নানাভাবে নানা উপায়ে বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল—সেই সময় শ্রীযুক্ত নীডহাম সাহেব রাজনৈতিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। তাহাদিগের বাসস্থানের সন্নিকটে ইংরাজরাজের বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপন বিষয়ে তাহারা বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল—নীডহাম তাহাদিগকে সশস্ত্র ইংরাজ অধিকারে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার অন্যায় উপদ্রব করিয়া ব্রিটিশ সুশাসনে বাধা জন্মাইতে লাগিল। আসাম চীফ কমিশনারের চেষ্টায় যদিও তাহারা কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল তবুও শীঘ্রই যে উৎপাত আরম্ভ করিবে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

প্রথমে তাহারা অতি সামান্য দুইএকটি উপলক্ষ্য ধরিয়া ব্রিটিশ অধিকারে প্রবেশ পূর্ব্বক শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল, পরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একদল সশস্ত্র পুলিশ সিপাহীকে আক্রমণ করিল। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে অনেক সিপাহী নিহত হইল,—তখন রীতিমত সৈন্যদল প্রেরিত হইল। আবরগণ সাধ্যমত ব্রিটিশ বাহিনীর প্রতিকূলতা করিতে লাগিল; নীডহাম সাহেব তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর পূর্ব্বক চারিদিকের আবর গ্রামগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন—ক্রমে নিবিড় অরণ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। আসিয়া দেখিলেন তাঁহার অধিকৃত গ্রাম সকল পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছে। তখন তিনি

আবরগণ

নিষ্ঠুরভাবে চারিদিকে গ্রাম ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কঠিনরূপে শাসিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত তাহারা আর কোনরূপ উপদ্রব অত্যাচার করে নাই। ডাক্তার গ্রেগারসন এবং উইলিয়ামসনের শোচনীয় পরিণাম অত্যন্ত মর্ম্মবিদারক। উইলিয়ামসন, সহকারী রাজনৈতিক কর্ম্মচারী এবং পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ছিলেন। তিনি কি জন্য আবরদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার যথার্থ কারণ এখনও জানা যায় নাই। তিনি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন, সম্ভবতঃ মৃগয়ার জন্যই বন্ধুবর ডাঃ গ্রেগারসনকে সঙ্গে করিয়া আবর দেশে গিয়াছিলেন। পরন্তু উইলিয়ামসন অনেকগুলি কুলী সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি অজ্ঞাতদেশ আবিষ্কার চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা যে সকল গ্রামে যান সেখানে গ্রামবাসিগণ সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ২৮ শে মার্চ্চ তারিখেও তাঁহারা পাসিমিয়ং প্রদেশে ছিলেন, ৩০শে তারিখে সকলে আহারাদির পর আবরদিগের ভেলায় নদী পার হইলেন—নদী সঙ্কীর্ণ হইলেও অত্যন্ত গভীর

এবং স্রোতও ভয়ানক প্রখর। বেলা দশটার সময় উইলিয়ামসন রিউগ্রামে উপস্থিত হইলে আবরগণ তাঁহার অবস্থানের জন্য কুটীর ঠিক করিয়া দিয়াছিল,—তাহারি সম্মুখে তাম্বু ফেলিয়া তাঁহারা বাসের বন্দোবস্ত করেন। এইখানে রিউগ্রামের মণ্ডল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে এবং তাহারি সঙ্কেত আহ্বানে প্রায় এক সহস্র শস্ত্রধারী আবর চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার দলের অনেক লোককে হত্যা করে। কেন যে তাহারা এরূপ করিল সে রহস্য এখনও কেহ ভেদ করিতে পারে নাই।

আবরদিগের বিরুদ্ধে আপাততঃ অধিক সংখ্যক সেনা ও কামান প্রেরিত না হইলেও আসামের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তে যে শীঘ্রই দারুণ সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সামান্য যুদ্ধের আয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে, ইহাতেও যদি আবরগণ শাসিত না হয় তাহা হইলে আগামী শীতকালে মহাযুদ্ধের আয়োজন হইবে—সেই প্রজ্বলিত রণহুতাশনে স্বল্প সংখ্যক আবর নিশ্চয়ই পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

আমেরিকায় বর্ণসমস্যা। এক সময় যে আমেরিকা নিগ্রোদিগের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছিল, তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে শ্বেতবর্ণ নাগরিকদিগের সমান অধিকার দান করিয়াছিল,—অধুনা সেই আমেরিকাই, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন এবং সাম্যমন্ত্র প্রচারক আমেরিকাই, নিগ্রোদিগের প্রতি কি ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে। নিগ্রোদিগের পক্ষে সে দেশে বসবাস অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অল্প দিন হইল নিউইয়র্কের ঠিকাগাড়ী কোম্পানী তাহাদের সমস্ত নিগ্রোকোচম্যানকে ছাড়াইয়া দিতে মানস করিয়াছেন। এই সকল কোচম্যান পরিশ্রমী, বিশ্বাসী এবং কার্য্যক্ষম কিন্তু হোটেলবাসিগণ নিগ্রোকোচম্যান দেখিলে গাড়ী ভাড়া লইতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে রাখিলে কোম্পানীকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, কাজেই তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁহার আপন বাসা-বাড়ীতে একটি সভা আহ্বান করেন—তাহাতে শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণেরই নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু বাড়ীওয়ালা এ সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে বাসা ছাড়িয়া দিবার নোটিস দিল—অধ্যাপক মহাশয়কে বাধ্য হইয়া সভা বন্ধ করিতে হইল। নিউইয়র্কের কোন নিগ্রো—তাহাকে বিনা অপরাধে অন্যায় করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া আনায় জন্য আদালতে খেসারতের দাবীতে মকদ্দমা আনিয়াছিল, কিন্তু বাদী কৃষ্ণবর্ণজাতি বলিয়া সুবিচারক তাহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বলেন "কালা আদমীকে গ্রেপ্তার করিলে সে কখনই সাদা আদমীর মত অপমান বোধ করে না—তাহার খেসারতের কোন দাবী থাকিতে পারে না।" নিগ্রোদিগকে দেশান্তরিত করিয়া আবার আফ্রিকায় পাঠাইবার প্রস্তাব অনেকবার উঠিয়াছে। কিন্তু এমনতর অসম্ভব ব্যাপার কোনরূপেই সাধ্যায়ত্ত নয় জানিয়া এ প্রস্তাবের কোন ফল হয় নাই। কোনরূপ সভাসমিতি কিম্বা পাঠাগারে নিগ্রোদিগের প্রবেশ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে নিগ্রো স্ত্রীলোক অনেকে উত্তরে আসিয়া চাকরি পাইতেছে, কেবল পুরুষদিগেরই কোনো উপায় নাই। ফলে তাহারা অসদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছে। যুদ্ধবিপ্লব আত্মীয়বন্ধুর রক্তপাতে যে উত্তর আমেরিকা একদিন নিগ্রোস্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিল আজ সেইখানেই অত্যাচারের মাত্রা অধিক হইয়াছে—সামাজিক শিষ্টতা তো দূরের কথা;—রাজনৈতিক অধিকার হইতেও তাহারা ভ্রষ্ট হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রোদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়—এমন কি তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার অধিকারদানেও অনেকেই বিমুখ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং অর্থ নৈতিক অধ্যাপক ডু বোয়া কৃষ্ণবর্ণ এই দোষে আটালান্টার কার্ণেগি পাঠাগারে প্রবেশাধিকার হারাইয়াছেন; অথচ তাঁহারি রচিত পুস্তকাবলী সেই গৃহের বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ। সম্প্রতি একজন নিগ্রো—সহকারী আটর্ণি জেনারেলের পদে নিযুক্ত

হওয়াতে পশ্চিম ভার্জ্জিনিয়ার সংবাদপত্রে এ বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে। এ বিষম ব্যাপারের বিরুদ্ধে সকলেই খড়্গহস্ত।

এইরূপ হৃদয়হীন অন্যায় অনুদার নীতির জয় দেখিলে হৃদয় ক্রোধে দুঃখে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

বাল্যবিবাহের অপকারিতা। বাল্যবিবাহ যে আমাদের দেশের কত অপকার করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা কিছু নূতন কথা নয়। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ ইহা দেখিয়া, জানিয়াও কেন যে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত হই না ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়জনক নূতন কথা। মিসেস্ ওয়ালেস একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা। তিনি কিছুদিন হইতে এদেশে আসিয়া ইহার সংস্কারে প্রাণপাত করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি এ বিষয়ে যে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—"বাল্যবিবাহ নিবারণ করা এদেশের যুবকবৃন্দের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য সুসাধিত হইলে ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ হইবে। তরুণ বয়সেই হৃদয় উৎসাহে উদ্যমে পূর্ণ থাকে, এই সময়েই ভারতবর্ষীয় যুবকগণ স্বদেশীয় নারীগণকে শ্রেষ্ঠ আদর্শে গঠিত এবং পরিণত করিতে চেষ্টা পাইলে সে প্রয়াস কখনও ব্যর্থ হইবে না। উপযুক্ত শিক্ষাদানই এই পরিণতির প্রকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা এদেশে বালিকাবিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলেন বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়, বালিকার বয়স দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ না হইতেই তাহার বিবাহ হয় এবং মা সরস্বতীর সহিত জন্মবিচ্ছেদ ঘটে। আধুনিক সকল চিকিৎসকই বলিয়া থাকেন অষ্টাদশবর্ষ পূর্ব্বে নারীর এবং পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে পুরুষের বিবাহ হওয়া কখনই উচিত নয়। যদি বালিকাগণ যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তবে উপযুক্ত পরিণত বয়স্ক মাতা, পত্নী এবং ভগিনীলাভের আশা দুরাশা।" এ কথা এমন সুস্পষ্ট সত্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই সরল সত্যের কথা আমাদের বিদেশী বন্ধুদিগের মুখে শুনিতে হয়। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা দেশের মঙ্গল চেষ্টায় ব্রতী, যাঁহারা সুবিবেচক তাঁহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই জানেন যে বাল্যবিবাহ জাতীয় উন্নতির কি ভয়ানক অন্তরায়; কিন্তু তবুও অবস্থাবৈগুণ্যে মধ্যে মধ্যে বাল্যবিবাহের যতটুকু বাধা আসিয়া পড়ে তাহা ছাড়া তাহা রোধ করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রবল চেষ্টা এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। এখন পর্য্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এই পুরাতন প্রথার অপকারিতা সম্যক স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না; অন্ততঃ তাহা নিবারণে যত্ন করিতে বিমুখ, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। মিসেস্ ওয়ালেস যুবকবৃন্দকে এই কার্য্যে উৎসাহী করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের যে কত উপকার করিতেছেন তাহা সুবিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন। বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুবকগণ যদি ইহার প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প হন তাহা হইলে অতি সহজেই এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন হইবে। এ কর্ত্তব্য পালন করা তেমন কঠিন নহে;—কেবলমাত্র একটুখানি দৃঢ়তার আবশ্যক; তাহা হইলেই অতি সহজে তাঁহারা সফলকাম হইয়া দেশের এবং বংশের স্থায়ী উন্নতিসাধন করিতে পারেন।

কবি সম্বর্দ্ধনা। যদিও আমাদের দেশেরই প্রবচন—স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে; তবুও রাজা এবং রাজপ্রতিনিধি দেশান্তর হইতে আসিয়া অনেক সমাদর লাভ করিয়া যান, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়; কেবল দেশের বিদ্বান কখনো বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র আমাদের দেশের অসামান্য গৌরব বর্দ্ধন করিয়াও কোন অসাধারণ মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই? স্বদেশের জন্য তাঁহারা রত্ন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহা ভোগ করিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতির সম্মান রক্ষা করিবার উদ্দাম উদ্যোগ কোথায়?

এতদিনে আমরা যে আমাদের এই ত্রুটি অপসারণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, ইহা বড় আনন্দের কথা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র দেশের শ্রেষ্ঠ কবি নহেন সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। কাব্য,

উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ এবং ধর্ম্মোপদেশে মাতৃ-ভাষার ভাণ্ডার অতুল সম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহার দেশভক্তি কেবল স্বদেশপ্রেম-পূর্ণ সঙ্গীত রচনায় পর্য্যবসিত হয় নাই; নিয়ত পরিশ্রম, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অদ্ভুত আত্মত্যাগে তিনি বোলপুর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার পঞ্চাশতম জন্মদিনে বোলপুরে উৎসবের আয়োজন করিয়া শিক্ষক, ছাত্র, ভক্ত এবং অনুরক্তগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইয়াছেন। কলিকাতায় সাহিত্যপরিষদের সংযোগে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইতেছে। একান্ত মনে প্রার্থনা করি, কবিবর দীর্ঘজীবি হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করুন, তাঁহার উজ্জ্বল ও মহৎ আদর্শ পরবর্ত্তী সকলকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করুক।

সমালোচনা।

জ্যোতিঃ। শ্রীমতি হেমলতা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। আমরা এই কবিতাগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তি পাইয়াছি। অল্পদিনমাত্র 'জ্যোতিঃ'র কবি সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন, ইহার মধ্যেই তিনি এখানে বেশ একটি সুপ্রতিষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন, ইহা 'অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে। 'জ্যোতিঃ'র অধিকাংশ কবিতাই ধর্ম্মভাবোদ্দীপক,—সহজেই সকল শ্রেণীর পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করে। ছন্দেও একটা প্রাণ আছে। গ্রন্থের শেষে লেখিকার স্বরচিত কয়েকটি সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী বীণাপাণির এই একনিষ্ঠ পূজারিনী-কবির ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

এলোকেশী। গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—উপন্যাসখানি তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের রচনা—ষোড়শ বর্ষে ইহার "দুয়টি চরিত্র গ্রথিত" করিয়াছেন এবং "কাহাকেও দেখাইয়া লইবার প্রবৃত্তি বা কাহারও মতানুযায়ী চলা রোগটা অভাগার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।" বটে। ইহাই ত প্রতিভার লক্ষণ। উপন্যাসের যেমন ভাব। তেমনই ভাব, তেমনই উপাখ্যানভাগ, আবার রুচিও সেইরূপ! এমন মণিকাঞ্চন যোগ বড়-একটা দেখা যায় না।

মন্দার। (গীতিকাব্য) শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র। কবিবর 'আভাষে' জানাইয়াছেন, "উপন্যাসের অগণ্য চরিত্রের সংঘাতে ও ভাববিধির উচ্ছ্বাসে পাছে আমার কবিতা ডুবিয়া প্রাণ হারায়, এই ভয়ে বাছারা ত্বরায় হামাগুড়ি দিয়া বাহিরে আসিয়া বাঁচিল।" মরি মরি। 'বাছা'দিগের মুখে লবণ দিবার জন্য কি কেহ ছিল না? তাহা হইলে কবি ত বাঁচিতেনই, সঙ্গে সঙ্গে, আমরাও এ "মন্দার" কবিতা গ্রন্থপাঠরূপ মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইতাম।

ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির। শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি যুধিষ্ঠির চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। রচনায় কোন বিশেষত্ব নাই।

শেফালিগুচ্ছ। শ্রীমতী মুকুমারী দেবী। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। প্রকাশক শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মূল্য বার আনা মাত্র। এখানি কবিতাগ্রন্থ। লেখিকার প্রথম উদ্যম বলিয়াই মনে হইল। রচনায় একটা মিষ্টতা আছে। কয়েকটি কবিতা করুণরসাত্মক মর্ম্মস্পর্শী। নির্ব্বাচনে আর কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। আমরা লেখিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নৌকাবিহার

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১৮ [৩য় সংখ্যা।

লঙ্কার নটরাজ শিব।

লঙ্কার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ভূগর্ভ খনন করিয়া একটী প্রাচীন তাম্রমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা নটরাজ শিবের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির মস্তক জটাজুটশোভিত। দক্ষিণদিকের জটায় গঙ্গানদী প্রবাহিত ও বামদিকের জটায় অনন্ত সর্প বিরাজিত। নটরাজের তিন চক্ষুঃ ও গলদেশে নরকপালের মালা। তিনি একাধারে পুরুষ ও রমণী এই হেতু বাম ও দক্ষিণ কর্ণে যথাক্রমে পুরুষ ও রমণীর ন্যায় কুণ্ডল ধারণ করেন। তাঁহার চারি হস্ত। দক্ষিণ দিকের উপরিতন হস্তে ডমরু। উহা দ্বারা তিনি অজ্ঞানমগ্ন লোকদিগকে জাগরিত করেন। দক্ষিণদিকের নিম্নতন হস্ত সংসারভীত লোকসমূহকে অভয়দান করিবার নিমিত্ত ব্যাপৃত। বামদিকের উপরিতন হস্ত নিম্নাভিমুখ কিন্তু বাম চরণ উত্তোলিত। ইহার সাঙ্কেতিক অর্থ এই যে তাঁহার বামচরণ জীবগণের অন্তিম আশ্রয়। তিনি দক্ষিণচরণের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান। এই চরণ মায়াসুরকে দলিত করিতেছে। মায়াসুর অবিদ্যার নামান্তর।' মূর্ত্তিটি পদ্মাসনের উপর অবস্থিত।

নটরাজ শিবের এই মূর্ত্তি লঙ্কার পুলস্ত্যপুর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাবণের পিতামহের নাম পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের সহিত পুলস্ত্যপুরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। সিংহলীয় পালিগ্রন্থে পুলস্ত্যপুর পুলৎথিপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী গ্রন্থে এই নগর অধুনা পোলোন্নরু নামে পরিচিত। পুলস্ত্যপুর এক সময়ে লঙ্কার রাজধানী ছিল। মহাবংশের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় ৮৪৬ খৃঃ অব্দে শিলামেঘবর্ণ নামক রাজা পুলস্ত্যপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি চল্লিশ জন রাজা এই নগরে রাজত্ব করেন। ১২১৫ খৃঃ অব্দে পুলস্ত্যপুরের ধ্বংস হয়। অধুনা পুলস্ত্যপুর জনশূন্য ও নিবিড় অরণ্যে সমাকীর্ণ।

নটরাজের মূর্ত্তি অতি দুর্লভ। আর্য্যাবর্ত্তের কোথায়ও এই মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণাপথেরও কেবল একটী স্থানে নটরাজের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের নাম চিদম্বরম্। ইহা মান্দ্রাজের প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। চিদম্বরম্ শৈবসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমি চিদম্বরম্ পরিদর্শন করি। চিদম্বরমে নটরাজের একটি সুদৃশ্য মন্দির বিদ্যমান আছে। এই স্থানের নটরাজকে দর্শন করিবার জন্য

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে শত শত যাত্রী প্রতিদিন সমাগত হয়। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা যত্নের সহিত আমাকে সমস্ত প্রদর্শন করেন। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ নটরাজকে প্রণাম করিবার সময় নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠ করেন :—

লোকানাহূয় সর্ব্বান্ ডমরুকনিনদৈঃ ঘোর সংসার মগ্নান্। দত্বাংভীতিং দয়ালুঃ প্রণত-

নটরাজ।

ভয়হরং কুঞ্চিতস্পাদপদ্মম্॥ উদ্ধৃত্যেদং বিমুক্তেরয়নমিতি করাদ্দর্শয়ন্ প্রত্যয়ার্থং॥ বিভ্রদ্ বহ্নিং সভায়াং কলয়তি নটনং যঃ স পায়ান্নটেশঃ॥ ॥

"যিনি ডমরুর ধ্বনিদ্বারা ঘোর সংসারমগ্ন লোকদিগকে আহ্বান করেন, যিনি দয়াপরবশ হইয়া প্রণতভক্তের বিপত্তি নিবারণ পূর্ব্বক অভয়দান করেন, যিনি কুঞ্চিত পাদপদ্ম উত্তোলন করিয়া হস্তনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলেন 'ইহাই মুক্তির পথ' এবং যিনি কপালে ও হস্তে বহ্নি ধারণ করিয়া সভায় নৃত্য করেন, সেই নটরাজ আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কি করিয়া লঙ্কায় নটরাজের মূর্ত্তি প্রবেশ করিল। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—লঙ্কার তামিল অর্থাৎ হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শৈব। উহারা দক্ষিণাপথ হইতে লঙ্কায় গমন করিয়া তথায় নটরাজের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। উপরে যে মূর্ত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইল উহা পুলস্ত্যপুর ধ্বংসের অগ্রে অর্থাৎ অন্যূন ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে লঙ্কায় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কতকাল পূর্ব্বে তামিলগণ লঙ্কায় প্রথম প্রবেশ করে ইহা নির্দ্ধারিতরূপে বলা যায় না। লঙ্কার সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিজয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গ তামিল কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে লঙ্কেশ্বর রাবণ তামিলবংশ সমুদ্ভূত। লঙ্কার অনেক তামিল ক্ষত্রিয় আপনাদিগকে রাবণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে তৎসন্নিহিত পাম্বান্ নামক স্থানে আমি একদিন অবস্থান করি। তত্রত্য জলযান পরিদর্শক (Steam agent) তামিল ক্ষত্রিয়। তাঁহার সহিত আমার নানা বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি আমাকে বলিলেন—"মহাশয়, আমরা রাবণের কুলে সমুৎপন্ন। রাবণ দক্ষিণাপথের রাজা ছিলেন। বহু তামিল সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি লঙ্কায় গমন করিয়া ঐ দ্বীপ অধিকার করেন। রাবণ স্বয়ং লঙ্কায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রতিনিধি দক্ষিণাপথের শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন। বাল্মীকি রাবণকে রাক্ষস বলিয়াছেন বলিয়া আমরা যথার্থ ই রাক্ষস নহি। দক্ষিণাপথের তামিলগণ কৃষ্ণকায় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। কাহারও মতে তামিল ভাষা সংস্কৃতের অপেক্ষা প্রাচীন। তামিলগণের সামাজিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। উত্তরভারত হইতে আর্য্যগণ দক্ষিণাপথে প্রবেশ করায় তামিল সভ্যতার লোপ ও বৈদিক সভ্যতার প্রচার হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তামিল সাহিত্যের প্রচার রুদ্ধ হইয়াছে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

তাপ ও উত্তাপ।

আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কঠিন, তরল এবং অনিল।* স্বর্ণ, লৌহ, প্রস্তর প্রভৃতি বস্তু কঠিন; পারদ, জল ইত্যাদি তরল; এবং বায়ু, জলীয় বাষ্প, উদজন প্রভৃতি অনিল। এই তিন প্রকার অবস্থার বিশেষত্ব ও স্থূল কারণ এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে কি ধর্ম্মের বিভিন্নতায় পদার্থের ঐ ত্রিধা বিভাগ করা হইয়াছে।

কঠিন পদার্থ আপন আকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপ ও আয়তনবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এক খণ্ড কঠিন বস্তু একবার যে আকৃতি প্রাপ্ত হয়, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলে বা এক আধার হইতে অপর আধারে রক্ষিত হইলে, সহজে সেই আকৃতির রূপান্তর হয় না। বিনা আয়াসে কঠিন বস্তুকে খণ্ডীকৃতও করা যায় না। সকল কঠিন বস্তুরই একটা স্থায়ী আকৃতি থাকে। কিন্তু তরল পদার্থ সেরূপ নহে; যে পাত্রে রাখা যায়, তাহা অবিলম্বে আপনাআপনি সেই পাত্রের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। গোলাকার পাত্রে জলের আকৃতি গোল; লম্বা নলের মধ্যে উহার আকৃতি ঐ নলের ন্যায় লম্বা। উহাদের নিজের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই; আধার পাত্রের আকৃতিই উহাদের আকৃতি। অপিচ, বিনা আয়াসে তরল বস্তুকে এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালা যায় এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা যায়। কঠিন পদার্থে ছুরিকা বিঁধিলে একটা বাধা অনুভূত হয়, কিন্তু তরল পদার্থে সেরূপ কোন বাধা নাই। কঠিন পদার্থে ছুরির দাগ বহুকাল-স্থায়ী, তরল পদার্থে দাগ স্থায়ী হয় না। কঠিন পদার্থের জন্য বিশেষ কোন আধার পাত্রের আবশ্যক নাই, যেখানে রাখ সেইখানে থাকে; কিন্তু তরল পদার্থ কোন পাত্রে না রাখিলে ছড়াইয়া পড়ে ও বহিয়া যায়। এই বহিয়া যাওয়াই তরল পদার্থের বিশেষত্ব। জল, দুধ, পারা প্রভৃতি তরল পদার্থের এই বস্তুগত চাঞ্চল্যই প্রধান ধর্ম্ম। কঠিন ও তরল হইতে অনিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বায়ু, অম্লজন প্রভৃতি পদার্থ যদিও দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি স্পর্শ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। গাছের পাতা নড়িলেই বায়ু আছে এ ধারণা সহজেই হইয়া থাকে। অনিল পদার্থের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নাই এবং উন্মুক্ত পাত্রে রাখিলে উহারা শীঘ্রই অপসৃত হইয়া যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল অধিকার করে—পাত্র হইতে স্বতঃ বহির্গত হইয়া তাবৎ স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। তরলের ন্যায় অনিলও এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিতে পারা যায়, এবং উহা আধার-পাত্রেরই আকৃতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অনিলের একটা বিশেষত্ব, ও তরল হইতে বিভিন্নতা আছে। তরল পদার্থ উন্মুক্ত পাত্রে

---

* এই পরিভাষা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত।

(খোলা বোতলে বা বাটিতে) রাখিলে তৎক্ষণাৎ সেই পাত্র হইতে বাহির হইয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়ে না; ক্রমশঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইলে, অর্থাৎ তরল হইতে অনিল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর তবে গৃহস্থিত বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশিয়া যায়, অনিলকে কোন পাত্রে কিছুকাল রাখিতে হইলে সেই পাত্রে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে চলিবে না; সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ পাত্রেই অনিল বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। অনিল পদার্থের আরও এক বিশেষত্ব আছে। উহা প্রায়ই বায়ুর ন্যায় বর্ণহীন এবং অত্যন্ত লঘু।

জড় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম উহার গুরুত্ব। অনিল জড় পদার্থ—এবং উহার গুরুত্ব আছে। কিন্তু কঠিন ও তরল বস্তুর তুলনায় অনিল এত লঘু যে উহার ওজন সহজে করা যায় না। বায়ু-নিষ্কাসন যন্ত্রের দ্বারা একটা বোতলের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলিলে ঐ বোতলের ওজন কমিয়া যায়। সাধারণ খালি বোতল বায়ুপূর্ণ থাকে। উহাকে বায়ুহীন করিয়া ওজন করিলে ভার কম বোধ হয়। ভার যতটা কম হয়, সেইটুকু এক বোতল বায়ুর ওজন। মনে কর, একটি বোতল জল শুদ্ধ ওজনে পাঁচ পোয়া হইল। জল ফেলিয়া দিয়া "খালি" বোতলের ওজন, ধর আধ সের। তাহা হইলে যে জলটুকু ফেলিয়া দেওয়া হইল, উহার ওজন কত? সাধারণতঃ বলিব, তিন পোয়া কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই ভুল ধরা পড়িবে। যে বোতলটা আমরা "খালি" বলিলাম ও যাহার ওজন আধসের হইল, বস্তুত সে বোতল খালি নহে। উহার মধ্যে এক বোতল বায়ু আছে। সুতরাং,

বোতল + জল = পাঁচ পোয়া। (১)

বোতল + বায়ু = আধ সের। (২)

এই দুইয়ের এর অন্তর শুদ্ধ জলের ওজন হইবে না। জলের ওজন তিনপোয়া অপেক্ষা বেশি—ঐ বায়ুর ওজন যত ততটুকু বেশি। যদি দ্বিতীয় ওজনে কেবল বোতলের ওজন আধ সের হইত, তাহা হইলে জলের ওজন তিন পোয়া হইত। কিন্তু এ স্থলে শুদ্ধ বোতলের ওজন আধ সেরের অপেক্ষা কম, কারণ বোতলের সহিত বায়ু লইলে তবে আধ সের হয়। সুতরাং বোতল ও জল পাঁচ পোয়া এবং বোতল আধসেরের কম হইলে, জল তিন পোয়ার বেশি। এ স্থলে (১) ও (২) বিয়োগ করিলে, জল − বায়ু = তিন পোয়া হয়। অতএব জলের ওজন = তিন পোয়া + বায়ু। কিন্তু বায়ুটুকু এত লঘু যে তিন পোয়ার সহিত যুক্ত হইলে বড় একটা বেশি পার্থক্য হয় না। তিন পোয়ার তুলনায় বায়ুর ওজনটি ছাড়িয়া দিলে বিশেষ ক্ষতিও হয় না। এক ঘড়া জল হইতে যদি এক বিন্দু জল ফেলিয়া দিই তাহা হইলে ঘড়া ও জলের ওজন কম বোধ হয় না। ইহা আমাদের বোধ শক্তির দোষ সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড আমাদের ন্যায় অকর্ম্মণ্য নহে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত লঘু বস্তুরও গুরুত্ব পরিমিত হইতে পারে। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া গেল তাহাতে অনিলের লঘুত্ব বুঝা যাইবে।*

যে আয়তন (১০০০ লিটার) জলের

* ৪০ ইঞ্চি বা ২।০ হাত লম্বা × ঐ প্রস্থ × ঐ স্থূল আয়তন = ১১ $\frac{১}{৪}$ ঘন হাত বা প্রায় ৩৭ ঘন ফুট ১০০০ লিটার। ১ ঘন ফুট জলের ওজন প্রায় ৩১।০ সের। সুতরাং ৩৭ ঘন ফুট জলের ওজন প্রায় ২৯ মণ। পরীক্ষা দ্বারা

ওজন ২৯ মন সেই আয়তন উদজনের ওজন দেড় ছটাক মাত্র! ইহা হইতে অনিলের লঘুত্ব অনুমিত হইবে। উদজনের অপেক্ষা জলীয় বাষ্পের ওজন প্রায় নয় গুণ অধিক ও বায়ুর ওজন ১৪ গুণ অধিক!

কঠিন তরল ও অনিল এই তিনটি অভিধা যে, কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থের নাম তাহা নহে। উহারা পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার নাম মাত্র। একই বস্তু ক্রমান্বয়ে ঐ তিনটি অবস্থাই প্রাপ্ত হইতে পারে। বস্তুগত পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে একই পদার্থ ঐ তিন প্রকার বিভিন্ন দশাপন্ন হয়। জল কখন কঠিন তুষার, কখন তরল বারি, কখন আবার অনিল বাষ্প —এই তিন অবস্থায় পাওয়া যায়। উহার বস্তু জল জলই থাকে। সকল অবস্থাতেই উহা অম্লজন ও উদজনের যৌগিক; তুষারে, তরলে, বাষ্পে ঐ দুই উপাদান ও তাহাদের পরিমাণ সমান থাকে। নয় সের জল যে অবস্থা হইতেই বিশ্লিষ্ট হউক না কেন, সর্ব্বদা এক সের উদজন ও আট সের অম্লজন উৎপন্ন করিবে;—বস্তুগত বৈলক্ষণ্য হয় না কেবল আকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে অনায়াসে আনিতে পারা যায়। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন তাপ সাহায্যে হইয়া থাকে। সামান্য তাপে এমন কি হস্তের উত্তাপে বরফ গলিয়া তরল বারিরূপে পরিণত হয়; যথেষ্ট তাপ দিলে ঐ বারি ফুটিয়া অনিল অবস্থায় বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আবার যথেষ্ট শীতল করিলে (তাপ বাহির করিয়া লইলে) বাষ্প হইতে বারি এবং বারি হইতে বরফ পাওয়া যায়। এইরূপে অধিকাংশ পদার্থ তাপের তারতম্যে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাপের অনুপ্রবেশে কঠিন হইতে তরল ও অনিল, এবং তাপের নির্গমনে অনিল হইতে তরল ও কঠিন অবস্থান্তর হইয়া থাকে।

পদার্থের এই তিন অবস্থার মূল কারণ তাপ। তাপ কি? উহা যে জড় পদার্থ নহে তাহা সহজেই জানা যায়; কারণ তাপের গুরুত্ব নাই। একসের বরফ হইতে একসের মাত্র জল পাওয়া যায়, বেশিও নহে, কমও নহে। অথচ খানিকটা তাপ না দিলে বরফ গলিবে না। তাপযুক্ত হইয়া যখন ওজন বাড়িল না, তখন অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে তাপ সাধারণ জড়পদার্থ নহে। যদি জড় পদার্থ না হয়, তবে তাপের প্রবেশ, তাপের নির্গম পরিচালন ইত্যাদি জড়সুলভ ক্রিয়া উহা দ্বারা কিরূপে সম্ভবে? এ স্থলে পরীক্ষা দ্বারা যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

আমরা তাপের সাধারণতঃ এই কয়টি ক্রিয়া দেখিতে পাই।

(১) পদার্থের উত্তাপ বৃদ্ধি।

নিরূপিত হইয়াছে যে ৩৭ ঘন ফুট বায়ুর ওজন প্রায় ২১ ছটাক; ৩৭ ঘন ফুট পরিমিত জলীয় বাষ্পের ওজন প্রায় ১৩ ছটাক ও ৩৭ ঘন ফুট পরিমিত উদজনের ওজন প্রায় ১½ ছটাক।

(২) পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি।

(৩) কঠিন, তরল, অনিল, এই তিন অবস্থার পরিবর্তন।

(৪) রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ।

(৫) বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি।

একে একে এই কয়টি ক্রিয়া বিশদরূপে দেখা যাউক। যে শক্তির দ্বারা উপরি উক্ত ক্রিয়া সকল সংঘটিত হয়, তাহার নাম তাপ। তাপ একটি ক্রিয়াশীল শক্তি।

১। পদার্থের উত্তাপ। কোন পদার্থের তাপ সংক্রান্ত অবস্থার নাম উত্তাপ। তাপ কার্য্যকরী শক্তি, উত্তাপ সেই শক্তির পরিচায়ক অবস্থামাত্র। পদার্থ তাপসংযোগে উত্তপ্ত হয়, তাহার উত্তাপের বৃদ্ধি হয়; তাপের নির্গমনে উত্তাপের হ্রাস হয়। জল যেমন সমধিক উচ্চ স্থান হইতে নিম্নতর স্থানে প্রবাহিত হয়, তাপও সেইরূপ সমধিক উত্তপ্ত বস্তু হইতে পরিচালিত হয়। সমতলের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যেমন জল প্রবাহিত হয় না, সেইরূপ দুইটি সমান উত্তপ্ত বস্তুর কোনটি হইতে তাপ অপরটিতে যাইতে দেখা যায় না। এস্থলে তাপের উপমান জল এবং উত্তাপের উপমান ঐ জলের উচ্চতা বা নিম্নত্ব। জলের উচ্চতা যেমন জল নহে, জলাধারের একটা অবস্থা মাত্র, সেইরূপ উত্তাপ তাপ নহে, তাপাধারের অবস্থা মাত্র। তাপের গতি সর্ব্বদা উত্তপ্ত বস্তু হইতে শীতল বস্তুর দিকে।*

একটি উত্তপ্ত ও একটি শীতল বস্তু পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখিলে, তাপ উত্তপ্ত বস্তু হইতে বহির্গত হইয়া শীতল বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমশঃ উত্তপ্ত বস্তুটি শীতল হইতে থাকে ও শীতল বস্তুটি উত্তপ্ত হইতে থাকে। তাপ যতই কমিতে থাকে, প্রথম বস্তুটি ততই শীতল হইতে থাকে, এবং ততই অল্পপরিমিত তাপ উহা হইতে নির্গত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বস্তুটীতে যতই তাপ বাড়িতে থাকে, উহা ক্রমশঃ ততই উত্তপ্ত হইতে থাকে এবং উহাতে ততই অল্পপরিমিত তাপ প্রবেশলাভ করিতে থাকে। পরিশেষে যখন উহাদের তাপিক অবস্থা (উত্তাপ) সমান হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর তাপের পরিচালনা অনুভূত হয় না। এইরূপ উত্তাপের সাম্যাবস্থায়ও তাপের গতি কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না। দুইটিরই উত্তাপ সমান, সেইজন্য দুইটি হইতেই সমান পরিমাণে তাপ নির্গত হইয়া একের উত্তাপ অপরে যায়; কিন্তু সেই তাপের পরিমাণ সমান বলিয়া একটি বস্তু হইতে যতটুকু তাপ নির্গত হয়, ঠিক ততটুকু তাপ অপরটি হইতে নির্গত হইয়া উহাতে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়; এইজন্য উহার তাপের পরিমাণ অবিকৃত থাকে। এইরূপে যতগুলি উত্তাপ বিশিষ্ট বস্তু একত্র থাকে, কালে সকলের উত্তাপ সমান হইয়া যায় এবং প্রত্যেকটি যতটুকু তাপ অপরগুলিকে দেয়, ঠিক ততটুকু তাপ ফিরিয়া পায়। প্রকৃত পক্ষে তাপের পরিচালনা হইতে থাকে, কিন্তু আগম নির্গমনের হার সমপরিমিত হওয়ায় প্রত্যেকের

* এক ঘড়া ফুটন্ত জল ও এক বাটি ফুটন্ত জল উভয়ের উত্তাপ সমান (১০০ ডিগ্রী) কিন্তু ঘড়ার জলে তাপ যে অনেক বেশি তাহা সহজেই বুঝা যায়। উভয়কে সমান উত্তাপে নামাইতে হইলে ঘড়ার জল হইতে বেশি পরিমাণ তাপ বাহির করিতে হইবে।

তাপের সমষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। এইরূপ তাপের উচ্চতা ও নিম্নত্ব বিলুপ্ত হইলেও, তাপ সমতলে অবস্থিতি করিলেও, এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে তাপের চলাচল হইতে থাকে, কিন্তু মোটের উপর উভয়েরই লাভ লোকসান সমান হওয়ায় সাম্যাবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থাকে "উত্তাপের চলৎসাম্যাবস্থা". (Mobile Equilibrium) বলিতে পারি।

প্রত্যেক শক্তির কার্য্যকারিতা দুইটি রাশির গুণফলের উপর নির্ভর করে। একটি ঐ শক্তির পরিমাণ (Quantity factor) এবং অপরটি ঐ শক্তির প্রাখর্য্য (Intensity factor)। স্রোতের দ্বারা চালিত যন্ত্রাদির পক্ষে জলস্রোতের কার্য্যকারিতা জলের পরিমাণ ও স্রোতের বেগ এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। স্রোতে জল যত বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হইবে, ঐ যন্ত্রাদি ততই অধিক কার্য্য করিবে। সুতরাং ঐ যন্ত্রের কার্য্য সুচারুরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কেবল জল লইলেই চলিবে না, ঐ জলের একটা বেগও আবশ্যক। এক সের জল ঘণ্টায় এক মাইল বেগে প্রবাহিত হইলে যে কার্য্য লাভ হইবে, দুই সের জলে সেই গতিতে তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইবে; আবার যদি ঐ দুই সের জল ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে (২×২=৪) চতুর্গুণ ফললাভ হইবে। জলস্রোতের প্রাখর্য্য উহার বেগ; যত উচ্চ হইতে যত নিম্নে স্রোত যাইবে, ততই ঐ বেগ বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ঐ প্রাখর্য্য-সূচক রাশি জলের উচ্চতা ও নিম্নত্ব লইয়া নিরূপিত হয়। তাপেরও অবিকল ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ যখন কোন উত্তপ্ত বস্তুতে স্থিরভাবে থাকে, তখন উহার দ্বারা এঞ্জিন প্রভৃতি কোন যন্ত্রই পরিচালিত হইতে পারে না। ঐরূপ যন্ত্র পরিচালিত করিয়া কার্য্যফল লাভ করিতে হইলে তাপকে উত্তপ্ত বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত করিতে হইবে;—তাপেরও একটা স্রোত সৃজন করিতে হইবে। উক্ত বস্তুদ্বয়ের উত্তাপের দূরতা যত বেশি হইবে, তাপ ততই বেশি কার্য্যক্ষম হইবে। প্রত্যেক এঞ্জিনে একটি উত্তপ্ত বস্তু, তাপের উৎস (Boiler or source) ও একটি শীতল বস্তু, তাপের নিম্নতর আধার (Condenser or Refrigerator) থাকা অপরিহার্য্য। সাধারণতঃ এঞ্জিনে জলীয় বাষ্পের আয়তন বৃদ্ধি ও হ্রাস লইয়া কার্য্য হইয়া থাকে। তাপ সাহায্যে ঐ বাষ্প সমধিক প্রসৃত হইয়া যে নলে উহা অবরুদ্ধ থাকে তাহার মুখরোধক দণ্ডকে (piston rod) ঠেলিয়া উহা আয়তনে বাড়ে। তাহাতে ঐ নলদণ্ডের একবারমাত্র একদিকে একটা গতি হয়। ঐ নলদণ্ডের গতি ক্রমাগত অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ঐ দণ্ডকে পুনরায় উহার পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহাতে ঐ তাপের নির্গমন আবশ্যক, সুতরাং একটা শীতল বা শৈত্যাধার (refrigerator) আবশ্যক। ঐ দণ্ড পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে তাপের আবার পূর্ব্বক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং অবিচ্ছেদ গতিতে এঞ্জিন চলিতে থাকে। যদি শৈত্যাধার না থাকে তাহা হইলে তাপ একবারমাত্র কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যায়। যতক্ষণ ঐ এঞ্জিনের দ্বারা কার্য্য লাভ করিতে হইবে, ততক্ষণ তাপ, উত্তপ্ত

উৎস হইতে শৈত্যাধারে অবিচ্ছিন্ন গতিতে পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুইটি বিভিন্ন উত্তাপ-বিশিষ্ট বস্তু নিকটে থাকিলে উভয়ে অবশেষে উত্তাপের সমতা প্রাপ্ত হয়। এই বিধানে, কোন এঞ্জিন্ যতই কার্য্য করিতে থাকিবে উৎস হইতে তাপ ততই দূরীভূত হইয়া শৈত্যাধারে যাইবে। অবশেষে যখন উৎস ও শৈত্যাধার এই দুইয়ের উত্তাপ সমান হইয়া পড়িবে, তখন আর এঞ্জিন চলিবে না। জগতে যে সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে কালে সকল বস্তুরই উত্তাপ সমান হওয়াই সম্ভব। সুদূর ভবিষ্যতে সকল পদার্থের উত্তাপ সমান হইয়া পড়িলে তাপসংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়াই স্থগিত থাকিবে। গতি, স্ফূর্ত্তি, এমন কি বৃক্ষলতাদি ও জীবগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এ বিষয় বারান্তরে সবিশেষ আলোচিত হইবে।

নির্দ্দিষ্ট পরিমিত তাপ সংযোগে সকল বস্তুর উত্তাপ সমান পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় না। যে তাপে জলের উত্তাপ ০ ডিগ্রী হইতে ১০০ ডিগ্রী ওঠে, সেই তাপে সেই ওজন পারার উত্তাপ মাত্র তিন ডিগ্রী উঠে। সুতরাং সমান ওজন জল ও পারার উত্তাপ সমানরূপে বৃদ্ধি করিতে হইলে পারা অপেক্ষা জলে প্রায় ৩৩ গুণ অধিক তাপ দেওয়া আবশ্যক। ধাতু মাত্রেই স্বল্প উত্তাপে সমধিক উত্তপ্ত হয়। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুরই একটা "আপেক্ষিক তাপ" (specific heat) আছে। সমান ওজন জলের জন্য সামান্য উত্তাপ আনিতে হইলে যত তাপ আবশ্যক সেই অনুপাতে বস্তুর আপেক্ষিক তাপ নিরূপিত হয়। নিম্নে কতক-গুলি বস্তুর আপেক্ষিক তাপ দেওয়া গেল:—

জল	...	১
পারদ	...	$\frac{১}{৩০}$
গন্ধক	...	$\frac{১}{৫}$
লৌহ	...	$\frac{১}{৯}$
রৌপ্য	...	$\frac{১}{১৮}$
দস্তা	...	$\frac{১}{১০}$
তাম্র	...	$\frac{১}{১১}$
স্বর্ণ	...	$\frac{১}{৩২}$

ইত্যাদি

তাপের এই বস্তুগত ক্রিয়া, উত্তাপ বৃদ্ধি, লইয়া তাপের পরিমাণ নিরূপিত হয়। কোন রেখার দৈর্ঘ্য মাপিতে হইলে যেমন একটি "মাপকাটি" থাকা আবশ্যক, তাপেরও সেইরূপ একটি আদর্শ পরিমাপক কিছু থাকা আবশ্যক। সেই জন্য যে পরিমাণ তাপ এক গ্রাম ওজন জলকে ০ ডিগ্রী হইতে ১ ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে পারে, সেই পরিমাণ তাপকে আদর্শ লইয়া উহার নাম এক "ক্যালোরী" তাপ রাখা হইয়াছে। তাপের পরিমাণ কত ক্যালোরী জানিতে হইলে, ঐ তাপে এক গ্রাম ওজনের বিশুদ্ধ জল ০ ডিগ্রী হইতে কত ডিগ্রী উত্তপ্ত হইতে পারে দেখিয়া, প্রতি ডিগ্রীতে এক ক্যালোরী হিসাবে, যত ডিগ্রী তত ক্যালোরী ধরা হয়।

গন্ধকের আপেক্ষিক তাপ $\frac{১}{৫}$; ইহার অর্থ এই যে, এক গ্রাম গন্ধককে ০ ডিগ্রী হইতে ১ ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে হইলে $\frac{১}{৫}$ ক্যালোরী তাপ আবশ্যক, অর্থাৎ সেই তাপে সমান ওজন (এক গ্রাম) জল $\frac{১}{৫}$ ডিগ্রীমাত্র উত্তপ্ত হয়।

ক্যালোরী তাপের পরিমাপক, উত্তাপের নহে। উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের (thermo-

meter) দ্বারা নিরূপিত হয়। বহু পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে সন্ত গলনশীল বরফ এবং ফুটন্ত জলের বাষ্প এই উভয়ের উত্তাপ দেশকালপাত্রভেদে বিকৃত হয় না ;—উহা কেবল বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করে। প্রথম উত্তাপকে ০ ও দ্বিতীয়টিকে ১০০ এই সংখ্যা দিয়া উহাদের যে অন্তর হইবে তাহাকে, একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী উত্তাপ বলা যায়। "কোন বস্তর উত্তাপ ৫০ডিগ্রী," ইহার অর্থ হইবে গলনশীল বরফ ও সেই বস্তুর উত্তাপের যত অন্তর, ঐ বরফ হইতে ফুটন্ত জলের উত্তাপ তাহার ১০০/৫০ বা ২ গুণ অধিক। তাপমান যন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া পরে বিবৃত হইবে।

২। পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে তাপসহযোগে সকল বস্তু আয়তনে বাড়ে। কয়লার উনান তৈয়ারি করিবার সময় লোহার শিকগুলি মাটিতে বেশ আঁটিয়া বসান হইয়া থাকে ; কিন্তু দুই একবার অগ্নি জ্বালিলে ঐ শিকগুলি ঢিলা হইয়া যায়। সময়ে সময়ে উনানের ভিতর হইতে শিকের গোড়ার মাটি খসিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, তাপযুক্ত হইলে লৌহশলাকা লম্বে বাড়িয়া থাকে এবং উত্তাপ হ্রাস হইলে আবার উহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকাও আয়তনে বৰ্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু লৌহ তদপেক্ষা অধিক বৰ্দ্ধিত হয় ; সুতরাং একটু স্থান খালি পড়িয়া থাকায় শিক ঢিলা হইয়া যায়। তাপের মাত্রা বেশি হইলে শিকের দৈর্ঘ্য এত বৃদ্ধি হয় যে তাহার চাপে কঠিন মৃত্তিকা ফাটিয়া স্থানচ্যুত হইয়া যায়। এই প্রসরণ জন্যই দুইটি রেলের মধ্যে একটু ব্যবধান ইচ্ছা-পূর্ব্বকই রাখা হয়, কারণ গাড়ির চাকার ঘর্ষণে রেল উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে যদি প্রসারের স্থান না থাকে ত রেল বাঁকিয়া যায়। দিবসের উত্তাপে টেলিগ্রাফের তার বেশি ঝুলিয়া পড়ে, প্রাতঃকালে বা শীতকালে তার বেশ টানা থাকে।

কঠিন, তরল ও অনিল সকল পদার্থই উত্তাপ সাহায্যে আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কঠিন অপেক্ষা তরল এবং তরল অপেক্ষা অনিল অধিক প্রসৃত হয়। অনিল পদার্থের বিস্তৃতি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি স্বল্প তাপেই উহাদের আয়তনের বিশেষ প্রসার বৃদ্ধি দেখা যায়। প্রায় সমস্ত অনিল এই নিয়মে বাড়ে যে, ২৭৩ ঘন ফুট, ০ ডিগ্রী হইতে উত্তপ্ত হইলে প্রত্যেক ডিগ্রী উত্তাপে আয়তনের বৃদ্ধি ১ ফুট হয়। কঠিন বা তরলের বৃদ্ধি এরূপ কোন সুনিয়মের অধীন নহে।

যদি কোন উপায়ে উত্তপ্ত বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি নিবারণ করা যায় তাহা হইলে আধার পাত্রের গাত্রে উহারা চাপ সমধিক বেশি হয়। এঞ্জিনের নলে জলীয় বাষ্প ক্রমাগত উত্তপ্ত হইয়া চাপ বৃদ্ধি করে বলিয়া নলদণ্ড চালিত হয়। যখন উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে, চাপও এত বেশি হয় যে সময়ে সময়ে বয়লার (boiler) ফাটিয়া যায়। বারুদের দানা অতি ক্ষুদ্র ; কিন্তু অগ্নি-সংযোগে ঐ বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া এককালে এত বেশি অনিল উৎপন্ন হয়, যে, যে পাত্রে বারুদ রাখা হয় সেই পাত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। পটকা প্রভৃতি আতসবাজী এইরূপে কার্য্য করে। লৌহনলের মধ্যে ঐ অনিল

উৎপন্ন হইয়া বন্দুকের গুলি ভীষণবেগে বিদূরিত করে।

অনিলের এই উচ্চ প্রসরণশীলতা অনেক কাজে আসে। আয়তনে সমধিক বর্দ্ধিত হইলে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস হইয়া যায়। এক ঘন ফুট বায়ু উত্তপ্ত হইয়া যদি দুই ঘনফুটে পরিণত হয়, তবে সেই উত্তপ্ত বায়ুর এক ঘন ফুট ওজনে পূর্ব্ব শীতল ঘনফুটের অর্দ্ধেক হইবে। সুতরাং সমান আয়তন লইলে শীতল অনিল অপেক্ষা উত্তপ্ত অনিল অনেক লঘু। এক বোতল শীতল জল লইয়া উহার উত্তাপ বৃদ্ধি করিলে দেখা যায় যে বোতল ছাপাইয়া কতক জল বাহির হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট উত্তপ্ত জল যদিও বোতল পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, তথাপি যতটুকু বাহির হইয়া গিয়াছে, ততটুকু ওজনে কম। ঐ জল আবার শীতল করিলে একটু স্থান খালি থাকিয়া যাইবে। এমন দ্রব্য অনেক আছে, যাহা শীতল জলে ভাসে ও গরম জলে ডুবিয়া যায়। ইহার কারণ শীতল জল উত্তপ্ত জল অপেক্ষা ভারি।

একটা খালি (বায়ুপূর্ণ) বোতল উল্টাইয়া উহার মুখ একটা পাত্রস্থিত জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে যদি ঐ বোতল উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বোতলের বায়ু বুদ্বুদের আকারে মুখ হইতে নির্গত হইয়া জলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিতেছে। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে অনেকটা বায়ু নির্গত হইয়া যাইবে। এ স্থলে উত্তপ্ত বায়ু যে আয়তনে বর্দ্ধিত হইল, তাহা বেশ বুঝা গেল। পরে যখন বোতলটি শীতল করা যায়, আভ্যন্তরীন বায়ুর সঙ্কোচনও দেখা যায়—জল বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, যতটুকু বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থান অধিকার করে। উত্তপ্ত অবস্থায় বোতলেরও আয়তন বাড়িয়াছে, কিন্তু কতক বায়ু বোতল হইতে নির্গত হইল বলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বোতল (কাচ) অপেক্ষা বায়ুর প্রসার বৃদ্ধি অনেক বেশি। এই পরীক্ষায় ইহাও জানা গেল যে, উত্তপ্ত বায়ু আয়তনে বাড়ে বলিয়া শীতল বায়ু অপেক্ষা তাহা অনেক লঘু।

যে ঘরে অনেক লোকের বাস সেই ঘরের বায়ু সহজেই উত্তপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত লঘু হয় ও উপরে উঠে। কবাট অর্দ্ধ-উন্মুক্ত রাখিয়া একটা জলন্ত বাতি দ্বারের উপরি-ভাগে ধরিলে দেখা যায় যে শিখা বাহিরের দিকে বাঁকিয়া থাকে, কারণ উত্তপ্ত লঘু বায়ু উপর দিয়া ঘরের বাহিরে যায়। ঐ বাতি দ্বারের নিম্নদেশে ধরিলে শিখা ভিতরের দিকে বাঁকে, কারণ বাহিরের শীতল অপেক্ষাকৃত গুরু বায়ু নিম্ন স্থান দিয়া আসিয়া নির্গত বায়ুর স্থান অধিকার করে। দ্বারের মধ্য দেশে দীপশিখা সরল ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচলের জন্য "কুজু' কুজী" জানালা বা দ্বার খুলিবার আবশ্যক নাই; একটা বড় জানালা বা দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেই যথেষ্ট। কারণ উত্তপ্ত বায়ু স্বীয় প্রসরণ বলে দ্বারের উপরিভাগ দিয়া স্বয়ং বহির্গত হইয়া যাইবে ও বিশুদ্ধ বায়ু নিম্নদেশ দিয়া তৎস্থানে আসিবে।

বিশাল প্রাকৃতিক জগতে বায়ুর এই প্রসরণশীলতার ফলে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। সূর্য্যতাপে ধরা যখন উত্তপ্ত হয়, সেই সময় বায়ু উত্তপ্ত ধরণীর সংসর্গে উত্তপ্ত

হইয়া লঘু হয় ও উপরে উঠে। চতুঃপার্শ্বস্থিত শীতল বায়ু বেগে আসিয়া সেই উত্তপ্ত বায়ুর পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। এইরূপে "মৃদু মলয়ানিল" হইতে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি হয়। বায়ুর এই গতি আছে বলিয়াই এক স্থানের কলুষিত বায়ু সেই স্থান হইতে শীঘ্র বিদূরিত হইতে পারে।

৩। অবস্থার পরিবর্ত্তন। যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে কঠিন বস্তু তরলাকৃতি ও তরল বস্তু অনিলাকৃতি ধারণ করে। একখণ্ড বরফ ফ্লানেল, কম্বল অথবা করাতের গুঁড়ার মধ্যে রাখিলে উহাতে বহিঃস্থ তাপ প্রবেশ করিতে পারে না—বরফও গলে না। ইহার কারণ উক্ত দ্রব্যসকল তাপের অপরিচালক। তাপ দিলে তবে বরফ গলিতে আরম্ভ হয়; গলিবার সময় উহার উত্তাপ ০ ডিগ্রী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত বরফ গলিয়া শেষ হয়, ততক্ষণ উহার উত্তাপ ০ ডিগ্রীই থাকে। তাপ বরফে অনুপ্রবিষ্ট হয় বটে কিন্তু উহার উত্তাপ বৃদ্ধি না করিয়া কেবলমাত্র অবস্থার বিভিন্নতা সম্পাদন করে। কঠিন হইতে তরল অবস্থায় আনিতে হইলে সকল বস্তুরই ঐরূপ তাপ গ্রহণ ও প্রচ্ছন্নভাবে বস্তুর অভ্যন্তরে উহা রক্ষণ ধর্ম্ম দেখা যায়। এক গ্রাম ওজনের কঠিন, স্বীয় গলনের উত্তাপে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিয়া উহা প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া সেই উত্তাপেই তরলীভূত হইয়া থাকে তাহাকে ঐ কঠিনের "গলনতাপ" (Latent heat of fusion) বলিতে পারা যায়। মৌলিক ও বিশুদ্ধ যৌগিক কঠিন পদার্থসকলেরই বিশেষত্ব এই যে উহারা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে গলিতে আরম্ভ হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমিত তাপের সাহায্যে সেই উত্তাপেই সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায়। নিম্নে কতকগুলি কঠিনের গলন-উত্তাপ ও গলন-তাপ দেওয়া গেল:—

কঠিন	গলনের উত্তাপ	গলনতাপ
বরফ	০ ডিগ্রী	৭৯ ক্যালোরী
দস্তা	৪২০ "	২৮ "
সীসক	৩২৫ "	৫ "
রাং	২৩১ "	১৪ "
গন্ধক	১১৪২ "	৯ "
রৌপ্য	১০০০ "	২১ "
লৌহ	১৬০০ "	২৩ "

এই তালিকা দেখিলে বোধ হইবে যে বরফের গলন উত্তাপ যদিও অতি নিম্ন, উহার গলনতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে তাপে এক সের মাত্র বরফ গলে, সেই তাপে প্রায় পৌনে তিন সের দস্তা, সাড়ে পাঁচ সের রাং, নয় সের গন্ধক, ষোল সের সীসক, পৌনে চারি সের রৌপ্য ও সাড়ে তিন সের লোহা গলে। কিন্তু বরফের গলন উত্তাপ অতি নিম্ন (০ ডিগ্রী) বলিয়া উহা শীঘ্রই গলিতে আরম্ভ হয়। ঐ সকল বস্তু গলিতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণরূপ গলিতে যত সময় ও তাপ লাগে, তাহার মধ্যে বরফের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় ও তাপ লাগে। বরফ গলান সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত।

তরল বস্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া অনিলে পরিণত হয়। জল ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকে। সেই উত্তাপে যদি উহাতে তাপ সংযোগ করা যায়, উহার উত্তাপ না বাড়িয়া উহা অনিল বাষ্প হইয়া পড়ে, উত্তাপ সেই ১০০ ডিগ্রীই থাকে। প্রত্যেক মৌলিক ও বিশুদ্ধ যৌগিক তরল পদার্থের

বিশেষত্বই এই যে উহারা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে ফুটিতে আরম্ভ হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমিত তাপ প্রচ্ছন্নভাবে লইয়া সেই উত্তাপেই সম্পূর্ণরূপে অনিলে পরিণত হয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট তাপকে ঐ তরলের স্ফুটনতাপ ও উত্তাপকে স্ফুটনের উত্তাপ (Latent heat of vaporization and boiling point) বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ একবিন্দু তরল অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ উত্তাপ সমভাবে থাকে, সংযোজিত তাপ কেবল ঐ বস্তুকে অনিল অবস্থায় আনিতে ও রক্ষা করিতে ব্যয়িত হয়। নিম্নে কতকগুলি তরলের স্ফুটনের উত্তাপ ও স্ফুটনতাপ দেওয়া গেল :—

তরল	স্ফুটনের উত্তাপ	স্ফুটনতাপ
জল	১০০ ডিগ্রী	৫৩৬ ক্যালোরী
সুরাসার (বিশুদ্ধ)	৭৮ "	২০৯ "
টারপিন্	১৫৬ "	৬৯ "
পারদ	৩৫০ "	৬২ "
ক্লোরোফর্ম	৬১ "	৮১ "

এ স্থলেও জল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ লইয়া অনিলীভূত হয়। যে তাপে এক সের জল ফুটিয়া বাষ্প হয়, সেই তাপে নয় সের পারদ, আড়াই সের সুরাসার সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া যায়। বরফ গলান যেমন শক্ত জল ফোটানও তেমনি শক্ত।

এক দিকে যেমন তাপ দেওয়া আবশ্যক, অনিল হইতে তরল ও তরল হইতে কঠিন অবস্থায় আনিতে হইলে ঠিক সেই সেই পরিমাণ তাপ বাহির করা আবশ্যক। তাপ বাহির করা অর্থে শীতল করা। উত্তাপ সমভাবেই থাকে গলনের ও জমানর উত্তাপ এক। *

জলের অবস্থান্তর করিতে হইলে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাহাতে এক মহান শুভ সাধিত হয়। শীতপ্রধান প্রদেশে রাত্রিকালে তুষার পাত হইয়া পথ, মাঠ, গৃহছাদ প্রাঙ্গন ইত্যাদি সকল স্থানই বরফে ঢাকিয়া যায়। যদি সেই বরফ স্বল্প তাপেই গলিয়া যাইত তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হইয়া পড়িত; বৃক্ষ লতা শস্যাদির কথা দূরে থাকুক অনেক গৃহ প্রাসাদ ও জীবজন্তু সেই ভীষণ জলস্রোতে ভাসিয়া যাইত। তাপ অত্যন্ত অধিক আবশ্যক হওয়ায় বরফ ধীরে ধীরে গলে ও জল কতক বাষ্প হইয়া যায়, কতক বা স্বল্প বেগে নর্দ্দামা প্রভৃতি প্রণালী দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া যায়।

৪। রাসায়নিক ক্রিয়া। তাপ রাসায়নিক ক্রিয়ার অঙ্গ। রাসায়নিক সংশ্লেষণে যেমন তাপ উদ্ভূত হয়, তেমনি তাপসহযোগে অনেক স্থলে যৌগিক পদার্থসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তাপযুক্ত হইলে কাষ্ঠ জ্বলিতে আরম্ভ হয়। জ্বলন রাসায়নিক ক্রিয়া—ইহাতে কাষ্ঠের বিশ্লেষণ হইয়া কতকগুলি মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অনতিবিলম্বে অম্লজনের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সম্মিলনে এত তাপ জন্মায় যে কাষ্ঠখণ্ড ক্রমাগত জ্বলিতে থাকে এবং সেই কাষ্ঠ সংলগ্ন সমস্ত বস্তুকে

* বরফ ০ ডিগ্রীতে ৭৯ ক্যাঃ তাপ যোগে তরল হয়, আবার জলও সেই ০ ডিগ্রীতে ৭৯ ক্যাঃ তাপবিহীন হইলে জমিয়া বরফ হয়। তরল ও অনিলেরও রূপান্তরে এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়।

উত্তপ্ত করে। সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক পদার্থের সংমিশ্রণে তাপ উদ্ভূত হয় ও সেই তাপ আমাদের কাজে আসে। এ বিষয় বারান্তরে আলোচিত হইবে।

৫। তাপের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া। একখণ্ড ধাতুর দুই প্রান্ত অসমান উত্তপ্ত হইলে দেখা যায় যে একটি তাড়িতপ্রবাহ ঐ ধাতুর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাকে (Thero-electricity) "তাপের-তাড়িত" বলিলাম। এ বিষয়ও বারান্তরে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

আমরা মোটামুটি তাপের ধর্ম্ম দেখিলাম। বুঝিলাম তাপ নৈসর্গিক শক্তি, ক্রিয়াফল দেখিয়া উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। দেখিলাম জগতের বিরাট পরিবর্ত্তন সকল তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়। সকল তাপের মূল উৎস সূর্য্য। ঐ গ্রহরাজ হইতে আমরা যে শক্তি পাই, তাপ তাহার অন্যতম। সেই তাপ সাহায্যে জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। আজ যদি সূর্য্যদেব বাঁকিয়া বসেন ও তাপদানে বিমুখ হন তাহা হইলে এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে সমগ্র প্রাণীজগৎ ধ্বংস হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ বায়ুর গতি বন্ধ হইয়া প্রাণীর বাসস্থান বিষাক্ত বাষ্পে পূর্ণ হইয়া উঠিলে শীঘ্রই প্রাণনাশ ঘটিবে। জলীয় বাষ্পের অভাবে মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হইবে না। তাপের অপর মুখ্য উৎস রাসায়নিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার ফলে জীবদেহের উত্তাপ সংরক্ষিত হয়। মৃত্যু হইলে যখন দেহের মধ্যে আর রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না, তখন দেহের উত্তাপ চতুঃপার্শ্বস্থ কাষ্ঠ প্রস্তরাদির সহিত সমান হইয়া পড়ে। আমরা মৃতদেহ "হিম" হইয়া যায় ইহাই জানি কিন্তু বস্তুতঃ উহা অপরাপর বস্তু অপেক্ষা যে নিম্ন উত্তাপ বিশিষ্ট তাহা নহে। আমরা অভ্যাসবশতঃ দেহকে উষ্ণই দেখি; সুতরাং যখন সেই উষ্ণত্ব দূর হইয়া যায়, আমাদের একটা ধারণার অভাব আসিয়া পড়ে ও শৈত্যবোধই তখন উপস্থিত হয়। অহোরাত্র আমরা দেহকে সজীবই দেখিবার ও উষ্ণবোধ করিবার অভ্যাস করিয়াছি—সুতরাং সেই দেহের উত্তাপ চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুর উত্তাপ অপেক্ষা উচ্চ না হইলে, (সমান হইলেও) অভ্যাস-বশতঃ শীতল বোধ হয়। মানবদেহ কতকটা উত্তাপের প্রাখর্য্য ও কতকটা শৈত্য সহ্য করিতে পারে। সহনের মাত্রা অতীত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই মনে হয় আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ অগ্নির পূজা করিতেন—তেজঃ পদার্থের স্তবস্তুতি করিতেন—দেবতার ন্যায় তাপকে ভক্তি করিতেন।

তাপ কি ও কিসে উহার উৎপত্তি হয় তাহা বারান্তরে বলিব। এ প্রবন্ধে কেবল তাপের কার্য্য স্থূলতঃ বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম।

পরিভাষা

তাপ—Heat
উত্তাপ—Temperature
বিশুদ্ধ যৌগিক—Pure Chemical Compound
আয়তন—Volume
প্রসরণ—Expansion
আপেক্ষিকতাপ—Specific Heat
গলনতাপ—Latent Heat of Fusion
স্ফুটনতাপ—Latent Heat of Vaporisation.
শক্তি—Energy
এক গ্রাম (Gramme) প্রায় এক সেরের সহস্রাংশ পরিমিত ওজন।
১০০০ গ্রাম=১ কিলোগ্রাম=২ পাউণ্ড=১ সের।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

একাম্র-ক্ষেত্র।

প্রাচীন কলিঙ্গ আর নাই! উৎকলে তাহার কঙ্কাল আছে। ইতিহাসে তাহার স্মৃতি আছে। লয়-কর্ত্তার পীঠভূমিতে লয় ভিন্ন আর কি দেখিতে চাও?

কিন্তু নগর বড় সুন্দর ছিল। তরুচ্ছায়া-সুপ্ত রাজপথ, অমলজল জলাশয়, কারুকার্য্যময় প্রাসাদ,—কলিঙ্গে কিছুরই অভাব ছিল না। জগতের অনেক গৌরব সমাধির উপরে নূতন করিয়া প্রমোদশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু কলিঙ্গের শ্মশান-ভস্ম সরাইয়া, আর কেহ তেমন করিয়া শোভার নন্দন সাজাইতে পারে নাই। সে শ্মশান-ভস্মের উপরে এখন কেবল ভোরের আলো,—বিধবার জ্বালাদগ্ধ হৃদয়ে একমাত্র শিশুর মত খেলিয়া যায় আবার তমা-অমানিশার কৃষ্ণ-যবনিকা তাহার বক্ষে বিসর্পিত হইয়া গিয়া, সে শ্মশানদৃশ্য ঢাকিয়া দেয়। দু'দণ্ডের আলো ও ছায়া!

বাস্তবিক, একাম্র-ক্ষেত্রে যত ধ্বংসাবশেষ নজরে পড়ে, এমন আর উৎকলের কোথাও না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাই বলেন, পালি-শিলালিপি-উক্ত কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগর এখানেই ছিল। বুদ্ধের নব-প্রচারিত যে সাম্য-নীতি বিচ্ছেদ-বিষম ভারতখণ্ডে প্রেমের মোহনমন্দন রচনা করিতেছিল, কলিঙ্গ প্রথমযুগেই সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করে। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যপাঠে আমরা জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের পবিত্র চিতাভস্ম হইতে কলিঙ্গপতি বঞ্চিত হন নাই। অমূল্য বুদ্ধদন্তের রক্ষণগৌরবও কলিঙ্গের (মহাবংশ)। একটী সুন্দর মন্দিরে সযত্নে এই মহারত্ন রক্ষিত ছিল। এখন তাহা সিংহলে। শুনিতে পাই, পুরী হইতে তাহা সিংহলে স্থানান্তরিত হয়।

"Buddha's sacred tooth had been removed from Puri to Ceylon." (Statistical Account of Puri.—By Hunter 80—81. Vol XIX.)

অতএব বুঝা যাইতেছে কলিঙ্গরাজ্য বৌদ্ধজগতে একটী শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং সেই বৌদ্ধধর্ম্ম,—দশ শতাব্দীকাল কলিঙ্গভূমিতে আপনার গৈরিক-পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছিল।

(Balfour's "Cyclopædia of India."—Vol. III.—P.48)

নির্ব্বাণ-মূল বৌদ্ধধর্ম্ম অনাচার-প্রাবল্যে আপনিই যখন নির্ব্বাণোন্মুখ হয়,—তখন তাহা দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া গেল। সেই দ্বিবিভাগের নাম, মহাযান ও হীনযান। শেষযুগের অজ্ঞান এবং নামসর্ব্বস্ব বৌদ্ধ যতিগণ যখন দেখিলেন, অহিংসাবাদে জন-গণের ভক্তি আকর্ষণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, বিলাস-বিরাগী নির্ব্বাণ-বাদী আর তাহার চটুল জনসাধারণের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারিতেছে না—তখন তাঁহারা উপযুক্ত উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আপন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মস্থানটী সুরক্ষিত না করিয়া, তাঁহারা প্রচলিত নব মতের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন।

"বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেখিলেন, জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম, মানবের প্রতি পদস্খলনে

অবিচলিত দণ্ডহস্তে সে কেবল কর্ম্ম এবং ফলের মধ্যে অমোঘ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে, লোকে নিরাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সহজ বিধি দিলেন, যাজকমণ্ডলী সমীপে দুষ্কৃত স্বীকার করিলেই মুক্তি। * * সন্ন্যাসীরা মালাজপের ব্যবস্থা দিলেন, আশীর্ব্বচনের অমোঘতা প্রতিপন্ন করিলেন এবং স্থলবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও দিতে লাগিলেন। * * এইরূপে স্পষ্টতঃ না হইলেও নিঃশব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমার্গচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ্যের তন্ত্রজালে জড়িত হইয়া পড়িল। * * * সৃষ্টি হইল;—বৌদ্ধতন্ত্র যাহা যথার্থ বৌদ্ধ ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের কালস্বরূপ।" (৺বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। খণ্ডগিরি —৩৬০—৩৭২ পৃঃ)

"বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার নিজস্ব মত সম্পত্তির বিনিময়ে ব্রাহ্মণ্যের কতকথাংশ হরণ করিলেন—ব্রাহ্মণ্যও কতক কতক বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত ও ভাব গ্রহণ করিলেন, এইরূপে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীণপ্রাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রখর ব্রহ্মতেজে বিলীন হইয়া যায়।" (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "বৌদ্ধধর্ম্মঃ ২১ পৃঃ)।

এই নবসৃষ্ট অপূর্ব্ব বৌদ্ধতন্ত্র, যাহারা অবাধে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল,—তাহারাই মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত হইল। কলিঙ্গরাজ্য, সেই সাম্প্রদায়িকের দুর্গস্বরূপ।

কলিঙ্গে যখন কেশরী রাজগণের প্রবল আধিপত্য,—সেই সময়ে বিখ্যাত ভ্রমণকারী য়ুয়ন-চুয়াঙ্ এদেশে আসেন। কলিঙ্গকে তিনি উ-চা বা ওড্ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে উৎকলের বিস্তৃতি ছিল সাত হাজার লি—অর্থাৎ ১১৬৭ মাইল। য়ুয়ন-চুয়াঙের কলিঙ্গ ভ্রমণের কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। তিনি কলিঙ্গের যে উজ্জ্বল বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার করিলাম :—

"A hundred monasteries with ten thousand monks who study the law of the Great Translation. There are many parties who frequent the temples of the Devas. The followers of error and truth live pellmell."

বর্ত্তমান উৎকলই যে প্রাচীন ওড্,—সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই,—অন্ততঃ জেনারেল কানিংহাম সাহেবের এই মত। কেশরী-বংশীয়গণ, কেবলমাত্র যে শিল্পরম্য সৌধ-মন্দিরমালা নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নয়, পরন্তু দেব-ভোগ্য প্রচুর ভূমিদান করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কলিঙ্গে যাজক-মণ্ডলীর জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।*

* প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন :—"য়ুয়ন-চুয়াং যখন কলিঙ্গরাজ্য দর্শন করেন, তখন ইহা গঞ্জামের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ২৩২—২৫০ মাইল দূরে, ছিল। এবং ৩০৩ মাইল পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি।"—("South Indian Inscriptions."—P. 63)

মহাভারতের বনপর্ব্বে এবং কালিদাসের রঘুবংশে—কলিঙ্গের-নামোল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারত ও রঘুবংশের বর্ণন, পাঠ করিলে, বর্ত্তমান উৎকলই যে প্রাচীন কলিঙ্গ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

পণ্ডিত কোলব্রুক বলেন, "গোদাবরী নদীতীরেই প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অবস্থান ছিল।"
(Colbrok's Essays. Vol II. P. 179)

টলেমিও কলিঙ্গের অবস্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরের কাছেই।
(Indian Antiquary. Vol XIII. P. 363.)

মঠে বসিয়া বৌদ্ধযতিরা প্রমাদ গণিলেন। লয়-দেবের বিজয়-মহিমা আকাশে বাতাসে বাজিয়া উঠিল—মন্দির-চূড়ায় সূর্য্যকরদীপ্ত লৌহ-ত্রিশূল যেন তাঁহাদেরই বক্ষ-শোণিত-পানের জন্য তৃষিত,—ভিক্ষার ঝুলিতে আর কেহ তণ্ডুলকণা দেয় না,—নিখিলভক্তি আজ কেবল লুপ্তালোক বিরাট-রন্ধ্র মন্দির-গর্ভে মূক দেবতার পাষাণ-চরণে সাগ্রহে নিবেদিত হইতে লাগিল—চাহিনা আমরা সন্ন্যাসসর্ব্বস্ব শূন্যবাদ, কিন্তু ধর্ম্ম চাহি,—যাহা হিন্দহৃদয়ে সনাতন—যাহা ভোগে দাস্যে শোভন—কিন্তু জাগরণে নিত্য নূতন। পুরাতনকে ভবন দ্বার হইতে নির্ব্বাসিত কর—তাহার জরা, তাহার দৌর্ব্বল্য, তাহার কণ্ঠ-সুপ্ত অস্ফুট সঙ্গীত নিয়া সে বিলুপ্ত হইয়া যাক—উড়াও বিজয়-নিশান বাজাও পিনাকীর বিষাণ! যতিরা আপনাদের নিজ শৈলনিবাসে ফিরিয়া গেলেন—কেহ বা নূতনকেই বরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু এমন যে ধর্ম্ম,—যাহা জগৎকে ধারণ করেন,—তাঁহাকে লইয়া গিরিগুহায় বসিয়া থাকা চলে না। প্রচার চাই, কিন্তু সম্প্রদায়ে যতির অভাব এবং দেশে শুনিবার জন্য লোকের অভাব! গিরিগুহাতেও বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। এমনি অবস্থাতেই, সেই পবিত্র দেবতাস্থানীয় বৌদ্ধদন্ত,—একদিন যাহা ভূমানন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস এবং সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক ঐকান্তিক ইচ্ছার মধ্যে মহাযত্নে রম্যসুন্দর দেবালয়ের পূতবেদিকার উপরে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই আজ অযত্নে, অনাদরে মুষ্টিমেয় ভক্তের সহিত সিংহলে স্থানান্তরিত হইয়া গেল। এই পতনের ইতিহাস বিয়োগান্ত নাটকের শেষদৃশ্য অপেক্ষা শোচনীয়, অধিক মর্ম্মবিদারী। হা মানবহৃদয়! অসাধারণ তোমার বৈচিত্র্য,—অলৌকিক তোমার প্রকৃতি!

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই। শতাব্দীর ব্যবধান ইহার মধ্যে বিভেদ-রেখা টানিয়া দিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যের নব অভ্যুদয়ের প্রধান ক্ষেত্র,—এই একাম্র-ক্ষেত্র। এই পুণ্যভূমি কেবল হিন্দুর অপূর্ব্ব স্থাপত্যকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত নয়,—পরন্তু বিগত যুগের ধর্ম্ম-বিপ্লবের একটী উজ্জ্বল সাক্ষ্যস্বরূপ। এমন একদিন গিয়াছে, যখন সমগ্র উৎকলের ভাগ্য,—এই একাম্র ক্ষেত্রের শুভাশুভের উপরে নির্ভর করিত। রাজধানী এবং দেবধানীর এমন সুন্দর মিলন, অন্যত্র প্রায় দুর্লভ। এখন চারিদিকে তাহারই চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। একদিকে ভুবনেশ্বরের বিরাট শিখর যেন আকাশের নীলিমা বিদীর্ণ করিতে চাহিতেছে; অদূরে বনশ্যামলিত খণ্ডগিরি বক্ষে বৌদ্ধযতির বিজন তপালয় এবং শিরে জৈনমন্দিরের মুকুট পরিয়া যেন নিষ্ঠুর মহাকালের পদাঙ্ক গণনা করিতেছে; এখানে প্রাচীন রাজবংশের প্রাসাদ-কঙ্কাল; ওখানে লুপ্তবংশ নাগরিকগণের ধ্বংসচূর্ণ ভবনাবশেষ; মাঝে মাঝে অধুনা-পঙ্কিল দিব্যায়ত জলাশয়—তাহার হৃদয়ে কৃত্রিম দ্বীপ, তাহার চারিধারে অসংখ্য সোপান-স্তর,—এখন সে সোপানশ্রেণী পরস্পর-বিযুক্ত,—জীর্ণ—খণ্ডবিখণ্ড—কোন স্থানে বা একেবারে বিলুপ্ত! সবই গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে

কিন্তু এখনো বুঝি তাহার সেই বিরাট মহিমার কথা লোকে ভুলিতে পারে নাই! তাই আজও সেখানে নিত্য নূতন যাত্রী ছুটিয়া যায়,—পাষাণ দেবতার চরণে কেহ ভক্তির পসরা কেহ বা পাপের পসরা নামায়! তাই আজও সেখানে প্রভাতে সন্ধ্যায় আরতিবাদন বাজিয়া উঠে,—মহাকালের গভীর বন্দনাগানে ঘাটমাঠবাট ভরিয়া যায়! এবং এইজন্যই একাম্র-ক্ষেত্রের এত গৌরব!

ভুবনেশ্বরের পরিচয় আগে দিয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে একাম্র-ক্ষেত্রের অন্যান্য কতিপয় দেবালয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

একাম্র-ক্ষেত্রের অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনত্ব গৌরব,—একমাত্র পরশুরামেশ্বরের। ইহাই এখানকার ভিতরে—শুধু এখানকার ভিতরে কেন—সমগ্র উৎকলব্যাপী হিন্দু-নির্ম্মিত মন্দিরারণ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ফার্‌গুসান সাহেব বলেন,—"প্রাথমিক কেশরীবংশের সময়ে, উৎকলে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার নির্ম্মাণকৌশল সে সকল হইতে বিভিন্ন।" (History of Indian and Eastern Architecture.)

খৃষ্টীয় ৪৫০ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার বনিয়াদ চতুষ্কোণ—সকলদিকে ৩০ ফুট।

মন্দিরটী তেমন বড় নয়—উচ্চে ৩৮ ফুট মাত্র। ফার্গুসান আরো বলেন:—

"It may however, be that if this is really the oldest temple of its class, in Orissa, its design may be copied from a foreign example."

মন্দিরের আয়তন যৎসামান্য বটে,—কিন্তু কারুকার্য্য অসামান্য। আর সেই কারণেই ইহার এত আদর! ইহার আ চূড়া-ভিত্তিতল ক্ষোদিত মূর্ত্তি এবং বঙ্কিম পুষ্পলতায় আকীর্ণ, তাহার মাঝে অবকাশ নাই। আর সে অতুল্য শিল্প,—যদিও তাহা সর্ব্বত্র স্বাভাবিক নয়,—তত্রাচ, এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাপাতে এবং সুগঠিতভাবে সম্পূর্ণ,—যে একবার দেখিলে চোখ ফিরাইয়া লওয়া যায় না। হিন্দুশিল্পীর ইহা এক বিশেষত্ব। আমি এমন অনেক হিন্দুশিল্প দেখিয়াছি যাহা প্রতীচ্য কলার সম্পূর্ণ বিরোধী। হয়ত মূর্ত্তির হাতখানা এমনিভাবে বাঁকানো—যে তোমার আমার মত সহজ মানুষ, হাতখানা যথাদৃষ্টভঙ্গীতে বাঁকাইতে গেলে, অস্থিনামক কঠিন পদার্থটাকে রবারের মত স্থিতিস্থাপক করিয়া তুলিতে হইবে। হয়ত শিল্পী, মূর্ত্তির ভুরু জোড়া কুপাকারখোদনে এমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যে পশ্চিমদেশীয় শিল্পী হাসিয়াই খুন হইবেন। হয়ত যে সব লতাপাতা পাথরের গায়ে প্রকীর্ণ রহিয়াছে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পাঠ আগাগোড়া সারিয়া লইয়াও তাহার নামকরণ করিতে গেলে দর্শনেন্দ্রিয়টা আশ্চর্য্যরকম স্থির হইয়া যাইবে। তথাপি সেগুলির ক্ষোদনকৌশল, তাহাদের সূচাগ্রসূক্ষ্মবৎ পরস্পরবিযুক্ত রেখাবলীর মধ্যে এমন এক সৌন্দর্য্য, এমন এক নূতনত্ব আছে, যে সকল কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। আসল কথা, আর্য্য শিল্পের ভিতরে স্নিগ্ধতার যে একটী

পেলবকান্তি নজরে পড়িয়া যায়,—প্রতীচ্য শিল্পের কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না। প্রতীচ্য শিল্প অনাবশ্যক স্বাভাবিকতায় এমন তীক্ষ্ণ,—যে, দৃষ্টিকে প্রতিপলকপাতে বিদ্ধ করিতে থাকে। আমি এখানে আদর্শের দোষ ধরিতেছি না। কারণ সকল দেশের শিল্পই আপন আপন আদর্শ লইয়া শ্রেষ্ঠ। যে তীক্ষ্ণতা—যে অতি পরিস্ফুটভাব—যে স্বাভাবিকতা হিন্দুশিল্পে দুর্লভ,—হিন্দুশিল্পে দোষ বলিয়া কথিত,—তাহাই আবার অন্যদেশীয় শিল্পে যথাতথা নিবিষ্ট হইয়া দর্শকের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বুঝিতে পারি না, এখানে কাহার ভুল—কাহার ঠিক! এবং সেইজন্যই বোধ হয় এক আদর্শের অনুপাতে অন্য আদর্শের বিচার করিতে বসিলে, অবিচার করা হয়। জগতে সৌন্দর্য্য বলিয়া একটা যে বৃত্তি আছে, তাহার স্পন্দন সকলে একভাবে অনুভব করিতে পারে না। তাই মনুষ্য-জীবনেও দেখিতে পাই, কাহারো ভোমর কালো নয়নতারাই বুদ্ধিহারা হইবার পক্ষে প্রচুর, আবার কাহারো কাছে বা কটা চোখের বক্র কটাক্ষই ভয়ানক মারকবিশেষ। ফলে, দু'দেশের লোকেই দু'দেশের চোখকে নিন্দা করিয়া যাইতেছে, কিন্তু চোখের ক্ষতি কোথায়—তাহার কাজ সমানই চলিতেছে! এখন আদর্শের কথা থাক,—যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

পরশুরামেশ্বরের মন্দির-পরিমাপ ও তাহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে বালফোর বলেন,—

"That called Parasurameswara is 20 feet square and 38 feet high. * * It is supposed to have been built A.D. 450 or 500. (Cyclopœdia of India.—Vol. III.)

ইহার চাঁদনীর উপরে আকাশের মুক্তালোক আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে বারোটী জানালা আছে। একমাত্র "বেতাল দেউল" ভিন্ন উৎকলের অন্য কোন মন্দিরের বন্দোবস্ত এরূপ নয়। চাঁদনীর দক্ষিণ দ্বারপথে একটী শিলালিপি আছে। তাহাতে মন্দিরনির্ম্মাতা কোন কলিঙ্গ নরপতির বিষয় উৎকীর্ণ। মন্দিরের অনেক স্তম্ভ ভাঙিয়া গিয়াছে এবং মন্দির গাত্রেও কালের ক্ষতের অভাব নাই।

পরশুরামেশ্বরের মন্দির-শেষে একটী কুণ্ড আছে,—নাম গৌরীকুণ্ড। তাহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি মন্দির, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং সুন্দর মন্দির মুক্তেশ্বরের। ইহার কার্য্য প্রায় পরশুরামেশ্বরের মন্দিরেরই মত,—কিন্তু আরো চমৎকার। ইহার চাঁদনীও উৎকলীয় ছাঁচে গঠিত। ইহাতে স্তম্ভশ্রেণী নাই। এবং ইহার ছাদ, ভুবনেশ্বর ও কণারক মন্দিরের মত। মন্দিরের উচ্চতা ৩৫ ফুট। চাঁদনী ২৫ ফুট। চাঁদনীর ডানদিকে একটী পর্য্যোপরিস্থ খিলান আছে,—তাহা ১৫ ফুট উচ্চ। মুক্তেশ্বরের মন্দির বিন্দু সাগরের ঈশান কোণে। ইহার পূর্ব্বদিকেও "সিদ্ধ কুণ্ড" নামে এক কুণ্ড আছে। প্রবাদ, ঐ কুণ্ডের জল পান করিলে বন্ধ্যা রমণীও পুত্রসুখলাভে বঞ্চিতা থাকেন না এবং মৃতবৎসার সন্তান নষ্ট হয় না। কিছু দূরেই প্রসিদ্ধ আম্র-বন। তাহার শোভা অতুল্য এবং স্থানটীর চারিদিকে যে অবিদীর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে, তাহাও সাতিশয়

উপভোগ্য। বঙ্গের স্বর্গীয় ছোটলাট উডবরণ সাহেব, এখানকার নির্জ্জনতা এবং মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধভাবে শতমুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মুক্তেশ্বর-গাত্রস্থ কারুকার্য্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিলাম।

"একটি মহিলা, এক দণ্ডায়মান হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়াছেন এবং সম্মুখস্থ এক অসিচর্ম্মধারী অসুরের বিরুদ্ধে তাঁহার তরবার উন্মুক্ত। এক ব্যক্তি ভগবান শিবের উদ্দেশে দান করিতেছেন। হস্তিযূথের সহিত সিংহদলের সংগ্রাম হইতেছে। কোথাও যুবতী রমণীগণ। কেহ নৃত্যপরায়ণা, কেহ ক্রীড়াবিলসিতা এবং কেহবা মৃদঙ্গ বা তানপুরা বীণাবাদননিরতা ভীষণদর্শন জীবজন্তুগণ বিপুল ভার সকল বহন করিতেছে। সাধুগণ শিবার্চ্চনায় তদ্গতচিত্ত! একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। আর একজন তালপত্রে লিখিত পুস্তক পাঠ করিতেছেন। বইখানি একটী টুলের উপরে স্থাপিত। একটী ছাতির নীচে এক মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন। আর একজন একটী দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া,—তাঁহার হাতে একটী পায়রা। আরো কতকগুলি রমণী, কেহ তরুচ্ছায়া উপভোগ করিতেছেন এবং কেহবা কচ্ছপের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। শেষোক্ত মূর্ত্তিটী পৃথিবীদেবীর।" (Antiquieties of Orrissa Vol. II.) রাজারাণী মন্দিরও উৎকল স্থাপত্যের আর একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার স্তম্ভের নীচে তিনটী হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। তাহার উপরে তিনটী সিংহ,—কেশরীরাজবংশের বিশেষ চিহ্ন। আরো উঁচুতে একটী নাগিনী তাঁহার সপ্তফণাযুক্ত মাথা লইয়া,স্তম্ভের উদ্ধাংশ অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই নাগিনীদের মূর্ত্তি উৎকলের সমস্ত মন্দিরেই সংখ্যাতীত। শুধু উৎকল বলিয়া নয়, সমগ্র ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে এবং চিত্রমালায় নাগ নাগিনীর মূর্ত্তি খোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায়। এদিকে আর্য্যশিল্পিগণের একটা অহেতুক প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি মানুষেরই মত,—কেবল শিরস্থ সফন-সর্প তাহাদের পৃথক জাতিত্বের একমাত্র পরিচয়। কাহারও মাথায় একটির অধিক সাপ নাই; আবার কাহারও মস্তকোপরি সর্প সংখ্যা একাধিক।

দ্বারপথের উপরে নবগ্রহ শিলা। তাহাতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এইটী নয়টী গ্রহের প্রতিমূর্ত্তি। উৎকলের মন্দিরমালায়, এই নবগ্রহশিলার প্রাচুর্য্য ও বড় কম নয়। নাগনাগিনীর মূর্ত্তি অপেক্ষাও ইহার সংখ্যা বেশী। এবং কি শৈব, কি বৈষ্ণব,—সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মন্দিরেই ইহার ক্ষোদন-চিত্র নজরে পড়িয়া যায়।

উড়িষ্যার মন্দির নির্ম্মাণের আদর্শ বিবিধ। প্রথম আদর্শ,—যাহা আমরা মুক্তেশ্বর ও পরশুরামেশ্বরের দেবালয়ে দেখিতে পাই। আর ভুবনেশ্বরের মহামন্দির দ্বিতীয় আদর্শানুসারী। এই আদর্শের বিভেদ ধরিয়া বিচার করিলে, মন্দির নির্ম্মাণের কালনির্ণয়-সম্বন্ধে কোন গোলমালের ভয় থাকে না।

অনন্তবাসুদেবের মন্দির, নূতন করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। কিন্তু শিল্পাভিজ্ঞগণের সতর্ক দৃষ্টি ইহার উপরে পড়িবার

আগেই, মন্দিরের নিম্নাংশের কতক শিল্পকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ মন্দিরটি বেশ বড়। ইহাতেও চাঁদনী আছে, ভোগশালা আছে, নাটমন্দির আছে। উচ্চতা, প্রায় ৬০ ফুট। মন্দিরের একটী শিলালিপি দেখিয়া জানা যায়, যে এই দেবালয়, রাজা হরিব্রহ্মের মন্ত্রী, রাঢ়ী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ভট্টভব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। বাচস্পতি মিশ্র নামক এক ব্যক্তি এই শিলালিপিটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

অতএব, জানা যাইতেছে যে এ মন্দিরটী বড় বেশীদিনের পুরাতন নয়। মন্দিরাবস্থান বিন্দুসাগরের পূর্ব্ব তটে। মন্দির এবং তাহার চাঁদনী,—উভয়ই শিল্প-সুন্দর ক্ষোদন কার্য্যে রমনীয়। দেখিতেছি, উৎকলের রাজগণই কেবল শিল্প কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন এমন নয়; তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণও,শুধু রাজকার্য্যের হিসাবনিকাশের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যাপৃত থাকিয়াই মানব জীবনের সকল সমস্যা মিটাইয়া দিতেন না; পরন্তু তাঁহাদের কর্ম্ম চিন্তার অবসরও দেবতার জন্য কারু-শিল্প-কম বিরাম ভবন নির্ম্মাণে অতিবাহিত হইত। এবং এই সমবেত চেষ্টার ফলেই, উৎকলভূমি আজ জাগতিক স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে বরণীয়া হইয়াছেন। আবার বিদ্যমানকালে, তাঁহাদেরই বংশধরগণ, সভ্যতা ও শিক্ষায় ভারতবর্ষের সকল জাতির পশ্চাদ্বর্ত্তী! আশ্চর্য্য!

অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে যে থামালটী আছে—ভুবনেশ্বরের সকল মন্দির অপেক্ষা তাহা উচ্চ। মন্দির অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বলরামের মূর্ত্তি। একাম্র-ক্ষেত্রের অনেক দেবতার মত, তাঁহারা আজও ভক্তপ্রদত্ত খাদ্যের অভাবে অনাহারী হন নাই—তাঁহারা নিয়মিতরূপে ভোগ পান।

"বেতাল-দেউল" মন্দির, উৎকল-স্থাপত্যের আর একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ঐ মন্দিরটীর অবস্থা, তেমন মন্দ নয়। ইহার নির্ম্মাণাদর্শ, উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দির হইতে কিছু ভিন্ন। মন্দিরগাত্রে,—বহির্দ্দেশে নয়নরঞ্জন চারুশিল্প। ইহার চাঁদনী নবনির্ম্মিত। একাম্র-ক্ষেত্রের সকল মন্দিরের পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা যে কয়টীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম,—তদতিরিক্ত দর্শন যোগ্য অন্যান্য সুন্দর মন্দিরগুলির নাম এখানে দেওয়া হইল।

১। ব্রহ্মেশ্বর। ২। গোসংহস্রেশ্বর। ৩। কপিলেশ্বর। ৪। কোটিতীর্থেশ্বর। ৫। ঈশানেশ্বর। ৬। গোপালিনী। ৭। যমেশ্বর। ৮। যোগমাতা রাধা। ৯। জলেশ্বর। ১০। নাগেশ্বর। ১১। সিদ্ধেশ্বর। ১২। একাম্রেশ্বর। ১৩। সোমেশ্বর। ১৪। অলাবুকেশ্বর।

ইহার মধ্যে ব্রহ্মেশ্বরের নির্ম্মাণকাল, রাজেন্দ্রবাবুর মতে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ। চাঁদনী আছে। একটী ছাদাকৃতি উচ্চ বাঁধের উপরে মন্দিরটী স্থাপিত। ভুবনেশ্বরের অন্য কোন মন্দিরে ভিতর ও বাহির দুই অলঙ্কৃত নয়, একমাত্র ব্রহ্মেশ্বরে তাহা আছে। কোটীতীর্থেশ্বরও একটী খুব পুরাতন মন্দির। ৪০ ফুট উচ্চ। চাঁদনীর অভাব নাই। নাগেশ্বরের মোহনটী খুব উচ্চ। অলাবুকেশ্বর রাজার নাম পাইয়াছে। খুবই সাধারণ এবং মোহনটী নাগেশ্বর হইতেও ছোট।

হিন্দু দেবতাগণের মধ্যে মন্দিরবাস

সৌভাগ্য শিবের যেমন,—তেমন আর কোন দেবতার না। যেমন কাশ্মীরে অমরনাথ, চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ, মথুরায় সুন্দরেশ্বর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, কলিকাতার অনতিদূরে তারকেশ্বর, দেওঘরে বৈদ্যনাথ ও সেতুবন্ধে রামেশ্বর! শিবালয়ের নিঃশেষে নামোল্লেখ করা সহজ নয়। সোমনাথ এখন অতীতস্মৃতি। তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র এখনো পড়িয়া আছে।

হিন্দুত্বের পুনরুদ্বোধন কালে শৈব ধর্ম্মই তাহার প্রধান সহায় ছিল। হয় ত ভারতবর্ষে শিবপন্থিগণের প্রভুত্বের কারণ তাহাই। আর শুধু ভারতবর্ষ কেন, ইতিহাস আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে, যে এককালে প্রায় প্রাচীন সভ্য দেশমাত্রেই শিবপূজা প্রচলিত ছিল। এখানে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভরসা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রাচীন মিশরে,—এই লিঙ্গপূজা একটী বিশেষ সমারোহের ব্যাপার ছিল। মিশরের সংস্কৃত নাম মিশ্রদেশ। রুবেন বারো বলেন, "মিশর দেশের পিরামিডগুলিও শৈবমন্দির ভিন্ন আর কিছু নয়।" এ মতের মধ্যে সত্যের অস্তিত্ব কতটুকু, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তবে মিশরে যে লিঙ্গপূজার অভাব ছিল না,—তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। প্রাচীন কাহিনী বলে, টাইফনের অস্ত্রে খণ্ডীকৃতদেহ অসিরিসের বিধবা স্ত্রী আইসিস্ কর্ত্তৃক এই লিঙ্গপূজা সর্ব্ব প্রথমে মিশরে প্রচলিত হয়। তাহার পর, মিশর হইতে গ্রীসেও এই পূজার প্রচার হইয়াছিল। গ্রীক কবি অরিষ্টফেনিসের টীকাকারের কথায় জানা যায় যে এই পূজার একটি বিশেষ উৎসবও প্রতি পাঁচ বৎসর পরে এক একবার হইত। মিশরে এই লিঙ্গ পূজার নাম ছিল, "ফ্যালিক ফেষ্টিভ্যাল।" গ্রীসবাসিগণ ইহাকে "ডাইও-নেসিয়া উৎসব" বলিতেন। মনস্বী স্যর উইলিয়াম জোন্স বলেন, "সংস্কৃত ঈশ ও ঈশানী বা ঈশ্বর ও ঐশী শব্দ হইতে মিশরের অসিরিস ও আইসিস্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।" কিন্তু উক্ত দেশদ্বয়ে, এই পূজার সমারোহ এমনি অশ্লীলতাকলুষিত ছিল,—যে এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

একাম্র-ক্ষেত্রও এই জগদ্ব্যাপী মহাদেবের একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। এখানে শিবের অবস্থান সম্বন্ধে বহু পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর হইতে একটীর উল্লেখ করা গেল।

বিবাহ ত হইয়া গেল,—কিন্তু মহাদেব শ্বশুরবাড়ী আর ছাড়িতে চান না। বুঝি সন্ন্যাসের সে কঠোর সংযম দেবাদিদেবের কাছে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি যৌবনপুষ্পিতা পার্ব্বতীর পেলব প্রেমের মধ্যে আপনার চিন্তাবিযুক্ত মানসকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বড় সুখেই কালাতিবাহন করিতে ছিলেন।

এদিকে পার্ব্বতীর লাঞ্ছনার আর সীমা নাই। একদিন পুরস্ত্রীরা তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন "সতি! তোমার ভাগ্য ভাল! স্বামী পাইয়া তুমি দিনরাত বেশ সুখেই আছ! আর তোমার স্বামীরও লজ্জা নাই—তিনি ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীতে দিব্য রাজার হালে আছেন—ঘরে ফিরিবার নামটী নাই!"

পার্ব্বতী কহিলেন, "কত তপস্যা করিয়া তবে আমি এমন পতি পাইয়াছি। আমি

তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না,—তাই তিনি এখানে আছেন—নহিলে কবে চলিয়া যাইতেন!"

তখন মা আসিয়া মেয়েকে বলিলেন,—"বাছা! তোমার পতির কি গুণে তুমি ভুলিয়াছ? ও ছাইমাখা ছাইরূপ নিয়া তোমার স্বামী নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যান—তুমি গহনা পরিয়া, ভালো কাপড় পরিয়া আমার কাছেই সুখে থাক।" স্বামীর নিন্দা! মেয়ের অভিমান উথলিয়া উঠিল। এদিকে বিবাহের পর, মেয়েকে কুলোকাদ পা দিয়া দাঁড়াইতে হয়। স্বামী নিন্দাও সহ্য হয় না—বাপ মাকেও কথার ধার হইতে নিরাপদ রাখিয়া চলিতে হয়। কাজেই সতী স্বামীর কাছে গিয়া মায়ের নাম না করিয়াই বলিলেন "প্রভু! তোমার কি অন্য কোথাও থাকিবার যায়গা নাই? শ্বশুর-বাড়ীতে বেশীদিন বাস করা উচিত নয়।"

সিদ্ধি খাইলেও, শিবের বুদ্ধি ঠিক ছিল। তিনি সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়া, স্ত্রীকে লইয়া ষাঁড়ে চাপিয়া গঙ্গার তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সেখানে পঞ্চক্রোশব্যাপী পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই বারাণসী।

বারাণসীর রাজার স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব স্বীকার করেন, যে সেখানে যুদ্ধ বাধিলে তিনি রাজার হইয়া নিজে যুদ্ধ করিবেন। কিছু দিন পরে, বিষ্ণু, কাশিরাজের উপরে ভয়ানক চটিয়া, তাঁহার প্রতি চক্র সন্ধান করিলেন। এদিকে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত, শিবও রাজাকে বাঁচাইবার জন্য, চক্রবেগ প্রতিরোধার্থ আপনার পাশুপত অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কিন্তু পাশুপত বিষ্ণুচক্রের কিছু করিতে পারিল না। চক্র সমস্ত কাশীধাম দগ্ধ করিতে লাগিল। অগত্যা, মহাদেব বিষ্ণুর স্তবে বসিলেন।

তখন বিষ্ণু স্তবে তুষ্ট হইয়া শিবকে খুব বহু তিরস্কার বলিলেন "যদি কাশীত্যাগ করিয়া তুমি আমার পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইয়া বাস করো—তবেই আমি তোমার প্রার্থনায় তথাস্তু বলিব—নহিলে নয়।"

কাজেই, শিব আর কি করেন—বিষ্ণুর আজ্ঞামত একাম্র-ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

(স্কন্দপুরাণ—উৎকলখণ্ড।)

আর কিছু নয়,—শুধু জগন্নাথের মাহাত্ম্য বন্ধনচেষ্টাতেই এই কাহিনীর উৎপত্তি।

উৎকলের মধ্যে, চিত্রলিখিতবৎ প্রাকৃতিক শোভা যদি কোথাও থাকে,—তবে তাহা এই একাম্র-ক্ষেত্রে। মানবের কর্কশ কোলাহল প্রকৃতির সকল কবিত্ব নষ্ট করে। একাম্র-ক্ষেত্রে তাহার একান্ত অভাব। ইহার একদিকে ধান্য-হরিৎ সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে রত্নদ্রাববৎ সূর্য্যোকরোজ্জ্বলা বালুকাবিতানবসনা তটিনী; তাহার আশেপাশে মেদিনীমুকুটপ্রতিম শ্যামসুন্দর গিরি-রেখা। কোথাও দূরত্বনিবন্ধন তাহা জলদ লেখাবৎ। এবং প্রান্তর-প্রান্তভাগে শান্ত-শ্যামলিত কান্তার-অন্তরে যে অশ্রান্ত, অনন্ত মর্ম্মর-মন্ত্র ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন ঐ নীলাব্জ-নীল অম্বর চরণে নন্দিত বন্দনা-গাথা!

মন আপনাকে ভুলিয়া যায়,—শ্রবণ তখন পরিতৃপ্ত—নয়ন তখন নিষ্পলক—যেন মোহন-নন্দনের একটি মূর্ত্তসঙ্গীত এখানে কাহার মায়াপ্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে—সমীর-তালে তাহার ছন্দ এবং পাখীর ডাকে তাহার মূর্চ্ছনা!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

যীশুর জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যীশুর জন্ম, তাঁহার কার্য্যকলাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেকে আজকাল এই কথা বলিতেছেন যে, যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, ধীবর পুত্রদিগকে তাঁহাদের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলেন নাই; বা রোমাণদিগের ক্রুশকাষ্ঠে শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জনও করেন নাই; ওসকল গ্রীকদিগের পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, বাইবেল-বর্ণিত যীশু ধর্ম্মবিশ্বাসের চূড়ামণি ও প্রেমের অবতার। সে সুধামাখা জীবনীপাঠে আত্মা শীতল হয় ও প্রাণ মধুময় হইয়া উঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর কিছু অধিক হইল, যীশু প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত বেথলিহাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্যালেষ্টাইন তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আগষ্টাস সিজার, তখন রোম রাজ্যের সম্রাট। বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় যীশুর জন্ম কাহিনীও অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। তাঁহার জন্ম দেবপ্রসাদাৎ। সূত্রধর জোসেফের সহিত মেরীর বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল, এমন সময়ে মেরী গর্ভবতী হইলেন। এমন নারীর পাণিগ্রহণে জোসেফ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে এড়াইতে পারে? জোসেফের স্বপ্নাবস্থায় এক স্বর্গীয় দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মেরী পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, তুমি উঁহাকে গ্রহণ কর।

আগষ্টাস সিজার সে সময়ে এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, প্যালেষ্টাইন নগরে সকল নরনারী উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের নাম ধাম লিখাইয়া দিবে। জোসেফ মেরীকে সঙ্গে লইয়া প্যালেষ্টাইনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মেরীর আশু সন্তান প্রসবের সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইল, সরাইগুলি জনতাপূর্ণ, এজন্য এক অশ্বশালায় তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। এই স্থানেই পতিপত্নী নবকুমারের মুখ দর্শন করিলেন।

প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য জীবনে প্রকাশ না পাইলে, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের অবতার হওয়া যায় না, এজন্য তাঁহাদের জন্মের আনুসঙ্গিক ঘটনায় আমরা অলৌকিক কার্য্যেরই অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হই। বুদ্ধ জন্মিবার পূর্ব্বে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন যে, একটি শ্বেতহস্তী তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সংসারত্যাগী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ এক অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়; তাঁহার কোন এক বিখ্যাত শিষ্য আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন মানবের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় নাই। পরমহংসদেবের জননী কোন শিব মন্দিরে শিবার্চ্চনার জন্য গমন করেন, এমন সময়ে এক অলক্ষিত শক্তি তদীয় জননীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জীবনের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনা আরোপ করিয়া অবতারবাদ প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া, অতি ভ্রান্তির কার্য্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রোমের কোন কোন সম্রাটও মানব সম্ভূত নহেন বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছেন। যীশুর জন্মে আরো একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আকাশে সূর্য্যদেব উদিত থাকিলেও তারকা দেখা গিয়াছিল। শাস্ত্রবিদেরা বিনা সংবাদে তাঁহার এই জন্মকথা অন্তরে বুঝিতে পারিয়া মানবের এই পরিত্রাতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কংশের শ্রীকৃষ্ণ বধের চেষ্টার ন্যায় হেরদরাজাও তাঁহার প্রাণবধের জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

যীশুর বাল্যজীবনের ঘটনা, খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে অতি অল্পই দেখা যায়। শৈশব হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল তাঁহার চৌদ্দ বৎসরের সময়ের কথার কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। তিনি একদিন য়ীহুদিদিগের কোন ধর্ম্মমন্দিরে য়ীহুদি শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। সে সময় তাঁহার জননী তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া যীশু বলিয়াছিলেন, "কে আমার পিতা, কেই বা আমার মাতা," যিনি সেই সর্ব্বশক্তিমানের পূজা করেন তিনিই আমার পিতা এবং তিনিই আমার মাতা।" এ কথার উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদী কোন ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন, খৃষ্টের মাতা পিতার উপর এই উপেক্ষার ভাব হইতেই খৃষ্টীয় সমাজে অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, সংসারের উপর বীতরাগের ভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে।

যীশু চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমের পর, ত্রিশবৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত, কোথায় কাটাইয়াছিলেন, আর কি করিলেন, বাইবেল গ্রন্থে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধানে আমরা শুনিতেছি যে, যীশু ভারতের কোন বৌদ্ধমঠে শ্রমণদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। যীশু 'জন'এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়াই কেহ কেহ বিশ্বাস করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর যখন প্রচারের জন্য প্রস্তুত হন, তখন তিনি নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া ৪০ দিন ও ৪০ রাত্রি সাধনায় রত ছিলেন। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শয়তান আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, তাঁহাকে সংসারের ধনরত্ন প্রদানের কথা বলিয়া তাঁহার ব্রতভঙ্গ করিতে উদ্যত হয়, এবং বলে, "যদি তুমি আমার পদতলে পতিত হও, আমি তোমাকে এ সকলই প্রদান করিব।" যীশু তদুত্তরে "শয়তান পশ্চাতে যাও" বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। নরনারীর চিত্ত স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, যাহাতে রসনার তৃপ্তি হয়, যাহাতে নয়ন মন চরিতার্থ হয়, যাহাতে শারীরিক সুখ হয় সে সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করা সাধারণ মনুষ্যের দ্বারা সম্ভব নহে। সাধারণ লোকের সঙ্গে মহাত্মাদিগের এই খানেই প্রভেদ। যীশু এক মহৎ আদর্শ ধরিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন; ধরাধামে এক নবযুগের সূত্রপাত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার পক্ষে অন্তরের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি দমন ও বাহিরের সুখ সম্পদের প্রতি বীতরাগ প্রকাশ বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। এই প্রলোভন জয় যীশু চরিত্রের একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া বাইবেল

প্রভু ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেবল যীশুই যে নরকুলের মধ্যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা নহে। এই সূত্রধর পুত্রের জন্মগ্রহণের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কপিলবস্তুর রাজকুমার, সুন্দরী ভার্য্যা ও তদীয় ক্রোড়স্থ নবকুমার ও অতুল ধন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গয়াধামে গিয়া কঠোর সাধনায় রত হন। সেখানে তাঁহার সম্মুখে সংসার-বাসনা নানারূপ মোহিনীমূর্ত্তিতে তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিল।

যীশু নির্জ্জন প্রদেশ হইতে অন্তরে শক্তিলাভ করিয়া সজনে আগমন করিলেন। তখনও বৌদ্ধ শ্রমন যোহন জর্দ্দান নদীতীরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। যোহন একদিন সকলের নিকট যীশুর আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহা দ্বারা যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এ কথাও সকলকে বিদিত করিলেন।

যীশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। যাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশেষ মত বিস্তার করিতে চাহেন, তাঁহাদের অনুগত শিষ্যের প্রয়োজন। যীশু আপনার কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া, অনতিবিলম্বেই শিষ্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে দ্বাদশ শিষ্য মনোনীত করেন; তন্মধ্যে চারিজন ধীবর সন্তান। ইঁহারা নৌকা করিয়া গ্যালালীর সমুদ্রবক্ষে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেন, যীশু ইঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার অনুগমন কর, এবং প্রেমের জাল বিস্তার করিয়া নরনারীর মন প্রাণ প্রেমাধীন করিয়া ফেল। ম্যাণ্টপ্ খাজনা আদায় করিতেন, অপরে অন্যান্য কাজে লিপ্ত ছিলেন। যীশু শিক্ষিত ও ধনী লোকদিগের মধ্য হইতে শিষ্য সংগ্রহ করেন নাই। যাঁহারা সরল, সামান্য অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট, এমন সকল লোকদিগের মধ্য হইতেই তিনি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া, বিশ্বাসের ও প্রেমের রাজ্য সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বিফলে যায় নাই।

যীশু এই সময়ের মধ্যে একদিন পর্ব্বতের উপর গিয়া উপবেশন করিলে, তাঁহার শিষ্য-বৃন্দ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন তাঁহাদিগকে সংক্ষিপ্ত কথায় কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশগুলি তাঁহার উপদেশের সার। এই সকল কথার মধ্যে সমাজ বা বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই নাই; সকলি আধ্যাত্মিক উপদেশ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যদিও কোন স্থলে, তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, "দেখ সরোবর বক্ষে শতদল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, ইহারা বয়ন করে না, তথাপি ধনশালী সলমনও উহার একটির ন্যায়ও সুশোভিত হইতে পারেন নাই।" কিন্তু এটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অনুভব করিবার জন্য নহে, মানবকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবার জন্য।

যীশুর উপদেশগুলির মধ্যে একটা প্রধান কথা, 'স্বর্গরাজ্য'। স্বর্গরাজ্য কি, এ সম্বন্ধে সকলে একমত নহে। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গরাজ্য অর্থে যীশু অধ্যাত্মজগতের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহসংসারে নরনারী যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে, এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তিনি স্বর্গরাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান-চার্চ্চের কোন সুবিখ্যাত ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন "This Kingdom of God is nothing else, but perfect human conditions." এ ধরাধামে নরনারী সুখে বাস করিবে, যীশুর প্রচারিত স্বর্গরাজ্য ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যীশু তাঁহার প্রচারের মধ্যে প্রেমকেই সর্ব্বোপরি স্থান দান করিয়া গিয়াছেন। অগ্রে নরপ্রেম, তৎপর ভগবৎপ্রেম। আমরা খৃষ্টীয় বাইবেলে তাঁহার কথার এইরূপ প্রমাণ দেখিতে পাই,—

"When thou bringest thy gift to the altar and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift."

যখন তুমি বেদীর সম্মুখে পূজার জন্য কোন উপহার আনিবে, তখন যদি তোমার মনে হয়, যে কোন লোকের সঙ্গে তোমার অসদ্ভাব আছে, তাহা হইলে অগ্রে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া মনোমালিন্য দূর করিবে তৎপর পূজার উপহার বেদীর সম্মুখে প্রদান করিবে।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজে অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হয়। রোম্যান ক্যাথলিক চর্চ্চের প্রোটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার; দরিদ্রদিগের অর্থ লইয়া অনেক স্থলে অকর্ম্মণ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের বিলাসিতা বৃদ্ধি করা—যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা রক্তস্রোতে ধরা অনুরঞ্জিত করা, এ সকল মানব-প্রেমের পরিচয় নয়—যীশুরও শিক্ষা নহে। এ বিষয়ের আলোচনায় কোন একজন বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, "Christianity has sadly misrepresented Jesus. Jesus puts love for man, first, not love for God."

যীশু যে অগ্রে মানবপ্রেম, তৎপর ভগবৎ প্রেমের কথাই বলিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম সে ভাব প্রকৃতরূপে মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সাধু অসাধু সকলের উপর তাঁহার কি প্রেম! একবার কয়েকজন লোক তাঁহার নিকট এক স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া বলে, এই নারী দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকে। যীশু অভিযোগকারীদের কথা শুনিয়া বলিলেন,"এ নারী পাপ করিয়াছে; বেশ, তোমাদের মধ্যে যে কখন পাপ কর নাই সে উহার গাত্রে ঢিল নিক্ষেপ কর।" যীশুর এই কথা শুনিয়া সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তৎপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন "ঘরে যাও, আর পাপকার্য্যে রত থাকিয়া জীবন কলঙ্কিত করিও না।"

একবার একব্যক্তি যীশুকে আসিয়া বলে, আমার পুত্র ক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছে না। যীশু সেই ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। জননী পুত্র লইয়া উপস্থিত হইলে, যীশু তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার ক্ষিপ্ততা দূর করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা গুরুর এই আশ্চর্য্য শক্তি দর্শন করিয়া কিরূপে এ ঘটনা সম্পন্ন হইল, জিজ্ঞাসা করায় যীশু তাহাদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

যীশু অনেক সময় গল্পেরচ্ছলে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহার মধ্যে অপব্যয়ী পুত্রের গল্পটি অতি উৎকৃষ্ট। কোন ধনশালী ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করে। পিতা উভয়ের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন। কনিষ্ঠ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া কিছু উশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। পিতার অধীনে থাকিতে সম্মত হইল না। পিতার বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইল, এবং কোন দূরদেশে গিয়া অসৎসঙ্গে মিশিয়া, অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, পিতা-প্রদত্ত সকল ধনই নষ্ট করিয়া ফেলিল। ধনীর সন্তান তখন পথের ভিখারী হইয়া অন্নাভাবে কোন শূকর ব্যবসায়ীর শূকর চরাইবার ভার গ্রহণ করিল। য়ীহুদি জাতির মধ্যে একার্য্য অতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। বিপথগামী পুত্র অপকৃষ্ট কার্য্য গ্রহণ করিয়াও, উপযুক্ত-রূপে অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হইত না। অন্নাভাবে তাহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যে মনের দুঃখে গৃহত্যাগী পুত্র একদিন নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল, হায়! আমার পিতা ধনী, আমার বাড়ীতে কত দাসদাসী কার্য্য করিতেছে, আমি এমন পিতার সন্তান হইয়া আজ শূকর চরাইয়াও ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। এই আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর যেন জ্বলিয়া উঠিল। পিতার অবাধ্য হইয়া বিপথগামী হওয়াতেই যে তাহার এই শাস্তি তাহা সে তখন বুঝিতে পারিল; এবং মনের ক্লেশ পিতাকে জানাইয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে বলিয়া নিজ গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। পিতা পূর্ব্ব হইতে সন্তানের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, বহুদিন পরে পুত্রমুখ দেখিবার জন্য বাটী হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে সন্তানকে আসিতে দেখিয়া, তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া পুত্রের বাক্যস্ফুরণের পূর্ব্বেই দুইহাতে সন্তানের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন; উভয়ের চক্ষের জল একসঙ্গে মিশিয়া উভয়ের বক্ষস্থল ভিজাইয়া ফেলিল; পুত্র গৃহে আসিল। পিতা, পুত্রের জন্য দাসদাসীদিগকে পরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন, এবং তাহার আগমনের জন্য সেদিন রাত্রিতে প্রীতিভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

যীশু অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন ব'লিয়া কথিত আছে; ইহাতে আমরা বিস্মিত নহি, কেন না এরূপ ঘটনা আমরা আদৌ অসম্ভব বিবেচনা করি না। একজনের শরীর মনের উপর আর একজনের আধিপত্য বিস্তারের কথা ভারতভূমে নূতন নহে। অতিরিক্ত জড়বাদী পাশ্চাত্য জগতেও এই আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবের কার্য্য অনেকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং ভারতের অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তিরা পূর্ব্বে যে শক্তিসঞ্চারের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আজ প্রতীচ্য জগতে যাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই শক্তি পরিচালনের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, অধ্যাত্ম শক্তিরই জয় ঘোষণা করিতেছেন।

এই মহাপুরুষ কার্য্য করিতে করিতে শত্রুদিগের চক্রান্তে পতিত হইলেন। আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া তিনি অদূরস্থিত নিস্তব্ধ গেথসিমান উদ্যানে গমন করেন। অন্ধকার

রজনীই তাঁহার জীবনের শেষ রজনী। ক্রুশের যন্ত্রণা, রক্তমাংসের দেহ কিরূপে বহন করিবে এই ভাবনা তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছিল। যে প্রার্থনাকে তিনি জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রার্থনার সাহায্যেই অন্তরে বললাভ করিবার জন্য এই নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। যামিনীর অন্ধকার পোহাইতে না পোহাইতে জুডাস্ ইস্কেরিয়ট পঞ্চবিংশ মুদ্রার লোভে এক মশাল হস্তে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, মানবকুলের হিতৈষী, বিনয়ের অবতার, ভক্তচূড়ামণী যীশুকে শক্রহস্তে তুলিয়া দিল। পায়লেটের বিচারে রোমান আইন অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। যীশু ক্রুশকাষ্ঠে আবদ্ধ হইলেন।

খৃষ্টানদিগের পরিত্রাতা যীশুও এ সময় যথার্থ রক্তমাংস বিশিষ্ট মানবের ন্যায় এই কথা বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর! তুমি কি এখন আমায় পরিত্যাগ করিলে?" কিন্তু পেরেকের আঘাতে বক্ষস্থল হইতে যখন দরদর ধারে রক্ত বহিয়া যাইতে লাগিল, তখন হত্যাকারীদিগের জন্য এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ! ক্ষমা কর, ইহারা জানে না যে ইহারা কি কার্য্য করিতেছে।" যিনি জীবনে মানব-প্রেমকেই একমাত্র নিয়ামক করিয়াছিলেন, আজ জীবনের অন্তিমকালে সেই কথা উচ্চারণ করিয়াই প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া গেলেন।

এমন লোকের চরণে হৃদয়ের প্রীতির কুসুম অর্পণ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকা যায়? না করিলে মানবের মনুষ্যত্ব থাকে না—জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি হয় না। তবে দুঃখ এই; ভ্রান্ত মানব তাঁহাকে মহান্ পরমেশ্বরের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই প্রকৃত গৌরব-বিস্তারে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

মহাত্মা খৃষ্টের একটি উপদেশ।

মহাত্মা খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে সুন্দর ছোট ছোট গল্পে উপদেশ দিতেন। তিনি এক সময় তাঁহার শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "কোন নগরে সাতটি সুমতি ও সাতটি কুমতি স্ত্রীলোক থাকিত। তাহারা একদিন শুনিল 'অদ্য এক বর যাইতেছেন।' ইহা শুনিয়া তাহারাও ঐ বরের সহিত যাইবার সংকল্প করিল। সুমতি স্ত্রীলোকগুলি অগ্র হইতে তৈল, প্রদীপ প্রভৃতি সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া বরের প্রতীক্ষায় গন্তব্য স্থানে বসিয়া রহিল। আর কুমতি স্ত্রীলোকগুলি ভাবিল, বরের আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে, ততক্ষণ একটু ঘুমাইয়া লইনা কেন? দোকান ত নিকটেই, বর আসিবার কিঞ্চিৎ অগ্রে উঠিয়া তৈল, প্রদীপ প্রভৃতি কিনিলেই চলিবে। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা, সুমতিদের পার্শ্বে শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে বরের বাজনার শব্দ শুনা গেল, সুমতি স্ত্রীলোকেরা প্রদীপ উস্কাইয়া ব্যগ্র হইয়া বসিয়া রহিল, কুমতি স্ত্রীলোকেরা বাজশব্দে উঠিয়া দেখিল যে বর অতি নিকটে—তখন তাহারা সুমতি স্ত্রীলোকগুলিকে বলিল, "ভাই তোমরা

আমাদের কিঞ্চিৎ তৈল ধার দিতে পার?" সুমতিরা উত্তর করিল, "ভাই আমাদের তৈল অতি অল্প পরিমাণে আছে, তোমাদের ধার দিতে পারিব না।" তখন তাহারা তাড়াতাড়ি দোকানে তৈল কিনিবার নিমিত্ত গেল। ইতিমধ্যে বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সুমতি স্ত্রীলোকেরা সজাগ হইয়া বসিয়া ছিল, বর আসিবামাত্র তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। কুমতিরা দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বর অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন। তখন তাহারা সুমতিদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বরের বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরের বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা দ্বারে বার বার করাঘাত করিতে লাগিল। ভিতর হইতে বর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'তোমরা চলিয়া যাও, আমি তোমাদের চিনি না।"'

আমাদেরও সেই বরের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি কখন আমাদের লইতে আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই। তিনি যখনই আসিবেন, তখনই যেন আমাদের দেখিতে পান। আমরা যেন ঘুমাইয়া না পড়ি, বিলম্ব না করি। তিনি যেন আমাদের কখনও না বলেন "আমি তোমাদের চিনি না।"

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সমাধি-সাধ।

যেথায় পাপিয়া সনে,
গাহে নদী কুলু তানে,
মুখরিত চারিদিক সুমধুর গানে;
পায় ধরে আজি সাধি, দিও মোরে সেথা বাঁধি,
চির জীবনের সেই অনন্ত শয়ানে।

যেথা জ্যোৎস্না নিরমল,
ঝলসিছে ঝল মল
সুবিমল নির্ঝরণী সহস্র ধারায়;
বড় সাধ যায় মনে, আমি সেথা সঙ্গোপনে,
কাটাব জীবন মোর অনন্ত শয্যায়।

যেথায় ফুলের গন্ধে,
গাহে নব নব ছন্দে,
সৌরভ-মদিরা-প্রিয় বিহগ সকল;
বিকশিত বনস্থল, সুশোভিত তরুদল,
আমার সাধের সেই সমাধির স্থল।

যেথায় পেখম ধরি,
শিখী নাচে শাখা-পরি,
ভ্রমর গুঞ্জরে, যেথা পিকের সুতান;
যেথা শতদল শত, ঢালে সুধা অবিরত,
সেই ত আমার প্রিয় সমাধির স্থান।

যেথায় মলয়া সনে,
সুরভিত কুঞ্জবনে,
চৌদিক ছাইয়া হাসে ফুলের সুবাস;
সেই স্বপনের দেশে, সমাধি স্থাপিয়া শেষে,
রচিব অনন্ত শয্যা এই অভিলাষ।

শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর গুহ।

জাপানে অতিথিসৎকার।

অতিথিসৎকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারত-ইতিহাসে যতটা দেখিতে পাওয়া যায় অপর কুত্রাপি তেমন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। সমস্ত দিনের ভিক্ষালব্ধ অন্নে অতিথিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নিজে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকা, এবং অতিথির মনস্তুষ্টির জন্য একমাত্র পুত্রের মস্তক ছেদন করার বিবরণ কেবলমাত্র ভারতেই দেখা যায়। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা আমাদের শাস্ত্রেরই উক্তি। অধুনা জনসাধারণের অধিকাংশই উদরান্নচিন্তাভারগ্রস্ত:—দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাই পূর্ব্বের ন্যায় তেমন ভাবের অতিথিপরিচর্য্যা আমাদের ভিতর না থাকিলেও পল্লীর স্থানে স্থানে আজ পর্য্যন্তও কাহারো কাহারো ভিতর প্রাচীন আতিথেয়তার আভাসমাত্র দেখিয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই।

জাপানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, কূটনীতিজ্ঞ কাউণ্ট ওকুমাকে বক্ষ স্ফীত করিয়া কোন কোন সভায় বলিতে শুনিয়াছি—প্রাচ্য-সভ্যতা এশিয়ার পশ্চিম প্রদেশ হইতে ক্রমে জাপানে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে না পারিয়া সে সভ্যতা জাপানেই ঘনীভূত হয়। তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতা সেই বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমেরিকায় আসিয়াই ঘনীভূত হইয়াছিল। হঠাৎ বাঁধ কাটিয়া দিলে বন্যার জল যেমন চক্ষের পলকে নিম্নদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলে তেমনি আমেরিকার সে সভ্যতার বাঁধ ছিন্ন হওয়ায় আজ জাপান নব্য পাশ্চাত্য সভ্যতায় ডুবু ডুবু। সুতরাং জাপান আজ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে।

কাউণ্টের ঐ উক্তির প্রতিবাদ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমার মনে হয় জাপানে কোন সভ্যতাই তেমন ঘনীভূত অবস্থায় পরিণত হইতে পারে নাই; কেবল দুই সভ্যতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রন ঘটিয়াছে। উহাদের অতিথিসৎকার হইতেই ইহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আজ দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথম ছয় মাস ভাষা-জ্ঞান নিতান্ত কম ছিল বলিয়া জাপনীদের সহিত ততটা মেশামিশি করিতে পারি নাই। যাঁহারা ইংরাজী বলিতে পারিতেন এমন কতকগুলি বন্ধু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া গল্প স্বল্প করিতেন। সাত আট মাস অতীত হওয়ার পর উত্তর জাপানে সর্ব্বপ্রথম এক ভদ্রপরিবারে নিমন্ত্রিত হই। বাড়ীর কর্ত্তা সেনাবিভাগের একজন কাপ্তান, তাঁহার ছেলে আমাদের বন্ধু। তিনি কৃষিবিভাগের একজন গ্রাজুয়েট এবং আমাদের কালেজের জনৈক অধ্যাপকের জামাতা। তিনি হোক্কাইদো দ্বীপের গভর্ণর জেনারলের অফিসে কায করিতেন। তাঁহারা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সহর হইতে তিন মাইল রেলে গিয়া তাঁহাদের গ্রামের ষ্টেশনে নামিতে হয়। জাপানে স্ত্রী পুরুষ সকলেই চিত্র-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত; বন্ধু পূর্ব্বেই ষ্টেশন হইতে রাস্তা, ঘাট, বাড়ীর গেট, ঘর দরজা প্রভৃতি সুন্দর ভাবে কাগজে অঙ্কিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সে চিত্র হাতে লইয়া যে কোন ব্যক্তি অপরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অনায়াসেই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে। আমরা কেবলমাত্র দুইটী ভারতবাসীই তখন সে দ্বীপে বাস করিতাম, উভয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমরা বিদেশী, কোনরূপ অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া আমাদের বোর্ডিংএর একজন সহাধ্যায়ী বন্ধু স্বেচ্ছায়ই আমাদের সঙ্গে চলিলেন, তিনি ইংরাজী জানিতেন। আমরা বন্ধুর দ্বারদেশে 'মাপ করুন' বলিয়া উপস্থিত হইলাম। বন্ধু বাহির হইয়া হাটু গাড়িয়া অভিবাদন করিতে করিতে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বসিবার ঘরে ধরিয়া লইয়া গেলেন। জাপানী ঘর তাতামি অর্থাৎ এক প্রকার মাদুর আঁটা খড়ের গদিতে আবৃত। তাহার উপর কয়েকখানা ভল্লুকের চামড়া বিছান ছিল। চামড়ার উপর আবার প্রত্যেকের জন্য এক একখানা আসন রাখা হইয়াছিল। বড় লোকের বাড়ীতে সাধারণ ব্যবহারের জন্য এবং গরীবের বাড়ীতে অতিথির অভ্যর্থনার জন্য রেশমী আসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপবেশন করিলে মাথা হেঁট করিয়া পুনঃ পুনঃ কতকগুলি অভিবাদনের পদ আবৃত্তি করিতে করিতে আমরা পরস্পর পরিচিত হইতে লাগিলাম। সহাধ্যায়ী বন্ধু অনাহূত হইয়া, কেবল আমাদের সাহায্যের জন্য, তথায় গিয়াছেন বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করিলে পর তিনিও পরিচিত হইলেন। দুইচারি কথার পর বন্ধুর স্ত্রী হাটু গাড়িয়া কয়েক পাত্র চা আমাদের সম্মুখে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতে করিতে পরিচিত হইলেন। প্রায় সকলের বাড়ীতেই প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চায়ের জন্য জলের কেটলি আগুনের উপরই চাপান থাকে। কোন আগন্তুক বাড়ীতে আসিবামাত্রই গরমজলে শুষ্ক চা-পত্র ছাড়িয়া দিয়া সবুজ চা (Green tea) দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়;—আমাদের বাংলা দেশে যেমন পান তামাক দেওয়া রীতি। প্রথম প্রথম ঐ চায়ের আস্বাদন আমরা টনিক ঔষধের মত মনে করিতাম। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে দেখিলাম শীতপ্রধান দেশে উহার প্রক্রিয়াও অনেকটা টনিক ঔষধের ন্যায়। চা আমাদের সম্মুখে রাখা হইলে পর বন্ধুর এক ভগিনী এক ঝুড়ি আপেল, নাশপাতি এবং কয়েকখানা ছুরি রাখিয়া হাটু গাড়িয়া অভিবাদন করিতে করিতে পরিচিত হইলেন, এবং অপর এক ভগিনীও কেক বিস্কিটের পাত্র রাখিয়া পূর্ব্বোক্তভাবেই পরিচিত হইলেন। এইরূপে সকলে পরিচিত হইয়া আমাদের সম্মুখ হইতে গিয়া পাশের ঘর হইতে উঁকি মারিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। বন্ধুর মা ও ঠাকুর মা খানিকটা দূরে পর্দ্দার আড়াল হইতে অতি সঙ্কোচের সহিত এক একবার আমাদিগকে দেখিতে ছিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধা, প্রাচীনের লজ্জা আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের ভিতর অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। বন্ধু গ্রাজুয়েট হইলেও নিজে ইংরাজী বলিতে কিম্বা অপরের ইংরাজী বুঝিতে পারিতেন না, শুধু বই পড়িয়া বুঝিতেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চেয়ে বেশী ইংরাজী জানিতেন। আমরা ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। সহাধ্যায়ী তাহা জাপানীতে তর্জ্জমা করিয়া বন্ধুকে

বুঝাইতে লাগিলেন। বন্ধু কখন কখন ইংরাজীতে দুই এক কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে শিশুর কথা কহিবার মতো চেষ্টা, অপর কক্ষ হইতে রমণী কণ্ঠের হাস্য তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে উপবেশন করিলাম। বন্ধুর তৃতীয় অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভগিনী অন্ন, ব্যঞ্জন, ভাজা, মিষ্টি প্রভৃতি সামগ্রী পুনঃ পুনঃ হাটু গাড়িয়া পরিবেশন করিলেন। তিনি জলযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া এই উপলক্ষে পরিচিত হইলেন। জীবনের সর্ব্বপ্রথম সেই দিনই জাপানীদের ন্যায় দুইখানা কাষ্ঠ শলাকার সাহায্যে আহার্য্য মুখে তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আহারান্তে এক ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় নানাভাবে অভিবাদন করার পর সহরে চলিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য ষোড়শোপচারে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেও প্রতি বিষয়ে ত্রুটি স্বীকার করা ইঁহাদের অভ্যাস! আমরা সেদিন উঁহাদের ভিতর গ্রাম্য সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মাঝে মাঝে আমরা ঐ গ্রামেরই অপর এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ যাইতাম। এই বাড়ীতে সহরের আড়ম্বরমিশ্রিত অভ্যর্থনাতেও গ্রাম্য সরলতা উপলব্ধি করিয়াছি। বৃদ্ধা মাঠে কৃষিকর্ম্ম করিতেন; তিনিই বাড়ীর কর্ত্রী। তাঁহার ছেলেমেয়েরা রাজধানী টোকিও সহরের স্কুলকলেজে পড়াশুনা করিতেন। সেখানেই তাঁহাদের সহিত আমাদের জানাশুনা। এক ভাই আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো সহরে পড়িতেন, এক বোন চীনে শিক্ষকতা করিতেন এবং আর এক ভাই ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহাদের সেখানে গেলে গান বাজনা ও খেলার যোগাড়যন্ত্র যেমন থাকিত খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তও তেমনি হইত। বৃদ্ধা আমাদের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলে মাঠের কায বন্ধ করিয়া খুরপী, রেক প্রভৃতি কৃষি যন্ত্র হাতে লইয়াই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহার সরলতায় এবং আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের বৃদ্ধাদের সরলতায় যেন কোন পার্থক্য দেখিতাম না। বৃদ্ধা তাঁহার ছেলেমেয়েদের গল্প করিয়া আনন্দে আটখানা হইতেন। একদিন বৃদ্ধা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই হঠাৎ আমরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তাঁহার ছেলেমেয়েরা কেহ বাড়ীতে ছিল না। আমরা বাড়ীর বাহির হইতেই ফিরিতেছিলাম কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই ফিরিতে দিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন যে যদি তোমরা বাড়ীর বাহির হইতেই ফিরিয়া যাও তাহা হইলে আমার ছেলেমেয়েরা মনে করিবে যে আমি তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করি নাই; তাহারা হয়ত ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়াই দিবে। অগত্যা তাঁহার অনুরোধে আমরা ভিতরে গিয়া বসিলাম। তাঁহার আট বছরের দৌহিত্রীটিকে কেক বিস্কিট প্রভৃতি আনিতে দোকানে পাঠাইয়া তিনি আমাদের সহিত নানা রকম গল্প করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, জাপানের যে কোন পল্লীতে কেক, বিস্কিট, সোডা, লেমনেড, ল্যাম্প, চিমনি, শাক তরকারী প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের দোকান আছে। জলযোগ করিয়া যখন আমরা

ঘরে ফিরিতেছিলাম তখন বৃদ্ধা ১২টি ডিম আনিয়া জোর জুলুম করিয়া আমাদের পকেটে দিলেন। আমরা কিছুতেই লইতে রাজী না হওয়ায় বৃদ্ধা বড় দুঃখিতা হইলেন। তিনি বলিলেন, বাবা তোমরা বোর্ডিংয়ে থাক। মাবোনের মত কেহ তোমাদের খাওয়া দাওয়ার তত্বাবধান করিতে নাই, তোমরা ষ্টোভে, নিজের ঘরেই ভাজিয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া খাইতে পার। আর যদি তাহাতেও অসুবিধা মনে কর কাঁচা ডিম শুধু ভাঙ্গিয়া মুখে ঢালিয়া দিলেই অনেক উপকার। আমার কথা রাখ, ডিম কয়েকটি লইয়া যাও। আমরা বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে এবং অভিবাদন করিতে করিতে ডিম কয়েকটি লইয়া প্রস্থান করিলাম। জাপানী ছাত্রগণ প্রতিদিনই কাঁচা ডিম খাইয়া থাকে। পরীক্ষার সময় প্রত্যেকে দৈনিক ৫।৬ টা ডিম খায়। উত্তর জাপানে এক একটা ডিমের দাম পাঁচ পয়সা।

কলেজের ছেলেদের সহিত দল বাঁধিয়া যদি কখনো কোনো বাগানে গিয়া আপেল, আঙুর কিম্বা নাশপাতি প্রভৃতি ফল খাইয়া আসিতাম অন্যান্য সকলে ভাগে উহার দাম দিত কিন্তু আমাদিগকে দাম দিতে দিত না। উহারা বলিত তোমরা আমাদের অতিথি, তোমাদের নিকট হইতে দামের অংশ লইতে পারি না। কয়েকজন মিলিয়া পার্কের পুকুরে নৌকা চালনা অভ্যাস করিতে যাইতাম, তাহাতেও আমাদের নিকট হইতে ভাড়া লইত না। প্রথম বৎসর জাপানের উত্তর ভাগে সকলের কাছে আমরা ঠিক অতিথির ন্যায় বিবেচিত হইতাম।

বুদ্ধদেবের তিরোধান দিবসে প্রতি বৎসর মন্দিরে মন্দিরে পূজা অর্চনায় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমরা কয়েকজন জাপানী বন্ধুর সহিত সে সমারোহ ব্যাপার দেখিতে মন্দিরে গিয়াছিলাম। মন্দির লোকে পূর্ণ; মোমের বাতি জ্বালিতেছিল, ধূপধূনার গন্ধে চৌদিক আমোদিত। পুরোহিতগণ একটি বাদ্যযন্ত্রের সহিত তাল মিলাইয়া পালি, চীন, কোরিয় এবং জাপানী ভাষা মিশ্রিত মন্ত্র উচ্চস্বরে গাহিতেছিলেন। আমরা গিয়া তথায় উপবেশন করিবা মাত্রই কয়েক জন অভ্যর্থনা কমিটির লোক আসিয়া আমাদিগকে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে প্রাঙ্গনের মত এক স্থানে ধরিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে দুইটি বৃদ্ধা অতি নতভাবে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া মন্দিরের প্রসাদ খাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা ওরূপ খাদ্যে অভ্যস্ত না থাকায় শুধু সবুজ চা গ্রহণ করিলাম। আমাদের জাপানী বন্ধুগণ প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাদ্বয় হাটু গাড়িয়া আমাদের চক্ষু, মুখ, নাসিকা, ভ্রূ প্রভৃতি ওছাকা ছামার (বুদ্ধদেবের) ন্যায় বলিয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। আমাদের দুই একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা জাপানী কথা শুনিয়াই যেন উঁহারা উঁহাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। আমরা রাস্তা ঘাটে নব্য-জাপানী কর্তৃক নিগ্রো নামে অভিহিত হইলেও পল্লীর বৃদ্ধাদের নিকট আজ পর্য্যন্তও যেন অনেকটা দেববংশ সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হই।

'রাজধানী তোকিও সহরের আতিথেয়তা কৃত্রিমতা পূর্ণ, পাশ্চাত্যের আভরণে অলঙ্কৃত; স্বার্থে বিজড়িত এবং বাহ্যিক শিষ্টাচারে মুখরিত। তোকিওর জাপানী বন্ধুগণ উত্তর

অঞ্চলের বন্ধুদের ন্যায় নহে। উহাদের সঙ্গে কোন উৎসবে যোগ দিলে উহারাই আমাদের স্কন্ধে চাপিত। বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতেও অনেক সময় নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিয়াছি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। সদাগরের জাতিতে যেরূপ আশাকরা যায় তাহাই উপলব্ধি করিয়াছি। যাঁহারা ব্যবসাবাণিজ্যে ভারত হইতে অর্থ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব অথবা যাঁহাদের অন্য কোন রূপ অভিসন্ধি আছে তাঁহারাই মহা সমাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্যানুসন্ধানে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। স্বার্থবিহীন স্থলে প্রায়ই মৌখিক আত্মীয়তা দেখা যাইত। সহরে বন্ধুবান্ধবের সমাগমে গান বাজনা, হাসি-তামাসার ফোয়ারা ছোটে। কোন বন্ধু দেখা করিতে আসিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহার সহিত যে প্রকারেই হউক তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেই হইবে। আমরা অনেক সময় উহাতে বিরক্তি এবং ক্লান্তি বোধ করিতাম। অনেকে বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া আমাদের নিকট ইংরাজী শিখিতে আসিত। জাপানে স্কুলকলেজের সহপাঠী কিম্বা বন্ধুদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ অপরের বাড়ীতে গেলেই চা বিস্কিট দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে। তারপর গল্পপ্রসঙ্গে যদি আহারের সময় উপস্থিত হইয়া পড়ে তবে বন্ধুকেও আহার করাইতে হয়। দিনে উহাদের তিনবার প্রধান ভোজন—প্রাতে সাড়ে ছয়টায়, মধ্যাহ্নে বারোটায় এবং সায়াহ্নে ছয়টায়।

অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন কাটাইতে আমরা এতটুকুও দ্বিধা বোধ করি না। আমার পিসতুত ভাইয়ের শ্যালকপুত্র জজের উকিল, মাসে তিন চারি শত টাকা উপার্জ্জন করে, তাহার ঘাড়ে চাপিলে অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্নবস্ত্র না দিয়া পারিবে না;—এই ভাবে আমরা দশজনে এক জনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছি; কিন্তু জাপানীয়া অতি নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতেও একদিনের বেশী দুদিন থাকিতে গেলেই লজ্জা এবং ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আমি কয়েক জনকে জানি যাহাদিগকে মামলামোকদ্দমা এবং উমেদারী উপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য মফস্বল হইতে তোকিও সহরে আসিতে হইয়াছিল। শ্বশুর প্রমুখাৎ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ী ঐ সহরে রহিলেও হোটেলে থাকিয়া উহারা কায করিত। দেখাসাক্ষাতের জন্য কেবল একবেলা আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল।

গ্রামের অনেক ছেলে সহরে পড়িতে যায়। সহরে যাহাদের আত্মীয় আছে তাহারা আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়াই পড়াশুনা করে; যেহেতু আত্মীয়েরা অভিভাবকের ন্যায় তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, বোর্ডিং কিম্বা হোটেলের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হারে খরচ দিয়াই প্রত্যেককে আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট অথবা হাউস অব লর্ডের মেম্বরের বাড়ীতেও এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইউরোপ এবং আমেরিকার ন্যায় জাপানে এ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারে কোন ভারতীয় ছাত্র থাকিতে পায় না। একাই কাওয়াগুচি নামক যাজক বংশীয় জনৈক ভদ্র জাপানী কয়েক বৎসর

কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে রাজার হালে অবস্থান করেন। আমাদের জাপানস্থ কোন ভারতীয় বন্ধুর আত্মীয় স্বজন উক্ত কাওয়াগুচি মহাশয়ের নিকট অনেক অনুরোধ করিয়া উঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। ছেলেটি জাপানী কাঁচা এবং পচা খাদ্যে অভ্যস্ত না থাকায় প্রায় দুই সপ্তাহেই গুরুতর আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েন। অগত্যা তিনি উক্ত বাড়ী ছাড়িয়া পুনরায় ভারতীয় ছাত্রদের মেসে আসিয়াই বাস করেন। যথা নির্দ্দিষ্ট হারে হিসাব পরিষ্কার করিয়া কাওয়াগুচি মহাশয়ের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার কালে উঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া কয়েক দিনের জন্য একটি বাক্স সেখানে রাখিয়া আসেন। কয়েক দিন পরে বাক্সটি আনিবার সময় জানা গেল বাক্স রাখিবার ভাড়া চুকাইয়া না দিলে বাক্স উদ্ধার হইবে না। যাজকই হউন আর লর্ডই হউন সকলের ভিতরই সদাগরী ভাব। কেহ অপরের নিকট হইতে, বিশেষতঃ বিদেশীর নিকট হইতে সুযোগ পাইলে এক কপর্দ্দকও ছাড়ে না।

বিবাহ অতি সংক্ষেপে বাড়ীতে সম্পন্ন

বালিকার অতিথিসৎকার।

করা হয়। বিবাহাদি ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব যথাসময়ে কোন এক হোটেলে গিয়া ভোজন এবং আমোদ উৎসব সমাধা করিয়া আসেন। বিবাহস্থলে নিমন্ত্রিতের উপস্থিতি প্রায়ই দেখা যায় না।

উঁহাদের আতিথেয়তা নব্য এবং পাশ্চাত্য ভাবাপন্নই হউক আর স্বার্থ বিজড়িতই হউক উপসংহারে উঁহাদের একটি বিষয়ের প্রশংসা না করিয়া পারি না। সেটি বড় লোকের সহিত নিঃস্ব গরীব লোকের মিলন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখিতে পাই নিঃস্ব গরীব লোক দূরের কথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তান যদি কোন বড় লোকের সাক্ষাৎ অভিলাষী হইয়া এক সপ্তাহ কাল হাবুডুবু খাইয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হয়েন তবে তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। জাপানীদের অতি বড় লোকও

সামান্য ব্যক্তিকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা ভারতীয় ছাত্রগণ তথাকার বড় বড় ব্যক্তির তুলনায় অতি নগণ্য ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ কাউণ্ট ওকুমা, ধনকুবের ব্যারণ শিবু ছাওয়া, এবং সুশিক্ষিত ব্যারণ খান্দা, এম, এ, প্রমুখাৎ লর্ড এবং পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরগণের দ্বারা আমরা যে ভাবে অভ্যর্থিত হইতাম তাহাতে মনে হইত, যেন আমরাও তাঁহাদেরই সম্পদস্থ ব্যক্তি! বৃদ্ধ কাউণ্ট ওকুমা এক পদে ভর করিয়াই ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন। রাজনৈতিক প্রতিযোগীতায় জনৈক ছষ্ট লোক লোক কর্ত্তৃক আহত হইয়া কাউণ্ট এক পা হারাইয়াছেন।

সময় সময় কলেজের অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী যাইতাম; অধ্যাপকপত্নী দরজায় হাটু গাড়িয়া অভিবাদন করিতে করিতে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির দ্বারদেশে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এবং সাধারণ লোকের দ্বারদেশে ক্ষুদ্র পিত্তলের ঘণ্টা লাগান আছে; আগন্তুকের আগমন-আভাস পাওয়ামাত্রই বাড়ীর কেহ না কেহ দৌড়িয়া আসেন। সাধারণতঃ রমণীরাই অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাটু গাড়িয়া দরজা খুলিয়া থাকেন।

দ্বারদেশে হাটু গাড়িয়া অভ্যর্থনা।

আজ যদি আমি কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হই তবে ঘরে ফিরিয়া কালই আমাকে তাঁহার সদয় অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে, এমন কি সহপাঠীদিগের ভিতরও এ প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যদি পরস্পরের বাড়ী অতি নিকটেই হয় তাহা হইলে সশরীরে গিয়া কৃতজ্ঞতামূলক অভিবাদন করিয়া আসিতে হয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

অপূর্ব্ব সোনার মেয়ে।

(১)

আমার সোনার মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে,
আজি আমি বুঝিয়াছি বেশ,
চাচর চিকুর কেশে নয়ন ভুলানো'বেশে
নাই, নাই—সৌন্দর্য্যের লেশ!

চাঁপার মতন কান্তি তা' শুধু আঁখির ভ্রান্তি;
বিম্বাধর, তাও মাগো ফাঁকি!
কে তবে রূপসী মেয়ে বুঝেছি মা তোরে পেয়ে'!
—বুঝেছি মা তোর কাছে থাকি!

(২)

যে রূপসী কহিনুর তারো রূপ হয় চুর,
কাচ সম ভেঙ্গে চুরে যায় ;
চপলা চমক সম কান্তি যার অনুপম,
তাও মাগো আঁধারে মিশায় !
সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ হায় বরিষা-বুদ্‌বুদ প্রায়
মিশাইতে নাহি থাকে বাকী !
কে তবে রূপসী মেয়ে বুঝেছি মা তোরে পেয়ে,
বুঝেছি মা তোর কাছে থাকি !

(৩)

অলোকসামান্যা কন্যা, লোকবরেণ্যা, ওলো ধন্যা,
ওলো কন্যা শতপুত্র জিনি,
যারে হেরি অনুরাগে প্রীতি পবিত্রতা জাগে,
সেই কন্যা ভুবনমোহিনী !
বিশ্বপ্রেম জেগে উঠে, আনন্দ লহরী ছোটে,
ইচ্ছা করে সবে ভালবাসি ;
হেরি যার মুখকান্তি ঘোচে আত্মপর ভ্রান্তি,
সেই কন্যা লাবণ্যের রাশি !

(৪)

তোরে হেরি, নমুধন,* দুনয়নে প্রেমাঞ্জন
মাখিয়াছি—যেই দিকে চাই
হবিময়, হরিময়, রামময়, কৃষ্ণময়
শ্যামময় দেখিবারে পাই !
তাই তুই রূপসী মা ! কি মহিমা, কি গরিমা !
দীপ্তিছটা বদনে প্রকাশে।
দেখ সবে ত্বরা করি, রূপে বিশ্ব আলো করি,
ভুবনমোহিনী কন্যা হাসে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

শাপে-বর।

১

নিখিলবাবু ও সতীশবাবু দুইজনে কলিকাতার এক বড় আপিসের মালিক। উপেন্দ্র সেই আপিসের অল্প বেতনভোগী সামান্য কেরাণী ; রামবাবু সেখানকার বড় কেরাণী। বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী এবং খুব বিশ্বস্ত বলিয়া আপিসের মালিক দুইজন, আপিসের দেখাশুনা প্রভৃতি সমস্ত ভারই রামবাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ! রামবাবু লোকটি একটু কড়া। তিনি নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না,— অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ঘানির বলদের মত খাটাইয়া মনিবদের মনোরঞ্জন করিতেন।

উপেন্দ্র এইজন্য রামবাবুকে আদবেই দেখিতে পারিত না। সে মনে মনে ভাবিত, "রামবাবুরই বা এত প্রতিপত্তি কেন ? তিনি মোটে দু'তিন ঘণ্টা কাজ করেন, আর আমি সেই দশটা থেকে ছটা পর্য্যন্ত একটানা পরিশ্রম করি—একটু জল খাবারও অবসর পাই না। রামবাবু পান পাঁচশত টাকা, আর আমার মাহিনা মোটে কুড়ি টাকা !"

সেদিন উপেন্দ্র কাজ শেষ করিয়া, টেবিলের উপর কাগজগুলি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া একবার ঘড়ির দিকে চাহিল—সাতটা বাজিয়া গিয়াছে ! আপিসে আর কেহ নাই। কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া

* কন্যাটির নাম "নর্ম্মদা", আমরা আদর করিয়া তাহাকে "নমুধন" বলিয়া ডাকি।

বাড়ি ফিরিতে উপেন্দ্রের প্রায় প্রত্যহই এইরূপ দেরী হয়। কিন্তু আজ উপেন্দ্রের মনটা কি জানি কেন বড়ই খারাপ ছিল।

উপেন্দ্র যখন বাড়ি ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। গৃহে গৃহে দীপ জ্বালা হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত উপেন্দ্র জামা কাপড় ছাড়িয়া একখানা মাদুর টানিয়া খানিকক্ষণ এদিক ওদিক গড়াইয়া, হাতমুখ ধুইল। তাহার পর কিছু জলযোগ করিয়া আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

পথে বাহির হইয়াই সে একটি চুরুট কিনিল;—চারি পয়সায় একটি চুরুট কেনা আজ তাহার প্রথম। চুরুটটি ধরাইয়া, অবসন্ন মনে নিরুদ্দেশভাবে উপেন্দ্র যখন রাস্তায় বেড়াইতেছে তখন হাওয়ার মত বেগে একটা জুড়ি গাড়ি তাহার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। উপেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, গাড়ি নিখিলবাবুর। তাহার দৈন্য আরও ফুটিয়া উঠিল—মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

বেড়াইতে বেড়াইতে উপেন্দ্র একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে সে কখনও এরূপ স্থানে আসে নাই। অনেকেই দোকানে বসিয়া চা পান করিতেছিল। উপেন্দ্র কি করিবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দোকানের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দোকানদার নিকটে আসিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাইয়ের কি চাই?"

অপরাধীর মত আস্তে আস্তে উপেন্দ্র কহিল, "এক পেয়ালা চা।"—ভাবিয়াছিল এক পেয়ালা চায়ের দাম ত আর দু'পয়সার বেশি নয়।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, "কত দামের দিব?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপেন্দ্র কহিল. "কম দামের যা আছে তাই দিন।"

দোকানদার বলিল, "চার পয়সার কমে নাই।"

উপেন্দ্রের কাছে মোটে দু'পয়সা ছিল। সে তখন কি করে? অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "না মশায়, আমার চা চাইনে।" বলিতে তাহার আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল।

কোনরকমে বাহিরে আসিয়া উপেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এমন বিপদেও লোকে পড়ে! সে রাত্রে উপেনের ঘুম হইল না—চায়ের দোকানের ঘটনা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

পরদিন আপিসে আসিতে উপেন্দ্রের প্রায় একঘণ্টা দেরী হইল। ইতিপূর্ব্বে এত দেরী তাহার আর কখনও হয় নাই। কাজ করিতেও সেদিন তাহার অনেক ভুল হইল।

একবার রামবাবু আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া গেলেন "উপেন, আজ তোমার কাজে বড়ই অমনোযোগ দেখ্‌চি—এরূপ হইলে চলিবে না।"

একে উপেন্দ্র রামবাবুকে মোটেই দেখিতে পারিত না, তাহার উপর রামবাবুর এই কথাগুলি তাহার প্রাণে বড়ই লাগিল। রামবাবু চলিয়া গেলে সে ক্রোধকম্পিতস্বরে আপনমনে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, কাজ এবারে ভাল কোরেই করব।"

সেদিন জলখাবারের ছুটির সময় উপেন

ডাকঘর হইতে তাহার বহুক্লেশোপার্জ্জিত দেড় শত টাকা উঠাইয়া লইল এবং আপিস হইতে ফিরিবার সময় ভাল ভাল জামা, কাপড়, ঘড়ি, ঘড়ির চেন ইত্যাদি কিনিল এবং কিছু টাকা হাতে রাখিল।

২

সেদিন শুক্রবার। আপিসের কাজ শেষ করিয়া উপেন্দ্র দেখিল, আপিসে সে ছাড়া আর কেহই নাই। আপিসের চারিদিক ভাল করিয়া ঘুরিয়া দেখিল—সত্যই কেহ নাই। উপেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে রামবাবুর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল; দু'একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া, একটি চাবি দিয়া রামবাবুর ডেস্ক খুলিল। ডেস্ক খুলিয়া আপিসের চেক-বই বাহির করিতে তাহার হাত কাঁপিল। আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া, আর একবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, একখানি পুরাতন চেকের উপর নূতন বইয়ের একখানি চেক রাখিয়া উপেন্দ্র কোনমতে আপিসের নাম জাল করিল। চেক দু'খানি পাশাপাশি রাখিয়া উপেন্দ্র দু'তিনবার ভাল করিয়া মিলাইয়া লইল। তাহার পর চেক লইয়া সে যখন রাস্তায় বাহির হইল, তখন তাহার মুখ শবের ন্যায় বিবর্ণ।

কতদিন উপেন্দ্র এই পথ দিয়া গিয়াছে কিন্তু আজ সেই চিরপরিচিত পথও যেন তাহার পায়ে ঠেকিতে লাগিল। একটু শব্দ হইলে উপেন্দ্র চমকিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে!

উদ্বেগ ও আশঙ্কায় উপেন্দ্র কোনরকমে বাড়ি পৌঁছিল।

৩

পরদিন আপিসে আসিয়া উপেনের বোধ হইতে লাগিল যেন সকলের দৃষ্টিই তাহার দিকে! যেন সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে! অন্যদিন উপেন্দ্র কেমন হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা কহে, আজ সে ভাল করিয়া কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া চাহিয়া কথা কহিতে পারিল না। উপেন্দ্রের ভাবান্তর দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

বেলা তিনটা পর্য্যন্ত নামমাত্র কাজ করিয়া, উপেন্দ্র একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল। সতীশবাবু, নিখিলবাবু, ও রামবাবু তিনজনেই আপিসে রহিয়াছেন। এই ত চেক ভাঙাইবার শুভ অবসর! অসুস্থতার ভাণ করিয়া উপেন্দ্র রামবাবুর কাছে ছুটি চাহিল।

উপেন্দ্রর মুখের দিকে তাকাইয়া রামবাবু বলিলেন, "সত্যিই উপেন, দু'তিনদিন থেকে তোমাকে কেমন কেমন দেখাচ্চে। কাজ কর্‌তেও তেমন মন নেই।" কি হয়েচে বল দেখি?"

উপেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া কেবল বলিল, "শরীরটা ভাল নেই।" রামবাবু তাহাকে ছুটি দিলেন।

৪

পরক্ষণেই উপেন্দ্র ব্যাঙ্কের সম্মুখে উপস্থিত। দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া, একেবারে সোজা ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিল। অনেকেই চেক ভাঙাইতেছে—সেও চেকটি ব্যাঙ্কের কেরাণীর হাতে দিল। চেকটি হাতে পাইয়াই কেরাণী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল;

তাহার পর ব্যাঙ্কের বড়বাবুকে চেকখানি দেখাইয়া উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নোট নেবেন, না টাকা নেবেন?"

উপেন্দ্র কহিল, "নোট।"

নোট হাতে পাইয়া না গুণিয়াই উপেন্দ্র তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ি ফিরিয়া উপেন্দ্র রামবাবুকে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি দিল—ডাক্তার তাহাকে কিছুদিনের জন্ত স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। সে আজই রাত্রিকালে রওনা হইবে। কবে ফিরিবে তাহার ঠিক নাই।

৫

সন্ধ্যাকালে নববেশে সজ্জিত উপেন্দ্র একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ট্রেনে উঠিল—ভাবিল এইবার তাহার মনের সকল চঞ্চলতা দূর হইবে। কিন্তু ট্রেনও যেমন ছাড়িল সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাদ ও চিন্তার ছায়া তাহার মনকে ছাইয়া ফেলিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "কেন এ কাজ করিলাম?"

পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া, গুণিয়া তৎক্ষণাৎ আবার পকেটে রাখিয়া উপেন্দ্র মনে মনে বলিল, "না, এত অশান্তি কে জানিত!"

৬

পরদিন প্রাতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া, উপেন্দ্র একটি প্রসিদ্ধ হোটেলে বাসা লইল।

সন্ধ্যার পর উপেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইল। অশান্তমনে একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া তখনই আবার হোটেলে ফিরিয়া আসিল।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া উপেন্দ্র একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না,—ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে এখন কি করিবে?

ভাবিতে ভাবিতে উপেন্দ্র যেন একটা কিনারা পাইল—সে এক মুহূর্ত্তেই স্থির করিল মনিবদের নামে সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে আবার জমা দিবে।

পরদিন হোটেলের সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিয়া উপেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল এবং ব্যাঙ্কে সমস্ত টাকা মনিবদের নামে জমা দিল।

৭

উপেন্দ্রকে আপিসে দেখিয়া রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপেন, শরীর কেমন? কোথাও যাও নাই?"

উপেন্দ্র কহিল, "আজ্ঞে না। টাকার অভাবে যাওয়া হয় নাই।"

সেদিন মনিবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপেন্দ্রের কোনো সুবিধা ঘটিল না। পরদিন আপিসের সম্মুখে উপেন্দ্র এবং নিখিলবাবুর দেখা হইল।

নিখিলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপেন, কেমন আছ?"

অভিবাদন করিয়া উপেন্দ্র বলিল, "ভাল আছি।" তাহার পর একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

নিখিলবাবু কহিলেন "কি কথা উপেন?"

উপেন্দ্র বলিল, "একটু নির্জ্জনে হলেই সুবিধা হয়।"

"আচ্ছা, আমি এখন একটা দরকারী

কাজে যাচ্চি, অন্য সময়ে দেখা কোরো।” বলিয়া নিখিলবাবু চলিয়া গেলেন।

সমস্তক্ষণ নিখিলবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে উপেন্দ্র অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উপেনের কথা নিখিলবাবুর মনে না থাকায়, তিনিও উপেনকে ডাকেন নাই, উপেনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করে নাই।

৮

ইহার পর তিনদিন কাটিয়া গিয়াছে। নিখিলবাবুর সহিত উপেনের সাক্ষাতের কোনও সুযোগ ঘটে নাই।

চতুর্থ দিনে নিখিলবাবু চেকবই পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, ১৯শে তারিখে কুড়ি হাজার টাকার একখানি চেক লেখা হইয়াছে। তিনি ত দেখিয়াই অবাক। নিখিলবাবু তখনই জমার খাতা বাহির করিয়া দেখিলেন, সমস্ত টাকাই আবার দু'তিনদিন পরে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবু মনে মনে কহিলেন, “এত কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ আমি বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলাম না। কে ইহা করিল? আপিসের বাবুরা কখনই এরূপ কাজ করিতে সাহসী হইবে না। নিশ্চয় ইহা সতীশবাবুর কাজ। সতীশবাবুর এ কি অন্যায়। আমাকে না বলিয়া এরকম কাজ করা তাঁহার কখনই উচিত হয় নাই। আপিসের বাবুরা জানিতে পারিলেই বা কি মনে করিবে! ওহো, ঠিক কথা! উপেন্দ্র বোধ হয় এই বিষয়ই আমাকে নির্জ্জনে বলিতে চাহিয়াছিল। ভারি হুঁসিয়ার লোক!”

উপেন্দ্রের ডাক পড়িল।

নিখিলবাবু ডাকিতেছেন শুনিয়া উপেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে সে নিখিলবাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এইবার বুঝি ধরা পড়িলাম!

নিখিলবাবু যখন বলিলেন, “উপেন, তুমি কি সেদিন আমার সঙ্গে চেক্ সম্বন্ধে কোন কথা কইতে চেয়েছিলে?”

উপেন জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল, “আজ্ঞে হাঁ।—”

উপেনের কথায় বাধা দিয়া, নিখিলবাবু টেবিল চাপড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও বিষয়ে আমি সব জানি। ও টাকা আমিই ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছিলেম, আবার দু'দিন পরেই জমা দিয়ে দিয়েচি। তোমাদের ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই। আর খাতায় যেন ওটা তোলা না হয়। বুঝ্‌লে?”

প্রথমে উপেনের বড় ভয় হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। সে বলিল “কিন্তু—”

“কিন্তু আবার কি? যা বল্‌ব তাই করবে। যাও এখন।” বলিয়া নিখিলবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সতীশবাবু সেই ঘরে আসিয়া দেখেন যে, টেবিলের উপর চেকবইখানি এবং জমার খাতা এলোমেলো-ভাবে খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে চেকবইয়ের একটি পাতার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ত একেবারে অবাক্! কুড়ি হাজার টাকা লওয়া হইয়াছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না! এ কাহার কাজ? নিশ্চয়ই নিখিলবাবুর!

তাহা না হইলে কে এমন কাজ করিতে সাহসী হইবে! বাবুরা জানিতে পারিলে আপিসের উপর তাহাদের কেমন করিয়া বিশ্বাস থাকিবে! যা'হোক কেহ টের না পায়—উপেনকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত।

এই ভাবিয়া সতীশবাবু উপেনের নিকট গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "দেখ উপেন, ১৯শে তারিখে ব্যাঙ্ক থেকে আমি কুড়ি হাজার টাকা ধার করেছিলাম; আবার সমস্ত টাকাই জমা দিয়ে দিয়েচি। খরচখাতায় ওটা যেন তোলা না হয়—কারবারের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিয়া উপেনের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে সতীশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "যে আজ্ঞে।"

আপিসে সেদিন উপেনের কেবলই মনে হইতেছিল "এ কি কাণ্ড! আমি করলাম চুরি কিন্তু মনিবরা নিজের ঘাড়ে দোষ নিলেন।"

৯

ইহার পর সতীশবাবু ও নিখিলবাবুতে একটু মনোমালিন্যের সূত্রপাত দেখা গেল। সতীশবাবু মনে মনে ভাবিতেন "আমি যে নিখিলবাবুর কাণ্ড জানিতে পারিয়াছি, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।" নিখিলবাবুরও মনে হইত, "আমি যে এ বিষয়ে সমস্ত জানি তাহা সতীশবাবুরও অজ্ঞাত নাই।" নিখিলবাবু মনে মনে বলিতেন "একথা সতীশবাবুর আমাকে এতদিনে জানান উচিত ছিল।" সতীশবাবুও তাহাই মনে করিতেন, "একথা নিখিলবাবুর আমাকে এতদিনে জানান উচিত ছিল।"

কিন্তু কাহারও কাছে কেহ এসম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করেন না। এমন করিয়াই বা কতদিন চলে? সতীশবাবু ঠিক করিলেন, তিনিই এ কথা প্রথমে নিখিলবাবুর কাছে ভাঙিবেন। এই স্থির করিয়া, সতীশবাবু, একদিন নিখিলবাবুকে বলিলেন, "দেখুন নিখিলবাবু, ১৯শে তারিখে ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি হাজার টাকার একখানি চেক ভাঙান হয়েছিল।"

সতীশবাবুকে প্রথমে এই কথা উত্থাপন করিতে দেখিয়া, নিখিলবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সতীশবাবুই এই কাজ করিয়াছেন। উত্তেজিত হইয়া, নিখিলবাবু উত্তর করিলেন, "এবং সে টাকা দু'দিন পরেই আবার জমা দেওয়া হয়েচে।"

নিখিলবাবুকে এইরূপ উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে শুনিয়া সতীশবাবুর মনে হইল, তাহা হইলে নিখিলবাবুই এই কাজ করিয়াছেন। গম্ভীরভাবে সতীশবাবু বলিলেন, "আমাদের মতন লোকের কারবারে এমন না হওয়াই কি অভিপ্রেত নয়?"

"নিশ্চয়ই—সর্ব্বতোভাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় মনের ভার লাঘব হইয়া উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইয়া গেল। কিন্তু কে এ কাজ করিয়াছে তাহার কিছু ঠিকানা হইল না।

১০

এই ঘটনার একমাস পরে, বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব শেষ হইলে দেখা গেল, আপিসের বিস্তর লাভ হইয়াছে। একদিন

কথাপ্রসঙ্গে সতীশবাবু নিখিলবাবুকে বলিলেন, "উপেন খুব বিশ্বাসী লোক।"

নিখিলবাবু তদুত্তরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

সতীশবাবু কহিলেন "তাহার মাহিনা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।"

নিখিলবাবু বলিলেন, "আমিও এতদিন মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম। কত টাকা বাড়ান যাইবে? কুড়ি না ত্রিশ?"

"গরীব মানুষ—ত্রিশই বাড়ান যাক্।"

উপেনের ডাক পড়িল।

উপেন বিপদ গণিয়া কম্পিতপদে মনিবদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

উপেনের মুখের দিকে তাকাইয়া সতীশবাবু বলিলেন, "দেখ উপেন, তোমার কাজকর্ম্ম দেখিয়া আমরা খুব খুসী হইয়াছি। তোমার মাহিনা এ মাস থেকে বাড়াইয়া দিলাম। তুমি কুড়ি টাকা বেতন পাইতে, আগামী মাস হইতে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাইবে।"

উপেন মনে মনে কারাগৃহের যে চিত্র দেখিতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! আনন্দে উপেনের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। কোনরকমে মনিবদের ধন্যবাদ দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।*

শ্রীনগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

করুণ-কঠোর

প্রলয় মূর্ত্তি ধরিয়া এসেছ দুয়ারে;
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে!
ধূর্জ্জটি তব জটাজাল উড়ে গগনে,
মাতে উন্মাদ নৃত্য ঝঞ্ঝা পবনে,
ললাট নেত্র চমকে আঁধার ভেদিয়া!
হে ঈশান, তব প্রলয় বিষাণ ফুকারে;
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে!

হে নিঠুর, এলে করুণ মূরতি ধরিয়া,
সব তাপদাহ নিমেষে লইলে হরিয়া!
ঝরিছে তোমার বেদনা বরষা প্লাবনে,
রুদ্ধ দুয়ারে করিছ আঘাত সঘনে;
মধুরে ভীষণে মিলন নেহারি অপরূপ;
প্রলয়, সৃজন, নাচিছে বিশ্ব পাথারে!
রুদ্র, দয়াল, নমি বার বার তোমারে!

অম্বর ঘেরি ডম্বরু তব বাজে হে;
এস হে ভিখারী, এস মঙ্গল সাজে হে।
এমনি ধূলায় ধূসর করিয়া লহ গো,
আদেশ তোমার বজ্রের রবে কহ গো,
দগ্ধ করিয়া সকল অশিব সংশয়
রিক্ত করিয়া করহে পূর্ণ আমারে!
হে শিব, কঠোর, নমি বার বার তোমারে

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিমান ও মিলন।

অগ্নিগর্ভ গিরি যথা অনল পুষিয়া,
ধূম্ররাশি করে পরিহার,
অভিমানে দৃপ্ত হৃদি গুমরি গুমরি,
দীর্ঘশ্বাস ত্যজে বারবার।
যথা ঝঞ্ঝা তীব্র মেঘগর্জ্জনের শেষে
বর্ষণেতে শীতল গগন,
উগ্র বাগ্‌যুদ্ধ শেষে, প্রিয়জন সহ
আঁখি জলে তেমনি মিলন।

শ্রীকালিদাস রায়।

---

* একটি ইংরাজি গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

ব্যক্তি ও সমাজ।*

একটি হিন্দুমহিলা একবার এক অতি নির্জ্জন প্রদেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারেন নাই। অত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "দেখ, সেখানে অসুবিধা কিছুই ছিল না, সব রকমেই ভাল, কিন্তু মানুষ যেখানে নাই, সেখানে থাকিতে পারি না।" তাহাতে বলা হয়, "আপনি কলিকাতায় গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারও বাড়ী যাইতে পান না। মধ্যে মধ্যে দুই একটা কুটুম্ব ভিন্ন আর কাহারও সহিত ত' আলাপের সুবিধা হয় না, তবে কলিকাতায় আর সে স্থানে কি তফাৎ হইল?" তিনি উত্তর দিলেন, "মানুষের গায়ের যেন একটা আঁচ আছে। চেনা-শোনার দরকার নাই, আমার চারিধারে মানুষ আছে, এটা জানিলেই মন বেশ থাকে।"

কথাটি মানব চরিত্রের একটি অন্তঃনিহিত গূঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। একটা না একটা সমাজ না হইলে আমরা থাকিতে পারি না। সমাজের মধ্যেই আমাদের জন্ম, স্থিতি ও লয়। সমাজের বহির্ভূত হইলে যেন দিগ্‌ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে এবং দণ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুকে নির্জ্জনকারাবাস অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করে। ইহাও দেখা যায় যে, নির্জ্জন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রায়ই উন্মাদগ্রস্ত হয়, অথবা আত্মহত্যা করে। আরও দেখিতে পাই যে, সমাজসঙ্গ হইতে কোন প্রকারে বঞ্চিত না হইলে এই সত্যের উপলব্ধি প্রায়ই আমরা করিতে পারি না।

ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি সামাজিক সত্য আছে, যেগুলিকে, ঘটনাবিশেষের সাহায্য না পাইলে বা অবস্থাবিশেষে পতিত না হইলে, আমরা বুঝিতে পারি না। অথচ এই সমস্ত বুঝিবার উপর আমাদের শুভাশুভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কারণ, ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, সমাজ ব্যতীত আমাদের অস্তিত্বই নাই। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজ না থাকিলে আমাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। এইরূপ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের অস্তিত্বই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা এই অগণ্য সমাজ পরম্পরায় আধুনিকতম ফলস্বরূপ। আবার, সমাজ যে শুধু আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছে, তাহা নহে, আমাদের জীবন রক্ষাও করিয়াছে। জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে যত দিন আমরা স্ব স্ব জীবনোপায় সংগ্রহক্ষম হইতে না পারি, ততদিন সমাজ আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা ও বিপদাদি হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে। তাহার পরও, জীবনধারণের উপায়োপার্জ্জনক্ষম হইলেও, সমাজ সেই উপায়ের সুবিধা করিয়া দেয়, যাহাতে আমরা শারীরিক ও মানসিক শক্তির সঞ্চালনে কর্ম্ম করিয়া তদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। আবার আমরা আজ যে এ স্থলে

* ভবানীপুর সাহিত্যসমিতির দশম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত, ১লা বৈশাখ ১৩১৮।

সমবেত হইতে পারিয়াছি, তাহাও সমাজের আনুকূল্যে। আমাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের, সমাজে এরূপ সমবেত হইবার ভাবই হয় ত' নাই। থাকিলেও এরূপভাবে দশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত নির্ভয়ে বাদপ্রতিবাদ দ্বারা বিচার করা সম্ভব নহে। আরও, আমি যে আজ আপনাদের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, এবং আপনারা যে আমার কথাগুলি বুঝিতে পারিতেছেন, ইহাও সমাজের দয়ায়। আমরা বাল্যাবধি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজকর্ত্তৃক ব্যবহৃত কথা শুনিয়াই এইরূপ কথা বলিতে ও লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার সত্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মূকগণ। আপনারা সকলে জানেন যে মূকদিগের মূকত্ব প্রায়ই মুখ্যভাবে বাগ্‌ যন্ত্রের বৈকল্যের জন্য নহে; প্রায় সকল মূকই জন্মাবধি বধির; সেই জন্য তাহারা কোন প্রকার শব্দই শুনিতে পায় না; শুনিতে না পাইলে স্বাভাবিক অনুকরণ-প্রবৃত্তির এই বিষয়টির অভাব প্রযুক্ত কোন শব্দই উচ্চারণের চেষ্টা করিতে পারে না। সেই জন্যই তাহাদের বাগ্‌যন্ত্র কার্য্যাভাবে বর্দ্ধিত হইতে না পাইয়া ক্রমে কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়ে (atrophy)। সমাজ-দত্ত সাহায্য গ্রহণ করিতে না পারিয়াই মূক, অন্ধ প্রভৃতির দুরবস্থা; আমরা সে সাহায্য লইতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়াই আমাদের সে দুরবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই। সমাজ যদি আমাদিগকে এইরূপ সাহায্যদানে পরাম্মুখ হয়, তাহা হইলে আমরা জন্মিতে বা বাঁচিতে পারি না। ইহা ব্যতীত আর একটী সত্য আমরা দেখি যে, এ পৃথিবীতে অন্যান্য সব বস্তুর ন্যায় আমাদের অস্তিত্বও আপেক্ষিক (relative)। আমাদের বিবেকাদি বৃত্তি প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও, আমরা সমাজের মধ্যে আছি বলিয়াই আমরা মানুষ। বস্তুতঃ আমাদের অনেকগুলি বৃত্তি সামাজিক সম্পর্কাদি হইতে সঞ্জাত। যদি হঠাৎ আমরা এমন কোন স্থানে গিয়া পড়ি, যে স্থানে কোনরূপ সমাজ নাই, তাহা হইলে আমরা আর তখন পূর্ণ মনুষ্য থাকিব না, মনুষ্য হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন এক প্রকার জন্তুমাত্র হইয়া পড়িব।

কিন্তু যদি সমাজটা কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, সেটা একটা হস্তপদগ্রাহ্য কিছু নহে, ধরিতে গিয়া দেখি যে সেটা যেন হস্তাঙ্গুলির মধ্য দিয়া গলিয়া যায়। হতাশ হইয়া বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বোধ হয়, যেন সেটা কতকগুলি ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে ব্যর্থ প্রযত্ন হইয়া মানুষ কখনও একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, কখনও বা অন্ধের হস্তী দর্শনের মত ঐকদেশিক জ্ঞান লাভ করে, এবং এই প্রকার জ্ঞানকে কর্ম্মদ্বারা সাফল্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া বহুপ্রকারে বিড়ম্বিত হয়, ও হয় ত' আপনার ও অন্য অনেকের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত করে।

এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। ইহা যে শুধু তথ্যমাত্র আবিষ্কার করিবার জন্য, তাহা নহে, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইলে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমাদের অনেক প্রকার উপকার হইতে পারে।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে

আমরা দুইটি প্রধান বস্তু পাইতেছি—"ব্যক্তি" এবং "সমাজ"। স্বভাবতঃ এ কথা আমাদের মনে আসিতে পারে—এই দুইটির মধ্যে প্রধান কোনটি? কোনটির স্থান অগ্রে, কোনটির পশ্চাতে? এই বিষয়টি গত শতাধিক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে বিশেষভাবে আন্দোলিত ও আলোচিত হইতেছে। তাহার ফলে ব্যক্তিবাদ (Individualism) ও সমাজবাদ (Socialism) নামক দুইটি বিশেষ মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুইটি মতই এত তীব্র ভাবে সমর্থিত হয় যে, উভয় দলই প্রভূত অর্থ ও লোক সংগ্রহ করিয়া আপন আপন মত প্রচার ও লোকসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এবং যেরূপ এই সমাজবাদীদের একটী শাখা, শান্ত উপায়ে আপনাদের মতের সাফল্য (অর্থাৎ সমাজের প্রাধান্য-স্থাপন) অসম্ভব ভাবিয়া তদুদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বিপ্লববাদ প্রচার ও তজ্জন্য লোক সংগ্রহ করেন, ঠিক সেইরূপ বিখ্যাত Anarchist গণ বিপ্লব দ্বারা সমাজ, শাসনতন্ত্র প্রভৃতির তিরোধান ঘটাইয়া ব্যক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন। এই জন্য Anarchist গণকে বৈপ্লবিক ব্যক্তিবাদী বলা উচিত।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে শুধু যে দুইটি বিরুদ্ধ মত আবির্ভূত হইয়াছে তাহা নহে, উভয়েরই বিশেষরূপ চরমপন্থী দলও আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাতে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়—দুইটিই কি সত্য? তাহা বোধ হয় হইতে পারে না। তাহা হইলে সত্য কোথায়? এই সত্য জানিতে হইলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করা আবশ্যক। সে জন্য মানব-সমাজের উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

মানবসমাজের একেবারে প্রথমাবস্থা কি ছিল, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন; তবে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সভ্য ও অসভ্য জাতির অবস্থা-দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, বোধ হয় প্রথমে সমাজ বলিয়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। মানুষ বোধ হয় অন্যান্য অনেক পশুর ন্যায় স্ত্রীপুরুষে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, এবং সে অবস্থায় অন্যান্য পশুগণ অপেক্ষা যে বিশেষ উন্নত অবস্থায় ছিল, তাহা নহে। ক্রমে কিন্তু অন্যান্য মানবমিথুন ও হিংস্র পশুদের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুই বা ততোধিক মানবমিথুন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে কৃষিকার্য্যের আবিষ্কারের পর তাহারা কোন কোন স্থানে কিছুদিন করিয়া বাস করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে গ্রামের উৎপত্তি হইল। এই সময়েই বিশেষতঃ বিপদনিবারণের জন্য, সামাজিক কর্ত্তব্যের উৎপত্তি হইল। তখন গ্রামরক্ষণ ও শত্রুর আমক্রণ-নিবারণের জন্য অধিবাসীগণকে পর্য্যায়ক্রমে রক্ষীর কার্য্য করিবার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এখনও ইহাকে ঠিক "সমাজ" বলা যায় না; বোধ হয় "সমজ" বলাই উচিত। কারণ, এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সামাজিক কর্ত্তব্য ও স্বত্ব (Duty and Right) মানুষ পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা যে এক সঙ্গে থাকে তাহা

কতকাংশে জীবনযাত্রার জন্য, কিন্তু বিশেষ ভাবেই নিরাপদে থাকিবার জন্য। তাহারা এ সময় যাহা কিছু করে, তাহা বিশেষভাবে বর্ত্তমানের জন্য; অন্য যাহা ভবিষ্যতের জন্য করে, তাহা "নিকট" ভবিষ্যতের জন্য। দূর ভবিষ্যৎ বা কোন সামাজিক আদর্শের ভাব তাহাদের মধ্যে থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে প্রথমতঃ নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা হইতে ক্রমে পরস্পরের সাহায্যের ভাব আসে। তাহা হইতে অল্পে অল্পে সমাজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহারই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং ব্যক্তির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুইএকটি দৃষ্টান্ত দেখিবার পর ইহার সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

আমরা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে মানব-সমাজের ইতিহাস কিছু দেখিব। ইউরোপে মানবসমাজসম্বন্ধে আদিমতম ঐতিহাসিক তথ্য আমরা সীজার (Cæsar) টাসিটস্ (Tacitus) হইতে পাই। তাঁহারা জর্ম্মান্ অসভ্যদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উক্ত জর্ম্মান-গণ বন্য ও দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতির ছিল। পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের সময়ে তাহাদের জাতিগুলি কথঞ্চিৎ গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতদূর জানা যায়, তাহা প্রধানতঃ লুণ্ঠনাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও অপর জাতি কর্ত্তৃক আপনাদিগের লুণ্ঠন নিবারণের জন্য। তাহারা একপ্রকার তস্করের দল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সীজার ও ট্যাসিটস্ বর্ণিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, যদিও শান্তি ও যুদ্ধের সময় অল্ডারম্যান (Alderman) ও হেরেটোগা (Heretoga) নামক দুইজন সমাজের নেতা থাকিতেন, তাহা হইলেও সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা অধিকারের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। বস্তুত, ব্যক্তি ও ব্যক্তি এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বন্ধন এত শিথিল ছিল যে তাহারা একত্র বাস প্রভৃতি করিলেও তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের উৎপত্তি হয় নাই। ইহাকে সমাজের সমজস্তর বলিতে পারা যায়।

ইহার পরবর্ত্তী আর একটী স্তর আমরা গ্রীকদিগের মধ্যে দেখিতে পাই। তখন সমাজ বেশ পুষ্টিলাভ করিয়া ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছে। সমাজই সর্ব্বেসর্ব্বা, ব্যক্তি যেন কেহই নহে। সমাজের স্বার্থ, সমাজের নির্দ্দেশ, ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির নির্দ্দেশের উপরে ও অগ্রে। সমাজের স্বার্থের নিকট ব্যক্তির স্বার্থ দাঁড়াইতে পারে না। ব্যক্তি বাঁচে, কাজ করে, মরে, সমাজের জন্য। সমজস্তর হইতে প্রাপ্ত, ব্যক্তির প্রাধান্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রজাসত্তাতেও সামাজিক প্রাধান্যের চিহ্ন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত। উন্নতিশীল এথেন্স (Athens) রক্ষণশীল স্পার্টা (Sparta) অপেক্ষা এ বিষয়ে কিছু উদার হইলেও, স্থূল ভাবে দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, দুই স্থানেই সামাজিক ভিত্তি প্রায় একই। দুই স্থানেই ব্যক্তি সমাজের সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ও আজ্ঞাবহ।

ইহার পর আর একটী স্তর দেখি যখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ঠিক পূর্ব্বে সমাজশৃঙ্খলা অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া

পড়িতেছিল। তখন খৃষ্টীয় মিশনরীগণ ইউরোপে আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার সমাজ গঠন করিয়া দিলেন। কিন্তু এবার সমাজ গঠিত হইল ভিন্ন প্রণালীতে। ইহার অল্পকাল পূর্ব্বে ইউরোপের উপর দিয়া বর্ব্বরপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থানেই প্রাচীন সভ্যতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রজাসভা স্থানে স্থানে বর্ত্তমান থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাচর্চ্চাও প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি বর্ব্বরদিগের অত্যাচারে লোকদের মনে পূর্ব্বের সাহস অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে কাপুরুষোচিত ভীরুতার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সঙ্কট সময়ে খৃষ্টীয় মিশনরীগণ আসিলেন। তাঁহারা সকলেই ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, কাজেই সম্পূর্ণ নির্ভীক, এবং সমগ্র সমাজের মধ্যে একমাত্র তাঁহাদেরই বিদ্যাশিক্ষা ও অনুশীলনের সুবিধা ও শক্তি ছিল। তাঁহারাই সমাজের নেতৃত্ব লইয়া সমাজকে প্রায় অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহারা এরূপ অকুতোভয়ে সমাজ শাসন করিতেন যে এরূপ সময় গিয়াছে যে সময় তাঁহারা, সামান্য দরিদ্র সন্ন্যাসী হইয়াও, গর্ব্বিত ও প্রভূত-শক্তিশালী রাজামহারাজার গলদেশ পদমর্দ্দিত করিতে ভীত হন নাই। তাঁহারা যে, সমাজের কার্য্য হাতে লইয়াছেন ও তাহারই জন্য খাটিতেছেন, ইহা জানিতেন, এবং যতকাল তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ে বহন করিয়াছিলেন, ততকাল তাঁহারা তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য, নিজ জীবনে কর্ম্মের দ্বারা, এবং সামাজিক জীবনে উপদেশ-নিদেশের দ্বারা, সফল করাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সংসারে সব বস্তুরই অবনতি ও ক্ষয় আছে! ক্রমে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মেরও সেই দশা হইল। তখন ধর্ম্মের স্থানে পৌরোহিত্যের, বিশ্বাসের স্থানে কুসংস্কারের, এবং কর্ম্মের স্থানে ভোগবিলাসের আবির্ভাব হইল, এবং পুরোহিতের উপদেশ রাস-পতির আদেশে পর্য্যবসিত হইল এবং সেই সমস্ত আদেশ পারলৌকিক দণ্ডের বিভীষিকা দেখাইয়া পালন করাইয়া লওয়া হইতে লাগিল। ক্রমে আরও এক কারণে এই অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিল। অভিজাতদিগের জ্যেষ্ঠপুত্রেরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের স্থানে অধিষ্ঠিত হইত, কিন্তু কনিষ্ঠেরা, অনেক স্থলেই জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ম প্রচলিত থাকায়, পিতৃসম্পত্তি হইতে বিশেষ কিছু পাইত না। সেজন্য তাহারা সৈন্য-বিভাগ বা পুরোহিত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইত। ইহার মধ্যে পুরোহিতপদই বিশেষ লোভনীয় বোধ হইত, কারণ এই শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে, বিনা পরিশ্রমে যাজকপরিষদ্‌সম্পর্কে প্রভূত ভূসম্পত্তি এবং উত্তমোত্তম ভোগবিলাস মিলিত। অভিজাত-শ্রেণীয়েরাই পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদগুলি পাইত। ইহাতে শেষে এরূপ দাঁড়াইল যে অভিজাতবর্গেরাই সৈন্যবিভাগ, রাজকর্ম্মচারীবিভাগ প্রভৃতি দিয়া এক দিক হইতে, এবং পুরোহিত শ্রেণী দিয়া অন্য দিক হইতে, সমগ্র রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ-রূপে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়া রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা আপনাদের সুবিধামত করিয়া গড়িয়া লইল। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যভার ও স্বত্বসমূহ তাহাদেরই মনোমতভাবে বণ্টন করিল;—কর্ত্তব্যভার পাইল সাধারণ জনসমূহ এবং

স্বত্বগুলি পাইল অভিজাতশ্রেণী। সাধারণ জনসমূহ পরিশ্রম করিবে, এবং তাহার ফল-ভোগ করিবে ভূম্যধিকারীশ্রেণী সমভিব্যাহারে পুরোহিতগণ, ইহাই যেন শেষে নির্দ্ধারিত হইল।

কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী করিতে হইলে জনসাধারণকে অজ্ঞ ও দরিদ্র করিয়া রাখা প্রয়োজন। তাহাও ভূম্যধিকারী ও পুরোহিতের সমবেত চেষ্টায় সম্ভব হইতে চলিল। প্রজাকে সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও শোষণ করিয়া ভূম্যধিকারী তাহাকে দরিদ্র করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরোহিত ও রাজপুরুষের সাহায্যে স্বাধীন চিন্তা অসম্ভব করিয়া মানুষকে পশুতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ব্যাপার কিছু-কাল বেশ জোরের সহিত চলিয়াছিল বটে, কিন্তু অশুভ চেষ্টা কখনও সফল হয় না এবং এ ক্ষেত্রেও হইল না। জনসাধারণের অস্বস্তির অস্ফুটধ্বনি ক্রমে কাতর ক্রন্দনে পরিণত হইল; তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিল না, বরং পশুবলপ্রয়োগে এই ক্রন্দন স্তব্ধ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন তাহারা অনবরত উৎপীড়নে উন্মত্তপ্রায় হইল। তাহাদের কাতর ক্রন্দন যুদ্ধহুঙ্কারে পরিণত হইয়া জার্ম্মানীতে লুথারের ধর্ম্মবিপ্লবের ও ফ্রান্সে ফরাসীবিপ্লবের অবতারণা করিল। এই শেষোক্ত বিপ্লব যেরূপ উদ্দাম বেগে এক চরম হইতে আর এক চরমে গিয়াছিল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি জনসাধারণের মন কিরূপভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই বিপ্লবের মুখে শুধু যে ধর্ম্মস্থানাপহারী পুরোহিত, সমাজস্থানাপহারী ভূম্যধিকারী এবং রাজস্থানাপহারী অত্যাচারী ভাসিয়া গেল, তাহা নহে। ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য দেখা গেল। ব্যক্তি আসিয়া সমাজের স্থান অধিকার করিল; লোকে সমাজের অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিল; ব্যক্তির স্বার্থ সকল স্বর্থের উপর স্থান লাভ করিল। রাজার স্থানে স্বাধীনতার নামে অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। বিপ্লবের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে লোকে ক্রমে বুঝিল যে, অত্যাচারী বিনাশ যোগ্য বটে, কিন্তু সমাজ যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দ্বারা গঠিত ও পৃথিবীতে তাহার যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহার অধ্যক্ষতা ও চালনার জন্য একটা কর্তৃত্ব-শক্তির প্রয়োজন; ধর্ম্মের ভাণ কখনও থাকিতে দেওয়া উচিত নয় বটে, কিন্তু কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না; ব্যক্তি আছে বটে, কিন্তু সমাজের অস্তিত্ব আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না; উপেক্ষা করিলে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে ব্যক্তিরই পুষ্টি অসম্ভব শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি হইলে একসঙ্গে সমাজের ও ব্যক্তির বিশেষ অনিষ্ট হয়। সমাজকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে যথোচিতরূপে নিয়োজিত করিলে মনুষ্যজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। উপযুক্ত স্থলে সমাজই শাসনশক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে; তাহা না হইলেও সমাজ যে শাসনশক্তির সহায় ও পরিচালকের কার্য্য করিতে পারে, তাহা স্থির। এরূপ অবস্থায় সমাজকে ব্যক্তির উপরে স্থান দেওয়া প্রয়োজন কারণ কর্ত্তব্য যেরূপ বিরাট, তাহাতে সমাজ ভিন্ন ব্যক্তি কখনই সে কর্ত্তব্য সাধন করিতে

পারে না। এই সমস্ত কারণেই ইউরোপে সমাজবাদের পুনরুৎপত্তি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সমাজের প্রথম স্তর আমরা বঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে আজও দেখিতে পাই। আর্য্যদিগের মধ্যে, বোধ হয়, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বেই সমাজ গঠিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের ভারতবর্ষ-জয়ের সময় তাঁহাদিগের উপনিবেশগুলি এক একটী সেনানিবাসের মত ছিল এবং এই জীবনসংগ্রামের সময় প্রত্যেক উপনিবেশস্থ ব্যক্তিগণকে উপনিবেশের আপদ-নিবারণের জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইত। উপনিবেশের জন্য চিন্তা ব্যক্তিগত চিন্তা প্রভৃতিকে দূরে রাখিত। তখন তাঁহাদের মধ্যে বর্ণবিভাগ ছিল—আর্য্য ও শূদ্র। তখন সভ্যতার নিয়মানুসারে সমাজে কর্ম্মবিভাগ উপস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতিত্ব সৃষ্টি হয় নাই। শেষে এই কর্ম্মবিভাগ জাতিবিভাগে পরিণত হইল। এ দেশেও ক্রমে পুরোহিত শ্রেণী উৎপন্ন হইল। ঘটনাচক্রে পুরোহিত বৃত্তি ক্রমে ক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। প্রথমে পুরোহিতগণ রাজাদিগের পারিষদ্ ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন এবং এই স্থান অধিকার করিয়া সমাজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহারই লোকপ্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের পুরাতন স্মৃতি শাস্ত্রে যাহা দেখি, তাহা হইতে বেশ অনুমান হয় যে, সেই সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের রচনাকালে আমাদের দেশে সমাজ বেশ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আমাদের সমাজে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তির জীবন মরণ সমস্তই সমাজের জন্য। রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই সামাজিক হিসাবে কর্ত্তব্য ও স্বত্ব নির্দ্ধারিত আছে এবং সমাজ-নিয়মে সকলেই তদনুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য। সমাজ যদিও মুখ্যভাবে শাসনশক্তি নহে, তথাপি লোকমত এবং ধর্ম্মের ভিতর দিয়া রাজশক্তির উপর যথেষ্ট প্রভাব দেখাইত। ব্যক্তির উপর সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ন্যস্ত করিয়া সমাজ যেমন ব্যক্তিকে আপনার নিয়ে আনিত, তেমনি ব্যক্তিকে বহুপ্রকার স্বত্ব দিয়া বহু উপায়ে তাহার পুষ্টিসাধন করিত। কিন্তু ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর কর্ত্তব্যপরায়ণতার হ্রাস দেখা গেল। সামাজিক স্বার্থের সংরক্ষণ ক্রমে ক্রমে পুরোহিতশ্রেণীর গৌণকর্ত্তব্যে পরিণত হইল। তাহাদের হস্তে ন্যস্ত শক্তির দ্বারা নিজ শ্রেণীর প্রাধান্যস্থাপনই তাহার মুখ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। দেবতা সাহায্যে তাহা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে দেখিয়া পুরোহিতশ্রেণী দেবতাদিগের সহিত সম্বন্ধ ও তাঁহাদের উপর শক্তির দাবী করিল, এবং এই সমস্ত অদ্ভুত দাবীর ভিতর দিয়াই সমাজে নিজের জন্য বহু প্রকার স্বত্ব সৃষ্টি করিয়া লইল। ক্রমে পুরোহিতশ্রেণী প্রায় সমাজের স্থানই অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। সমাজস্থ অবশিষ্ট শ্রেণী ও ব্যক্তিগণ পুরোহিতশ্রেণীর দাস ও তাহার মতের পরিপোষকরূপে পরিণত হইল। শ্রেণী ও শ্রেণীগত ব্যক্তি, শ্রেণী-অপেক্ষা-বৃহত্তর সমাজ ও শ্রেণীগত-ব্যক্তি-অপেক্ষা-বৃহত্তর সমাজগত ব্যক্তির উপর এইরূপে অনায়াসে জয়লাভ করিল। তাহাতে শ্রেণী ও শ্রেণীগত ব্যক্তি প্রভূত শক্তিশালী হইয়া

উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সমাজ ও সমাজগত ব্যক্তির ব্যয়ে। ইহার ফলে সমাজ ক্রমশঃই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইয়া শ্রেণী ও ব্যক্তি উভয়কেই হীনদশায় টানিয়া আনিতে লাগিল।

সমাজের এই বিপদ দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক মতমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। এইরূপে বহুকাল চলিয়াছিল। ভারতে মুসলমান-প্রবেশেও ইহার বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই! কিন্তু এ দেশে ইংরাজ আসিবার পর পৌরোহিত্য শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে ইংরাজশাসনের আমরা দুইটি প্রধান ফল দেখিতে পাই—অবাধ শিক্ষা এবং ব্যক্তিবাদের প্রভাব। ইহার ফল কতকাংশে ভাল ও কতকাংশে মন্দ। পুরোহিত-শ্রেণী উৎসাহের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা করিলেও স্বার্থসাধনের জন্য নিজ শ্রেণী মধ্যেই তাহা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই জন্য সমাজ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। অবাধ শিক্ষা-প্রচারে সমাজের অবস্থা অনেক প্রকারে উন্নত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আশা করা যাইতে পারে। ব্যক্তিবাদের প্রভাবে (গুণাভাবেও) বংশগত সামাজিক স্বত্বে বড় কেহ আর বিশ্বাস করিতে চাহে না। স্বত্ব পাইতে হইলে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও কর্ত্তব্য পালনই যে প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা আর কেহ সন্দেহ করে না। ব্যক্তিবাদ সমাজে প্রত্যেককে বড় হইবার, ভাল হইবার সুবিধা ও উপায় দেখাইয়া দেয় এবং আমাদের সমাজে এই ব্যক্তিবাদের প্রয়োগে যে কতপ্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এই ব্যক্তিবাদ সমাজের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকেই আজ স্বস্ব প্রধান। ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বে যে বন্ধন ছিল আজকাল তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থলেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাব দেখা যায়। সামাজিক স্বার্থ প্রায়ই উপেক্ষিত হয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ (ও সময়ে সময়ে, ব্যক্তিগত অভিমানও) সদর্পে সমাজকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যায়। পুরোহিত শক্তি অন্তরূপে অনিষ্টকারী হইলেও সমাজের উপর তাহার নৈতিক শাসন দৃঢ় করিয়া রাখিত। ব্যক্তিবাদের প্রভাবে সে শাসন আজ তিরোহিত, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা আজ সমাজের প্রতি লক্ষেপ না করিয়া, এবং সময়ে সময়ে ভ্রূকুটি করিয়াও, সমাজকে কলঙ্কিত ও বিপন্ন করিতেছে। বোধ হয় যেন পুরাকালের একটী বিচিত্র সৌধ দ্রুতবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রথমে সমাজ বলিয়া কোন কিছু থাকে না, ব্যক্তিই প্রথমে থাকে। ক্রমে ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলেই সমাজের উৎপত্তি হয়। সমাজের প্রথমাবস্থায় ব্যক্তির ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু সমাজের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ক্ষমতার হ্রাস হয়, এবং ক্রমে সে সমাজের নিম্নে আসিয়া পড়ে। তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার কিয়দংশ সমাজ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি স্বত্ব ও সুবিধার

বিনিময়স্বরূপ সমাজের হস্তে অর্পণ করিতে হয়।

সমাজের উৎপত্তি প্রায় সম্পূর্ণই শারীরিক প্রয়োজনাদি হইতে। সে সমস্ত প্রয়োজনের ব্যবস্থা হইলে ক্রমে মানসিক প্রয়োজনাদিও সমাজের দৃষ্টিগোচর হয়। এ স্থানে দেখা উচিত—আমরা "সমাজ" অর্থে কি বুঝি। "সমাজ" অর্থে—সমাজভুক্ত কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিমাত্র নহে। স্থূলভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, "সমাজ" অর্থে প্রায় এক নিয়মাদির বশবর্ত্তী কোন জনসঙ্ঘ ও তাহার সাধারণ ইচ্ছা বা মত; ক্রমে ইহার মধ্যে রীতি-নীতিও আসিয়া পড়ে। পরে এই সমস্ত রীতি-নীতি প্রভৃতির উদ্দেশ্য বিবেচিত হইলে দেখা যায় যে, সমাজ যে শুধু কোন অতীত সমাজের বর্ত্তমানস্থিত ফল, তাহা নহে। ইহা বিশেষভাবে জীবন্ত ও বৃদ্ধিশীল। অতীত হইতে যেমন আমরা এই বর্ত্তমান সমাজকে পাইয়াছি, তেমনই আবার এই বর্ত্তমান সমাজ ভবিষ্যতে আর এক রূপ ধারণার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই রূপকে সামাজিক আদর্শ বলে এবং ইহা প্রতি সভ্য সমাজে ভাবরূপে (Idea) বর্ত্তমান।

এই ভাব দুই প্রকার—আত্যন্তিক (Absolute Ideal) ও আপেক্ষিক (Relative Ideal)। "আত্যন্তিক" বলিলে একটা সার্ব্বজনীন ভাব মনে আসে এবং তাহার সঙ্গে প্রতি ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের কথা মনে আসে। মনশ্চক্ষে একটা বিশ্বসমাজের চিত্র ভাসিয়া উঠে, যে বিশ্বসমাজে প্রতি মনুষ্য যে উচ্চতম অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহাকে "পূর্ণতম মনুষ্যত্ব" ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। "পূর্ণতম মনুষ্যত্ব" অর্থে বুঝি, যে অবস্থায় তাহার সমস্ত মনুষ্যোচিত বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ ও মিলন হইয়াছে। সমাজ ও শাসন-শক্তির কর্ত্তব্য সমস্ত বাধা অপসৃত করিয়া দিয়া উপরি উক্ত অবস্থায় পৌছিইবার উপায় স্থির করিয়া দেওয়া। "আপেক্ষিক" অর্থে বুঝি, যে আদর্শ দেশকাল পাত্রানুযায়ী। দেশকাল পাত্রানুসারে এই আদর্শ বিভিন্ন হয়, এবং একই দেশে কাল ও পাত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিলে আদর্শেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই জন্যই যাহা এক যুগের কর্ত্তব্য, তাহা প্রায় অন্য কোন যুগের কর্ত্তব্য হয় না। আবার যখন কোন আপেক্ষিক আদর্শ সাফল্যে নীত হয়, তখন আবার সমাজকে আরও উন্নত করিবার জন্য অন্য আদর্শের সময় আসে। এইরূপে আমরা অপেক্ষিক আদর্শ পরম্পরার ভিতর দিয়াই আত্যন্তিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এই দুই ভাব আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও যুগসন্ধির সময়েই আমরা ইহাদিগের অস্তিত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। যখন এক যুগ শেষ হইতেছে এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগ আরম্ভ হইতেছে, সেই সন্ধিকাল সমাজের জীবনে একটী অতি সঙ্কট সময়। সে সময় পারিপার্শ্বিক ঘটনা-বলীই আপেক্ষিক আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় এবং সেই সময়ে আত্যন্তিক আদর্শও উদিত হইয়া আপেক্ষিক আদর্শে সাময়িক উত্তেজনা-জনিত যাহা কিছু ভুল বা অশুভ থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। এই সময়ে, সমাজকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া

শুভ ও প্রকৃত পথে লইয়া যাইবার জন্য, সমাজে বিশেষরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এই সময়ে দেখিতে পাই যে, যেমন ব্যক্তি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজের ফলস্বরূপ, সেই রূপ ব্যক্তিই অনেকাংশে ভবিষ্যৎ সমাজের জনয়িতা। এই সঙ্কট সময়ে দেখা যায় যে, সমাজের প্রায় সমগ্র শক্তিই অতীত সমাজের আদর্শের দিকে, এবং ভবিষ্যতের আদর্শের আবশ্যকতা বুঝিতে ইচ্ছুক নহে। এই সময়ে হয় ত' কোন এক অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি উঠিয়া—অতীত সমাজের আদর্শ যে গতজীব, ও তাহার রক্ষণে সমাজের সমূহ বিপদ, এমন কি বিনাশও ঘটিতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ সমাজ যে নূতন আদর্শ চাহে—তাহা অমিত সাহসে প্রচার করেন। তিনি এই কার্য্যে অনেক বাধা প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে শেষে তাঁহার জয় অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে তিনি মরণোন্মুখ সমাজের ধ্বংশসাধন করিয়া ভবিষ্যতের নূতন সমাজের সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। এইরূপে তিনি সমাজকে আত্যন্তিক আদর্শের দিকে এক পদ অগ্রসর করাইয়া দেন।

তাহা হইলে দেখিতেছি যে, ব্যক্তি ও সমাজ, এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকেও আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতে পারা যায় না। সমাজ বড় বলিয়া ব্যক্তি ক্ষুদ্র নহে। আদিম ব্যক্তি যেমন বর্ত্তমান সমাজের বীজস্বরূপ, সেইরূপ বর্ত্তমান ব্যক্তিও অনেক অতীত সমাজের ফলস্বরূপ, এবং বর্ত্তমান ব্যক্তিও সময়বিশেষে সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে ও গড়িয়া থাকে। সামাজিক কর্ত্তব্য খুব বৃহৎ বটে, কিন্তু তাহার প্রকাশ, স্ফূরণ ও সাফল্য ব্যক্তির ভিতর দিয়া, এবং সেই প্রকাশ, স্ফূরণ ও সাফল্য সমাজের বহু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, সমাজের ভিতর দিয়াই, ব্যক্তিরও বহু পরিবর্ত্তন ঘটায়। এইরূপে আমরা দেখি যে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারাই দূরস্থিত আত্যন্তিক আদর্শের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে।

আবার দেখি যে সামাজিক আদর্শ এত বৃহৎ যে, কোন ব্যক্তিরই এরূপ সামর্থ্য নাই যে, তাহাকে একাকী কার্য্যে পরিণত করিতে পারে; সেজন্য সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা ও শক্তির প্রয়োজন। আবার ব্যক্তির মত অনেক সময় ভুল হইতে পারে, কিন্তু সমাজের সাধারণ মত প্রায়ই ঠিক হইবার সম্ভাবনা। আবার, সমাজে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি অব্যাহতভাবে হইতে দিলে দেখা যায় যে, তাহাতে অনেক সময় সমাজ ও তৎসহিত ব্যক্তির বিশেষ হানি হয়। আরও সমাজে ব্যক্তিবাদ চরমরূপে গৃহীত হইলে সমাজশাসন শিথিল হইয়া যায়, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে প্রশ্রয় পাইয়া সমাজকে বিনাশের মুখে অগ্রসর করে। কখনও বা সমাজের শ্রেণীবিশেষ ছলে বলে কৌশলে সমগ্র সমাজের স্বত্ব অপহরণ করিয়া সমাজের অবশিষ্টাংশকে আপনাদিগের দাসরূপে পরিণত করে। এই সমস্ত অবস্থা যে শুধু অপ্রার্থনীয়, তাহা নহে। ইহারা সামাজিক আদর্শের পথ হইতে সমাজকে পিছাইয়া দিয়া ক্রমে তাহাকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। আবার দেখা যায় যে, সামাজিক কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পাইলে ও তাহা উপযুক্তভাবে

ব্যবহৃত হইলে ব্যক্তিরও কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায় ও তাহার অনেক উপকার হয়, এবং ব্যক্তি এইরূপ উচ্চতর স্তরে নিজে পৌঁছিয়া পরবর্ত্তী সমাজের আরও উচ্চস্তরে পৌঁছাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। এইজন্য ব্যক্তির উপর সমাজের নিয়ামক শক্তির প্রয়োগ অনেক সময় বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যক্তি সমাজের বীজস্বরূপ হইলেও ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ একমাত্র সমাজের ভিতর দিয়াই সম্ভব। সমাজের কার্য্যের পরিসমাপ্তি পূর্ণবিকশিত ব্যক্তির সৃষ্টিতে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাফল্য উচ্চস্তরের সমাজ-গঠনে। এই মহৎ কার্য্যের জন্য সমাজ বিশেষরূপ শক্তিশালী হওয়া উচিত; কিন্তু আবার সমাজের শক্তি যাহাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের হানি না করে, তাহাও দেখা আবশ্যক। এইজন্য বোধ হয় যে, ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়া এবং আপন শাসনশক্তির সাহায্যে সেই স্বাধীনতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিরোধ করিয়া দিয়া যদি সমাজ সেই পুষ্ট ব্যক্তিত্বের সমন্বয় করে, ও তাহার সাহায্যে আপনার আত্যন্তিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মানবসমাজের প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা।

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

অচেতন।

ছিদ্রহীন নৌকা খানি
বাঁধা থাকে ঘাটের কিণারে
সারা দিন কত যাত্রী
লয়ে যায় এপারে ওপারে
নদীর আনন্দ স্রোত
তারি নীচে বহে কলস্বরে
তরঙ্গেরা ছুটে এসে
দোল দিয়ে যায় সমাদরে।
এক পারে কত লোক
তারি পরে যাত্রী হ'য়ে যায়
অন্য পারে আরো কত
বসে থাকে তারি প্রতীক্ষায়,
পার মাঝি মহানন্দে
নৌকা বাহি চলে তরানীরে
ভাঙা ছিদ্র নৌকা খানি
পড়ে থাকে শুষ্ক নদীতীরে;
বুকের পঞ্জর যত
সবগুলি দেখা যায় তার
ভুলে কভু তার পানে
চাহেনাক কেহ একবার।
পার নৌকা নাহি জানে
আপনার সৌভাগ্য যেমন
ভগ্নতরী হতভাগ্যে
সেই মত নিত্য অচেতন।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

সবুজ সমাধি।

(একখানি চীন দেশীয় নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে)

পাত্র ও পাত্রী।

ইয়ন্ত ... চীন সম্রাট।
হান্‌চীন্ খাঁ ... তাতার সর্দ্দার।
মৌংসু ... চীনসম্রাটের একজন অমাত্য।
শাওকীন্ ... কৃষক কন্যা; পরে রাণী।
মুখ্য অমাত্য, তাতার দূত, প্রতিহারী প্রভৃতি।

প্রস্তাবনা।

হান্ চীন্ খাঁ।

শীতের বাতাস এসেছে আজিকে
কাঁপায়ে ঘাসের বন
পশ্‌মী আমার শিবিরের মাঝে
পশিছে অনুক্ষণ।
নিশীথ চাঁদেরে বিরহী সিপাহী
শোনায় ব্যাকুল বাঁশী,
কুৎসিত যত কুটিরের 'পরে
জোছনার ম্লান হাসি।
আমি সর্দ্দার, হুকুমে আমার
শিঙা বাঁকাইয়া ধরি'
লাখ লোক ছোটে যুদ্ধ করিতে
মরণ তুচ্ছ করি'।

আমি হুণ বংশের হান্‌চীন্ খাঁ; এই বেলে মাটির মুলুকের প্রাচীন বাসিন্দা; উত্তর খণ্ডের আমি একলা মালিক। শীকার আমাদের ব্যবসা, যুদ্ধ আমাদের নিত্যকর্ম্ম। চীনসম্রাট উন্‌কং আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল, উইকং আমাদের ভয়ে সন্ধির প্রার্থী হয়েছিল। চীনে হুণে শেষবার যে যুদ্ধটা হ'য়ে গেছে সেই যুদ্ধে হার মেনে চীন সম্রাট আমার পূর্ব্বপুরুষকে কন্যাদান ক'রে বিবাদ মিটিয়েছিল। এমন কতবার হ'য়েছে।

সম্প্রতি গৃহবিবাদে আমাদের কিছু কাবু হ'তে হ'য়েছিল; যা' হোক শেষে সকলে আমাকে সর্দ্দার বলে মেনে নিয়েছে। আমার হাতে এখন লাখো লোক। এবার রাজবংশের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছায় দক্ষিণে আসা গেছে। সম্রাটের কাছে কন্যা প্রার্থনা ক'রে কাল এক দূত পাঠিইচি। বলতে পারিনে তিনি আমাদের প্রাচীন দাবী রাখবেন কি না। আমার লোকেরা সব শীকারে বেরিয়েচে। কিছু জুটে গেলেই মঙ্গল; আমরা তাতারের লোক,—ক্ষেতও নেই, খামারও নেই, যা ক'রে তীর ধনুক। (প্রস্থান)

(মৌংসুর প্রবেশ)

মৌংসু। কলিজা শিকারী বাজের মতন
চীলের মতন চক্ষু যার,
নষ্টামি, লোভ, তোষামোদ আর
ছেঁদো কথা যার গলার হার,
প্রভুর চোখে যে ধূলা দিতে পারে
অধীনের পায়ে টিপিতে গলা
আজীবন তার কত যে সুবিধা
এক মুখে তাহা যায় না বলা।

এই মৌংসু যে সম্রাটের অমাত্য হ'য়েছেন সে তো এমনি ক'রেই। চাটু অস্ত্র এমনি পটুতার সঙ্গে প্রয়োগ ক'রে আসা হ'য়েচে যে সম্রাট এখন আর আমাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চান না। আমি নইলে

মন্দির পথে

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

তাঁর আমোদই হয় না। আমার কথায় ওঠেন বসেন। এখন এ রাজ্যে এমন কে আছে যে মৌংসুকে দেখে মাথা না নোয়ায়? কে না খাতির করে? ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক মৌংসুর সমাদর এখন সর্ব্বত্র।...কি বললে?...কেমন ক'রে এমন হ'ল? মন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে।

বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, বিদ্যাবানের
নীতি উপদেশ করিয়া হেলা,
আমার কথায় বসায়েছে রাজা
প্রাসাদে রমণীরূপের মেলা।

ইস্! এই যে মহারাজ!

(নারী ও নপুংসক বেষ্টিত সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট। সাত পুরুষের রাজা আমার
রাজ্যে আমার সাত শ' জেলা,
সবারি সঙ্গে সন্ধি আমার
জীবন কেবলি সুখের মেলা।

শোক নেই, উদ্বেগ নেই, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই; সাত পুরুষ কেন—দশ পুরুষ এম্‌নি চলে আস্‌ছে। আমার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা কৌৎ যে দিন এই রাজ্য অধিকার করেন সেই দিন থেকে চতুঃসীমান্তের কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আট দিক একেবারে ঠাণ্ডা। এতে আমার নিজের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই; আমার রাজভক্ত রাজপুরুষদের কল্যাণেই শান্তি সুরক্ষিত হচ্ছে। প্রাসাদে কিন্তু আর প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় না; পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে অন্তঃপুরিকারা স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় অন্তঃপুর একেবারে শ্রীহীন হ'য়ে পড়েছে! আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না।

মৌংসু। দেবপুত্র! আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করচেন? গরীব চাষাও ইচ্ছামত পত্নী গ্রহণ করতে পারে, আর আপনি—যিনি অষ্টদিকপালের মধ্যে একজন, সাক্ষাৎ দেবতার অংশ, সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীন, আপনি পারবেন না? অধীনের নিবেদন—রাজ্যের দিকে দিকে বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে জাতি কুল নির্ব্বিচারে, পনের থেকে কুড়ি বছরের যেখানে যত সুন্দরী আছে সকলকে রাজানুগ্রহের ছায়ায় আনা হোক; অন্তঃপুর আবার আনন্দের পুরী হ'য়ে উঠুক।

সম্রাট। ঠিক ঠাউরেচ, মৌংসু, ঠিক ঠাউরেচ। নির্ব্বাচনের ভার তোমার উপরেই অর্পিত হ'ল; হুকুমনামা আজই লিখে দেওয়া যাচ্চে। দেখ, পাকা জহুরীর মত বেশ তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করবে, উপযুক্ত রত্নের সন্ধান পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে তার একখানি প্রতিরূপ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কর্ম্মে গুণপণা দেখাতে পারলে, চাই কি তোমাকে, পুরস্কৃত করবার অবসরও আমাদের দিতে পার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মৌংসু। সোনাদানা যেটা হাতে এসে পড়ে
নিজের ঘরেই ভরি,
পাতকের স্রোত বহাই রাজ্যে
আইন আমি না ডরি।

শাস্ত্রে বলেচে 'লক্ষ্মী নাবসীদন্তি', টাকা কোনোরকমে একবার হাতে এসে পড়্‌লে আর তারে হাতছাড়া করতে আছে?... মরে গেলে লোকে নিন্দা করবে? ইতিহাসে মন্দ বলবে?... তার ভয় আমি রাখিনে।

রাজার হুকুম মত নিরানব্বইটি সুন্দরী রাজ্য খুঁজে আবিষ্কার করা গেছে। যারই কন্যাকে, রাজার জন্যে নির্ব্বাচন ক'রে সম্মানিত করেছি সেই আমাকে সাধ্যমত অর্থ দিয়ে খুশী করেছে। এই সুযোগে যে ধন সমাগম হ'য়েছে—তা' নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু এই পাড়াগেঁয়ে চাষাটার কাছ থেকে, কিছুই বা'র করতে পারা গেল না! মেয়ে সুন্দরী!—আরে তাতে কি? চীন সাম্রাজ্যে ওর জোড়া নেই! বলি তা' বল্লে তো আর আমার পেট ভর্‌বে না। আমায় এক শ' ভরি সোনা দাও,—সম্রাটের কাছে যেমন ক'রে রূপবর্ণনা করতে হয় তা করচি। গরীব? দিতে পারবে না? নিজেই মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়ীতে হাজির হবে? যাও, গিয়ে একবার দেখ। আমিও বিনা মৎলবে পথ চলিনে। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) আমিও মেয়েটার একখানা ছবি বিকৃত করে সম্রাটের কাছে সদরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তূলির দু'এক টানে এম্‌নি মূর্ত্তি বদ্‌লে দেব যে বাস্‌; —প্রাসাদে গিয়ে ধর্‌ণা দিয়ে পড়ে থাক্‌লেও সম্রাট ওর দিকে ফিরেও চাইবেন না। দেখি চাষার মেয়ে কেমন রাজরাণী হয়।' হুঃ! যে নিজের কোট বজায় রাখতে না পারে সে আবার মানুষ? (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চীনের রাজপ্রাসাদ। রাত্রি।

শাওকীন ও পরিচারিকা।

শাওকীন্‌। রয়েছি রাজার প্রাসাদে,—
পেয়েছি ঠাঁই,
রাজ দরশন তবু মিলিল না হায়!
সেতারটি বিনা সাথী হেথা কেহ নাই,
এমন রাত্রি একাকী কাটিয়া যায়।

মার মুখে শুনেছিলুম আমার যেদিন জন্ম হয়, সেই দিন মা স্বপ্নে দেখেছিলেন, যেন জ্যোৎস্না এসে তাঁর বুকে নেমেচে; খানিক পরেই সে জ্যোৎস্না আর বুকে রইল না, ধূলোর উপর গড়িয়ে পড়্‌ল। আমি গরীবের মেয়ে রাজার প্রাসাদে উঠিচি, হয় তো স্বপ্নের সেই জ্যোৎস্নার মত আবার ঐ ধূলোতেই আমায় নাম্‌তে হ'বে। তার আগে যদি একবার তাঁকে দেখ্‌তে পেতুম। বাবা আমার টাকার মানুষ নন্‌, রাজার লোককে টাকা দিতে পারেন্‌ নি, তাই সে কুৎসিত ব'লে আমায় রাজার কাছে বর্ণনা ক'রেচে; আমার ছবিখানা পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়ে দিয়েচে; গোড়াতেই রাজার মন ভাঙিয়ে নিয়েচে। রাজা যখন এদিকে আসেন লোকে আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে যায়, আমায় সরে যেতে বলে। আমার রাজা,—শুধু কুচক্রীর চক্রে পড়ে,—আমার পানে এ পর্য্যন্ত একবার ফিরেও চাইলেন না। আমি কী দুর্ভাগা,—কী দুর্ভাগা! সময় আর কাট্‌তে চায় না। এই নিস্তব্ধ রাত, এই জ্যোৎস্না,—কেউ নেই। ভাগ্যে সেতারটি সঙ্গে এনেছিলুম; এখন এই আমার বন্ধু, এই আমার দোসর।

(সেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

(সম্রাটের সঙ্গে কাগজের লণ্ঠন হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

সম্রাট। প্রায় শতাধিক কিশোরীকে প্রাসাদে আনা হ'য়েছে, কিন্তু, কই? তেমন ত' সুন্দরী একজনও দেখা গেল না। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন

একজনও নেই। নাঃ, বিরক্ত হ'য়ে গেছি,—সমস্ত ব্যাপারটার উপর বিরক্ত হ'য়ে যাওয়া গেছে। (নেপথ্যে সেতারের আওয়াজ) ওকি? কোনো নবাগত সুন্দরী সেতার বাজাচ্ছেন নাকি?

প্রতীহারী। ঠিকই অনুমান করা হ'য়েচে। আমি এখনি ওঁকে মহারাজের আগমন সংবাদ দিয়ে আস্‌চি।

সম্রাট। উহুঁ, দাঁড়াও; স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী, তুমি খোঁজ নিয়ে এস দেখি উনি আমাদের প্রাসাদের কোন্ মহলে বাস করেন? নাঃ, থাক্, ওকে এই খানেই আস্‌তে বল।

প্রতীহারী। (শব্দের অভিমুখে) ওগো! কোন্ ঠাকুরাণী সেতার বাজাচ্ছেন? সম্রাট আগত, তাঁকে বিধিপূর্ব্বক অভিবাদন করতে আজ্ঞা হোক্। ("কাউ-তাউ" করিতে করিতে শাওকীনের প্রবেশ।)

সম্রাট। স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী! তোমার মসমলের লণ্ঠনটা ভাল জ্বলচে না; একটু এই দিকে নিয়ে এস দেখি!

শাওকীন। দাসী যদি একটু আগে জান্‌তে পারত মহারাজ আস্‌বেন, তবে তার এটুকু বিলম্বও ঘটত না; দাসীর অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সম্রাট। নিখুঁত! চমৎকার!—অপূর্ব্ব সুন্দরী! এমন সৌন্দর্য্য এতদিন কোন্ অন্ধকারে কেমন করে লুকিয়ে ছিল?

শাওকীন। দাসীর নাম শাওকীন; চিংতু সহরের কাছে আমাদের বাড়ী, আমার পিতা দরিদ্র, কিছু পৈতৃক জমী আছে, তাই চাষে লাগিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আমি গরীব গৃহস্থের মেয়ে, রাজ প্রাসাদের শিষ্টাচার কিছুই জানি নি।

সম্রাট। আশ্চর্য্য! এই অসাধারণ সৌন্দর্য্যরাশি এত কাছে রয়েছে অথচ আমরা টের পাইনি, আমাদের চোখেই পড়ে নি?—এতো ভারি আশ্চর্য্য!

শাওকীন। অমাত্য মৌংসু আমাকে পছন্দ ক'রে আমার ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন; সেই সঙ্গে তিনি আমার পিতাকে বলেছিলেন "তোমার মেয়েকে রাজরাণী ক'রে দিচ্চি, তার জন্যে আমাকে একশো ভরি সোনা দিতে হ'বে।" বাবা গরীব মানুষ,—দিতে পারলেন না। অমাত্য সেই জন্যে রাগ ক'রে, সম্রাটের কাছে পাঠাবার জন্যে আমার যে ছবি আঁকিয়ে ছিলেন, সেই ছবিতে, আমার চোখের নীচে একটা বিশ্রী কাটা দাগ এঁকে দিলেন।

সম্রাট। স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী! এঁর ছবিখানি আমার চোখের সাম্‌নে ধর, দেখি। (প্রতীহারী অনেকগুলি ছবির ভিতর হইতে বাছিয়া একখানি বাহির করিল।) ইস, এমন সুন্দর মূর্ত্তি এম্‌নি ক'রে দাগী করেছে,—শরৎ শেষের নির্ম্মল ধারা একেবারে ঘোলা ক'রে এঁকেচে! (প্রতীহারীর প্রতি) স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী! কোতোয়ালকে জানাও যে আমি অমাত্য মৌংসুর ছিন্ন মুণ্ড দেখতে ইচ্ছা করিচি।

শাওকীন। দেবপুত্র! আমার পিতা গরীব—

সম্রাট। ভবিষ্যতে তাকে কোনো খাজনাই দিতে হ'বে না; আজ থেকে সে রাজার শ্বশুর। শাওকীন্! আজ থেকে তুমি রাণী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হান্‌চীন্ খাঁ। চীন সম্রাট কন্যাদানে সম্মত হ'লেন না; দূত ফিরে এসেচে; রাজকন্যার বয়স অল্প, হুঁঃ, ও একটা ছল মাত্র। ইচ্ছা থাক্‌লে সম্রাট্ অন্ততঃ তাঁর নির্ব্বাচিত সুন্দরীদের ভিতর থেকে একজন কাউকে পাঠাতে পারতেন। তা' পাঠালেও আমাদের সম্মানের হানি হত না। না, লোক পাঠিয়ে দূতকে ফিরিয়ে আনা যাক্; যুদ্ধই করতে হল দেখ্‌চি। এতদিনকার সন্ধিটা ভঙ্গ করতেও মন উঠ্‌চে না। ব্যাপার কোন্ দিকে গড়ায় দেখা যাক্; হাল্‌টা ভাল ক'রে বুঝেই চাল্‌টা চাল্‌তে হ'বে।

(প্রস্থান)

(মৌংসুর প্রবেশ)

মৌংসু। সম্রাটের জন্যে সুন্দরী বাছতে গিয়ে বেশ গুছিয়ে নেওয়া গিইছিল; প্রাণের দায়ে সব ফেলে আস্‌তে হ'ল। ভাগ্যিস্ টাকা জমাতে শিখেছিলুম, টাকার জোরেই রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচিয়ে পালিয়ে আস্‌তে পেরেচি, কিন্তু এ মাথা এখন রাখি কোথায়?...শাওকীন্‌টা সব মাটি ক'রে দিয়েচে, সব মাটি, সব মাটি। আচ্ছা, শাওকীন, দেখা যাবে, শেষে কে হারে আর কে জেতে।...ওঃ কি হাঁটাই হেঁটেচি, কতদূর যে এসে পড়িচি তাও ঠিক বুঝতে পারচিনে। এই যে—মেলাই ঘোড়া, মেলাই লোক! তাতারদের তাঁবু নাকি? হুঁ, তাই বটে। (পরিক্রমণপূর্ব্বক নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওহে দাঁড়িদার। তোমাদের সর্দ্দার হান্‌চীন্ খাঁকে বল, যে চীন সম্রাটের একজন অমাত্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন।

(হান্‌চীন্ খাঁর প্রবেশ)

হান্‌চীন্। এই দিকে এস; তুমি কে?

মৌংসু। আমি চীন সম্রাটের একজন অমাত্য, আমার নাম মৌংসু। দেখুন সম্রাটের পশ্চিম প্রাসাদে সম্প্রতি একজন পরমা সুন্দরী কিশোরীকে এনে রাখা হ'য়েচে, তার নাম শাওকীন্। আপনার দূত যখন আমাদের সম্রাটের কাছে আপনার ন্যায্য প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন এবং সম্রাট রাজকুমারীর বয়সের অল্পতার আছিলায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন আমি এই শাওকীন্‌কে আপনার কাছে পাঠাবার কথা সম্রাটকে বলেছিলুম। কিন্তু সম্রাট রাজী হ'লেন না, দেখলুম ওদিকটাতে তাঁর নিজের একটু নজর জন্মেচে। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বলেছিলুম,—বলেছিলুম যে তুচ্ছ একজন স্ত্রীলোকের জন্যে, অশান্তি আন্‌বেন্ না, তাতার সর্দ্দারকে চটাবেন না, যুদ্ধ বাধাবেন না। তাতে তিনি উল্‌টে ভয়ানক রেগে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি তো পালিয়ে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে এসেচি; আসবার সময় তাড়াতাড়িতে নজর দেবার মত কিছুই আন্‌তে পারিনি, কেবল শাওকীনের এই ছবিখানি আপনার জন্যে, জামার ভিতরে লুকিয়ে, অতি সাবধানে নিয়ে এসেচি। (চিত্র প্রদর্শন)

হান্‌চীন্। চমৎকার—চমৎকার! এমন রূপ হয়? এমন রূপসী পৃথিবীতে জন্মায়? একে পেলে আমি রাজকন্যাকেও চাই নি।

এখনি পত্র লিখে দূত পাঠাচ্ছি। আপনার সম্রাট রাজী হন ভাল; নইলে বাধ্য হ'য়ে আমায় সন্ধিভঙ্গ করতে হ'বে। রসদ ফুরিয়ে এসেচে,—আমুক, আমার সৈন্যেরা শীকার লব্ধ মাংসের উপর নির্ভর করে অভিযান করতে পারবে। তারপর একবার সীমান্তটা পার হ'য়ে লোকালয়ের কাছাকাছি গিয়ে পড়তে পারলে রসদ জুটিয়ে নেওয়া শক্ত হ'বে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সম্রাটের প্রাসাদ।

শাওকীন ও পরিচারিকা।

শাওকীন্। যতদিন দুর্ভাগা ছিলুম ততদিন সবাই দয়ার চক্ষে দেখ্‌ত। সম্রাটের সুনজরে পড়ে পর্য্যন্ত সকলেই মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত। সম্রাট আমায় ভাল-বাসেন, আমায় কাছে কাছে রাখেন, অন্তঃপুরের বাইরে যেতে চান্ না, রাজকার্য্য দেখেন না,—সে কি আমার দোষ! আমি কি বারণ করি। দেখ্ দেখি, আজ তো অনেক উদ্যোগ ক'রে, মিনতি ক'রে রাজ-সভায় পাঠিয়ে দিলুম, নইলে কি যেতেন? কিন্তু পাঠালে কি হয়, ঐ তো এখনি ফিরবেন। (আশীর সম্মুখে আপনা আপনাকে দেখিতে দেখিতে) না প্রায় ঠিকই আছে। (বেশ বিন্যাসে প্রবৃত্ত)

(সম্রাটের প্রবেশ)

সম্রাট। পশ্চিম প্রাসাদে শাওকীনকে দেখে অবধি যেন মাতাল হ'য়ে থাকা গেছে, দিনগুলো সব খেয়ালের ঝোঁকে কেটে যাচ্ছে। কতদিন যে দরবারে যাওয়া হয় নি তা মনেই নেই। আজ, তার উপর, দরবারের শেষ পর্য্যন্ত হাজির থাকতে গিয়ে একেবারে বিরক্ত হ'য়ে যাও গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারা গেল না, দেরী সইল না; সভার পোষাকেই একবার ওকে দেখে যাওয়া যাক। ঐ যে; কাছে যাওয়া হ'বে না, এইখান থেকে লুকিয়ে দেখা যাক। (ধীরে ধীরে ক্রমশঃ শাওকীনের পিছনে আসিয়া, স্বগত) বাঃ! গোল আশীখানির ভিতরে প্রতিবিম্ব পড়েচে, মনে হ'চ্ছে যেন চাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করচে। (স্তব্ধ ভাবে নিরীক্ষণ)

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান। মন্ত্রীর কাজ মন্ত্রণা দেওয়া
ফেলে রেখে পাশা দায়,
মন্ত্রীর কাজ দরবারে ব'স'
দেশের ভাবনা ভাবা!
এখন এদের আনাগোনা হায়
কেবলি প্রমোদ বনে
রাজ্য ও রাজা—কাহারো কথাই
পড়ে না'ক' আর মনে।

এদিকে হঠাৎ হানচীন খাঁর দূত এসে হাজির! হানচীন্ খাঁ রাজকুমারীর বদলে শাওকীন দেবীর পাণিগ্রহণ করতে চায়; সহজে সুবিধা না হ'লে যুদ্ধ করবে। কাজেই বাধ্য হ'য়ে একরকম মহারাজের পিছনে পিছনেই, আমাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হ'ল। (সম্রাটকে দেখিয়া) মহারাজের কাছে নিবেদন এই, যে উত্তরবাসী বিদেশীদের সর্দ্দার হানচীন্ খাঁ, পলায়মান মৌংসুর কাছে শাওকীন দেবীর চিত্র দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, এবং বিবাহের প্রস্তাব ক'রে

মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। মহারাজ যদি শাওকীন দেবীকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে সম্মত না হন তো তিনি যুদ্ধ করবেন—চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন, লিখেচেন।

সম্রাট। চীনসাম্রাজ্য ছারখার করবেন? ...লিখেচেন? বটে! সৈন্য সামন্ত রয়েচে, কি জন্যে? তারা রক্ষা করবে না? সবাই তাতারের ভয়ে আড়ষ্ট? কারো ক্ষমতা নেই? কেউ এই অসভ্য বর্ব্বরগুলোকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারবে না! এই অপমান দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে? রাজপত্নীর লাঞ্ছনা অনায়াসে সহ্য করবে? আশ্রিত স্ত্রীলোককে শত্রুর হাতে সপে দিয়ে কাপুরুষের মত বেঁচে থাকবে?

প্রধান। মহারাজ মার্জ্জনা করবেন, অধীনকে রাজকার্য্যের অনুরোধে বাধ্য হ'য়ে বাচালতা অবলম্বন করতে হচ্চে। মহারাজের এই অতিপ্রেমের কাহিনী দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েচে; সবাই জান্‌তে পেরেচে আপনি অকলঙ্কীর প্রেমে রাজলক্ষ্মীকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেচেন। আপনি রাজকার্য্য দেখেন না বলে রাজপুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেচে, রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা। কাজেই বিদেশী বর্ব্বরেরা সাহস পেয়ে গেছে, ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করচে। এখন, এ অবস্থায়, শাওকীন দেবীর মায়া ত্যাগ করা ভিন্ন আর কী উপায় আছে? আমাদের সৈন্য সুশিক্ষিত নয়, উপযুক্ত সেনাপতির অভাব ও অনেক দিন মহারাজকে জানিয়েচি। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাতারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হ'লে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর, তার উপরে, তাতারেরা একবার লুটপাট আরম্ভ করলে দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা থাক্‌বে না। অন্তত প্রজাদের মুখ চেয়েও শাওকীন দেবীকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। তাতার দূত রাজদর্শনের জন্যে বাইরে প্রতীক্ষা করচে।

সম্রাট। আস্‌তে আদেশ কর।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। তাতার সর্দ্দার হান্‌চীন্ খাঁ মাননীয় চীন সম্রাটকে এই কথাগুলি জ্ঞাপন করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েচেন। প্রথম কথা, এই যে, চীন সম্রাট তাতারদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ; সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে, তাতার সর্দ্দার চীন রাজবংশের কোনো সুন্দরী মহিলার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হ'য়ে চীন সম্রাটের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালে সম্রাট ঐ প্রস্তাবে সম্মত হ'তে বাধ্য। দ্বিতীয় কথা এই, যে, এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে তাতার সর্দ্দারের পক্ষ থেকে দু'বার দু'জন দূত এসে নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেছে; চীন সম্রাট কন্যাদানে সম্মত হননি। এই ঘটনার পর চীন সম্রাটের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য মৌংচু তাতার সর্দ্দার হান্‌চীন্ খাঁকে শাওকীন নাম্নী রাজান্তঃপুরবাসিনী কোনো সুন্দরী মহিলার একখানি আলেখ্য দেখিয়েছেন। তৃতীয় কথা এই, যে, তাতার সর্দ্দার এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে তৃতীয়বার দরবারে দূত পাঠিয়েচেন। এখন সম্রাট যদি প্রাচীন সদ্ভাব রক্ষা করতে চান্ তবে শাওকীন্ দেবীকে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে

দিতে দ্বিধা করবেন না। সম্রাট যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না থাকেন তবে হান্‌চীন্ খাঁ, তাঁর সঙ্গত দাবী বজায় করবার জন্যে চীনরাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হ'বেন। ভাগ্য নির্ণয় অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হ'বে। মহারাজ ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা ক'রে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে আমরা বাধিত হ'ব।

সম্রাট। দূতকে এখন বিশ্রাম গৃহে নিয়ে যাওয়া হোক্। (দূতের প্রস্থান)

অমাত্য প্রধান! সেনাপতিকে খবর দিন, সান্ধিবিগ্রহিককে খবর দিন; সবাই একত্র হ'য়ে, পরামর্শ ক'রে এমন একটা পন্থা স্থির ক'রে ফেলা হোক,—যাতে তাতার সৈন্যের তর্জ্জনও নিরস্ত হয়, শাওকীন দেবীকেও না বর্ব্বরের হাতে সঁপে দিতে হয়। ... ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন।...হ'ল না? পারলেন না?...আমি সহজেই লোকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে এসেচি, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কারো প্রতি কখনো কঠোর ব্যাভার করিনি,—তার ফলে সকলেই কি আমার ইচ্ছার বিরোধী হ'য়ে উঠ্‌ল?...যখন আমার পিতামহী সাম্রাজ্ঞী লুহাও বেঁচেছিলেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইতে পারে এমন দুঃসাহসী একজনও ছিল না; তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন।...ভবিষ্যতে দেখ্‌ছি সাম্রাজ্যের ভার, এতগুলো পুরুষ মানুষের হাতে না রেখে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের হাতে রাখ্‌লেই সমস্ত সুশৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌বে।

শাওকীন। মহারাজের স্নেহের প্রতিদান নেই; তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান—প্রাণও নেই। তবে তাঁর মঙ্গলের জন্যে, তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্যে দাসী মৃত্যুমুখে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু...এই অনুরাগ...এ আমি কেমন ক'রে ভুলব!

রাজা। তোমায় কি বল্‌ব? আমিই যে ভুল্‌তে পারব তা জোর ক'রে বল্‌তে পারিনে।

প্রধান। মহারাজ! অধীনের নিবেদন, পৈতৃক রাজ্য যাতে পরহস্তে না গিয়ে, পুত্র পৌত্রের ভোগে আসে সেই পন্থাই অবলম্বনীয়। দেবীকে অবিলম্বে তাতার শিবিরে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করাই সুযুক্তি।

সম্রাট। তবে তাই হোক। দূতের হাতে সঁপে দাও।...আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাব,... শাওকীনকে একদিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আস্‌ব; ..পা'ক্লিং সেতুর এ পারে শেষ বিদায় নিয়ে ফিরব।

প্রধান। সর্ব্বনাশ! এতে যে সম্রাটের মর্য্যাদার হানি হ'বে; এমন কি, এর জন্যে এই বর্ব্বর তাতার গুলো পর্য্যন্ত টিটকারী দিয়ে হাস্‌বে।

সম্রাট। হাসুক্। আমরা আমাদের অমাত্যের সকল অনুরোধই আজ রেখেচি, অমাত্য কি আমাদের এই অনুরোধটাও রাখ্‌বেন না?...যে যাই বলুক, আমরা শাওকীনকে একটা দিনের পথ এগিয়ে দিয়ে আস্‌ব...বিদায় নিয়ে আস্‌ব। তার পর শূন্য প্রাসাদে ফিরে আমরণ বিশ্বাসঘাতক মৌংসুর ব্যাভার স্মরণ করতে থাকব।

প্রধান। আমাদের মজ্জাগত এই অক্ষমতার জন্যে নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে, কেবল লোকক্ষয় ধনক্ষয়

নিবারণ করবার জন্যে, মহারাজকে আশ্রিত-বর্জ্জনের মন্ত্রণা দিতে হ'ল। উপায় নেই,... তার উপর এই স্ত্রীজাতির জন্যে—বিশেষতঃ রূপবতী রমণীর জন্যে জগতে এপর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, অনেক রাজ্য ধ্বংস হয়েচে, অনেক জাতি উৎসন্ন গেছে।...সাহস হয় না... স্ত্রীলোকের জন্যে লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস হয় না।

শাওকীন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে বর্ব্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চলেচি। যুদ্ধ বাধ্‌লে কত লোকের সর্ব্বনাশ হ'ত, কত নারী পতিপুত্র হারাত, সে সর্ব্বনাশের পথ আমি বন্ধ কর্‌তে যাচ্চি।...তারা কি আমায় মনে করবে?...তারা কি আমায় আশীর্ব্বাদ করবে?...হয়তো করবে; তবু মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার বুক ভেঙে যাচ্চে। (প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাক্লিং সেতু।

শাওকীন, দূত ও অনুচরগণ।

শাওকীন। (স্বগত) ওঃ! এই আমি,... মহারাজের কাছে মান পেয়েছিলুম, মর্য্যাদা পেয়েছিলুম, অনুগ্রহ পেয়েছিলুম, স্নেহ পেয়েছিলুম।...তাতার সর্দ্দার লিখেচে, আমায় না পাঠালে রাজ্য ছারখার করবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! একজনের জন্যে রাজ্যের লোককে খুনজখম করবে!...এই সব বর্ব্বর... এদের কাছে আমায় যেতে হ'বে...এদের সঙ্গে থাক্‌তে হবে,...এদের খুসী করতে হ'বে! শুনেছি, এরা যে দেশের লোক সে দেশ ভারি ঠাণ্ডা, বরফ পড়ে; কেমন ক'রে সে দেশে থাকব! ভগবান! যাকে রূপ দিয়েছ তার কপালে সুখশান্তি লিখ্‌তে একেবারে ভুলে গেছ!...কি করব?... নিরুপায়, নিরুপায়।

(সম্রাট ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

সম্রাট। বিদায় নেবার সময় এসেছে... এই আমাদের শেষ দেখা। (অমাত্যদের প্রতি) পারলে না? শাওকীনকে বর্ব্বরের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? পত্নী-বর্জ্জন ভিন্ন রাজ্যরক্ষার কোনো উপায় ভেবে পেলে না?...অকর্ম্মণ্য। (ঘোড়া হইতে নামিয়া শাওকীনের হস্তধারণপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন ও নাট্যের দ্বারা পরস্পরের দুঃখপ্রকাশ)

দূত। দেবি, একটু ত্বরান্বিত হ'তে আজ্ঞা হোক; আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এল, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই।

শাওকীন। প্রভু! আর কবে আপনাকে দেখ্‌তে পাব! কেমন ক'রে দেখ্‌তে পাব!... আজ যে রাজার রাণী কাল সে বর্ব্বরের বাঁদী হবে। প্রাসাদের বেশ এইখেনেই ছেড়ে যেতে চাই, এই উজ্জ্বল সাজ চামড়ার তাঁবুতে একটুও মানাবে না।

দূত। দেবী, আবার আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল...একটু ত্বরান্বিত হ'ন্‌ অত্যন্ত দেরী হ'য়ে যাচ্চে।

সম্রাট। না, আর দেরী কিসের? শাওকীন! অনেক দূরে চলে যাচ্চ, কিন্তু দেখ, আমাদের অনুরাগের এই শৈশব স্মৃতি রোষের আগুনে যেন নীরস হ'য়ে না ওঠে, অভিমানের স্পর্শে যেন মলিন হ'য়ে না যায়।

আমার অক্ষমতা স্মরণ ক'রে ক্ষমা কোরো,... মনে রেখো।

(শাওকীন ও দূতের প্রস্থান)

আমায় লোকে বলে সম্রাট? চীনরাজ্যের ভাগ্য বিধাতা!

প্রধান। মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্, আশ্বস্ত হোন্।

সম্রাট। চলে গেল...ভাসিয়ে দিতে হ'ল! এই [illegible] প্রাচীর, এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গ শ্রেণী, এই সহস্র সৈন্য সামন্ত...সব মিথ্যা! যাহাদের নামে কম্পমান! এতগুলো পুরুষের বুদ্ধিবল এবং বাহুবলে রাজ্য রক্ষা হ'ল না, একটা আশ্রিত স্ত্রীলোককে বলি দিয়ে রাজ্যরক্ষা করতে হ'ল! বীরপুরুষেরা কাপুরুষের মত বেঁচে রইলেন!

প্রধান। মহারাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করতে আজ্ঞা হোক্। আপনি বিজ্ঞ, গতানুশোচনা যে নিষ্ফল সেকথা আপনার অজানা নেই। শাওকীন দেবীর কথা এখন বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়।

সম্রাট। হৃদয় যদি লোহার হ'ত তাহ'লে বিস্মৃত হওয়া যেত, অমাত্য প্রধান, তাহ'লে ভোলা যেত। অজস্র চোখের জল...মুছে শেষ করতে পারছিনে।...আজ, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে, তার পরিত্যক্ত ঘরখানিতে, হাজার রোপ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে, তার ছবিখানিকে সামনে রেখে তার কল্যাণে সারারাত আমি দেবার্চ্চনা করব।

প্রধান। এখন তবে প্রাসাদে ফিরে চলুন, দেবী এতক্ষণ বহুদূর চলে গেছেন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তাতার শিবির। হানচীন্ খাঁ, শাওকীন ও তাতারগণ।

হান্‌চীন্। চীন সম্রাট সর্ব্বমত-সুন্দরী শাওকীন দেবীকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। এঁকে আমি দেশে ফিরেই, সসম্মানে পত্নীত্বে বরণ করব। যাক্, দুই দেশের প্রজাই অশান্তির হাত থেকে নিস্তার পেলে। (একজন তাতারের প্রতি) ওহে ছোকরা, সকলকে তাঁবু ওঠাবার হুকুম জানিয়ে দাও, আজই উত্তরে ফিরতে হ'বে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

আমুর নদীর উপর নৌকা।
হান্‌চীন্ খাঁ, শাওকীন।

শাওকীন্। এ কোন্ জায়গা?

হান্‌চীন্। এই হ'ল দুই রাজ্যের সীমানা এই যে নদী একে আমরা বলি কাল-নাগিনী। এর এ কূল চীন সম্রাটের অধীন, ওকূল তাতার সর্দ্দারের আয়ত্ত।

শাওকীন। তাতার সর্দ্দার, এই খানে, আমি আমার দক্ষিণের আত্মীয়দের উদ্দেশে এক অঞ্জলি ফুল ভাসিয়ে দিতে চাই। (ধারে গিয়া) আমার দেবতা, মধুর-উদার-প্রকৃতি চীন সম্রাট! তোমার উদ্দেশে এ জীবনে আমার এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি। (নদীতে পতন) পরলোকে তোমারি প্রতীক্ষা—(জলে অদৃশ্য হইয়া গেল।)

হান্‌চীন্। (ধরিতে না পারিয়া) গেল —গেল ঘূর্ণিজলে পড়তে না পড়তে একেবারে তলিয়ে চলে গেল! প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল

—বিদেশী তাতারকে বিবাহ করবে না। আর উপায় নেই।... নৌকা ভিড়াও, এই নদীর তীরে শাওকীনের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে; তার আগে দেশে ফিরব না। মন্দিরের নাম হবে সবুজ সমাধি।... আর সে নেই; চীন সম্রাটকে অকারণে উৎপীড়ন করা হল।... কুচক্রী, হতভাগা মৌংসুই এই অনর্থের মূল। (একজন তাতারের প্রতি) দেখ, মৌংসুকে, এখনি বন্দী করে, চীন সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দাও, সেই খানেই ওর উচিত শাস্তি হ'বে। ওকে একদণ্ডও আর আমাদের মধ্যে রাখা হ'বে না। মৌংসুর মত কুটিল লোককে যে আশ্রয় দেবে তার বিপদ পদে পদে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পশ্চিম প্রাসাদ।

চীনসম্রাট ও প্রতিহারী।

সম্রাট। শাওকীনকে পরের হাতে তুলে দিয়ে পর্য্যন্ত আর দরবারে মুখ দেখাই নি।... রাত্রির নিস্তব্ধতাও ভাল লাগে না, মন যেন আরো হতাশ হ'য়ে পড়ে। সান্ত্বনার মধ্যে তার এই ছবিখানি, এই খানিকে সামনে রেখে, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যায়। (প্রতিহারীর প্রতি) স্বর্ণ তোরণের প্রতিহারী! দেখ, দেখ, এদিকের ধূপটা একেবারে নিবে গেছে, আর একটা জেলে দাও দেখি। ...সে চোখের আড়াল হ'য়ে চলে গেছে, তাই ব'লে তাকে প্রাণের আড়াল করতে পারব না; তার এই ছায়াখানিই এখন আমার জীবনের অবলম্বন।... ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়চে, অথচ ঘুম আসে না। দেখি একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ। স্বপ্নে শাওকীনের আবির্ভাব।)

শাওকীন। বর্ব্বর তাতারেরা আমায় উত্তর দেশে নিয়ে যেতে চায়;—আমি তাদের তাঁবু থেকে লুকিয়ে চ'লে এসেচি।...এই না মহারাজ? রাজা আমার! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসিচি।

(স্বপ্নে একজন তাতার সিপাহীর আবির্ভাব)

সৈনিক। একটু তন্দ্রা এসেছে কি অমনি পালিয়েচে! স্ত্রীলোকের এত সাহস? আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে তার পিছন পিছন ছুট্! ছুটতে ছুটতে একেবারে পশ্চিম প্রাসাদের দরজায় এসে পড়েচি···এই না সে? হুঁ, খুব পালানো হয়েচে যে! এখন চল। (শাওকীনকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তর্ধান)।

সম্রাট। (জাগিয়া), যা, অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দিনের বেলায় জেগে থাকতে, যাকে এত ডেকেও সাড়া পাইনি, স্বপ্নের কৃপায় তাকে পেয়েছিলুম,···রাখতে পারলুম না,... স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।···ওই!···বিরহী চক্রবাক্ চীৎকার করচে; আমার এই বেদনার মর্ম্ম শুধু ওই বনের পাখীই বুঝতে পেরেচে।···চক্রবাকের মতন দুর্ভাগ্য আর কারো নেই;···উত্তরে ওর তাতার সিপাহীর তীরের ভয়, দক্ষিণে ফন্দিবাজদের জালে পড়বার ভয়। নাঃ, আবার ডাকতে সুরু করলে, এই পাখীগুলোর জালায় মনটা আরো খারাপ হ'য়ে উঠল।

প্রতীহারী। মহারাজ, আপনি দেবতুল্য, আপনি শোকে মলিন হ'য়ে থাকেন এ আমাদের সহ্য হয় না।

সম্রাট। এ শোক দমন করবার ক্ষমতা ...আমার নেই। আমাকে তোমরা সবাই মিলে কেন এই এক কথা বারম্বার বারম্বার বল? তোমরা কি শোক দুঃখের মর্ম্ম জান না?···ওই যে পাখীর আওয়াজ এখনি শুন্‌লে ওতো মুকুলভোজীর আনন্দ কলরব নয়।···শাওকীন আমার গৃহশূন্য ক'রে চলে গেছে।···হয় তো ঠিক এই মুহূর্ত্তে বুনোপাখীর হাহাকার শুনে আমারি মত সে আকুল হ'য়ে উঠেচে। স্বর্ণ তোরণের প্রতীহারী! বল্‌তে পার—সে এখন কোথায়? বল্‌তে পার? জান?

(প্রধান অমাত্যের প্রবেশ)

প্রধান। মহারাজ, এইমাত্র তাতার সর্দ্দারের দু'জন লোক মহারাজের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য মৌংস্থকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে এনে হাজির করেচে। তাতার সর্দ্দার লিখেচেন,—এই বিশ্বাসঘাতকই সকল অনর্থের মূল; এ আপনার আজ্ঞা অমান্য ক'রে পালিয়েছিল,, সেইজন্যে আপনার হাতেই একে প্রত্যর্পণ করা হ'য়েচে। নইলে, সর্দ্দারই একে সমুচিত শাস্তি দিতেন। তাতার সর্দ্দার চীনসম্রাটের সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্‌তে ইচ্ছুক, সম্রাটের অভিপ্রায় জান্‌বার জন্যে দূত অপেক্ষা করচে। সর্দ্দার এই চিঠিতে আর একটা সংবাদ দিয়েছেন···শাওকীন দেবী আর ইহলোকে নেই।

সম্রাট। (অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাও, সকল অনর্থের মূল বিশ্বাসঘাতক মৌংস্থর মুণ্ড ছিন্ন ক'রে অভাগিনী শাওকীন দেবীর অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্ত্যর্থে দান করগে।···আর, তাতার দূতের সম্মানার্থে সমারোহ পূর্ব্বক প্রাসাদে ভোজের আয়োজন করতে ভুলনা, যাও। (অমাত্যের প্রস্থান)

চক্রবাকের ক্রন্দন শুনি' কানে,
কত না স্বপন জেগে উঠেছিল প্রাণে!
সারারাত শুধু ভেবেছি তাহারি কথা,
সে যে বেঁচে নাই জানি নাই সে বারতা।
সবুজ সমাধি* আছে শুধু নদী তীরে,
সিক্ত তাতার চীনের অশ্রুনীরে।
যে পটুয়া তার ছবি ক'রেছিল মাটি,
মূল্য সে দিবে নিজের মুণ্ড কাটি'।

যবনিকা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আষাঢ়ে।

নবীন ধূসর মেঘে মেদুর অম্বর।
গিরি কটিদেশ বেড়ি গর্জ্জি গুরু গুরু
নিয়ে তপোবনশির ছায় ঘনতর
আশ্রম পালিত মৃগ কাঁপে দুরু দুরু।
যজ্ঞ সাথে ত্রস্তে ঋষি পশিছে কুটীরে
হোমধূম মিশে যায় নীরদের গায়
চঞ্চল বলাকা মালা শোভে অদ্রি শিরে,
হোমধেনু সচকিতে আশ্রমেতে ধায়।
রুক্ষ কেশ সনে উড়ে বল্কল অঞ্চল
প্রত্যাসন্ন মেঘগাত্রে রাখি নেত্র দুটি
অঙ্কেতে আশ্রিত মৃগ শাবক চঞ্চল
রুদ্রাক্ষ বলয় পড়ে শ্লথ হয়ে টুটি
মণিবন্ধ হ'তে, তপঃক্ষীণ তনুলতা
শুনে মেঘমন্দ্রে আজি আশার বারতা।

শ্রীনিরুপমা দেবী

* আমুর নদীর বালুকাময় তটের কেবল একটি মাত্র অংশ শস্প-সমাচ্ছন্ন, এই অংশটিকে লোকে এখনও শাওকীন রাণীর সবুজ সমাধি বলে।

সুন্দর।

পশ্চিম আকাশের পরে তখনো সূর্য্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুলছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল; যেদিন প্রত্যহ সূর্য্যের উদয় এদেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখীর কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলত; এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনত, ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্য্যাবর্ত্তের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আদ্য-পিতামহেরা তাকে এক দিনও এক বেলাও উপেক্ষা করেননি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং-সন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেবল ভোগীর মত নয়, ভাবুকের মত নয়। সৌন্দর্য্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন—সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে, মনকে স্থির শান্ত করে উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল নদীসঙ্গমে সমুদ্রতীরে পর্ব্বতশিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানে তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেননি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান্‌রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠ্‌ছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোট না করে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জান্‌তে পারি। অর্থাৎ কেবলি তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে, আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল,

সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান্ বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত সৌখীন রকম করে দেখ্‌তে চাই;—তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি, সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই, এই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোট করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়র মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখ্‌তে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠিনে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে, তার সমস্ত ছোটকে আমরা বড় করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়, কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারিনে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখ্‌তে পাইনে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্ত্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখচি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনি অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইচে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম্ তাহলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত হয়ে যেতুম। টুক্‌রো টুক্‌রো করে যদি দেখ তাহলে এর মধ্যে কত ঘাত সংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! এই যে আমাদের চোখের সাম্‌নেই ঐ গাছটি এই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ'কে যদি আংশিক ভাবে দেখ্‌তে যাই তাহলে দেখ্‌তে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে! আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই, কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা কিছু তুচ্ছ যা কিছু ব্যর্থ যা কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করচে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য্য যে কাটাছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডীকাটা জিনিষ নয় বিশ্ববিধাতা

তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্চেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্চেন এত বড় বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করচে। সেই শক্তিকে দেখ্‌তে পাই সে অতি ভীষণ, সে কাট্‌চে ভাঙচে টান্‌চে জুড়চে, সে তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্য নিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে, তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে রোদসী রোদন করে উঠ্‌চে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি! যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখ্‌লে এমন ভয়ঙ্কর, তারই অখণ্ড সত্যরূপ কি পরম শান্তিময় সুন্দর! সেই ভীষণ যদি সর্ব্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য্য থাকৃত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলি বিচ্ছিন্নতার মধ্যে থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্যে থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুল্‌চে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ঙ্কর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য্য। জগতে এই মুহূর্ত্তেই যেমন আকাশজোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্ত্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্চে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্চেন—তাঁর ভয়ঙ্কর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুল্‌চে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্চে, এখনি এ আমরা কত সহজে কি অনায়াসেই দেখ্‌তে পাচ্চি—আমাদের মনে ভয় নেই, ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করচে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ঙ্কর ঘাতসংঘাত সর্ব্বদাই বড় করে প্রত্যক্ষ করচি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য হানাহানি কাটাকাটির মন্থন কেবলি চারিদিকে চল্‌চে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকৃত তাহলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিস্রস্ত হয়ে একটা আকারআয়তনহীন কদর্য্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চল্‌চে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ততেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্য্যবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌চে; তারই ভয়ঙ্কর পেষণে ঘর্ষণে রাজ্য সাম্রাজ্য শিল্প সাহিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠ্‌চে। এই সংসারের মাঝখানে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন—তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহাসৌন্দর্য্যকেই দেখেন—তাঁরা অমৃতকেই দেখেন—য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমন ভাবে বলেন, যেন, প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন, যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে যেন উপরে ওঠবার কোন বেগ নেই; সেই জন্যেই মানবপ্রকৃতিকে

বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক্ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা ত প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্চি—সে ত জড়যন্ত্রের মত একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করচে না। এ পর্য্যন্ত তাকে ত তার পথের কোন একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চল্‌তে চল্‌তে আজ মানুষে এসে পৌঁচেছে; এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড়, কত প্লাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্নিউচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠচে; আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘন মেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অদ্ভুত পাখী, কত আশ্চর্য্য জন্তু কোন্ নেপথ্য গৃহ থেকে এই সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমিতে এসে তাদের জীবনলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্দ্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে ত যায় নি। থেমে যদি যেত তাহলে এখনি যা কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা 'অদি-অন্তহীন বিশৃঙ্খলতার স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌ত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলি তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্ত্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারচে। কেবলি তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে করেই এগতে হচ্চে। কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই জন্যেই এত দুঃখ এত মৃত্যু। কিন্তু সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্যের বেড়ের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্চে না, কেবলি ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুইটিকেই আমরা এক সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখ্‌তে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়;—এই জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতি ভীষণ ভাঙা-গড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্ত্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখ্‌তে পাচ্চি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্চে সুন্দরকে দেখা—এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সবসময়ে আমরা এই দুইটিকে, এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্চে সেই-খানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিন্তু সেই

সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করচে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখ্‌চি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখচিনে, সেই জন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্চেন না, সেই জন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

কিন্তু মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখ্‌তে চাও? তাহলে নিজের স্বার্থপর ষড়রিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এস। মানবচরিত্রকে যেখানে বড় করে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াও। ঐ দেখ শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্চে—তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্চে! কি তার দীপ্তি, কি তার সৌন্দর্য্য, কি তার পবিত্রতা! কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখ! কি দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ঐ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তাহলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ এঁকে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈসাকে দেখ। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কি সুন্দর! শুধু তাই নয়; তাঁর চারিদিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সঙ্কীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্ত্তির উপকরণ;—পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখ্‌তে পাচ্চি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখ্‌তে পাই। কেননা সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখিনে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখ্‌ব, ভীষণকে সুন্দর বলে জান্‌ব, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি, তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে, অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড করে এক করে সুন্দর করে দেখ্‌ব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাক্‌ব—নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা

সৌন্দর্য্যকে যখন আমাদের দুর্ব্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে—তখন সেই সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে—সেই সৌন্দর্য্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে ত মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনি সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্ম্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

নির্ব্বাসন-কাহিনী। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। গিরিধি। মূল্য আট আনা মাত্র। নির্ব্বাসনকালে লেখকের অন্তরে বাহিরে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র লেখক এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ণনার ভঙ্গী যেমনই সরল, বিষয়টুকুও তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। এরূপ বিষয় লিখিতে বসিলে মনের উচ্ছ্বাস স্বতঃই একটু মাত্রা ছাড়াইয়া পাঠককে ক্লান্ত পীড়িত করিয়া তুলে, কিন্তু মনোরঞ্জন বাবু কোথাও মাত্রাতিরিক্ত অসংযত হন্ নাই, তাহারই ফলে পাঠক বহিখানি উপন্যাসের মতই একান্ত আগ্রহে পড়িয়া ফেলিবে—কোথাও বিরক্তি ধরিবে না। রচনায় কোন কৃত্রিমতা নাই, আড়ম্বর নাই—বেশ স্বচ্ছ ঝরঝরে ভাষায় আন্তরিক কথাগুলি লেখক গুছাইয়া বলিয়া গিয়াছেন। বহিখানি উপভোগ্য।

ভারতীয় বিদুষী। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দশ আনা মাত্র। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলাম, এখনও তাহার অতিরিক্ত বলিবার বড় কিছু নাই। এই সংস্করণে বহু স্থল পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে তাহার ফলে উপাদেয়তা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং বহু অপূর্ব্ব-প্রকাশিত বিদুষীর পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে। এ গ্রন্থের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

ছেলেদের চণ্ডী। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, সিটিবুক সোসাইটী। বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। চণ্ডীর কাহিনীটি লেখক বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছেন—অনেকগুলি রঙ্গিন্ চিত্রের সমাবেশে ছেলেদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। তবে ভাষায় প্রাদেশিকতারূপ দোষটুকু পরিহার করিলে ভাল হয়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই বেশ পরিপাটি হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

চয়ন।

লীনার কাহিনী। (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭০

তুমি বড় লক্ষ্মী, তুমি আমাকে দোষী করনি; আমার প্রতি তোমার কি গভীর ভালবাসা তা তোমার পত্রে বেশ প্রকাশ পায়। প্রাণের সখি বেত্তিনা, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ। তুমি আমাকে খুব সৎ উপদেশ দিয়েছ; সে উপদেশের মর্য্যাদা আমি বেশ অনুভব করচি। সেই উপদেশ অনুসারে চল্‌বার চেষ্টা করব;—সত্যি চেষ্টা করব। কিন্তু পার্‌ব কি? কিন্তু বড় দুর্ব্বল —বড়ই দুর্ব্বল।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে, একটি লোক মারা যায়। তার স্ত্রী তিনটি অনাথ শিশু সন্তানকে নিয়ে এখন একেবারে নিরুপায়। আজ প্রাতে সেই বেচারীর জন্য কতকগুলি পুরাণো কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম। সে আমাকে বল্লে,—দু দিন হ'ল, একজন ফরাসী সেনা-নায়ক তার কাছে এসেছিলেন। তার শোচনীয় অবস্থাসম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে' বেশ একটা থোকা টাকা তাকে দিয়ে গেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে সেনা-নায়কের নামটা কি; সে তার নাম জানত না। কিন্তু সে যে-রকম তাঁর বর্ণনা করলে, তাতে তিনি কাপ্তেন গার্ণিয়ে বলেই মনে হল। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বরাত্রে কাপ্তেনের কাছে সেই হতভাগিনীর অবস্থার কথা বলেছিলুম, তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বলেননি, কিন্তু এটা আমি লক্ষ্য করছিলুম, তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছিলেন। আজ রাত্রে ভোজনের সময় আমি তাঁকে বল্লুম, আমার আশ্রিতা বিধবাটির জন্য আপনি যা করেছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তাঁর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল।—"কোন্ আশ্রিত বিধবা? তার জন্য আমি কি করেছি?"— এই কথা তিনি একটু অস্ফুটস্বরে বল্লেন। আমি বল্লুম—যার কথা আমি বল্‌ছি আপনি বেশ জানেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে, অন্য কথা পাড়লেন। আমি তোমার কাছে স্বীকার করচি বেত্তিনা, কাল থেকে আমি খুব সুখী হয়েছি; সুখী এই মনে করে যে, আমরা দুজনেই একটা সৎকার্য্যে লিপ্ত হয়েছি। হায়! এতে আনন্দ প্রকাশ করাও কি আমার পক্ষে নিষিদ্ধ? শুধু তা নয়। আমি ভাবছিলুম,—এই রকম মনে করে আমি যে রকম সুখী হয়েছি, হয়ত তিনিও এই রকম মনে করে' সুখী হয়েছেন। আমি ঐ হতভাগিনীর জন্য ভাবি বলে', হয়ত তিনি ঐ জন্যই তার সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। আমার একি অদ্ভুত কল্পনা! তিনি কি স্বাভাবিক দয়ার বশবর্ত্তী হয়ে এ কাজ করতে পারেন না? অন্য কারণ দর্শালে, তাঁর পুণ্যের লাঘব করা হয় না কি? কিন্তু সে যাই হোক্, যদি সেই অন্য কারণটা সত্যি হয়, তাহলে, সখি, তাতেই আমার স্বর্গ-সুখ।

২২ ডিসেম্বর

তুমি ঠিক বলেছ; এই প্রেম একটা স্বপ্ন"বই আর কিছুই হতে পারে না;

বিষাদময় জাগরণের পরেও এই স্বপ্ন আমাকে অনুসরণ করবে, তোমার মতনই আমি সব বুঝ্‌ছি; আমি এটাকে মায়াবিভ্রম বলেই জান্‌চি। কিন্তু এই বিভ্রমের স্রোতে ভেসে না যাবার বল আমার নেই। কয়েক সপ্তাহ আমি খুব সুখে ছিলুম—সত্যিই খুব সুখে ছিলুম। আমি জান্‌চি পরিণামে আমি নিশ্চয়ই কষ্ট পাব, তবু সেই কষ্ট পরিহারের মূল্যে আমার জীবনের ঐ কয়েক সপ্তাহ বিক্রয় করতে আমি ইচ্ছা করিনে।

গত রাত্রে, এই প্রথমবার, কাপ্তেন গার্ণিয়ে আমাদের সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে ছিলেন; আর এই প্রথমবারই আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি পিয়ানোতে গিয়ে বসলুম; আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল; আমাকে একটা-কিছু করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি একটা ইটালীয় গান গাইলুম—তারপর একটা ধর্ম্মের গান গাইলুম। ভাবের আবেগে আমার কণ্ঠস্বর একটু কম্পিত হল। বোধ হয় তাতেই গানগুলি আরও একটু মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠ্‌ল। গার্ণিয়ে আমার পিছনে, চিম্নীর দক্ষিণে একটা কেদারায় বসেছিলেন। ইটালীয় গানটা গাওয়া হয়ে গেলে, তিনি একেবারে নিস্তব্ধ হলেন; তারপর সেই ধর্ম্মের গান। তিনি বল্লেন:—"কি চমৎকার • ভাবের উচ্ছ্বাস!" আরও তিনি এই কথা বল্লেন:—"আপনি যেমন সমস্ত প্রাণ দিয়ে, দরদের সঙ্গে এই গানটি গাইলেন এরূপ আর কোথাও শুনিনি; আপনাকে ধন্যবাদ; সঙ্গীতের কি মোহিনী শক্তি, আজ যেমন বুঝলুম, এরূপ আর কখনও বুঝিনি।" এই কথাগুলি আমার কাণে ও আমার হৃদয়ে যেন মধু ঢেলে দিলে। তাই তাঁর কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত করে দিলুম। ও-থেকে আমার গর্ব্বের ভাব মনে আসেনি। আমি বেশ জানি আমি সঙ্গীতের একজন ওস্তাদ নই; কিন্তু এ আমি বেশ জানি, তিনি যা আমাকে বল্লেন, তাই তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস; যেরূপ স্বরে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন, তাতে ভুল হবার জো নেই। তবে হয়তো... না, তা নয়, তা নয়, শুধু আমার কণ্ঠস্বরে তিনি খুসী হয়েছিলেন, আর আমার গান গাওয়াটাও নেহাৎ মন্দ হয়নি।

২৫ ডিসেম্বর।

আমি কি সুখীই হয়েছি! এই খৃষ্টমাস-দিনের সুখের স্মৃতিটা বরাবর থেকে যাবে, আমার মন থেকে কখনই অপনীত হবে না। লুইসা বুড়ী আর আমি দুজনে মিলে একটা ছোট খৃষ্টমাস-গাছ নানাপ্রকার টুকি-টাকি জিনিস ও খেলানাতে বিভূষিত করে রেখেছি। আজ সায়াহ্নে, ছেলেদের বাপ মায়া যে সব ছেলেদের পাঠাবে তাদের জন্য এই আয়োজন। আমার কাকা, আমার খুড়তুতো ভগিনী আগাথ্‌ ও বের্থাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আজ সকালে কাপ্তেন আমাদের বল্লেন, যদি তিনি সায়াহ্ন-ভোজনের সময় বাড়ীতে না থাকেন তাহলে আমরা যেন তাঁকে ক্ষমা করি। তিনি যে বাড়ী থাক্‌বেন না, তার দুই কারণ হতে পারে। তিনি হয়ত মনে করছেন, তিনি থাক্‌লে উৎসবটা বিষাদময় হয়ে উঠ্‌বে, কিংবা মনে করছেন, এই উৎসবে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে

শোভন হবে না। আমার মনে হয়, আজ খৃষ্টমাসের রাত্রিটা তিনি নির্জ্জনে কাটাবেন; তাই আমার মনটা খারাপ হয়েছে। অপরাহ্ণে, আমি বাগানে নাম্‌লুম। কয়েক সপ্তাহের বৃষ্টিবাদলের পর আজ পরিষ্কার হয়েছে, নীল আকাশে সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করচে। বাতাসটা বেশ মিঠে; মনে হয় যেন বসন্তকাল। কাপ্তেন গাণিয়েকে ঝাউএর গলি দিয়ে যেতে দেখ্‌লুম। যে দরজার সম্মুখে নদীর দৃশ্য, তিনি সেই দরজার দিকে গেলেন। আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে অভিবাদন করলেন। আমি কোন রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই তাঁর নিকটে গেলুম। তিনি একটা বড় তালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে বল্লুম:—"আজ রাত্রে, এই প্রথমবার, আমার মনে খৃষ্টমাসের আনন্দের সঙ্গে একটা বিষাদ এসে মিশ্রিত হবে। আমার মনে হবে, আমরা ভাগ্যক্রমে যে অতিথিকে পেয়েছিলুম, খৃষ্টমাসের দিনটা এসে তাঁকে আমাদের বাড়ী থেকে দূরে নিয়ে যাবে; আর তাঁর পক্ষেও আজকের দিনটা অন্যদিনের চেয়ে আরও ঘোর অন্ধকার বলে মনে হবে।" গাণিয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, পরে আমাকে এই কথা বল্লেন: "কিছুতেই যেন আপনার আনন্দের ব্যাঘাত না হয়, আপনি যে কথাগুলি বল্লেন, সেই কথাগুলিই আমার আজকের দিনের সমস্ত বিষাদ অপনীত করবে।" আর একটুক্ষণ তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন আরও কিছু বল্‌তে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পরে আমাকে এইকথা বলে প্রস্থান করলেন:—"আজ তবে বিদায় হই, কাল দেখা হবে।" "আপনার কথাগুলি, আমার আজকের দিনকার সমস্ত বিষাদ অপনীত করবে"—এই কথাগুলি আমি ক্রমাগত আবৃত্তি করচি। আমার হৃদয়ে এই কথাগুলির কি মধুর প্রতিধ্বনি হচ্চে! কি অনুরাগের স্বরে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। আর তাঁর দৃষ্টিতেও কি মাধুর্য্যই প্রকাশ পাচ্ছিল! একথা বোলোনা, প্রিয় সখি,— তাঁর কথাগুলিতে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে; তুমি যদি তাঁর কণ্ঠস্বর ও চাহনী লক্ষ্য করে দেখ্‌তে, তাহলে ওকথা বল্‌তে না। তাছাড়া, উত্তর দেবার আগে ওরূপ নিস্তব্ধতা কেন? আবার উত্তর দেবার পরেও ক্ষণেকের জন্য একটু ইতস্তত ভাব, তার পরেই হঠাৎ প্রস্থান—পাছে আরও কিছু বলে ফেলেন এই ভয়ে। না, না, আমি ভুল বুঝিনি; আমি শপথ করে বল্‌চি, আমি ভুল বুঝিনি। আমি চক্ষু মুদ্রিত করে, এখনও যেন সেই তাল-তরুর তলায় আমার সম্মুখে তাঁকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি। তিনি যখন কথা কচ্ছিলেন, অস্তগামী সূর্য্যের আলো তাঁর মুখের উপর পড়েছিল, আর সমস্ত উদ্যানটি জীবন ও উল্লাসে যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ওরে ক্ষুদ্র উদ্যান! শীতঋতুতে হতশ্রী হয়েও আমার চক্ষে আজ তুই যেরূপ সুন্দর, তোর বসন্তকালে সেই হরিত ক্ষেত্র, তোর সেই তরুরাজির হাস্যময় শাখাপল্লব, সেই বিচিত্র বর্ণের কুসুমরাশি,—এসমস্ত মিলেও তোকে এত সুন্দর করতে পারেনি। আজ তুই আমার মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে; মুগ্ধ চিত্তের সম্মুখে যেরূপ উল্লাসময় হয়ে উঠেছিস, তোর সেই বসন্তকালের পাখীর কূজন, সেই অলির গুঞ্জনেও

তোকে এত মধুর বলে আমার মনে হয়নি!

২৬ ডিসেম্বর

তিনি চলে যাচ্ছেন···আজ তিনটের সময় হুকুম এসেছে। একজন সৈনিক সেই হুকুম নিয়ে এসেছে। তখন আমি বাড়ীতে একলা ছিলুম। সে এই কথা বলে আদেশপত্রখানা আমার হাতে দিলে;—"এই চিঠি ফরাসী কাপ্তেনের জন্য"। আমি জানতুম না এ পত্রে কি আছে, তবু পত্রখানি দেখে আমার মনটা অস্থির হল। একটু পরেই, গার্নিয়ে এলেন; আমি সেই পত্র তাঁকে দিলুম। আমি তখন আমার কাকার সঙ্গে বৈঠকখানা-ঘরে ছিলুম। গার্নিয়ে কাকাকে বল্লেন,—"ডাক্তার, আমি কাল চলে যাচ্ছি; সমস্ত ফরাসী সেনানায়ক এই নগর ছেড়ে চলে যাবে; তাদের জন্য অন্য বাসা নির্দিষ্ট হয়েছে।" আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিলুম না; পাছে পড়ে যাই এই জন্য দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রইলুম। কাকা জিজ্ঞাসা করলেন—"এই নূতন বাসাটা কোথায়?"—"তা আমি জানি না"। আমার কাকা দু-চার পা চলে' হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালেন, আর গার্নিয়েকে এই কথা বল্লেন;—"কাপ্তেন, যদি আমার বাড়ী থেকে মুক্তি লাভ করে তুমি দেশে ফিরে যেতে তাহ'লে তোমার প্রস্থানে আমি খুসী হতুম; কিন্তু যখন তা হচ্ছে না, তোমাকে বিদায় দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে।" একটু দৃঢ় অথচ চাপা স্বরে কাপ্তেন উত্তর করলেন;—"ডাক্তার মহাশয়! আপনাকে ধন্যবাদ"। তার পর, তাঁর নিজের কামরায় ঢুকলেন, সমস্ত দিন কামরা থেকে আর বেরোলেন না। রাত্রির ভোজনের সময় সবাই নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার সময়, আধ ঘণ্টাকাল তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কেন এত অল্পক্ষণ? তিনি আমাকে গান করতে অনুরোধ করলেন না; ভাগ্যি করেন নি; আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, গানের একটা কথা গাইলেই চোখের জলে আমার বুক ভেসে যেত...তবু—তবু···আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, তিনি গাইতে আমাকে যদি একবার অনুরোধ করেন।

কাল তিনি চলে যাচ্ছেন। এ কি সম্ভব? হায়! স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, এরমধ্যেই ভেঙ্গে গেল! গত কল্যকার সেই দিন—আর তার পরেই কিনা...হা' ভগবান! আমার বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কাল, মধ্যাহ্নে! তিনি আমাকে একটি কথা না বলেই চলে যাবেন?

২৭ ডিসেম্বর

তিনি চলে গেছেন! ওরা তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল? আমি তা কিছুই জানি নে, কখনও যে জানতে পারব তাও মনে হয় না। যারা তাঁর প্রতি উদাসীন, তারাই তাঁকে দেখ্‌বে, তাঁর সঙ্গে কথা কবে। তাদের মধ্যেই তিনি থাক্‌বেন; হয় সুখী হবেন, নয় দুঃখী হবেন। আর আমার সঙ্গে তাঁর জন্মের মত বিচ্ছেদ! এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র তিনি এখান থেকে চলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন এক শতাব্দী!

রাত্রে নিদ্রা হয় নি, দুঃখকষ্টে রাত্রিটা কাটিয়েছি, আজ সকালে উঠে আমার ঘরের জান্‌লার ধারে গেলুম। আকাশ আবার তার সেই ধূসর অবগুণ্ঠন পরেছে, আর দমকে-দমকে ঝোড়ো বাতাস উঠে সোঁ-সোঁ শব্দ করচে। আমি বাগানে নেমে এলুম। হায়! আজ বাগানটির

কি উদাস ভাব, কি উজাড় ভাব, কি পরিবর্ত্তন! আমি বাগানে আধঘণ্টা কাল ছিলুম; আমি তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলুম; হাঁ, আমি তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলুম। আমি তোমার কাছে একথা স্বীকার করচি। আমি ত বলেছি, তোমার কাছে আমি কোন কথাই লুকোবো না। আমি প্রত্যাশা করছিলুম, তিনি আসবেন। তিনি এলেন না। তবে কি সেদিন, তাঁর কথায়, তাঁর কণ্ঠ-স্বরে, তাঁর দৃষ্টিতে আমি ভুল বুঝেছিলুম? হায়! তাই বটে; আমার হৃদয়ই ভালবাসার মোহে, ঐসকলের মন-গড়া অর্থ করেছিল। আবার দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হয়ে আমার ঘরটিতে আবার প্রবেশ করলুম।

মধ্যাহ্নে, কাপ্তেন গার্ণিয়ের ট্রেনে পৌঁছবার কথা। আমরা ১১টার সময় আহার করলুম। ভোজনের সময় তিনি কাকার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্ত্তা কইলেন। তবু আমার মনে হচ্চে, সচরাচর তাঁকে যে রকম দেখা যায়, তার চেয়েও যেন বেশী পাণ্ডুবর্ণ। নিশ্চয়, এটাও আমার একটা বিভ্রম। পৌনে বারোটার সময়, "কুরোন" নামক পান্থশালার একজন ভৃত্য তাঁর তোরঙ্গ ব্যাগ্ আদি নিতে এল। আমার কাকাকে তিনি বল্লেন, "বিদায় হলুম ডাক্তার মহাশয়, আপনার এই হতভাগা অতিথির প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি ছিল, আপনাকে ধন্যবাদ।" কাকা গদগদ স্বরে উত্তর করলেন "যেখানেই যান ঈশ্বর যেন আপনার সঙ্গে থাকেন।" তার পর কাপ্তেন আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "আপনার কাছেও বিদায় হলুম।" আমি কিন্তু তার উত্তরে বলতে পারলুম না, "আচ্ছা তবে আসুন",—সেটুকু বলও আমার ছিল না। আর করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াতেও সাহস হল না। তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাকা ও লুইসা, রাস্তার দরজা পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল, আর আমি বৈঠকখানা ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে লাগ্‌লুম। আমার মনে হতে লাগল, আমার হৃদয় যেন আমাকে ছেড়ে তাঁরই অনুসরণ করচে। সকালের চেয়ে এখন আকাশটা আরও ঘোর হয়ে এসেছে, বৃষ্টি পড়চে। সেই তরুণ সেনানায়ককে যেদিন গোর দিতে নিয়ে যাচ্ছিল আজ অনেকটা সেই দিনকার মত। হা! বেচিনা এখন আমার মরণ হলেই ভাল।

(গার্ণিয়ের বিধবা মাতার প্রতি গার্ণিয়ের পত্র।)

২৮ ডিসেম্বর ১৮৭০

মা,

আমি স···রে পৌঁছেছি। জর্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে সমস্ত ফরাসী সেনা-নায়ক, যত দিন না দেশে ফিরে যাবার অনুমতি পায়, ততদিন আমি এইখানেই বাস করব। আমরা গতকল্য মধ্যাহ্নে, ব· হতে ছেড়েছি।

আর সেখানে না যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল। আমি কখন কিছু তোমার কাছে লুকোইনি। আমি তোমাকে ঠিক কথা বলব। কখন কখন আমার পত্রে, ডাক্তার র—এর মেয়ে কুমারী লীনার কথা তোমাকে লিখেছি। মা, তুমি যদি তাকে একবার দেখ্‌তে, তার কি চমৎকার রূপলাবণ্য, তার মনটা কি সুন্দর, কি নির্ম্মল। আমি তাকে ভালবেসেছিলুম, এখনও ভালবাসি। তার

প্রতি আমার যেরকম মনের ভাব, সেই রকম মনের ভাব তার মনেও কি আমি উদ্রেক করতে পেরেছিলুম? না আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ওরূপ চেষ্টা করতে আমাকে নিবারণ করেছিল। সেই কুমারী আমার পত্নী কখনই হতে পারেন না। তাঁর কাকা কখনই তাঁকে একজন ফরাসীর হাতে সমর্পণ করতেন না। আর আমার জন্মভূমির দুর্দ্দশা থেকে আমি একটা মস্ত সুখলাভ করলুম, একথাটি কি আমার মনের ত্রিসীমায় আস্‌তে দিতে পারি? এ সুখ-সৌভাগ্য যদি আমি গ্রহণ করতুম, তাহলে আমার মনে হত আমি জন্মভূমির একজন বিশ্বাসঘাতক সন্তান। তাই আমার ভালবাসা আমার অন্তরের মধ্যেই বদ্ধ করে রেখেছি; আর আমি আশা করি একথা কুমারী ল... কখনই জান্‌তে পারেন নি। কেবল একবার, —আমার সেখান থেকে চলে আস্‌বার দুদিন আগে,—আমার মন একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, আর আমার প্রতিক্ষণ মনে হচ্ছিল, এই-বার বুঝি আমার মনের কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যাহোক ঈশ্বরের কৃপায় আমি সেই সময় কোনপ্রকারে বাক্‌সংযম করতে পেরেছিলুম। হায়! কাল বিদায় নেবার সময় কত কষ্টে যে আমার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা রক্ষা করেছিলুম, কত কষ্টে যে আমার চোখের ভাব গোপন করেছিলুম তা আর কি বলব। আমি হাতটি পর্য্যন্ত বাড়ালুম না পাছে কর-মর্দ্দনের সময়, আমার অন্তরের কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। জীবনে এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত আসে যা বড়ই নিষ্ঠুর মা! আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, বড় কষ্ট পাচ্ছি। তোমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাক,—আমি একজন সৈনিক। জন্মভূমির ভক্ত সন্তান।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মির্জার স্বপ্নদর্শন।

(জোসেফ অ্যাডিসন্ রচিত 'ভিসন অব্ মির্জা'র অনুবাদ।)

[গ্রাণ্ড কায়রোতে অবস্থানকালে কতকগুলি পূর্ব্ব-দেশীয় পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছিল। সেগুলি এখনও আমার নিকটে আছে। তাহার মধ্যে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া আমি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। সাধারণের মনোরঞ্জনকারী বিষয়ান্তরের অভাবে আমি সেই স্বপ্ন বিবরণটি সাধারণে প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। প্রথম স্বপ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার প্রতি কথার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।]

"বংশপরম্পরাগত প্রথানুসারে শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর দিন আমি অতি শুদ্ধাচারের সহিত যাপন করিতাম। সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতাম। তাহার পর, দিবসের অবশিষ্ট ভাগ চিন্তা ও ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে বোগদাদের শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিতাম। শৈলশৃঙ্গোপরি বায়ু সেবন করিতে করিতে মনুষ্যজীবনের অসারতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইতাম এবং চিন্তা করিতে করিতে মনে হইত—'মনুষ্য ছায়াস্বরূপ, মনুষ্যজীবন দীর্ঘকালব্যাপী একটী দুঃস্বপ্ন।'

"একদিন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অদূরবর্ত্তী

পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে আমার দৃষ্টি নিপতিত হইল। দেখিলাম, মেষপালকের বেশধারী এক ব্যক্তি, হস্তে একটি ক্ষুদ্র বংশী ধারণ করিয়া, সেই শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি বংশীটি অধরসংলগ্ন করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বংশীধ্বনি করিয়া অতি মধুর বিবিধ সুর সংযুক্ত অনির্ব্বচনীয় সুললিত সঙ্গীত লহরী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এরূপ সঙ্গীত আমি কখন শুনি নাই। আমি বিমোহিত হইলাম। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ গতাসু হইলে তাঁহাদের আত্মা স্বর্গারোহণ সময়ে যেরূপ স্বর্গীয় সঙ্গীত দ্বারা উপসেবিত হইলে তাঁহাদের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার স্মৃতি বিনষ্ট হয় ও তাঁহারা স্বর্গসুখোপভোগের অধিকারী হন, সেইরূপ সঙ্গীতের কথা আমার মনে পড়িল। নিরতিশয় আনন্দে আমার হৃদয় গলিয়া গেল।

"আমি শুনিয়াছিলাম ঐ পাহাড়ে কোন ভূতযোনির আবাসস্থান আছে। অনেকে ঐ পাহাড় অতিক্রম করিবার সময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, ইহাও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্গীতকারীকে কেহ দর্শন করিয়াছেন, এ কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনজনিত সুখ সম্ভোগার্থ আমার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছি দেখিয়া হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থানে অগ্রসর হইতে আমাকে সঙ্কেত করিলেন।

"প্রগাঢ় ভক্তিভাবে আমি ধীরে ধীরে তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। তাঁহার চিত্তহারী বংশীবাদন শ্রবণ করিয়া আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে তাঁহার সমীপস্থ হইবামাত্র আমি তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি প্রশান্ত ও অমায়িকভাবে ঈষৎ হাস্য করিলেন। পূর্ব্বে যে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাঁহার মুখশ্রী ও সৌম্য ভাব দর্শনে তাহা একেবারে বিদূরিত হইল—এবং তাঁহাকে চিরপরিচিতের মত মনে হইতে লাগিল। তিনি হস্তধারণপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, 'মির্জা, আমি তোমার নিভৃত চিন্তার বিষয় অবগত আছি। আমার অনুসরণ কর।'

"তিনি পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে লইয়া গেলেন। বলিলেন,—'পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি কি বিষয় তোমার নয়নগোচর হয় তাহা আমাকে বল।' আমি বলিলাম,—'একটি সুগভীর উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি নদী তরঙ্গভরে প্রবাহিত হইতেছে।' তিনি বলিলেন,—'তুমি যে উপত্যকা দর্শন করিলে, উহা দুঃখ-উপত্যকা এবং যে প্রবাহিনী নদী সন্দর্শন করিলে, উহা অনন্ত কাল-স্রোত।' আমি বলিলাম,—'ঐ নদী, এক প্রান্তে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে এবং অপর প্রান্তে কুজ্ঝটিকার মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে, তাহার কারণ কি?" তিনি উত্তর করিলেন,—'নদীর পরিদৃশ্যমান অংশ অনন্তকালের যে ভাগ সূর্য্যের গতিদ্বারা নিরূপিত হয় তাহাই। ঐ সময় পৃথিবীর প্রারম্ভ ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল।'

"ভূতযোনি বলিতে লাগিলেন,—'উক্ত পার্শ্বে তিমিরাচ্ছন্ন এই সমুদ্র পরিদর্শন করিয়া কি দেখিতে পাইলে বল।' আমি বলিলাম,—'সমুদ্র প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি সেতু দেখিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'ঐ সেতু মনুষ্য জীবন, মনোযোগের সহিত উহা পরিদর্শন কর।' পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, সেতুটি সত্তরটি সম্পূর্ণ এবং অনেকগুলি ভগ্ন খিলানের উপর অবস্থিত। ভগ্ন ও অভগ্ন খিলানের সংখ্যা প্রায় একশত হইবে। আমি খিলানগুলি গণনা করিতেছি দেখিয়া ভূতযোনি বলিলেন,—'ঐ সেতু প্রথমতঃ এক সহস্র খিলানের উপর অবস্থিত ছিল। একটি প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস খিলানগুলি ভাঙ্গিয়া সমুদ্র-গর্ভে নিপাতিত করিয়াছে। সেইজন্য সেতুটি বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।'

"তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঐ সেতুর উপর কি দেখিতে পাইতেছ'? আমি বলিলাম,—'বহুসংখ্যক লোক উহার উপর যাতায়াত করিতেছে এবং সেতুর উপর দিকে দুই খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ লম্বমান থাকিয়া

দৃষ্টিরোধ করিতেছে।' অধিকতর মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলাম বহুসংখ্যক পথিক সেতুর মধ্যদিয়া অধঃস্থিত প্রচণ্ড প্রবাহ মধ্যে নিপতিত হইতেছে। আর-ও মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণে দেখিতে পাইলাম ঐ সেতুর মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার রহিয়াছে। তাহাদের উপর পদবিক্ষেপ করিতে না করিতে পথিকগণ প্রবাহমুখে নিপতিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

"সেতুর প্রবেশ মুখে এই ছিদ্রগুলি অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট, সুতরাং যাত্রীগণ দলে দলে সেতুর তিমিরাচ্ছন্ন ভাগ অতিক্রম করিবামাত্র ছিদ্রপথে নিপতিত হইতেছে। সেতুর মধ্যভাগে ঐ সকল ছিদ্রের সংখ্যা অধিক নহে, কিন্তু সেতুর যে অংশে অটুট খিলানগুলি শেষ হইয়াছে সেই অংশে ছিদ্রের সংখ্যা অগণ্য এবং অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট।

"দেখিলাম, অত্যল্প সংখ্যক লোক দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভগ্নখিলানের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা অতিশয় শ্রান্ত এবং দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনহেতু অবসন্নদেহ। তাহারা আসিয়া একে একে প্রবাহ মধ্যে পতিত হইল।

"সেতুর নির্মাণ প্রণালী অদ্ভুত এবং বহুবিধ পদার্থ যাহা তদুপরি দিয়া পরিদৃশ্যমান হইতেছিল তাহা দেখিয়া আমি কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন থাকিলাম। বহুসংখ্যক লোক আমোদপ্রমোদ করিতে করিতে সহসা মৃত্যুপথে পড়িতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় প্রগাঢ় বিষাদে পূর্ণ হইল। দেখিলাম, পতনোন্মুখ ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলভাবে সম্মুখস্থিত দ্রব্যগুলি ধরিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কতকগুলি লোক চিন্তানিবিষ্ট ভাবে ঊর্দ্ধাভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং সহসা হোঁচট লাগিয়া নিপতিত ও অদৃশ্য হইতেছে। বহুসংখ্যক লোক তাহাদের সম্মুখের নর্তনশীল দৃশ্যতঃ দীপ্তিশালী বুদ্বুদগুলির পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত। অভীষ্টবস্তু আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে ভাবিতেছে এমন সময়ে পদস্খলন হইয়া তাহারা সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে।

"দেখিলাম, এই বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ প্রদেশে কতকগুলি লোক বক্র তরবারি হস্তে সেতুর উপর ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে এবং অনেককে তরবারির প্রান্তভাগ-দ্বারা সবলে ছিদ্রমুখে ঠেলিয়া দিতেছে। উক্ত পথিকগণ যে পথ অনুসরণ করিয়াছিল তাহা ছিদ্র শূন্য। বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত না হইলে সম্ভবতঃ তাহারা রক্ষা পাইত।

"পুরোবর্ত্তী এই বিষাদজনক দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া দুঃখাভিভূত হইয়াছি দেখিয়া ভূতযোনি বলিলেন,—'সুদীর্ঘকাল সেতু পরিদর্শন করিয়াছ, এক্ষণে সেতুর উপর হইতে দৃষ্টি অপসারিত কর এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার তাহা আমাকে বল।' ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আমি বলিলাম,—'একটি সুবৃহৎ পক্ষীর ঝাঁক সেতুর কাছে কাছে অনবরত উড়িয়া বেড়াইতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে সেতুর উপর বসিতেছে। ঐ পক্ষী ঝাঁকের মধ্যে গৃধ্র, হার্পি*, কাক, অন্যান্য সামুদ্রিক পক্ষবিশিষ্ট জীব, বহুসংখ্যক পক্ষবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক—দলে দলে মধ্য খিলানের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতেছি; তাহার তাৎপর্য্য কি?' ভূতযোনি বলিলেন,—'ইহারা দ্বেষ, অর্থলিপ্সা, কুসংস্কার, নৈরাশ্য, ইন্দ্রিয়পরতা প্রভৃতি দুঃখজনক অসৎ প্রবৃত্তি। মনুষ্য জীবন এই সকল কু-প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ।'

"আমি কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। বলিলাম,—'হায়, মনুষ্যজীবন কি অসার! মানব, দুঃখ ও মৃত্যুর সম্পূর্ণ অধীন; মানব জীবিত কালে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে'।

"ভূতযোনি আমার প্রতি করুণাপরবশ হইলেন, এবং আমাকে এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য সন্দর্শনে বিরত হইতে আদেশ করিলেন। বলিলেন,—'ইহা মানবের অনন্তকাল বিস্তৃত মহাযাত্রার প্রথমাবস্থামাত্র। উহা হইতে চক্ষু অপসৃত কর এবং এই জলস্রোত, তন্নিপতিত পুরুষগণকে যেখানে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে সেই কুয়াশাচ্ছন্ন প্রদেশ অবলোকন কর।'

* অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক ও অর্দ্ধেক পক্ষীর আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী। লেঃ।

"তাঁহার আদেশ অনুসারে আমি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। প্রসন্ন ভূতযোনি কোন অলৌকিক শক্তি দ্বারা আমার দৃষ্টিরোধক কুজ্ঝটিকা কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করিয়া দিয়াছিলেন কিনা জানি না; কিন্তু দেখিতে পাইলাম, উপত্যকার দূরতরপ্রান্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সুতরাং নদীটি অসীম সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। বজ্রসদৃশ একটি প্রকাণ্ড পাহাড় তাহার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়া সমুদ্রকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

"সমুদ্রের একার্দ্ধ এখনও এত মেঘাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্য দিয়া কিছু-ই দেখিতে পাইলাম না। অপরার্দ্ধ অসংখ্য দ্বীপযুক্ত অসীম সমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইল। ঐ দ্বীপপুঞ্জ ফুল ও ফলে সুশোভিত এবং শত শত সমুজ্জ্বল ক্ষুদ্র উপসাগরে বেষ্টিত। দেখিলাম মনুষ্যগণ, হীরকোজ্জ্বল বিবিধবর্ণের পরিচ্ছদে ভূষিত ও বিচিত্র সুরভি পুষ্পমাল্যে প্রসাধিত হইয়া বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যে বিচরণ করিতেছে; শব্দবহুল নির্ঝরের পার্শ্বে শয়ান রহিয়াছে, এবং সুকোমল কুসুম বিকিরিত দূর্ব্বাদলের উপর বিশ্রাম করিতেছে। বিহঙ্গমের কূজনগীতি, জল প্রপাতের মৃদুকলধ্বনি, সুকণ্ঠ মানব কণ্ঠোত্থিত সুশ্রাব্য কলরব, এবং বাদ্যযন্ত্রের মধুর নিক্কণ একটি বিচিত্র সঙ্গীত প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে।

"এই রমণীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সাধ্য থাকিলে আমি তদ্দণ্ডেই ঐ সুখস্থানে গমন করিতাম।

"ভূতযোনি বলিলেন,—'সেতুর উপর যে সকল মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছ তাহা উত্তীর্ণ না হইয়া ঐ রমণীয় স্থানে যাইবার উপায়ান্তর নাই।'

তিনি বলিতে লাগিলেন,—দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মহার্ণবের যতদূর দৃষ্টিপথে পতিত হয় ততদূর সুস্নিগ্ধ শ্যামল তরুলতাময় দ্বীপশ্রেণী দেখা যাইতেছে। সমুদ্রোপকূলস্থ বালুকারাশির ন্যায় উঁহারাও গণনাতীত। যে দ্বীপসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাদের পশ্চাতে আরও অসংখ্য দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপগুলি দৃষ্টি ও কল্পনারও সীমা বহির্ভূত। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে পরিমাণে বিবিধ ধর্ম্মোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন তাঁহারা তদনুসারে ঐ সকল পারত্রিক সুখাবাসের অধিকারী হইয়াছেন। ঐ সকল গৃহ স্ব স্ব অধিকারীর রুচি ও পুণ্যের মাত্রা অনুসারে বহুবিধ সুখকর পদার্থসম্ভারে পরিপূর্ণ। প্রতি দ্বীপ স্ব স্ব অধিবাসীর উপযোগী। মির্জ্জা! এই সকল সুখাবাস মানবের লোভনীয় সামগ্রী নহে কি? যে জীবনে আমরা এই পুরস্কার লাভ করিবার অবসর পাই, সে জীবন কি কেবল দুঃখময়? যে মৃত্যুদ্বারা আমরা এই পারত্রিক সৌভাগ্য লাভ করি, সে মৃত্যুকে ভয় করিবার কারণ কি? যে মানবের জন্য অনন্তসুখ ও অনন্তজীবন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই মানবের জীবন অসার কে বলে?'

"আমি ঐ দ্বীপের শোভা ও দ্বীপবাসীগণের সুখ দেখিয়া অবর্ণনীয় সন্তোষ লাভ করিলাম। বলিলাম,—'বজ্রসদৃশ্টিত পর্ব্বতের অপরপার্শ্বে যে মেঘাচ্ছন্ন প্রদেশ পরিদৃষ্ট হইতেছে, আমি কাতরভাবে অনুনয় করিতেছি তন্মধ্যস্থ রহস্যসমূহ আমার দৃষ্টিগোচর করুন।'

ভূতযোনি কোন উত্তর না করায় তাঁহার দিকে ফিরিয়া পুনরায় উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলাম তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখন, আমি যে দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া সুদীর্ঘকাল চিন্তামগ্ন ছিলাম তদভিমুখে নয়ন ফিরাইয়া প্রবাহমানা নদী, খিলানোপরিস্থিত সেতু, সুখময় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, বোগদাদের সুদীর্ঘ সুগভীর উপত্যকা এবং তাহার উভয়পার্শ্বে গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র তৃণ ভক্ষণ করিতেছে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

পঞ্চম ভাগ।

কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জের পরিধি প্রায় ৪০০০ লি; রাজধানী গঙ্গানদীর উপর। উহা ২০ লি দীর্ঘ এবং ৪।৫ লি বিস্তৃত। রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে জলপূর্ণ পরিখা এবং উহা দুর্গবেষ্টিত। চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান, পুষ্করিণী-গুলি স্বচ্ছ কাচের ন্যায় দেখা যায়। মূল্যবান পণ্য দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয়। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী এবং নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট। গৃহাদি সুন্দর। সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে ফল ও পুষ্প পাওয়া যায় এবং ভূমি উপযুক্ত সময়ে কর্ষিত হয় জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীরা সচ্চরিত্র সাধু এবং দেখিতে সুন্দর। পরিধানের জন্য উহারা চিত্রিত এবং উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহারা বিদ্যাভ্যাসী। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং অবিশ্বাসীগণের সংখ্যা সমতুল্য। প্রায় একশত সঙ্ঘারামে দশ সহস্র যতি বাস করেন। ইহারা হীন ও মহা উভয় যানাবলম্বী। দুই শত মন্দিরে কয়েক সহস্র অবিশ্বাসী বাস করে।

পুরাতন রাজধানীকে লোকে কুসুমপুর বলিত। ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান রাজা হর্ষবর্দ্ধন বৈশ্য জাতীয়। রাজকর্ম্মচারীগণ রাজ্য শাসন করে। হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্বে রাজা রাজ্যবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেন। প্রভাকর বর্দ্ধন নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

রাজ্যবর্দ্ধন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব ভারতবর্ষে কর্ণসুবর্ণ নামক দেশে শশাঙ্ক নামে এক রাজা তাঁহার মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্ম্মিক হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়।" ইহাতে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিহত করিল।

রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্য অনধিকৃত হইল। তখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ভণ্ডি সমাগত মন্ত্রীগণকে নিবেদন করিলেন, "রাজ্যের ভবিষ্যৎ অদ্য নির্দ্ধারিত হইবে। পূর্ব্বতন রাজার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু রাজভ্রাতা দয়ালু স্নেহময় এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। বিশেষতঃ, তিনি নিজ পরিবারের প্রতি অনুরক্ত, সেজন্য প্রজারা তাঁহাকে ভক্তি করে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে তিনিই রাজা হউন; প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিমত জ্ঞাপন করুন।" এ প্রস্তাবে সকলেই এক মত হইয়া স্বীকার করিল যে বস্তুতঃই তিনি অসীম গুণসম্পন্ন।

ইহাতে প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ এবং শাসনকর্ত্তারা সকলে তাঁহাকে রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল "রাজপুত্র শ্রবণ করুন। পূর্ব্বতন রাজার পুণ্যীভূত গুণরাশি এবং যোগ্যতা দ্বারা এই রাজ্য সমৃদ্ধ সুশাসিত হইয়াছিল। যখন রাজ্যবর্দ্ধন রাজত্ব পাইয়াছিলেন তখন আমরা মনে করিলাম যে তিনিও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার ন্যায় দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীদের দোষে তিনি শত্রুর করতলগত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য রাজ্যে এই অশান্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা মন্ত্রীগণেরই দোষ। প্রজাসাধারণের অভিমত এই যে আপনি রাজা হউন এবং বংশের সহিত রাজত্ব করুন। আপনার শত্রু পরাজিত করুন। আপনার যে অপমান হইয়াছে তাহা ধৌত করুন। ইহাতে আপনার সুযশ বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

রাজপুত্র উত্তর করিলেন "দেশশাসন অতি দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য এবং ইহাতে যথেষ্ট বিপদ আছে। এরূপ কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে চিন্তার আবশ্যক। আমি নিজে ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বর্ত্তমানে আমার পিতা ও ভ্রাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ না করিলে উহাতে প্রজাবৃন্দের কোনই উপকার হইবে না। নিজের অক্ষমতা বিস্মৃত

হইয়া অপরের মতানুসারে চলাই সমীচীন। এইরূপ গঙ্গাতীরে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে; ইহা হইতে অনেক অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে। আমি ইহার নিকট যাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করিব।" যে স্থানে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ছিল তথায় তিনি উপস্থিত হইয়া উপবাস ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অন্তরের অকপটতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বর প্রার্থনা কর?" রাজপুত্র উত্তর করিলেন "আমি অত্যন্ত মানসিক ক্লেশ পাইয়াছি। আমার দয়ালু পিতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার ভদ্র ও দয়ালু ভ্রাতাও অপ্রীতিকর উপায়ে হত হইয়াছেন। এই সকল বিপদের জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত হীন বিবেচনা করিতেছি; তত্রাপি জনসাধারণ পিতৃসিংহাসনে বসিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞ ও মূর্খ; এইজন্য আমি বোধিসত্ত্বের আদেশ প্রার্থনা করিতেছি।"

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন "পূর্ব্বজন্মে তুমি এই বনে সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিতে এবং তোমার গভীর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তুমি যে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়াছিলে তাহার ফলে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কর্ণসুবর্ণরাজ বৌদ্ধধর্ম বিনষ্ট করিয়াছেন। এইক্ষণ তোমার রাজ্যলাভ হইলে তুমি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি দয়া ও করুণা প্রকাশ করিবে। যদি তুমি আর্ত্তের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগকে লালনপালন করিতে থাক, তবে অবিলম্বে তুমি পঞ্চভারতের উপর রাজত্ব করিতে পারিবে। যদি তুমি তোমার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে আমার আদেশ শ্রবণ কর, আমার গুপ্ত ক্ষমতা বলে তুমি এমন শিক্ষালাভ করিবে যে তোমার প্রতিবেশী কোন রাজাই তোমার উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইবে না। সিংহাসন অধিরোহণ করিও না এবং নিজেকে মহারাজা নামে অভিহিত করিও না।"

এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেকে কুমার নামে আখ্যাত করিলেন; তাঁহার উপাধি ছিল শিলাদিত্য। তিনি তাঁহার মন্ত্রীগণকে নিম্নলিখিত প্রকারে আদেশ করিলেন "আমার ভ্রাতার শত্রুগণ এইক্ষণও শাস্তি পায় নাই; নিকটবর্ত্তী দেশও অধীন হয় নাই; যতদিন এই অবস্থা থাকিবে, ততদিন আমার দক্ষিণ হস্ত আমার মুখে আহার্য্য তুলিয়া দিবে না।" ইহাতে মন্ত্রীগণ রাজ্যের সকল সৈন্য একত্র করিলেন এবং যুদ্ধনীতিবিশারদ শিক্ষকগণকে আহ্বান করিলেন। পাঁচ সহস্র হস্তী দ্বিসহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশসহস্র পদাতিক একত্রিত হইল। কুমার পথিমধ্যে সকলকে পরাজিত করিয়া সসৈন্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; হস্তীগণ ও সৈন্যগণ কোন প্রকার অবসর পাইল না।

ছয় বৎসরে তিনি পঞ্চভারত বশীভূত করিলেন। এই প্রকারে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া তিনি সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন; তাঁহার ৬০ হাজার যুদ্ধহস্তী ও একলক্ষ অশ্বারোহী হইল। ত্রিশ বৎসর পরে তিনি যুদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইলেন এবং রাজ্য সকল শান্তিতে শাসন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মিতাচারের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মোপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে পশুহত্যা মাংসাহার পঞ্চভারতে নিষিদ্ধ হইল এবং এই নিষেধ অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড হইবে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। তিনি গঙ্গাতীরে ১০০ ফুট উচ্চ কয়েক সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। সমুদায় নগরে গ্রামে তিনি আহার ও পানীয় পরিপূর্ণ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তথায় চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন এবং পর্য্যটক ও দরিদ্রদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ দিবার আদেশ প্রচারিত করিলেন। যে যে স্থানে বুদ্ধদেবের স্মরণ চিহ্ন ছিল সেই সকল স্থানেই তিনি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রতি পাঁচ বৎসরে তিনি মোক্ষ নামক বৃহৎ পরিষৎ আহ্বান করিতেন। সেই সময়ে সৈন্যরক্ষার ব্যয় ব্যতীত তিনি কোষাগারের সমস্ত ধন দানে ব্যয় করিতেন। প্রতি বৎসরে তিনি সকল দেশ

হইতে শ্রমণগণকে একত্রিত করিতেন এবং তৃতীয় ও সপ্তম দিবসে তাঁহাদিগকে আহার্য্য, পানীয়, ঔষধ ও বস্ত্র দান করিতেন; বেদী সজ্জিত করিতেন এবং ভজনালয়গুলিকে উত্তমরূপে অলঙ্কৃত করিতেন। তিনি যতিগণকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিতেন এবং নিজে বাদানুবাদ বিচার করিতেন। তিনি ধার্ম্মিককে পুরস্কৃত, দুষ্কৃতের দণ্ডপ্রদান, মন্দ ব্যক্তিকে পদচ্যুত ও যোগ্যের সম্মান করিতেন। নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক যতিকে শিলাদিত্য সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা করিতেন। যদি কেহ সদাচারী হইয়া বিদ্বান না হইতেন, তবে তাঁহাকেও সম্মান প্রদর্শন করা হইত, তবে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত হইতেন না। যদি কেহ দুর্নীতিপরায়ণ হইতেন, তবে তাঁহার মুখ দর্শন বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না; অধিকন্তু তাঁহাকে নির্ব্বাসন করা হইত। নিকটবর্ত্তী কোন রাজা বা তাঁহার মন্ত্রী ধর্ম্মপরায়ণ হইলে তিনি তাঁহার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে "সম্মানীয় বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন কিন্তু ভিন্ন চরিত্র লোকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করিতেন না। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে তিনি দূত নিয়োগ করিতেন - ইহারা অনবরত দেশদেশান্তরে যাতায়াত করিত। কোন নগরের জনসাধারণের ধর্ম্ম ব্যবহারে ত্রুটী দেখিলে তিনি তাহাদের নিকটে যাইতেন। যেখানে তিনি ভ্রমণ করিতেন সেখানে তিনি সদ্য প্রস্তুত আবাসে বাস করিতেন। বর্ষাকালের তিন মাস তিনি ভ্রমণ করিতেন না। সদা-সর্ব্বদাই তাঁহার নগর-প্রাসাদে তিনি অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের জন্য উত্তম খাদ্য সরবরাহ করিতেন। প্রায় এক সহস্র বৌদ্ধ যতি ও পাঁচ শত ব্রাহ্মণ একত্রিত হইতেন। দিবাভাগকে তিনি তিন অংশে বিভক্ত করিতেন। প্রথমাংশে তিনি রাজকার্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। দ্বিতীয়াংশে তিনি অনবরত ধর্ম্মাচরণ করিতেন। আমি যখন প্রথম কুমাররাজের নিমন্ত্রণ পাইলাম, আমি বলিলাম যে আমি মগধ হইতে কামরূপ যাইব। এই সময়ে শিলাদিত্য তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতে ছিলেন; তিনি এই সময়ে কলিঙ্গায় ছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুমাররাজের নিকট এই আদেশ প্রেরণ করিলেন "আমার ইচ্ছা যে তুমি নালন্দমঠে যে বৈদেশিক শ্রমণের আতিথ্যসৎকার করিতেছ তাহাকে লইয়া অবিলম্বে এই পরিষদে আগমন কর।" ইহাতে কুমাররাজের সমভিব্যাহারে আমরা পরিষদে প্রবেশ করিলাম। পথশ্রম দূর হইলে রাজা শিলাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন্ দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন এবং আপনার পর্য্যটনে আপনি কি অনুসন্ধান করিতেছেন?"

উত্তরে বলিলাম "আমি ট্যাং দেশ হইতে আগমন করিতেছি এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহে অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

রাজা বলিলেন "ট্যাং দেশ কোথায়? আপনি কোন পথ দিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন? ঐ দেশ কি আমাদের দেশ হইতে দূরে না নিকটে?"

উত্তরে জানাইলাম "আমার দেশ এই দেশ হইতে কোটী কোটী লি উত্তর পূর্ব্বে; ভারতবর্ষে এ দেশ মহাচীন নামে কথিত হইয়া থাকে।"

রাজা উত্তর করিলেন,—"আমি শ্রবণ করিয়াছি যে মহাচীন দেশে সীন্ নামে এক রাজা আছেন। পূর্ব্বে এই রাজ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ছিল; সর্ব্বত্রই দলাদলি ছিল; সৈন্যগণ অবিরত যুদ্ধ করিত এবং দেশবাসী নানারূপ ক্লেশভোগ করিত। তখন স্বর্গের পুত্র সীন তাঁহার করুণা প্রেমের দ্বারা রাজ্যের সর্ব্বত্র সন্তোষ ও শান্তি আনয়ন করিলেন। সকল দিকেই তাঁহার শাসন ও শিক্ষা ব্যাপৃত হইতে লাগিল। অন্যদেশীয় অধিবাসীগণ তাঁহার প্রজা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। জনসাধারণ তাঁহার গুণে প্রীত হইয়া তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার এইরূপ প্রশংসা অবগত হইয়াছি। এই সকল প্রশংসা-সূচক গানের ভিত্তি কি সত্যমূলক? আপনি কি এই রাজার কথা বলিতেছেন?" তদুত্তরে আমি

জানাইলাম "আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাগণের দেশের নাম চীন কিন্তু ট্যাং দেশই হইতেছে বর্ত্তমান রাজার দেশ। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের রাজা সীন রাজ্যের অধিপতি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশ লোপ পাইলে, দেশে রাজা ছিল না, দেশে চতুর্দ্দিকে অন্তর্বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলা ছিল; এই সময়ে সীনের রাজা তাঁহার অনৈসর্গিক ক্ষমতা বলে চতুর্দ্দিকে তাঁহার ভালবাসা ও অনুকম্পা বিস্তার করিতে লাগিলেন; তাঁহার ক্ষমতা দ্বারা তিনি দুষ্টকে বিনাশ করিয়া সর্ব্বদিকে শান্তি আনয়ন করিলেন এবং দশ সহস্র রাজ্য তাঁহাকে কর প্রদান করিতে লাগিল। তিনি প্রজাদিগের দুঃখ দূর করিলেন; দণ্ডের উপশম করিলেন এবং এই কারণে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রজাগণ শান্তিভোগ করিতে লাগিল। তিনি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত।"

শিলাদিত্য রাজা উত্তর করিলেন "অতি সুন্দর। প্রজাগণ নিশ্চয়ই এইরূপ ধার্ম্মিক রাজার শাসনে সুখে আছে।"

শিলাদিত্যরাজ কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ধর্ম্মসঙ্ঘ আহ্বান করিলেন। কয়েক কোটী লোকসহ তিনি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এবং কয়েক লক্ষ লোকসহ কুমাররাজ গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া তাঁহারা জল ও স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুসজ্জিত সৈন্যাবলীসহ ঐ দুই রাজা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। সৈন্যেরা কেহ নৌকায়, কেহ হস্তীতে, কেহ ঢক্কানিনাদ করিতে করিতে, কেহ বা বংশীবাদন করিতে করিতে অগ্রগামী হইল। নব্বই দিন পরে তাঁহারা কান্যকুব্জে পৌঁছিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ পুষ্পবাটিকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তৎপর, বিংশতি রাজ্যের নরপতিগণ যাঁহারা শিলাদিত্য রাজার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ দেশীয় প্রসিদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণসহ এবং শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যসহ তথায় সমবেত হইলেন। রাজা ইতিপূর্ব্বেই গঙ্গার পশ্চিম তীরে বৃহৎ সঙ্ঘারাম এবং ইহার পূর্ব্বদিকে ১০০ শত ফুট উচ্চ মূল্যবান চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চৈত্যের দক্ষিণাংশে তিনি বৌদ্ধমূর্ত্তি ধৌত করিবার জন্য মূল্যবান বেদী স্থাপনা করিলেন। এইক্ষণ বসন্ত কালের দ্বিতীয় মাস চলিতেছিল। মাসের প্রথম দিবস হইতে একবিংশ দিবস পর্য্যন্ত রাজা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকার সুখাদ্য দান করিয়া আসিতেছিলেন। অস্থায়ী রাজপ্রাসাদ হইতে সঙ্ঘারাম পর্য্যন্ত সুসজ্জিত মণ্ডপে বাদ্যকরগণ তাহাদের যন্ত্রাদিসহযোগে নানাপ্রকার বাদ্য করিতেছিল। রাজা বিশ্রামাগার পরিত্যাগ করিয়া সুসজ্জিত প্রকাণ্ড হস্তীর উপর তিন ফুট উচ্চ বুদ্ধদেবের সুবর্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ইন্দ্র বেশে রাজা শিলাদিত্য মূল্যবান চন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া ও দক্ষিণ পার্শ্বে কুমাররাজ ব্রহ্মরাজবেশে শ্বেত চামর ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পাঁচ শত যুদ্ধ হস্তী ছিল; বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে ও পশ্চাতে বাদ্যকর বহন করিয়া একশত হস্তী যাইতেছিল। রাজা শিলাদিত্য অগ্রসর হইবার সময় চতুর্দ্দিকে মুক্তা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি, সুবর্ণ ও রৌপ্যের পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সুগন্ধি জল দ্বারা ধৌত বুদ্ধমূর্ত্তি রাজা নিজ স্কন্ধের উপর করিয়া পশ্চিম দ্বারে লইয়া গেলেন এবং তথায় তিনি শত সহস্র লক্ষ মুক্তাখচিত রেশমের বস্ত্র মূর্ত্তিকে উপহার প্রদান করিলেন। এই শোভাযাত্রায় কেবলমাত্র কুড়িজন শ্রমণ এবং নানাদেশীয় রাজগণ সহচররূপে সঙ্গে ছিলেন। ভোজনান্তে বিদ্বান লোক সকল একত্রিত হইয়া শুদ্ধ ভাষায় গূঢ় বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে রাজা সপারিষদ নিজ ভ্রমণ-প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মাতৃঋণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাহিত্যিক মজলিস।

মানুষ ঠেকিয়া শিখিতে চায়, দেখিয়া নহে। শিশু প্রকৃতিতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

মাত্রর কাহিনী শুনিয়া জ্যাক প্রথমটা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল কিন্তু মরোভাঁর আদরে ও শিক্ষকগণের সুমধুর ব্যবহারে সে ভয় দুঃস্বপ্নের মত কোথায় মিলাইয়া গেল।

প্রথম কয়েক মাস জ্যাক এতখানি আদর সোহাগ ভোগ করিল যে সে ভুলিয়া গেল অভাগা মাত্রর ভাগ্যেও গোড়ায় এমনই আদর সোহাগ একদিন ঘটিয়াছিল, কিন্তু বেশী দিন রহে নাই!

লাবাস্যাঁদর হারজ্, আর্জেন্ট সকলেই জ্যাকের সুখের জন্য শশব্যস্ত! মরোভাঁ তাহাকে পাশে বসাইয়া ভোজন করান! ছাত্রেরা খেলাধূলা করে, গান গাহে, সে সব জ্যাকের তৃপ্তির জন্য!

জ্যাক্ মহা সন্তুষ্ট!

জ্যাকের এই অবস্থা দেখিয়া মাত্রর ভারী দুঃখ হইত। সে জ্যাকের পানে কেমন এক করুণার দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে চাহিত—সে চাহনির অর্থ, হায় অবোধ! এ সুখ, এ সোহাগ কয় দিনের জন্য? অমন আদর যত্ন আমিও একদিন পাইয়াছিলাম, কিন্তু হায়, —আজ!—

এমন ভাবেই কয়েক মাস কাটিয়া গেল। জ্যাকের মা প্রায়ই জ্যাককে দেখিতে আসিত। সে সময় জ্যাকের মার খাতির কত! তাহার সামান্য একটা কথাও জিমনেসের সকলে নিবিষ্ট মনে শুনিত!

সেদিন সহিসের ছেলেরা দল বাঁধিয়া খেলা করিতেছিল। ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া জ্যাক খেলা দেখিতেছিল। মরোভাঁ আসিয়া ডাকিল, "জ্যাক্, জ্যাক্, তোমার মা এসেছেন!"

মা! জ্যাক লাফাইয়া মারোভাঁর নিকট আসিল, সাগ্রহে কহিল, "কোথায়?"

সুবেশে সজ্জিতা ইদা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। হাতে ছোট ঝুড়ি—মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ। ইদা ছাত্রদের ডাকিয়া পাঠাইল। শীর্ণকায় জীর্ণবেশ বালকের দল সম্মুখে আসিলে, ইদা মুঠি ভরিয়া সকলকে প্রচুর বিস্কুট কেক প্রভৃতি বিতরণ করিল। ছাত্রের দলে উৎসব পড়িয়া গেল! মার কোলের কাছে দাঁড়াইয়া জ্যাক্ অপূর্ব্ব গর্ব্বোল্লাসের সহিত ভোজ দেখিতেছিল!

এই রকম ব্যাপারে ইদা যখন-তখন অত্যন্ত অর্থব্যয় করিত। মরোভাঁর গাটা রিষ্-রিষ করিত—অনর্থক এই সব বাজে খরচ—এই টাকাগুলা যদি কোন উন্নত সদাশয় ব্যক্তির সাহায্যে খরচ করা হইত!—এই যেমন মরোভাঁ একজন! বেচারার কেবল টাকার অভাব!

মরোভাঁর অনেক সময় ইচ্ছা হইত, মনের ভাবটা ইদাকে ভাঙ্গিয়া বলে, কিন্তু সে পারিয়া উঠিত না! তাহার চোখে মুখে কেমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিত এবং তাহাই যে

ইদার বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে না ইহাতেই মরোভঁার কেমন রাগ হইত!

মরোভঁার অনেক দিন হইতে সাধ—একখানি কাগজ বাহির করে! নিজেদের একখানা কাগজ না থাকিলে কি আপনাদের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা যায়!

মরোভঁা তাহার 'হলে হতে পারতুম-মস্ত-একজন' বন্ধুবান্ধবদের কাছে যখন-তখন এই কাগজ বাহির করার কথা পাড়িত। তাহারা সকলেই উৎসাহ দিত।—বেশ কথা!—একখানা কাগজ বাহির করিতে পারিলে বড় সুন্দর হয়!—কত নূতন ভাব, নূতন চিন্তা তাহাদের মাথায় আসে—যাহা এ পর্য্যন্ত কেহ ভাবে নাই—প্রকাশ করা ত দূরের কথা! আহা, কেবল একখানা নিজেদের কাগজের অভাবে সে সব চাপা পড়িয়া রহিয়াছে!

মরোভঁার মনে কেমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল—যদি তাহারা কাগজ বাহির করে, জ্যাকের মা নিশ্চয় খরচ যোগাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইদার নিকট মরোভঁা কথাটা চট্ করিয়া তুলিল না।—কি জানি, তাহার মৎলবে ইদা যদি কোন সন্দেহ করে! তাহা হইলেই সব মাটি! সে ধীরে ধীরে সমস্ত কাজ গুছাইয়া লইবে ঠিক করিল।

মরোভঁার স্ত্রী নানা কথার পর ইদাকে ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "মুসেঁা মরোভঁা তোমায় একটা অনুরোধ করতে চান কিন্তু একটু কুণ্ঠিত হচ্ছেন।"

বাকী কথাটুকু শেষ না হইতেই ইদা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি?—কি?......"

ইদার কথায় এতখানি আগ্রহ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছিল যে মরোভঁার একবার ইচ্ছা হইল সে কাগজের জন্য কিছু টাকা চাহিয়া বসে! কিন্তু সে একজন বিলক্ষণ চতুর লোক—ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কাজ করে! সুতরাং মরোভঁা আসল কথার কিছুই পাড়িল না—সে ইদাকে শুধু কহিল, "আমাদের একটা সাহিত্য-সভা আছে, এই রবিবার একটা অধিবেশন হবে, অনুগ্রহ করে আসবেন কি?"

ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কি কি হবে?"

"প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি, গান—"

"আর কে কে আসবেন?"

মরোভঁা একটু কাশিয়া উত্তর দিল, "আরও অনেক ভদ্রলোক আসবেন। মহিলারাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন!"

ভদ্রসমাজে মিশিবার একটা উৎকট বাসনায় ইদা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে একমুহূর্ত্ত ইতস্তত করিল না।

মরোভঁা ভারী খুসী হইল। সভাগৃহ যতদূর সাধ্য ভাল করিয়া সাজাইবার বন্দোবস্ত করিল। ফটকের সম্মুখে দুইটি রঙিন আলোর ব্যবস্থা হইল। বাতিদান কয়টা নাহু ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া তুলিল। কক্ষের আসবাবগুলি নাহু যথাসাধ্য মার্জ্জিত করিল। রাত্রি আটটায় মজলিস!

মরোভঁার জীবনে ইহা এক মহা উৎসব। তাহার পরিচিত যত ব্যর্থ-কবি ব্যর্থ-শিল্পী সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

আটটার সময় বালকের দল বেঞ্চে নিজেদের জায়গায় বসিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রিত লোকেরা দলে

দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের ভিতর কবি আছে, শিল্পী আছে, চিত্রকর আছে, দার্শনিক আছে, বৈজ্ঞানিক আছে—কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী কাহারও প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই!—অনাদৃত প্রতিভার সমষ্টি!

তাহাদের শীর্ণকায় জীর্ণবেশ কোটরগত চক্ষু—দারিদ্র্য-পীড়িত বিষণ্ণভাব দেখিলে দুঃখ হয়!

প্রতিভাসত্ত্বেও তাহাদের কদর, লোকে বুঝিল না, এই দুঃখই যেন তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে!

সকলেই আসিয়াছে কিন্তু জ্যাকের মা ইদা কৈ?—যাহার জন্য মরোভাঁর এত আয়োজন!

ইদার বিলম্ব দেখিয়া মরোভাঁ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, শুধু মারোভাঁ কেন, সকলেই একটু ক্ষুণ্ণ হইল।

মরোভাঁ সকলের কাছে-কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, "কাউণ্টেসের জন্যই একটু অপেক্ষা করছি!"

অবশেষে, ইদার আসিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আর্জেন্তকে তাহার কবিতা পাঠ করিতে বলা হইল।

আর্জেন্ত তখন কত কায়দার সহিত কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল! যেমন জঘন্য কবিতা, তেমনই জঘন্য তাহার আবৃত্তি ভঙ্গী! কিন্তু তবু ঘন-ঘন করতালি পড়িতে লাগিল! কেহ বলিল, "বাহবা!"

"অতি সুন্দর!"

"অপূর্ব্ব!"

এইরূপ প্রশংসিত হইয়া আর্জেন্ত আরও উৎফুল্ল হইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

এমন সময় ইদা ধীরে ধীরে সেই-কক্ষে প্রবেশ করিল।

আর্জেন্তর দৃষ্টি তখন ঊর্দ্ধে। সে ইদাকে দেখিল না। কিন্তু ইদা তাহাকে দেখিল—নূতন চোখে! সেই মুহূর্ত্তেই ইদার ভবিষ্যৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল! তাহার মনে হইল, যেন তাহার সারা জীবনের সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা আজ ঐ মানুষটির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইদার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে! এক মুহূর্ত্তেই ইদা আপনাকে তাহার পায়ে ঢালিয়া দিল!

ইদাকে দেখিয়া জ্যাক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, মরোভাঁ শশব্যস্তে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। আর, আর্জেন্ত ভিন্ন কক্ষস্থ সকলেই ইদার মধুর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইদা কাহারও পানে চাহিল না!—সে শুধু আর্জেন্তকে তাহার জীবনের স্বপ্ন—সুখের, সাধের স্বপ্ন করে আর্জেন্তকে দেখিতেছিল!

মরোভাঁ ইদাকে কহিল, "আপনার জন্যই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম......সময়টা নেহাৎ আড়ষ্ট ঠেকবে বলে কাউণ্ট আর্জেন্তর কবিতা শোনা যাচ্ছিল!"

ইদা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল—কাউণ্ট! সবই ভাল!

ইদা তখন সলজ্জ বালিকার মত তরল কণ্ঠে আর্জেন্তকে কহিল, "থামলেন যে?—বেশ চলছিল!"

আর্জেন্ত কিন্তু রাজি হইল না। কবিতার খুব শ্রেষ্ঠ অংশটা আবৃত্তির সময় ইদার আগমনে বাধা পাইয়া সে মনে মনে চটিয়াছিল। আর্জেন্ত কহিল, "আর ত নাই!—শেষ হয়ে গেছে।" ইদার প্রিয় কবি ইদার

পানে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অন্যান্য লোকের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। ইদা যেন মরমে মরিয়া গেল। প্রথম দর্শনেই সে তাহার প্রিয়তমের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে! ইদার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল!

তারপর সভার কত কাজ হইয়া গেল—ইদার কিন্তু আর কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু তাহার কবিকেই দেখিতেছিল!—কি সুন্দর তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী!—কি উদাস তাহার চোখের দৃষ্টি—কবির উপযুক্ত বটে!—এ জগতে তাহার মন নাই;—কোন সুদূর কল্পনা স্বর্গে তাহার চিত্তচকোর কি এক অপার্থিব সুধার আশায় তখন ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ইদা মনে মনে আর্জেন্তর কত প্রশংসা করিতে লাগিল! এইরূপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। আবার আর্জেন্তর পালা আসিল।

ইদা তৃষিতচিত্তে শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে "কি সুন্দর", "কি সুন্দর" বলিয়া সে বারবার মরোভার পানে চাহিল!

মরোভা বিজয়গর্ব্বভরে ঈষৎ হাসিল। ইদা মরোভাকে কহিল, "এমন লোক আপনাদের সভার সভ্য?—আপনি ভাগ্যবান!"

আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কোন্ কাগজে এঁর কবিতা ছাপা হয়?"

"কোথাও নয়!"

মরোভার মনে হইল, ইদা যেন এই প্রশ্নে তাহার ক্ষত স্থানে আঘাত করিল! কিন্তু এই সুযোগ মরোভার খুব কাজে আসিল। সে বর্ত্তমান রুচির নিন্দা করিয়া কহিল, "সাহিত্যের এমনই দুর্দ্দশা হয়েছে যে ভাল লেখা এখন আর সম্পাদকের পছন্দ হয় না। যত পচা লেখারই এখন আদর! প্রতিভার যুগ চলে গেছে এখন সুপারিশ তোষামোদের কাল পড়েচে!" মরোভা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

"যদি নিজেদের একখানা কাগজ থাক্‌ত!"

ইদা কহিল, "আপনাদের একখানা কাগজ থাকা খুব দরকার!"

"নিশ্চয়ই!—কিন্তু টাকা কোথায়?"

"টাকার ভাবনা কি? সে যেমন করে হোক হবে!—এমন সুন্দর জিনিষগুলো তা বলে চাপা পড়ে থাক্‌বে!"

"কখনই উচিত নয়!"

মরোভা ভাবিল, আর ভাবনা কি?—এইবারে কাজ বাগাইতে পারিব!

মরোভা তখন আর্জেন্তর সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ইদার মনটুকু আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। আর্জেন্তর কথা শুনিতে শুনিতে ইদা মুগ্ধ হইয়া গেল! সেই সময় জ্যাক মাকে কি বলিতেছিল, ইদা বিরক্ত হইয়া বলিল, "জ্যাক, ছিঃ, চুপ কর—দুষ্টামি করোনা!"

প্রথমে আর্জেন্ত বুঝিতে পারে নাই যে তাহারই সম্বন্ধে মরোভার সহিত ইদার এত নিবিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। অবশেষে সে জানিতে পারিয়া নিজেকে আরও জাহির করিবার চেষ্টা করিল। যখন সে অন্যের সহিত কথা কহিতেছিল, তখন সে বেশ বুঝিতেছিল, তাহার দিকে ইদার পিয়াসী চক্ষু দুইটি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে!

ইদাও এখন একটু বুঝিয়াছিল যে তাহার

উপর আর্জেন্তঁর যে মোটেই লক্ষ্য ছিলনা এমন নহে!

আর্জেন্তঁর কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতেছিল—"কি সুন্দর! —এমন আর দেখা যায় না!" আর ইদা?—

অভাগিনী আত্মহারা! তখন অনেক রাত্রি—সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

রাজকন্যা।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মহারাণী মণিমুক্তাশোভিত সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন।)

ম। শুনছি পঞ্চনদের রাজকুমার তার চন্দ্রপ্রার্থী, সে রাজরাণী হবে! উঃ মনটা এ কি করে উঠেছে!—

বেশ ত যাবে যাক না? আমার চোখের বালি, বুকের শেল দূর হয়ে যাক্—বাঁচি ত! নাঃ; তার অত সুখ কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। আমি চাই বাঁদির মত দুটি দুটি অন্ন দেব,—দু চার খানা ময়লা পুরাণ কাপড় পরাব—আর উঠতে বসতে মনের জ্বালা দেব—তবু সে ছেঁড়া বালিসের মত আমার পায়ের কাছে লোটাবে। বিয়ে যদি দিতেই হয়—শেষে আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব,—চিরকালই আমাদের চরণতলায় পড়ে থাকবে।—কিন্তু এতদিন ধরেও ত এ ইচ্ছা পূর্ণ হোল্ না, আমার বাগের মধ্যে কিছুতেই ত তাকে আনতে পারছিনে। আজ আবার একেবারে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চল্লো- উঃ—উঃ!

(কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া)

রাজরাণী সে—রাজরাণী!—স্বামী সোহাগে সোহাগিনী—পুত্রগরবে গরবিনী! আর পারিনে! হয়ত সেই ছেলেই একদিন আমার বুকের উপর বসে—আমার রাজ্যে রাজত্ব করবে; একজন গিয়েও রক্ষা নেই; আর একজন আবার,--উঃ কি যন্ত্রণা!

মা চামুণ্ডে আমি তোর চরণে কি এত অপরাধ করেছি, এত দিয়েও আমাকে তুই সন্তান দিলিনে! এ কেন ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব যে বৃথা ভবানি! উঃ—আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি। শত ছাগ শত মহিষ ও চরণে বলি দেব—নরবলি—ঐ কুমারীর রক্তেই তোমার রাঙাচরণ রাঙিয়ে তুলব—মাগো, প্রসন্ন হও—আমাকে—"

(নেপথ্যে দুন্দুভি বাদন।)

এ কি এরই মধ্যে কি বিশ্রাম প্রহর ফুরিয়ে গেল? সন্ধ্যার কাল এসে পড়লো? মনে যে নরক জ্বালা—কি করে এখন দেহ সাজাব—?

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ ও নমস্কার পূর্ব্বক)

প্র। মহারাজ আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে আসবেন; সংবাদ পাঠিয়েছেন।

রাণী। বেশ! তাঁকে মহারাণীর নমস্কার জানাও।

প্র। যে আজ্ঞে। (নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান)

(সখিগণের থালিকাসজ্জিত রত্নালঙ্কার ও অঙ্গরাগাদি বহন করিয়া আগমন ও থালিকা নামাইয়া নমস্কার করিতে করিতে)

সকলে। জয় হোক মহারাণীর।

প্র-স। আমরা আজ সপ্তম সিন্ধুকের অলঙ্কার আপনার সজ্জার জন্য এনেছি—আদেশ হলেই সাজাতে আরম্ভ করি।

রাণী। (উঠিয়া হেলান দিয়া বসিয়া) সাজা তবে তোরা সাজা, নিখুঁৎ করে সাজা! মহারাজ আজ বিকালেই আসবেন।

(সখীগণ একে একে থালিকা হইতে এক একখানি রত্নালঙ্কার হস্তে তুলিয়া)

প্র। এই রত্ন মুকুট বড় রাণীর মাতার ছিল—তিনি কন্যার বিবাহের সময় নিজের মাথা থেকে কন্যাকে এইটি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বি। এই হীরকহার সিংহলরাজ বড় রাণীকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

তৃ। এই রত্নবলয়—এই মণিখচিত মেখলা—নাগর রাজরাণী রাজকন্যার জন্মোপহার পাঠিয়েছিলেন।

রাণী। এ সমস্তই এখন আমার—আমারই,—

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ। এ সকল এখন আপনারই। আর আপনার অঙ্গে এই সকল মণিরত্ন যেমন শোভা ধারণ করে—এমন পূর্ব্বে কারো অঙ্গেই শোভা পায়নি।

(অলঙ্কার পরাইতে পরাইতে গান)

সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে,
সুন্দর সুমোহন বেশ ভূষণে।
কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে
সুগন্ধ উথলিত চারু বসনে!
তারকা বিমোহন মুকুট সুশোভন
দিগন্ত ঝলকন মণি রতনে
মুক্তা হীরক মালা, মরকত মেখলা
বিচুথা বাজু, বালা, ফুল কাঁকনে!
রাগিণী ঝঙ্কৃত নূপুর চমকিত
কনক পদ্ম পীত দিব চরণে!
মাধুরী উথলিয়া— হাসি বিকাশিয়া
উথলিবে রূপ ছটা দিকে গগনে!

(সজ্জা শেষ করিয়া।)

প্র। কি সুন্দরই দেখাচ্চে!

দ্বি। আহা মরে যাই!

তৃ। স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীও কি এত সুন্দরী

(রাণীর উঠিয়া ভাবভঙ্গী সহকারে আয়নায় আপনাকে নিরীক্ষণ)

রা। এইবার কুসুমালঙ্কার পরিয়ে দে দেখি তোরা।

প্র। মাতঙ্গিনী দিদি এখনো এসে পৌঁছেন নি।

রা। এত দেরী যে আজ!

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

দ্বি। এই যে নাম করতেই।

তৃ। মাতঙ্গিনী দিদি আমরা তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি,—ফুল—কই?

প্র। এ কি শূন্য হস্ত যে!

মা। মহারাণী ভয়ে কব—না নির্ভয়ে কব?

রা। অবশ্য নির্ভয়ে। ব্যাপার খানা কি বল দেখি? সজ্জার সময় তুমি অনুপস্থিত আর

এলে যখন তখনো—ফুল নিয়ে এলে না! হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে যে!

মা। রাজকন্যার দাসী এসে তাঁর জন্যে সব অলঙ্কার—সব ফুল নিয়ে গেছে।

রা। রাজকন্যার জন্যে? আমার অলঙ্কার—আমার ফুল সমস্ত তার জন্যে নিয়ে গেছে! তুমি কি প্রলাপ বকছ—মাতঙ্গিনি?

মা। প্রলাপ নয়—সত্যি কথাই বলছি মহারাণি।

রা। (ভ্রূকুটিরুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) এ কি আমাকে যে পাগল করে তুল্লে? মালিনীরা দিলে কেন?

মা। তারা বল্লে—হাসি এসে সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে গেল; হাজার হোক রাজকন্যার দাসী ত—তাই তারা কিছু বলতে সাহস পেলে না।

রা। কি আস্পর্দ্ধা—অসহ্য অসহ্য! (স্বগত) —দেবীর কাছে বলি দিলেই এর সমুচিত শাস্তি বিধান হয়। (প্রকাশ্যে) বন্দী করে আনতে বল মাতঙ্গিনি,—শুধু তাকে না তার কর্ত্রীকেও।

মা। ক্ষমা করবেন,—একটি কথা বলতে দিন —

রা। কি বলবে বল, আমি কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

প্র। প্রমোদ ভবনে মালী যে ফুল রেখে গেছে তাই কি নিয়ে আসব?

রাণী। হাঁ সেই রকম দশাই দাঁড়িয়েছে বটে! পুষ্পালঙ্কার যত রাজার মেয়ের, আর—

মা। আর বাগান ঝাঁটান ঝরাফুল যত রাণীর—? এ কথা মুখে আনিস কি করে লো?

রাণী। না আমার ফুলে দরকার নেই। (মাতঙ্গিনীর ইঙ্গিতে) পরিচারিকাগণ তোমরা এখন যাও আমার সজ্জা শেষ হয়েছে।

(সখীগণের নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।)

মা। মহারাণি—ধৈর্য্য ধরুন; প্রকাশ্যে এ রকম কোন শাস্তির আজ্ঞা দিলে আমরাই শেষে হেরে যাব। হাজার হোক তিনি রাজকন্যা, কোন প্রহরী বা সৈনিক কেহই এ আজ্ঞা সহসা পালন করতে চাইবে না।

রা। তুমি কি ভুলে যাচ্ছ—সেনাপতি আমার ভ্রাতা; সেনাপতির হুকুম কেউ পালন করবে না!

মা। কিন্তু নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে পালন করবে,—আর রাজার কানে কথাটা উঠলে ক্ষতি হবে আমাদেরই।

রা। তুমি তবে কি পরামর্শ দাও বল, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমিই একটা উপায় উদ্ভাবন কর। প্রতিশোধ আমি চাই ই চাই—এ রকম অপমান সহ্য করে চুপ করে থাকা আমার কর্ম্ম নয়!

মা। আপনার অপমান—আপনার চেয়েও আমার অসহ্য। আমি নিশ্চয়ই শোধ তুলব—হাসিকে জব্দ করবই—আর তাকে জব্দ করলেই রাজকন্যা জব্দ হবেন।

রা। উপায় কি ঠাওরাচ্ছ বল দেখি?

মা। চুপে চুপে হাসির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব—সবংশে সব নির্ব্বংশ হবে।

রা। হাঁ, তাতে হাসির দণ্ড হবে বটে, কিন্তু আমি রাজকন্যারও দণ্ড চাই—পঞ্চনদের রাজপুত্র এসে যে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে—এ আমার সহ্য হবে না।

মা। তা যাতে না হয়—তার ত সহজ

উপায় পড়ে আছে, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিন না—

রা। রাজা কি রাজি হবেন?

মা। আপনার কথায় রাজা রাজি হবেন না—কি বলেন? কিন্তু আগে সেকথা বলবেন না,—আগে বিয়েটা ভেঙ্গে দিন! পঞ্চনদের রাজা এঁদের অপমান করেছিলেন, এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই এটা সহজে সিদ্ধি হবে।

রা। যদি না হয়?

মা। তখন অন্য উপায় ভাবা যাবে,—আমি থাকতে আপনার কোন ইচ্ছাই বিফল হবেনা—এ বেশ জানবেন। দেখুন না এখনি আমি কি কাণ্ড করে আসি!

রাণী। যাও মাতঙ্গিনী, তুমিই আমার প্রকৃত সখী, বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষিনী—তোমার উপকার জীবনে ভুলব না।

মাতঙ্গিনী। (স্বগত) রাজারাণীর কথায় যে ভোলে সেও নির্ব্বোধ—আর আপনার লাভটুকু বুঝে যে তাঁদের মন যুগিয়ে না চলে—সে আরও নির্ব্বোধ! (প্রকাশ্যে) মহারাণি, আপনার কাজেই যেন এজীবনটা কাটিয়ে যেতে পারি! তাহলেই জ.বনটা সার্থক জ্ঞান করব। চল্লেম তবে।—

(মাতঙ্গিনীর প্রস্থান ও প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাণি, মহারাজ প্রমোদভবনে এসে আপনার অপেক্ষা করছেন।

রাণী। এরই মধ্যে! যাও প্রতিহারিণি—সংবাদ দাও—আমি এখনি আসছি।

(প্রতিহারিণীর প্রস্থান।)

(রাণীর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে করিতে)

কিছুরই ত ত্রুটি মনে হচ্ছে না, আয়নায় ত রূপটা ঝলমলই করে উঠেছে—এখন!—

—যাই—আর দেরী করব না।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

[পুষ্পসজ্জিত প্রমোদ গৃহ; ফুল রচিত সিংহাসনে রাজা রাণী উভয়ে উপবিষ্ট; নিকটে সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। রাজা সতৃষ্ণ নয়নে রাণীর দিকে চাহিয়া উভয়ে গুণগুণ করিয়া কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে সম্মুখে সজ্জিত পুষ্পস্তূপ হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া নৃত্যকারিণীদিগকে পারিতোষিক বর্ষণ করিতেছেন।]

সখীগণের গান।

জয় জয় জয় জয়
গাও আমাদের রাজা রাণীর জয়!
এমন সুখের রাজ্য কোথা ত্রিভুবনময়!
ফুলে হেথায় নাহি কাঁটা, মেঘে নাহি আঁধার ঘটা
আলোক মধুর স্নিগ্ধ ছটা, প্রখর তপ্ত নয়।
জয় জয় জয় জয়।

গাও আমাদের রাজারাণীর জয়!
এমন সুখে আমরা আছি—নাহি দুঃখ ভয়।
হেথা, সদাই বাজে মধুর বাঁশি,—শুধুই প্রমোদ শুধুই হাসি,
মলয় বায়ু দিবানিশি, সুধা গন্ধে বয়!
জয় জয় জয় জয়
গাও আমাদের রাজারাণীর জয়!

(ফুল বর্ষণের মধ্যে নৃত্যগীত করিতে করিতে সখীগণের প্রস্থান।)

মহা। (রাণীর দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া স্বগত)—কি সুন্দর! যেন চমকে যেতে হয়!

রা। মহারাজ আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাক—আর আমি দিবানিশি—তোমার অপেক্ষায়—তোমারি ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকি।

রাজা। কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছ মহিষি! তোমাকে দেখলে আমার কোন কথাই—কোন কথাই মনে থাকে না—সংপ্ত হৃদয়ে ঐ রূপসুধাসমুদ্রে মগ্ন হয়ে পড়ি।

রাণী। মহারাজ আমি পরম সৌভাগ্যবতী।

রাজা। তুমি সৌভাগ্যবতী—না আমি সৌভাগ্যবান?

রাণী। ছি ছি ও কথা বলনা প্রিয়তম;—এখন বল অসময়ে কি সংবাদ দিতে এসেছ?

রাজা। একটি সুসংবাদ এনেছি মহারাণি। পঞ্চনদের রাজপুত্র, কল্যাণীর জন্য প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছেন।

রাণী। খুব আহ্লাদের কথা। পুরস্কার কিছু দেবার থাকলে দিতেম—মনোপ্রাণ আগেই ত সব দিয়ে ফেলেছি। অমন জামাতা লাভ সৌভাগ্য বটে—কিন্তু—

মহা। কিন্তু কেন মহারাণি?

রাণী। এঁর পিতা শুনেছি মহারাজের পিতাকে পাদুকা পাঠিয়ে অপমানিত করেছিলেন।

মহা। এ কি কথা!

রাণী। (স্বগত) সব আশা ব্যর্থ হোল বুঝি! (প্রকাশ্যে)—কিন্তু এই রকম ত সবাই বলে।

রাজা। কে বলে—নামটা কর দেখি। আমার পিতাই বরঞ্চ অন্যায় করেছিলেন। পঞ্চনদের তিনি যখন অতিথি—সেই সময় রাজার পিতৃব্যকে তিনি ব্যঙ্গ করেন, তাইতে উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পিতাই পরাজিত হন, ঘটনাটা হচ্ছে এই,—ঠিক বিপরীত।

রাণী। (স্বগত)—বাঁচা গেল তবু একটা সূত্র পাওয়া গেছে। (প্রকাশ্যে) ওঃ বুঝেছি—এই পরাজয়ের অপমানটা—লোকে পাদুকাঘাত ধরে নিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে—এই ঘটনার পর ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা কি সেই অপমানকে স্বীকার করে নেওয়া নয়? সে বংশের কন্যা আনা স্বতন্ত্র কথা—তাতে বরঞ্চ অপমানের শোধ নেওয়া হয়, কিন্তু অপমানিত হয়ে কন্যাদান ঘোর অপমানজনক!

ম। প্রথমতঃ দোষ আমার পিতারই;

অথচ—তিনি অতিথি বলে—পঞ্চনদরাজই এই ঘটনায় যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এস্থলে—কিছুতেই আমি সে বংশের প্রতি শত্রুভাব রাখতে পারিনে। দ্বিতীয়তঃ সে বহুদিনের কথা, আমার পিতার ও পঞ্চনদের পিতৃব্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—সে ঘটনাও বিস্মৃতি মগ্ন হয়েছে।

রাণী। কিন্তু লোকে ত তা বলে না,—তা বোঝে না!

রাজা। লোকে অধঃপাতে যাক!

রাণী। কিন্তু তোমার কন্যার যে রকম দম্ভ সেও যে ও বংশে আত্মদানে সম্মত হবে—তাও ত মনে হয় না।

মহা। তার মতামত কে জিজ্ঞাসা করবে?—আমার আজ্ঞাই কি এখানে যথেষ্ট নয়।

রাণী। তাহলে ভাবনা কি ছিল মহারাজ! সে কি এতদিনেও আমাকে মা বলে স্বীকার করেছে—আমার অপরিসীম স্নেহও কি তার গর্ব্বকে নষ্ট করতে পেরেছে!

রাজা। মহারাণি, ও কথা আর বলো না—আমার রক্ত আগুন হয়ে ওঠে।

রাণী। আমি কি তোমাকে সব কথা বলি মহারাজ। তোমার মনে পাছে আঘাত লাগে, পাছে তার প্রতি স্নেহ তোমার কমে যায়—এই ভয়ে যতক্ষণ পারি—নিজের মনে আমি সব সহ্য করি—।

রাজা। তুমি ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—

রাণী। এই আজই আমার জন্যে ফুল আনতে গিয়ে ফিরে এল। আমাকে অপমানের জন্যই রাজকুমারীর দাসী সব ফুল লুট করে নিয়ে গেছে।

মহা। সেই জন্যই বুঝি তোমার অঙ্গে আজ ফুলাভরণ নেই! তুমি দেবি—তুমি মূর্ত্তিমতী ক্ষমা।

রা। মহারাজ সে আমার সন্তান—কুসন্তান হলেও কুমাতা হয় না। আমাকে হাজার অসম্মান, অবজ্ঞা করলেও—তবু তাকে আমি কিছুতেই খর্ব্ব করতে চাইনে,—তার তেজ গর্ব্ব তার বংশেরই যোগ্যগুণ।

রাজা। রাণি—তুমি যা বলছ—এতে তার গুণ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছেনা—তোমার মহত্বই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তাকে বিদায় করে দাও—এ বিয়েটা শীঘ্র শেষ করে ফেলা যাক—তোমার যন্ত্রণা ঘুচুক!

রাণী। (স্বগতঃ) আমি যে তা চাইনে—কিন্তু আজ দেখছি বেশী বলা ভাল নয়—সময় বুঝে বলতে হবে।

রাজা। মহিষি—তোমার প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করে তার মুখ দর্শন করতে আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবান আমার সন্তান ভাগ্য বড়ই মন্দ করেছেন! যাকে নিয়েছেন তার পরিবর্ত্তে যদি একে গ্রহণ করতেন—

রাণী। মহারাজ—আমি যদি প্রাণ দিয়েও সে শোক নিবারণ করতে পারতুম—

রাজা। ভগবান যদি তোমার গর্ভে আমাকে একটি সন্তান দিতেন—তাহলেই আমার সব শোক নিবারণ হোত!

(অভিনয় শিক্ষয়িত্রীর প্রবেশ।)

শি। (নমস্কারপূর্ব্বক) জয় হোক! আমরা প্রস্তুত—আদেশ হলেই দৃশ্যপট উন্মুক্ত করা যায়।

রাজা। ক্ষণকাল বিলম্ব কর!—এ কি! এমন চীৎকার ধ্বনি উঠছে কেন?

(নেপথ্যে—আগুন আগুন—রক্ষা কর রক্ষা কর,—মহারাজ—মহারাজ—)

শি। তাই ত—এ কি ব্যাপার!

রাজা। যাও,—দেখ—প্রতিহারিণীকে ডাক, আমি ক্ষণবিলম্বে অভিনয়ের আদেশ পাঠাব।

(যথাদেশ বলিয়া অভিবাদনান্তে শিক্ষয়িত্রীর প্রস্থান)

(প্রতিহারিণীর আকুলভাবে প্রবেশ।)

প্র। মহারাজ—বিষম অগ্নি কাণ্ড! পশ্চিম প্রজাবাস অংশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে!

মহারাজা। মন্ত্রী, সেনাপতি—এঁরা সব কোথা? তাঁরা অবশ্যই নিস্তার প্রয়াস করছেন।

প্র। মহারাজ! প্রজাগণ আপনার দর্শন চাচ্ছে—আপনার নিকট দুঃখ নিবেদন করতে এসেছে।

রা। মহারাজ কি নিজে অগ্নি নির্ব্বাপিত করবেন—এইরূপ তারা প্রত্যাশা করে!

রাজা। রাণী সুস্থির হও, আমি সব বন্দোবস্ত করছি—প্রতিহারিণী সেনাপতিকে ডাকতে বল।

প্র। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান।)

রাণী। মহারাজের মত করুণহৃদয় রাজা পেয়েই তারা এমন অসময়েও অসম্ভব প্রস্তাব করে। তারা কি মহারাজকে একটু বিশ্রামেরও অবসর দেবে না?

(প্রতিহারিণীর পুনঃ প্রবেশ।)

প্র। মহারাজ, রাজকন্যা আপনার দর্শনে এসেছেন—এখানে আসতে চান।

মহা। রাজকন্যা—কল্যাণী!

প্র। আজ্ঞে হাঁ—আমাদেরই রাজকন্যা!

মহা। এখানে আসতে চায়! কখনই না! এমন অবাধ্য কন্যার মুখদর্শন করব না।—যাও প্রতিহারিণি এখানে আসতে তাকে নিষেধ কর।

প্র। তিনি বলছেন খুব জরুরী—

রাজা। তুমি যাও আমার হুকুম প্রতিপালন কর। (প্রতিহারিণীর প্রস্থান)

রাণী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কল্যাণী এখানে! একবার পিতাপুত্রীতে দর্শন হলে আমার মতলব সবই ব্যর্থ হবে। (প্রকাশ্যে) বোধহয় তিনি আমার নামেই কিছু বলতে এসেছেন। দাসী ফুল লুট করেছে শুনলে মহারাজা পাছে অসন্তুষ্ট হন—হয়ত তিনি তার সাফাই করতেই আসছেন।

রাজা। আমি চল্লেম—মহিষি—সে এখানে এসে পড়তে পারে—তার মুখদর্শন আমি করতে চাইনে!

(প্রস্থান—ও পথিমধ্যে কন্যাকে দেখিয়া স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান)

কন্যা। (প্রণাম করিয়া) অভাগিনী কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ।

রাজা। (স্বগত) সেই রকমই প্রতিকৃতি! প্রশান্ত সুমঙ্গলমূর্ত্তি! দেখলে ক্রোধ বিরাগ সব দূরে চলে যায়। এমন মধুরতার মধ্যেও এত ঈর্ষা বিদ্বেষ!

(নেপথ্যে—আগুন—আগুন—ইত্যাদি)

রাজকন্যা। মহারাজ, পিতা,—আমি প্রজাদের দুঃখ নিবেদন করতে এসেছি। প্রজামণ্ডল অগ্নিদাহে ভস্মীভূত। ঐ শুনুন কিরূপ ক্রন্দন কোলাহল উঠছে!

রাজা। সেজন্য ত তোমার চিন্তার কোন কারণ দেখি না! মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা সকলে নির্ব্বাণ ব্যবস্থা করচেন।

কন্যা। আমি সেই কথাই নিবেদন করতে এসেছি;—আপনি যাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত আছেন—তারাই প্রজাপীড়ক।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও, তারাই আগুন লাগিয়েছে?

কন্যা। মহারাজ ক্ষমা করবেন—প্রজারা তাই বলছে—আরো বলছে—

রাজা। কি বলছে আমি শুনতে চাইনে—তুমি হয়ত বলবে—মহারাণীর আদেশেই এরূপ ঘটেছে—তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়!

কন্যা। নিরীহ প্রজাদের অনুযোগ আপনি না শুনলে—কে শুনবে? কে তাদের প্রতি সুবিচার করবে?—সত্যই তারা মহারাণীকে—

রাজা। ক্ষান্ত হও, মাতৃনিন্দা মহা অধর্ম্ম,—তোমার এই ঈর্ষা আমার অসহ্য! তুমি আমাকে রাজধর্ম্ম শিখিও না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করে চল;—তাতেই রাজ্যের সমস্ত অশান্তি অমঙ্গল দূর হবে!

(সক্রোধে প্রস্থান)

রাজকন্যা। উঃ কি করে আমি মহারাজার অন্ধ নয়ন ফোটাব! কি করে দুর্ভাগা প্রজাদের দুঃখ দূর হবে!

[পটক্ষেপ। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।]

জীবন ও মৃত্যু।

জন্মের মাঝে মৃত্যুর বাস,
সুখের মাঝারে দুখ—
ওরে মন, তুই জেনে শুনে তবু
কেন বিষণ্ণ মুখ?

ফুলের কোরকে ফলটি হেরিয়া
ব্যথা পেয়েছিস্ কবে?
জীবনের মাঝে মরণে দেখিয়া
নয়ন মুদ্রিতে হবে!

চন্দ্র তারকা অস্ত যায় সে,
আবার ফিরিয়া উঠে;
ফলটি ফলায়ে ফুল ঝরে' যায়,
সেই ফলে ফুল ফুটে।

দিবসের শেষে রাত্রি আসেই
দিন আর ফিরে নাকি?
তেমি সে মৃত্যু-রাত্রির শেষে
দিবস রহিবে বাকী!

মৃত্যুর মানে শেষ নয় শুধু—
নবজীবনের সূত্র;
দুঃখের কোল ভরি দেখা দেয়
আনন্দ নবপুত্র।

রে অবিশ্বাসি, সৃষ্টির বিধি
তোরি তরে নয় ভিন্ন,
বিশ্ববিধানে চুনে' চুনে' নেরে
এক-ই সে চরম-চিহ্ন।

জীবন মৃত্যু, তাঁহারি সে দান,
তাঁরি দান সুখ দুখ;—
ওরে মন, তুই সেই বিশ্বাসে
বেঁধে নেরে আজ-বুক।

সুখ ও দুঃখ, চড়া আর খাদ
উঠে নামে ঘুরে-ঘুরে—
বেজে উঠে তায় পূর্ণ রাগিণী
জীবন-যন্ত্র-সুরে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

রাজকোট।

বিগত বৎসর রাজকোটে গিয়াছিলাম—গুজরাতি সাহিত্যপরিষদের তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন দেখিতে। রাজকোট বোম্বাই হইতে রেলযোগে ২০ ঘণ্টার পথ এবং কাঠিওয়ারের কেন্দ্রস্থান। অধিবেশনের কাজ অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোণ্ডলের উদার সুশিক্ষিতা মহারাণী নন্দকুমারীকে অভ্যর্থনা কমিটির সভানেত্রী পদে বরণ করা হইয়াছিল। রাজকোটের সুবিনির্মিত বিস্তৃত 'হলে' অধিবেশন হইয়াছিল; সভাগৃহ অতি সুন্দর ও পরিপাটিরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সভা প্রারম্ভে একদল বালক "অমে কাঠিবারী সরল সৌরাষ্ট্র বাসী" 'ললিত কবির' তৎকালোপযোগী গানটী গাহিলে পর আর একদল বালিকা আর একটি সুন্দর গান করিয়াছিল। প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক মহিলা সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণীর অভ্যর্থনা পাঠ সমাপন হইলে দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সাকর লাল দেসাই এম এ, এল এল, বি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কাঠিওয়ারের গবর্ণার সে সভায় উপস্থিত হইয়া রাজকোটে সাহিত্যসেবীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

চারিদিন ধরিয়া অধিবেশনের কার্য্য চলিয়াছিল। অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। মহিলাদিগের মধ্যে শ্রীমতী বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত বি, এ, সারদা সুমন্ত বি, এ, প্রভৃতি মহিলাগণ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্যে মহিলাদিগের কীর্ত্তি, স্ত্রীসাহিত্যিকগণ, স্ত্রীকবিগণ, হিন্দুস্থানে এক ভাষা, প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ এবং প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

এই সাহিত্যপরিষদের সংশ্লিষ্টে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে পৌরাণিক পুঁথিপত্র, শিলালিপি, মুদ্রা, চিত্র, সাজসজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছিল।

পুণার প্রাচীন পুস্তকাগার হইতে বিবিধ সংস্কৃত, গির্ব্বান, গুজরাতি ও মারাঠী পুস্তক আনিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তালপত্রে লিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, তাম্রলিপি ও মুদ্রা বহুল পরিমাণে ছিল। প্রাচীন কতকগুলি চিত্রও নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। শিবাজীর বাঘনখ অস্ত্র, সাতারার রাণীর পরিচ্ছদ, পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহগুলির স্থান নির্ণয়ের জন্য অপূর্ব্ব যন্ত্ররাজ আনিত হইয়াছিল। যন্ত্ররাজে ১২ খানি 'প্লেট' আছে। সেই 'প্লেট'গুলি ঘুরাইয়া পৃথিবী ও নানা গ্রহ উপগ্রহের স্থান নির্ণয় অতি সহজে হইয়া যায়। এইরূপ আর একটী যন্ত্র মিসরে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

বরোদার গায়কবার সাহেব পটাকারের অতি দীর্ঘ, সুবর্ণানুলেপিত ও চিত্রাঙ্কিত একটী রামায়ণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা বড় চমৎকার!

শিলালিপি, তাম্রলিপি, পুস্তক ও মুদ্রাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসাধ্য।

অধিবেশনের শেষ দিনে গোণ্ডলের মহারাণী সাহিত্যপরিষদের হস্তে ৫০টী স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

চতুর্থ দিনে গোণ্ডলের মহারাণী প্রতিনিধিবর্গ লইয়া একটী সান্ধ্যসমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেখানে একজন ভাট, ফরমাস্ অনুযায়ী নানা ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল। সান্ধ্যভোজন ও বিবিধ আমোদের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল।

রাজকোটে কাঠিওয়ারের গবর্ণরের বাসভবন। ইনি কাঠিওয়ারের সমস্ত রাজন্যবর্গের 'রেসিডেণ্টের' কাজ করেন।
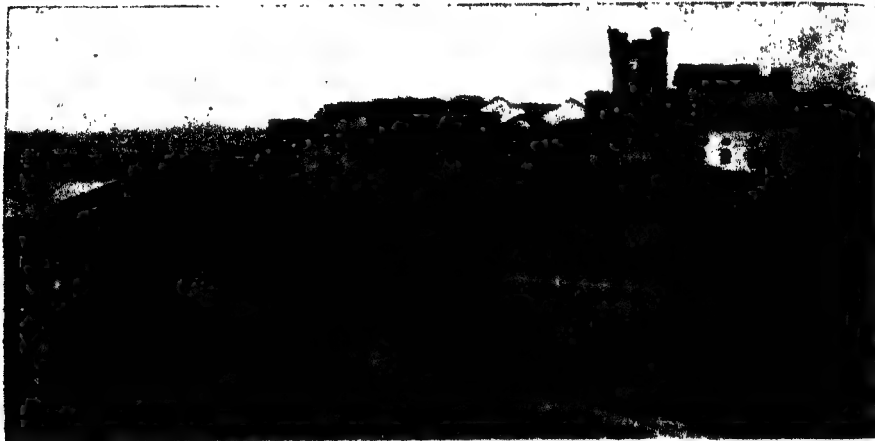
রাজকোট।

এখানে রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য একটী 'কলেজ' আছে।

রাজকোট সহরটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ রমণীয়। একটী ক্ষুদ্র জলস্রোত সহরের পার্শ্ব দিয়া, পাষাণ তলদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। দিগন্ত প্রসারিত মাঠ,—সৌরাষ্ট্রের প্রাচীন ছবি, প্রকৃতির তরুলতার মধ্যে বোধ হয় একই ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

রাজকোটের তিন মাইল দূরে একটী সুরমা হ্রদ আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

পূর্ণিমায়।

সুখ-সুপ্ত এ ধরায় মৃদু-মন্দ মধু-বায়
আবেশ বহিয়া আনে ধীরে—অতি ধীরে;
বাসন্তী পূর্ণিমা নিশা পরিপূর্ণ দশদিশা।
কি আনন্দ,—কি আনন্দ! সুগন্ধি সমীরে
দূর হ'তে আসে বহি' 'কুহু'ধ্বনি রহি রহি';
বিশ্ব কোথা মুছে গেছে,—নাহি যায় দেখা!
জোৎস্না-স্নাত বসুন্ধরা নিবিড় স্তব্ধতা ভরা;
আর কোথা কিছু নাহি, শুধু আমি একা!
অনন্ত অম্বর' পরে ভাব-সমীরণ ভরে
অসীম অমৃত-সিন্ধু আনন্দে মথিয়া,
অশ্রান্ত এ "কুহু"-তান, তা'র সনে এই প্রাণ,
—দুইটি প্রার্থনাসম চলিল ভাসিয়া!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৫৪, অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সম্রাজ্ঞী মেরী
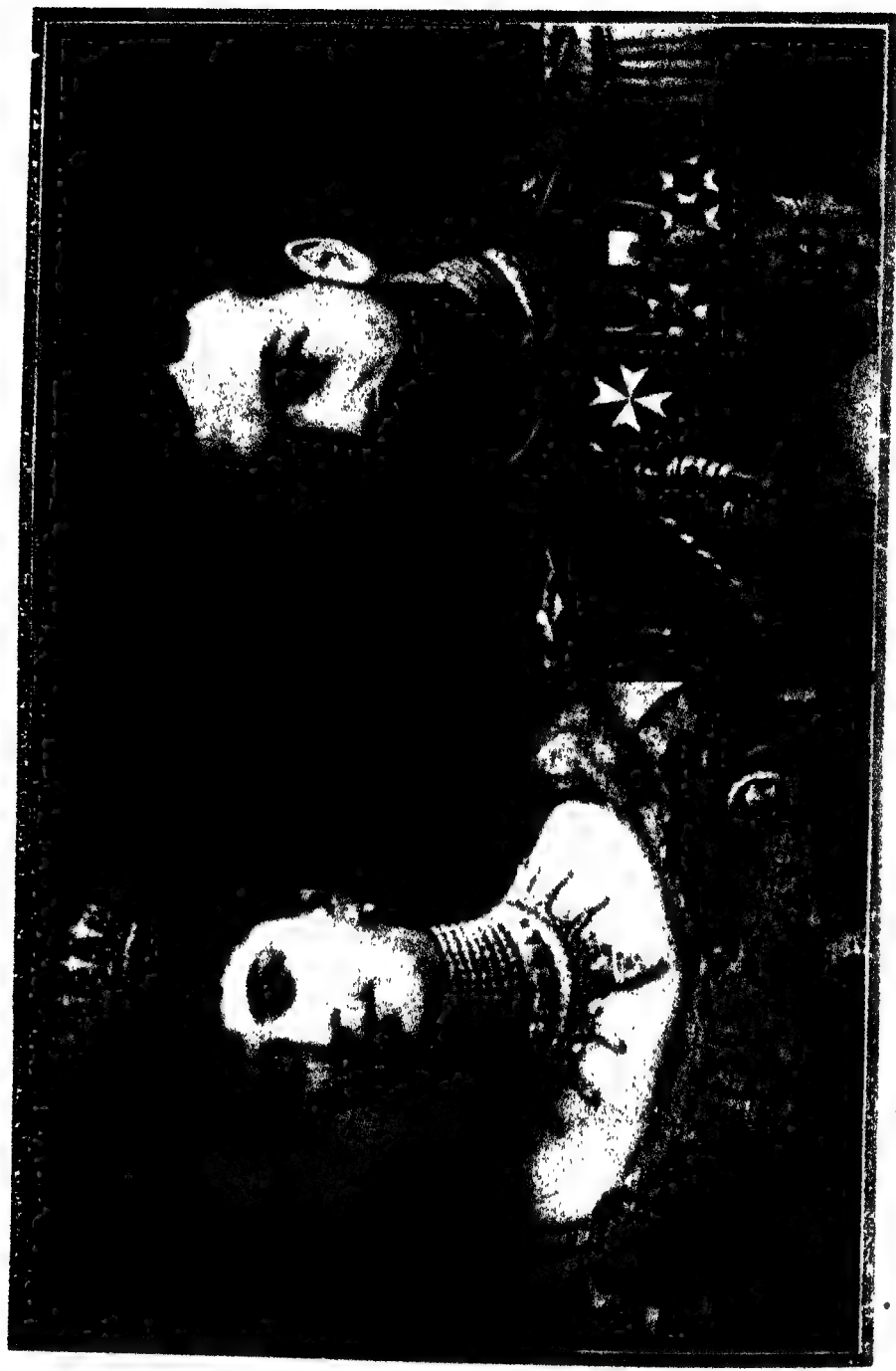
সম্রাট পঞ্চম জর্জ

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩১৮ [৪র্থ সংখ্যা।

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা।*

কর্ম্ম করতে করতে কর্ম্মসূত্রে এক এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে,—তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে খুল্‌তে সেরে নিতে চারদিকে কত রকমের টানাটানি করতে হয়—তাতে মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল—তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াগাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে, এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কি করলে জটা ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুন্‌তে পারবে সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখ্‌তে দেখ্‌তে উত্তর পশ্চিমে ঘন ঘোর মেঘ করে এসে সূর্য্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পর-পারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মত ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্ত ভাবে ছুটে আস্‌চে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠ্‌ল; তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল—পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্ম্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘন ধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারিদিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছিল। স্নান ও পানের জলের কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে সে জন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম, মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল

* ৩ই বৈশাখে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সার মর্ম

স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলে একেবারে চারিদিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়—চিন্তা করে নয় চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্য্যাপ্ত বর্ষণ এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারি ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা একমুহূর্ত্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ করে', একটুর সঙ্গে আরেকটুকে জুড়ে গেঁথে কোনোকালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষ কোটি ফুলের নিগূঢ় মর্ম্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করচে—যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে' অকস্মাৎ সে কি আশ্চর্য্যরূপে দেখা দেয়! বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্ত্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে একমুহূর্ত্তে শ্যামল করে তোলে—তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখ্‌তেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কি বাধাহীন, কি প্রচুর, কি মধুর, কি গম্ভীর সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করচে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই—কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বল্‌চে না; কেবল ইচ্ছা করচে বিশ্বজগতের মধ্যে যে একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখবিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারচে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই—তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে, সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাক্‌বে—যে দীনতা কোনো দিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নাম্‌বে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাক্‌বে তোমার প্রসাদধারা—গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠ্‌চে। বারিধারা ঝরচে ঝরচে—সমস্ত ধুয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত নবীন হয়ে উঠ্‌চে, শ্যামল হয়ে উঠ্‌চে। বাইরে কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার—তারি মধ্যে নেমে আস্‌চে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি; ভরে ভরে নিয়ে আস্‌চে তাঁরি সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই—এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে; তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কি গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব; সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে;—প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে—তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারিদিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুসির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুসি হও! এই সহসা অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুসি, এই এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুসি—সেই খুসির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মনপ্রাণশরীর আজ খুসি হয়ে উঠুক! আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্ম্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক্—পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এস, এস, তুমি এস,—আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এস! হে গোপন, তুমি এস! প্রান্তরের এই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এস! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এস, আজ তুমি বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও—তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শপাতের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংলণ্ডের ট্রেণিং কলেজ।

শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনার্থে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করাই ট্রেণিং কলেজের উদ্দেশ্য। কেবল আইন পড়িলেই যেমন নিপুণ উকীল হওয়া যায় না, বিচার্য্য বিষয়ের পক্ষ তথা বিচারালয়ে কার্য্যকালীন আইনানুসারে ধরিতে জানা চাই এবং সে সম্বন্ধে মতামত কৌশলে প্রকাশ করা চাই, সেইরূপ কেবলমাত্র বিদ্যাজ্ঞান থাকিলেই যে কেহ সুদক্ষ শিক্ষক হইতে পারিবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; এ জ্ঞানের সহিত তাঁহার আরও কিছু থাকা আবশ্যক;—ছাত্রছাত্রীগণের সম্বন্ধে কি প্রকারে পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান ধরিলে সহজে ও অনায়াসে তাহারা জ্ঞানার্জ্জনের পথে চলিতে পারে তাহা তাঁহার জানা চাই। অবশ্য এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ছাত্রের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক জীবন গঠনের নিমিত্ত শিক্ষকের অন্যান্য গুণও থাকা চাই, কিন্তু উহা আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নহে।

১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা দুইজন ভারতীয় ছাত্রী লণ্ডনের ট্রেণিং কলেজে শিক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তি হই। এই কলেজ ইংলণ্ডের

প্রথম প্রতিষ্ঠিত ট্রেণিং কলেজ। "মেরায়া গ্রে ট্রেণিং কলেজ" নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে ইহা কাথলিক সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত; কিন্তু তাহা নহে। শ্রীমতী মেরেয়া গ্রে নাম্নী জনৈক ধনী মহিলার যত্ন ও অধ্যবসায়ে ইহা স্থাপিত হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার স্মরণার্থ কলেজের উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। কলেজের ছাত্রীনিবাস রাস্তার অপর পার্শ্বে স্থিত।

সেপ্টেম্বর ১৯শে প্রাতে গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিল। ছাত্রীনিবাসে ৩৬ জন ছাত্রী ছিলেন সকলেই প্রাতে আহার টেবিলে আসিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন এবং কয়েক জন আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া কলেজে লইয়া গেলেন। কলেজের ফটকে যে দ্বারবান দাঁড়াইয়া ছিল আমাদের সহচরীগণ সকলেই তাহাকে "গুড্ মর্ণিং মিষ্টার স্কট্" বলিয়া শুভ প্রাতঃকাল ঘোষণা করিলেন। প্রত্যুত্তরে মিঃ স্কট্ও "গুড্ মর্ণিং" বলিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন। আমাদের কাছে ইহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইল এবং মিঃ স্কট্ বাস্তবিক দ্বারবান কি না সে সম্বন্ধে তখন সন্দেহও উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ দ্বারবানও "মিষ্টার" নামে অভিহিত হইবে ইহা ইতিপূর্ব্বে কখনও মনে করি নাই। ইংলণ্ডে থাকিয়া দেখিলাম, এখানে সর্ব্বত্রই চাকর চাকরাণীর সহিত যথোচিত সম্মানের সহিত কথা বলিতে হয়—কোন জিনিস আনিতে বলিলে বা চাহিলে "অনুগ্রহ" কথাটা ব্যবহার করিতেই হইবে।

ফটক পার হইয়া আমরা একটি চত্বরে পড়িলাম উহার দুই পার্শ্বে কলেজের উদ্যান। ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটী "মে" বৃক্ষ। সেপ্টেম্বর মাসে সকল বৃক্ষই লোহিতাভ বর্ণের পত্রে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহা আমাদের চক্ষে এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতেছিল। চত্বরের মধ্যস্থল হইতে সোপানশ্রেণী দেখা যাইতেছে, তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক আমরা কলেজের "হলে" উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই কলেজের মূল বচন "সানন্দে শিক্ষা গ্রহণ ও দান কর" —(Gladly learn and Gladly teach) স্বর্ণাক্ষরে এক কাষ্ঠফলকে লিখিত রহিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে ইহার উপর ছাত্রীদিগের চক্ষু পতিত হইয়া উৎসাহ পূর্ণ করিত কি, না জানি না, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের ভারে যখন আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম তখন কত সময় ইহা আমার মনে উৎসাহ ও নবশক্তি প্রদান করিয়াছে। চসারের গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০ টা বাজিলে কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট সকল ছাত্রী সমাগত হইলেন, তিনি প্রত্যেক ছাত্রীর কর মর্দ্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যাঁহারা পুরাতন ছাত্রী তাঁহাদের সহিত আরও দুই একটী বাক্যালাপ করিলেন। প্রিন্সিপালের দক্ষিণ পার্শ্বে কলেজের মহিলা অধ্যাপকগণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই প্রকার পরিচয়াদি লইতে ১২টা বাজিয়া গেল। তখন কলেজের যে গৃহে ছাত্রীদের জন্য কাগজ খাতা পেন্সিল রবার প্রভৃতি রক্ষিত থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য ঘণ্টা পড়িল। কলেজের নিয়মানুসারে প্রতি টার্ম্মে প্রত্যেক ছাত্রীকে খাতাপত্রের জন্য পাঁচ শিলিং করিয়া

দিতে হয় এবং প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি বারে একজন শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদের প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগকে এই সকল ষ্টেশনারী বিতরণ করেন। সকল ছাত্রীকেই এক আকারের খাতা পত্র দেওয়া হয়। ১টার সময় লাঞ্চের বা মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। ২টা পর্য্যন্ত ছুটী। যে সকল ছাত্রী কলেজের ছাত্রী-নিবাসে থাকেন তাঁহাদের তথায় গিয়া আহার করিতে হয়, অবশিষ্ট ছাত্রীগণ কলেজেই আহার করেন। এ সম্বন্ধে কলেজ গৃহে সুন্দর ব্যবস্থা আছে। যিনি যে প্রকার খাদ্য পছন্দ করেন তিনি সেইরূপ খাইতে পান। মাছ, ডিম, মাংস, সুপ, ম্যাকারোণী, শাকসবজী, রুটী মাখন, চিজ্, পুডিং ফল দুধ, কোকো, চা সবই থাকে। কলেজের দ্বারবানের স্ত্রীর (মিসেস্ স্কট) হস্তে আহার তত্বাবধানের ভার।

কলেজ গৃহটী চারিতলা। প্রথমতলায় আহারশালা, পাকশালা, ক্লোক ও জুতা

ট্রেনিং কলেজ

রাখিবার ঘর, কিণ্ডারগার্টেন শ্রেণীর পাঠশালা এবং লাইব্রেরী ব্যায়াম বা ড্রিল-কামরা।

দ্বিতীয় তলায় প্রিন্সিপালের বসিবার ঘর, তাঁহার অফিস, প্রকাণ্ড হল, এবং হলের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরগুলিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের পাঠগৃহ। তৃতীয় তলায় কলেজের ছাত্রী-দিগের পাঠাগার। চতুর্থ তলায় সঙ্গীত ও অঙ্কন শিখিবার জন্য স্বতন্ত্র দুইটী বড় ঘর, অবশিষ্টগুলি কলেজের চাকর চাকরাণীদের।

মেয়াদের ট্রেনিং কলেজের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার সহিত কিণ্ডারগার্টেন শিশু শ্রেণী হইতে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশান শ্রেণী পর্য্যন্ত সংযুক্ত আছে। যাহাতে হাইস্কুল ও কিণ্ডারগার্টেন শ্রেণীতে ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীগণ অধ্যাপনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন্ এই নিমিত্তই ইহা কলেজের সহিত যুক্ত রাখা হইয়াছে। লণ্ডনের ইয়র্ক প্লেসে যে বেডফোর্ড ট্রেনিং কলেজ আছে তাহাতে এ সুবিধা নাই। দ্বিতীয়তঃ আর

একটী সুবিধা যে ইহা লণ্ডন সহরের মধ্যে অবস্থিত না হওয়ায় দিবারাত্রি গাড়ীর কর্ণভেদী শব্দ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কলেজের সম্মুখ দিকে সলস্‌বেরী রোড, দক্ষিণে কুইন্‌স্ পার্ক নামক উদ্যান, পূর্ব্বদিকে কলেজের উদ্যান ও টেনিস্ কোর্ট, এবং পশ্চিমে চিভনীং রোড।

প্রত্যেক ছাত্রী যাহাতে কলেজের নিয়ম অবগত হন এবং তাহা পালন করেন তজ্জন্য প্রথম দিন লাঞ্চের পর প্রিন্সিপাল ছাত্রীদের সম্বন্ধে সমুদয় নিয়মগুলি পড়িলেন এবং কি উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে ও উহা ভঙ্গ করিলে কি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা সবিশেষ বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে যাহাতে ছাত্রীগণ আত্মমর্য্যাদা স্মরণ পূর্ব্বক নিয়মগুলি পালন করেন তন্নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ জাতি নিয়ম পালনে সদা তৎপর, এবং আমি দুই বৎসরের কলেজ জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে কাহাকেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখি নাই এবং নিয়ম পালন যে কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে এমন ভাবও কেহ প্রকাশ করেন নাই।

ইহার পর নূতন ছাত্রীগণকে তাঁহাদের শরীরের মাপ ও ওজন লইবার জন্য অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়; যাহার যত ওজন তাহা কলেজের রেজেষ্টী খাতায় ছাত্রীর নামের সহিত লেখা থাকে। তৎপরে তাঁহাদিগকে একটী ছোটখাট পরীক্ষা দিতে হয়—ইহা বড় নূতন ধরণের পরীক্ষা।

এ, বি, সি, ডি, শিখিয়া অবধি কোন দিন মনে এতটুকু সন্দেহ আসে নাই যে আমি ইংরাজী বর্ণমালার কোন বর্ণ সঠিক্ উচ্চারণ করিতে পারিব না; কিন্তু, যখন এই Voice Production বা কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা দিতে হইল তখন দেখিলাম যে এমনও বর্ণ আছে যাহা যথাস্থান হইতে সঠিক উচ্চারণ করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। তালু, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থান হইতে বর্ণগুলি ঠিক উচ্চারিত হইতেছে কি, না তাহা জানিবার জন্য এই পরীক্ষা গ্রহণ। যাহার যে বর্ণ উচ্চারণে দোষ আছে তাহাকে সাপ্তাহিক Voice Production ক্লাসে যাইতে হইত। আমাদের হস্তে একটী করিয়া জলন্ত মোমবাতি দিয়া পরীক্ষক বলিলেন যে, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বাম নাসারন্ধ্রের সাহায্যে—আবার বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের সাহায্যে একবারমাত্র ফুৎকারের দ্বারা বাতি নিবাইতে হইবে। যে ছাত্রী উভয় প্রকার করিতে সক্ষম হইলেন তিনি পাশ! ছাত্রীর সাধারণ স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত নূতন ছাত্রীগণকে কলেজকর্ত্রী কলেজের মহিলা ডাক্তারের নিকটে প্রেরণ করেন। যদি খাদ্য বা পরিশ্রম সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তাহা হইলে ডাক্তার সে বিষয় কলেজের অধ্যক্ষকে জানাইয়া থাকেন এবং সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব কর্ত্তৃপক্ষগণ যত্ন লইতে ত্রুটী করেন না।

ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য কলেজের আর ট্রেণিং কলেজেও তিনটী টার্ম—সেপ্টেম্বরের মধ্য হইতে ডিসেম্বরে বড় দিনের ছুটীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিকেলমাস টার্ম্ম। বড়দিনের জন্য এক মাস ছুটী হয়। তারপর ইষ্টার টার্ম।

ডক্রাইডের অনতিপূর্ব্বে চারি সপ্তাহের জন্য ইষ্টারের ছুটি হয়। এই টার্ম্মই তিনটীর মধ্যে দীর্ঘ। ইহার পর গ্রীষ্ম টার্ম্ম। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রীষ্মাবকাশের নিমিত্ত কলেজ বন্ধ হইয়া পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ খোলে।

ট্রেণিং কলেজে তিনটী বিভাগ আছে, ১ম,—লণ্ডন সার্টিফিকেটপরীক্ষা—২য়,কেম্ব্রিজ সার্টিফিকেটপরীক্ষা, ৩য়—ফ্রোবেল ইউনিয়ন সার্টিফিকেট পরীক্ষা।

শেষোক্ত পরীক্ষায় ফ্রেডরিক ফ্রোবেলের মতে শিশুদিগের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ শিক্ষার্থীদিগকে তাহারই পরীক্ষা দিতে হয়। উপরিউক্ত দুইটী পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত কঠিন, বৃটিশ বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট বা বি, এ, উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রীগণই এই দুইটী পরীক্ষায় সাধারণতঃ প্রেরিত হন।

লণ্ডন সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও কেম্ব্রিজ সার্টিফিকেট পরীক্ষার মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ।

লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রী হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণী বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে কোন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী অথবা কোন কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারেন। আমাদের এই ট্রেণিং কলেজের কর্ত্রী ও অধ্যাপিকাগণ সকলেই কেম্ব্রিজ ট্রাইপস্ ও ট্রেণিংকলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেম্ব্রিজ ট্রাইপস্ ও এম, এ, উপাধিধারিণী।

উক্ত দুই বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয় যথা, Theory of Education, History of Education এবং Practice of Education. এতদ্ব্যতীত অঙ্কন ও ব্যায়াম শিখিতে হয়। তদ্ভিন্ন যে কোন একটী শতাব্দীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশেষ ঘটনা পড়িতে হয়। আমাদের সপ্তদশ শতাব্দীর শিক্ষার বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল; অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে শিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল এবং কোন্ কোন্ মনীষী কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আদ্যোপান্ত জানিতে হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিবৎসর কোন এক শতাব্দীর শিক্ষা বিষয় কেম্ব্রিজ বা লণ্ডন সিণ্ডিকেটের মেম্বরগণ কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

ফ্রোবেল্ ইউনিয়ন্ সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উপরিউক্ত তিনটী বিষয় অতি অল্প পরিমাণে পড়িতে হয়; কিন্তু তুলির দ্বারা রঞ্জিত চিত্রাঙ্কনে এবং মৃন্ময় পদার্থাদির গঠন ইত্যাদিতে অধিক সময় ব্যয় করিতে হয়।

প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ, সাহিত্য ও প্র্যাক্টিকেল জ্যামিতি ট্রেণিং কলেজে শিক্ষার প্রধান বিষয়।

ড্রিল বা ব্যায়াম ইংলণ্ডের সমুদায় বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীতেই হয়। ইহা ব্যতীত বিবিধ খেলার আয়োজনও আছে।

শ্রীসরলাবালা মিত্র।

আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ।

নাম নহিলে পরিচয় দেওয়া যায় না, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়েরই একটা স্বতন্ত্র আত্মগত নামের দরকার। সাহিত্যে এই নাম প্রকরণের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত, পুষ্প যেমন বৃন্তকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হয়, সাহিত্য সেইরূপ নামকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। নামপ্রকরণের এই অপরিহার্য্য নিয়ম বশে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি উপরিলিখিত প্রকারে অভিহিত করা গেল।

বিষয়টি প্রচুর ভূয়োদর্শন সাপেক্ষ। যিনি এই নিশাবসান ও উষাগমের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উভয়কালই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই এতদুভয়ের মধ্যে যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল রূপে বলিতে পারিবেন। রুদ্ধদ্বার গৃহের পশ্চাতে বাতায়ন-ছিদ্রের মধ্য সঞ্চালিত দৃষ্টি যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিবে, হয় ত তাহাতে বহু ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে, কিন্তু তবুও এই উভয়যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা যাহা হারাইতে বসিয়াছি তাহার বেদনা বহিয়া ও যাহা লাভ করিতেছি তাহার আনন্দ লইয়া চুপ করিয়া থাকা যাইতেছে না!

প্রাচীন ভারতে সমাজ রচনা।

প্রাচীন ভারতের প্রথম সমাজ রচনার মধ্যে আমরা একটি একান্ত সুসংহত ভাব দেখিতে পাই, একটি শোভন পারম্পর্য্যগত শৃঙ্খলার দ্বারা তাহা গ্রথিত ও সজ্জিত। সমগ্র সমাজকে চতুরাশ্রমে ও চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত করিয়া দিয়া এবং প্রত্যেক আশ্রম ও বর্ণের পৃথক্ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সে শাস্ত ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী হইয়াছিল। তাহার জীবন-যাত্রার কোনো স্থান দিয়া কোনো ঘাত সংঘাত ছিল না, একটি প্রবল নিরাকুল ধারা নিঃশব্দ মন্থর গমনে রণক্ষেত্রের শোণিত চিহ্ন ধৌত করিয়া ও ধ্যাননিশ্চল ঋষিপুঞ্জের আশ্রম তরুমূল অভিষিক্ত করিয়া নীরবে বহিয়া চলিয়াছিল। নিশাবসানে যে আলোক-ধারা বিশ্বের প্রাঙ্গণে অবতরণ করিতে থাকে, তাহার অনাহত অকুণ্ঠিত বিশালতার মত সে প্রত্যেককে নীরবে পরিণতি দান করিয়াছিল, উজ্জ্বলতামণ্ডিত করিয়াছিল, শ্রী বিভূষিত করিয়াছিল! বিচারনিষ্ঠ হইয়া আজ আমরা ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছি যে "চণ্ডালের বংশধরকে যদি আবহমান কাল চণ্ডালের কাজেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের সম্ভাবনা কোথায়? প্রতিভা কখনও স্থান কাল পাত্র বিভেদ করে না,—চণ্ডালের বংশেও প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভবের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং তাহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। কিন্তু প্রতিভাকে এমনি করিয়া বাঁধিয়া যদি সামাজিক শাসনের প্রাচীর মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্যতার পাথর চাপা দেওয়া যায়, তবে সমাজকে অবশ্যই একদিন তাহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এবং সে ক্ষতি তখন পূরাইবার কাহারো সাধ্য থাকিবে না।" কঠিন মৃত্তিকা এবং ইমারতের কঠিনতর রচনা ভেদ করিয়া বৃক্ষাঙ্কুর যখন তাহার কোমল অপরিণত ক্ষুদ্র শির বাহির করে, তখন তাহাকে যেমন দাবিয়া রাখা যায় না, তেমনি প্রতিভাকে সমাজ কখনও তাহার

কৃত্রিম অনুশাসনের ভারে নিষ্পিষ্ট করিতে পারে নাই, প্রতিভার আত্মগত যে বিশেষ শক্তি আছে, তাহা চিরদিনই তাহার অদৃশ্য অপরাজেয় বিক্রমে তদুপরি পুঞ্জীভূত প্রতিবন্ধকতার শিলাস্তূপকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া আপনার পথ বাহির করিয়া লইয়াছে! সেকালে ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার ছিল না, তবু জনক রাজা রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়াও মুনিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। নিষাদপুত্র একলব্য যখন ব্রাহ্মণ্য গৌরবগর্ব্বিত দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, তখন সে প্রত্যাখ্যান তাহার ধনুর্ব্বেদে পারদর্শিতা লাভেচ্ছাকে বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব করিতে পারে নাই, পরন্তু তাহার ধনুর্ব্বিদ্যার নিকট একদিন দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উন্নত শির নত করিতে হইয়াছিল! এই রকম, সাধারণের জন্য একটা সাধারণ বিধি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও যেখানে নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণকে বিদ্যায় পরাজিত করিয়াছে সেখানে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের কাছে শিষ্যত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নাই, মহাভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক।

এই সব পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, তখনকার যুগে উপায় উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিত না এবং উদ্দেশ্য কখনও উপায়ের সঙ্ঘাত বাহুল্যের ভারে অচল হইয়া পড়িত না। যেখানেই উভয়ের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত সেখানেই উপায়কে ছাঁটিয়া উদ্দেশ্যের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকতার যে একান্ত সহজ সরল গতি—তাহাকে এরূপ অনায়াসকৃত চেষ্টার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করায় তাহা কখনও বদ্ধ হইয়া যাইতে পারে নাই, তাহার নিত্যোৎসারিত নির্ম্মল জলধারা সৌন্দর্য্যে ও শোভায় চারিদিক ভরপূর করিয়া তুলিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষণ। এই ত গেল প্রাচীন ভারতের প্রাচীন চিত্র। মধ্য-যুগে ভারতের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা বিপ্লববেগে একান্ত সংক্ষুব্ধ। ভারতের নিপুণগঠন সমাজ-সৌধ তখন অনার্য্যজাতি সমূহের সহিত সংমিশ্রণে উদ্ভূত নবধর্ম্ম সমূহের সংঘাতে বিপর্য্যস্ত; ধর্ম্মবাদ সমাজবিধি লোকবিধি—চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠান নবযুগ সমুচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগে কম্পমান। নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের গৈরিক কেতু সমুচ্চ দেবমন্দির সমূহের চূড়া ভেদ করিয়া তখন প্রবল শক্তিতে উড্ডীয়মান; —নিয়মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ্যকে পদতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া একজাতিত্বের ও একধর্ম্মের সাম্যগানে ভারতের আকাশ প্রতিধ্বনিত। ভারতের উদীয়মান বৌদ্ধযুগ ও বিলীয়মান ব্রাহ্মণ্যযুগ দুই প্রাধান্যপ্রয়াসী প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বী পরস্পরের সহিত অবিরত যুদ্ধ নিরত। প্রাচীন ভারতবর্ষের অবনতির ইহাই প্রারম্ভযুগ।—কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম, উভয় পক্ষই এ সময় ধর্ম্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রাধান্যের জন্য চেষ্টিত এবং পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য বহু কৃত্রিম উপায়ে আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। ইহার ফলে বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম উভয়ই স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল, এবং ধর্ম্মের যে অতুলনীয় আদর্শকে পরম নিষ্ঠার সহিত তাহারা এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল তাহা একেবারে বিকৃত হইয়া গেল। উভয় দিকে এই সময়ে যে গুণাবলোপ (degeneration) ঘটিল তাহা ভারতের ভাগ্যাকাশে দুরপনেয় রূপে লগ্ন হইয়া রহিল। সাকারোপাসনার বহু বিভ্রম ও প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধদেব ঈশ্বরীয় প্রশ্নের উত্তরে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ শুধু সাধনের দিকে ছিল, ভজনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার প্রেম-প্রধান মনোবৃত্তি লইয়া বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত একমাত্র সাধন-পথ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রাণপূর্ণ ব্যাকুলতা লইয়া সে চাহিতে লাগিল সাধ্য বস্তুকে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন তাহা দিতে পারিল না তখন তাহারা বুদ্ধদেবকেই তাহাদের শূন্য পাদপীঠে স্থাপন করিয়া অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। ফলে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল সাকারোপাসনায় পরিণত হইয়া চৈত্য বিহার গিরিগুহায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের পীঠস্থান, কিন্তু সেই ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধধর্ম্মের কোনো কিছু নাই, তাহা সমুদ্রপারবর্ত্তী সুদূরতর দেশদেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মূলে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই চিরপ্রেম-প্রবণতাকেই দেখিতে পাই। যে ধর্ম্ম শুধু অনুষ্ঠানে—তাহাকে সে হৃদয় দান করিতে পারে নাই, প্রেমাস্পদের জন্য তাহার যে চিরন্তন আকুলতা,—তাহা তাহাকে শুষ্ক জ্ঞানের ও কর্ম্মের রসহীন বৈচিত্র্যহীন ভূমির বেষ্টন হইতে বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। ভারতের এই প্রেম প্রবণতায় যখন নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম আদ্যোপান্ত সেশ্বর হইয়া উঠিল, তখন প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মও আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বর্ত্তমান যুগে দাঁড়াইয়া ভারতের অতীতকে যে তিনটি বিশেষ যুগের দ্বারা বিভক্ত করা যায়—তাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর। এই তিন যুগেই ব্রাহ্মণ তাহার ধর্ম্মসৌধের স্তম্ভ স্বরূপ, ব্রহ্মণ্যধর্ম্মই তাহার ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। সত্যযুগে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়া যখন তাঁহার কুঠারাঘাতে বসুন্ধরাকে দ্বাদশবার নিঃক্ষত্রিয় করিলেন, তখন তিনি প্রচার করিলেন ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠতা। তাহার পরবর্ত্তী যুগে শ্রীরামচন্দ্র কৈশোর হইতে সমস্ত বিপদ ও ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া যখন ব্রাহ্মণের কাজে আপনার জীবন নিয়োগ করিলেন তখন তিনি পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত এই ব্রহ্মণ্য প্রাধান্যেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যখন ব্রাহ্মণের পদাঘাতের চিহ্ন আপনার বক্ষে ধারণ করিলেন তখন তিনি সেই প্রাধান্যেরই গৌরব ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইহার পরে বুদ্ধদেব যখন তাঁহার সাম্যবাদের কুঠার দ্বারা এই প্রবলশক্তি ব্রহ্মণ্যকে আঘাত করিলেন, তখন তাহা পরশুরামের কুঠারমুখে পতিত ক্ষত্রিয়বংশের মতই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িল। পরে শঙ্করাচার্য্য তাহার মৃতদেহে প্রাণদান করিলেও তাহার পূর্ব্বতন স্বাস্থ্যশ্রী আর ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন নাই। তন্ত্র প্রভৃতি বহু উপধর্ম্ম ও উপশাস্ত্রের এই সময়ে

উদ্ভব হইল, বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে যাহারা কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যোগসিদ্ধি অর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল, নির্ব্বাণসাধক বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে আপনার গৈরিক পতাকার তল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল এবং তাহার প্রতিযোগী ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম আপনার বলবৃদ্ধির জন্যই হউক্ অথবা তাহার চিরভ্যস্ত উদারতা অথবা সদাশয়তার জন্যই হউক্, তাহাকে বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইল। ফলে যে হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতির ভিতরে পুরুষকে উপলব্ধি করিয়া ঋকের উপর ঋকের ঝঙ্কার তুলিতেছিলেন সেই হিন্দুধর্ম্ম তেত্রিশকোটী দেবদেবীর স্বকপোলকল্পিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ বহুবিধ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতের ফলে বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

এই সুদূরগত যুগগুলির সহিত বিংশ শতাব্দীর লোক আমরা কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবী করিতে পারি না। তাহার সহিত আমাদের দৃঢ় বন্ধন বহুকাল হইল বিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের কল্পনা ও কাব্যের স্বপ্ন লোকের ভিতর একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহাকে লইয়া যদি আজ আমরা বিচার করিতে বসি তবে তাহা একেবারেই বাস্তব সীমার বহির্ভূত হইয়া পড়িবে।

আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে অপর তিন যুগের মত ঠিক ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম নিশ্চয়ই বলা যায় না। বরঞ্চ তত্তৎযুগে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্যের যে আতিশয্য ঘটিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তাহার প্রতিক্রিয়া এরূপ দ্রুতবেগে আরম্ভ হইয়াছে যে আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কোনো কোনো স্থলে ব্রাহ্মণ-নিরপেক্ষ দেবতাপূজা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে! যে জিনিষটা যত উপরে উঠান যায় তাহার পতন বেগ তত প্রবল হইবেই। যে ব্রাহ্মণ—আগে সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজ যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে চালিত হইত, রাজ্যেশ্বর ভূপাল যাহার পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যখন শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হইল, তখন ভারতবর্ষ সেই চূর্ণাবয়ব বিকৃতদেহ ভ্রষ্ট-সৌন্দর্য্য আকৃতির দিকে চাহিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল!

উনবিংশ শতাব্দীর ভারত।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ভারতের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহা মধ্যযুগের বিপ্লব চিত্র অপেক্ষা বহু পরিমাণে শোচনীয়। কারণ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যাহারা যৌগিক ক্ষমতা লাভ করিয়া বীভৎস বামাচারে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের শান্তিসুখ উৎসাদন করিতেছিল তাহারা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী যখন জরাগ্রস্ত আলস্যাতুর অবশাঙ্গ ভারতের তন্দ্রাস্তিমিত চক্ষের কাছে তাহার বহির্ভবনের চিররুদ্ধ কপাট খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন এই আসমুদ্র হিমাচল কুমারিকান্ত ভারতবর্ষ তাহার অপরূপত্বের মোহে আবিষ্ট হইয়া পড়িল। তাহার নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা সহসা তাহার কাছে বিবর্ণ ও হতশ্রী

হইয়া উঠিল, তাহার আভরণ তাহার কাছে মলিন হইয়া গেল, তাহার সজ্জা তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল, সে তখন নিজের যাহা কিছু তাহাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে প্রাচীন ভারতবর্ষ যখন এইরূপে তাহার জন্মবাঞ্ছিত রত্নসম্ভার অবহেলে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তখন তাহার জরাস্তিমিত দুর্ব্বল শক্তি তাহাকে সে প্ররোচনা দান করে নাই; দীর্ঘকাল আচার পালন করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভোগ নিরত থাকিয়া কর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল, ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে চাহিয়াছিল একবার নড়িয়া বসিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে, আপনার নিঃসঙ্গ নিষ্ফল কঠিন উচ্চতাকে বর্জ্জন করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক সজলা সফলা ভূমির সঙ্গে একবারে সমান হইতে; যে বিস্তৃত ধ্যানের আসনে বসিয়া সে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অসাড় করিয়া ফেলিতেছিল, তাহা হইতে আপনাকে একবার উত্থিত করিতে! কোথায় সে দুর্গম শিলা গহনের নীচে ভোগবতীর পুণ্য ধারা—পলিতকেশ জড়িমা-বিবশ-অঙ্গ প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার সন্ধানে যাত্রা করিতে পারিল না। তাহার কাছ দিয়া কর্ম্মনাশার যে তটস্বংশী প্রবাহ চলিতেছিল, তাহার জলেই সে অবগাহন করিতে নামিল!

উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গদেশের পক্ষে অতি বিচিত্র কাল। রামমোহন, রামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ ধর্ম্মাত্মাগণ, হরিশচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, সুরেন্দ্র-নাথ, শিশিরকুমার প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতাগণ উমেশচন্দ্র, তারকনাথ প্রভৃতি মনস্বী ব্যবসায়-জীবিগণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী সাহিত্যিকগণ এমন কি কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই শতাব্দীতেই অভ্যুদিত হইয়াছেন। আবার এই যুগই নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত সমাজ বিপ্লবকারী যুবকদলের আবির্ভাবকাল। তাহাদের প্রসাদে তখন দেশে বহু "তাজ্জব ব্যাপার" অভিনীত হইতে লাগিল। ফল যখন বোঁটা ছাড়িয়া মাটিতে পড়ে, তখন তাহা তাহার সুপক্কতার অনিবার্য্য কারণ বশতঃই পতিত হয়, এবং তাহার সেই স্বাভাবিক যে চরম পরিণতি—তাহা প্রাপ্ত হইয়া সে আপনি ধন্য হয় এবং বিশ্বলোককে তৃপ্তি দ্বারা ধন্য করে। কিন্তু একদিন সহসা এক আকস্মিক ক্ষুধার উদ্রেকে যদি তাহাকে অপরিণত অবস্থায় বৃন্ত হইতে পৃথক করা যায়, তবে তাহার বিনষ্ট স্বাদের কষায় ও তিক্ত রসের দ্বারা ভোক্তাকে পীড়িত করিতে থাকে। ঠিক এইরূপ একটা আকস্মিক আকাঙ্ক্ষাবেগে চঞ্চল হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর অপরিণামদর্শী ইয়ং বেঙ্গল অধঃপতনের নিম্নপথে নামিয়া পড়িতে লাগিল। ভারতের যুগ যুগার্জ্জিত পুণ্য পসরা সুরাস্রোতে নিমজ্জমান হইয়া, তাহার পৌরুষত্ব হরণ করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাহার নির্ব্বাণ নিরাসক্ত হৃদয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষার বীজ অকস্মাৎ শাখা পল্লব মেলিয়া তাহার চিরমুক্ত নভস্তল তমোতিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

উনবিংশ শতাব্দির উক্তরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সংস্কার শক্তির ঘাত প্রতিঘাত সংঘর্ষণে সম্মার্জ্জিত ও অভিজ্ঞ বিচার শক্তিতে জাগরিত বিংশ শতাব্দী যখন ভারতে অভ্যুদিত হইল,

তখন সে গত শতাব্দী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চিত্র তাহার সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইল। পানদোষ এবং তাহার আনুসঙ্গিক ঘৃণিত কুৎসিত পাপ প্রায় এককালীন দূরীভূত, ছাত্রসমাজ চরিত্র-নীতিতে শ্রদ্ধাবান ও নৈতিক সদাচার পালনে উৎসাহান্বিত, বহুবিবাহ, প্রভৃতি বহু সামাজিক কুরীতি সমূলে উচ্ছিন্ন ও অবশিষ্টগুলির বিদলনের চেষ্টা এবং বিলয়োন্মুখ সম্প্রীতির সংরক্ষণের উদ্যম জাগরিত। রামমোহন প্রমুখ ধর্ম্মাত্মাগণের কৃপায় ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম (ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যদিও নয়) পুনর্বিকাশের পথে অগ্রসর, পরমহংসদেব প্রমুখ যুবক-সমাজ প্রতীচ্য দর্শন শাস্ত্র-সমুদ্ভোপিত সংশয়বাদ ও নাস্তিকতায় চড়িত শোচনীয় বিশ্বাসহীনতা হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের সেই নব-সমুত্থিত পতাকা মূলে সম্মিলিত। নূতনত্বের মোহ ও অপরূপত্বের কুহক কাটাইয়া বর্ত্তমান ভারত নিজে কর্ম্মাকর্ম্ম সমূহের ফলাফল নিরূপণে সক্ষম হইয়াছে! সেই অন্ধ অনুকরণ—যাহা শুধু পশ্চিমের দ্বারপ্রান্তে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাস্তূপের ভিতর দিয়া তাহাকে একদিন পঙ্কে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল—তাহা হইতে সে এখন মুক্ত হইয়া স্নান-নির্ম্মল বেশে দাঁড়াইয়াছে! তাহার সম্মুখে আবার তাহার সেই পুণ্য যজ্ঞাগ্নি জ্বলনোন্মুখ, তাহার পরিত্যক্ত উত্তরীয় আবার তাহার স্কন্ধে বিলম্বিত, তাহার ললাট আবার সেই পূজ্য চন্দনের কল্যাণ ললাটিকায় বিভূষিত, তাহার কণ্ঠ আবার সেই দেবতার প্রসাদী ফুলের আশীর্ব্বপূত মাল্যে অলঙ্কৃত!

একাল ও সেকাল। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখে আজকাল একাল ও সেকালের প্রখর সমালোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সময়ে যাহা ছিল, তাহা যে বুদ্ধিহীন বর্ত্তমান ভারত সব খোয়াইয়া বসিয়াছে—তাহা বলিয়া তাঁহারা বিষম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখন দেখা যাক্ তাঁহাদের উক্ত অভিযোগের ভিতর কতটা সত্য নিহিত আছে। কিন্তু একথা কেহ যেন বিস্মৃত না হন যে, এই তুলনায় সমালোচনা আমাদের উদীয়মান এবং বিলীয়মান যুগের মধ্যেই,—যে যুগ আমাদের স্মরণাতীত দিবসের স্বপ্নের মত বহুকাল অস্ত গিয়াছে—সেই একান্তগত অতীতের সহিত নয়।

শোনা যায় যে, আমাদের এই বিলীয়মান যুগে ধর্ম্ম নিষ্ঠার খুব প্রাবল্য ছিল। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যাক্। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর ভারত যখন কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ভাবের আতিশয্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ধর্ম্মচর্চ্চা ও কর্ত্তব্য সাধন সমান ভাবে পরস্পরের সহিত স্খলিত হইয়া পড়ে! এদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম তখন তাহার হরিনামাঙ্কিত পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া বিশ্বময় প্রচার করিয়া দিল যে একবার মাত্র হরিনামে শত জন্মের কলুষ ক্ষালিত হয়। তৎপর জনসাধারণ সে আশ্বাসে শ্রেয় পালনের কঠোরতার দায় হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লইল। পৃথিবীতে যত কিছু নিন্দনীয় বিষয় আছে, যত কিছু বর্জ্জনীয় পাপ আছে—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তির চর্চ্চা চলিতে লাগিল। উন্নত অনুন্নত ধনী নির্ধন জ্ঞানী অজ্ঞানী আপামরসাধারণ তাহাদের জীবনের অকুণ্ঠিত চর্চ্চিত পাপরাশি তুলসীর তলে এবং জাহ্নবীর স্রোতধারায় নিক্ষেপ

করিয়া পরম নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে লাগিল। আমাদের বিলীয়মান যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের এই কর্ম্মবর্জ্জিত ভাবাতিশয্যের তরঙ্গ বিলক্ষণ বহিতেছিল, ধর্ম্মের খাতিরে মনুষ্যত্বের বিরোধী কোনো কার্য্য হইতে বিরত থাকা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা বাহিরে যতই কেন না রক্ষিত হউক্, তখনকার গার্হস্থ্য জীবন প্রবলতম পাপে জড়িত ছিল। শতকরা একজন লোককেও চরিত্র গৌরবে গরীয়ান দেখা যাইত না। দাসপ্রথার তখনো এরূপ আমূল উচ্ছেদ ঘটে নাই। অবস্থাপন্ন প্রত্যেক গৃহেই ক্রীত অথবা পালিত দাস দাসীর বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য ছিল। এই সমস্ত দাসীগণ প্রভুগৃহে দাম্পত্য সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক্ অধিকার করিয়া থাকিত। তাহাদের গর্ভোদ্ভূত সামাজিক ভাবে অস্বীকৃত হীন সন্তানগণকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও পিতাগণ লজ্জাবোধ করিতেন না। যে সমাজে—যে গৃহে—দেবমূর্ত্তির সম্মুখে (তখন প্রত্যেক গৃহেই আড়ম্বরে দেব দেবীর পূজা হইত) এইরূপ পশ্বাচার ও নির্লজ্জতা সর্ব্ব সমক্ষে অভিনীত হইতে পারে, জানি না সেই সমাজে ও সেই গৃহে কয়জন ধর্ম্মের অধিষ্ঠান স্বীকার করিবেন! অথচ ইহা প্রত্যক্ষ, অবিকৃত, অতিশয্য বর্জ্জিত সত্য, এবং সে সত্য স্বীকার করিতে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখিকার হস্তের লেখনী লজ্জার কশাঘাতে নিশ্চল হইয়া আসিতেছে! জননী, জায়া, ভগিনী, দুহিতার সম্মুখে,—পিতা পিতামহ, পিতৃব্য, পুত্র, জামাতার পার্শ্বে, গুরু, পুরোহিত, পণ্ডিত, গ্রামবাসী বেষ্টিত হইয়া মৃত্যুযাত্রী লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ অসঙ্কোচে অকুণ্ঠিত চিত্তে এইরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন,। তখন লজ্জায় অধোমুখ দেবতা কি সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের ধর্ম্মনিষ্ঠা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, হয় ত তাহা না বলিলেই ভাল হইত, কিন্তু হায় রে হতভাগ্য সমালোচকের দায়িত্ব! যেখানে তাহার যাওয়া নিষিদ্ধ, সেখান হইতে তাহার ফিরিয়া আসিবার যো নাই, যেখানে তাহার আঘাত পাইবার সম্ভাবনা, সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার তাহার পথ নাই, যেখানে তাহার উপর অভিশাপ উদ্যত, সেখান হইতে তাহার মস্তক অপসারিত করিবার উপায় নাই! আমরা যখন কোনো জাতিকে কিম্বা কোনো সমাজকে, অথবা কোনো সম্প্রদায়কে বিচার করিতে বসি, তখন অবশ্য আমরা তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিকে লইয়া করি না; ভালই হোক্ আর মন্দই হোক, সেই বিশেষ দিকের বিশেষ সংখ্যার দ্বারা তখন আমাদের বিচার নিষ্পন্ন করিতে হয়, এক্ষেত্রেও যাঁহারা এই অভিযোগের বাহিরে, তাঁহারা আমাদের নমস্য, আমার এই প্রবন্ধের এই পৃষ্ঠাগুলি তাঁহাদের জন্য নয়।

অবশ্য এমন কথা আমরা বলিতে পারি না যে তখনকার সময়ে গার্হস্থ্য জীবন একেবারে সন্নীতি ও সদাচার বর্জ্জিত ছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই যে একটি বৃহৎ কদাচার সমস্ত নীতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ আমরা তাহার দিকে চাহিয়া অনিবার্য্য ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেছি!

বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মেয়েদের অবস্থাও এই সময়ে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার কন্যাগণের সম্বন্ধে যে একান্ত মর্য্যাদানিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, মুসলমান রাজত্বের সময় তাহার এককালীন বিলোপ ঘটিয়াছিল, পরে ঊনবিংশ শতাব্দী যখন সেই বিগ্রহশূন্য পূজামন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আপনার বিলাস ও যথেচ্ছাচারের রঙ্গক্ষেত্র করিয়া লইল, তখন শক্তিহীন ভারতবর্ষ তাহাতে কোনো আপত্তি করিতে পারিল না। এই সময়ে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা হইতে স্বার্থবুদ্ধি সুচতুর চাণক্যের শ্লোক তাহার কাণে পঁহুছিল, এবং স্ত্রীগণের কল্পিত প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির বিভীষিকাগ্রস্ত ভারতবর্ষ তাহার অন্তঃপুরিকাগণের মানসিক শক্তি চালনার পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়া মনোজগৎ হইতে তাহাদের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইল!

আমাদের পিতামহীগণ পতিগৃহের ঘরণী গৃহিণী হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইতেন, তাঁহাদের সহিত প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের জীবন মনের (স্বাভাবিক অনুরাগ ও ঘরকন্না ছাড়া) কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইত না! এমন কি পতি পত্নী পরস্পরকে বার্দ্ধক্যে ছাড়া আর চিনিবার অবকাশ পাইতেন না। স্বামী তাঁহার ইচ্ছা প্রবৃত্তি ও সামাজিক নিয়ম লইয়া যে জীবন যাপন করিতেন, পত্নীর সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এবং পত্নী তাহার রুচি ও সংস্কার লইয়া যেরূপ যদৃচ্ছ ভাবে দিনাতিপাত করিতেন, স্বামী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতে পাইতেন না। দ্বিপ্রহর নিশীথে, পরিবারস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে, নির্ব্বাপিতদীপকক্ষে পত্নী স্বামী-সম্ভাষণে গমন করিতেন, এবং দিবা প্রকাশের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা স্বামীকে চিনিতে পারিতেন না, তখন অবস্থা এরূপ দাঁড়াইত যে স্বামীর পরিবর্ত্তে যদি অপর কেহ শয্যা গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমাদের পরম শুচিশালিনী পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা পিতামহীগণ সহসা সে প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। *

ভাবের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে যতটা গূঢ়ত্বই থাকুক না কেন, মানুষের দ্বিধা গঠিত সংশয়-সঙ্কুল কর্ম্মকঠিন জীবনে ইহা বহু অনর্থপাত করিয়াছে। পতি পত্নী পরস্পরের বিধি সঙ্গত সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "অতিশয় কোনো কর্ম্ম না করিও ভাই।" লজ্জার এই মিথ্যা আতিশয্য তখনকার দাম্পত্য সম্পর্ককে শোচনীয়রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল!

বিলীয়মান যুগের সহিত আমাদের

* অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা আনুমানিক অথবা অতিশয়োক্তি মাত্র, কিন্তু যিনি একথা বলিয়াছিলেন তিনি আত্মজীবন হইতেই বলিয়াছিলেন। অবশ্য আমার সেই পূজনীয়া যদি স্বপ্নেও জানিতে পারিতেন যে তাঁহার সেই গূঢ় দাম্পত্য কাহিনী এরূপভাবে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তবে নিশ্চয়ই এক বর্ণও প্রকাশ করিতেন না।

অন্তঃপুর হইতে আর যে দুইটি বৃহৎ অশুভ বিদায় গ্রহণ করিতেছে, তাহা কলহ-প্রিয়তা ও পরনির্য্যাতনেচ্ছা। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের পিতামহী-গণ উদার সহানুভূতির যেরূপ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান নবীনা ভগিনী-গণ সেরূপ করেন না।

আমাদের বিলীয়মান যুগে কনিষ্ঠাগণ, বিশেষতঃ গৃহবধূ এবং দাসদাসীরা সামান্য অপরাধে বা নিরপরাধে দারুণ লাঞ্ছনা ও তাড়না ভোগ করিয়াছে! ছেলেবেলায় যখন "আঙ্কল টম্‌স ক্যাবিন" পড়ি তখন হতভাগ্য দাসগণের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার চিত্র দেখিয়া কত না অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদেরি নিজেদের ঘরে কি তাহারই মত ভয়াবহ অভিনয় হইয়া যায় নাই! বিধাতার আশীর্ব্বাদে বর্ত্তমান ভারতের তারুণ্যপ্রভাদীপ্ত ললাট হইতে সেই দারুণ কলঙ্ককালিমা অপনোদিত হইয়াছে। তাহার মুখে লুপ্ত মনুষ্যত্বের গৌরবদীপ্তি পুনর্বিভাসিত হইয়া উঠিতেছে!

কলহপ্রিয়তা ও পরনির্য্যাতনেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে অসূয়াবিষ হইতেও আমাদের উদীয়মান যুগ অনেক পরিমাণে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সেকালে সপত্নী ও তাহার গর্ভজাত সন্তান কিরূপ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার সহিত নির্য্যাতিত হইত তাহা অনেকেরই জানা আছে। আমাদের পল্লী প্রচলিত কাহিনীর ভিতর আমরা দেখিতে পাই, বিমাতা সপত্নী-সন্তানের কর্ত্তিত হৃৎপিণ্ডের রক্ত-ধারায় স্নান করিতে চাহিতেছেন। কি ভয়াবহ রাক্ষসী হিংসা এ! ক্রূরতার কি অমানুষিক এ চিত্র! সদাগর বাণিজ্যে যাইবেন, তিনি ময়রা মুদী গোয়ালা প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের প্রচুর ধন দান করিয়া গেলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রকন্যাকে তাহারা অশন বসন যোগাইবে। ঘরে তাহাদের বিমাতা—কি জানি, যদি সে তাহাদের হিংসা করিয়া খাইতে না দেয়! কিন্তু সদাগরের সতর্কতার কোনো ফল ফলিল না, সদাগরের বাণিজ্য তরণী নীলোর্ম্মি চঞ্চল সমুদ্রের পারে অদৃশ্য হইয়া যাইতে না যাইতে হিংসা বিষ-জর্জ্জরা বিমাতা বাড়ী বাড়ী গিয়া সেই সব ধন কাড়িয়া লই-লেন এবং ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পরাইয়া অনাথ বালকবালিকা দুটিকে রৌদ্র-দারুণ মাঠে ছাগল ভেড়া চরাইতে পাঠাইয়া দিলেন। বৈশাখের দীর্ঘ বেলা অনাহারক্লিষ্ট ছেলে-মেয়ে দুটি গাছের ফল খাইয়া ক্ষুন্নিবারণ করিতে লাগিল, বিমাতা সন্ধান লইয়া সে গাছ কাটিয়া দিলেন। কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া তখন তাহাদের জীবনোপায় হইল, বিমাতা সন্ধান লইয়া তাহাও কাড়িয়া লইলেন। সেদিন ক্ষুধায় মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তাহারা ছাগল ভেড়া হারাইয়া ফেলিল এবং অবশেষে প্রহারভয়ে ভীতচিত্তে পিতৃগৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই যে চিত্রটি আমরা দেখিতেছি, ইহা শুধু আমাদের বিশ্বাসশীলা কুমারীগণের প্রেমলাভের পুণ্য কাহিনী নয়, ইহার ভিতরে আমরা আমাদের ইদানীন্তন সমাজের চিত্র দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের এই উদীয়মান যুগে আমাদের সর্ব্বজন-নিন্দিত

মা যশোদা।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

'একেলে মেয়ে'গুলি সপত্নী-সন্তানের প্রতি এরূপ প্রশংসিত স্নেহ-শীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে যে বিলীয়মান শতাব্দী যদি আজ তাহার বিরাম শয্যা হইতে জাগিয়া বর্ত্তমান ভারতের এই অভিনব চিত্রের দিকে চাহিতে সমর্থ হইত তাহা হইলে সে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া যাইত এবং এই নারীমণ্ডলীর অপূর্ব্ব চরিত্র গৌরবে তাহার অন্ধকার মুখ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত!

শ্রীআমোদিনী ঘোষজায়া

কাসিমের মুরগী।

কাসিম ছেলেবেলা থেকেই জানোয়ার পাখী খুব ভালবাসিত। রাস্তায় কুকুর দেখিলে কাসিম তাহার দুই পা ফাঁক করিয়া তাহাকে বুকের উপর চড়াইয়া তাহার মুখে মুখ ঘসিতে থাকিত, ছাগল দেখিলে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পাতা ছিঁড়িয়া খাওয়াইত, রাস্তা দিয়া গরুর পাল চলিয়াছে—কাসিম তাহাদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কাসিমের পাখীরও খুব সখ্ ছিল।

মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও দ্বাদশবর্ষীয় বালক কাসিম মাছমাংস কিছুই খাইত না।

সাঁওতাল পরগণায় মধুবনী গ্রামে কাসিমদের ঘর; কাসিমের ঊর্দ্ধতন তিন-পুরুষ এইখানে বাস করিয়া আসিতেছেন।

ছোট একতলা বাড়ি; বাড়িতে থাকিবার তিনটি মাত্র ঘর, দূরে উঠানের এক কোণে রান্নাঘর, ও বাড়ির বাহিরে পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট একটু কুটরী;—এইখানে ঘরের যত ভাঙা জিনিসপত্তর, কাটকুটা প্রভৃতি থাকিত।

কাসিমের পিতার অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়। সংসারে থাকিবার মধ্যে কাসিম নিজে, তাহার মা, ও কাকা আব্দুল্লা। আব্দুল্লা দেখিতে যেমন লম্বাচওড়া ছিল, তাহার মেজাজটাও তদনুরূপ কড়া ছিল। কাসিম কাকাকে বাঘের মত ভয় করিত;—কাকা একবার হাঁক দিলে আর রক্ষা ছিল না, কাসিম ভয়ে জড়সড় হইয়া কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। আব্দুল্লার চামড়ার ব্যবসার ছিল, তাহাতেই সংসার একপ্রকার সুখেস্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

বিধবার একমাত্র ছেলে—কাসিমের আদরযত্নের আর সীমা ছিল না। লোক থাকিতেও ছেলেকে স্নান করান, খাওয়ান, ছেলের কাপড় কাচা, ছেলের প্লেটটি গেলাসটি মাজা বিধবা নিজ হাতেই সব করিত। ছেলে মাছমাংস খাইত না, বিধবা ছেলের জন্ম নিত্য-নূতন কতরকমের চাটনি আচার তৈয়ারি করিত তাহার আর ঠিক ছিল না। সমস্ত দিনই ছেলের কাজ লইয়াই ব্যস্ত। বিধবার নিজের কিছুই ছিল না—সংসার-খরচের পয়সা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে ছেলের সখের সামগ্রী এটা-ওটা কিনিয়া দিত।

এইরূপে দিন যায়। একদিন এক সাঁওতাল দুধের মত ধবধবে শাদা তিনটি

মুরগী লইয়া কাসিমদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। কাসিম তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কি সুন্দর মুরগী মা! কি সুন্দর! আমাকে কিনে দাও, আমি পুষ্‌ব। আমার কাছে ছ'আনা পয়সা আছে, আর চার আনা দিলেই হবে। দাও মা কিনে!"

মা বলিল, "তোর আর পয়সা দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি।"—ছ' আনা পয়সা দিয়া মা তিনটি মুরগী কিনিয়া দিল। কাসিমের আর আনন্দ ধরে না।

ছোট কুটরীটি পরিষ্কার করিয়া কাসিম তাহাতে মুরগীদের থাকিবার স্থান ঠিক করিল;—মেজেয় খড় বিছাইয়া দিল, একটা ভাঙা প্লেটে চারটি চাল রাখিল, একটি ছোট গামলায় জল রাখিয়া দিল। স্থানাভাববশতঃ অপরিষ্কারের ভয়েও আব্‌দুল্লা এপর্য্যন্ত বাড়িতে কখনও মুরগী পোষেন নাই। বালক কাসিম সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া লইল।

ইহার পর কাসিমের আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল। ভোর হইতে না হইতে মুরগীরা যখন কোঁকোর—কোঁ—কোঁ করিয়া ডাকিয়া ওঠে, কাসিম আর বিছানায় থাকিতে পারে না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুটরীর দরজা খুলিয়া মুরগীদের বাহির করিয়া দেয়, মাটিতে ধান ছড়াইয়া দেয়, তাহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, কাসিম একমনে তাহাই দেখে; কোনটা বা একটু দূরে চলিয়া যায়, কাসিম তাড়াইয়া লইয়া আসে,—কোনটা বা চালের উপর গিয়া ওঠে, কাসিম নানা উপায়ে তাহাকে নামাইয়া দেয়; প্রাতে পড়া শেষ হইতে না হইতে কাসিম বই ফেলিয়া মুরগীদের দেখিয়া আসে, স্কুলে যাইবার সময় একবার দেখে, স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের খোঁজ লয়, সন্ধ্যার পর মাঠ হইতে খেলা শেষ করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঘরবন্ধ করে।

একদিন আব্‌দুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া কহিল, "কাসিম, মুরগী পুষেচিস্‌?"

কাসিম ভয়ে ভয়ে কহিল, "হাঁ।"

আব্‌দুল্লা কহিল, "যদি ঘর অপরিষ্কার হয় তো দেখ্‌বি!"

কাসিম আস্তে আস্তে কহিল, "না কাকা।"

আব্‌দুল্লা আর কোন কথা বলিলেন না। কাসিম সে দিন এত সহজে অব্যাহতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

২

একমাস কাটিয়া গেল। কাসিম রোজই সাগ্রহে মুরগীর ডিমের প্রতীক্ষা করে।

সে দিন সন্ধ্যাকালে কাসিমের মা পাশের বাড়ি গিয়াছিলেন। কাসিম অন্যান্য দিনের ন্যায় মাঠ হইতে ফিরিয়া মুরগীদের ঘরবন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, একটি মুরগী নাই। গাছের ঝোপ্‌ঝাপ্‌ পাঁচিলের আশপাশ, কুয়োর ধার কাসিম তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কোথাও পাইল না; উঠানে একবার দেখিল, সেখানেও নাই। অবশিষ্ট মুরগী দুইটিকে ঘরে বন্ধ করিয়া কাসিম হতাশমনে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল; হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় কাসিম যাহা দেখিল তাহাতে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, আস্তে আস্তে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

মা আসিয়া কাসিমকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "কাসিম, বাবা, এ'র মধ্যে শুয়ে কেন? অসুখ ক'রেচে না কি?"

কাসিম কোন উত্তর দিল না।

মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েচে বল্ না বাবা,—মাথা ব্যথা ক'রচে?"

কাসিম কোন কথা কহিল না।

মা তখন বিছানার উপর উঠিয়া ছেলের মাথা কোলের উপর টানিয়া লইয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "বল্ না বাবা, কি হয়েচে,—লক্ষ্মীটি?"

কাসিম আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি এত করে' মুরগী পুষ্‌লুম—কাকা আমার একটা মুরগী কেটে রান্না করচে—মা, আমি এত করে' পুষলুম।"

মা'র চোখে জল আসিল, কোনমতে রোধ করিয়া ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা কহিলেন, "এতে এত কান্না! ছিঃ কাসিম, কাঁদিস্‌নে, চুপ্ কর্, আমি কালই তোকে আর চারটে মুরগী কিনে দেব।"

কাসিম কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "না, আমি আর মুরগী পুষ্‌ব না।"

সে রাত্রে কাসিম কিছু খাইল না—তাহার ভাল ঘুম হইল না।

ভোর হইতে না হইতে কাসিম উঠিয়া দরজা খুলিয়া মুরগী দুইটিকে বাহির করিয়া দুইহাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রাস্তা দিয়া ছুটিতে লাগিল। তখন ভয়ানক দুর্য্যোগ, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসে জলের ঝাপ্‌টায় গাছের মাথা নুইয়া পড়িতেছে; পথ জনশূন্য। কাসিম দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রায় একমাইল দূরে তাহার এক সমপাঠী হিন্দু বন্ধুর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহির হইতে কাসিম ডাকিল, "জীবন, ঘরে আছিস্?"

কাসিমের সমবয়স্ক একটি বালক বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "কি রে, এত বৃষ্টিতে?"

কাসিম কহিল, "এই মুরগী দু'টি ভাই তোকে দিতে এনুম, পুষিস্; যত্ন করিস্ কিন্তু।"

জীবন কাসিমকে ঘরে আসিতে বলিল। কাসিম কহিল, "না ভাই, আমাকে এখনি ফিরতে হবে, কাকা টের পেলে আর রক্ষে রাখ্‌বে না।"

কাসিম ফিরিয়া আসিয়া মাকে চুপিচুপি সমস্ত কথা জানাইল, কহিল, "মা, কাকা যেন টের না পায়।"

কিন্তু মুরগীর ডাক শুনিতে না পাইয়া, কাসিমকেও আর কুটুরীর দিকে যাইতে না দেখিয়া আব্‌দুল্লার মনে সন্দেহ হইল। সেই দিন অপরাহ্নে আব্‌দুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া কহিলেন, "কাসিম, মুরগীগুলো গেল কোথায়?"

কাসিম চুপ করিয়া রহিল।

"বল্ কোথায় গেল,—শেয়ালে খেল' না কি?"

কাসিম ভয়ে ভয়ে কহিল, "জানিনে কাকা, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"—বলিতে কাসিমের একটু গলা কাঁপিল।

"ঠিক্ বলচিস্ ত? দেখিস্!"—বলিয়া আব্‌দুল্লা কাসিমকে বিদায় দিলেন।

৩

পরদিন প্রাতে আব্‌দুল্লা বাহিরে ঘরের

উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। গতরাত্রে খাদনের টাকা লইয়া কোন এক কর্ম্মচারীর পলায়নসম্বাদে তাঁহার মেজাজ্‌টা বড়ই খারাপ ছিল;—মুহুর্মুহু ধূম-উদ্গীরণে চিন্তাতরীকে কোন একটা কূল-কিনারায় লইয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন।

এমন সময়ে কাসিমের বন্ধু জীবন একটি খাঁচা করিয়া দুইটি মুরগী লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আব্‌দুল্লা বালকের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ও কি! কা'র মুরগী?"

বালক কহিল, "কাসিম এই মুরগী দু'টো আমাদের বাড়ি রেখে এসেছিল। বাবা কোনমতেই রাখ্‌তে দিলে না, তাই ফেরৎ দিতে এসেছি।"

আব্‌দুল্লা ডাকিলেন, "কাসিম!"

"কাকা!" বলিয়া কাসিম ঘরের বাহির হইয়া আসিল। জীবন ও তাহার সঙ্গে মুরগী দুইটি দেখিয়া কাসিমের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

আব্‌দুল্লা কহিলেন, "এ কি!"

কাসিম ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল।

আব্‌দুল্লা কহিলেন, "আচ্ছা! যাঃ এখন রেখে দে—আমি দেখ্‌চি!"

কাসিম কাঁদিতে কাঁদিতে মুরগী দুইটি লইয়া কুটরীতে রাখিয়া আসিল; প্লেটের শুক্‌নো চাল ফেলিয়া আবার ভাল চাল রাখিল, গামলার বাসি জল ফেলিয়া দিয়া আবার টাট্‌কা জল রাখিয়া দিল।

সমস্ত দিন কাসিম একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; স্কুলে গিয়া পড়া বলিতে না পারিয়া মার খাইল; সে দিন কাসিম মাঠে আর খেলা করিতে গেল না।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন্‌ সময়ে আব্‌দুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া তাহার মুরগী দুইটি আনিতে বলিলেন। কাসিম মুরগী দুইটি লইয়া ভয়ে ভয়ে কাকার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। আব্‌দুল্লা কাসিমের হাত হইতে মুরগী দুইটি লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। কাসিমও সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকিল।

আব্‌দুল্লা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটি মুরগীকে ছাড়িয়া দিল—সে উড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে কাসিমের বুকের উপর গিয়া ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিল; কাসিম তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

আব্‌দুল্লা তখন উনানের পাশ হইতে ছুরি তুলিয়া লইল,—কাসিম চীৎকার করিতে লাগিল, "মেরো না কাকা, মেরো না! আমার পোষা মুরগী! দু'টি পায়ে ধরি! আমাকে মারো কাকা,—আমি তোমার পায়ে ধরি, মেরো না!"—

সে চীৎকার আব্‌দুল্লার পাষাণ-বক্ষ ভেদ করিতে পারিল না। "ফের মিথ্যেকথা বল্‌বি, বল্‌!"—বলিতে বলিতে আব্‌দুল্লা হাতের মুরগীটিকে চাপিয়া ধরিল, ছুরি উঠাইল,—মুহূর্ত্তে পক্ষীর অর্দ্ধছিন্ন কণ্ঠ ঝুলিয়া পড়িল,—ঝর্‌ঝর্‌ঝর্‌ রক্ত ঝরিতে লাগিল।

আব্‌দুল্লা যখন কাসিমের হাত হইতে আর একটি মুরগী লইতে গেল, তখন কাসিম "মাগো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

আব্‌দুল্লা দরজা খুলিয়া দিল।

কাসিমের মা তখন কুয়োর ধার হইতে

কাপড় কাঁচিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন,—কাসিমের চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া মুচ্ছিত ছেলেকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া "কাসিম! বাবা কাসিম!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবদুল্লা অনেক কষ্টে তাঁহাকে উঠাইয়া কাসিমকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দিল।

আবদুল্লা যখন নানা উপায়ে কাসিমের চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাসিমের মুরগীটি আসিয়া ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল;—তাহার আর ভয় নাই, সে আবদুল্লার গায়ের উপর দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কাসিমের হাতে পায়ে গায়ে মাথায় ঠোঁট ঘসিতে লাগিল—তাহার বুকের উপর গিয়া বসিয়া রহিল।

জ্ঞান হইয়া কাসিম বলিয়া উঠিল, "আমার মুরগী!"

মা কহিলেন, "এই যে বাবা, এইখানে!"—আবদুল্লাও তাড়াতাড়ি মুরগীটিকে কাসিমের হাতের কাছে সরাইয়া দিল।

কাসিম মুরগীকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত রাত তাহাকে বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া রহিল।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চারিটি উপমা।

হাসিহীন মুখ যেন চন্দ্রহীন নিশার মতন,
স্নেহহীন প্রাণ যেন মৌন-মূক কারার ভবন,
অশ্রুহীন আঁখি যেন বৃষ্টিহীন সুচির নিদাঘ,
দীর্ঘশ্বাসশূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।

শ্রীকালিদাস রায়

আবির্ভূতা

মোর স্বপ্নলোক হ'তে কোন পথ ধরি
কেমনে আসিলে হেথা, ওগো মায়াবিনী,
হে মোর যৌবন-স্বপ্ন-স্বর্গ বিলাসিনী,
মনঃসজা চিত্তলক্ষ্মী, হে সুরসুন্দরী,
চক্ষে আসি দিলে দেখা? ধ্যান-নিমীলিত
আঁখি মোর বিম্বোপরি ফেলি যবনিকা,
নিভৃত আঁধার রচি' একান্তে হেরিত,
শুভ্রস্নিগ্ধ দীপ্তি তব,—জ্যোতির্ময়ী শিখা
স্বর্ণ দীপ মুখে যথা মন্দির তিমিরে!
মর্মের মুকুর মাঝে মৌনমূর্ত্তিখানি
ছিল ছায়া মায়া শুধু, আজি সশরীরে
চক্ষে বক্ষে দিলে ধরা। সোহাগের বাণী
শুনি কানে, ঘ্রাণে পাই সৌরভ দেহের,
অঙ্কের অঙ্কিনী হ'লে দেবী অন্তরের।

শ্রীহরেশ্বর শর্ম্মা।

জাপানে স্নানাগার।

আমরা গত বৈশাখের ভারতীতে আমেরিকার গ্রীষ্মাবকাশ প্রবন্ধে সুসভ্য আমেরিকাবাসীর স্নানের রীতিনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। উহাতে দেখিয়াছি—"গা খুলিয়া কলের নীচে বসিয়া স্নান করা দেশের রীতি ও আইন বিরুদ্ধ,—অথচ মজা এই স্নানাগারে বা নদীতে কিম্বা ঝরণাতলে সকলে একত্র উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করা দোষের নহে; কলেজে, ব্যায়াম মন্দিরে কলের জলের ঝরণার নীচে সকলে একত্র উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিয়া থাকে। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা। প্রত্যেক মেয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্নানাগার আছে, মেয়েরা কেহই ছেলেদের মত একসঙ্গে স্নান করে না।"

শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়ের লিখিত তাঁহার ব্রাউইন ঘাট বিবরণীতে ইংরাজ নরনারীর সমুদ্র স্নানের বিষয়ও কিঞ্চিৎ অবগত আছি। কিন্তু আজ নূতন সুসভ্য জাপানীগণ এই বিষয়ে সভ্যতায় ইউরোপ আমেরিকাকেও পরাস্ত করিয়াছে।

জাপানে গিয়া প্রথম ছয়মাস আমরা কতকগুলি ভারতবাসী ছাত্র একসঙ্গে একটি মেসে বাস করিতাম। তখন আমাদের ইচ্ছানুরূপ স্নানাগারের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইত। আমাদের বাড়ীর ক্ষুদ্র স্নানাগারে ঢুকিয়া একে একে সকলে স্নান করিয়া আসিতাম। জাপানী পাব্লিক-স্নানাগারের কথা শুনিলে তখনও লজ্জা ও ঘৃণা মিশ্রিত একটা ভাবে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। দুই এক জন নূতন অভিজ্ঞতার জন্য কখন কখন পাব্লিক স্নানাগারে যাইতেন।

ছয়মাস পরে আমি অপর এক বন্ধুর সহিত জাপানের উত্তর অঞ্চলের কৃষিকলেজে প্রবেশ লাভ করিলাম। সে সহরে কেবল মাত্র আমরা দুইজন ভারতবাসী! কাজেই মেস্ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আমরা কলেজ বোর্ডিংয়ে ঢুকিলাম। জনৈক অধ্যাপক আমাদিগকে বোর্ডিংয়ের আফিস্, লাইব্রেরী, ছাত্রদের প্রাইভেট ঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি দেখাইয়া স্নানাগারে লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়াই আমরা উভয়ে অবাক। অন্যূন ১৫।২০ জন ছাত্র উলঙ্গ হইয়া গল্প গুজবে স্নান করিতেছিলেন! অধ্যাপকমহাশয়কে দেখিয়া কেহ একটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচের ভাবও দেখাইলেন না, বরং তাঁহার সহিত কাহারও কাহারও কিছু কিছু কথাবার্ত্তাও চলিল।

আমরা রাজধানী হইতে তিন চারি দিন রেলে এবং জাহাজে চলিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম; কাযেই স্নান করা নেহাৎ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ স্নানাগারের যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে আর স্নানের প্রবৃত্তি রহিল না। ১৫ দিন মাথা ধুইয়া ভিজে তোয়ালে দিয়া শরীর রগড়াইয়া কাটাইলাম। প্রতিদিন যাহাদের

স্নানের অভ্যাস, তাহারা এভাবে আর কত দিন কাটাইতে পারে? তাই আমরা দুজনে কয়েকদিন পরামর্শের পর সাহসে ভর করিয়া একখানা বড় তোয়ালে পরিধান করিয়া এবং অপর কয়েকখানা স্কন্ধে রাখিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে স্নানাগারে ঢুকিলাম। যেই ভিতরে প্রবেশ অমনি চারিদিকে হাসির রোল আরম্ভ হইল।

অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন ইউরোপ আমেরিকাতেও কি এইরূপ? এরূপ করার তাৎপর্য কি? * * * ইত্যাদি। কেহ কেহ তাড়াতাড়ি স্নান সমাধা করিয়া ঘরে ফিরিয়াই বোর্ডিংয়ের আর আর ছেলের নিকট সংবাদ দিলেন, তাঁহারা দৌড়িয়া স্নান করিতে গিয়া আমাদিগকে দেখিয়া লইলেন। প্রথম ৩।৪ দিন আমাদের স্নানের সময় স্নানাগারে বড় ভিড় হইত। আমাদের বোর্ডিংয়ের স্নানের জল ইঞ্জিনে গরম করা হইত। দুই তিন মাস পরে হঠাৎ ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় পুনরায় নূতন বিপদে পড়িলাম। কতদিনে যে ইঞ্জিন পুনরায় দুরস্ত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারিল না। বোর্ডিং আপিস হইতে সকলকে পাব্লিক স্নানাগারে যাইতে প্রতিদিন এক একখানা টিকেট দেওয়া হইল। আমরা দুইজনে পুনর্বার সংক্ষেপে মাথা ধুইয়া পূর্বের ন্যায় কয়েকদিন কাটাইলাম। দীর্ঘকাল অস্নাত অবস্থায় থাকিলে ব্যারাম পীড়া হইবার সম্ভাবনা এই ভয়ে কয়েক দিবস পরে অগত্যা পাব্লিক স্নানাগারে যাইতেই বাধ্য হইলাম। এইবার ভীষণ পরীক্ষা।

পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষা মন্দিরের বিবরণ জানিতে হয়ত পাঠকগণের কৌতূহল জন্মিতে পারে। সহরের স্থানে স্থানে দুই তিন রাস্তার সঙ্গমস্থলের নিকটেই এক একটি পাব্লিক স্নানাগার। স্নানাগারের দুইটি দরজা, একটী স্ত্রীলোকের জন্য এবং একটি পুরুষের জন্য। দুই দরজার মাঝখানে কেবলমাত্র স্নানাগারের মালিক কিম্বা তাহার পত্নী অথবা তাহাদের নিয়োজিত জনৈক ব্যক্তির উপবেশনোপযোগী উচ্চ স্থান। আগন্তুকের অভ্যর্থনা করা তাহাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং নির্দ্দিষ্ট হারে তাহাদের নিকট হইতে খরচ আদায় করা উক্ত উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রধান কার্য। ঘরে ঢুকিলেই দুই ধারে দুইটি প্রকোষ্ঠ—একটি স্ত্রীলোকদের অপরটি পুরুষদের বস্ত্রত্যাগের জন্য। মাঝখানে কাগজ কিংবা কাষ্ঠের দেওয়াল, এই দুই প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে কয়েকখানা দর্পণ ঝুলান আছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই ১৫।২০টি বাঁশ কিম্বা বেত নির্ম্মিত ডালা রহিয়াছে। এই দুই প্রকোষ্ঠের অব্যবহিত পাশের দুই প্রকোষ্ঠেই স্নানের জন্য গরম এবং ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চা, কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছোট ছোট গামলা প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহার একটি প্রকোষ্ঠ স্ত্রীলোকদের এবং অপরটি পুরুষদের। এই সকল স্নানাগার কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা কোম্পানী বিশেষের। বড় বড় স্নানাগারে অয়েল অথবা ষ্টিম ইঞ্জিনে এবং ছোট স্নানাগারে কয়লার সাহায্যে জল গরম করা হয়। নিজ নিজ কাপড় এক একটি ডালায় রাখিয়া স্নানার্থীগণ সকলেই উলঙ্গ হয় এবং

তারপর ছোট ছোট এক একখানা নয়ানসুকের গামছা ও সাবানের বাক্স লইয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করে।

আমরা অগত্যা উভয়ে অন্যান্য ছেলেদের সহিত মিলিয়া একদিন পাবলিক স্নানাগারে ঢুকিলাম। এ যাত্রায় কোনরকমে আলগা আলগা ভাবে তোয়ালে দ্বারা শরীর ঢাকিয়া অন্যান্যের ন্যায় কাপড়চোপড় ছাড়িয়া স্নানাগারে ঢুকিলাম। সেখানে অনেক অপরিচিত ভদ্র অভদ্রের সহিত একই স্নানাগারে স্নান করিতে হইল। আমাদের যেমন নীচ জাতীয় ব্যক্তির ছায়া শরীরে লাগিলেও স্নান করিতে হয় সেখানে তেমন নহে। এক সঙ্গে একই চৌবাচ্চায় ঢুকিয়া প্রভু, ভৃত্য, ধোপা, নাপিত, চামার, মেথর, হাকিম, বারিষ্টার, শিক্ষক, ছাত্র, লর্ড প্রভৃতি অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতেছেন। স্নানাগারে ঢুকিয়াই প্রত্যেকে এক একটি কাঠের গামলা হাতে লইলাম। জলে শরীর ধুইয়া গরমজলের চৌবাচ্চায় ঢুকিলাম। সে ফুটন্ত জল প্রথম প্রথম আমাদের নিকট নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত। ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিলাম। চৌবাচ্চার ভিতর ১০।১২ জন উলঙ্গ ব্যক্তি গা ডুবাইয়া প্রায় ১০ মিনিট কাল বসিয়া থাকে। তারপর চৌবাচ্চা হইতে উঠিয়া এক এক জন এক এক জায়গায় বসিয়া সাবান ব্যবহার করিতে থাকে কোন কোন জায়গায় গাত্রমার্জ্জনার জন্য চাকর চাকরাণীও ভাড়া করিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যুবতী মেয়েরা সাবান এবং তোয়ালের সাহায্যে উলঙ্গ পুরুষদের শরীর পরিষ্কার করিয়া দিতেছে, আবার শুনিতাম কোন কোন স্নানাগারে পুরুষ চাকরগণও উলঙ্গ মেয়েদের শরীর পরিষ্কার করিয়া দেয়। শরীর পরিষ্কার করার পর ভাল জলে গা সুন্দররূপে ধৌত করিয়া পুনরায় গরমজলের চৌবাচ্চায় কতক্ষণ শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকে। তারপর চৌবাচ্চার বাহিরে আসিয়া ঠাণ্ডা জলে কিম্বা ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশাইয়া তাহাতে মাথা এবং শরীর প্রক্ষালণ করার পর গামোছা দ্বারা বেশ করিয়া শরীর রগড়াইয়া ফেলে। তারপর পরিচ্ছদের ঘরে আইসে। অনেকক্ষণ গরম জলে থাকার দরুণ স্নানের অব্যবহিত পরে উহাদের শরীরের রং অনেকটা আপেলের ন্যায় লাল হয়। পরিচ্ছদের ঘরে আসিয়া উলঙ্গ অবস্থায় আয়না চিরুণীতে কেশ বিন্যাস করে। পুরুষের ঘরে পুরুষগণ এবং স্ত্রীলোকের ঘরে স্ত্রীলোকগণ একই ভাবে বেশ বিন্যাস করে। আমরা যে স্নানাগারে গিয়াছিলাম তথাকার দুই পরিচ্ছদ-প্রকোষ্ঠের ভিতর যে দেওয়ালের উল্লেখ করিয়াছি—তাহার উচ্চতা ৩।৪ ফুটের অধিক নহে। সামনাসামনি তাকাইলে কাহারও কোন দৃশ্য দেখিতে বাকী থাকে না, আর যাহারা সামনাসামনি তাকাইতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করে তাহারা দুই প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ঝুলান আয়নার প্রতিফলিত চিত্রেই ঘরের সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া লয়। পরিধেয় গ্রহণ করার পর সকলে দরজার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট খবর দিয়া চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি ধন্যবাদ প্রদানান্তর পুনরায় তাহাদিগকে স্নানাগারে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দেয়। গ্রাহকগণও ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া যায়। অনেকেই দিনের বেলায় কায কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, তাই সন্ধ্যাবেলায়

স্নান করিতে অবকাশ পায়। সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত স্নানাগারে খুব ভিড় হয়। স্নানের পর পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলে এদিকে ওদিকে কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে আর প্রণয়ীর দল পার্কে, নদীর ধারে অথবা সমুদ্রতীরে হাওয়া খাইতে বাহির হয়। কেহ কেহ কেহ বা থিয়েটারে চলিয়া যায়। গরমের দিনে অধিকাংশ স্নানাগারের প্রবেশ দ্বারেই কেবল একখানা মাত্র বাতাসে দোদুল্যমান কাপড়ের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। অনেক সময় চলিবার পথেই স্নানাগারের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য রাস্তার লোকজনের দৃষ্টিগোচর হয়।

অধিকাংশ বড় সহরের স্নানাগার প্রায়ই উল্লিখিত ধরণের। তবে কোনও কোনও সহরে প্রাচীন ধরণের স্নানাগারও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ধরণে স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে একই স্নানাগারে উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিয়া থাকে। আওমেরি নামক একটি প্রকাণ্ড সহরেও এই পদ্ধতি দেখিয়াছি। দশ বার ফুট লম্বা এবং পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ চৌবাচ্চার ভিতর ১২।১৪ জন নগ্ন স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে ঢুকিয়া পড়ে। অধিকাংশ গরীব গ্রামে স্ত্রীপুরুষের জন্য মাত্র এইরূপ একটি স্নানাগারই দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্যে আমাদের সর্ব্বশরীর দুর্ব্বা‌নল্জ্জায় শিহরিয়া উঠিত। মনে মনে এই সভ্যতাকে চূড়ান্ত অসভ্যতার মূলাভিষিক্ত করিয়া শত ধিক্কার দিতাম।

গরম জল ভিন্ন ঠাণ্ডা জলে স্নান করা শীতপ্রধান দেশে একপ্রকার অসম্ভব। বাড়ীতে একটি স্নানাগার করিতে অনেক খরচ। যে সকল মধ্যবিত্ত পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে একটি করিয়া স্নানাগার আছে। বলা বাহুল্য সে স্নানাগারেও পিতা মাতা ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলে এক সঙ্গে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতে একটুকুও লজ্জা বোধ করে না। এ সকল দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিকই সৃষ্টির প্রথম অবস্থার কথা মনে হয়।

তোকিও সহরের প্রাইভেট বোর্ডিং হাউসেও একবছর ছিলাম। সেখানেও একই ভাব। সেখানে আমি একমাত্র ভারতবাসী ছিলাম। আমি তোয়ালে পরিয়াই অন্যান্য বন্ধুদের সহিত স্নানাগারে ঢুকিতাম। কখন কখন চাকরাণীগুলি আসিয়া ছাত্রদিগের শরীর পরিষ্কার করিয়া দিত। বস্ত্রপরিহিত বলিয়া অনেক সময় স্নানাগারে বন্ধুগণ আমাকে বিদ্রূপ করিত। তাই প্রায়ই আমি সর্ব্বাগ্রে অথবা সর্ব্বশেষে একাকী স্নান করিতে প্রয়াস পাইতাম। উঁহাদের কেহ কেহ নীচের তলায় স্নান করিয়া কতঘর অতিক্রম করিয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই উপরের নিজ নিজ ঘরে চলিয়া যাইত।

কোন কোন চিত্রশালায় স্নানাগারের আভ্যন্তরীণ চিত্র গোপনে গোপনে বিক্রীত হইয়া থাকে। শুনিতে পাই প্রকাশ্যে ঐরূপ চিত্রের বিক্রয় নাকি আইনবিরুদ্ধ। চারি বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বৈদেশিক ভদ্রমহিলা ক্যামেরার সাহায্যে জাপানের উত্তর প্রদেশের এক স্নানাগারের আভ্যন্তরীণ চিত্র লইতে উপক্রম করেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই উঁহাদের ফোটো লওয়া হইবে

বলিয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই বেশ একটু কায়দায় সহিত দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় একজন বিশিষ্ট মহিলার উহাতে আপত্তি থাকায় তিনি আর দুই এক জন স্ত্রীলোকের সহিত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই নিকটবর্ত্তী পুলিশ বক্সে খবর পাঠান, অবিলম্বে একজন পুলিশ আসিয়া মেম সাহেবকে থানায় লইয়া যায়। কোর্টের বিচারে ক্যামেরা এবং নেগেটিভ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। কোন কোন গরীব পল্লীতে অনেক সময় খোলা যায়গাতেও স্ত্রী পুরুষকে উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিতে দেখা যায়।

সমুদ্রে এবং উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান আজ কাল একটা বিশেষ ফ্যাশানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। গরমের দিনে যুবক যুবতী, ছেলে বুড়ো অনেকে দশ পাঁচ দিনের জন্য সমুদ্র তীরে বাস করিতে যান। এ দৃশ্যে অনেকটা তর্কীর ব্রাইটন ঘাটের কথা মনে পড়ে। সমুদ্র তীরে যে সকল জায়গায় প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম তথায় স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য সুন্দর সুন্দর হোটেল রহিয়াছে। স্নানার্থীগণ হোটেলে অবস্থান করে। প্রাতে ৬টা ৭টার মধ্যে প্রাতর্ভোজন সমাপন করিয়া একঘণ্টা বিশ্রাম করার পর তাহারা সমুদ্রে নামে। পুরুষগণ ল্যাঙ্গট ও ক্ষুদ্র জামা এবং মেয়েরা জাঙ্গিয়া গেঞ্জি পরিধান করে। অনেকক্ষণ রৌদ্রে বাহিরে থাকিতে হয় তাই দুই তিন পয়সা মূল্যের এক একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত টুপি ঐ কয়েক দিনের জন্য কিনিয়া লয়। সন্তরণাদি নানারূপ জলক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তীরে উঠিয়া কতক্ষণ বালিতে গড়াগড়ি দিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়। আবার জলে নামিয়া পড়ে। এইরূপে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য হোটেলে ফেরে। ভোজনের পর সতরঞ্চ জাতীয় কোন খেলা কিম্বা তাসখেলায় কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া পুনরায় ৪টায়

জাপমহিলার সমুদ্র স্নান।

সময় সমুদ্রে নামে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সন্তরণাদি রীতিমত চলে। তারপর হোটেলে ফিরিয়া আইসে। এইভাবে কয়েক দিন সমুদ্রতীরবাস সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এরূপ সভ্যতা আমাদের নিকট অসভ্যতা বলিয়াই মনে হয়। চীন-বাসীরাও এ অভিনব দৃশ্যে অবাক হয়।

আমি যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি আমার ক্যাবিনে দুটি ইংরাজ পুরুষ ছিলেন। একজন বয়সে কতকটা প্রাচীন। তিনি লঙ্কাদ্বীপে কয়েক বৎসর চা বাগানে চাকুরী করিয়া যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার তাহা করিয়াছেন। তিনি একজন রসিক পুরুষ এবং ভারতবাসীর নিন্দাবাদে তিনি পঞ্চমুখ। কুৎসিতপীড়াবশতঃ তাঁহার এক হাত ও এক পা বিকল। লাঠিভর করিয়া তিনি চলিতেন এবং সময় সময় তাঁহার যৌবনের অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া উঠিতেন। অনেক গরীব ভারত সন্তান তিন চারি হাত কাপড়ে অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র আবৃত করে এই বলিয়া ভারতবাসীকে অসভ্য বর্ব্বর বলিতে বড় আমোদ বোধ করিতেন। অপর ব্যক্তি তাঁহার উল্‌টা—তিনি অতি ভদ্র যুবক। পড়া-শুনা শেষ করিয়া তিনি ভূপ্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন। জাপান চীন এবং সিঙাপুরে তিনি যাহা কিছু ভাল দেখিতেন তাহারই

সন্তরণপ্রয়াসী বালক বালিকাগণ।

বিস্তর প্রশংসা করিতেন। তাঁহার শিষ্টাচারে আমি নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম। তিনি কয়েক-দিন কলম্বো সহরে অবস্থান করিয়া ভারত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমরা তিন জনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাকে ভারতের জাহাজ লইতে হইল। যুবকটির একটি অভ্যাস পুনঃ পুনঃ জাপানের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। স্নানাগার ৬০।৭০ ফুট দূর হইলেও কামরার ভিতরেই তিনি উলঙ্গ হইতেন এবং তোয়ালে হাতে সেই অবস্থাতেই কত আরোহীকে অতিক্রম করিয়া স্নানাগারে চলিয়া যাইতেন! অনেক দিন গল্প করিতে করিতে স্নানে যাইতে প্রস্তুত হইতেন। সে গল্প শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হয়ত আধ ঘণ্টা নগ্ন দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত গল্প চালাইতেন! তথাপি তাঁহারা সুসভ্য আর আমাদের গরীবেরা ছোট কাপড়ে শরীর আবৃত করে অতএব আমরা অসভ্য বর্ব্বর!

শ্রীযদুনাথ সরকার।

রাজকন্যা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তঃপুরে রাণীর চারি জন সখী—
লতা, পাতা, ফুল, রেণু।

লতা। পাতা ভাই, এক দণ্ড আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই।

পাতা। চল ভাই আমরা রাজকুমারীর কাছে যাই—সেখানে প্রতারণা নেই, বিশ্বাস-ঘাতকতা নেই; কেবল স্নেহ প্রীতি ন্যায় সুবিচার।

ফুল। ঠিক বলেছিস ভাই; এখানে এই ঐশ্বর্য্য সম্পদের মধ্যেও হাহাকার—!

রেণু। কখন কি ব'লে বিষ নজরে পড়ব—সেই ভয়েই অস্থির।

লতা। এ মিথ্যা জীবন আর সহ্য হয় না—!

পাতা। চল ভাই আমরা রাজকন্যার কাছে যাই।

(আলো ছায়ার প্রবেশ—)

আ। তোরা যে ক্ষেপলি দেখছি! আমাদের ত সুখের অভাব নেই—অত ন্যায়-অন্যায় পীড়ন—সমালোচনার দরকার কি ভাই আমাদের!

লতা। হ্যাঁ সুখ! গরীবদুঃখীর কান্না শোনাটা খুবই সুখ বটে!

পাতা। তোরা শুনতে পারিস্ শোন।

ফুল। যাকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে তাকে রোজ চার বেলা মুখে ভালবাসা দেখান নিশ্চয়ই মহা সুখ!

রেণু। আর ত পারা যায় না!

আলো। তাতে হয়েছে কি—দুট মিষ্ট কুটো বলে যদি কাজ আদায় হয় তাতে কুণ্ঠিত হওয়াইত মূঢ়তা।

লতা। তা যাই বল ভাই—আর কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে।

পাতা। আমিও না—

ফুল। আমিও পারি না—

রেণু—তোরা গেলে কি ভাই আমি একলা থাকব না কি?

ছায়া। তবে যা—সেখানে এক মুঠো খেয়ে যদি বনের মোষ তাড়াতে চাস্ ত যা।

আলো। আমরা ভাই তা পারবও না—যাবও না।

পাতা। হাজার কষ্ট হোক তবু ত সেখানে পাপের কষ্ট নেই।

ছায়া। আরে দেখা যাবে ধর্ম্মগিরি কদিন থাকে—!

আলো। আবার সেই আসতে হবে লো হবে,—এই বলে দিলুম।—এখন অভিনয়ে যাবি কি না বল দেখি?

লতা। না ভাই আমি যাব না। ও সব রঙ্গের গান আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না এখন।

পাতা। আমারো না—।

আলো। কিন্তু বুঝে, দেখ—রাণী কি তাহ'লে রক্ষে রাখবেন?

ছায়া। শেষে ধনে প্রাণে মারা যাবি!

ফুল। তবে ভাই থাক্ আর রাজকন্যার কাছে গিয়ে কাজনেই;—কি বলিস!

রেণু। চল ভাই তবে অভিনয়েই যাওয়া যাক।

লতা।—তা তোরা যে যাবি যা, আমি অভিনয়ে যাব না—আমি রাজকন্যার কাছেই যাই—মরি সেও ভাল।

পাতা। আমারও ভাই অসহ্য হয়েছে—আমিও যাব।—এখন স্বামিটীকে কেবল বাগাতে পারলে হয়। সেই নিরীহ জীবটিকে পর্যান্ত যখন এই নরক চক্রে ঘুরতে দেখি তখন একদণ্ড আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

আচ্ছা। তা তোরা যা হয় কর—আমরা চলুম।

আলোছায়ার প্রস্থান—

লতা। চল ভাই আমরাও রাজকন্যার কাছে যাবার উদ্যোগ করি —।

পাতা। চল ভাই,—আমার আবার স্বামিটিকে বাগাতে হবে।—

প্রস্থান।

(সুসজ্জিত কক্ষ। বিদূষক আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোঁপে চাড়া দিতে দিতে।)

বি। গৃহিণী যা বলে তা কিন্তু ঠিক! রাজার যেন মতিচ্ছন্ন ধরেছে—প্রকাশগুলে আগুন লাগলো—আর রাজা কিনা অন্তঃপুরে প্রমোদমগ্ন! সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয় হয়েছে! রাজকন্যারই আশ্রয় নিতে হোল দেখছি? কিন্তু স্থানটা শুনেছি খুব কঠোর। কেবল চালকলা খেয়ে কি কাটাতে পারব? সেইটাই ভাবছি। তা ব্রাহ্মণীও ত সঙ্গে থাকবে? ভাবনা কি? সে নিশ্চয়ই আমার জন্য মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করবে। ডান চোখটা নাচছে যে!

হাসিটি যেন সত্যই হাসি! তাকে দেখলে ক্ষুধা তৃষ্ণাও থাকবে না আর! গিন্নি তুমি কিন্তু ঠাকরুণ নিজের পায় নিজেই কুড়োল মারছ—আমি এই বলে খালাস! আচ্ছা—সেই আদ্যি যুগ থেকে মেয়েরা দেখছি সমান বোকা! রত্নাবলীকে ঘরে এনে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে তখন কাঁদলে কি আর কেউ চ'খের জল মোছায়! এ শর্ম্মাকে দেখে যে, সে রত্নাবলীটিও মন ঠিক রাখতে পারবে—তাত কিছুতেই মনে হয় না।

(মাথা নীচু করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক)

খুঁতের মধ্যে এই টাকটুকু—তা সহজেই বাগাতে পারব।

(পাশের চুল দ্বারা সযত্নে টাক আচ্ছাদনের প্রয়াস,—এমন সময় পাতার প্রবেশ।—তাহাকে দেখিয়া টাক ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি পুনরায় গুম্ফ আক্রমণে ব্যস্ত)

পাতা। গোঁপে যে খুব চাড় পড়েছে—এদিকে রাজ্যে হুলস্থূল!

বি। এস এস প্রেয়সি—আমার প্রাণ সমুদ্রে বান—আমার জীবন মাঠে ধান—! (স্বগত, তাকে এই রকম করে বল্লেই বোধ হয় ঠিক হবে।)

(আনমনে পুনরায় টাক বিন্যাস –)

পা। দেখ অত করে আর চুল বাগাতে হবে না—যে রূপ আছে তোমার,—তাতেই মরে আছি!

(হাত দিয়া চুলগুলা লণ্ডভণ্ড করণ।)

বি। (শশব্যস্তে অর্দ্ধ হাত দূরে গিয়া) আরে কর কি কর কি? (স্বগত) (টের পেয়েছে দেখছি) প্রকাশ্যে—কেন প্রেয়সি—

তোমরা রূপে শান দাও তাতে দোষ নেই আর আমাদের বেলাতেই মানহানির দণ্ড!

পাত্রা। তোমাদের এখন তরবারে শান দিতে হবে—দেখছ কি সময় বড় খারাপ পড়েছে।

বি। তবেই হয়েছে—আমি ঢাল তরবার ধরলেই রাজ্য সাবাড়!

পাত্রা। আচ্ছা মহারাজকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলতে পার না?

বি। সর্ব্বনাশ! এতদিন রাণীর সখিগিরি করে তোমার এরূপ বুদ্ধি হয়েছে? তাঁরা যদি বলেন—সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে—তা কখনই মিথ্যা হবার নয়—বুঝলে ত?

পা। তবে চল সখিগিরি সখাগিরি ছেড়ে রাজকন্যার আশ্রমে যাওয়া যাক। তোমাকে নিয়ে যেতেই আমি এসেছি।

বি। (স্বগত) তা একবার গিয়েই দেখা যাক না,—তেমন তেমন দেখি—সরে পড়তে কতক্ষণ? (প্রকাশ্যে) তা চলনা—তুমি যে পথে যাবে শর্ম্মা তোমার আঁচলে বাঁধা।

গান

কীর্ত্তনের সুর।

মান যাও ভুলে—চাও মুখ তুলে
ওগো গরবিনী-ধনী-রাধা—!
হের বৃন্দাবন ধন গোপীমোহন,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা—
ঐ শ্রীচরণমূলে বাঁধা।
হের—ভূমিতে লুটায় মুরলীখানি,
নীরব সরব রাগরাগিণী
সপ্তসুর ললিত মধুর—
তব নামে যে গো সাধা—!
ওগো তুমি রাধা তার মাথার মণি—
আমাদের শ্যাম রাজা সে তোমাতে ধনী,
তুমিই তাঁর পরমা কামনা—
ধরমে করমে বাধা—।

গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সেনাপতির কক্ষ।

(কক্ষে পদচারণা করিতে করিতে)

সেনা। এত দিনে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত! প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলতে আর বেশী প্রয়াস পেতে হবে না। তারপর তারা যদি জেতে ত আমি সিংহাসনে উঠবই, আর যদি হারে তাহলেও মহারাজ জানবেন—আমিই বিদ্রোহ দমন করেছি। এ চালের আর মার নেই!

(অধীনস্থ সেনানায়ক ধ্রুবকুমারের প্রবেশ।)

ধ্রুব। নমস্কার সেনাপতি।

সেনা। নমস্কার ধ্রুবকুমার—খবর কি বলদেখি?

(স্বগত) এই লোকটাকে দিয়েই আমার কার্য্যসিদ্ধি করব! লোকটা অত্যাচারবিরোধী, কিন্তু প্রকৃত বীর, এ যদি একবার নেতা হয়ে দাঁড়ায়—তাহলে প্রজারা সহজেই বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে।

ধ্রু। সেনাপতি শুনেছেন—ঘরে আগুণ লাগার যে সব প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে রাজদরবারে অভিযোগ করতে গিয়েছিল—তারা বিদ্রোহী ব'লে বন্দী হয়েছে! উঃ কি অরাজকতা! শাসনের নামে কি অশাসন—বিচারের নামে কি অবিচার!

সেনা। সেটা তুমি আজ নতুন ক'রে বুঝছ—আমরা অনেক দিন থেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে এই জ্বালা ভোগ করছি—কিন্তু কি করব বল?

ধ্রুব। কি করবেন?—মহারাজকে বুঝিয়ে বলবেন! তিনি ত দেখতে পাই, আপনার কোন কথাই অগ্রাহ্য করেন না; তিনি ত দেখি আপনার উপরই সমস্ত ভার দিয়েছেন,—আপনি যদি প্রজাদের একটু আশ্বাস দেন—যে তাদের উপর আর অত্যাচার হবে না, তা হলেই তারা শান্ত হয়। একটু দয়া একটু অনুগ্রহের উপর রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে। অত্যাচারের সম্পর্ক ঘুচিয়ে স্নেহের সম্পর্কে তাদের আবদ্ধ করুন—দেখবেন রাজ্য মঙ্গল-শ্রীতে ভ'রে উঠেছে।

সেনা। (স্বগত) রাজ্যের মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয় কই? (প্রকাশ্যে) বোঝনা হে একটু প্রতাপ না দেখালে প্রজারা মাথায় চড়ে বসে; প্রতাপ প্রভাবই হচ্ছে রাজ্য শাসন।

ধ্রুব। আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন?

সেনা। আমি কি মনে করি না করি তাতে ত কাজ চলে না—মহারাজা তাই মনে করেন। আমি তাঁর দাস।

ধ্রু। এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে—আমি বেশ বুঝতে পারছি তিনি প্রকৃত কথা কিছু জানেন না। আপনি সাহস করুন—তাঁকে বুঝিয়ে বলুন—দেশ রক্ষা করুন।

সেনা। তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। আমি যতক্ষণ তাঁর আজ্ঞা পালন করব—ততক্ষণই তাঁর সেনাপতি—।

ধ্রুব। তবে কি আপনি বলতে চান—আমাদের রাজা সত্যই এত নিষ্ঠুর—এত অত্যাচারী—এত—

সেনা। তা আমি বলছিনে। আমি বলছি—রাজা যে রকম করে রাজ্য শাসন করতে চান, অবনত মস্তকে তাই তোমাকে সুশাসন বলে মেনে নিতে হবে।—

ধ্রুব। তা আমি পারব না, তাহলে আমি সৈনিক পদ ত্যাগ করব। অন্যায় জেনে বুঝে ভ্রাতৃরক্তে আমি অসি কলঙ্কিত করতে পারব না।

সেনা। তা হলে তুমি বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করবে?

ধ্রুব। তারা বিদ্রোহী নয়—তারা সুবিচার প্রার্থী!

সেনা। তথাপি রাজাদেশে তারা বন্দী—রাজবিচারে তারা বিদ্রোহী, তাদের পক্ষ গ্রহণ করাই বিদ্রোহিতা! তুমি বিশ্বাসই করবে না—এরূপ আদেশ পালন আমার পক্ষেও কিরূপ কষ্টকর!—সময় সময় বিদ্রোহিতা ভাবে আমার রক্তও জ্বালামুখীর ন্যায় ফুটে উঠতে থাকে, তবু আমি নিরুপায়,—আমি দাস।

ধ্রুব। হা ভগবান! এই রকমেই—রাজভক্ত প্রজারাও অবশেষে সত্যই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে!—আমার কথা শুনুন—আপনি মহারাজকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন?

সেনা। নিশ্চয় জেনো—তাতে আমিই কেবল বিদ্রোহী বলে গণ্য হব। তখন কি তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে?

ধ্রুব। রক্ষা করতে পারব কি না জানি না,—তা যদি হয় আমিই নেতা হয়ে রাজ বিরুদ্ধে দাঁড়াব। যাঁকে ভগবান প্রজা রক্ষার ভার দিয়েছেন—তিনি যদি প্রজা-পীড়ন করেন—তখন আর তাঁকে পিতা মনে করতে পারিনে। কিন্তু তার আগে—আমি নিজে মহারাজকে সব জানাব—!

সেনা। (হাসিয়া) বেশ তাই কর; দেখ কি ফল লাভ হয়!

ধ্রুব। হাসবেন না! আপনার এই অবিশ্বাসে আমার অন্তরের বল যেন সব নিঃশেষ হয়ে আসে! অথচ আমার অন্তরাত্মা বলছে, পুণ্যের জয়—ধর্ম্মের জয় অব্যর্থ, মহারাজা সত্যই নিষ্ঠুর নন। যতক্ষণ দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, আমি এই অমঙ্গল দূর করতে চেষ্টা করব। যাই,—দেখি কি উপায় করতে পারি।

প্রস্থান।

মন্ত্রী। নাঃ—যা আশা করেছিলেম হোলনা, এ'কে বিদ্রোহী করা দেখছি সহজ নয়। বেশ বুঝছি এ-ই আমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কণ্টকটাকে যে এখন সরাতে পারলে হয়! সে জন্য ভাবনাই কি এত! একটা কুটাকে খণ্ড করতে বেশী বলের আবশ্যক করে না। তারপর রাজলক্ষ্মী যে আমার অঙ্কশায়িনী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।—কিন্তু রাজ্যই বৃথা—যদি না রাজকন্যাকে লাভ করি।—এত চেষ্টাতেও ত তাঁর একদিন দর্শন পেলুম না! অথচ আর সকলে অনায়াসেই তাঁর দর্শন পায়! যখন সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে বন্দিনীকে সম্মুখে দাঁড় করাব—তখন? তখনও কি ভিক্ষুক রমণী আমার মহিষী হতে শ্লাঘা অনুভব করবে না! তা যদি হয় তখন সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হবে। এখন রাজ্যধ্বংসের উপায় দেখা যাক।

প্রস্থান।

(রাজপথে ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রু। উঃ কি ষড়যন্ত্র! সত্যই বিদ্রোহিতার আয়োজন হচ্ছে! আর সেনাপতিই তার মূল! কি ক'রে মহারাজকে সাবধান করা যায়! তিনি দেখছি এদের হাতে যন্ত্র স্বরূপ! হায় হায়! কি উপায়ে তাঁকে সব জানাব! রাজকন্যার কাছে গেলে হয়ত কোন উপায় হতে পারে! যদি তাঁর দর্শন পাই।

প্রস্থান।

বর্ষা-মধ্যাহ্নে।

বৃষ্টি নাই আজ তবু মেঘে ঢাকা গগনমণ্ডল
দিকে দিকে রুদ্র-জটা উড়ে যেন অসিত-পিঙ্গল!
ম্লান দিবসের আলো—মধ্যাহ্নে কি গোধূলি-লগন—
রূপসী প্রকৃতি বালা অশ্রু-মাত্রা বিরস বদন!

সম্মুখে সরসী মোর নীরপূর্ণ যৌবন-চঞ্চলা
তীর-চুম্বী ধান-ক্ষেতে রচিয়াছে আসন কমলা!
কদলীর কুঞ্জ তীরে—ক'শবনে ঘেরা চারিধার—
উদাসী সমীর ফিরে ফিপ্ত যেন করি হাহাকার!

একা আমি শূন্য-গৃহে বসি মুক্ত বাতায়ন-পথে
সারা প্রাণে চাহিতেছি—স্মৃতি তব শত দিক হতে
জড়ায়ে ধরিতে বক্ষে; ফুরাইতে বিরহী প্রহর—
বৃথা কেটে যায় আজি বিরহের বিক্ষুব্ধ সময়!

প্রেমময়ী দেবী তুমি, দীন ভক্তে পাশরি কেমনে
রহিয়াছ বহুদূরে অন্যের আনন্দ-ভবনে!

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

গুজরাত কৃষক-পল্লিচিত্র।

গুজরাতের তরঙ্গায়িত নির্জ্জন অলস প্রসার মাঠের উপর দিয়া গোশকট রেখাঙ্কিত আঁকা বাঁকা ধূলিপূর্ণ ক্ষুদ্র রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রান্তরের কোন এক দিক হইতে বংশীধ্বনির ন্যায় করুণ মর্ম্মস্পর্শী একটা আর্ত্তনিনাদ আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন—পল্লী দুই তিন মাইল ব্যবধান মাত্র। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই শস্যশ্যামল ক্ষেত্র সকল নয়ন গোচর হইবে, এবং ক্ষেত্রসন্নিহিত বিভিন্ন কূপ হইতে দড়ি ও চাক সংযোগে বলদ বা মহিষ দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া কৃষকবৃন্দ শস্যক্ষেত্রে সিঞ্চন করিতেছে দেখিবেন;—কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই জল উত্তোলনের শব্দই আপনাকে উৎকর্ণ করিয়া দিয়াছিল; যাহা আপনি পাখীর ডাক বলিয়াই হয়ত স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সে স্থান হইতে পল্লী অভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সারস, ময়ূর, টিয়া তিত্তির প্রভৃতি নানা জাতীয় পাখীর সুধাস্রাবী মিশ্র কাকলীকলাপে আপনার কর্ণকে অধীর করিয়া তুলিবে এবং অদূরে বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্না অবগুণ্ঠিতা পল্লীচিত্রখানি আপনার নয়নবর্ত্তিনী হইয়া উঠিবে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভরিয়া কোথাও এলাচি বনগুল্মের হরিদ্রাবর্ণ কুসুমের সমাচ্ছাদন, কোথাও রবিতাপশীর্ণ শুষ্ক তৃণাচ্ছাদন, কোথাও ঘনসমাচ্ছন্ন শ্যামল পত্র-বহুল বাবলাগাছের কণ্টকাকীর্ণ শাখারাজি ভরিয়া হরিদ্রাবর্ণ কুসুমের শোভা। নিম আম তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি বদ্ধ প্রান্তরের স্থানে স্থানে ছায়া-স্নেহ-স্নিগ্ধ কোল পাতিয়া দিয়াছে। এক প্রকার তৃণ মঞ্জরী ও অজানিত নামা পীতকুসুমশোভী একরূপ গুল্ম প্রান্তরের কোথাও কোথাও হাস্যরেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিকের সুশ্যামল ক্ষেত্রগুলির মধ্যস্থলে নতনম্রা পল্লিজননী কতকগুলি নরনারীর সুখ দুঃখের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত হইয়া তাহাদিগকে বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পল্লির অতি সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিলে সরোবর বা জলাশয়আকারের একটা কিছু দেখিতে পাইবেন। এই জলাশয়ই পল্লির জীবন। সমস্ত পল্লিগুলিই এইরূপ একটা জলাশয় উপযোগী স্থান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উর্ব্বর ভূমি দেখিয়া অতীতকালে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। পল্লিপ্রান্ত পথে পৌঁছিয়া আপনি পথধূলির উপর বিহগরচিত চরণচিহ্ন দেখিতে পাইবেন;—একখানি সুচিত্রিত হারের মত শ্রেণীবদ্ধাকারে ধূলিলাঞ্ছিত চিহ্নগুলি কোন বিশুদ্ধ চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকাস্পর্শ-সজীব চারু চিত্রের বিভ্রম জন্মাইবে। প্রভাতে এই চিহ্নগুলি দেখিয়া মনে হয়—বনদেবী বুঝি যামিনীতে পল্লির এই ধূলিময় পথে বিচরণ করিয়াছেন। অগণিত পাখী পল্লির চিরমুগ্ধ সহচর। পল্লির চারিদিকে অনেক ময়ূর অসঙ্কোচে পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক পুলকরোমাঞ্চে ললিত নৃত্য করিতেছে, আর কেকারবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে। পল্লির ঘন সন্নিবিষ্ট খোলার ঘরগুলি আপনার চক্ষে অভিনব বোধ হইবে।

পল্লির ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনি থমকিয়া দাঁড়াইবেন—কোন পথে আপনি চলিবেন বুঝিতে পারিবেন না;—পল্লির প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর উপর দিয়াই পথ, বহির্বাটী ও অন্তঃপুর কিছুই নাই,—পল্লির একটী লোককে সঙ্গে করিয়া আপনি পল্লির সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন; এই পল্লিতে কতগুলি পরিবার তাহা আপনার পক্ষে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আঙিনার কোন ব্যবধান নাই; সকলই এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। পল্লির প্রতি চালে চালে অগণিত ময়ূর ময়ূরী দেখিতে পাইবেন; নরনারী সকলকেই সমভাবে চলা ফেরা করিতে দেখিবেন; পুরুষগণের সকলেরই মস্তক পাগড়ী বা টুপি দ্বারা আবদ্ধ, আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাহারা শ্মশানবান্ধব হইবার সময় কেবলমাত্র টুপি পাগড়ী পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হয়; স্ত্রীলোকগণের পরিধানে নানা বর্ণের ঘাগ্‌রী, তদুপরি নানা রঙ্গিণ শাড়ী ও বক্ষে কাঁচলী; হস্তে বালা, কর্ণে মাকড়ী পদে গুজরী মল। স্ত্রীলোকগণ সৌষ্ঠবময়ী, সবলা ও বিবিধ গৃহকর্ম্মপরায়ণা। পল্লির মধ্যে একটী দোকান পল্লির সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে; এই বিলাস স্রোতে ভাসমান জগতে তাহাদের প্রয়োজনীয় শুধু ডাল, চাল, গুড় বাজরি ও তেল নুন কাপড়,—ইহাই তাহাদের জীবন পরিপুষ্টকারক ও সৌষ্ঠবের সকল উপাদান ও উপকরণ। হিন্দু, জৈন ও মুসলমানগণ একত্রভাবে অবস্থান করে, ইহাদের মধ্যে সৌখ্যসূত্রের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই পল্লিগুলির উপর দিয়া কালের কত ঝঞ্চাবাত বহিয়া গিয়াছে, তবুও ইহা অটল স্থির একভাবেই দণ্ডায়মান। প্রতি পল্লিতেই জৈন চৈত্য, হিন্দু-মন্দির বা মুসলমান মসজিদ দেখিতে পাইবেন। সেখানে ক্ষুদ্র পল্লির প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। এখানে নূতন উত্তেজনার কিছুই নাই—পুরাতন কথা গুলিই একমাত্রসম্বল;—মাঠের কথা, ফসলের কথা, সম্বৎসরের অবস্থার কথা তাহাদের নিত্য আলোচনীয় বিষয়।

কৃষকের সম্পত্তির মধ্যে তাহার জীর্ণ কুটীর, লাঙ্গল এবং কয়েকটী মহিষ বা বলদ। কোন কোন স্থলে কোন কোন পরিবারে দুই একটী গরু বা মহিষের গাড়ীও দেখিতে পাইবেন। কন্‌বীগণই গ্রামের কৃষিজীবি; তাহারা তিনভাগে বিভক্ত—লেবা, কড়ুয়া ও আঞ্জন। তাহারা নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়; কালের পরিবর্ত্তনে এখন হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাণিয়াগণ গ্রামোৎপন্ন দ্রব্যে বাণিজ্য করিয়া বিশেষ অর্থশালী।

গ্রামের "পটেল" বা পঞ্চায়িত গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা; তিনি গ্রামের সমস্ত বিচার নির্ব্বাহ করেন, পল্লী রক্ষার্থ চৌকিদার নিযুক্ত করেন; গ্রামের যাবতীয় শান্তি রক্ষার সুবন্দোবস্ত ও কৃষিজীবিদিগের সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করেন।

গ্রামে আদিম অসভ্য জাতি ভীল, কুলি, মীন, মীর প্রভৃতি কৃষি কার্য্য বা অন্যান্য বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

গ্রামে 'শৈবান্বিত', 'বৈষ্ণান্বিত' ও শ্রাবক

(জৈন) তিন শ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী দেখা যায়। ভীল, মীর কুলি, মীন প্রভৃতিগণ অনেক স্থলে কবীরপন্থী।

"পটেল" গ্রামের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি, তাহা দ্বারাই গ্রামের যাবতীয় বিষয় নিরূপিত হয়। প্রতি গ্রামে রজক, নাপিত, কুম্ভকার তৈল-কার, চৌকিদার যেপর সকলেই স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। প্রতিগ্রামে গ্রামের উন্নতি বিধান জন্য একটী ধনভাণ্ডার আছে। শস্তের সময় প্রতিবাড়ী হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া এই ধনভাণ্ডারটী পূর্ণ হয়। সেই অর্থে গ্রামের কর্ম্মচারী সকলকে নিয়মিত বেতন দিয়াও তাহা যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। উহারা আজকাল সহরের পুলিশ কর্মচারী-গণের বুভুক্ষিত ক্ষুধা নিবৃত্তি করা হয়। এইরূপে গ্রামের কত অর্থ যে অনর্থক ব্যয়িত হইতেছে, তাহা বলা সুকঠিন। এই অর্থে গ্রামের কত মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিত। এই অর্থের দাতাগণের কিন্তু পরিধানে 'চট' সমতুল এক ধুতি ও হস্তে এক লাঙ্গল মাত্র সম্বল। তাহাদের এই কষ্টসঞ্চিত অর্থগুলি তাহাদের কোন কাজেই আসিতেছে না।

গ্রামে একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা আছে, তাহাতে গ্রামের নগ্ন, ধূলিধূসরিত বালকবৃন্দ শিক্ষালাভ করিতেছে। এই স্কুলের কোন মাহিনা নাই। পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় মাসে একদিন মাত্র ঝুলিস্কন্ধে, ছাত্রবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রতি বাড়ী হইতে এক এক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করেন। ছাত্রগণ "একরে একরে এক" একরে বেকরে "বে একরে তেকরে ত্রাণ" করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে।

কৃষকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। কনুবিগণ বিশেষ সাহসী বলিয়া পরিচিত। কৃষকগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলদগুলিকে কিছু আহার্য্য প্রদান করে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে পরিবারের কিছু কার্য্য করিয়া বলদ গুলিকে লইয়া মাঠে চলিয়া যায়। বেলা ১০টার সময় কৃষকরমণীগণ তাহাদের আহার্য্য লইয়া মাঠে গমন করে; সেখান হইতে রমণীগণ ফিরিয়া আসিয়া আহার সমাপনান্তর—গমচূর্ণ করা চাউল প্রস্তুত করা প্রভৃতি গৃহের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। তৎপর সন্ধ্যায় রাত্রির আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকে।

একবার রন্ধনশালার দৃশ্যটা দেখুন;—তথায় তৈজসপত্রাদি কিছুই নাই, গোময়লিপ্ত ঘরের এক কোণে উনানে একখানা কাষ্ঠ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার উপর 'তাওয়া' চড়ান; কৃষক পত্নী কিছু বাজরীর আটা হাতে মর্দ্দিত করিয়া তাওয়াতে অগ্নিতপ্ত করত "রোটলা" প্রস্তুত করিতেছে। মুখে রূপাকনুবীর ভজন গান চলিতেছে।

শরতে সন্ধ্যার পর কৃষকপত্নিগণ একটী প্রদীপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া হেলিয়া দুলিয়া করতালি দিতে দিতে কি গান গাইতেছে শুনুন;—

গরবী

"ও ঈশ্বর অরজী উর ধারো,
দুনিয়ানা দুঃখ নিবারো রাজ,
দয়া কর হবে দীনবন্ধু।

সারাজন শঙ্কটমা পড়িয়া
নরসানা ছাট্টা নড়িয়া রাজ।
দয়া কর হরে দীন বন্ধু।"

হে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর, হে রাজ দুনিয়ার দুঃখ নিবারণ কর, এখন দীনবন্ধু দয়া কর। অসৎ লোকের সংসর্গে পড়িয়া ভাললোক সঙ্কটে পড়িয়াছে এখন দীনবন্ধু দয়া কর।

"যে পরোপকারী ছে পুরা,
এ পণ নথি রক্ষা অধুরা রাজ।"

যে পূর্ণ পরোপকারী তাহারও এখন রক্ষা নাই।

"জো থস্ত অড়গ জগশে জ্যারে,
জগ রেহেশে শা আধারে রাজ।"

গুজরাতি মহিলারা প্রার্থনা করিতেছে।

যে স্তম্ভের উপর জগত স্থিত তাহা ভাঙ্গিলে জগত কিসের উপর রহিবে।

ফরিখি মনমা কোই নহি ফুলে
ভবমা আদুঃখ নহী ভলে রাজ।
সুখ পামো দৌ গামো গামে
দিধি আশীষ দলপত রামে রাজ।

পুনর্ব্বার কেহই মনে অহঙ্কার করিবে না, সেজন এই পৃথিবীতে দুঃখ প্রাপ্ত হইবেনা, প্রতি পল্লিতে পল্লিতে সুখ প্রদান কর, দলপত রাম এই আশীষ দিতেছে।

কৃষাণ কবি রূপা কন্‌বী বিরচিত "কনবীর দুঃখ" নামক গান হইতে তাহাদের সম্বৎসরের সকল সুখ দুঃখের কথা জানিতে পারিবেন। গুজরাতের প্রতি পল্লিতে কৃষক বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেই অতি উৎসাহের সহিত এই গানটী গাহিয়া থাকে।

"সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি
কনবী কেরা দুঃখনী কহু কথায় জো।
দে দুঃখ টালী অবনীনা আধার তু;
অমণী রাখো তমে রাম রেহি বায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।"

হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কর কন্‌বী কেরার দুঃখ বর্ণনা করিতেছি আমাদের দুঃখ দূর কর, তুমিই অবনীর আধার; রাম তুমিই আমাদিগকে এখানে রাখিয়াছ, তাই আছি। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

চড়ে বাদলা মাস আষাঢ়ো আওতা
মেঘ তমু তো পড়বা মাড়ে নীর জো;
রাশ পরোনো কনবী কেরা হাথমা
ভিজী জায়ছে কনবী কেরু শরীর জো।
সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

আষাঢ় মাস আসিতেই মেঘ দেখা দেয়, মেঘতন্ত্র পড়িতেই জল হইতে আরম্ভ হয়;

কনবী ও রেয়া হস্তে রাশ ও পাচন গ্রহণ করে,
কনবী কন্দুর শরীর জলে ভিজিয়া যায়।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

শ্রাবণ মাসে মেহুলো বরষে শরবড়ে,
খেদদ পলড়ী জায় নর নে নার জো;
দীকরাণী বহু সসরা পাসে জই কহে,
"সসরাজী কাই বাবো ভাঙ্গর জায় জো"।
সামলবে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

শ্রাবণ মাসে মেঘ হইতে বৃষ্টি মাঝে মাঝে হয়; নরনারী পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যায়। পুত্রবধূ শ্বশুরের নিকট যাইয়া বলে—শ্বশুর মহাশয় কিছু শস্য বপন করুন। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"ভাদে আবিয়ো ভাদব মহিনো হবে;
কনবী কেরী নারী লদবদ থায় জো,
চার তনো ভারো মাথে জেনী গলে,
ছৈয়া কেড়ে রড়তা পলতী যায় জো।
সামলবে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

ভাদ্র মাসে খুব ভালরূপ বৃষ্টি হয়, কনবী কেবার নারী ভিজিয়া যায়; তৃণ সমষ্টি ভেদ করিয়া জল ক্রন্দনরত বালকের মাথার উপর পড়িয়া ভিজাইয়া দেয়—হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"আসোনো আশা তো বাধী অতি ঘনী,
বাট জোতলে মেঘ বরসবা কাজ জো;
জার বাজরা চড়ে আবী বেসবা,
ডাঙ্গর পাণি বিনা শুকায়ে আজ জো।
সামলবে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি!

আশ্বিন মাসে অত্যন্ত আশা করি যে, মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। জোয়ার এবং বাজরা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। জল অভাবে ধান শুষ্ক হইয়া যায়। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"কার্ত্তিক মা ওথরাতদার তে আবিয়ো;
করে আঙ্কড়ো সীমমাহ তৈয়ার জো,
"এক সিঙ্গ কে কণ নব কাই উপাড় শো",
এবী রায়তনী আজ্ঞা নো সার জো।
সামলয়ে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।"

কার্ত্তিক মাসে রাজকর্ম্মচারী আসিল, গ্রাম প্রান্তে বসিয়া হিসাব তৈয়ার করিল—"এক কণা শস্য কেহ উত্তোলন করিও না" এই প্রকার রাজার আজ্ঞা শ্রবণ কর। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

মাগশর মহিনো আব্যো রুড়া রীতথী,
পেহেলো হপতো ওথরাবা মণ্ডায় জো;
মুখী তলাটী চোরে বেসে জই চড়ী
কনবী বিচারো বহু রীতে কুটায় জো।
সামলয়ে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

অগ্রহায়ণ মাস ভালরূপই আসিল; খাজনার প্রথমবারের টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। প্রধান ও তহসিলদার গাড়ীতে সহরে গমন করিল; কনবীর অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইল। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

পোষে বীজো পাক রবীনে থায়ছে,
কণ্য কানা কাটী যায় সমাজ জো;
জুনী বন্ধা দূর করীছে আ সমে,
পন তে মা এক নবা চলাবা কাজ জো।
সমালয়ে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

পৌষ মাসে দ্বিতীয় বার শস্য বপন করা হয়, কাপাসের গুটি ফুটিতে আরম্ভ করে। সেই সময় পুরাতন সব দূর করা হইয়াছে। কেবল নূতনের জন্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

আবো মাঘ মহিনো রুড়ী রীতথী ;
লীলা কচ সৌ খেতর তো দেখায় জো,
রাজানো জে কর তে সঘলো আপিয়ো,
পন মাথাপর হীম তন্থু ভয় থায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারি বিনতি।

মাঘ মাস ভাল রূপই আসিল; ক্ষেত্র সকল শ্যামল দেখাইতে লাগিল। রাজার কর সকলই দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মাথার উপর হিমকণা ভয় দেখাইতেছে। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"ফাগন মহিনো আবো রুড়ী রীতথী
হীমে থহনো কীধো পুরো নাশ জো
"চালো আপন সটি যে" পণ শা কামহু।
মুখিয়ে মুকী চোকী চারে পাস জো
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।"

ফাল্গুন মাস ভাল রূপই আসিল। হিমে শস্য সমুদয় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। "চল পলায়ন করি?"—কিন্তু কেমনে! মোড়ল চারিদিকে পাহারা বসাইয়াছে। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"চোরে তো সৌ থায় একঠা চৈত্রমা ;
মাগে "লাবো কর জেতম পর থায় জো,
কাস্তনারী বিধবাণী মজুরী লে লুটী,
সর্ব্বে জোর জুলমথী লুটী জায় জো।
সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।"

চৈত্রমাসে সকলে সহরে একত্র হয়। বলে "তোমার উপর যা কর হইয়াছে আন।" নিরাশ্রয় বিধবা নারীর উপার্জ্জন লুটিয়া লয়; সবই জোর করিয়া লইয়া যায়। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"জমিনদার বৈশাখে আবীনে লুটে,
গায় ভেসনা দুধ দহীনু জে কায় জো;
ছায় বিনা ছৈয়া সৌ লেবল বহু করে,
পন পাপিয়ো চালু লুট মায় জো
সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

বৈশাখ মাসে জমিনদার আসিয়া গরু মহিষের দুধ দই সব লুটিয়া লয়—দুধ মাখন বিনা সন্তানগণ খুব ক্রন্দন করে কিন্তু পাপীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া চলিয়া যায়। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"জেঠ মহিনো আবো রুড়ী রীতথী,
চীড়াই গয়ে লো কনবী খন্ধো থায় জো;
সম খাতানে আশা তেনে আপতা
খেতর মা থাতর তে সুরবা জায় জো।
সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

জ্যৈষ্ঠ মাস ভালরূপই আসিল। কৃষক কনবী শান্ত হইয়া যায়, তাহারা বিধাতার নিকট প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প করে, এবং ক্ষেত্রে চাষ করিতে গমন করে, হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

"বারে মহিনা রূপা মা পুরা থয়া,
তেমা কনবী কেরী কথা কথায় জো;
জে কোই গায় অনে শিখে নে সামলে
বাস স্বর্গমা তেনো ঝট থই যায় জো।

বার মাস রূপা দ্বারা পূর্ণ হইল; ইহাতে কনবী কেরার দুঃখ বর্ণিত হইল। যে কেহ ইহা গায়, শিক্ষা করে—বা শোনে তাহার অতি শীঘ্র স্বর্গ বাস ঘটিয়া থাকে। হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গ্রামের সকল কৃষকদিগকে লইয়া পরবর্ত্তী বৎসরের সুখ দুঃখের আলোচনা এবং বর্ত্তমান বর্ষে কৃষি-কার্য্যের কি নূতন বন্দোবস্ত হইবে তাহা ঠিক

করিবার জন্য পেটেল পল্লিপ্রান্তে বৃক্ষতলে সমবেত হয়। কৃষকগণ গত বৎসরের দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে পেটেল তাহাদিগকে—প্রজাই রাজার প্রাণ, প্রজা ব্যতীত রাজা কিছুই নয় ইত্যাদি নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া গ্রামের মোড়লকে একটা পাগড়ী উপহার দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করে। তৎপরে পুনরায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য সকলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া উঠিলে তালুকদার, জমিদার বা তাহাদের কর্ম্মচারী গ্রামের পেটেলকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে গমন করেন। পেটেল কোন ক্ষেত্রে কত শস্য জন্মিয়াছে তাহা নিরূপণ করেন। তালুকদার বা জমিদারের কর্ম্মচারী শস্যের পরিমাণ একটু বাড়াইয়া ধরেন। কৃষক তৎসম্বন্ধে যেরূপ অনুরোধ অনুনয় করে তাহা শুনিয়া তখন জমীদারের প্রাপ্য স্থির হয়। কৃষক শস্য কর্ত্তনের পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক জমিদারের অংশ তাঁহাকে প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। গুজরাতের বিভিন্ন অংশে এই বণ্টনের অংশ বিভিন্নরূপ। ঝালাবারের কোন স্থলে অর্দ্ধেক কোনও স্থলে এক তৃতীয়াংশ কোনও স্থলে দুই তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাপ্য। ধান্য প্রভৃতি যে সকল শস্য কূপ পুকুর প্রভৃতি স্থান হইতে জল সিঞ্চন দ্বারা জন্মাইতে হয়, সাধারণতঃ সে সকল শস্যের এক তৃতীয়াংশ জমিদার গ্রহণ করিয়া থাকে। যব বারলী প্রভৃতি যে সকল বৈমর্থ্যক শস্যে জল সিঞ্চনের সুবন্দোবস্ত আছে তাহার এক চতুর্থাংশ জমিদারের প্রাপ্য। কোথাও কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য অতি সামান্য মাত্র জমিদারকে প্রদান করিতে হয়। প্রতি বলদ ও কৃষিকর্ম্মক্ষম লোকপ্রতিও একটা খাজনা নির্দ্ধারিত আছে।

গুজরাতের যে সমস্ত স্থানে জলের বন্দোবস্ত অতি সামান্য সেই সকল স্থানে চূড়াসমা রাজপুত ভূম্যধিকারীগণ কৃষক দিগের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভিন্ন উপায় স্থির করিয়াছেন।

সমস্ত জমী উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। তার পর সমস্ত উৎপন্ন শস্য একত্র করিয়া যত মণ হয় তাহা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত জমির গণিতক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া প্রতি জমির উপর একটা আন্দাজ মত হিসাব ধরা হয়। তৎপর প্রতি একার জমিতে এক মণ শস্য বীজের জন্য বাদ দিয়া উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ কৃষকের পারিশ্রমিক ধরিয়া বক্রী অংশ জমিদার ও কৃষকগণ সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া লয়।

পল্লির শস্য বণ্টনের পুরাতন প্রথা নিম্নরূপ।

কৃষকদিগের সমুদয় শষ্য পল্লির সর্ব্ব সাধারণের গোলাবাড়ীতে স্তূপীকৃত হইত। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট এক দিনে জমিদার, গ্রামের মোড়ল, গ্রামের চৌকিদার, ব্যবসায়ী লোক ও বাণিয়া তাহা বিভাগ করিবার জন্য পাল্লা পাল্লা সহ গোলাবাড়ীতে সমবেত হইত। শস্যের এক অষ্টচত্বারিংশ ভাগ রাজার জন্য থাকিত তাহা হইতে কিছুকমভাগ গ্রামের তহশিলদার, গ্রাম্যচিকিৎসক, রাজপুত্রের বাজেখরচ, গ্রামের চৌকিদার, দেবায়তন, পুষ্করিণী সংস্কার, ও কুকুরবিড়াল প্রভৃতির জন্য থাকিত।

তৎপর বাকি অংশ জমিদার ও কৃষক সমান অংশে ভাগ করিয়া লইত।

বর্ত্তমান সময়ে জন্মা অজন্মা সকল বৎসরেই কৃষককে অধিকাংশ স্থলে শস্তের পরিবর্ত্তে অর্থরাজস্ব দিতে হয় বলিয়া তাহারা প্রপীড়িত বোধ করে; অনেক স্থলেই দেখা যায় এইরূপ অর্থরাজস্ব প্রদান করিতে যাইয়া শস্য ক্ষেত্রগুলি উত্তমর্ণের হস্তগত হয়।

ভূম্যধিকারী বা কৃষকবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া মামলতদার 'সরকারে' জমা দেয়; কাজেই মামলতদার মহকুমার রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তারূপে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। মামলতদারের মনস্তুষ্টি—করিতে যাইয়া ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারী অনেকস্থলে নিঃস্ব হইয়া পড়ে।

গুজরাতি কৃষকেরা কার্পাস লইয়া যাইতেছে।

বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত পল্লিগুলিতে রমেশচন্দ্রের উদার শাসননীতি অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা পল্লির নির্ব্বাচিত পঞ্চায়িতের হস্তে এবং গ্রামের উন্নতি বিধানের সমস্ত ভার গ্রামবাসীদের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। রাজসরকার হইতে বাৎসরিক যাহা কিছু সাহায্য তাহা পল্লিসমিতির হস্তে অর্পিত হয়।

শিক্ষার উন্নতি, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির উপায় ও বাণিজ্য প্রসারের সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা রাজসরকার করিয়া দেন। পল্লি-হস্তে ঐরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় দিন দিন পল্লিগুলির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে বৎসর বৎসরই রাজস্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ৫০ বৎসরে রাজস্ব বাড়িয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি না পাইলেও এইরূপ করভারে প্রপীড়িত ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রজা দুরন্ত মড়কে করাল গ্রাসে নিপতিত হইতেছে।

২৭ শালের (১৯২৭ বিক্রমসম্বৎ) ভীষণ দুর্ভিক্ষের স্মৃতি গুজরাতবাসীদের অন্তঃকরণ হইতে মুছিয়া না যাওয়ায় দেশবাসী বাণিজ্য নীতির প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং তৎফলে দেশের অবস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

সে বৎসরের দুর্ভিক্ষে ধনী দরিদ্র সকলকেই করাল গ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সহর পল্লি সর্ব্বত্রই ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই —গুজরাতের বাণিজ্যের নূতন যুগ দেখা দিয়াছে। দেশের লোক দেশ ছাড়িয়া আফ্রিকা, সুমাত্রা, কানাডা, ফ্রান্স নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ব্যপদেশে ছাইয়া পড়িয়াছে।

গুজরাতউৎপন্ন কার্পাসের উপরই গুজরাতের ধনাগম বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেজন্য কার্পাসের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

গুজরাতের নিম্নশ্রেণী কর্তৃক প্রস্তুত calico printing কাপড় সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া বহু লক্ষ টাকা দেশে আগম হয়। খারেটা কাপড়, অবিকৃত মাখন, কাষ্ঠ প্রভৃতি বহুতর ক্ষুদ্র বৃহৎ বাণিজ্য প্রচল দ্রব্যে বহুতর অর্থ দেশবাসী প্রাপ্ত হয়।

ইহার ক্ষেত্রোৎপন্ন কার্পাস কেবল মাত্র বিদেশবাসীর নিকট বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রাপ্ত হয় এমন নহে,—দেশবাসীও ইহা ক্রয় করিয়া তদ্বারা সূত ও কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিদেশ এবং প্রদেশ হইতে বহুতর অর্থ উপার্জ্জন করে।

সমস্ত পশ্চিম ভারতের মধ্যে একমাত্র গুজরাতই সর্ব্বিশেষ উর্ব্বর ও শস্যশালী প্রদেশ; কাজেই রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের বহু অধিবাসী বহুবার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হইয়া জন্মভূমি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গুজরাতের চিরস্থন অধিবাসী হইয়াছে। এইরূপে সহস্র সহস্র রাজপুত গুজরাত পল্লীতে, নগরে আশ্রয় লইয়াছে; কোথাও বা স্বতন্ত্র রাজপুত পল্লী গড়িয়া তুলিয়াছে।

বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুজরাতের সহরগুলি অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। গুজরাতের বাণিজ্যের তরঙ্গাভিঘাতে বোম্বাই নগরী ঐশ্বর্য্য ও হর্ম্ম্যে ইন্দ্রাবতী তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। অমদাবাদ, সুরত, ভরোচ, কাম্বে, খোগা, রাজকোট সমস্ত নগরী গুলিই কল-কারখানা ও বাণিজ্য বিনোদনে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র কৃষক স্বীয় পল্লিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কল-কারখানা ও বাণিজ্য ব্যাপারে যুক্ত হইয়া শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। এবং দূরাগত আশ্রিতেরা কেহ কৃষিকার্য্যে কেহ বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেছে। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুজরাতবাসীর ১ম যুগ বা প্রাচীন যুগ বলা যাইতে পারে। মুসলমান শাসন কাল ২য় যুগ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় ও অধিকার এবং ইংরেজরাজের আগমন গুজরাতের তৃতীয় যুগ রূপে পরিগণিত; ইংরেজরাজের শাসন কাল হইতে ৪র্থ যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই চারি যুগের মধ্যে তৃতীয় যুগেই গুজরাত-বাসীদের চূড়ান্ত দুর্দ্দশা হইয়াছিল। একদিকে অস্তগামী মুসলমানশক্তির শেষ চেষ্টা অপর দিকে মহারাষ্ট্র সৈন্যের অভিযান,—এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া গুজরাতবাসীদের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে পুনরায় গুজরাতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

ওথমান ও আলি।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে প্রায় ২৪ বৎসর গত হইয়াছে। আবুবেকর ও ওমার মহম্মদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া মুসলমান শক্তি বর্দ্ধিত করতঃ একে একে পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ওথমান এখন মদিনার খলিফা। ওথমান মহম্মদের জামাতা। আবুবেকর ও

ওমার কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া মুসলমান শক্তি সংযত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন করুণ-হৃদয় ওথমান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, সেই দিন হইতে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। ওমার যেমন স্বীয় ব্যবহার দ্বারা প্রজাপুঞ্জকে বিলাসিতা-বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতেন, তেমনি যেখানেই বিলাসিতার উন্মেষ দেখিতেন সেখানেই কঠোর ভাবে তাহার দমন করিতেন। জেরুজালম নগর অবরোধের সময় এক উষ্ট্রপৃষ্ঠে ওমার তথায় গমন করিয়াছিলেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাঁহার আসবাবের মধ্যে ছিল, কিছু ফল ও শস্য পরিপূর্ণ দুইটি থলি, চর্ম্মনির্ম্মিত একটি জলাধার ও একখানি থালা। জেরুজেলমের অধিবাসীগণ তাঁহার বাসের জন্য এক মনোরম প্রাসাদ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ওমার নগরের বহির্ভাগে এক তাম্বুর মধ্যে মৃত্তিকায় আসীন হইয়া নাগরিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন—সুসজ্জিত প্রাসাদে পদার্পণ করেন নাই।

স্বীয় রাজত্বকালে বিলাসিতার আবির্ভাব হইতে দেখিয়া ওথমান ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। কঠোর কার্য্যে তিনি নিতান্তই অপটু ছিলেন। ওমারের মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত আরব ও পারস্যদেশ, সিরিয়া, মিশর, ও আফ্রিকা দেশ এবং শাইপ্রাস দ্বীপ মদিনার খলিফার পদানত হইয়াছিল। পূর্ব্বে হিন্দুকুশ ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মুসলমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল। এতবড় সাম্রাজ্যের যাহারা প্রতিষ্ঠাতা, দেশবিদেশ লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত ধনরত্ন যাহারা স্বদেশে আনিয়াছে, ওমারের কঠোর শাসন অপসৃত হইবার পরেই তাহারা বিলাসিতায় মগ্ন হইয়া পড়িল। ওথমান তাহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইলেন না। এদিকে ওথমান আর এক ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি উপযুক্ত লোক দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় আত্মীয়-স্বজনদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত বীর মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারা ওথমানের অবহেলায় ক্ষুণ্ণ হইলেন। আবার বিলাসিতা বৃদ্ধির সহিত দেশের দারিদ্র্যও বাড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ ধূমিত হইয়া উঠিল। মহম্মদের সঙ্গী আবুদার নামক এক ব্যক্তি কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে লাগিলেন, অর্থ সমস্ত অনর্থের মূল, সুতরাং বল প্রয়োগ করিয়া ধনীগণকে তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতে বাধ্য করা উচিত। অন্য এক প্রচারক আবির্ভূত হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন মহম্মদ সত্বরই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া মুসলমানদিগের উপর যে সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচার করিতেছে তাহা দিগকে বিনাশ করিবেন। সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় মুসলমান প্রজা রাজশক্তিকে অবহেলা ও ঘৃণা করিতে শিখিল।

মুখে মুখে মহম্মদ যে সমস্ত উপদেশ দান করিতেন, তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যাবতীয় উক্তি একত্র সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকার ধারণ করে নাই। আবুবেকর এই সমস্ত বচন একত্র করিয়া প্রচার করেন। আবুবেকরের সংকলিত

কোরাণ ওথমান পুনঃসংস্কৃত করিয়া প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান মুসলমানজগতে ওথমানের এই কার্য্য তাঁহার কীর্ত্তিরূপে গণ্য। কিন্তু তদানীন্তন মুসলমানগণ ওথমানের কার্য্যকে মহম্মদের বচনের উপর হস্তক্ষেপ মনে করিয়াছিল। মহম্মদ উপাসনা কালে যে স্থলে দুইবার ভূমিষ্ঠ হইবার নিয়ম করিয়াছিলেন, ওথমান তথায় চারিবার ভূমিষ্ঠ হইবার নিয়ম প্রচলিত করেন। ইহাতেও অনেক মুসলমান উত্তেজিত হইয়া উঠে।

অসন্তোষ ও অশান্তি পরিশেষে এমন আকার ধারণ করিল, যে একদিন মসজিদে উপাসনা আরম্ভ করিবার জন্য ওথমান যেমনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন, অমনি চারিদিক হইতে তাঁহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বাধ্য হইয়া খলিফাকে মসজিদ ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল।

ক্রমে সমগ্র মুসলমান জাতি নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল প্রত্যেক দলেই ওথমানের স্থলে নূতন খলিফা চাহে। অবশেষে একদিন মিশরের একদল সৈন্য সশস্ত্র অবস্থায় মদিনায় উপস্থিত হইল। ওথমানের কথায় সেবার তাহারা প্রত্যাগমন করিল বটে, কিন্তু অচিরেই পুনরায় মদিনায় প্রত্যাগত হইল।

সেদিন শুক্রবার। শুক্রবারে কোরাণ আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া ওথমান জলগ্রহণ করিতেন না। ওথমান কোরাণপাঠে অভিনিবিষ্ট, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, আততায়ীগণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বন্ধুগণ তাহাদিগের প্রতিরোধের আয়োজন করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু ওথমান তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "মহম্মদ স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া বলিয়াছেন যে উভয়ে একত্রে আজ স্বর্গে প্রাতরাশ করিতে হইবে।" তবুও পাঁচ শত শরীররক্ষী আক্রমণকারীগণের গতিরোধে চেষ্টিত হইল কিন্তু সকলেই নিহত হইল। খলিফার পত্নী স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তরবারির আঘাতে তাঁহার এক হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়িল। আলির-পুত্রগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণ আক্রমণকারীদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না। আততায়ীগণ খলিফার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তরবারীর আঘাতে রক্তাক্ত খলিফা ভূমিশায়ী হইলেন। পবিত্র কোরাণ খলিফার রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। দামাস্কাসের মসজিদে আজিও সেই রক্তাক্ত কোরাণ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "স্বর্গের দ্বারে আমি ওথমানের নাম লিখিত দেখিয়াছি। আল্লার সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে আমি ওথমানের নাম উৎকীর্ণ দেখিয়াছি, দেবদূত গাব্রিয়েলের পক্ষে আমি ওথমানের নাম চিত্রিত দেখিয়াছি।" মহম্মদের জামাতা, মহম্মদের ভৃত্য, মহম্মদের প্রিয় বন্ধু ওথমান্ এইরূপে নির্দ্দয় ভাবে মহম্মদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। খৃষ্টীয় ৬৫৬ অব্দে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, কিন্তু সমস্ত আরব-দেশকে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। ওথমানের মৃত্যুর পরে পাঁচ বৎসর যাবত গৃহযুদ্ধে আরব অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ওথমানের হত্যার পরে আলি খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। মহম্মদ মৃত্যুকালে আলিকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া

যান বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু মহম্মদের পত্নী আয়েসা আলির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মহম্মদের ইচ্ছা গোপন রাখিয়া তিনি আলির খলিফাপদপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন। আলি মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র। শৈশবে যিনি পিতার স্নেহে মহম্মদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত কোরেশ জাতির বিদ্বেষ হইতে যিনি মহম্মদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, মহম্মদের ধর্ম্মগ্রহণ না করিয়াও যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মহম্মদকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়াছিলেন, সেই আবুতালেব আলির পিতা। মহম্মদের প্রথম পত্নী খতিজা বিবি, ও খতিজাবিবির গর্ভজাত মহম্মদের কন্যাগণ, মহম্মদের ক্রীতদাস জেদ এবং আলি –ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে মহম্মদকে "আল্লার রসুল" বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। দুষ্ট কোরেশগণ যখন মহম্মদকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন মহম্মদের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আলিই আততায়ীদিগকে প্রতারিত করতঃ মহম্মদকে পলায়নের সুযোগ প্রদান করিয়া আততায়ীগণের প্রচণ্ড বিদ্বেষ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। যেখানে বিপদ সেইখানেই আলি সর্ব্বপ্রথমে বুক পাতিয়া দিয়াছেন। মহম্মদ আলিকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং স্বীয় কন্যা ফতেমা বিবির সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। আলিকে অগ্রাহ্য করিয়া আয়েসা বিবির প্ররোচনায় মহম্মদের সঙ্গীগণ যখন আবুবেকরকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, আলি তখন দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া মুসলমানের রক্তে মহম্মদের পদরেণুপূত আরব দেশকে কলঙ্কিত করিবার ইচ্ছা একবারও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। আবুবেকারের পরে ওমার যখন খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনও বন্ধুগণের পরামর্শ অবহেলা করিয়া আলি নূতন খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ঘাতকগণ যখন ওথমানকে নিধন করিতে গিয়াছিল, তখন আলির পুত্রগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া আহত হইয়াছিলেন। ওথমানের মৃত্যুর পরে যখন আলিকে খলিফা নির্ব্বাচিত করা হইল,—তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিনি উক্ত পদগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

আলির দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনা কারণেও তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁর স্ত্রীর বিমাতা আয়েসা তাঁহার পরম শত্রু ছিলেন। আলির খলিফাপদ প্রাপ্তি আয়েসার মনোমত হইল না। মহম্মদের প্রথম ধর্ম্মপ্রচার কালে আবু সুফিয়ান নামক একজন সম্ভ্রান্ত মক্কাবাসী তাঁহার ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। ওহদের যুদ্ধে (৬২৫ খৃঃ অব্দে) এই আবু সুফিয়ানই মহম্মদ ও তাঁহার মদিনাবাসী বন্ধুগণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদ স্বয়ং এই যুদ্ধে গুরুতর ভাবে আহত হন; তাঁহার পিতৃব্য হামজা নিহত হন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ বিবি সমরনিহত শত্রুগণের কর্ণনাসিকা ছেদন করিয়া তাহার মালা গাঁথিয়া পরিধান করেন। এমন কি মহম্মদের পিতৃব্য হামজার মৃত দেহ হইতে তাহার হৃদয় কর্ত্তন করিয়া লইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দের গর্ভে আবু সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। আলি

যখন খলিফা পদে আরোহণ করেন মোয়াবিয়া তখন সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা। আলি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ধূর্ত্ত মোয়াবিয়াকে পদচ্যুত করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু মোয়াবিয়া খলিফার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বিদ্রোহ অবলম্বন করেন। তিনি আলিকে ওথমানের হত্যার সহায়তাকারী এবং ওথমানের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য নিজে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন। এদিকে আরবের অনেক লোকে ন্যায়পরায়ণ আলির নিকট প্রার্থিত পদ না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আয়েসার সহিত মিলিত হইয়া আলির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আয়েসা নিজে সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া আলির প্রতি বিদ্বেষের চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। একদিন মহম্মদ আয়েসাকে বলিয়াছিলেন "আমার এক পত্নী কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া জেবোর গ্রামে উপনীত হইলে কুকুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে।" আয়েসা যখন সসৈন্যে জেবোর গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন গ্রামের যাবতীয় কুকুর তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। স্বামীর ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করিয়া আয়েসা সভয়ে পলায়নোন্মুক্তা হইলেন। কিন্তু নানাপ্রকার প্রতারণার সাহায্যে তাঁহার দলস্থগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। খোরাইবার যুদ্ধে আয়েসার সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইল এবং আয়েসা বন্দীভাবে আলির নিকট নীত হইলেন। উদারহৃদয় আলি সসম্মানে শ্বশ্রূকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে মদিনায় প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু আয়েসাকে পরাস্ত করিয়া আলি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মোয়াবিয়া রক্তাক্ত গাত্রাবরণ সংগ্রহ করতঃ ওথমানের ডামস্কাস নগরে পথে পথে তাহা প্রদর্শন করিয়া দামস্কাস্‌বাসীগণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মিশর বিজয়ী অমরু মোয়াবিয়ার সহিত যোগদান করিলেন, এবং উভয়ে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আলির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

সিফিন প্রান্তরে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সাহসে ও পরাক্রমে আলি অমরু ও মোয়াবিয়া কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনমাস যাবত উভয় সৈন্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহাতে মোয়াবিয়ার সৈন্যগণই ক্রমাগত পরাজিত হইতে থাকে। অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া মোয়াবিয়া স্বাভাবিক ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিলেন।

কতিপয় সৈন্যের বর্শার অগ্রভাগে কয়েকখণ্ড কোরাণ স্থাপন করিয়া মোয়াবিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "এই আমাদের পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক ইহাতে মুসলমানের রক্তপাত নিষিদ্ধ আছে। এই পুস্তকের সাহায্যে আমাদের বিবাদের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।" মোয়াবিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আলির সৈন্যগণ কোরাণের উপদেশের কথা শুনিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিল। সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য মোয়াবিয়ার ধূর্ত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়া আলি বক্তৃতা করিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না। সৈন্যগণ বলিয়া উঠিল

"ওথমানের মত তোমাকেও আমরা হত্যা করিব।"

সালিশীদ্বারা বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্ত সৈন্তগণ একজন সালিশ মনোনীত করিতে আলিকে অনুরোধ করিল। করতলগত বিজয়-লক্ষ্মীকে অপস্থত হইতে দেখিয়া আলি ক্ষুণ্ণ হইয়া পাড়য়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আমার যখন স্বাধীনতা নাই, তখন তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" সৈন্তগণ আবুমুশা নামক একজনকে আলির পক্ষে সালিশ নিযুক্ত করিল। মোয়াবিয়ার পক্ষে নিযুক্ত হইলেন—চতুর অমরু। অমরু আবুমুশাকে বুঝাইলেন "মোয়াবিয়া ও আলি কাহারও রাজপদে নির্ব্বাচন বিধিমত সম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং প্রথমতঃ উভয়কেই খলিফার পদ হইতে অবনমিত করিয়া, পুনরায় খলিফা নির্ব্বাচনই সঙ্গত, সে নির্ব্বাচনে আলি ও মোয়াবিয়ার মধ্যে যিনি জয়লাভ করিবেন—তিনিই বৈধ খলিফা বলিয়া স্বীকৃত হইবেন।" আবুমুশা অমরুর শঠতা বুঝিতে না পারিয়া প্রতারিত হইলেন। সালিশীর দিন উপস্থিত হইলে, আবুমুশা দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় অঙ্গুলি হইতে এক অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিতে করিতে বলিলেন "এই অঙ্গুলী হইতে যেমন আমি এই অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া ফেলিতেছি—তেমনি খলিফার সিংহাসন হইতে আলি ও মোয়াবিয়া উভয়কেই অবনমিত করিলাম।" পরমুহূর্ত্তে অমরু দণ্ডায়মান হইলেন, এবং স্বীয় অঙ্গুলীতে এক অঙ্গুরীয়ক পরিধান করিতে করিতে বলিলেন "যেমন আমি এই অঙ্গুলীতে এই অঙ্গুরীয়ক অর্পণ করিতেছি, তেমনি খলিফার শূন্য সিংহাসন ও রাজত্ব আমি মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিলাম। মোয়াবিয়াকে ওথমানের ন্যায় সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া, আমি অভিনন্দন করিতেছি।"

আলির সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। তাঁহার সৈন্তগণ আপনাদের দুর্ব্বুদ্ধিতার পরিণাম দেখিয়া একে একে ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং "খারিজিত" নামে পরিচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে আলি ও মোয়াবিয়া উভয়েই খলিফা পদের অনুপযুক্ত। আলি, অমরু ও মোয়াবিয়া এই তিনজনকে সমস্ত অনর্থের মূল মনে করিয়া তাহারা তিনজনকেই বিনাশ করিবার সংকল্প করিল। ষড়যন্ত্রকারীগণ এক দিনে তিন জনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে কুফা, দামস্কস ও মিশরে গমন করিল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে প্রাসাদের বাহিরে আগমন না করায় অমরুর প্রাণ রক্ষা হইল। মোয়াবিয়া সামান্যরূপ আহত হইয়া পলায়ন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিল। নিয়তি-পীড়িত আলিই কেবল ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সমগ্র মুসলমান ইতিহাসে আলির প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য্য সরলতা ও বিনয় মুসলমান সমাজের আদর্শ। তাঁহার বাহুবলেই মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে ঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাধিক বৎসর যাবত মুসলমানগণ ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার স্মৃতির পূজা করিয়া আসিতেছেন। আলি ও মোয়াবিয়ার বিবাদ হইতে সিয়া-সুন্নি পার্থক্যের সূত্রপাত হয়। সিয়াগণ আলির পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন

খলিফাকে ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন না। মহম্মদের পরেই তাঁহারা আলিকে প্রথম খলিফা বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারা আলিকে মহম্মদের সমকক্ষ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। অনেকে আবার মহম্মদ অপেক্ষাও আলিকে উচ্চাসনদান করিতে চান। সুন্নিগণ আলির এতাদৃশ গুণ ছিল বলিয়া স্বীকার করেন না। উভয় সম্প্রদায়ের আর একটী পার্থক্য এই যে সিয়াগণ মুসলমানসমাজের প্রাচীন পদ্ধতি মানিয়া চলিতে স্বীকৃত নহেন, একমাত্র কোরাণই তাঁহাদের গ্রাহ্য। সুন্নিগণ কোরাণের ন্যায় প্রাচীন পদ্ধতির উপরও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তুরস্ক, মিশর, আরব ও ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই সুন্নিমতাবলম্বী, তাহার পারস্য ও ভারতীয় মুসলমানগণের কিয়দংশ সিয়া মতাবলম্বী।

কুফা নগরে আলি নিহত হন। তথায় একপকাণ্ড মসজিদ আজিপর্য্যন্ত তাঁহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। স্থানটীর নাম "মেসেদ আলি" (আলির সমাধিস্থান)। ইহা মুসলমানগণের তীর্থস্থান।

আলির মৃত্যুর পরে তৎপুত্র হাসান খলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অত্যল্প দিন মধ্যেই তিনি মোয়াবিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া খলিফাপদ ত্যাগ করেন। তবুও ওমায়দগণের নির্দ্দয় হস্ত তাঁহাকে ক্ষমা করে নাই। মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের প্ররোচনায় মদিনানগরে হাসান নিহত হন। হাসানের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আলির দ্বিতীয় পুত্র হোসেন কারবালা ক্ষেত্রে নিহত হন। তথায় কালে এক স্বর্ণমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্থানটী মেসেদ হোসেন (হোসেনের সমাধি) নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আজিও সিয়াগণ মহরমের সময় "হা হোসেন, হা হাসান" এইরূপ করুণ রবে শ্রোতার মন বিচলিত করিয়া দেয়।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

দৈবীখাল।

(১)

বরুণা নামে নদী; তার একদিকে সোনাপুর গ্রাম, অপরদিকে 'ঝিল্লা' নামে অনতি উচ্চ শৈলশ্রেণী। গ্রামে অনেক ঘর কৈবর্ত্ত নমঃশূদ্র ও জোলাজাতির বাস। পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু এখন একটি সংকীর্ণ খাল নদী হইতে পাড় ভাঙ্গিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া একটি আঁচড় কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রতিবেশী সনাতন ও ধনরাম কৈবর্ত্তের মধ্যে আগে বেশ মেলামেশা এবং আত্মীয়তা ছিল, কিন্তু এই অদ্ভুত খালের প্রবাহে তাহাদের দুই বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা জায়গাটিতে যেমনি ভাঙ্গন ধরিতে সুরু হইল সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহাদের অন্তরেরও বিচ্ছেদ সূচিত হইয়া সহস্র তুচ্ছ ব্যবহারের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ তাহাদের মনের বিদ্বেষ অসদ্ভাব সেই খালটির মতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সনাতনের বাড়ী হইতে ধনরামের বাড়ী

প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে, মাঝের খালটি পনের হাতের বেশী হইবে না। খালের উপর একটি বাঁশের সাঁকো দ্বিধাবিভক্ত গ্রামটিতে লোক চলাচলের পথ করিয়া দিয়াছে। বাহিরের এই খালটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ও ঘনরামের মধ্যে অন্তরের বিচ্ছেদ যতই বাড়িয়া যাইতেছিল ততই এই বর্দ্ধনশীল সাঁকোটির মত গ্রন্থনবদ্ধ অন্য দুইটি স্থিতিস্থাপক হৃদয় একটা অজ্ঞাত বেদনার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। তের চৌদ্দ বৎসরের দুলাই তাহার পিতা সনাতনের একমাত্র পুত্র, দশ এগার বৎসরের মনু ঘনরামের একমাত্র কন্যা; পরিবারের অসদ্ভাব তাহাদের প্রীতি বন্ধন যেন প্রতিদিন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল।

ক্ষুদ্র বরুণায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচির আর অন্ত নাই; সকাল সাঁঝে নদীতটে সমাগত গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও বুঝি অন্ত নাই। শ্যামলতা ও রাঙিমার মোহবেষ্টনে বদ্ধ অগণ্য বীচি-শিশুগুলা রবিকরদীপ্ত নীল আকাশের নীচে সকাল সন্ধ্যায় বর্ণের পর বর্ণ হৃদয়ে লেখে আর মুছে, এবং হাত ধরাধরি করিয়া মৃদু মধু চঞ্চল চরণ ফেলিয়া নৃত্য করিয়া বেড়ায়; সুখ সৌন্দর্য্য হাসিগানের তাহারা অক্ষয় ভাণ্ডার। দুঃখকেও তাহাদের একটুকুও গ্রাহ্য নাই, আকাশ আঁধারে ছাইয়া আসুক তবু বাহির হইতে চক্ষুগুলি মুদিয়া লইয়া মায়ের দুটি বাহুবেষ্টনের মধ্যে তাহাদের হর্ষ নৃত্য ও কলধ্বনির তখনো বিরাম নাই। এতগুলার মাঝে দুইটিকে আমাদের প্রয়োজন, দুইটি মাত্র বীচি, অনন্ত সংসার সাগর লীলায় ক্ষুদ্র দুইটি বীচিভঙ্গ।

"মনু, মনু, ও মনু! দাঃ আর ডাকব না, ডাকতে ডাকতে গলা ধরে গেল, তারণকে নিয়েই যাব। তারণ, তারণ! চল্ ঝিল্লার নীচের জামগাছ থেকে জাম নিয়ে আসি।"

তারণ মনুর জ্যাঠ্তুত ভাই, খালের ওপারে নদীতটে সে নুড়ি কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। সে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "চল।" দুলাই নিমেষের মধ্যে খালে বাঁধা ছোট্ট ডিঙ্গিতে ছোট্ট বৈঠা ধরিয়া নদীতে আসিয়া পড়িল। তারণ আসিয়া উঠিলে দুলাই বলিল "দেখ ভাইয়া আজ মনুকে একটাও জাম দেব না," তাহার কণ্ঠস্বর রাগে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তারণ নৌকার একধারে বসিয়া নদীর জলের উপর ঝুঁকিয়া মুখ দেখিতে লাগিল, আর দুলাই প্রত্যেক বৈঠার ঘায়ে শীতল জলের মধ্যে প্রভাতের মৃদু উষ্ণ সুখস্পর্শ সূর্য্যরশ্মিকে শাণিত ইস্পাতের ছুরির মত অপূর্ব্ব সুন্দর ঝক্‌ঝকানিতে জাগাইয়া দিয়া ডিঙ্গি বাহিয়া চলিল; কিন্তু কিছুতেই আজ তাহার তেমন উৎসাহ বোধ হইতেছিল না। তবে নিরুৎসাহ প্রকাশ করাটা দুলাইএর স্বভাব নয়, সে কণ্ঠ ছাড়িয়া গান ধরিল,—

বাঙা পুরুষ হেসে উঠল পূবের কোণে,
নয়ন মেল নয়ন মেল ওগো ললনে।

হঠাৎ তীর হইতে চীৎকার শোনা গেল 'দুলাইদা, দুলাইদা আমাকে নেবে না?' নৌকা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, আপনা আপনিই যেন স্রোতে ভাসিয়া গিয়া কিছু দূরে পাড়ের একটি বাড়া অংশে লাগিয়া পড়িল; মনু দৌড়িয়া গিয়া নৌকায় উঠিল; উঠিয়াই চঞ্চল বালিকা হাত পা নাড়িয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে সর্ব্বশরীর দিয়া যেন বলিতে আরম্ভ করিল,—"দুলিদা, কাল রাত্তে যা স্বপ্ন দেখেছি

সে কি আর বল্‌ব? যেন একটা মস্ত বড় লালচোখো বাঘ ঝিল্লার পাহাড় থেকে লাফিয়ে নদী সাঁতরিয়ে আমার শিয়রের কাছে এসে আমাকে খাবে বলে হাঁ করে রয়েছে, আমি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম; জোরে তোমাকে ডাক্‌লাম, কিন্তু মুখে শব্দ ফুটল না; তখন হঠাৎ জেগে দেখি ভোর হয়েছে, দৌড়ে তোমাদের বাড়ী তোমাকে বল্‌তে গেলাম, তুমি তখনো ঘুম থেকে ওঠনি। আচ্ছা দুলিদা আমাকে না নিয়ে আজ—" মনু এতক্ষণ নিজের ভাবেই এতদূর বিভোর ছিল যে দুলাই এর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার তাহার অবসর হইয়া উঠে নাই; হঠাৎ যখন সে বুঝিতে পারিল দুলাই তাহার কথায় কিছু মাত্র কান দিতেছে না; মনোযোগের সহিত মাথা গুঁজিয়া বৈঠা পরিষ্কারে প্রবৃত্ত আছে তখন বালিকার সদ্যোদ্দীপ্ত উজ্জ্বল হাস্যস্ফূর্ত্তি নিমেষের কাল মেঘে যেন সহসা একেবারে মলিন হইয়া গেল; বালিকার মুখে আর কথা সরিল না।

সকলে আসিয়া নদীর পর পারে নামিয়া পড়িল। দুলাই আঁচল ভরিয়া গাছ হইতে জাম পাড়িয়া আনিল, কিন্তু মনুকে একটাও দিল না। সে মনুকে ফেলিয়া এখানে সেখানে কতক্ষণ ছুটিয়া বেড়াইল। কিছু পরে মনুকে বেদনা দিবার নূতন উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিতেছিল এমন সময় সহসা তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল; অদূরে জামগাছের নিকটবর্ত্তী নিম্নভূমি দিয়া প্রবাহিত ঝরণার জল হইতে উঠিয়া একটা বন্য মহিষ তাহার শিং বাগাইয়া দুইটা করুণ চক্ষুর বিশ্বাসঘাতক স্থিরদৃষ্টিতে মনুকে লক্ষ্য করিতেছিল। সর্ব্বনাশ! এ যে মনুর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! দুলাই দারুণ উৎকণ্ঠাপূর্ণ সভয় উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল "মনু মনু সরে যা, মহিষ মহিষ!" চিন্তামগ্ন মনু হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে এত জড়সড় হইয়া গেল যে এক পা নড়িতে পারিল না, বায়ুতাড়িত পত্রের মত শুধু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য দুলাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল,—পর মুহূর্ত্তে হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই চট্ করিয়া তুলিয়া সজোরে মহিষের মাথা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। তাহার অব্যর্থ লক্ষ্য এবং প্রস্তর খণ্ডের মহিমায় মহিষের একনিষ্ঠ গতিবেগ থামিয়া গেল; মহিষের নাক দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল, সে এক মুহূর্ত্তে ফিরিয়া যন্ত্রণা-সূচকশব্দ করিতে করিতে পলাইয়া গেল। দুলাই দৌড়িয়া আসিয়া কম্পমান অর্দ্ধ চেতনালুপ্ত মনুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

(২)

"মনু, আর কখনও যদি তুই ঐ পাজি ছোড়াটার সঙ্গে যাবি তবে তোর হাড়গোড় ঠেঙ্গায়ে একেবারে গুঁড়া করে দিব।" বলিষ্ঠ দেহ যণ্ডামার্ক ঘনরাম মাছ বিক্রয়ের পর বিকালে বাড়ী আসিয়া তারণের নিকট হইতে যখন সকালের ঝিল্লা ভ্রমণের বিশেষ বিবরণ শুনিল তখন তাহার আর রাগের অন্ত রহিল না। ঘনরাম সেই শ্রেণীর লোক যাহাদের অন্তরদেশে প্রচুর দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে একটু সংঘর্ষ বা তপ্ত হাওয়ার সংস্পর্শ পাইলেই আর কথা নাই অমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

অগ্নিগর্ভ ঘনরামের রাগের প্রথম ধাক্কা তারণের উপর দিয়াই গেল, এবং তাহা যাওয়াই ত সঙ্গত; কারণ সজীব পদার্থের মধ্যে সেখানে দ্বিতীয় কেহ ছিল না, এমন কি গরু মহিষ শিয়াল কুকুরটা পর্য্যন্ত নয়,—থাকিবার মধ্যে শুধু জড় মাটি আর কঠিন পাথরের টুক্‌রা,—বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান-স্বপ্নের সহিত অপরিচিত ঘনরামের নিকট তা'রাত আর মনুষ্য হৃদয়ের সহিত ভাবের আদান প্রদানের যোগ্য নয়! ঘনরামের দ্বিতীয় ধাক্কা অবশ্যই মনুরই প্রাপ্য; মনুর কোমল গণ্ডগ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশের সহিত তাহার শিরাস্ফীত ফাটাহাতের সংস্পর্শ বেশ একটু প্রচণ্ড হইয়াই উঠিয়াছিল। ঘনরামের তৃতীয় ধাক্কাটা যে কাহার উপর কল্পিত হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানি না; তবে ক্রোধমাত্রার ক্রমিক বর্দ্ধনশীলতা এবং পশ্চাদ্বর্ণিত ঘটনায় মনে হয় আরো একটু বেশী অবসর পাইলে তৃতীয় ধাক্কাটা একটা প্রলয় কাণ্ডে পর্য্যবসিত হইত,—কিন্তু বিশ্ব-সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু বোধ হয় তখন অনুকূল ছিলেন,—তাই আর প্রলয়-কাণ্ডটা তখন ঘটিতে পারিল না।

ঘনরাম দ্রুত ঘন ঘন পাদক্ষেপে খালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। খালের ওপারে নদী তটের কাছে সনাতন তাহার পুরাতন জালে গাবের আটা লাগাইতে ব্যাপৃত ছিল। ঘনরাম একেবারে সপ্তমে সুর চড়াইয়া সনাতনের উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ হইতে দুলাইকে পর্য্যন্ত খুব গাল পাড়িয়া লইল। হাট হইতে পঞ্চানন নমঃশূদ্র বাড়ী ফিরিতেছিল, সনাতন তাহাকে ডাকিয়া বলিল "দেখ ত পঞ্চানন দা, ওর রকমটা দেখত, ওটা কি ভদ্রলোকের মতো হলো; আমি ওকে কি বলিছি, গায় পড়ে কেন ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসে?"

ঘন। না তুই কি কিচ্ছু বলিস্, তুই শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারিস্; পাজি শ্যালাকে চিবিয়ে খেলে তবে আমার গায়ের ঝাল মেটে।

সনা। ও রতন খুড়ো, রতন খুড়ো, দেখে যাও ত, কাণ্ডখানা দেখে যাও ত; এই পঞ্চানন দা সাক্ষী—আমি ভদ্রলোকের মত কাজ কর্‌ছি, কিচ্ছু বল্‌তে কিচ্ছু না, আমার উপর এসব কেন?

ও পাড়ার রতন, নাজির সেখ, রামনাথ এবং আরো-কয়েকজন আসিয়া সেখানে জড় হইল। পঞ্চানন সকলকে বৃত্তান্তটা জানাইয়া দিল। সনাতন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমরা সকলে দেখ এতে আমার কি দোষ, ওর ব্যাভারটাও দেখ্‌লে, ওটা কি ভদ্রলোকের মত ব্যাভার হলো? তোমরা সকলে আছ, নইলে ও হয়ত আমার খুন করে ফেল্‌ত!"

ঘনরাম একটা বংশদণ্ড লইয়া ও পার হইতে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে "শ্যালা কেবল 'ভদ্রলোক ভদ্রলোক' করে, কি ভদ্রলোক রে শ্যালা, সকলের সাম্‌নেই আজ তোকে খুন কর্‌ব, শ্যালা সয়তানের আন্দি!" বংশদণ্ড খাড়া ভাবে উন্নত করিয়া পুল পার হইয়া ঘনরাম সনাতনকে মারিবার জন্য এপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকজন লোক গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, রতন সনাতনের আপন লোক, সে ঘনরামকে

মারিতে উদ্যত হইল; অন্যান্য সকলেও ঘনরামের এই অন্যায় ব্যবহারে তাহার প্রতি অত্যন্ত রাগিয়াছিল, রতনকে কেহ বাধা দিতে চাহিল না। তখন সনাতন গিয়া রতনের হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল "মেরো না, ভদ্রলোকে কি মারামারি করে!"

ভদ্রলোক-সুলভ সনাতনের এই ক্ষমা-প্রবণতায় ঘনরামের কথঞ্চিৎ শমতা-প্রাপ্ত রাগ আবার দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এবার ঘনরামের রাগ গ্রামবাসীদের হস্ত বন্ধন এড়াইয়া সনাতনের মাথায় বংশ-দণ্ডের এক আঘাতে পরিণত হইল। সে আঘাতে দুর্বল সনাতন ভূমিশায়ী হইল, তাহার মাথা সামান্য কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। পিতৃভক্ত দুলাই কিছু দূরে বড়্‌শির ছিপ হাতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল; সে অন্যায় সহ্য করিবার ছেলে নয়—তথাপি ঘনরামের উপর হাত তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই,—কিন্তু ঘনরাম যখন তাহার পিতাকে আঘাত করিল তখন দুলাই সমস্ত ভুলিয়া গেল,—বড়্‌শির গোড়ার দিক বাগাইয়া দৌড়িয়া গিয়া সে ঘনরামের মাথায় সজোরে এক ঘা বসাইয়া দিল। সরু ছিপের আঘাতে ঘনরামের বিশেষ কিছু হইল না। একজন দুলাইকে ঠেকাইয়া রাখিল; রতন ঘনরামের হাতের দণ্ড কাড়িয়া লইয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা' দিল। দুই একজন গ্রামবাসী মধ্যস্থ হইয়া গোলমাল মিটাইয়া দিয়া ঘনরামকে ধরিয়া তাহার বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। সনাতন তখনো কিছু বলিল না, কেবল যখন রামনাথ তাহাকে ধরিয়া তুলিল তখন তাহার বাহিরের চক্ষু দুটার অন্তরালে আর এক জোড়া চক্ষু যেন ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে ঘনরামের কথিত সয়তান-সুলভ নর-কাগ্নি-শিখার একটা ক্ষণিক গোপন দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছিল।

ঘটনা স্থান হইতে কিছু দূরে আসিয়া পঞ্চানন বলিল "দেখ্‌লে শ্যালা ঘনরামের কাণ্ডটা, ব্যাটাকে বরাবর আমি দেখ্‌তে প্যারি না। দেখ্‌লে সনাতন কেমন, এত গালিগালাজ মারপিট মুখে রা'টি নেই। ওর মত লোক হয় না।" রাম মুন্সি বলিল "ঠিক! ওদিন দেখ্‌লে না বাজারে করিম সেক তাকে কি নাস্তানাবুদটাই কল্লে! এই ঘটনার পর করিমের বাড়ী পুড়ে যায়; কেরামদ্দি, আইনদ্দি, তারা সবে বলে যে ও সনাতনের কাজ, আমার কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস হয় না। হরি আমায় বলিল "এ হতেই পারে না!"

(৩)

মা-মরা মনু পিতাকে ভাল-ও বাসে ভয়-ও করে। অভিমানী অথচ বিদ্রোহ-ভাব বিরহিতা বালিকা পিতার হাতে মার খাইয়া একমাত্র দুলাইদা ভিন্ন কাহারো নিকট সান্ত্বনার আশা রাখিত না, অথচ পিতার নিষেধে সে পথেও কাঁটা। যাহাদের অভিমান মনের এবং বাহিরের ছোটখাটো বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তাহাদের ব্যথিত হৃদয় সেই বিদ্রোহের মধ্যেও একটা বলিষ্ঠ আশ্রয় পায়, সেই উন্মাদনাই ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা লাঘব করে। কিন্তু প্রতিশোধ নিশ্চেষ্ট বিদ্রোহহীন সহজ সরল ঘরকন্নার ভিতর দিয়া যে কষ্ট বহন করিতে হয় তাহা অত্যন্ত গভীর। মনুর তাহাই হইয়াছিল। পিতার

নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে চুপ্‌টি করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল, সারাটা বিকাল তাহার কি ভাবে কাটিল সেই শুধু জানে। তখন গ্রামসুদ্ধ সনাতন ও ঘনরামের ঝগড়ার কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে,—মন্নুও শুনিল যে দুলাই তাহার পিতাকে মারিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ছেঁড়া কাঁথা ও ময়লা বালিসের উপর মন্নুর রুদ্ধ অশ্রুবেগ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুলাই সেদিন সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নদীর পারে পারে অকারণে ছিপ হাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল; মাছ ধরিবার চেয়ে সেদিন তার হাওয়া খাইবারই বেশী প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছিল। বিকালের সেই ঘটনার অল্প পরেই তাহার রাগ কিছু পড়িয়া আসিতেই তাহার যেন কেমন একটা অনুশোচনার ভাব জাগিল। ছিঃ সে ঘনরামকে মারিয়া ভাল করে নাই, না জানি মন্নু তাহার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছে!

এইরূপে কয়দিন কাটিয়া গেল। সনাতন নৌকায় তিন চারিদিনের পথ দূরে সহরে গিয়া ঘনরামের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। ঘনরামও রতন এবং সনাতনের বিরুদ্ধে পাল্টা নালিশ রুজু করিল। সকল সাক্ষীই সনাতনের পক্ষে; ঘনরামের কিছু দিনের জন্য জেল হইয়া গেল।

সনাতন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সকলেই বেশ শান্তিতে আছে, কোনো ঝগ্‌ড়া ঝাঁটি নাই। কিছু দিন পরে একদিন হঠাৎ শোনা গেল মন্নুদের একটা গাই হঠাৎ মাঠ হইতে বাড়ী আসিয়া মাটিতে আছাড়িয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। রামদীন ওঝা গ্রামের ভূতে পাওয়া অনেক মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুকে আরোগ্য করিয়াছে; সে-ও ইহার কোনো কিনারা করিতে পারিল না। অল্পদিন পরেই আর একটি গরু মারা গেল। যথা ক্রমে হরি চামার আসিয়া দুইটিরই চামড়া লইয়া গেল। দুগ্ধবতী গাভীদের মধ্যে অবশিষ্ট তৃতীয়টিকেও যখন গাভীদের শমনের (রামদীনের মতে সকল জীবেরই পৃথক পৃথক শমন আছে) হাত হইতে ফিরান গেল না তখন রামদীন মন্নুর জ্যেঠাই মাকে বলিল "এ বড় শক্ত 'দেওয়ে' ধরেছে, আর দেখ্‌ছ না দুধওয়ালা গাইয়ের দিকেই নজরটা বেশী, এত সহজে ছাড়্‌ছে না। অন্যান্য গাইগরু এবং তোমাদের পর্য্যন্ত এ ছেড়ে কথা কবে না। ফকিরের দরগায় তোমাকে সিন্নি দিতে হবে,—তার জন্য সোয়া সের দুধ, সোয়া সের ঘি, সোয়া সের মাখন, সোয়া সের ঘোল, সোয়া সের দই আর সোয়াটা টাকা দিতে হবে।" নানা রোগে টোট্‌কা ঔষধ প্রয়োগ, গ্রামের মেয়েমহলে বুদ্ধি ও উপদেশ বিতরণ—এবং কর্কশ কণ্ঠের জন্য তারণের মা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল "বটে শক্ত দেওইত বটে, আমি এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছি,—ও সব ঐ বিদ্‌ঘুটে ব্যাটা সনাতনের কাজ; ও হরি চামারের সঙ্গে কি পরামর্শ করছিল কয়দিন হল আমি দেখেছি; নিশ্চয় ঐ দুই ব্যাটা মিলে আমার গরুগুলিকে বিষ খাইয়ে মেরেছে; আমুক আগে মন্নুর বাপ, এর শোধটা তুল্‌বে এখন। তুমি যাও সিন্নি মিন্নিতে এর কিছু হবে না।" এখানে বলিয়া রাখা ভাল তৃতীয় গরুটি মারা

যাওয়ার পর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আশ্চর্য্য সত্ত্বরতার সহিত কোথা হইতে হরি চামার আসিয়া তাহার প্রাপ্য চামড়াটি লইয়া গিয়াছিল।

(৪)

কোনো ইতিহাসে এবং কোনো কাব্যে অথাৎ কোনো একটি লোক তাহার পরিবারের এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর নাকি বলিয়াছিল "একজন মারা গেল তাতেও ত দুঃখ নাই, কিন্তু যমে যে পথ চিনিয়া ফেলিল।" আমাদের তারণের মা-ও বলিতে পারিত 'গাই মারা গেল শুধু তা ত নয় —সঙ্গে সঙ্গে বিপদ যে পথ চিনিয়া ফেলিল'; কারণ কয়দিনের মধ্যেই একটি মাত্র ঘর অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাদের বাড়ীটিও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; তারণের মা মনু ও তারণকে লইয়া সেই ঘরে আশ্রয় লইল। ধনরামের সঞ্চিত সামান্য অর্থ, এবং তারণের মার পরামর্শে সে যে দুই এক জায়গায় টাকা ধার দিয়াছিল সেই সব তমসুকও আগুণে পুড়িয়া গেল। তারণের মার নিজের সামান্য অর্থ দিয়া সংসার চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় তারণের মার কণ্ঠস্বর উচ্চতর থাদে উঠিয়া সমস্ত গ্রামে যে সব কথা প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল তাহাতে গ্রামবাসীদের মনে সনাতন সম্বন্ধে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক; এমন কি দুলাই পর্য্যন্ত এই সন্দেহের স্পর্শ হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারিল না। একটা অপ্রিয় সত্যের আভাসে দুলাইএর মনে প্রথমটা অত্যন্ত আঘাত লাগিল। যে যোদ্ধা সত্যের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন পণ করিয়া বহুদিন যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে সে যদি হঠাৎ জানিয়া ফেলে যে সে সত্য শুধু ভিত্তিহীন মিথ্যার মায়া-কুহেলিকা মাত্র তখন তাহার যেমন আঘাত লাগে দুলাইও প্রথমটা সেইরূপ বেদনা অনুভব করিল। কিন্তু কিছু পরেই সে যেন একটা দুঃসহ দায়িত্বভার হইতে মুক্তি লাভের অনির্ব্বচনীয় আরাম বোধ করিতে লাগিল, আর তাহার মিথ্যা যুদ্ধ করিয়া মরিতে হইবে না; যে পথ খাঁটি, যাহা সত্য, যাহা হৃদয়ের রক্তে বিচিত্র, সহৃদয়তায় কোমল দুলাই আজ হইতে সেই পথই অবলম্বন করিতে পারিবে।

ঝিল্লার পাহাড়ের আড়াল দিয়া লাল হইয়া তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; মন্দ স্রোতে স্থির বরুণার জল যেন সোনার স্বপ্ন দেখিতেছে। দুলাই ধীরে ধীরে সাঁকোটি পার হইয়া মনুদের বাড়ীর সাম্‌নে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে তারণ নুড়ি লইয়া খেলা করিতেছিল, এবং বাড়ীর একটা পোড়া ভিতের উপর মনু দুলাইদের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া মৌন হইয়া বসিয়াছিল। মনু দুলাইকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া ফেলিল। তারণ দুলাইকে আসিয়া বলিল "কাকা আর মা আমাকে ও মনুকে তোমার সঙ্গে যেতে মানা করে দিয়েছে, আমাদের কাছে তুমি আর এসোনা।" মনু গূঢ় বেদনায় ভরা একটি মৌন সকরুণ দৃষ্টি তারণের দিকে নিক্ষেপ করিল, তারণ তাহার কোনো অর্থ বুঝিল না। দুলাই মনে মনে একটা নিবিড় ব্যথা অনুভব করিল, এক মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার রঙ

তাহার কাছে ম্লান হইয়া গেল। সে নিজেরও অজ্ঞাতসারে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। হায় মনু! তুমি দুলাইএর সঙ্গে কথা কহিবার জন্য বাহিরের এবং মনেরও প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে কিরূপ যুদ্ধ করিতেছ, দুলাই আঁধার মুখে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তোমার বুকের শিরা যে বেদনায় ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে,—দুলাই তাহার কিছুই বুঝিল না!

(৫)

এমনি করিয়া আরো কয়দিন কাটিল। ঘনরাম জেল খাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। সে সমস্ত দেখিল। উপস্থিত প্রয়োজনের জন্য সে বেচু কৈবর্ত্তের নিকট গিয়া তাহার পাওনা টাকা চাহিল; টাকা নিয়াছে বলিয়া বেচু সাফ্ অস্বীকার করিয়া বসিল; ভজা, মধু, রামনাথ তা'রাও বেচুর পথই অনুসরণ করিল। এই অনুগত লোকেরাও যে এখন এরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার কারণ বুঝিতে ঘনরামের বাকী রহিল না। পদে পদে সনাতনের প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। সে বহুকষ্টে কিছু টাকা ধার করিয়া বাড়ীতে দুইটি ঘর বাঁধিল।

সেদিন সারারাত বৃষ্টি হইয়া গিয়া সকালে উজ্জ্বল আলোকধারা আকাশ হইতে ফাটিয়া পড়িয়া ঝিল্লার বৃষ্টিধৌত শ্যামল পাহাড়ে পাহাড়ে, গাছে বনে, ঝরণার আনন্দকেলিপূর্ণ চঞ্চল বীচিগুলার মাথায় মাথায়, ঝরণা 'চুর্ণার' চুর্ণ জলকণাগুলোর বুকে বুকে পুলকে গলিয়া পড়িয়াছে। সোনাপুর গ্রামটি গত রজনীর অশ্রুজলের ভিতর দিয়া প্রভাতের হাসিতে যোগ দিয়াছে। সোনাপুরের কৈবর্ত্তরা আজ মস্কোর মোহানায় মাছ ধরিতে যাইবে। সোনাপুর হইতে সে জায়গা নৌকায় প্রায় একদিনের পথ; সারারাত তা'রা সেখানে মাছ ধরিয়া পরদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়া ফিরিবে। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রকলাকৃতি বড় বড় মেছো নৌকা তাহাদের মধ্যদেশ জলে সংলগ্ন রাখিয়া এবং দুইদিকে দুই মাথা আকাশে বহু উর্দ্ধে তুলিয়া পালে ও জালের বড় বড় বংশদণ্ডে নভোপট চিত্রিত করিয়া দিয়া বহিয়া চলিল। পাল পাওয়ায় অনেক বেলা থাকিতেই তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। এবার প্রচুর মাছের আমদানী, সকলে মহা উৎসাহে জাল ফেলে আর তুলে এবং ঝাড়িয়া নৌকা বোঝাই করে। মাছ ধরিতে ধরিতে সনাতন ও ঘনরামের নৌকা একবার খুব কাছাকাছি হইয়া পড়িল, এমন কি সনাতনের দাঁড়ের ঘা ঘনরামের ফেলা জালের সীমার মধ্যে পড়িল। দাঁড়ের ঘা'য়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কাতল মাছ ঘনরামের জাল হইতে লাফাইয়া প্রায় পনের হাত দূরে সনাতনের জালের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িল। অমনি ঘনরাম বলিয়া উঠিল "ঐ মাছ আমার"। সনাতন বলিয়া উঠিল "আমার জালে এসেছে এই মাছ আমার।" বেশী কথার প্রয়োজন ছিল না, ঘনরামের জালের কোনো ক্ষেপে আজ বেশী মাছ উঠে নাই, তা'তে এত বড় মাছটা আর কাহারো নয় কিনা সনাতনের জালে লাফাইয়া পড়িল; বিশেষতঃ ঘনরামের দৃঢ় বিশ্বাস মাছের আভাস পাইয়া ইচ্ছা করিয়াই সনাতন দাঁড়ের আঘাত

করিয়াছে; সর্ব্বোপরি সনাতনের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই ঘনরামের হৃদয়ে ক্রোধ এবং বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল;—মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘনরাম মাছ-কাটা দা লইয়া সনাতনের নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আঘাত করিল। সনাতন পূর্ব্ব হইতেই ঘনরামের লক্ষ্য হইতে একটু সরিয়া গিয়াছিল,—তাহাতে তাহার বাহুর দিকে দা'র আঘাত লাগে, সেটা তত মারাত্মক হয় নাই, কিন্তু সনাতন ঘুরিয়া নৌকার ধারাল কিনারায় পড়িয়া গিয়া মাথায় ভয়ানক আঘাত পাইল এবং সংজ্ঞা হারাইয়া জলে পড়িয়া গেল। দুই একজন সাঁতার দিয়া তাহাকে নৌকায় তুলিল। নিকটবর্ত্তী নবগ্রাম থানা হইতে সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

কয়দিন দুলাই রাগে দুঃখে গৃহ হইতে মোটেই বাহির হয় নাই। ঘনরামের প্রতি তাহার পূর্ব্ব ঘৃণা ও ক্রোধ গভীরতররূপে ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন হইতে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া দুলাইএর জীবনের একটা বড় কাজের মধ্যে পরিগণিত হইল। হায়! কিন্তু তাহাতে ত তাহার পিতা আর ফিরিয়া আসিবে না। দুলাইএর মা এই কয়দিন ধরিয়া মাটিতে আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে; তাহাদের রীতিমত খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত হইতেছে না। এই কয়দিনের দুঃখযন্ত্রণায় ও অবিচারে দুলাইএর দেহের উজ্জ্বলশ্রী ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে যেন এখন সহসা চিনা যায় না।

(৬)

সেদিন সকাল হইতে অবিরাম বৃষ্টিপাতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। মুষলধারায় বিরামহীন বারিপাত, মনে হয় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ধরার উপর গলিয়া পড়িতেছে; ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বসংসার কাঁপাইয়া দিয়া ঘন ঘন বজ্রধ্বনি; তপনহীন মেঘে-ঢাকা দিবসের ম্লান আলোর মাঝে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুদ্বিকাশ; দেহমনকে জমাইয়া দিয়া শীতস্পর্শ সূচিতীক্ষ্ণ বাতাসের অবিরাম সন্ সন্ শব্দ! সারা সোনাপুর গ্রাম রুদ্ধ গৃহের ভিতরে ছেঁড়া-কাঁথা জড়াইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছে; বাহিরে মাঠ ঘাট নদী বিল জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সনাতন ও ঘনরামের বাড়ীর মাঝের খালটি জলে ফুলিয়া উঠিয়া দুই পার স্পর্শ করিয়া পূর্ণ ও বিস্তৃততর হইয়া উঠিয়াছে, খালের জল এখন আর তাহাদের বাড়ী হইতে দূরে নহে; খালের সাঁকোটি দুইদিকে দুই নিম্ন অংশে ডুবিয়া গিয়াছে, মধ্য জায়গায় কতকটা স্থান শুধু জলের উপরে ভাসিতেছে; পুলের মাটি ও অনেক বাঁশ জলে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। দুলাই ঘরে একা বসিয়া আছে এমন সময় সহসা মনু আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইল। তাহার কাপড় ও সর্ব্বশরীর ভিজা, মাথার এলো-মেলো চুল হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল; তাহার চক্ষুতে একটা গভীর বিষাদছায়া এবং করুণাভিক্ষা ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যেন দুলাইকে কি একটা কথা বলিতে আসিয়াছে কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। দুলাইও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মনু ডাকিল "দুলিদা!" দুলাইএর একবার ইচ্ছা হইল আদর করিয়া মনুকে সেই আগেকার মত দুই একটা কথা বলে,

কিন্তু কোথা হইতে দুঃখ অভিমান ও ক্রোধে ভরা একটা জটিল মেঘভার তাহার বাক্যের উৎসমুখ আটকাইয়া রাখিল। মনু আবার ডাকিল "দুলিদা!" দুলাই তখনো কোনো কথা কহিল না। মনু কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন পাশের বাড়ীর মনার মা দুলাইএর মার নিকট কি কথা বলিতেছিল; সহসা একটা কি কথা শুনিয়া দুলাই চমকিয়া উঠিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাশী দিদি কি হয়েছে?" মনার মা বলিল "শুনিস্‌নি ঘনরামের যে ফাঁসি হবে গিয়েছে, শুন্‌ছিস্ না তারণের মা যে কাঁদ্‌ছে?" দুলাই কান পাতিয়া তারণের মার চীৎকারধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে শুনিতে পাইল। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠানে বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; দিনের যা' একটু আলো ছিল তা'ও আঁধারে মিলাইয়া গিয়াছে। দুলাই ধীরে ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেখিল, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না; ধীরে ধীরে জলে নামিল; পুলের ভাঙা অংশে উঠিতে তাহার বুক জল পর্য্যন্ত হইল। সে খাল পার হইয়া মনুদের বাড়ীতে আসিল। এক ঘরে তারণের মা ও তারণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, দুলাই সেখানে গিয়া দেখিল মনু নাই, তারণের মা তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না। দুলাই প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক কোণটি পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল, কোথাও মনুকে দেখিতে পাইল না। সে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মনুকে ডাকিতে লাগিল "মনু, মনু!" কেহ উত্তর দিল না। দুলাই খালের কাছে আসিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল "মনু মনু!" কেহ কোনো সাড়া শব্দ দিল না। আতঙ্কে দুলাইএর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিদায়কালের মনুর বেদনা-কাতর মুখখানা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল; হায়! তাহাতে কত দুঃখ কত অশ্রু লুকাইয়া ছিল।

* * * *

পরদিন প্রাতে মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে একটু একটু রোদের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে; বরুণা শান্তভাবে গান গাহিয়া চলিয়াছে। গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিল সনাতন ও ঘনরামের বাড়ীর মধ্যে সুবিস্তীর্ণ খাল প্রকাণ্ড অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া পড়িয়া আছে; বাহিরের সংযোগকারী পুলটির কোনো চিহ্ন মাত্র নাই, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্রটিও কখন ছিঁড়িয়া গিয়া কোন্ অতলে লুকাইয়া পড়িয়াছে!

গ্রামবাসীরা প্রতিদিন ভোরে আসিয়া খালটি দেখে; এবং প্রতিদিন খালটি কিছু কিছু করিয়া ছোট হইয়া তাহাদের চোখে প্রতিভাত হইয়া উঠে দেখিয়া বিস্মিত হয়।

দুই একদিনের মধ্যেই একদিন গ্রামে সংবাদ আসিল সনাতন ও ঘনরামের মৃত্যুর কথা মিথ্যা! তিন চারি দিনের পথ সহর হইতে কোনো সংবাদই আসিয়া সেই সুদূর পল্লীতে সঠিক পৌঁছে নাই। হাঁসপাতালে থাকিয়া সনাতন মৃত্যু মুখ হইতে বাঁচিয়া

উঠিয়াছে। ঘনরামের মাত্র কয়েক মাসের জন্য জেল হইয়াছিল, সেও শীঘ্র বাড়ী ফিরিবে।

কিছু দিন পরে বরুনার উপর দিয়া দুইটি ছোট ডিঙ্গিনৌকা ভাসিয়া আসিতেছিল, একটিতে সনাতন, অপরটিতে ঘনরাম। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিল; কিন্তু কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কহিল না। ঘনরাম বাড়ী আসিয়াই ডাকিল "মনু, মনু!" কেহ কোনো উত্তর করিল না, শুধু ভাবণের মা কাঁদিয়া উঠিল। সনাতন ঠিক সেই সময়েই বাড়ী আসিয়া ডাকিল "দুলাই দুলাই!" কেহ কোনো সাড়া দিল না, শুধু দুলাইএর মা মাটিতে আছাড়িয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঘনরাম সনাতন উভয়েই খালের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। খাল তখন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, জলের কোনো চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই; শুধু একখানি শুষ্ক সংকীর্ণ রেখা—কোনো দিন সেখানে খাল ছিল তাহার ক্ষীণ পরিচয় দিতেছে। ঘনরাম ও সনাতন দুই জনই অগ্রসর হইয়া সেই রেখাটির উপর মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল, ঘনরামের চোখে সে বিজাতীয় রাগ নাই, সনাতনের চোখে সে নারকীয় দীপ্তি নাই!

* * * *

সেই খালের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান, গ্রামের লোকে ইহাকে "দৈবীখাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। নৌকাবাহী যাত্রীরা খালের নিকট দিয়া যাইবার সময় এই করুণ কাহিনী শুনে এবং সেই সুদূর অতীতের জন্য একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া যায়!

শ্রীসুধররঞ্জন রায়।

পাতালভেদী রাজা।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে বর্ত্তমান যশোহর নড়াইলের প্রসিদ্ধ পল্লী সিঙ্গিয়ার অনতিদূরে এক হিন্দু রাজা ছিলেন। রাজার আসল নাম কি ছিল—তিনি কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন—ধনদৌলত, সৈন্যসামন্ত, ক্ষমতা যোগ্যতা তাঁহার কেমন ছিল,—তাঁহার রাজধানীকেই বা লোকে কি নামে অভিহিত করিত—শতমুখী জনশ্রুতিও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক। তবে তাঁহার সময়ের বহুদূরব্যাপী প্রশস্তগড়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অগণিত ইষ্টক স্তূপ, বৃহৎ অট্টালিকা সমূহের ভিত্তিমূল চিহ্ন, বিশাল সরোবর, নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুপ্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি দৃষ্টি করিলে তিনি যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত ধনশালী নরপতি ছিলেন ইহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রবাদ আছে—রাজা বহিরাক্রমণ হইতে আপনার ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে ভূনিম্নে একটী গুপ্ত পাতালগৃহ নির্ম্মাণ করেন;

এই জন্যই লোকে তাঁহাকে সাধারণতঃ পাতালভেদী রাজা নামে অভিহিত করিত।

ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে রাজরাজড়ার যুদ্ধ অপরিহার্য্য। কালে এই 'পাতালভেদী রাজার'ও গ্রহবৈগুণ্যে কোন মুসলমান নরপতির সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে রাজা নিজের ধনদৌলত ও পরিবার-বর্গকে সেই পাতাল গৃহে নিরাপদে রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আমি যুদ্ধে চলিলাম। ভগবানের কৃপায় যুদ্ধে শত্রু জয় করিয়া আবার আসিয়া তোমাদিগকে লইয়া সুখ শান্তিতে জীবন অতি-বাহিত করিব। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত, তোমাদিগকে এখানেই থাকিতে হইবে।" পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া রাজা যুদ্ধে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় কই!—তা যদি হইত তবে কি জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শোকদুঃখের করুণ ঝঙ্কারে দিক্‌বিদিক আকুলিত হইয়া উঠিত!

রাজা আশা করিয়াছিলেন তিনি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া বিজয় গৌরবে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত সুখশান্তি ভোগ করিবেন। রাজপরিবারও দিন গণিতে ছিলেন—রাজা যুদ্ধান্তে দেশে আসিয়া তাঁহা-দিগকে পাতাল গৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন—তাঁহারা সূর্য্যের আলোকে, রাজার সোহাগে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন। কিন্তু ভগবান—কাহারও আশা পূর্ণ করিলেন না। রাজা যুদ্ধে নিহত হইলেন। সেই পাতাল গৃহের সন্ধান কেবলমাত্র রাজাই জানিতেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত তাঁহার পরিবারবর্গের আশার ক্ষীণ সূত্রটুকুও ছিঁড়িয়া গেল। তাঁহারা সেই পাতাল গৃহেই চিরসমাধি লাভ করিলেন।

বিজয়ী মুসলমান নরপতি সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজার রাজধানী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলি-লেন। রাজা গেলেন—রাজার পরিবারবর্গ, ধনদৌলত, রাজ্য, রাজধানী সব গেল—রহিল কেবল জনশ্রুতি—কালে বুঝি তাও যায়!

এ প্রদেশের আপামর সাধারণের ধারণা, ভূগর্ভে এখনও রাজার সেই পাতালপুরী বর্ত্তমান আছে। এই জনশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই যশোহরের প্রসিদ্ধ নীলকর মিঃ আর, উইলিয়াম একবার এই সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক স্তূপের একটী আমূল খনন করিয়া জনশ্রুতির মূল রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে যশোহরে ভীষণ নীলবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় উদ্যোগী উইলিয়ম বিপন্ন হইয়া নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 'পাতালভেদী রাজা'র মূল রহস্য ভূগর্ভের যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেল।

কিন্তু কে বলিতে পারে—এই অগণিত স্তূপ নিম্নে—এই পাতাল গৃহের গুপ্ত কক্ষে 'পাতালভেদী রাজা'র কোনও অজানিত পরিচয় পত্রে বাঙ্গালা ইতিহাসের কোনও অজ্ঞাত পৃষ্ঠা লুক্কায়িত আছে কিনা!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

দগ্ধ মৎস্য।

আমার জীবনে একটা প্রহসন অভিনীত হইয়া গেছে তাহা তোমরা জাননা।

তখন সবেমাত্র ব্যারিষ্টার হইয়াছি। এক পয়সা উপার্জ্জন নাই। মামা হাইকোর্টের একজন বড় ব্যারিষ্টার;—প্রত্যহ তাঁহার গাড়িতে কোর্টে যাই, সেখানে এ এজলাস, সে এজলাস করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াই, গাঁটের পয়সা ভাঙিয়া ইংরাজি হোটেলে টিফিন খাই এবং বৈকালে শূন্য পকেটে শুষ্ক মুখে বাড়ি ফিরিয়া আসি—তখন কাজের মধ্যে এই!

প্রথম যখন ব্যারিষ্টার হই তখন মনে করিয়াছিলাম, মা লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের চাবিতে বুঝি এখন হইতে একলা আমারই অধিকার জন্মিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এ কী ব্যর্থতা!

আমার তখনকার দিনগুলার বিশদ বর্ণনা এখানে করিব না, কারণ তাহাতে আমারই মতো ব্রিফ্‌শূন্য অনেক ব্যারিষ্টারের হাঁড়ির খবর বাহির হইয়া পড়িবে। কি জানি, তাহাতে তাঁহাদের মনে যদি দুঃখ হয়! পরের মনে দুঃখ দেওয়া পাপ। সে পাপে আমি লিপ্ত হইতে চাহিনা। তবে এইটুকু জানিয়া রাখো যে বিলাত হইতে হ্যাট কোট বুট টাই প্রভৃতি যে কয়েকটা খোলস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম সকল দুঃখের উপর সেই কটাই আমাকে বেশি করিয়া দুঃখ দিত। সাহস করিয়া তাহাদের ছাড়িতে পারিতাম না কিন্তু তাহারা আমাকে নির্দ্দয়ভাবে ত্যাগ করিবার জন্য—আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবার জন্য বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আমাকে নোটিশ দিয়া বসিয়াছিল। শ্বশুরের পয়সায় বিলাতে খোলস পরিয়াছিলাম, দেশে ফিরিয়া শ্বশুরের নিকট আবার খোলস কিনিবার পয়সা চাহিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হইত। তখন মনে হইত, বিলাত গিয়া এ কী অপকর্ম্মই করিয়াছি! এ গরম দেশে গায়ের কামিজ ও গলার কলার কি ছাই একদিনের বেশি পরিষ্কার রাখা যায়! অথচ প্রত্যহ পরিষ্কার না রাখিলে চাল বজায় থাকে না। পোষাকের এই দীনতা যে কি করিয়া ঢাকিতে হয় তাহার উপায়টা বিলাতে আইন শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিখাইয়া দেয় তাহা হইলে আমার মতো অনেক ব্যারিষ্টারের অনেকটা দুর্ভাবনা কমিয়া যায়।

একদিন মনে হইল, এতদিনে বুঝি মা লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সেদিন সকালে মামা খবর দিলেন যে সন্তোষপুরের জমীদার হরেন্দ্রবাবুর একটা মকদ্দমা আছে, মামা অন্য কাজে ব্যস্ত সেইজন্য এ 'কেস্' তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না—আমাকে তাহার তদ্বির করিতে হইবে। আমি সে সংবাদ পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। আমার বিশ্বাস ছিল আমার কৃতিত্বের অভাব নাই, কেবল তাহা দেখাইবার সুযোগ জোটেনা।

সেদিন সোমবার। বেলা দুইটার সময় আমার সহিত হরেন্দ্রবাবুর দেখা করিতে আসিবার কথা। আমি সেদিন একটু ভালো করিয়া পোষাক করিয়া কোর্টে গেলাম বাড়ি হইতে কয়েকখানা আইনের বই এবং

মামার কয়েকটা পুরানো ফাইল হইতে গোটা দুই বস্তা সংগ্রহ করিয়া উকিল পাড়ায় আমার চেম্বারের আলমারিতে ও র‍্যাকে সাজাইয়া রাখিলাম। খানকতক খবরের কাগজ কিনিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া দিলাম; ঘর ও ঘরের আসবাবপত্রগুলা ভালো করিয়া পরিষ্কার করাইয়া লইলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘরটাকে লইয়া এমনি করিয়া ওলটপালট করিয়া দিলাম যাহাতে দেখিলেই মনে হয় যেন হাইকোর্টের অধিকাংশ কাজের কেন্দ্রস্থল আমার এই ঘর! জনকতক বন্ধুকেও সেদিন বেলা দুইটা নাগাদ অকারণ নিমন্ত্রণ করিলাম—তাহাদের জটল্লাতে আমার ঘরের চিরন্তন নিস্তব্ধতা অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যও ভঙ্গ করিয়া রাখা দরকার!

ঘড়ির কাঁটা যতই দুইটার দিকে সরিতে লাগিল আমার মনের মধ্যেও একটা উদ্বেগ ততই বাড়িতে লাগিল। আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য মন স্থির করিয়া—ঠিক করিয়া লইলাম মক্কেলের সহিত কি ভাবে কথাবার্তা কহিতে হইবে। তাহার পর যখন দুইটা বাজিতে পাঁচ মিনিট তখন তাড়াতাড়ি একটা পুরানো নথি পাড়িয়া একখানা ফুলস্কেপ কাগজ সম্মুখে রাখিয়া 'নোট' করিবার ভাণ করিতে লাগিলাম;—আমার মক্কেল যেন দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে আমার কাজের অভাব নাই—কাজের মধ্যেই আমি ডুবিয়া আছি।

টং টং করিয়া আমার ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল—সিঁড়ির পথে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। আমি একান্ত মনে নথির উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম—যেন সম্মুখ দিয়া কে যায়, কে আসে আমার দেখিবার অবসর নাই।

ঘরে কেহ প্রবেশ করিল না। পদশব্দও দূরে মিলাইয়া গেল। আমার হঠাৎ মনে হইল যেন এমনি করিয়া আমার আশাও মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইতেছে!

আরো আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল তবুও হরেন্দ্র বাবুর দেখা নাই। মনে মনে ভারি বিরক্ত হইতেছিলাম। নথিপত্র লইয়া এতক্ষণ অভিনয়ে আমার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—প্রথমটা যেমন উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিয়াছিলাম তেমন উৎসাহটা আর বজায় রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু না, শৈথিল্য হইলে চলিবে না! মনকে ধমক দিয়া বলিলাম—শৈথিল্য ত্যাগ কর!

প্রায় তিনটা। তখনও জমীদার বাবুর দেখা নাই। একে বাঙালি তায় জমীদার;—আমি মনে মনে বলিলাম—কি ভুলই করিয়াছি! দুইটার সময় যখন দেখা করিবার কথা তখন চারিটার পূর্ব্বে নিশ্চয় শুভাগমন হইবে না—একথাটা আমার আগে বোঝা উচিত ছিল। বিলম্ব দেখিয়া মনের মধ্যে যে একটা নৈরাশ্য আসিতেছিল এই কথাটা মনে হওয়াতে তাহা দূর হইল—আবার যেন একটু বল পাইলাম।

খুট্ করিয়া শব্দ হয় কান তুলিয়া শুনি—খস্ করিয়া কি সরিয়া যায় আড়চোখে দেখি; বাতাসে যেমন দরজাটা নড়িয়া ওঠে অমনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া নথি পড়িতে লাগিয়া যাই। এত সাবধানতা জীবনে কখনো অভ্যাস করি নাই—মনের মধ্যে এত অধীরতা আর কখনো অনুভব করি নাই!

এতক্ষণ আমার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল,—আনন্দে বুকটা একবার নাচিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক ধীরভাবে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সামনের চেয়ারে আসিয়া বসিল। আমি নথি হইতে মুখ তুলিলাম না—কোনো সম্ভাষণও করিলাম না! হঠাৎ একবার মনে হইল কাজটা অন্যায় হইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম—না, এমন না করিলে পসার মাটি হইবে!

দেখিলাম লোকটিও ভারি অদ্ভুত। আমি না হয় তাহার আগমন জানিতে পারিলাম না; কিন্তু কৈ সেও তো তাহা জানাইয়া দিল না! সে বিনা বাক্যব্যয়ে টেবিল হইতে একখানা খবরের কাগজ উঠাইয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল;—ব্যস্ততার কোনো চিহ্ন দেখাইল না।

আমি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলাম। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া একবার চকিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম—"My God! Three O'clock!"

আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া লোকটি একটা ব্যাগ হইতে কতকগুলা কাগজ পত্র বাহির করিতে লাগিল।

আমি অধীরভাবে বলিয়া উঠিলাম—"Excuse me. আমি টিফিনে যাচ্ছি।"

ভদ্রলোকটি অপ্রতিভভাবে কাগজগুলি আবার ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিল, জড়িত কণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা, আপনার টিফিন শেষ হ'ক—আমি অপেক্ষা করচি।"

আমার জীবনের প্রথম মক্কেলটিকে একটু আপ্যায়িত করিবার জন্য আমি বলিয়া উঠিলাম,—"you must be hungry—আসুন না/ হোটেলে যাই—if you don't mind of course!"

ভদ্রলোকটি একটুমাত্র ইতস্তত করিল না। আমার কথাতে একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল;—যাইবার জন্য প্রস্তুত। আমি টুপি লইয়া মুখে একটা ইংরাজি সুরের শিস দিতে দিতে সিঁড়ি নামিতে লাগিলাম—ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। দরজার সামনে আসিয়াই একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম—হাঁক দিয়া বলিলাম—"উইলসন্ হোটেল।"

হোটেলে দুইটা টিফিনের অর্ডার দিলাম। দেখিলাম, ভদ্রলোকটি বিলাতি ধরণে আহার করিতে বেশ পটু! আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম—পল্লীগ্রামের লোকও ছুরি কাঁটা ধরিতে শিখিয়াছে! আদব কায়দা বিলাতি ধরণের হইলেও লোকটার আহারের পরিমাণ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বদেশী! অন্তত তিন দিন উপবাস না করিয়া থাকিলে এত আহার কেহ করিতে পারে না!—এক একটা ডিস্ দুই তিনবার করিয়া চাহিয়া লইয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। পাড়াগেঁয়ে লোক কিনা—আহার বেশি হইবারই কথা!

আহার শেষ হইলে হোটেলের বিল আসিয়া হাজির হইল—দশ টাকা! টাকার সংখ্যা দেখিয়া মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! কিন্তু ভয় কি? সুদে আসলে আদায় করিয়া লইব।

সাহেবি চালে ত্বরিত পদে আমি গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আপিসে পৌছিয়া একটা চুরট ধরাইয়া আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন বলুন দেখি আপনার কাজ।"

ভদ্রলোকটি কোনো কথা না কহিয়া ব্যাগ হইতে কতকগুলা কাগজ পত্র বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিল।

কাগজের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে মনে হইতে লাগিল—যাহা দেখিতেছি সব ভুল—মনের উদ্বেগে বোধ হয় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শেষে যতই ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম ভুলটা ততই সত্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এ কী! এ যে লাইফ ইন্সুরেন্সের কাগজ!

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম —"এ সব কাগজ আমায় দেখাচ্ছেন কেন?"

—"আজ্ঞে এই তো আমার কাজ! দেখুন, মানুষ মাত্রেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; সেই জন্যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করা। তা ছাড়া আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান—একথা নিশ্চয় আপনি বোঝেন যে আপনি যখন মানুষ হয়ে জন্মেছেন তখন মনুষ্য সমাজের উপর আপনার একটা কর্ত্তব্য আছে। ভগবান না করুন, আপনি যদি অকালে মারা যান তার জন্যে তো একটা সংস্থান রাখা চাই। সে সংস্থান কত সহজে কত অল্পে হবার উপায় রয়েচে—এক গুণ দিলে দশগুণ পাবার সম্ভাবনা। আর যদি দীর্ঘজীবী হন, তাতেও ক্ষোভ নেই;—আপনার অর্থের লাভ থেকে কত দরিদ্র অন্ন পাবে, কত অনাথা, বিধবা, অপগণ্ড সাহায্য লাভ করবে;—এ সমস্ত—"

—"থামুন! থামুন!" আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"থামুন।" প্রথমটা আমি এমনি থতমত খাইয়া গিয়াছিলাম যে লোকটা কি বকিয়া যাইতেছে তাহা ভালো বুঝিতে পারিতেছিলাম না—তাহাকে বাধা দিতেও পারিতেছিলাম না।

আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। আমি অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"আপনি সন্তোষপুরের জমিদার নন?"

—"আজ্ঞে না! আমি ইন্সুরেন্সের দালাল!"

আমি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম— "সে কথা আগে বলেন নি কেন?"

—"আজ্ঞে বলবার সময় দিলেন কৈ!"

তাই তো, সে কথা ঠিক। দোষটা আমারই বটে। একটু লজ্জিত হইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলাম—"যান মশায়! এখন আমার কাজ আছে।"

লোকটা আবার কি বলিতে যাইতেছিল, আমি ধমক দিয়া উঠিলাম; সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমার মনের মধ্যে একটা অনুশোচনা তীরের ফলার মতো বিঁধিতে লাগিল;— কেবলই মনে হইতে লাগিল—মিছামিছি দশ দশটা টাকা নষ্ট করিলাম।

নানারূপ প্রবোধ দিয়া চিত্তটা স্থির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় মামাব সহিস একখানা চিঠি আনিয়া হাতে দিল। মামা লিখিয়াছেন—"কোনো বিশেষ কারণে সন্তোষপুরের জমীদার আজ কলিকাতায় আসিতে পারিলেন না।"

আমি বুঝিলাম আমার নিতান্তই শনির দশা—নইলে মৎস্য পালায়?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্গমাতার আর একটী সুসন্তান জননীর অঙ্ক শূন্য করিয়া গত ১৬ই আষাঢ় অনন্ত শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ চিন্তাশীল উদারমতাবলম্বী বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গদেশে বিরল। সংবাদপত্র পরিচালন করিতে হইলে যেরূপ উদারমত থাকা আবশ্যক নরেন্দ্রনাথের তাহা ছিল। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বপ্রেমকে একদিনও আঘাত করে নাই। তিনি জাতিনির্বিশেষে সমগ্র মানবসন্তানের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এইটুকুই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য।

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার চতুর্থ পুত্র। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরিমোহন সেন মহাশয় জয়পুর রাজষ্টেটে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ শৈশবে বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতার হিন্দুস্কুলে প্রেরিত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু প্রতিভা কখনও ভগ্নোদ্যম হইতে জানে না। নরেন্দ্রনাথ স্কুল ত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার অভ্যাস অক্ষুণ্ণই রহিল। পুত্রের এইরূপ অদম্য জ্ঞানানুশীলন প্রবৃত্তি দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের পিতা এক অভিজ্ঞ ইংরাজ শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার সমর্পণ করিলেন। তাঁহারই হাতে নরেন্দ্রনাথের পরিণত জীবন গঠিত হইতে লাগিল।

বিংশবর্ষ বয়সে নরেন্দ্রনাথ এক এটর্ণির আফিসে কাজ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনিই বোধ হয় বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন এটর্ণি। কিন্তু অধিক দিন তিনি এটর্ণির কার্য্য করেন নাই। উপার্জ্জন অভাবে যে তাঁহাকে এটর্ণির ব্যবসায় ছাড়িয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল এমন নহে। আপনার চরিত্রগুণে ব্যবসায়ের প্রারম্ভেই তাঁহার প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু যে জীবন জনসাধারণের কার্য্যের জন্য পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে তাহা কি জীবিকা উপার্জ্জনরূপ সামান্য কাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে!

ইংরাজী ১৮৬১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়নমিরর সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে এদেশে এক হিন্দুপেট্রিয়ট ব্যতীত দেশের লোকের পরিচালিত অন্য কোন ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল না। ইণ্ডিয়নমিরর প্রথমে পাক্ষিক পত্র ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ কাগজে নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। কিছুদিন পরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র উহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। তখন হইতেই নরেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক। এই ইণ্ডিয়নমিরর সম্পাদনেই তাঁহার প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সংবাদপত্র সম্পাদন ব্যতীত তিনি দেশের প্রায় সমস্ত কল্যাণকর অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে যোগদান করিতেন। বাল্যবিবাহের অশুভ ফল দর্শনে সেই প্রথা নিবারণ সংকল্পে

অধুনা যে এক সভা গঠিত হইয়াছে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একজন প্রধান হিতৈষী সভ্য ছিলেন। রাজ কার্য্যেও তিনি গবর্ণমেণ্টকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ অমায়িক ভাব তাঁহার তেজস্বী নির্ভীক চরিত্রকে একটী শান্তভাবে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ সেন।

এই কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তির অভাব শীঘ্র পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয়ের ন্যায়ই শোকাভিভূত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

চয়ন।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(Sylvain Levi-র ফরাসী হইতে)

পৌরাণিকী কথা।

ভরত ও নাট্যশাস্ত্র।

আশ্চর্য্যরসের প্রতি ভারতীয় প্রতিভার এত অধিক প্রবণতা যে তাহার ফলে ইতিহাস ভারত হইতে একপ্রকার নির্ব্বাসিত হইয়াছে বলিলেও হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যকে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, নাট্যশাস্ত্র স্বর্গ হইতে ধরাতলে আনীত হইয়াছে। স্বর্গেই উহার জন্ম। স্বয়ং ব্রহ্মা, সকৃত অন্য চারি বেদের পরিশিষ্ট-রূপে এই নূতন শাস্ত্রের সংহিতা রচনা করেন। ভরত এই নাট্যশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মানবদিগের নিকট প্রেরণ করেন। পঞ্চম বেদের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভরতমুনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—একদা অনধ্যায়কালে, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণ নাট্যকোবিদ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন;—ভগবান্, আপনি যে নাট্য-বেদের কথা কহিয়াছিলেন, উহা কাহার জন্য এবং কিরূপে উৎপন্ন হয়, উহার অঙ্গ কত-প্রকার, মূলই বা কি, প্রয়োগই বা কিরূপ? ভরত কহিলেন;—তোমরা অবহিত হইয়া এই ব্রহ্মনির্ম্মিত নাট্যবেদের কথা সংক্ষেপে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে কামক্রোধাদিবিকৃত গ্রাম্যধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে লোকসকল ঈর্ষা দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতে-ছিল। ঐ সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন ভগবন্, যাহা দৃশ্য ও শব্য এইরূপ কোন এক ক্রীড়নক আমাদের আবশ্যক। বেদচতুষ্টয় শূদ্রজাতির শ্রবণযোগ্য নয়, অতএব আপনি এই সূত্রে সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করুন। তখন ব্রহ্মা তাঁহা-দের অনুরোধে ভাবী লোকের সর্ব্বকর্ম্ম-প্রদর্শক সর্ব্বশাস্ত্রার্থযুক্ত ইতিহাস-সহ নাট্যাখ্য পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়া যোগবলে বেদচতুষ্টয়কে স্মরণ করিলেন এবং ঋক্ হইতে নৃত্য, সাম হইতে গীত, যজু হইতে অভিনয় এবং অথর্ব্ব হইতে রস আহরণ করিয়া নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। তদন্তর ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে একটি রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন; নাট্যশালা নির্ম্মিত হইলে, এই নাট্যবেদের প্রয়োগভার ভরতের প্রতি অর্পিত হইল। প্রয়োগকালে শিব উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরাকালে তণ্ডুর দ্বারা যেরূপ একবার নৃত্য করাইয়াছিলেন সেই প্রচণ্ড তাণ্ডব-নৃত্য তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি উহা ভরতকে শিক্ষা দিলেন। আবার দেবী পার্ব্বতীও সন্তুষ্ট হইয়া, লাস্য নামক কমনীয় নৃত্য ভরতের নিকট প্রদর্শন করিলেন। ভরত ঐ তাণ্ডব-নৃত্য মনুষ্যদিগের নিকট আনয়ন করিলেন। স্বয়ং পার্ব্বতী বাণ-দুহিতা উষাকে লাস্য-নৃত্য শিক্ষা দেন। উষা আবার ঐ

নৃত্য কৃষ্ণ-নগরী দ্বারাবতীর গোপীগণকে শিক্ষা দেন। তাহাদিগের নিকট হইতে সুরাষ্ট্রের রমণীগণ ঐ নৃত্য শিক্ষা করে; ক্রমে উহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে নাট্য কলা প্রচারিত হয়। ইহার সংগঠনে বিষ্ণুরও কিছু হাত ছিল। নাট্যপ্রয়োগের যাহা জননী-স্বরূপ, বিষ্ণু সেই চারিপ্রকার নাট্যবৃত্তির স্রষ্টা।

নাট্যসূত্রে এই যে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আপ্তবিশ্বাসী ভক্ত হিন্দুর নিকট যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু য়ুরোপীয় বিচারক ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ভারতীয় গ্রন্থকারদিগেরই সাক্ষ্য-প্রমাণে, কাল্পনিক উপাখ্যানাদির স্থানে ইতিহাসকে স্থাপন করিয়া, নাট্যশাস্ত্রের প্রামাণিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে এই গ্রন্থের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজ-অন্তঃপুরের দুইজন নাট্যাচার্য্য প্রত্যেকেই আপন আপন শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠতা লইয়া আত্মগরিমা করিতেছিলেন, পরিশেষে তাঁহারা এই বিষয়ে রাজাকে মধ্যস্থ মানিলেন; রাজা পরিব্রাজিকার উপর বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। পরিব্রাজিকা:—"দেখুন মহাবাহু, নাট্যশাস্ত্র প্রয়োগ-প্রধান—এ বিষয়ে বাক্য-ব্যবহারে কি ফল?" Weber "নৃত্যের কলাবিদ্যা" এইরূপ অস্পষ্ট বাক্যে "নাট্য-শাস্ত্রের" অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু কালিদাস যিনি স্বকীয় গ্রন্থে কলাবিদ্যার সমস্ত পারি-ভাষিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় দিতে যত্ন পাইয়াছেন, যিনি কলাবিদ্যার নিয়মাদি নতশিরে পালন করিতেন, তিনি যে, শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারেই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমাদের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে তিনি ভরতের যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয় যে, ভরতকে তিনি নাট্য-শাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়াই মনে করিতেন। আবার ভবভূতিও ভরতকে তৌর্য্যত্রিকের সূত্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আরও একটা কথা, কালিদাসের সম-সাময়িক মাতৃগুপ্ত, ভরত প্রণীত গ্রন্থের একটি ভাষ্য পদ্যে রচনা করেন। কিন্তু আমরা যে গ্রন্থকে এক্ষণে নাট্যশাস্ত্র বলিয়া জানিতেছি, কালিদাস ও ভবভূতি কি ঠিক্ সেই গ্রন্থকেই ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র বলিয়া জানিতেন? ভরত-কৃত মূলগ্রন্থের যে একটা দৃঢ়ভিত্তি নাই তাহা আমরা বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। ভাষ্যকার রাঘবভট্ট এই নাট্য-শাস্ত্রের অনুরূপ, "আদি-ভরত" নামক আর একটি নাট্য-শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার মধ্যে "আদিভরত-প্রস্তার" নামক গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাম ছাড়া তৎ-সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় না। পক্ষান্তরে, নবম শতাব্দীতে শিবস্বামিন্, ভরতের লিখন-রীতির সহিত যমুনার অন্ধকারময় জলের তুলনা করিয়াছেন। ভবভূতি-প্রযুক্ত "সূত্র" শব্দের সহিত এই বর্ণনার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কেন না, সূত্র অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য—দুর্ব্বোধ ও অন্ধ-কারাচ্ছন্ন; সুতরাং, যে বাক্যবহুল সবিস্তার গ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার সহিত উক্ত বর্ণনার মিল হয় না।

কালসহকারে, ভরতের এই সূত্রগুলি, একত্র সন্নিবদ্ধ হইয়া পাণিনি উল্লিখিত "নটসূত্র" নাম ধারণ করে। এইরূপে, আমরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হই।

এই দীর্ঘকাল মধ্যে, নাট্যকলা নিশ্চয়ই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল; অন্তত ঐ সুদূর অতীত কালের যুগ হইতে, ইহার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। "নাট্যশাস্ত্র" নাট্যোৎপত্তির কালটাকে দূর অতীতে পিছাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

ইতিহাস।

যদি কালিদাসের পূর্ববর্ত্তীদিগকে ভারতবর্ষ বিস্মৃত হইয়া থাকে, যদি প্রাচীন নাট্যকারদিগের অপরিপক্ক রচনাগুলি—কোন চিহ্ন না রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়া থাকে, উৎকৃষ্ট রচনাগুলিসমেত ভারতের নাট্যসাহিত্য যদি কোন অলৌকিক ঘটনাক্রমে ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে, নাট্যকলার দৈব উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া এবং উহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া যদি অহঙ্কারপ্রিয় বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকে,—তাহা করুক; এসমস্ত সত্ত্বেও, কিরূপে ক্রমে ক্রমে নাটকের সৃষ্টি হইল, সেই—ক্রমোন্নতির ইতিহাস ব্রাহ্মণেরা সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে সমর্থ হয় নাই। নাটকীয় রচনার সাক্ষ্য অভাবে অন্যজাতীয় রচনাবলী,—সাক্ষাৎ ভাবেই হউক, বা পরোক্ষ ভাবেই হউক—ভারতীয় নাট্যের ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে, সংস্কৃতের পুনরভ্যুদয়ের পূর্ববর্ত্তী কালের প্রামাণিক দলিলপত্রের অভাব নাই। সঠিক সময় নিরূপণ করিতে না পারিলেও, বৈদিক সংহিতাগুলি যে খৃষ্টীয় যুগের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সংহিতার পরেই ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয়। বৃহৎ মহাকাব্যদ্বয় যদিও অনেক বিলম্বে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি উহারা বৈদিক যুগের ঐতিহ্য, প্রথা, প্রকরণাদির ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের সহিত যে একসূত্রে সংযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনি ও পতঞ্জলী—এই দুই বড় বৈয়াকরণ, বিক্রমাদিত্য যুগের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেকগুলি বচনও প্রাচীন সময়কার। এই সকল বিচিত্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে,—কতকগুলি গ্রন্থে, নাট্যের অবস্থা সম্বন্ধে, রঙ্গভূমি সম্বন্ধে, অভিনয়ের রূপ সম্বন্ধে, নাট্যকলা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়; আবার অন্যান্য গ্রন্থে, নাটকীয় দৃশ্যের কথোপকথন, বক্তৃতা, ভূমিকা-বিন্যাস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রয়োগ পৃথক্‌ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

অতীব অস্পষ্ট ও স্বল্প-নিশ্চিত নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল প্রমাণ-লেখ্যের ব্যাখ্যা যদি নিতান্ত খামখেয়ালি ও দুঃসাহসিক চেষ্টা বলিয়া কাহারও মনে হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানের অন্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ হইতে সংবাদ আহরণ করিয়া, এমন কি, আধুনিক পর্য্যবেক্ষকদিগের নিকট হইতেও খোঁজখবর লইয়া, প্রকৃত তথ্যে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। নাট্যকলার সম্বন্ধীয় শব্দকোষের মধ্যেও

এমন কতকগুলি সংজ্ঞা সংরক্ষিত আছে—যাহা হইতে আমরা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করিতে পারি। একত্র সংযুক্ত, শ্রেণীবদ্ধ, ও পরস্পরের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে, এই সকল প্রমাণ-লেখা হইতে এমন একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খল প্রস্তুত হইতে পারে, যাহার অংশগুলি, কালিদাস ও ভবভূতিকে, আর্য্যঋষিদিগের সহিত একসূত্রে নিবদ্ধ করিবে।

ক—বৈদিক সাহিত্য।

যাহা ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, যাহা বৈদিক সংহিতার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সেই ঋগ্বেদে কথোপকথনের প্রয়োগ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়: কখনকখন কথোপকথনের দ্বারা মন্ত্র ও মন্ত্রপাঠ, কখন বা সমস্ত সূক্তিই বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১৪টি সূক্তি এইরূপ কথোপকথনের আকারে লিপিবদ্ধ; ইহা কতকগুলি মণ্ডলে বিভক্ত এবং কতকগুলি ঋষিবংশের নিজস্ব বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকে (I, ১৬৫, ১৭০, ১৭৯; III ৩৩; IV, ১৮; VII, ৩৩; VIII, ১০০; X ১০, ২৮, ৫১—৫৩, ৮৬, ৯৫, ১০৮)। এই সকল মন্ত্র বিচিত্র প্রকৃতির; যাহারা কথোপকথন করিতেছে তাহাদের সংখ্যা প্রায়ই তিনের অধিক নহে: নেমা ভার্গব প্রশ্ন করিতেছেন, ইন্দ্র উত্তর দিতেছেন (VIII, ১০০); যমী তাহার ভ্রাতাকে প্রেমসম্ভোগে আহ্বান করিতেছেন, যম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, (X, ১০); পুরুরবা চপলচিত্ত উর্ব্বশীকে আহ্বান করিতেছেন, এবং সেই অপ্সরা অন্তর্ধান করিতেছে, (X, ৯৫); অগস্ত্য, তাঁহার পত্নী লোপমুদ্রা ও তাঁহাদের পুত্র—পরস্পরের সহিত প্রহেলিকার আকারে বাক্যালাপ করিতেছেন (I, ১৭৯); ইন্দ্র, বামদেব অদিতির মধ্যেও (IV, ৮); ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, বর্ষাকপির মধ্যেও (X, ২৮); এইরূপ বাক্যালাপ চলিতেছে। কখন কখন, একজনের স্থলে, দলবদ্ধ হইয়া কতিপয় লোক প্রশ্ন করিতেছে:—যথা, ইন্দ্র, অগস্ত্য ও মরুৎগণ (I, ১৬৫, ১৭০) বিশ্বামিত্র ও রিবিয়েরগণ (III; ৩৩); বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রগণ (VII, ৩৩); সরমা ও পাণিগণ (X, ১০৩); অগ্নি ও দেবগণ (X, ৫১-৫৩)। কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই এই সকল রচনার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইবে।

X, ১০৮।—পাণিগণকর্ত্তৃক অপহৃত স্বর্গীয় ধেনুবৃন্দ, পাণিগণের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য,ইন্দ্রপ্রেরিত দূত সরমা সমাগতা।

পাণিগণ।—কি অভিপ্রায়ে সরমা এখানে আসিয়াছেন? এই দীর্ঘপথ বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সরমা আমাদের নিকট চাহেন কি? কি জন্য এত ত্বরা? রসার তরঙ্গরাজি কিরূপে তুমি পার হইলে?

সরমা।—হে পাণিগণ, আমি তোমাদের নিকট হইতে মহারত্ন উদ্ধার করিবার জন্য, ইন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। এই সকল বিভীষিকা হইতে, পতন হইতে, তিনিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে আমি রসার তুঙ্গরাজি অতিক্রম করিয়াছি।

পাণিগণ।—হে সরমা, কে এই ইন্দ্র? অতদূর হইতে যাঁহার দূত হইয়া তুমি আসিয়াছ তাঁহার কিরূপ আকৃতি? তিনি এখানে আসুন, তাঁহার সহিত আমরা মিত্রতা করিব। তিনি আসিয়া আমাদের ধেনুগণের রক্ষক হউন।

সরমা।—আমি জানি তাঁহাকে কেহ প্রবঞ্চিত করিতে পারে না। আমি অতদূর হইতে যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছি তিনিই অন্যকে প্রবঞ্চিত করিতে পারেন। গভীর নদী সকল তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিতে পারে না। হে পাণিগণ, ইন্দ্রের দ্বারা প্রহত হইয়া তোমরা ধরাশায়ী হইবে!

পাণিগণ।—হে সরমা! হে ভদ্রে! তুমি যে ধেনুদিগকে লইতে আসিয়াছ, উহা আমরা স্বর্গের শেষপ্রান্ত হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। বিনা যুদ্ধে কে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? আমাদেরও সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি আছে।

সরমা।—হে পাণিগণ, তোমাদের কথাগুলি ত অস্ত্রহীন। তোমাদের জঘন্য শরীর বাণের দুষ্প্রবেশ্য হইলেও, এই দীর্ঘ পথ অলঙ্ঘনীয় হইলেও, তথাপি বৃহস্পতির নিকটে তোমাদের নিষ্কৃতি নাই।

পাণিগণ।—হে সরমা, এই রত্নভাণ্ডার—এই সকল ধেনু, অশ্ব ও ধনরত্ন প্রস্তরের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। সুরক্ষক পাণিগণ উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। তুমি যেস্থানে আসিয়াছ উহা শূন্যগর্ভ; এখানে কিছুই পাইবে না।

সরমা।—ভাল! সোম পানে উত্তেজিত হইয়া, আয়াস্য, আঙ্গিরস নবগ্বস্ এই ঋষিগণ এখনি আসিবেন। তোমাদের গোশালার গাভীদিগকে তাঁহারা আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইবেন; তখন পাণিগণ তাহাদের বাক্য পুনর্গমন করিবে।

পাণিগণ।—সরমা, তুমি অবশ্য ইন্দ্রদেবের দ্বারা বাধ্য হইয়া এখানে আসিয়াছ। তোমাকে আমি ভগিনীরূপে গ্রহণ করিব, তুমি এখান হইতে যাইও না; সুন্দরি! এই ধেনুগণের কিয়দংশ তোমাকে আমরা দান করিব।

সরমা।—আমি ভাইও জানিনা, ভগিনীও জানিনা! সে জানেন ইন্দ্র, আর সেই ভীষণ আঙ্গিরসগণ। তাঁহারা এই সকল ধেনু লইতে চাহেন, আর তাঁহাদের ইচ্ছা আমি এইখানে আগমন করি; পাণিগণ! তোরা এখান হইতে দূর হ'!

এই কথা বলিবামাত্র যথাধর্ম্ম গাভীগণ হম্বারব করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল; বৃহস্পতি, সোম, প্রস্তরগণ, এবং সোমোত্তেজিত ঋষিগণ একটা প্রচ্ছন্ন স্থানে এই গাভীগণকে আবিষ্কার করেন!

অন্যত্র,—দেবতারা, তাঁহাদের সমকক্ষ আর এক দেবতা অগ্নির সহিত কথোপকথন করিতেছেন। অগ্নি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত হইয়াছিলেন; পরে কতকগুলি কঠিন সর্ত্তে স্বকীয় কার্য্যসম্পাদনে স্বীকৃত হইলেন। (X, ৫১; ৫৩):—

দেবগণ।—বৃহৎ সেই আবরণ, কঠিন সেই আবরণ—যে আবরণে আবৃত হইয়া তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে অগ্নি জাতবেদ! কেবল একজন দেবতা সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া, এবং অনেকবার অন্বেষণ করিয়া তোমার শরীরকে দেখিতে পাইয়াছে!

অগ্নি।—কে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে? কে সেই দেবতা যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াছেন? হে মিত্র বরুণ! দেবতাদিগের অভিমুখে অগ্নির যে শিখাগুলি উত্থিত হয় সেই শিখাগুলি কোথায় তবে প্রচ্ছন্ন থাকে?

দেবগণ।—হে জাতবেদ! অনেক স্থানেই তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছি—জলের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছি, ওষধি বনস্পতিদিগের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছি। হে দীপ্তিমান! দশটি আবরণের মধ্য হইতে যখন তুমি অতিমাত্র দীপ্তি পাইতেছিলে, সেই গুপ্ত স্থানে যম তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অগ্নি।—হে বরুণ! আমি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আর পারি না। তাই আমি প্রস্থান করিয়াছি; আর যেন দেবতারা আমার প্রতি আসক্ত না হন। আমি এখন সর্ব্বপ্রকারে বিশ্রাম করিতেছি; অগ্নির কাজ আর আমার ভাল লাগে না।

দেবগণ।—আইস; ধর্ম্মনিষ্ঠ মনু যজ্ঞ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, আর তুমি অগ্নি কিনা এখন অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ! যে পথ দিয়া দেবতারা গমন করেন, সে সকল পথ সুগম করিয়া দেও। সরলঅন্তঃকরণে, যজ্ঞের বলি আনয়ন কর।

অগ্নি।—পথানুসরণকারী সারথিদিগের ন্যায় অগ্নির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এই গুরুভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, তাই বিরক্ত হইয়া, হে বরুণ,—যেমন মহিষ, ব্যাধের রজ্জু হইতে দূরে পলায়ন করে,—সেইরূপ আমি পলায়ন করিয়াছি।

দেবগণ।—ভাল! তোমাকে জরা হইতে আমরা অব্যাহতি দিতেছি, তাহা হইলে কাজ করিবার সময় তোমার কোন কষ্ট হইবে না, এবং তাহা হইলে, হে আর্য্য! তুমি সদন্তঃকরণে দেবতাদিগের যজ্ঞাংশ দেবতাদিগের নিকট বহন করিতে পারিবে।

অগ্নি।—সকল খাদ্যাদির মধ্যে প্রযাজস্ ও অনুযাজস্ (যজ্ঞের পূর্ব্বে ও যজ্ঞের পরে যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়) যেন একমাত্র আমারই হয়; এবং আমি যেন ঘৃত ও বৃক্ষাদির সারাংশ প্রাপ্ত হই; আর হে দেবগণ! অগ্নির আয়ু যেন দীর্ঘ হয়।

দেবগণ।—প্রযাজস্ ও অনুযাজস্ তোমারই হউক; যজ্ঞের এই সরস অংশ তোমার হউক; এই সমস্ত যজ্ঞ তোমারই হউক; নিকৃচতুষ্টয় যেন তোমাকেই পূজা করে!

কখন কখন স্বয়ং কবি,—হয় কথোপকথনের একজন বক্তা হইয়া—নয়, নিজ কর্ম্মের পুরস্কার আদায় করিবার জন্য, রঙ্গস্থলে অবতরণ করেন:

ঋগ্বেদ III, ৩৩।—ভরতগণের পুরোহিত বিশ্বামিত্র, যে সকল নদী সিন্ধু অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি নদীর নিকট, ভরতবংশীয়দিগের জন্য পথ খুলিয়া দিতে প্রার্থনা করিতেছেন।

বিশ্বামিত্র। দ্রুতগামী মুক্ত দুই অশ্বিনীর ন্যায়, লেহনশীলা বৎস-জননী দুই গাভীর ন্যায়, বিপাস ও শুতুদ্রী, গিরি-বক্ষ হইতে নির্গত হইয়া, ক্ষীর সহ অবাধে প্রধাবিত হইতেছে। অবাধ-গমনেচ্ছু রথ-যোজিত অশ্বযুগলের ন্যায়, ইন্দ্র কর্তৃক তাড়িত হইয়া তোমরা

সাগরাভিমুখে গমন করিতেছ। হে সুন্দরি! তরঙ্গে স্ফীত হইয়া অতি দ্রুতভাবে, তোমরা একজন আর একজনের দিকে গমন করিতেছ।

আমি মাতার মাতা সেই সিন্ধুর নিকট গিয়াছিলাম; আমরা বিস্তৃত ও সৌভাগ্যবান বিপাশের নিকট গিয়াছিলাম। বৎস লেহন-কারিণী দুই গাভীর ন্যায় উহারা উহাদের সাধারণ মাতার অভিমুখে গমন করিতেছে।

নদীগণ।—তুমি দেখিতেছ, ক্ষারের দ্বারা স্ফীত হইয়া, দেবগণরচিত গর্ভাধার অভিমুখে আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি। আমাদের প্রচণ্ড স্রোতকে আমরা ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে যিনি এরূপ উচ্চৈস্বরে আহ্বান করিতেছেন, সেই পুরোহিত কি প্রার্থনা করেন?

বিশ্বামিত্র।—আমার সোম-বাক্যের দ্বারা তোমাদিগকে থামিতে বলিতেছি; ধর্মের বশীভূত হও, ক্ষণেকের জন্য তোমরা বহিতে ক্ষান্ত হও; আমার প্রবল প্রার্থনা সিন্ধুর অভিমুখে গমন করিতেছে; আমি কুশিক তোমাদের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছি, তোমা-দিগকে অনুনয় করিতেছি।

নদীগণ। বজ্রধর ইন্দ্র তিনিই আমাদের পথের আবরণ মোচন করিয়াছেন; নদীর আবরণকারী বৃত্তকে তিনি উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুন্দর হস্তবিশিষ্ট দেব সবিতা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন; তাহারই কল্যাণে আমরা বিস্তৃত হইয়া গমন করিতে পারিতেছি।

বিশ্বামিত্র।—ইন্দ্রের বিক্রমকীর্ত্তি নিত্য-কাল পরিঘোষিত হউক—তিনি অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার বজ্রের দ্বারা সকল প্রতিবন্ধক চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন; তাই জলরাশি একটা পথ অন্বেষণ করিতে বাহির হয়।

নদীগণ। হে উদ্‌গাতা, তোমার এই কথাটি বিস্মৃত হইও না; উত্তরবংশীয়েরা এইকথা উচ্চকণ্ঠে পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করিবে। দেখ ঋষি! তোমার সূক্তিসমূহের মধ্যে, প্রীতিসহকারে আমাদের উল্লেখ করিও। মানুষের নিকট আমাদিগকে নতশির করিও না। জয় হউক তোমার!

বিশ্বামিত্র।—শুন ভগিনীগণ! ঋষির কথায় কর্ণপাত কর; তিনি শকটে করিয়া বহুদূর হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছেন; নদীগণ! তোমরা তোমাদের তরঙ্গ সমেত শকটের অক্ষ হইতেও নিম্নে অবনত হও।

নদীগণ।—আচ্ছা ঋষি, তোমার কথাই শুনিলাম! তুমি দূর হইতে শকটারোহণে এখানে আসিয়াছ। স্ফীতবক্ষ রমণীর ন্যায় আমি তোমার নিকট অবনত হইব; পতির নিকট নববিবাহিতা তরুণী যেরূপ আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করে আমিও সেইরূপ তোমার নিকট আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিব।

বিশ্বামিত্র।—গোমেষাদি পশুর অন্বেষণে ত্বরান্বিত ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত ভরত-বংশীয়েরা তবে নদী পার হউক। দেবিগণ অপ্রতিহত প্রচণ্ড বেগে তোমরা বহিয়া যাও, আমি তোমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী। (সমস্বরে পাঠ: আনষ্টমিত ছন্দের পদ্য)।—পশুর অন্বেষণে বহির্গত ভরতেরা নদী পার হইয়াছে; পুরোহিত নদীগণের অনুগ্রহলাভ করিয়াছে। হে উদারচেতা! তোমরা আপনাদিগকে

স্ফীত কর, আপনাদের পার্শ্বদেশ স্ফীত করিয়া দ্রুত গমন কর।

ঋগ্‌বেদ I, ১৬৫।—ইন্দ্রের সহচর মরুতেরা ইন্দ্রের জয় ঘোষণা করিতেছে।

ইন্দ্র।—আমার সহচর ও এক নীড়ের ভ্রাতা যে তোমরা মরুৎগণ, তোমরা কি প্রচণ্ড বেগেই প্রধাবিত হইয়াছ? তোমাদের অভিপ্রায় কি?

এই নৈবেদ্যলোলুপ পুঙ্গবেরা স্বকীয় কণ্ঠস্বরে দিগ্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কোথা হইতে আসিতেছে?

মরুৎগণ।—ইন্দ্র, তুমি একাকী হৃষ্টচিত্তে কোথা হইতে আসিতেছ? ব্যাপারটা কি? আমরা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এই সময়ে তুমি কিনা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাক্যালাপ করিতেছ। হে পিঙ্গল অশ্ববিশিষ্ট দেব! বল, আমাদের নিকটে তুমি কি চাও?

ইন্দ্র।—আমি যজ্ঞের জন্য, মন্ত্রাদির জন্য, সোমের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি; উহা হইতে সুগন্ধ উত্থিত হইতেছে; আমি আপনিই প্রস্তর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। এই সূক্ত গুলি আমাদিগের আরাধনা করিতেছে, আমাদিগকে চাহিতেছে। আমার ঘোটকেরা উহাদিগের নিকট আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে।

মরুৎগণ।—ইন্দ্র, যে সকল স্বাধীন পুরুষ আমাদের খুব নিকটবর্ত্তী, তাহাদের সহিত এখনই আমাদের বেগবান দেহ সংযোজিত করিয়া দিব; এরূপ দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিব, যাহাতে তুমি স্বচ্ছন্দে আমাদিগের নিকট উপনীত হইতে পার।

ইন্দ্র।—বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যখন তোমরা আমাকে একাকী রাখিয়া গেলে, তখন তোমাদের সে শ্লাঘ্য ইচ্ছা কোথায় ছিল?

মরুৎগণ।—হে দেবপুঙ্গব! সহস্র জয় সাধন করিয়া তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ। আমরাও যেন ইচ্ছামত বীর্য্য সহকারে বহু বিক্রমের কার্য্য সাধন করিতে পারি।

ইন্দ্র।—হে মরুৎগণ! ক্রোধোৎপন্ন বজ্রের দ্বারা আমি বৃত্রকে বধ করিয়াছি। বিচিত্র-কিরণদীপ্ত জলরাশিতে মনু যাহাতে অবাধে উপনীত হইতে পারেন সেই নিমিত্ত আমিই বজ্রধর ইন্দ্র পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

মরুৎগণ।—হে মঘবন্! ত্রিভুবনে তোমার অজেয় কিছুই নাই। তোমার সমান দেবতা অন্য আর কেহ নাই; কি বর্ত্তমান কি ভূত-কালের কোন জীবই তোমার সমকক্ষ নহে। হে মহান্ ইন্দ্র, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

ইন্দ্র।—একা হইলেও, আমার শক্তি বিজয়ী হইবে; যাহা আমি ইচ্ছা করি, আমার সংকল্প তাহা সংসিদ্ধ করে; কেন না হে মরুৎগণ, আমি শক্তিমান্। যে কোন কর্ম্মেই আমি প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই আমি বিজয়ী হইয়া বাহির হই। মরুৎগণ! তোমরা আমার সুহৃৎ, আমিও তোমাদের সুহৃৎ; তোমরা তোমাদের সুহৃৎ ইন্দ্রের প্রতি যে সুশ্রাব্য সুমধুর সূক্তি প্রয়োগ করিবে, সেই সূক্তি শ্রবণে আমি আনন্দিত হইয়াছি।

"যাহারা মনের দ্বারা আমার বল ও মহিমাকে বিবর্দ্ধিত করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, সেই শুভ্রবর্ণ পুরুষ যে

তোমরা,—হে মরুৎগণ! তোমাদের প্রতি আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি।

কবি।—হে মরুৎগণ, কে এখানে তোমাদের চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়াছে? রহস্যময় অর্থ সকল সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত বন্ধুর গৃহে বন্ধুভাবে তোমরা আইস; আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগী হও।

যিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছেন, তিনি পুরস্কারের যোগ্য সন্দেহ নাই।

অতএব কবির দিকে তোমরা মুখ ফেরাও, তোমাদের সম্মানার্থেই তিনি এই সূক্তি গান করিয়াছেন।

হে মরুৎগণ, মান নন্দন মান্দর্য্য নামক কবির রচিত এই গান, এই সূক্তি তোমাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইখানে আসিয়া তোমরা শ্রান্তি দূর কর। আমরা তোমাদের জন্য এমন একটি নিবাস নির্দ্ধারিত করিব যেখানে শতস্রাবী প্রচুর ধারা বিন্দু বিদ্যমান আছে।

পূজার অনুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে এই কথোপকথনাত্মক সূক্তির প্রয়োগ নাই। সংহিতার প্রাচীন বিভাগ অনুযায়ী ঐ সকল সূক্তি, "সম্বাদ" নামক একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূত। উহাদের মধ্যে, কতকগুলির লক্ষণ তেমন সুস্পষ্ট না থাকায়, ঐ সম্বন্ধে তর্কের অবসর হইয়াছে; তাই, যাস্ক (X, ৯৫) এই সূক্তকে সম্বাদের মধ্যে ধরিয়াছেন; এবং শৌনক উহাকে ইতিহাসের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। অধুনা ওলডেনবর্গ এই সকল সূক্তির প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ঐরূপ সূক্তিগুলি মহাকাব্যগত খণ্ডাংশের বিচ্ছিন্ন ভগ্নাবশেষ মাত্র। উহাদের আখ্যানাংশ হইতে সহজে উপস্থিতমত গাথা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আখ্যান একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত না হওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। কিন্তু দেবতাদিগের ও ঋষিদিগের বাক্যগুলি, কথোপকথনকারীদিগের মাহাত্ম্য বশতঃ, মুখপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

এই অনুমানটি বেশ নৈপুণ্যাত্মক হইলেও আমরা উহাতে ভুলিব না। ঐ সূক্তিগুলি এমন সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে, উহাতে কথোপকথন এরূপ সুন্দররূপে অনুসৃত হইয়াছে যে, উহার আখ্যানমূলক টীকাটিপ্পনী বাহুল্যমাত্র।

এই সূক্তিগুলির অধিকাংশ পাঠ করিলে, সে সময়ে কোন একপ্রকার নাট্য দৃশ্যের প্রয়োগ যে হইত তাহা কল্পনা না করিয়া থাকা যায় না। ১—১৬৫ সূক্তিটিতে যে একটু নাটকীয় ধরণ আছে, তাহা মোক্ষমূলরেরও মনে হইয়াছিল। তিনি বলেন "এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মরুৎদিগের সম্মানার্থ যে যজ্ঞ হইত সেই যজ্ঞে এই মরুৎইন্দ্রের সংবাদটি আবৃত্তি করা হইত। অথবা দুইটি "কোরাসের" (chorus) মধ্যে একটি ইন্দ্রের ভূমিকা ও অপরটি মরুৎগণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিত।"

নাট্যাভিনয়ের আনুষঙ্গিক অন্যান্য কলা সেই বৈদিক যুগে এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছিল, যে তাহার সাহায্যে জাঁকজমকের সহিত অভিনয় ব্যাপার অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিত। যে সামবেদে, ঋগ্বেদের

শ্লোকগুলি শুধু সঙ্গীতের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সামবেদ হইতে বুঝা যায়, কতটা পাণ্ডিত্য ও মার্জ্জিত রুচি-সহকারে সে সময়ে ধর্ম্মসঙ্গীতের অনুশীলন হইয়াছিল। নৃত্যগীত আর্য্যদিগের প্রিয় আমোদ ছিল। (অথর্ব্ববেদ V-XII, ১, ৪১) "মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণ দুন্দুভির বাদ্যসহকারে নৃত্যগীত করিয়া থাকে।" (ঋগ্বেদ-V, I, ৯২, ৪)—আর্য্যবংশের যে সকল শাখা পঞ্জাবে শিবির সন্নিবেশ করে, তাহাদের সহিত অলঙ্কার-বিভূষিতা নর্ত্তকী ছিল, এবং সেই বৈদিককালেও নারী-হৃদয় নাট্যসৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল:—(শতপথ ব্রাহ্মণ III ২, ৪৬) "যাহারা গান ও নৃত্য করে রমণীগণ তাহাদিগকে ভালবাসে।"

আমরা যতদূর জানি, অন্যান্য বৈদিক সংহিতার মধ্যে কথোপকথনের আকারে কেবল একটি সূক্তি আছে: অথর্ব্ববেদ-V, ১১; পুরোহিত অথর্ব্বন্ বরুণের নিকট, বেতনস্বরূপ একটি গাভীর দাবী করিতেছেন। বরুণ তাহা দিতে বড় রাজি নহেন, কিন্তু পুরোহিতের জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি অবশেষে জয়ী হইল; এমন কি বরুণ তাঁহার সহিত চিরবন্ধুত্বের অঙ্গীকার পর্য্যন্ত করিলেন।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্, পুরাকালীন পণ্ডিত-দিগের বাদানুবাদগুলি প্রায়ই সংবাদের আকারে অবতারণা করিতেন; কিন্তু একটীমাত্র অংশ যাহার সহিত নাট্য ইতিহাসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তাহা বাজসনেয়ী সংহিতায় (XXX) প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় যাহার অর্থ অভিনেতা, সেই শৈলূষ শব্দ গায়কদিগের আবৃত্তিকালে—সর্ব্ব প্রথমে উহাতেই পরিদৃষ্ট হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাহিনী।

(গী দে মোপাসাঁ রচিত Confession গল্প হইতে)

মার্গারিট আজ মৃত্যুশয্যায়! বয়স খুব বেশী না হইলেও, জরাস্পর্শে, বার্দ্ধক্যের শীর্ণ রেখাগুলি তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আকুলিত শ্বাস, এবং অব্যক্ত বেদনায় শীর্ণ মুখচ্ছবি, স্থিরদৃষ্টি—থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল! যেন সে কি এক ভয়ঙ্করী ছায়া দেখিয়াছে!

শয্যাপার্শ্বে তার হাতখানি ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া সুজেন কাঁদিতেছিল। সুজেন তার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মার্গারিট অপেক্ষা সে ছয় বৎসরের বড়। নিকটে একখানি ছোট টেবিল—ধবধবে শাদা চাদরে ঢাকা; তারই উপর দুটী বাতি জ্বলিতেছে।

ঘরের চারিধারে একটা বিষাদের সুর জমিয়া উঠিয়াছে,—চিরবিদায়ের এক গভীর শোকের রাগিনী! ঔষধের শিশি, ফ্লানেল, বরফ প্লেট প্রভৃতি কক্ষমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—চেয়ারগুলা সজ্জিত নহে—আসবাব-পত্র অবধিও যেন কি এক ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! মৃত্যু—ভীষণ কঠোর মৃত্যু—যেন গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

এই দুই ভগিনীর কাহিনী কি করুণতা

মানানো! দেশের লোক সে কাহিনী ভালোই জানিত,—সে কাহিনী শুনিয়া অনেকেই দুই চারি বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিত!

সুজেন একদিন এক তরুণ যুবাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিল—সে ভালবাসা ব্যর্থ হয় নাই, উভয়ের প্রেমে উভয়ে জীবনে কি অপূর্ব্ব সুখেরই স্বপ্ন দেখিত! বিবাহেরও দিন স্থির হইয়াছিল—সব ঠিক্—এমন সময় তরুণ হেনরির মৃত্যু হইল—কুমারী সুজেনের সকল আশা, সকল সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সুজেনের শোকের সীমা ছিল না—জীবনে সে আর বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে প্রতিজ্ঞা শত অনুরোধে, সহস্র আরাধনাতেও অটল ছিল—বিধবার আচার পালন করিয়াই জীবনের দিনগুলা কাটাইয়া দিতেছিল!

তারপর এক প্রভাতে, তার দ্বাদশবর্ষীয়া ছোট ভগিনী মার্গারিট কোলের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "দিদি, তুমি একাই কি এ কষ্ট ভোগ করবে? না কখনো না। আমি এ শোকের ভাগ নেব, তোমার সঙ্গ ছাড়বো না। আমিও চিরকুমারী থাকবো। তুমি স্থির জেন, তোমার ছোট বোন মার্গট আজ হতে তোমার দুঃখের সঙ্গিনী।" সুজেন মার্গারিটের কথায় বিচলিত হইল। শুধু তার পানে চাহিয়া রহিল—মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

বালিকা আপন সত্য রক্ষা করিয়াছিল। পিতামাতার শত শাসন অনুজ্ঞা, জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর সাদর অনুরোধ কাতর মিনতি সত্বেও সে বিবাহ করে নাই। অপরূপ সুন্দরী মার্গারিট ধনজনের প্রলোভনে আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে নাই। সে জ্যেষ্ঠার সঙ্গিনী হইয়াছিল।

সারাজীবন দুই ভগিনী একত্রে কাটাইয়াছে একদিনের জন্যেও পৃথক হয় নাই। মার্গারিটের মুখে কেহ কোনদিন হাসি দেখে নাই। সুজেনের অপেক্ষা তার শোক যেন অধিকতর! ত্যাগের একটা সকরুণ পাণ্ডুরতা তার মুখে-চোখে নিত্য বিরাজ করিত—তাহার স্পর্শেই সে অকালবৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাহার কেশগুচ্ছে শুভ্রতা দেখা দিয়াছে। সে চিররুগ্না,—যেন কোন এক দুর্জ্জয় ক্ষয়রোগে জর্জ্জরিত। আজ সে সুজেনের সম্মুখেই মরিতে বসিয়াছে।

কাল সারা রাত্রি দিনে সে একটিও কথা কহে নাই—মাঝে মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছু না। আজ প্রত্যূষে অতি ক্ষীণস্বরে সে বলিল "আচার্য্যকে শীঘ্র ডাকাও—আর—" একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে শিহরিয়া উঠিল; ঠোঁট দুটী ঈষৎ কাঁপিল—মুখে একটা ভয়ের রেখা পড়িল!

শোকবিহ্বলা সুজেন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মার্গট্! বোন্!" মার্গারিট সুজেনের প্রতি করুণ ভাবে চাহিল, কি যেন বলিবে—কিন্তু কথা ফুটিল না।

সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। দ্বার খুলিয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল, সঙ্গে শ্বেত বস্ত্র পরিহিত বৃদ্ধ-আচার্য্য!

আচার্য্যকে দেখিবামাত্র মুমূর্ষু যেন বল পাইল। সে উঠিয়া বসিল। জড়িত স্বরে কয়েকটী কথা বলিয়া বিছানার চাদর ধরিয়া

টানাটানি করিতে লাগিল। আচার্য্য সাইমন নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া শিরচুম্বন করিয়া নম্রস্বরে কহিলেন "মা ভগবান তোমায় ক্ষমা করুন, ভয় কি মা, মুক্তকণ্ঠে তোমার পাপ স্বীকার কর; এই ত সময়।"

মার্গারিটের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কহিল "বোসো দিদি এখানে বোসো, তুমিও শোন।" কথাটা বলিয়া মার্গারিট ঢলিয়া পড়িল।

আচার্য্য তাহাকে উঠাইয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। দুই ভগিনীর দুই হাত ধরিয়া আচার্য্য বলিতে লাগিলেন "হে জগদীশ্বর ইহাদিগকে বল দিন, ইহাদিগকে আপনার করুণা দান করুন।"

ধীর-কম্পিত স্বরে মার্গারিট কহিল "ক্ষমা, দিদি, ক্ষমা কর আমাকে। ওঃ! তুমি যদি জান্‌তে—জীবনে এই মুহূর্ত্তটুকুকে আমি কি ভয় করতাম!—"

সুজনের চক্ষে ধারা বহিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "কি ক্ষমা করবো বোন্? আমার জন্যে তুমি কি না করেছ—সুখ ঐশ্বর্য্য যা কিছু সবই ত ত্যাগ করেছ,—দেবী তুমি, তোমায়—"

মার্গারিট বাধা দিয়া কহিল "চুপ কর, দিদি, তুমি জানো না। আমাকে বল দাও, বাধা দিও না। ওঃ, জলে যাচ্ছে!—আমাকে একবারে—সবটুকু-শেষ করতে দাও। শোন, —মনে আছে—হেন্‌রিকে—" সে আর বলিতে পারিল না। সুজন চমকিয়া ভগিনীর পানে চাহিল।

মার্গারিট আবার বলিতে লাগিল "সব ভালো করে শোন তুমি, না হলে বুঝবে না! যখন আমার বয়স বারো বছর—মনে আছে? সেই বারো বছর বয়সেই আমি মরেছিলাম। যা মনে এসেছিল তাই করেছিলাম। কেমন করে মরেছি জান? শোন।"

"হেনরি—আহা প্রথম যেদিন সে আসে, —পায়ে দীঘ বুট, ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়া থেকে নেমে,—তার সে বেশের জন্য লজ্জা পেয়ে সে ক্ষমা চেয়েছিল। বাবার কাছে সে একখানা চিঠি এনেছিল। মনে পড়ে? না, চুপ করে শুনে যাও। সেদিন—যেদিন তাকে প্রথম দেখি—সে কি দিন! যতক্ষণ সে ছিল ড্রয়িংরুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে আমি শুধু তাকেই দেখেছি—তার প্রত্যেক কথাটি আমার কাণে কি মিষ্টি বাজছিল।—পুরুষ এমন সুন্দর!"

"তার পর আবার সে এসেছিল—কত-বার—চোখ ভ'রে তাকে দেখতাম। তখন আমি বালিকা হলেও আমার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু খুব সাবধানে থাকতাম, ঘুণাক্ষরেও কাকে জান্‌তে দিইনি। মনে মনে কত জপেছি—হেনরি—হেনরি ডি সাম্পায়ার! পরে শুনলাম তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে—মনে দারুণ আঘাত লাগ্‌ল—সে আঘাতের বেদনায় তিন রাত্রি ঘুমাইনি। প্রত্যহ সে সন্ধ্যের পর আসত,—আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর, মনে পড়ে?"

"কথা বলো না,—শোন, কেক্ সে বড় ভাল বাসত। মাখন, দুধ দিয়ে, তুমি নিজের হাতে তৈয়ারী করে দিতে,—সে আমার বেশ মনে আছে; প্রয়োজন হলে আমিও তৈয়ারী করে দিতে পারতাম!

"সে এক এক গ্রাসে এক এক খানা

নিঃশেষ করে ফেলে এক গেলাস সুরা গালে ঢেলে বলত—চমৎকার! মনে পড়ে, কেমন ভাবে কথাটি সে বলত? হিংসায় আমার সারা দেহ জ্বলে উঠত। দানবী জ্বালা!

বিবাহের বিলম্ব ছিল না।—আর পনের দিন বাকী! অসহ্য!

আমি ভাবলাম—সুজেন, সুজেনকে বিয়ে করবে—না না! আমার বয়স হলে আমাকেই সে বিয়ে করবে!

জীবনে কাকে এমন ভালবাসিনি, কাকেও না, এর এতটুকুও না। কি সে গভীর ভালবাসা!

সে এক সন্ধ্যের সময়—বিয়ের ঠিক দশ দিন আগে তুমি তার সঙ্গে বাড়ীর সামনে বেড়াচ্ছিলে। চাঁদের আলোয় চারিধার ভরে গেছল—সেই দেবদারু গাছটার নীচে সেই বড় গাছটার কাছে তোমাকে সে চুম্বন করলে,—বুকের মধ্যে মধ্যে টেনে উঃ—কতক্ষণ, মনে পড়েছে? বোধ হয় সেইই প্রথম!

বাড়ী ফিরে আমার পানে চাইতে লজ্জায় তোমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আমার তা বেশ মনে আছে! আমি তোমাদের দেখে-ছিলাম। সেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখেছিলাম। কি এক জ্বালা—আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল! বোধ হয় হাতে কিছু থাকলে দুজনকেই খুন করতাম। সে কি ভীষণ ক্ষণ!

সুজেনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে! না, কখনো না—আর কারো সঙ্গে না,—আমি তা সইতে পারব না! তাকে বড় হীন মনে হল—এমন লোক সে, আমি আছি, এমন সুন্দর স্নিগ্ধরূপ—কিশোরের মোহন স্পর্শে দীপ্তোজ্জ্বল আমাকে অগ্রাহ্য করে—? না কখনো না!

তার পর আমি কি করলাম, জানো,—শোন তবে। মালী কুকুর মারবার জন্য বিষ আনতো, আমি জানতাম। পাথর দিয়ে বোতল গুঁড়া করে এক টুকরা মাংসর সঙ্গে সে গুঁড়া মিশিয়ে দিত।

মার ঘর হতে ওষুধের একটা বোতল চুরি করে, তাকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে লুকিয়ে রাখলাম। বোতল চূর গুলা ঝক্ ঝক্ করছিল, হীরের মত ঠিকরে পড়ছিল। তার পর দিন তুমি কেক্ তৈয়ারী করলে আমি ছুরি দিয়ে বোতলচূর তার ভিতর পুরে দিলাম। তিন খানা কেক সে খেয়েছিল, ছখানা পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলাম। তিন দিন পরে দুটো রাজহাঁস মরে, মনে পড়ে?

"আঃ! চুপ কর—শোন আগে—

আমি শুধু মরিনি! কিন্তু তবু এ মৃত্যু

হেনরি চলে গেল! মনে পড়ে?—শোন, শুধু তাই নয়। তার পর মনে কি একটা ভীষণ আতঙ্ক কেবলি যন্ত্রণা!—মনকে বোঝাতাম—দিদির কাছ-ছাড়া হব না, মরবার সময় দিদির কাছে সব কথা বলে যাব। এখন বলা হয়েছে—আজীবন তাই এই মুহূর্ত্ত টুকুর জন্য ভাবতাম—কি করে বলব! এখন সব কথা বলা হয়েছে তবু—!

সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাত্রে কেবলি ভাবতুম একদিন না একদিন তোমাকে সব বলব—কেবল সেদিনের প্রতীক্ষায় থাকতাম। সব বললাম তবু ত মন খালি হয় না! কেবল

কি ভয়! যা হবার তা হয়েছে—এখনো ভয়—মনে করতে ভয় হয় যদি তার সঙ্গে দেখা হয়! আজ আমি মরতে বসেছি—দিদি, তুমি আমায় ক্ষমা কর,—তুমি না ক্ষমা কল্লে তার সঙ্গে দেখা করতেও পারব না আমি! আচার্য্য মশায় দিদিকে ক্ষমা করতে বলুন, নইলে মৃত্যুতেও আমার শান্তি নেই।" মার্গারিট নিস্তব্ধ হইল। সে হাঁপাইতেছিল।

সুজেন দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভাবিতেছিল—হেনরি,—তাহাকে সে কত ভালবাসিত, সে আজ কতদিনের কথা—সে আজ থাকিলে কি সুখেই না দিন কাটিত! আহা!

আজ বহুদিন পরে আবার নূতন করিয়া হেনরিকে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল—সেই এক অতীত দিনের হাসি খেলার মধ্যে হেনরির মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। হায়! সে কি স্মৃতি-মণ্ডিত সুখের অতীত ক্ষণগুলি! এস প্রিয়তম হে মৃত্যু পথের পথিক, এস আজ সুজেনের কাছে ফিরিয়া এস! আজ সুজেনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় যে! সেই চুম্বন! সেই এক, সেই ধ্রুব! তার স্মৃতি সুজেনের প্রতি শিরাটিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল! তারপর আর কিছুই নাই শূন্য—সকলি—শূন্য—দারুণ হাহাকার!

আচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুজেনকে কহিলেন, "মা, দেখ, আর বুঝি দেরি নাই—"

সুজেন ভগিনীর পানে চাহিল। চোখের জলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। ভগিনীর বুকের উপর পড়িয়া তার অধরে চুম্বন করিয়া সুজেন কহিল "মার্গট! মার্গট! বোনটি আমার,—ক্ষমা, ক্ষমা—প্রাণভ'রে ক্ষমা করলাম তোকে!—"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

সমুদ্রকূপ।

প্রয়াগ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহার আধুনিক নাম এলাহাবাদ। শুধু হিন্দুর তীর্থ ব'লয়াই প্রয়াগের প্রসিদ্ধি নহে। কি প্রাকৃতিক দৃশ্যে কি ঐতিহাসিক তথ্যে কি প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে প্রয়াগের গৌরব সমুজ্জ্বল। সর্ব্বধ্বংসী কালের অপ্রতিহত-প্রভাব সত্ত্বেও প্রয়াগে এখনও বহু দর্শনীয় বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে। সমুদ্রকূপ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। উহা ত্রিবেণীসঙ্গমের পরপারে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

ঐ কূপের নামকরণ সম্বন্ধে তিন প্রকার মত শুনিতে পাওয়া যায়।—পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে গুপ্তসংবৎ প্রবর্ত্তক কৌশাম্বী-অধিপতি সমুদ্রগুপ্ত ঐ কূপ খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই উহা সমুদ্রকূপ নামে বিখ্যাত। কিন্তু প্রয়াগের পাণ্ডারা বলেন যে, সমুদ্রের সহিত ঐ কূপের যোগ থাকাতেই উহার নাম সমুদ্রকূপ হইয়াছে। আবার, জনসাধারণের বিশ্বাস, রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার্থে বনগমন করিলে তদীয় অনুজ ভরত অগ্রজকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার মানসে যখন তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে

তিনি সঙ্গে সমুদ্রবারি লইয়া যান। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যদি রামচন্দ্র প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হন তাহাহইলে তাঁহার ললাটে ঐ জলে রাজটিকা পরাইয়া দিবেন। কিন্তু রামচন্দ্রে প্রত্যাবর্ত্তনে অসম্মত হওয়ায় ঐ জল ভরত হতাশচিত্তেযে স্থলে নিক্ষেপ করেন—সেই স্থলেই উক্ত কূপের সৃষ্টি হয়।

বলা বাহুল্য এইরূপ বিশ্বাস কল্পনাকুশল

সমুদ্রকূপ।

জনসাধারণের উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে! আমাদের দেশের অন্যান্য ইতিহাস যেমন একটা-না একটা উদ্ভট কল্পনায় আচ্ছন্ন থাকে ইহাও সেইরূপ।

যাহা হউক কালে ঐ কূপ শুষ্ক ও ভরাট হইয়া গিয়াছিল। কিছু দিন হইল কোন সাধু উহার সংস্কার করাইতে আরম্ভ করিলে স্থানীয় পাণ্ডাগণ তাঁহাকে ঐ প্রকার দুঃসাহসের
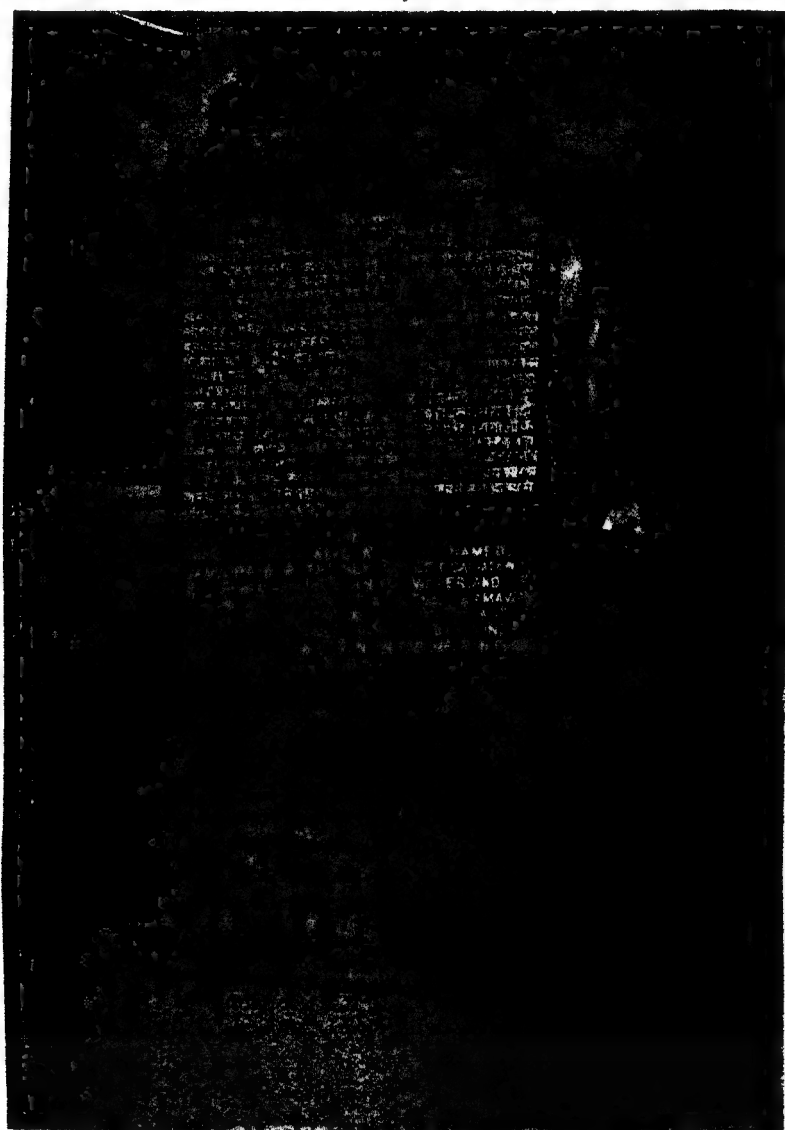
সমুদ্রকূপের অভ্যন্তরে ক্ষোদিত লিপি

কার্য্য করিতে নিষেধ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ঐ কূপ খনন করিলে সমুদ্রের নিরুদ্ধজলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত প্রয়াগ ভাসাইয়া দিবে। বলাবাহুল্য সংস্কারকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে এবং প্রয়াগের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে নাই।

মাতৃঋণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(মজলিসের জের)

পরদিন মনোভাঁর কাছে মাদাম বার্গেসের এক চিঠি গিয়া উপস্থিত!—তাহার বাড়ী সস্ত্রীক মনোভাঁর নিমন্ত্রণ! চিঠির তলায় একটা ছোট্ট 'পুনশ্চ'তে কবি আর্জেন্দুঁকে সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য আবার বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া আর্জেন্দুঁ কহিল "আমি তাঁদের যাচ্ছিনা!"

মনোভাঁ মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "যাবেনা!—কেন?"

"আমি ঐ রকম স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আলাপ করতেই বড় একটা রাজী নই—বাড়ী গিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া তো পরের কথা!"

"না, তুমিই—দেখছি—আমার সব আশাটি মাটী করবে!—নেমন্তন্নে যেতে দোষ কি? মাদাম বার্গেসকে তুমি যা ভেবেছ, তা নয়, আর যদিই তাই হয় তবু আমার খাতিরে তোমার যেতে হবে! বুঝেছ তো—ঐ উদ্যোগ না বাগাতে পারলে কাগজ-খানা আমাদের মোটেই বেরুবে না!"

অনেক বলাকহার পর আর্জেন্দুঁ যাইতে রাজি হইল।

ছেলের উপর জিন্ নগের ভার দিয়া মনোভাঁ সস্ত্রীক ইদার বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কারণ আর্জেন্দুঁ বলিল "তোমরা এগোও আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব!"

মনোভাঁ জিজ্ঞাসা করিল "ঠিক যাচ্ছো?"

"হাঁ।"

সাতটার সময় আর্জেন্দুঁর উপস্থিত হইবার কথা। এই আসে এই আসে করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল! কিন্তু আর্জেন্দুঁ আসিল না! ইদা অস্থির হইয়া উঠিল! সে মনোভাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কৈ এখনও এলেন না ত! অসুখ-বিসুখ ক'রল না ত!—তাঁর যে শরীর!"

মনোভাঁরও বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল—আর্জেন্দুঁ না আসিলে কাগজের কথা ত তোলাই যাবে না!—আঃ আর্জেন্দুঁটা সব মাটি করিবে!

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আর্জেন্দুঁ আসিয়া উপস্থিত হইল!

আর্জেন্দুঁকে দেখিয়া ইদার প্রাণের ভিতর কি যেন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। মনোভাঁ বলিল "কিহে এত দেরী?"

"হঠাৎ একটা কাজে দেরী হয়ে গেল!"

ইদার বাড়ী দেখিয়া আর্জেন্দুঁ একটু মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—বেশ ত কিটফাট সুসজ্জিত ঘরগুলি! ইদার ঘরের আসবাব দেখিয়া মনোভাঁর মত অজস্র প্রশংসা না করিলেও আর্জেন্দুঁ মনে মনে একটু সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং পূর্ব্বের মত গম্ভীর ভাবে বসিয়া না থাকিয়া কথাবার্ত্তাও বেশ কহিতেছিল।

আর্জেন্দুঁ কথাবার্ত্তায় যে নিতান্ত অপটু তাহা নয় কিন্তু নিজের কথা ছাড়া সে আর কিছু কহিতে বড় ভাল বাসেনা। ইদার আবার স্বভাব যে কাহারও আত্মকথা বড় বেশীক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারে না।

শ্রোতার এই অধৈর্য্যে আর্জেন্ত আবার ভারী চটিয়া যায়। আর্জেন্তর কথার মাঝে ইদা অনেক বার আপনার অজ্ঞাতে বাধা দিয়া ফেলিল। আর্জেন্ত একপ্রকার বিরক্তির দৃষ্টিতে ইদার পানে চাহিল। ইদা সঙ্কুচিতা হইয়া গেল—ভাবিল—আর্জেন্ত কেন এমন করিয়া চাহিল? বিরক্ত হইয়াছে?...কেন? ইদার বুকের মাঝে রক্ত উছলিত হইয়া উঠিল। আর্জেন্তর বিরক্তি ইদার পক্ষে যে মৃত্যুরও অধিক! ইদার ইচ্ছা হইতে লাগিল,—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠে!

ভোজনান্তে সকলে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। মরোভাঁ ভাবিল কাগজের কথাটা তুলিবার এই ঠিক সময়। বলিল "দেখুন কাউণ্টেস্, আপনি যে সেই একখানা কাগজ প্রকাশ করার কথা বলেছিলেন আমি সে সম্বন্ধে ভেবে দেখেছিলুম...খরচটা যত পড়বে ভেবেছিলুম তত লাগবে না!—"

ইদা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল "হ্যাঁ।"

"দেখুন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা খুব দরকার—"

ইদার কানে এ কথা পৌঁছিল কি না সন্দেহ!—সে আর্জেন্তর কথা ভাবিতেছিল—কেন সে অমন চিন্তিতভাবে পায়চারি করিতেছে!

ইদার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া মরোভাঁ তাহার পত্নীর পানে চাহিয়া একটু হাসিল। তাহার অর্থ—"একেবারে বিভোর!"

এদিকে ইদা ভাবিতেছিল কি করিয়া সে আর্জেন্তর মনের মেঘ সরাইয়া তাহার মন পাইবে। হঠাৎ একটা মতলব তার মাথায় আসিল। ইদা আর্জেন্তকে কহিল—"অনুগ্রহ করে আপনার সেই কবিতাটা একবার শোনাবেন—আমার বড় ভাল লাগে!

কি জানি কেন আর্জেন্তর মনে একটু করুণা হইল। বলিল, "বলুন কোন কবিতাটা শুনতে ইচ্ছে!"

সেই যে কবিতাটি জিম্‌নেসে পড়েছিলেন—প্রথম লাইনটা তার—

"প্রেম, বিভু সম পূজ্য—কেহ নহে ছোট—।"

আর্জেন্ত তাহার এই একনিষ্ঠ ভক্তটির প্রতি প্রসন্ন না হইয়া আর থাকিতে পারিল না। বলিল "আমার কবিতার লাইন পর্য্যন্ত আপনি মনে রেখেছেন দেখছি—ধন্যবাদ!"

আনন্দে ইদার মুখে ক্ষণেকের জন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্ত পরে আত্মভাব সংযত করিয়া ইদা কহিল "আমার সে কবিতাটি বড় ভাল লেগেছিল—ভাল কবিতার লক্ষণই হচ্চে মনে গেঁথে থাকে।"

ইদার এই অতিরিক্ত প্রশংসায় আর্জেন্তর সমস্ত মুখে একটা গৌরবদীপ্ত ফুটিয়া উঠিল। আর্জেন্ত একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল, তাহার অর্থ—তবু সম্পাদকে তার লেখা ফিরাইয়া দেয়!

জিমনেসে ফিরিবার পথে মরোভাঁ আর্জেন্তকে বলিল—"দেখ যদি আমাদের কাগজ একখানা বেরোয় তবে তোমাকে তার সম্পাদক হ'তে হবে!"

মরোভাঁ ভাবিয়াছিল আর্জেন্তকে সম্পাদক হইবার লোভ না দেখাইলে তার ততটা 'চাড়' হইবেনা, আর আর্জেন্ত ব্যতীত কাউণ্টেসের নিকট হইতে টাকা বাহির করাও কাহারও সাধ্য নহে।

মঁশোর কথায় আর্জেন্ত কিন্তু কিছু উত্তর দিল না! কাগজের কথা সে একটুও ভাবে নাই। তাহার জীবনে নিমেষের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের 'ঢল নামিয়াছে' সে তাহারই বিষয় ভাবিতেছিল! এ পর্য্যন্ত কোন নারী তাহার মনে এতটুকু দাগ পাড়িতে পারে নাই কিন্তু সহসা আজ এই নারী কি করিয়া তাহার মনের বাঁধন এত সহজে শ্লথ করিয়া দিল!—

সেই দিন হইতে ইদার প্রতি বাহ্যতঃ কোনরূপ ভাবান্তর না দেখাইলেও আর্জেন্তর হৃদয়ের নিভৃত পটে যে একখানি নারীমূর্ত্তি দিন দিন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল আর্জেন্ত নিজে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল!

আর্জেন্ত জ্যাককে নানা কথার মধ্য দিয়া তাহার মায়ের কথা তাহাদের বাড়ীর অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। আর্জেন্তর আদরে জ্যাক্ গলিয়া গিয়া তাহাদের বাড়ীর ছোট খাট যত কথা সব একে একে তাহাকে বলিয়া যাইত! এক দিন জ্যাক্ কথায় কথায় বলিল "আমার বন্ধু আমায় খুব ভালবাসেন।"

আর্জেন্ত জিজ্ঞাসা করিল "বন্ধু?—তিনি কে?"

জ্যাক্ ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল "আপনি বন্ধুকে চেনেন্ না? ...তা চিন্‌বেন কেমন করে—তিনি তো এখানে কখন আসেন নি!

"তিনি কত বড়—কি নাম?"

"কি নাম তা জানিনা, আমি তাঁকে বন্ধু বলে ডাকি,—ঢের বড় আপনার চেয়েও।"

"তোমার মা তাঁকে কি বলে ডাকেন!"

"মা?—মাও তাঁর কৈ নাম ধরে ডাকেন না—মুসোঁ—মুসোঁ করেন।"

"তোমাকে ভাল বাসেন?"

"খুব ভালবাসেন!—যখন তখন আমাদের দেখতে আসেন, যখন না আসতে পারেন তখন কত ফলটল পাঠিয়ে দেন!—আমিও বড় ভালবাসি তাঁকে!"

"তোমার মাও তাঁকে ভালবাসেন?

"হাঁ—ভালবাসেন বই কি!"

জ্যাক সরল ভাবেই উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু ঐ কথায় আর্জেন্তর মনে কে যেন খানিকটা তীব্র বিষ ঢালিয়া দিল। সেই দিন হইতে বন্ধুর কথা আর্জেন্তর মোটেই ভাল লাগিত না। তার বন্ধুর উপর আর্জেন্তর কেন এমন ভাব হইল জ্যাক কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা। আর্জেন্তকে জ্যাকও ক্রমে আর দেখিতে পারিত না। ইহার উপর জ্যাকের মা আবার আর্জেন্তর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে দেখিয়া জ্যাক জ্বলিয়া যাইত! ক্রমে আর্জেন্ত জ্যাকের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল।

ছুটির সময় জ্যাক বাড়ী আসিলে ইদা জিজ্ঞাসা করিত—"তোর মাষ্টারমশাই আর্জেন্ত তোকে ভালটালো বাসেন?"

জ্যাক মুখ ভার করিয়া বলিত—"ছাই!"

মাসে দুইটি বৃহস্পতিবার জ্যাক হাফ্‌ছুটি পাইত। সেই দুই দিন জ্যাক মায়ের কাছে থাকিত, খাওয়া দাওয়া করিত। এক বৃহস্পতিবার জ্যাক দেখিল খাইবার ঘরটি বেশ সাজান হইয়াছে—ফুলদানীগুলি কতরকমের ফুলে ভরা! ঘরে তিন জনের খাইবার আসন। জ্যাক মহা আহ্লাদিত হইল—সে ভাবিয়া

ছিল তাহার বন্ধু আজ তাহাদের সঙ্গে ভোজন করিবেন।

এমন সময় মাকে দেখিয়া জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল "মা আর একজন কার জায়গা হয়েছে?"

"বল দেখি—যদি বল্‌তে পার—তবে তোমায় একটা খুব ভাল খেল্‌না দেব—বল্‌ দেখি কে আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন?"

জ্যাক ভাবিয়াছিল সে ঠিকই বলিতে পারিবে তাই সে ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ফুলাইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিল "বলি?—বন্ধু আসবেন্‌!"

জ্যাকের মা হাসিতে হাসিতে বলিল—"হলোনা—তোমাদের মাষ্টার - আর্জেন্ত!"

আর্জেন্ত!

পলকের মধ্যে জ্যাকের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। ইদা ভাবিল পুরস্কার লাভে হতাশ হইয়া জ্যাকের মুখ অমন হইয়া গেল। সে জ্যাককে বুকের—মাঝে টানিয়া লইয়া বলিল—"না—না—খেল্‌না পাবে!"

তিন জনে খাইতে বসিল। আজ জ্যাকের মনে এতটুকু সুখ নাই!—ইদা ও আর্জেন্ত গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিল। তাহাদের কোন কথা জ্যাকের কানে যাইতেছে না!—জ্যাকের আর এক দণ্ড সেখানে থাকিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না! আজ—তাহার চারি দিকে বিষাদ!

আহার শেষ হইলে ইদা ও আর্জেন্ত দুই জনে বসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিল! আর্জেন্ত তাহার অতীত জীবনের যত সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল আর ইদা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। বেচারা জ্যাক দূরে এক খানা ছবির বই দেখিতে দেখিতে ঈষৎ তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছিল।

ইদা জ্যাককে কহিল—"জ্যাক, যাও—এখানে ঘুমিও না—কঁস্তাকে ডাকো।"

জ্যাক সকরুণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ইচ্ছা আর একটু মায়ের কাছে থাকে!

ইদা কহিল, "ছি যাদু আমার, যাও তা নইলে মাষ্টার মশাই বক্‌বেন!"

জ্যাক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মায়ের আজ্ঞা পালন করিল।

ইদার সহিত আর্জেন্তর যত ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তর হইতে লাগিল ততই জ্যাক আর্জেন্তর চক্ষুশূল হইতে লাগিল। ইদা আর্জেন্তর জন্য আর সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু জ্যাক—তাহার আদরের জ্যাক আহা তার লাঞ্ছনা তাহার বুকে শেলের মত আঘাত করে! বরং জ্যাককে সে ছাড়িয়া থাকিতে পারে কিন্তু জ্যাকের কষ্ট তাহার অসহ্য!

আর্জেন্তর বিষনয়ন হইতে জ্যাককে দূরে রাখিবার ইচ্ছায় ইদা একদিন স্পষ্টই আর্জেন্তকে কহিল—"চল আমরা অন্যত্র যাই—আমার নগদ কিছু আছে তা ছাড়া আমি খাটতে পারব।"

আর্জেন্ত সম্মত হইল না—বলিল "এত শীঘ্র! না আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর—আমার এক আত্মীয়া আছেন তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে—শীগ্‌গীরই কিছু দাঁও মারা যাবে!—বুঝেছ কি না তখন আর আমাদের বিবাহের কোন বাধা হবে না—"

এই বলিয়া আর্জেন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

চিত্র আঁকিতে বসিত। ইদাও মুগ্ধ হইয়া দেখিত। এইরূপে শীত কাটিয়া গেল।

একদিন জ্যাক ম্লানমুখে জানালার পাশে বসিয়া বসন্তের সুনীল আকাশ পানে চাহিয়া আছে। সেদিন বৃহস্পতিবার। জ্যাক আর বড় একটা স্কুলের বাহির হয় না! বসন্তের বাতাসে শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে। জ্যাক ভাবিতেছিল এই সময় অন্য কোথায় যদি যাওয়া হত!

এমন সময় হঠাৎ কে ডাকিল "জ্যাক!" জ্যাক ফিরিয়া দেখে—তাহার মা! তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছে!—

জ্যাকের আহ্লাদ দেখে কে! সে তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করিবার জন্য তাহার ঘরে যাইতেছে হঠাৎ মাড়ুর সঙ্গে দেখা হইল।

মাড়ুকে দেখিয়া জ্যাক ইদাকে কহিল "মা মাড়ুকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলনা!" ইদা কহিল "মাড়ুকে কি এরা যেতে দেবে?"

"হাঁ মা তুমি বল্লে যেতে দেবে!"

"জ্যাকের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া মাড়ু যাইবার হুকুম পাইল। জ্যাক তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল, বলিল "মাড়ু মাড়ু শীগ্‌গির সব ঠিক করে নাও?"

গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল—কেমন, মাড়ু বেশ—না!"

মাড়ু চারি দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল —"বেশ!"

সমুদ্রধারের একটা হোটেলে আহারাদি করিয়া জ্যাকের মা বলিল "চল এখানকার চিড়িয়াখানা দেখে আসা যাক্!"

শুনিয়া জ্যাক ত আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—বাঃ—বাঃ বেশ!—মাড়ু কখনও চিড়িয়াখানা দেখে নি—তারও দেখা হবে!"

এতক্ষণ মাড়ু জ্যাকের খাতিরে পড়িয়া বলিতেছিল তার আমোদ হইতেছে। কিন্তু চিড়িয়াখানা দেখিয়া বাস্তবিকই সে প্রীত হইল! কত দেশের কত শত পশুপক্ষী বন্দী হইয়া রহিয়াছে—কেন?—শুধু মানুষের সুখের জন্য! চিড়িয়াখানার উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া জিমনেসের উঁচু দেয়াল মনে পড়িল—তার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মাড়ু ভাবিল,—তার অবস্থা এই সব জন্তুর অপেক্ষা কতটুকু উঁচুতে?—খুব কম! সেও মানুষের হাতে বন্দী—এরাও তাই?—অসহায় পশুপক্ষীর নীরব বেদনা মাড়ু আপনার বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

হঠাৎ মাড়ু দেখিল এক প্রকাণ্ড হাতী চড়িয়া অনেকগুলি নরনারী মাড়ুর দিকে আসিতেছে! সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণ তাহাদের উপরে পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

হাতী দেখিয়া স্বদেশের কথা মাড়ুর মনে পড়িল। স্বদেশের স্মৃতির সঙ্গে মাড়ুর অতীত সৌভাগ্যের কথা মনে আসিল। অতীতের স্মৃতি মাড়ুর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা যেন জাগাইয়া দিল। মাড়ু যেন কি রকম হইয়া গেল! জ্যাক বলিল—"মাড়ু—মাড়ু কি হয়েচে তোমার?"

মাড়ু কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর যখন সে শুনিল সেও ইচ্ছা করিলে হাতীর উপর চড়িয়া চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে পারে তখন তাহার মুখের বিষণ্ণভাব কাটিয়া গেল!

জ্যাক বলিল "তুমি তবে হাতী চড় আমি

মার কাছে থাকি। তাহারা মাতাপুত্রে দুই জনে মাহুর হাতীর উপরে উঠা দেখিতে লাগিল। মাহু কি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতিতে হাতীর উপর উঠিল!

হাতীর উপরে উঠিয়াই মাহুর মেজাজ ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছে...তাহার নিজের রাজত্বে! পলকের মধ্যে চোখের সামনে দাহমীর রাজপ্রসাদ যেন দেখিতে পাইল—রণবাদ্য যেন কাণে আসিতে লাগিল—সে যে মরোভী জিমনেসের একজন লাঞ্ছিত ছাত্র একথা সে মনেই করিতে পারিল না!

মাহু হাতী চড়িয়া অনেকক্ষণ বেড়াইল।

ক্রমে বেলা গেল—মাহুকে হাতী হইতে নামিতে হইল!—আবার যে মাহু—সেই মাহু!—

বাটী ফিরিবার সময় হইল। জ্যাকের মনের আর সে আনন্দ নাই! ইদাও বিমর্ষ চিত্ত!—কি যেন বলিবে—বলিবে করিতেছে কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ এই রকমে গেল।

অবশেষে ইদা ডাকিল—"জ্যাক!"

"জ্যাক মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "কি—মা?"

ইদা জ্যাকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে বলিল "তোমায় একটা কথা...বলব.. তোমার দুঃখ হবে ..কিন্তু..."

জ্যাক শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"না মা .. তবে, থাক—বলো না!

"না জ্যাক আমায় বলতেই হবে—কিছু দিনের জন্যে আমায় একটু দূরে যেতে হবে—"

"মা!"

"ছি---কেন না!—" আমি তোমাকে চিঠি লিখব—আর বেশী দিনও থাকব না!—" বলিয়া ইদা জ্যাককে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

জ্যাক শুধু পাষাণের মত আড়ষ্ঠ হইয়া বসিয়া রহিল—চোখের—দুই কোণে দুই বিন্দু জল! সমস্ত বিশ্বটা যেন এক মুহূর্ত্তে অন্ধকূপ হইয়া গিয়াছে।—চারি-ধারে বিষাদ—বাধা—নির্ম্মমতা!

ইদার কোলের কাছে বসিয়াও জ্যাকের—মনে হইতে লাগিল—সে আজ—মাতৃহীন—একা, অসহায়! (ক্রমশঃ)

বিদায়।

(টেনিসন হইতে)

ধীরে ধীরে বহে যাও মধুরা তটিনি!
সুদূর সাগরে মিলো যেয়ে;
আমি আর আসিব না, ভ্রমিব না তীরে,
রহিব না তব পানে চেয়ে।
বহ ধীরে, বহে যাও চুমি তৃণ ভূমি,
নির্ঝরিণী তরঙ্গিণী পরে,
যেথায় চরণ নাহি পড়িবে আমার,
চিরদিন, চির দিন তরে।
হাসিবে তোমার জলে সহস্র তপন,
শত শশী জোছনা ঢালিবে,
কেবল র'বনা আমি, হেরিতে সে শোভা
চির তরে বিদায় জানিবে।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

সম্রাট জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক।

বিগত ২২ শে জুন বৃহস্পতিবার সম্রাট জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক হইয়া গেল। সেদিনকার অভূতপূর্ব্ব মোহন দৃশ্য দেখিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি লণ্ডন সহরে সমবেত হইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে রাজ্যাভিষেক ব্যাপার বিশেষ সমারোহ এবং নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের
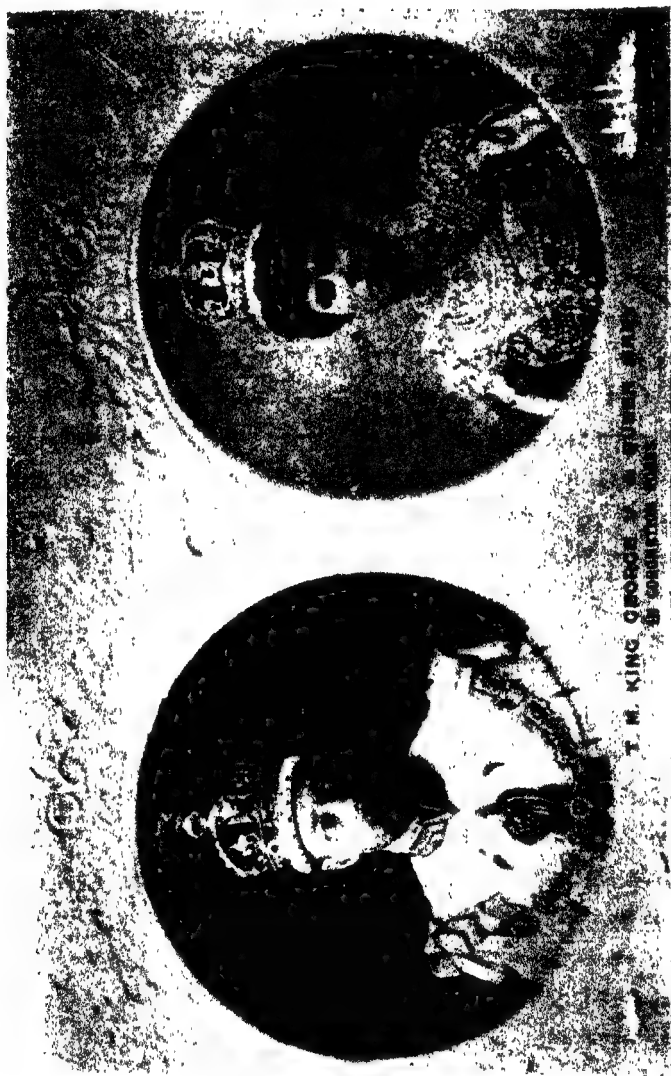
সম্রাজ্ঞী মেরী।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।

সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রাজ্যাভিষেক ব্যাপার বর্ত্তমান ঘটনার সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই পর্ব্ব উপলক্ষে লণ্ডন সহরে যে অপরিমেয় জনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় নাই। এক ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে,

রাজসজ্জা ও রাজমুকুটের ব্যয় ব্যতীত, অর্দ্ধ কোটী মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ যদিও ৪র্থ জর্জ্জের রাজভূষণ পরিধান করিলেন তথাপি তাহাও বিস্তর অর্থব্যয়ে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। রাণী মেরী র মুকুট ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। লোকে বলিতেছে যে মুকুটের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, তাহার বহুমূল্য হীরকের জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তাহাকে মুকুট না বলিয়া আলোক কিরীট বলিলেই ঠিক হয়। এতদিন ভিক্টোরিয়ার মুকুটের কথা লোকে স্পর্দ্ধাভরে উল্লেখ করিত, এখন পঞ্চম জর্জ্জ ও রাজ্ঞী মেরীর মুকুটের নিকট তাহা হীনপ্রভ হইয়া গেল। বিগত রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে কেবল যে ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে। সুশৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা, সুরুচি, সহৃদয়তা প্রভৃতি ইংরাজ জাতির প্রধান প্রধান গুণেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উৎসব দর্শনার্থ লক্ষ লক্ষ বিদেশীয়গণ মহা আগ্রহ সহকারে ব্রিটীশ রাজধানীতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। এক অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১০০০০, কেনেডা হইতে ৮০০০, ভারতবর্ষ হইতে কত সহস্র, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে শত শত ব্যক্তি,—লক্ষ লক্ষ আমেরিক কুবের, কত ইউরোপীয় এবং ভারত রাজন্যবর্গ, কত জাপানী, কত উচ্চপদস্থ চীনবাসী লণ্ডন সহরে সমবেত হইয়াছিলেন। আমেরিকা এই কয় দিনে ৬ কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে। যে পথ দিয়া রাজা গমন করিয়াছিলেন তাহার ধারে উপবেশনের জন্য এক এক জন ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অকাতরে ব্যয় করিয়াছে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অপরাপর জন সাধারণের ব্যয় অপরিমেয়। একটী দিনে কত লোকের চিরজীবনের উপজীবিকার সংস্থান হইয়া গিয়াছে। এক রাত্রে কত দরিদ্র ধনবান হইয়াছে। ইংলণ্ডরাজের রাজ্যাভিষেক! এমন সুবর্ণন বৃহৎ অনুষ্ঠানের দর্শনলাভ সচরাচর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না! রাজাপ্রজায় এমন মধুর সম্বন্ধ আর কোথায় আছে? ইংরাজ জাতি যেমন স্বাধীনতাপ্রিয় তেমনি রাজভক্ত। এই রাজ্যাভিষেকে ইংলণ্ডে রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির কি অপূর্ব্ব সমাবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার ভিতর এরূপ সম্বন্ধ ছিল না। পূর্ব্বের অবস্থা থাকিলে আজ কি এত বিপুল সমারোহে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। ভিক্টোরিয়ার পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার বংশধরগণেরও আজ এত সমাদর। পূর্ব্বে ইংরাজ জাতি ভাবিত যে রাজ সিংহাসন কেবল শোভা ও সম্ভ্রম সংবর্দ্ধনার্থ। কিন্তু সপ্তম এডওয়ার্ড প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্যই ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন।

অভিষেক দিবস।

২২ শে জুন প্রত্যূষে সেণ্ট জেমস্ পার্ক হইতে ২১টী কামান ধ্বনিত হইয়া লণ্ডন নগরে এই শুভদিনের সুপ্রভাত ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ লণ্ডন টাওয়ার হইতে আরও ৪১টী কামান ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণে লণ্ডনবাসীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। পূর্ব্ব রাত্রে লণ্ডনবাসী আর শয্যাগ্রহণ করে নাই। যে লণ্ডনের নৈশ নিস্তব্ধতা কখন ভঙ্গ হয় না আজ তাহা জনকোলাহলে মুখরিত এবং অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া সুপ্রভাতের অপেক্ষা করিয়া আছে। সহরবাসী আনন্দ সঙ্গীত করিতে করিতে পথ ঘাট মাঠ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সশস্ত্র শান্তিরক্ষক আসিয়া দলে দলে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে লাগিল। আজ তাহাদিগের কার্য্যভার বড় গুরুতর। কি বিপুল জনতা! কি প্রবল জন সঙ্ঘ। লর্ড কিচনার ৪৫০০০ সৈনিক লইয়া এই বিপুল জনসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুনিয়মিত করিবার জন্য আজ রাজপথে অবতীর্ণ। হাইডপার্কের কোণে ট্রাফালগার স্কোয়ারের সম্মুখ পুলিশের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সৈন্য বিভাগ বারবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। দর্শকগণ প্রত্যূষ হইতে বৃষ্টি জলে সিক্ত হইয়া অনিদ্রায় অনাহারে দণ্ডায়মান। এই সকল ক্ষুধিত তৃষিত ব্যক্তিগণকে ফল এবং জল বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এমনি ঘোর জনতা যে বৃষ্টি এবং শীতল বায়ু সত্ত্বেও কত রমণী

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, অমনি সেবিকাগণ তাহাদিগকে সেবা করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছেন। ঠিক ৬½ টার সময় ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জ্জাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কত অতীত ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ সেই গম্ভীর স্থানে আজ কি বিচিত্র পুণ্য দৃশ্যেরই অভিনয় হইবে। অতি প্রভাত হইতে শকটমালা অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমাগত ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জ্জার দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল কিন্তু ৭ টার সময় সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্যই যেন একবার সূর্য্যদেব মেঘের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিলেন। আদিকাল হইতে সর্ব্বদর্শী সূর্য্যদেব ইংলণ্ডের এরূপ দৃশ্য কখনও স্বর্ণকিরণে অনুরঞ্জিত করেন নাই। যে পথ দিয়া রাজা ও রাণী ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জ্জায় গমন করিয়াছিলেন তাহার উভয় পার্শ্বের দৃশ্যের বর্ণনা অসাধ্য। পুষ্পে, পত্রে, পতাকায়, এবং বিচিত্র তোরণসমূহে সুসজ্জিত সমুদায় রাজপথ ইন্দ্রপুরীর তুল্য বোধ হইতেছিল। ক্রমে ৮টা বাজিল তখন সমুদায় অভিজাতকুল সপরিবারে সমারোহে অভিষেক স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। গির্জ্জার সম্মুখে রাজন্যবর্গের সুশোভিত শকটশ্রেণী জলস্রোতের ন্যায় চলিতে লাগিল। এই প্রকারে দেখিতে দেখিতে সাত সহস্র সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ জ্ঞানী গুণী প্রভৃতি ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন সমূহে সেই বিরাট অভিষেক স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। অভিজাতবর্গের মহিষীগণ সভাগৃহের উভয় ভাগে সমাসীন হইলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ বহুমূল্য, কণ্ঠে বিচিত্র হীরকহার, পশ্চাতে কোড়ে তাঁহাদের রত্নখচিত স্বর্ণ কিরীট। দক্ষিণে সমস্ত রাজন্যবর্গ—তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় আসনের নিম্নে মুকুট স্থাপন করিয়াছেন। বেদীর সম্মুখে রাজার বিচিত্র সিংহাসন—রাজমুকুট, রাজদণ্ড, স্বর্ণপাত্র প্রভৃতি অভিষেকের সমুদায় উপকরণ যথা স্থানে বিন্যস্ত। সকলে যথাক্রমে পদমর্য্যাদানুসারে স্ব স্ব চিহ্নিত আসনে উপবেশন করিলে পর সঙ্গীতবাদ্যরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সাড়ে আট ঘটিকার সময় সমুদায় পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। আর একখানি শকটও চালিত হইল না। ৯টা বাজিতে বাজিতে সকলে অভিষেক গৃহে যথা স্থানে উপবেশন করিয়া উৎগ্রীব হইয়া শুভ লগ্নের অপেক্ষায় রহিলেন।

এদিকে বাকিংহামপ্রাসাদে রাজার বিরাট শোভাযাত্রার বাহিনী সুসজ্জিত ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রথমে রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, জর্ম্মণ যুবরাজ ও রাজদূতগণ অগ্রসর হইলেন। তৎপরে পাঁচখানি সুসজ্জিত শকটে রাজকন্যা রাজপুত্রগণ ও রাজবাটীর উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ। ইহার শেষ শকটখানিতে যুবরাজ ও তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী মেরী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রসন্ন উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই দর্শকগণ ঘোরনিনাদে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। তৎপরে রাজার অঙ্গরক্ষক সেনাদল যাত্রা করিল,—এবং রাজা ও রাণী শকটে পদার্পণ করিবামাত্র কামান ধ্বনিত হইল। কি আশ্চর্য্য! ঠিক এই মুহূর্ত্তে সূর্য্যদেব মেঘমালা অপসারিত করিয়া তাঁহার কিরণরশ্মি বিতরণ করিলেন। ৮টী স্বর্ণাভ অশ্ব মন্থর-ভাবে নৃত্য করিতে করিতে রাজা রাণীকে বহন করিয়া চলিল। রাজশকটের পশ্চাতেই প্রধান সেনাপতি ও সমুদায় রাজ সেনা—যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া আনন্দগৌরবে অনুসরণ করিল। রাজারাণীর দর্শন মাত্রেই—দর্শকগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া জয়ধ্বনিতে সমুদায় সহর কম্পিত করিয়া তুলিল। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জ্জা পর্য্যন্ত আনন্দ কল্লোল তরঙ্গের পর তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেদিনকার কোটী কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্রাট সম্রাজ্ঞীর কর্ণে চিরধ্বনিত হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

রাজশকটের পরেই—লর্ড কিচনার দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভারতীয় সেনার তেজোব্যঞ্জক উন্নত দেহ ও উজ্জ্বল বেশ ও শ্যাম কান্তি দর্শনে দর্শকগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।—এইরূপে সেই বিশাল শোভাযাত্রাবাহিনী ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জ্জায় উপস্থিত হইল। সর্ব্ব প্রথমে বিদেশীয় দূতগণ, জর্ম্মণ রাজকুমার ও রাজকুমারী সভা

গৃহে প্রবেশ করিয়া সগৌরবে সমাদৃত সম্মানিত হইয়া স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে গার্টারবেশধারী যুবরাজ হাই-ল্যাণ্ডারের বেশে সজ্জিত ভ্রাতৃগণের সহিত সভা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সমুদায় রাজপরিজন তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যুবরাজের এক হস্তে যুবরাজের টুপী অপর হস্তে মুকুট। প্রথমে যুবরাজ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে, তাঁহার সম্মুখ দিয়া সমুদায় রাজপরিবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবরাজ নতমস্তকে একে একে সকলকেই সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজকুমারী মেরী উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হইয়া মুকুট হস্তে অগ্রসর হইলেন, তৎপরে পুরোহিতগণ দর্শন দিলেন। একজন রাণীর দণ্ড, মুকুট প্রভৃতি বহন করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে স্বয়ং রাজ্ঞী পুরোহিতদ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তিনী হইয়া ধীর পাদক্ষেপে উপস্থিত হইলেন রাণীর পশ্চাতে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ। তৎপরে, রাজদণ্ড, তরবারি, পোষাক প্রভৃতি বহন করিয়া রাজার অনুচরগণ একে একে দর্শন দিলেন। এই সকল রাজকীয় চিহ্নের পশ্চাতে স্বয়ং রাজা ধীর পাদক্ষেপে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণীকে দর্শন মাত্রেই সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহা-দের প্রবেশের পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজ-দর্শন মাত্রেই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলের ছাত্রগণ লাটিনভাষায় স্বস্তিবচন পাঠ করিল। রাজসিংহাসনের সম্মুখে যে অপূর্ব্ব আসন বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে ভারতের পদ্ম, কেনেডার মেপেল, গোলাপ, সেমিরক প্রভৃতি যুক্তরাজ্যের সমুদায় সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল বিচিত্রভাবে চিত্রিত ছিল।

রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া।

রাজা ও রাণী বেদীর সম্মুখে আসিয়া প্রথমে নতজানু হইয়া ঈশ্বর স্মরণ করিলেন,—তৎপরে অভি-ষেক ক্রিয়া আরম্ভ হইল। রাজা রাণী ঈশ্বর স্মরণ করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে রাজপুরোহিত উচ্চকণ্ঠে ক্রমান্বয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়া এইরূপ ঘোষণা করিলেন, "আমি এই সাম্রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি আপনারা কি ইহাকে রাজোচিত সেবাভক্তি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছুক আছেন?"

পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান রাজাও উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে ফিরিতে লাগিলেন। সভায় সকলে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ দীর্ঘজীবি হউন বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন।

তৎক্ষণেই জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। অভিষেকের উপকরণ সামগ্রী যথাস্থানে রক্ষিত হইলে, আচার্য্যগণ সমস্বরে প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিলেন। রাজপুরোহিত তৎপরে রাজার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বাইবেল পাঠ করিলেন। রাজা রাণী এবং অন্যান্য সকলেই দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিলেন। তদনন্তর ইয়র্কের ধর্ম্মাচার্য্য উপদেশ পাঠ করিলেন। উপাসনার সময় রাজার মস্তক অনাবৃত ছিল—উপদেশ শ্রবণকালে মস্তকে টুপী পরিধান করিলেন।

উপাসনান্তে রাজা রাজধর্ম্মপালনের জন্য বিধিপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বিধিঅনুসারে ন্যায়সঙ্গতভাবে ন্যায়-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজত্ব করিতে এবং ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মবিধি অনুসারে ধর্ম্মসমাজ শাসন করিতে ও তাহার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। প্রতিজ্ঞার পর রাজা আসনত্যাগ করিয়া অনাবৃত মস্তকে দক্ষিণ হাত বাইবেলের উপর রাখিয়া গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করতঃ "ঈশ্বর আমার প্রতিজ্ঞাপালনে সহায় হউন" বলিয়া বাইবেল চুম্বন করিলেন। তখন রাজারাণী উভয়ে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন ও সঙ্গীত গীত হইল। অতঃপর যথারীতি অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রধানাচার্য্য মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পবিত্র তৈল দ্বারা রাজার মস্তক হস্ত ও বক্ষঃস্থল সিক্ত করিলেন। তৈলাভিষেকের পর রাজা তাঁহার পিতা এডওয়ার্ডের সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহাকে তরবারি অঙ্গুরী

অভিষেকের উপকরণ সামগ্রী।
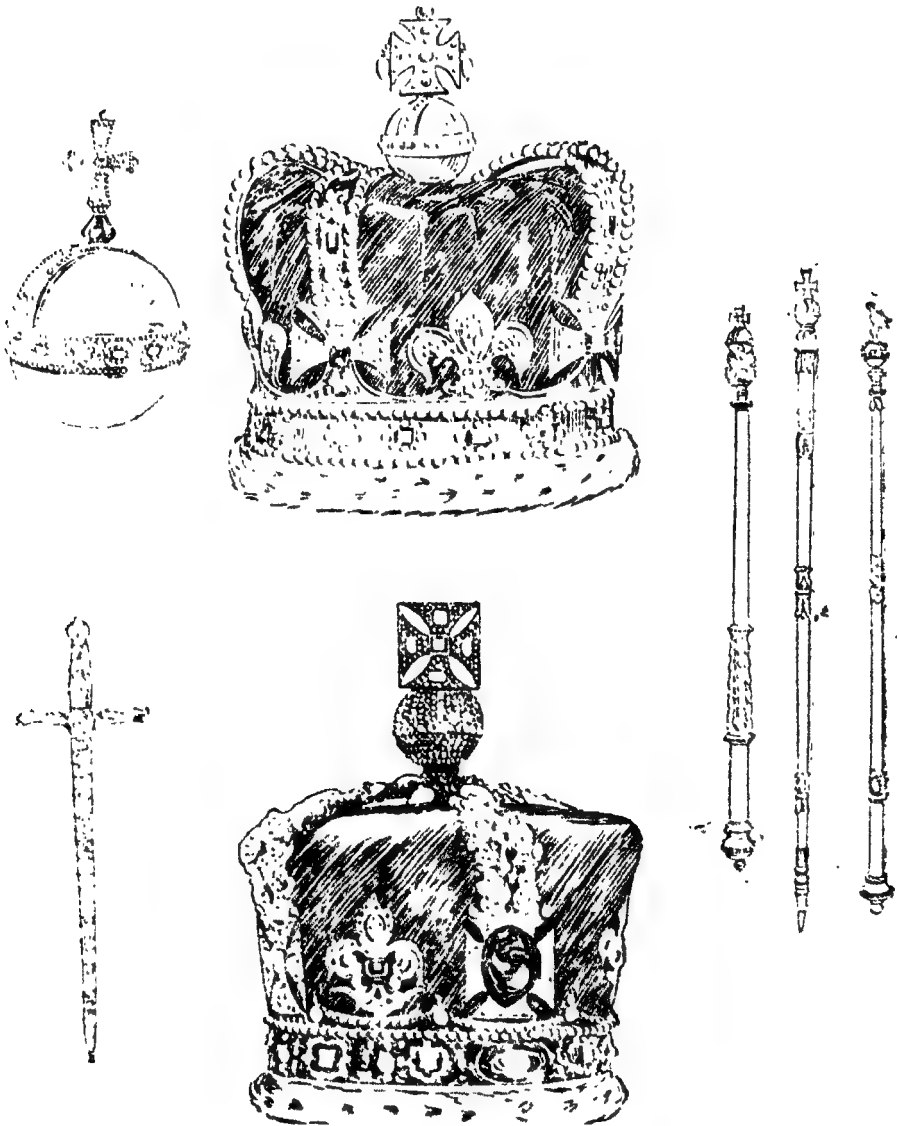
(1) Imperial Orb.

(2) Crown of King Edward.

(3) The King's Sceptres.

(4) The Sword of State.

(5) The Crown of State.

অভিষেকের উপকরণ সামগ্রী।
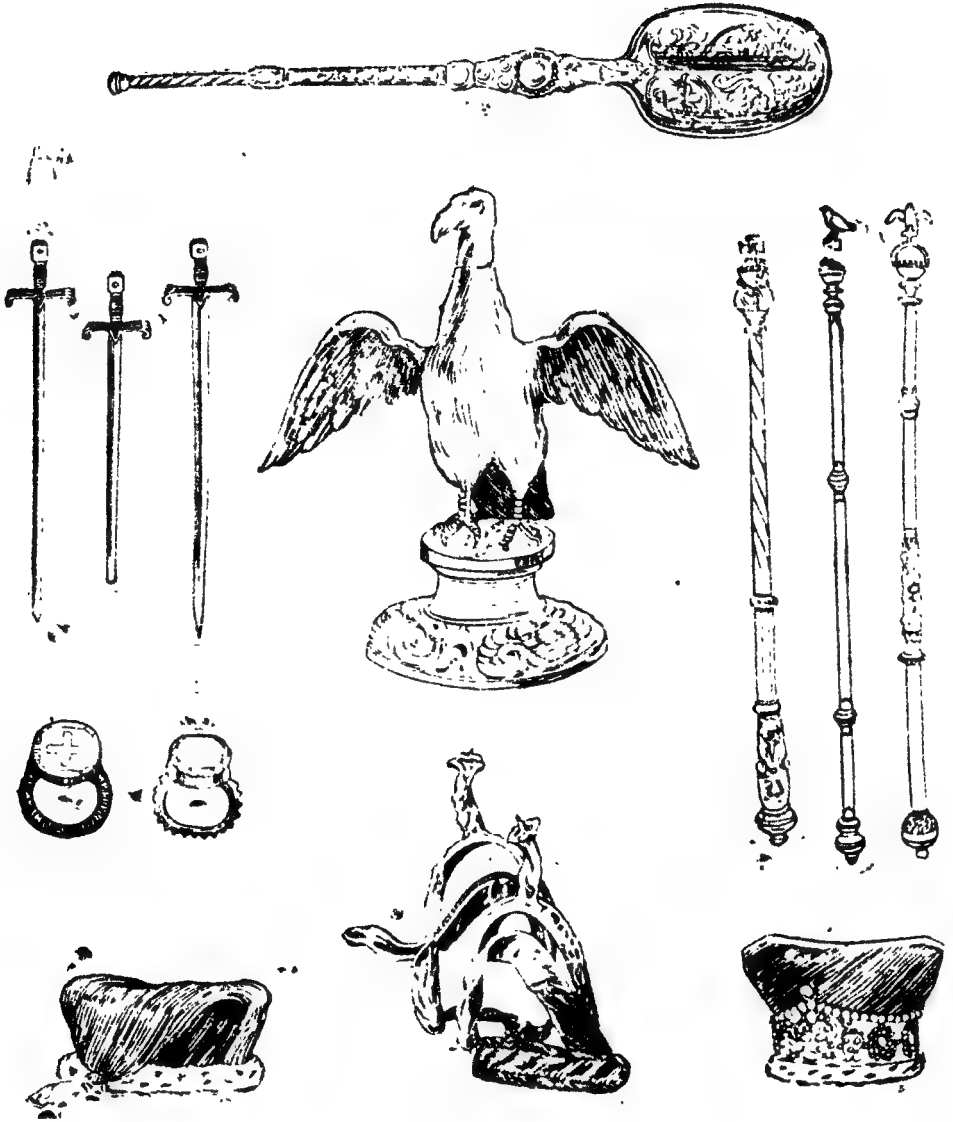
(1) Spoon for anointing.
(2) Swords of Justice, Mercy and Spirituality.
(3) Golden Ampulla.
(4) Queen's Sceptres and Ivory Rod.
(5) King's and Queen's Rings.
(6) King's Cap of Maintenance.
(7) The Golden Spurs.
(8) Queen's Cap of Estate.

রাজদণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন রাজচিহ্ন সকল মন্ত্র সংস্কারে শোধিত হইল। এই প্রকারে রাজার দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড বামহস্তে রাজকীয় গোলক পার্শ্বে তরবারি প্রভৃতি শোভিত হইল—তিনি রাজবেশ পরিধান করিলেন। তখন প্রধানাচার্য্য মুকুটহস্তে রাজ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ধীরগম্ভীরভাবে রাজার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন। রাজা মুকুটভূষিত হইবামাত্র সমবেত মণ্ডলি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুদায় রাজন্যবর্গ স্বীয় স্বীয় মস্তকে মুকুট পরিধান করিলেন। ঘোর রবে জয়ঢক্কা বাজিয়া উঠিল এবং লণ্ডন টাউয়ার হইতে গভীর গর্জ্জনে কামান গর্জিত হইয়া পঞ্চম জর্জ্জের মুকুট পরিধানসংবাদ সমুদায় সহরে ঘোষিত করিল। কামানধ্বনি শুনিয়া সহরময় আনন্দসঙ্গীত হইতে লাগিল—জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল, লোকে টুপী উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। জয়ধ্বনি মন্দীভূত হইলে আচার্য্য রাজাকে বাইবেল উপহার দিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

বশ্যতা স্বীকার।

রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে প্রধানাচার্য্য প্রথমে রাজার নিকট অবনতজানু হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমবেত সমুদায় আচার্য্য উপাচার্য্যগণ স্ব স্ব আসনে অবনতজানু হইয়া বসিলেন। প্রধানাচার্য্য বশ্যতা স্বীকারান্তর রাজার বামগণ্ডে চুম্বন করিলেন।

তৎপরে বালক যুবরাজ মুকুট খুলিয়া রাজার নিকট নতজানু হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের সকলেই মুকুট উন্মোচন করিয়া নতজানু হইয়া যুবরাজের সহিত সমস্বরে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যুবরাজ দণ্ডায়মান হইয়া রাজার মুকুট স্পর্শ করিয়া তাঁহার বামগণ্ডে চুম্বন করিবামাত্র রাজা পুত্রকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিলেন। তৎপরে একে একে ডিউক, মারকুইস ভিস্কাউণ্ট প্রভৃতি রাজবংশীয়গণ আসিয়া রাজার বামগণ্ডে চুম্বন করিলেন। পরিশেষে সকলে সমস্বরে রাজা দীর্ঘজীবি হউন বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্ঞী মেরীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার মস্তকে মুকুট দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড বামহস্তে গজদন্তনির্ম্মিত দণ্ড—রাণী এবম্প্রকারে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাকে অভিবাদন করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই প্রকারে রাজসাজে সজ্জিত হইয়া রাজদণ্ড হস্তে রাজা ও রাণী মন্দির ত্যাগ করিলেন। রাজশকট মুকুটভূষিত রাজারাণীকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজদর্শনমাত্রে দর্শকগণ আকাশ বিদারী স্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষগণ আনন্দে তরবারি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে অভূতপূর্ব্ব সমারোহে রাজারাণীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আমরা তাঁহার ভারতীয় প্রজাগণ সুদূরে থাকিয়াও সেই শুভ দিনে ভারতের গ্রামে সহরে সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তঃকরণে সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছি এবং দিল্লিদরবারে রাজারাণীর অভিষেক পূর্ণসমারোহে সুসম্পন্ন দেখিবার আশায় সমুৎসুক হইয়া আছি।

কেতকী।

অগো নাথ যুক্ত করে ঊর্দ্ধ মুখে আছি প্রতীক্ষায়,
আমারে সার্থক কর, ওগো প্রিয় মৌন মনোহর!
কণ্টকী কেতকী আমি, ফুটেছি কাঁটার বনে হায়,
তবুও করুণা তুমি কর মোরে জীবন সুন্দর!
ফুটেছি কাঁটারবনে, সাপের শাসনে করি বাস,
অজস্র অঙ্কুর মাঝে দিনে দিনে হয়েছি লালিত,
চৌদিকে শ্বসিয়া উঠে ভুজঙ্গের গরল নিশ্বাস,
সদা সশঙ্কিত প্রাণ, গন্ধমান, নেত্র মুকুলিত।

সুচির সন্ধ্যায় যেথা দৃষ্টিহারা ম্লান বনীতলে,
তোমারি যেথানে থাকি গন্ধভরা শুভ্রধূপ ধরি';
মেঘের পরাণ দ্রবে, ঝিঁঝিঁ ডাকে জোনাকী সে জ্বলে,
কুণ্ঠিত এ প্রাণ মোর রসের রভসে ওঠে ভরি'।
সুরভি সুষমা আর কাঁটা লয়ে জন্মেছি জগতে,
পেলব-পরুষ আমি, অবিদিত নহে সে তোমার,
তবুও সার্থক করি' লও ওগো লও কোনো মতে
কণ্টকের কুণ্ঠা সনে সৌরভের গৌরব আমার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মধুমক্ষিকা ও ফলোৎপত্তি।

লণ্ডনের ডেলিমেল পত্রিকার সুলেখক P. W. D. Izzaid মহাশয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুমক্ষিকার মধ্যে এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ঐ ব্যাধির নাম "Isle of Wight" ব্যাধি; কারণ উহা প্রথমে ঐ দ্বীপের মধুচক্রেই আবির্ভূত হয়, পরে সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য মধুমক্ষিকার ধ্বংস সাধন করে। মক্ষিকার সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পরিণাম এই দেখা গেল যে সে বৎসর ভাবং উদ্যানেই ফলোৎপত্তির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে এবং ফলও নিতান্ত ক্ষুদ্র, অপরিপুষ্ট ও নীরস হইয়াছে। প্রবন্ধে ইজার্ড্ সাহেব স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন যে উৎকৃষ্ট ফল পাইতে হইলে মধুমক্ষিকার সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এমন কি তাঁহার গবেষণার পর একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে "No bees no fruit" "মৌমাছি না থাকিলে ফল হয় না"। বর্ত্তমান প্রবন্ধ উক্ত লেখক মহাশয়ের ভাব মাত্র লইয়া লিখিত হইল।

প্রথমতঃ মধুমক্ষিকার বিষয় কিছু স্থূল জ্ঞাতব্য আছে। মধুমক্ষিকা পতঙ্গজাতীয় প্রাণী এবং সকল পতঙ্গের ন্যায় উহারাও তিন প্রকার। (১) পুংমক্ষিকা বা পুরুষ মাছি (Drone); (২) স্ত্রীমক্ষিকা বা রাণী মাছি (Queen Bee) এবং (৩) নপুংসক (Worker Bee)। পুংমক্ষিকার দেহ স্থূল, মস্তক বৃহৎ ও গোলাকার, এবং পক্ষ দুইটিও সমধিক বৃহৎ। উহাদের "হুল" (sting) থাকে না, এবং উড়িবার সময় ডানার শব্দ হয় না। উহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রাণীমাছিকে ডিম্ববতী করা। সুদূর আকাশে উড়িবার কালে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং অনতিবিলম্বে পুংমক্ষিকা মরিয়া যায়। সমস্ত মৌচাকে যতগুলি মাছি থাকে তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ পুরুষ এবং মাত্র একটি রাণী। রাণীমাছির দেহায়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সরু ও লম্বা, মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উহাদের হুল্ থাকে। সকল মক্ষিকাই রাণীকে অত্যন্ত স্নেহ ও সমধিক মান্য করে। বিপদে আপদে রাণীর চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক নপুংসক মক্ষিকা সর্ব্বদা রক্ষক স্বরূপ থাকে এবং তাহার সেবা করে। নপুংসক মক্ষিকা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, কিন্তু অপর দুই জাতীয় মক্ষিকা অপেক্ষা সমধিক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। উহাদের একটা লম্বা শুঁড় (proboscis) থাকে। উহাদের হুলও অত্যন্ত তীব্র। মধুমক্ষিকার হুল্ এক বিচিত্র গঠনে নির্ম্মিত। উহা একটি শক্ত সূক্ষ্ম নালাকার স্থায় ও সূচ্যগ্র এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক থাকে। ঐ শল্ক এরূপ ভাবে অবস্থিত যে যদি কোনও স্থানে হুল্ বিদ্ধ হয়, প্রবেশ সময় উহা কোন বাধা পায় না, কিন্তু বাহির করিবার সময় শল্কগুলি এমন আটকাইয়া যায় যে মাছির নিম্ন উদরের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া হুল্ শুদ্ধ বিদ্ধ স্থানে সংলগ্ন থাকিয়া যায়; মক্ষিকাও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অনুবীক্ষণে দেখা যায় যে হুলের বহিরাবরণ ঐরূপ শল্কাবৃত। একটি ক্ষুদ্র বিষভাণ্ড হইতে ঐ হুলের মধ্যস্থ নল দ্বারা বিষ বেগে ক্ষতস্থানে সিঞ্চিত হয়, আততায়ী মাছির প্রাণনাশ ঘটে। প্রকৃতির নিয়মই এমনি অদ্ভুত। নপুংসক মক্ষিকা

মধুচক্রের সমস্ত কার্য্য করে। রাণী ও পুংমক্ষিকাগুলি কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। রাণী ডিম্ববতী হইলে নপুংসকেরা পুরুষ মাছিদের মারিয়া ফেলে, অনর্থক মধু অপব্যয় করে না। রাণী মাছি প্রত্যহ ২০০০ হইতে ৫০০০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ক্রমান্বয়ে ছয় সপ্তাহ প্রত্যহ এইরূপ ডিম্ব প্রসব করিয়া কিছুকাল নিশ্চেষ্ট থাকে। ৪। ৫ বৎসর রাণীর ডিম্ব হয় পরে বৃদ্ধা হইলে নপুংসকেরা তাহার অশেষ যত্ন ও সেবা করে। ইত্যবসরে অপর একটি রাণীর অভ্যুদয় হয়, এবং এইরূপে বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। নপুংসক মক্ষিকার কর্ম্মদক্ষতা ও সংকর্ম্মতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মধুচক্র প্রস্তুত করণ, মধু ও পরাগ সংগ্রহ করা, মোম প্রস্তুত করা, রাণীমাছির সেবা ও মধুচক্রের রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুপালন, শত্রুর সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত গুরুতর কার্য্য এই ক্ষুদ্র নপুংসক মক্ষিকার উপর ন্যস্ত। উহারা বাস্তবিক নপুংসক নহে। শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া রীতিমত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে উহারা অপুষ্ট (বা কুপুষ্ট) স্ত্রীমক্ষিকা। উহাদের গর্ভকোষ এবং উৎপাদিকা শক্তির সম্যক অভিব্যক্তি হয় নাই এবং অভ্যাসের অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। কদাচিৎ দেখা যায় যে একটা নপুংসক (?) অকর্ম্মণ্য "বাওয়া" ডিম্ব প্রসব করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ উহারা নপুংসক ধর্ম্মী; উহারাই মধুচক্রের শিল্পী এবং কর্ম্মকর।

মধুমক্ষিকার প্রধান কার্য্য পুষ্প হইতে মধু এবং পরাগ আহরণ করা। মধু আহরণকারী মক্ষিকাদের একটি লম্বা শুঁড় থাকে তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; ঐ শুঁড় দ্বারা মধু শোষিত হয় এবং মুখের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া উদরে যায়। মধুমক্ষিকাদের দুইটি উদরগহ্বর থাকে। প্রথম গহ্বরটি একটি স্বচ্ছাবরণ থলিয়ার ন্যায়, কেবল মধু সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহাতে খাদ্য পরিপাক হয় না। প্রত্যেক ফুল হইতে আহৃত হইয়া মধু ঐ থলিয়াতে জমিতে থাকে, এবং যখন উহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন মক্ষিকা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মধুচক্রের প্রকোষ্ঠে উদ্গীর্ণ করিয়া রাখে। ঐ মধু পরে খাদ্য রূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন নিম্ন উদরে গিয়া পরিপাক হয়। পরাগ মক্ষিকাশিশুর খাদ্য। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে পরাগ হইতে মোম প্রস্তুত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরাগ কেবল সদ্য উদ্ভূত মক্ষিকাশাবকদের একমাত্র খাদ্য। নপুংসক মাছিদের নিম্নদেহ হইতে এক প্রকার নাতি তরল চট্‌চটে পদার্থ নির্গত হইয়া জমিয়া মোম হয়। আহারের পর মক্ষিকা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করে হস্তপদ কিছুই নাড়ে না; সেই সময় উহাদের গাত্র হইতে মোম নির্গত হয়। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঐ দেহসম্ভূত অনতিকঠিন রসমক্ষিকাগণ সম্মুখের পদদ্বয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র পিণ্ডাকারে মণ্ডিত করিয়া বাসগৃহের ভিত্তির জন্য ব্যবহার করে। মক্ষিকা মিষ্টরস যত বেশি খাইতে পায়, মোমও তত বেশি উদ্ভূত হয়। এই জন্যই বুঝি মোমকে "মধুত্থ" বলে। শুষ্ক পরাগ খাইয়া মাছির মোম হয় না; আবার একটিও ফুলে বসিতে না দিয়া যদি শর্করা বা গুড় খাওয়ান যায় তাহা হইলে প্রচুর মোম হয়। সুতরাং পরাগ মোমের উপাদান নহে

তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মধু আহরণ কালে মক্ষিকা যে একটি মহৎ উপকার সাধিত করে, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

মধুমক্ষিকার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে এ স্থলে পুষ্প ও পুষ্পের বিশিষ্ট অবয়বের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। সচরাচর পুষ্পের চারিটি অবয়ব থাকে। একটি বৃন্তের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকৃতি স্তবকাকারে সজ্জিত হইয়া একের উপর অপরটি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। ১ম চিত্র ও দ্বিতীয় চিত্রে আদর্শ পুষ্প ও তাহার প্রত্যঙ্গাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া চিত্রিত হইল। সর্ব্বনিম্ন বা বহিঃস্থিত স্তবকে প্রায় হরিৎ বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় বেষ্টন পত্র (১, ১) (calyx and sepals)। তাহার পর বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট কোমল পুষ্পদল বা পাপড়ি (২, ২) (coralla and stamens) পুষ্পদলের অভ্যন্তরে প্রায় বর্ণহীন কোমল সূক্ষ্মসূত্রের ন্যায় পরাগকেশর (৩, ৩)। প্রত্যেক পরাগকেশরের দুইটি বিশিষ্ট অংশ থাকে। প্রথম কেশরদণ্ড, (filament) এবং দ্বিতীয় পরাগকেশর (anther)। ইহার পরবর্ত্তী স্তরে পুষ্পের স্ত্রী স্তবক (pistil) (৪)। এই স্ত্রী-স্তবকের তিনটি অংশ থাকে; সর্ব্ব নিম্ন স্থূল গর্ভকোষ (ovary) তদুপরি গর্ভদণ্ড বা কর্ণিকা (Style) এবং সর্ব্বোপরি কিঞ্জল্কাগ্র (stigma)।

চতুর্থ চিত্র দেখ।

পরাগকোষের মধ্যে পরাগ জন্মে। প্রায়শঃ পরাগ অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার বা
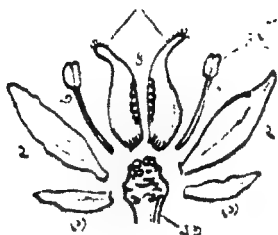
(প্রথম চিত্র)

(১।১) বেষ্টন পত্র (Sepals

(২।২) পাপড়ি (Petals)

(৩।৩) পরাগকেশর; প কো=পরাগকোষ (Anther)

(৪) গর্ভকোষ বা স্ত্রীস্তবক (Pistill); গ=গর্ভকেশর (Style) ও তাহার (Stigma) প্রান্ত।
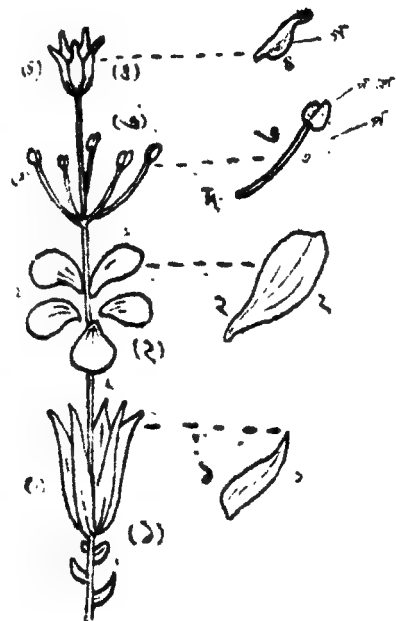
(দ্বিতীয় চিত্র)

ব্যবচ্ছিন্ন আদর্শ-পুষ্প।

প্রথম চিত্রে ব্যাখ্যাত।

১ মধ্যে ২ তন্মধ্যে ৩ ও তন্মধ্যে ৪ এইরূপে সাজান থাকে।

ডিম্বাকৃতি একটি রেণু, ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ। যখন পরাগ সুপক্ব হয়, তখন পরাগকোষ একটি মধ্যরেখা ধরিয়া বিখণ্ড ও উন্মুক্ত হয় এবং পরাগ বাহির হইয়া পড়ে। সেই পরাগ স্ত্রী-স্তবকের উপরিভাগে কিঞ্জল্কাগ্রে পতিত হইলে উহার গাত্রে সংলগ্ন হইয়া যায়; ইহার কারণ ঐ Stigmaর গাত্রে এক প্রকার চটচটে তরল পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহাতেই পরাগ সংশ্লিষ্ট হয় ও ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠে। পরে প্রত্যেক পরাগরেণু হইতে একটি সূক্ষ্ম নালিকা উদ্ভূত হয় ও গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চতুঃপার্শ্বস্থ কোমল পদার্থে ঐ নালিকা পরিপুষ্ট হয় এবং পরিশেষে গর্ভকোষ ভেদ করিয়া বীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। নালিকার অগ্রভাগস্থিত সূক্ষ্মকোষ, বীজস্থ (ovule) ঐরূপ সূক্ষ্মকোষের সহিত মিলিত হইয়া একটি নূতন কোষ সৃজন করে; উহাই প্রকৃত বীজ। ৪র্থ-চিত্রে স্ত্রীস্তবক ও পরাগসঙ্গম চিত্রিত হইল।

সুতরাং বীজ অথবা ফলের উৎপত্তির জন্য কিঞ্জল্কাগ্রে পরাগপাত অপরিহার্য্য। যদি অসময়ে কিঞ্জল্কাগ্র অথবা পরাগাধার ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আচরে ফুলের সকল অংশই শুকাইয়া যায় ফল হয় না। সচরাচর একই পুষ্প মধ্যে পরাগ-কেশর ও স্ত্রী-স্তবক উভয় যন্ত্রই থাকে। স্ব-পরাগ লইয়া ঐ সকল পুষ্প ফলবান হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ফল ও বীজের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে এক পুষ্পের পরাগ অপর পুষ্পের কিঞ্জল্কে লাগান আবশ্যক। অনেক বৃক্ষে পুষ্প বিকশিত হইবার পর দেখা যায় যে কোন কোন পুষ্পের পরাগকোষ সুপক্ব হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার কিঞ্জল্ক তখনও পরাগগ্রহণক্ষম হয় নাই। কিঞ্জল্কাগ্রে তরল পদার্থের উদ্গম হইলেই ঐ ভাগ সমধিক পুষ্ট হয় এবং তখনই পরাগ-গ্রহণক্ষম হয়। আবার কোনও পুষ্প এমনও দেখা যায় যে উহার স্ত্রীস্তবক পরিপক্ব হইয়াছে বটে কিন্তু পরাগকোষ তখনও পাকে নাই, বা তাহার বহু পূর্ব্বে ফাটিয়া পরাগ-বিহীন হইয়া গিয়াছে। এই সব পুষ্পও ফলবান হয় এবং ইহাদেরই ফল সমধিক উৎকর্ষ লাভ করে। ইহার কারণ অপর পুষ্প হইতে পরাগ আসিয়া উহাতে পতিত হয়। এইরূপ পরাগসঙ্গমকে Cross fertilisation বলে। এক পুষ্প হইতে পরাগ নানা উপায়ে অন্য পুষ্পে নীত হইতে পারে।

প্রায় দেখা যায় যে একটী ফুলে ৩।৪।৭ বা ততোধিক পরাগকেশর থাকে। কোন কোন ফুলে অসংখ্য পরাগ কেশর দেখা যায়। প্রত্যেক কেশরের উপর এক একটী পরাগকোষ থাকে এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পরাগ জন্মে। অথচ একটি গর্ভ-কোষের পক্ষে একটি পরাগকণাই যথেষ্ট। এত অধিক পরাগ জন্মিবার উদ্দেশ্য কি? ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষের পুষ্পে এত পরাগ উৎপন্ন হয় যে সময় সময় উহারা বায়ু চালিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত নীত হয় এবং বহুদূরের পুষ্পে লাগিয়া উহাকে ফল-বান করে। তাল, খর্জ্জুর, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষের পক্ষেও ঐরূপ দেখা যায়। ইটালি প্রদেশের উত্তরাংশে একটি তাল বৃক্ষ ছিল উহার প্রচুর পুষ্প হইত কিন্তু তাহাতে স্ত্রীস্তবক

মাত্র ছিল, পরাগ অভাবে উহা ফলশালী হইত না। এইরূপে প্রায় ২।৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফুল হইতে ফল ধরিতে দেখা যায় নাই। হঠাৎ এক বৎসর দেখা গেল যে উহাতে এক গাছ ফল ধরিয়াছে। সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং ইহার কারণ অনুসন্ধানে উদ্ভিদ্‌বেত্তারা বড় ব্যতিব্যস্ত এবং উৎকুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। স্বভাবের বিরুদ্ধে এই কার্য্য তাহাই আপাততঃ দৃষ্ট হইল পরে বহু অনুসন্ধানে জানা গেল যে প্রায় ৫।৬ শত ক্রোশ দূরে ইটালির দক্ষিণে ঐরূপ একটা তালগাছ আছে। তাহাতে কেবল পরাগ-কেশর ছিল কিন্তু স্ত্রী-স্তবক ছিল না। যে বৎসর সেই বৃক্ষ পুষ্পশালী হইল সেই বৎসর সেই সময়েই উত্তরের স্ত্রী-পুষ্পে ফল ধরিল। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ু সহযোগে দক্ষিণের পুং বৃক্ষের পরাগ আসিয়া উত্তরের অত দূরের পুষ্পে লাগিয়াছে, তাই সেই স্ত্রী-পুষ্পে ফল ধরিয়াছে। এ বিষয়ে পরীক্ষাও করা হইল। পর বৎসর ঐ পুংপুষ্পগুলিকে পুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট করা হইল। সে বৎসর উত্তরের সেই স্ত্রী-বৃক্ষে একটিও ফল হয় নাই। পর বৎসরে আবার ফল হইল। সুতরাং পরাগ বায়ুচালিত হইয়া বহু গ্রাম, নদী, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পাঁচ ছয় শত ক্রোশ দূরেও নীত হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

ঘাস, ক্ষেত্রস্থ ছোট ছোট বৃক্ষও এইরূপ বায়ু চালিত পরাগে ফলবান হয়। জলীয় বৃক্ষের পুষ্প জলস্রোতে ভাসমান পরাগ রেণুর দ্বারা ফলবান হয়। কতক বা বায়ু চালিত হইয়াও হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতঙ্গের দ্বারা বিশেষতঃ মধুমক্ষিকা ও প্রজাপতির সাহায্যে এই পরপরাগসঙ্গ (cross fertilisation) ঘটে। মধুমক্ষিকা এইজন্য প্রত্যেক ফলোদ্যানের একটি অপরিহার্য্য সামগ্রী। অতি সুদক্ষ মালী অপেক্ষাও মধুমক্ষিকার কার্য্য বেশী মূল্যবান। ইহাই একটু ভাল করিয়া দেখা যাউক।

কোন কোন পুষ্পের গঠন এরূপ যে স্বপরাগসঙ্গম ঘটিতেই পারে না। পরাগ-কেশর ও কিঞ্জল্কাগ্র এরূপ ভাবে অবস্থিত যে বায়ুহিল্লোলে বা পুষ্পবৃন্তের দোলনে যথাস্থানে পরাগপাত হইতেই পারে না। আবার কোন কোন পুষ্পে কেবল পরাগ-কেশর মাত্র থাকে, কিঞ্জল্ক নাই; কোন কোন পুষ্প কেবল স্ত্রী-জাতীয়। পরাগকেশর তাহাদের নাই, কেবল স্ত্রী-স্তবক মাত্র আছে। এই সকল পুষ্পের বৃক্ষে পতঙ্গ ভিন্ন পরাগ সঙ্গম হওয়া অসম্ভব। প্রকৃতিসুন্দরী এই সকল পুষ্প বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, উহাতে মনোলোভকর সুগন্ধ দান করিয়াছেন এবং উহাদের দল প্রান্তে (ভিতরের দিকে, প্রায় বৃন্ত স্থানে) অতি সুমিষ্ট পতঙ্গপাস্থ মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে, সুগন্ধে এবং মধুর জন্য মক্ষিকাদি ঐ পুষ্পে আকৃষ্ট হয়। পুষ্পদলের নিম্নপ্রান্তে ভিতরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিয়ার ন্যায় কোষ থাকে, তাহাতে উপযুক্ত সময়ে মধু জন্মায়। মধুমক্ষিকা, ঐ মধু আহরণ জন্য পুষ্পে উপবিষ্ট হইলে, পরাগ-কেশর এরূপ ভাবে গঠিত যে ঠিক সেই সময় মক্ষিকার গাত্রে পরাগরেণু লাগিয়া যায়। মধুমক্ষিকা পরাগও সংগ্রহ করিয়া

বেড়ায়; সেই পরাগ উহাদের সম্মুখের পদ দ্বয়ে সংগৃহীত থাকে। তৃতীয় চিত্র দেখিলে ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে। 'ক' চিহ্নিত চিত্রে পরাগকোষ সুপক হইয়াছে, কিঞ্জল্কাগ্র তখনও পুষ্ট হয় নাই। 'খ' চিহ্নিত চিত্র অপর একটি পুষ্প যাহার কিঞ্জল্কাগ্র পুষ্ট হইয়াছে, মক্ষিকা পুষ্পে প্রবেশ করিলেই পৃষ্ঠস্থিত পরাগ ঐ কিঞ্জল্কাগ্রে লাগিয়া যায়।

এইরূপ পরপরাগসঙ্গমের ফলে পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহা সমধিক পরিপুষ্ট, সরস ও প্রচুর বীজশালী হইয়া থাকে। উদ্যানে সেইজন্য ৫।৭টী মধুচক্র অতি যত্নে পালিত হয়। উহাদের মধ্যে যাহাতে কোন ব্যাধি না হয় সে বিষয় উদ্যানস্বামী খুব সতর্ক থাকেন এবং পুষ্পোদ্গম সময় অতীত হইলে শর্করা, গুড় ইত্যাদি নানারূপ খাদ্য যোগাইয়া মক্ষিকার প্রতিপালনে যত্নবান হয়েন।

(তৃতীয় চিত্র)

(ক) মধুমক্ষিকার পুষ্পে প্রবেশ কালে পৃষ্ঠে পরাগ লিপ্ত হয়। কিঞ্জল্কাগ্র অপক।

(খ) ঐ পুষ্পের গর্ভদণ্ড (ন) বর্দ্ধিত হইয়া বাঁকিয়াছে এবং মক্ষিকার পৃষ্ঠস্থ রেণু গর্ভদণ্ডের প্রান্তে লাগিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পরাগকেশর শুখাইয়াছে।

কতকগুলি পুষ্প আছে (যথা অর্কমূল ইত্যাদি) যাহাদের পুষ্পদল লম্বা নলের ন্যায় এবং পরাগকোষ ও স্ত্রী-স্তবক ঐ নলের অভ্যন্তরে অতি নিম্নদেশে থাকে (see Aristolochia &c)। উহাদের পরাগ স্বতঃ পুষ্পের বাহিরে আসিতে পারে না এবং উহাদেরও পুষ্প দুই জাতীয়। কোন পুষ্পে শুদ্ধ পরাগকোষ থাকে, তাহারা পুরুষ পুষ্প; এবং কোন পুষ্পে শুদ্ধ স্ত্রী-স্তবক থাকে; তাহারা স্ত্রী-পুষ্প এবং তাহারাই ফলবান হয়। ইহাদেরও পরাগসঙ্গম না হইলে ফল ও বীজ হয় না এবং প্রচুর মধু থাকায় উহাদের মধুমক্ষিকার দ্বারাই পরাগসঙ্গম ঘটে।

(চতুর্থ চিত্র)

স্ত্রীস্তবক ও পরাগ সঙ্গম
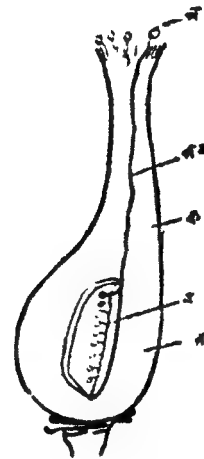
গ — গর্ভকোষ (ovary)
দ — গর্ভদণ্ড বা কর্ণিকা (style)
ক — কিঞ্জল্কাগ্র (stigma)
প — পরাগরেণু
প, ন — পরাগনলিকা
ব — বীজ

আমার টেবিলের উপর মালী এক তোড়া রজনীগন্ধা ও সেই জাতীয় নানারূপ 'লিলি' রাখিয়া দেয়। উহাদের বৃক্ষ প্রায় শিকড় ও গেঁড় হইতে হয়; বীজ পুঁতিয়া বৃক্ষ হইয়াছে দেখা যায় না। কতকগুলি প্রজাপতি আসিয়া ঐ ফুলের মধু লইতে লাগিল এবং দুই তিন দিন পরে দেখিলাম উহাদের পুষ্পের নিম্নে ফল ধরিয়াছে। অনেকগুলি ফল যত্নপূর্ব্বক পালন করিতেছি বীজও পুষ্ট হইতেছে। উহা হইতে বৃক্ষ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আম লিচু, পিয়ারা, কমলালেবু প্রভৃতি ফলের জন্য পরপরাগসঙ্গম নিতান্ত আবশ্যক—বিশেষতঃ লেবুর। উহাদের অনেক ফুল পুরুষ জাতীয় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্ত্রী-স্তবক পুষ্ট হয়। কমলামধু এই সব পুষ্প হইতে আহৃত হয়। মক্ষিকার দ্বারা বাগানে যাহাতে দুই চারিটি মধুচক্র বরাবর থাকে সে বিষয় আমাদের দেশের মালদের অথবা উদ্যানস্বামীদের আদৌ লক্ষ্য নাই। আম বাগান বা অন্যান্য ফলের বাগানে কৃত্রিম উপায়ে মধুমক্ষিকা পালনের উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আমাদের দেশের ফল যে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতেছে তাহা শীঘ্রই নিবারিত হইবে। ইউরোপে আজ কাল প্রত্যেক ফলোদ্যানে মধুমক্ষিকা প্রতিপালিত হয় সেইজন্য তাহাদের দেশে যে ফল হয় তাহারও সমধিক উৎকর্ষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে মক্ষিকা আপান আসিয়া জুটে তাই যাহা কিছু ফল পাই। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মাছি ও মৌচাক বসাইলে বাগানের ফল যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। দিন থাকিতে আমাদের দেশে এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত প্রথা টুকুর প্রবর্ত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ। উদ্যানস্বামীগণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সমালোচনা।

মেঘনাদবধ কাব্য।—৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য তিন টাকা মাত্র। মেঘনাদবধের এই সটীক সংস্করণখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের ভূমিকায় মাইকেলের রচনার বিশেষত্ব, মেঘনাদবধ কাব্যের কবির মৌলিকতা বেশ সরলভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। প্রতি সর্গের মুখবন্ধে সর্গোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাষ, কাব্যাংশের সাধারণ ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজি কাব্যাদির সহিত তুলনায় মেঘনাদবধের নিজস্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদানেও সম্পাদক মহাশয় অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কাব্য—শ্রেষ্ঠ কাব্যের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশকদ্বয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের মুখপত্রে কবিবর মাইকেলের চিত্র ও গ্রন্থমধ্যে বিষয়ানুযায়ী নয়খানি রঙিন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সকল চিত্রের পরিকল্পনার কিন্তু সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জরোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সেখ সাদা শিরাজী

প্রাচীন চিত্র হইতে

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩১৮ [৫ম সংখ্যা।

নব ভারতে নব সামাজিকতা।

প্রতীচ্য জগতের সভ্যতার সহিত সংস্রবে আসিয়া আমাদের মনে অনেক নূতন প্রশ্নের উদয় হইতেছে; তন্মধ্যে একটী প্রধান প্রশ্ন এই, নব ভারতের সামাজিক জীবন কোন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে? ইহা আমরা সকলে অনুভব করিতেছি যে প্রাচীন হিন্দুসমাজের সামাজিক জীবন আবহমানকাল যে ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে আর তাহাকে দণ্ডায়মান রাখিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু কোন্ নূতন ভিত্তির উপরে তাহা দাঁড়াইবে?

কালের গতিতে কতকগুলি ভাব ও কতকগুলি দোষ গুণ সকল সমাজেই ফুটিয়া থাকে। নানাপ্রকার কারণের সমাবেশে এই ফল দৃষ্ট হয়। নানাপ্রকার শক্তি নানা দিক দিয়া জাতীয় চরিত্রের উপরে কার্য্য করে। এমন কি দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও অনেক সময় জাতীয় চরিত্রের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কোনও চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন যে তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয় ও বিপুল প্রসার নদী সকলের মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়াতে প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া ভারতীয় হিন্দুগণ উদ্যমহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং প্রকৃতির উর্ব্বরতা ও জলবায়ুর সাম্যাবস্থা থাকাতে জীবনধারণের প্রয়াসের অল্পতা হইয়া তাহারা ক্রিয়াবিমুখ ও ধ্যান-পরায়ণ হইয়াছে; অপরদিকে ইউরোপীয় জাতিসকলকে অনুর্ব্বর ভূমি ও শীতাতপের বৈষম্যের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের দেহমনের শক্তির বিকাশ এবং উদ্যম ও স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। গ্রীক ও ইটালীয়গণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া আমোদ-পরায়ণ ও সৌন্দর্য্যরসজ্ঞ হইয়াছে, এইরূপ অপরাপর দেশেও জাতীয় চরিত্রের বিকাশের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণ সকল দৃষ্ট হয়। এ কথার মধ্যে যে যুক্তি নাই তাহা বলা যায় না।

তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্রবে আসিয়া জাতি সকলের মনে নব নব ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ইংলণ্ডকে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহার মধ্যে পিক্ট, স্কট, নর্ম্মান, স্যাক্সন, ডেন, ফরাসি প্রভৃতি কত জাতি আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং ইংরাজগণ সকলের দোষগুণ পাইয়াছে। এমন কি আমাদের স্থিতিশীল ও উন্নতি-বিমুখ দেশেও শক, জাট, হূন, মঙ্গোলিয়ান ও দ্রাবিড় প্রভৃতি কত জাতি মিলিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ও নবতত্ত্ববিদ্গণ

এ বিষয়ে যে সকল নূতন কথা দিন দিন আবিষ্কার করিতেছেন তাহা শুনিয়াই আমরা অবাক্ হইয়া যাইতেছি। এই সকল বিভিন্ন জাতির সংস্রব যে জাতীয় জীবনের মূলে অন্তুতরূপে কার্য্য করিয়াছে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? আমরা বর্ত্তমান হিন্দু চরিত্রে যে দোষ গুণ দেখিতেছি, তাহার মূলে কত জাতির সম্মিলন রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে।

জাতীয় জীবন ও জাতীয় সামাজিকতার মূলে এই সকল কারণ যে বিদ্যমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল রীতি নীতি ও সংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং বংশ পরম্পরা-ক্রমে মানবীয় চিত্তকে শাসন করিয়াছে, সে সকলও যে জাতীয় চরিত্র গঠনে প্রধান কারণ-স্বরূপ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনের বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সচরাচর লোকে ভারতীয় হিন্দুগণের সামাজিক জীবনকে স্থিতিশীল ও উন্নতি বিমুখ বলিয়া থাকে। এই স্থিতিশীলতা ও উন্নতি-বিমুখতার কারণ কি? চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনের ভিত্তিমূলে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় ছিল। প্রথম পারত্রিকতা ও অদৃষ্টবাদ দ্বিতীয় শাসনশক্তি বা বাধ্যতা, তৃতীয় জাতিভেদ ও বৈষম্য।

প্রথমে লওয়া যাউক পারত্রিকতা। নিষ্ঠা-বান প্রাচীন হিন্দু মাত্রেরই সংস্কার এই যে ঐহিক জীবন ও ঐহিক জীবনের সম্বন্ধ সকলই মায়ার খেলামাত্র; এই সংসার কারাগার স্বরূপ এবং অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ এখানে আর না আসার নামই মুক্তি। এ জীবনে বাস কেবল কর্ম্মফল ভোগের বিধান মাত্র, এবং এ জীবনের সদনুষ্ঠান কেবল কর্ম্মফল ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় মাত্র। এই পারত্রিকতা বা অদৃষ্টবাদ ভারতীয় ধর্ম্মের অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ভাব ও এই বিশ্বাস এ দেশের মানুষের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছে। এখানকার কবি ও সাধকগণের চিত্তে স্বতঃই এই ভাব ফুটিয়াছে। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ গাইয়াছেন:—

"তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল।"

কলিকাতায় রাজপথের পার্শ্বে একজন বেহারদেশীয় মুচি বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহার একজন বন্ধু আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তির সংসারিক দুঃখের কথা বলিতেছে। মুচি পাদুকাতে সূচ প্রবিষ্ট করিতে করিতে বলিতেছে "আরে ভাই! রামজী যো লিখলবাড়ে সোত হৈবে করে"—অর্থাৎ বিধাতা যা লিখেছেন তাত হবেই।

এই অদৃষ্টবাদ এদেশের মানবের মনে বদ্ধমূল থাকাতে একদিকে অদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অনাসক্তি উৎপন্ন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, একজন পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বে আর একটী পত্নী ঘরে আনিল; প্রথম পত্নী চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিল—"এ হতভাগীর কপালে সতীন ছিল, তা না হলে কি এমন হয়।"—পাড়ার মেয়েরা বলিল—"তা বৈ কি কপালে সতীন ছিল, তাইত সতীন এল।"—তারপর প্রথমা স্ত্রী মুখ বুজিয়া এক কোণে গেল, অবাধে দুঃখ সহিতে লাগিল। পুত্রশোকে জননী কাতরা, ক্রমে

বিশ্বাস আসিল, তাঁর কপালে ছিল ছেলেটী পলাবে, তখন তিনি হৃদয় বাঁধিলেন ও ধৈর্য্য ধরিলেন। এইরূপে অদৃষ্টবাদ দুঃখশোক বহনে সামর্থ্য দিয়াছে; এবং মানুষকে আসক্তির উপরে তুলিয়াছে; কিন্তু অপর দিকে এদেশের মানুষের মনে নৈরাশ্য উৎপন্ন করিয়া উদ্যমশীলতা, স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি নষ্ট করিয়াছে এবং সামাজিক দুঃখদুর্গতি ও দুর্নীতির প্রতি ঔদাসীন্যবুদ্ধি জন্মাইয়াছে। এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া যেরূপ সামাজিক ব্যাধি সহিয়া আসিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

এ জীবন ও জনসমাজ মানবের কর্ম্মফল ভোগের স্থানমাত্র এবং পারত্রিক সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনাসক্ত চিত্তে এখানে বাস করাই বুদ্ধিমানের কাজ, প্রজাসাধারণের মনে এই সংস্কার প্রবল থাকাতে এদেশের মানুষ সামাজিক জীবনের প্রতি তত মনোযোগ করে নাই। অবশ্য সামাজিক জীবনকেও ধর্ম্মের অনুগত রাখিবার জন্য প্রচুর উপদেশ আছে। বলিতে কি সমুদয় রামায়ণ গ্রন্থখানি মানুষের সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত করিবার উপদেশ মাত্র। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার পাতিব্রত্য, হনুমানের প্রভুভক্তি, যে বিষয়েই চিন্তা করা যাকনা কেন, সকল উপদেশেরই লক্ষ্য মানবের সামাজিক জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করা। এতদ্ব্যতীত স্মৃতি ও পুরাণে সামাজিক জীবনে ধর্ম্ম সাধনের অসংখ্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ সকল উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে মানবকে ব্যক্তিগত ভাবে উন্নত ও পবিত্র করিয়া পারত্রিক সম্পত্তির উপযুক্ত করা, এবং কর্ম্মফল ভোগ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া।

এই ত গেল কৌলিক ও লৌকিক ধর্ম্মের উপদেশ। জ্ঞানপথাবলম্বিগণ এই ব্যক্তিগত সাধনকে আরও অধিক মাত্রাতে ফুটাইয়াছেন। সমাজ ও সামাজিক জীবন যে মায়ার খেলা এ উপদেশ তাঁহারা আরও দৃঢ়তার সহিত দিয়াছেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

> কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
> সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

অর্থাৎ তোমার আবার স্ত্রী কে, তোমার আবার পুত্র কে, এ সংসারটা এক বিচিত্র খেলা, তা বুঝিলে না।

ধর্ম্মের এই পারত্রিকতা ও অদৃষ্টবাদ এদেশীয় জনগণের চিত্তে সন্নিবিষ্ট থাকাতে একদিকে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে অনাসক্ত ও ঐহিক সুখবিমুখ করিয়া ধর্ম্মের সাধনে মনকে নিযুক্ত রাখিয়াছে বটে, কিন্তু অপরদিকে সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে নিরাশ ও উদাসীন করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা দিন দিন অনুভব করিতেছি, এ জগতে মানুষ কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলে না। ব্যক্তিগতভাবে যেমন নিজ নিজ উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, তেমনি সম্মিলিতভাবে সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। মনে কর তুমি একজন জ্ঞানানুরাগী মানুষ, তুমি রাত্রি দিন পাঠে রত আছ, তুমি নানা ভাষাতে অভিজ্ঞ, দার্শনিকদিগের দর্শনতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকদিগের নব নব আবিষ্কার সকলি তোমার বিদিত; ইহা তোমার নিজের

পক্ষে অতীব স্পৃহণীয় অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পথ যে অপরেরও অবলম্বনীয়, তাহাও নিঃসংশয়; কিন্তু সমগ্রভাবে জনসমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, এবং এই জ্ঞানস্পৃহা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিতে হইলে, অপরের সহিত মিলিত হইয়া সামাজিক ভাবে নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। মনে কর তোমরা দশ জনে মিলিয়া একটি সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয় স্থাপন করিলে, সর্ব্বসাধারণের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করিলে, সেখানে জ্ঞানী পুরুষদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত করিলে, তাহার ফল এই হইল যে, যে জ্ঞানালোক তোমার ব্যক্তিগত অন্তরে আবদ্ধ ছিল, তাহা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; যে জ্ঞান-স্পৃহা তোমার চিত্তে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল তাহা সাংক্রামিক তাপশক্তির ন্যায় হয়ত শত শত চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল।

অতএব বর্ত্তমান সময়ে মানবের মনে এই একটা ভাব দাঁড়াইতেছে যে, ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির জন্য যেমন ব্যক্তিগত উপায় অবলম্বন আবশ্যক, তেমনি সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্য সামাজিক উপায়ও অবলম্বনীয়; কিন্তু আমাদের প্রাচীন শিক্ষা এই সামাজিক চেষ্টার অনুকূল নহে; তাহাতে ব্যক্তিগত সাধনকে ফুটাইয়াছে, অনাসক্তি ও বৈরাগ্যকে উৎপন্ন করিয়াছে, পারত্রিক কল্যাণের সহিত তুলনায় ঐহিক সুখকে তুচ্ছ করিয়াছে, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকে প্রিয় জ্ঞান করিয়াছে; কিন্তু মানবের সামাজিক জীবন ও সামাজিক উন্নতির প্রতি অন্ধ থাকিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইজন্যই এদেশের সমাজ গতিশীল না হইয়া স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে। সামাজিক উদ্যম ও চেষ্টার অভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব কতিপয় সাধকের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে; এবং সাধারণ জনমণ্ডলী অজ্ঞতার মধ্যে বাস করিতেছে। যেটা গারদখানা সেটার উন্নতিতে আবার কাহার মন থাকে! যার হাত পা কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, মুখ বুজিয়া সহ্য করাই যার একমাত্র পথ, সে আবার কোন্ সামাজিক উন্নতির প্রয়াস পাইবে! এরূপ প্রাণিপুঞ্জের সমাজ স্থিতিশীল হওয়া অনিবার্য্য।

ধর্ম্মের পারত্রিকতার পরে উল্লেখযোগ্য বিষয় শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা অর্থাৎ একদিকে শাসন শক্তি অপরদিকে বাধ্যতা। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা স্পষ্ট বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, মানবসমাজকে রাখিতে হইলে ইহার অঙ্গীভূত ব্যক্তিদিগকে চিন্তা ও কার্য্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে চলিবে না। যেমন গৃহ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক শিশু যদি স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় মত চলে; এবং স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলে গৃহে শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম থাকে না; এই কারণে যেমন শিশুদিগকে পিতামাতার আজ্ঞাধীন রাখিতে হয়, তেমনি জনসমাজেও মানুষের কর্ত্তৃত্বের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এইজন্যই তাঁহারা আদেশ করিয়াছিলেন যে, গৃহ-পরিবারকে পিতার অধীন, নারীকে পুরুষের অধীন, প্রজাসাধারণকে গুরু পুরোহিতের অধীন, রাজ্যকে রাজার অধীন রাখিতেই হইবে। এই শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা

আমাদের হিন্দু সমাজের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মধ্যে একান্নভুক্তপরিবারপ্রথা প্রচলিত থাকাতে এই শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা নবীনকে অনেক স্থলে প্রাচীনের শক্তির অধীন রাখিতেছে, এবং অনিবার্য্যরূপে সামাজিক উন্নতির গতিকে মন্দীভূত করিতেছে; ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। সামাজিক শাসন সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিসকলের মধ্যে এক একটী দম্পতির এক একটী সংসার এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তাহারা অনেক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে পায়; দুই জনে এক মত হইলেই অনেক সময়ে আপনাদের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেরূপ স্বাধীনভাব সম্ভব নহে। আমাদের দেশে মানুষের মনে কোনও নূতন ভাব আসিলেই সে দেখিতে পায় যে, সে অপর দশজনের সঙ্গে দৃঢ়সূত্রে বদ্ধ আছে, পিতা মাতার আজ্ঞাধীন আছে; সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যদিও বা সে সাহস করিয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে গুরুজনের অবাধ্যতা অপরাধে অপরাধী হইয়া তাহাকে সমাজের নিন্দা, কুৎসা ও অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। ইহার অনিবার্য্য ফল এই হয় যে, অধিকাংশ লোকই নূতন আলোককে আবৃত করিয়া প্রাচীনের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। এরূপ সমাজের পক্ষে স্থিতিশীল ও উন্নতিবিমুখ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেবল তাহা নহে; এই যে ব্যক্তিগত শক্তির উপরে সামাজিক শক্তির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রভাব, ইহার মধ্যে যে জাতি বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের জাতীয় চরিত্র হইতে উদ্যম, স্ফূর্ত্তি, স্বাবলম্বন, নবস্পৃহা, নবাকাঙ্ক্ষা সমুদয় অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং ক্রমে তাহারা গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ গতানুগতিকের অনুসরণ করিতে থাকে।

এইত গেল শাসন-শক্তি ও বাধ্যতার উপরে সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ফল। তৎপরে জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্যের ফলও তদনুরূপ। এদেশে জাতিভেদ প্রথা কিরূপে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ক্রম নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। তবে অনার্য্যদিগের মধ্যে আর্য্যদিগের আবির্ভাব ও জেতাবিজিতের সম্বন্ধ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে; ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক এ প্রথা যে অতি প্রাচীন তাহা নিম্নলিখিত বেদ মন্ত্র হইতেই জানা যায়। বেদের পুরুষ সূক্তে আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ,
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত।

ইহার অর্থ—পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

জাতিভেদ না রাখিয়া যে সমাজের স্থিতি রক্ষা পাইতে পারে তাহা এদেশের লোকের ধারণাতেই আসে নাই; এবং বর্ণ-সঙ্কর অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর বিষয় এদেশের পক্ষে আর কিছুই নাই। গীতাকার বলিতেছেন;—

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—"হে কৃষ্ণ অধর্ম্ম যখন প্রবল হয় তখন কুলস্ত্রীদিগের চরিত্র ভ্রষ্ট হয়; স্ত্রীলোক ভ্রষ্ট-চরিত্র হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়; বর্ণসঙ্কর কুলঘ্ন ব্যক্তিদিগেরও কুলস্থ ব্যক্তিদিগের নরকের কারণ হয়; যে কুলে বর্ণসঙ্কর হয় তাহার পিতৃগণ লুপ্ত-পিণ্ডোদক হইয়া পতিত হন; কুলঘ্ন ব্যক্তি-দিগের বর্ণ-সঙ্কর-কারক দোষে জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হয়; হে জনার্দ্দন যে মনুষ্যদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদের নিশ্চিত নরকে বাস হয়। এই কথা শুনিয়া আসিতেছি।"

গীতাকার বর্ণসঙ্করকে যেরূপ ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই ভয় এদেশের প্রজাসাধা-রণের মনে চির দিন কার্য্য করিতেছে; এই জাতিভেদ প্রথার উপরেই হিন্দু সমাজ দণ্ডায়মান। কিন্তু এই জাতিভেদ প্রথা হইতে অনিবার্য্যরূপে দুইটি ফল ফলিয়াছে। প্রথমতঃ—জাতিভেদের কঠিন নিয়ম সকল আচার ব্যবহারগত পার্থক্য উৎপন্ন করিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়, তন্মধ্যে সম্প্রদায়, এইরূপে কাশীর কৌটার মত বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। এক এক মুষ্টি মানুষ লইয়া এক একটী দল বা জাতি হইয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভারতীয় হিন্দুসমাজ এইরূপে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়াতে কোনও প্রকার সামাজিক উন্নতির জন্য সকলকে একত্র করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন দেখিতে পাইতেছি, সকল শ্রেণীর মানুষের মনে উন্নতি-স্পৃহা জাগিয়াছে বটে, কিন্তু এই জাতিগত পার্থক্য ঘুচাইয়া সকলে এক হৃদয়ে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে না। সেই উন্নতি স্পৃহার ফল এই দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থ-সভা, সুবর্ণ-বণিক সমিতি, বৈশ্য-সভা, বৈদ্যসমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া, পুরাতন সম্প্রদায়গত পার্থক্য সকলকে দৃঢ়ীভূত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে; এবং জাতীয় উন্নতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লওয়া হইতেছে। সুতরাং সমুদয় বিভাগের লোক সামাজিক ভাবে মিলিত হইয়া সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করা, এখনও কঠিন রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ – এই জাতিভেদ প্রথার আর এক ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ব্যক্তিগত মানুষকে অতিরিক্ত মাত্রায় জাতীয় শাসনের অধীন করিয়া প্রত্যেকের পক্ষে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়া কঠিন করিয়াছে। মানুষ যে কোনও নবভাব প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে তাহার যো নাই, জাতিনাশের ভয়েই অস্থির। বংশপরম্পরা ক্রমে এই ভয়ের মধ্যে বাস করিয়া করিয়া এ দেশের মানুষ ব্যক্তিত্বহীন ও স্বাবলম্বনশক্তি-হীন হইয়া গিয়াছে। কাজেই সমাজ স্থিতিশীল ও উন্নতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের সমাজ প্রাচীন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক প্রকার চলিতেছিল, ইতিমধ্যে প্রতীচ্য জগত হইতে আর এক শক্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে, এবং সামাজিক জীবনকে অধিকার করিতে চাহিতেছে।

এ শক্তির প্রকৃতি ও লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাচীন শক্তির লক্ষণ বলিয়াছি (১) পারত্রিকতা ও অদৃষ্টবাদ, (২) শাসন-শক্তি ও বাধ্যতা, (৩) জাতিভেদ ও বৈষম্য; এ শক্তির লক্ষণ, (১) ঐহিকতা, (২) স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি, (৩) সাম্য, একেবারে বিপরীত।

ঐহিকতার অর্থ এই—আমাদের পারত্রিক শাস্ত্রে বলে, ঐহিক সুখকে মোহ বলিয়া জান, পারত্রিক সম্পত্তিকেই লক্ষ্য স্থলে রাখ, কিন্তু পশ্চাত্য জগত হইতে যে ভাব আসিতেছে তাহাতে বলিতেছে, মানবের ঐহিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি,—পারত্রিক সম্পত্তির জন্য ঐহিক সুখকে তুচ্ছ করা নির্ব্বোধের কাজ, এ জগতের সুখ সম্পদ যত পার ভোগ কর। বলিতে কি পাশ্চাত্য জগতে মানুষের ভোগতৃষ্ণা যেন অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় মনে হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ কাম্য বস্তু পাইয়া কামনার কখনই নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহারা কামনাকে আরও বর্দ্ধিত করে।—পাশ্চাত্য রাজ্যে যেন তাহাই দেখিতেছি, ভোগের অন্ত নাই, কামনারও অন্ত নাই।

মানবের বুদ্ধিতে যত দূর আসে, মানবের অর্থসামর্থ্যে যত দূর কুলায়, ভোগের নানা পথ আবিষ্কৃত হইতেছে, অথচ আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের অন্ত নাই। বলিতে কি সে দেশের লোকের ঐহিক সুখের প্রতি এত দৃষ্টি যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিকেও তাহারা ঐহিক সুখের দ্বারা বিচার করিয়া থাকে। কোনও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কোনও নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে, শুনিলেই সর্ব্বাগ্রেই যেন তাহাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, এতদ্দ্বারা কোনও ঐহিক সুখ বা সুবিধা বৃদ্ধি করিবে কি না। যদি জানিতে পারে তদ্দ্বারা কোনও ঐহিক সুখের বৃদ্ধির আশা নাই, তখন তাহারা সেই মহাতত্ত্বের প্রতি উদাসীন হইয়া তাহাকে কতিপয় জ্ঞানীর আলোচনার জন্য রাখিয়া দেয়। এডিসন তাহাদের নিকট একজন প্রধান বিজ্ঞানবিৎ কারণ তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বসকল মানবের ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির মাত্রা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছে। অধিক কি যেন মনে হয়, যীশুর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ এই ঐহিক সুখ-লালসাকে সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিতেছে না।

কিন্তু এই ঐহিকতার আর একটা দিক্ আছে যাহা সামাজিক উন্নতির সহায় হইতেছে। গড়ের উপর তাহাদের মনের ভাব এই, যাহা হইবার এই জগতেই হইতে হইবে, যাহা করিবার এই জগতেই করিতে হইবে। মানুষের উন্নতি সংগ্রামসাপেক্ষ, বিশেষতঃ মানবের সামাজিক উন্নতি সংগ্রাম-সাপেক্ষ; একা একা সংগ্রাম করিয়া না পার, দশজনে মিলিয়া সংগ্রাম কর; দশ জনের উন্নতি হইলে প্রত্যেকের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই সংস্কার হৃদয়ে প্রবল থাকাতে, সে দেশের মানুষের অদ্ভুত সামাজিক সমবায় শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, তাহারা দেখিল যে কলকারখানায় মালিকদিগের [illegible] হইতে দরিদ্র শ্রমজীবিদিগকে বাঁচান চাই অমনি চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার লোক এক জোট হইয়া এক ধুয়া ধরিল, এক

সংগ্রামে ডুবিল! এইরূপে তাহাদের অদ্ভুত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির সহিত অদ্ভুত একতা-প্রবৃত্তির সমাবেশ দেখা যাইতেছে। ঐহিক সুখকে ক্ষুদ্র ও হেয় ভাবিলে তাহারা এইরূপ করিতে পারিত না। এই ঐহিকতার ভাব হৃদয়ে থাকাতেই সেসকল দেশের হাজার হাজার নরনারী মানব-সমাজের দুঃখদুর্গতি দূর করিবার জন্য দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা দুঃখীর দুঃখহরণ, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দান, রোগীদের শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত সাধনে মগ্ন থাকাকে স্বার্থপরতা জ্ঞান করিয়া সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অদৃষ্টবাদ তাহাদের মনে নাই। মানুষকে আপনার উন্নতি আপনি করিয়া লইতে হইবে হৃদয়ে এই সংস্কার বদ্ধমূল থাকাতে উদ্যম, সাহস, স্বাবলম্বন প্রভৃতি মানব চরিত্রে ফুটিয়া পুরুষকারের সৃষ্টি করিতেছে; এবং সেই পুরুষকার সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির সহায় হইতেছে।

তৎপরে নবাগত শক্তির আর একটী লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি। প্রতীচ্য জগতে এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তি দিন দিন এত বাড়িয়েছে যে, চিন্তাশীল মানবহিতৈষী ব্যক্তিগণ দেখিয়া ভয় পাইতেছেন; এবং অনেকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তির অতিরিক্ত বিকাশের প্রতি-বিধানস্বরূপ socialism বা সামাজিক সাম্যবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির বিকাশের অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ—বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বড় বড় সহরের সৃষ্টি হইয়া, হাজার হাজার নরনারী তার মধ্যে বাস করিতেছে। বড় বড় সহরে কেবা কার খবর লয়, কেবা কাহাকে দেখে! সুতরাং তাহারা সেখানে যথেচ্ছরূপে বাস করিতে পাইতেছে, অসঙ্কোচে স্বেচ্ছামত চলিতে পারিতেছে। গ্রামে ও জনপদে যে সামাজিক শাসনের মধ্যে মানুষকে বাস করিতে হয়, তাহারা তাহার বাহিরে থাকিতেছে, সুতরাং স্বেচ্ছাচারিতা তাহাদের প্রকৃতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ,—বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকাতে সামাজিক বন্ধন ও শাসনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে না, সুতরাং স্বীয় প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুসারে চলিবার সুযোগ পাইতেছে; তদ্দ্বারাও তাহাদের স্বাধীনতাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র সকল বহুল প্রচার হইয়া প্রতিদিন দেশবিদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামবার্ত্তা সকলের গোচর করিতেছে, তাহাতেও লোকের স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তিকে অদ্ভুতরূপে বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির বিকাশের ফলস্বরূপ ধনী দরিদ্রে, রাজা প্রজাতে বিবাদ বাধিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রমজীবিগণ আর অবজ্ঞার স্থলে থাকিতে চাহিতেছে না, তাহারা ইতিমধ্যে পার্লেমেণ্ট মহাসভাতে চল্লিশ জনের অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও দীন দরিদ্র শ্রমজীবিদিগের অভ্যুত্থান দৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু ইহাও বোধ হয় স্বীকার্য্য যে এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি অসংযত হওয়াতে অনেক স্থলে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিতেছে এবং মানুষকে

ধর্ম্মভাববিহীন করিয়া ভোগলালসাতে মগ্ন করিতেছে।

স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির পথেই সাম্য। সাম্যকে স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত বলিলেও হয়। স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া সে দেশের মানুষ আর চিরাগত সামাজিক বৈষম্যসকল সহ্য করিতে পারিতেছে না। সে সকল দেশে আমাদের দেশের ন্যায় জাতিভেদ নাই, কিন্তু সেখানেও ধনী দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান। কিন্তু সে বিষয়ে এক মহা বিপর্য্যয় এই ঘটিতেছে যে, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমের নানা দ্বার উন্মুক্ত হওয়াতে আজ যে দরিদ্র কাল সে ধনী হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং আজ যে অবজ্ঞার তলে বাস করিতেছে কাল সে সম্মানের পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং সাম্যের ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সকল শ্রেণীর মধ্যেই জ্ঞান বিস্তার হইয়া, সকল শ্রেণীতেই জ্ঞানী গুণী মানুষ-সকল দেখা দিতেছে। ইহাও সাম্যভাবের বৃদ্ধির অপর কারণ।

এখন আমাদের পক্ষে এই মহাপ্রশ্ন আসিয়াছে, কোন্ পথ আমাদের অবলম্বনীয়? আমরা কি প্রাচীন ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া, পারত্রিকতা, অদৃষ্টবাদ, শাসনশক্তি ও বাধ্যতা, জাতিভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখিব, না ঐহিকতা, স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি ও সাম্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রতীচ্য সভ্যতাতে ঢালিয়া দিব?

এ প্রশ্নের উত্তর এই, নব ভারতে নব সামাজিকতার প্রয়োজন অর্থাৎ যে সামাজিকতাতে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে মিলিত করিবে, যাহাতে ঐহিকতার সহিত পারমার্থিকতাকে, স্বাধীনতার সহিত সাধু-ভক্তিকে, সাম্যের সহিত একতাকে ব্যক্তিগত সাধনের সহিত সামাজিকতাকে সন্নিবিষ্ট করিবে, সেই সামাজিকতার প্রয়োজন। নব ভারতে নর নারী সমানভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিবে, অথচ স্বৈরাচারে নিমগ্ন হইবে না; পদদলিত জাতি সকল উত্থিত হইবে, অথচ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না; মানব ব্যক্তিগতভাবে আত্মোন্নতি সাধন করিবে অথচ সামাজিক উন্নতির জন্য সম্মিলিত হইবে।

ইহা কি সম্ভব? নিশ্চয় সম্ভব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রকৃত ভক্তিধর্ম্ম যদি ভারতের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব সম্মিলন সম্ভব বোধ হয়। ভারতের সামাজিক জীবনের বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই অনুভব করা যায় যে, ধর্ম্ম-ভাবই চিরদিন এদেশের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিতে রহিয়াছে। মানুষ বিষয়ের মধ্যে থাকিবে অথচ বিষয়ে আসক্ত হইবে না, ইহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন আর কিসে সাধিত হইতে পারে? প্রাচীনেরা পারত্রিকতাকে প্রবল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, যে ঐহিক যাহা দেখিতেছ, তাহা অনিত্য, অস্থায়ী ও কারাগার বিশেষ, মনকে ইহার বাহিরে ও ইহার উপরে রাখি, পারত্রিক কল্যাণ কিসে হয় সেই চিন্তা কর। সেই ধর্ম্মভাব এদেশের মানুষের চিত্তের অস্থিমজ্জাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সকল উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই নবসামাজিকতার অন্তস্তলে অনাসক্তির ভাবকে কিরূপে রক্ষা করা যায়? যদি তাহা করিতে না পার, মানুষ বিষয়-

শক্তিতে নিমগ্ন হইবে; এবং তদনুষঙ্গিক বিবিধ পাপে লিপ্ত হইবে।

নব সামাজিক জীবনের মূলে আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, মানুষকে নব ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করা। নব ভক্তিধর্ম্ম শব্দ এইজন্য ব্যবহার করিতেছি, যে আমাদের দেশে একপ্রকার পুরাতন ভক্তিধর্ম্ম আছে, যাহা ভাবুকতার নামান্তর মাত্র, এবং যাহা মানবের পাপপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে শাসনাধীন রাখিতে পারে নাই। নবভক্তিধর্ম্ম তাহাকেই বলিতেছি যাহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পুরুষে প্রীতিস্থাপন করাইয়া মানব প্রকৃতিকে অধ্যাত্মযোগে তাঁহার সহিত যুক্ত করে। অধ্যাত্মযোগের অর্থ তাঁহার স্বরূপে মানবাত্মার বিলয়। মোটামুটি বলিতে গেলে, তাঁর স্বরূপের তিন লক্ষণ আছে,—জ্ঞান, প্রীতি ও পবিত্রতা বা ধর্ম্মভাব। তিনি মানবাত্মাকে এই তিন স্বরূপ দিয়া আপনার সহিত যুক্ত রাখিয়াছেন। চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে মানুষ এই তিন স্বরূপে জগতের দিকে সীমাবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহার দিকে অসীম রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান যখন প্রসারিত হয়, তখন তার একটা সীমা রেখা আসে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে সে সীমা চরম সীমা? মানবাত্মা তাহা স্বীকার করে না। মানুষ জ্ঞানে সীমাবদ্ধ কিন্তু তাহার জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানের গতি অসীম। তবেই আমরা অনন্তের দিকে উন্মুক্ত বলিয়াছি। যে পরিমাণে আমরা জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গলভাব, ও ধর্ম্মবুদ্ধির অনন্তোন্মুখ প্রসারকে প্রাপ্ত হই, সেই পরিমাণে আমরা সেই পরমপুরুষের সহিত অধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হই। উপনিষদ এই অধ্যাত্মযোগ স্থাপনের বিষয়ে বার বার উপদেশ দিয়াছেন। এই অধ্যাত্মযোগ প্রকৃত ভক্তিধর্ম্মেই স্থাপিত হইতে পারে।

সেই পরমপুরুষে বিশুদ্ধ ও ঐকান্তিক প্রীতি স্থাপন করিয়া মানুষ এই অধ্যাত্মযোগে যখন আরোহণ করে, তখন তাহার চিত্ত বিষয় মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ের অতীত হইয়া যায়; মন সেই মহা সত্তায় ও মহাপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া ক্ষুদ্র প্রেমকে অতিক্রম করে সুতরাং অনাসক্তি স্বতঃই আসে ইহা মানুষের পাপ প্রকৃতিকে দমন করে; এবং যাহা অসৎ তাহাকে বর্জ্জন ও যাহা সৎ তাহাকে গ্রহণ করে।

এই ঈশ্বর-প্রীতিজনিত আধ্যাত্মিকতা সামাজিক জীবনে প্রবিষ্ট হইলে সে জীবনকে সুস্থ, সুখী, ও উন্নত করে, তখন মানুষ অনুভব করিতে থাকে মানব-সেবাই ঈশ্বরের সেবা, সুতরাং তখন জনসমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আপনার দেহ মন নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব ইহাতে ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতা মিলিত হয়।

কেবল তাহা নহে নব ভক্তিধর্ম্মে স্বাধীনতা ও সাধুভক্তি-উভয়কে মিলিত করিবে। অধ্যাত্মযোগের বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে তাহার প্রকৃতিই স্বাধীনতা। মৎস্য যেমন জলে বিহার করে, পক্ষী যেমন আকাশে বিহার করে, তখন তেমনি আত্মা যখন পরমাত্মাতে বিহার করে তাহার নাম অধ্যাত্মযোগ। যেখানে প্রীতি সেইখানেই স্বাধীনতা, সেইখানেই আত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা। অথচ এই ভক্তির সহিত

সাধুভক্তি জড়িত; কারণ প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা যে পায়, অপরে আধ্যাত্মিকতা দেখিবার চক্ষু সে পায়। যে হৃদয় প্রকৃত ভক্তিতে উন্নত, তাহা বিনয়ে সর্ব্বদাই নত। সুতরাং নব ভক্তি-ধর্ম্মের উন্মেষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তিজনিত উৎকট অশান্তির ভয় নাই।

ভারতে নব সামাজিকতার আবির্ভাব অনিবার্য্য বোধ হইতেছে। কি প্রকারে তাহাকে নব আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত করা যায় ইহাই এখন আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাগানবাড়ীর কথা।

নিস্তব্ধ বাগানবাড়ীর উপর দিয়া নিশাচর পাখী বিকট-স্বরে চীৎকার করিয়া গেল, তাহার সে চীৎকার শূন্যগৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ বৃক্ষ এবং লতাসমষ্টি সে চীৎকার শব্দে শিহরিয়া উঠিল। চাঁপা গাছ অন্য বৃক্ষগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই এর মানে তোমরা বলতে পার কি? কেন প্রত্যহ এমন সময়ে একটা পাখী সুদূর তালগাছের মাথা থেকে বাগান বাড়ীটার ঠিক উপর দিয়ে ঐ কাঁঠাল গাছটা পর্য্যন্ত এমনি চীৎকার ক'রে যায়?"

গোলাপ গাছ মাথা নাড়িয়া বলিল "আর কেবল তা নয়, সন্ধ্যাকালে মনে হয় কে যেন মাধবীগাছের আশে পাশে আমাদের ঘিরে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কেহই উত্তর দিতে পারিল না, সকলেই বলিল, "হাঁ ভাই আমরা প্রত্যহই ইহা দেখি বটে, কিন্তু জানিনা ইহার ভিতর কি গূঢ় রহস্য আছে।"

সহকারের বক্ষ লগ্ন সুপ্তোত্থিতা মাধবী-লতা তখন কোমল-কণ্ঠে বলিল, "আমি জানি সে কথা!"

সমস্ত তরুলতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি জান? কি জান মাধবি?

মাধবীলতা বাতাসের সহিত একটুখানি দুলিয়া স্থির হইয়া কহিল সে কথা তোমরাও জান্‌তে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখতে। যে ঘটনার কথা আমি বলব সেটা যখন হয়েছিল তখন আমার ঐ যে প্রধান ডালটা ঘরের ভিতর ঢুকেছে সেটা নিতান্ত শিশু ছিল। ঘরের ঐ জানালার পাশেই তার তরুণ শিরটি গিয়ে পৌঁছল, প্রভাতের শীতল-বাতাসের সঙ্গে সে দুলে দুলে নাচত, এবং কখনও স্থিরভাবে, কখনও একটী চতুর শিশুর মত চঞ্চল হ'য়ে সে ঐ ঘরের ভিতরকার মানুষদের, তাদের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহার নিরীক্ষণ করত। যে ঘটনার কথা বলছি, সেটা সেই প্রত্যক্ষ ক'রেছিল।

নিশ্চল বৃক্ষ-রাজি সেই অদ্ভুত কাহিনীর প্রত্যাশায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মাধবীলতা কহিল "রাজা রামলোচনের সময় এই বাগানবাড়ীতে প্রত্যহ যে কাণ্ড হইত তা তোমরা জান। রাজা তখন সুন্দরী দেখিলেই তাহাকে রাজার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। তাহারা যখন প্রথম প্রথম আসিত

তখন মনে হইত হায় ইহারা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিবে না, ধর্ম্মকে কিছুতেই বলিদান দিবে না। কিন্তু মানুষদের মধ্যে নাকি ধর্ম্ম অপেক্ষা উঁচু ঐশ্বর্য্য ব'লে একটা জিনিষ আছে। সেই ঐশ্বর্য্যের নিকট অবশেষে তারা পরাজিত হ'ত। ঐ যে বাগানবাড়ীর সাম্‌নে অভ্রভেদী শূন্য গৃহটাকে ঘিরে সন্ধ্যাকালের বাতাস হা হা ক'রে উঠ্‌তে থাকে, ও কার বাড়ী জান? এমনি একজন সুন্দরী যে প্রথম দিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি তার পর এক মাসের মধ্যেই তার বিহার-গৃহ ঐ বাড়ীর ভিত্তি আরম্ভ হ'য়েছিল।

এমনি করে কত দিনকার কত আশ্চর্য্য ঘটনাই এখানে সংঘটিত হ'য়েছিল। কত অনাথার অশ্রু, কত আশ্রয়হীনার দীর্ঘশ্বাস, কত অভিসম্পাত যে এই গৃহের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজও এক একদিন মনে হয় যেন কার করুণ ক্রন্দনে সমস্ত ঘরটা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, যেন কার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে, যেন কোন নিঃসহায়া তার শেষ সামর্থ্যটুকু দিয়ে আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছে, ব্যগ্র হ'য়ে জানালার মধ্য দিয়ে দেখি—অন্ধকার! সে দিন যে অত্যাচারটা নিদারুণ সত্য ছিল—তার মিথ্যা অভিনয় মাত্র।

অনেক দিন এম্‌নি ক'রে গেল, যারা নূতন আসত তারা দুই একদিন কান্নাকাটি ক'রে বশ মানত। তার পর যখন আরও পুরাতন হইয়া যাইত তখন আমাদের গা থেকে যেমন শুক্‌নো পাতা ঝরে পড়ে তেমনি তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। এই দেখে দেখে আমার মানুষের উপর এমনি ঘৃণা হ'য়েছিল! ফুল যখন আমাদের গা থেকে ঝরে পড়ে তখন আমরা তাদের জন্য কত দুঃখ করি কত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি, কিন্তু মানুষগুলো আমাদের চেয়েও নীচ! যাদের উপর আসক্তি মনে হয় জীবনে কখনও ভাঙ্গবে না, একদিন হঠাৎ তাদের ঘরের আবর্জ্জনার মত বাইরে ফেলে দেয় তার জন্য চোখে একবিন্দু অশ্রুও আসে না!

একদিন একটু নূতনত্ব দেখলাম। হেমন্তের কুয়াশা কেটে গিয়ে বসন্তের লক্ষ্মী-শ্রী তখন ধরাতলকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে'ছিল; আমের বোলের স্নিগ্ধ গন্ধে দিগ্‌দিক্‌ পরিপূর্ণ হ'য়ে যেত। আমার সমস্ত দেহ অকারণ সন্ধ্যায় ফুলে ভরে উঠ্‌ত, এবং একখানি সজীব বসন্ত ছবির মত পুষ্পময়ী কামিনী শোভায় সৌন্দর্য্যে ঝলমল করত। এমনি বসন্তের এক স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যাকালে এই বাগানবাড়ীতে একজন এল, যার রূপের কাছে বসন্তের অতুল সুষমাও ম্লান হ'য়ে গিয়েছিল, পূর্ণিমার চাঁদের শোভা যার কাছে নিষ্প্রভ বোধ হ'ত। তার রূপেরই মত স্নিগ্ধ তার নাম ছিল—মালতী।

প্রভাতের শুভ্র শিশির-কণার মত মালতী তেমনি স্বচ্ছ তেমনি সরল ছিল। কোথায় কোন গুপ্ত পাতার আড়ালে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত সে একদিন পবিত্র প্রভাতে জন্ম নিয়েছিল, হঠাৎ যখন তার চোখ খুল্‌ল, তখন সে এই বাগানবাড়ীর কদর্য্য অভিনয় দেখে শিহরিয়া উঠেছিল!

আমি ঠিক বুঝতে পারতাম সে হৃদয়ে একটা বিষম আঘাত পেয়েছিল। সে ভাবত, এই পৃথিবী! প্রভাতের স্নিগ্ধ সুন্দর বাতাসের মাঝখানে যখন শিশুর ঘুম ভাঙ্গে, তখন সে উঠে, নিয়ে, চারিদিকে প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়, ভাবে কি সুন্দর পৃথিবী! মালতীর যে দিন ঘুম ভাঙ্গল সে দিন সে চেয়ে দেখ্‌লে বাগানবাড়ীর রুদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে ঘৃণিত বিলাসিতা তার অশেষ কদর্য্যতা নিয়ে তারই পানে লোলুপ রক্ত-দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

মালতী রাজা রামলোচন আর তাঁর পারিষদবর্গের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে একেবারে উলট্‌ পালট্‌ ক'রে দিয়েছিল। অনুনয় বিনয় ভয়প্রদর্শন তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, অবশেষে যখন অর্থ মণিমাণিক্য পর্য্যন্ত তার কাছে পরাজিত হ'য়ে গেল, তখন রামলোচন বিষম প্রমাদ গণিলেন।

সমস্ত দিন ধ'রে মালতীকে দেখে আমার তৃপ্তি হ'ত না, মনে হ'ত এতদিন পরে একটা মানুষের দেখা পেয়েছি, যার কাছে ধর্ম্মই একমাত্র, আত্ম-মর্য্যাদার গৌরব যাকে ভাস্বর ক'রে তুলেছিল। মালতীকে দেখে ভক্তিতে আমার ডালগুলো নত হ'য়ে পড়ত, সে যখন আমার কাছে এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সুদূর আকাশের পানে তাকিয়ে থাকত, আর ধীরে ধীরে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে, উঠ্‌ত, তখন হাওয়ার আছিলায় আমার ডাল নেড়ে তার মাথায় ফুলগুলো নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে কৃতার্থ হ'তাম!

সন্ধ্যাকালে রামলোচন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া বলিল "আজ তাদের আনিনি।" মালতী কোন উত্তর করিল না।

একবার ঢোক গিলিয়া রামলোচন কহিল "আজ তোমাকে চাই-ই।" মালতী এবার উত্তর দিল "সংসারে সবই সম্ভব হ'তে পারে।" কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা তুমি আমাকে কিছুতেই পাবে না।

"মালতি, কিন্তু তোমাকে আমি সত্যই ভালবাসি, তোমাকে কেমন ক'রে পেতে পারি, সে উপায় ব'লে দাও।"

মালতী তার উজ্জ্বল দুটী চক্ষু রামলোচনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল "আমি কিন্তু তোমাকে চাই না। তুমি আমাকে ভালবাস এ কথা আমি বিশ্বাস করি না—ভালবাসা এত কদর্য্য এত নীচ নয়!"

"তোমার সঙ্গে আমি নীচের মত ব্যবহার ক'রেছি, স্বীকার করি; কিন্তু আমি তত নীচ নই, আমি সংশোধন ক'র্ত্তে চাই, কেমন করে সংশোধন করি, কেমন ক'রে দেখাই যে রামলোচনেরও সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি নিঃশেষে শুকিয়ে যায় নি!"

মালতী দৃঢ় অবিচলিত স্বরে বলিল "তবে আমাকে বিবাহ করো। অধর্ম্মের দ্বারা তুমি আমাকে কিছুতেই পাবে না, ধর্ম্মমত যদি আমাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করো তা হ'লে তুমি আমাকে পেতে পারো, অন্যথা নয়।"

* * *

তারপর একদিন ঢাক ঢোল সানাই সে বাগানবাড়ীতে বেজে উঠ্‌ল, পুরোহিত এলো, মন্ত্রপড়া হ'ল, রামলোচনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ হ'য়ে গেল। এ একটা মস্ত আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু কেন জানি না নিকষ কালো

মেঘের মত একটা গভীর অমঙ্গলের ছায়া যেন তাকে মলিন ক'রে দিয়েছিল। আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্য, ক্ষুদ্র ক্ষমতা, কিন্তু সেটুকু সম্পূর্ণ তাদের শুভ-আকাঙ্ক্ষায় নিয়োজিত ক'রেছিলাম।

তারপরে কিছুদিন গেল। রামলোচন প্রত্যহ মালতীর কাছে আসত, তাদের সুখ দুঃখের কত কথা হ'ত। মালতী আকাশের পানে চেয়ে থাকত। তার চোখে ক্রমশঃ একি আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠ্‌তে লাগল! প্রেম মানুষকে নবীন করে, তরুণ করে। রামলোচনের বিলাস-ক্লিষ্ট জীবনের মধ্যে একটা তরুণতা যেমন ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌তে লাগল, তেমনি মালতীর মুখে চোখে একটা নূতন প্রাপ্তি একটা নূতন তৃপ্তির ভাব স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল।

প্রেম জিনিষটা মালতীর কাছে যেমন নূতন, কদর্য্য বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত রামলোচনের কাছেও তেমনি নূতন বোধ হ'য়েছিল।

আমরা তাদের জীবনের এই নূতনত্ব দেখে ভাবতাম—আহা ভগবান এদের চির দিন এমনি রাখুন।

* * *

বসন্তের সে একটা ভারি সুন্দর দিন। খামখা আমাদের দেহ ফুলে ফুলে ভ'রে উঠ্‌ল। বাতাসের মধ্যে এমনি একটা মাদকতা এলো যে লোকগুলো যেন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌লো! তাদের হৃদয় থেকে এক মুহূর্ত্তে যেন চিরজীবনের সব ভার নেবে গিয়ে হাল্‌কা হ'য়ে গেল। দিকে দিকে সেদিন কি আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

কিন্তু এমন দিনে রামলোচন একটা মস্ত ভুল করেছিলো। সে দিন বোধ হয় সে প্রকৃতিস্থ ছিল না, তাই অজ্ঞে সে বুঝতে পারেনি সে কি ক'রছিল। সন্ধ্যার সময় সে আবার আগেকার মত দলবল নিয়ে বাগানবাড়ী'তে এসে উপস্থিত।

মালতী তখন ফিরোজা রঙের শাটি খানি পরে বসন্তের শোভাময়ী দেবতার মত কার প্রতীক্ষায় ছিল। তার চূর্ণকুন্তল কপালের উপর এসে পড়েছিল। ঠোঁটের উপর রঙিন নেশার মত একটা চাঞ্চল্য। চোখে একটা আবেশ-ভাব জেগে উঠেছিল।

এমন সময় রামলোচন ও তার সঙ্গীরা এসে ডাকিল "মালতি।"

মুহূর্ত্তে মালতী উঠিয়া দাঁড়াইল, রামলোচনের দিকে ফিরিয়া বলিল "একি!"

একজন সঙ্গী বলিয়া উঠিল "এমন সুন্দর দিনটা—"

মালতী রুদ্ধস্বরে রামলোচনকে বলিল "আমি তোমার ধর্ম্ম পত্নী, তুমি কোন সাহসে আমার নিকট তোমার সঙ্গীদের নিয়ে এসেছ!"

তখন তাহার সঙ্গিগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়া পরস্পরের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার মধ্যে একজন বলিল, "মিথ্যা মালতী! সে বিবাহ মিথ্যা। সে মন্ত্র মিথ্যা, সে পুরোহিত মিথ্যা, তোমাকে পাবার জন্যে রামলোচনের সে এক চাতুরী মাত্র—বিবাহের মিথ্যা অভিনয়।"

বজ্রপাতের পরমুহূর্ত্তের মত একটা গভীর নিস্তব্ধতা মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়িল। সঙ্গীগণ সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, এবং রামলোচন পাথরের মত চাহিয়া রহিল!

সহসা রামলোচন উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "নরাধম, পিশাচ, পাষণ্ড, দূর হ', দূর হ', এই মুহূর্ত্তে দূর হবে যা!"

সঙ্গিগণ চলিয়া গেল। রুষ্ট দেবতার সম্মুখে বিচার-প্রার্থী মানুষ যেমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি রামলোচন মালতীর সম্মুখে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হায় তাহার এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা!

মালতী অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল "শুনলাম তা সত্য? মিথ্যা বলো না।"

রামলোচন কহিল, "সত্য, আমাদের বংশের নিয়ম।"

মালতী দৃঢ় ভাবে বলিল "তোমাদের বংশের নিয়ম আমি শুনতে চাইনে। যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। তুমি আজ হ'তে আমার কেউ নও—আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও। এই আমার শেষ দেখা—তোমার এই প্রতারণার ফল যেন ভগবান তোমাকে দেন—এই আমার শেষ প্রার্থনা।" বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

বাহিরে রামলোচন প্রার্থনা করিতে লাগিল "মালতি, আর একটিবার দেখা করতে দাও।" সে দিন দেখলাম মালতী বজ্র অপেক্ষাও কঠোর।

• • •

গভীর রাত্রি মালতী ধীরে ধীরে এই জানালাটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার চোখে এক জ্বালা, মুখের এক ভাব! মাথার চুল তার রুক্ষ বোধ হচ্ছিল, তাহার দেহের বসন স্রস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। সে আকাশের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কি ভাবতে লাগলো, তারপর তার চোখ জলে ভ'রে উঠলো। তারপর এই জানালাটার উপর হাত দিয়ে তাতে আপনার মুখ রক্ষা ক'রলে,—ক'রে কতক্ষণ ধ'রে কাঁদলে!

সে কি ভাবছিল, সে কেন কাঁদছিল, কে জানে! যাকে সে সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে পরম আগ্রহ ভরে জড়িয়ে ধ'রেছিল, আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ যখন তার মিথ্যা প্রেতমূর্ত্তি দীর্ঘ কঙ্কাল নিয়ে তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'লো, তখনকার গভীর নিরাশা, লাঞ্ছিত প্রতারিত ধর্ম্মের বেদনা, কি অন্য আর কিছু, কে জানে! একটি মাত্র ভেলা আশ্রয় ক'রে সে মহাসমুদ্রে ভেসেছিল, যখন দিন দিন সে সেই ভেলাকে তার একমাত্র আশ্রয় একমাত্র রক্ষা মনে ক'রে ভবিষ্যতের দিকে আশা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইতে আরম্ভ ক'রেছিল, ঠিক সেই সময় কোথা হ'তে একটা ঝড় এসে তাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল! আজ রাত্রে এই ক্ষুব্ধ উচ্ছল সমুদ্রের মাঝখানে তার শেষ আশ্রয়টুকুকে বিসর্জ্জন দিয়ে, সে কি ভাবছিল সেই জানে।

অনেকক্ষণ পরে সে এখান থেকে সরে গিয়ে আপনার বাক্স খুললে। রামলোচনের দান সমস্ত বিলাস সামগ্রী দূরে ফেলে দিয়ে একটা ছোট কৌটা বার করলে! সেটা বিষের কৌটা, তার অন্তিমের আশ্রয়। তার কাছে তখন আর সব মিথ্যা, কেবল সেই ছোট কৌটাটি একমাত্র পরম সত্য ছিল।

একবার ফেলে দেওয়া রামলোচনের সেই দানগুলির দিকে তাকিয়ে, সজ্জিত সেই ঘরের চারিপাশ দেখে তার বুকের ভিতর

থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠ্‌ল। এ সবই তার, কিন্তু হায়, সে আজ কারো নয়।

জলের মাঝে অন্তিম ডুব দেওয়ার আগে পৃথিবীটা চো'খের সামনে যেমন-ধারা বোধ হয় তারও তেমনি বোধ হ'চ্ছিল! এই সব সামগ্রী, এই সব বিলাসিতা, সব মিথ্যা, একটা ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মত মুছে যাবে, দিনশেষে আলোর মত নিঃশেষে নিবে যাবে! মরণ—সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জীবনটা একবার আগাগোড়া ভেবে দেখে, সুখ দুঃখ আশা প্রেম এবং অবশেষে গভীর প্রতারণার কথা মনে ক'রে তার বুকের মধ্যে কি হ'চ্ছিল কে জানে! কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ফলে ফুলে ভরা, শোভা-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য-আনন্দে পূর্ণ এই পৃথিবী আর তার কেউ নয়, প্রথম যৌবনের অসীম-সৌন্দর্য্যভরা তার অনিন্দিত এই দেহ-খানি উপকূলে রেখে, তাকে কোন্ দেশে কোন্ মহাপথে যাত্রা করতে হবে কে জানে!

কিন্তু সে অজ্ঞাত, সে অনির্দ্দিষ্ট মহাযাত্রা, পৃথিবীর এই পঙ্কিল, কদর্য্য, কলুষতার অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রিয়তমের অন্তিম চুম্বনের মত পরম—আগ্রহ ভরে বিষপাত্র নিঃশেষ করিয়া মালতী ধীরে ধীরে শয়ন করিল।

সেই সময় এক নিশাচর পাখী আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত তার করুণ ক্রন্দনে বিদীর্ণ ক'রে গেলো, এবং তার পর দিন থেকে প্রত্যহ সে কার জন্ম নিস্তব্ধ রাত্রে ঠিক এমনি সময়ে কেঁদে ওঠে! তারপর থেকে প্রাতরাত্রে আমার মনে হয়, মালতী আমার পাশে এই জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে আছে, তার চোখ জ্বালাময়, চুল রুক্ষ, মুখ বিবর্ণ, বসন স্রস্ত, আর মাঝে মাঝে যেন তার সমস্ত বক্ষ-পঞ্জর ভেদ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে, পৃথিবীর সমস্ত নবীনতা সমস্ত তরুণতাকে মলিন ক'রে দিচ্ছে!

আমার দেহ থেকে যেমন সবে-মাত্র ফুটতে আরম্ভ-করা মাধবীর কুঁড়ি অকস্মাৎ একদিন অসময়ে ঝ'ড়ে পড়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর গা থেকে সে রাত্রে সহসা, এই পরম সুন্দর মালতী কুঁড়িটি কোন্ অন্ধকারে ঝ'রে গেল কে জানে!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গের কাননে তব মধুর 'কাহিনী'
শ্যামল পল্লবে, কবি, অম্লান সুন্দর,
'কল্পনা' ফিরিছে গাহি নীলিমা ভিতর
তোমার কীর্ত্তির 'কথা' জগৎ প্লাবিনী,
নির্জ্জন নির্ঝর কূলে মানসহারিণী
'কণিকা' তোমার করে হ'ল দিনকর,—
বর্ষার সরস ধরা মেদুর অম্বর
'ক্ষণিকে' আঁকিলে তুমি স্বর্ণ-সৌদামিনী।

তুমি দেখায়েছ, কবি, কুহক ঝঙ্কারে
'মানসী'র অভিসারে কি প্রেম আবেগ,
তোমার 'সোনার তরী' উদ্দাম জোয়ারে
'চিত্রা' তটে সহিতেছে বিচিত্র উদ্বেগ,
নহে ইহা সন্ধ্যারতি,—দীপ্ত প্রভাকর;
এ 'নৈবেদ্যে' করি পূজা হইলে অমর।

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিবার সময় এরূপ অনেক জটিল তত্ত্বে উপনীত হইতে হয় যে সহজে তাহার মীমাংসা হওয়া নিতান্ত দুরূহ; অন্ততঃ বিশেষ চিন্তা ও সময় সাপেক্ষ এবং বহু কষ্টসাধ্য। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে এক নামের বহু ব্যক্তি ইতিহাসে আবির্ভূত হইয়াছেন—লৌকিক কিম্বদন্তী তাঁহাদের একই ব্যক্তি স্থির করিয়াছে অথচ তাঁহাদের আবির্ভাবকাল, জীবনের ঘটনাবলী তাঁহাদের স্বকৃত কার্য্য,—সে কার্য্য গ্রন্থরূপই হৌক বা কোন দেশহিতকর স্থায়ী অনুষ্ঠান রূপই হৌক—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনেক ঘটনা এরূপ লোকের সহিত এরূপভাবে জড়িত যে উক্ত ঘটনার সহিত সেরূপ লোকের কোনও সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অনেক ঐতিহাসিক সত্য ঐ জাতীয় অন্যান্য সত্যের সহিত এরূপভাবে সম্মিলিত যে আপাততঃ দৃষ্টিতে উভয়বিধ সত্যই এককালের ঘটনা বলিয়া বোধ হয় কিন্তু উহাই ধ্রুব সত্য ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অনেক সত্য ঐতিহাসিক বলিয়া শুধু আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এরূপ নহে, এমন কি অনেক ইতিহাসবিদেরাও উহা প্রামাণিক ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; অথচ মূলানুসন্ধান করিয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে উহা বিষম ভ্রম। ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকেরা পদে পদে এরূপ রহস্য দেখিতে পাইবেন। নিম্নে কতকগুলি এরূপ রহস্যের উল্লেখ করা গেল। যদি কোনো পাঠক প্রবন্ধ লিখিত রহস্যের সকল সমাধান বা ইহার কোনো রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারেন বা কাহারও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ইহাতে জাগ্রত হয় তাহা হইলে প্রবন্ধ লেখক সফলশ্রম জ্ঞান করিবে।

১ম। ভারতেতিহাসে কালিদাস নামে কয়জন লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন? যে জগদ্বিখ্যাত মহাকবির নাম অভিজ্ঞান শকুন্তল, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি মহাকাব্য নাটকের সহিত জড়িত তাঁহার আবির্ভাবের যথার্থ সময় কি? পুষ্পবাণ বিলাস, শ্রুতবোধ, মালতীমাধব ও অভিজ্ঞান শকুন্তলাদির রচয়িতা কি এক ও অভিন্ন? প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে সত্য যে অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে এরূপ ত বোধ হয় না। ডাউদাজী ভাণ্ডারকর রমেশচন্দ্র রামদাস প্রমুখ প্রাচ্য পণ্ডিতগণ এবং মোক্ষমূলর মণিয়র উইলিয়মস্ 'বিদ্বৎশার্দ্দূল' বুহ্লার প্রমুখ প্রতীচ্য মনীষিবর্গ যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার ফলে কালিদাস পাঁচ শত বৎসর (খ্রীষ্টীয় ১ম হইতে ৬ম শতাব্দী) ইতস্ততঃ করিতেছেন! এক আধ বা বিশ পঁচিশ বৎসর এদিক ওদিক নহে একেবারে পাঁচ পাঁচ শত বৎসর! পণ্ডিত 'শার্দ্দূলদের' অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা,—কিন্তু ইহা ভোজ প্রবন্ধকারের মত সিদ্ধান্ত বলিয়াই অনেকটা বোধ হয় না কি? ভোজ প্রবন্ধকার স্বীয় গ্রন্থে ভবভূতি ও কালিদাসকে সমসাময়িক ও এক নৃপতির সভা উজ্জ্বল করিতেছেন বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। এই পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে বেচারা কালিদাসকে নাস্তানাবুদ্ হইতে হইয়াছে। কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে সব প্রমাণ এতাবৎকাল শুনিয়া আসিতেছি তদ্ব্যতীত চূড়ান্ত প্রমাণ আর কোনও কিছু আছে কিনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগকে সে বিষয়ে মতামত দিতে সানুনয় অনুরোধ করি।

২য়। সেন বংশীয় নরপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রধান ধর্ম্মাধিকার ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' নামক গ্রন্থ সূচনায় বলিয়াছেন (১) যে তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালসেনের তিনি ধর্ম্মাধিকার ও বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। (১) আমরা (১৮৯৫, জুলাই) "কলিকাতা রিবিউ" পত্রিকায় "Halayudha, His life and times" প্রবন্ধে হলায়ুধের আবির্ভাবকাল নিরূপণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছি যে এই ধনঞ্জয়ের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অর্থাৎ ১০৪১ খ্রীঃ হওয়া সম্ভবপর। এদিকে আবার ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় মুঞ্জ ভোজরাজের সভাসদ ছিলেন। তিনি "দশরূপ নিবন্ধের" রচয়িতা। এই 'দশরূপ নিবন্ধে' ও "সরস্বতি কণ্ঠাভরণ" গ্রন্থে রাজশেখরের শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। পণ্ডিতদের মতে রাজশেখর দশম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। ইত্যাদি নানা কারণে পণ্ডিতবর কোলব্রুক ধনঞ্জয়ের আবির্ভাবকাল ১০৪১ স্থির করিয়াছেন। এই যে সময়গত ও নামগত ঐক্য ইহা ব্যতীত তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোনো ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে কি না?

৩য়। হলায়ুধের পিতামহ (প্রপিতামহ?) মহেশ্বর ১০২১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। হলায়ুধ ইঁহার কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে হলায়ুধের পিতামহের এই সময়ে আবির্ভাব হওয়াই সম্ভবপর। এই নামের আরও দুই জন লোক আছেন। একজন 'বিশ্বপ্রকাশ' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানের ও 'সাহসাঙ্ক-চরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি স্বরচিত বিশ্ব-প্রকাশের 'নির্ঘণ্ট'র প্রারম্ভে আপনাকে গাধি পরেশ্বর সাহসাঙ্কের রাজবৈদ্য ও শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলসন্ ইঁহার আবির্ভাব কাল ১১১১ খৃঃ স্থির করেন। সুতরাং এক সময়ে আবির্ভূত হইলেও ইঁহাদের মধ্যে কোন গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। একজন ব্রাহ্মণ ও আর একজন বৈদ্যবংশসম্ভূত। ইহা ছাড়া আর একজন মহেশ্বর আছেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহাকে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দশম ও (সুতরাং) হলায়ুধের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২) "ভারতী" পত্রিকার কোনো পাঠক

(১) মূলে কেবল 'ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান পরঃ জ্যোতিষাং" এই কথা লিখা আছে। হলায়ুধ যখন অল্প বয়সেই রাজামাত্য হন তখন তাঁহার পিতা যে বল্লালের ধর্ম্মাধিকার ছিলেন এ অনুমান করা বোধ [illegible] অযৌক্তিক নহে।

(২) সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৫৬৬-৬৭ পৃঃ। বিদ্যানিধি মহাশয় মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথায় "ভট্টের অধস্তন দশম মহেশ্বর" এ পংক্তি হইতে এ তথ্য সংগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ ধরিলে সময়ের পার্থক্য পড়ে না এ কথা সবিস্তারে সাহিত্যের' উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি।

অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিবেন কি যে হলা-য়ুধের উক্ত পূর্ব্বপুরুষ ও বিদ্যানিধিমহাশয়ের উল্লিখিত মহেশ্বরের ঐক্য আছে কি না? আমরা কয়েক বৎসর হইল 'সাহিত্য-পত্রে' 'ভটনারায়ণের বংশাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই দুই ব্যক্তির ঐক্য সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম কিন্তু উভয়ের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। বিদ্যানিধি মহাশয়ের এ সত্য স্থাপনের জন্য প্রমাণপ্রয়োগও আমাদের সন্তোষজনক বোধ হয় নাই। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই আমাদের প্রদত্ত বা বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রদর্শিত প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা কি অধিকতর সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া যায় না?

৪র্থ বিভিন্ন দেশে বৎসর গণিবার বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত দেখা যায়। এরূপ বৎসর গণনার প্রারম্ভের ইতিহাস বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। সচরাচর দেখা যায় যে কোন লোকোত্তর চরিত্রের মহাপুরুষের আবির্ভাব বা তিরোভাব ধরিয়া বা কোন জগজ্জয়ী মহাবীর সম্রাটের বা কোনো গুণগ্রাহী নৃপতির আবির্ভাবকাল হইতে এরূপ বৎসর গণনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী বা মহম্মদীয় হিজিরা এইরূপ, মহাপুরুষের আবির্ভাব তিরোভাব বা তাঁহার জীবনের কোনো প্রধান ঘটনা (যেমন মহম্মদের মদিনায় পলায়ন) অবলম্বন করিয়া এই দুটী বর্ষ গণনা প্রচলিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা তাঁহাদের যুগপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতার তিরোধান স্মরণ করিয়া বর্ষ গণনা করে। বিক্রমসম্বৎ, শালিবাহনের সাল, চৈতন্যসম্বৎ, ব্রাহ্মসম্বৎ, লক্ষ্মণসম্বৎ, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সত্যের দৃষ্টান্ত। এমন কি আজ কাল পরমহংস রামকৃষ্ণের তিরোভাব স্মরণ করিয়া বর্ষ গণনা ব্যবহার ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। অসভ্য জাতিদের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বর্ষ গণনার ইতিহাস একটু পরিবর্ত্তিত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অপরিণত মন প্রাকৃতিক কোন বিপ্লব বা দুর্বিপাক—যেমন মহামারী, জলপ্লাবন, দারুণ দুর্ভিক্ষ, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রভৃতি—অবলম্বন করিয়া বর্ষ গণনা করে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই শিক্ষার তারতম্যানুসারে মানবের মনের পরিণতি ও গঠনবৈচিত্র্য ভাবিয়া দেখিলেই বিস্মিত হইতে হয়। সে যাহা হউক আমাদের দেশে যে সমস্ত বর্ষ গণনা প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার প্রধানগুলি এই :—শক, সম্বৎ, সন, হিজ্‌রী, বঙ্গাব্দ, ফস্‌লী, মঘী, ত্রিপুরাব্দ ও লক্ষ্মণাব্দ। ইহার অনেক-গুলি পঞ্জিকার শিরোদেশ অলঙ্কৃত করে দেখিতে পাই কিন্তু অধিক ইতিহাস জানি-বার কৌতূহল আমাদের মনে জাগ্রত হয় না এটা আমাদের জড়প্রকৃতি জাতির স্বভাব-সঙ্গতই বটে। ইহার মধ্যে এক একটী বর্ষ গণনা প্রথার ইতিহাস আলোচনা করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে পারে। সেরূপ শক্তি ও সময়ের আমাদের একান্ত অভাব। *এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে যতটুকু আলোচনা করা সম্ভব তাহাই করা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন সালগুলির সংক্ষিপ্ত

আলোচনা পরে করিতেছি। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল বিহার প্রদেশে অবস্থানকালীন বাঁকিপুর সহরের 'খড়্গ-বিলাস' প্রেসের অধিকারী, হিন্দী ভাষার উন্নতিকল্পে একান্ত উৎসাহী মিত্রবর শ্রীযুক্ত রামদীন সিংহ মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত এক সাধুর নিকট প্রাপ্ত একটী ডাকের কথা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। উহাই প্রথমে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অনেকগুলি সম্বতের নাম ছিল। উক্ত সুহৃদ্বর বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককে ঐ শ্লোক কয়টী অবলম্বন করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিতে অনুরোধ করেন লেখকও সেই কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু নানা কারণে এ কয় বৎসর সে প্রতিজ্ঞা পালনে আমরা অসমর্থ ছিলাম। ইতিমধ্যে যদি তিনি কোনো পত্রিকায় স্বয়ং বা পণ্ডিতবর গ্রীয়ার্সন্ প্রমুখ তাঁহার অন্য কোনো সুহৃদের দ্বারা এ বিষয়ে আলোচনা করাইয়া থাকেন বলিতে পারি না। কিন্তু বিষয়টি এমন গুরুতর ও কৌতূহলজনক যে একবার আলোচিত হইলেও তাহার পুনরুল্লেখ এস্থলে পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না বিবেচনায় সে কয়টী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"সম্বৎ কই এক ভাঁতিকে জানো।
ডাক কহে সব শুনো সেয়ানো॥
কলি কোলম কলি চুরি সিং।
লৌকিক-বিক্রম লছিমন সিং॥
বুদ্ধ নির্ব্বাণ মৌর্য্যশক ভাই।
চালুক বিক্রম গুপ্তগণাই॥
গাঙ্গে হর্ষ নিবারহুঁ জানত।
পয়ং ত্রিহুত লছিমন মানত॥

উক্ত ডাকের কথা মতে কয়টি বর্ষের আমরা উল্লেখ পাইতেছি।

যথা :—(১) কলিসম্বৎ (২) কোলম (কোলম্ব ?) (৩) কলিচুরি সম্বৎ (?) (৪) লৌকিক সম্বৎ (শালিবাহনের সন) (৫) বিক্রম সম্বৎ (শকাব্দা) (৬) বুদ্ধ নির্ব্বাণ সম্বৎ (৭) লক্ষ্মণ সেন সম্বৎ (লং সং) (৮) মৌর্য্যশক (৯) চালুক্য সম্বৎ (১০) বিক্রম সম্বৎ (১১) গুপ্ত সম্বৎ (১২) গাঙ্গ (গঙ্গাবংশীয় নৃপতিদিগের সম্বৎ ?)।

এই কয় সম্বতের মধ্যে অনেকগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়। চালুক্য, গুপ্ত, মৌর্য্যশক যেন একরকম বোঝা গেল, কারণ তত্তৎনামীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশ ভারতের সৌভাগ্যের দিনে ভারতেতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। গাঙ্গসম্বৎ ইহা উড়িষ্যার ইতিহাস প্রসিদ্ধ গঙ্গাবংশীয় কেশরী-রাজগণের প্রতিষ্ঠিত সম্বৎ অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হইবে না। তবে ঐ ডাকের শেষ ছত্রের পূর্ব্ব ছত্র—'গাঙ্গে হর্ষ নিবারহুঁ জানত' এই ছত্রের অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট। পরবর্ত্তী ছত্রের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিতে গেলে এই রকম অর্থ হয় যে "গাঙ্গ সম্বৎ 'হর্ষনিবার' দেশের লোকেদের মধ্যে জানিত অর্থাৎ প্রচলিত।" যদি এ ব্যাখ্যা সমীচীন হয়,—তবে 'হর্ষনিবার' দেশ কোথা ও কাহাকে বলে? 'পয়ং ত্রিহুত লছিমন মানত' অর্থাৎ ত্রিহুত অঞ্চলে নৃপতি লক্ষ্মণসিং (লক্ষ্মণ সম্বৎ তাম্র শাসনাদির প্রসিদ্ধ 'লং সং')—সকলে মানিয়া চলে। এ ছত্রের স্পষ্ট অর্থগ্রহ হয়। 'কলি' সম্বৎ যেন কলিযুগের আরম্ভ হইতে ধরা

গেল। কিন্তু কোলম্, কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ কি?

আমাদের পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শোভিত আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বঙ্গাব্দই বা কি? কোন্ নরপতি বা কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটন হইতে এ বর্ষ গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? আর সন, বঙ্গাব্দ ও ফসলী তিনটী বর্ষগণনার অঙ্কাংশ এক (১৩১৮)। 'মঘী' গণনা কোন্ ঘটনা অবলম্বনে গণনা করা হয়? 'ত্রিপুরাব্দ' কি ত্রিপুরা দেশের রাজগণের আদিপুরুষ কর্ত্তৃক বংশপ্রতিষ্ঠা ধরিয়া গণনা করা হয়? তাই যদি হয় তবে ত্রিপুরার কোন বংশ? এ বর্ষ গণনা ত্রিপুরায় প্রচলিত কি না? 'দাশিমাব্দ' বা কি? ঐতিহাসিক রহস্যের এ সব অন্ধতম গুহায় আলোকপাত কে করিবে?

৫ম। সংস্কৃত সাহিত্যে 'হরিৎ' এই শব্দ অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আভিধানিক অর্থ পলাশবর্ণ অর্থাৎ পীত মিশ্রিত সবুজবর্ণ। (হরিদ্রাভঃ পলাশো হরিতো হরিৎ ইত্যমরঃ)। আবার 'হরিৎ' দিক্ শব্দের একটী পর্য্যায়মাত্র ('দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা আশাশ্চ হরিতশ্চ তাঃ'); 'দিক্' কিনা এই অনন্ত সীমাশূন্য আকাশের মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট কোণ বিশেষ। আকাশের ত কোনো প্রাকৃতিক অংশ নাই অনন্তের আবার সীমা বা কোণ কি? মনুষ্য কেবল বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণের জন্য অজ্ঞাত ভাষায় প্রচলিত কথার মত এই 'দিক্' শব্দেরও ব্যবহার করে। 'সূর্য্য' পর্য্যায়ে সূর্য্যের বহু নামের মধ্যে দুইটী নাম এখানে আমাদের প্রধানতঃ আলোচ্য। সে দুটী নাম 'সপ্তাশ্ব' ও হরিদশ্ব' (পূষৎ বিবস্বৎ সপ্তাশ্বো হরিদশ্বোষ্ণরশ্ময়ঃ)। সূর্য্যের এই দুইটী নামের অর্থ এইরূপ 'হরিৎ' অর্থাৎ 'হরিদ্রাভ সবুজবর্ণ অশ্ব যাহার', 'সাতটী অশ্ব যাহার', 'দিক্ অশ্ব যাহার'—সূর্য্যের এই তিন অর্থই সার্থক। অধ্যাপক মোক্ষমূলর 'হরিৎ' শব্দের আরও একটী অর্থ করেন 'কিরণ'। 'হরিৎ' শব্দ 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কিন্তু তিনি এ শব্দকে 'ঘৃ' ধাতু দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ করিয়াছেন। এ ধাতু নিষ্পন্ন কিরণার্থক একটী শব্দ 'ঘৃণিঃ'—কাব্য সাহিত্যে এ শব্দের প্রয়োগ আভাবিক। ('কিরণোস্র ময়ূখাংশুগভস্তিঘৃণিরশ্ময়ঃ।) আচার্য্য 'হরিৎ' শব্দকে গ্রীকদের সবিতৃদেবের রথবাহী 'Charites' দের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সূর্য্য পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমে ভ্রমণ করেন, দিকই তাঁহার অশ্ব অর্থাৎ বাহন। তাঁহার কিরণ পিতাভ হরিৎ,—কিরণই তাঁহার অশ্ব—এ সকল বিশেষণই তাঁহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এজন্যই হয়ত হিন্দু ও গ্রীকপুরাণে সূর্য্যদেবের হরিৎ সপ্তাশ্ব বাহনরূপে চিত্রিত হয়। ইহার 'সপ্তাশ্ব' নামটী আরও বিস্ময়কর। কারণ, 'সপ্তাশ্ব'='সপ্ত অশ্ব যাঁহার' বা, (মোক্ষমূলরের 'হরিৎ' শব্দের 'কিরণ' অর্থ গ্রহণ করিলে)=সপ্ত কিরণ যাঁহার, সূর্য্যের সপ্ত কিরণ কি? এ প্রশ্নে সহজেই আর্য্যদের Spectrum সম্বন্ধে জ্ঞানের কল্পনা করা কি একেবারে অযৌক্তিক? (৩)

(৩) গত বৎসরের 'প্রবাসী' পত্রিকায় বর্ত্তমান লেখকের 'একটী প্রশ্ন' প্রবন্ধের উত্তরে অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় সপ্তাশ্বের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আমাদের সন্তোষজনক বোধ হয় নাই। গীতায় অনুবাদ পুস্তকে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের মতই সপ্তাশ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষাতেই জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সপ্রাধ কথা উঠিতে—রোম, গ্রীস, চীন প্রভৃতি মহা পরাক্রান্ত জাতিদের সহিত এককালে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কেবল পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদানে নহে—ভাবেরও আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার কথা সহজে উঠে। অনেকেই জানেন যে জ্যোতিষের সিদ্ধান্তভাগের এক ভাগের নাম 'রোমক সিদ্ধান্ত'। এ অংশের প্রণেতার নাম যবনাচার্য্য। গ্রীক্ ও হিন্দুদর্শন প্রণালী একটু চিন্তাশীলতার ও অপক্ষপাতিতার সহিত আলোচনা করিলে উভয়ের মধ্যে ভাবের অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। চার্ব্বাক দর্শনের সহিত এপিকিউরিয়ানদের (Epicureans) সাইনিকদের (Cynic) সহিত যোগী ও কাপালিকদের মূলগত ধর্ম্মমতের ঐক্য নাই কি? ষ্টোইকদের (Stoics) উচ্চচিন্তা যে ক্রমে ক্যাণ্ট ও হিজেলিয়ানদের (Hegellians) চিন্তা প্রণালীতে উন্নীত হইয়া বেদান্ত শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য অমৃতময় অদ্বৈতবাদে এককালে উপনীত হইবে না এ কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? গ্রীক ও হিন্দুদর্শন পুরাণেতিহাস ও মহাকাব্যেও অদ্ভুত সাম্য। সে সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে ও সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব। সে শব্দগুলি 'নিষ্ক' 'দীনার' 'চেল' 'চীনাম্বর' প্রভৃতি। নিষ্ক ইদানীন্তন প্রচলিত সুবর্ণ মুদ্রার পরিমাণ। ১০৮ সুবর্ণে বা ২ কার্ষাপণে এক 'নিষ্ক' বা 'দীনার'। এই দীনার শব্দ গ্রীক্ মুদ্রা দীনার (Dinar) শব্দের রূপান্তর। এই নিষ্ক শব্দের প্রয়োগ মনুর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। অমরসিংহ নিষ্ক, সুবর্ণ, কার্ষাপণ, পল, দীনার এই সকলের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এক সময়ে উভয় দেশের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

গ্রীক্ ও রোম দেশের ন্যায় তুল্যরূপ না হউক চীন দেশের সহিতও যে পণ্যের ও ভাবের আদান প্রদান হইত,—বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ও তদনুপরবর্ত্তী পুরাণাদিতেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। রামায়ণে সুগ্রীব স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বানরদের যখন বিভিন্ন দিগ্দেশে পাঠাইতেছেন তাহাতে উত্তর দেশে পার্ব্বত্য জাতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনাপাঠে তিব্বতীয় ও চীনদেশীয় লোকদের কথা মনে পড়ে। কালিকাপুরাণে ইহাদের ভাষরত্ব বর্ণনা আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে চীনাংশুক, চীনাম্বর ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। কালিদাস চীনাম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন—

"চীনাংশুকমিবকেতো প্রতিবাতং নীয়মানস্য"।

এরূপ শব্দের অন্যত্রও বহুল প্রয়োগ আছে। কালিদাসকে যদি অন্ততঃ খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক স্থির করা যায় তাহা হইলেও তাহার পূর্ব্ব হইতেও যে চীন দেশের সহিত বাণিজ্যের চলাচল হইত এ অনুমান আদৌ অমূলক বোধ হয় না। বিক্রমাদিত্যের জগদ্বিখ্যাত রাজসভার অন্যতম সভাসদ্ অমর সিংহের অভিধানে চীনাম্বরের কোনো উল্লেখ নাই।

বস্ত্রের কথা বলিতে আর এক কথা মনে পড়িল। বঙ্গীয় 'চেলী' শব্দ কি দেশজ না

কোন সংস্কৃত শব্দজ? 'চেল' শব্দ বস্ত্রের পর্য্যায়ে পাওয়া যায়, চেলী শব্দ চেল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন এরূপ যদি কল্পনা করা যায় তবে ইহা বস্ত্রমাত্রেরই নামান্তর বুঝায়,—রেশমী বস্ত্র এরূপ বুঝায় না। অথচ প্রচলিত 'চেলী' শব্দে 'ক্ষৌম বসন' এ অর্থ কোথা হইতে আসিল ভাবিবার বিষয় বটে।

৩৬। প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হইতেছে। উপসংহারে একটীমাত্র বিষম ঐতিহাসিক ভ্রমের উল্লেখ করিয়া এ যৎকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ শেষ করিব। সে ভ্রম সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বখতিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়। বহুদিন এ ভ্রম লইয়া কোনো আলোচনা হয় নাই। মনে হইয়াছিল এই নিষ্ফলা নির্লজ্জ মিথ্যা যাহা ঐতিহাসিক সত্যের আকার গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখে তাহা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে সম্প্রতি একজন ক্ষমতাশালী বঙ্গীয় চিত্রকর লক্ষ্মণসেনের পলায়ন নাম দিয়া একটি চিত্র আঁকিয়া আবার এই মিথ্যা কাহিনীকে লোকসমক্ষে নূতন আকারে প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে তাঁহার বিচিত্র ক্ষমতাশালী লেখনী এই অসত্যের বিরুদ্ধে চালনা করিয়া বিবিধ প্রবল যুক্তিগর্ভ ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উক্ত ভ্রমকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন। সেই সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক ভ্রম' প্রকাশের পর আবার কেহ এ নির্লজ্জ কথা উত্থাপন করিতে সাহস করিবেন তাহা মনে করি নাই। কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় চিত্রকরের চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচন বিস্ময়কর! তিনি অসঙ্কোচে, অম্লান বদনে এই নির্লজ্জ মিথ্যাকে এই জাতীয় কলঙ্ককে চিত্রের আকার দিয়া স্থায়িত্ব দিতে প্রয়াসী! মধ্যে আবার দেখিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কুশলী শিল্পীও এই চিত্রের বিষয়নির্ব্বাচন সমর্থন করিতে তাঁহার ক্ষমতাশালী লেখনী প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা তাঁহার মত চিত্রকলাকুশল নহি। কোন্‌টা চিত্রবিদ্যার বিষয়, কোন্‌টা নয়, এ সব তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে এটা মোটামুটি বলা যায় যে জাতীয় কলঙ্কই যাহার ভিত্তি,—অসত্যই যাহার প্রতিষ্ঠা—সেই বিষয় লইয়া কোনো চিত্রকরের নিজের কল্পনাকৌশল বা কলাকুশলতা দেখাইবার প্রয়াস আদৌ প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচনা হয় না। কোনো ভাণ করিয়াই এরূপ কার্য্যকে সমর্থন কর যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই 'ভারতী' পত্রিকায় "ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে মিনহাজ্‌ উদ্দীনের এ মিথ্যা রটনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাঁহার তবকাৎ 'নাসিরি' গ্রন্থ—যাহা হইতে এ নির্লজ্জ অসত্যের প্রথম উদ্ভব হইয়াছে ও ইলিয়ট্‌ প্রমুখ ঐ শ্রেণীর ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যাঁহারা নিজ জাতির অযথা মহিমা প্রচার ও সুবিধা পাইলেই এদেশীয়দের কলঙ্ক রটনায় সিদ্ধহস্ত, যাঁহাদের লেখনীগুণে সিরাজ একটী নরপিশাচ ও ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌, একটী নরাকারে দেবতা—ছত্রপতি শিবাজী একটী কপটদস্যু আর ক্লাইভ্‌ একজন ত্যাগী মহাপুরুষ—তাঁহারা এ বিষম ভ্রম, এ কুৎসিত নির্লজ্জ মিথ্যাকে অম্লানবদনে

গলাধঃকরণ করিয়া গিয়াছেন! একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই যে সত্যপ্রিয় মিন্‌হাজ্‌ বখ্‌তিয়ারের এ বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী কোথা হইতে পাইলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা এ ঘটনার কিছুই জানিলেন না—জানিলেন কে? না, বঙ্গবিজয়ের অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বৎসর পরে আগত বিদেশী, সত্যপ্রিয় মিনহাজ্‌,—তিনি জেনে মাঝে ও তাদের বাগ্মীদের মুখে এই "জনরব"(!) জানিয়া নাকি নিজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! কৌতুকের বিষয় এই যে রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষিবর্গ অকাট্য যুক্তি সহকারে দেখাইয়াছেন (৪) যে বক্তিয়ারের সময় বাঙ্গালার সিংহাসনে লক্ষ্মণ সেন থাকিতেই পারেন না, তাঁহার পৌত্র লাক্ষ্মণেয় তখন বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। অথচ, "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক" অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় চিত্ররচনা হইয়া গেল! বঙ্কিমচন্দ্রের পূত পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এ অক্ষম লেখককর্তৃক ও বখ্‌তিয়ারের সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বঙ্গবিজয়রূপ পিতামহীর উপকথা খণ্ডিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও এসম্বন্ধে তাঁর লেখনী চালনা করিয়া, ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। সে সব যুক্তির বিস্তৃতভাবে পুনরবতারণা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠক সে সব প্রবন্ধ অনুগ্রহ করিয়া অনুসরণ করিবেন। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে যখন সাময়িক ইতিহাসে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই—যখন দেখিতে পাই যে পাবেট্, ত্রিপুরা, কাছাড়, জয়ন্তী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বাঙ্গালার অন্যান্য স্বাধীন রাজ্য তখন প্রবল প্রতাপে বর্তমান, তখন কি আমাদের মিন্‌হাজ্‌ ও তাঁহার পদলেহনকারীদের সহিত সমস্বরে চীৎকার করিতে হইবে যে সপ্তদশ মাত্র সৈন্যই বঙ্গবিজয় করিয়াছিল? (যদিও বহু সৈন্য বখ্‌তিয়ার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন একথা স্বয়ং মিনহাজই বলিয়াছেন।) বলিতে হইবে কি যে কেবলমাত্র গৌড়নগর অধিকার করাই বঙ্গবিজয়? এবং সঙ্গে সঙ্গেই অমনি একটা কাল্পনিক ঘটনা—অন্ততঃ যে ঘটনা তর্কের বিষয় ও সন্দেহস্থল, সেই অনিশ্চিত জাতীয় অবমাননাসূচক ঘটনাকে কল্পনার মনোহর আবরণ দিয়া তাহাকে নূতন ভাবে, নূতন আকারে লোক সমক্ষে প্রকাশের চেষ্টা প্রশংসনীয় বলিয়া খাড়া করিতে হইবে? অনেকস্থলে ইহার প্রতিবাদ হইলেও তদুত্তরে কেবল নীরব উপহাস ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে! সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ও সত্যস্থাপনা করিতে হইলে বলবত্তর প্রমাণ প্রয়োগ প্রয়োজন।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

---

(৪) তাঁহার "Indo Aryans" গ্রন্থে "The Sen and the Pal Dynasties of Bengal" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দেখুন।

রাজা।

১

মন্ত্রী রাজাকে বলিল—"মহারাজ সে একটা আস্ত পাগল!"—

রাজা কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "এঁ্যা তাই নাকি?"

মন্ত্রী কহিল "নইলে টাকার আশায় পথের ধারে বসে ভগবানকে ডাকে!—টাকা কি মহারাজ পথের ধুলো যে উড়ে গিয়ে হাতে পড়বে?"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে, কি বলে?"

"সে যা বলে মহারাজ, শুনলে হাসি পায়।"

রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম?"

"সে বলে প্রাণভরে ডাকলে ভগবান নিজে এসে তাকে টাকা দিয়ে যাবেন!"

রাজার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রী খবর নাও লোকটা শঠ কি না!"

মন্ত্রী কহিল "না মহারাজ, লোকটা শঠ নয়—তবে লোকটার মাথা খারাপ।"

রাজার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—বলিলেন "শঠ নয়?—তা হলে লোকটার কি গভীর আস্থা—ভগবানের উপর!"

মন্ত্রী বলিল "মহারাজ, বলেছি ত লোকটার মাথা খারাপ!"

"তা যাই হ'ক—আমি একবার তাকে দেখব!"

"তাহ'লে কাল ঘোষণা করে দেওয়া হ'ক—মহারাজ চণ্ডীপাগলাকে দেখতে যাবেন!"

"না কিছু দরকার নেই!—আমি আর তুমি যাব—আর কেহ নয়।"

২

চণ্ডীপাগলকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি চোখ বুজে সব সময় বসে থাক কেন?"

পাগল মুদিত চক্ষুতেই জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

"আমি কে জেনে কি হবে?"

"না, আমি সকলকে আমার কথা বলিনা!"

রাজা মন্ত্রীর পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি রকম লোককে তোমার কথা বল?"

"যে আমার প্রাণ বুঝবে তাকেই বলি!"

"কি রকম লোকে তোমার প্রাণ বুঝবে মনে কর?"

"যার প্রাণ আছে সেই পরের প্রাণ বুঝবে!"

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাণ আবার কা'র নেই?"

পাগল মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, প্রাণ কি সকলের আছে ভাই,—প্রাণের বাজার বড় আক্রা—বড় আক্রা!"

রাজা মন্ত্রীকে ইঙ্গিতে নিরস্ত হইতে বলিয়া পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম মানুষের প্রাণ আছে মনে কর চণ্ডি?"

পাগল পূর্ব্বের মত মুদিত নেত্রে কহিল "এই তোমার কথাবার্ত্তায় মনে হচ্চে যেন তোমার একটু প্রাণ আছে!"

"তবে বল—তোমার কি কামনা?"

"তার আগে আমার কথার উত্তর দাও—"তুমি কে?"

"কেন তুমিত এই বল্লে যার প্রাণ আছে তাকেই তুমি তোমার প্রাণের কথা বল্‌বে!"

"তবু পরিচয়টা বলতে ক্ষতি কি ?"

তখন রাজার ইঙ্গিতে মন্ত্রী পাগলের নিকট রাজার পরিচয় দিল।

শুনিয়া পাগল আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "রাজা ?—রাজায় আমার প্রাণ বুঝবে ?—না আমি কিছুই বলবনা।"

রাজা তরলকণ্ঠে বলিলেন—"পাগল, রাজা হলেই কি তার হৃদয় জিনিসটি নষ্ট হবে যায় ?"

পাগল রাজার পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিল, "তুমি রাজা—সত্যি ?"

"আমি এই দেশবাসীর সেবক।"

"বাঃ।—তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি।—রাজায় এমন ভাবে কথা বলতে জানে।—আচ্ছা তোমায় আমার কামনা বলব।"

"কি—বল।"

"পৃথিবীতে যাকে আমি সব চেয়ে প্রাণহীন পাষাণ মনে করি—আমি তাই হতে চাই।"

"কি—সে ?"

"রাজা।—সেই জন্যেই ভগবানকে ডাকি।"

"এ অপরূপ সাধ, কেন ?—বিশেষতঃ তোমার ?"

"একবার জানতে বড় সাধ সিংহাসনে বসলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা কেন ?"

"চণ্ডি, কে বলে তুমি পাগল।"

"পাগল নই ?—এতদিন ধরে শুনে আসচি, আমি পাগল, আর আজ তুমি বলছ আমি পাগল নই ?—পাগল না হলে রাজা হবার জন্যে কেউ চোখ বুজে দেশে দেশে পথে পথে বিশ বছর কাটিয়ে দেয় মহারাজ ?"

"হ্যাঁ—বিশ বছর।"

"হ্যাঁ মহারাজ—"

"আর কতদিন এমনি ভাবে কাটাবে ?"

"যতদিন না আমার বাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন।"

"তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তুমি স্থির জান"—

"মহারাজ আমিত আজো সিংহাসনে বসিনি, তবে তাঁর উপর এ অবিশ্বাস আসবে কোথা থেকে ?"

মন্ত্রীর আর ধৈর্য্য রহিল না,—বলিল, "পাগল, মহারাজের সঙ্গে অমন অসম্ভ্রম করে কথা কয় ?"

রাজা মন্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "চণ্ডী ঠিকই বলেচে। আমারই অন্যায় হয়েচে।—যে সরল বিশ্বাসে আঘাত করে সে দস্যুরও অধম।—তারপর পাগলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"চণ্ডী কাল থেকে তুমিই এদেশের রাজা।—চল মন্ত্রী—অভিষেকের আয়োজন করবে।"

"মহারাজ।"

"চুপ কর মন্ত্রী—আমার আদেশ।"

পাগলের মুখ এক স্বর্গীয় শ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৩

চণ্ডী বলিল "মহারাজ আমার রাজ্যলাভ হয়েছে আমি চললুম।"

রাজা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কৈ এখনও তো অভিষেক পর্য্যন্ত হয় নাই।"

"হয়েছে বৈকি। যখনি আপনি ভগবানের নামের গৌরব রক্ষার জন্য একটা পথের পাগলকে আপনার সিংহাসনে বসাতে চেয়েছেন তখনই আমার অভিষেক ও

রাজ্যলাভ হয়েছে!—রাজতক্তে বসে সকলেরই হৃদয় যে পাথর হয়ে যায় না এবং ভগবানের নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করবার লোক আজো যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় এই মহাজ্ঞানই আমার রাজ্যলাভের অধিক—আমি চল্লুম্।"

রাজা কাতরভাবে বলিলেন "যাবে?—কিন্তু বলে যাও তুমি—কে?"

দেখিতে দেখিতে পাগলের চারিধারে একটা জ্যোতির্ম্ময় আভা মণ্ডলাকারে ফুটিয়া উঠিল, এমন সময় অদূরে প্রভাতের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। স্বপ্নমুক্ত রাজা দেখিলেন তিনি আপনার শয্যায় শায়িত।

রাজার লোক চারিদিকে সন্ধান করিল কিন্তু পাগলের কোন সাক্ষাৎ মিলিল না। ইহাতে রাজবাটীর সকলেই প্রফুল্ল হইল—কেবল রাজা বিমর্ষ!

মন্ত্রী কহিল "মহারাজ, বলেছিলাম—ওটা একটা ঘোর পাগল! কি খেয়াল হতেই সরে পড়েছে—আবার হয়ত একদিন এসে উপস্থিত হবে!"

রাজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "না মন্ত্রী, আর তাঁর দেখা পাবনা!"

শ্রীপাচুলাল ঘোষ।

সিন্ধু

অনন্ত বিশাল বপু করিয়া বিস্তার
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে
ভৈরব নিনাদ রঙ্গে
আস্ফালিছ বিশ্বজনে জলধি ভয়াল।
উন্মত্ত আহবে মাতি
গর্জ্জিতেছ দিবারাতি
সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি সতত তোমার,
ভীমনাদে রুদ্র হবে
ডাকিয়া কাতরে সবে
মুক্তি পথে যাইবার এই "স্বর্গদ্বার।"
নাহি ক্লান্তি নাহি ক্লেশ
নাহি দয়া স্নেহ লেশ
কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর আঁধার হৃদয়,
ধর নীল কলেবর
ক্রোধে সদা জর জর
অগণ্য বালুকা নাশ ঘোষিছে প্রলয়,
সহস্র নাগিনী যেন
উগারিয়া শ্বেত ফেন
তীর ভূমে আছাড়িয়া পড়িছে সরোষে,
ব্রহ্মাণ্ড করিতে গ্রাস
জগত জুড়িয়া ত্রাস
তুলিতেছে বাসুকীর গরল নিশ্বাসে।
মথিয়া তোমার বারি
সকলি লয়েছে কাড়ি
দেবগণ, সেই ক্রোধে প্রতিহিংসাসার—
তোমার জীবনে আজি,
কৌস্তভ রতন রাজি
নাহি, লক্ষ্মী তিরোধান ছাড়ি রত্নাকর,
সুধাভাণ্ড গেছে লয়ে
হলাহল ঢালি দিয়ে
তবু হৃদয় আরো অশান্ত করিয়া,
মাতৃহারা হয়ে তাই
মুহূর্ত্তের শান্তি নাই
জগবন্ধু পদাশ্রয় গিয়েছ ভুলিয়া।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ।

আমাদের বর্ত্তমান যুগেই হউক কিম্বা অতীত যুগেই হউক পারিবারিক জীবনের শিক্ষা দান কখনই প্রচলিত নাই। শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা করিতে গিয়া স্পেন্সার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবিকা অর্জ্জনের জন্য লোকে কি বৃহৎ আয়োজন-ই না করিয়া থাকে; কিন্তু সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য সেরূপ উদ্যম ও চেষ্টা প্রয়োজনীয় বলিয়া কেহ মনে করেন না। ছেলেরা সাধারণতঃ ভদ্রলোকের উপযোগী শিক্ষা আয়ত্ত করিতে বহু বৎসর যাপন করিয়া থাকে, এবং মেয়েরা সামাজিকতা রক্ষার জন্য যেটুকু শিক্ষার দরকার সেটুকু অধিগত করিবার জন্য তাহাদের জীবনের পূর্ব্বাহ্ন ক্ষেপণ করে, কিন্তু উভয়পক্ষের কোন পক্ষই—জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় যে—পরিবার গঠন সে সম্বন্ধে, এক ঘণ্টার জন্যও কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না।"

ইহা হইতে আমরা সুস্পষ্ট-ই দেখিতে পাইতেছি যে পারিবারিক কর্ত্তব্যপালনের দুরূহতা সভ্যতম সমাজেও আজও পর্য্যন্ত উচিত মত স্বীকৃত হয় নাই। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জ্ঞান, জ্যেষ্ঠ ও পূজনীয়গণের প্রতি এরূপভাবে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছিল, যে স্নেহভাজন ব্যক্তিরা সেই আতিশয্যের ফলে শূন্যমাত্র লাভ করিয়াছিল। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ কবে শাস্ত্র রচনার সময় এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, দুরত্ববশতঃ সে স্বর-তরঙ্গ তখন তাহার কানে পঁহুছিতে ছিল না, সুতরাং—পিতামাতার সন্তান সম্বন্ধে, জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠ সম্বন্ধে, স্বামীর স্ত্রীর সম্বন্ধে অশেষ কর্ত্তব্য থাকিলেও সে কর্ত্তব্যপালনের কোনো একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল না।

শ্বশ্রূ ও বধূ।—অবশ্য, ইহা হইতে আমরা এমন কিছু প্রতিপন্ন করিতেছি না যে সেকালে জননীগণ সন্তানকে স্নেহ করিতেন না, কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে জননীর স্বাভাবিক যে পুত্রস্নেহ, পুত্রবধূগণ তাহার উপর কিছুমাত্র দাবী করিতে পারিত না। সেকালে পুণ্যলিপ্সু পিতামাতা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিতেন, কিন্তু মাতৃঅঙ্ক-চ্যুত সেই সুকুমারী বালিকা পতিগৃহে আসিয়া তাহার লুণ্ঠিত পিতৃমাতৃ স্নেহ ও সহোদর সহোদরার অপূর্ব্ব প্রীতির পরিপূরক কোনো পদার্থই পাইত না। সেই অসহায় শৈশব পতিগৃহের উপেক্ষা ও অনাদরের ভিতর কিরূপভাবে তাহার দিন কাটিত সেই সর্ব্বজ্ঞ তাহার বিধাতা পুরুষই জানিতেন, পরে যখন সে বয়স্থা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিত তখন শ্বশ্রূমাতা তাহাকে আপনার পরম বাৎসল্যের পাত্রী বিবেচনা না করিয়া বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দেখিতে আরম্ভ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে ছেলের সঙ্গে এ যাবৎকাল তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, বধূ আসিয়া তাহার খানিকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতেছে, এবং তাঁহাদের দিক্ হইতে স্নেহের পাল্লা উঠিয়া গিয়া বধূর দিকে নামিতেছে, সুতরাং আপনার

ভাগে কম পড়িবার ভয়ে তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া সেই প্রাপ্য অংশটুকুকে রক্ষা করিবার জন্য যুঝিতে আরম্ভ করিয়া দিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এইরূপ বিপরীত গতি অবলম্বন না করিয়া তাঁহারা যদি আপনার জীবনের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন তাহা হইলেই তাহার সন্তোষজনক উত্তর লাভ করিয়া এ মিথ্যা ক্ষোভ বিদূরিত করিতে পারিতেন। অবশ্য তাহাতে খানিকটা ঔদার্য্য অবলম্বন করিতে হইত।

স্বার্থবর্জ্জনে সামাজিক বিধান।—পৃথিবীতে সভ্য সমাজ মাত্রেই আপনার সঙ্গে পরের বিনিময়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের এই যে প্রবল শক্তিশালী ক্ষুদ্র "আমি"—যাহাকে প্রতিনিয়তই সে খণ্ডন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু যাহার কবল হইতে আপনাকে সে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিতেছে না, তাহার সঙ্গে সে এই একটি পন্থায় সন্ধিস্থাপন করিয়াছে। তাহার যাহা কিছু নিজের, তাহা সে বিলাইয়া দেয়, যাহার উপর তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই, তাহা লইয়াই সে চিরদিনের ঘরকন্না পাতে। পিতামাতাকে তাই নিজের মেয়ে পরকে দিয়া পরের মেয়ে নিজের করিয়া লইতে হয়, বধূকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহ আপন করিতে হয়, পত্নীকে নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বামীর স্বার্থ গ্রহণ করিতে হয়—এবং জননীকেও তাই পুত্রের উপর হইতে খানিকটা স্বত্ব উঠাইয়া লইয়া "পরের মেয়েকে" একটু জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়; আমাদের এই সামাজিক বিধিগুলির মধ্যে স্বার্থ বর্জ্জনের এই যে প্রশস্ত উদারপথ—আপনার সঙ্কীর্ণতায় যাঁহারা তথায় মিলিত হইতে না পারিয়াছেন, কিম্বা তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা বিধাতার এ সমৃদ্ধিময় জগতে পরম দারিদ্র্যই ভোগ করিয়াছেন এবং আপনার চারিদিকে চরম অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন! তদানীন্তনকালে বধূর উপর শ্বশ্রূগণের যে অমানুষিক অত্যাচারের কথা শোনা যায়, তাহার মূলে এই একটি হেতুকেই আমরা নির্ণয় করিতে পারি। এখন চাকর চাকরাণীকেও কেহ স্বল্প আহার অথবা কদন্ন দিতে পারেন না এবং শ্রম-সম্বন্ধেও যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না, কিন্তু তখন কন্যাসমা বধূকে ক্রীত দাসী অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় অবস্থায় রাখিতে প্রায় কেহ কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার আহার স্বল্প, পরিধেয় কষ্টে লজ্জাবারণক্ষম, গৃহকার্য্যে হাজারো সে নিপুণা হোক্, শ্রমে সে হাজারো অনলসক্ষমতা হোক্, পরিজনের সেবায় সে হাজারো শ্রদ্ধাশীলা হোক্,—তবু তাহার ত্রুটির অন্ত নাই, দোষের সীমা নাই, আচরণের অশোভনত্বের শেষ নাই, তাহার বয়ঃক্রমের অনুপযুক্ত বহু কঠোর কার্য্যের ভারে তাহার কোমল পাণিতল যেরূপ নিষ্পেষিত হইয়া যাইত, তাহার কোমলতর বালিকাহৃদয় তদপেক্ষা বহু কঠোরতর আঘাত ও সংঘর্ষণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইত। হায় অভাগিনী বঙ্গবধূ! গৃহের নিভৃত প্রান্তে, স্নেহবর্জ্জিত কোমলতাশূন্য সহানুভূতির যে গরলদিগ্ধ জীবন তাহাদের—যেখানে তাহাদের দুঃখ দুঃখ বলিয়া কথিত নয়, ক্লেশ, ক্লেশ বলিয়া স্বীকৃত নয়, কঠোরতা কঠোরতা বলিয়া উক্ত নয়, যেখানে

তাহাদের মুখে ভাষা নাই চক্ষে দৃষ্টি নাই, হৃদয়ে হৃদ্বৃত্তির উত্তাপ নাই—সমাজ সংস্কারক হোন্, দেশনায়ক হোন্, ধর্ম্মপ্রচারক হোন্—সেখানে কবে কাহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে! ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বধূর রন্ধনে সামান্য একটু ত্রুটি হইয়াছিল বলিয়া মাতৃসমা শ্বশ্রূদেবী তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠের দ্বারা পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। উপস্থিত বর্ত্তমান যুগেও এখন সেদিন দেখিলাম দ্বিপ্রহরে কর্ম্মক্লান্তা বধূ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করার অপরাধে শ্বশ্রূমাতা তাহার নিদ্রিত অবস্থায় মুখে চোখে লঙ্কাবাটা মাখাইয়া দিলেন। এইরূপ নির্য্যাতন দেখিলে শুনিলে কি ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্বাচরিত সন্ত প্রসূতা কন্যাবধ প্রথাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না!

কিন্তু সাহস করিয়া আজ আমরা বলিতে পারি আমাদের বিংশ শতাব্দীর ভারত হইতে এরূপ দৃশ্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, আমাদের বিলীয়মান যুগের অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নিভৃত অন্তঃপুরকোণ ও রন্ধনশালা হইতে বালিকাবধূর উত্তপ্ত নিশ্বাস ও অশ্রুজল বিদায়গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের উদীয়মান যুগ আমাদের শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে এইটুকু নবসঞ্চয় করিয়াছে, এখন আমাদের বিলীয়মানযুগের সঙ্গে যে সব রত্নরাজি আমাদের জীর্ণদ্বারের সংস্কারহীন বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহিরে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

অভ্যাসের বল ও ইচ্ছাশক্তি।

পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষণের ফলে যদিও ভারতের অনেক মহার্ঘ দ্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে তত্রাচ সত্যের অনুরোধে একথা স্বীকার্য্য যে পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষণের প্রচণ্ড অভিঘাতে নিদ্রিত ভারতবর্ষ অকস্মাৎ তাহার নির্ব্বাপিত কক্ষে জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। নিদ্রার জড়িমায় অবশ হইয়া সে যে শূন্য কক্ষতলে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়াছিল তাহার প্রতি চাহিয়া আজ তাহার কপোলে লজ্জার রক্তিমা সঞ্চারিত হইতেছে! তাহার অতীত দিবসের চির আচরিত কর্ম্মের অভ্যাস যে তাহাকে গাড়ীর চাকার মত আপনার নির্দ্দিষ্ট দুর্গম পথের উপর দিয়া টানিয়া লইতেছিল তাহা দেখিয়া আজ সে আপনার সমস্ত শক্তিকে সচেতন করিয়া দাঁড়াইয়াছে! মৃত মহিমার মুকুট মাথায় দিয়া সে আর আজ আপনাকে জগতের কাছে মহিমান্বিত বলিয়া বিবেচিত করিতে চাহে না, সে যাহা কিছু পাইতে চায় তাহা আপনার বোধশক্তির ভিতরে, চেতনার ভিতরে, কর্ম্মের ভিতরে পাইতে চায়, তাহার ভিতরে যে মহান্ মনুষ্য প্রকৃতি সুপ্ত আছে, তাহাকেই সে আজ জাগাইয়া তুলিতে চায়!

গৃহকর্ম্ম—প্রাচীনা ও নবীনা।

সেকালে পরিচ্ছন্নতা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এখনও প্রাচীনাগণের নিকট অপরিচ্ছন্নতা বিনয়ের নামান্তর। কিন্তু আমাদের শিক্ষিতা নবীনা ভগিনীগণ গৃহকার্য্যে প্রাচীনাগণ অপেক্ষা পরিচ্ছন্নতার পরিচয় প্রদান করা সত্ত্বেও নৈপুণ্যে তাঁহাদের সহযোগিতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

দেশের মহাপুরুষেরা কর্ম্মযোগের সহস্র মহিমা কীর্ত্তন সত্ত্বেও কর্ম্মবিমুখতার স্রোত কিছুতেই ফিরিতেছে না, বিলাসের চঞ্চল বায়ুবেগে তাহা

ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বহিরঙ্গণ ছাড়িয়া পুরাঙ্গণের দিকেও অগ্রসর হইতেছে। প্রসবদক্ষতা তাই এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, কষ্টসাধ্য কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে চায় না, পল্লী-ভৈষজ্য—নানাবিধ গাছগাছড়া লতা পাতা ইত্যাদি এখন অনাদৃত হইয়া বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইতেছে, এবং সহজ অমূল্য—আমাদের পিতামহীগণ যাহা অঙ্গুলি হেলনে বিদূরিত করিয়াছেন, তাহা দরিদ্র গৃহস্থের রুধির শোষণ করিয়া চিকিৎসকের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। একালে মেয়েরা অসম্ভব মাত্রায় বিলাসিতার দিকে ঝুঁকিয়াছে, এইরূপ একটা অভিযোগের মধ্যে খানিকটা সত্যও নিহিত আছে। কিন্তু, একদিন যাহারা নির্বাক সংস্কৃতাধ মনুষ্যের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে এইটুকু সংযম কঠোরতা কি এতই অসাধ্য! আমাদের নবীনা ভগিনীগণ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

বঙ্গের শক্তিশালী কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয় অলঙ্কারপ্রিয়া ভার্য্যার সম্মার্জ্জনার কথা প্রায় তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এমন কি উদ্বাহ কবিতায় ভাবী পাত্রকে সেই ভীষণ ভবিষ্যতের বিভীষিকা দেখাইতেও ক্ষান্ত হন নাই। বিগত যুগেরই হোক কিম্বা বর্ত্তমান যুগেরই হোক, এ সম্বন্ধে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যাঁহারা দুঃখ-তাপ-ক্লিষ্ট পৃথিবীতে রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকে সান্ত্বনা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাঁহারা—অর্থচিন্তাগ্রস্ত ক্লান্তশ্রান্ত আর্ত্ত স্বামীকে সেবা ও সহানুভূতির পরিবর্ত্তে আপনার বিলাস আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য তাড়না করেন, একথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই নাই।

পল্লীশিল্প ও পল্লী-চিত্রকলা। সেকালের মেয়েদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই চিত্রকুশলা ছিলেন। ব্রত উপলক্ষ্যে, পূজা উপলক্ষ্যে, বিবাহ উপলক্ষ্যে তাহার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহা অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। আমাদের সেই সব বাঞ্ছনীয় শোভন পল্লীশিল্প ও পল্লী-চিত্রকলা—ধনী ও দরিদ্রের যাহাতে সমান অধিকার ছিল—কোন্ অপরাধে যে তাহা বর্জ্জিত হইল তাহা বোঝা দায় বটে!

প্রাচ্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব। বিগত শতাব্দীর সহিত বর্ত্তমান প্রাচ্য ভারত তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যশ্রীও হারাইয়াছে। পশ্চিমের উদাহরণ লইয়া এবং দেশগত জল-বায়ু বিভেদের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া খাদ্যা-খাদ্যের বিচার অনাবশ্যক বোধে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ধর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচ্য শাস্ত্রকারগণ স্বাস্থ্যোন্নতির যে নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার অটুট স্বাস্থ্যতেজকে বিনষ্ট করিতেছে। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ অসীম গবেষণা ও অধ্যয়নের ফলে যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব আজ আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা সেই সুদূর কালে সহজ জ্ঞানের মধ্যেই ছিল। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে মনুষ্য শরীরের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে এবং গ্রহ বিশেষের অবস্থান ভেদে আচার্য্য বিশেষের পার্থক্য এবং উপবাসাদি দ্বারা যে তাহা খণ্ডন করা যায়, তাহা বহুকাল হইল তাঁহারা লোক সমাজে

প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ-পূর্ব্ব ভারত এই নিয়মগুলির প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিল বলিয়াই অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ পরমায়ুলাভ করিয়াছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সে যেরূপ কঠোরাচরণ করিত, বিলাস সুকুমার বর্ত্তমান ভারত আজ তাহা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ বিমুখ। অথচ প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আজ সমস্বরে তাহার কাণের কাছে বলিতেছে "উপবাস মনুষ্য শরীরে রোগ-বীজাণুর ধ্বংস সাধনের প্রধান উপায়! রোগ ভোগ অপেক্ষা রোগ দমন করার কষ্ট তাহার কাছে আজ কঠোর হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান ভারত।—সত্য বটে আমাদের পিতামহগণ চরিত্র-নীতির উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, কিন্তু তত্রাচ ইহা স্বীকার্য্য যে সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাদের প্রশংসনীয় ছিল। শাঠ্য, ধূর্ত্ততা, পরপ্রবঞ্চনা এক রকম ছিলই না, আমাদের উদীয়মান ভারত এই ত্রিবিধ পাপে বিষম জড়িত হইয়া পড়িতেছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তখনকার সময়ে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এরূপ দুষ্কর ছিল না, শস্য সুপ্রচুরা মেদিনীর অভাবক্লেশ-বর্জ্জিত সন্তানগণ লব্ধদ্রব্য সম্ভারের সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়াছে। ভারতের শস্যোৎপাদিকা শক্তি যতই কমিয়া যাইতেছে, পণ্যদ্রব্য ততই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। উদরান্নের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া লোক আপনার সহোদর ভ্রাতার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেও আজ কুণ্ঠিত নয়! তাই স্বল্পে তুষ্ট ভাব আর এখন নাই, বৃহৎ লাভের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা লোকের ধর্ম্মবুদ্ধিকে শোচনীয়রূপে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে, যাহা আপাতমধুর ও আশু ফলদায়ক, তাহারই জন্য সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের দৃষ্টি একদিন স্থূল জগতের তিমিরাবৃত যবনিকা ভেদ করিয়া ভুবর্লোক স্বর্লোক প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছে, তাঁহারা আজ আপনার স্বার্থকামনার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন! আমাদের পিতামহীগণ মাননীয় ও পূজনীয়গণের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পরিমাণে যত্ন ও সুশাসন যদি তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিতেন তাহা হইলে হয়ত এরূপ ঘটত না। পতিগৃহে সংসারভার মাথায় লইয়া তাঁহারা সংসারের সকল ব্যাপারই সুনিপুণ ভাবে চালাইয়াছেন, কেবল এ সম্বন্ধে দৃক্‌পাত করেন নাই। আমাদের সমাজ বিধাতৃগণ সকল বিধানের সুব্যবস্থা করিয়া কেবল ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে "নারীর স্বার্থ পুরুষের নিজের স্বার্থ। যদি তাহারা উন্নতির পথে উত্থান করে তবে পরস্পরের হাত ধরিয়াই করিবে, যদি অধঃপতনের পথে নামে তবে তাহাদের সম্মিলিত বাহুই তাহাদের একত্র টানিয়া নামাইবে, উচ্চতায় হোক্ আর ক্ষুদ্রতায় হোক্, তাহারা এক সঙ্গে তথায় পঁহুছিবে। নারী যদি সঙ্কীর্ণচিত্ত ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় তবে তাহার গর্ভজাত পুরুষ কি করিয়া উন্নতির আশা করিবে?" এখনও যদি আমাদের নবীনা জননীগণ এবং তাহাদের ভাগ্যবিধাতৃগণ একথা বিস্মৃত হইয়া চলেন এবং শিশুদের চরিত্র-শিক্ষার প্রতি পূর্ব্ববৎ ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তবে ভবিষ্য-ভারত

বিগত কালের লুপ্ত কুফলের পুনরাস্বাদ করিবে সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নয়, বর্ত্তমান ভারত তাহার এই দুর্ব্বল ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া যদি একবার বিপথে স্খলিত হইয়া পড়ে তবে সে আর পুনরুত্থান করিতে পারিবে না। যে বৃহৎ শক্তিতে সে একবার বৃহত্তম পাপকেও লঙ্ঘন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে শক্তি তাহার এখন নাই, এখন যদি সে গোষ্পদেও পতিত হয়, তবে তাহাও তাহার পক্ষে লঙ্ঘন অসাধ্য হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারব্ধ প্রতিক্রিয়া।—আমাদের উদীয়মান যুগের বধূগণ এখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নম্রতা ও বশবর্ত্তিতা প্রভৃতির পরিচয় দিতেছে না, প্রাচীনাগণের মুখে এরূপ অভিযোগ অত্যধিক মাত্রায় শোনা যাইতেছে। অবশ্য যদি কেহ এরূপ ধৃষ্টতা ও দুর্নীতির পরিচয় প্রদান করে তবে তাহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বিগত যুগে বধূগণ যাহা সহ্য করিয়াছে, প্রাকৃতিক নিয়ম বশে বর্ত্তমান যুগে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যদি কোনো বৎসর শস্য অপর্য্যাপ্ত হয়, পর বৎসর শস্য জন্মায় না, এবং যে বৎসর বৃষ্টি আদৌ হয় না তাহার পর বৎসর জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। যে বৎসর যাহার আতিশয্য ঘটে পর বৎসর তাহার স্বল্পতাবিধান করিয়া প্রকৃতি তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া থাকেন। আমাদের জীবন আমাদের প্রকৃতি জননীর সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য নহে, একই শক্তি যে একই প্রণালীতে জড়জগতে ও মনোজগতে কাজ করিতেছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নিগৃহীত কনিষ্ঠদের ও স্নেহভাজন ব্যক্তিদের এ যুগে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, বধূরা পারিবারিক মর্য্যাদার ভিতর তাহাদের বিধি নির্দ্দিষ্ট স্থান দাবী করিতেছে, পুত্র পরিজনের শাসন উপেক্ষা করিয়া আপনার পথ নির্ণয় করিয়া লইতেছে, চাকর চাকরাণী এবং সমাজের নিম্নস্তর—এ যাবৎকাল যাহারা জড় পদার্থবৎ উচ্চতর সমাজ সমূহের যথেচ্ছাচার অম্লান বদনে সহিয়া আসিতেছিল, তাহারা তাহাদের মাথার উপর পুঞ্জীকৃত অনুশাসনের স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া সদর্পে জগতের অপরাপর জাতির সহিত সম্মিলিত হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রুদ্ধস্রাব আগ্নেয়গিরির আকস্মিক বিদারণের মত সমগ্র সমাজ আমূল কম্পিত করিয়া তাহাদের সেই দীর্ঘকাল সঞ্চিত অন্যায় ও অত্যাচারের ফল উত্তপ্ত লাক্ষা প্রবাহের মত উৎকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আজ আর তাহাকে অবহেলা করিবার যো নাই, তাহার মুখের উপর দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবার পথ নাই, আজ সমগ্র বঙ্গদেশময় ত্রাসসূচক ধ্বনি পড়িয়া গিয়াছে "সামাল! সামাল!" আজ সকলে শঙ্কিত নেত্রে নিয়ম ভঙ্গকারীর প্রতি রোষোদ্গীরণ করিয়া তাকাইতেছে, কিন্তু হায়! এ যে আঘাতের প্রতিঘাত—এ যে বিধাতার বিধি—ইহাকে নিরোধ করিবে কে? শাসনে যতই বেষ্টন করা যাক্ দুর্ব্বলেরো যে বল আছে, এবং আপনাকে যতই বড় মনে করা যাক্ উপরে যে ভগবান আছেন, আমাদের শক্তিমদমত্ত সমাজ-বিধাতৃগণ যতদিন এ কথা না স্বীকার করিয়া লইবেন ততদিন ইহার প্রতিকারের পথ নাই—এ কথা যেমন সত্য, অপর পক্ষে

এ কথাও তেমনি সত্য যে, যে কারণেই হোক, নিয়ম যে লঙ্ঘন করিবে, বিশ্ব জগতের বিধান অনুসারে নিয়মভঙ্গের যে ফল—তাহা হইতেও তাহাদের অব্যাহতি নাই। অহমিকায় স্ফীত হইয়া কিম্বা আত্মসুখচেষ্টায় অন্ধ হইয়া বর্ত্তমান ভারত যদি সগর্ব্ব পদক্ষেপে কল্যাণকে লঙ্ঘন করিয়া চলে, তবে তাহার অভ্যুত্থানের নবীন প্রভাত অচিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং বিংশ শতাব্দীর অবসানে নব শতাব্দীর উষা তাহাকে "যে তিমিরে সে তিমিরেই" মগ্ন দেখিয়া বিশ্ব-সকাশে নতমুখী হইয়া দাঁড়াইবে!

মানুষের শক্তির নির্দ্দিষ্ট মাত্রা।—মানুষ শক্তির একটা বিশেষ মাত্রা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়। তাহার হাতের সেই মূল ধনটুকু হইতে যদি কোনো দিক দিয়া সে একটু বেশী খরচ করিয়া ফেলে, তবে অন্য দিকে খরচের বেলায় তাহার অভাব পড়া সুনিশ্চিত। বিদ্যায় যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সাংসারিকতায় সে তত প্রখরতা লাভ করিতে পারে না, সাংসারিকতায় যে অতি মাত্রায় নিপুণ, মানুষের অন্য সব বাঞ্ছনীয় গুণাবলীতে সে বঞ্চিত। সাহসিকতায় যে অতুলনীয়, স্নেহ তাহার অগভীর, স্নেহ যাহার অত্যন্ত সাহসিকতা তাহার প্রশংসনীয় নহে। মনোবৃত্তির মধ্যে একটি দিক অতি পুষ্ট হইয়া উঠিলে সেই প্রাচুর্য্যের অনুপাতে অপর দিকে সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর সামঞ্জস্য দ্বারা মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে প্রাচীন ভারতবর্ষ উপদেশ দিয়াছিল। কোনো মনোবৃত্তিকেই বাদ দিয়া নয়, কোনোটির অপর্য্যাপ্ত বৃদ্ধিতেও নয়, প্রত্যেক মনুষ্যোচিত গুণকে অনুশীলনের দ্বারা পরম পরিণতির ভিতরে লইয়া যাওয়াই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এই সামঞ্জস্য সাধনার পথ হইতে স্খলিত হইয়া একের আতিশয্যে যখন অন্যটিকে অভাবগ্রস্ত করিয়া তুলিল, তখনই তাহার বিশ্ব-বন্দিত স্বর্ণযুগের গৌরবোদ্ভাসিত দিবা অবসান হইল!

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের গন্তব্য পথ।—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরেকবার এই মহান্ সামঞ্জস্য সাধনার সুর বঙ্কিমবাবুর পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর নাদে ভারতের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তন্দ্রাতুর প্রাচীন ভারত স্বপ্ন জড়িত চক্ষে ঝিমাইতেছিল। নগরোপকণ্ঠে ধ্বনিত তূর্য্যধ্বনির মত কেহ সে স্বর শুনিতে পাইল কেহ পাইল না! আজ পুরাতন ও নূতনের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাত লাভ ও ক্ষতি বিনাশ ও সৃষ্টির দিকে চাহিয়া বর্ত্তমান ভারত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিহ্বল চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে এই অনাবশ্যক আতিশয্য ও স্বভাববিরুদ্ধ স্বল্পতা এই দুইকে একান্তভাবে পরিত্যাগ করিয়া, যাহাকে যেখানে রাখা কর্ত্তব্য এবং যাহাকে যতটুকু দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাকে সেখানে রাখিবার ও সেটুকু দিবার ক্ষমতা লাভ না করিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার দুর্দ্দশা হইতে দুর্দ্দশান্তরে ভ্রমণ অনিবার্য্য!

শ্রীআমোদিনী ঘোষজায়া।

ভিতর গড়।

ভারত বক্ষে যে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে বোধ হয় এরূপ স্থান অতি অল্পই আছে যথায় কোন না কোন প্রকার ইতিহাস সম্পর্কিত প্রাচীন কীর্ত্তি দৃষ্টি গোচর না হয়। উত্তর বঙ্গে যেন আবার এইরূপ কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ সংখ্যাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দীর্ঘিকাতৃণগুল্মবৃক্ষাদি সমাকীর্ণ হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত তাহাদের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। কালের ক্ষয়কারী তাড়নায় তাহারা জরাজীর্ণ হইয়াছে; আর কত কাল এই তাড়না সহ্য করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব টুকু রক্ষা করিতে পারিবে কে জানে?

এই ভগ্নাবশেষসকলের অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক তথ্য অতীতের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। কোন্ অতীতের কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সব মহান কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন লিখিত বিবরণ আমাদের হস্তে আসিয়া পৌঁছে নাই; কিন্তু সেই সকল অজ্ঞাতনামা মহাপুরুষ যে অতি ভীমকর্ম্মা ছিলেন ও অন্যান্য ইতিহাস বিশ্রুত মহাপুরুষদের সমসাময়িক ছিলেন অদ্য তাঁহাদের অতীত কীর্ত্তি সকলের ধ্বংসাবশেষ অতি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট স্বরে বলিয়া দিতেছে। আজ আমরা এইরূপ একটি পুরাতন নষ্ট গৌরবের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি, তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ঐরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্পন্ন করিতে কত শ্রম, কত সময় ও কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

জলপাইগুড়ী জেলায় বোদা ও সন্ন্যাসীকাটা নামে দুইটি পরগণা আছে। এই দুইটি পরগণারই কতকাংশ লইয়া ভিতর গড়। সম্প্রতি আমরা উহা যে অবস্থায় দেখিতেছি ও যে স্থানে উহার পরিখা ও মৃৎ প্রাচীর বর্ত্তমান রহিয়াছে সে স্থান জলপাইগুড়ী সহর হইতে আট দশ মাইল দূরে অবস্থিত। তালমা নাম্নী ক্ষুদ্র গিরি-সরিৎ আজ এই মৃত্তিকা প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু হাণ্টার সাহেব এই ক্ষুদ্র নদীটিকে দুর্গ-মধ্য-প্রবাহিণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তালমা যথায় প্রবাহিত, তথায় দুর্গের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। হাণ্টার মহোদয় এই দুর্গ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দর্শন করেন; তাঁহার বর্ণনানুসারে যদি এই নদীটিকে দুর্গ-মধ্য-প্রবাহিণী বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে এই দুর্গটিকে প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ ও আট নয় মাইল প্রস্থ বলিতে হয়। পরন্তু, এই হিসাব ছাড়িয়া দিয়াও, আমরা বর্ত্তমানে যাহা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতেও এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে সাত মাইল ও প্রস্থে প্রায় পাঁচ মাইল হইবে; অথবা, অন্য প্রকারে বলিতে গেলে, এত বড় সহর সমগ্র ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে দুই একটির অধিক নাই। হাণ্টার সাহেব ইহাকে মহানগরী (city) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা

ইহাকে গড় অথবা দুর্গ বলিতেছি; কারণ পরে দর্শাইব।

দুর্গটি একটি সমকোণ বিশিষ্ট সরল রৈখিক ক্ষেত্র, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে প্রায় সাত ও পাঁচ মাইল। অধুনা যেমন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমে প্রায় বিশ ফুট প্রশস্ত একটি পরিখা পার হইতে হয়। তাহার প্রায় পঞ্চাশ ফুট পরে প্রথমোক্তটির ন্যায় আর একটি, ও তদ্‌পর অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবিষ্ট ও অল্প পরিসর আরও তিনটি পরিখা বিদ্যমান। এই পাঁচটি পরিখা পার হইয়া অল্প কিছু দূর গমন করিলে আর একটি পরিখা, ইহার প্রসার পঞ্চাশ ফুটের ন্যূন নহে। পূর্ব্বোক্ত পরিখা সমূহের গভীরতা এখন বিশেষ কিছুই নাই। তীর প্রদেশ, লতা, গুল্ম, তৃণ ও অন্যান্য নাতি বৃহৎ স্থানীয় বৃক্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে। এই পরিখাময় ভূভাগের পরই এক বৃহৎ মৃৎপ্রাচীর দুর্গটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি করা যায় তত দূরই সুবৃহৎ অজগরের ন্যায় সরল ভাবে লম্বমান এই বিশাল প্রাচীর-দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই প্রাচীরের পরই লম্বাদিকে এক মাইল ও চওড়া দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ধান্য ক্ষেত্র পার হইলে অনুমান বিশ ফুট প্রশস্ত আর একটি পরিখা। ইহারও গভীরতা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গুলির ন্যায় ও ইহার পর ইষ্টক প্রাচীর। এই প্রাচীর সকল এক্ষণে প্রাচীরত্ব হারাইয়া ইষ্টক মিশ্রিত লোহিত স্তূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ আপনাদের ও গবাদির গতায়াতের সুবিধা জন্য স্থানে স্থানে কাটিয়া পথ করিয়া লইয়াছে; তদ্‌ব্যতীত সমস্ত অংশ অবিচ্ছিন্ন ও প্রায় সমোচ্চ রহিয়াছে। তদ্‌পর লম্বা ও চওড়া দিকে যথাক্রমে আট শত ও চার শত ফুট ধান্যক্ষেত্র পার হইলে এক তড়াগোপম বৃহৎ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্যক; কেন না তাহা হইলে, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ অজ্ঞাতনামা পুরুষের দ্বারা এই সুবৃহৎ জলাশয় এইরূপ সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যস্থলে খনিত হইয়াছিল তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ চিন্তা করিবার সুবিধা পাইবেন।

দীর্ঘিকাটিকে স্থানীয় লোকে "মহারাজা দীঘি" বলিয়া থাকে। উহা উত্তর দক্ষিণে ১১৭৫ ফুট ও পূর্ব পশ্চিমে ১০০০ ফুট। হণ্টার মহোদয় ইহার পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে যথাক্রমে ৮০০ শত ও ৭০০ শত গজ বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, আমরা ফিতা দ্বারা মাপিয়া দেখিয়াছি। ইহার পাহাড়ের উচ্চতা কোন স্থানে ত্রিশ ফুট আবার কোন স্থানে বা পঞ্চাশ ফুট, এবং পাদদেশের প্রশস্ততা কোন স্থানেই এক শত দশ ফুটের ন্যূন নহে। শীর্ষ প্রদেশের প্রশস্ততাও প্রায় সর্ব্বত্রই পঁচিশ ফুট। বস্তুতঃ এই প্রকাণ্ড তীর পাহাড়বৎ প্রতীয়মান হয় ও উহার চূড়া প্রদেশে আরোহণ করিতে পর্ব্বতা-রোহণের ন্যায় ক্লান্তি বোধ হইয়া থাকে। তীরস্থিত এই প্রভূত মৃত্তিকারাশি দৃষ্টে বিশাল দীর্ঘিকাটির গভীরতার বিষয়ও কিঞ্চিৎ অনু-ধাবন করা যাইতে পারে।

এই জলাশয়ের মোট দশটি অবতরণিকা

অথবা ঘাট আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমধারে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি এবং উত্তর ও দক্ষিণধারে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি। পূর্ব্ব-ধারের তিনটি ঘাট ব্যতীত অন্যান্য সাতটি ঘাটই ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। হাণ্টার সাহেব পূর্ব্বদিকের ঘাঠগুলিকেও ইষ্টক নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এখন ইষ্টকাদির বিশেষ চিহ্ন কিছু দেখা যায় না। ঘাটগুলি সরোবরের বিশালতারই অনুরূপ; বিশেষতঃ পার্শ্বের অবতরণিকা সমূহের জঙ্গলাচ্ছন্ন অথচ অভগ্ন অংশের গঠন প্রণালী দেখিয়া এরূপ মনে হয় যে উহারা ছাদ বিশিষ্ট গৃহের ন্যায় ছিল; হয়ত কত সুন্দরী সমাগমে ঐ গৃহ সকল আলোকিত হইয়া

মহল গড়ের ভগ্নাবশেষের একাংশ।

উঠিত, এবং কত ঋত্বিক কণ্ঠো-চ্চারিত স্তোত্র গানে তাহারা পবিত্র শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিত।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ৫০০ শত ফুট ৯০০ শত ফুট ও ১৩০০ শত ফুট এবং উত্তর দক্ষিণ দিকে ৩৫০ ফুট ও ৬৫০ ফুটের উপর এক একটি করিয়া ঘাট সন্নিবিষ্ট। ইহার দক্ষিণ পারের পশ্চিম দিকের ঘাটের উপর একটি একুশ ফুট পরিধি বিশিষ্ট বটবৃক্ষ। বৃক্ষটির চতুর্দ্দিক ইষ্টক দ্বারা বাঁধা ছিল, এখন গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও ইষ্টকরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ স্থানে এখনও বারুণী স্নান ও মেলা হইয়া থাকে।

দীঘিকাটি সর্ব্বতোভাবে আবর্জ্জনা শূন্য। কোন প্রকার জলজ বৃক্ষ ইহাতে আজও পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে নাই। জল অতি পরিষ্কার। এরূপ পরিষ্কার জল অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সুবিশাল

বারিবক্ষ যখন পবনান্দোলিত হইয়া বীচি-বিক্ষোভিত হইতে থাকে, তখন সেই গাম্ভীর্য্যের নিকট হৃদয় স্বতঃই নত হইয়া পড়ে ও মন অতীতের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে অজ্ঞাতের চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ সন্ধ্যার গাঢ়-ছায়ায় সে দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে সে আর কখনই ভুলিতে পারিবে না। বারি রাশির ঐরূপ অনাবিলতায় গ্রামবাসীগণ দেবত্বের আরোপ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তলপ্রদেশ বালুকাময় হওয়াতেই জলও পরিষ্কার রহিয়াছে এবং ইহাতে কোন রূপ জলজ বৃক্ষ বা আবর্জ্জনাও জন্মিতে পারে নাই। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, কোন প্রকার মৎস্যের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। যে কোন জলাশয়ে এমন কি ক্ষুদ্র ডোবাতে পর্য্যন্ত অন্ততঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যও বিচরণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু এই সুবৃহৎ জলাশয়ে, আমরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কোন বৃহৎ মৎস্যের কথা দূরে থাকুক, অতি ক্ষুদ্র কোন একটি মৎস্যও দেখিতে পাই নাই। ইহার কারণ কি? এ বিষয়টি কি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত নহে? গ্রামবাসিগণ দীর্ঘিকাটিকে অতি পবিত্র মনে করে এবং সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাতে তাহারা কদাচ মল মূত্র ত্যাগ করে না কিম্বা কোন প্রকারে ইহার অবমাননা করে না। আমাদের সঙ্গের হাতীর মাহুতেরা জলে 'এঁটোপাত' ফেলিতে উদ্যত হওয়ায়, সেই স্থলে উপস্থিত কয়েকজন গ্রামবাসী তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিয়াছিল। শুনা গিয়াছে তাহারা এ জলে নামিয়া মুখ পর্য্যন্ত ধৌত করে না; তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে পীড়া হয়।

দীর্ঘিকার প্রতি স্থানীয় লোকের এইরূপ সম্মানের ভাব কোথা হইতে আসিল? আমরা ইহার উত্তরে বলিতে চাই যে দুর্গ-বাসিদের পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ ইহা খনিত হইয়াছিল এবং দুর্গ অবরোধ কালে উত্তম পানীয় জলের অভাব না হয় এইজন্য জন সাধারণ ইহার কোন প্রকার আবিলতা সম্পাদনে বিরত থাকিত। কাল সহকারে এই ভাব, ভয় সংযুক্ত ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন পুণ্যতোয়া ভাগিরথী অশেষ মঙ্গল বিধায়িনী বলিয়া সরল বৃদ্ধ হিন্দু-হৃদয়ে মুক্তিদায়িনী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন—ইহাও তেমনি জীবনরূপ মঙ্গল রাশি বিতরণ করিয়া দুর্গবাসিদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সরল মধুর শ্রদ্ধা ভক্তিটুকু আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে জল যখন অত্যন্ত কমিয়া যায়, সেই সময় দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ জলের উপর প্রায় আধ হাত কি এক হাত উচ্চে ভাসিয়া উঠে। স্থানীয় লোকে বলে, জল মধ্যে এক মন্দির আছে, তাহারই চূড়া দেখা যায়। পূর্ব্বকালে অনেক দীর্ঘিকা অথবা সরোবরের মধ্যস্থলে দেব মন্দির কিংবা বিলাসভবন নির্ম্মিত হইত। সেইরূপ একটি মন্দির অথবা ভবন হয়ত এখানেও ছিল, ভূমিকম্প অথবা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে নিমজ্জিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা এই চূড়াকার দ্রব্যটি দেখিতে পাই নাই; কারণ

আমরা কার্ত্তিক মাসে ঐ স্থানে গিয়াছিলাম; তবে আমাদের অন্যান্য বন্ধুগণ, যাঁহারা গ্রীষ্ম সময়ে তথায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে উহা একটি কাষ্ঠ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দীর্ঘিকার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত আর একটি স্থান। স্থানীয় লোকে ইহাকে "মহলগড়" বলিয়া থাকে। এই স্থানটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ২০০০ ফুট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১০০০ ফুট হইবে। ইহারই মধ্যস্থলে আবার দুই দিকে পরিখা বেষ্টিত আর একটি স্থান। পরিখার উপরেই ইটের কাজ; বোধ হয় প্রাচীর ছিল, অথবা পরিখার উপরেই অট্টালিকা উত্তোলিত হইয়াছিল। তার পর একটি চুণ-সুরকি-ইট-মিশ্রিত অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান, সম্প্রতি এইস্থলে মাষ কড়াই আবাদ হইয়াছে। এই স্থানে যে নিশ্চয়ই একটি ইষ্টক গৃহ ছিল তাহা আজিও স্পষ্ট-ই বুঝা যাইতেছে, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আর বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। আমাদের বোধ হয় চাষের দ্বারা এরূপ বহু চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। এই স্থানের পশ্চিম পার্শ্বে এক ইষ্টক স্তূপ। কিন্তু এক স্থানে রোয়াকের এক অংশ এখনও অভগ্ন রহিয়াছে। গাঁথনি এমনই শক্ত যে আমরা টানাটানি করিয়া তার একটুকুও ভাঙ্গিতে পারি নাই। এই রোয়াক এবং স্তূপ অতি দীর্ঘ ঘাসাচ্ছাদিত। ইহার পশ্চিম উত্তর কোণে আর একটি স্তূপও ঐরূপ ঘাসাচ্ছাদিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। উত্তর দিকে আর একটি স্তূপ; এটি প[illegible] এটি কোন মঠাকৃতি ইষ্টক গৃহ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উত্তর দিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা একটি ছোট পুষ্করিণী। কোন মুসলমানের খোদিত কি? ইহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে দীর্ঘ-তৃণ-সমাকীর্ণ দুইটি উচ্চ স্থান। মহলগড়ের ভিতরে এখন চারিটী পথ দেখা যায়। পথ-গুলির অনেকাংশ ইষ্টকময়। পথ চারিটি পূর্ব্ব হইতেই ছিল কি পরবর্ত্তীকালে করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা এখন অতি কঠিন। পূর্ব্বদিকের প্রাচীর কাটিয়া যে স্থানে পথ হইয়াছে সে স্থানে যেন একটি থামের গাঁথনি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতেই মনে হয় এই স্থানে, অথবা কয়েকটি পথেই, খিলানদ্বার ছিল। পূর্ব্ব দ্বারের অনতিদূরেই একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন পুষ্করিণী রহিয়াছে; ইহার নাম "ফুল পুকুর।" চারি পার্শ্বে চারিটি ঘাট, সমস্ত বৎসর জল থাকে, শুকায় না; পুষ্করিণীটি সমচতুষ্কোণ। পুকুরে যাইতে হইত বলিয়া এখানকার তোরণের একটু বিশেষত্ব থাকা অসম্ভব নয়। ইহার দক্ষিণ দিকে প্রায় ১০০ শত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া এক আম্র কানন।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকগুলি প্রায় ভগ্ন। উহার মধ্যে যে গুলি অভগ্ন রহিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় ইট দুই প্রকারের। এক প্রকার, নয় ইঞ্চি দীর্ঘ, আট ইঞ্চি প্রস্থ, দেড় ইঞ্চি পুরু ও অন্য প্রকার নয় ইঞ্চি দীর্ঘ, সাড়ে চার ইঞ্চি প্রস্থ ও দেড় ইঞ্চি পুরু।

ভিতর গড়ের দুই একটি বৈশিষ্ট্যের কথা না বলিলে এ স্থানের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দীর্ঘিকার দক্ষিণ দিকে

এক স্থানে শুধু এক লজ্জাবতী বন। এক স্থানে এত বহুসংখ্যক লজ্জাবতী আমরা আর কুত্রাপি দর্শন করি নাই। কে যেন কয়েক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া এই লতার চাষ করিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই স্থান ব্যতীত গড়ের অন্যত্র কোথায়ও আমরা আর একটিও লজ্জাবতী দেখিতে পাই নাই। আর একটি বৈশিষ্ট্য, এই গড়ের লেমন ঘাস (Lemon Grass)। জলপাইগুড়ীর ঐ প্রদেশে ঐ তৃণ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই গড়ে যত এত আর কোথাও দেখা যায় না। যে স্থানে কোন ভগ্ন স্তূপ বা উচ্চ ভূমি, সেই স্থানই এই তৃণসমাকীর্ণ ও স্থানে স্থানে তাহারা এমন সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে ব্যাঘ্রাদি অন্যান্য শ্বাপদ তো দূরের কথা, অতিকায় হস্তী পর্য্যন্ত তাহাতে লুকাইয়া থাকিতে পারে। আর সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমগ্র দুর্গ মধ্যে দুই স্থান ব্যতীত অট্টালিকা প্রভৃতির বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এরূপ হইবার কারণ কি? হাণ্টার সাহেবের ন্যায় ইহাকে মহানগরী বলিতে হইলে, ইহার অভ্যন্তরে বহু অট্টালিকা, বহু দেবালয়, বহু আপণ, বহু বিপণি প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল এরূপ কল্পনাও করিতে হয়; এবং তাহা হইলে ঐ সমস্তের চিহ্ন পর্য্যন্তই বা দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমাদের বোধ হয় কোন রাজা—খুব সম্ভব তিনি ভগদত্তবংশীয়,—কামরূপ হইতে আসিয়াছিলেন; শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে এক সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহারই পরিখা ও প্রাচীর সকল মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মহলগড় নাম হইতে বুঝা যায়, ঐ স্থানে রাজান্তঃপুর ছিল। কিন্তু ভগ্ন চিহ্ন যাহা রহিয়াছে—তদৃষ্টে ইহাকে রাজান্তঃপুর তো দূরের কথা, রাজার কোন একটি পদস্থ কর্ম্মচারীরও ভবনের ন্যায় বোধহয় না; বরং এটি দেবালয় ছিল এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হাণ্টার মহোদয়ও এটিকে দেবালয় বলিয়াই অনুমান করেন। কিন্তু তিনি যেস্থানে রাজবাড়ীর নির্দ্দেশ করেন, দুঃখের বিষয়, যেস্থানে আমরা কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। মোটের উপর, এই স্থানটির ঐতিহাসিক রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের উত্তরবঙ্গ শাখা-সমিতি আজকাল এই প্রদেশের অনেক স্থানের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, এই গড়টির প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ভিতরগড় এই নাম কোথা হইতে আসিল? ভিতরগড় বলিলেই যেন আবার একটি বাহির গড়ও ছিল, এরূপ প্রত্যাশা মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। বারান্তরে ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ।

শিবপূজা

প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রতিমা।

মেয়েটি ছিল অপরূপ রূপসী। তাহার অঙ্গে ছিল ফুলের লাবণ্য, তাহার গতিতে ছিল বসন্তের হাওয়া।

দেশের লোক তাহাকে দেখিয়া পাগল হইয়া গেল। সকলে স্বপ্নে তাহাকেই দেখে, গানে তাহারই স্তব করে। কেহ বা তাহাকে বলিত দেবী কেহ বা তাহার নাম খুঁজিয়া পাইত না।

রাজা বলিলেন—"উহাকে না পাইলে আমার রাজ্য কিসের?" রাজপুত্র কহিল—"উহাকে না পাইলে আমার জীবন বৃথা!" দেবালয়ের পুরোহিত কহিল—"মেয়ে তো মানবী নয়, ওতো শাপভ্রষ্ট দেবী। উহাকে দেবতার মন্দিরে আনিয়া রাখিব।"

সকলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল—"না, সে হইবে না। তাহা হইলে মন্দির ভাঙিয়া ফেলিব।"

মেয়েটি জানালার কাছে বসিয়া ভাবে—আমার মধ্যে কী আছে! কেন লোকে এমন করিয়া পাগল হয়!

সে তো কিছুই বুঝিতে পারিল না। যতই না বুঝিল ততই তাহার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমাকে সকলে যেমন করিয়া দেখিতেছে আমাকে কে আমার কাছে তেমন করিয়া দেখাইতে পারে!

সে সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কী দেখিতেছ! কী চাও!"

তাহারা উন্মত্ত, ভালো করিয়া কিছুই বলিতে পারে না। কেবল বলে—তোমাকেই চাই!

মেয়েটি আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাকে কেন চায়? আমি তো দশজনের মধ্যেই একজন—আমাকে লইয়া কী হইবে?

অনেক ভাবিল, কিন্তু কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। প্রশ্নের বেদনায় ব্যাকুল দুই চক্ষু আকাশের দিকে তুলিয়া সে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি শুধু একটা রত্নের কৌটা! আমার মধ্যে কি আছে তাহার কোনো মূল্য জানি না?"

আকাশ হইতে একটি বাণী আসিল—যে তোমাকে চায় না, যে তোমার কাছ হইতে দূরে আছে, সেই দেখাইয়া দিতে পারিবে, তুমি কী।

কে আছে তেমন যে তাহাকে চায় না! সে লোককে সে খুঁজিতে লাগিল। সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে চায় না এমন লোক এ দেশে কে আছে?"

শুনিতে পাইল, তেমন একজন লোক তাহার ঘরের পাশেই আছে। পাথর কাটিয়া সে মূর্ত্তি গড়ে, কেহ তাহার সে মূর্ত্তির কোনো খবরও লয় না। কতবার দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে, ঘর হইতে সে বাহির হয় না। যখন লোকে মনে করে হয় তো বা সে মরিয়াছে তখন দেখা যায় ঘরের বাহিরে সে ভোলা মনে বসিয়া আছে!

একদিন সকাল বেলায় সেই শিল্পীর দ্বারে আঘাত পড়িল। সে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, প্রভাতের আলোতে পৃথিবীর সেই কামনার ধন তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া। শিল্পী একটু হাসিল।

মেয়েটি মাথা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"সবাই আমাকে চায়, তুমি আমাকে চাওনা কেন ?"

সে বলিল—"সবাই যাহা চায় সে আমি পাইয়াছি, তাই তোমাকে আমার আর দরকার নাই।"

মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"তুমি আমাকে পাইয়াছ ? তবে একবার দেখাও কী পাইলে !"

শিল্পী তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ঘরটি অন্ধকার। মাঝখানে একখানি আসন পাতা। প্রভাতের প্রথম আলোকের রেখাটি আসিয়া পড়িল ও কাহার উপরে ? আসনের সম্মুখে বেদীর উপরে ও কে দাঁড়াইয়া ? সমস্ত বিশ্বের বিস্ময় নিবিড় হইয়া একখানি শ্বেত পাথরে মূর্ত্তি ধরিয়াছে ও কে !

শিল্পী কহিল—"দেশের লোকে যাহাকে চায়, অথচ জানে না কাহাকে চায় সে ঐ।"

মেয়েটি কহিল—"ঐ কি আমি ?"

শিল্পী কহিল—"হাঁ, ঐ তুমি !"

মেয়েটি কহিল—"ও যে অমরী !"

শিল্পী কহিল—"হাঁ ও অমরী ওই তুমি।"

মেয়েটি হাত জোড় করিয়া মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিল্পীর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল—"তুমি আমাকে দেখাইয়া দিলে, তুমিই আমাকে লও।"

শিল্পী কহিল—"না, আমি সাহস করি না।"

মেয়েটি কহিল—"কেন ?"

শিল্পী কহিল—"কোন্ দিন ঐ অমরীর সঙ্গে তুমি আমার ভেদ ঘটাইয়া দিবে, তখন শুধু তোমাকে লইয়া কী করিব।"

রাজা তখন পথে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছিলেন।

কন্যাটি কুটীর ছাড়িয়া যখন বাহিরের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার দুই চক্ষু-পল্লবে দুইটি অশ্রুবিন্দু।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

চিরমৌন।

হে বসন্ত বায়ু,
তোমার আছে অনেক সুর
অনেক কথা জোটে,
সখা তোমার সাড়া পেয়ে
অনেক গানই ছোটে,

বসন্তে বনের মাঝে মর্ম্মরিয়া যাও,
নীরব আঁধার সাঁঝে, উদাসীন গাও,
বিশ্ব ভরা জাগে আশা, আকাশেতে শোক
বর্ষ কাব্যে কত ছন্দে নিত্য নব শ্লোক !

আমি শুধু পড়ে আছি ধরণীর মত ;
বহু দূরে চাপা আছে দুঃখ তাপ যত ;
অঙ্কুরিয়া ওঠে তৃণ বক্ষে নব আশা,
পুষ্প মাঝে কেঁপে সারা মোর ভালবাসা !

সখা যবে মোর বনে সাড়া দিয়ে যাও,
কুসুমের গন্ধ লুটে ছুটিয়া পলাও ;
কুহরিয়া উঠে পিক নির্ঝরিণী গায়
আমি শুধু স্তব্ধ থাকি ধরণীর প্রায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা

মালয়া উপদ্বীপে হিন্দুভাষা ও সাহিত্য।

সুদূর ব্রহ্মদেশের দক্ষিণভাগে যে প্রকাণ্ড ভূ-খণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাই মালয়া উপদ্বীপ বলিয়া অভিহিত। ইহা ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। এই দূরবর্ত্তী স্থানও পুরাকালে হিন্দুমাহাত্ম্য প্রকাশ করিত। হিন্দুগণের পুরাতন দেবভাষা মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। উক্ত দেবভাষার ক্ষমতা কেবল যে আসাম, নেপাল, ভূটান ও কাশ্মীর প্রভৃতি পার্ব্বত্য-সীমান্তপ্রদেশসমূহে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা নহে চীন, তিব্বত, বর্ম্মা ও মালয়াতেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

মালয়জাতির সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্যে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন কিন্তু এ প্রসঙ্গ কেহই উল্লেখ করেন নাই। বাণিজ্যাদি লইয়া হিন্দু-জাতির সহিত এই জাতির বহুকাল হইতে সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। সেইহেতু আর্য্যজাতির প্রধান সম্পদ ভাষা ও সাহিত্যও উক্ত জাতির মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উইলিয়ম মার্সডেন সাহেব বলেন—

"আমি মালয়া ভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়া ভারতীয় দেবভাষার সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখিয়াছি। মালয়বাসীগণ সংস্কৃত ভাষার নিকট বহুগুণে ঋণী। আমি আরও জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে এই জাতি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবার বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হইয়াছিল।"

আজকাল বহু আরবী কথা উক্ত ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে বহু কথা কোরাণ হইতে গৃহীত। কিন্তু সে সকল কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না। কারণ আরবী কথার উচ্চারণ সহজ নহে। মার্সডেন সাহেব বলেন, আরবী ভাষায় সরলভাবে মনের ভাব প্রকাশক কথা নাই। সুতরাং উক্ত উপদ্বীপে উহার প্রচলন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে তথাকার লোকে অপর ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। হিন্দুভাষায় মনের ভাব সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হয় বলিয়া উহা সভ্যসমাজের উপযোগী। মালয়বাসীগণ সংস্কৃত ভাষা হইতে বহু কথা গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইহাদের কিপ্রকার সম্বন্ধ তাহার একটি তালিকা যথাসময়ে প্রদান করিলেই পাঠকগণ উভয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এই সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা কেবল মালয়া উপদ্বীপেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। ইহার নিকটবর্ত্তী সুন্দ, ফিলিপাইন, মোলাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উক্ত ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে। ইহাকেই ইংরাজীতে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' (Lingua franca) কহে। যেমন আমাদের দেশে হিন্দী লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী মাডাগাস্কার ও পূর্ব্বদ্বীপে অর্থাৎ দ্রাঘিমান্তরে দুইশত ডিগ্রি পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত উক্ত ভাষা পরিব্যাপ্ত। ইহাতেই বুঝিতে হইবে আমাদের হিন্দুজাতির ভাষা ও সাহিত্যের কিপ্রকার অপ্রতিহত প্রভাব। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও অন্যান্য ভাষারও বহু শব্দ ধীরে ধীরে

উহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে তথাপি ইহার গোড়া পত্তন সংস্কৃত লইয়াই—কারণ মালয় অভিধানে সংস্কৃত শব্দই অধিক।

মালেয়ার সন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রদেশসমূহ অসভ্যজাতির নিবাসভূমি। তাহাদের প্রতিবাসী হইয়া মালয়গণ যে সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ তাহারা হিন্দুভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া। একথা বহু ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন। হিন্দুগণের এইপ্রকার সুদূর দেশে আগমন শ্রবণে কাহারও বিস্ময়ের কারণ নাই। হিন্দুজাতি বহুকাল হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদেশে গমনাগমন করিতেন। তাঁহারা ইউরোপে ইতালী প্রভৃতি দেশে ও আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিতেন। তবে মালয়াবাসীগণের সঙ্গে হিন্দুগণের কিপ্রকারে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তদ্বিষয় নিরাকরণ দুঃসাধ্য। আমরা ইহার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি।(১) হিন্দুগণের বাণিজ্যার্থে বিভিন্নদেশে গমন, (২) দেশবিজয়লিপ্সা এবং (৩) ধর্ম্ম প্রচার। যে কোন প্রকারেই হউক হিন্দুজাতি এই উপদ্বীপে আগমন করিয়া তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্দেশের ভাষা ও সাহিত্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতবর্ষের সঙ্গে জহর, সিঙ্গাপুর ও মালাকা প্রভৃতি স্থানের রীতিমত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। সর্ব্বপ্রথমে যখন পোর্ত্তুগীজেরা এই সকল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে আইসে তখন তাহারা বহুসংখ্যক হিন্দু বাণিজ্য-পোত ঐ সকল দ্বীপের উপকূলে দর্শন করিয়াছিল। পোর্ত্তুগীজেরা এই বিষয়ে তাহাদের পুস্তকে সবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহারা আরও বলিয়াছে ঐ সকল জাহাজ 'করমণ্ডল' উপকূল হইতে আগমন করিয়া মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিত। এই প্রকারে বহু পুরাকাল হইতে মালেয়া ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের অধিবাসীগণ হিন্দুজাতির নিকট হইতে ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা ত্রৈলিঙ্গ ও তামিল জাতির নিকট হইতে কোনপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। তবে ইহারা উত্তর ভারত-বাসীর নিকট হইতে বহুবিষয় শিক্ষা করিয়াছে। ইহা হইল বহু বৎসরের কথা। তৎপরেই আরবী ভাষার কিঞ্চিৎ প্রচলন দৃষ্ট হয়,—আরবীর সকল কথা নহে কেবল কতিপয় বিশেষ্য ও প্রধান ক্রিয়াপদগুলি। গুজরাটী-গণের নিকট হইতেই ইহারা সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া লয়। আমরা মালয়-অভিধান হইতে কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু ভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইব।

মালয়া	সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা
সুক	সুখ
সুক চেথা	সুখচেষ্টা
দুক	দুঃখ
বাগি	ভাগী
বংশ	বংশ
বাষা	ভাষা
বিহার	বিহার
বিজ	বাচি, বীজ
বুদি	বুদ্ধি
লোব	লোভ
জাগা	জাগা
পুত্রী	(রাজ) পুত্রী

রথ	রথ
পর্ণমা	পুর্ণিমা
চরি	বিচরি

যে সকল মালয়বাসী আরবী বা অপর কোন ভাষা গ্রহণ করে নাই তাহারা হিন্দু-বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে তাহাদের বর্ণযোজনা করিয়া লইয়াছে,—এখনও ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মালয় উপদ্বীপে এক প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত আছে তাহাকে "রেজাং বর্ণমালা" (Rejang alphabet) কহে। তাহার দুই চারিটি নমুনা দিতেছি।

	রেজাং	সংস্কৃত
(Ka)	ক	ক
(Ga)	গ	গ
(Nga)	ঙ	ঙ
(Ta)	ত	ত
(Da)	দ	দ
(Na)	ন	ন
(Pa)	প	প
(Ba)	ব	ব
(Ma)	ম	ম
(Cha)	চ	চ
(Ja)	জ	জ
(Nia)	ঞ	ঞ। প্রভৃতি।

সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রতি বর্গে পাঁচটি বর্ণ। কিন্তু রেজাং বর্ণমালার তিনটি দ্বারা এক একটি বর্গ শেষ করা হইয়াছে। রেজাং বর্ণমালার ক বর্গের কার্য্য ক, গ ও ঙ দ্বারাই সম্পন্ন হয় কিন্তু বর্ণমালার উচ্চারণ উভয়েরই এক। মালয় অভিধান হইতে পূর্ব্বে যে কতিপয় শব্দের তালিকা প্রদান করিয়াছি তাহাতে শব্দের কিঞ্চিৎ উচ্চারণ প্রভেদ লক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহারা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রায়ই এক। কেবল মালয়বাসীগণ অনুস্বার ও বিসর্গের লোপ করিয়া লইয়াছে মাত্র। সেলিবিস্ দ্বীপেও হিন্দুপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তত্রস্থলের বর্ণমালারও স্বরবিস্তর ঐক্য দৃষ্ট হয়।

আর একটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে হিন্দুপ্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। মালয়বাসীগণ কোন গল্প লিখিতে যাইয়া রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনায় বিষয়গুলির সঙ্গে তুলনা করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি একখানি হস্ত লিখিত পুঁথিতে হিন্দু-গণের সাহিত্য ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রতি পত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মিশ্রিত ভাষায় লিখিত তাহাদের একটি গল্প হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এই বাক্যটির সার্থকতা প্রদান করিব।

"টারলালু ব্যাএক সেগালা রূপানীয়া মহাইন্দ সেপাটি পাণ্ডুলিমা।" অর্থাৎ তাহাদের 'রূপ' যেন 'পঞ্চপাণ্ডবের' ন্যায় অতুলনীয়। এই স্থলে 'পঞ্চপাণ্ডব' মহাভারত হইতে গ্রহণ না করিলে তাহারা এই কথাটি পৃথিবীর অপর কোন স্থলে প্রাপ্ত হইতে পারে না। অপর স্থলে আছে—"লাকুনীরা মেং-য়্যামক ঈতু সেপাটি পাণ্ডু জীমা তৎকাল ঈয়া মেং-য়্যামক ডেডালাম রাত্রৎ কুরু।"

অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব যে প্রকারে যুদ্ধ করিতে করিতে কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন তাহারাও তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিয়া লউন ইহা কোন দেশের কথা।

মালয়বাসীগণ রামায়ণের কথা গল্পাকারে বর্ণনা করিয়াছে। মালয়ার রাজকুমারগণ

এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় কপিসৈন্য লইয়া রাক্ষসগণের সঙ্গে মনুষ্যের ক্ষমতাতীত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর হনুমানকে যে প্রকারে সীতা অন্বেষণার্থে লঙ্কাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহারাও তদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মালয়া গ্রন্থাদিতে বিষ্ণুদেব, মহামেরু পর্ব্বত, মাণ্ডুরত্ন সরোবর (এই জলাশয়ে নীলপদ্ম জন্মে) সিংহ-শক্তি (ভগবতীর অলৌকিক শক্তিশালী সিংহ) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কোন স্থলে মহাবীর কর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে যে তথায় হিন্দু প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল এই সকলই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুগণ বাণিজ্যের জন্য ভারত সমুদ্রের উপকূলস্থ দ্বীপ সমূহেও গমন করিয়া বহু প্রাচীন কাল হইতে লবঙ্গ, এলাইচ, জৈত্রী জায়ফল, দারুচিনি, তেজপত্র প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্য আনয়ন করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও জাভা, বর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপেও এক প্রকার ব্রাহ্মণের বাস দৃষ্ট হয়। ইহাও বাণিজ্য ব্যাপদেশে সংঘটিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পুরাকালে হিন্দুগণের সমুদ্র যাত্রা নিষেধ ছিল না এই প্রকার বাণিজ্য হইতে আমরা তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাইতেছি।

শ্রীগণপতি রায়

প্রাবৃট ও শরৎ।

নির্ব্বাপিত বহ্নিকুণ্ড, তাপ দগ্ধ কায়
ভরি উঠে বিটপীর শ্যামল শোভায়,
আধিক্ষীণা গিরিবালা যজ্ঞ ভস্ম শেষ
মাখি অঙ্গে,—ধায় খুঁজি সাগর উদ্দেশ!
সাঙ্গ হ'ল পঞ্চতপ, নিবৃত্ত গো, উমা! –
মুক্ত মুক্ত মেখলায় আতপ-অরুণা!
সিদ্ধ মা সাধনা,—চাহ গগনের পানে,
শোন' কার বরযাত্রা বার্ত্তা পশে কানে।
বাজে ওই গুরুগুরু ডমরুর ধ্বনি
লীলায়িত সিতিকণ্ঠে মুহু দীপ্ত ফণি!
ছায় ব্যোম জটা ঘটা অসিত পিঙ্গল,
ঝরে ঝর ঝর প্রেম মন্দাকিনী জল!
মত্ত ভূত দ্বন্দ্বে নাচে হাসে খল খল,
ভূত সঙ্গে ভূতপতি আনন্দে-বিহ্বল!

শিব সুপ্রসন্ন মেন,—রজত ভূধর
শুভ্র বরকান্তি হেরি মুগ্ধ চরাচর।
ভালে শিশুশশী, ওষ্ঠে সৌম্য শান্তহাস!
মধুর মঙ্গল রূপে দিক্ সুপ্রকাশ।
আবরি কাঞ্চন-কান্তি হরিদ্ অঞ্চলে
বধূবেশে নবনেত্রা, কোকনদ দলে
রাখি রক্ত পা-দুখানি, শিশিরাশ্রু ছুটি
শেফালিকাসহ ঝরে লাজমানে ছুটি!
শুদ্ধকাল,—ছত্রসম ধরি নীলাম্বর,
নারিকেল শীর্ষ নাড়ি ঢুলায় চামর
নন্দী-বায়ু কভু রসে ঢুলাইছে কাণে
শিশুসম, হেরি মৌন মৃদুমন্দ হাসে
বধূর অধরে ফুটে ভূচম্পক দল!
গাহে বিশ্ব শিব-শিবা মিলন মঙ্গল!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

এইপ্রকারে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি প্রত্যহ সুবর্ণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি বহন করিতেন; অবশেষে শেষ দিবসে অকস্মাৎ চৈত্যে ও সঙ্ঘারামের উপরিস্থিত মন্দিরে অগ্নি দেখা দিল। তদ্দৃষ্টে রাজা বলিলেন "আমি আমার সমস্ত অর্থ দান করিয়াছি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা নিজেকে স্মরণীয় করিবার প্রয়াস করিয়াছি কিন্তু আমার সমস্তই বৃথা হইল। যখন এই সকল বিপদ ঘটিতেছে, তখন আমার জীবন ধারণে আবশ্যক কি?"

পরে তিনি গন্ধদ্রব্য প্রজ্বলিত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে আমি ভারতবর্ষাধিপতি হইয়াছি; আমার পুণ্যবলে এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হউক; যদি অগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, তাহা হইলে আমার যেন মৃত্যু হয়।" পরে তিনি উৎসাহের সহিত প্রজ্বলিত দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র, অকস্মাৎ ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল এবং ধূমরাশি অদৃশ্য হইল।

উপস্থিত রাজন্যবর্গ এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া রাজার প্রতি আরও ভক্তিমান হইলেন কিন্তু রাজা রাজন্যবর্গকে বলিলেন "এই অগ্নি আমার ধর্ম্মজীবনের প্রধান কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছে। আপনারা এ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন?"

রাজন্যবর্গ তাঁহার পদতলে নত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আপনার এই অতুলকীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে কিন্তু একমুহূর্ত্তে ইহা ভস্মে পরিণত হইয়াছে। আমরা এ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না। কিন্তু অবিশ্বাসীগণের যে ইহাতে আনন্দ হইয়াছে ও তাহারা যে ইহাতে আনন্দপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে আমাদের আরও কষ্ট হইতেছে।"

রাজা উত্তর করিলেন "অন্ততঃ ইহাতে আমরা বুদ্ধদেবের কথা যে অভ্রান্ত ইহা দেখিতেছি। অবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মতাবলম্বীগণ সকল দ্রব্যই নিত্য বলিয়া মনে করে কিন্তু আমাদের বুদ্ধদেব সকলই অনিত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমার কার্য্য আমি শেষ করিয়াছি এবং তথাগতের শিক্ষাই যে সত্য এই বিপদ হইতে ইহাই আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিতেছি। ইহা আমাদের আহ্লাদেরই বিষয়,—দুঃখের নহে।"

তৎপর তিনি অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বৃহৎ স্তূপোপরি আরোহণ করিলেন। ঊর্দ্ধদেশে পৌঁছিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া অবরোহণ করিবামাত্র, অকস্মাৎ এক অবিশ্বাসী ছুরিকা হস্তে রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা এই আকস্মিক আক্রমণে ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ ভয়ে এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে রাজাকে কি প্রকারে সাহায্য করিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

উপস্থিত রাজন্যবর্গ তৎক্ষণাৎ অপরাধীকে শমন সদনে প্রেরণের প্রার্থনা করিলেন কিন্তু শিলাদিত্যরাজ অপরাধীকে যাহাতে হত্যা না করা হয় ধীরভাবে তাহার আদেশ দিয়া নিজে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি তোমার কি করিয়াছি,যে তুমি আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে?" অপরাধী উত্তর করিল "মহারাজ! আপনার যশোরাশি বিমল; সর্ব্বত্রই উহা সুখ আনয়ন করে। আমি নির্ব্বোধ ও হতবুদ্ধি; অবিশ্বাসীগণের একটী কথায় বিপথগামী হইয়া এবং তাহাদের অনুরোধে গর্ব্বান্বিত হইয়া আমি রাজার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়াছি "

রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "অবিশ্বাসীগণ কি জন্য এই অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে?" অপরাধী

উত্তর করিল "মহারাজ! আপনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীগণকে একত্রিত করিয়াছেন এবং শ্রমণগণকে উপহার ও বৌদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে রাজকোষ শূন্য করিয়াছেন কিন্তু দেশ দেশান্তর হইতে যে সকল অধিবাসী আসিয়াছে তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করেন নাই। এইজন্য তাহাদের অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে এবং আমার ন্যায় হতভাগ্যকে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ পাঁচশত প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণকে রাজার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজা শ্রমণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই হেতু শ্রমণদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা প্রজ্বলিত তীরসংযোগে মূল্যবান প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল যে অগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যখন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে তখন তাহারা রাজাকে হত্যা করিবে। ঐ কার্য্যে বিফল মনোরথ হওয়াতে, তাহারা এই ব্যক্তিকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

এই সংবাদে মন্ত্রিগণ ও উপস্থিত রাজন্যবর্গ অবিশ্বাসীগণকে নির্ম্মূল করিবার প্রার্থনা করিলেন। রাজা উহাদের নায়কবর্গকে শাস্তি দিয়া অপর সকলকে ক্ষমা করিলেন। ঐ ৫০০ শত ব্রাহ্মণকে তিনি সীমান্ত প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজধানীর উত্তর পশ্চিমে রাজা অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে তথাগত পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সাত দিবস ধরিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের উত্তম উত্তম সত্য প্রচার করিয়াছিলেন। স্তূপের সন্নিকটেই চারি জন বুদ্ধ উপবেশন ও ব্যায়ামের জন্য পদচারণা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত একটী ক্ষুদ্র স্তূপে বুদ্ধদেবের চুল এবং নখ আছে এবং যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন, সেখানেও একটী স্তূপ আছে।

গঙ্গাতীরে দক্ষিণ দিকে তিনটী সঙ্ঘারাম আছে; ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার থাকিলেও একই প্রাচীর ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এইস্থানে সুচারু কারুকার্য্য শোভিত বুদ্ধদেবের কয়েকটী মূর্ত্তি আছে। পুরোহিতগণ ভক্ত ও নম্র; কয়েক সহস্র উপাসকও এই স্থানে পুরোহিতগণের অধীনে বাস করেন। এই বিহারে মূল্যবান আধারে দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ বুদ্ধদেবের একটী উজ্জ্বল দন্ত আছে; প্রাতে ও রাত্রিতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন রং হয়। দেশ দেশান্তর হইতে জনসাধারণ এই স্থানে সমবেত হয়; প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্যক্তি সকলের সহিত একত্রিত হইয়া পূজা করেন। প্রত্যহ শত সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া থাকেন। এইরূপ জনতার লাঘব উদ্দেশ্যে বিহাররক্ষকগণ এক একটী সুবর্ণ মুদ্রা দন্তদর্শনী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্রাপি বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হয় এবং এক এক সুবর্ণ মুদ্রা আহ্লাদের সহিত ব্যয় করে। উৎসবের দিন রক্ষাকর্ত্তাগণ ইহা বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়া উচ্চ সিংহাসনোপরি স্থাপন করেন; তখন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি গন্ধদ্রব্য প্রজ্জ্বলিত ও পুষ্প বিকীর্ণ করেন এবং যদিও প্রচুর পরিমাণে পুষ্প স্তূপাকার করিয়া রাখা হয় তত্রাপি ঐ আধার আবৃত হয় না।

সঙ্ঘারামের সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে দুইটী বিহার আছে; প্রত্যেকটীর ভিত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত, প্রাচীর ইষ্টকের এবং প্রায় এক এক শত ফুট উচ্চ। মধ্যস্থলে মণিমুক্তাশোভিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি—একটী সুবর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত এবং অন্যটী তদ্দেশীয় তাম্র নির্ম্মিত। প্রত্যেক বিহারের সম্মুখেই এক একটী সঙ্ঘারাম আছে।

সঙ্ঘারামের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে অনতিদূরেই একটী বৃহৎ বিহার আছে; ইহার ভিত্তি প্রস্তরের; সঙ্ঘারামটী ২০০ ফুট উচ্চ এবং ইষ্টক নির্ম্মিত। তন্মধ্যে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহা তদ্দেশীয় তাম্র নির্ম্মিত এবং বহু মূল্যবান মণিমুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত। বিহারের চারিটী প্রাচীরই খোদিত চিত্র দ্বারা সুশোভিত। তথাগত যখন বোধিসত্ত্বরূপে বক্তৃতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখনকার সকল ঘটনা এই সকল প্রাচীরে খোদিত রহিয়াছে।

প্রস্তর বিহারের দক্ষিণে অনতিদূরে সূর্য্যোদয়ের

মন্দির এবং ইহার অনতিদূরে মহেশ্বরের মন্দির। উভয় মন্দিরই উজ্জ্বল নীল প্রস্তর নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে তাহারা বুদ্ধদেবের বিহারের সমতুল্য। প্রত্যেক মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য সহস্র ভৃত্য আছে; দিবারাত্রি সর্ব্ব সময়েই বাদ্য ও গীতধ্বনি হইয়া থাকে।

বৃহৎ নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে, এবং গঙ্গা হইতে ৬০ লি দক্ষিণে রাজা অশোক নির্ম্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। পৃথিবীতে অবস্থান কালীন, তথাগত দুঃখ, অনিত্য এই সম্বন্ধে ছয় মাস প্রচার করিয়াছিলেন।

ইহারই এক পার্শ্বে পূর্ব্বতন চার জন বুদ্ধ উপবেশন এবং ব্যায়ামের জন্য পাদচারণ করিয়াছিলেন। অদূরে, একটী ক্ষুদ্র স্তূপে তথাগতের চুল ও নখ আছে। যদি কোন রোগী প্রকৃত ভক্তিমান হইয়া এই মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি রোগমুক্ত হন এবং পুণ্যার্জ্জন করেন।

রাজধানীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ১০০ লি যাইয়া আমরা নবদেবকুল নগরে উপস্থিত হই। ইহা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত এবং ইহার পরিধি প্রায় ২০ লি। এস্থানে পুষ্পকুঞ্জ এবং স্বচ্ছসলিল হ্রদ আছে, এই সকল হ্রদে বৃক্ষের ছায়া প্রতিফলিত হয়।

নগরের উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে দেবতাদিগের একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের চূড়াগুলি কারুকার্য্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। নগরের প্রতি পূর্ব্বে ৩টী সঙ্ঘারাম আছে: ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দ্বার কিন্তু একই প্রাচীর বেষ্টিত। প্রায় ৫০০ শত যতি বাস করেন; ইহারা সর্ব্বাস্তীবাদীর হীনযান মতাবলম্বী।

সঙ্ঘারামের সম্মুখে ২০০ শত পদ দূরে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। যদিও এই সঙ্ঘারামের ভিত্তি পৃথিবী গর্ভে, তত্রাপি ইহা বর্ত্তমানেও ১০০ ফুট উচ্চ। এই স্থানেই তথাগত সাত দিবস ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী মূর্ত্তি আছে—উহা হইতে সকল সময়েই জ্যোতি নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে পূর্ব্বতন চারি জন বুদ্ধ উপবেশন ও ব্যায়ামের জন্য পদচারণা করিতেন।

সঙ্ঘারামের ৩১৪ লি উত্তরে এবং গঙ্গাতীরে রাজা অশোক নির্ম্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেব সাত দিবস ধরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় ৫০০ শত দৈত্য বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া দৈত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। স্তূপের নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন পাওয়া যায়। নিকটেই একটী স্তূপে বুদ্ধদেবের চুল ও নখ রক্ষিত আছে।

এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৬০০ লি যাইয়া এবং গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া আমরা অযোধ্যা পৌঁছি।

অযোধ্যা।

এই রাজ্যের ৫০০০ লি বিস্তৃতি; রাজধানী প্রায় ১০ লি। এদেশে যথেষ্ট শাকসবজী, ও প্রচুর পরিমাণে ফল ও পুষ্প পাওয়া যায়। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং মনোরম; অধিবাসীরা ভদ্র ও ধার্ম্মিক। তাহারা ধর্ম্মানুশীলনে রত এবং বিদ্যাভ্যাসে তৎপর। প্রায় একশত সঙ্ঘারামে তিন সহস্র যতি বাস করেন। ইহারা হীন ও মহা উভয় যানভুক্ত পুস্তকাদি পাঠ করেন। দশটী দেবমন্দির আছে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীগণ উহাতে বাস করে; কিন্তু উহারা সংখ্যায় অল্প।

রাজধানীতে একটী পুরাতন সঙ্ঘারাম আছে; এইস্থানে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হীন ও মহা উভয় যানান্তর্গত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। নিকটে কতকগুলি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়; এই স্থানান্তর্গত গৃহে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যবর্গ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের জন্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছিলেন।

নগরের ৪০ লি উত্তরে গঙ্গাতীরে বৃহৎ সঙ্ঘারামে রাজা অশোক নির্ম্মিত প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। তথাগত এই স্থানে তিন মাস কাল দেবতাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী

চারি জন বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন চিরস্থায়ী করিবার জন্য নিকটেই একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

সঙ্ঘারামের ৪।৫ লি পশ্চিমে একটী স্তূপে তথাগতের চুল ও নখচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। এই স্তূপের উত্তরে একটী সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, এই স্থানেই সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ান্তর্গত সুপণ্ডিত শ্রীলবোধ বিভাগ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

নগরের ৫।৬ লি পশ্চিমে বৃহৎ আম্রবৃক্ষস্থান মধ্যে প্রাচীন সঙ্ঘারাম; এই স্থানে অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব পাঠাভ্যাস করিয়া অন্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব রাত্রিতে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের রাজ-প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় যোগাচর্য্য শাস্ত্র, মহাযান সূত্রালঙ্কারটীকা, মধ্যান্ত বিভাঙ্গশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

আম্রোদ্যানের উত্তর পশ্চিমদিকে একশত পদ দূরে একটী স্তূপে তথাগতের চুল ও নখাবিশিষ্ট রক্ষিত আছে। নিকটে কতকগুলি প্রাচীরের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া অসঙ্গ বোধিসত্ত্বকে দর্শন করিয়াছিলেন। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব গান্ধারবাসী ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রস্থানের সহস্র বৎসরের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐশ্বরিক সূক্ষ্ম-দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তিনি শীঘ্রই বুদ্ধের ধর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মহিশাষক সম্প্রদায়ে যোগদান করেন কিন্তু পরে নিজমত পরিবর্ত্তন করিয়া মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত হন। তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব সর্ব্বাস্তিবাদিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। দেশবিদেশে তাঁহার খ্যাতি ব্যাপৃত ছিল; তিনি বুদ্ধিমান, ধীশক্তি সম্পন্ন এবং বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। অসঙ্গের বুদ্ধ-সিংহ নামে খ্যাত প্রতিভাশালী এক শিষ্য ছিলেন।

এই দুই তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তি অনেক সময় এইরূপ বাক্যালাপ করিতেন "আমরা যাহাতে মৃত্যুর পর মৈত্রেয়ের সম্মুখীন হইতে পারি তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম দেহত্যাগ করিয়া উপরোক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি যেন তাঁহার আগমনবার্ত্তা আমাদের পূর্ব্বেই নিবেদন করেন।"

এরূপ কথোপকথনের পরে, বুদ্ধসিংহ প্রথমে দেহত্যাগ করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না; তৎপর বসুবন্ধু-বোধিসত্ত্ব প্রাণত্যাগ করিলেন। ছয়মাস অতিবাহিত হইল, তত্রাপি তাঁহার নিকট হইতে কোনই সংবাদ পৌঁছিলনা এবং সেই জন্য সকল অবিশ্বাসীগণ নিন্দা ও উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল যে তাঁহারা হীন জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং সেই জন্য কোনরূপ ঐশ্বরিক চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

ইহার পরে, একদিন অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব যখন রাত্রির প্রথম ভাগে কি প্রকারে সমাধি দান করা যাইতে পারে, তাঁহার শিষ্যকে এই সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছিলেন, তখন গৃহমধ্যস্থ প্রদীপের আলো নিষ্প্রভ হইয়া গেল এবং শূন্যে উজ্জ্বল আলো দৃষ্ট হইল; সেই সময় এক ঋষি-দেব আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় অবতীর্ণ হইলেন এবং গৃহের সোপানাবলী আরোহণ করিয়া অসঙ্গকে অভিবাদন করিলেন। অসঙ্গ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনার আগমনে এত বিলম্ব হইল কেন? আপনি বর্ত্তমানে কি নাম ধারণ করিয়াছেন?" উত্তরে ঐ ঋষি-দেব বলিলেন "আমার মৃত্যুকালে আমি তুষিত স্বর্গে যাইয়া মৈত্রেয়ের নিকটস্থ পদ্মপুষ্প মধ্যে জন্মগ্রহণ করি। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, মৈত্রেয় প্রশংসাসূচক বাক্যে বলিলেন" স্বাগত! হে সুপণ্ডিত, আপনার আসিতে আজ্ঞা হউক; আমি প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বরাবর এইস্থানে চলিয়া আসিয়াছি।" অসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন "বুদ্ধসিংহ কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন "যখন আমি মৈত্রেয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম তখন তাঁহাকে বহির্দ্দেশে জনতার মধ্যে সুখ ও আনন্দপঙ্কে নিমগ্ন দেখিলাম। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না; সুতরাং এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া, তিনি যে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা আপনার নিকট বিবৃত

করিবেন, আপনি এরূপ আশা করিতেছিলেন ? অসঙ্গ বলিলেন ;" এইক্ষণ মৈত্রেয় দেখিতে কিরূপ এবং তিনি কিরূপে ধর্ম্মপ্রচার করেন ? তিনি উত্তর করিলেন "ভাষায় মৈত্রেয়ের শরীরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত উহার কোন বিভিন্নতা নাই। তাঁহার সুন্দর স্বর মধুর, পবিত্র এবং বিশুদ্ধ। যাহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা কখনও ক্লান্ত হন না ; যাহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পরিতৃপ্তির সীমা নাই ।"

অসঙ্গের ধর্ম্মপ্রচার গৃহ হইতে ৪০ লি উত্তর-পশ্চিমে আমরা গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী পুরাতন সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। ইহাতে একশত ফুট উচ্চ ইষ্টকের স্তূপ আছে ; বসুবন্ধু এই স্থানে প্রথম মহাযান পুস্তক অধ্যয়নে ব্রতী হন। উত্তর ভারত হইতে তিনি এই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সময়ে, অসঙ্গ তাঁহার শিষ্যগণকে বসুবন্ধুকে সাদরসম্ভাষণের জন্য প্রেরণ করেন। বসুবন্ধু এই স্থানে পৌছিলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। অসঙ্গের শিষ্য বসুবন্ধুর গৃহের বহির্ভাগে বিশ্রাম করিতেছিলেন, শেষরাত্রে তিনি দশভূমি সূত্র আবৃত্তি করিতে থাকেন। বসুবন্ধু ইহা শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ বোধগম্য করেন এবং ইতি পূর্ব্বে ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই, সেই জন্য আক্ষেপ করিতে থাকেন এবং জিহ্বাদ্বারা তিনি মহাযানকে নিন্দা করিয়াছেন, এই মনে করিয়া জিহ্বা-ছেদনে উদ্যত হন। একখানি ছুরিকা লইয়া তিনি জিহ্বা কর্ত্তনোদ্যত হইবা মাত্র অসঙ্গকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পান। অসঙ্গ তাঁহাকে বলিলেন" বস্তুতঃই মহাযান অপূর্ব্ব সুন্দর, সকল বুদ্ধগণই ইহা প্রশংসা করেন এবং সকল ঋষিগণই ইহার স্তুতিবাদ করেন। আমি আপনাকে ইহা শিক্ষা দিতাম কিন্তু এইক্ষণ আপনি নিজেই ইহা শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শিক্ষা করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্তেই আপনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা করিবেন না ; বরঞ্চ অনুতাপ করুন এবং পূর্ব্বকালে আপনি যে জিহ্বাদ্বারা মহাযানকে নিন্দা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এইক্ষণ ঐ জিহ্বাদ্বারাই তাহার প্রশংসা করুন। আপনি নূতন জীবন আরম্ভ করুন ; ইহাই সুন্দর উপায়। মুখবন্ধ করিয়া এবং জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কোন লাভই নাই। এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন।

বসুবন্ধু এই আদেশ মান্য করিয়া জিহ্বাকর্ত্তনে বিরত হইলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে তিনি অসঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং মহাযান মতাবলম্বন করিলেন। ইহাতে তিনি ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মহাযানের সহিত একমত হইয়া শতাধিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন ; এই সকল শাস্ত্র যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

এই স্থান হইতে গঙ্গার উত্তরে প্রায় ৩০০ লি যাইয়া আমরা হয়মুখ দেশে পৌছি।

হয়মুখ।

এই রাজ্য প্রায় ২৪০০ কি ২৫০০ লি বিস্তৃত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজধানীর পরিধি ২০ লি। এদেশের জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য অযোধ্যার ন্যায়। অধিবাসীরা সরল ও সচ্চরিত্র। ইহারা বিদ্যার্জ্জনে রত ও ধার্ম্মিক। ৫টী সঙ্ঘারামে সহস্রাধিক যতি বাস করেন। ইহারা হীনযান মতাবলম্বী। দেবতাদিগের দশটী দেবমন্দিরে নানাসম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তি বাস করে।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে রাজা অশোক নির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। এই এই স্থানে বুদ্ধদেব পুরাকালে তিনমাস প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে। নিকটে অন্য স্তূপে বুদ্ধদেবের চুল ও নখ রক্ষিত আছে।

স্তূপের নিকটস্থ সঙ্ঘারামে ২০০ শিষ্য বাস করেন। এইস্থানে সুসজ্জিত বুদ্ধদেবের একটী মূর্ত্তি আছে ; ইহা দেখিতে সুন্দর—জীবিত মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। প্রাসাদ ও বারাণ্ডাগুলি কারুকার্য্যশোভিত। পুরাকালে বুদ্ধদাস এইস্থানে প্রবস্তিবাদীগণের জন্য মহাবিভাগ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে ৭০০ লি যাইয়া আমরা প্রয়াগ পৌছি। (ক্রমশঃ)

মিলন।

সোফিয়া মনে মনে জ্যাক্‌কেই ভালবাসিত, কিন্তু তবুও পিতৃব্যের অনুরোধে অতুল ধনের অধিপতি ডাক্তার ডন্‌বারের পত্নীত্বে বদ্ধ হইতে আপত্তি করিল না, তাহার কারণ ঐশ্বর্য্যমোহ।

ডাক্তার ডন্‌বার লোকটা কিছু নির্জ্জনতা-প্রিয়। বড় বড় ভোজ, নৃত্যগীত—এ সব তাঁহার তেমন ভাল লাগিত না। তাই বিবাহের পরই স্ত্রীকে লইয়া তিনি সমুদ্রকূলে একটি নির্জ্জন পল্লীভবনে বাস করিতেছিলেন। চারিদিকে গাছপালা ও নানা বর্ণের ফলফুল শোভিত স্থানটি ছবির মত দেখাইত।

এ বিবাহে পতিপত্নীর মধ্যে প্রথম প্রণয়ের তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস দেখা যাইত না; তথাপি তাঁহারা কেহ অসুখীও ছিলেন না। শান্তিপ্রিয় গম্ভীরপ্রকৃতি ডাক্তার, পত্নীকে সুখী করিবার জন্য, বসনভূষণে অর্থব্যয় করিতে বা অন্যরূপে স্নেহযত্নের কোন ত্রুটি করিতেন না। পত্নীও আপনার ইচ্ছামত চলিতে পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। ভালবাসার ত্রুটি লইয়া কোন পক্ষ হইতেই কোন অভিযোগ ছিল না। ডাক্তার অধিকাংশ সময়ই তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে পুস্তক রাশির মধ্যে বেষ্টিত থাকিতেন। সোফিয়া নিজের ইচ্ছামত গাড়ী করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়াইত। পত্নীর কোনো কার্য্যে ডাক্তার ডনবারের বারণ ছিল না, শুধু একটা বিষয়ে তিনি পত্নীর উপর আপনার প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চাহিতেন। তিনি জ্যাকের সহিত সোফিয়ার দেখাসাক্ষাতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, জ্যাকের সহিত যখন সোফিয়ার এক সময় ভালবাসা ছিল—এমন কি বিবাহের কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল তখন তাহার সহিত অধিক মেলামেশায় লোকে নিন্দা করিতে পারে। স্বামীর এ কথায় সোফিয়া মুখে কিছু বলিত না, কিন্তু অন্তরে বিরক্ত হইত। সে মনে মনে বলিত—'স্বামীর মনে এ কি সন্দিগ্ধতা! লোকনিন্দার কথা একটা ছল মাত্র। তাঁহার নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা তিনি লোক-নিন্দার নামে গোপন করিতে চাহেন—এ কি আমি বুঝি না!'

সমুদ্রসৈকতে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে সোফিয়া প্রতিদিন জ্যাকের কথাই ভাবিত। জ্যাক এখনও তাহাকে মনে রাখিয়াছে কি? নিশ্চয়ই রাখিয়াছে নহিলে সে আজিও অবিবাহিত কেন? সে না কি বলিয়াছে এ জীবনে সে বিবাহ করিবে না। হায়! তাহারই জন্য কি! তাহার কেবলই মনে হইত তাহার সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামী যদি বাধা না দিত তাহা হইলে সে একদিন জ্যাক্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া যাহাতে সে বিবাহ করে তাহার জন্য অনুরোধ করিত; বলিত—তাহাদের যে ভালবাসা তাহা চিরদিনই অটুট থাকিবে, বিবাহ না করিলে কি ভালবাসা থাকে না? কেন, বোন যেমন ভাইকে ভালবাসে সে তেমনি করিয়া জ্যাককে ভালবাসিবে! কেন সে তবে মিছামিছি নিজের জীবন নষ্ট করিতেছে! তাহার জন্য সে কেন কাঁদিয়া বেড়াইতেছে? সে এখন অপরের

বিবাহিত পত্নী তাহাকে তো পাইবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইত এমনি ধূসর সন্ধ্যায় এমনি নির্জ্জন বেলাভূমে সে কতদিন জ্যাকের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়াছে। জ্যাকের স্বর কি মিষ্ট; কথা কহিবার ভঙ্গী কি সুন্দর! তাহার হাসি কি মধুর! ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি হইয়া যায়। জলে নক্ষত্রের ছায়া হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতে থাকে। শীকর-সিক্ত বায়ু তাহার ললাটে শীতলতা আনয়ন করে। সে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসে। সেখানেও সে শান্তি পায় না। একটা অনুশোচনা কেবলই তাহার হৃদয়ে বিঁধিতে থাকে। জ্যাককে সে প্রতারিত করিয়াছে! অর্থের জন্য, সম্ভ্রমের জন্য সে তাহার স্বর্গীয় ভালবাসা পদদলিত করিয়াছে। সে অপরাধিনী। একবার সে জ্যাকের নিকট ক্ষমা চাহিয়া সমস্ত অনুশোচনা দূর করিয়া লইবে—কিন্তু স্বামী যে তাহাতে বাধা দেন। সে প্রেমিকার মত তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না; সে ভগিনীর স্নেহে জ্যাকের হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু স্বামী ত তাহা বুঝেন না। তবে সে কি করিবে?

২

একটা বিশেষ প্রয়োজনে ডাক্তারকে এক সপ্তাহের জন্য সহরে যাইতে হইল। দাসদাসীদের বিশেষ সাবধানে থাকিতে বলিয়া পত্নীর নিকট দুঃখিতভাবে বিদায় লইয়া ডাক্তার সহরে চলিয়া গেলেন। সোফিয়া বিবাহের পর এই প্রথম দেখিল যে সে স্বামীকে যতটা হীন মনে করে তাহা নহে! বিদায়ের সময় তাঁহার নয়ন হইতে সত্যই একটা বেদনার সজলতা উথলিয়া উঠিতেছে—বিচ্ছেদের কাতরতায় সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রেমের একটা আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বামী চলিয়া গেলে সোফিয়াও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যাহাকে চিরদিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছে তাহারই সহিত একটা বন্ধন সমস্ত অবহেলার মধ্য হইতে কেমন করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারিল না! কিন্তু কেমন একটা অস্পষ্ট বেদনা তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল করিতে লাগিল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা সমুদ্র উপকূলে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন জ্যাকের কথা মনে পড়িল তখন সোফিয়া ভাবিল স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে জ্যাককে ডাকিয়া পাঠাইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে হয় না? দোষ কি? সেই দিনই সোফিয়া জ্যাককে নিমন্ত্রণ করিয়া একখানি চিঠি পাঠাইল। সে যে একবার মাত্র জ্যাকের দর্শনপ্রার্থনা সেকথা জানাইল, এবং ডাক্তারের গৃহে অনুপস্থিতির কথাও লিখিতে ভুলিল না। সে লিখিয়া দিল গৃহকর্ত্তা কার্য্যান্তরে সহরে গিয়াছেন সে জন্য তাহার আদর যত্নের যে ত্রুটি হইবে তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে দেখিয়া পাছে জ্যাক কিছু মনে করে, তাই সে লিখিয়াছিল নিতান্ত একা থাকায় দিন কাটান ভার; তাই সে তাহার ভ্রাতৃসম স্নেহাস্পদ জ্যাককে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেছে।

৩

ফুল বাগানে জ্যোৎস্নালোকে মর্ম্মর বেদির উপর বসিয়া অনেক দিনের পর আজ আবার জ্যাক্ ও সোফিয়া গল্প করিতেছিল। সন্ধ্যার শীতল বায়ু সোফিয়ার কুঞ্চিত স্বর্ণোজ্জ্বল কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছিল, তাহার গোলাপী পরিচ্ছদের প্রান্ত ভাগ লইয়া নাড়িতেছিল। অনেক দিনের পর জ্যাকের সহিত দেখা হওয়ায় আনন্দে সোফিয়ার সুন্দর মুখ অধিকতর সুন্দর দেখাইতেছিল। এই ছয়মাসে তাহার কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জ্যাক্ অনিমেষনয়নে মুগ্ধনেত্রে সোফিয়ার উন্নত সুন্দর দেহ, সুগোল বাহুলতা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সোফিয়া বন্ধু ভাবে জ্যাককে বিবাহ করিতে বলিতেছিল, পুরুষ মানুষ কাজ-কর্ম্ম না করিলে শরীর মন দুইই নষ্ট হইয়া যায়। জ্যাকের উচিত আপনার উন্নতির চেষ্টা করা, জ্যাক্ যদি কিছু না মনে করে তাহা হইলে সে তাহাকে ব্যবসা করিবার জন্য হাজার কয়েক টাকা স্বামীর নিকট হইতে চাহিয়া দিতে পারে। ছোট বোনের নিকট সাহায্য লইতে দোষ কি? জ্যাক সোফিয়ার এই অযাচিত অনুগ্রহে তাহাকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু সেই সঙ্গে জানাইল যে বিবাহ সে এজীবনে করিবে না, পুরুষের মন পাষাণের মতই কঠিন তাহা ভাঙিলে আর জোড়া লাগে না, দাগ পড়িলে সে দাগ আর তোলা যায় না। জীবন তাহার ভার মাত্র, আত্মহত্যা মহাপাপ, নচেৎ সে এতদিন সংসারের নিকট বিদায় লইয়া সমাধির শীতলশয্যায় আপনার তপ্তদেহ জুড়াইতে পারিত। হায় তাহাদের অতীত জীবন! বাল্যকাল সে কি সুখের দিনই গিয়াছে! সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুইটীতে একত্রে খেলাধূলা অবস্থান হাসিকান্না মান অভিমান। তারপর যৌবনের আরম্ভে সে যখন প্রথম জানিল সোফিয়া তাহারই তখন জগৎ কি সুন্দর কি ইন্দ্রজাল লইয়া তাহার চোখের সাম্‌নে দাঁড়াইয়াছিল! সেই ইন্দ্রজালের মধ্যে সেই প্রথম যৌবনের আশার আলোকে সে কি সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছিল! সে কি তখন জানিত ভালবাসায় নৈরাশ্য আছে, নারী হৃদয়ে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন বিরাজ করে! সে কি জানিত দরিদ্রের ভাল বাসিবার অধিকার নাই। তাহা জানিলে, কে জানে সে কি করিত! কিন্তু এখন? সংসারে তাহার কেহই নাই, কিছুই নাই। সে হতভাগ্য! নিতান্ত হতভাগ্য! এমনি করুণ কণ্ঠে এমনি কাতরতার সহিত সে এই সব কথা বলিতেছিল, সে অজ্ঞাতসারে সোফিয়ার দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। সত্যই কি জ্যাক্ তাহাকে এম্‌নি ভাল বাসে? কই এতটা ত সে জানিত না। জানিলে সে কখনই ডাক্তারের পত্নীত্বে আবদ্ধ হইত না। হায় কি বলিয়া সে এখন তাহাকে সান্ত্বনা দিবে।

সোফিয়া বুঝিতে ছিল এসব আলোচনা করা উচিত নয়—জ্যাক্‌কে এ সকল কথা হইতে নিবৃত্ত করা, তাহাকে বাধা দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য, তাহার এখন বলা উচিত—জ্যাক্ অতীত ভুলিয়া যাও, আমি বিবাহিতা পত্নী! এসব কথা আমার শুনিতে নাই। এস আমরা পবিত্র বন্ধুভাবে পরস্পরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি। কিন্তু তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না।

কথা বলিতে বলিতে জ্যাক্ সোফিয়ার একখানি হাত আপনার হস্তের মধ্যে তুলিয়া লইল। সোফিয়ার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা বিদ্রোহভাব তড়িতের মতো বহিয়া গেল। তাহার বাধা দিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু পারিল না। তখন তাহার মনে হইল হায়! কেন সে জ্যাক্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহাকে অধিকতর অসুখী করা ভিন্ন ত আর কিছুই হইল না। সে যে তাহার প্রেমের বহ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিয়া দিল। সে ত এতটা জানিত না। সে জানিত জ্যাক্ তাহাকে ভালবাসে বটে কিন্তু তাহারই জন্য যে জ্যাকের জীবন চিরদিনের মত শ্মশান হইয়া গেছে তাহাত সে জানিত না। নিজের প্রতি একটা ঘৃণায় ও অনুশোচনায় সোফিয়ার হৃদয়টা আকুল হইয়া উঠিল। জ্যাক তাহার সে বিচলতা দেখিয়া করুণ কণ্ঠের স্বর আরো উচ্চে চড়াইয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল।

এই সময় পরিচারিকা আসিয়া আহারের খবর দিল। সোফিয়ার চমক ভাঙ্গিল। তাই ত গল্প করিতে করিতে সময় বুঝিতে পারে নাই। সস্নেহে জ্যাকের কর মর্দ্দন করিয়া সে আহারের জন্য তাহাকে অনুরোধ জানাইয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। পরিচারিকা প্রদর্শিত পথে জ্যাক্ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। সোফিয়া বেশাগারের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুভ্র জ্যোৎস্না-লোকে সুন্দর গৃহমধ্যে কার্পেটের উপর একখানা পত্র পড়িয়াছিল। অসাবধানে জ্যাকের পকেট হইতে পড়িয়া থাকিবে—হয়ত কোন দরকারী কাগজ—এই ভাবিয়া সোফিয়া চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া জ্যোৎস্না-লোকে নাম পড়িবার চেষ্টা করিল। চিঠিখানা রমণীর হাতের লেখা। কৌতূহলের সহিত সোফিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রিয়তম জ্যাক্! তোমার শীকারযাত্রা শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি তুমি জয়ী হও। তুমি লিখিয়াছ হরিণী আপনি জালে পড়িতে চাহিতেছে। সে লিখিয়াছে তাহার স্বামী অনুপস্থিত তাই তোমায় দেখিতে চায়। হয় ত তুমি ভুল বুঝিয়াছ, তা থাক্ সাক্ষাতে সে সব কথার আলোচনা হইবে। এখন অনুরোধ নূতন পাইয়া পুরাতনের কথা ভুলিও না, তাহার খেয়াল দুই দিনেই ফুরাইবে। তোমার চিরদিনের

একান্ত অনুগতা রোজ্

পত্রে একটা প্রসিদ্ধ নাট্যশালার ঠিকানা ছিল! পত্র পড়িয়া সোফিয়ার কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণা! কাহাকে সে আদর করিয়া আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছে? এই জ্যাক্! ইহারই হস্তে হস্ত রাখিয়া সে এই মাত্র তাহার নিকট ভালবাসার উপন্যাস শুনিতে ছিল। অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শে যেমন সমস্ত দেহ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে জ্যাকের কর স্পর্শে তাহার নিজেকে তেমনি অশুচি বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। চিঠিখানা ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিয়া পদদলিত করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে সে ভোজন গৃহে ফিরিয়া আসিল।

জ্যাক্ যখন ভোজনাগারে ফিরিয়া আসিল তখন সোফিয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নত

শিরে একখানা টাইমটেবল দেখিতেছিল। পদ শব্দ শুনিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তার পর দ্বারের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া দৃঢ় অনুজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিল "মহাশয় গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী সময় নাই অতএব বিদায়! সহরে ফিরিবার এই শেষ গাড়ী আর এক মিনিটও আপনার অপেক্ষা করিবার সময় নাই।" জ্যাকের বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত না হইতেই সোফিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে পর্দ্দা ঠেলিয়া অপর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বাহির হইতে জ্যাকের সহস্র অনুনয় বিনয় অশ্রু মোচনেও সে দ্বার মুক্ত হইল না। পরিচারক আসিয়া জানাইল গাড়ী প্রস্তুত তাঁহার ষ্টেশনে যাইবার সময় হইয়াছে। অগত্যা মনের ক্ষোভ মনে রাখিয়া জ্যাককে সেই রাত্রেই অনাহারে গৃহে ফিরিতে হইল। তাহারই সামান্য অসাবধানতার ফলেই যে এটা ঘটিল ইহা যখন সে বুঝিল তখন আর দুঃখ রাখিবার তাহার স্থান রহিল না। সেই একখানি চিঠি! নচেৎ সে ত জয়ী হইয়াই ছিল।

এবার সহর হইতে ফিরিয়া ডাক্তার দেখিলেন এই কয়দিনের অদর্শনে তাঁহার হৃদয়হীনা পত্নীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সোফিয়ার চোখে আন্তরিক প্রেমের একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার চিরদিনের উপেক্ষিত স্বামীকে সে আজ হৃদয়াবেগের সহিত নিবিড় বাহুবন্ধনে বেষ্টন করিল।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

সারনাথ।

বারাণসীর অন্তর্গত অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানই সারনাথের ন্যায় কৌতূহলজনক নহে। অল্পদিন হইল যে খনন ও অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা দ্বারা এই বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানের অতীত যুগের বহুতর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে, এইরূপ অনেকেই আশা করিতেছেন।

সারনাথ নামটী সম্ভবতঃ সারঙ্গনাথ (অর্থাৎ মৃগাধিপতি) নামের অপভ্রংশ। একটি প্রাচীন প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে এস্থানটি এককালে মৃগয়াবণ্য ছিল।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও সারনাথ পবিত্র স্থানরূপে বিদ্যমান ছিল। তখন ইহার নাম ছিল ঈশিপত্তন (ঈশি=ঈশ্বর সম্বন্ধীয়; পত্তন=নগর) ও ঋষিপত্তন। অনুমান হয়, পূর্ব্ব নামটির সহিত মহাদেবের নামের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে; কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বারাণসীতে মহাদেবের পূজা হইয়া আসিতেছে।

"জাতক"গুলির (বুদ্ধের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় উপাখ্যান) মধ্যে একটির সহিত সারনাথ নামের উৎপত্তির বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় এবং এস্থান যে এককালে মৃগয়াক্ষেত্র ছিল ইহাতে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

যাইতেছে। আখ্যানটি অতিশয় তথ্যপূর্ণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব গৌতমরূপে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেও বহুবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার এইরূপ একটি আবির্ভাবকালে তিনি সারঙ্গনাথরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সারনাথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মৃগদল লইয়া ভ্রমণ করিতেন। বারাণসীর মৃগয়াশীল রাজা মধ্যে মধ্যে মৃগগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে বধ করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ প্রাণিহত্যায় অতিশয় ব্যথিত হইয়া সারঙ্গনাথ রাজার নিকট আবেদন করিলেন। রাজা বলিলেন আজ্ঞা তিনি আর মৃগ বধ করিবেন না কিন্তু রাজার আহারের জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ একটি করিয়া মৃগ প্রেরণ করিতে হইবে। সন্ধি-পত্র মত মৃগগুলি সারঙ্গনাথের নিকটেই রহিল। একদিন একটি গর্ভিণী হরিণীকে পাঠাইবার পালা আসিল। হরিণীটি তাহার জঠরস্থ শিশুটির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অত্যন্ত কাতরভাবে নিজের প্রাণভিক্ষা চাহিল। বুদ্ধদেব দয়ার্দ্রচিত্ত হরিণের পরিবর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা বুদ্ধরূপী মৃগের আনন্দাশ্রুজলরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি জন্য সে নিজেকে সমর্পণ করিতে আসিয়াছে। বুদ্ধদেব তখন তাঁহাকে ঘটনাটি বুঝাইয়া দিলেন। রাজা বুদ্ধের এই মহত্ত্ব দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি মনুষ্যদেহে মৃগ আর তুমি মৃগদেহে মনুষ্য।" অতঃপর তিনি বুদ্ধকে জীবনদান করিলেন এবং তাঁহার মৃগগুলিকে মুক্ত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা দিলেন।

সারনাথ সম্বন্ধে দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বের জ্ঞাতব্য বিবরণ চীনদেশীয় দুইজন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অবগত হওয়া যায়। তাঁহারা বারাণসী ও সারনাথ ভ্রমণ করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম ভ্রমণকারী ফাহিয়ান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে আগমন করেন। অপর হুয়েন সাং ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে আসিয়াছিলেন।

ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণ অতি অসম্পূর্ণ; তাহাতে তাঁহার পরিদর্শনের বৃত্তান্ত অপেক্ষা প্রবাদের কথাই অধিক আলোচিত হইয়াছে। তিনি এস্থানটি মৃগের আবাসস্থান ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেবের কঠোর তপস্যার গৌরবকীর্ত্তনও করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে পাঁচটী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধদেবের শিষ্য। ফাহিয়ান দুইটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিহারেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

হুয়েন্থসাঙের বিবরণ ইহাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। তিনি বারাণসীর একটী সাধারণ বিবরণ দিয়া সারনাথ সম্বন্ধে তদপেক্ষা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বারাণসীর পরিধি তখন ৬৬৭ মাইল ছিল। এ আকার সম্ভবতঃ বারাণসীরাজ্যের হইবে। তিনি যে ৩০টী বৌদ্ধবিহার ও ৩০০০ তিন সহস্র ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বারাণসী সম্বন্ধেই প্রযুয্য; কারণ অন্যস্থলে, সারনাথে ১৫০০ জন ধর্ম্মাত্মা ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবরণের

কোন অংশেই বুদ্ধবিষয়ক প্রবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অধুনা আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের সহিত চীনদেশীয় ভ্রমণকারীর বিবরণের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে খননকার্য্য আরও অগ্রসর হইলে ভবিষ্যতে হয়ত অনেক বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। একটি বিষয় অবধানযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অট্টালিকার পর পর স্তরগুলি যেরূপ ক্রমশঃ বাহির হইয়া পড়িতেছে তাহাতে কোন্‌টির কথা যে হুয়েন্থসাং বলিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা বড়ই সমস্যার বিষয়। সমগ্র ধ্বংসাবশেষ গুলি সপ্তদশ শতাব্দীর অট্টালিকার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। বুদ্ধদেব সম্ভবতঃ তাঁহার প্রচারকার্য্য খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ করেন। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে এস্থানটি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অনুমানটি সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে তাহার পরবর্ত্তী সময়ে বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তবে তাহাদিগের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে "চৌখণ্ডী" নামক উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর যে ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহটি আছে, তাহা হুমায়ুনের তথায় আগমনের স্মৃতি রক্ষায় নিমিত্ত আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিগত একশত বৎসর হইতে সারনাথের স্থান নিরূপণ উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে যথাযোগ্য অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অল্প কয়েক বৎসর মাত্র হইল ইহার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। মিষ্টার এফ্, ও, ওরটেল ১৯০৫ সালে ইহার সূচনা করিয়াছেন। এই স্থানের প্রথম খননকার্য্য প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানরূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর মহারাজার দেওয়ান বাবু জগৎসিং নগরের কোন একটী মহল্লায় নিজের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে ছিলেন। (পরে তাঁহারই নামে এই মহল্লার নাম জগৎগঞ্জ হইয়াছে) এই কার্য্যে সারনাথকে প্রস্তরখনিরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। জগৎ সিং সারনাথের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ হইতে তাঁহার মালমসলা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ সেরিং (Shering) বলেন যে, জগৎসিং সারনাথ হইতে একটি সম্পূর্ণ স্তূপই তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারই ভিত্তি ভূমি পরে "জগৎ সিং স্তূপ" রূপে অভিহিত হয়। মেজর কিটো (Kittoe) ও মিঃ টোমাস এই স্তূপ আবিষ্কার করেন। ইহার অন্তর্ভাগে একটী প্রস্তরের সিন্দুক পাওয়া যায়। সেই সিন্দুকের মধ্যে মূল্যবান-বস্তু সমন্বিত একটী মর্ম্মর প্রস্তরের আধার ছিল। সে আধারের বিষয় এখন কিছুই জানিবার উপায় নাই। প্রস্তরের সিন্দুকটি পরে তথা হইতে কলিকাতায় নীত হইয়া মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। তাহা এখনও তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পরে বুদ্ধমূর্ত্তির কিয়দংশও জগৎগঞ্জে পাওয়া গিয়াছে। তাহার আবিষ্কারও সম্ভবতঃ একই স্থান হইতেই হইয়াছিল।

এই স্তূপের বিশেষ বিবরণ সেরূপ উল্লেখযোগ্য নহে। ইহার মধ্যভাগে যদি কিছু

ছিল এমন হয় ত তাহা বহুদিন হইল অপসৃত হইয়াছে। এক্ষণে ইষ্টকের বেষ্টনীর উপর কতকগুলি বেষ্টনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, একই স্থানে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটিকে অন্যটির অন্তর্গত করিবার জন্য প্রত্যেকটিকেই পূর্ব্বটি অপেক্ষা বৃহত্তর করিতে হইয়াছিল।

সারনাথের স্তূপগুলিকে দেখিয়া বোধ হয় যে এগুলি স্মৃতি স্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্ভবতঃ বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলির সহিত জড়িত স্থানসমূহে মাহাত্ম্য প্রদান উদ্দেশ্যেই ইহাদের নির্ম্মাণ। অধিকাংশগুলিই বুদ্ধের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ উদার ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। হুয়েন্সাং লিখিয়াছেন, "তিনটি উল্লেখ যোগ্য স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; একটি যে স্থানে বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র ঘুরাইয়াছিলেন, আর একটী যে স্থানে বুদ্ধের প্রথম শিষ্যেরা তাঁহার নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একটী বুদ্ধ যেখানে পূর্ব্বজন্মে হস্তীরূপে তাঁহার দন্ত একটী ব্যাধকে দিয়াছিলেন।" হুয়েন্সাং উপসংহারে লিখিয়াছেন যে "তথায় শত শত বিহার ও স্তূপ রহিয়াছে কিন্তু আমরা কেবল শুধু তিনটিকে লক্ষ্য করিয়াছি, কারণ সকলগুলির বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা অতি দুরূহ কার্য্য।"

১৮১৫ খৃঃ অব্দে কর্ণেল ম্যাকাঞ্জি সর্ব্ব প্রথম ধ্বংসাবশেষ স্থানের কিছু দূর খনন করাইয়াছিলেন। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম অতি উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। সে গুলি এক্ষণে কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত। প্রাপ্ত বস্তুগুলির মধ্যে যে গুলির বিষয়ে তুল্যরূপ যত্ন লওয়া হয় নাই, সে গুলি তথায় পতিত ছিল। কানিংহাম লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে প্রায় ৪০টী মূর্ত্তি তথা হইতে নীত হইয়া বরুণা সেতুর খিলানের তলদেশ রক্ষার নিমিত্ত নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বরুণার অপর সেতুটী হইবার সময়ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরখনি (quarry) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেতুর ভিত্তি নির্ম্মাণের জন্য সারনাথ হইতে বহুল পরিমাণ প্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল।

কানিংহামের পরবর্ত্তী অনুসন্ধানকারী মেজর কিটো। তিনি সারনাথের খনন কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করাইয়াছিলেন। মেজর কিটো কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন না,—তিনি একজন বিখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কুইন্স কলেজ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। তিনি নাকি সারনাথ হইতে আনীত অনেক প্রস্তর এই কার্য্যে ব্যবহার করেন সেই সমস্ত প্রস্তর ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই একবার করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান আমরা করিতে পারি। কুইন্স কলেজের চতুর্দ্দিকের ভূমিতে যে সকল খোদিত প্রস্তর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লক্ষ্ণৌর মিউজিয়মে আর কতকগুলি পুনরায় সারনাথে নীত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিটো সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান কার্য্যের বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ইহার পর টোমাস সাহেব ও হল সাহেব

অনুসন্ধান কার্য্যে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা উল্লেখ যোগ্য কিছুই করিতে পারেন নাই।

১৯০৫ সালে মিষ্টার এফ্ ও ওরটেল (F. O. Oertel) এই আবিষ্কার ব্যাপারে একটি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ইহার পর হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর মার্সাল সাহেব (Mr. J. H. Mashell) বিশেষ যত্নের সহিত খনন কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন এবং ডাক্তার

ধামেক স্তূপ।

ষ্টেন্‌কোনাও ও মিষ্টার ডব্লিউ, এইচ, নিকোলস এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

নিম্নে সারনাথের বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

(১) 'ধামেক স্তূপ' (Dhamek Tower)*—ইহাকে আবিষ্কার করিতে হয় নাই। এই উচ্চ স্তূপটি চিরদিনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে! ইহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসমূহের অনুসন্ধান বিষয়ে ইহার স্থিতিসঙ্কেত যথেষ্ট ফলদায়ক হইয়াছিল।

জেনারেল কানিংহাম সাহেব এই স্তূপটির পর্য্যবেক্ষণের জন্য বহু সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মিঃ সেরিংকৃত কাশীধাম বিষয়ক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই স্তূপের মধ্যভাগে ইহার একটী স্তম্ভদণ্ড ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যভাগের গঠন প্রণালী অবগত হইবার জন্য কতকগুলি গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

স্তূপটী উচ্চতায় ১১০ ফুট্। তলদেশ ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ২৮ ফুট্ গভীর। ইহার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। বর্ত্তমান স্তূপটী পূর্ব্ব একটী স্তূপের ভগ্নাবশেষের উপর রচিত হইয়াছে। ইহার ব্যাস নিম্নদেশে ৯৩ ফুট্ এবং ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িয়াছে। ভূমি হইতে ৪৩ ফুট্ পর্য্যন্ত নিরেট প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই প্রস্তর খণ্ডগুলি সমস্তই লৌহের দ্বারা বাতাবদ্ধ। এই স্থান হইতে ১০ ফুট্ উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত বহির্ভাগে প্রস্তর এবং অন্তর্ভাগে ইষ্টক দ্বারা গঠিত। উপরিস্থিত অংশগুলি সম্পূর্ণরূপে সিমেণ্ট করা ইষ্টকে প্রস্তুত হইয়াছে।

স্তূপের মধ্যভাগে দুই ফুট্ দীর্ঘ ও এক ফুট্ প্রস্থের উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত কথা গুলি লিখিত আছে।

"যে সমস্ত কার্য্য, কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের কারণ তথাগত বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই মহাশ্রমণ সেইরূপে অস্তিত্বের (জীবনের) নির্ব্বাণ কারণও বুঝাইয়া দিয়াছেন।"

স্তূপের প্রস্তরনির্ম্মিত অংশে অতি সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায়। কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার নিম্নদেশে আটটি বহির্গত অংশ আছে। তাহার প্রত্যেকটি ২১½ ফুট্ করিয়া প্রশস্ত। এই প্রত্যেক অংশে অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি ৫ ফুট্ উচ্চের কুলঙ্গী আছে। আবার প্রত্যেক কুলঙ্গীই একটী করিয়া স্তম্ভমূল রচিত। কুলঙ্গীগুলি উচ্চতায় এক ফুট্ করিয়া এবং তাহাতে মূর্ত্তির নিম্ন ভাগ রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি ছিদ্র করা হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি অনেকদিন হইল অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু নিঃসংশয়ে এরূপ অনুমান করা যায় যে প্রত্যেক কুলঙ্গীতে একটী করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কুলঙ্গীর আকার দেখিয়া মনে হয়, মূর্ত্তিগুলি মনুষ্যমূর্ত্তির ন্যায় উচ্চ ছিল। এই কুলঙ্গীগুলির ঠিক নিম্নভাগে ৯ ফুট্ প্রশস্ত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের স্তম্ভ প্রদক্ষিণ করিয়া এক একটি বৃত্ত আছে। প্রত্যেক বৃত্ত আবার ক্ষুদ্রাকারের ৩ ফুট্ বৃত্তে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তমটির কারুকার্য্য জ্যামিতির নক্সার ন্যায়; সর্ব্ব নিম্নেরটীর কারুকার্য্য পুষ্পলতার আকৃতিবিশিষ্ট। কেবল একটি স্থানের কুলঙ্গীর সীমায় জীবজন্তুর আকৃতি

* এই ধামেক শব্দের উৎপত্তি লইয়া অনেক মতভেদ আছে। রয়াল এসায়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। লেখক।

খোদিত হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলির ন্যায়, আর কতকগুলির ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্যের আকার রাজহংসের ন্যায়, কতকগুলির ভেকের ন্যায়। মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলি পদ্মের উপর উপবিষ্ট

ধামেক স্তূপের কারুকার্য্য

এবং প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া পদ্ম রহিয়াছে। স্তম্ভের এই কারুকার্য্যে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

কারুকার্য্যগুলি ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞানের উন্নত অবস্থা জ্ঞাপন করে। নক্সাটী অতি উচ্চ ধরণের; খোদাই কার্য্যগুলি অত্যুৎকৃষ্ট।

আধুনিক সময়ের শিল্পের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২)। প্রধান মঠ বা সঙ্ঘারাম—

এই মঠটির ধ্বংসাবশেষ ধামেক স্তূপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ধ্বংসস্থান ১৮ ফুট উচ্চ এবং ৯৯×৯৯ ফুট বিস্তৃত। ইহার প্রাচীরের ঘনত্ব দেখিয়া অনুমান হয় যে ইহা একটি বিরাট উচ্চ গৃহকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। গৃহটির কতক অংশ ইষ্টকে আর কতক প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রস্তরগুলি বোধহয় অন্য কোন একটি প্রাচীনতর মন্দির হইতে গৃহীত হইয়াছে। অনুমান হয়, এই গৃহটি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত; কিন্তু একখানি উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে ইহার স্থাপন খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর। এই নির্ম্মাণ-সময় বোধহয় অন্য একটী প্রাচীনতর মন্দিরের হইবে। সেই মন্দির হইতেই, সম্ভবতঃ, ইহার মাল মসলা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই গৃহের মধ্যভাগে একটি প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার পূর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত। ইহার চারিদিকে আর তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। ইহারই দক্ষিণপার্শ্বস্থ একটি প্রকোষ্ঠে একটি সমচতুষ্কোণ প্রস্তরবেষ্টনী একটি স্তূপের নিম্নদেশ দেখিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেক ধার ৮॥ ফুট দীর্ঘ এবং ৪॥ ফুট উচ্চ। এই বেষ্টনী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহা একটি আস্ত নিরেট পাথর হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার গঠন যদিও অতি সামান্য ধরণের, তথাপি ইহার নির্ম্মাণকৌশল প্রবীন হস্তের বলিয়া বোধ হয়। খোদাই কার্য্য সম্পূর্ণ-রূপে স্বাভাবিক, পালিসও অতি উৎকৃষ্ট। এটি অশোকের সময়ের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

(৩)। অশোকস্তম্ভ—এই গৃহের নিকটেই একটি ভগ্নস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভগ্নাব-শেষের মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ইহার উপরিস্থিত একখানি লিপি হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এটি একটি অশোক-স্তম্ভ। এই লিপিখানি একটি রাজাজ্ঞা। ইহাতে প্রজাগণকে আদেশপালন করিতে ও কলহ হইতে সাবধান হইতে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ যে স্তম্ভের কথা লিখিয়াছেন, এটি সেই স্তম্ভ কিনা এ সমস্যা এখন অবধারিত হইবার নহে। তিনি বলেন, "একটি ৭০ ফুট উচ্চের প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। ইহার প্রস্তর পীলু নামক *) সবুজ পাষাণের ন্যায় মসৃণ এবং দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল। যাহারা একাগ্রচিত্তে আরাধনা করেন, তাঁহারা ইহাতে নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পান। এই সকল প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যেকের পাপপুণ্যের উত্তর বলিয়া দেয়। এই স্থানেই তথাগত পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মচক্র ঘুরাইয়াছিলেন।" এক্ষণে সে স্তম্ভ এবং এ স্তম্ভের একত্ব-নির্ণয়-বিষয়ে একটি আকারগত ভেদ উপস্থিত হইতেছে। এ বিতর্কের শেষ মীমাংসা এপর্য্যন্ত সাধিত হয় নাই। কারণ, অধুনা আবিষ্কৃত স্তম্ভটীর পূর্ণ উচ্চতা কতকটা অনুমানগত। তাহা ৫০ ফুট বলিয়াই অনুমিত হইয়া

* ইহার ইংরাজি নাম Jade হিন্দি নাম যশম্।

থাকে। চৈনিক ভ্রমণকারী অন্ত হর্ম্যাবলির সহিত ইহার স্থান নির্দ্দেশ যেভাবে করিয়াছেন এক্ষণে সেরূপ করাও অতি কঠিন কার্য্য। এই সকল হর্ম্যাবলীর ক্রমিক ধ্বংস হেতু যেরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা একরূপ অসম্ভব।

স্তম্ভচূড়ায় সিংহমূর্ত্তি।

তবে হুয়েন্ সাঙ্ তাঁহার বিবরণে এই অতি শোভাশালী স্তম্ভ চূড়ার উল্লেখ যে করেন নাই বা এবিষয়টী তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল এরূপ মনে করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

স্তম্ভের যে অংশটি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে, তাহার উচ্চতা ১৬ হইতে ১৭ ফুট। ইহার উপরের অংশটি ভগ্ন। তাহারি কতক অংশ মন্দির ও অপর অংশের মধ্যে পতিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

(৪)। স্তম্ভ-চূড়ার এক একদিকে মুখ করিয়া চারিটি সিংহের মস্তক রহিয়াছে। ইহার ঠিক নিম্নে একটি বেড়; তাহাতে চারিটি চক্র, চারিটি ক্ষুদ্রকায় জন্তু, একটী সিংহ, একটী হস্তী, একটী ষণ্ড, এবং একটী অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই চূড়াটি পরিণত ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারুকার্য্যে ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া স্থির করা যায় যে, ইহার ভাস্কর যে যুগের বা দেশের হউক না কেন, তাঁহাকে বিশেষরূপে সাধুবাদ না করিয়া উপায় নাই। স্তম্ভে ও চূড়ায় যে পালিসটি (*) ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এবং সুন্দর যে গ্র্যানাইটের সহিত তাহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্তম্ভ ও চূড়ার গাত্র হইতে প্রাচীন সংরক্ষণ প্রণালীরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্তম্ভটি যদিও ভগ্ন তথাপি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। সিংহের মস্তকগুলি ও স্তম্ভটি দেখিলে মনে হয়, যেন এইমাত্র শিল্পীর হস্ত হইতে আনীত হইয়াছে।

(৫)। জগৎসিংহ স্তূপ—ইহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৬)। বিহার—ইহা একটি ভগ্ন অট্টালিকা। ইহার কতক অংশ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। খননকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। আকৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, এস্থানে একটি বিস্তৃত অট্টালিকা বর্ত্তমান ছিল। ইহার নিম্নতল ও উর্দ্ধতল ইষ্টক এবং প্রস্তর স্থাপত্যের একএকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(৬)। চৌখণ্ডী—এটি ধামেক-স্তূপ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকটা দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ইহা আকবরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাঁহার পিতার স্মরণমন্দির। ইহার নিম্ন অংশ দেখিয়া মনে হয় যে এটি একটী স্তূপেরই স্থান ছিল। যদিও অন্যান্য গৃহগুলি হইতে ইহা কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত তথাপি যে এটি অন্যান্যগুলি হইতে বিচ্যুত নহে সম্ভবত ইহার খননকার্য্য তাহাই প্রকাশ করিবে।

(৭)। মিউজিয়ম—যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া এখানে রক্ষিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব বাহির করিবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত আরব্ধ হয় নাই। আশা করা যায়, যখন মিউজিয়মটি সম্পূর্ণ হইবে তখন কোন বিশেষজ্ঞের দ্বারা বস্তুগুলি যথাযথভাবে সজ্জিত হইবে এবং তাহাদের বিবরণীসহ তালিকাও প্রস্তুত হইবে। ইহা তখন নূতন করিয়া ইতিহাসগঠনে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

এখানকার একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটি বিরাট চিত্র বিচিত্র ছত্র বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয়টীর উৎকীর্ণ-লিপি হইতে

(*) পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, পালিসটী একটি কৃত্রিম আবরণমাত্র। এই প্রণালী পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—লেখক।

জানা যায় যে, এ দুইটী কনিষ্কের সময়ে অর্থাৎ খৃঃ ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়।

একখানি প্রস্তরের আটটি ফলকে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের নানা লীলা অতীব চিত্তাকর্ষক।

সারনাথের মিউজিয়ম।
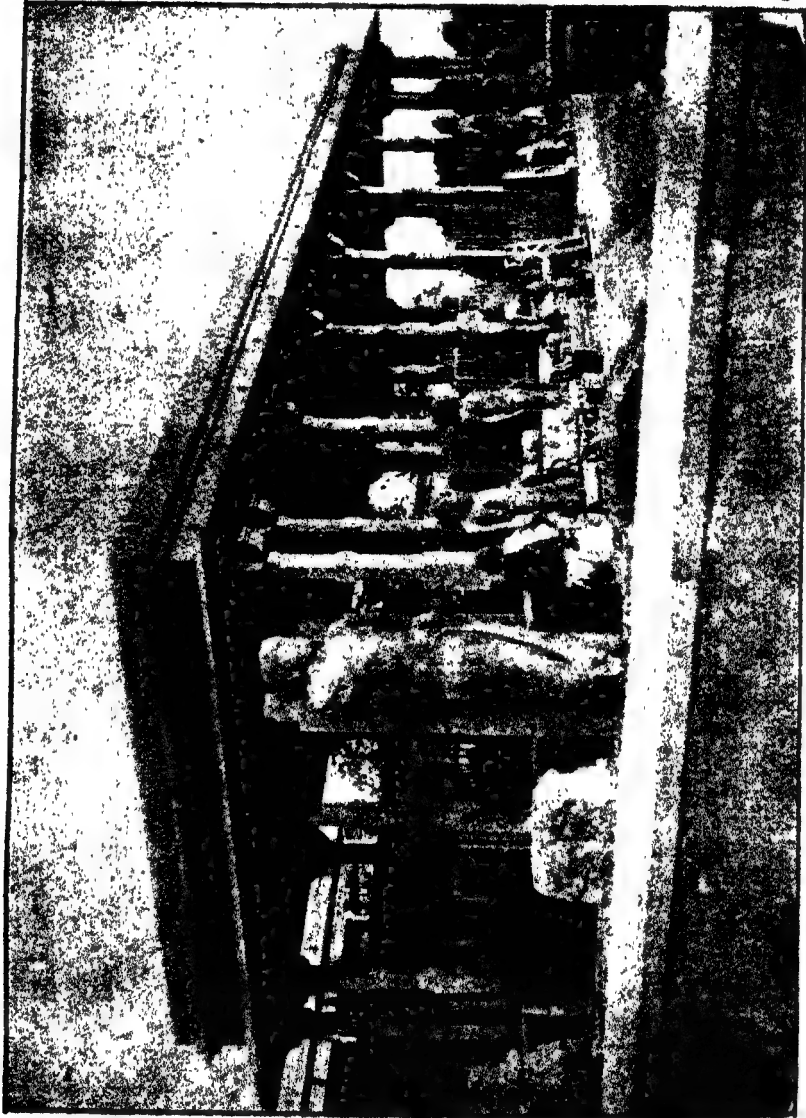
মহাদেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিও দর্শনের যোগ্য। আর একখানি দীর্ঘ প্রস্তর (সম্ভবতঃ দ্বারদেশে ছিল) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

ইহাতে অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি শিল্পের উন্নত অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

খ।—মহাকাব্য

ঠিক্ কোন্ সময়ে মহাভারত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা যদিও বলা যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে উহা পুরাকালের রচনা। সূত মাগধগণ কর্ত্তৃক রাজাদের নিকট যাহা গীত হইত, অথবা ভাটগণ কর্ত্তৃক যাহা নগরে নগরে কীর্ত্তিত হইত, ইতিহাস নামক সেই সকল প্রাচীনকাহিনী—এই প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ্যিক বিশ্বকোষের সংকলনকর্ত্তারা, পাণ্ডবদিগের ইতিহাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জনসাধারণের নিকট ভাবভঙ্গীসহকারে কাব্যপাঠের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করা ভারতে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। সপ্তম শতাব্দীতে বাণ তাঁহার প্রণীত একটি আখ্যায়িকায় লিখিয়াছেন, মহাভারতপাঠ শুনিবার জন্য রাণী বিলাসবতী আগ্রহান্বিতা হইয়া মহাদেবের মন্দিরে পদব্রজে চলিয়াছেন। (১) ক্ষেমেন্দ্র (২) তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের উল্লেখ করিয়া এইরূপ দোষ দিয়াছেন, তাহারা ত্বরান্বিত হইয়া উপদেশ শুনিতে যায়, কিন্তু সেই সকল উপদেশ কাজে পরিণত করিতে বিলম্ব করে। "ভক্তদিগের শিক্ষার জন্য এখনও মন্দিরে রামায়ণ মহাভারত পঠিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে লোকেরা কথকঠাকুরকে ঘিরিয়া বসে, এবং যখন মহাকাব্যের নায়কেরা বনবাসে গমন করে, তখন শ্রোতৃবর্গের ক্রন্দন ও হাহাকারে প্রায়ই পাঠের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু যখন তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া আবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়, তখন গ্রামের গৃহগুলি দীপমালায় ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হয়।" (৩) যাহারা রামায়ণ মহাভারতের ব্যাখ্যা করে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—'পাঠক" ও "ধারক"। পাঠক, মূলের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে, পরে ধারক অল্পশিক্ষিত ইতর-সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে সেই সকল শ্লোক লোকভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। পাঠক ও ধারক উভয়েই ব্রাহ্মণ। যে গৃহস্থ এইরূপ কথকতার স্থলে লোক নিমন্ত্রণ করে, যতদিন না কথকতা সমাপ্ত হয় ততদিন সে কথকদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। সমস্ত মহাভারতের কথা শেষ হইতে তিন মাস—কখন-কখন ছয় মাস লাগে। কথকতা শেষ হইলে কথকেরা পারশ্রমিকস্বরূপ প্রভূত অর্থ লাভ করে।

বিমিশ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে কথকেরা মহাকাব্যের গান করে। উহারা স্খলিত অঙ্গভঙ্গীসহকারে পাঠ আরম্ভ করে। পাঠের মধ্যে মধ্যে নৃত্য ও বাদ্য হইয়া থাকে।

(১) কাদম্বরী।

(২) ...চতুর্বর্গশতক—আবার বৃহৎ কথামঞ্জরীর আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) Max Muller; India, what can it teach us. (P. 81.)

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিরচিত সাঞ্চির একটি উৎকীর্ণ-চিত্রে কথকতা-বৈঠকের একটি চিত্র আছে। কথকেরা কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র হাতে করিয়া, বিবিধ ভঙ্গীসহকারে পা ফেলিয়া নৃত্য করিতেছে। এইরূপ মহাকাব্যপাঠ কতকটা নাট্যাভিনয়ের কাছাকাছি যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া কবিতা শ্রোতার কল্পনাকে উত্তেজিত করে এবং নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গী দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে। সমস্ত মিলিয়া দর্শকের মনে কাব্যের বিষয়টি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দেয়। দর্শকের বাস্তবিকই নাট্যবিভ্রম উপস্থিত হয়। দর্শকের আবেগ উচ্ছ্বাসই তাহার সাক্ষী। তাহার মনে হয় যেন কাব্যোক্ত নায়কদিগকে সে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে, তাহাদের কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেছে। ভারতীয় মহাকাব্যের বর্ণনা-পদ্ধতিও কতকটা এই বিভ্রম উৎপাদনে সহায়তা করে। হোমর ও তাঁহার অনুকারী-গণ যেরূপ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের দ্বারা পাত্রদিগের কথাবার্ত্তা প্রবর্ত্তিত করেন, মহাভারতের পদ্ধতি সেরূপ নহে। কথাবার্ত্তা প্রবর্ত্তিত করিবার সময় মহাভারতে কবিতার ছন্দ পরিত্যক্ত হয়। যথা, "যুধিষ্ঠির বলিলেন……", "দময়ন্তী বলিলেন……" এইরূপ ছন্দোভঙ্গ করিয়া, কবিতার বর্ণনা হইতে পৃথক্ রাখিয়া, পাত্রগণের প্রবেশের প্রতি লোকের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করা হয়।

এই কথোপকথনের পাঠ্যাংশকে অতি সহজেই নাট্যাকারে পরিণত করা যাইতে পারে। বেশী কিছু করিতে হয় না,—দুইজন কথক একত্র হইয়া দুইটি ভূমিকা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেই নাট্য হইয়া দাঁড়ায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে ও উত্তরা-কাণ্ডে ঠিক্ এইরূপ প্রকারের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নারদের উপদেশ অনুসারে বাল্মীকি একটি কাব্য রচনা করিলেন—যাহার নায়ক রাম। তিনি তাঁহার দুই শিষ্য কুশ ও লবকে ইহার আবৃত্তি করিতে শিখাইলেন; কুশ ও লব এই অভিনব কাব্য নগরে নগরে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাম যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই সময়ে লব কুশ অযোধ্যায় প্রবেশ করিল। তাহাদের গানে জনতা আকৃষ্ট হইল। রাজা উহা শুনিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার সমক্ষে সমস্ত রামায়ণের আবৃত্তি হইল। আবৃত্তি শেষ হইলে পর, তখন রাম জানিতে পারিলেন, নির্ব্বাসিতা সীতার গর্ভপ্রসূত তাঁহার পুত্রযুগল এইরূপ সূতমাগধের বেশে উপস্থিত হইয়াছে।

নাট্যসৃষ্টির পক্ষে মহাকাব্যের কি অপূর্ব্ব প্রভাব তাহা কবি ভবভূতি তাঁহার "উত্তর-চরিতে" দেখাইয়াছেন। জনক বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহার পৌত্র বালক লবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার জন্মবৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না। তিনি একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় সহানুভূতিসূত্রে ঐ বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি রামের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন।

জনক।—"আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই দশরথের পুত্রগণের মধ্যে কার কি সন্তান হয়েছে? তাদের নামই বা কি,—আর কোন্ স্ত্রীর কোন্ সন্তান?

লব।—কৈ, এ কথা ত আমরা শুনিনি, কিংবা অন্য কেহই ত শোনে নি।

জনক।—কবি সে কথা কি লেখেন নি?

লব। লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। তারই একটি স্থান তিনি নাট-আকারে রচনা করেছেন। আর সেটি খুব মধুর হয়েছে বলে, অভিনয় করবার জন্ম সেই ক্ষুদ্র কাব্যখানি তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার ভরত-মুনির হাতে দিয়েছেন।

জনক। তাঁকে দিয়েছেন কি অভিপ্রায়ে?

লব। তিনি সেই খানি অপ্সরাদের দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে'। (৪)

নাট্যের উৎপত্তির সহিত মহাকাব্যের যে সম্বন্ধ তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন নাট্যকলার শব্দ-কোষে সংরক্ষিত হইয়াছে। নটের যে দুই নামান্তর "ভারত" ও "কুশীলব", তাহা রাম ও পাণ্ডবদিগের কীর্তিকলাপের গায়ক সূত মাগধ-দিগের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে চলিয়া আসিয়াছে।

যে ভারত নাম নটের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা নাট্যকলার কল্পিত সূত্রকার ভরত হইতে উৎপন্ন, সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি অবশ্য ব্যাকরণ-নিয়মের অনুবর্তী; কিন্তু অন্যান্য সম্ভবপর ব্যাখ্যার মধ্যে এই ব্যাখ্যাটিই কেন গৃহীত হইল তাহার বৈধতা দেখাইতে হইলে, ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের সহিত এই ব্যাখ্যাটির সামঞ্জস্য আছে কি না তাহা দেখাইতে পারিলে ভাল হয়। ব্যক্তি ভরতমুনি কি ভারতমণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী?

এই নামটি বৈদিক কালের কুজ্ঝটিকা-তিমিরে আবৃত; সিন্ধুর শাখা-নদীসমূহের তটভূমে যে সময়ে বিজয়ী আর্য্যগণ শিবির স্থাপন করে, তখনই আর্য্যজাতির এক শাখা ভারতনামক যোদ্ধৃজাতি প্রভূত গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। ভরত-অগ্নি নামে তাহাদের নিজস্ব অগ্নি ছিল। অনুষ্ঠানপদ্ধতির মধ্যে, বিশেষরূপে এই অগ্নির জন্য হব্যের ব্যবস্থাও ছিল। প্রাচীন বীর-যুগের একজন রাজা, শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পুত্র,—তাঁহারও নাম ভরত। আরও অনেক রাজা পৌরাণিক উপাখ্যানে এই নামে পরিচিত। ভরত মুনি অত প্রাচীনকালের দাবী করিতে পারেন না। সংস্কৃতমূলক পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না। এই পুনরুত্থানের সময় হইতেই তিনি সাহিত্যের পূজ্য গুরু আলঙ্কারিকদিগের আরাধ্য অধি-নেতা। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতিপ্রতি-পত্তি সত্ত্বেও তিনি বরাবর অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আকারেই অবস্থিতি করিতেছেন। যে ভারত পৌরাণিক আখ্যানের রচনায় মুক্তহস্ত সেই ভারত ইহার কোন ইতিহাস দেন নাই। একটি মাত্র বচনে তিনি কন্দর্পের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। (৫) স্বর্গস্থ নাট্যা-ভিনয়ের পরিচালনাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার শিষ্য। নাট্যাভিনয়ের ব্যাঘাত করায় তাঁহারই অভি-

(৪) উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক।
(৫) বালরামায়ণ, তৃতীয় অঙ্ক।

শাপে উর্ব্বশী স্বর্গ হইতে বিদূরিত হয়। (৬) তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অবসর কালে, কোন আশ্রমে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা দেন। (৭)

এইরূপ ব্যক্তির ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্বীকার করা অসম্ভব। Lassen (ল্যাসেন) এই নামের উপর একটি রূপক-অর্থ আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সূত মাগধই ভরত শব্দের ঠিক্ অর্থ, কেননা সূতমাগধেরাই এই সকল কাব্য স্মৃতিতে "ভরণ" করিয়া অর্থাৎ ধারণ করিয়া নগরে নগরে গাহিয়া বেড়ায়।" (৮) ল্যাসেনের এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইতে পারে না; ব্যাকরণ এইরূপ শব্দগঠনের প্রতিকূল। তা ছাড়া, "ভরণকর্ত্তা" এই শব্দটির অর্থ যেরূপ অস্পষ্ট, তাহাতে ঐ অর্থে আরও অনেক ব্যবসায় বুঝাইতে পারে। সাধারণ নট অর্থে ভরত শব্দের ব্যাখ্যা না করিয়া উহা মুনি-বিশেষের নাম এইরূপ মনে করাই আমার বোধ হয় সঙ্গত।

ভারতের প্রকৃত অর্থ—ভরত-প্রসূত কোন এক শাখাজাতিসম্বন্ধীয়,—ভরতগণসম্বন্ধীয়। বিশেষণ-পদটি ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ্যরূপে পরিণত হইয়া, ভরতগণের ইতিহাস মহাভারত,—এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান কালেও প্রধান শ্রেণীর এক দল মাগধ (চলিত ভাষায় ভাট) এই ভারত নামে পরিচিত। ভারতেরা মহাভারত, রামায়ণ এবং অন্যান্য মহাকাব্য আবৃত্তি করিয়া থাকে। উৎসবে ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকালে উহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করে। উহারা অনেকের বংশাবলী জানে, এবং বড়-ঘরে উহারা কুলমর্য্যাদার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের অসীম প্রতিপত্তি। বন্য লোকেরাও উহাদের গায়ে হাত উঠাইতে সাহস করে না। সার্থবাহদিগের মধ্যে যদি একজন ভাট থাকে, তাহা হইলে উহাদের আর দস্যুর ভয় থাকে না, উহারা আপনাদিগকে সুরক্ষিত বলিয়া বিবেচনা করে। যে সকল ভারত, কালিদাসের বহুপূর্ব্বে চন্দ্রবংশের যশোগান করিত, বর্ত্তমান ভাটেরা সেই পুরাতন ভারতদিগেরই উত্তরাধিকারী। মহাকাব্যের আবৃত্তি যখন ক্রমে নাট্যে পরিণত হইল, তখন এই ভারত নামেরও অর্থান্তর উপস্থিত হইল। যখন মহাকাব্য হইতে নিঃসৃত হইয়া নাট্যকলা পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, তখন ভারত নাম ভাটকে ত্যাগ করিয়া নটকে আশ্রয় করিল। মহাভারতের আবৃত্তিকারী ভারত নামক এই শক্তিশালী ব্যবসায়ীমণ্ডলী আপনাদের একজন কল্পিত আদিপুরুষ সৃষ্টি করিয়া, ভারতদিগের পিতৃপুরুষ ভরত এই অর্থে তাঁহাকে ভরত নামে অভিহিত করিল। এইরূপ ব্রাহ্মণেরাও ভারতী শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রাণের মূর্ত্তিস্বরূপ ভরত নামক দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতদিগের বাক্য ভারতী এই সাদাসিধা আক্ষরিক অর্থটি এখন আর তাঁহারা গ্রহণ করেন না। (৯)

(৬) বিক্রমোর্ব্বশী দ্বিতীয় অঙ্কের শেষাংশ ও তৃতীয়াঙ্কের প্রথমাংশ।
(৭) গালব, পেলব। বিক্রমোর্ব্বশী—তৃতীয় অঙ্ক।
(৮) ভগবদ্‌গীতা Schlegel Lassen সম্পাদিত—সূচীপত্র—ভরত।
(৯) ঐতরীয় ব্রাহ্মণ ২, ২ ৪, ৬!

কুশীলব এই শব্দটি মহাকাব্যের আর এক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই যুগ্মশব্দ কুশীলব, রামায়ণের অনেক স্থলেই রাম ও সীতার যমজ পুত্রদ্বয় কুশ ও লবকে নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই যুগ্মশব্দের গঠনে, কুশ-শব্দের অন্ত্য-অ ী এ পরিবর্ত্তিত হওয়া অবশ্য প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ। কিন্তু শুধু এই ব্যাকরণঘটিত ব্যভিচারে নামটির পরম্পরাগত ব্যাপার অপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সেণ্ট-পিটার্সবর্গের অভিধানে যাঁহার মত অনুসৃত হইয়াছে সেই ওয়েবার সাহেবও এই শব্দটিকে দুই উপাদানে বিভক্ত করিয়াছেন: প্রথম 'কু'; দ্বিতীয়, শীল; উহা হইতে শীলব এই বিশেষণ পদটি উৎপন্ন। শীলের অর্থ, রীতিনীতি · এই অর্থে নটদিগকে কুশীলব বলিলে, নটেরা নিশ্চয়ই এই নামে শ্লাঘা বোধ করিবে না। ওয়েবার সাহেব "শৈলূষ" ও "শৈলালিন্" এই দুই পর্য্যায় শব্দের সহিত প্রাগুক্ত শব্দের নৈকট্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যুগ্ম-শব্দ "কুশী-লবো" এই গঠনটি অপেক্ষা "শীলবের" গঠনপদ্ধতি আরও অপূর্ব্ব। শীল-শব্দে যে ব-প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে, এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ ত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; এবং বৈয়াকরণেরাও ইহার উল্লেখ করেন নাই। ওয়েবার সাহেব তাঁহার প্রদত্ত নিরুক্তের অনুকূলে যে দুইটি পর্য্যায়শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উল্টা তাঁহার প্রতিপাদিত নিরুক্তের প্রতিকূলেই দাঁড়াইয়াছে; "শৈল" এই ব্যুৎপন্ন শব্দটির মূল-রূপ "শীল" (রীতিনীতি) কখনই নহে, পরন্তু উহার মূল-রূপ—"শিল" (প্রেস্তর)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঠগী-কাহিনীর একটি চিত্র

পুরুষ ঠগের কথাই আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু মেয়ে ঠগের কথা প্রায় শুনি নাই, তবে একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি, আজ এই প্রবন্ধে সেই ঘটনাটিই বিবৃত করিব।

আলিগড়ে ধনশ্রীলাল নামে একজন ধনবান হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা খুব উন্নত, তিন মহল বাড়ি, লোকজন কর্ম্মচারী দাস-দাসী বিস্তর; মান-সম্ভ্রম ও যশ-প্রভুত্বও অসাধারণ। এই অতুল বিভব, এই প্রশস্ত প্রাসাদ, ইহার ভাবী উত্তরাধিকারী ধনশ্রীর একমাত্র কন্যা; ধনশ্রীর আর কোনো সন্তান হয় নাই। তাঁহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বিবাহ করেন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীবাই এর জন্ম। লক্ষ্মীবাই ধনশ্রীর অন্ধের যষ্টি, তৃষ্ণার জল; পরিণয়-পাদপের একমাত্র সুরস ফল, মরুভূমি মধ্যে সুবাসিত সুশীতল বারিপূর্ণ সরোবরবৎ সর্ব্বদাই শোভমানা। তাহার আকর্ণবিস্তৃত বিকশিত নলিনী-দলের ন্যায় কৃষ্ণাভ তারা-বিশিষ্ট উজ্জ্বল চক্ষু, শরতের শোভাময় পূর্ণচন্দ্রের মতো কমনীয় মুখ, আগুল্ফ-লম্বিত কেশপাশ, চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণ,—আর

কোকিল-বিনিন্দিত স্বর। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত দয়াবতী। দরিদ্রের মলিনমুখ—পীড়িতের কাতরধ্বনি তাহার নিকট অসহ্য, কাহারো প্রার্থিত অভাব পূরণ করা তাহার জীবনের ব্রত ছিল।

ধনশ্রী মহাসমারোহে লক্ষ্মীর বিবাহ দিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, আলিগড়ে এত জাঁকজমকের বিবাহ কেহ কখনো দেখে নাই। পাত্রটিও পাত্রীর অনুরূপ—রূপে গুণে এবং ঐশ্বর্য্যে সব দিকেই সমান। ধনশ্রী উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন। পাত্রের বাড়ি মথুরায়। কোনো একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটায় বিবাহের পর সেযাত্রা ধনশ্রী কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে পারেন নাই। বিবাহের দুইমাস পরে কন্যা পাঠানো হইল।

একমাত্র কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে, সুতরাং ধনশ্রী তদুপযুক্ত অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বাকি রাখিলেন না। একখানি খুব ভালো 'বয়েল গাড়ি', তাহার মধ্যে সুন্দর সুকোমল শয্যা। গাড়ির গোরু দুটি প্রকাণ্ডকায় ও সমধিক বলিষ্ঠ। সঙ্গে দশজন বরকন্দাজ ও চারিজন মেহেরা (দাসী) চলিল। এবং আর ৮ জন হৃষ্টপুষ্ট বেহারা কিংথাপের বস্ত্রাচ্ছাদিত একখানি পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীবাই পাল্কীতেই যাইবেন, তবে যাইতে যাইতে ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ হইলে তখন 'বয়েল' গাড়িতে চড়িবেন। কারণ পথ অতি দীর্ঘ, আলিগড় হইতে মথুরায় হাঁটিয়া যাইতে দুই দিন লাগে।

ধনশ্রী বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে কন্যাকে সাজাইয়া দিলেন। আর একখানি পৃথক গাড়িতে জিনিষ-পত্র বোঝাই করা হইল। পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্ন স্থির করিয়া দিলে সকলে যাত্রা করিল। ধনশ্রী ও তাঁহার বাড়ির সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন।

দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার তামসী-ছায়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এমন সময়ে গাড়ি আসিয়া এক নির্জ্জন বনের ধারে থামিল। সেই রাস্তার দুই দিকেই গহন বন, তবে সঙ্গে অনেক লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র থাকায় কেহ ভীত হইল না। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর সকলে আবার অগ্রসর হইল। এখন সেই বন অতিক্রম করিয়া গাড়ি সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। তার দুই দিকে দুইএকখানি পল্লীগ্রাম। গ্রামগুলি ছোট ছোট মৃন্ময় পাহাড়ের শিরোদেশে অবস্থিত। তথাকার স্ত্রীলোকেরা আলো দেখিয়া নামিয়া আসিল এবং গাড়ির পর্দ্দা তুলিয়া নব-বধূর মুখ দেখিল। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেছে, ইহাতে কেহ আপত্তি করিল না। এই ঘটনার পর গাড়ি প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে, হঠাৎ এক অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সকলের শ্রুতিগোচর হইল। সকলে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিল যে, এক বৃদ্ধা রাস্তার পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে।

বাহকগণের কঠিন হৃদয় সেই বৃদ্ধার ক্রন্দনে কিছুমাত্র দ্রবীভূত হইল না। তাহারা কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তখন 'গাড়ির' মধ্যেই ছিলেন। পাল্কীখানি চলিয়াছে—'বয়েল' গাড়ির সকলের

পিছনে। লক্ষ্মীর কর্ণে সেই বৃদ্ধার রোদন-ধ্বনি প্রবেশ করিল—দয়াবতীর দয়ার্দ্র হৃদয় সহজেই গলিল, তখনি গাড়ি থামাইতে হুকুম দিলেন। গাড়ি থামিলে সঙ্গীগণ মনে করিল যে, গাড়ির 'রাস' ছিঁড়িয়াছে, সুতরাং তাহারা না থামিয়া চলিতেই লাগিল। লক্ষ্মী সেই বুড়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি কাঁদ্‌চিস কেন?" বুড়ী ক্রন্দনের সুর আরো চড়াইল—সহানুভূতির স্পর্শে তাহার শোক যেন সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল! সে বলিল,—"মা, তুমি রাজরাণী হও, রাজার মা হও, আমি অতি দুঃখিনী, আমার আর কেউ নেই গো—কেবল একমাত্র মেয়ে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

বুড়ীর চেহারা অত্যন্ত খারাপ, শরীর কৃশ অস্থিসার, কিন্তু নয়নে কুটিল কটাক্ষ—মুখে যেন একটু কি-যেন কেমন ভাব! হাতে একখানি লাঠি ও কাছে একটি পুঁটুলি। লক্ষ্মী বলিলেন,—"বুড়ি, কাঁদিস কেন? বল্‌না কি হয়েছে, তোর মেয়ের কি কিছু অমঙ্গল হয়েছে?"

বুড়ী বলিতে লাগিল,—"মা, আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে, তার উপর বিধাতার নজর পড়েছে। মাগো, আমার কি হবে গো?" বুড়ী আবার কাঁদিতে লাগিল।

লক্ষ্মী এরূপ ক্রন্দনের সুরে আসল কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিজ খাদ্যদ্রব্য হইতে কতকগুলি মিষ্টান্ন উঠাইয়া বুড়ীকে খাইতে দিলেন। বুড়ী তখন কান্না ভুলিয়া ভোজনে মনোনিবেশ করিল, আহারান্তে আবার তাহার সেই কাহিনী আরম্ভ করিল। লক্ষ্মী সেই সুদীর্ঘ কাহিনীর মধ্য হইতে এই বুঝিলেন যে, বৃদ্ধার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল, কিন্তু এখন একটি মেয়ে ভিন্ন আর কিছুই নাই। সে জাতিতে আহির, তাহার জামাতার অবস্থা ভালো নহে। কন্যাটি সম্প্রতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, তার শ্বশুর-বাড়ি মথুরা হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে। এই কাহিনীর পর বৃদ্ধা নিরস্ত হইল।

রজনীর অন্ধকার সমস্ত প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মাঠের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। বৃক্ষতলে, নদীর জলে, কঙ্করময় রাজপথে, চতুর্দ্দিকেই যেন গাঢ় মসী বৃষ্টি হইয়াছে! গগন মণ্ডলে কতকগুলি নক্ষত্র মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, বিশ্বসংসার নিস্তব্ধ! কেবল 'বয়েলগাড়ির' চাকার শব্দ, গোরুগুলির উপর চালকের নানাবিধ সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাষণ এবং দুই একটি গ্রাম্য কুকুরের চীৎকার ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছিল না।

বুড়ী একটু থামিয়া আবার আপন মনেই বকিয়া যাইতেছে, লক্ষ্মী মাঝে মাঝে 'হুঁ' দিতেছেন, আবার কখনো বা সে দিকে কর্ণপাতও না করিয়া পিতামাতার কথা ভাবিয়া অবসন্ন হইতেছেন। বুড়ীর গল্প কিন্তু এক টানা স্রোতের মতো চলিতেছে।

লক্ষ্মীর বড় পিপাসা পাইল। সমস্ত দিন রৌদ্রের প্রখর তেজ গিয়াছে, 'গাড়ির' চতুর্দ্দিক পর্দ্দা দিয়া ঘেরা—বায়ু সঞ্চালনের কিছুমাত্র উপায় নাই; দারুণ উত্তাপ! লক্ষ্মী সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, "বুড়ী মা, একটু জল দিতে পারিস?" বুড়ী "বলিস কেন,

তেষ্টা পেয়েছে জল খাবে তা দিচ্চি। 'গাড়ি' থামাতে বল কোথায় কূয়া আছে নেবে দেখি। রসি ও লোটা সঙ্গে আছে তো?" লক্ষ্মী বলিলেন, "না না, নাব্‌তে হবে না, এখানে মেটে কলসীতে জল আছে, তাই দে।" তখন বুড়ী কলসী হইতে জল ঢালিল এবং একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া বস্ত্র-প্রান্ত হইতে একটি ছোট কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া কি একটা গুঁড়া সেই জলে মিশাইল।

লক্ষ্মী একনিশ্বাসে সব জলটুকু খাইয়া ফেলিলেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট পরে বলিলেন,—"বুড়ী, আমার গা কেমন করচে তুই দরোয়ানকে ডাক্।" এই বলিয়াই তিনি বুড়ীর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

বুড়ী জলের সহিত তীব্র বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল!

বুড়ীর কোলে লক্ষ্মী অসাড় হইয়া পড়িয়া আছেন। বুড়ী তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিতে লাগিল, এবং উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি রেশমি রুমাল বাহির করিয়া বালিকার গলায় ফাঁসি লাগাইয়া তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিল।

তখন বুড়ীর অধরে কৃতকার্য্যতার মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল। সে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে হাতড়াইয়া লক্ষ্মীর গহনার বাক্সটি লইল এবং বালিকার মুখের কাছে মুখ লইয়া ফিশ্ ফিশ্ করিয়া কি মন্ত্র পড়িল, তৎপরে আস্তে আস্তে গাড়ি হইতে নামিয়া প্রস্থান করিল। গাড়ির মধ্যে রহিল—লক্ষ্মীর প্রাণশূন্য, স্পন্দনশূন্য নব-কিশলয়-দল তুল্য দেহ!

রাত্রি অল্প থাকিতে 'বয়েল' গাড়ি লক্ষ্মীর শ্বশুর-বাড়ির সদর দরজায় থামিল। এই প্রথম বার বধূ ঘর করিতে আসিতেছেন, একটা আনন্দের উৎকণ্ঠায় সমস্ত রাত বাড়ির কেহই ঘুমায় নাই। বাড়ির দরজায় আলপনা, নিকটস্থ পথে পঞ্চবর্ণের গুঁড়া ও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পুষ্প ছড়ানো। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিতেছেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্যই এই সব আয়োজন।

লক্ষ্মীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী মঙ্গল-প্রদীপ হস্তে লইয়া পুরমহিলাগণ সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে গিয়া গাড়ির দ্বার উন্মোচন করিলেন; দেখিলেন বধূ শুইয়া রহিয়াছেন, ডাকিলেন, "মা, মা, ওঠ মা, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেছ ওঠ মা!" কিন্তু হায়! মা কি আর আছেন!

গৃহিণী বধূর মুখের কাছে আলো ধরিলেন কী ভয়ানক! কী লোমহর্ষণ! কী শোচনীয়! সেই উষা-নলিনী তুল্য অনতি বিকশিত সৌন্দর্য্যে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে! সোনার অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছে! সেই খঞ্জনবৎ চঞ্চল চক্ষু স্থির ও নিস্তব্ধ! সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ সুন্দর তারকা উর্দ্ধে উঠিয়াছে! গৃহিণী দেখিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন—তাঁহার সংজ্ঞা-লোপ হইল! তখন বাড়িতে একটা ভীষণ হাহাকার উঠিল! আনন্দ উচ্ছ্বাস এই রোদনের ধ্বনিতে ডুবিয়া গেল! পথের ফুল পথেই পড়িয়া রহিল! সকলে সেই মূর্চ্ছিতা গৃহিণী ও লক্ষ্মীর শবদেহ বাড়ির ভিতর লইয়া গেল।

হায়! কী দুর্দ্দৈব! মুহূর্ত্তে বিবাহ বাসর

শ্মশানে, আনন্দ-উৎসব শোকবিভীষিকায় পরিণত হইল!

* * *

এই দুর্ঘটনার নায়িকা সেই রাক্ষসী ঠগী পরে ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিল।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

চীন-কুসুম।

(কবি লি পো—অষ্টম শতাব্দী)

জো—ইয়ে তটে

(১)

নদীর স্রোতমুখে তারা
করিতেছে মৃণাল চয়ন ;
শৈবাল করিছে নতশিরে
তরী হ'তে তবারে গোপন!
প্রাণের নিভৃত দেশ হ'তে
[illegible] সুখ আলাপন,
নদীর সে কলহাসি সনে
বহিয়া আনিছে সমীরণ!

(২)

নবীন সবুজ কুঞ্জমাঝে
সুবর্ণের দীপ্ত জ্যোতিরেখা,
চাঁদের বদন পরে আসি
বাঁধিয়াছে চারু চিত্রলেখা!
দেহের বাহু আভরণ,—
সুরভি সমীর খেলে তায় ;
মাঝে মাঝে চুপে চুপে তারে
প্রীত করে যত প্রাণ চায়।

কিন্তু হেথা কা'রা আসে ওই,
অশ্বারোহী সৈনিকের দল?—
বীরবেশ নদীর কিনারে
রবিকরে করে ঝলমল্।
সবে মিলে চলে সারি সারি,
তিন জন পাঁচ জন করি,
শৈবাল বনের পরপারে,
নিজড়িত স্রোতরেখা পার!

(৩)

অশ্ব এক করে হেষা রব,
সৈনিক যুবক একজন
অশ্বখুরে দলি ফুলদলে
করে বুঝি যাত্রা আয়োজন।
বৃথা চাহে ভীতা ওই বালা,
রোধিবারে হৃদয় কম্পন,
নয়নের গোপন কথায়
চাহে দিতে বৃথা আবরণ!

শ্রী[illegible]কুমার বসু।

স্থায়ীত্ব।

(সেখ সাদীর পারসী হইতে).

দাতার হৃদয় নহে রতনের বাস,
প্রেমিকের চিত্ত নহে ধৈর্য্যের আবাস,
শত ছিদ্র পাত্রে জল রহে কতক্ষণ,
কেবল পতনে তার লাগে যতক্ষণ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

মাতৃঋণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত্র।

ইহার কিছুকাল পরে আর্জেন্তর নিকট হইতে জিমনেসে মরোভাঁর নামে এক পত্র আসিল।

মরোভাঁকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছে,—অকস্মাৎ এক আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কাজেই স্কুলে অধ্যাপকের কার্য্য করা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় নিতান্ত দুঃখের সহিত এ পবিত্র ব্রত পালন করিতে সে সক্ষম হইতেছে না ইত্যাদি। পত্রের পাদদেশে কয়েক ছত্রে লেখা ছিল, মাদাম বার্বাসিও সহসা প্যারিতে চলিয়া আসিয়াছেন, পুত্র জ্যাককে পিতার মত স্নেহপরায়ণ অধ্যক্ষ মরোভাঁর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। মরোভাঁ জ্যাককে পিতার মত স্নেহ করিবেন, মাদাম এ আশা রাখেন। জ্যাকের অসুখ বিসুখ হইলে সে সংবাদ আর্জেন্তকে দিলেই চলিবে, আর্জেন্ত মাদাম বার্বাসিকে তখনই সে সংবাদ প্রেরণ করিতে একটুকু বিলম্ব করিবে না।

পিতার মত স্নেহপরায়ণ! কি অসহ্য এ বিদ্রূপ! আর্জেন্ত কি মরোভাঁকে জানে না? জ্যাকের মা এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—জ্যাকের তরফ হইতে একটা কপর্দ্দক পাইবারও যখন সম্ভাবনা ফুরাইয়াছে, তখন মরোভাঁর নিকট জ্যাক কেমন ব্যবহার পাইবে, তাহা আর্জেন্ত বেশ বুঝে! তবু এ কথা লিখিয়াছে! চমৎকার!

এই কয় ছত্র পাঠ করিয়া রোষে, ক্ষোভে মরোভাঁর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! সে অনলের তাপ জিমনেসবাসী সকলেই অল্পাধিক অনুভব করিল।

চলিয়া গিয়াছে!

সেই ভিখারী কদর্য্য লোকটার সহিত চলিয়া গিয়াছে। লোকটার না আছে বুদ্ধি, না আছে এতটুকু সামর্থ্য! নিতান্তই দাম্ভিক, মূর্খ, অপদার্থ। আর সেই নারী! সে এতটুকু দ্বিধা করিল না। স্বচ্ছন্দে এমন পুত্রের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কি হৃদয়হীনা,—কি পাষাণী সে!

আর্জেন্তর পত্রখানা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে মরোভাঁ একটা ক্রূর মৃদু হাস হাসিল, ভাবিল; বাপের মত যত্ন করব আমি, বটে। বাপের মত যত্ন, একেবারে হুবহু!"

সম্ভাবিত মাসিকপত্রের সমস্ত আশা লুপ্ত হইল বলিয়া যে মরোভাঁর এত আক্রোশ হইয়াছিল, তাহা নহে। এ আক্রোশের প্রধান কারণ ছিল, ঈর্ষ্যা! এই দুইটি প্রাণী প্রথম সাক্ষাৎ অবধি আপনাদিগকে যেমন একান্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনই উভয়ের চতুর্দ্দিকে তাহারা এমন একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করিয়া রাখিয়াছিল যাহার মধ্য দিয়া ভিতরকার এতটুকু গোপন রহস্যও মরোভাঁর সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। এমন করিয়া চতুর মরোভাঁর চক্ষে উভয়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবে এবং এত শীঘ্র—তাহা মরোভাঁ কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই!

জ্যাক! জিমনেসেই সে থাকিবে! কিন্তু অর্থ জোগাইবে কে? মরোভাঁ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সংবাদ লইতে গিয়া কর্ত্রীর মুখে শুনিল মাদাম বার্ঁাসি এখানকার বাস উঠাইবারই একরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, ফিরিবার সম্ভাবনা তাঁহার বড় একটা নাই!

জিমনেসে ফিরিয়া মরোভাঁ স্থির করিল, আর একটা মাস শুধু জ্যাক এখানে স্থান পাইবে! তার পর উদার আকাশের তলে সে আপনার আশ্রয় খুঁজিয়া লউক!

সে দিন জ্যাক আহারের সময় মরোভাঁর পার্শ্বে স্থান পাইল না। আহার্য্য ও যাহা মিলিল, তাহা নিতান্ত নিকৃষ্ট। জীবনে জ্যাক এমন আহার্য্য মুখে তুলে নাই! তাহার উপর মরোভাঁর দৃষ্টি কি ক্রুর, কি ভীষণ!

মাহুর কাছে আসিয়া জ্যাক ডাকিল, "মাহু!"

মাহু তখন আপনার মনে কি বকিতেছিল। জ্যাক কহিল, "তুমি কি গান গাচ্ছ, মাহু?"

মাহু কহিল, "না—একটা কথা ভাবছিলাম!"

জ্যাক মাহুকে আপনার কাহিনী বলিল, তাহার মা,—জগতে সে মা ছাড়া আর কাহাকেও সে জানে না,—সেই মা তাহাকে এখানে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছেন, আর ফিরিবেন কি না, কে জানে!

মাহু বন্ধুর নিকট আপনার মতলব খুলিয়া বলিল।

মাহু জিমনেস পরিত্যাগ করিবে। নিশ্চয়! অনেক দিন হইতেই কথাটা সে ভাবিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কখনও একটা দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারে নাই। অন্ধকার জীবনে এখন সূর্য্যোদয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে! আর সহ্যও হয় না! সেদিন চিড়িয়াখানায় গিয়া সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে! বাহিরের মিষ্ট বায়ু যাহা সে ভোগ করিতেছিল, পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীগুলা তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল! পরিমিত আহার, নিয়মিত সময়, সে কি দারুণ কষ্টকর! সে দাহমিতে কারিকার কাছে ফিরিয়া যাইবে! জ্যাক যদি সম্মত হয় ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে মাহু প্রস্তুত আছে! পথে কোন ভয় নাই, 'গ্রি-গ্রি'র গুণে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।

জ্যাক সম্মত হইল না! প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত মাহুর সে বনের গৃহ অপেক্ষা দুঃখদারিদ্র্য ঘেরা জিমনেসের এ বায়ু আলোকহীন কক্ষও অনেক ভাল।

মাহু কহিল, "বেশ, তুমি তবে এখানে থাক, আমি একলাই যাব।"

জ্যাক কহিল, "কখন যাবে, তুমি?"

মাহু কহিল, "কাল ভোরে।"

পরদিন বেলা হইলে জিমনেসে একটা কোলাহল উঠিল। ভোরে মাহু বাজারে গিয়াছে, বেলা এগারটা বাজে, এখনও তাহার দেখা নাই; কেহ এখনও খাইতে পায় নাই! মাদাম মরোভাঁ কহিল, "নিশ্চয়, পথে তার কোন বিপদ হয়েছে।" মরোভাঁ কিছু বলিল না। দীর্ঘ যষ্টি হস্তে অধীর আগ্রহে মধ্যে মধ্যে জিমনেসের দ্বারে আসিয়া মরোভাঁ দেখিতেছিল, কখন সে কাফ্রীটা ফিরে।

কিন্তু কাফ্রী ফিরিল না। মাদাম মরোভাঁ অবশেষে নিকটস্থ দোকান হইতে আহার্য্য আনিয়া ক্ষুধাতুর জিমনেসকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ করিল। আহারাদির

পর মরোভাঁ কহিল, "তার কাছে টাকাকড়ি কত ছিল?"

"পনেরো ফ্রাঙ্ক!"

"পনেরো ফ্রাঙ্ক! তা হলে নিশ্চয় সে পালিয়েছে!"

ডাক্তার হারজ কহিল, "পনেরো ফ্রাঙ্কে ত আর দার্হমি যাওয়া যায় না!"

মরোভাঁ মাথার টুপি উঠাইয়া থানায় চলিল!

যেমন করিয়া হউক এই মাত্রকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মার্শেল অবধি যেন সে না যায়! বনফিলদের কাণে যেন এখানকার কথা না উঠে! পৃথিবীতে চতুর্দ্দিকে কেবলই ঈর্ষা। রাজপুত্র জিমনেসের নিন্দা করিলে নিষ্কম্মা সংবাদপত্র-সম্পাদকের দল এখনই কুক্কুরের মত চীৎকার করিয়া উঠিবে। জিমনেসের প্রতিপত্তি, তাহা হইলে, নিমেষে টুটিয়া যাইবে! কাজেই সকলের মুখে চাপা দিতে হইবে!

পুলিশের নিকট মরোর্ভা যে বিবরণ লিখাইল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম,—মাত্র অনেক টাকাকড়ি লইয়া পলাইয়াছে, কিন্তু সেজন্ত মরোভাঁ কাতর নহে। হতভাগ্য, নির্ব্বাসিত, বিদেশী রাজপুত্র,—আহা সে বালক মাত্র,—পথে কত বিপদে পড়িতে পারে।

কথাটা বলিয়া ব্যাঘ্র চক্ষু মুছিল! ইনস্পেক্টর আশ্বাস দিল, "ভাবনা কি, মুসোঁ, নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করব!"

মরোভাঁ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইনস্পেক্টরের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "তাকে খুঁজে দাও, বেচারা রাজপুত্র সে,—আমি চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

চারিধারে সন্ধান চলিতে লাগিল। পারি সহরের সমুদয় ফটকে প্রহরীর দল সতর্ক রহিল। কষ্টমের কর্ম্মচারীর নিকট কাফ্রী বালকের আকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাঠান হইল। জিমনেসের বালকের দলকে লইয়া মরোভাঁ হারজ সকালে-সন্ধ্যায় নানাপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! কিন্তু বিশেষ ফল হইল না।

ঘরে ফিরিয়া জ্যাক ভাবিত, মাত্র এতদিনে কতদূর গিয়াছে। তাহার মাথার উপরও যে আকাশ, মাত্রর মাথার উপরও সে একই আকাশ! আকাশ তাহাদিগের দুইজনকেই দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছে না। রাত্রে মাত্রর শূন্য বিছানা দেখিয়া জ্যাক ভাবিত, মাত্র পলাইতেছে! পলাও, পলাও মাত্র—প্রাণপণে পলাও!

সে রাত্রে বিছানার উপর বসিয়া জ্যাক আপনার অবস্থার কথা ভাবিতেছিল! মা—কোথায়, মা? আর কি কখনও সে মার দেখা পাইবে না? বুকটা দারুণ দুঃখে ভরিয়া উঠিল। জ্যাকের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল!

বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ভীষণ শব্দে বৃষ্টি নামিল! জ্যাক ভাবিল, আহা, এই জলে পথে মাত্রর কত কষ্ট হইতেছে! শিলা ও ঘন তুষারপাত আরম্ভ হইল! মাত্রর কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্যাক ঘুমাইয়া পড়িল! সে স্বপ্নে দেখিল, কি সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে মাত্র পলাইতেছে—ঐ যে, মাত্র, ঐ যায়! একটা বিকট উল্লাস-চীৎকারে চমকিয়া জ্যাক জাগিয়া উঠিল! জাগিয়া

শুনিল, বাহিরে একটা রব উঠিয়াছে—জ্যাক বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একজন কহিল, "মাত্কে পাওয়া গেছে!" জ্যাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! ধরা পড়িয়াছে! বেচারা মাত্! নিতান্ত অভাগা!

জিমনেসের ছাত্রের দল সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অধ্যাপকের দল বসিয়া—মরোজাঁর সম্মুখে বিচারার্থীর মত দাঁড়াইয়া, মাত্! তাহার চোখদুইটা কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ শুষ্ক, পোষাক কাদামাখা, স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে—এই মাত,—কয়দিনে তাহার এ কি পরিবর্তন হইয়াছে!

মাত্ জ্যাকের পানে চাহিল! উভয়ের চোখে নীরবে কি বেদনার ভাষা ফুটিয়া উঠিল, তাহা তাহারাই বুঝিল! সে ভাষা বুঝিবার লোক জিমনেসে ছিল না।

পুলিসের লোক চলিয়া গেলে মাত্র শাস্তি আরম্ভ হইল! তীব্র তিরস্কারের সহিত পৃষ্ঠের উপর মরোজাঁর কশার তীব্রবেগে আঘাত পড়িল,—এক, দুই, তিন, চার—। মাত মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল! জ্যাক কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়ালে ভর দিয়া কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া লইল!

সারাদিনের মধ্যে জ্যাক মাত্কে আর দেখিতে পাইল না। রাত্রে তাহারই পার্শ্বের বিছানায় মাত শুইয়াছিল। নিকটে মরোজাঁ, মাদাম মরোজাঁ ও ডাক্তার হারজ্ দাঁড়াইয়াছিল।

মরোজাঁ কহিল, "অসুখটা কি বেশী, ডাক্তার হারজ্?"

মাদাম কহিল, "ভয় আছে, কিছু?"

হারজ্ কহিল, "ভয় আবার, কি? এ কাফ্রীগুলোর প্রাণ লোহার মত শক্ত!"

তাহারা চলিয়া গেলে, জ্যাক আসিয়া মাত্র পার্শ্বে বসিল, ডাকিল, "মাত্!"

"কে, জ্যাক?"

জ্যাক কহিল, "তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, মাত! অসুখ করেছে, কি?"

"মাত্ আর বাঁচবে না, জ্যাক—তার 'ত্রি ত্রি' কোথায় হারিয়ে গেছে।" জ্যাক স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

মাত ডাকিল, "জ্যাক!"

"কেন, মাত?"

"দাহমিতে আর যাওয়া হল না!"

এক ফোঁটা গরম জল মাত্র কপালের উপর পড়িল।

মাত কহিল, "জল পড়ল, কোথা থেকে? তুমি কাঁদছ, জ্যাক?"

"না,—তুমি ঘুমোও, মাত, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি।"

"না, না,—তুমি যাও! মরোজাঁ যদি দেখে ত, তোমায় আস্ত রাখবে না!"

সকালে মাত্র অবস্থা খারাপ হইল। ডাক্তার হারজ্ আপনার মৌলিকতা জাহির করিবার জন্য মাত্কে চিকিৎসার নূতন ব্যবস্থা করিল। বাগানের মধ্যে গাছের তলায় মাত্র বিছানা পড়িল। হারজের নানাবিধ উদ্ভট ঔষধ-প্রক্রিয়াতেও কোন ফল দেখা গেল না। শেষরাত্রে মাত্র সকল দুঃখের অবসান হইল।

মরোজাঁ আদেশ দিল, ঘটা করিয়া কবরের ব্যবস্থা করিতে হইবে!

এমন ঘটা দরিদ্র পল্লীতে কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই!

ফুল দিয়া শবাধার সজ্জিত হইল—অধ্যাপকের দল ছাত্রের দল পশ্চাতে নতমস্তকে চলিল; শোক-যাত্রার সাধ্যাতিরিক্ত আয়োজন হইল! সারা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে জিমনেসেব অভিমুখে ফিরিল! জ্যাক ইচ্ছা করিয়া মধ্যে মধ্যে পিছাইয়া পড়িতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নিবিড় হইয়া আসিল, তখন একটা অন্ধকার গলির মোড় বাঁকিবার সময় সকলের অলক্ষিতে জ্যাক কোথায় সরিয়া পড়িল!

তীর ছাড়িয়া অনাদৃত অসহায় বালক জগতের বিপুল কর্ম্মস্রোতের মুখে ঝাঁপ দিল। সে স্রোতের বেগে কোথায় যাইবে, কে জানে। ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর বয়স।

এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক রহস্ত দেখা যায়, যাহাদের উদ্ভেদ সাধারণ ব্যক্তিদের নিকট আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দিগের বিশাল মস্তিষ্কে সেই জটিল বিষয়ও অনেকটা সহজবোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বয়স সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ইহাদের অন্যতম।

বহুকাল হইতেই দুই বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল। পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর বয়স দুই কোটি হইতে চার কোটির মধ্যে। এদিকে ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে পৃথিবীর জন্ম অন্যূন দশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। সম্প্রতি এক অভিনব বিজ্ঞানের (Science of radio activity) আলোকে এই উভয় দলেরই মত খণ্ডিত হইয়া পৃথিবীর বয়স ন্যূনকল্পে ১৫০ কোটি বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বহির্দ্দেশ দেখিয়া ইহার আকার গঠন তাপপরিমাণ পরীক্ষা করিয়া, শূন্যে ইহার পরিভ্রমণবেগ, সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব, সূর্য্যের তাপাধিক্য ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, কতকগুলি প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়াছিলেন। এবং এই সকলের সহিত সূক্ষ্ম অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবীর বয়স দুই কোটি হইতে চার কোটির মধ্যে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাক্‌স্‌লি (Hasley) কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে যে মূল প্রতিজ্ঞা সমূহের উপর নির্ভর করিয়া পদার্থবিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বয়স নিরূপণে অগ্রসর হন, সে গুলিতে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। ভিত্তি এইরূপ শিথিল হইলে, তাহাতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ কখনও সুদৃঢ় হইতে পারে না।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বয়ঃক্রম নির্ণয় করিতে গিয়া ভূতত্ত্ব পন্থার অবলম্বন করেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, পৃথিবীর স্থলভাগ ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রগত হইতেছে। তুষারসংঘাতে পর্ব্বতগাত্র চূর্ণ হইয়া গিরিমূলে পতিত হইতেছে। তথা হইতে নদী বাহিত হইয়া সমুদ্রের তলদেশে স্তরোপরি স্তরবিন্যাস করিতেছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। বারিবর্ষণ, নদীপ্রবাহ, তুষারপাত প্রভৃতির অবিরাম ক্রিয়ায় কত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের ভগ্নাবশেষ মহাসাগরের অতলজলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। সমুদ্রগর্ভে এই স্তরবিন্যাস ক্রিয়া অবিরাম হইলেও খুবই ধীরগতি। মোটামুটি ধরিতে গেলে খ্রীষ্ট জন্মিবার পর হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠ কেবল আট ইঞ্চি মাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষয়ের পরিমাণ ও ইহার সহিত গঠিত পর্ব্বতস্তরসমূহের স্থূলতা ও উচ্চতা প্রভৃতির তুলনা করিয়া সূক্ষ্ম গণনার সাহায্যে এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপারে ন্যূনপক্ষে পৃথিবীর দশকোটি বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অধ্যাপক জোলি (Professor Joly) অন্যরূপ পরীক্ষায় ঠিক এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; এবং এইজন্য তিনি Royal Society নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সভা হইতে সম্প্রতি একটী স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক জোলি অনুমান করেন যে সমুদ্র একদা নদ পুষ্করিণী প্রভৃতির ন্যায় বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ ছিল; ইহার জলস্থ লবণের ভাগ সমস্তই নদীপ্রবাহে স্থল হইতে আসিয়াছে। এই অনুমান করিয়া তিনি সমুদ্রের নানা অংশের জলরাশির বিশ্লেষণ করেন; এবং বৎসর বৎসর নদী বাহিত হইয়া কত পরিমাণ লবণ সমুদ্রে আসিয়া পড়ে, তাহারও একটা গড়পরিমাণ স্থির করেন। এইরূপ তুলনায় তিনি দেখেন যে, সমুদ্রজলে এখন যে পরিমাণ লবণ আছে, তাহা জমিতে দশকোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

কিন্তু সম্প্রতি বিবিধ অংশুবিকিরণ তত্ত্বের আবিষ্কারে ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের এই ভূমণ্ডল ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান অপেক্ষা বহু কোটি বৎসরের প্রাচীন; ন্যূনকল্পে পৃথিবীর বয়স ৭৫০ কোটি বৎসর। এই সিদ্ধান্তের সহিত অমূলক কল্পনার কোনও সংস্রব নাই; প্রত্যুতঃ ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সূক্ষ্মগণনার সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইয়ুরেনিয়াম (Uranium) ধাতুর রহস্যাবিষ্কার এই তত্ত্বনিরূপণে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ইয়ুরেনিয়াম এক আশ্চর্য্য পদার্থ। ইহা রেডিয়াম ধাতু অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার অণু সমূহে যে কি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। সাড়ে সাতীশ মণ ইয়ুরেনিয়াম লণ্ডনের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড সহরকে এক বৎসর আলোকিত করিয়া রাখিতে পারে। ইহার চালক শক্তি এইরূপ যে, এক পেয়ালা পরিমিত ইয়ুরেনিয়াম প্রকাণ্ড 'ড্রেডনট' যুদ্ধ জাহাজকে পূর্ণবেগে সমস্ত পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে পারে। কিন্তু ইহার শক্তিসত্তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের কোন সংশয় না থাকিলেও তাঁহারা এই শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিতে এখনও সক্ষম হন নাই। ইয়ুরেনিয়াম নিয়তই নিজেকে সরলতর পদার্থে চূর্ণ করিয়া তাহার লঘু অণুগুলিকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে। এই চূর্ণিত অণুগুলির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে সহস্র সহস্র মাইল। যুদ্ধ জাহাজের একটা গোলা ২½ সেকেণ্ডে এক মাইল মাত্র গমন করে। কিন্তু ইয়ুরেনিয়ামের একটি অণু ঐ সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। ইয়ুরেনিয়ামের অণুগুলি নিয়তই রেডিয়ামে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এবং এই পরিবর্ত্তন ব্যাপার অবলম্বন করিয়াই আমরা ইয়ুরেনিয়ামের অস্তিত্বকাল অনুমান করিতে পারি।

অংশুবিকিরণ তত্ত্বের ইহা একটী বৈজ্ঞানিক নিয়ম যে, দুইটী অংশুবিকিরণকারী (radio-active) পদার্থ যদি বিভিন্নগতিতে পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে কোন খনিজ পদার্থে তাহাদের পরিমাণানুপাত দেখিয়া তাহাদের অস্তিত্বকালের পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। ইয়ুরেনিয়াম ও রেডিয়াম উভয়েই অংশুবিকিরণকারী পদার্থ; উভয়েই নিয়ত পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এবং উভয়কেই সর্ব্বত্র ও একত্র ও একই অনুপাতে দেখিতে পাই। এক গ্রেণ রেডিয়াম পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে ২৫০০ বৎসর আবশ্যক হয়। এবং সর্ব্বত্রই ইয়ুরেনিয়াম রেডিয়াম অপেক্ষা ৩০ লক্ষ গুণ অধিক দেখা যায়। অতএব অংশু বিকিরণ তত্ত্বের মূল সূত্রানুসারে ইয়ুরেনিয়ামের বয়সকাল রেডিয়াম অপেক্ষা ৩০ লক্ষ গুণ অধিক অর্থাৎ ইয়ুরেনিয়ামের অস্তিত্বকাল ৭৫০ কোটি বৎসর। সুতরাং আমাদের এই পৃথিবীও ন্যূনকল্পে সাত শত পঞ্চাশ কোটি বৎসরের প্রাচীন।

এই অংশু-বিকিরণকারী পদার্থসমূহের তত্ত্বাবিষ্কারে একটি ভৌতিকৈনিক মতবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞাবিদ্ পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পৃথিবী ক্রমশঃই শীতলতর হইতেছে এবং এই শীতল-

তার সহিত মানবজাতির জীবন প্রদীপের তৈলও ফুরাইয়া আসিতেছে; ক্রমে এমন একদিন আসিবে যখন পৃথিবীর সমুদায় উত্তাপের বিনাশ হইয়া, পৃথিবী আধুনিক চন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি অধ্যাপক ষ্ট্রাট (Professor Strutt) আমাদিগকে অভয় দিয়া বলিতেছেন যে, পৃথিবী শীতলতর হইয়া মানববাসের অযোগ্য হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ পৃথিবীর পর্ব্বত সমূহে এখনও এত রেডিয়াম রহিয়াছে যে উহারা পৃথিবীর তাপবিকিরণ-জনিত ক্ষতি অনায়াসে পূরণ করিতে সক্ষম। সুতরাং এই কোটি কোটি বৎসরের প্রাচীন পৃথিবীর জীবশূন্য হইবার আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

শ্রীদীনবন্ধু সেন বি, এ।

ব্যবহার ক্ষেত্র।

ব্যবহার মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ব্যবহার ব্যতীত কোন মনুষ্য থাকিতেই পারে না। ব্যবহারেই মনুষ্যের নানা গুণ ও শক্তির বিকাশ ঘটে, অতএব ব্যবহার ক্ষেত্র যে মনুষ্যের একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার যদি সত্য হয় তবে ইহা হইতেই মনুষ্য ভগবানের দর্শন বা মুক্তির পরম আনন্দ লাভে সমর্থ হয়।

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ব্যবহার কি প্রকারে সাধিত হয়? সম্বন্ধের দ্বারা। সম্বন্ধ বোধই মনুষ্যের ব্যবহারকে নিয়মিত করে। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের গভীরতম যোগ বা নিবিড় সম্বন্ধ অনুভবই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ; ইহাতেই ভগবান মনুষ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ হন। এই যোগ বা সম্বন্ধ প্রধানতঃ দুই প্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে, এক প্রয়োজনের মধ্য দিয়া আর এক বিশুদ্ধ প্রীতি বা আনন্দের মধ্য দিয়া। মুক্তি ব্যতীত আনন্দ নাই, যাঁহার অন্তঃকরণ মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিত, তিনি মনুষ্যের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রীতি দান ও গ্রহণ করিতে সক্ষম, আর যিনি মুক্তি লাভের জন্য একান্ত ভাবে ব্যাকুল তিনিও এই প্রীতি—আদান প্রদান করিতে না পারিলেও—অনুভব করিতে সমর্থ।

যে সকল মনুষ্যের মধ্যে মুক্তির সম্বন্ধে কোনো বোধ উদয় হয় নাই তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনের সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ এবং তাহাই তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে সম্বন্ধ কল্পনা করা হয় তাহা মায়া বা মিথ্যা এবং তাহার ফল অমঙ্গল ও দুঃখ। অতএব এরূপ সম্বন্ধ কল্পনা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

প্রয়োজন ও আনন্দ এই দুই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই কেবল যথার্থ পক্ষে ব্যবহার চলিতে পারে। ইহার মধ্যে প্রয়োজনের সম্বন্ধের দ্বারা শক্তির চর্চ্চা ও প্রীতির সম্বন্ধের দ্বারা আনন্দের উদ্বোধন হয়। আমাদের মধ্যে যিনি কেবল মাত্র প্রয়োজনের ব্যবহারে আবদ্ধ না থাকিয়া মুক্তির আনন্দ লাভে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহাকে এই উভয় ব্যবহারের সাধনাতেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

যাহার যাহা প্রয়োজন, অনুভব মাত্রেই যথাশক্তি তাহা সম্পন্ন করিতে অহরহ

প্রস্তুত থাকা, মুক্তিকামী ব্যক্তির প্রতি প্রীতি করা ও তাহার সাহায্যার্থে সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হওয়া এবং যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন একান্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তাঁহার আদর্শের সম্মুখে নতমস্তক হওয়াই এই উভয় ব্যবহারের সাধনা। ব্যবহার ক্ষেত্রে এইরূপ সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা। এবং ইহার ফলেই মনুষ্য সেই পরম পুরুষের দর্শন লাভে সমর্থ হয়—যিনি সদামুক্ত ও পূর্ণ আনন্দ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

দূরে।

দৃষ্টি হ'তে ভাল অদর্শন,
কল্পনার তুলিকায় আঁকা,
অনিন্দ্য কি সুষমা সৌরভে—
অরূপ মাধুরী থাকে মাখা।
স্মৃতির দারুণ-দীর্ঘশ্বাসে—
অভাবের দৃঢ় আকর্ষণে,
প্রীতির করুণ ছবি হায়!
চির বাধা পড়ে প্রাণমনে।
তাই ওগো দেবতা দুর্লভ
ত্যাগ করে দর্শন পিপাসা,
মৌন ধ্যানে আঁকিতে তোমারে—
দূরে—দূরে, এত দূরে আসা।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আলোর পথ।

হৃদয় আমার কে আজি লইল
আলোকের রথে তুলি,
পথের দুধারে ছড়ায়ে চলিল
আলোকের রেখাগুলি।
লতায় পাতায় চারু সুষমায়
পড়িল কিরণ তায়,
ঝরিল রুক্ষ পত্র শুষ্ক
বক্ষে যা ছিল যায়।
যত যায় রথ উজলিয়া পথ
আলোক পড়ে সে ঝরি,
এই পথ দিয়া কে যায় লইয়া
কাহার হৃদয় হরি—
চাহি দেখে লোক, এ কার আলোক
ঝরিছে ধরণী গায়,
ধরণীর ধূলি এ যে পথ ভুলি
আলোকে মিলিতে যায়!
হৃদয় আমার হয়ে যাবে লীন
আলোক সখার সাথে,
পথের চিহ্ন পড়িয়া রহিবে
যে লয় তুলিয়া মাথে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

রাজকন্যা।

অষ্টম দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণ। রাজকন্যা মৃগচর্ম্মে আসীনা,
সম্মুখে ভূমিতলে বীণাটি পড়িয়া।

রাজ। এর চেয়ে সব কষ্টই সুখ; কি করে এ অত্যাচার নিবারণ করব? পিতাকে সাবধান করব? কে আমার সহায় হবে! কে আমাকে পথ দেখাবে!—হরি, দয়াময় কোথায় তুমি?

(পূজাসম্ভার হস্তে সখীগণের প্রবেশ)

হাসি। আমরা এসেছি রাজকন্তে, প্রদক্ষিণ শেষ করে—আসুন এবার পূজা আরম্ভ করি।

রাজ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওঃ আজ সরস্বতী পূজা ভুলে গিয়েছিলুম হাসি। হায়! আজ তাঁর পূজার দিনেও কেন পুণ্যমিলন সঙ্গীতে জগৎ সুধাসিক্ত দেখতে পাচ্ছিনে!

(মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সকলের গান)

মঙ্গল পঞ্চমী আজি ভারতী
গাও পুণ্য সুমিলন গান;
সুভাব সঙ্গীত বন্যা সরিতে,
ঘুচাও, ঘুচাও এ ভারতে,
দ্বেষ বিদ্বেষ হীন স্বার্থ অভিমান।
আর্ত্ত শোণিত পাতে, দীপ কবোটি ভাতে,
হের গো ভারতি,—
একি তোমার অর্চ্চনা আরতি,
পুণ্য পূজা অপমান!
দীন অভাজনে, করুণা বিতরণে,
দেহ চেতনা,—
নিবার পাপ, কর সুধা বর দান!
প্রসাদ উথলিত, নীরব নিনাদিত,
বীণা তানে—
দেবি, প্রীতি পূরিত কর পৃথ্বীবিমান।
বাক্যে কর্ম্মে ভাবে ধর্ম্মে যজ্ঞে যাগে
প্রাণে প্রাণে গো—
বহাও মিলন রাগ উদার জ্ঞান।

রাজ। (প্রদক্ষিণান্তে) স্বস্তি স্বস্তি, দেবি প্রসন্ন হও।

সকলে। পঞ্চনদকুমার ও রাজকন্যার মঙ্গল হোক—।

হাসি। (স্বগত) হায়! মনে হচ্ছে যেন দেবীর নয়ন অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো!

রাজ। মঙ্গল হোক্, মঙ্গল হোক, সর্ব্বভূতের মঙ্গল হোক, অভাগা অসহায় দুঃখীজনের দুঃখ দূর হোক—।

(নেপথ্যে ভীষণ নাগাড়া শব্দ। সকলে চমকিয়া উঠিল, হস্তের দ্রব্যাদি স্খলিত হইয়া পড়িল।)

রাজ। (সোৎকণ্ঠে) একি! আজ অসময়ে এই ভীষণ নাগাড়া কেন ধ্বনিত হচ্ছে।

সখিগণ। তাইত আজ সরস্বতী পূজার দিনে চামুণ্ডামন্দিরের নাগাড়া কেন বেজে উঠলো!

রাজ। হায় হায়! হয়ত কোন অভাগার বলিদানই বা হচ্ছে! হয়ত কোন নিরপরাধী শূলমঞ্চেই বা উঠেছে! যাও সখিগণ তোমরা যাও সংবাদ আন; এই উৎকণ্ঠা নিয়ে কি করে দেবীপূজা করব! আমি দেখি কোন রকমে মহারাজের যদি একবার দেখা পাই।

(সকলের প্রস্থান, ও কিছুপরে রাজকন্যার একাকী পুনঃপ্রবেশ)

রাজ। দেখা পেলেম না, কিছুতেই দেখা পেলেম না! হায়! আমার অসহায় নিরপরাধ আশ্রিতদের আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না! ওঃ পারিনে,—আর পারিনে! শুনেছি রাজপুত্র পঞ্চনদ আমার প্রার্থী—তিনিই তবে আসুন; আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যান,—এই অত্যাচার নিষ্ঠুরতা আমি আর চোখে দেখতে পারিনে,—রাজা যখন রাজধর্ম্ম ভুলেছেন তখন ক্ষুদ্র আমার আর কি সাধ্য! এস রাজপুত্র এস—আমাকে নিয়ে যাও, আর পারিনে,—আমি পারিনে—!

(মুদ্রিতনেত্রে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়া পুনরায়)

কি ভয়ানক! কাদের ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি? এই আমার অনাথ সন্তানদের,—অত্যাচারিত ভাইভগিনীদের দুঃখসমুদ্রে ফেলে রেখে আমি সুখী হতে চলে যাব? হায়! কি করে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার এ ভাব মনে এল? তারা যদি অগ্নির জ্বালা সহ্য করে তবে আমি কি তা পারব না! সুখের চেয়ে সে আগুনও যে আমার উপভোগ্য? না—চলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব,—অসম্ভব! আমি শুধু বন্ধু চাই, সহকারী চাই, সহায় চাই। এস পঞ্চনদ এস,—শুনেছি তুমি করুণ হৃদয় ন্যায়বান, তুমি এসে এই অত্যাচার নিবারণে আমার সহায় হও, এস বন্ধু—এস—!

(ধ্রুবকুমারের আগমন—ও বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকন্যাকে নিরীক্ষণ)

ধ্রু। কি পুণ্যমহিমাময়ী মূর্ত্তি? দেখলে হৃদয় আনন্দে আর্দ্র হয়ে উঠে। স্বর্গের শিশির ধারার মত পবিত্র সেই আনন্দবারি ঢেলে চরণ ধৌত করতে ইচ্ছা হয়।

(নিকটে আসিয়া)

দেবি নমস্কার!

রাজ। (স্বগত) কে এ সৌম্যমূর্ত্তি, পুণ্যরূপ যুবাপুরুষ? বিধাতা কি আমার প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে এঁকেই আমার সহায় স্বরূপ পাঠালেন? (প্রকাশ্যে) কে তুমি ভদ্র?

ধ্রু। দেবি, পুণ্যবতি, আমি রাজসৈনিক, আপনার দাস, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে চরণ দর্শনে এসেছি।

রাজ। বল ভদ্র কি কাজ?

ধ্রু। রাজার বিরুদ্ধে প্রবল ষড়যন্ত্র চলেছে—আমি গোপনে জানতে পেরেছি। প্রজাদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহিতার উদ্যোগ হচ্ছে—অতি সত্বর কার্য্য আরম্ভ হবে।

(নেপথ্যে নাগাড়ার শব্দ)

ঐ শুনুন নাগাড়ার শব্দ,—চীৎকারউল্লাস!

রাজ। এ তবে বিদ্রোহী প্রজাদের ঘোষণা—?

ধ্রু। কিন্তু মহারাজ এ ঘোষণায় বধির, তিনি ভাবছেন চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে তাঁর আদেশে অপরাধীর বলিদান হচ্ছে। তিনি শত্রুকে মিত্র ভেবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদ করছেন। দেবি তাঁকে সাবধান করুন এই মুহূর্ত্তে সাবধান করুন। এই কথা বলতেই আমি এসেছি।

রাজ। ভ্রাতঃ, এ-কি বলছ তুমি?—আমিও যে তাঁর নিকট অবিশ্বাসী—এইমাত্র তাঁর দ্বার হতে তাড়িত হয়ে আসছি।

ধ্রু। কি উপায় তবে? না সাবধান করতে পারলে—হয়ত আজ রাত্রেই তিনি বন্দী হতে পারেন।

রাজ। ভ্রাতঃ যাও, তুমি যাও, যে উপায়ে পার—তাঁকে রক্ষা কর।

ধ্রু। দেবি, আপনি আমাকে ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন—আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আমার প্রাণে অসীম উদ্যম, দেহে অমিত বল সঞ্চার হচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার স্বল্প সেনা নিয়েও নিশ্চয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে পারব।

রাজ। যাও ভ্রাতঃ যাও, ভগবান তোমার সহায় হউন, এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রেরণা,—এ জয়ে কেবল রাজরক্ষা নয় রাজ্য-রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা। ভগবান তোমার সহায় হোন।

ধ্রু। চল্লেম। সম্ভবত যুদ্ধ করতেই হবে না, তাদের অভিসন্ধি প্রকাশ হয়েছে—এ কথা রাষ্ট্র হলে আপনা হতেই বিদ্রোহ দমন হয়ে যাবে। তা যদি না হয়—শেষ পর্য্যন্ত আমি সেনাপতিকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করব,—অকৃতকার্য্য হয়ে যেন না ফিরি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

(অবনত জানু হইয়া নমস্কার। দেবীর পূজার ফুল মস্তকে দিয়া রাজকন্যার তাহাকে আশীর্ব্বাদ)

রাজ। যাও ভ্রাতঃ, যাও ভাগ্যবান, কর্ত্তব্য পালন কর—যাও পুণ্যবান,—ধর্ম্ম যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ কর।

ধ্রু। (উঠিয়া) আপনার আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মের বল—আমি হৃদয়ের প্রতি অণুতে পরমাণুতে অনুভব করছি—।

জয় মহারাণার জয়,—জয় রাজকন্যার জয়—জয় সত্যের জয়—জয় জয় ধর্ম্মের জয়!

(প্রতিবাক্যের সহিত তরবারি উত্তোলন এবং শেষে উত্তোলিত তরবারি মস্তকে স্পর্শ করত নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান)।

রাজ। হায়! হৃদয় তবু আশ্বস্ত হচ্ছে না,—হয়ত এই ষড়যন্ত্রে মিত্রজনই শেষে নিষ্পেষিত হবে!—হয় হোক—তাতেই বা দুঃখ কি! এ মৃত্যু জীবনের চেয়েও প্রার্থনীয়, সুখের চেয়েও বরণীয়!

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ!)

নবম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর। রাজা ও মহিষী উপবিষ্ট।

রাজা। মহিষি, আশ্চর্য্য ব্যাপার! কথা উঠেছে তোমার সিপাহীসৈন্য দাসদাসী প্রজা-পীড়ন করে,—তোমার ভ্রাতা সেনাপতি অবিচারে প্রজাগণকে শাস্তিদান করেন—তোমারি আজ্ঞায় প্রজাদের ঘরে আগুন লাগান হয়েছিল,—এই সব।

রা। মহারাজ! তাই কি তুমি বিশ্বাস করেছ?

ম। আমি বিশ্বাস করব! কিন্তু তোমার শুভ্র নামে এই বৃথা অপবাদও আমার পক্ষে অসহ্য কষ্টকর।

রা। আমারি দুর্ভাগ্য! আমি প্রজাদের সন্তান তুল্য ভালবাসি—তবু তারা আমার নামে অপবাদ রটায়!

ম। কিন্তু এর ত প্রতিকার করা চাই!

রা। প্রতিকার! কি বল মহারাজ! এর প্রতিকার কি করে হবে, আমার মৃত্যু ভিন্ন এর প্রতিকার আর কিছুই নেই।

মহা। মহিষি, তুমি কি ভুলে যাও, ও রকম কথায় প্রতিশোধের স্পৃহা আরো জ্বলন্ত হয়ে ওঠে? যারা এরূপ মিথ্যা রটনায় সাহস করে—তাদের শাস্তিবিধানই এর প্রতিকার।

রা। নিরীহ নির্ব্বোধ সব প্রজা—তাদের শাস্তি দেবার কথা মনেও এন না মহারাজ! তাদের কি দোষ? গৃহ বিচ্ছেদই এর মূল। যে কথা বলতে আমার একেবারেই ইচ্ছা করে না এমনি অদৃষ্ট যে বাধ্য হয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়। নির্দ্দোষ প্রজাদের উপর তুমি রাগ করবে তাও ত আমি সইতে পারি না।

ম। বল তবে তুমি কি জান মহিষি!—

রা। বলতে যে মুখ বন্ধ হয়ে আসে—

ম। তবু বল, আমার অনুরোধ বল!

রা। তবে বলি—রাজকন্যার শত্রুতাই এ কথার কারণ।

ম। (স্বগত) তা ত আমি বেশ বুঝতে পারছি।

রা। যদি বল্লেম তখন সব কথাই খুলে বলা ভাল। শুনছি—রাজকন্যাই প্রজাগণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন। তুমি ত রাজকার্য্য নিয়েই ব্যস্ত—কিছুত খবর রাখ না —রাজকন্যাই এ রাজ্যের রাজা—তাঁর মহল হচ্ছে—একটি দরবারস্থান। যত প্রজাদের আবদার বিচার পরামর্শ সব সেখানে চলে।

ম। আর বলোনা—থাক। বিয়ে দাও মহারাণি, বিয়েটা দিয়ে দাও, এ রাজ্য থেকে দূর হয়ে যাক্।

রাণী। বিয়ে করলে ত? তবে আরও একটু খুলে বলতে হয়—কিন্তু মুখ যে ফোটে না।

ম। না বল মহারাণি আমার জানা আবশ্যক।

রাণী। সে পঞ্চনদকে কিছুতেই বিবাহ করবে না। ধ্রুবকুমার বলে কে একজন সৈনিক আছে, শুনছি—তারই প্রতি সে অনুরাগিণী, তাকে রাজ্যে বসানই তার উদ্দেশ্য—!

রা। বিশ্বাস হচ্ছে না,—বিশ্বাস হচ্ছে না—আর যতই দোষ থাক, আমার কন্যা সে কখনো দুশ্চরিত্রা হতে পারে না।—

রা। প্রার্থনা করি মহারাজ, এ কথা মিথ্যাই হোক। কিন্তু সবরেই ধ্রুবকুমারকে তার কাছে সর্ব্বদা দেখতে পায়—।

ম। যদি সত্য হয়—তাহলে চামুণ্ডার নিকট বলিদানেই তার প্রায়শ্চিত্ত,—এই আমাদের বংশের নিয়ম। কিন্তু প্রমাণ চাই,—প্রমাণ চাই।

(নেপথ্যে—চীৎকারকোলাহল ও নাগাড়ার শব্দ।)

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

প্র। মহারাজ—সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান; প্রজাগণ বিদ্রোহী,—

ম। এ আবার কি ব্যাপার!

(ত্রস্তে উঠিয়া দ্বারদেশে আগমন।)

সেনা। (অন্তরাল হইতে) মহারাজ—দারুণ ষড়যন্ত্র,—রাত্রিকালেই রাজবাটী আক্রমণ করবার উদ্যোগ হচ্ছিল; সৌভাগ্য ক্রমে আমি সেটা ব্যর্থ করতে পেরেছি।

মা। সত্য! কি ভয়ানক! কে নেতা?

সেনা। ধ্রুবকুমার। তার দল ছিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু তাকে ধরতে পারিনি,—সে

পলায়ন করেছে। শুনছি রাজকন্যা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—।

ম। উঃ আমি যে পাগল হয়ে যাব! যাও সেনাপতি—তুমি বিদ্রোহীদের বন্দী কর—আমি এখনি রাজকন্যার কাছে যাচ্ছি।

দ্রুতপদে প্রস্থান।

রাণী। উঃ বড় ভয়ে ভয়ে ছিলেম,—কিন্তু দেবী চামুণ্ডা উদ্ধার করেছেন—চারিদিকের মেঘ কেমন আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে আমার সৌভাগ্য সূর্য্যকে প্রকাশ করে তুলেছে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ—)

মা। জয় হোক মহারাণীর!

না। বল খবর কি?

মা। খবর কত বলব? এক মুখে বলা যায় না। একদিক থেকে ফাঁশি, শূল, কারাবন্ধন, দ্বীপান্তর।

রা। বল বল ভাল করে বল,—প্রাণটা প্রফুল্ল হয়ে উঠুক—ফুল যেমন সূর্য্য কিরণে একটু একটু করে খোলে তেমনি করে হৃদয়-দল বিকশিত হতে থাকুক।

মা। যারা বলেছিল—মহারাণীর হুকুমে আগুন লেগেছে—তাঁদের ফাঁসি, যারা রাজদ্বারে আবেদনে এসেছিল তারা উত্তেজক বলে নির্ব্বাসিত;—যারা চুপে চুপে আলোচনা করেছিল তারা বেত্রাহত; যারা দাঁড়িয়ে দেখেছিল—তারা বন্দী—

রা। তার পর? এ বিদ্রোহটা আবার কি ব্যাপার বল দেখি!

মা। সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে মনে হচ্ছে রাজকন্যাকে ও ধ্রুবকুমারকে জব্দ করবার জন্যই সেনাপতির এ আর একটা ফন্দী।

রা। বেশ হয়েছে! ঠিকই হয়েছে। মহারাজ রাজকন্যার পুরে গেলেন, এখন তাকে সেখানে দেখতে পেলে হয়।—চামুণ্ডে বলির রক্তে তোমার চরণ ধৌত করব যেন মহারাজ সেখানে ধ্রুবকুমারকে দেখতে পান। তা নইলে—আমার সমস্ত আয়োজন সমস্ত উদ্দেশ্য—বৃথা হবে।

মা। অভিনয়ের সব ঠিক, চলুন—দর্শন করতে—।

রা। চল চল আজ আমার জয়ের দিন হর্ষের দিন! প্রস্থান।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুইজন মহারাজ।

শ্রীযুক্ত প্রাইস কলিয়ার সাহেব তাঁহার প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় দুইজন মহারাজার বর্ণনা করিয়াছেন, একজন সর্ব্বজন প্রিয় বরদার মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত সয়াজিরাও গাইকাওয়াড়, অপরটি সূর্য্যবংশগৌরব উদয়পুরের মহারাণাধিরাজ স্যার ফতে সিং।

গাইকাওয়াড় সম্বন্ধে প্রাইস বলেন "বরদার মহারাজা আট সহস্র পাঁচশত বর্গমাইল ভূমির অধীশ্বর। তাঁহার প্রজাসংখ্যা বিংশতি লক্ষ এবং তাঁহার বাৎসরিক আয় এককোটি আট লক্ষ। তাঁহার নিদাঘ প্রাসাদে প্রথম সাক্ষাতের দিন দেখিলাম তিনি শুভ্র শুভ্র পরিচ্ছদপরিহিত মধ্যাকৃতি সবলকায়পুরুষ, তাঁহার চলাফেরা উঠাবসা অতি সহজশ্রীমণ্ডিত।

ইংরাজী এবং ফরাসী উভয় ভাষাতেই অবলীলাক্রমে সুন্দররূপে তিনি বাক্যালাপ করিতে পারেন। দুইবার আমেরিকা এবং ইউরোপ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন। পুত্রদিগের মধ্যে একজনকে ইংলণ্ডে অন্যটিকে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকাতে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি আমেরিকার রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী;—তাঁহার বিশ্বাস ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর যদি কোন দিন পরিবর্ত্তন ঘটে তবে তাহা যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ হইবে। সকল শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের ন্যায় তাঁহারও বিশ্বাস ব্রিটীশ শাসনকর্ত্তাদিগের গর্ব্বিত সহানুভূতি-হীন সুদূর ব্যবহারই বর্ত্তমান অসন্তোষের কারণ,—অবিশ্বাসই অবিশ্বাসের জন্মদাতা। তিনি রাজ্যে যে সকল সংস্কার করিয়াছেন এবং নিয়তই করিতেছেন তাহাতে প্রথমতঃ অধিকাংশ প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট হয় কারণ তাহারা অজ্ঞ, কিন্তু যখন তাহারা সংস্কারের উপকারিতা উপলব্ধি করে তখন অসন্তোষের কোনই কারণ থাকে না, বরং তখন তাহারা আনন্দিত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন যতদিন রাজা প্রজায় কোন সম্বন্ধই নাই, উভয়েই আপন মত ও ইচ্ছানুসারে চলে, রাজা প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ততদিন রাজকার্য্যে প্রজার অভিমতের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না কিন্তু যখনই রাজা নূতন আইন করেন, প্রজার জন্মগত এবং ধর্ম্মগত মতামতের বিরুদ্ধে সংস্কার প্রচার করেন, স্বাস্থ্য রক্ষা, বিবাহকাল, শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে থাকেন তখনই রাজাকে কেবলমাত্র আপন মত এবং ইচ্ছানুসারে চলিলে হয় না, তখন তাঁহার পদে পদে প্রজাদিগের ইচ্ছা, মত এবং পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য। প্রাচ্যদেশীয়দিগের ধর্ম্মবিশ্বাস, জাতি-ভেদ, পানাহার, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি চিরাগত প্রথা বিদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার বিশেষ অন্তরায় তাহা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করিলেন। স্বায়ত্ত শাসনের দিন এখনও বহুদূরে তবে শাসনকর্ত্তা-দিগের ব্যবহার যদি অধিকতর সদয় এবং বিশ্বাসপূর্ণ হয়, তাহা হইতে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর এবং প্রীতিপ্রদ হইবে সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহমাত্র নাই।

মহারাণা। মিবার রাজধানী উদয়পুর, এই রাজ্য ১২ সহস্র বর্গ মাইল বিস্তৃত, ইহার প্রজাসংখ্যা দশ লক্ষের কিছু অধিক, বাৎসরিক রাজস্ব ১৯,৫০০০০ উনবিংশ লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র। ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজন্য-বর্গের মধ্যে উদয়পুরের মহারাণার পদ সর্ব্বোচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ, দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল তাঁহাদের রাজবংশ চলিয়া আসিতেছে, এই পূজ্য রাজকুলের আদিপুরুষ সূর্য্যবংশাবতংস ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্র। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজে তাঁহার পদ-গৌরবের তুলনা হয় না, তিনি একাধারে রাজা, শ্রেষ্ঠ পুরোহিত এবং ধর্ম্মনেতা।

এ রাজ্যে আধুনিক কিছুই নাই স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাদিগের অধিকার, বিদ্যুতের কল কারখানা, স্বাস্থ্যরক্ষার অভিনব নিয়মাধীন রাজনৈতিক উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার এ সকল সম্পূর্ণ অজানিত। সংবাদপত্র নাই, সংবাদ নাই, যাহা আছে তাহা বাজারগুজব। এখানকার হালফ্যাসানের বয়স সাতশতঅষ্টবিংশতি বৎসর। কোন ত্বরা নাই, কোন ব্যস্ততা নাই, এখানে আসিলে ভুলিয়া যাইতে হয় সভ্যতা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে। যে দিন পাহাড় হইতে শিকারী কৃষ্ণব্যাঘ্রের আগমন সংবাদ লইয়া ছুটিয়া আসে সেদিন খুব ধুমধাম, আড়ম্বর, আয়োজন, উত্তেজনা এবং উৎ-সাহ জাগিয়া উঠে। জাপানের ভূমিকম্প, পর্ত্তু-গালের রাজ্যবিপ্লব, ইংলণ্ডের মন্ত্রীবরণ, নিউইয়র্কের নূতন বিভীষিকা, পারস্য রাজধানীতে শ্রমজীবিদিগের দৌরাত্ম্য, বার্লিন রাজনৈতিক নেতার অগ্নিস্রাবী বাগ্মিতার সংবাদ কেহই রাখে না। পররাজ্য বিদ্বেষ, পররাজ্যলোলুপতা এবং পররাজশ্রীকাতরতার কোন লক্ষণই এখানে নাই। কেনই বা থাকিবে, মহারাণা তাঁহার অসংখ্য প্রজামণ্ডলীর একান্ত পূজ্য দেবতা। তিনি যাহা করেন, তাঁহার রাজ্যে যাহা বর্ত্তমান তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; থাকিতে পারে না, প্রজাগণের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। মহারাণা সম্বন্ধে কোন রূপ সমালোচনা তাহাদের কল্পনার অতীত।

ভারতবর্ষীয়ের শীলতা।

ডেলি ক্রণিক্যাল নামক সংবাদ পত্রে হ্যারল্ড ডিগবি সাহেব লিখিয়াছেন "আমি ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহুকাল ধরিয়া পর্য্যটন করিয়াছি, এই সুদীর্ঘ ভ্রমণকালে ভারতবাসীদিগের আচার, ব্যবহার, বেশ, বাস, জীবনযাপন প্রথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছিল। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার অবসরে তাহাদের পরিচ্ছদ এবং শীলতা পর্য্যালোচনা করিবার প্রচুর সুবিধা পাইয়াছিলাম। বাষ্পযানে কিম্বা গোযানে ভ্রমণকালে জনতাপূর্ণ ষ্টেশন অলিন্দে, জনসঙ্ঘ পরিপূর্ণ রাজপথে কত বার কত ভাবে ভারতবাসীদিগকে দেখিয়াছি কিন্তু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, কন্যা অন্তরীপ হইতে হিমালয়, কিম্বা বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত কোন নগর কিম্বা কোনও গ্রামে কোথাও কখনও একবারও তাহাদের শীলতাপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারের, সুরুচিপূর্ণ শোভন পরিচ্ছদের লেশ মাত্র ব্যতিক্রম দেখি নাই। যে ভয়ানক গায়ে-পড়া অভদ্র ব্যবহার ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র পর্য্যটকের দৃষ্টি ও মনের পীড়াদায়ক তাহার কোন পরিচয়ই ভারতবর্ষে দেখি নাই। পর্ব্বোপলক্ষে ছুটির দিনে জনতার মধ্যে ইংলণ্ডে স্ত্রী পুরুষের যে অভদ্র ব্যবহার, মধ্যবিত্তদিগের যে হঠাৎ নবাবি চালের বিষম ঝাঁকজমক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের যে গোঁয়ারের মত কুৎসিত আমোদ প্রমোদ, যে চীৎকার লম্ফ ঝম্প, বেশ বিন্যাসে যে রুচি বিকারের প্রাদুর্ভাব, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে নিতান্ত অজানিত; একান্ত বিদেশীয়। ভারতবর্ষে মূর্খের অভাব নাই, এদেশবাসী এখনও অনেকে তেত্রিশ কোটী দেবতার পায়ে মাথা ঠুকিয়া মরে, অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবী সমতল, বিজাতীয় এবং বিদেশবাসীর ছায়া স্পর্শে অনেকেই আপনাকে কলুষিত জ্ঞানে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিতে ত্রুটি করে না, তবুও সজনে কিম্বা বিজনে, রাজধানী কিম্বা নিবিড় বনপ্রান্তে জনবিরল গ্রাম্যপথে, কিম্বা জনতাপূর্ণ ষ্টেশনগৃহে সর্ব্বত্রই তাহার শোভন পরিচ্ছদ, নম্র, ভদ্র, সুশীল ব্যবহার দর্শককে বিমুগ্ধ করে। যে নিরক্ষর স্ত্রীলোক, মৃন্ময় দেবতার পদে ভক্তিভরে অর্ঘ্য নিবেদন করে তাহারও বেশ বিন্যাস বসন্তের পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় মনোমুগ্ধকর, তাহার ব্যবহার আদর্শ রমণীর ন্যায় লজ্জানম্র সুকুমার মাধুর্য্যমণ্ডিত। এই ভ্রমণকালে স্বদেশবাসীদিগের সহিত এই অজ্ঞ বিদেশবাসীদিগের ব্যবহার তুলনা করিয়া কতবার হৃদয় ক্ষুব্ধ এবং বিষন্ন হইয়াছে; স্বদেশে রঙ্গালয়ে এবং ভজনালয়ে পরিচ্ছদে কি বর্ব্বর রুচিবিকার, পান্থশালায় কিম্বা ষ্টেশনে কি অভদ্র দাম্ভিক ব্যবহার, সেখানে অনেকে নিউটনের পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও আচার ব্যবহারে বর্ব্বরাধম, একমাত্র সভ্যস্বরূপ ঈশ্বরে ভক্তিশালিনী সুশিক্ষিতা রমণীও পরিচ্ছদ রুচিতে, নিকৃষ্ট রঙ্গালয়ের নটী অপেক্ষাও হীন। দেখিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে, বর্ব্বরতা যেন অত্যধিক সভ্যতার ফল, কেননা দেখিয়াছি ইংলণ্ডের নির্জ্জনতম সুদূর পল্লীতে বেশব্যবহারে যে সুরুচি এবং শীলতা দৃষ্টিগোচর হয়, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন নগরে অভিজাতবর্গের আবাসস্থল অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে তাহা একান্ত বিরল।

মৃত্যুর সহিত দ্বন্দযুদ্ধ।

কেমন করিয়া ক্ষুদ্র শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীগণ সসাগরা ধরণী আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এ এক বিষম সমস্যা। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যে গুণ থাকিলে, মানুষ মানুষ হয়, বীর হয় তাহা ইংরাজ চরিত্রে প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান। আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও কর্ত্তব্যের জন্য জীবন মরণ পণ করিতে ইংরাজ বিমুখ হয় না। যে কেহ যে কোন কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছে তাহা যেমনই হৌক তাহার সাধনে সময়, বুদ্ধি, সুখ, স্বার্থ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরাজের উত্তর দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার চেষ্টা, রঞ্জন আলোকের পরীক্ষা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন বাণিজ্য বিস্তার ইত্যাদি কত কথা বলা যাইতে পারে। এক একটি উদ্দেশ্যে তাহারা কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছে কত জীবনই না বিসর্জ্জন

দিয়াছে; তাহারা মরুভূমি, তুষারপ্রান্তর, হিংস্রজন্তু, এবং হিংস্রতর মানবের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ইংরাজের আর এক প্রধানগুণ বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা—বিশেষতঃ যেখানে স্বজাতি বিপন্ন সেখানে দীনতম প্রজা হইতে মহামহিম রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

সম্প্রতি হোয়াইট হেভেন নামক (white haven) কয়লার খনিতে বিপন্ন উদ্ধারের চেষ্টায় তাহারা যেরূপ বীরত্বপ্রকাশ করিয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। একদিন রাত্রে কাজ করিতে করিতে কয়েক জন খনকারী বুঝিতে পারিল কোথা হইতে যেন ধূম নির্গত হইতেছে। খনিতে আগুন লাগিবার মত বিপদ আর নাই, আগুন লাগিলে উদ্ধার অসম্ভব, দাঁড়াইয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। যে কয়জন ধূম দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারা ব্যাপার কি জানিবার জন্য খনির মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ পথে আসিয়া, যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল তাহা বর্ণনাতীত। হৃদয়বিদারক শব্দ করিয়া খনকারীগণ এদিক ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ বা ধূমে বদ্ধ নিশ্বাস হইয়া অজ্ঞান হইয়াছে কেহ বা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর, যাহারা বাহিরে খনির উপরে ছিল নানারূপ শব্দ শুনিয়া বিপদের আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ খনকারী-দিগের সহিত কথা কহিয়া সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইল। খনির মুখ হইতে বারম্বার প্রশ্ন করিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন তাহারা খনির মধ্যে অবতরণ করিল। যেখানে কাজ চলিতে ছিল সে স্থান খনির মুখ হইতে দেড় ক্রোশ নীচে, অবতরণযন্ত্র দ্বারা যখন সেখানে পৌঁছিল তখন দেখিল ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন এবং তাপ এত অধিক যে দাঁড়ান অসম্ভব। তবুও তাহারা নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও বিমুখ না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, দু একজন অজ্ঞান হইয়া গেল। দলের নেতা যখন দেখিলেন আগুনে প্রবেশোপযোগী পরিচ্ছদ ও অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য জলের সুদীর্ঘ পাইপ সঙ্গে নাই, তখন আর অগ্রসর হওয়া অনুচিত বিবেচনায় আবার উপরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাহারা ছিল তাহারা যখন শুনিল খনিতে আগুন লাগিয়াছে এবং তখনও ১৩০ জন খনকারী সেখানেই পড়িয়া আছে হয়ত পুড়িয়া মরিতেছে কিম্বা মরিয়া গিয়াছে তখন যে আর্ত্তনাদ উঠিল তাহা কল্পনা করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। যাহাদের অগ্নি সমাধি হইতেছিল বাহিরে তাহাদের আত্মীয়স্বজন মাতা, ভগিনী, দুহিতা, পত্নী বারবার ব্যাকুলকাতর স্বরে বলিতে লাগিল, আমাদের যাইতে দাও, আমরা তাহাদের রক্ষা করিয়া আনি, যদি তাহারা মরিয়া গিয়া থাকে তবে আমাদের মরণই শ্রেয়। আবার কয়েকজন অবতরণ যন্ত্রে আরোহণ করিয়া খনির মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের অধিক দূর নামিতে হইল না, অর্দ্ধ ক্রোশ নামিতে না নামিতেই প্রায় সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তাপ এত অধিক যে অগ্নিরোধক লৌহ আবরণ উত্তপ্ত হইয়া মাথার চুল সব পুড়িয়া যাইতে লাগিল, উপরে উঠিয়া আসিবামাত্র খনকারীদের কয়জন রক্ষা পাইয়াছে মনে করিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল কিন্তু অবিলম্বে আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। উদ্ধার জন্য যে কয়জন নামিয়াছিল তাহাদের প্রায় সকলেই অজ্ঞান এবং দু একজন মৃত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। তবুও নিরস্ত না হইয়া দশ দল দশবার খনির ভিতর নামিবার চেষ্টা করিলেন। যখন প্রত্যেক বারই তাঁহারা ব্যর্থ-মনোরথ, অজ্ঞান ও মৃত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন তখন বোঝা গেল আর কোন আশা নাই।

আমাদের পিতৃপুরুষগণও মৃত্যুসাধন জানিতেন। কর্ত্তব্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ দান করাই জীবনের সার্থকতা তাহা তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই দীক্ষা, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, আমরা সে মন্ত্র ভুলিয়াছি তাই এই অধোগতি। হায়, আজ ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যাতেই আমাদের বীরত্ব। এই শ্রেণীর নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শ কিরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে দেখিলে হৃদয় স্বতঃই বেদনাপূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রীঃ।

মোহনবাগান ফুটবল-দল।

আমাদের বাঙলাদেশে ইংরেজদিগের স্তায় অনেকগুলি দেশীয় ফুটবল ক্লব থাকিলেও এ পর্য্যন্ত কোন দেশীয় ক্লব 'চ্যালেঞ্জশীল্ড' নামক শ্রেষ্ঠ জয়-চিহ্ন লাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু আনন্দের বিষয় এ বৎসর বাঙালী ফুটবল দলের গৌরব মোহনবাগ'ন ফুটবল ক্লব' তিনটি বিখ্যাত ইংরাজ ফুটবল টিম্‌কে ক্রীড়ায় পরাভূত করিয়া সেই দুর্লভ 'চ্যালেঞ্জশীল্ড' অধিকার করিয়াছে।

এই প্রতিযোগী ক্রীড়া দেখিবার জন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতেও লোক আসিয়াছিলেন। এবং শেষ খেলার দিবস ময়দানে যেরূপ বিপুল জনতা হইয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মোহনবাগানের এই জয়লাভে এ দেশবাসীর অনেকেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য এরূপ ভাবাতিশয্য অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমাদের এই প্রথম সাফল্যে এরূপ আনন্দাতিশয্য অপেক্ষা ভাবের সংযমই বাঞ্ছনীয়। সংযমেই শক্তির সঞ্চয়, উচ্ছ্বাসে অপচয়েরই আশঙ্কা। এ বিষয়ে জাপান আমাদের অনুকরণ যোগ্য। ফুটবল ক্রীড়ার কথা দূরে থাক তাহারা বড় বড় যুদ্ধ জয় করিয়াও হৃদয়ের উল্লাসআবেগ যেরূপ ধীরভাবে সংযত করিয়াছিল তাহাতেই তাহাদের বীরত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল।

শ্রীপ

ইংলণ্ডে ভোটপ্রার্থী মহিলাদিগের শোভাযাত্রা। (বিলাত পত্র)

১৭ই জুন শনিবার ইংলণ্ডে উক্ত মহিলাদলের শোভাযাত্রা বাহির হইয়া 'ওয়েষ্টমিনিষ্টার' হইতে 'আলবার্ট হলে' যাত্রা করিল। সে কি অভূতপূর্ব্ব সমারোহ! সাত মাইলব্যাপী প্রোসেশান।

এই শোভাযাত্রা উপলক্ষে এত জনতা হইয়াছিল যে তাহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুঃসাধ্য। গাড়ী ঘোড়া অনবরত চলিতেছে,—মোটারের ত সংখ্যাই হয় না। কিন্তু এরূপ বিপুল জনতাতেও পুলিসের সুবন্দোবস্তে গাড়ী ঘোড়া যাতায়াতের কোনই অসুবিধা হয় নাই। গাড়ীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক—কাহারো বক্ষে সফরেজিষ্টদিগের বিশেষ চিহ্ন (ব্যাজ) শোভা পাইতেছে কেহ বা নিশান ধারণ করিয়া আছেন আবার কাহারও হাতে 'Votes for women কাগজ বিক্রয়ের ব্যাগ।

প্রোসেশনের প্রত্যেক লাইনে পাঁচজন করিয়া স্ত্রীলোক নিশানহস্তে চলিতেছিলেন। সে এক অভিনব দৃশ্য। দেখিলে হৃদয় উৎসাহে ভরিয়া উঠে। এবং এ দেশের মেয়েদের কঠোর সাধনা ও দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সফরেজিষ্টদের এই অবিচলিত সাধনা অদূর ভবিষ্যতে যে সিদ্ধিলাভ করিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকের মনে হইতে পারে ভোট দেওয়াটা এমন কি অপরূপ পদার্থ যে তাহার জন্ত এত হাঙ্গাম। কিন্তু স্বাধীন জাতির হৃদয়ের ভাব আমাদের হইতে ভিন্নপ্রকার। তাহারা লক্ষ্য-বস্তু যতই তুচ্ছ হউক না কেন একবার যদি তাহা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্ত তাহারা সব করিতে পারে। এই যে একনিষ্ঠ অধ্যবসায় এইটুকুই আমাদের শিক্ষণীয়।

বিলাতে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া স্ত্রীলোকদের এই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের অধিকার লাভের জন্ত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম জনষ্টুয়ার্টমিল রমণীগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র পার্লামেণ্টে দাখিল করেন। সেই অবধি এই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে।

সফরাজিষ্টদিগের একটা বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তাহারা সকলেই একটা না একটা কাজে লিপ্ত আছে—বিনা পরিশ্রমে কাহারও সময় অতিবাহিত হয় না।

এই আন্দোলনের যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী তন্মধ্যে মিশেস প্যাঙ্কহার্ষ্ট (Mrs. Pankhurst) ও মিসেস ড্রেসপার্টের (Mrs Drespard) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিসেস প্যাঙ্কহার্ষ্ট ফ্রান্সে শিক্ষিত হন। সে সময় ফরাসী
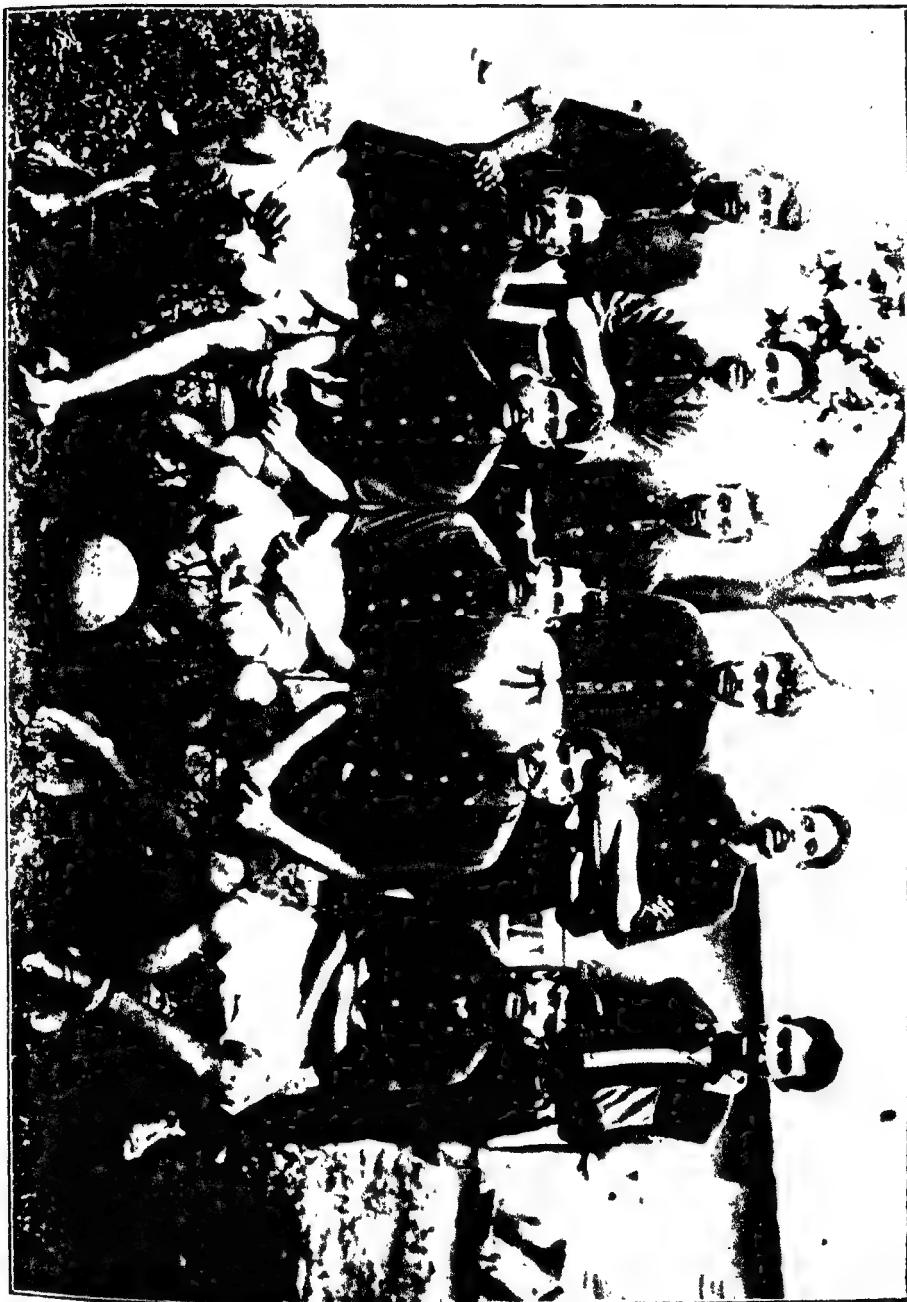
দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তত শান্তিপূর্ণ ছিল না। ইঁহার দল প্রথমে Womens Franchise League গঠিত করেন কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহারা বিলাতের লিবারেলপার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে লিবারেল পার্টি স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে আদৌ লিবারেল নন দেখিয়া তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া Indipendent Labour Partyর সহিত যোগদান করেন। ইঁহারা স্ত্রীজাতি

মিসেস প্যাঙ্কহার্ষ্ট।

মিসেস ড্রেপপার্ট।

সম্বন্ধে যথেষ্ট উদার মত পোষণ করিতেন। তাহার পর ১৯০১ সালে ইঁহার যুবতী কন্যা ক্রিষ্টাবেল (Christabel) সফরাজিষ্ট দিগের দলপুষ্টির জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

ক্রিষ্টাবেল আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল Lincoln's Inn এ প্রবেশ করেন। ব্যারিষ্টারি শিখিবার অনুমতি পাইলে তিনি যে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার হইতে পারিতেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না।

আজ সফরেজিষ্টদের ফণ্ডে এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যেদিন Anhie Kenney মিলের কার্য্য ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের নারী সমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করেন তখন তাঁহার হাতে দুই পাউণ্ড মাত্র ছিল। এই অ্যানি কেনি ও মিসেস প্যানহার্ষ্ট এবং তাঁহার কন্যা কতবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ডেও নারীগণের স্বাধীনতালাভের জন্য চোর-তস্করের ন্যায় কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। স্বার্থে আঘাত পড়িলে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ জাতিই সমান মূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে প্রভেদ খুব অল্পই থাকে!

শ্রীহঃ

রাজকুমার এডওয়ার্ডের যৌবরাজ্যে অভিষেক।

প্রায় সার্দ্ধপঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডাধীপ তৃতীয় এডওয়ার্ড স্বীয় নেতৃত্বে আপন পুত্রগণ এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহসিক পুরুষদিগকে লইয়া একটি বীর সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন।—এই সম্প্রদায়ের নাম Knights of the blue Garter—নীল জানুবন্ধধারী বীর পুরুষ। উইণ্ডসর প্রাসাদে সেণ্ট জর্জ্জের (St. George) উৎসব দিনে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়।

১৩৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন উক্ত উৎসব দিবসে বীরকেশরী তৃতীয় এডওয়ার্ড এবং তাঁহার শোভনা রাজ্ঞী বহুসংখ্যক বীরপুরুষ এবং তিন শত সুসজ্জিতা অভিজাতরমণীগণ পরিবৃত হইয়া নব প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জর্জ্জ ভজনালয়ে উপস্থিত থাকিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রথম স্থাপনা করেন। সেইদিন তরুণবয়স্ক তেজোদীপ্ত রাজপুত্র এডওয়ার্ড প্রথম ওয়েল্‌স প্রদেশের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পর ৫০ শতাব্দী গত হইয়াছে তবুও সে উৎসবের ঔপন্যাসিক মোহ আজিও অপসারিত হয় নাই, গত ১০ই জুন তারিখে ভারতসম্রাটের প্রথম পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক উৎসব উক্ত পুরাতন অনুষ্ঠান অনুসারে মহা সমারোহে সমাধা হইয়াছে।

উইণ্ডসর প্রাসাদের অবারিত সেই সিংহদ্বার দিয়া বহুসংখ্যক দেহরক্ষক যখন মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল তাহাদের দীপ্ত কাঞ্চনবর্ণ অঙ্গচ্ছদ এবং শিরস্কের পবনান্দোলিত শুভ্র পক্ষকলাপ সূর্য্যালোকে অধিকতর উজ্জ্বল মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া সম্মুখের শ্যামল পাদপমণ্ডিত প্রাঙ্গণে তাহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল। তখন তাহাদের ভূমি স্পর্শী উন্মুক্ত অসিফলকে সূর্য্যালোক বিচ্ছুরিত হইয়া সম্রাটের আগমন পথ যেন হীরকমালায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল, রাজকীয় ভেরীবাদকগণ স্বর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কিয়দ্দূরে অবস্থিত ছিল, আর একদল শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধ পুরুষ বাদ্য পতাকা সঙ্গে মন্দিরের পশ্চিম দ্বার সম্মুখীন সোপান শ্রেণীর উভয় পার্শ্ব অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। ইহা ভিন্ন রক্তবেশ পরিহিত একদল সৈনিক বহিরঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সুসজ্জিত ছিল, স্থান শাদ্বলের উপর এই রক্ত পরিচ্ছদের শোভা দিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তখন মন্দিরে বহু ঘণ্টা একত্রে বাজিতেছিল; তাহাদের সুরগ্রাম গম্ভীর সমতান নিনাদে চারিদিক পরিপূরিত করিয়া হৃদয়ে বহু পুরাতন প্রিয় স্মৃতি জাগরূক করিতেছিল। মনে হইতেছিল আবার বুঝি কবিবর সেক্সপীয়র এবং উপন্যাসকার ওয়ালটার স্কট বর্ণিত দিনগুলি ফিরিয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডের প্রাচীনতম সুন্দরতম উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সেদিন যে মোহন দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল তাহা বর্ণনা করিতে সেক্সপিয়র উৎসাহী হইতেন সন্দেহ নাই, সে সুন্দর দৃশ্য তাঁহারি কাব্যের দিব্যতুলিকা স্পর্শে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত। রাজকীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত সম্রাট সম্রাজ্ঞী বাদ্য ধ্বনি সহকারে সিংহাসন গৃহে আগমন করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিলেন এবং ঐতিহাসিক আর্থাররাজপ্রবর্ত্তিত গোল টেবিলের চারিদিক ঘিরিয়া তাঁহারি বীর অনুচরবর্গ ‘ল্যানসিলট’ প্রভৃতির ন্যায় স্পেনের রাজা ম্যানুয়েল, রাজকুমার আর্থার, রাজপিতৃব্য ডিউক অব কনট এবং রাজকুমার খৃশ্চিয়ান দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে এই বীরের সম্প্রদায়ের যিনি অগ্রণী স্যর অ্যালফ্রেড স্কট তিনি একে একে ত্রয়োবিংশতি জন বীরকে রাজসমক্ষে অগ্রসর করিলেন। ইহারা সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলে পর, স্যর ডগলাস, লসন এবং রাজকুমার আর্থার যুবরাজ এডওয়ার্ডকে সিংহাসন গৃহে লইয়া আসিলেন। তরুণ যুবরাজ যখন গম্ভীর মুখে ধীর পদক্ষেপে গৃহের মধ্যে অগ্রসর হইয়া সম্রাটকে অভিবাদনসম্বর্দ্ধনায় করিলেন তখন সম্রাট সম্রাজ্ঞী

এবং উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাহু প্রসারণ করিয়া পুত্রকে টানিয়া লইলেন, এবং আপনার দক্ষিণ পার্শ্বের আসনে উপবেশন করাইলেন। রক্ত পরিচ্ছদ পরিহিত স্যর অ্যালফ্রেড তখন ক্ষৌম সূত্রে গ্রথিত একটি জানুবন্ধ (Garter) সম্রাটের হস্তে আনিয়া দিলেন। ক্ষৌম সূত্রের এই জানুবন্ধ ধারণ খৃষ্টীয় শ্রেষ্ঠ বীর সম্প্রদায়ের বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ; পঞ্চম জর্জ দেহ আনমিত করিয়া পুত্রের বাম জানুতে যখন তাহা বাঁধিয়া দিলেন তখন রাজ পুরোহিত বলিলেন—"অসীম শক্তির আধার পরমেশ্বরের মহিমা এবং ধর্ম্মবীর সেণ্ট জর্জ্জের স্মৃতিসম্মান রক্ষার জন্য, এবং তোমার যশকামনায় এই সুমঙ্গল সূত্র তোমার বাম জানুতে বন্ধন করা হইল। পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ খৃষ্টীয় বীর সম্প্রদায়ের চিহ্নস্বরূপ ইহা তুমি সতত ধারণ করিবে—কখনো বিস্মৃত হইবে না, কিম্বা ইহাকে দেহ বিমুক্ত করিবে না—ইহার পুণ্য স্পর্শ তোমার হৃদয়ে সাহস এবং শরীরে বল সঞ্চার করিবে এবং যে মহাজীবন সংগ্রামে তোমাকে সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহাতে রক্ষাকবচ স্বরূপ এই বন্ধন তোমাকে নিয়ত বিঘ্ন রহিত এবং জয়যুক্ত করিবে।" রাজপুরোহিতের আশীর্ব্বচন উচ্চারণের অব্যবহিত পরেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার স্কন্ধে ধর্ম্মবীর জর্জ্জের মূর্ত্তি সমন্বিত মণি মাণিক্য খচিত পদক, বক্ষে হীরক তারকা এবং কণ্ঠে স্বর্ণ নির্ম্মিত গোলাপ পুষ্পের মালিকা পরাইয়া দিলেন—সর্ব্বশেষে যুবরাজ পিতার সম্মুখে নতজানু হইলে তিনি তরবারির দ্বারা পুত্রের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন "হে খৃষ্টীয় শ্রেষ্ঠ বীরসম্প্রদায়ভুক্ত তরুণ বীর উত্থান কর।" এইরূপে পুরাতন বহুবিধ অনুষ্ঠান উপচারে রাজপুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক সম্পন্ন হইয়া গেল। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর তাঁহারা সকলে রাজ প্রাসাদের বাহিরে আগমন করিলেন এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীর ভাবে ভজনালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেহরক্ষকদিগের ঊর্দ্ধে উত্তোলিত অনাবৃত অসিফলকে সূর্য্যালোক বিচ্ছুরিত হইয়া সম্মুখের পথ সমুজ্জ্বল এবং বহুকাল পরে বীরসম্প্রদায়ভুক্ত অভিজাতদিগের সুন্দর পরিচ্ছদ দর্শকদিগের নয়ন মুগ্ধ করিল। সর্ব্ব প্রথমে উইণ্ডসরের চতুর্দশ জন রক্ত পরিচ্ছদধারী যোদ্ধ,পুরুষ উজ্জ্বল সুবর্ণদীপ্ত সজ্জায় শোভিত হইয়া তৎপরে ইয়র্ক, উইণ্ডসার, রিচমণ্ড এবং সমরসেটের চারি জন রাজদূত ইংলণ্ডের বহু পুরাতন শস্ত্র সমূহ বহন করিয়া এবং সর্ব্বশেষে লর্ড মিণ্টোর নেতৃত্বে দুই দুই জন করিয়া এই সম্প্রদায় ভুক্ত বাইশ জন বীর অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের মস্তকে উষ্ট্রপক্ষীর শুভ্র পক্ষশোভিত কৃষ্ণবর্ণ মখমলের টুপি, অঙ্গে নীলবর্ণের আচকানের মত দীর্ঘ অঙ্গরক্ষা তাহার উপরে দীপ্ত প্রবাল বর্ণের অনতিদীর্ঘ উজ্জ্বল কোট—কণ্ঠে স্বর্ণাভরণ,—প্রত্যেককে হলবিন চিত্রিত এক এক খানি ছবির মত দেখাইতেছিল। ইঁহাদের পশ্চাতে রাজকীয় নাইটগণ আসিতেছিলেন। উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের বাতায়ন, সৌধছাদ, গবাক্ষপথে দণ্ডায়মান দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি সর্ব্ব প্রথমে মুহূর্ত্তকালের জন্য বীরসুন্দর, পাণ্ডুমুখ স্পেনের মুকুটহীন রাজা ম্যানুয়েলের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; তৎপরে তাহা নাইটবেশে সজ্জিত সমগ্র ইংলণ্ডের আশা এবং ভাবী গৌরব তরুণহৃদয় যুবরাজের প্রতি অর্পিত হইল। এই পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল—তাঁহার নির্ম্মল হাস্যফুল্ল নবীন জীবনের আনন্দ এবং গৌরবদীপ্ত মুখ সেদিন দেখিয়াছে যে সে ধন্য। যুবরাজের পশ্চাতে নাইট সম্প্রদায়ের অগ্রণী বীরগণ তৎপরে সম্রাট দম্পতি। ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া গায়কদিগের নিকটে রাজদম্পতি এক দিকে, যুবরাজ অপরদিকে বসিলেন। তাঁহাদিগের চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পতাকা আন্দোলিত হইতেছিল, বাতায়নের বিচিত্রবর্ণ কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া মন্দির কুট্টিমে যেন অসংখ্য আরক্ত পুষ্প দল ছড়াইয়া দিয়াছিল।

তখন সুমধুর বন্দনা সঙ্গীতে মন্দিরমণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল। সম্রাট সম্রাজ্ঞী যুবরাজ এবং অভিজাতবর্গের

শ্রবণ মন পূর্ণ করিয়া বহু পুরোহিতের সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হইল, "হে বিশ্বসম্রাট অসীমশক্তিশালী দেবাদিদেব বর্ষণ কর তোমার অপার করুণা, রক্ষা কর আমাদিগের শাসনকর্ত্তা আমাদের বহু পুরাতন রাজবংশতিলক বদান্য ধর্ম্মরক্ষক রাজ্যেশ্বরকে; নিয়মিত হউক তাঁহার চিন্তা এবং তাঁহার ক্ষমতা, তোমার অনন্ত মহিমা প্রচারে। তোমার শক্তি তাঁহার বাহুকে বলশালী তাঁহার চিত্তকে অমিততেজ প্রদান করুক; তাঁহার ন্যায়ের শাসন যেন অক্ষুণ্ন থাকে; দুর্ব্বল, পীড়িত, অসহায় এবং আর্ত্ত যেন তাঁহার আশ্রয়ে নির্ভয় হয়। এই ধর্ম্মবীর সম্প্রদায়ে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী এবং সহায় তোমার অপার দয়ায় তাঁহাদের সকলের এবং প্রত্যেকের ধর্ম্ম বন্ধন যেন দৃঢ় হয়, ধৈর্য্যে, মহত্বে, এবং দৃঢ়তায় তাঁহারা যেন এই বিশাল রাজ্যের সম্মান এবং সুনাম রক্ষা করিয়া কালে কালে প্রশংসালাভ করেন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

উদীয়মান কবি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্গসাহিত্যের শৈশবসময়ে যেসকল মনস্বী তাঁহাদের মনীষা সঞ্চারিত করিয়া বঙ্গভাষার অনুপ্রাণন কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারই পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দায়াদসূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—কিন্তু ভিন্ন ভাবে। অক্ষয়কুমার ধীরোদাত্ত গদ্য রচনায়, নূতন শব্দ সঙ্কলনে, এবং বিদেশী জ্ঞানরাজ্যের সংবাদ প্রদানে বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর সত্যেন্দ্রনাথ মধুরললিত পদ্য রচনায়, যথাযোগ্য শব্দচয়নে, এবং বিদেশী ভাবরাজ্যের বিচিত্র সংগ্রহে বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বয়সে নবীন, তিনি সবে পাঁচ বৎসর মাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন; কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার কবিত্বখ্যাতি বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারও মূলে তাঁহার পৈত্রিক উত্তরাধিকার। একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনা, পাঠানুরাগ, আত্মশক্তিতে অবিচলিত নির্ভর, স্বাধীন ও চিন্তাসংস্কৃত মতপোষণ ও প্রচার প্রভৃতি যেসকল গুণ অক্ষয়কুমারকে তদানিন্তন কালের বহু সাহিত্যসেবকের উর্দ্ধে তুলিয়াছিল, সেইসমস্ত গুণ সত্যেন্দ্রনাথে বর্ত্তমান থাকাতে তিনি এত অল্পসময়ের মধ্যে এত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। কবিযশের প্রলোভন মাসিকপত্রের ঢেউয়ের মাথায় লঘুতুচ্ছ ফেনের মত অকালে তাঁহাকে নাচাইয়া লইয়া ফিরে নাই; তিনি গোপন সংযত সাধনার ফল যেদিন 'বেণু ও বীণা'র মধুর ঝঙ্কারে ঘোষণা করিলেন সেদিন পাঠকমাত্রেই কোষমুক্ত প্রজাপতির মত এই নবীন কবির চিত্তসৌন্দর্য্যের বিচিত্র পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। বিষয়কে নূতন চোখে দেখিবার শক্তি, মিষ্ট শব্দের মোহরচনায় পটুতা, "স্বাধীন ও যুক্তিসঙ্গত মতপ্রচারের সাহস তরুণ কবির কিশোর কাব্যখানির" পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। তারপর 'হোমশিখা'র পুণ্য তেজস্বী আলোকে কল্পনা ও উচ্চচিন্তার

বিচিত্র সমাবেশ, উদার প্রেম, নির্ভীক স্বাধীনতা উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। তারপর কবি বঙ্গবাণীর পুণ্যাভিষেকের জন্য যেদিন নানা তীর্থের জলে তাঁহার সোনার কলস ভরিয়া-

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিলেন, সেদিন সেই 'তীর্থ-সলিল' বঙ্গবাণীর চরণামৃত হইয়া কবিকে অমর করিয়াছে। তখনও কবির বিরতি নাই; "ভাব-নগরীর ভাবের ব্যাপারী বিতরি' 'তীর্থরেণু'" বঙ্গবাসীকে নিজের তীর্থযাত্রার পুণ্যফলভাগী করিয়াছেন। এমন দুখানি মনোজ্ঞ সংগ্রহ

পুস্তক ইংরাজির মত সম্পন্ন সাহিত্যেও নাই, ইহাই আমাদের ও কবির অধিকতর গৌরবের কারণ; যাহা ব্যষ্টিরূপে ছড়াইয়াছিল তাহারই সমষ্টি করিয়া কবি বিশ্বমানবের, সভ্য অসভ্য সকল জাতির চিন্তা ও ভাবের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন করিয়া দিয়াছেন। এযাবত কবির যে কাব্যচতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম দুখানি মৌলিক এবং শেষ দুখানি অনুবাদ। কিন্তু ইহা অনুবাদ হইলেও কবির নিজস্বীকৃত। এইরূপ অনুবাদ যেন—

"The poetic transfusion of a poetic spirit from one language to another, and the re-representation of the ideas and images of the original in a form not altogether diverse from their own...It is the work of a poet inspired by the work of a poet; not a copy, but a reproduction; not a translation, but the re-delivery of a poetic inspiration."

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও ইঁহার অনুবাদ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলেন—

"কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে ইহার অধিকাংশকেই অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনো মতেই অনুবাদে ঠিক মত সঞ্চার করা যায় না—কিন্তু তোমার লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।"

কবির অনুবাদ ও মৌলিক কবিতা রচনায় বিরাম নাই। আগামী পূজার পূর্ব্বেই তাঁহার মৌলিক কবিতার পুস্তক 'ফুলের ফসল' প্রকাশিত হইবে। এবং আগামী বড়দিনের সময় আর একখানি মৌলিক কবিতার পুস্তক 'কুহু ও কেকা' প্রকাশিত হইবে এরূপ সম্ভাবনাও আছে।

আমাদের আন্তরিক শুভাশীর্ব্বাদ, কবি নব নব রসে বঙ্গীয় পাঠকের তৃপ্তিসাধন করিয়া দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য সফলতা লাভ করুন।

সমালোচনা।

ভাগ্যচক্র।—(উপন্যাস) শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রসিদ্ধ ডচ্ উপন্যাসকার লুই কুপারস প্রণীত Noodlot গ্রন্থের ইংরাজী অবলম্বনে 'ভাগ্যচক্র' রচিত হইয়াছে। মানবচিত্তের বিচিত্র ভাবের সহিত পরিচয় ঘটাইতে ফরাসী, ডচ্, জর্ম্মাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকারগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। "ভাগ্যচক্র" উপন্যাসে, উদার হৃদয় ফ্রাঙ্ক, আত্মনির্ভরতাহীন বন্ধু বার্টি, সরলা ইভা, কন্যাবৎসল ইভার পিতা—এই কয়টি মাত্র চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই কয়টি চরিত্রের সুখ দুঃখের আশানিরাশার কথা পাঠ করিয়া

আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ছোট খাট ঘটনার মধ্য দিয়া একটি পূর্ণ উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপন্যাস খানি আগাগোড়া এমন একটি কৌতূহল জাগাইয়া রাখে যে, বহিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এমন সুন্দর হইয়াছে যে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। চরিত্রগুলি হৃদয়ের মধ্যে গভীর দাগ টানিয়া যায় তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া মনে হয় না—যেন নিতান্তই আপনার জন। সহানুভূতিতে সমগ্র চিত্ত ভরিয়া উঠে। আজি-কালিকার অপাঠ্য উপন্যাসের যুগে এমন মধুর উপন্যাস প্রকাশ করিয়া মণিবাবু একটি উপভোগ্য বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছেন। আশা করি ইহা পড়িয়া তথাকথিত উপন্যাস সমূহের লেখক ও পাঠক সম্প্রদায় প্রকৃত উপন্যাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। আগাগোড়া ছাপা কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার- মূল্যও সে হিসাবে সুলভ হইয়াছে।

ভূদেব-জীবনী।—চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। মহাত্মা ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন আদর্শের স্থল। এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠে তাঁহার দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও স্বদেশপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ, আদর্শ গুরু, আদর্শ স্বদেশ প্রেমিক। এই মহাপুরুষ কিরূপ অনাড়ম্বর ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিপুল শ্রদ্ধায় চিত্ত অবনমিত হইয়া পড়ে। ভূদেব বাবুর বিস্তৃত জীবন বৃত্তান্ত কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমরা সমাদরে আমাদিগের লাইব্রেরীতে অভিনন্দন করিয়া লইতেছি।

আঙুর।—শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র—বাঁধাই দশ আনা। এখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি। পাঁচু-বাবুর নাম সাহিত্যানুরাগী পাঠকের অপরিচিত নহে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ক্ষুদ্র গল্প রচনায় সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এই গল্প গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। "জীবনপথে", "মনের দাগ", "হারজিত", "দেনা-শোধ", "স্বর্ণ-শয্যা" প্রভৃতি গল্পগুলি বাঙ্গালা ছোট গল্পের রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান পাইবে। আজ কাল ছোট গল্পের যুগ পড়িয়াছে; বহু লেখক ছোট গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু অনেকেই জানেন না, ছোট গল্প কাহাকে বলে, ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য কি। ছোট গল্প রচনায় আর্ট, পাঁচু-বাবু আয়ত্ত করিয়াছেন। পাঁচুবাবুর 'আঙুর' মিষ্টরসে পরিপূর্ণ; যিনি স্বাদগ্রহণ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। লেখকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ, সরল। কোথাও অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই। পাঁচুবাবুর সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক কামনা। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই পরিপাটি—মূল্যও সুলভ হইয়াছে।

ঝরাফুল।—শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত কবিতা পুস্তক। মূল্য বারো আনা। ভালো ছাপা, ভালো বাঁধাই ঝরাফুলের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। করুণাবাবু কবিতার নামে ভেজাল চালান নাই—খাঁটি জিনিস দিয়াছেন। তাঁহার রচনায় সত্যকার কবিত্ব আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ নিপুণতার সহিত ঝরাফুলের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলেই গ্রন্থখানির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে। তিনি লিখিয়া-ছেন—"করুণাবাবুর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় যেন তিনি প্রকৃতির দুলাল—প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের ন্যায় সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গীতে ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। * * কবিতাগুলি যেন ছবির পর ছবি। কোথাও সন্ধ্যাধূসর তালবনানী চামর দুলাইয়া দূরদূরান্তে মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও পদ্মফোটা দীঘির পাড়ে নারিকেলকুঞ্জের সারি চলিয়াছে, কোথাও ভাটের ফুলের মিঠে গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে কোথাও ফাগুন মাসের উতল বাতাস প্রাণকে উদাস

করিতেছে, কোথাও ধান-নাচানো মাঠের হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কোথাও দিনের রৌদ্র কালোমেঘের রৌপ্য পাড়ে জরির মত ঝিকমিক করিতেছে—ছবিগুলি সবই যেন স্বপ্নের মত একটির পর একটি চক্ষের সম্মুখ ভাসিয়া যায়, ছায়ালোক মণ্ডিত মায়াপুরী সৃজন করে।"

মেগাস্থিনীসের ভারত বিবরণ।—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১।০ কাগজের মলাট ১৷৹০। গ্রন্থখানি জর্ম্মন অধ্যাপক শোয়ানবেক্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত মেগাস্থিনীস রচিত মূল গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদকের ভাষা বেশ সরল ও স্বচ্ছ হইয়াছে, আগাগোড়া কৌতূহল উদ্রিক্ত থাকে—পড়িতে কোথাও বাধে না। এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া অনুবাদক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। প্রথমটিতে গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, দ্বিতীয়টিতে ভৌগলিক নির্ঘণ্ট, ও ভৌগলিক নামগুলির যথাযথরূপ ভারতীয় প্রতিরূপ এবং তৃতীয়টিতে স্মরণীয় বিষয়গুলির নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। কি বিশেষজ্ঞ, কি সাধারণ সকল শ্রেণীর পাঠকই ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা।—(ত্রৈমাসিক)। পঞ্চম ভাগ। অতিরিক্ত সংখ্যা সেরপুরের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু প্রণীত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য আট আনা। লেখক সুশৃঙ্খলভাবে সেরপুরের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু জ্ঞাতব্যতথ্যে পরিপূর্ণ এই ইতিহাসগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বিশুদ্ধ প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতির সুন্দর হাফটোন চিত্রে বর্ণনীয় বিষয়গুলি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বঙ্গলক্ষ্মী।—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। হিতবাদী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। এখানি উপন্যাসগ্রন্থ গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "হিন্দু সমাজের অবনতি দেখিলে প্রাণে ব্যথা লাগে", তাই তিনি "হিন্দুর ঘরে ঘরে দেবীমূর্ত্তি" দেখিবার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাস লিখিয়াছেন। আশা করি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

পঞ্চ-প্রদীপ।—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক, মজুমদার লাইব্রেরী, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কমার্সিয়াল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য (বাঁধাই) দশ আনা। এখানি গল্পপুস্তক. লেখক "নিবেদনে" বলিয়াছেন, "গল্পকটি স্বর্গীয় কাউণ্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে লিখিত।" আজিকালিকার দিনে এ ঋণ স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দুই একটি গল্পে আধ্যাত্মিকতার মাত্রা কিছু অধিক হইলেও গল্পগুলি সুখপাঠ্য তৃপ্তিদায়ক। তবে রচনায় তেমন লিপিকুশলতার পরিচয় পাইলাম না। উপাখ্যানগুলি চমৎকার। লেখক শক্তিসম্পন্ন হইলে, রচনার গুণে এগুলি ছোট গল্পের রাজ্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইতে পারিত।

বাঙ্গলা বুককিপিং।—তকরারি নিয়মে মহাজনী হিসাব রক্ষা। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। কুমারখালি. মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার নলডাঙ্গা রাজ-ষ্টেটের সরবরাহকার। জমা খরচ হিসাব রক্ষা প্রভৃতি শিখিবার পক্ষে গ্রন্থখানি উপযোগী হইয়াছে। ইহা পাঠে হিসাব রক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয়, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৪, তন্ড বালিগঞ্জরোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

প্রথম চিত্র।

এবং তাহার ফলে সৃষ্টি করা বা create করা।

Realityর নিকটে সৃষ্টবস্তুগুলা সুগোচর এবং সেগুলার নির্ম্মাণকৌশলটাও সুগম;

দ্বিতীয় চিত্র।

কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টশক্তি এ দুইই তাহার কাছে অগোচর অনির্দ্দিষ্ট একটা

কিছু। সৃষ্টকর্ত্তা এবং সৃষ্টশক্তির অস্তিত্ব realist যে স্বীকার না করেন এমন নয়

কিন্তু সৃষ্টিশক্তি লাভ করা এবং তাহার ফলে স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়াটাকে তিনি কাযের মধ্যে কায না বলিয়া নিজের হাতের এবং চোখের সাহায্যে যতটা সম্ভব সৃষ্টবস্তুগুলার এক একটা প্রতিরূপ খাড়া করাকেই বলেন art এবং ঐরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকেই তিনি বলেন artist. মানুষের পক্ষে সৃষ্টিশক্তি পাওয়া realistএর কাছে অসম্ভব; আর ঠিক ঐটাই idealistএর নিকট সম্ভবপর এবং সেইটাকে পাওয়াই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

Realistএর বুলি হইতেছে—'যদৃষ্টং তল্লিখিতং'। Idealist বলিতেছেন ওগো তা নয়—'যন্মনসানুভূতং তল্লিখিতং'; মন দিয়া দেখ দৃশ্যবস্তুটার অন্তরে তাহার স্বরূপ বা তেজ লুকাইয়া আছে। চন্দ্র সূর্য্যের আলো গ্রহণ করিয়া জ্যোৎস্নার রূপান্তরিত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেছে—স্বরূপের খর তেজ তেমনি তোমার মনোদর্পণে গ্রহণ করিয়া সেটাকে সম্পূর্ণ একটা নূতন গুণ অর্পণ করিয়া প্রেরণ কর, তবেই বলিব তুমি artist এবং তবেই জানিলাম তুমি নবগুণে মণ্ডিত একটা নূতন সামগ্রী সৃষ্টি করিলে।

তবেই দাঁড়াইতেছে—realismটা যেন কাচখণ্ডে ফোটো তুলিয়া লওয়া আর idealism যেন মণিদর্পণে খর কিরণ গ্রহণ করিয়া অমৃত উৎপাদন করা।

এইবার একবার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ করা যাক্।

Ruskin শিল্প ও শিল্পীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—Higher এবং Lower. তিনি বলিলেন—

"The lower merely copies what is set before it, whether in portrait landscape or still life."

"The higher either entirely imagines its subject or arranges materials presented to it so as to manifest the imaginative power............"

মনে কর গুরুর পাঠশালে দুই শ্রেণীর ছাত্র লিখিতে আসিয়াছে। প্রহ্লাদের মত উচ্চ শ্রেণীর এবং আহ্লাদের মত নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। আহ্লাদের দল 'ক'য়ে আঁকড়ি 'ক' কেবলি কাপি করিয়া চলিয়াছে আর প্রহ্লাদের মত ছেলেগুলির 'ক' দেখিয়া কৃষ্ণ মনে পড়িয়াছে এবং হরেকৃষ্ণ বলিয়া সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিয়াছে।

অনেকের কাছে Ruskin এখন সাবেকি বলিয়া তত আদর না পাইতে পারেন সুতরাং অত্যন্ত আধুনিক Theodorechild সাহেবের মতটা তুলিয়া দিতেছি। ইনি বলেন—

"Nature (দৃশ্য জগৎ) is only a dictionary. Idealists seek in their dictionary those elements which are in harmony with their conception and by arranging them with a certain art they give them an entirely new physiognomy." আর "Realists copy the dictonary."

Dictionary মুখস্থ করা খুব একটা শক্ত কাজ কিন্তু সেটা যে Dictionaryটার সংব্যবহার তাহা কেমন করিয়া বলি।

মাঠের মাঝে একটা শাল গাছ তার পাতা প্রায় সমস্তই খসিয়া গিয়াছে একটা

লোক যাহার কল্পনাও নাই এবং অলঙ্কার শাস্ত্রটাও মুখস্থ নাই সে বলিল—

শুষ্কং কাষ্ঠং পশুত্যগ্রে—একটা শুক্‌নো গাছ দেখি যে?

আর একটি লোক যার একটু পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছে সে ঐ কথাটাই একটু গুছাইয়া বলিল—

নীরস তরুবর পুরতো ভাতি

উভয়েরই কাছে গাছটা গাছ মাত্র; Realismএর গণ্ডি কেহই পার হইল না।

তৃতীয় ব্যক্তিটি ভাবুক অর্থাৎ Idealist. সে বলিয়া উঠিল—

বৃক্ষৈব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ

বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ একটি মহাপুরুষ আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

কেমন একটা অপরূপ মহিমাময় ছবি সে আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে সে নিজেরও একটা মানসিক শক্তির পরিচয় আমাদের দান করিল।

এই যে মানসিক শক্তিবলে একটা গাছকে নূতন ভাব ও মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তোলা ইহারই ইংরাজিটা হচ্ছে Idialism.

আর এই যে বাকচাতুরী দ্বারা অথবা সিধা কথায় গাছটাকে গাছ মাত্র দেখাইয়া দেওয়া ইংরাজীতে ইহাকেই বলে Realism.

Theodore সাহেবের মতে Realist বলিতেছে—

"I wish to represent thing as they are, or else as they would be, supposing that I do not exist."

আর Idealist বলিতেছে—

"I wish to illuminate things with my mind and project the reflection thereof upon other minds."

Realist আকৃতিমূলক আর Idealismটা হচ্ছে প্রকৃতিমূলক।

ধর realist এবং idealist দুই শিল্পীকে একখানা ছবি আঁকিবার জন্য ডাকা হইল এবং প্রশ্ন দেওয়া হইল—'কাক'। কা এবং ক এই অক্ষর দুইটা চোখে পড়িবামাত্র দুইজনের মনে কি যে আঁকিতে হইবে তাহার একটা ধারণা হইল; কেননা পূর্ব্ব হইতেই দুজনেরই মনে কাকের এক একটা ফোটো তোলা ছিল এবং দুইজনেই সেই ফোটোটা কাযে খাটাইতে চাহিল। এখন realist করিল কি? সে সেই ফোটোখানির একটি নিখুঁত drawing কাগজে তুলিয়া দিয়া হাত গুটাইয়া বসিল। কিন্তু Idealist সেরূপটা করিয়া উঠিতে পারিল না। কাকের আকৃতি অপেক্ষা তাহার প্রকৃতি অর্থাৎ কাকের চতুরতা নষ্টামি তাহার বসিবার চলিবার উড়িবার খেলিবার নানা ভঙ্গী—একটা মূর্ত্তিমান কৌশল ও চাতুর্য্য তাহার মনে উদয় হইল। সুতরাং সে কাকের আকৃতির যে যে অংশ এই চতুর ও কৌশলী মূর্ত্তিটিকে ফুটাইয়া তোলে তাহাই সযত্নে ফুটাইয়া বাকি সমস্তটা মোটামুটি রকমে সারিয়া দিল, ইহাতে হইল কি? Realistএর কাকের মত সেটার নিখুঁত anatomyটা পাওয়া গেল না কিন্তু তাবৎ কাকের অন্তরের একটা চিকণ কালো ছাপ্ পাওয়া গেল।

Idealismএ এই অন্তরের ছাপটা দিবার

চেষ্টা এবং realismএ ঐ বাহিরের আকারটা ধরিয়া ফন্দি চিরদিন চলিতেছে। এখন Ideal ও Real এই দুই মূর্ত্তিকে কেমন করিয়া চিনিয়া লইবে বলিতেছি।

দুইটা বুদ্ধমূর্ত্তি ভারতবর্ষের দুই বিভিন্ন অংশ হইতে আনিয়া পাশাপাশি রাখিলাম। দুইটাতেই বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন; কিন্তু দুইটা মূর্ত্তিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতাবলম্বী দুই শিল্পী গঠন করিয়াছে! ওই যে অস্থিপঞ্জর-সার নরমূর্ত্তি ওটি হচ্ছে গান্ধার দেশ হইতে আনীত গ্রেকো রোমান realistic শিল্পের নিদর্শন, (১ম চিত্র) আর অন্যটি হচ্ছে সিংহল দেশ হইতে প্রাপ্ত ভারতশিল্পের একটি সুন্দর Idealistic মূর্ত্তি (২য় চিত্র)। অবশ্য এই শিল্পীদের মধ্যে দুইজনেই কেহ কোনদিন বুদ্ধদেবকে দেখেন নাই, বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াই দুইজনকে মূর্ত্তি গঠন করিতে হইয়াছে। Realistic যে গ্রেকো-রোম্যান বা গান্ধারশিল্পী সে দেখিল ছয় বৎসরের কঠোর উপবাস এবং তপস্যার পরে বোধিতরুতলে বুদ্ধদেব ধ্যানে বসিয়াছেন এবং সে তদুপযুক্ত একটি জীর্ণ শীর্ণ মডেল চোখের বা মনের সম্মুখে রাখিয়া বুদ্ধমূর্ত্তিটি গঠন করিয়া ছাড়িয়া দিল। আর Idalistic প্রাচ্য-শিল্পী যখন ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি গঠন করিতে বসিল তখন ছয় বৎসরের উপবাসে বুদ্ধের আকৃতি। কিরূপ হইতে পারে সেটা সে বিচার করিল না বুদ্ধকে সে সুগঠিত প্রশান্ত স্থির গম্ভীর একটি জিতেন্দ্রিয় যোগী মূর্ত্তিতে একটি নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় গড়িয়া তুলিল। ফলে Realistic শিল্পীর হাতে বুদ্ধদেবের শীর্ণতাটাই অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় প্রকাশ পাইতে থাকিল আর Idealistic শিল্পীর হাতে ঐ মূর্ত্তিটি বুদ্ধত্বের অক্ষয় কবচে মণ্ডিত হইয়া অক্লান্ত শরীর এবং অটল ধ্যান লইয়া বজ্রাসনে বিরাজিত হইল।

Realism দিল সম্ভবপর একটি আকৃতির প্রতিকৃতি আর Idealism দিল সম্ভবপর প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট আকৃতি।

Realism বুদ্ধের দীন অংশটাকেই সার বলিয়া গ্রহণ করিল। আর Idealism বুদ্ধের সম্যক প্রবুদ্ধ হইবার সতেজ উপাদান-গুলাকেই বাছিয়া লইয়া ধন্য হইল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সীতারাম।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সীতারামের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য আবেদন করি। সীতারামের অমর কীর্ত্তি রক্ষার জন্য, শুদ্ধ আমাদের নহে, অনেক ইংরাজেরও যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পুনার মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। স্পুনার সাহেব এই প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লেখেন—

"ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তির সংখ্যা অসংখ্য; কিন্তু এই সকল রক্ষা করিতে যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক তাহা না থাকায় গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কম। বিশেষতঃ সীতারামের কীর্ত্তি

রামসাগর।

রক্ষণের উপযোগী কি না এ বিষয়েও সন্দেহ আছে।”

এই পত্র পাইয়া আমি তাঁহাকে মহম্মদপুর যাইতে অনুরোধ করি। কিন্তু তখন অন্য কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশ যাইতে হইল। এই কারণে তিনি আমাকে মহম্মদপুর গিয়া এক্ষণে কীর্ত্তিগুলি কি ভাবে আছে এবং উহাদের রক্ষা সম্ভবপর কি না, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রভৃতির ভার গ্রহণ করিতে বলেন।

তদনুসারে গত গ্রীষ্মাবকাশে কতিপয় বন্ধুর সহিত মাগুরা হইতে ষ্টীমার যোগে মহম্মদপুর যাত্রা করি। বিনোদপুরে ষ্টীমার ছাড়িয়া আমরা ধীরে ধীরে মহম্মদপুর পৌঁছিয়া প্রথমেই সীতারামের একটী প্রধান কীর্ত্তিস্বরূপ রামসাগর নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা তীরে উপস্থিত হইলাম। এই সুবৃহৎ জলাশয় ১৬৫৫ হাত দীর্ঘ ও ৬২৫ হাত প্রস্থ। এরূপ দীর্ঘিকা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

এই দীর্ঘিকা খনন সম্বন্ধে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন ‘লঘুভারত’ গ্রন্থে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়।

> “একদা স চ ভূপালো নিজাধি কৃত ভূমিষু।
> পর্য্যটন্ বিবিধস্থান মুপ তস্থৌ প্রজাপুরে॥
> স্বভাব বিপরীতৈত কাস তাহলাবুকলস্তঃ।
> স্থূল পাত্রাবৃহৎ পত্রাঃ লুঠ তৃণ গৃহোপরি॥
> দৃষ্টাতদ্ভুতং বৃক্ষং ধনানাং খনি সূচক।
> মূলাং দত্ত্বো চিত্তং তস্তচখানতদধস্তলং॥”

এই অলাবু তলায় সীতারাম যে ধন প্রাপ্ত হন, তাহা দ্বারাই এই সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করেন। মহম্মদপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচলিত প্রবাদ এই যে সীতারাম মেনাহাতীকে এক তীর নিক্ষেপ করিতে বলেন। এই তীর যতদূরে যাইয়া পড়ে, ততদূর পর্য্যন্ত দীর্ঘিকা খনন করিলে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে ইহা খনন করা হয়। পূর্ব্বে রামসাগরের চতুঃপার্শে ঘাট বাঁধান ছিল। এক্ষণে কেবল মাত্র এক পার্শ্বে তাহার সামান্য চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ রামসাগরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারা যায় না। যে রামসাগর এক কালে লক্ষ লক্ষ লোকের পানীয় জল সরবরাহ করিত, সীতারামের সাধের সেই সাগরে এক্ষণে মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার জন্য বাঁধ ও তৎসঙ্গে অন্যান্য আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করিয়া উহার জল দূষিত করিয়া দিতেছে। বোধ হয় এরূপভাবে ৫।৭ বৎসর থাকিলে উহার জল অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবে। এতদিন না হইবার কারণস্বরূপ অধিবাসীগণ বলেন যে, সীতারাম বৃহৎ তালবৃক্ষ পারদ পরিপূর্ণ করিয়া উহার তলদেশে রাখিয়া দিয়া ছিলেন।

কিছুক্ষণ “সেই হিল্লোল দোলায়িত নদী-প্রতিম বাপীতটে” দণ্ডায়মান হইয়া তাহার “মারুত হিল্লোল” সেবন করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল, পবিত্র কনখল তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিরাত্রি বাস করিতে পারিলে যদি সকল পাপমুক্ত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গে বাস করা সম্ভব হয়, তবে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন প্রভৃতি সকল বঙ্গবাসীর এই রামসাগর মহাতীর্থে স্নান এবং ত্রিরাত্রি মহম্মদপুরে বাস করিলে কেনই বা মহাপুণ্য লাভ না

হইবে? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইতে লাগিল—

"আস্ফালিতং যৎ প্রমদা করাগ্রৈর্মৃদঙ্গধ্বানি মযগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি-
দীর্ঘিকাণাম্॥"

সীতারামের দুর্গ

পূর্ব্বে যে সকল দীর্ঘিকায় অন্তঃপুরবাসিনীগণ সুখে সন্তরণ করিতেন, আর তাঁহাদের বাহুবল্লী-প্রহৃত হইয়া জলরাশি শব্দ করিত, আজ সেই স্থানে বন্য মহিষাদি অবতরণ পূর্ব্বক

তাহাদের কঠিন শৃঙ্গ দ্বারা নীল জলরাশি আহত করিতেছে। দীর্ঘিকার এক্ষণে আর "স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ নাই, এখন সে যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকারই করিতেছে। কালের কি কুটিল গতি!

রামসাগর পরিত্যাগ করিয়া আমরা মহা শ্মশানের মধ্য দিয়া, সেই সুমহান অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে মহম্মদপুরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, নগর জনশূন্য; দেবমন্দিরে প্রতিমা

প্রথম ইট—সিংহাসনে সীতারাম।

নাই। দেখিলাম মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কাহিনীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু সেই ধ্বংসাবশেষই তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-জ্ঞান, তাঁহার বীরত্ব, মহত্ব, ধর্ম্মপ্রাণতার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছে। জলকষ্ট নিবারণের জন্য শুনিতে পাই তাঁহার সঙ্গে দ্বাবিংশ হাজার বেলদার সৈন্য থাকিত। প্রত্যহ নূতন পুষ্করিণীতে স্নান তাঁহার ব্রত ছিল। এ ব্রত বিলাসিতার জন্য নহে, এ ব্রত প্রজা-বৃন্দের জলকষ্ট নিবারণের জন্য। এ ব্রত পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য। দেবমন্দিরগুলি দেখিতে লাগিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল, হায়, এককালে এই সকল মন্দির দ্বারে কত শত সহস্র নর নারী ভক্তি গদগদচিত্তে, এক

অপূর্ব্ব পুলক সমাবেশে, এই সকল মন্দিরস্থ দেবতাদিগের চরণে প্রণত হইত! দেখিলাম, অনেকগুলিতে সেই সকল দেবমূর্ত্তি আছে, কিন্তু আজ রাজপথ জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ, প্রাসাদাবলী হতশ্রী, বাপীতড়াগাদি প্রায় বিশুষ্ক, তন্মধ্যে কচিৎ কোনটি ঘন-পঙ্কিল জলপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রত্যাগমন কালে আমরা ঘুরিয়া কানাই

দ্বিতীয় ইট—সীতারামের সৈন্যগণ।

নগরের হরিকৃষ্ণের মন্দির দেখিয়া আসিলাম। সে দিন কি দুর্য্যোগ! মুষলধারে বৃষ্টি সেই সঙ্গে ঝড়। সেই ঝড় বৃষ্টিতে কাঁচা রাস্তায় কয়েক মাইল ধরিয়া পথব্রজে চলা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা এ অবস্থায় যিনি না পড়িয়াছেন তাঁহার পক্ষে বুঝা দুঃসাধ্য। বহুকষ্টে মন্দির স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম অন্যান্য মন্দিরগুলির ন্যায় ইহার দশাও শোচনীয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবতাকে নাটোরের মহারাজা বাহাদুর স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াতে

এ পথে আর জনমানব দৃষ্ট হয় না। মন্দির পরিত্যাগ কালে প্রাচীরগাত্রস্থ চিত্রাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম এক স্থানে দুইটি ইষ্টক এক সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে। একখানি ইষ্টকের উপরিস্থ খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। বহু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত সীতারামে পড়িয়াছিলাম "দশভুজার মন্দিরে এক প্রাচীরে শিবিকার মধ্যে সীতারামের একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ফোটোগ্রাফার অভাবে সে মূর্ত্তি এবার উঠাইতে পারিলাম না। সেই মূর্ত্তি ও নিশানাথ ঠাকুরের ধ্যানে জানিয়াছি যে সীতারাম অসিতবর্ণ, বৃহৎ মস্তক, বৃহৎ চক্ষু, মধ্যম আকার বলিষ্ঠপুরুষ ছিলেন।"

আবহমান কাল হইতে প্রচলিত প্রবাদও এই যে, দশভুজা মন্দিরের ঐ মূর্ত্তি সীতারামেরই। আমরাও দেখিলাম সিংহাসনোপরি বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট, মধ্যমাকার, বলিষ্ঠদেহ এক পুরুষমূর্ত্তি,—হাতিয়ারধারী সৈন্যগণ তাঁহাকে কুর্ণিশ করিতেছে। দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে এমূর্ত্তি সেই মহাপুরুষেরই। তখন হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সকল কষ্ট, সকল পরিশ্রম, সকলব্যয় সার্থক জ্ঞান করিলাম।

পাঠক উক্ত দুই খানি ইষ্টকের চিত্রই ভারতীতে সন্নিবিষ্ট দেখিতেছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি, এ,
হাজারিবাগ।

জাপানের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের ভিত্তি। জাপানীরা জড়বিজ্ঞানের আরাধনায় আজকাল মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেও উহাদের জাতীয় শক্তির মূলে ধর্ম্ম। উহাদের ধর্ম্মসূত্র প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ব্বপুরুষদের আত্মা, প্রকৃতিদেবী এবং স্বদেশের পূজা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। শিন্তোধর্ম্ম বলে পূর্ব্বপুরুষদের আত্মা জাপানের পবিত্রক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের সন্তানসন্ততির ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহাদের সন্তানগণ পবিত্র জাপানভূমি নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হইতেছে কি না। এই ধর্ম্মবিশ্বাসের দরুণই জাপানীরা যাহাতে তাহাদের বাসভূমি পরপদদলিত না হইয়া নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক রহিয়া যায় তৎপ্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। এই ধর্ম্মবিশ্বাসেই উহাদের স্বদেশপ্রেম অচল অটল রহিয়াছে। এবং এই বিশ্বাসের জন্যই উহারা যে কোন মুহূর্ত্তে স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। শিন্তোধর্ম্মের পর কনফিউশিয়াজের ধর্ম্ম উহাদের ভিতর নৈতিকবল আনয়ন করে। ইহা চীনের বিখ্যাত দার্শনিক কনফিউশিয়াজ (৫৫১—৪৭১ খৃঃ পূঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। ক্রমে চীনদেশীয় প্রচারকগণ কর্ত্তৃক উহা জাপানে প্রচারিত হয়। ইহার পর ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মই জাপানে সভ্যতার

বীজ বপন করে। কালক্রমে সেই সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান যুগে জাপানকে এক প্রথমশ্রেণীর সুসভ্য দেশে পরিণত করিয়াছে। আজও পর্য্যন্ত জাপানের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে শুনিয়াছি যে জাপানের উন্নতির মূলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতার বিস্তার, ইউরোপ কিম্বা আমেরিকার সভ্যতা নহে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্যক্ প্রসারণের নিমিত্ত অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে অধিকাংশ জাপানীই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সেটি ভুল। আজও পর্য্যন্ত জাপানে হাজার করা পাঁচ জন লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায় শিন্তোধর্ম্মই জাপানের আদি ধর্ম্ম এবং শিন্তোধর্ম্মই ষ্টেট্ রিলিজন (রাজধর্ম্ম) রূপে গৃহীত। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অনেকে আমাকে এই অজ্ঞাতধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ব্যারণ কেকো ছুয়েমাৎসু বি, এ, এল, এল, এম, লিখিত বিবরণ হইতে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান মূলসূত্রের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। "শিন্তোধর্ম্ম জাপানের ধর্ম্ম, ইহা অপর কোন দেশ হইতে আনীত হয় নাই। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন প্রবর্ত্তক বা অবতার নাই এবং অন্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহাতে কোন বাঁধাবাধি কড়া নিয়ম নাই। সামাজিক রীতি, নীতি, পদ্ধতি এবং লৌকিক স্বভাব চরিত্র হইতে এ ধর্ম্মের উৎপত্তি, শিন্তোধর্ম্ম অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করে, ঐশ্বরিক শক্তিকে বিশ্বাস করে এবং পূর্ব্বপুরুষের আত্মাকে পূজা করে। নৈতিক বিষয়ে চীনের কনফিউশিয়াজ ধর্ম্মের তুল্যভাব প্রদর্শিত না হইলেও এ বিষয়ে শিন্তোধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে অতিক্রম করে। এ ধর্ম্মে জাপানীদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে যেহেতু ইহার সহজ সূত্রে সকলেই সন্তুষ্ট।

"শিন্তোধর্ম্ম পরিবারপালক, সমাজপতি এবং দেশনায়কদিশকে সম্মান করিয়া চলিতে উপদেশ দেয়। শিন্তোধর্ম্মের নৈতিকসূত্র দেহ এবং মনকে পরিষ্কার রাখিতে আদেশ করে এবং দূষিত মনকে কালো অথবা পঙ্কিল এবং নির্দ্দোষ মনকে লাল অথবা পরিষ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করে; সাহস, সরলতা এবং সৎকর্ম্ম সম্পাদনে বলবতী স্পৃহা প্রভৃতি এ ধর্ম্মের লক্ষণ। রাজা বা শাসনকর্ত্তাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা শিন্তোধর্ম্মের অপর সূত্র।

কাগজে কলমে শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা নিতান্ত কম হইলেও প্রত্যেক জাপানীর ভিতর শিন্তোধর্ম্মের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে। চীনের কনফিউসাজ ধর্ম্ম কতক দিবসের জন্য জাপানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। উহার কতকগুলি মূল্যবান সূত্র জাপানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তি জাপানে আজ কাল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিউশিউ এবং ফর্ম্মোজা দ্বীপের মাঝখানে কোন এক ক্ষুদ্র দ্বীপে নাকি কতকগুলি কনফিউসাজ ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের অধিকাংশ লোকই আজ কাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এখন জাপানে কর্ম্মযুগ। উহাদের সমস্ত কাজকর্ম্মে,

স্বভাবচরিত্রে অতীতের ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্মের প্রক্রিয়া প্রকটিত হইলেও বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কোন এক কার্য্যোদ্ধারের জন্য যতটুকু আবশ্যক ততটুক মাত্র ধর্ম্মের সংস্রব তাহারা রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন—কোন একটি ছেলের ইচ্ছা যে সে কোন খ্রীষ্টান পাদরীর স্কুলে পড়িয়া ইংরাজী ভাষাটা বেশ ভালরূপে শিক্ষা করে। পাদরী জানাইলেন যে তাঁহার স্কুলে খৃষ্টান ভিন্ন অন্য কাহাকেও লওয়া হয় না, অগত্যা বালক খৃষ্টান গণ্য করিয়াই আপনাকে ভর্ত্তি করিতে অনুরোধ করিল। এবম্বিধ খৃষ্টান বালক ছাত্রাবস্থাতে স্কুলের নিয়মানুযায়ী প্রার্থনাদি করিতে লাগিল। তিন বৎসরে স্কুলের অধ্যয়ন শেষ হইল; বাহির হইয়া বালক পূর্ব্বের ন্যায় বৌদ্ধই রহিল। কার্য্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিনের জন্য বাহ্যিক ভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে উহাদের আপত্তি নাই। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক এবং মহামূল্য পদার্থ। অন্তরের শুচি, পবিত্রতা, সাধুতা, সরলতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক আর্য্যভূমি হিন্দুস্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ লইয়া গিয়া তাৎকালিক সুসভ্য চীনদেশে বপন করিতে থাকেন। তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করে। ক্রমে কোরিয়ার যাজকগণ উহাতে দীক্ষিত হইয়া জাপানে প্রচার আরম্ভ করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার লাভ করিলেও সপ্তম শতাব্দীতে উহা বদ্ধমূল হয়। এই শতাব্দীতে সাত জন সম্রাট এবং পাঁচ জন সম্রাজ্ঞী রাজত্ব করেন। সর্ব্বত্রই পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ভিতর ধর্ম্মভাব প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এই সময় সম্রাজ্ঞীদের প্রযত্নে অতি সহজেই জাপানের শিক্ষিত সমাজের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে থাকে এবং রাজ্যের স্থানে স্থানে মন্দিরে মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে রাজা অশোক যেমন বিখ্যাত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে কোমিও এবং কোকেনো নামক সম্রাজ্ঞীদ্বয় তেমনি বিখ্যাত। রাজ্ঞী কোমিও রাজ্যের স্থানে স্থানে ১৬ ফুট এবং নারা নামক স্থানে ৫৩ ফুট উচ্চ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরস্থাপন, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং নানা উপায়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সম্রাজ্ঞী কোমিও এবং কোকেনো হিন্দুরাজা শিলাদিত্যের ন্যায় অনেকবার রাজকোষ নিঃশেষিত করেন। উঁহাদের পর প্রায় দেড় শত বৎসর কাল ধর্ম্মস্রোত থামিয়া যায়। ফুজিওয়ারার সময় পুনরায় অপর কতিপয় সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম জাগিয়া উঠে। ৯ম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানে ফুজিওয়ারা বংশের প্রতিপত্তি বিশেষ বাড়িয়া উঠে বলিয়া ঐ সময় জাপানে ফুজিওয়ারা সময় নামে প্রসিদ্ধ।

স্বদেশপ্রীতি শিন্টো ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। জাপানীদের ভিতর যেরূপ স্বদেশানুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির ভিতর তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর পূর্ব্বপুরুষের আত্মা 'পুনরায়' জাপানে আসিয়া তাঁহাদের সন্তান-

গণ জাপান স্বর্গকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিতেছে কিনা তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; কি বিশ্বাস। ইহাই উহাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ উহাও উহাদের ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের ফলে উহারা ব্যাধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতিতে নির্ব্বিকার। গত যুদ্ধে কত পরিচিত ব্যক্তিকে পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে হারাইয়াও অম্লানবদনে জয়োৎসবে যোগদান করিতে দেখিয়াছি। রেলওয়ে ষ্টেশনে রমণীগণ পতিপুত্রকে সমরক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন দেখিয়াছি। আর কত ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় উপযুক্ত পুত্র কিম্বা স্বামীকে ব্যাধির করালকবলে নিপতিত হইতেও দেখিয়াছি। কিন্তু একদিনের জন্যও জাপানে কাহাকেও শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতে দেখি নাই।

শিন্তোমন্দিরে (shrine) কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি নাই। পর্ব্বদিনে কিম্বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শূন্যঘরে পূজা এবং নানা উপচারে ভোগের বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। আর বৌদ্ধমন্দিরে (tepmle) অনেক স্থলেই ধ্যানে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পূজা প্রায় এক ভাবেই হয়। তোকিও সহরের বিবরণীতে দেখিয়াছি যে একমাত্র তোকিও সহরেই ছোট বড় তিন সহস্র বৌদ্ধমন্দির আছে। আমাদের দেশের ন্যায় পুরোহিত কিম্বা ধর্ম্মযাজকের পুত্র হইলেই পুরোহিত কিম্বা ধর্ম্মযাজক হইতে পারে না। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় আছে; ঐ সকল বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করিলেই ধর্ম্মযাজক হইতে পারেন।

সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি।

কোন কোন পর্ব্বদিনে ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া দেখিয়াছি যাজকগণ যে ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন উহা সাধারণ জাপানীদের বোধগম্য

নহে। উহাতে নাকি অনেক পালিশব্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া মিশ্রিত হইয়াছে। দেবমন্দিরে ছোট ছোট কাষ্ঠফলকে কিম্বা বস্ত্রখণ্ডে লিখিত অনেক মূল্যবান উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে দুই একটি অক্ষর আমরা বুঝিতে পারিতাম। উহা অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায়। জাপানের কোন কোন মন্দিরে এবং এক জায়গায় শাক্যমুনির মূর্ত্তির উপরে "ওঁ" লিখিত দেখিয়াছি। দেবমন্দিরে মোমের বাতি এবং ধূপধুনা দেওয়া হয়। পদ্ম ফুল এবং নব পল্লবের (আমের নহে, পাইন বৃক্ষের) ব্যবহারও দেখিয়াছি। অনেকের বাড়ীতে কোন এক প্রকোষ্ঠে অথবা ঘরের বাহির উঠানে এক একটি ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত আছে। প্রতিদিন তথায় ভাতের ভোগ দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধাগণ মোমের বাতি জ্বালাইয়া থাকেন। এক মন্দিরের সম্মুখে এক বৃদ্ধাকে অনেক দিন বাতি জ্বালাইয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কয়েকবার ঘুরিতে এবং হাতে তালি দিতেও দেখিয়াছি। ধর্ম্মমন্দির অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার সময় অনেককে যোড় হস্তে নমস্কার করিতে দেখিয়াছি। স্থূলকথা ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক চলিত নিয়মের সহিত আমাদের দেশের নিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল সর্ব্বসাধারণে মাছমাংস খাইলেও ধর্ম্মযাজকগণ মাছমাংস স্পর্শ করেন না, এমন কি কচিৎ দুই একজন সাধু পুরুষকে দেখা যায় যাঁহারা দুগ্ধও পান করেন না।

মূলধর্ম্ম এক হইলেও জাপানে ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী প্রচারকের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচারকের মতভেদে ক্রমে ১২টি শাখা এবং ৪৭টি প্রশাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

(১) হোস্সো—৬৫৩ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। নারা সহরের কোফুকুজি মন্দির এ সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির। বিখ্যাত ফুজিওয়ারা বংশের সকলে এই মন্দিরেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

(২) তেন্দাই—৮০৫ খৃষ্টাব্দে ছাইচো কর্ত্তৃক চীন হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। যাবতীয় গুণের পরিচালনা দ্বারা সৎপথে জীবনাতিবাহিত করাই মুক্তির প্রধান উপায়; ইহাই এ সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। হিউয়ে পর্ব্বতোপরি এনরিয়াকু মন্দিরই ইহাদের প্রধান মন্দির।

(৩) নসিঙ্গ—৮০৬ খৃষ্টাব্দে কুকাই নামক জনৈক প্রচারক কর্ত্তৃক চীন হইতে আনীত। এ সম্প্রদায়ের প্রার্থনা বিশেষ বিখ্যাত। কিওতো সহরের গোকোকুজি (অপর নাম তোজি) মন্দির ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। ইহাদের প্রাচীন এক প্রশাখার প্রধান মন্দির কইয়া পর্ব্বতস্থ কোঙ্গোবুজি।

(৪) জোদো—৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হোনেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে গেঙ্কু কর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ের দুই মত। (ক) এক মতে ব্যক্তিমাত্রেরই স্ব স্ব চেষ্টায় বুদ্ধদেবের ন্যায় পবিত্র পথ অনুসন্ধান করিয়া সৎপথে চলিয়া মুক্তি প্রাপ্ত করিতে হইবে। (খ) অপর মতে বুদ্ধদেবের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া জীবন কাটাইলেই মুক্তি। কিওতো সহরস্থিত চিওন্‌ইন্ মন্দিরই এ ধর্ম্মের প্রধান মন্দির।

(৫) জেন—লোগেন ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে জেন মত লইয়া যান। ইহাতে আত্মা, ধর্ম্ম এবং নশ্বরত্বের মূল অনুসন্ধান করতঃ চিন্তা ও গবেষণাদ্বারা প্রকৃত জ্ঞানমার্গে উপনীত হইতে হয়। মেইজি অব্দের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রিণ্‌ছেই, ছোদো এবং ওবাকু নামক তিনটি প্রশাখা বাহির হইলেও মূলে উহারা একই। য়েইহেইজি এবং ছোজি জি উহাদের প্রধান মন্দির।

(৬) শিন—জোদোর প্রবর্ত্তক হোনেনের শিষ্য শিনরান শোনিন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় ত্রিপিটকের সূত্রানুযায়ী পরিচালিত হয়। এ মতে এক মাত্র অমিতাভ বুদ্ধে অচলা ভক্তিতেই মুক্তি। এ সম্প্রদায়ের

কোফুকুজি মন্দির।

মধ্যে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং শরীররক্ষার নিমিত্ত মাংস ভোজন করা ধর্ম্মানুমোদিত। প্রবর্ত্তক ১২২৪ খৃষ্টাব্দে ইনাদা নামক স্থানে ইহাদের প্রথম ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিওতো সহরে উঁহার ভস্মাবশেষের উপর বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ নিশি (পশ্চিম) হোঙ্গানজি মন্দির নির্ম্মিত হয়। উঁহার প্রধান শিষ্য শিমুৎসু শোনিন, শিমোছা নামক স্থানে ছেন্‌গুজি নামক মন্দির স্থাপন করেন। কালে ইহা ইছে নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। তৎপর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে প্রবল পরাক্রান্ত ইয়েইয়াছু আমাদের লাট কর্জ্জনের বঙ্গবিচ্ছেদের ন্যায় এই পরাক্রান্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হ্রস্ব করিবারে উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক মতলবে প্রসিদ্ধ হিগাশি (পূর্ব্ব) হোঙ্গান

জি মন্দির স্থাপন করেন। বর্ত্তমান কালে এই নিশি (পশ্চিম) এবং হিগাশি (পূর্ব্ব) হোঙ্গেনজি মন্দিরদ্বয় জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মন্দিরদ্বয়ের দুই ধর্ম্মযাজকই (লর্ড য়্যাবট) স্বামী কাউন্ট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পশ্চিম হোঙ্গানজির য়্যাবট কাউণ্ট ওতানি ইউরোপে অনেক বৎসর বিদ্যার্জ্জন করেন। পিতার মৃত্যুতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্দিরের ভার গ্রহণ করেন। ইনি প্রিন্স্ কুজোর দ্বিতীয় কন্যা অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্রাউন প্রিন্সপত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন।

(৭) নিচিরেন্ অথবা হোকে সম্প্রদায় ১২৫২ খৃষ্টাব্দে নিচিরেন্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ের লোক "মিওহরেঙ্গেক্যো" এই পবিত্র ধর্ম্মগীতি উচ্চরবে গাহিতে গাহিতে নির্ব্বাণ লাভের কামনা করেন। মিনোবু পর্ব্বতের উপর ইহাদের প্রধান মন্দির।

(৮) জি সম্প্রদায় ইপ্পেন শোনিন্ কর্ত্তৃক ১২৭৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফুজিছাওয়া নামক স্থানে ইহাদের প্রধান মন্দির ছেইজোকো অবস্থিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় শিন্তোধর্ম্মেও অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে। জাপানের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বলিলে পাঠকগণ আমাদের হিন্দুস্থানের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতির ন্যায় দলাদলি, ঠেলাঠেলি, এবং ভেদাভেদির সম্প্রদায় মনে করিবেন না। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বিষয়; একজনের শরীরের ছায়া লাগিলেই ধর্ম্ম নষ্ট হওয়া কিম্বা অপবিত্র হওয়া একমাত্র ভারতেই সম্ভবপর। মানুষ মানুষকে যতটা ঘৃণা হিন্দুস্থানে করিয়া থাকে দুনিয়ায় আর কোন দেশে তেমন নাই।

আমরা কুকুর বিড়ালকে ক্রোড়ে বসাইয়া চুম্বন করিতে পারি আর আপন ধর্ম্মভাইকে নীচজাতির ঘৃণিত জীবের চেয়েও ঘৃণিত বলিয়া মনে করি। প্রাচীনকালে প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য মুনিঋষিগণ কি ভাবে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন, প্রসারণ এবং সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন আর আমাদের ন্যায় ঘোর স্বার্থান্ধ সংস্কারকের দোষে আজকাল ধর্ম্মের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ পবিত্রভাব রসাতলে গিয়াছে; স্বার্থপরতা, কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, চৌর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের পবিত্র সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—আমাদের ধর্ম্ম এখন ছুতিমার্গে।

জাপানীরা কল্পনাতেও এ সকল ধারণা করিতে পারে না। ধর্ম্ম পবিত্র জিনিষ; যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমন ভাবেই ভগবানকে ধ্যান করিতে পারেন। জাপানীদের এক বাড়ীতে এক পরিবারের ভিতরেই কতিপয় ধর্ম্মের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি স্বামীস্ত্রীও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়াছি। আমাদের জাপানীভাষার শিক্ষক খৃষ্টান ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু জাপানে বহু ধর্ম্ম হইলেও দেশের কাযে, দশের কাযে সমগ্র জাপানের পণে পাঁচ কোটি লোক এক। জাতীয় কার্য্যে সমবায়শক্তিপ্রয়োগে তাহারা ধরণীতলে অদ্বিতীয়। দুঃখের বিষয় শৃগাল কুকুরের ভিতর যে সহানুভূতি এবং সমবেদনা আছে

আমাদের ভিতর সে টুকুও নাই। একটি শৃগালের ক্রন্দনে দশটি শৃগাল কাঁদিয়া উঠে আমরা একজনের পতন দেখিলে দূরে দাড়াইয়া হাসি।

আগামী বারে জাপানের নব্য খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ সরকার

সরোজ-বাসিনী।

(কোন এক লক্ষ্মীপ্রতিমা বালিকার প্রতি)

১

এসেছিস্ কন্যারূপে, আয় মা ইন্দিরা,
আয় মা, আনন্দ-নির্ঝরিণী!
চৌদিক রাঙিয়া উঠে, পুলকে অধীরা,
স্থলে পদ্ম, জলে কমলিনী!
আয় চির পৌর্ণমাসী, আয় চির হাসি রাশি,
আপনি মা ফুল্লা সরোজিনী,
তবুও লীলার ছলে সরোজ-বাসিনী!

৩

একি রূপ! চিত্র পটে ছবি যেন আঁকা!
বিশ্ব শোভা, লাবণ্যের রাণী!
দুটি ভুজে শোভা পায়, শাদা দুটি শাঁখা;
আল্‌তায় রাঙা পা দুখানি!
ঝলকে ঝলকে রঙ্গে রাঙা চেলি নাচে অঙ্গে;
আয় আয় মধুর মধুরা!
রিণিকি, রিণিকি, রিণি, শিঞ্জিত নূপুরা!

৩

মধুব পদ্মের একি চাঁচর চিকুর!
গোলাপগুচ্ছের একি রূপ!
উষাতে সন্ধ্যাতে একি মিলন মধুর!
অতুলন, একি অপরূপ!
কুন্দেন্দু- ধবলা অয়ি! কমলা আনন্দময়ি!
দিলি হাত তারে তারে তারে;
বাজিছে হৃদয়-বীণা ললিত ঝঙ্কারে।

৪

জলধি মন্থন কালে অতল হইতে
তুই যবে উঠিলি সুন্দরি!
অনন্ত নীলাম্বু রাশি ধাঁধিয়া চকিতে,
দিক্ চক্র রূপে আলো করি,
কৌতুকে আনন্দে ত্রস্ত, সুরাসুর শশব্যস্ত,
রূপে ম্লান ভাবে, তারানাথ,
"এ কোন্ রজনী-শেষে অপূর্ব্ব প্রভাত!"

৫

কোন্ নব নন্দনের ফুল্ল পারিজাত?
কোন্ রক্ত চন্দনের ফুল?
কোন্ পুণ্যফল, কোন্ অমৃত প্রপাত?
সুরাসুর ভাবিয়া আকুল!
দিবসেই কুমুদিনী হইল রে আহ্লাদিনী!
অকস্মাৎ, আরাধনা বিনা,
ঝঙ্কারি উঠিল হর্ষে নারদের বীণা!

৬

অশোক হইল রাঙা চুম্বিয়া চরণ,
চুম্বি মুখ ফুটিল বকুল !
এ কোন্ মধুর স্বপ্ন ? সুখ জাগরণ ?
সুরাসুর ভাবিয়া আকুল !
চাহি তোর মুখ পানে ভাতিল দৈত্যেরো প্রাণে
একি, সত্য !—ভুলি আত্মপর,
দেবে করে আলিঙ্গন, ভাবিয়া সোদর !

৭

হে বরাঙ্গি ! ছিলি তুই গভীর অতলে,
কোটি কোহিনুর যথা জলে ;
যথা কোটি পদ্মরাগ লোহিতে উছলে,
শঙ্খ হাসে অপূর্ব্ব ধবলে ;
এখনো বুঝি মা তাই, শ্রীঅঙ্গে দেখিতে পাই,
চন্দ্রকান্ত মুকুতা ও মণি।
আপনি লো চন্দ্রাননি মণি-শিরোমণি।

৮

এসেছিস্ কন্যারূপে ? আয় তবে আয়,
সন্তানের হৃদয়-মন্দিরে !
মনের কালিমা-রাশি রূপের প্রভায়
ধৌত হোক্ হে দেবি অচিরে।
হৃদয়-সরোজ-মাঝে, সরোজ-বাসিনী-সাজে,
নিত্য রূপে দে মা দরশন !
খুলে যাক্ ঘুচে যাক্ বাসনা-বন্ধন !

৯

ঘুচে যাক্ বাসনার বিপদ বিপাক ;
অকিঞ্চনে কর কৃপাদান ;
এক হয়ে যাক্ মাগো, এক হয়ে যাক্
ধ্যেয় বস্তু ধ্যানী আর ধ্যান !
যেমতি নির্ব্বাত স্থলে কম্পহীন দীপ জ্বলে,
থাক্ তুই হে তিমির হরা,
থাক্ তুই সুধা পাত্র ! চির-সুধা-ভরা !

১০

তোর চন্দ্রমুখ হেরি সুধাংশুরূপিনী
ফুটুক এ হৃদি কুমুদিনী !
না জানি আসিবে কবে বিশ্ব আহ্লাদিনী
সে শারদী সচন্দ্রা যামিনী।
তোর শ্রীচরণে লুটে আনন্দে উঠিবে ফুটে
এ হৃদয় রক্ত কমলিনী।
কোথা মা, কোথা মা, তুই সরোজ-বাসিনী॥

১১

চিরদিন চিরদিন আমি লক্ষ্মী-ছাড়া ;
জন্মাঙ্কের একি, অলক্ষণ !
চিনিনি পরশমণি হয়ে জ্ঞান হারা ;
রত্ন ভাবি কাঁচেতে যতন।
এবে মাগো বুঝিয়াছি, ঠেকে মাগো শিখিয়াছি
তুলনায় তুচ্ছ ব্রহ্মপদ,—
কল্পতরু মাগো তোর পদ কোকনদ।

১২

সেই কল্প-তরু শাখে—বরদা, শুভদা,
ফলে রাঙা চতুর্ব্বর্গ ফল,
তবু সে মাকাল ফল ; তাই গো জ্ঞানদা,
বুঝিয়াছি তাহাও গরল।
ধনৈশ্বর্য্য, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সে শুধু দুঃখের বৃদ্ধি,
মায়াবিনি ! আর ভুলায়ো না ;—
তোমারে তোমারি তরে করি মা কামনা।

১৩

আত্মপূজা, আত্মজ্ঞান, আর আত্মজয়,
এই তিনে সব আসি জোটে।
আছে যার এই তিন, সে জন অভয় ;
বিশ্ব তার পদতলে লোটে।
যার এই তিন নাই, সব তার ভস্ম ছাই ;
রাজা নয়, সেজন ভিখারী।
ভস্ম মাখি খ্যাপা ভাবে "আমি ত্রিপুরারি"।

১৪

ফুটুক রজনীগন্ধা, হাসুক সেফালি,
কোটি তারা জ্বলুক আকাশে,
তবু সেই নিশীথিনী ভয়াল, করালী;
পূর্ণচন্দ্র যদি নাহি' হাসে।
তাই মাগো তোরে চাই, তুই বিনা গতি নাই;
নারী যথা হয় না মধুর,
বিনা সেই সুলক্ষণ ভালের সিন্দুর।

১৫

চক্রে, চক্রে, ষট্ চক্রে ফুটাও চক্রিণী,
আনন্দের অফুটো কমল;
জাগুক্ মা সুষুম্নায় সুপ্ত কুণ্ডলিনী,
স্পর্শে তোর হরষে চঞ্চল।
সেই সরসীর জলে, সেই ফুল্ল শতদলে,
সদা হোস্ সরোজবাসিনী,
স্থির সৌদামিনী সম সদা সুহাসিনী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(১)

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকালের আহ্বানে, বহুদিবস পরলোকগত। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কোন জীবনচরিত প্রকাশিত হইল না। ইহা বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক। শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং "আত্মচরিত" রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তাঁহার নৃপ-সম্পর্কীয় কর্ম্ম-জীবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার মৃত্যুর চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তথাকথিত 'আত্মচরিত' সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে, এইরূপ আদেশ ছিল। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে,—কিন্তু অদ্যাপি তাহা অপ্রকাশিত। ইহার কারণ কি? প্রকৃতই কি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন 'আত্মচরিত' আছে? অথবা, তাহা নষ্ট হইয়াছে কিংবা ইহা অমূলক জনরব? আমরা ইহার সদুত্তর পাইলে সন্তুষ্ট হইব।

উপস্থিত প্রবন্ধে, আমরা তাঁহার জীবনী বা জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা বঙ্কিম-যুগের কথা আলোচনা করিব। অতীতের গল্প, সুখময়ী স্মৃতির নির্ঝর; সুতরাং বড় মধুর। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাই বলিব।

এ'যুগের প্রথমেই, আমরা গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করি। সকলেই জানেন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও রঙ্গলাল প্রভৃতির 'হাতে খড়ি' ঈশ্বরচন্দ্রেরই নিকটে। এখানে, সে বিষয়ের সবিস্তার পরিচয় দিয়া লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের আনন্দদায়িনী রসিকতা, আজ সাহিত্য-সমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। হয়ত' বহুস্থলে তাহা শ্লীলতা-বর্জ্জিত—কিন্তু সর্ব্বস্থলে নয়। সে রসিকতা, অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে শাণিত হইয়া অধঃপতিত সমাজের দুর্নীতি-দুষ্ট অঙ্গে প্রচণ্ড খড়্গাঘাতের মত গিয়া বাজিত। তাহার একাধিক প্রমাণ, সেকালের "সংবাদ প্রভাকর" প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। গুপ্তকবির এই শ্রেণীর রস রচনা, তাৎকালিক সমাজ, কিরূপ ভাবে

গ্রহণ করিত, আজ তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এ'বিষয়ে, আমি একটী ঘটনা জানি—তাহাই বলিতেছি।

গুপ্তকবির আদিবাস কাঁচড়াপাড়ায়। বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীগ্রামের মত আজ তাহা ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিগত-শ্রী। কাঁচড়াপাড়া, বহু প্রসিদ্ধ বৈদ্যের জন্মস্থান। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়বন্ধু, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে প্রথম ডিঃ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুপণ্ডিত ৺জগদীশনাথ রায় মহাশয়ও এই কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুপ্তকবি, আপনার "প্রভাকর" পত্রে, কাঁচড়াপাড়াবাসী ব্রাহ্মণজাতির সম্বন্ধে কতকগুলি অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। ফলে, অনেক দুর্ব্বাসা বংশধরের দ্বিতীয় রিপু প্রবল হইয়া উঠিল। কলির ব্রাহ্মণের সবই গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে, আছে সুধু এই কোপ!

দুপুর বেলা, গুপ্তকবি বিশ্রাম করিতেছিলেন—হঠাৎ ঠাকুরেরা দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের চোখে ক্রোধাগ্নি, মুখে পইতা ছিঁড়িবার কথা! একালে, এ'সকল তর্জ্জন-গর্জ্জন, অনেকেই আমলে আনেন না—কিন্তু সেকালে ঠিক ইহার উল্‌টা ছিল—ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি একবার যদি জ্বলিয়া উঠিত,—তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা নিভিয়া যাইবে, সকলে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইত। কাজেই, গুপ্তকবি একটু ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং ব্যাপারটা বড় নিরাপদ্ ভাবিতেও পারিলেন না।

শান্ত হইবার নাম নাই,—ঠাকুরদের কোপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া গুপ্তকবি তাড়াতাড়ি হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "ভিতরে আসিয়া বসুন,—একটু তামাকু আজ্ঞা করিয়া দাসকে ধন্য করুন,—রোদে কতক্ষণ আর বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবেন?"

কথাটা, ঠাকুরদের কাছে নেহাৎ মন্দ লাগিল না। তাঁহারা ঘরের ভিতরে যাইলেন এবং কবিবর নিজেই তামাকু সাজিতে বসিয়া গেলেন।

এখন ঘরের একটী জানালা খোলা ছিল,—ভিতর হইতে বাহিরের একটা কলাগাছ দেখা যাইতেছিল। ঠাকুরদের একজনের মাথায় হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। গুপ্তকবিকে অপদস্থ করিবার জন্য তিনি বলিলেন,—ওঃ! কবি ত' ভারি! আচ্ছা বাপু, তোমার কবিত্বের একটা প্রমাণ দাও দেখি!"

কবিবর বলিলেন "আজ্ঞা করুন।"

ঠাকুর বলিলেন "কদলীর উপরে একটী কবিতা এখনি রচনা কর দেখি! তুমি কত বড় কবি বুঝি!"

গুপ্তকবি বলিলেন, "ঠাকুর, কবিতা শুনিয়া বেশীরকম চটিয়া উঠিবেন না ত?" স্বীকার করেন ত' বলি!"

ঠাকুর স্বীকার করিলেন। গুপ্তকবি, তখনই বলিলেন:—

গোলক বিহারী হরি ভৃগুপদ বক্ষে ধরি
তোদের মান বাড়িয়েছে,
শোনরে শোন লেড়ে লেড়ে গলায় দড়ি ভেড়েভেড়ে
তাইতে তোদের প্রণাম করি।
('বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া) নৈলে কলা কেঁদেছে!"

গাছের কলার পরিবর্ত্তে, হাতের কলার আস্বাদ পাইয়া ঠাকুরদের পেট ভরিয়াছিল কি না,—ইতিহাসে তাহা লেখে না!

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধানতঃ রসরাজরূপে পরিচিত থাকিলেও, গুপ্তকবিকর্ত্তৃক বঙ্গ-সাহিত্যের বহু বিভাগ, প্রচুর উন্নতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যে মহাত্মাগণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে, বঙ্গ সাহিত্য আজ পুষ্প-পল্লবে শোভমান এবং জ্ঞানে বিজ্ঞানে মহিমাময় ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রভাকরের প্রভায় বঙ্গ সাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে বহু নবীন লেখক সাধারণ্যে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়,—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি বঙ্গের গৌরব-কীর্ত্তি-স্বরূপ প্রাচীন কবিগণের জীবন-সম্বন্ধীয় কথা অনেকেই জানিতেন না বা অল্পই জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে, বহু পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসা বলে তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সম্মুখে আনয়ন করেন। এ সকল ঋণ অপরিশোধ্য। ফলতঃ,—সকল দিকে না হোক্—অনেক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র, আদর্শ সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট,—যে ঈশ্বরচন্দ্রের ঋণ আমরা গ্রহণ করিয়াছি—কিন্তু সে ঋণ পরিশোধের উপায় আমরা কিছুই করি নাই,—ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবন বাঙ্গালী জানে না।

ইতিপূর্ব্বে জগদীশনাথের নাম উল্লেখ করিয়াছি, অতঃপর, তাঁহার সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব।

জগদীশনাথের জীবনীকথাও সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; প্রতিযোগিতায়, কেহ কখনও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। শুনিয়াছি, বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণী হইতে উর্দ্ধ-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বৎসরান্তে তিনি উর্দ্ধ শ্রেণীর পরীক্ষা ত' দিতেনই;—তাহার উপরে আবার নিম্ন-শ্রেণীর পরীক্ষাও প্রদান করিতেন। এবং উভয় শ্রেণীর পরীক্ষাতেই, তৎকর্ত্তৃক প্রথম স্থান অধিকৃত হইত। বারংবার এইরূপ হওয়াতে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, অবশেষে বাধ্য হইয়া নিয়ম করিলেন, জগদীশনাথ পরীক্ষা দিন,—ক্ষতি নাই,—কিন্তু পরীক্ষায় প্রথম হইলেও,—তিনি আর পুরস্কার পাইবেন না—যে বালক দ্বিতীয় হইবে,—সে-ই পুরস্কার পাইবে। অবশ্য, এ নিয়ম নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষাতে,—নিজের শ্রেণীতে জগদীশনাথ পরীক্ষাও দিতেন এবং বলা বাহুল্য পুরস্কার লাভেও বঞ্চিত হইতেন না।

কিন্তু জগদীশনাথের কৃতিত্ব কেবল বিদ্যালয়ে নয়, কার্য্যক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রতিভার যে সকল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন,—তাহা এই অল্প স্থানে স্বল্পাবকাশে বলিবার নয়। পুলিশবিভাগে তিনি যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—বাঙ্গালীর দগ্ধ অদৃষ্টে সচরাচর তাহা ঘটে না। কিন্তু এই কার্য্য তৎকর্ত্তৃক যেরূপ নিপুণতাসহ সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের গর্ব্ব প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাঁহার চক্ষুতে এমন একটা তীব্র জ্যোতিঃ ছিল, যে সেই প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে অনেককেই সঙ্কুচিত হইতে হইত। শুনিয়াছি,

একবার একজন দুর্দ্দান্ত ও উন্মত্ত অস্ত্রধারী পুরুষ,—তাঁহার মুখের একটি কথায় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরা বারান্তরে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয়-সূচক কয়েকটী কৌতূহলবর্দ্ধিনী কাহিনী বলিব।

জগদীশনাথের পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের উৎসর্গ-পত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে। জগদীশনাথের পুস্তকাগারে নানাবিষয়ক বহু সহস্র জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক একাধারে সংগৃহীত ছিল,—অবসরকালে সেই সকল পুস্তকই তাঁহার অধ্যয়ন লিপ্সা চরিতার্থ করিত। তিনি প্রকৃত সাহিত্যরসিক ছিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার অধিকারও অল্প ছিল না। "বঙ্গদর্শন" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়,—তখন তাহাতে যে নিয়মিত লেখকগণের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল তাহার ভিতরে তাঁহাকেও দেখিতে পাই। অধিকন্তু তথাকথিত পত্রে তাঁহার সঙ্গীত-বিষয়ক রচনাও বাহির হইয়াছিল। সঙ্গীতে তিনি সিদ্ধব্রত ছিলেন। তিনি গান ধরিলে,—আর কাহারও উঠিবার ক্ষমতা থাকিত না,—তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর ছিল। পরন্ত, এই যে সঙ্গীতাভিজ্ঞতা,—ইহা তাঁহার অশিক্ষিত পটুত্ব নয়,—সাধনা দ্বারা, বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্যের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ইহাতে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এবিষয়ে একটি গল্প বলিতেছি।

কোথায়,—তাহা জানি না,—মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথা-প্রসঙ্গে, মাইকেল দুঃখপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, "অনেক কবিতাই সুরসংযোগে গীত হয়,—কিন্তু লোকে বলে, আমার "মেঘনাদ বধ" বড় কর্কশ,—তাহাতে গান হয় না। আপনার মত কি?"

জগদীশনাথ বলিলেন, "গানে গাওয়া যায় না,—এমন বিষয় নাই। সুকণ্ঠ থাকিলে "মেঘনাদ বধে"র শ্লোক অনায়াসে গাহিতে পারা যায়।" মাইকেল সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জগদীশনাথ, তখনই মেঘনাদ বধ হইতে প্রমীলার উক্তি লইয়া সুর তানে গান ধরিলেন,—আর সে গানে সকলেই মুগ্ধ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" সকলেই পাঠ করিয়াছেন এবং তাহার ভিতরে বঙ্কিমের নিজের জীবনের ছায়া আছে, এ কথা এখন অনেকেরই নিকটে পরিচিত। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না, যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র নন—বিষবৃক্ষের মধ্যে, এক প্রান্তে জগদীশনাথও বিরাজ করিতেছেন! পরন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কেবল জগদীশনাথের চরিত্রাঙ্কণের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—তাঁহার একখানি ইংরাজী পত্রের সম্পূর্ণ অনুবাদও বিষবৃক্ষের মধ্যে বিদ্যমান! বিষবৃক্ষের রচনা-কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, বঙ্কিমচন্দ্র, একখানি পত্রে জগদীশনাথকে লিখিয়াছিলেন, আমি তোমাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি,—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমি তোমাকে আঁকিতে পারিলাম না।

জগদীশনাথ, যখন কলিকাতায় আসিতেন,—তখন তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, সেকালের সাহিত্যিকগণের জটলা হইত। রবিবার পড়িলে, তাঁহার ভবনে

সমারোহের আর সীমা থাকিত না। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণ, সেখানে একত্র হইয়া,—নানাবিষয় লইয়া তর্কালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং সেই আলোচনা শ্রবণ করিলে, বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠের তুল্য ফল হইত। জগদীশনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায়
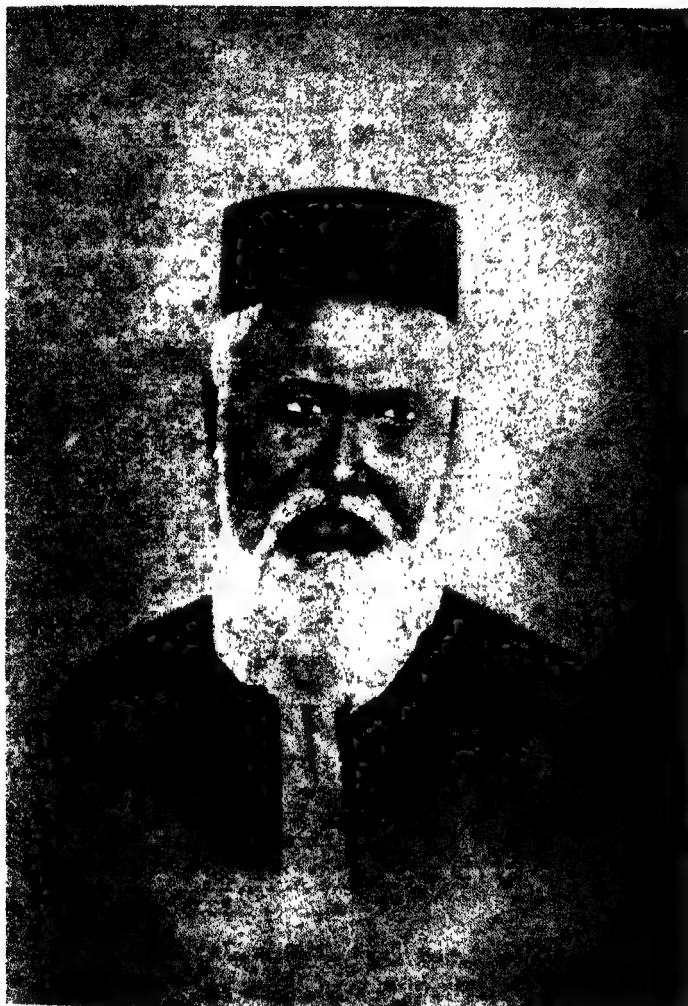
জগদীশনাথ রায়।

মহাশয়, একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন "তখনকার কথা কখনও ভুলিবনা,—আর সে সকল কথা বলিলেও, সেই বর্ণনাতীত ব্যাপার বুঝাইতে পারিব না। এক একদিনের "টেবল টক্" শুনিতাম আর মনে হইত, আজ কত নূতন জ্ঞান, নূতন শিক্ষা

পাইলাম!” এখানে ইহাও বলিয়া রাখি,—যে বঙ্কিমচন্দ্র, কোন নূতন পুস্তকের রচনা কালে জগদীশনাথের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিতেন। বঙ্কিমের বহু শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকের উপকরণ জগদীশ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশনাথ অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও, তাঁহারা উভয়ে অভিন্ন-হৃদয় ছিলেন। জগদীশের আলয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র কতদিন রাত্রিযাপন করিয়াছেন,—একসঙ্গে স্নানাহার করিয়াছেন। শুনিয়াছি, জগদীশ-নাথের বাড়ীতে গিয়া বঙ্কিম প্রায়ই পূর্ণস্নান করিতেন না। জলের টবের উপরে মাথাটি দিয়া,—ঘটী হইতে জল ঢালিয়া স্নান সমাপ্ত করিতেন।

বাস্তবিক, সে বন্ধুত্ব সকলেরই স্পৃহনীয়। আর, বঙ্কিমের বন্ধু-প্রীতিও সাহিত্যক্ষেত্রে আজ বিখ্যাত। এত খোলাখুলি এমন হরি-হর ভাব, বিদ্যমান যুগের বিদ্বেষ কলুষিত সাহিত্যক্ষেত্রে বড় একটা দেখা যায় না। একদিনের কথা বলি। বঙ্কিম, তখন কাঁথিতে। সেই প্রসিদ্ধ কাঁথি,—যেখানে কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি। এ দিকে, জগদীশের নিকটে হঠাৎ একদিন নাটককার দীনবন্ধু আসিয়া উপস্থিত। একথা সে কথার পর, জগদীশ বলিলেন, “চল, কাঁথিতে যাই,—বঙ্কিমকে একবার দেখে আসি।” দীনবন্ধু সম্মত হইলেন। উভয়ে, যথাসময়ে কাঁথিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া জগদীশ বলিলেন, “দেখ, বঙ্কিম যখন জানেনা যে আমরা তার কাছে যাইতেছি, তখন একটু মজা করা যাক। দেখি, বঙ্কিম চিনিতে পারে কি না।”

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসার নিকটে উপস্থিত হইয়া, জগদীশ ভিখারীর সুরে, ভিখারীর গান ধরিলেন। বঙ্কিম, সত্যই জানিতেন না, যে জগদীশ তাঁহার কাছে যাইবেন। তিনি ঘরের ভিতরে ছিলেন। এমন সময়ে গান শুনিতে পাইলেন। এবং তখনই ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন,” থাম ভিখারী থাম! তোমায় চিনিয়াছি—এ গান কি ভুলিবার!” তখন ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এবার আমরা এইখানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম,—বারান্তরে বঙ্কিমের জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প বলিব। পরিশেষে বক্তব্য ভবিষ্যতে যদি কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত রচনা করেন,—যেন জগদীশকে ভুলিয়া না যান! কারণ, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া, বঙ্কিমের জীবনচরিত রচিত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মী কালবিভাগ ও কলিযুগের আরম্ভ।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক পাই :—

সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।
তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সত্তম।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেষাহবিষ্ণুসংপ্লবে।
ত্রৈলোক্যমখিলং গ্রস্তা ভগবানাদিকৃদ্বিভুঃ॥
স্বমায়াসংস্থিতো বিপ্র সর্ব্বভূতো জনার্দ্দনঃ।
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ যথাপূর্ব্বং তথা পুনঃ।
সৃষ্টিং করোত্যব্যয়াত্মা কল্পে কল্পে রজোগুণঃ॥ ৪৮—৫১

"এক কল্প নিঃশেষিত হইতে এক সহস্র যুগ (সময়) কথিত আছে। তাহার পর সেই পরিমিত (কাল) নিশা হয়। কল্পান্তে অম্বুসংপ্লব (জলপ্লাবন) হইলে ব্রহ্মরূপধর ভগবান্ আদিকর্ত্তা বিভু অখিল ত্রৈলোক্যকে গ্রাস করিয়া সর্ব্বময় (নারায়ণ) জনার্দ্দনরূপে নিজমায়ায় সংস্থিত হইয়া শেষাহি (অনন্ত নাগ) শয্যায় শয়ন করেন। তাহার পর নিশান্তে প্রবুদ্ধ হইয়া সেই অব্যয়াত্মা ভগবান রজোগুণে যথাপূর্ব্ব পুনরায় সৃষ্টি করেন; এইরূপ কল্পে কল্পে ঘটিয়া থাকে।"

এই পুরাণোক্ত বাক্যে যে কালবাচক "কল্প" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহা কি এবং উহার পরিমাণ কত? এই প্রশ্ন বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ "যুগ" কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে, কারণ এক সহস্র যুগ পরিমিত কালকে এক কল্প বলে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এক কল্পের শেষে মহাপ্রলয়ে চরাচর বিশ্ব পয়োধি জলে নিমগ্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম নারায়ণ রূপে শেষাহিশয্যায় নিদ্রিত থাকেন। তখন নিশা—সেই ব্রহ্ম নিশাও এক সহস্র যুগব্যাপী। তাহার পর নূতন কল্পারম্ভ ও নূতন সৃষ্টি।

ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে আমরা "যুগ" শব্দের অর্থ পাই। মানবের এক বৎসর দেবতার এক অহোরাত্র; সুতরাং মানুষের ৩৬০ বৎসরে, দৈব ৩৬০ অহোরাত্র বা এক "দৈব বর্ষ" হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ লইয়া এক "দৈব যুগ"। এই চতুর্যুগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে নিম্নে দেওয়া হইল।*

মৎস্য পুরাণে এই চারি যুগের পরিমাণ মানব বৎসর স্পষ্ট দেওয়া আছে। অতএব দৈবযুগে মোট দ্বাদশ সহস্র দেববর্ষ অর্থাৎ "বিংশ সহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশ লক্ষ" (৪৩ লক্ষ ২০ হাজার) মানব বৎসর। আমাদের দেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতেও এই সংখ্যা আছে।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে কলির বর্ষসংখ্যা সমস্ত দৈবযুগের এক দশমাংশ ভাগ মাত্র। তাহার দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা, ও চতুর্গুণ সত্য। দৈবযুগের বর্ষ সংখ্যা ৪৩২০০০০ আর্য্যভটির মতে "খ্যুঘৃ" এই সূত্রে প্রতিপন্ন হয় তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বলিব। প্রাচীন রোমান জ্যোতির্বিদেরা ঐ পরিমিত কালকে সৃষ্টি বিবর্ত্তন কাল (Annus mundanus) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় আছে।

এতদ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥
দৈবিকানাং যুগানাস্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতীং রাত্রিমেব চ ॥
তদ্বৈ যুগ সহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্ব্বিদুঃ।

*১।	সত্য	—৪৮০০	দৈববর্ষ	অর্থাৎ	মানবের	৪৮০০ × ৩৬০ = ১৭২৮০০০	বৎসর।
২।	ত্রেতা	—৩৬০০	"	"	"	৩৬০০ × ৩৬০ = ১২৯৬০০০	" ।
৩।	দ্বাপর	—২৪০০	"	"	"	২৪০০ × ৩৬০ = ৮৬৪০০০	" ।
৪।	কলি	—১২০০	"	"	"	১২০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০	" ।
		১২০০০				৪৩২০০০০	বৎসর

রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ॥
তস্য সোহহর্ণিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকঃ॥
প্রথম অধ্যায় ৭১—৭৬ শ্লোক।

এক সহস্র দৈবযুগে, অর্থাৎ চারি শত বত্রিশ কোটি মানব বৎসরে ব্রহ্মের এক দিন বা লৌকিক এক কল্প হয়। সৃষ্টির আদি হইতে ৪৩২০০০০০০০ বৎসর পরে মহাপ্রলয় হইয়া ব্রহ্মনিশা আরম্ভ হয়; তাহার পর আরও ৪৩২ কোটি বৎসর পরে নিশাবসান হয় এবং সৃষ্টির পুনর্গঠন হয়। এইরূপ আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে যে ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মমাস হয়। কারণ এক কল্প এক দিন হইলে ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মের এক মাস হওয়াই সঙ্গত। তাহার প্রথম ১৫ কল্প শুক্ল এবং শেষ ১৫টি কৃষ্ণ। এই ত্রিশটি কল্পের নামও পাওয়া যায়।*

মহাভারতে আছে যে এইরূপ ত্রিশ কল্পে একমাস হইলে, এইরূপ দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ কল্পে ব্রহ্মের এক বৎসর হয়। "এবং বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ আয়ুঃ তত্র পঞ্চাশদ্বর্ষাঃ ব্যতীতাঃ একপঞ্চাশদারম্ভে অধুনা শ্বেত বারাহঃ কল্পঃ"। "ব্রহ্মের পরমায়ু এক শত বর্ষ" অর্থাৎ ৩৬০০০ কল্প। অহোরাত্র ধরিয়া মানবের ৩১১০৪০০০০০০০০, একত্রিশ হাজার একশত চারি অর্ব্বুদ বৎসর হইলে ব্রহ্মের এক বৎসর হয়। এইরূপ এক শত বৎসর ব্রহ্ম আয়ুঃ, তন্মধ্যে ৫০ বৎসর শেষ হইয়াছে —একান্ন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, সবে মাত্র তাহার প্রথম কল্প (বারাহঃ) চলিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মের বয়ঃক্রমও ঠিক করা গিয়াছে।

এক কল্প চতুর্দ্দশ (১৪) মন্বন্তরে বিভক্ত সুতরাং এক মন্বন্তরে ১০০০ ÷ ১৪ = প্রায় ৭১ৡ টি দৈবযুগ। ভাগবতে আছে

"যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দ্দশ।
স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকং হ্যেক
সপ্ততিং॥ ৩-১২।২৩॥

অপিচ মনুসংহিতায়

যৎপ্রাক্ দ্বাদশ সাহস্রং উদিতং দৈবিকং যুগং
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥
প্রথম অধ্যায়—৭৯ শ্লোক॥

অমরকোষে দেখি "মন্বন্তরং তু দিব্যানাং যুগানাং একসপ্ততিঃ।" কালবর্গ ২২॥

বিষ্ণু পুরাণে চতুর্দ্দশ মনুদের নাম আছে এবং অধুনা কোন মন্বন্তর তাহারও নির্দ্দেশ আছে; যথা—

মনুঃ স্বায়ম্ভুবো নাম মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমিস্তামসিশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা॥

* ১ শ্বেতবারাহঃ	৮ কন্দর্পঃ	১৬ নারসিংহ	২৩ সুপ্তমালী
২ নীললোহিতঃ	৯ সত্যঃ	১৭ সমাধিঃ	২৪ বৈকুণ্ঠঃ
৩ বামদেবঃ	১০ ঈশানঃ	১৮ আগ্নেয়ঃ	২৫ আর্চ্চিষঃ
৪ গাথান্তরঃ	১১ ধ্যানঃ	১৯ বিষ্ণুজঃ	২৬ বল্মীকল্পঃ
৫ রৌরবঃ	১২ সারস্বতঃ	২০ সৌরঃ	২৭ বৈরাজঃ
৬ প্রাণঃ	১৩ উদানঃ	২১ সোমকল্পঃ	২৮ গৌরীকল্পঃ
৭ বৃহৎকল্পঃ	১৪ গরুড়ঃ	২২ ভাবনাঃ	২৯ মাহেশ্বরঃ
	১৫ কৌর্ম্মঃ (অত্র পূর্ণিমা)		৩০ পিতৃকল্পঃ (অত্র অমাবস্যা)

এতেতু মনবোহতীতাঃ সপ্তমস্ত রবেঃ সুতঃ।
বৈবস্বতোহয়ং যস্যৈতৎ সপ্তমো বর্ত্ততে যুগং॥

স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামসি, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয়টি মনু অতীত হইয়াছেন; অধুনা সপ্তম মনু বৈবস্বত (রবির পুত্র) মনুর কাল, এবং তাহার সপ্তম যুগ বর্ত্তমান।

অতএব আমরা অধুনা ব্রহ্মের (৫১) একপঞ্চাশত্তম বর্ষের প্রথম কল্প শ্বেতবারাহ কল্পের সপ্তম মন্বন্তরের সপ্তম যুগে আছি। এক্ষণে এই যুগের বিভাগ দেখা যাউক। এস্থলে যুগ অর্থে দৈবযুগ সত্যদ্বাপরাদি চতুর্যুগ।

সপ্তম মন্বন্তরের ছয় যুগ অতীত হইয়াছে। সপ্তম যুগের ও সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর সম্পূর্ণ হইয়াছে, এবং কলিরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে কলির কত বৎসর গিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্মের বয়স এবং আমাদের সৃষ্টির স্থিতি কাল বুঝা যাইবে।

কলির প্রারম্ভ কখন হইয়াছে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। প্রথম মতে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনার একচ্ছত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সেই দিন সূর্য্যোদয় হইতে কলির প্রারম্ভ হয়। কলিতে ছয় জন নরপতি শককর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত আছেন তন্মধ্যে প্রথম যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের নাম প্রথম থাকায় এবং ছয়টি শকের মোট বৎসর কলির মান ৪৩২০০০ বৎসর হওয়ায় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হইতে কলির আরম্ভ।

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম শালিবাহনৌ
ততোনৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুন ভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

দাক্ষিণাত্যে ও মহারাষ্ট্র পঞ্জিকায় উক্তশ্লোক এবং তাহার নিম্নমত ব্যাখ্যা দেখা যায়।*

সুতরাং কলির শক বিভাগ এইরূপঃ—

১।	যুধিষ্ঠির শক	৩০৪৪ বৎসর।
২।	বিক্রমাদিত্য „	১৩৫ „
৩।	শালিবাহন „	১৮০০০ „
৪।	বিজয়াভিনন্দন „	১০০০০ „
৫।	নাগার্জ্জুন „	৪০০০০০ „
৬।	কল্কী „	৮২১ „
	মোট	৪৩২০০০ বৎসর॥

গোয়ালিয়রে অবস্থান কালে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) একখানি "লস্কর পঞ্চাঙ্গ" নামক ঐ দেশের পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহাতে উক্ত শ্লোকটি নাই বটে, কিন্তু প্রথমাংশেই এই বিবৃতি আছে। "অস্মিন্ কলৌ ষট্ শককর্ত্তারঃ নৃপাঃ। তদেন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির শকঃ ৩০৪৪। ততউজ্জয়িন্যাং বিক্রম শকঃ ১৩৫। ততঃ প্রতিষ্ঠানে শালিবাহনশকঃ ১৮০০০ তন্মধ্যে গতাব্দাঃ ১৮২৩ শেষশকাঃ ১৬১৭৭॥ ততো গৌতমীসাগরসম্ভেদে বিজয়া ভিনন্দনশকঃ ১০০০০। ততো ধারাতীর্থে নাগার্জ্জুনশকঃ ৪০০০০০। ততঃ সম্ভল গ্রামে কল্কী ভবিতা তচ্ছকঃ ৮২১। ততঃ কৃতযুগপ্রবৃত্তির্ভবিত্রী॥"

*"প্রথম ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরস্তস্য শকঃ ৩০৪৪॥ দ্বিতীয় উজ্জয়িন্যাং বিক্রমস্তস্য শকঃ ১৩৫॥ তৃতীয়ঃ প্রতিষ্ঠানে শালিবাহনস্তস্য শকঃ ১৮০০০॥ চতুর্থো বৈতরিণ্যাং সিন্ধুসঙ্গমে বিজয়াভিনন্দনঃ তস্য শকঃ ১০০০০॥ পঞ্চমো গৌড়দেশে ধারাতীর্থে নাগার্জ্জুনস্তস্য শকঃ ৪০০০০০॥ ষষ্ঠঃ করবীরপত্তনে কর্ণাটকে কল্ক্যবতারঃ তস্য শকঃ ৮২১॥ এবং ষট্ (৬) শককর্ত্তারঃ॥"

উক্ত দুইটি পঞ্জিকার লিখন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আরম্ভ হইতেই কলির আরম্ভ। লস্কর পঞ্জিকায় কল্কীর শক ৮২১ বৎসর শেষ হইলে কলির শেষ, কারণ তাহার পর আবার সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, অধুনা প্রচলিত শকগুলির হিসাবে কলির আরম্ভ কবে? এ বিষয়ে আমি একটি মাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছি। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়সলমিরে হনুমানের একটি মন্দির আছে। তাহার গাত্রে একখণ্ড শিলায় খোদিত নিম্নলিখিত লিপি আছে।

"শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য অজাতশত্রোঃ সিংহাসনাধ্যাসনাৎ বর্ষবৃন্দ ৪৮৯৮ গতে বিক্রমার্ক রাজ্যাৎ সম্বৎ ১৮৭৪ শালিবাহন শকাংশকে ১৭১৯ উত্তরায়ণ গতে।" খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে শালিবাহন শক আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে আমাদের দিনপঞ্জিকা ও লস্কর পঞ্জিকা ও প্রমাণ। খ্রীষ্টাব্দ ১৯০১ সালে লস্কর পঞ্জিকার মতে শকাব্দা (গত শকাঃ) ১৮২৩, সুতরাং শকাব্দা (১৯০১—১৮২৩) ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। এ বৎসর (১৯১১ খ্রীঃ) শকাব্দা ২৮৩৩ সুতরাং মন্দিরস্থ লিপির মতে ১৭১৯ শকাব্দায় খ্রীষ্টীয় ১৭৯৬ অব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের বর্ষবৃন্দ ৪৮৯৮ গত হইলে, যুধিষ্ঠিরের শকারম্ভ (অর্থাৎ রাজ্যারম্ভ এবং কলির ও আরম্ভ) ৪৮৯৮—১৬৯৬=৩১০২ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব (B. C.) অব্দে হইয়াছিল। অতএব এই মতে আমরা পাই যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০২ অব্দে কলি আরম্ভ হয় (B. C. 3102)।

অপর একটি প্রমাণ আছে! যুধিষ্ঠিরের শক ৩০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর বিক্রম শক ১৩৫ বৎসর ছিল এবং এ পর্য্যন্ত শালিবাহনের ১৮৩৩ অতীত হইয়াছে সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত

যুধিষ্ঠিরের— ৩০৪৪ বৎসর
বিক্রমের— ১৩৫ "
(১৯১১) শকাব্দার— ১৮৩৩ "

মোট ৫০১২ বৎসর গত হইয়াছে। অতএব কলির আরম্ভ হইতে ৫০১২ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহা আমাদের গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি পঞ্জিকাতেও পাওয়া যায়। এ বৎসরের গুপ্তপ্রেসের ৪র্থ পৃষ্ঠায় আছে "কলের্গতাব্দাঃ ৫০১২ কলেঃ স্থিতাব্দাঃ ৪২৬৯৮৮"। অতএব আমরা কলির ৫০১১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৫০১২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। এখনও কলির (৪৩২০০০—৫০১২=৪২৬৯৮৮ বৎসর বাকি রহিয়াছে। বঙ্গীয় ও অন্যান্য পঞ্জিকায় মাঘী পূর্ণিমা শুক্রবারে কলির আরম্ভ। ইংরাজী মতে হিসাব করিলে ঐ দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী ছিল।

কলির ৮২১ বৎসর থাকিতে কল্কীর রাজ্যারম্ভ হইবে। তাহা হইলে এখন হইতে ৪২৬১৬৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪২৮০৭৭ খৃষ্টাব্দে কল্কী অবতার হইবে। এবং ৮২১ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া যুগান্তর আনয়ন করিবে। সে পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় অব্দ থাকিতে পারে, কারণ কল্কী "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে" তাঁহার প্রবর্ত্তিত শক ব্যয়িত করিবেন। কিন্তু তত দিন (শালিবাহন শক) শকাব্দা প্রচলিত থাকিবে না। এই শকের পরমায়ু ১৮০০০ বৎসর, তাহার মধ্যে ১৮৩৩ বৎসর অতীত হইয়াছে, বাকি

৬১৬৭ বৎসর আছে; তাহার পর বিক্রমাদিত্য-নন্দন, নাগার্জ্জুন ও কল্কীর শক যথাক্রমে প্রবর্ত্তিত হইবে। তিনটি শককারক যুধিষ্ঠির বিক্রমার্ক, ও শালিবাহন হইয়াছেন। শেষটি চলিতেছে। অবশিষ্ট তিনটি এখনও ভবিষ্যং-গর্ভে। অথচ আমরা তাহাদের নাম, ধাম ও পরমায়ু সমস্ত জানি! ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণ অনন্ত কালের আদি অন্ত বোধ হয় নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন। নচেৎ ভবিষ্যৎ কল্পের নাম এবং ব্রহ্মদেবেরও পরমায়ু কিরূপ স্থিরীকৃত হইল!

কলির আরম্ভ লইয়া আরও দুইটি মত আছে। যে মতটি আমরা উপরে ব্যাখ্যা করিলাম উহাই বহুসম্মত এবং প্রথম। দ্বিতীয় মতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হইতে কলির আরম্ভ ধরা হয়। বায়ু পুরাণে আছে

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদা দিনে
প্রতিপন্নঃ কলিযুগস্তস্য সংখ্যাং নিবোধত।"
৯৯ অধ্যায় ৪২৮ শ্লোক।

অপিচ বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে কলিবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ॥ ৩৫॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাং।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥ ৩৬॥
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে॥ ৪০॥

"যখনই বসুদেবকুলোদ্ভূত ভগবান বিষ্ণুর অংশ স্বর্গে গমন করিলেন তখনই কলি আসিল। ৩৫। যতক্ষণ তিনি (কৃষ্ণ) পাদপদ্ম দ্বারা বসুন্ধরাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন ততক্ষণ কলি পৃথিবী অধিকার (পৃথ্বী আলিঙ্গন) করিতে সমর্থ হয় নাই। ৩৬।" শেষের শ্লোকটি পূর্ব্বোক্ত বায়ুপুরাণের শ্লোকের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলে।

অধিক প্রমাণ প্রয়োগ বাহুল্য। এই দ্বিতীয় মতে কলির আরম্ভ, প্রথম মত হইতে প্রায় ২০।২১ বৎসর পরে—প্রায় ৩০৮১ অব্দে। তাহা যথা সময়ে দেখান যাইতেছে।

তৃতীয় মতে, যে দিন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব ভার্য্যাসহ মহাপ্রস্থান করিলেন সেই দিবস হইতে কলির আরম্ভ। বিখ্যাত রবিকীর্ত্তি এবং আর্য্যভট এই মত অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন 'ভারত মহাযুদ্ধের অবসান" হইলে কলির প্রারম্ভ হয়। মহাভারতেরও স্থানে স্থানে ভারত যুদ্ধের "শেষ অঙ্ক," "কাল দ্বাপরয়োঃসন্ধৌ", কলি ও দ্বাপরের সন্ধিস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহাযুদ্ধের অবসান বা শেষ অঙ্ক তখনই ধরা যায় যখন সমস্ত গোল-যোগ মিটিয়া গিয়া বিজয়ীপক্ষ রাজ্যে দৃঢ় অধি-ষ্ঠিত হইলেন। সেই হিসাবে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান এবং পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকই ভারতযুদ্ধের শেষ কাহিনী; আর্য্যভটীয় দশগীতিকসূত্রের তৃতীয় শ্লোকে "ভারতগুরুদিবস" অর্থে যে দিবস তাঁহার (আর্য্যভটের) চতুর্থ যুগপদ (লৌকিক কলিযুগ) আরম্ভ হয় তাহার পূর্ব্ব দিবস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বাপরের শেষ দিনকে তিনি "ভারত গুরুদিবস" বলিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার পরমাদীশ্বর ঐ শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন, "ভারতাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ। তৈরুপলক্ষিতো গুরুদিবসো "ভারত গুরুদিবসঃ। রাজ্যং চরতাং যুধি-ষ্ঠিরাদীনাং অন্ত্যো গুরুদিবসো দ্বাপরাবসান গত ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ দিনে যুধিষ্ঠিরাদয়ো রাজ্য-

মুৎসৃজ্য মহাপ্রস্থানং গতা ইতি প্রসিদ্ধিঃ॥" ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে দিবস যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভোগের শেষ দিন, সেই বৃহস্পতিবারই "ভারত গুরুদিবস" এবং সেই দিনই দ্বাপরেরও শেষ দিন। তাহার পর দিন, শুক্রবারে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদী ও সারমেয় একত্র মহাপ্রস্থানের পথে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন—সেই শুক্রবারই কলির প্রথম দিন॥

উপরি উক্ত তিনটি বিভিন্ন মত যে এক সময়ে কলির আরম্ভ নির্দ্দেশ করে না, তাহা বেশ বুঝা যায়। যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় রাজ্যাভিষেক (প্রথম), কৃষ্ণের তিরোধান (দ্বিতীয়) এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান (তৃতীয়) এই তিনটি ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু কাল ব্যবধান ছিল।

প্রথমে খাণ্ডবপ্রস্থ লাভ ও ইন্দ্রপ্রস্থ (আধুনিক দিল্লি) নির্ম্মাণ ও তথায় যুধিষ্ঠিরের প্রথম রাজ্যাভিষেক। তাহার পর রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি এবং যুদ্ধ ইত্যাদিতে ১২ বৎসর গত হইলে যখন যুদ্ধের অবসান হইল তখন দেখা গেল যে পাণ্ডব পক্ষে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা সাত্যকি ও কৃষ্ণ ও এবং কুরুপক্ষে ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা এবং শরশয্যাশায়ী মুমূর্ষু ভীষ্মদেব এই কয়জন মাত্র যোদ্ধা জীবিত আছেন। তখন উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপন হইল এবং যুধিষ্ঠির হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ উভয়ের একছত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইহা যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেক। প্রথম মতে এই দিন হইতে কলির আরম্ভ।

তাহার পর ৫৮ রাত্রি শরশয্যায় থাকিয়া ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করেন। পরে অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিতের জন্ম হয়। তাহার পর এক বৎসর ব্যাপী অশ্বমেধযজ্ঞ; এইরূপে যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকের ১৫ বৎসর পরে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এক বৎসর পরে পাণ্ডবেরা তাঁহার পাদবন্দনার্থ বনে যান। তিন বৎসর বনবাসের পর দাবানলে ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু হয় (মহাভারত-আশ্রমবাঃ ৩৯)। মৌষল পর্ব্বে লিখিত আছে যে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের প্রথম রাজ্যাভিষেকের পর ৩৬ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠির দুর্লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়েই কৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধের বাণে নিহত হন। বিষ্ণুপুরাণেও ও আমরা দেখি যে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেই যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

কিন্তু আমার বোধ হয় কৃষ্ণের মৃত্যু সম্বাদ হস্তিনায় পৌঁছিতে দুই তিন বৎসর লাগিয়াছিল। কারণ সেই সংবাদবাহক অর্জ্জুন প্রথমে দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া, পথে ব্যাসদেবের সহিত দেখা করিয়া তবে হস্তিনায় গমন করেন। যখন যুধিষ্ঠির শুনিলেন যে তাঁহার সখা কৃষ্ণ আর নাই, তখনই রাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রথম রাজ্যাভিষেক হইতে ৩৬ বৎসর পরে কৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, এবং প্রথম রাজ্যাভিষেক হইতে ১৫ বৎসর পরে দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেক হইলে, কৃষ্ণের মৃত্যু যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকের ২১ বৎসর পরে হইয়াছিল ইহাই সাব্যস্ত হয়। সুতরাং দ্বিতীয় মতে কলির আরম্ভ ৩১০২—২১= ৩০৮১ খৃষ্ট পূর্ব্ব অব্দে (B. C.)। তৃতীয় ও

দ্বিতীয় মতে মাত্র ২।৩ বৎসরের ব্যবধান থাকিতে পারে।

উপসংহারে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদের সৃষ্টির কাল নির্ণয় এইরূপ হইবে। ব্রহ্মদেবের ৫১ বৎসরের প্রথম কল্পের ৭ম মন্বন্তরের ৭ম যুগের সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর সম্পূর্ণ এবং কলির ৫০১২ বৎসর গত হইয়াছে। ব্রহ্মের বয়স ৫০×৩৬০=১৮০০০ কল্প, ৬ মন্বন্তর ৬দৈবযুগ এবং ৩৮৯৩১২ বৎসর (শেষ সংখ্যা সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরের সম্পূর্ণ এবং কলির ৫০১২ বৎসর)।

উক্ত গণনা আমাদের জ্যোতিষ ও গণিতে কাল নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক; কোন ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক প্রথার আনুকূল্যে না ধরিলেও প্রাচীন গণিত ও জ্যোতিষ বুঝিতে হইলে এইরূপ কাল বিভাগ অপরিহার্য্য। এইরূপ বিরাট প্রথা কোন দেশে কোন শাস্ত্রে কল্পিত হয় নাই। উহা ভারতবর্ষের প্রখর মস্তিষ্কের পরিচায়ক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সৌভাগ্য।

যেদিন কবিতা দেবী কৃপাপরবশ
পরাণে সিঞ্চিয়া দেন তাঁর সুধারস
অকস্মাৎ সর্ব্ব ঋতু আসে যেন ছুটে
একসাথে বরষের সব ফুল ফুটে!
চাতক ময়ূর পিক কলহংস গায়
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ু বহে যায়,
বর্ণগন্ধ গীতছন্দে আকুল পরাণ
কি রাখিবে কিবা ছেড়ে করিবে প্রয়াণ
পারেনা বুঝিতে, যদি এতটুকু পায়
পিছনে অনেক তবু পড়ে থাকে হায়!
ক্ষুদ্র এই সীমা বদ্ধ মানুষের মন
সে কেমনে অসীমতা করিবে ধারণ?
অনন্ত আকাশ আর বিশাল ধরায়
ঋতুগুলি একে একে দেখা দিয়ে যায়!

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

সতীর প্রতি।

দৃষ্টি তোমার স্নিগ্ধ-মধুর দুগ্ধধারার সম,
পরশ তোমার হরি-চন্দন, উশীর সরসতম।
আনন তোমার ফুলভরা সাজি শোভায় হৃদয় হরে,
কাননসরসী কাঙাল করিয়া কে যেন এনেছে ভবে'।
তব নিশ্বাস-মন্দপবনে অগুরু গন্ধ সার,
চামরের মত চল চিক্কণ চারু চিকুরের ভার।
অঙ্গ তোমার হেমভৃঙ্গার গঙ্গার বারিভরা
অঙ্গুলি তব চম্পক ফুল অঞ্জলি পুটে ধরা।
বচন তোমার, পূজার মন্ত্র তন্ত্রীর মূর্চ্ছনা,
কণ্ঠের হার লুণ্ঠিত বুকে—মঙ্গল আলিপনা!
মণ্ডন তব গন্ধের ডালা মন্দার মধু-খনি,
কঙ্কণ কণ-ঝঙ্কারে উঠে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
হাস্য তোমার নবনী-শুভ্র, নৈবেদ্যের থালা,
দন্তের পাঁতি ইন্দুকান্তি কুন্দকুসুম মালা
শোভে সীমন্তে সিঁদূরবিন্দু উজ্জ্বল হোমানল,
অম্লান চির আরতি আলোক আঁখি দুটী জ্বল জ্বল।
নহ গো ভোগ্য, তুমি যে অর্ঘ্য—স্বর্গীয় নিবেদন,
দেবতার পায় নিত্য পূজায়, মানবের আয়োজন।

শ্রীকালিদাস রায়।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ-মন্দির।

ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজধানী রেঙ্গুন নগরে পদার্পণ করিলে প্রথমেই দুইটি সুবৃহৎ ও সুদর্শন বৌদ্ধমন্দির আমাদের নয়ন মুগ্ধ করে। ইহাদের একটির নাম সুলে মন্দির,

সুলে মন্দির

এবং অন্যটির নাম সোয়েডেগুন মন্দির। নিকট এবং সোয়েডেগুন মন্দির নগরের স্থলে মন্দির নগরের মধ্যস্থিত চিফ্‌কোর্টের প্রান্তস্থিত ক্যান্টন্‌মেণ্টের নিকট অবস্থিত।
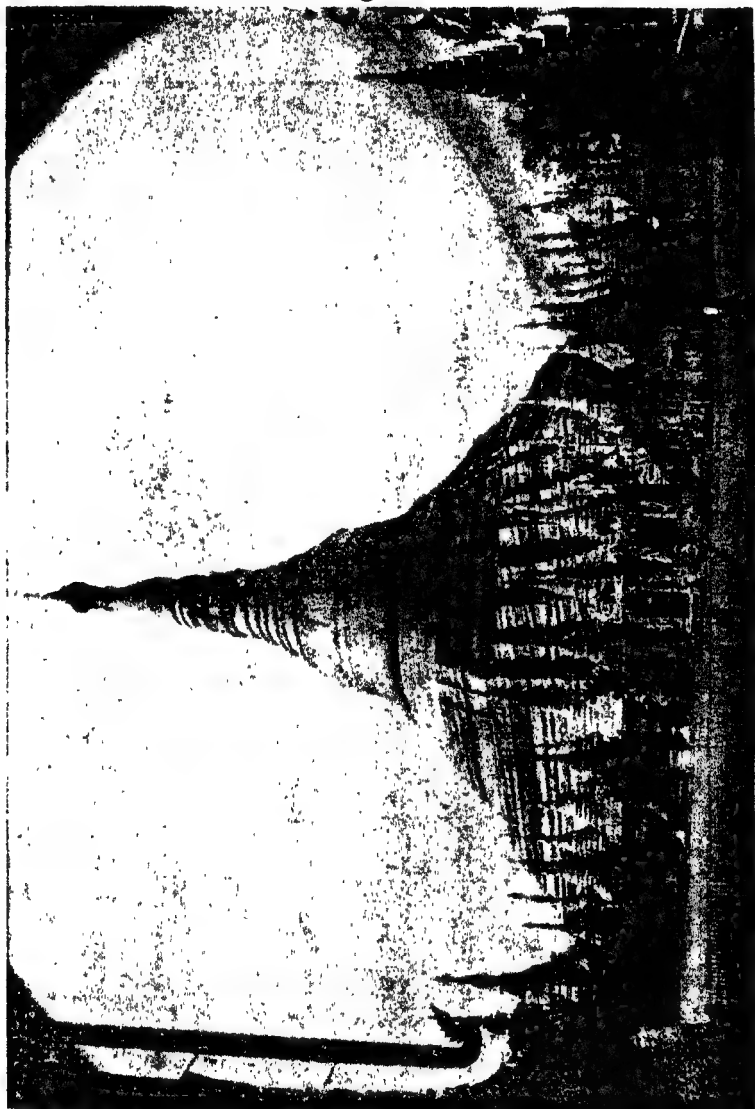
সোয়েডেগুন মন্দির।

ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় সোয়েডেগুন শব্দের অর্থ স্বর্ণ-চূড়। শুনা যায়, রাজা সিন-পিউ-ইন মণিপুর ও কাছাড়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সেই উল্লাসের স্মৃতি রক্ষার্থে সোয়েডেগুন মন্দিরের চূড়া সুবর্ণ-মণ্ডিত করাইয়া দিয়াছিলেন। সোয়েডেগুন মন্দিরের গগনভেদী অত্যুচ্চ

মরকত-মণ্ডিত চূড়া বহুদুর হইতে দর্শকদিগের নয়নমন আকর্ষণ করে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এই মন্দির দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

এই স্বর্ণ-চূড় প্রধান মন্দিরটির চারিধারে আরও বহু ক্ষুদ্রবৃহৎ মন্দির আছে। এই সমুদয় মন্দিরই একটি বিস্তৃত স্থানের মধ্যে পরিবেষ্টিত। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য

সোয়েডেগুন মন্দিরের বহির্দৃশ্য।

একটি বিরাট তোরণ আছে। এই তোরণ রাজপথ হইতে অনেক উচ্চ। অনেকগুলি সোপান উত্তীর্ণ হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। সোপানশ্রেণীর দুইধারে স্থানীয় রমণীগণ পূজার উপকরণ ফুল ফল বাতি ও পাখা প্রভৃতি লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বুদ্ধদেবের মস্তকের কেশগুচ্ছ এই মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ যাত্রী রেঙ্গুনের সোয়েডেগুন

রেঙ্গুনের বুদ্ধমূর্ত্তি।

মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। তীর্থ-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় অনেক স্থলেই আছে। এখানেও দেখা যায়, কাশীর পাণ্ডাদের ন্যায়, কতকগুলি বৌদ্ধ-পুরোহিত যাত্রীদিগের

নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য নানারূপ বাক্‌চাতুরী প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

এই সুবৃহৎ মন্দিরটির চারিধারে যে সকল ছোটবড় মন্দির রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। সকল মূর্ত্তিগুলি একভাবের নয়, কোনটি শায়িত কোনটি বা দণ্ডায়মান; কিন্তু অধিকাংশ মূর্ত্তিই মুদ্রিতলোচন—ধ্যাননিরত-ভাবে উপবিষ্ট। বৌদ্ধযাত্রিগণ ঐকান্তিক ভক্তিভরে এই সকল মূর্ত্তির পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকেন এবং নানাবিধ উপকরণ সামগ্রী তৎসমীপে উপহার দিয়া থাকেন। এই মন্দির দর্শন করিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মবাসীরা বুদ্ধদেবকে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বুদ্ধের নামে, বুদ্ধের উদ্দেশে, বুদ্ধের পূজায়, বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় ইঁহারা অকাতরে কত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিতে
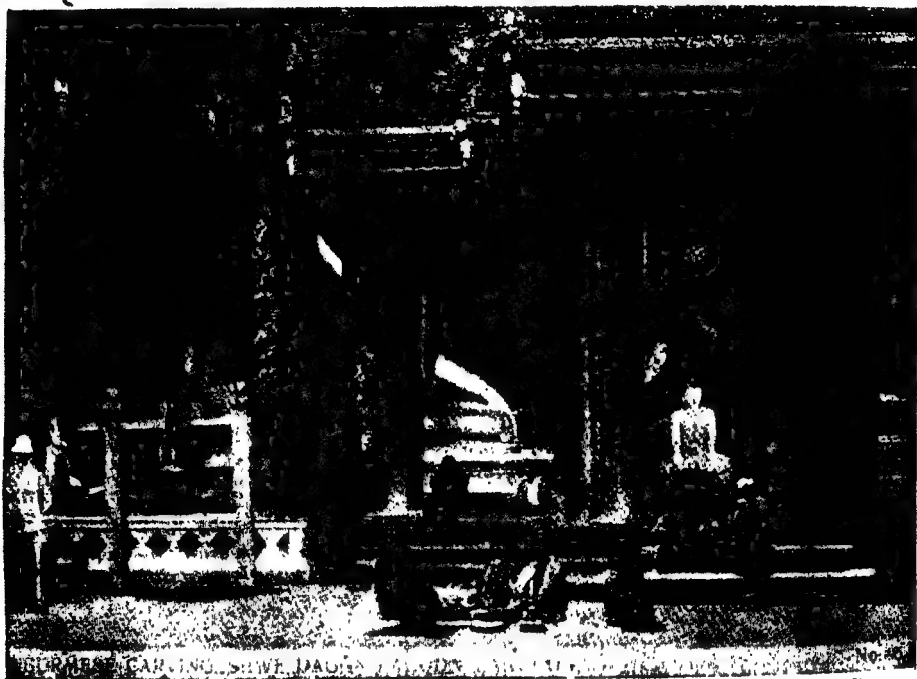
সোয়েডেগুন মন্দিরের কারুকার্য্য।

ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ একেবারে মুক্তহস্ত বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। ইঁহারা কল্যকার জন্য চিন্তা না করিয়া, পূজা-পার্ব্বণে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

দৈনিক আহারব্যবহারেই ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া আমোদআহ্লাদ করিয়া থাকেন। ইহার উপর যদি পূজা-পার্ব্বণের দিন উপস্থিত হয় তবে কি আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে? মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া এবং

বহুবিধ আহারসামগ্রী সঙ্গে লইয়া পর্ব্বোপলক্ষে ইঁহারা সপরিবারে "ফয়া" দর্শনে গমন করেন। যে সকল মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহাকে ব্রহ্মবাসীরা 'ফয়া' বলেন। 'ফয়া' বলিতে যেন পীঠস্থান বুঝায়। প্রত্যেক পীঠস্থানেই বহু বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এই সকল মন্দির ও মূর্ত্তি গৃহস্থ ব্যক্তিরা নিজব্যয়ে কিংবা সাধারণের প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মাণ করাইয়া

উৎসব

প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হয়, ব্রহ্মবাসীদেরও এরূপ বিশ্বাস আছে। এজন্য ব্রহ্মদেশের পথে ঘাটে হাটে মাঠে অসংখ্য 'ফয়া' প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল।

স্বরলিপি।

মিশ্র মল্লার—রূপকড়া

উতল ধারায় বাদল ঝরে
বেলা যে যায় একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে
তমাল বনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।

আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেবো প্রেমের বাতি
পরাণ খানি দিব পাতি,
চরণ রেখো তাহার পরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা রা -মা । মা -া । মা -া -গা I রা রা -পা । পাঃ মঃ । পা -া -রা I
উ ত ল্ ধা ০ রা ০ য়্ বা দ ল্ ঝ ০ রে ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা রা -মা । পা ধা । র্সণাঃ -া -ধ I পধা পা -ধ পাঃ । মা -গা । রা -াঃ গসা I
বে লা ০ যে ০ যা ০ য়্ এ কা ০ ০ ঘ ০ রে ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { না না -া । না -া । না -া -পা I পা না -া । র্সা -না । র্রর্সা -া ণা I
স জ ল্ হা ০ ওয়া ০ ০ ব হে ০ বে ০ গে ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধা ধা -ণা । ণা -ধা । পধা -া -া I ধাঃ ধণা-র্সা । ণা -ধা । পা -া -া } I
পা গ ল্ ন ০ দী ০ ০ উ ঠে ০ ০ জে ০ গে ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মামা-ণাঃ । ণা -া । ধা -া -া I ধা ধণা -র্সা । ণর্সণা -ঃ -ধঃ । পা -া -া I
আকাশ্ ঘে ০ রে ০ ০ কাজ ০ ল্ মে০ ০ ঘে ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পর্সা ণর্সা -া । ণা -ধা । পা -া -রা I সা রা -া । রা -া । রা -া গসা II
ত মা ল্ ব ০ নে ০ ০ আঁ ধা র্ ক ০ রে ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { সা রাঃ -া । রা -া । রা -া -গা I রা রা -পা । মা -গা । রা -াঃ -সা I
ওগো ০ বঁ ০ ধু ০ ০ দি নে র্ শে ০ ষে ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা রা -মা। পা -ধা। ণা -া -ধা I পধা পা -ধপা। মা -গা। রা -া -া I
এ লে ০ তু ০ মি ০০ কে ম ০ ন্‌ বে ০ শে ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
I মামা -পা। পা -া। পা া -ধা I মা পা -না। না -া। সা -া -া I র্সা র্সর্সা -র্রা।
আঁচ ল্‌ দি ০ য়ে ০ ০ ঙ কা ০ ব ০ জ ০ ল্‌ মু ছা ০ ০

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
I র্সণাঃ -ধঃ। পধপা -া -রা I রপা পা -া। মা -গা। রা -া -া } I { না না -া।
ব ০ পা ০ ০ ০ আ কু ল্‌ কে ০ শে ০ ০ নি বি ড়্‌

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। না -া। না -া -পা I পা না -া। র্সা -না। র্রর্সা -া ণা I ধা ধা -ণা। ণা -ধা।
চ ০ বে ০ ০ তি মি র্‌ রা ০ তি ০ ০ জ্বেলে ০ দে ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
। পধা -া -া I ধা ধণা -র্সা। ণা -ধা। পা -া -া } I মামা -ণা। ণা -া। ধা -া -া I
বো ০ ০ প্রেমে ০ র্‌ বা ০ তি ০ ০ পরা ণ্‌ খা ০ নি ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধা ধণা -র্সা। পর্সণা -ঃ -ধঃ। পা -া -া I পর্সা নর্সা -া। ণা -ধা। পা -া -রা I
দি ব ০ ০ পা ০ ০ তি ০ ০ চ র ণ্‌ রে ০ পো ০ ০

১´ ২ ৩
I সা রা -া। রা -া। রা -া -গ সা IIII
তা হা র্‌ প ০ রে ০ ০ ০।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজকন্যা

দশম দৃশ্য।

(নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল,—নাগাড়া শব্দ, অস্ত্রধ্বনি, চীৎকার আস্ফালন ইত্যাদি। স্থান—পথসন্নিহিত উদ্যান-ভূমি। উৎকণ্ঠিত ভাবে রাজকন্যার প্রবেশ।)

রাজ। (আকাশের দিকে চাহিয়া) উঃ আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন! দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যা ভ্রম হচ্ছে। রাত থেকে যুদ্ধ চলেছে এখনো ত কোলাহলের নিবৃত্তি নেই—ক্রমশঃই যেন বাড়ছে! কোন্‌ পক্ষের জয় হোল কিছুই ত বুঝতে পারছিনে। যাকেই সংবাদ আনতে

পাঠাচ্ছি সেই অদৃশ্য হয়ে পড়ছে! (করযোড়ে) হরি, বিপদের কাণ্ডারি, দয়াময় রক্ষা কর প্রভু!

(হাসির উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ।)

রাজ। বল বল কি সংবাদ হাসি!

হাসি। রাজকন্যে, উঃ কি দৃশ্য সে কি দৃশ্য!

রাজ। মহারাজ অক্ষত ত?

হাসি। কি বলব রাজকন্যে কিছুই জানি নে। শুধু কানে বাজছে সেই গগনভেদী চীৎকারহুঙ্কার, আর চোখের উপর নৃত্য করছে সেই সহস্র হস্তের অসির ফলক, রক্তের ঝলক, কাটামুণ্ড আর কাটা দেহ!

রাজ। (স্বগতঃ) বল দাও প্রভু, বল দাও!

হাসি। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাজকন্যে—! তবু দূর থেকে দেখেছি; তোমাকে যে একা ফেলে গেছি—নইলে—

রাজ। ধ্রুবকুমার—হাসি?

হাসি। জানি নে রাজকন্যে, কি করে জানব কে ধ্রুবকুমার?

রাজ। (স্বগত) হৃদয় যে অবসন্ন হয়ে আসছে।

হাসি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সেই চঞ্চল মানুষের দল, মারছে কাটছে চীৎকার করছে—আর—

রাজ। (স্বগত) একি আশঙ্কা—এ যে তাঁর মঙ্গল শক্তির প্রতি অবিশ্বাস!

হাসি।—আর আহত হয়ে মাটিতে পড়ছে। তার মধ্যে কে শত্রু কে মিত্র, কে আত্মীয় কে পর কি করে জানব—কি ক'রে চিনব রাজকন্যে!

রাজ। (স্বগত) তবু ভক্তি অটল রাখ দেব;—বিশ্বাস অবিচলিত হোক।

হাসি। হায় হায়! কত আত্মীয় স্বজনকে না জানি হারালেম—!

রাজ। তাই হয় হোক, অন্ধকার প্রভাতের আগমনই ঘোষণা করে,—ঝটিকা শান্তিরই পূর্ব্ব সূচনা, সেই শোণিত পাতেই—যদি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাই হোক্! বল দাও প্রভু বল দাও।

(নেপথ্যে দ্বিগুণতর কোলাহলহুঙ্কার, মার মার কাট কাট ধ্বনি, উভয়ের ব্যাকুল ভাবে পথের দিকে নিরীক্ষণ)

হাসি। (ভীত চকিতভাবে) রাজকন্যে বিদ্রোহীরা এই দিকেই আসছে, কি জানি তাদের মনে কি আছে, মন্দিরে চলুন, মন্দিরে চলুন—

(মন্দিরাভিমুখে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় রাজকন্যার হস্ত ধারণ)

রাজ। শান্ত হও হাসি, নির্ভয়ে থাক। আমাদের প্রতি এরা কখনই কোন অত্যাচার করবে না—একি—একি—

হাসি। (রাজকন্যার হস্ত ত্যাগ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) দেখুন দেখুন—সত্যই তারা এই দিকেই আসছে—এইখানেই—

রা। এ যে ধ্রুবকুমার! অভিমন্যুর মত চারদিক থেকে তাকে সকলে আক্রমণ করছে। ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ—থাম থাম—

(নেপথ্যে)

এ যে আমাদের রাজকন্যা,—তিনি কি আদেশ করছেন শোন—

রাজ। তোমরা আমার ভাই, আমার

সন্তান—অসহায় আহতজনকে আঘাত করো না তোমরা।

(নেপথ্যে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে)

ছেড়ে দাও তবে ছেড়ে দাও –,

যাঃ তবে। বড় ভাগ্যের জোর বেটার, বেঁচে গেল!

বেশ বাগিয়ে জালে ফেলা গিয়েছিল মস্ত মাছটা ফস্কে গেলরে—!

রাজ। ইনি আমাদের শত্রু নন, মিত্র সহায় বন্ধু—

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে)—এ বেটারা কে শত্রু কে মিত্র তাত বোঝার যো নেই—সবাইকেই এক কোপে নিকাশ করতে পারলেই মঙ্গল!

কিন্তু রাজকন্যা আদেশ করেছেন তার উপর ত কথা নেই। যাঃ বেটা যা তোর অনেক পরমায়ু—!

সকলে। প্রণাম হই রাজকন্যে, জয় আমাদের রাজকন্যার জয় জয়—জয়।

(জয়ধ্বনি করিতে করিতে নেপথ্য হইতে সকলের প্রস্থান—রক্তাক্তদেহে ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রু। দেবি, ভগিনি, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে, মহারাজ অক্ষত, বিদ্রোহ নিবারিত হয়েছে।

(বলিতে বলিতে পদতলে ভূমিতে পতন)

রা। জল হাসি জল—শীঘ্র ঐ পুকুর থেকে জল আন! (পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হায়! কিন্তু তুমি যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এসেছ ভ্রাতঃ!

(হাসির প্রস্থান। রাজকন্যা ধ্রুবকুমারের অঙ্গবস্ত্র উন্মোচনে নিরত)

রা। (রক্তাক্ত অঙ্গরক্ষা খুলিতে খুলিতে) ভ্রাতঃ তুমিই ধন্য! তোমার জীবন মৃত্যু সবই ধন্য! সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য এ জীবন তুমি তুচ্ছ করেছ! হায়! তবু কেন চোখের জল মানছে না! উঃ একখানা ভাঙ্গা বর্ষাফলক এখনো বুকে বিঁধে রয়েছে—রক্তে যে স্থান ভেসে গেল!

(বর্ষাফলক তুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ ও অঞ্চল বস্ত্রে রক্ত মার্জ্জন)

(ধ্রুবকুমার মুদ্রিত নেত্রে হস্ত আস্ফালন করিয়া) দুর্বৃত্ত—কৃতঘ্ন!

রা। শান্ত হও, শান্ত হও বৎস,—তুমি জয়ী হয়ে এসেছ।

ধ্রু। (চক্ষু খুলিয়া) ভগিনি, দেবি, এ তুমি! কি শান্তি! কি আনন্দ! মহারাজ অক্ষত—সেনাপতি ব্যর্থ—আঃ—

(পুনরায় মূর্চ্ছিতভাবে অবস্থান। উদ্যান ভূমিতে পতিত একটা জীর্ণ ঝারিতে করিয়া হাসির জল লইয়া আগমন।)

রাজ। (ধ্রুবকুমারের ক্ষতস্থানে জল দিতে দিতে) যাও হাসি তুমি আবার যাও, ছুটে প্রলেপাদি নিয়ে এস—আর পথে যাকে পাও শিবিকা আনতে বলো।

হা। আর তুমি একলা—

রা। যাও হাসি দেরি করো না। আমি একলাই সেবা করছি যাও—

(হাসির প্রস্থান)

(রাজকন্যা ধ্রুবকুমারের ক্ষতস্থান ধৌত করিতে করিতে)—হায়! এ শোণিতে কি মহারাজের জাগরণ হবে না—হবে না! ধর্ম্মের আলোকে সত্যের আলোকে তাঁর অন্ধ নয়ন খুলে যাবে না?—অসত্যের জয়—অল্পদিন সত্যের জয় চিরন্তন—

ধ্রু। (মুদ্রিত নেত্রে) কোথায় গেল কোথায় গেল, তাকে যে ধরতে পাচ্ছিনে—

রা। শান্ত হও ভ্রাতঃ। হায়! এখনো যুদ্ধের মধ্যেই বিরাজ করছেন! একি এঁর বক্ষ থেকে একি রত্ন হাতে খুলে এল, জলে ধুয়ে যেন তারার মত জলছে—একি একি! এ যে আমারই ভ্রাতার কবচ! ভ্রাতঃ, বৎস, বীর, এতদিন যে আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলেম! প্রিয়তম, প্রাণাধিক আজ কি মৃত্যুতে তোমাকে পেলেম!

(নত হইয়া ধ্রুবকুমারকে বক্ষে ধারণ।
রাজার প্রবেশ ও স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

রাজা। সত্য তবে—সব সত্য! আমার অন্তরের ভিতর থেকে এ কথায় যে প্রত্যয় জন্মায় নি। তবু সত্য, তবু সত্য! দুশ্চারিণি—

রাজ। (সচকিতে ও সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পিতা—মহারাজ—তোমারই সন্তান,—এ তোমারি—

মহা। (অসিতে হাত দিয়া) চুপ্ নির্লজ্জা, চুপ্ পাপীয়সি—বিধাতাপুরুষকে শত ধিক্কার যে তুই আমার সন্তান। এই অস্ত্রে আজ—না এ হস্ত তোর পাপরক্তে কলঙ্কিত করব না—।

(দ্রুতবেগে নিষ্ক্রমণ, দ্বারদেশে সেনাপতিকে দেখিয়া নেপথ্য হইতে)

সেনাপতি চামুণ্ডা মন্দিরে এখনি বলিদানের আয়োজন করতে বল—আর ঐ সৈনিকের মৃতদেহ চণ্ডালহস্তে সমর্পণ কর।

সেনা। (নেপথ্য হইতে) যথাদেশ—।

উভয়ের প্রস্থান।

রাজ। তবু ধৈর্য্য ধরতে হবে—উঃ কি করব—কি উপায়! কি করে বাঁচাব! (একটি বৃক্ষপত্র কুড়াইয়া) এই পাতায় এই রক্ত দিয়েই পত্র লিখি—সময় নেই সময় নেই! অবসাদ ক্ষণকাল দূরে থাক;—মৃত্যু মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর—ভগবান বল দাও—বল দাও—।

(বর্ষাফলকখণ্ডে ভূমির রক্ত লইয়া গাছের পাতায় পত্র লিখিয়া)

কাকে দেব—কে নিয়ে যাবে?—বুঝি সব বৃথা হোল,—এখনি এসে পড়বে, ঐ বুঝি এলো—

বিদূষকের প্রবেশ।

উঃ ভগবান রক্ষা করলেন! ধন্য তাঁর দয়া!

বিদূ। হাসির সঙ্গে পথে দেখা—সে আমাকে এই সব ওষুধ বিষুধ দিয়ে এখানে পাঠালে—আর নিজে শিবিকার চেষ্টায় গেল। —উঠুন—আপনি উঠুন আমি সেবা করছি। বেদবেদান্ত কিছু শিখি না শিখি বৈদ্যশাস্ত্রটা একরকম দখল করেছি—বিশ্বাস করবেন।

রাজ। (উঠিয়া) বিদূষক, দাও ওষুধ আমাকে দাও—আর তুমি শীঘ্র যাও,—এই পত্র নিয়ে এখনি ছুটে যাও।

বিদূ। আবার ছুটতে হবে! (বক্ষে হাত দিয়া) উঃ এখনো যে নিশ্বাস পড়ছেনা! এ কি এ যে রক্তে লেখা! কোথায় যাব?

রাজ। যাও বিদূষক, শীঘ্র যাও—আর সময় নেই—এই পত্র এখনি মহারাজকে দিতে হবে—যদি পত্রখানি না দিতে পার ত মুখে বলো—এ সৈনিক তাঁরই সন্তান, আমাদের যুবরাজ—রাজপুত্র মরেন নাই।

বিদূ। ধ্রুবকুমার আমাদেরই রাজপুত্র!

রাজ। হ্যাঁ বিদূষক যাও, সেই কথাই মহারাজকে শীঘ্র বল; নইলে শত্রুর হাত থেকে এঁকে বাঁচাতে পারব না; শীঘ্র যাও—

আর এই কবচটি তাঁকে দিও তাহলেই তিনি সব বুঝবেন।

বিদূ। আমাদের রাজপুত্র জীবিত—কি আনন্দ কি আনন্দ! যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি! এই সুখবর আমিই তাঁকে দেব—দেখবেন একথা আর কাউকে এখন বলবেন না।

দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রাজ। (পুনরায় উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে দিতে) রক্তে যে ভেসে গেল! হাসিত এখনো শিবিকা নিয়ে এল না? আবার কার পায়ের শব্দ এ! হায়! বুঝি পারলেম না—সব নিষ্ফল—সব ব্যর্থ! ভগবান দয়াময়—

(চণ্ডাল সৈনিকগণের সহিত সেনাপতির প্রবেশ ও সকলের রাজকন্যাকে সৈনিক প্রথায় নমস্কার)

সেনা। শিবিকা প্রস্তুত আপনি উঠলেই—

রাজ। শিবিকার প্রয়োজন নেই,—মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি এখনি পদব্রজে চামুণ্ডামন্দিরে উপস্থিত হব।

সেনা। ক্ষমা করবেন,—এ জীবন থাকতে সে নিষ্ঠুর আদেশ পালিত হতে দেব না। আমি শিবিকা এনেছি আপনাকে নিরাপদ করার জন্য—বিলম্ব করবেন না।

রাজ। তোমার মঙ্গল হোক। কিন্তু আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে অপারক—কেবল একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা আমার আছে।

সেনা। বলুন—আমি আপনার দাস।

রাজ। সৈনিকেরা যেন এই দেহ স্পর্শ না করে।

সেনা। (স্বগত) কি অনুরাগ! হৃদয় জ্বলে—উঠছে—জ্বলে উঠছে! (প্রকাশ্যে) ক্ষমা করুন—আপনাকে রক্ষার জন্য রাজাদেশ লঙ্ঘন করতে পারি কিন্তু সামান্য সৈনিকের জন্য—

রাজ। সামান্য সৈনিক!—(স্বগত)—না বলা হবে না।

সেনা। সৈনিকগণ এই শব উঠিয়ে নিয়ে যাও।

(সৈনিকগণের ধ্রুবকুমারকে লইতে আগমন)

রাজ। বৎসগণ—এঁকে তোমরা স্পর্শ কোরো না, দূরে দাঁড়াও—তোমাদের রাজকন্যার আদেশ—দূরে দাঁড়াও।

(সৈনিকগণের সচকিতে দূরে দণ্ডায়মান ও সভয়ে সেনাপতিকে নিরীক্ষণ)

সেনা। আপনি কন্যা হয়ে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে এদের প্রবৃত্ত করছেন?

রাজ। না। মহারাজ শব নিয়ে যেতে বলেছেন। এ সৈনিক এখনো জীবিত।

সেনা। (স্বগতঃ) উঃ সহ্য হয় না! জীবিত! এই মুহূর্ত্তে এই অসির আঘাতে শত খণ্ড করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে! কিন্তু তাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। (প্রকাশ্যে) রাজকন্যার আদেশ—আচ্ছা সৈনিকগণ—যতক্ষণ না আমি ডাকি তোমরা অন্তরালে দাঁড়াও।

(সৈনিকগণের যবনিকার অন্তরালে গমন)

রাজকন্যা যা আদেশ করবেন—এ দাস তাই পালন করতে প্রস্তুত! আপনার জন্য এ জীবনদানও তুচ্ছকথা—কিন্তু—কিন্তু দাসও পুরস্কার প্রার্থনা করে—

রাজ। বল কি পুরস্কার চাও—

সেনা। আপনাকে—আমার—মহিষী—

রাজ। মাতঃ বসুন্ধরা বিদীর্ণ হও—বিদীর্ণ হও—

সেনা। (সক্রোধে) সামান্য সৈনিকের পদসেবা অপমানের নয়—আর আমার মহিষী—

রাজ। চুপ নরাধম চুপ—(করযোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত এবং ধ্রুবকুমার সহসা উঠিয়া—)

পাপিষ্ঠ নরাধম! এত বড় স্পর্দ্ধা! এই—এই—প্রতিশোধ,—এই প্রতিফল!

(সেনাপতির বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ এবং সেনাপতি ও ধ্রুবকুমার উভয়েরই ভূমিতে পতন—

সেনা। উঃ কি জ্বালা! সৈনিকগণ চণ্ডালগণ লও, ধর, বাঁধ—প্রতিশোধ প্রতিশোধ!

ধ্রুব। এখন মৃত্যুতেও আমার দুঃখ নাই।"

পটক্ষেপ

একাদশ দৃশ্য।

(মন্দিরে—দেবীর সম্মুখে বলির স্থান। স্তম্ভিত পুরোহিতের পার্শ্বে পূজারি এবং রাজকন্যার পার্শ্বে ক্রন্দনপরায়ণা সখীগণ দাঁড়াইয়া)

রাজ। ঠাকুর আর বিলম্ব করবেন না—রাজার আদেশ—

পু। মাতঃ! আমি রাজাদেশ পালনে অক্ষম। মাতৃরক্তে আমি মাতার পূজা করতে পারব না—পারব না—আজ হতে আমি আমার পৌরোহিত্য ত্যাগ করলেম।

রাজা। (পূজারির নিকট অগ্রসর হইয়া) পূজারি তবে তুমি এস! মন্ত্রের জন্য আর অপেক্ষা করনা,—বৃথা কেন কালক্ষেপ করছ—রাজাজ্ঞা পালন কর—

(ভূমি হইতে খড়্গ উঠাইয়া) এই লও খড়্গ,—পিতার আজ্ঞালঙ্ঘন পাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও—।

পূজারি। (নতমুখে অস্পষ্টস্বরে) পারব না—পারব না—।

(হাসির তাড়াতাড়ি রাজকন্যার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া এবং তাহা পূজারির পদমূলে রাখিয়া নতজানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক)

ঠাকুর আমার রক্ত গ্রহণ করুন—রাজকন্যার বদলে আমাকে—

রাজ। (গম্ভীর স্বরে) ওঠ হাসি—আমার আজ্ঞা—ওঠ।

লতা। আমি এসেছি দেব—আমাকে—

পাতা।—তুমি সর, আমি—আমি—

ফুল।—ওঠ তোমরা ওঠ আমাকে ঠাকুর—

রাজা। সখিগণ; তোমরা আমার ধর্ম্ম পালনে বাধা দিওনা,—আমাকে কর্ত্তব্যপালনে বল দেও—ওঠ—মিনতি করছি—আজ্ঞা করছি—ওঠ—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

(সকলের কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া করযোড়ে প্রার্থনা)

অভয়া—অভয় দান কর—অভয় দান কর—তারিণি, ত্রাণ কর—ত্রাণ কর।—

(মাতঙ্গিনীর সহিত রাণীর প্রবেশ)

রাণী। জানি আমি জানি—এ কাজে কেউ অগ্রসর হবেনা—কাপুরুষ পুরোহিত—ভক্তিহীন পূজারি! তোরা নরাধম নরাধম! মাতঙ্গিনি—চিরকালই তুমি আমার সখি—সহায়; এইবার তোমার প্রীতিভক্তির চরম পরীক্ষা! এস—এস—

(তাহার হস্তে খড়্গ প্রদান)

মা। (খড়্গ হস্তে লইয়া পুনরায় মাটীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) মহারাণি ক্ষমা করবেন—পারব না—পারব না—আর যা বলবেন তাই করব—

রাণী। এ কি মাতঙ্গিনি—এ সময় তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে? এই শেষ মুহূর্ত্তে—শেষ মুহূর্ত্তে! তুমি যে একদিন আমারি আদেশে আমারি মঙ্গলের জন্য এর ভাইকে—শিশু রাজপুত্রকে বধ করেছিলে—আর আজ—

মাত। না বধ করিনি··আমি আমি—পারিনি মহারাণি পারিনি—ধাত্রী তাকে নিয়ে গিয়েছিল।—আজও পারব না—এ কাজ পারব না—আর যা বলেন—

রাণী। কি বল্লে তুমি—ধাত্রী তাকে নিয়ে গেছে—পারনি তুমি—পারবে না? এই দেখ—(খড়্গ তুলিয়া)—মাথা নত কর্ পাপীয়সি—

রাজ। (মস্তক নত করিয়া) নমস্কার মাতা,—এ প্রাণ গ্রহণ করুন—রাজ্যের মঙ্গল হোক—

রাণী। (খড়্গ তুলিয়া) একি আমার হাত ওঠে না কেন? অঙ্গ যে অবশ হয়ে আসছে, চামুণ্ডে সদয় হও।

রাজ। হায়! এই হতভাগিনীর জন্য কত লোকের কষ্ট! মাতঃ, আর না—প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, আমাকে গ্রহণ কর—রাজ্যের অশুভ অমঙ্গল নিবারিত হোক।

(রাণীর অবসন্ন হস্ত হইতে খড়্গ স্খলিত হইয়া রাজকন্যার অঙ্গে পতন, এবং ধরাশায়ী রাজকন্যার রক্তে ভূমিতল প্লাবিত। সকলের চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান। রাজা ও বিদূষকের মন্দির সম্মুখস্থ পথে আগমন।)

রাজা। (কবচ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) সত্য কি জীবিত! বল বিদূষক! ধ্রুবকুমার আমারি পুত্র! সত্য কথা—না মিথ্যা প্রতারণা!

বি। মিথ্যা নয়,—সত্যই রাজপুত্র জীবিত। রাজকন্যার অন্তঃপুরে তাঁর সেবা শুশ্রূষা হচ্ছে।—কিন্তু আপনি শীঘ্র চামুণ্ডার মন্দিরে আসুন—আগে রাজকন্যার বলি নিবারণ করুন—।

রাজা। কল্যাণীর বলি!

বিদূ। হ্যাঁ মহারাজ, আপনারই আদেশে তিনি বলি স্থানে গেছেন—।

মহা। কি সর্ব্বনাশ! মনে পড়েছে মনে পড়েছে—যাও বিদূষক—যাও বলি নিবারণ কর—

বিদূ। এই যে আমরা চামুণ্ডা মন্দিরের দ্বারেই এসেছি,—

(উভয়ের মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

রাজা। (উন্মত্ত ভাবে) একি! কি দৃশ্য এ! একি স্বপ্ন—!

বিদূ। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া) না মহারাজ—এ জাগরণ!

রাজা। অভাগিনি! বৎসে, সত্যই পিতা হয়ে তোমায় বলিদান দিলেম! চামুণ্ডে—রাক্ষসি,—এ কি করলি—এ কি হোল!

কন্যার পদতলে পতন।

চিত্রার্পিত দৃশ্য,—শূন্যদেশ উজ্জ্বল আলোকমালায় রঞ্জিত।

পটক্ষেপ

উপসংহার।

(রাজার সন্ন্যাসীবেশে প্রবেশ)

রাজা। উঃ কি রক্ত সে কি রক্ত! সে রক্তে জগৎ সংসার লাল হয়ে গেছে! এতদিন বিশ্ব অন্ধকার ছিল—সেই পবিত্র রক্তের স্রোতে—সে অন্ধকার কোথায় ভাসিয়া নিয়ে গেছে! যে নয়ন এতদিন অন্ধ ছিল—তার নিমীলিত নয়নের দৃষ্টি দিয়ে সেই অন্ধ নয়ন সে ফুটিয়ে তুলে গেছে—আজ পূর্ণ জাগরণ নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি। হে বিশ্বনিয়ন্তা, মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষ—তাই হোক—তাই হোক যে উদ্দেশ্যে সে প্রাণপাত করেছে সে উদ্দেশ্য সফল হোক। এ রাজ্য হতে মিথ্যা ধর্ম্ম দূর হোক, আচারের নামে বিদ্বেষ ঘৃণা, পাপাচার, দেবপূজার নামে নরবলি দূর হোক।—মঙ্গলসত্যের মহিমা-বিস্তারই মানবের ব্রত হোক—পুণ্যকল্যাণে, শান্তিসমতায় মর্ত্ত্যলোকে নবযুগ অভ্যুদিত হোক। হে শুভশক্তি দাতা জ্ঞানস্বরূপ তুমি সহায় হও, জ্ঞান দাও—বল দাও, তোমার পুণ্যশক্তিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর।

(নিশান হস্তে সন্ন্যাসিনী বেশে হাসি, লতা, পাতা, ফুল, রেণু প্রভৃতি বালিকাগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

জয় জয় সত্যের জয়—।
দুঃখে করিনা ভয়, মৃত্যু অমৃতময়
সত্য ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে
মিথ্যা হউক ক্ষয়—
পাপ হউক লয়—!
জয় জয় ধর্ম্মের জয়।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

কালো।

মা তুই আমায় বল্‌লি কেন কালো?
আমায় তবে বাসিস্ না তো ভালো—
মা তুই তবে যা!
তোর কাছে মা আস্‌বনাক আর,
খুঁজে যখন কর্‌তে যাবি বা'র—
কথাই কব না।
হেসে মাতা কহেন—পাগল ছেলে,
পারিস্ কেমন যা না দেখি ফেলে'!
আবার যদি ডাকিস্ কালো বলে'—
সত্যি কিন্তু যাব এবার চলে'
দিদির শ্বশুর বাড়ী!
দিদি গেলে' কাঁদিস্ যেমন করে',
দেখ্‌ব তেম্‌নি কাঁদিস্ কিনা পড়ে',
পাঠাস্ কিনা গাড়ী।
তুই-ও যাবি দিদির মতন হ'লে'—
কহেন মাতা অশ্রু-ভাঙা বোলে।

আচ্ছা, মাগো—বাবাও ত সে কালো,
তাঁরেও তবে বাস্‌বি নাক ভালো—
তুই মা একা তবে;
তিনটি জনে থাক্‌ব আমরা ঘরে,
দেখ্‌ব মা তুই থাকিস্ কেমন করে'—
এমনি মজা হবে!
বক্ষে টানি' চক্ষু মুদে' খানিক—
কহেন মাতা—আমার কালো মাণিক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পাড়াগেঁয়ে।

আকাশ বাতাস ও আলোর প্রভাবে রমানাথের জীবন নিতান্ত সহজভাবে প্রকৃতির কোলে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জন্মাবধি সে সহরের মুখ দেখে নাই। সহরের ইঁট-কাঠ চূণ-সুরকিনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, আলো, পাখা, কলকারখানা—এ সকলের কথা সে অনেকবার শুনিয়াছিল, কিন্তু এগুলিকে রমানাথ বাস্তবরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। শান্ত বনানীর অসংখ্য শাখাপরিবেষ্টিত, ছায়ালোক-মণ্ডিত তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর ও তাহার আশ-পাশই রমানাথের বাস্তবরাজ্যের একমাত্র পরিমাপ ছিল। ইহার বাহিরে যে আর কিছু থাকিতে পারে, রমানাথ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সে নির্জ্জনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বর মিলাইয়া শিস্ দিতে থাকিত, কোঁচড় ভরিয়া শিউলি, চাঁপা, রজনীগন্ধা ফুল তুলিয়া বেড়াইত, নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া দিন কাটাইত।

রমানাথ আশৈশব পিতৃমাতৃহীন। রমানাথের এক বৃদ্ধা মাসী তাহাকে লালন-পালন করিতেছিলেন।

রমানাথের লেখাপড়া সামান্তই হইয়াছিল। গ্রামের এক প্রাচীন দোকানদারের নিকট সে প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, শিশুবোধ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িয়া তাহার মাসীকে শুনাইত। অধিকাংশ সময়ই রমানাথ বাঁশঝাড়ের তলায় চঞ্চল রৌদ্রের খেলা দেখিত, মধ্যাহ্নে, উত্তপ্ত-বাতাসে, সুনির্ম্মল আকাশের নীচে যে দু'এক-খানা মেঘ ভাসিয়া যাইত, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটাছুটি করিত,—অনেকদূরে যে গাছটা আর সব গাছগুলার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহার উপরকার শাখাপ্রশাখা রৌদ্রে বিছাইয়া দিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার দিকে হাঁ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। সব চেয়ে রমানাথের গাছপালারই সখ্ ছিল;—ছোট ছোট গাছ পুঁতিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, জল ঢালিয়া তাহাদের বড়-করার মত এমন্ আনন্দ সে আর কিছুতেই পাইত্ না। তাহাদের ছোট্ট গ্রামখানির ভিতর এমন্ শতাধিক বৃক্ষ তাহারই যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

রমানাথ একদিন স্নান করিতে গিয়া দেখিল, তীরে একখানি নৌকা বাঁধা আছে। অনেকগুলি বালক জলে নামিয়া কোলাহল করিতেছে। কেহ জল ছুঁড়িতেছে, কেহ কাদা মাখিতেছে, কেহ বা তীরের কাছে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখিতেছে। নৌকার উপর বসিয়া একটি ভদ্রলোক তামাক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতেছিলেন।

হঠাৎ একটি বালক "গেলুম, বাবা গো গেলুম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বেশী জলে গিয়া পড়িয়াছিল, অথচ ভাল সাঁতার জানিত না। নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা "ওগো, কি হ'ল গো", বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ভদ্রলোকটি "ধর, ধর", বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রমানাথ

মুহূর্ত্তের মধ্যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালকটির কাছে গিয়া, তাহাকে টানিয়া তীরের কাছাকাছি লইয়া আসিল।

রমানাথের আদর আর ধরে না। মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। বালকের পিতা রমানাথকে কোলে করিয়া নৌকায় লইয়া আসিলেন, তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া নূতন জামা কাপড় পরাইয়া দিলেন, তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইলেন; রমানাথের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি বাবা, আজ থেকে আমাদের ছেলের মত হ'লে। আমাদের সঙ্গে কল্‌কাতায় চল। তোমার মাসীকেও আমরা নিয়ে যাব।"

ভদ্রলোকটি তখন রমানাথের মাসীকে ডাকাইয়া আনিয়া সব বলিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। তিনি কলিকাতার এক সওদাগর-আফিসে বড় চাকরী করেন, নাম নগেন্দ্রনাথ রায়, জাতিতে বৈদ্য। পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে; স্ত্রীর শরীর ভাল নাই, তাই নৌকা-পথে হাওয়া খাইতে খাইতে কলিকাতায় ফিরিতেছেন। তাঁহার ছেলেটি রমানাথের প্রায় সমবয়সী, দুইজনে একসঙ্গে বেশ থাকিবে। তিনি সমস্ত ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আমার হারু এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমানাথকে অনেককালের পুরোণো বন্ধুর মত করে' ফেলেচে—ঐ দেখ না!"—হারু তখন আপনার ব্যাগের জিনিস-পত্র রমানাথকে দেখাইতেছিল,—মায়ের কথা শুনিয়া সে একমুখ হাসি লইয়া রমানাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি একে আর ছেড়ে দেব না।"

রমানাথের মাসী কলিকাতায় যাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গ্রাম ছাড়িয়া, চাষের জমি ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। তবে রমানাথকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। মাসী বলিলেন, "রমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, নিয়ে যাও। আমি বুড়োথুড়ো হয়েছি, কখন্ কি হয়। ওর যদি একটা উপায় হয় সে ত ভাল কথা।"

আশৈশব পল্লীগ্রামে থাকিয়া রমানাথের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত, সহর দেখিয়া আসে। তাহাদের গ্রামবাসী দু'একটি লোকের মুখে কলিকাতার বিবরণ শুনিয়া ইদানীং তাহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছাটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য, সে তাহার মাসী এবং পল্লীধাত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি করিল না।

সেইদিন অপরাহ্নে যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, রমানাথের মাসী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

২

কলিকাতায় আসিয়া রমানাথ যাহা দেখে তাহাতেই অবাক্ হইয়া যায়। সে তাহার মাসীর নিকট যে পরীরাজ্যের গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে হইল, এ সকল সেই পরীরাজ্যেরই অন্তর্ভূত। তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বন্ধু হারাধনেরও দিনকতক আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল।

অপরিচিতকে কলিকাতার মধ্যে পরিচিত করিয়া দেওয়াকে হারাধন বিশেষ একটা গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিল। এক

একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখায়, আর রমানাথ অবাক্ হইয়া তাহা দেখে। ঐ দেখ পাঁচ-ঘোড়ার গাড়ী, ঐ দেখ মনুমেণ্ট, ঐ দেখ বড়লাট সাহেবের বাড়ী,—রমানাথ হাঁ করিয়া দেখে। হারু বিজয়ী বীরের মত উল্লাসে রমানাথকে লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

কিন্তু হারুর মনে শীঘ্রই ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রমানাথ পাড়াগেঁয়ে বলিয়া সময়ে সময়ে বিপদে পড়িত। একদিন অনবধানতা-বশতঃ এক ঘোড়ার গাড়ীর সম্মুখে পড়িয়া সে চাবুক খাইল, আর একদিন ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, হারুর সঙ্গে একদিন ফুটবল খেলিতে গিয়া এমন্ এক ধাক্কা খাইল যে, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এইসকল ব্যাপারে রমানাথকে লক্ষ্য করিয়া যে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত, হারু তাহাতে যোগ দিত। হারু মনে করিত, রমানাথ তাহার বিশেষ সম্পত্তি, এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে হাসাইবার এক আশ্চর্য্য কল।

রমানাথ বাড়ীতে আসিয়া হারুর নিকট প্রায়ই করুণভাবে অনুযোগ করিত। সে বলিত, "অন্য লোকে হাসে হাসুক্, তুমি তা'দের সঙ্গে হাস কেন! ট্রাম থেকে নাম্‌তে গিয়ে পড়ে' গেলুম, তুমি কোথায় আমাকে ধরে' তুল্‌বে, না তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও হাস্‌তে লাগ্‌লে! সেদিন গাড়োয়ানটা আমায় চাবুক্ মার্‌লে, তুমি হেসে উঠে বল্‌লে, বেশ হয়েছে! ছেলে-গুলো সেদিন আমার কাণ ম'লে দিলে, কত রকম ঠাট্টা কর্‌লে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লে! তোমার কি ভাই এসব উচিত?"

হারু বলিত,"বাঃ রে, আমিও বুঝি তোমার সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য কর্‌ব—লোকে আমাকে পাড়াগেঁয়ে, বোকা বলুক্ আর কি!"

রমানাথ বলিত,"আমি হ'লে অমন্ কর্‌তুম না।"

রমানাথের একটি প্রধান দোষ ছিল, সে সব সত্যকথা বলিয়া ফেলিত। হারু যদি বাপকে লুকাইয়া ঘুড়ি উড়াইত, কিংবা পেটের অসুখের উপর চানাচুর খাইত, অথবা দুপুর বেলায় ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত,—রমানাথের জন্য সে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। হারু বলিত, "তুমি ত আচ্ছা বোকা! বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আর সব বলে' ফেল্লে! আচ্ছা বোকা ত!" রমানাথ বলিত, "আমি কি কর্‌ব, আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌ব!"

উত্তর শুনিয়া হারু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে সে রমানাথের সঙ্গে বেড়ান একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। রমানাথ একলাটি এখর সেখর করিয়া বেড়াইত।

রমানাথের জন্য হারু তাহার বাপের নিকট প্রায়ই মার খাইত। ইহাতে হারুর মাও রমানাথের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; বলিতেন, "কি রকম হাবা ছেলে, কেবলই আমার হারুর নামে লাগায়!"

এইরূপে রমানাথ নগেন্দ্রবাবুর গৃহে অনাদরে দিন কাটাইতে লাগিল।

৩

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, সে হারুর সঙ্গে এক-ক্লাশে পড়িত। পড়াশুনায় রমানাথের খুব মন ছিল, এজন্য নগেন্দ্রবাবু তাহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং ভাল ভাল জিনিস কিনিয়া দিতেন। হারুর মনে ইহাতে খুব হিংসা হইত, সে রাতদিন রমানাথকে জব্দ করিবার ফন্দী খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হারু জানিত, রমানাথ খুব গাছপালা ভালবাসে; সে তাহার কাছে কত রকম গাছের নাম করিত, স্কুলে যাইবার সময় পথে কত রকম গাছ চিনাইয়া দিত, কত রকম ফুলের নাম করিত,—কোন্ ফুল কখন্ ফোটে, কোন্ ফুলের কি রকম রঙ্, তাহাদের বাড়িতে কি কি গাছ আছে, সব বলিত।

একদিন শনিবারে স্কুল হইতে ফিরিবার সময় হারু রমানাথকে সঙ্গে লইয়া নারিকেল-ডাঙ্গার এক বাবুর বাগান-বাড়িতে গেল। মালী ছাড়া আর কেহই তখন সেখানে ছিল না। দুজনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল; কত রকমের ফলফুলের গাছ, কত রকমের লতাপাতা,—দেখিয়া রমানাথের আনন্দ আর ধরে না! এত রকমের গোলাপ গাছ সে কখনও চক্ষে দেখে নাই।

হারু বলিল, "এস ভাই, আমরা একটা গোলাপ-গাছ চেয়ে নিই, টবে পুঁতে ছাতে রেখে দেব—কেমন?"

রমানাথের ভারি আনন্দ হইল, সে বলিল, "বেশ ভাই, বেশ!"

হারু বলিল, "তুমি ভাই, তা' হ'লে এখানে একটু দাঁড়াও, আমি মালীর কাছে গিয়ে সব ঠিক্ করচি।"

রমানাথ দাঁড়াইয়া রহিল। হারু মালীর কাছে গিয়া তাহার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "একটা গোলাপফুলের গাছ দিতে পার?"

মালী টাকা পাইয়া একটার পরিবর্ত্তে দুইটা গাছ আনিয়া হারুকে দিল। হারু তখন রমানাথকে দেখাইয়া দিয়া মালীকে চুপিচুপি কি কহিল; তাহার পর রমানাথের কাছে গিয়া তাহার হাতে দুইটা গাছ দিয়া কহিল, "এই দেখ, কেমন গাছ এনেছি। কাউকে বোলো না ভাই যে, আমি তোমাকে গাছ দিয়েচি। বল্‌বে না ত, এ্যাঁ! তোমার আবার বলে' দেওয়া রোগ আছে।"

রমানাথ প্রতিশ্রুত হইল, কাহাকেও সে বলিবে না। উভয়ে বাড়ি ফিরিল; দুইটা ভাঙা মাটির কলসীতে মাটি ভরিয়া, গাছ পুঁতিয়া ছাতে রাখিয়া দিল। মালী তাহাদের পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাদের বাড়ি দেখিয়া গেল।

পরদিন নগেন্দ্রবাবু বৈকালে আপিস হইতে আসিলে মালী আসিয়া তাঁহার কাছে গাছ-চুরির নালিশ করিল,—তাঁহারই বাড়ির এক ছেলে তাহার মনিবের বাগান হইতে গাছ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু, হারু রমানাথ উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উভয়ে আসিলে, মালী রমানাথকে দেখাইয়া কহিল, "এই বাবুই আমার গাছ নিয়েচে।"

নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ ত সে রকমের ছেলে নয়! নগেন্দ্র-

বাবু ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে, বোধ হয় মালীর দেখিবার ভুল হইয়া থাকিবে।

নগেন্দ্রবাবু রমানাথকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "বল ত রমা, কি হ'য়েছিল?" রমানাথ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াও হারুর নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া কোন কথাই প্রকাশ করিল না। রমানাথ ছলছলনেত্রে বলিল, "ক্ষমা করবেন, আমি কিছু বল্‌তে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। রমানাথ কখনও তাঁহার মুখের উপর কথা বলে নাই। নগেন্দ্রবাবু রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "সে কি! বল্‌তে পারবে না কি!" রমানাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি কিছু বল্‌তে পারব না।" নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা' হ'লে নিশ্চয়ই তুমি গাছ নিয়েচ!" রমানাথ চুপ্ করিয়া রহিল।

হারু দূরে দাঁড়াইয়া রমানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার ভয় হইতেছিল, রমানাথ কি বলিয়া ফেলে।

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "তা' হ'লে বুঝলুম্, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।"—একটু থামিয়া নগেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি যে কেবল বিশ্বাসের অযোগ্য তা' নও, তুমি চোর, তুমি প্রবঞ্চক! তুমি আমাকে এতদিন প্রতারণা করে' এসেচ!"—নগেন্দ্র বাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বেত লইয়া রমানাথকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন—বেত্রাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল।

হারু সমস্ত দিন আর রমানাথের কাছে ভিড়িল না; নগেন্দ্রবাবু রমানাথের সঙ্গে সেদিন কোন কথা বলিলেন না; বাড়ীর কেহই রমানাথের কোন খোঁজ লইল না। নিতান্ত উপেক্ষায়, অনাদরে, বেদনায় রমানাথ আস্তে আস্তে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

হারুর মা বলিলেন, "যা' হোক্ বাপু, অমন্ ছেলেকে বাড়ীতে রাখ্‌তেও আমাদের ভয় করে।" তাঁহার দিদি বলিলেন, "আমি ত প্রথমেই বলেছিলুম, পাড়াগেঁয়ে ছেলে—পেটে পেটে নষ্টামি বুদ্ধি! ওদের কি বাড়ীতে যায়গা দিতে আছে!"

রাত্রে খাবার সময় হারুর মা রমানাথকে ডাকিতে আসিলেন। রমানাথ বলিল, "আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাব না।"

মাঝরাত্রে রমানাথ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। জ্বরের তাপে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, বেদনায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতেছিল। রমানাথ একাকী একঘরে থাকিত; সে উঠিয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহার মাসী, তাহার পল্লীভবনের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভোর হইতে না হইতে রমানাথ দুইটি টাকা সঙ্গে লইয়া, খালিপায়ে খালিগায়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ি চড়িয়া, রমানাথ একেবারে তাহার পল্লীবাসভবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বিপ্রহরের প্রখর তেজ

সমস্ত বনভূমি শুষ্ক, ম্রিয়মাণ; রৌদ্রের দাপটে গাছগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে। রমানাথ দৌড়াইয়া গিয়া, নদীর জলে কাপড় ভিজাইয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া সমস্ত গাছের তলায় জল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখানে বকুল গাছটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, এখানে শিউলিগাছের সব পাতা খসিয়া পড়িয়াছে, এখানে গোলাপগাছটি কিসে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রমানাথ জরগায়ে রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া সব ঠিক করিতে লাগিল।

অপরাহ্নের দিকে হঠাৎ মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুইজন কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতে যাইতে দেখিল, এক বালক ছোট একটি সন্ধ্যামণির চারাগাছ নিজের শরীর দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া আছে। তাহারা কাছে গিয়া দেখিল, বালকটির জ্ঞান নাই—কোন কথার উত্তর দিতে পারিতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিতেছে, "একবার রোদে পোড়াব, আবার বৃষ্টিতে ভেজাব,—একি কাণ্ড!"

কৃষকদের মধ্যে একজন রমানাথকে চিনিতে পারিল। সে রমানাথের মাসীকে খবর দিল। মাসী আসিলে সকলে ধরাধরি করিয়া রমানাথকে ঘরে লইয়া গেল। রমানাথের মাথা দিয়া তখন আগুন বাহির হইতেছে, চোখ দু'টা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে বিছানায় শুইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া মাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘটিতে জল আনিয়া রমানাথের মুখে চোখে দিতে লাগিল, পাখা করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। কৃষক দুইজনের মধ্যে একজন ক্ষেতের কাজে চলিয়া গেল, আর একজন পাড়া-প্রতিবেশিনীকে খবর দিতে ছুটিল। মাসী রমানাথকে লইয়া একলা বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণপরেই নগেন্দ্রবাবু হারুকে লইয়া রমানাথের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারু রমানাথকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি বাবাকে সব বলেছি ভাই, আর কখ্‌খনো এমন্ করব না—কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না! চল ভাই, আমাদের বাড়ি ফিরে' চল।"

রমানাথ কোন কথা কহিল না—অনেকক্ষণ নিস্পন্দের মত থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া, দুইহাতে প্রাণপণে হারুর গলা জড়াইয়া ধরিল, তখনই আবার ছাড়িয়া দিয়া ঘটি লইয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

কাঁটা মাড়াইয়া, বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া, রমানাথ সন্ধ্যামণির গাছতলায় আসিয়া ঘটিটি একেবারে উপুড় করিয়া দিল। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছে, পায়ে বল নাই, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মাটিতে শুইয়া পড়িল।

সকলে যখন রমানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্রান্ত বালক ঘটিটি হাতে করিয়া সন্ধ্যামণির গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্যাকরণঘটিত প্রমাণ।

পাণিনিকর্ত্তৃক উদ্ধৃত নটসূত্রের গ্রন্থকর্ত্তা শিলালিনের নামও শিল শব্দের সহিত সন্নিবদ্ধ। যে সকল নট এই সকল নাট্যসূত্রের প্রয়োগ করিত, তাহারা শৈলালিন্ নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার যাহারা কৃশাশ্বের উপদেশ অনুসরণ করিত, তাহারা কৃশাশ্বিন্ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আচার্য্যদ্বয়ের গ্রন্থাবলী বহুকাল যাবৎ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রণীত নটসূত্রের উল্লেখমাত্রে নাট্যকলার ইতিহাস, একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। পাণিনির আবির্ভাবকাল একটা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, এই তথ্যের অসাধারণ মূল্য হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতীয় কিংবদন্তী,—সেকন্দরশার সমসাময়িক শেষ-নন্দের রাজত্বকালে পাণিনিকে স্থাপন করিয়াছে। এবং গুণাধ্যায়কৃত বৃহৎকথাও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাণিনির গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই কালটি মোক্ষমূলর গ্রহণ করিয়াছেন; এমন-কি বৈদিক কাল-ক্রমনির্ণয়ে তিনি ঐ সময় হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, M. M. Peterson ও Pischel সম্প্রতি পাণিনিকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে পাণিনিপ্রদত্ত তথ্যাদির সহিত গ্রীক প্রমাণ-লেখ্যাদির তুলনা করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছি যে এ সম্বন্ধে কিংবদন্তীর কথাই সম্পূর্ণরূপে সত্য। ভারতীয় নাট্যকলা, মহাকাব্য হইতে যে চরম বিকাশ লাভ করে, তাহা পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলীর মহাভাষ্য হইতে আমরা অবগত হই। ঠিক্ কোন্ সময়ে পতঞ্জলী আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

তাঁহার গ্রন্থ যাহা "চূর্ণি" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে,—"বাক্যপদেব" গ্রন্থকার ভর্ত্তৃহরি, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঐ গ্রন্থেরও আবার ভাষ্য করিয়াছিলেন। ভর্ত্তৃহরির দ্বিতীয় কাণ্ডে, পতঞ্জলি হইতে আরম্ভ করিয়া এই মতবাদের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। "আচার্য্যের মৃত্যুর পর বৈজি, সৌভব, হর্য্যক্ষ, যাঁহারা শুষ্ক তর্কবিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা ঐ পুরাতন গ্রন্থ হেলায় হারাইয়াছিলেন; পরিশেষে, এই মূলগ্রন্থ পাণিনির শিষ্যদিগের হস্তগত হয় নাই; কেবল উহার একটিমাত্র প্রাতলিপি দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান ছিল। তেলিঙ্গনার অন্তর্ব্বর্ত্তী "পর্ব্বতে" যে মূলগ্রন্থ পাওয়া যায়, চন্দ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ ঐ মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সূত্র ও ভাষ্যাদির অনুশীলন করেন এবং এইরূপে তাঁহাদিগের

কর্ত্তৃক অসংখ্য শাখা সংগঠিত হয়। আমার আচার্য্য যিনি তর্কপদ্ধতিতে ও স্বকীয় দর্শনে সিদ্ধ ছিলেন, তিনি আমাদের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।”(১) অতএব পতঞ্জলি ও ভর্ত্তৃহরির মধ্যে বহুপুরুষপরম্পরার সুদীর্ঘ ব্যবধান। ভাণ্ডরকার কতকগুলি গুরুতর যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে,“মহাভাষ্য” ১৪০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে বিরচিত হয়। এই অভিমতের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত স্ব স্ব মতের সারবত্তা প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কতকগুলি গুরুতর তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া আমরা ভাণ্ডরকারনির্ণীত কালই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। (২)

“যখন কোন ক্রিয়া বক্তার সমক্ষে সংঘটিত হয়, তখন সেই স্থলে লঙ্ (imperfect tense) প্রয়োগ করিবেক”—কাত্যায়ন তাঁহার একটি বার্ত্তিকায় এই যে আদেশ করিয়াছেন, মহাভাষ্যের গ্রন্থকার তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই বিধির অযথতা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:— “বাসুদেব কংসকে হত্যা করিয়াছে।”— ভাষ্যকার নাগোজিভট্ট ইহার উপর আর একটু টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন,—“যে ব্যক্তি, ঐ ঘটনাটি তখনই ঘটিয়াছে এইরূপ বলিতেছে, সে ঐ ঘটনা স্বচক্ষে দেখে নাই।”

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এস্থলে এমন কোন ব্যক্তির উল্লেখ করা হইতেছে যে পাতঞ্জলির সময়ে ঐ প্রজাপীড়ক রাজার হত্যা স্বচক্ষে দেখিয়াছে (৩) আর একটি বচনে এই বিষয়টী আরও বিশদীকৃত হইয়াছে ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে (৪)। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে যে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ আছে, পতঞ্জল তাহার পরীক্ষা করিতেছেন; “তিনি কংসকে হত্যা করিলেন।” “তিনি বালিকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিলেন”।—পতঞ্জলি বলেন “অস্মৎকালের বহু পূর্ব্বে কংস নিহত হয়, বালি শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়; তবে এস্থলে কিরূপে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ হইতে পারে? ইহা ছায়া কল্প। বস্তুত শৌভিকেরা (উহারা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে) কংসের মৃত্যু ও বালির বন্ধন, চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে (৫)।—সূতমাগধেরাও এই ধরণে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু উহারা শুধু বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করে (উহারা শৌভিকদিগের মত অভিনয় করে না)। উহারা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কথা আবৃত্তি করে, এবং এই রূপে বাক্যের দ্বারাই পাত্রগণের অবতারণা করে। এই হেতু উহারা পরস্পর পৃথক ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আপনা-

(১) বাক্যপদ II.

(২) Quid de Græcis veterum Indorum monumenta traderint, Paris 1890. P. 16 & 38.

(৩) Goldstuckerএর গ্রন্থে উদ্ধৃত, Panini, P. 230, n. 267.

(৪) পাণিনি III, ১, ২৬

(৫) Kielhornএর সংস্কারে, Weber এর গ্রন্থে শোভানিকা।

সন্ধ্যা।

দিগকে প্রদর্শন করে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক কংসের দলভুক্ত, আবার কতকগুলি লোক বাসুদেবের দলভুক্ত; এমন কি, উহারা বিভিন্ন বর্ণও ধারণ করে! কেহ বা মুখে লাল রং, কেহ বা কালো রং মাখিয়া থাকে। প্রচলিত রীতি অনুসারে তিন কালের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়:—"পালাও; উহারা কংসকে হত্যা করিতেছে"; "পালাও উহারা কংসকে হত্যা করিবে; "এখন পলায়ন করা বৃথা, উহারা কংসকে হত্যা করিয়াছে।"

উপরের অনূদিত বাক্যে যে শৌভিকাঃ" পদটির অর্থ অভিনেতা—এইরূপ সূচিত হইয়াছে, মহাভারতের টীকাকার কৈয়ট তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

কংস প্রভৃতির ভূমিকাগ্রহণকারী অভিনেতাদিগকে যে সকল আচার্য্য অভিনয়ের শিক্ষা দেন তাহারা শৌভিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ইত্যাদি।

পতঞ্জলিও নটদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; উহারা যে শুধু বাক্য (৬) আবৃত্তি করিতে অভ্যাস করে তাহা নহে, (৭) গানও অভ্যাস করে। (৬) সাহিত্যিক ইতিহাসের যুগে উহাদের রীতিনীতি জঘন্য ছিল, উহাদের সামাজিক অবস্থাও অত্যন্ত হীন ছিল। বোধ হয় নটীরা সে সময়ে শুধু গায়িকা ও নর্ত্তকী মাত্র ছিল। সে কালে "ভ্রূকুংশ" নামক ছদ্মবেশী নটেরা রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিত। উহারা দীর্ঘকেশ ও কৃত্রিম স্তন ধারণ করিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনটি স্বপ্ন।

(শ্রীমতী অলিভ শ্রীনারের স্বপ্ন হইতে)

(১)

আমি মরুভূমির উপর দিয়া যাইতেছিলাম, রৌদ্র তখন প্রখর। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলে ঘোড়া থামাইয়া নামিলাম; জিন খুলিয়া ঘোড়াটাকে চরিতে ছাড়িয়া দিলাম। ডাহিনে বাঁয়ে পোড়া মাটির ধূসর বিস্তার; দিগন্ত জুড়িয়া রৌদ্রতপ্ত হাওয়া যেন হাঁপাইতেছিল। গাছের তলে বসিয়া বসিয়া তন্দ্রা আসিল; জিনের গায়ে মাথা দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে মজার স্বপ্ন দেখা দিল।

আমি যেন প্রকাণ্ড মরুপ্রান্তরের এক ধারে দাঁড়াইয়া আছি, আর দগ্ধ বালু অগ্নিবাণ হানিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। মনে হইল যেন একজন কে মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার পাশে আর একজন কে দাঁড়াইয়া—যেন দুটি ভারবাহী পশু, মরুযাত্রীর সহচর। যে পড়িয়া আছে, সে

(৬) নটস্য শৃণোতি। নটস্য শ্রোতারঃ।

(৭) অগাসিন্ নটাঃ।

স্ত্রীজাতি। তাহার পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা আর তাহার আশে পাশে বালি জমিয়া উঠিয়াছে, যেন কত শতাব্দ ধরিয়া জমিয়াছে। আর দাঁড়াইয়া আছে যে সে নর।

আমি কৌতূহল-দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। আর, আমার কৌতূহল আর একজন কৌতুক-দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। আমি সেই দণ্ডায়মান জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই যে প্রাণীটি বালির উপর পড়িয়া আছে, এ কে?

সে বলিল—নারী, যিনি নরের জননী।

আমি বলিলাম—ইনি এমন ভাবে ধূলি-শয়নে পড়িয়া কেন?

সে বলিল—কতকাল ধরিয়া ইনি এমনি পড়িয়া আছেন, বায়ু হা হা করিয়া উপর দিয়া ধূলা উড়াইয়া বহিয়া গেছে। বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ লোকেও ইঁহাকে নড়িতে দেখে নাই; পুরাতন, অতি পুরাতন পুরাণও এই একই কথা বলে। কিন্তু বৃদ্ধেরও বৃদ্ধ, পুরাতনেরও পুরাতন ভগ্ন সমাজরীতি ও বিস্মৃত ভাষান্তরের মধ্যে ইঁহার চরণচিহ্ন দেখা গিয়াছে; ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে যিনি এখন পাষাণী হইয়া পড়িয়া আছেন, একদিন তাঁহার এমন ছিল যখন তিনি স্বাধীন ভাবে তাঁহার পার্শ্বচরের সহিত সঞ্চরণ করিতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি এখন পড়িয়া আছেন কেন?

সে বলিল—বোধহয় যখন ইনি নর-কে নত হইয়া স্তন্য দিতে গিয়াছিলেন সেই সময় অকৃতজ্ঞ সন্তান ইঁহাকে বন্ধন করিয়া পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। তখন ইনি একবার ধরণীর পানে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আশা কোথাও দেখিতে পান নাই। তখন বোঝার চাপে সেই যে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন আজ পর্য্যন্ত তেমনি পড়িয়াই আছেন। শতাব্দী আসিয়াছে, শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তিনি যেমনকার তেমনি পড়িয়া আছেন, বন্ধন ঘুচে নাই।

আমি ভূপতিতার মুখের দিকে চাহিলাম; নয়নে তাহার যুগযুগান্তের ধৈর্য্য; কিন্তু ভূমি তাহার অশ্রুজলে সিক্ত; শ্বাসস্ফীত নাসারন্ধ্র বালির ঘূর্ণী উড়াইতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি কি কখনো নড়িতে চেষ্টাও করেন না?

সে বলিল—কখনো কখনো অঙ্গস্পন্দ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারি বোঝা বহিয়া ইনি উঠিতে পারিবেন না বলিয়াই কখনো দুশ্চেষ্টা করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও পশুটা পাশে দাঁড়াইয়া মরিতেছে কেন? ইহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও ত পারে।

সে বলিল—না, পারে না। দেখ—

আমি চাহিয়া দেখিলাম একটা চওড়া ফিতা জমির উপর দিয়া লুটাইয়া গিয়াছে, উহার দ্বারা ইহারা দুজনেই বাঁধা।

সে বলিল—যতদিন এ পড়িয়া থাকিবে ততদিন উহারও ঠায় দাঁড়াইয়া মরুভূমির দিকে হাদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

আমি বলিলাম—নরটি কি জানে সে কেন নড়িতে পারিতেছে না?

আমার সঙ্গী বলিল—না।

আমি কোনো কিছু ছিন্ন হওয়ার শব্দ শুনিলাম। দেখিলাম, যে-বন্ধন নারীর পিঠে বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা ছিন্ন

হইয়া গেল; বোঝা গড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

সে বলিল—আত্ম-বোধ নারীর দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করিল। নরের অকৃতজ্ঞতার বোঝা খসিয়া পড়িয়াছে। নারী এখন উঠিলেও উঠিতে পারে।

কিন্তু আমি দেখিলাম সে তখনো বালুকা-শয়নে স্থির নিশ্চল—চক্ষু তাহার রুদ্ধ, অঙ্গ তাহার লুণ্ঠিত। সে যেন দূর দিগন্তে কিছু খুঁজিতেছিল কিন্তু পাইতেছিল না। আমার সন্দেহ হইতেছিল সে জাগ্রত অথবা সুপ্ত। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার উদারনেত্রে দীপ্তি জাগিল, যেমন অন্ধকার ঘরে সূর্য্যরশ্মির অনুপ্রবেশ! তনু তাহার কম্পিত হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—একি!

সঙ্গী মৃদুস্বরে বলিল—চুপ! উহার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে 'আমি কি উঠিতে পারি না?'

আমি দেখিলাম। সে ধূলা হইতে তাহার মাথা তুলিল। তারপর একবার তাহার এত-দিনের ধূলিশয়নের দিকে, একবার উন্মুক্ত বিশাল, প্রসন্ন নির্ম্মল আকাশের দিকে, একবার তাহার পার্শ্বচরের দিকে সে তাকাইল। কিন্তু তাহার পার্শ্বচর নর মরুপ্রান্তরের সীমাহীন সীমার দিকে তাকাইয়া ছিল।

আমি দেখিলাম নারীর দেহ কম্পিত হইল। সে হাঁটুতে ভর দিল, শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—ঐ ঐ নারী উঠিতেছে!

কিন্তু চেষ্টাশ্রমে শুধু তাহার বক্ষপঞ্জর ধ্বনিত হইতে লাগিল, সে যেখানকার সেখানেই পড়িয়া রহিল।

কিন্তু এখন মস্তক তাহার উন্নত, সে-মাথা ধূলায় আর পড়িল না।

আমার সঙ্গী বলিল—নারী বড় দুর্ব্বল। দেখ দেখ, তাহার চরণ এতকাল অব্যবহারে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেছে।

সে বেচারা আবার চেষ্টা করিতে লাগিল, স্বেদবিন্দুতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—উহার পার্শ্বচর এখন নিশ্চয় উহাকে সাহায্য করিবে।

আমার সঙ্গী বলিল—না, সে সাহায্য করিবে না। নারীকে আত্মশক্তিতেই উঠিতে হইবে। করুক, করুক সে চেষ্টা। চেষ্টায় শক্তি আপনি লাভ হইবে।

আমি বলিলাম—নর সাহায্য না করুক, বাধা ত দিবে না! দেখ দেখ, ও দূরে সরিয়া ফাঁশ আরো কষিয়া দিতেছে যে, নারী যে আবার পড়িয়া যায়!

সঙ্গী আমার উত্তর করিল—হতভাগা জানে না সে কী অন্যায় করিতেছে। যখন নারী নড়িতেছে তখন বন্ধনরজ্জুতে টান পড়াতে নর ব্যথা পাইতেছে, তাই নরও নারীর নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই শুভদিন আসিবে যেদিন নর বুঝিবে নারীর এই প্রচেষ্টার অর্থ। নারী চেষ্টা করিতে থাকুক, বোধ পাইলে নর নারীর পাশে দাঁড়াইবে, সমবেদনায় ইহাদের শুভদৃষ্টি হইবে।

নারী তাহার গ্রীবা প্রসারিত করিল,

স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, একটু উঠিয়াই আবার সে পড়িয়া গেল।

আমি বলিয়া উঠিলাম—হায় হায়! এত কালের অনভ্যাস তাহার সকল শক্তি হরণ করিয়াছে। আহা অবলা! চলিতে সে পারিবে না!

আমার সঙ্গী বলিল—দেখ দেখ তাহার নয়নে জ্যোতি!

ধীরে ধীরে বেচারা কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁটুতে ভর দিয়া উঠিল।

২

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথাও কিছু নাই; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শুধু উষর ক্ষেত্র ও শুষ্ক ঝোপ। লাল পিঁপড়ে লাল বালির মধ্যে ব্যস্তভাবে আনাগোনা করিতেছিল। গরম ভীষণ। আমি কৃষ্ণচূড়ার পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে দেখিলাম আকাশ যেন হাজার কোটি নীল চোখ সবুজ পাতার জাফরির ফাঁকে রাখিয়া উঁকি মারিয়া আমায় দেখিতেছে। আমি সটান শুইয়া স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই পাগল-করা রক্ত-নাচানো গরমে মাথার মধ্যে স্বপ্ন আবার খেলা জুড়িল।

আমি দেখিতে লাগিলাম যেন একটা মরুভূমি ধূধূ করিতেছে। একটি নারী মরুবালুকা ভাঙিয়া ভাঙিয়া একটা কালো নদীর পাড়ে আসিল, সে পাড় অতি উঁচু, অতি খাড়া! এখানে তাহার সহিত এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হইল, বুড়ার দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি, হাতে একটা পেঁচানো লাঠি, তার উপরে লেখা 'যুক্তি'। বৃদ্ধ নারীকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি চাও?

নারী বলিল—আমি নারী; আমি স্বাধীনতার রাজ্যে যাইতে চাই।

বৃদ্ধ বলিল—সে রাজ্য ত তোমার সম্মুখেই—

নারী বলিল—আমি ত এই কালো নদীর উঁচু পাড়ের ওপারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ বলিল—ওপারে, দূরে?

নারী বলিল—কিছুই না। কখনো কখনো অনেক দূরে যেন একটি বৃক্ষচ্ছায়া-সমাকীর্ণ পাহাড় দেখিতে পাইতেছি মনে হয়,—পাহাড়ের মাথায় গাছের চূড়ায় রৌদ্রের ঝিকিমিকি যেন চোখে ঠাহর হইতেছে।

বৃদ্ধ বলিল—ঐ ঐ, ঐ স্বাধীনতার রাজ্য!

নারী জিজ্ঞাসা করিল—কেমন করিয়া আমি ঐ দেশে যাইতে পারিব?

বৃদ্ধ বলিল—উপায় আছে, কিন্তু সে এক মাত্র উপায়। শ্রমের পাড়ি বাহিয়া, কষ্টের স্রোত ভাঙিয়া। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

নারী। কোনো পুল নাই?

বৃদ্ধ। না।

নারী। জল কি গভীর?

বৃদ্ধ। অতি গভীর।

নারী। স্রোত কি প্রখর?

বৃদ্ধ। অত্যন্ত। যে কোনো মুহূর্ত্তে তোমার পদস্খলন হইতে পারে এবং তুমি অতলে ডুবিতে পার।

নারী। কেহ কি এ নদী উত্তীর্ণ হইয়াছে?

বৃদ্ধ। কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছে।

নারী। কোথাও কি পারঘাট আছে, যেখানে উত্তরণ সহজ।

বৃদ্ধ। ঘাট নিজেকেই গড়িয়া লইতে হইবে।

নারী বলিল—আমি যাইব।

বৃদ্ধ বলিল—বেশ। তোমার মরুবাসের বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল; যাহারা আগে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা ঐ কাপড় জড়াইয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

নারী নিঃসঙ্কোচে তাহার জীর্ণ প্রাচীন সংস্কার খুলিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ বলিল—তোমার পায়ের দাসত্বের বেড়ি 'মল' খুলিয়া ফেল।

নারী বাহুল্যবর্জ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গে শুধু একটি শুভ্র আবরণ, দুধের ফেনার মতো শাদা, তার বুকের উপর লেখা 'সত্য'।

বৃদ্ধ বলিল—ঐ আবরণ রাখিতে পার; উহা স্বাধীনতার রাজ্যের লোকেই পরে; জলে উহা তোমাকে ভাসাইয়া রাখিবে।... লও এই দণ্ড। ধর উহা দৃঢ় করিয়া। যে দিন এই দণ্ড তোমার হস্তচ্যুত হইবে, সে দিন তোমার সর্ব্বনাশ। ইহা দিয়া জল মাপিয়া মাপিয়া যাইয়ো, যেখানে ইহা থৈ পাইবে না, সেখানে তোমার পা দিয়ো না।

নারী বলিল—তবে আমি এখন যাই?

বৃদ্ধ বলিল—না, থাম। তোমার বুকে ও কি?

নারী নীরব।

বৃদ্ধ বলিল—খোল খোল, আমি দেখি ও কি?

নারী বক্ষাবরণ খুলিল; তাহার বক্ষে একটি ছোট শিশু স্তন্যপান করিতেছিল; কুসুম-কিঞ্জল্কের মতো কুঞ্চিত তাহার চুলগুলি; তাহার কচি কচি ননীর ডেলার মতো হাত দুখানি নারীর বক্ষে লগ্ন ছিল।

যুক্তি বুড়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কে? বক্ষ জুড়িয়া ও কি করিতেছে?

নারী বলিল—দেখ দেখ এর হাত দুটি!

যুক্তি বলিল—উহাকে বুক হইতে নামাইয়া ফেল।

নারী বলিল—আহা! এ যে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্তন্য পান করিতেছে। আমি ইহাকে বুকে বহিয়া স্বাধীনতার দেশে লইয়া যাইব। এ যে আমার বুকের ধন, সাধের শিশু। স্বাধীনতার দেশে এ মানুষ হইবে, আমরা দুজনে একত্র বিচরণ করিব, এর ঐ ক্ষুদ্র কিশোর হাত দুটি দীর্ঘায়ত হইয়া আমায় ঢাকিয়া রাখিবে। মরুভূমিতে সে শুধু একটি কথা আমার কানে গুঞ্জন করিত—সে কথাটি 'বাসনা'। স্বাধীনতার দেশে গিয়া ওকে নূতন ভাষা শিখাইব—সখিত্ব।

বুড়া যুক্তি বলিল—উহাকে বুক হইতে নামাইয়া দেও।

নারী মিনতির স্বরে বলিল—আমি এক হাতে ইহাকে এমনি করিয়া বহন করিব, আর হাতে জল কাটিব।

বুড়া বলিল—না না, উহাকে নামাইয়া দেও। জলে নামিয়া তোমার সমস্ত মন পড়িয়া থাকিবে উহারই দিকে। নামাও নামাও উহাকে।...;......ভয় নাই, ও মরিবে না। যখন ও দেখিবে তুমি উহাকে একলা ফেলিয়া গিয়াছ, তখন ও আপনার হাত পা

মেলিয়া আত্মচেষ্টায় উঠিবে। তখন ও তোমার আগেই স্বাধীনতার রাজ্যে পৌঁছিবে। স্বাধীনতার রাজ্যে তোমাদের ভাবনা নাই, সেখানে প্রেম হস্ত প্রসারিত করিয়াই আছে। উহাকে অসহায় শিশু স্তন্যপায়ী করিয়া রাখিও না, নামাও উহাকে, উহাকে বাড়িয়া উঠিতে দাও, মানুষ হইতে দাও।

নারী শিশুর মুখ হইতে স্তন খুলিয়া লইতে গেল। তখন সে এমন জোরে দংশন করিল যে,দুগ্ধধারার সহিত শোণিতধারা মিশ্রিত হইল। নারী তাহাকে মাটিতে শয়ন করাইয়া আপনার আহত স্থান আবৃত করিল এবং নত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিশুর কেশকলাপ শুভ্র হইয়া উঠিল, সে শৈশব হইতে একেবারে বার্দ্ধক্যে উপনীত।

নারী তখন নদীর পাড়ে গিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—হায়রে হায়! আমি কেন কোথায় যাইতেছি! এ নিরুদ্দেশ যাত্রা আমার কেন! হায় হায় আমি একা! আমি একাকিনী!

এই আক্ষেপ শুনিয়া সেই বুড়া যুক্তি বলিল,—চুপ! শুনিতেছ কিছু?

নারী মন দিয়া কান পাতিয়া থাকিয়া থাকিয়া বলিল—হাঁ হাঁ শুনিতেছি, যেন দূরে অতিদূরে পদধ্বনি, হাজার লক্ষ, লক্ষ কোটি পদধ্বনি, যেন এই দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

বৃদ্ধ বলিল—উহা তাহাদেরই পদধ্বনি যাহারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে। অগ্রসর হও! ওগো নূতন পথের প্রথম পথিক! পথ করিয়া দাও!...... তুমি কি দেখিয়াছ পঙ্গপালের নদী পার হওয়া? প্রথমে একটা জলে পড়ে, স্রোতে সে ভাসিয়া যায়; তাহার পশ্চাতে আর একটা, তাহার পশ্চাতে আর একটা; এমনি করিয়া তাহাদের মৃতদেহের শৃঙ্খল এপার ওপার জুড়িয়া যখন দেয়, তখন অবশিষ্ট সকলে সহজে নদী উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

নারী বলিল---যাহারা প্রথমে আসে তাহারা মরিয়া যায়? ভাসিয়া যায়? কেহ তাহাদের মনে করে না? আহা করে না?

বৃদ্ধ বলিল—নাইবা করিল তাহাতে কি!

নারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তাহাতে কী?

বৃদ্ধ। তাহারা পথ ত করিয়া যায়!

নারী। আমাদের দেহপাতে যে পথের সূত্রপাত সে পথে চলিবে কে?

বৃদ্ধ। সমগ্র মানবসমাজ।

নারী তখন নিজের বক্রদণ্ড জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল। আমি দেখিলাম সে সেই কালো নদীর জটিল পথে নামিয়া গেল।

(৩)

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমার চারিদিকে অপরাহ্নের পীতাভ আলোক সোনার-বোনা চাদরের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্য কৃষ্ণচূড়ার ডগায় ডগায় সোনার আলতা পরাইয়া দিতেছিল। আমার ঘোড়া আমার পাশে নিঃশব্দে আহারে ব্যাপৃত। আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম। লাল বালির মধ্যে হাজার হাজার লাল পিপীলিকার সারি। আমি যাত্রা সুরু করিব মনে করিলাম, কিন্তু আবার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা-ঘোরে আবার স্বপ্ন দেখিলাম।

সে এক চমৎকার দেশ। সেখানকার পাহাড়ের চূড়ায় সাহসিকা নারী সাহসী পুরুষের পাশাপাশি হাতধরাধরি বিচরণ করিতেছে। তাহারা সরল অকপট ভাবে পরস্পরের চোখের দিকে চাহিতেছিল, সে দৃষ্টিতে না ছিল লজ্জা, না ছিল সঙ্কোচ, না ছিল দ্বিধা বা ভয়! সেখানে নারীর সঙ্গে নারীরও মধুর সখিত্ব—সকলেই সেখানে সমান।

আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওগো এ কাহার দেশে বিদেশী নামিনু এসে?

সে বলিল—এ স্বর্গ!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কোথায়?

সে বলিল—পৃথিবীতেই!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এমন স্বর্গরাজ্য আমরা কবে দেখিব।

সে বলিল—ভবিষ্যতে।

আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। আমার চারিদিকে অস্তকালের সোনার মায়া। পাহাড়ের কপালে সোনার তিলকের মতো সূর্য্য, আর সকলদিক-ভরা শীতল শান্তি! পিপীলিকারা ধীরে ধীরে গর্ত্তগৃহে ফিরিতেছিল। আমি ঘোড়ায় চড়িলাম, সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে ডুবিয়া গেল। সে তিরোধান কী ভীষণ হইত যদি আমি না জানিতাম যে সূর্য্য আবার কাল এমনিতর সোনার রং ছড়াইয়া আর এক দিকে উদিত হইবে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

প্রয় গ।

এই নগরের পরিধি প্রায় পাঁচ হাজার লি এবং ইহা একই নদীর দুই শাখার মধ্যে অবস্থিত। রাজধানী প্রায় ২০ লি। প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে এবং ফলের গাছও অনেক। জলবায়ু উষ্ণ ও মনোরম; অধিবাসীরা ভদ্র ও বিনয়ী। ইহারা বিদ্যানুরক্ত এবং ধর্ম্মবিরোধী। দুইটি সঙ্ঘারামে হীনযানসংক্রান্ত কয়েকজন যতি বাস করেন। দেবমন্দিরও কয়েকটি আছে; বিধর্ম্মীদিগের সংখ্যা যথেষ্ট।

রাজধানীর দক্ষিণে, চম্পাবৃক্ষোদ্যানে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে; ইহার ভিত্তিমূল মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইলেও, প্রাচীরগুলি বর্ত্তমানেও শতাধিক ফুট উচ্চ। পুরাকালে তথাগত এই স্থানেই অবিশ্বাসিগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। নিকটস্থ একটী স্তূপে বুদ্ধদেবের নখ ও কেশের চিহ্ন আছে এবং অন্য একটী স্থানে যথায় পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধ ভ্রমণ ও উপবেশন করিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন আছে।

শেষোক্ত স্তূপের সন্নিকটেই একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম আছে; এইস্থানে দেব বোধিসত্ত্ব শতশাস্ত্রবৈপুল্যম্ প্রণয়ন করিয়া হীনযানমতাবলম্বিগণের মূল তত্ত্ব খণ্ডন করিয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসিগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে বোধিসত্ত্ব প্রথমতঃ এই সঙ্ঘারামেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে নগরে একটী স্বনামখ্যাত ভাষাবিৎ তার্কিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও উহার নানাপ্রকার প্রয়োগদ্বারা তিনি তাহার প্রতিদ্বন্দীকে প্রশ্ন করিয়া নিরস্ত করিতেন। বোধিসত্ত্বের সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাহাকে ভাষা প্রয়োগে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনার কি নাম?"

দেব বোধিসত্ব বলিলেন "তাহারা আমাকে দেব বলিয়া ডাকে।" অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব কে?" দেব উত্তর করিলেন "আমিই দেব"। অবিশ্বাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি অর্থ কি?" দেব উত্তর করিলেন "কুকুর।" অবিশ্বাসী বলিলেন "কে কুকুর?" দেব উত্তর করিলেন "তুমি।" অবিশ্বাসী বলিলেন "তুমি অর্থ কি?" দেব বলিলেন "দেব।" অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব কে?" দেব উত্তর করিলেন "আমি"। অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কে?" দেব উত্তর করিলেন "কুকুর"। অবিশ্বাসী বলিলেন "কুকুর কে?" দেব বলিলেন "তুমি।" অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" দেব উত্তর করিলেন "দেব।" তাঁহারা এই ভাবে প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিলেন। অবশেষে অবিশ্বাসী বুঝিতে পারিলেন তাঁহাকে পরাজিত করা অসম্ভব। সেই সময় হইতে তিনি দেব বোধিসত্বের যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

নগরাভ্যন্তরে সুসজ্জিত ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একটী দেবমন্দির আছে। প্রবাদ এই যে, পুণ্যার্জ্জনের ইহা একটি প্রশস্ত স্থান। অন্যত্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিলে যে ফল হয়, এই স্থানে কপর্দ্দক দান করিলে ততোধিক ফল হয়। অপিচ, এই মন্দিরে যদি কেহ নিজ জীবন হেয় জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যা করে, তবে সে স্বর্গে অক্ষয় সুখ ভোগ করে। মন্দিরের বৃহৎকক্ষের পুরোভাগে শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটী বৃহৎ বৃক্ষ আছে। এই স্থানে মনুষ্যভোজী একটি দৈত্য—পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আত্মহত্যা প্রচলিত ছিল বলিয়া, এই বৃক্ষে বাস করিত; এই জন্য এই বৃক্ষের দক্ষিণে ও বামে প্রচুর অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই কোন যাত্রী এই মন্দিরে উপস্থিত হন, তখন নিজ জীবন হেয় জ্ঞান করিয়া দেহত্যাগের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পান। অবিশ্বাসীবৃন্দের প্ররোচনায় ও বৃক্ষস্থ দুষ্ট দৈত্যের প্রলোভনে, তাঁহাকে আরও প্রলোভিত হইতে হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মিথ্যা দেশাচার চলিয়া আসিতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে "পুত্র" উপাধিধারী, বিজ্ঞ, কৌতুকপ্রিয় এক ব্রাহ্মণ এই মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সমাগত জনবৃন্দকে বলিলেন "মহাশয়গণ, তোমরা বিপথগামী এবং উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতিবিশিষ্ট; তোমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রদীপ্ত করা দুঃসাধ্য।" তৎপর, তিনি তাহাদের মতি পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনিই আবার নিজে ঐ বৃক্ষারূঢ় হইয়া বন্ধুগণকে বলিলেন "আমি প্রাণত্যাগ করিব। পূর্ব্বে আমি বলিতাম যে তাহাদের শিক্ষা মিথ্যা এবং কুক্রিয়াপূর্ণ; এইক্ষণে আমি বলিতেছি ইহা উত্তম ও সত্য। স্বর্গীয় ঋষিগণ আকাশে তাঁহাদের স্বর্গীয় বাদ্যসহ আমাকে আহ্বান করিতেছেন। এই পবিত্র স্থান হইতে আমি আমার অপবিত্র শরীরকে নিক্ষেপ করিব।" তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে একার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ করা সত্ত্বেও যখন কৃতকার্য্য হইল না, তখন তাঁহার পতনের প্রাক্কালে বৃক্ষের নিম্নে তাহাদের বস্ত্রগুলি প্রসারিত করাতে, পতন হইলেও তাঁহার মৃত্যু হইল না। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি বলিলেন "আমি মনে করিয়াছিলাম যে আকাশে দেবতাগণ আমাকে যাইবার জন্য ডাকিতেছিলেন কিন্তু পরে এই দুষ্ট অবিশ্বাসী দৈত্যের জন্য আমি স্বর্গীয় সুখভোগে বঞ্চিত হইলাম।"

রাজধানীর পূর্ব্বে নদীর দুই শাখা-মধ্যে অবস্থিত ১০ লি পরিমিত মনোরম উচ্চস্থান। এই স্থান সূক্ষ্ম বালুকাকীর্ণ। আবহমান কাল হইতে রাজা ও অভিজাতগণ, এই স্থানেই উপস্থিত হইয়া দান করেন। এইজন্য সকলে ইহাকে বৃহৎ দানক্ষেত্র বলে। বর্ত্তমান কালে রাজা শিলাদিত্য নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের পদানুসরণ করিয়া পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত ধন এই স্থানে একদিনে বিতরণ করিয়াছেন। এই দানক্ষেত্রে রাশীকৃত মণি মুক্তা ও ধন একত্রিত করিয়া, প্রথম দিবস তিনি একটী বুদ্ধমূর্ত্তিকে মহার্ঘ বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মণিমুক্তা দ্বারা ইহাকে পূজা করেন। পরে তিনি এই স্থানের ভিক্ষুগণকে নানা দ্রব্য দান করিয়া, তৎপর দূরাগত অতিথিগণকে দান করেন। তৎপর, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে

এবং সংসারাশ্রয়ী বিধর্ম্মিগণকে দান করিয়া, অবশেষে, বিধান, আতুর, অনাথ ত্যক্ত এবং ভিক্ষুক-গণকে দান করেন।

এই প্রকারে নিজ কোষাগার শূন্য করিয়া এবং সকলকে আহার্য্যে পরিতৃপ্ত করিয়া, পরে তিনি নিজ রাজমুকুট ও কণ্ঠহার দান করেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন না এবং যখন তাঁহার দান শেষ হয় তখন তিনি আহ্লাদের সহিত বলেন" এক্ষণে আমার যাহা ছিল তাহা অবিনশ্বর ও অক্ষয় কোষাগারে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পরে, বিভিন্ন দেশের শাসনকর্ত্তাগণ নিজ নিজ আভরণ, মণি মুক্তা প্রভৃতি রাজাকে দান করেন এবং এইপ্রকারে রাজার কোষাগার পুনরায় পূর্ণ হয়।

এই দানক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকে নদীসঙ্গমে প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি স্নান করিয়া দেহত্যাগ করে। এতদ্দেশ-বাসীরা বিবেচনা করে যে যাহারা স্বর্গে জন্মলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা উপবাস করিয়া যেন এই স্থানে নিমজ্জনে দেহত্যাগ করে। তাহাদের মতে এই পবিত্র জলে স্নান করিলে সকল পাপ ধৌত ও বিনষ্ট হয়। এই জন্য নানাদিক হইতে এবং দূর-দেশ হইতে যাত্রিগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রাম করে। সাত দিবস উপবাসী থাকিয়া তাহারা দেহত্যাগ করে। এমন কি হনুমান ও পার্ব্বতীয় হরিণগুলি পর্য্যন্ত নদীতীরে সমবেত হইয়া কেহ কেহ স্নান করিয়া প্রস্থান করে, কেহ কেহ উপবাস করিয়া দেহত্যাগ করে।

শিলাদিত্যরাজ যখন দানাদি করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী হনুমান বৃক্ষতলে বাস করিত। এই হনুমানও গোপনে উপবাস করিয়া কয়েক দিবস পরে ঐ কারণে দেহত্যাগ করিল।

যে সকল অবিশ্বাসিগণ তপশ্চারণ করে, তাহারা নদীর মধ্যস্থলে একটী উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালীন তাহারা এই স্তম্ভে আরোহণ করিয়া, আশ্চর্য্যরূপে এক হস্ত ও এক পদদ্বারা এই স্তম্ভ ধারণ করে; এইপ্রকার অবস্থায় তাহারা সূর্য্যের অভিমুখে চাহিয়া থাকে এবং সূর্য্যের গতির প্রতি লক্ষ্য করে। সন্ধ্যা হইয়া গেলে, তাহারা স্তম্ভ হইতে অবতরণ করে। অনেকগুলি সন্ন্যাসী এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে তাহারা জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইতে আশা করে এবং অনেকে বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ তপশ্চারণ করিয়া থাকে।

এই দেশ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যাইয়া আমরা হিংস্র পশু ও বন্য হস্তীপূর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করি। ইহারা বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া পর্য্যটকগণকে নির্য্যাতন করে এবং ঐ জন্য একসঙ্গে অনেক পর্য্যটক না হইলে এস্থানে ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য।

প্রায় ৫০০ লি যাইয়া আমরা কৌশম্বী দেশে পৌঁছি।

কৌশম্বী

এই দেশ প্রায় ৬০০০ লি এবং রাজধানী ৩০ লি। উর্ব্বরা শক্তির জন্য এতদ্দেশীয় ভূমি প্রসিদ্ধ। দেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও ইক্ষুদণ্ড পাওয়া যায়। জলবায়ু অত্যন্ত উষ্ণ; অধিবাসীরা কঠোর প্রকৃতির ও নির্দ্দয়। ইহারা বিদ্যার্চ্চনা করে এবং ধার্ম্মিক। জনশূন্য দশটী সঙ্ঘারাম আছে; ইহাদের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখা যায়। ৩০০ শত যতি বাস করেন—ইহারা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। ৫০টী দেব-মন্দির আছে এবং অসংখ্য অবিশ্বাসী এই দেশে বাস করে।

নগরাভ্যন্তরে প্রাচীন প্রাসাদে ৬০ ফুট উচ্চ বৃহৎ বিহারে চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে; এই বুদ্ধ মূর্ত্তির ঊর্দ্ধে প্রস্তরের চাঁদোয়া আছে। রাজা উদ্যান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐশ্বরিক শক্তি বলে ইহা হইতে এক দৈব আলোক নির্গত হইয়া মধ্যে মধ্যে দীপ্তিমান হয়। নানা দেশীয় নরপতিগণ এই মূর্ত্তি স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহারা ইহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া ইহাই প্রকৃত উদ্যানরাজনির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করেন।

তথাগতের শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তখন

তাঁহার আত্মার হিতার্থে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়া, তিন মাস অনুপস্থিত ছিলেন। উদ্যানরাজ স্নেহ বশতঃ তথাগতের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি মুদ্গাল্য নারায়ণকে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিবলে কোন কারিকরকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া বুদ্ধের শরীর চিহ্ন লক্ষ্য করিবার জন্য এবং তাঁহার চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যখন তথাগত স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন ঐ চন্দনমূর্ত্তি উত্থিত হইয়া পৃথিবীপতিকে প্রণাম করিল। পৃথিবীপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভবিষ্যতে অবিশ্বাসীদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং ধর্ম্মপথে চালিত করাই তোমার কার্য্য রহিল।"

বিহারের একশত পদ দক্ষিণে পূর্ব্বতন চারি জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই তথাগত কর্ত্তৃক ব্যবহৃত একটী কূপ ও স্নানাগার। কূপে এখনও জল আছে কিন্তু স্নানাগারটী বিনষ্ট হইয়াছে।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে, গোশীর নামক অভিজাতের প্রাচীন বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখা যায়। মধ্যস্থলে বুদ্ধের বিহার এবং একটী স্তূপে বুদ্ধের কেশ ও নখ চিহ্ন আছে। তথাগতের স্নানাগারের ভগ্নাবশেষও দেখা যায়।

নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে, একটী প্রাচীন সঙ্ঘারাম আছে। এই স্থানে পূর্ব্বকালে গোশীরের উদ্যান ছিল। অশোকরাজ কর্ত্তৃক দুই শত ফুট উচ্চ একটী স্তূপ এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথাগত এই স্থানে কয়েক বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। স্তূপের সন্নিকটেই পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন আছে। এই স্থানে অন্য একটী স্তূপে বুদ্ধের কেশ ও নখের চিহ্ন আছে।

সঙ্ঘারামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দ্বিতল প্রাসাদের উপরিস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত কক্ষে বসুবন্ধু বোধিসত্ব বাস করিতেন। এই কক্ষে তিনি হীনযানমতাবলম্বীদিগকে পরাস্ত ও অবিশ্বাসীবৃন্দকে হতবুদ্ধি করিবার জন্য বিদ্যামাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের পূর্ব্বে, আম্রোদ্যানে প্রাচীন প্রাচীরের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; এই স্থানে অসঙ্গ বোধিসত্ব হিনহিয়াং সিং কিও শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

নগরের ৮।৯ লি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিষাক্ত সর্পের প্রস্তরনির্ম্মিত বাসগৃহ আছে। তথাগত এই সর্পকে দমন করিয়া এই স্থানে নিজ ছায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত, তত্রাপি এই ছায়ার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। নিকটেই অশোকনির্ম্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ। নিকটে তথাগতের ইতস্ততঃ ভ্রমণের চিহ্ন আছে এবং অন্য একটী স্তূপে তথাগতের কেশ ও নখ রক্ষিত আছে। যে সকল শিষ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহারা এই স্থানে প্রার্থনা করিয়া আরোগ্য লাভ করে।

শাক্যমুনির ধর্ম্ম লোপ পাইয়া এই শতাব্দী হইতে ইহার পুনরুত্থান হইবে। এই জন্য উচ্চ নীচ যাহারা এই দেশে আগমন করেন, সকলেই প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়েন। কেহ কেহ ক্রন্দনও করেন।

সর্পাবাসের উত্তর পূর্ব্ব দিকে আমরা ১০০ শত লি যাইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া কিয়াপোলো পৌঁছি। এই নগরের পরিধি প্রায় দশ লি; অধিবাসীরা ধনী এবং সুখী। নগরের নিকটেই একটী প্রাচীন সঙ্ঘারাম; ইহার ভিত্তিমূল অবশিষ্ট আছে। এই স্থানে ধর্ম্মপথ বোধিসত্ব অবিশ্বাসিগণকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই দেশের পূর্ব্বতন একজন রাজা বিধর্ম্মীগণের ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন এবং অবিশ্বাসীদিগের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। একদিন তিনি অবিশ্বাসীগণের মধ্য হইতে একজন শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন। তিনি বত্রিশ সহস্র শব্দ পূর্ণ সহস্র শ্লোকের এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি বুদ্ধদেবের মত খণ্ডন করিয়া, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজা, বুদ্ধ যতিগণের এক সভা আহূত করিয়া

ঐ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন যে, অবিশ্বাসীবৃন্দ জয়লাভ করিলে তিনি বুদ্ধধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিবেন কিন্তু পরাজিত করিতে না পারিলে অবিশ্বাসী তার্কিকের জিহ্বা কর্ত্তন করিতে হইবে।" এই সময়ে সমবেত যতিগণ, পরাজয়ের আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রণার জন্য একত্রিত হইলেন এবং বলিলেন "জ্ঞান সূর্য্য অস্তমিত হওয়াতে, ধর্ম্মের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। রাজা অবিশ্বাসীদের প্রতি পক্ষপাতী; এক্ষেত্রে আমরা কিরূপে জয়লাভ করিতে পারি? বস্তুতঃ আমরা—ঘোর সমস্যায় পতিত। কি করিয়া এইক্ষণ উদ্ধার পাইতে পারি?"

ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব বয়সে নবীন হইয়াও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে তাহার চরিত্রের সুযশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন এবং উৎসাহের সহিত সমবেত যতিগণকে নিম্নোক্তভাবে অভিভাষণ করিলেন "যদিও আমি অজ্ঞ, তত্রাপি আমি কয়েকটা কথা বলিতে চাই। প্রকৃতই আমি রাজার আদেশ এইক্ষণই প্রতিপালন করিব। যদি তর্ক দ্বারা জয়লাভ করিতে পারি, তবে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে; কিন্তু যদি আমি তর্কে পরাভূত হই, তবে লোকে আমার নবীন বয়সের হেতু পরাভূত হইয়াছি, এইরূপ বলিবে। উভয় প্রকারেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে এবং ধর্ম্মরক্ষা হইবে। সমবেত সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাজাদেশ মান্য করিবার জন্য তাঁহাকেই নির্ব্বাচন করিলেন। পরক্ষণেই তিনি বেদী আরোহণ করিলেন।

তৎপর অবিশ্বাসী প্রচারকমহাশয় তাঁহার বিপক্ষবাদীর ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। অবশেষে সকল প্রকারে নিজ বক্তব্য শেষ করিয়া অপর পক্ষের বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব প্রতিবন্দীর কথা শুনিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন "আমি জয়লাভ করিয়াছি। আমি দেখাইব যে [illegible] তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বর্ণনাকালে বিশৃঙ্খলা করিয়াছেন।" প্রতিবাদী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "মহাশয়! উচ্চাভিলাষী হইবেন না। যদি আমাকে পরাস্ত করিতে পারেন, তবে অবশ্যই আপনি জয়লাভ করিবেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার বক্তব্য প্রণিধান করিতে চেষ্টা করুন।" তখন ধর্ম্মপাল ধীরস্বরে প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করিলেন।

বিধর্ম্মী, ধর্ম্মপালের বক্তব্য শ্রুত হইয়া নিজ জিহ্বাকর্ত্তনে উদ্যত হইল। কিন্তু ধর্ম্মপাল বলিলেন যে "নিজ জিহ্বা কর্ত্তন করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। মত পরিবর্ত্তন করিলেই প্রকৃত অনুতাপ হইবে।" তৎক্ষণাৎ সেই অবিশ্বাসীর জন্য তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন এবং অবিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন। রাজাও এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্মান করিতে লাগিলেন।

নিকটেই রাজা অশোকনির্ম্মিত স্তূপ; ইহার প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে তথাপি ইহা এইক্ষণেও প্রায় দুইশত ফুট উচ্চ। এইস্থানে বুদ্ধদেব ছয়মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। নিকটেই তাঁহার ভ্রমণের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যস্তূপে তাঁহার কেশ ও নখ রক্ষিত হইয়াছে।

এইস্থান হইতে উত্তর দিকে ১৭০ কি ১৮০ লি যাইয়া আমরা বিশাখা দেশে পৌছি।

বিশাখা।

এই রাজ্য ৪০০০ লি এবং রাজধানীর পরিধি ১৬ লি। দেশে প্রচুর পরিমাণে শাকশবজী পাওয়া যায় এবং ফুলফলও যথেষ্ট। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীরা সৎ। ইহারা বিদ্যাভ্যাসে অনুরক্ত এবং অবিরত ধর্ম্মাচরণ করে। বিশটী সঙ্ঘারামে প্রায় তিন সহস্র যতি বাস করেন; ইহারা হীনযান মতাবলম্বী সম্মতি-সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে পঞ্চাশটী দেবমন্দির ও বহুসংখ্যক বিধর্ম্মী আছে।

রাজপথের বামদিকে ও নগরের দক্ষিণে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারাম আছে। এই স্থানে অর্হৎ দেবশ্রম বিজ্ঞানকশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে তিনি আমিত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিয়াছিলেন। ইহাতে

অনেক [illegible] হয়। এই স্থানে ধর্ম্মপাল বোধিসত্ব সাত দিবসে হীনযানমতাবলম্বী একশত পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘারামের নিকটে রাজা অশোকনির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ। এইস্থানে পুরাকালে তথাগত [illegible] বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও মনুষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। স্তূপের সন্নিকটে ৬।৭ ফুট উচ্চ একটী আশ্চর্য্য বৃক্ষ। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা একই ভাবে আছে, ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই। পুরাকালে তথাগত দন্তধাবন করিয়া ক্ষুদ্র শাখাদণ্ড এই স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। অবিশ্বাসী ও ব্রাহ্মণগণ অনেক সময় এই বৃক্ষ ছেদন করিয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি পায়।

নিকটে, পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে। কেশ ও নখ রক্ষণের জন্যও স্তূপ আছে। এই স্থানে অনেক মন্দির আছে। উত্তর পূর্ব্বদিকে ৫০০ শত লি যাইয়া আমরা শ্রাবস্তি পৌঁছি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুজাতি।

বহু প্রাচীনকাল হইতে আফ্রিকার দাক্ষিণাংশে জুলু নামক জাতিরা বাস করে; এই জন্য ইংরাজেরা ঐ স্থানের নাম দিয়াছেন জুলুল্যাণ্ড। ইহার স্থান পরিমাণ প্রায় ৮৯০০ বর্গ মাইল। উত্তরে সাজীল্যাণ্ড ও টোঙ্গাল্যাণ্ড, পূর্ব্বে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে টুগেলা নদী পশ্চিমে ড্রাকেন্সবার্গ নামক পর্ব্বতমালা। বর্ত্তমান সময়ে ইহা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধিকারে নেটাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শাসিত হইতেছে। লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। প্রায় সাড়ে ছয় শত ইংরাজ এখানে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেছেন।

জুলুজাতি বাণ্টু নামক হাব্‌সি সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ। নেটাল, কেপকলোনি, দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকা, মোজাম্বিক প্রভৃতি প্রদেশের সমুদ্রতীরেই প্রায় ইহারা বাস করে। জাঞ্জিবর, মোজাম্বিক প্রভৃতি স্থানে মূর্ত্তিপূজার বহু প্রচলন দেখিয়া মুসলমানগণ ইহাদিগকে কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মী বলিতেন, সেই হইতে ইহাদের আর এক নাম জুলুকাফের হইয়া পড়িয়াছে।

জুলুজাতির আদিম বাসস্থান কোথায় এবং কি প্রকারে তাহারা উক্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার কোনও প্রামাণিক পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকের অনুমান অন্যান্য হাবসী জাতির আগমনের পরে ইহারা এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। ইংরেজ যে সময়ে পূর্ব্ব আফ্রিকায় আগমন করেন বোধ হয় তাহার দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে জুলুজাতি উক্ত দেশে আগমন করে। কিন্তু ইহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জুলুজাতি বাণ্টু শ্রেণীর অন্যান্য জাতির অপেক্ষা সুগঠিত ও সুন্দর। ইহাদের বর্ণও উহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। পূর্ব্বে ইহারা মেষাদি পশু চর্ম্মে আপনাদের পরিধেয় প্রস্তুত করিত কিন্তু এখন তাহারা সূত্র-নির্ম্মিত

স্ত্র ব্যবহার করে। অন্যান্য সভ্য জাতির অপেক্ষা ইহাদের বস্ত্রের ব্যবহার অনেক কম। কেবল শীত ও বর্ষাকালে ইহারা একপ্রকার লম্বা জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের কখনও কখনও বক্ষোবস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষদের বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা অনাবৃতই থাকে। পুরুষদের ব্যবহৃত জামার বর্ণ একরূপ হয় না।

কতকগুলি জুলু স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা।

প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক বর্ণের ও বিভিন্ন প্রকারের জামা পরিধান করিয়া থাকে। কেহ কেহ জামায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচখণ্ড সংলগ্ন করিয়া দেয়। কেহ কেহ বা নানাপ্রকারের বোতামে অথবা কড়িদ্বারা আপনাদের জামা সাজায়।

ইহাদের কেশবিন্যাস অতি বিচিত্র রকমের পুরুষদের সমস্ত শিরোদেশ মুণ্ডিত করিয়া

মধ্যস্থলে এক গুচ্ছ কেশ রাখিয়া দেয়। ইহারা ৪।৫ ইঞ্চ ব্যাসের এক প্রকার টুপি পরিধান করিয়া উক্ত কেশগুচ্ছকে টুপির ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। ঐ টুপিতে কখনও কখনও তাহারা পাখীর পালকও লাগায়। সময়ে সময়ে তাহারা তামাকের ডিবা, ছোট ছোট সূচ প্রভৃতি ঐ টুপির ভিতর রাখিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের

এক জুলু পরিবার।

কেশ চর্ব্বি অথবা অন্য কোন আটা দ্বারা পাক দিয়া তাহাতে একপ্রকার লম্বা বেণী প্রস্তুত করে। ঐ বেণী অনেক সময়ে উপর দিকে উঠিয়াই থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোক ছোট ছোট বেণী প্রস্তুত করিয়া ঝুলাইয়া রাখে। দাঁতে মিশি দেওয়া এবং দাঁতের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া তাহাতে কোনপ্রকার ধাতুখণ্ড সংলগ্ন করা তাহাদের

একটা প্রধান সখ। অন্যান্য অসভ্য জাতীয়ের মত জুলুরাও আপনাদের দেহ চিত্রিত করে। কিন্তু এই প্রথা অনেকটা তাহাদের ধর্ম্মভাব মিশ্রিত। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-প্রমুখ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ যজ্ঞোপবীত ও কর্ণবেধপ্রথা প্রবর্ত্তিত আছে উহারাও তদ্রূপ অবশ্যকরণীয় ভাবিয়া দেহ চিত্রিত করিয়া থাকে। এই সংস্কারের সময় শিশুদের

জুলু যাদুকরদিগের নৃত্য

ই জল মিশ্রিত রক্তে ধৌত করিয়া একবার শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা তাহাতে লেপন করে। ঐরূপে শিশুদের সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতমৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হইলে তাহাদিগকে ধূলিরাশির উপরে নাচিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ধূলি সংস্পর্শে ঐ শ্বেতমৃত্তিকা শুকাইয়া গেলে পুনরায় ঐরূপ শ্বেতমৃত্তিকা মাখান হইয়া থাকে। তখন ঐ বালককে যেন রজতবপুঃ

মহাদেবের মত দেখায়। অনেক যুবতী স্ত্রী কখনও কখনও আপনাদের দেহও ঐরূপ অনুরঞ্জিত করে। গহনা পরিবার জন্য জুলু স্ত্রীলোকেরা নাক কাণ প্রভৃতি বিদ্ধ করে। অনেক স্ত্রীলোক নাসিকাপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া তাহাতে একপ্রকার মোটা নথ পরিধান করিয়া থাকে।

জুলুজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে বাস করে।

এক জুলু যোদ্ধা।

বৃক্ষের যে সকল শাখা অবনত হইয়া প্রায় মাটিতে ঠেকিয়াছে সেই সকল শাখাকে ঝুঁকাইয়া মাটী চাপা দেয়। পরে ঐ শাখা-প্রশাখাসকলের উপরে ঘাস বা অন্য পত্র বিছাইয়া দিয়া তাহারা শীতাতপ নিবারণোপ-যোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। ঐ সকল কুটীরের প্রবেশদ্বার এত ক্ষুদ্র যে হাত ও হাঁটু মাটিতে পাতিয়া শিশুর মত হামাগুড়ি

দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহারা কুটীরের মধ্যে চ্যাটাই অথবা কম্বল বিছাইয়া শয়ন করে। ইহাদের মধ্যে বালিশেরও ব্যবহার আছে। তাহাদের বালিশ একপ্রকার নরম চামড়ায় প্রস্তুত। ইহারা খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি একপ্রকার মোটা কাপড়ে প্রস্তুত ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া রাখে। ঐ ব্যাগের মুখে পিত্তলের তালা দেওয়া

জুলু সর্দার

থাকে প্রত্যেক গৃহে উল্লিখিত দ্রব্য সকল, রন্ধনোপযোগী পাত্রাদি এবং শিকার ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত তীরধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে।

বনের ফল দুগ্ধ মাংস মধু প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে ইহারা মৎস্য রুটি প্রভৃতিও ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা সকল খাদ্য অপেক্ষা মধু অধিক ভালবাসে।

জুলুকুমারকুমারীর বিবাহ অনেকটা তাহাদের মাতাপিতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পুত্রের পিতা কন্যার পিতার নিকটে একটা ষাঁড় পাঠাইয়া দেয়। যদি কন্যার পিতা তাহা গ্রহণ করে তবে বুঝিতে হইবে বিবাহের সম্বন্ধটা গৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন পরে বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত হইলে পুত্রের পিতা কন্যার পিতার নিকটে আবার আর একটা ষাঁড় পাঠাইয়া দেয়। তখন বিবাহের দিন স্থির হইয়া থাকে। বিবাহের সময় কন্যা বরের নিকট হইতে অনেক উপহার প্রাপ্ত হয়। ইহাদের সমাজে বহুবিবাহ নিন্দনীয় নয়। কিন্তু এইরূপ বহুবিবাহ অনেকটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যে ধনী সে-ই একের অধিক পত্নীগ্রহণে সমর্থ হয়। ইহাদের সমাজে স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর পক্ষেও স্বামি-পরিত্যাগ দূষণীয় নহে। কিন্তু এইরূপ পরিত্যাগের সময়ে স্ত্রী বা স্বামী অপরের দোষ প্রদর্শনে বাধ্য!

জুলুরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের পূজা করে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে মৃতব্যক্তি-গণের আত্মা ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় অন্যত্র অবস্থিতি করিতেছে। আরাধনা দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে সেই স্থানে আনা যাইতে পারে। তন্ত্রমন্ত্রের উপর জুলুদের ঘোর বিশ্বাস। কাহারও কোন শারীরিক কষ্ট হইলে সে মনে করে তাহার পূর্ব্বপুরুষের আত্মার কষ্ট হইতেছে বলিয়া তাহাকেও কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। এই জন্য ইহারা প্রেতের উদ্দেশে বলি প্রদান করে। জুলু চিকিৎসকেরাও প্রেতদিগের সন্তুষ্টির জন্য উপায় অবলম্বন করিয়া রোগ দূরীকরণের প্রয়াস পায়। তাহারা বলে মন্ত্রপ্রভাবে বৃষ্টি আনিতে বা নদীর বন্যা বন্ধ করিতে পারা যায়। ডাইন ও ওঝাগণকে (চিকিৎসক) ইহারা অতিশয় ভয় করে।

জুলুজাতি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের অন্য কোন উপদেশ ইহারা তাদৃশ রক্ষা করে না। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। যাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের সামাজিক নিয়ম স্বজাতীয়ের অপেক্ষা ক্রমশঃই পৃথক হইয়া পড়িতেছে।

জুলুজাতি মৃতদেহ দাহ করে না। প্রায়ই প্রোথিত করে। ওঝারা আপনাদের তান্ত্রিক কার্য্য সাধনোদ্দেশে ভূপ্রোথিত মৃতদেহ উৎখাত করিয়া থাকে। এইজন্য অপেক্ষাকৃত ধনী জুলুরা মৃত আত্মীয়গণের সমাধির নিকটে বর্ষাধিককাল পাহারা দেয়।

পশুশিকার, কৃষিকর্ম্ম এবং পশুপালন দ্বারাই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা লৌহ পিত্তল প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া তদ্দ্বারা তাহাদের কার্য্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিয়া লয়।

জুলুজাতি অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ। ইহাদের অধিকাংশ সৈন্যই পদাতিক। তীর ভল্ল ঢাল তলোয়ার গদা প্রভৃতিই ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র। ইহারা কখনও কখনও নিজের দেশ ছাড়িয়া অন্যের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করে। প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বে ইহারা রোডেশিয়া, জাম্বেজী, ন্যাসাল্যাণ্ড, প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। কতকগুলি জুলু সরদার আফ্রিকাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। পাঠকেরা বোধ হয় জুলু

সবদাব ডেনির নাম অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ধৃত হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

জুলুজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। অসভ্যজাতি মাত্রেই প্রায় মনে করে "জোর যার মূলুক তার"; কিন্তু জুলুদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস নাই। ইহাদের রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ কোন রাজার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রই রাজা হন। জুলুদিগের ধর্ম্মাধিকরণ বিচারক ও আইনব্যবসায়ীও আছে। আইনজ্ঞ ব্যক্তির কথা শুনিয়া বিচারক বিচার করেন। আইন স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ নাই। ইহাদিগের আইনজ্ঞ সম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় আইনেরই ব্যবসায় করিয়া থাকে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ আইনই ইহারা জানে। জুলু বিচারালয়ে সাধারণের আবেদন নিবেদনের সমান অধিকার আছে।

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাতৃঋণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাতৃসান্নিধ্যে।

দৌড়াইলে পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, এই ভয়ে জ্যাক দৌড়াইল না, ধীরে ধীরে চলিল।

কিন্তু গতি ধীর হইলেও, সামান্য কিছুতে বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে যাহাতে ছুটিয়া পলাইতে পারে, সে বিষয়ে সে সতর্ক রহিল। খানিকটা পথ এইরূপে চলিয়া তাহার ইচ্ছা হইল, একবার সে ছুট দেয়—ধীরে চলিবার ধৈর্য্য আর থাকিতেছিল না। উদ্বেগে অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছিল। তথাপি সে ছুটিল না। গৃহের দিকে সে চলিয়াছিল।

সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে? শূন্য—শূন্য গৃহ! মা নাই! তাহা হইলে সে কি করিবে? মার সংবাদ তবে কোথায় মিলিবে? কেমন করিয়া মিলিবে?

নাই মিলুক, জিমনেসে সে ফিরিবে না! ফিরিবার উপায় সে রাখে নাই! সেখানে ফিরিবার কথা, তাই মুহূর্ত্তের জন্যও জ্যাকের মনে উদয় হইল না। যদিও বা হইত, মাতুর পৃষ্ঠে কশার আঘাত, মাতুর কাতর ক্রন্দন, প্রচণ্ড শাস্তি—সে সকল মনে পড়িতেই তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

ঐ যে বাড়ী—আলো জ্বলিতেছে! মা তবে আছে! বাতায়নের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া বাহিরে পথে পড়িয়াছিল। দেখিয়া জ্যাকের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা না থাকিলে গৃহের প্রতি কক্ষে এত আলো জ্বলিবে কেন? মা তবে আছে! যদি এখনই কেহ বলে বাহির হইয়া যাও? জ্যাক দ্রুতগতিতে বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল।

সারা বাটিতে কি বিপুল জনতা! চেয়ার টেবিল সোফা কৌচ—ছবি, আলনা প্রভৃতি হলঘরে বিক্ষিপ্ত স্তূপাকার করিয়া রাখা হই-

য়াছে। নানালোকে নাড়া-চাড়া করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া এ কি করিতেছে! ভিড় ঠেলিয়া জ্যাক ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করিল। মাতার শয্যা, খাট এমন অবস্থায় কেন? তাহার নিজের শয্যাটি মাথায় লইয়া ও কে বাহির হইয়া যায়?

জ্যাক তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার বিছানা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এ আমার বিছানা।"

লোকটা সবিস্ময়ে জ্যাকের মুখের পানে চাহিল। এমন সময় কঁস্তাঁ আসিয়া কহিল, "এ কি, জ্যাক যে! তুমি কোথা থেকে আসছ? স্কুল থেকে কার সঙ্গে এলে?"

"মা কৈ?" নম্র স্বরে জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল, "মা?" তাহার কণ্ঠস্বরে একটা ভয়ের ছায়া প্রচ্ছন্ন ছিল। উত্তরে সে কি শুনিবে?

"মা ত এখানে নেই, জ্যাক! আহা, জান না বুঝি তুমি?"

"কোথায় মা? এ কি সব কচ্ছে? কারা এরা?"

"দিনের বেলা নিলাম হয়ে গেছে—যারা জিনিষপত্র নিয়ে যেতে পারেনি, তারা নিয়ে যাচ্ছে। তুমি ভিতরে এস, রান্নাঘরে এস, সেখানে কথা কব, চল।"

রান্নাঘরের পথে পুরাতন ভৃত্যের দল জ্যাককে ঘিরিয়া ফেলিল। পাছে ইহারা তাহাকে ধরিয়া জিমনেসে রাখিয়া আসে, এই ভয়ে জ্যাক কাহাকেও বলিল না যে, সেখান হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে! সে বলিল, ছুটি পাইয়া একবার মাকে শুধু দেখিবার জন্য সে বাড়ী আসিয়াছে।

কঁস্তাঁ কহিল, "মা ত এখানে নেই—কোথায় গেছে, তা আমি"—কথাটা বাধিয়া গেল। কঁস্তা আবার বলিল, "আহা, এমন ছেলে ফেলে গেল, এর কাছে লুকোতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে—না, না—জ্যাক আমি জানি মা কোথায়—বলছি। পারিস পরে এতিঁয়ো গ্রাম—মা সেখানে।"

"সে কি অনেক দূরে, কঁস্তাঁ?"

"এখানে থেকে বারো ক্রোশ।"

এতিঁয়ো—এতিঁয়ো—এতিঁয়ো! জ্যাক মনে মনে বারবার ঐ নাম উচ্চারণ করিল। এতিঁয়ো! নামটা সে মুখস্থ করিয়া ফেলিল। কঁস্তাঁ কহিল, "ছোট খাটো কতকগুলো বাগান আছে—তারি কাছে ছোট একখানি সুন্দর বাড়ী, বাড়ীর নাম, আরাম-কুঞ্জ। সেখানে মা আছে।"

একান্ত আগ্রহে, জ্যাক কথাগুলি শুনিল। এখান হইতে যে পথ বাসি গিয়াছে—সেই পথ ধরিয়া চলিয়া ক্লারেন্তঁ, ভিঁভে ভর্জ্জ পার হইয়া লাঃনের পথ ছাড়িয়া কর্বেলের পথে পড়িতে হইবে। তারপর সেই রাস্তা ধরিয়া সিন্ নদীর ধার দিয়া গেলে সেনারের জঙ্গল, সেটা পার হইলেই এতিঁয়ো!

দূরত্বের কথা শুনিয়া জ্যাকের ভয় হইল না। সারা পথ সে হাঁটিয়া যাইবে। আজ রাত্রেই চলিতে আরম্ভ করিবে! আজ সারা রাত্রি, কাল সারা দিন চলিলেও কি এতিঁয়ো পৌঁছান যাইবে না? পথে কত লোক চলিতেছে—অনাথ আতুর ভিখারী যাহারা—তাহাদিগের ত গাড়ী চড়িবার পয়সা মিলে না, তাহারা যে পদব্রজেই দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে জ্যাক কেন হাঁটিয়া এতিঁয়ো

পৌঁছিতে পারিবে না? যেমন করিয়া হউক, সে এ্যাঁডিঝো যাইবে, মাকে দেখিবে! কিসের ভয়?

জ্যাক বলিল, "তবে আমি স্কুলে চললুম, কর্ত্তা।" আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিল—ভাবিতেছিল, একবার জিজ্ঞাসা করে, সেই আর্জেন্ট ও কি এ্যাঁডিঝোতে আছে?—সেই শত্রুটা কি মাতা-পুত্রে এমন ব্যবধান ঘটাইল? কিন্তু কথাটা জ্যাকের মুখে বাধিয়া গেল—বাহির হইল না!

"তবে, এস জ্যাক,—রাত হয়ে যাচ্ছে! সঙ্গে কেউ যাক্, না হয়!"

"না, না, কোন দরকার নেই, কর্ত্তা।" বালকের মনে একটা দুর্জ্জয় অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল! মা—যাহার জন্য জ্যাকের মনে এতটুকু শান্তি নাই, যাহাকে দেখিবার জন্য জ্যাকের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে—যে মার সংবাদ একদণ্ড না পাইলে জ্যাকের বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না—সেই মা—তাহাকে ভুলিয়া, তাহার কোন সংবাদ না লইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। জ্যাক ভাবিল, একবার মার কাছে গিয়া মার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারে ত, মার এই অবহেলা-অনাদরের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লওয়া হয়, তাহারও অশান্ত প্রাণখানা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া বাঁচে! আঃ, কি সে সুগভীর তৃপ্তি! কর্ত্তা ও ভৃত্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জ্যাক পথে বাহির হইল।

তখন চারিধার কুয়াশায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে পথের আলোকগুলা ঊষার আকাশে দীপ্তিহীন নক্ষত্রের মত মিটমিট করিতেছিল। চলিবার সময় মাঝে মাঝে অজানিত আশঙ্কায় জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল! কতদূর—তাহাকে যাইতে হইবে! কত পথ তাহাকে চলিতে হইবে! উপায় নাই, চলিতেই হইবে! না হইলে সেই দুর্দ্দান্ত মরোভার হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না! প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, যদি ধরা পড়ে! পথে কনষ্টেবলের লণ্ঠন দেখিলেই জ্যাকের বুকটা ধ্বক করিয়া উঠে, বুঝি সন্ধান পাইয়া সে তাহাকেই ধরিতে আসিতেছে! দূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে জ্যাক কাঁপিয়া উঠে—মনে হয়, কে যেন তাহারই সন্ধান বলিয়া দিতেছে। জ্যাক আকাশের দিকে চাহিল, মনে হইল, যেন সারা আকাশ নিস্তব্ধভাবে তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছে! শুধু দেখিতেছে, কোথায় সে যায়! যেমনই সে বিশ্রাম করিতে বসিবে, অমনই তাহাকে ধরিয়া জিমনেসে চালান দিবে! নিস্তব্ধ বাড়ীগুলা, নিস্তব্ধ আকাশ,—নিস্তব্ধ প্রকৃতি সকলে মিলিয়া তাহারই বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে! ঐ না কে বলে, "ধর, ধর, জ্যাক যে পলায়!"

সারারাত্রি ধরিয়া জ্যাক চলিল। তাহার পর যখন প্রভাত হইল, তখন তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তবু বিরাম নাই, সে চলিয়াছে! এ দীর্ঘ পথে একটা যন্ত্রের মত শুধু চলিয়াছে! উদাস দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ যেন প্রাণহীন, মনহীন একটা পুতুলকে কে দম দিয়া পথে ছাড়িয়া দিয়াছে!

পথে কত লোক চলিয়াছে। কর্ম্ম-

চক্রের ঘর্ঘররবে চারিদিক মুখরিত। সে শব্দে সকলেই কি এক গভীর ব্যাকুলতার সহিত কিসের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে জ্যাক যে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! জ্যাকের শুষ্ক মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিবার কাহারও অবসর ছিল না!

ক্রমে রৌদ্র পড়িয়া আসিল। নদীর ধার দিয়া পথ—জ্যাক সেই পথে চলিল। অপরাহ্নের বায়ু সূর্য্যের শেষ রশ্মিকণাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। দিনের গান থামিয়া আসিতেছিল। কর্ম্মক্লান্ত ধরিত্রীর তপ্ত নিশ্বাস নদীর জলে মিশাইয়া যাইতেছিল। প্রকৃতি মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল। আলোকের রেখার উপর ক্রমে ধীরে ধীরে কে একটা সূক্ষ্ম কালো পর্দ্দা বিছাইয়া দিল। চারিদিকে আঁধার নামিল!

সারারাত্রি, সারাদিন জ্যাক পথ চলিয়াছে। এখন পা দুইখানা যেন আর চলিতে চাহে না! জ্যাকের মনে হইল, আর না, এইবার ভূমিতে দেহভার লুটাইয়া দিই, জন্মের মত চলার বিরাম হইয়া যাক! কিন্তু না, মা—মা—কোথায় মা!

বিশ্রাম করিতে বসিলে চলিবে না—বিলম্ব নয়—যেমন করিয়া হউক, মার কাছে যাইতেই হইবে। মৃত্যু যদি হয় ত, এখন নয়,—ওগো জীবন, মার কোলে দুর্ভাগ্য বালককে পৌঁছাইয়া দাও, তার পর ছাড়িয়া যাইও! হে বন্ধু! আর কিছুক্ষণ সহচর থাক!

তখন গভীর রাত্রি। গ্রামের পথে কচিৎ আলো দেখা যায়! অন্ধকারে চারিধার ডুবিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য পথে আর কেহ নাই, শুধু সে চলিয়াছে। একবার সে বসিল! বসিয়া আকাশের দিকে চাহিল—জিভ শুখাইয়া আসিতেছিল—পা দুইটা বিষম ভার বোধ হইতেছিল। এ ভার টানিয়া লইয়া যাইবার শক্তি আর তাহার ছিল না! এমন সময় সহসা সে দেখিল, দুইটি আলোক-রশ্মি তাহারই দিকে আসিতেছে!

আলোক-রশ্মি ক্রমে সম্মুখে আসিল। জ্যাক ডাকিল, "মশায়!"

তাহার জিভ জড়াইয়া গিয়াছিল। প্রথমটা স্বর বাহির হইল না। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জ্যাক ডাকিল, "মশায়, গাড়ী থামান।"

"কে তুমি?"

"আমায় গাড়িতে নিন, আমি চলতে পাচ্ছি না, সারা রাত হেঁটে আর পাচ্ছিনা—"

"কোথায় যাবে, তুমি?"

"সেনারে!"

"বেশ এস, আমার সঙ্গে—আমি এতিঁয়োতেই যাচ্চি!"

গাড়িতে উঠিয়া জ্যাক বলিল, সে স্কুলের বোর্ডিংএ থাকে। সেনারে মার অসুখ হইয়াছে, শুনিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষায় থাকিতে তাহার ধৈর্য্য রহিল না, কাজেই হাঁটিয়া চলিয়াছে! মা ছাড়া জগতে তাহার আর কেহ নাই!

লোকটি কহিল, "আমার পথেই তোমার বাড়ী পড়বে। আগে সেনার, তার পর জঙ্গল পার হলে তবে এতিঁয়ো। আমি আরো দূরে যাব। তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব।"

জ্যাকের মনে অনুতাপ হইল। কেন সে মিথ্যা বলিল? সত্য করিয়া সে কেন বলিল না, যে সেও এডিংয়োতে যাইবে! সেনারে তাহাকে নামাইয়া দিলে আবার এ পথটুকু হাঁটিয়া যাওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে? সে শক্তি নাই! হায়, কেন, এ দুর্ব্বুদ্ধি তাহার হইল? এখন কি সংশোধন করিয়া লইয়া সত্য কথাটা বলিবে? না! তাহা হইলে ইঁহার মনে সন্দেহ হইবে—যদি ইনি রাগ করিয়া নামাইয়া দিয়া যান! সত্য বলিবার সাহস—আজ জ্যাকের নাই! কি দুর্ভাগ্য, সে!

গাড়ী চলিতেছিল। জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সহসা জ্যাক শুনিল, "এই তোমার সেনার—নামো।" জ্যাকের মনে হইল, কে যেন তাহাকে লগুড়াঘাত করিল। কি ভয়ঙ্কর! জ্যাককে নামাইয়া গাড়ী চলিয়া গেল!

জ্যাক অবসন্ন চিত্তে পথের প্রান্তে বসিয়া পড়িল। গাড়ীর আলো ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে মিলাইয়া গেল! তখন শীতল বায়ু বহিতেছিল! সুগভীর ক্লান্তিতে জ্যাকেরও অনুভব-শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রগুলা নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া রহিয়াছে! গাছের পাতা কাঁপাইয়া বায়ু বহিতেছিল—নৈশ প্রকৃতির বিরাট গানে প্রান্তর মুখরিত—জ্যাক ইহার মধ্যে বসিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না!

সহসা ভীষণ শব্দে চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিল! অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে চাহিয়া সে দেখে, একটা সুদীর্ঘ আলোকপুচ্ছধারী রাক্ষস সশব্দে অদূরস্থ বনপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দীপ্ত লোহিত চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল! পরক্ষণে বাঁশীর শব্দ শুনিয়া সে বুঝিল, এ রাক্ষস নহে, অদূরে লৌহ পথ দিয়া একখানা ট্রেণ সবেগে চলিয়া গেল।

কয়টা বাজিয়াছে? কোথায় সে? কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? সে জানে না—ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে। সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যেন মাতুর কবরের উপর মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাতু তাহার শ্রান্ত শিরে হাত বুলাইতেছিল। সে হিমশীতল স্পর্শে তাহার রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল. মাতুর দিকে ফিরিয়া চাহিতেই মনে পড়িল, এ কি, মাতু যে মরিয়া গিয়াছে! এমনই সে কাঁপিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে মাতুর কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় জ্যাকের ভয় হইল। আবার নিদ্রা গেলে যদি স্বপ্নে মাতু দেখা দেয়! মাতুর সে মূর্ত্তি মনে করিতে যে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে!

জ্যাক আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আরও কত পথ চলিলে তবে বনের প্রান্ত মিলিবে! এ কি সুদীর্ঘ যাত্রা—অফুরাণ পথ!

এমন সময় অদূরে একটা কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল। আকাশের পিছনে ঊষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারই ভূষণের হেমচ্ছটা আকাশের কালো পর্দ্দা ভেদ করিয়া ছিটাইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধভাবে ঊষার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কোথায় ঊষা—এস তুমি—তোমার কিরণে জগতের অন্ধকার দূর করিয়া দাও! ক্লান্ত অসহায় বালককে আশা, ও উষ্ণতা দিয়া

জুড়াইয়া দাও তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সে দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল হইয়া রহিয়াছে!

"ইদা জ্যাককে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল।"

সহসা সম্মুখে এতিঁয়োর পথে দুই হাতে আকাশের পর্দ্দা ঠেলিয়া ঊষা আসিয়া জগতে দেখা দিল! প্রথমে সুদীর্ঘ সূক্ষ্ম একটা পীত রশ্মি তুলির মত দেখা দিল। তাহার পর কে যেন সেই রঙ্গিন তুলিটা আকাশের চারিদিকে বুলাইয়া দিল! কুয়াশার আবরণের মধ্য দিয়া সে বিচিত্র বর্ণ ধরণীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল।

সারা প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার স্নিগ্ধকোমল নিশ্বাস ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। ক্রমে পাখীর গানে, চারিধার ভরিয়া উঠিল!

সম্মুখেই জ্যাক দেখে, পরিচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহের একটি বাতায়ন মুক্ত হইতেছে—মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া কাহার মৃদু সঙ্গীতের স্বর ভাসিয়া আসিল। পরিচিত কণ্ঠে পরিচিত গান, এ কে গায়? জ্যাক চাহিয়া দেখিল।

বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া, কে, ও? এ কি স্বপ্ন? জ্যাক দুই হাতে চক্ষু মুছিল, আবার চাহিয়া দেখিল—না এ ত স্বপ্ন নয়!

জ্যাক ডাকিল, "মা!" ক্ষীণ স্বর বাতাসে মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন পার্শ্বে যে রমণী দাঁড়াইয়াছিল, সে বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল—তাহার কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত থামিয়া গেল—সে পথের ধারে চাহিয়া দেখিল। সে রমণী, ইদা।

তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইতেছে। ইদা দেখিল, সূর্য্যের লোহিত আলোকে স্নাত এক বালক বাতায়নের নিম্নে সোপানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া! বালকের মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরে গিয়াছে! ইদার দেহ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল—শিরার মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল—ইদা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "জ্যাক!" তাহার দেহ আপনা হইতে কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ইদা জ্যাকের নিকট ছুটিয়া আসিল। বাটীর সম্মুখস্থ সোপানের নিম্নে জ্যাকের অবসন্ন শরীর ঢলিয়া পড়িতেছিল, ইদা আসিয়া সোপানের নিম্নে বসিয়া জ্যাককে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল—আপনার মাতৃহৃদয়ের সযত্ন-সঞ্চিত স্নেহের তাপে হিম-শীতল মুমূর্ষু পুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। মার বুকে মাথা রাখিয়া জ্যাক গভীর সান্ত্বনায় ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ক্রমশঃ

ছায়ামূর্ত্তি।

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

সম্প্রতি কোন একটা মোকদ্দমায়, কিরূপ ভীষণ বিবিক্ত-বাসের দণ্ডবিধান হইয়াছে, সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। একটা প্রাচীন পান্থশালায়, সায়াহ্ন-সম্মিলন উপলক্ষে কতকগুলি লোক সমবেত হয়। প্রত্যেকেই এক একটা ঘটনার বৃত্তান্ত বলিতেছিল, আর বলিতেছিল, ঘটনাটা সত্যই ঘটিয়াছিল।

তুর-স্যামুএল নামক ৮২ বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ মার্কুইস্, 'চিম্‌নীর' নিকটে আসিয়া চিমনীর উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন। ঈষৎ কম্পিত স্বরে তিনি বলিলেন :

—"আমিও একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা জানি, এমন অদ্ভুত যে, তাতেই যেন আমার সমস্ত জীবনটা রাহুগ্রস্ত হয়ে আছে। ৫৬ বৎসর হ'ল, আমার এই ঘটনাটা হয়, আর এমন একটা মাসও যায় না যখন আমি তার স্বপ্ন দেখি নে। সে ঘটনাটা আমার উপর একটা ভয়ের দাগ, একটা ভয়ের ছাপ রেখে গেছে ;—কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে? হাঁ, দশ মিনিট ধরে এমন একটা ভয় পেয়েছিলুম, যে সেই ভয় এখনও পর্য্যন্ত আমার মনকে দখল করে আছে। কোন একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ শুন্‌লে আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে। সন্ধ্যার ছায়ায় কোন একটা অস্পষ্ট জিনিস দেখ্‌লে, আমি কোথায় পালাব ভেবে পাইনে। আর রাত্রিকে আমি বড়ই ভয় করি।

"আমার এখন যে বয়স হয়েছে এ বয়স না হলে আমি এই ঘটনার কথা কারও কাছে প্রকাশ করতেম না। কিন্তু এখন আমি সমস্তই বল্‌তে পারি। এই ৮২ বৎসর বয়সে কাল্পনিক বিপদে ভয় পাওয়া বোধ হয় তেমন নিন্দার কথা নয়। কিন্তু ঠাকরুণ তোমরা বেশ জেনো, আসল বিপদের সময় এ বুড়া কখনও পিছপাও হয় নি।

"এই ঘটনাটা আমার মনকে এমন ওলট-পালট করে দিয়েছিল, আমার অন্তরে এরূপ গভীর, এরূপ রহস্যময়, এরূপ ভীষণ একটা আতঙ্ক জন্মে দিয়েছিল, যে, এ কথা আমি কখন কারও কাছে বলি নি। এই কথাটা আমার অন্তরের সেই অন্তস্তলে লুকিয়ে রেখে-ছিলুম যেখানে আমাদের কষ্টকর গুপ্ত কথাগুলি, লজ্জাজনক গুপ্ত কথাগুলি আমাদের জীবনের সমস্ত অপ্রকাশ্য দুর্ব্বলতাগুলি লুকান থাকে।

আমি তোমাদের কাছে যেমনটি ঘটেছিল ঠিক্ তাই বল্‌চি ; কেন ঘটেছিল তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করব না। অবশ্যই তার কোন একটা কারণ ছিল ; তবে যদি আমি সেই সময়ে একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়ে থাকি, সে আলাদা কথা। কিন্তু না, আমি পাগল হই নি, আমি তার প্রমাণ দেব। এতে তোমাদের যা মনে কর্‌তে হয় কর'। বৃত্তান্তটা সোজাসুজি এই :—

"১৮২৭ অব্দে জুন মাসে আমি রুঁয়া নগরে দুর্গরক্ষী সৈন্যের মধ্যে ছিলেম।

"একদিন আমি পোস্তা-বাগান মাল-

ঘাটের উপর পায়চালি করচি, এমন সময়ে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল'। মনে হল যেন চিনি, কিন্তু লোকটি কে ঠিক্ স্মরণ হচ্ছিল না। আমি অজ্ঞাতসারে যেন একটু দাঁড়াবার ভঙ্গী করলেম। অপরিচিত লোকটি আমার এই ভঙ্গী লক্ষ্য করে' আমার পানে একবার চেয়ে দেখ্‌লে, তারপর আমার উপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল।

"লোকটি আমার বাল্যবন্ধু, এক সময়ে ওকে খুবই ভাল বাস্‌তেম। পাঁচ বৎসর কাল ওকে আর দেখি নি। মনে হল অর্দ্ধ শতাব্দীর বার্দ্ধক্য তার উপর এসে পড়েছে। চুল সব সাদা হয়ে গেছে। চল্‌বার সময় শরীরটা নুয়ে পড়চে এমনি জরাগ্রস্ত। আমি বিস্মিত হয়েছি বুঝ্‌তে পেরে, তাঁর জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত আমার কাছে বল্লেন। একটা ভীষণ দুর্ঘটনায় তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে।

"তিনি একটি নবযুবতীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, তাকে বিবাহ করেন। এক বৎসরকাল যুবতীর সুখের সীমা ছিল না, প্রাণভরা ভালবাসা দিয়ে যেন তার তৃপ্তি হত না,—তারপর সে হঠাৎ মারা গেল—বোধ হয় হৃদ্‌রোগে। বোধ হয় অতি ভালবাসাই তার মৃত্যুর কারণ।

"যে দিন গোর দেওয়া হল সেই দিনই আমার বন্ধু রুয়ঁার হোটেলে এসে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি একাকী,—বিষণ্ণ ও হতাশভাবে কালযাপন করতে লাগ্‌লেন। শোকানলে তাঁর হৃদয় দিবানিশি দগ্ধ হতে লাগ্‌ল। তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন কথা তাঁর মনে আস্‌ত না।

"—তিনি বল্লেন;—আবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হল, তখন ভাই আমার একটি উপকার করতে হবে; আমার জমিদারীর কুঠীতে গিয়ে আমার ঘরের ডেস্‌কোর দেরাজ থেকে কতকগুলি জরুরী কাগজপত্র খুঁজে বের করতে হবে। যে-সে লোককে দিয়ে সে কাজ হয় না, কেননা সেটি অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার,—খুব বিশ্বাসী লোকের দরকার। আর আমার কথা যদি বল, আমি সে বাড়ীতে আর প্রবেশ করচি না। কিছুতেই না।

"সেই ঘরের চাবি ও ডেস্‌কোর চাবি তোমার কাছে দিচ্চি,—আমি চলে আস্‌বার সময় সেই ঘর ও ডেস্কো বন্ধ করে এসে-ছিলেম। তাছাড়া, আমার বাগানের মালীকে আমার এই চিঠিটা দিলেই সে আমার বাড়ীর দরজা খুলে দেবে।

"কাল সকালে আমার ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজন কর'—সেই সময়ে ঐ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হবে।

"তাঁর এই সামান্য কাজটি অবশ্যই করব—অঙ্গীকার করলুম। তা ছাড়া এই উপলক্ষে আমার বেড়ানও হবে। তাঁর জমিদারী রুয়ঁা হতে প্রায় দশ মাইল; ঘোড়ায় চড়ে গেলে এক ঘণ্টায় পৌঁছন যায়।

"তার পরদিন, দশটার সময় তাঁর ওখানে গেলেম। মুখোমুখী হয়ে আমরা ভোজনে বস্‌লেম। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে বিশটি কথাও বেরুল না। তিনি এই জন্য আমার কাছে মাপ চাইলেন। তিনি বল্লেন, যে ঘরটির ভিতর তাঁর সমস্ত সুখশান্তি নিহিত, সেই ঘরে আমি যাচ্চি—এই চিন্তাটি মাত্রই তাঁর

চিত্তকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। আমার মনে হ'ল, তাঁর মনে কি একটা যুঝাযুঝি চল্‌চে—তাতেই তাঁর চিত্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে,—তাতেই যেন তাঁর সমস্ত মন ব্যাপৃত হয়ে আছে।

"অবশেষে তিনি আমাকে ঠিক বুঝিয়ে দিলেন, সেখানে কি প্রণালীতে কাজ করতে হবে। সে খুব সোজা ব্যাপার। যে দেরাজের চাবি আমি পেয়েছি, সেই দেরাজ থেকে, একটা পুলিন্দা ও এক তাড়া দলিলপত্র বের করে' নিতে হবে। তারপর তিনি আরও এই কথা বল্লেন—

"—কিন্তু তার উপর তুমি নজর দেবে না, এ কথা তোমাকে অনুরোধ করাই বাহুল্য।

"এই কথায় আমি একটু ব্যথিত হলেম, এবং একটু তীব্রভাবে উত্তর দিলেম। তিনি আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগ্‌লেন।

"—আমাকে মার্জ্জনা করবে, আমি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্চি।

"এই কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

"তাঁর এই কাজটা করবার জন্য, প্রায় একটার সময় আমি তাঁর ওখান থেকে ছাড়লেম।

"দিনটি বেশ উজ্জ্বল। পেঁচার ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চল্লেম। আমার তলোয়ার খাপও বুটজুতায় ঠেকে তালে-তালে শব্দ করতে লাগ্‌ল।

"তারপর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে, ঘোড়াকে কদম-চালে চালাতে লাগলেম। বৃক্ষের শাখাপল্লব আমার মুখচুম্বন করতে লাগ্‌ল। কখন-কখন একটা পাতা দাঁত দিয়ে ধরে' আগ্রহের সহিত আমি চিবতে লাগ্‌লেম; কেন তা জানিনে—তখন আমার মনে কি একটা তুমুল আনন্দের ভাব, কেমন একটা স্ফূর্ত্তি, কেমন একটা বলের মত্ততা এসেছিল।

"সেই পল্লী-প্রাসাদের কাছাকাছি এসে, মালীর নামে আমার কাছে যে চিঠিটা ছিল সেই চিঠিটা বের করবার জন্য পকেট্ হাত্‌ড়াতে লাগ্‌লেম। চিঠিটা বের করে দেখ্‌লেম, চিঠিটা গালা দিয়ে আঁটা। আমি এই দেখে এমন আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হলেম যে, ইচ্ছে হচ্ছিল ফিরে চলে যাই। কিন্তু তারপর ভাবলেম, সেটা ভাল হবে না; এতে আমার কুরুচি প্রকাশ পাবে। আমার বন্ধুটির মন যে রকম বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তাতে হয়ত তিনি ভুলে চিঠিটা গালা দিয়ে এঁটে ফেলেছেন।

"মনে হল পল্লী-ভবনটি ২০ বৎসর কাল 'পোড়ো' অবস্থায় রয়েছে। বেড়ার কাঠ-গুলো খুলে গেছে,—পচে গেছে। কেমন করে খাড়া আছে কে জানে। শুঁড়ি পথগুলা তৃণাচ্ছন্ন ঘাস্-জমির সীমা-চিহ্ন আর ঠাওর হয় না।

"একটা খড়খড়ির উপর পদাঘাত করায়, সেই শব্দে একটি বৃদ্ধ, পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, আর আমাকে দেখে যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। ঘোড়া থেকে আমি মাটিতে লাফিয়ে পড়লেম, তারপর সেই চিঠিটা তার হাতে দিলেম। সে, চিঠিটা পড়লে, ফের আর একবার পড়লে, চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমাকে

আড়চোখে দেখে নিলে, তারপর, চিঠিটা পকেটে গুঁজে আমাকে বল্লে :—

"—ভাল, আপনি কি চান ?

"আমি রুক্ষভাবে উত্তর করলেম ;—

"—আমি কি চাই তোমার তা জানা উচিত, কেন না, ঐ চিঠির মধ্যেই তোমার মনিবের হুকুম আছে। আমি এই বাড়ীতে ঢুক্‌তে চাই।

"সে যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে উত্তর করলেঃ—

"—তাহলে, আপনি ঠাকুরাণীর···কামরার ভিতর···যেতে চাচ্চেন ?

"আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হবার উপক্রম হল।

"কি আপদ! আমাকে ক্রমাগত এই রকম প্রশ্ন করবার তোমার উদ্দেশ্যটা কি ?

"সে আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগ্‌ল।

"—না, না···মশাই···কিন্তু ঘরটা,··· ঘরটা, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে···আর খোলা হয়নি। পাঁচ মিনিট্‌ যদি অপেক্ষা করেন, আমি একবার দেখে আসি ঘরটা······

"আমি রেগে তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লুম :—

"বটে, আমাকে তুমি এখানে আট্‌কে রাখ্‌তে চাও? তুমি ত সে ঘরে ঢুক্‌তে পারবে না—এই দেখ, সে ঘরের চাবি আমার কাছে।

"তখন সে আর কি বল্‌বে,—সে বল্লে :—

—আচ্ছা, তাহলে মশায় আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্চি।

"—আমাকে কেবল শিঁড়িটা দেখিয়ে দেও, আমি একলা যাব। তুমি সঙ্গে না এলেও, আমি পথ চিনে যেতে পারব।

"—কিন্তু······মশায়·· ···তবু·····

"এইবার আমার ভয়ানক রাগ হল।

"—এখন তুমি চুপ্‌ করে থাক, চুপ্‌ করবে কিনা? না হলে, তোমার পক্ষে ভাল হবে না বল্‌চি।

"আমি ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেম, তারপর বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌লেম।

"প্রথমে রান্নাঘরটা পার হলেম, তারপর, যে দুটি ছোট কাম্‌রায় এই লোকটা সস্ত্রীক বাস করত, সেই দুটো কাম্‌রা পার হ'লেম। তারপর একটা বৃহৎ প্রবেশ দালান পার হয়ে, শিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। তারপর, আমার বন্ধু যে দরজাটা নির্দ্দেশ করেছিলেন, সেই দরজাটা দেখ্‌তে পেলেম।

"দরজাটা অক্লেশে খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেম।

"ঘরটা এরূপ অন্ধকেরে যে, প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারলেম না। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেম। ঘরগুলাতে কেমন একটা ভাপ্‌সা গন্ধ—পরিত্যক্ত 'পোড়ো' ঘরের মত। ক্রমে ক্রমে আমার চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলেম, একটা বড় ঘর; জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে আছে। খাটের উপর চাদর নেই, কিন্তু গদি ও বালিসগুলা আছে; সেই বালিসের এক জায়গা কুনুয়ের চাপে কিংবা মাথার চাপে যেন একটু দমে গেছে—মনে হয় যেন কেউ এইমাত্র শুয়েছিল।

"কেদারাগুলা অগোছালভাবে ইতস্তত পড়ে আছে। আরও লক্ষ্য করলেম, একটা

দরজা,—বোধ হয় একটা আলমারীর দরজা—অৰ্দ্ধেক খোলা।

"ঘরটায় আলো আনবার জন্য, জানলার কাছে গিয়ে জান্‌লাটা খুলে দিলেম; কিন্তু খড়খড়ির লোহালক্কড় এমন মর্চ্চে ধরেছিল যে, খড়খড়িগুল খোলা গেল না।

"আমার তলোয়ারের ঘায়ে সেগুল ভাঙবার চেষ্টা করলেম কিন্তু পারলেম না। এই ব্যর্থ চেষ্টায় বিরক্ত হয়ে, যেটুকু আলো আছে সেই আলোর উপরেই নির্ভর করে,' সেই ডেক্‌সোটার কাছে এগিয়ে গেলেম।

"একটা আরাম-কেদারায় বসে, আমার বন্ধু যে দেরাজটার কথা বলেছিলেন, সেই দেরাজটা খুল্লেম। দেরাজটা জিনিসপত্রে একবারে ভরা ছিল। আমার কেবল তিনটে পুলিন্দার দরকার, আমি সেই পুলিন্দাগুল খুঁজতে লাগ্‌লেম। আমি যতদূর পারি চোখ্‌ টেনে-টেনে পত্রের শিরোনামাগুল পড়বার চেষ্টা কচ্ছিলেম—এমন সময়, আমার পিছনে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেলেম—বরং বলা উচিত—অনুভব করলেম। আমি তাতে বড় একটা ভ্রুক্ষেপ করলেম না; আমার মনে হল, বাতাসে হয়ত কোন কাপড় নড়ে উঠেছে। কিন্তু মিনিট্‌ খানেক পরে, খুব অস্পষ্ট আবার একটা চলাফেরার শব্দ হল। এইবার আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। এইরকম অল্পেতেই ভয় পাওয়া নিতান্ত মূঢ়তা মনে করে লজ্জায় পিছন দিকে আর ফিরে তাকালেম না। যে কাগজের তাড়াটা আমার দরকার, সেইটে তখন খুঁজতে লাগ্‌লেম। তৃতীয় তাড়াটা খুঁজে পেয়েছি ঠিক্‌ সেই সময় আমার কাঁধের উপর কে যেন কষ্টে নিশ্বাস ফেল্‌চে মনে হল—অমনি আমি এক লাফে উঠে সেখান থেকে দশ হাত দূরে সরে দাঁড়ালেম। তারপর, তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে পিছন ফিরে দেখলেম—যদি তলোয়ারটা না থাকত তাহলে বোধহয় ভীরুর মত দৌড়ে পালাতেম। দেখ্‌লেম:—সাদা কাপড়-পরা একটি দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক, একটু আগে যাতে বসেছিলেম সেই আরাম-কেদারার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে।

"আমার সর্ব্বশরীর থরথর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাই আর কি। সে কি রকম মূঢ় ধরণের ভীষণ ভয় তা যে না অনুভব করেছে সে কখনই বুঝতে পারবে না। অন্তরাত্মাটা যেন গলে' যেতে লাগ্‌ল। আমার হৃদয়কে যেন আর আমি অনুভব করতে পারছিলাম না। সমস্ত শরীরটা যেন স্পঞ্জের মত তল্‌তলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমার সমস্ত ভিতরটা ধ্বসে পড়চে।

"আমি ছায়ামূর্ত্তিতে বিশ্বাস করিনে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের ভয়ে আমি প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলেম। ওঃ! কিছুক্ষণ আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছিলেম, সেরকম দারুণ যন্ত্রণা জীবনে কখন ভোগ করিনি—সে একটা অলৌকিক ভয় থেকে অনিবার্য্য বিকট যন্ত্রণা।

"যদি সেই স্ত্রীলোকটি না কথা কইত, আমি ভয়েই মারা যেতেম! কিন্তু সে কথা কইলে। এমন মধুর ও দুঃখের স্বরে কথা হইতে লাগল যে, আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ল। আমি যেন আত্মহারা ও হতবুদ্ধি

হয়ে পড়লেম। কিন্তু আমার মধ্যে যে একটা অহঙ্কার ছিল—সৈনিকের অহঙ্কার ছিল, তা-থেকেই আমি কোনরকমে আমার মুখে ভয়ের ভাব আন্‌তে দিইনি। সে রমণীই হোক্ বা ছায়ামূর্ত্তিই হোক, আমি স্থিরভাবে ছিলেম। কিন্তু এসব কথা আমি কিছুকাল পরে জান্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু যখন ছায়া-মূর্ত্তিটা দেখি ঠিক্ সেই মুহূর্ত্ত আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেম।

"রমণী বল্লে:—

"—"মহাশয়, আপনি ইচ্ছা করলে আমার একটা খুব উপকার করতে পারেন।

"আমি উত্তর দেব মনে করলেম, কিন্তু একটি বর্ণও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হ'ল। কেবল এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ আমার কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হ'ল।

"রমণী আবার বল্‌তে লাগ্‌ল:—

"উপকারটা করবেন কি? আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন, আমাকে আরোগ্য করতে পারেন। আমি ভয়ানক কষ্ট পাচ্চি; ওঃ! কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা!

"রমণী আমার সেই আরাম কেদারায় আস্তে আস্তে বসে পড়ল। বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

"—উপকারটা করবেন কি?

"আমি নাকী স্বরে উত্তর করলেম—হুঁ। তখনও আমার কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হয়ে ছিল।

"রমণী তখন একটা ঝিনুকের চিরুণী আমার দিকে এগিয়ে ধরে গুণগুণস্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল:—

"—চিরুণীটা দিয়ে আমার মাথা আঁচ্‌ড়ে দিন। ওঃ—শীঘ্র মাথা আঁচড়ে দিন। তা হলেই আমি সেরে উঠ্‌ব।

আমার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখুন ...আমার কি কষ্ট হচ্চে; আমি এই চুলের দরুণ কি যন্ত্রণাই পাচ্চি!

"আমার মনে হল, রমণীর ঘন কৃষ্ণ আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ আরাম কেদারার পিঠের উপর দিয়ে ঝুলে পড়ে একেবারে মাটি ছুঁয়েছে।

"কেন আমি এ কাজ করলেম? কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কেন আমি চিরুণীটা ধর্‌লেম, কেন আমি রমণীর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ হাতে নিলেম? কতকগুলা সাপকে হাতে করে ধরলে যে রকম বোধ হয় সেই রকম হাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। কেন আমি এ কাজ করলেম, কিছুই জানি না।

"সেই অনুভূতিটা যেন আমার আঙ্গুলে এখনও রয়ে গেছে, তা ভাবলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়।

"আমি চিরুণী দিয়ে তার চুল আঁচড়ে দিতে লাগ্‌লেম। কেমন করে যে সেই শীতল কেশগুচ্ছ বাগিয়ে ধর্‌লেম এখন তা বুঝতে পারচি নে। একবার চুলটাকে পাকিয়ে নিলেম, একবার গ্রন্থি দিলেম, আবার গ্রন্থিটা খুলে ফেল্লেম। ঘোড়ার বালামচীতে যেমন বিনুনী করে সেই রকম বিনুনী করে দিলেম। রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌ল, মাথাটা হেঁট করে রইল, মনে হল, যেন একটু আরাম পাচ্চে।

"তারপর, সে হঠাৎ আমাকে বল্লে, "ধন্যবাদ।" আর এই কথা বলেই চিরুণীটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে,—যে

দরজাটা পূর্ব্বে অর্দ্ধেক খোলা দেখেছিলেম, সেই দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

"আমি এখন একাকী। ভীষণ দুঃস্বপ্নের পর জেগে উঠ্‌লে যে রকমটা হয়, কিছুক্ষণ ধরে সেই রকম ভয়ে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেম। তারপর যখন জ্ঞান হল, আমি দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে খুব একটা ধাক্কা দিয়ে খড়খড়িগুল ভেঙ্গে ফেল্লেম।

"একটা আলোক-তরঙ্গ ঘরের ভিতর এসে পড়্‌ল। যে দরজাটা দিয়ে রমণী পালিয়েছিল, আমি সবেগে সেই দরজার কাছে এলেম। দেখ্‌লাম, দরজাটা বন্ধ, একটুও নড়ান যায় না।

"তখন পলাবার জন্ত যেন আমি উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লেম—আমার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল, যুদ্ধের সময় যেরূপ সৈন্তদলের মধ্যে হঠাৎ আতঙ্ক উপস্থিত হয়—সেই ধরণের আতঙ্ক। খোলা ডেক্‌সের উপর যে তিনটে চিঠিপত্রের পুলিন্দা ছিল, খপ্ করে সেই গুল হাতে নিলেম,—নিয়েই এক দৌড়ে ঘরটা পার হলেম, চার চার ধাপ টপ্‌কে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগলেম। এই রকম করে কোন প্রকারে বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে পড়লেম্। দশ পা দূরে আমার ঘোড়াটাকে দেখ্‌তে পেয়ে, এক লাফে তার উপর চড়ে বসে, নক্ষত্রবেগে ছুটে চল্লেম।

"একেবারে রুয়াঁয় গিয়ে আমার বাসার সম্মুখে এসে থাম্‌লেম। আমার আর্দ্দালির হাতে ঘোড়ার রাশটা দিয়ে, তাড়াতাড়ি আমার কামরায় গেলেম—সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে বস্‌লেম।

"আমার শুধু একটা দৃষ্টি-বিভ্রম কি না এই নিয়ে এক ঘণ্টা কাল আমার মনে তোলপাড় হতে লাগল। হয়ত আমার সেই রকম একটা স্নায়বীয় হৃৎকম্প হয়েছিল, যা থেকে নানাপ্রকার অসম্ভব অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায়।

আমি যখন জান্‌লার কাছে গেলেম, আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে আস্‌ছিল ওটা আমার দৃষ্টি-বিভ্রমই বটে, ইন্দ্রিয় বিভ্রমই বটে। কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের উপর নজর পড়্‌ল। দেখলেম আমার কোর্ত্তাটা স্ত্রীলোকের চুলে ভরা—চুলগুল বোতামে জড়িয়ে গেছে!

"একএকটা চুল তুলে বাহিরে ফেলে দিতে লাগ্‌লেম, আর আমার আঙ্গুলগুল কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

"তারপর আমার আর্দ্দালিকে ডাক্‌লেম। ভয়ে আতঙ্কে আমার মন এতটা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল যে সেদিন আমি আর বন্ধুর ওখানে যেতে পারলেম না। তারপর, তাঁকে কিরূপ বলা যাবে, স্থির হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম।

"আমি একজন সৈনিককে দিয়ে চিঠিপত্রগুলি বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেম। তিনি তার হাতে একটা রসিদ দিলেন। তিনি সৈনিকের কাছ থেকে আমার অনেক খবর নিয়েছিলেন।

সে তাঁকে বলেছিল, আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি, আমার রৌদ্র লেগে সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছিল, আরও কত কি ; এই কথা শুনে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

"তারপরদিন, খুব ভোরে আমি তাঁর

ওখানে গেলেম, মনে করেছিলুম যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তাঁকে বল্‌ব। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর বাড়ী ফেরেন নি।

"আমি সেই দিনই ফিরে এলেম—তার সঙ্গে দেখা হল না। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলেম। তখনও বাড়ী ফেরেন নি। আমি পুলিসে খবর দিলেম। চারিদিকে তাঁর খোঁজ হল; কোন্ পথে গেছেন, কোথায় আছেন তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

"সেই 'পোড়ো' অট্টালিকায় তন্নতন্ন করে খোঁজ করা হল। সন্দেহ করবার মত' কিছুই পাওয়া গেল না।

"এমন কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না যাতে মনে হতে পারে, ওখানে কোন রমণী লুকিয়ে আছে।

"খানাতল্লাসিতে কোন ফল হল না—তারপর আর কোন অনুসন্ধান হয়নি।

"এই ছাপান্ন বৎসর আমি আর কোন খবর পাই নি। আর কিছুই জানি নে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংসারের সার।

(ব্রাউনিং হইতে)

সারা বরষের যত সুষমা-সৌরভ,
সঞ্চিত সে থাকে,
ভ্রমরের এক মধু-চাকে!

সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব
লুকায়িত আছে
এক খানি হীরকের মাঝে!

সিন্ধু-ব্যাপী ছায়া-নীল আলোর ঝলক
বিরাজিছে সুখে,
ক্ষুদ্র এক মুকুতার বুকে!

সুষমা, সৌরভ, ছায়া আলোর পুলক
মোহ ও বৈভব,
তুলনায় তুচ্ছ এই সব;—

নিষ্ঠা সে মুক্তার চেয়ে খাঁটি সমধিক,
নির্ভর সরল
হীরকের অধিক উজ্জ্বল;

মিলিয়াছে গূঢ়তম নির্ভর নির্ভীক
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে
তরুণীর প্রথম চুম্বনে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মুক্তা ও শুক্তি।

মুক্তা বলে "দেখ শুক্তি আমারি কারণে
তোমারি গৌরব বাড়ে নরের সদনে।"

শুক্তি বলে "হায় বন্ধু! বৃথা অভিমান,
তোমারি কারণে মোর নষ্ট হয় প্রাণ।"

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

রাসমণির ছেলে।

(১)

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি—কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই—শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া পরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন কি, তাঁহার বড় ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি এক পয়সা নিজে লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন কি ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারো ভাল লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীন ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতা-বশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার

পুত্রের মতই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক্ করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন;—বলিয়াছেন, বাবা, এ ত সমস্তই তোমাদের; এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি ত স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কি।—শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মত থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে এক একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না, কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

এদিকে শ্যামাচরণের বড় ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্ম্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কি জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।

পৃথক্ হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন—তাহার যে কোনো একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায় সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, খুড়ামহাশয় কাণ্ড কি! আপনি এত ভাবিতেছেন কেন? বিষয় ভাগ ত হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই ত ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন—সত্য না কি! আমি ত তাহার কিছুই জানি না।

তারাপদ কহিলেন, বিলক্ষণ! জানেন না ত কি? দেশশুদ্ধ লোক জানে পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন—সেই ভাবেই ত এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাড়ি?

তারাপদ কহিলেন, ইচ্ছা করেন ত বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমার যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইল দেখিয়া তাহার ঔদার্য্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন—তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন ওমা, সে কি কথা! আলন্দি তালুক ত আমার খোরপোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম—তাহার আয়ও ত তেমন বেশি নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন?

ভবানী কহিলেন, তারাপদ বলে পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর কিছু দেন নাই।

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন? কর্ত্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন—তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্ধুকেই আছে।

সিন্ধুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল্ নাই। উইল্ চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতা পুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভাইয়ের ত সমান অংশ থাকিবেই।

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল্ বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্ধুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মী পেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য—সামান্য দুটো একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমর্য্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

(২)

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মত বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায়

করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বার বার করিয়া বলিতেন ধর্ম্মে ইহা কখনই সহিবে না। ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমি আইন আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাস-বাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনার জিনিষ। সতী সাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল—কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড় করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই যে পূর্ব্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দুদিনের একটা অভিনয় মাত্র —এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেককালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন, তিনি ভাবিলেন ইহারা জানে না এ সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য—তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে ইহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মত দেখিতে পাইতেন যে, বর্ত্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কত বার পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, না হইবে, এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্য্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ্দ রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন

তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক একবার চঞ্চল হইত;—তাহার কারণ এ নয় যে নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সখ ছিল—বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতন ভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন—কিন্তু যাহার ঐশ্বর্য্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বর্গীয় কর্ত্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠিতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনি ভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্য্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মত সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্ব্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি ত একটা কর্ত্তব্য আছে! আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তান মাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে, ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমিই ইহাকে ঠকাইলাম। তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীচরণের স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনো দিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন—ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব বংশে তাঁহার স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত—চৌধুরীদের মানমর্য্যাদা সম্বন্ধে ঠিক মত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন—বলিতেন, আমি গরীবের মেয়ে মান সম্ভ্রমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্ সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য।—উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শুষ্ক নদীপথে আবার বান ডাকিবে এ সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল এই সকলের চেয়ে বড় মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই একবার তাঁহার

সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগ মাত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড় অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিতের দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারো কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ সংসারে সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনো প্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে ত চাকরি করাইয়া লওয়া—তাহাতে আশ্রয়-দানের মূল্যই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও নানা পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড় কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে, তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে—তালুক ব্রহ্মত্র অল্পস্বল্প যা কিছু এখনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্তই রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত কষাকষি কোনো দিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উল্টা, সে বাহির

হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনো দিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াৎ করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্য্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখন কখন মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ সমস্ত নিন্দা ও ভৎর্সনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন;—তিনি গরীবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়মানুষিআনার কিছুই বোঝেন না এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া, ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনো দিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্—তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্ব্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্ত্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিষ্কৃত্য করিয়া রাখাই তাহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে সে বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই;—এই তাঁহার অকর্ম্মণ্য সরল-প্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত সঙ্কোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এপর্য্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কি, উহার দোষ কি! ও বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর ত উপায় নাই! এই জন্য তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্বেও

প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অত্যাস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে, বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারৎপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয় ত বলিতেন, ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে! বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্কার দিতেন। নয় ত লক্ষীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন,—ভবানীচরণ তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড় খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানীচরণ অম্লান মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন, এবং তাহার পর—তাহার কি হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে-ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে—সেখানে যে খুসি আসে যায়—কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে ত তাঁহারই গর্ভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে এবং খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না ওটা নহিলে অপমান বোধ হয় এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবেন না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপ শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড় মুস্কিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায় এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়!

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে কর্ত্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড়

জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুসি হয়, সে ত সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জনে না—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক! কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্ব্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ ভোলানো সস্তা সৌখীন জিনিষ আনাইয়া কয়েকমাসের জন্য ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালী, ছিপছড়িছাতার একত্র সমবায়, ছবি আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে কেনা নানা রঙের পচা রেসম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা পাড়ওয়ালা সাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি-মাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য্য মেমের মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন্ একজায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্ত্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে এই জন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণ-কণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারীর মত তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—পাগল হইয়াছ!

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা দেখ, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও সেটার ত প্রয়োজন নাই।

রাসমণি বলিলেন, প্রয়োজন নাই ত কি?

ভবানীচরণ কহিলেন, কবিরাজ বলে উহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়।

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তোমার কবিরাজ ত সব জানে!

ভবানীচরণ কহিলেন—আমি ত বলি রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভাল হয়। উহাতে পেট ভার করে।

রাসমণি কহিলেন, পেটভার করিয়া আজ পর্য্যন্ত তোমার ত কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই ত তুমি মানুষ!

ভবানীচরণ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত—কিন্তু সেদিকে ভারি কড়াকড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে কিন্তু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভাবনী-চরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেষমূর্ত্তিটি ভবানীচরণের দই পায়স ঘি লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেষের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনোই কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্ত খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্ত কিনিতে পারিতেছেন না একথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সঙ্কোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে মোড়া একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই—তাই মনে করিয়াছি এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্ত লইয়া যাইব।

জামিয়ারের চেয়ে অল্পদামের কোনো জিনিষ যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না—কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবেনা—গ্রামের লোকেরা ত নিন্দা করিবেই তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবেনা। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমার সেই মেষের কি হইল? ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, রোস্—এখনি কি! সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক!

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যতর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কি একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন—দেখ আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।

রাসমণি কহিলেন—বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন? ওর ত আমি কোনো অসুখ দেখি না।

ভবানীচরণ কহিলেন—দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কি যেন ভাবে।

রাসমণি কহিলেন—ও একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি ত বাঁচিতাম! ওর আবার ভাবনা! কোথায় কি দুষ্টামি করিতে হইবে ও সেই কথাই ভাবে!

দুর্গপ্রাচীরের এদিকটাতেও কোনো দুর্ব্বলতা দেখা গেল না—পাথরের উপরে গোলার দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব কসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন, ক্ষুধা একেবারেই নাই।

এইবার দুর্গপ্রাচীরে মস্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন—ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে,তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাতে লোভ করিলে অর্দ্ধেক চুরি করা হয়, তা জান!

কালীপদ নাকীসুরে কহিল—আমি কি জানি! বাবা যে বলিয়াছেন ওটা আমাকে দেবেন।

তখন বাবার বলার অর্থ কি, রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই—তিনি যাহা করিতেন খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন—কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন একমুহূর্ত্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন—কঠোরস্বরে কহিলেন, তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর যাহা পাইবার নয় তাহা কোনমতেই পাইবে না।—এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ

কাজ আছে এম্‌নি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল—বাবা, আমার সেই মেম্—

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—রোস, বাবা, আমার একটা কাজ আছে—সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে!—বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকাল বেলাকার করুণসুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, আমি সেই পাখা-করা মেম চাই না।

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুপুরি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কি একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামাভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি ফেলিয়া রাসমণি তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি পায়সের সদ্গতি হইবে না, এমন কি মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণ ই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনি এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল কিন্তু দধি পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনি এটা বাহির করিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেমমূর্ত্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, আজ রান্নাটা বড় উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর দইটা যে কি চমৎকার জমিয়াছে সে আর কি বলিব!

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখাখাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষা উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের এক

ঘেরে পাখা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত—কিন্তু অষ্টমীর দিনেই এই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গুরুপুত্রকে দুইটাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্য এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সসমেত পুতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেকদিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না একথা বিনা উপদেশ-বাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক্।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি ত মানুষ হইতে পারিব না।

মা বলিলেন, সে ত ঠিক কথা বাবা। কলিকাতায় ত যাইতেই হইবে।

কালীপদ কহিল, আমার জন্তে কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্ম্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মত বিষয় সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, কালীপদকে ত মানুষ হইতে হইবে।—কিন্তু পুরুষানুক্রমে কোনো দিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই ত চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে! বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মত ভয় করেন। কালীপদর মত বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কি করিয়া কাহারো মাথায় আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্ব্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্য্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, কালীপদ একদিন উকীল হইয়া সেই উইল্‌চুরি ফাঁকির শোধ দিবে—নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন—অতএব কলিকাতায়

যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরাণো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্ম বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন—কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড় করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন—এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে।—সংসার খরচ হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্ব্বাদের মত সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না এই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

(৩)

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্ম তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষ্যে নাক হইতে চষমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনোপুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই—এমন কি, হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর একটা পুল বাঁধা হইতেছে এ সমস্ত বড় বড় খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র! —শুনেছ ভায়া গঙ্গার উপর আর একটা যে পুল বাঁধা হচ্চে—আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি তাতে সমস্ত খবর লিখেছে!—বলিয়া চষমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভাল করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন।—দেখ্‌চ ভায়া। কালে কালে কতই যে কি হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর শেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে কলিতে এও ঘটল হে!—গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড় একটা জয়বার্ত্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে সেই আনন্দে তিনি বর্ত্তমানযুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা

পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, আমি বলে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই!—মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন গঙ্গা যখনই যাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্ব্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এদিকে কলিকাতায় কালীপদ বহুকষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য্য ঘটনা উপলক্ষ্যে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন তরী ত প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই যে সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না সুতরাং যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না, তবু পড়া শুনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক সুবিধা অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়মানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক—তবু সে মেসে থাকিতেই ভালবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসাভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল—সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালবাসে—কিন্তু আত্মীয়দের মুস্কিল এই যে, কেবল মাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়;—কাহারো সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারো সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এই জন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস্। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা

আসে যায়, হাসে কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মত, কেবলি বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল সে লোক ভাল; যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভাল লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহঙ্কার জিনিষটা হাতিঘোড়ার মত নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল—এইজন্য আপনার অহঙ্কারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনাখরচে চরিয়া খাইতে দিত না;— দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালবাসিত। কিন্তু এত ভালবাসিত যে যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দ্দয় হইয়া উঠিত তখন বড় ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁঠা খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্ব্বদা মনে করিয়া না রাখা তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতায় বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী সৌখীন সাবান এবং এসেন্স, আর তারি সঙ্গে এক আধখানি হালের আমদানী বিলাতী ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, তোমাকেই কিন্তু ভাই পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।—দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিষ বাছিয়া তুলিত;—তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত—আরে ছি ছি, তোমার কি রকম পছন্দ!—বলিয়া সব চেয়ে সৌখীন্ জিনিষটি টানিয়া তুলিত। দোকান-দার হাসিয়া বলিত, হাঁ ইনি জিনিষ চেনেন বটে!—খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত—অপরপক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারিদিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার সখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাঁৎসেতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হোক তাহাকে স্কলারশিপ্ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে

মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়-মানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে—কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে মেশা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁসে নাই—এবং যদিও সে জানিত শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা একমুহূর্ত্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তবু কোনো কঠিন সঙ্কটেও তাহার প্রসাদ-লাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরীব হইয়া তবু দূরে থাকিবে শৈলেন এই অহঙ্কারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং মশারি বিছানা যখনি দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনি সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো; এবং সে দুই সন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুইএকটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দুইচারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু এই মুখচোরা মানুষের মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর ত নয়ই কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হইল। কালীপদ জানাইল ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবলসমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপ্‌ধাপ্‌শব্দ ও সবেগে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতি পরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত তিন চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়ত বা কলিকাতা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপনিই জন্মে কলিকাতায় হাওয়ায়

সর্ব্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলি দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার একপাটির পরিবর্ত্তে একটি অতি উত্তম বিলাতী জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এসম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতামেরামৎওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেস্‌টা লইয়া আসিয়াছেন! আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।—কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।—এই যে, এইখানেই আছে, বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্‌ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল এফ্‌ এ পরীক্ষায় যদি ভালরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস্‌ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এবৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই—যাহাদের প্রায় নিত্য অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানিনা সে কি মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এপর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা ত আমাদের অগোচর

নাই তবে উহার এত বড়াই কিসের? ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়!

সরস্বতীপূজা ধুম করিয়া হইল—কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত—সকল দিন সময়মত আহার জুটিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালমন্দ কমিবেশী সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সঙ্গতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জ্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল্ করিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সঙ্কোচ করিয়া তাহাকে আরো একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রবসত্ত্বেও বিনাভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু যথাসময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মস্ত পুঁটুলিসমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদপ্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চাল্‌তা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত তাহার অবর্ত্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর কোনো ভাবনা ছিল না কেবল তাহার বড় সঙ্কোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিষগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত—কিন্তু এ সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন ;—যে আধারে সেগুলি রক্ষিত, সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও সহরের ঐশ্বর্য্য সজ্জার কোনো লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোনো সহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে—ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য। আগের বারে তাহার এই সমস্ত বিশেষ জিনিষগুলিকে তক্তাপোষের নীচে পুরাণো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচমিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালাবন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল ধনরত্ন ত বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে—একেবারে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল্ হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের

কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনা ছিটের চায়নাকোটটার লোভ সাম্‌লাইতে না পারি! ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নূতন কোট কিনিয়া না দিলে ত কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে!

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালিখসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বদ্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, এবারে কালীপদ কোন্ সাত-রাজার ধন মাণিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির কর!—এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা—তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে—প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে জন দুই তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তাপোষের নীচে হইতে আচার চাট্‌নি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কি পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আরেকটি প্রায় তিনচার খানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া কেহ আর হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল এই নোট খানারই জন্যে কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদ-প্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল রাস্তায় কালীপদর মত যেন কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে

কিছুই নয় তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিতনা। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল দেখা যাক্ এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কি রকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্ত দেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তপোষের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল হয় ত সে চাবিবন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলট্ পালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিষপত্র বাহির করিয়া দেখিল তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বারবার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এদিকে উপরের তলার দুই একটি করিয়া লোক যেন আপন কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইলনা তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মত পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোটখানি—জীবনের কত মুহূর্ত্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত আবর্ত্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিনকার মত এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড় বাণী, যে মহত্তম আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্রমন্থনকরা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মত মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে—এও সেই রকম।

উপরের তলার অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়;—একমুহূর্ত্তে সে বুঝিতে পারিল শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই

নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগর্ব্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনো সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার—কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিলনা। কাঠের ছাদওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহবা চৌকিতে কেহবা বেতের মোড়ায় বসিয়া হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্গদস্বরে বলিয়া উঠিল—দিন্ আমার নোট্ দিন্!

যদি সে মিনতির সুরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কি বলেন মশায়! কিসের নোট!

কালীপদ কহিল, আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন!

এতবড় কথা! আমাদের চোর বল্‌তে চান্!

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্ত্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চারপাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মত গুম্‌রাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই—কোনো প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা একশোটাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসগে যাও।

সহচররা কহিল, পাগল হয়েছ! তেজটুকু আগে মরুক্—আমাদের সকলের কাছে একটা রিটন্ অ্যাপলজি আগে দিক্ তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল—ভাবিল, হয় ত উকীল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইল। কালীপদ কি যে বকিতেছে ভাল বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে "বাবা" "বাবা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয় ত সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই তিনবার ডাকিল, কালীপদবাবু। কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়বিড় বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল—কালীপদবাবু দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট্ পাওয়া গেছে। দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক্।—কেহ কেহ পরামর্শ দিল, পুলিশ ডাকিয়া আন—কি জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে—কাল যে রকম কাণ্ড দেখিয়াছি—সাহস হয় না!

শৈলেন কহিল, না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আন। অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন—এ ত বিকার বলিয়াই বোধ হয়।

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল—তক্তাপোষের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া—তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে—তাহার রক্তবর্ণ চোখ দুটা খোলা, এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার আত্মীয় কেহ আছে?

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন বলুন দেখি?

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, খবর দেওয়া ভাল, লক্ষণ ভাল নয়।

শৈলেন কহিল, ইহাদের সঙ্গে আমাদের ভাল আলাপ নাই—আত্মীয়ের খবর কিছুই জানিনা। সন্ধান করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কি করা কর্ত্তব্য?

ডাক্তার কহিলেন, এ ঘর হইতে রোগীকে এখনি দোতলার কোনো ভাল ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্ত নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত—প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্ত

আর একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতি যত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি—আর একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনী! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্ম্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভাল লাগে নাই এবং অন্য সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন —শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, একথা সে জানিত। তাহার পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত পরমস্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোট-- তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন—ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস্—আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।—তাঁহার ছেলেরা এসব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্ত্তমানে ভবানী-চরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না—কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভনসত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্ত্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

(৪)

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান

করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতি যত্নে তাঁহাকে একটা ভাল বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, দেখো যেন অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝো আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।—চৌধুরীবাড়ির বধুর পক্ষে হটহট করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসঙ্গত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্য্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখনো ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাষ্টার মশায় বলিয়া ডাকিল—ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে, বাবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল—তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন—এই যে বাবা, এই যে আমি এসেছি।—কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, জ্বর পূর্ব্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়ত এবার ভালর দিকে যাইবে। কালীপদ ভালর দিকে যাইবে না একথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড় হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে—সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোক-মুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভাল বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভাল শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে এ কথা কে বলিবে! বিশেষত কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন ত দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন সে ত হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কি আর সহবহৎই বা কি!

জ্বর কিছু কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্যলাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা সহরের ছেলেদের পরিহাসের

পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর! মনে হইল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভাল বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কি করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইবে সে সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একসময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে না কি! প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে ত ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি আমাকে মাপ করুন।

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সঙ্কোচে কোনো দিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত—যদি বন্ধুর মত ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত তবে সে কত খুসিই হইত—কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত, তখন তাহার সৌখীন চাদরের সুগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তারেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্ত্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁৎসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্য্যলোকের ঐশ্বর্য্য বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দ্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না—আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের

সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাসা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুণদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুণদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতাব অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে একথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড় একটি গভীর আনন্দ হইল! তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায় যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল আহা মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ সুন্দর যুবাটিকে সে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্নকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দপ্রবাহে মাঝে মাঝে বড় বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান ছিল—কোনো একসময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল একথা লইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ কথাটাকে কোনো "কিন্তু" দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের দিনের কথা গর্ব্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল—তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎস-মূর্ত্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃজায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারের গৃহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কি অজস্র আদরই তাঁহারা লুঠিয়াছিলেন—সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই ত ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু এই সমস্ত সুখস্মৃতি আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি সেই উইল চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যাইবে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই—তাঁহার সতীসাধ্বী মার কথা কখনই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগ্‌লামিমাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগ্‌লামিকে আপোসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভাল লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।—কিন্তু এরূপ তর্কে উল্টা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা

তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভাল লাগে না। এমন কি, সেও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্ধুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সাম্‌নেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না ত কি! কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত—তা বেশত বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা ত তোমারি ছেলেরই মত, তারা ত তোমারি ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম সুখের কথা!—শৈলেন এসব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত—শৈলেন হয়ত তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই একথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়ই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন একথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে সেকথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ্ ফস্‌কাইয়া গিয়াছে আর ত সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—এসম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—সেখানে মা একলা আছেন। আমি ত বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।

শৈলেনও বলিল, এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর ত ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে

দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর, আমরা ত আছি।

ভবানীচরণ কহিলেন—সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই ভাই! বিশেষত তোমার ঠাকরুণ দিদি যখন যেটি ধরেন সে ত আর ছাড়াইবার জো নাই।

শৈলেন হাসিয়া কহিল—ঠাকুর্দা তুমিইত আদর দিয়া ঠাকুরুণদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা ভাই আচ্ছা, ঘরে যখন নাৎবৌ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কি রকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতার নানা-প্রকার আরাম আয়োজনও রাসমণির আদর যত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড় বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকাল বেলায় জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার চোখমুখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মত গরম,—কাল অর্দ্ধেক রাত্রি সে পজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্ব্বলতা ত সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, এবার ত গতিক ভাল বোধ করিতেছি না।

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, দেখ ঠাকুর্দা, তোমারও কষ্ট হইতেছে রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকরুণদিদিকে আনানো যাক্।

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তোমরা যেমন ভাল বোঝ তাই কর!

রাসমণির কাছে চিঠি গেল তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টামাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুই জনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল আর আমার সয় না! তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্ত রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিলনা। কিছুক্ষণ বিছানায় এ পাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে "দয়াময় হরি" বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকতায় যায় নাই তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোষের উপর পাতা আছে, তাহার নানাস্থানে এখনো সেই কালীর দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোষের এক কোণে কতকগুলি হাতে বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয়খণ্ড রয়াল রীডারের ছিন্নাংশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তার ছেলে-বয়সের ছোট পায়ের এক পাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়াছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড় হইয়া চোখে দেখা দিল জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোট জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি—টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকালতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে—তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময় পূজার সময় কলেজের ছুটি হয় কিন্তু যাহার জন্ত তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনো দিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল কিন্তু জগৎ সংসারে সে এই বৃদ্ধকে কি একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল! বাহিরে বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে ঘাস-পাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বুঝি কোনো মতেই আশা করিবার নহে

তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে—ওযে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সাম্‌নে আসিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে—তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু সে যেন মাথায় কালীপদরই মত হইবে। এসেছিস্ বাপ্—বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার "কালীপদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহাল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কি পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন দলিলের মত। চষমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কিও?

ভবানীচরণ কহিলেন—সেই উইল।

রাসমণি কহিলেন—কে দিল?

ভবানীচরণ কহিলেন—কালরাত্রে সে আসিয়াছিল—সে দিয়া গেছে।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি হইবে?

ভবানীচরণ কহিলেন—আর আমার কোনো দরকার নাই। বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্ব্বে বলিল—আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?

রামচরণ মুদি কহিল—কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কি একটা দেখিয়াছিলাম।—

"আরে দূর" বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সর্ব্বজাতীয় বিরাট সম্মিলন।

সংবাদপত্রপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে সম্প্রতি লণ্ডনে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির একটি বিরাট সম্মিলন (Universal Races Congress) হইয়া গিয়াছে। এই বিরাট সম্মিলনে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত প্রতিনিধিরা সর্ব্বজাতীয় মানব সমাজের মধ্যে মিলনের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন।

যেদিন শ্বেতকায় আর্য্যেরা মধ্য এসিয়ার সুবিস্তীর্ণ অন্ধকারময় অরণ্য ভেদ করিয়া আলোকময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে জ্ঞান ও শক্তির অনুশীলন করিবার জন্য বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিলেন, সেদিন তাঁহারা ভাবেন নাই যে শত শত বৎসর পরে ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের প্রভেদ ক্রমে ক্রমে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য লইয়া পরস্পরের রক্তশোষণেই পরম তৃপ্তিলাভ করিবে। এই বিদ্বেষরহস্যের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া বিশ্বমানবকে শান্তি, ভালবাসা ও একত্বের পথে চালিত করাই এই মিলনযজ্ঞের উদ্দেশ্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানলক্ষ্মী তাঁহার নব নব আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বারা ধর্ম্ম ও দার্শনিক জগতের উপর আপনার বিজয়শ্রী অপ্রতিহতভাবে ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু একদিকে বিজ্ঞানলক্ষ্মী যেমন জ্ঞানের প্রদীপশিখা হস্তে আমাদিগকে ক্রমে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ বিশ্বজগতের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মহীনতা ও বিদ্বেষপ্রিয়তা আমাদের মহাযাত্রার পথে এক নিবিড় অন্ধকারছায়াপাত করিয়াছে। এবং আশ্চর্য্য এই যে, বিংশ শতাব্দীতে এই নিবিড় বিদ্বেষছায়া ক্রমে গভীর হইয়া আসিতেছে। মনের উদারতা ও সাম্যনীতির অভাবে ভারতবর্ষে সমাজের মধ্যে শ্রেণী, বর্ণ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়া মানবের একত্বের পথে কণ্টক উৎপন্ন করিয়াছে। আর পাশ্চাত্য জাতিরা উদারতা, সাম্যমন্ত্র ও মিলনের বাণী প্রচার করিয়াও কৃষ্ণকায় জাতির উপর যে অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এমন কি শ্বেতকায় আমেরিকানরা কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগের সহিত এক রাস্তায় ভ্রমণ করিতে, এক উপাসনালয়ে উপাসনা করিতে, এক রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেও অপমানিত বোধ করেন।

বিসপ মিড নামক একজন সুসভ্য আমেরিকান পাদ্রী নিগ্রোদিগের জন্য এক প্রার্থনা পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"This rule you should always carry in your mind that is, you should do all service for your masters as if you did it for God Himself.....You are to do all service to them as unto Christ. Failing to do this, you will he turned over to the devil to become his slaves for ever in hell."*

মানুষ আপনার ধর্ম্মের নীতি ভুলিয়া কতদূর মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। খ্রীষ্ট যদি আজ পুনরায় স্বর্গরাজ্য হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহার শ্বেত শিষ্যদিগের ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় মর্ম্মাহত হইয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া যান!

প্রাচীন ভারত এককালে এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা আজ বিংশ শতাব্দিতে সভ্যতাভিমানী জাতির অনুকরণীয়। যখন কোন প্রপীড়িত জাতি করুণনেত্রে ভারতমাতার দ্বারে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হইয়াছে তখন তাহাকে ভারতমাতা কল্যাণময়ী মাতৃরূপে আপনার অঙ্কের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন। পার্শী, খ্রীষ্টান, মোগল ও পাঠানেরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ এই বুদ্ধ ও চৈতন্যের দেশে হিন্দুজাতির মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণী

*Vide Modern Review for August 1911.

বিভাগ ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া একত্বের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ২৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুণ্য ভূমিতে এক মুক্ত আত্মা বুদ্ধত্বলাভ করিয়া ভারতে মানবসমাজে যে একত্ব ও সাম্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আজ ভারতের ইতিহাস হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একবার "ভারতীর" তখনকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীকে লিখিয়াছিলেন "আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই, আমাদের বেদান্ত মত আছে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে আমাদের কার্য্যে মহা ভেদ বুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।"

কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীন জাতিদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য নানা প্রকার উপায় ও চেষ্টা উদ্ভাবন করা হইতেছে এবং দেশে নানা প্রকার সভা সমিতি বসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফল কিছুই হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে পাশ্চাত্যসাধারণ অন্তরের সহিত পৃথিবীর সমস্ত জাতির অবাধ সম্মিলন ও শান্তিস্থাপন অনুমোদন করে না। তাহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে ইউরোপের ৪২৪,৭০০০০০০ শ্বেতকায়ের সহিত এসিয়ার ৮৯৭,০০০০০০ কৃষ্ণকায়ের মিলন অত্যন্ত অসম্ভব! এই সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত বিলাতের ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত স্থলে ইংলণ্ডের অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য সমূহের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন ব্রিটিশ রাজ্য মধ্যে শান্তি ও সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। এই শান্তিসভায় অষ্ট্রেলিয়ার শাসনকর্ত্তা মিঃ ফিশার এই প্রস্তাব করেন যে, ইংলণ্ডের অধীনস্থ রাজ্যসমূহ হইতে যাহাতে অশান্তিপ্রিয় অসভ্য বিদেশীয় লোকদিগকে দূরে রাখা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা হউক। এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলে সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সমস্ত অষ্ট্রেলিয়া হইতে চীনাকুলি এবং অন্যান্য কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে বিতাড়িত করাই মিঃ ফিশারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয় নাই। আবার অপর দিকে বিচার করা যাক। ইউরোপের সমস্ত জাতি কেবল যে জোর করিয়া চীনদের পোতাশ্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্য করিতেছে তাহা নহে, তাহারা চীনদিগকে সবলে আফিম ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। এবং চীনে খ্রীষ্টীয় মিসনারী প্রবেশ করাইয়া ইউরোপীয় জাতি নানা প্রকার ধর্ম্মবিদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে আর এই বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণস্বরূপ চীনকে লক্ষ লক্ষ অর্থ ইউরোপীয় জাতিকে উপহার দিতে হইয়াছে। সে যাহাই হউক, স্বার্থস্থলে ব্যক্তিগত বা জাতিগত উদারতার যতই ব্যতিক্রম দেখা যাক ইংরাজ জাতি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যে পক্ষপাতী—এই বিরাট জাতীয় সম্মিলনই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই মিলন যজ্ঞে যথার্থই তাঁহারা জাতিগত বর্ণগত বৈষম্য ভুলিয়া গুণের সমাদর করিয়াছেন। ভারতপূজ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে এই মিলনসভার সভাপতি বরণ করিয়া ভারতবর্ষকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও একত্ব স্থাপনের জন্য নিম্ন লিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন:—

(১) The organisation of a world's Humanity League (not an Aborigines Protection Society), with branches and committees, and bureaus in different countries.

(২) The endowment of Professorships in oriental civilisation and culture in Western Universities and Academies, to be held by Orientals from the countries concerned.

(৩) Publication of an International Journal of comparative civilisation.

(৪) Some organised effort, if possible, against the anti-social, and anti-humanitarian tendencies of the modern political situation.

মহাসভার প্রতিনিধিগণ যদি এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে সত্য সত্যই তাঁহারা পৃথিবীর পরম উপকার করিতে পারিবেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

ভিটো আইন।

সকলেই জানেন ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা (Parliament) দুই অংশে বিভক্ত; একটি অভিজাতবর্গের অন্যটি প্রজাসাধারণের অধিকারভুক্ত। সাধারণ সভা যে বিধিব্যবস্থা প্রচার করেন অভিজাতবর্গ অনেক সময় নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা চালনা করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা বহু পূর্ব্ব হইতে অভিজাতবর্গ লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহারি দোর্দ্দণ্ডশক্তিতে অনেক উন্নতিজনক এবং শুভকর বিধানে তাঁহারা বাধা দিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে বটে কিন্তু আবার অনেক সময়ে এই ক্ষমতার বলে দেশ যুদ্ধবিগ্রহে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি এই ক্ষমতা রহিত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। পরিশেষে নিতান্ত নাচার হইয়া অভিজাতগণ এই Veto Bill অর্থাৎ নামঞ্জুর করিতে পারিবেন না—এই আইন পাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এ বিষয়ে স্বীয় প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অভিজাতগণ যখন এই বিধি সমর্থন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তখন সম্রাট বলিয়াছিলেন যে তিনি যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উন্নীত করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন লর্ড করিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ করিবেন। যাহা হউক তাহা করিতে হয় নাই। এতদিন জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল ইংলণ্ডের সম্রাটগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট মুকুটদণ্ডধারী পুত্তলিকামাত্র, তাঁহারা অভিজাতবর্গের হস্তের ক্রীড়নক—তাঁহারা সম্রাটদিগকে যেরূপে চালান সেইরূপেই চলিতে বাধ্য। এই ঘটনায় তাহা অপ্রমাণ হইয়া গেল। এই দারুণ সঙ্কট সময়ে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যেরূপ ধৈর্য্য, সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছেন যে তিনি জড় পুত্তলিকা নহেন, তিনি দেশের এবং প্রজাগণের মঙ্গলসাধক জীবন্ত, জাগ্রত, শক্তিশালী পুরুষ।

উপনিবেশে ব্রিটিশ ন্যায়পরতা

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় দুই সহস্র ভারতবর্ষীয় বাস করে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই শিখ, অনেকেই ব্রিটিশরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিয়াছে;—যুদ্ধে বীরত্ব, সাহস ও নিপুণতার পরিচয়স্বরূপ অনেকেই সুবর্ণপদক পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ ইহারা সুস্থ সবল শরীর, সংযতস্বভাব এবং শিক্ষিত। ইহাদের নায়ক পণ্ডিতপ্রবর সুন্দর সিং ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবাপুরুষ—যুক্তরাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট জনসাধারণের পক্ষ হইতে তিনি যে আবেদনরচনা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অধিকার অনন্যসাধারণ। প্রাচ্যদেশীয়দিগের উপনিবেশবাস সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি এবং বিরুদ্ধমত আছে তাহা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা যে অধিকার লাভ করিয়াছে তাহা আইনসঙ্গত এবং সেই কারণবশতঃই ইহাদিগকে সে অধিকারচ্যুত করা কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। উপনিবেশ বাস করিবার অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে যে সকল দুরূহ পরীক্ষা দান করিতে হইয়াছিল সে পরীক্ষায় ইহারা উত্তীর্ণ—কাজেই ইহাদিগকেও সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রজাস্বরূপে শাসনকর্ত্তাগণ

গ্রহণ করিতে বাধ্য। কত অসুবিধা সহ্য করিয়া তাহাদিগকে ব্যবসায় চালাইতে হয়, তাহা প্রথমেই এই আবেদন পত্রে লেখা হইয়াছে, (১) আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিবারের বিচ্ছেদ (২) যাত্রা-উপযোগী জাহাজের অভাব এবং (৩) প্রভূত অর্থ জমা দেওয়া; এই তিনটি প্রধান বাধা। দুঃখের বিষয় জাপানীদিগের পক্ষে এরূপ কোন দুরূহ বিধি ব্যবস্থা নাই। অথচ এই শিখগণ ব্রিটিশরাজের প্রজা। এই সকল বাধা রচনা করা কেবল মাত্র অন্যায় নয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পক্ষ হইতে দেখিলে যে বিশেষ নির্ব্বুদ্ধির কাজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একজন হিন্দু অপেক্ষা একজন বৌদ্ধ জাপানীকে প্রাধান্য দিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। সভ্যতার এবং ন্যায়পরায়ণতার নিয়মসকল উদার এবং বিশ্বনৈতিক, তাহা কাহারও ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার দ্বারা সঙ্কুচিত করিবার অধিকার নাই। যে ব্রিটিশ ন্যায়পরতা প্রবাদপ্রবচনের ন্যায় সাধারণে মান্যমান করিত তাহার অপলাপ দেখিয়া লজ্জা পাইতে হয়—সে ন্যায়পরতা অন্ততঃ ব্রিটিশ রাজত্বসীমার মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। এই ব্রিটিশ ন্যায়পরতা যে কি তাহার সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ অসম্ভব,। ব্রিটিশ ন্যায়পরতা বলিলেই যে উদার নিরপেক্ষ ধর্ম্মবিচারের কথা মনে উদয় হয় ব্রিটিশ রাজ্যে এবং উপনিবেশ-প্রদেশে তাহার ব্যতিক্রম, ইহা অপেক্ষা হীনতার বিষয় আর কি হইতে পারে। বহুকাল হইতে ইংলণ্ডের বিশেষ গর্ব্বের বিষয় এই ছিল, যে-কেহ তাহার রাজ্যসীমায় পদার্পণ করিত ক্রীত দাস হইলেও সে ব্যক্তি স্বাধীনতার সুখ এবং গৌরব লাভ করিতে পারিত। এই ন্যায়পরতার বলেই ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব সম্ভবপর হইয়াছে,—যেখানে প্রজাগণ শাসনকারীদিগের তুলনায় অসংখ্য, সেখানে কেবলমাত্র নৈতিক প্রভাবেই যে রাজ্যশাসন নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যখন ব্রিটিশরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই ন্যায়পরতার অক্ষুণ্ণ প্রভাব তখন ঔপনিবেশিক রাজ-ভক্ত শিখদিগের পক্ষে তাহার ব্যতিক্রম করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। এই ভক্ত প্রজাগণ ইংরাজকর্তৃক পঞ্জাব অধিকারের পর হইতে সর্ব্বতোভাবে সকল বিদ্রোহ ভাব ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ রাজের সহায়তা করিয়াছে। সিপাহী বিপ্লবের ঘোর দুর্দ্দিনে ইহাদেরই বীরত্বে ইংরাজরমণীর সতীত্ব, শিশুর জীবন, এবং গৃহের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছিল। ইহার পর যতবারই ব্রিটিশরাজকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে ততবারই শিখ বীরত্বে তাঁহাদিগের জয়লাভ হইয়াছে। রুষ-তুর্ক সমরে, সুদান সংগ্রামে চিরস্মরণীয় মাগডালার অবরোধে, উন্মাদ মোল্লার বিরুদ্ধে সোমালিদেশে, চীনযুদ্ধে, তিব্বত যাত্রায় ইহাদের সাহস বীরত্ব রাজভক্তি চিরদিনই রাজপুরুষদিগের সর্ব্বপ্রধান সহায়। এখনও ভিক্টোরিয়ার রাজপথে এমন কত শিখ বীরের সহিত সাক্ষাৎ হয় যাহারা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সিপাহী বিপ্লব দমন করিয়াছিল। এখনও তাহাদের কণ্ঠে সুবর্ণ পদক অক্ষয় কবচের ন্যায় শোভিত। সুন্দর সিংহের পিতাও মাগডালায় ব্রিটিশ পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস শিখ বীরত্বের যে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত তাহার অধিক পরিচয় বাহুল্য মাত্র। তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই অথচ আজ সেই শিখ জাতির প্রবাসী জনকয়েক ভ্রাতা কেনেডায় সামান্য সাধারণ ব্রিটিশ স্বত্বাধিকার লাভের প্রার্থনা করিতেছে, —ইহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়, কেন না ইহা ধর্ম্মসঙ্গত।—নিঃসন্দেহ এই আবেদন প্রত্যেক ইংরাজের সহানুভূতি লাভ করিবে—কেন না উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে কোন বীর জাতিই বিমুখ হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের প্রস্তাবিত নূতন বিধি—জনসাধারণের অবৈতনিক শিক্ষা।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সাময়িক অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলের প্রস্তাবিত নূতন বিধির সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকন্যা কর্তৃক পঠিত হয়। বলা

বাহুল্য,—উপস্থিত প্রত্যেক মহিলাই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয় যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিতে পারেন তজ্জন্য বড়লাটের মন্ত্রীসভায় শ্রীযুক্ত গোখলে আগামী শীতকালে একটি নূতন বিধির 'পাণ্ডুলিপি' উপস্থিত করিবেন। রাজপুরুষগণ যাহাতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলন করেন ইহাই প্রস্তাব্য বিধির উদ্দেশ্য;—ইহা বিধিবদ্ধ হইলে জনসাধারণ বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে, কেবলমাত্র তাহাই নহে, এই বিধির নিয়োগে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা যাইতে পারে। জনসাধারণকে বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদান করিতে হইলে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষকে যাহা ব্যয় করিতে হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই বহন করিতে হইবে। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য নূতন কর স্থাপিত হইবে।

প্রত্যেক স্বাধীন এবং সভ্য দেশে এইরূপ বিধি প্রচলিত আছে। সেসকল দেশের প্রত্যেক অধিবাসীই কিছু না কিছু লেখা পড়া জানে, জ্ঞানবলে তাহারা স্বীয় দেশকে মহিমার সমুচ্চশিখরে উন্নীত করিতে সক্ষম। আমাদের দেশে কেবল মুষ্টিমেয় লোক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়। ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা গণনা (Census) হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতবর্ষে ২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ লোকের বাস—ইহার মধ্যে প্রায় ১ কোটি সামান্য লেখাপড়া জানে বাকি ২৮ কোটি ৩৪ লক্ষ সম্পূর্ণ মূর্খ,—তাহারা ক, খ পর্য্যন্ত জানে না। যে দেশের প্রায় সমগ্র জনসংখ্যাই মূর্খ সে দেশ এমন অধঃপতিত অবস্থায় থাকিবে না ত কি? যে দেশ এককালে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, জগতের জনমণ্ডলী যে দেশবাসীদিগকে গুরুর ন্যায় মান্য করিত; সেই দেশ আজ অজ্ঞান অন্ধকারে সুপ্ত, এবং বহু কুসংস্কারজালে জড়িত হইয়া দিনে দিনে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠে। এই দুরবস্থা দূর করিবার একমাত্র উপায়—শিক্ষা, এই উনত্রিশ কোটি নরনারীকে শিক্ষাদান করা। আমাদের দেশের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে অধিকাংশ লোকই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—তাহারা টাকা খরচ করিয়া শিক্ষালাভ করিবে কিরূপে? সুতরাং তাহাদের শিক্ষার ব্যয় আমরা—যাহারা ঈশ্বরের দয়ায় একটু জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি, যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত একটু সচ্ছল তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। আমাদের দরিদ্র স্বদেশবাসীর জন্য আমরা কি এতটুকুও স্বার্থত্যাগ করিতে পারিব না? আমরা দেখিতেছি দেশের যত সৎকার্য্য যত মহদনুষ্ঠান তাহা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেরাই বহন করিয়া থাকেন। দেশের অগণ্য অশিক্ষিত লোকেরা এ সকলের মর্ম্ম বোঝে না, স্বদেশকে চেনে না, স্বদেশের জন্য ভাবে না, তাহারা নিজেদের সুখ দুঃখ লইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ঘরের কোণেই জীবন কাটাইয়া দেয়। তাহারাও শিক্ষা লাভ করিয়া যখন শিক্ষিতদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য কার্য্য করিবে তখন সে কাজ কত বড় হইবে! দেশের বল কত বাড়িবে! ত্রিশ কোটি ভাই ভগিনী যে দিন স্বদেশের উন্নতির জন্য চিন্তা করিবে যে দিন তাহাদের জ্ঞানের কিরণচ্ছটায় দিক্‌দিগন্ত আলোকিত হইবে সেদিন ভারতের কি মহা দিন! সেদিন কাঙালিনী ভারতজননী আবার হাসিয়া গৌরবমণ্ডিত মস্তক উন্নত করিবেন।

আমরা নিম্নে ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা স্পষ্ট করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ		
তন্মধ্যে		
পুরুষ ১৪কোটি৯৫ লক্ষ	১ কোটি ৪৬লক্ষ	১৩ কোটি৪৭লক্ষ
স্ত্রীলোক—		
১৪ কোটি ৩৯ লক্ষ।	১০ লক্ষ	১৪ কোটি২৯লক্ষ

ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষ ১০ লক্ষ স্ত্রীলোক ১ লক্ষ।

স্বদেশী মেলা।

গত ৭ই আগষ্ট ১১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটি স্বদেশী মেলা খোলা হইয়াছিল। ইহাতে গত ছয় বৎসর কাল স্বদেশে যে সকল আবশ্যকীয় এবং সৌখীন দ্রব্যাদি নির্ম্মিত ও প্রস্তুত হইয়াছে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছিল। মেলাগৃহের ঘরে ঘরে স্বদেশজাত বহুবিধ দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রত্যেক স্বদেশ-প্রাণ স্ত্রী-পুরুষের হৃদয় অভিনব আনন্দে এবং উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে আবশ্যকীয় এত জিনিষ এমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। পেন্সিল, নিব, কালী, কল-কারখানা, জুতা, সূচ, পিন, কাচের বাসন, খেলেনা, মাটির খেলেনা, কেশতৈল এবং আরও কত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য তার ঠিক নাই। ইহা ভিন্ন ঢাকা, বারাণসী, শান্তিপুরী, মুর্শিদাবাদের সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি, হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত খেলেনা, দেবপ্রতিমা ইত্যাদি বহুবিধ শোভন দ্রব্য ভারতবর্ষের চিরন্তন কারুকার্য্যের পরিচয় দিয়াছে।

ত্রিপুরার রাজকুমারীগণ স্বীয় হস্তের যে সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং ক্ষৌম বস্ত্র বয়ন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাশিল্পাশ্রমের অন্তঃপুরিকাগণ জরির কাজ এবং গেঞ্জিবয়নের জন্য সুবর্ণপদকলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়। এখন প্রস্তাব হইতেছে এই সকল স্বদেশজাত দ্রব্যাদি একত্র করিয়া একস্থানে রাখিয়া তাহার বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের বহুল উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি আগামী বৎসরের মেলায় স্বদেশজাত দ্রব্যাদির অধিকতর উন্নতি দেখিতে পাইব।

শোক সংবাদ।

৺হরিনাথ দে।

মাতা সরস্বতীর এই বরপুত্র অকালে, গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে, ইহলোক ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে গভীর শোকের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন। ভারত মাতা আজ যে উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন তাহার স্থান আর কেহ শীঘ্র পূরণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

আজিকালিকার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে কি স্বদেশে কি বিদেশে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে হরিনাথ দের নাম কাহারও অবিদিত নাই। গত ১৮৭৭ সালে তাঁহার জন্ম হয়। এই ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি ২৯টি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ভাষাপণ্ডিত ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীতে আর জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

তিনি কেবল পণ্ডিত ছিলেন না তাঁহার ন্যায় বদান্য পরদুঃখকাতর লোক বড় অল্পই দেখা যায়। প্রার্থনা করিয়া কেহ তাহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিত না, ঋণ করিয়াও দান করিতে তিনি বিমুখ হইতেন না। সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও প্রিয়ভাষী ছিলেন, তিনি এতই অধিক সরল ছিলেন, ভাল মন্দ কিছুই গোপন করিতে জানিতেন না, সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। এই সংসার-অনভিজ্ঞতা এবং অনন্যসাধারণ সরলতার জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এই স্বল্পায়ু জীবনে হরিনাথ যে সকল ভাষা আয়ত্ত করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সংস্কৃত, আরবিক, পালি, ফার্সি, উর্দ্দু, উড়িয়া, হিন্দী, বাঙ্গলা, ইংরাজী, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ, জর্ম্মাণ, তুর্কি, পর্ত্তুগিজ, পুস্তু, রুশিয়ান, পোল, হিব্রু, চীনা, জাপানী, মগ, শ্যাম, সিংহলী, তিব্বতী। দুঃখের বিষয়, এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তার কোন নিদর্শনই তিনি পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন অসম্পূর্ণ পড়িয়া আছে। আশা করা যায় দেশের গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ এই সকল রচনা একত্রে প্রকাশ করিয়া

পণ্ডিতপ্রবর হরিনাথের স্মৃতি স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন। হায়! হরিনাথের অভাবে আজ মাতার অঙ্ক শূন্য, পত্নীর হৃদয় চিরশ্মশানে পরিণত হইল।—তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের একান্ত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। শোকদুঃখের একান্ত নির্ভর বিশ্বপিতা তাঁহাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

হাইদ্রাবাদের নিজাম।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সামন্তরাজ্য দাক্ষিণাত্যের হাইদ্রাবাদ। এই রাজ্যাধিপতি আসফজা নিজাম উলমুলুক গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ২৯শে প্রাতে সংবাদ আসিল নিজাম বাহাদুর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন—অপরাহ্নে সংবাদ আসিল তিনি আর ইহলোকে নাই। তিনি যখন অতি শিশু তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়—শাসনযোগ্য বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত তিনি ইংরাজরাজের রক্ষকতায় ছিলেন। সরকার বাহাদুর অতিযত্নে তাঁহার শিক্ষা বিধান করেন। আরবি, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, এবং ইংরাজীতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দর কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং উর্দ্দু ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। পুরুষোচিত সকল কার্য্যেই তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হাইদ্রাবাদ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রাজ্যে বহু বিদ্যালয়, ঔষধালয়, সূতার কল, কাপড়ের কল, তেলের কল, ময়দার কল, রেশম পশম প্রভৃতির কারখানা স্থাপিত এবং রেল বিস্তার হইয়াছে। ইঁহার আর একটি বিশেষ রাজোচিত গুণ ছিল গুণগ্রাহিতা। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে তিনি গুণের আদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় প্রধানগণ অধিকাংশই হিন্দু। তিনি ইংরাজ-রাজের পরম মিত্র ছিলেন। মিসরযুদ্ধে, সীমান্তযুদ্ধে, বুয়রযুদ্ধে প্রত্যেক বিপদের সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজপুরুষগণের সাহায্যে অগ্রসর হইতেন এবং সীমান্তে শান্তি রক্ষা করিবার জন্য তিন বৎসরকাল ২০ লক্ষ মুদ্রা সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ইনি দুইবার মাত্র নিজের রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। একবার বড় লাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায়, দ্বিতীয়বার কর্জন লাটের দিল্লীর দরবারে আসিয়াছিলেন। নিজাম স্বীয় রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আজ তাঁহার বিয়োগে বিশাল হাইদ্রাবাদ শোকাচ্ছন্ন।

সমালোচনা।

সওগাত।—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। সর্ব্বসমেত ষোলটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আছে। হাস্য ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। আরম্ভ হইতে এমন একটি কৌতূহল স্বতঃই জাগিয়া উঠে যে গল্পগুলি একাসনে বসিয়াই পড়িয়া শেষ করিতে হয়। "একটি মেহেদির পাতায়" ছোট গল্পের আর্ট দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। নূতন ব্রতীগণ পাঠ করিয়া উপকার পাইবেন, ছোট গল্পের বিশেষত্ব কি, তাহা বুঝিবেন। "প্রবাসী" গল্পটির উপাখ্যানে কোন ঘটনা নাই, অথচ বিদায়-ক্ষণের সেই সুগভীর বেদনায় আমাদিগের সমগ্র অন্তর ক্ষুব্ধ স্তম্ভিত হইয়া উঠে। বালিকা কুন্দ তাহার অশ্রুসজল নেত্র লইয়া একেবারে আমাদিগের সম্মুখে সশরীরে আসিয়া দাঁড়ায়। "ব্যবধান" গল্পটি আগাগোড়া নাটকীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। সকল গল্পেই প্রাণ আছে, একটা সুমধুর বৈচিত্র্য আছে। পরিপাটি ছাপা, সুদীর্ঘ গ্রন্থ অথচ মূল্য সুলভ,—শারদীয় আনন্দোৎসবে এ "সওগাত" বাঙ্গালী পাঠক সাদরে গ্রহণ করিবে বলিয়া আমাদিগের যথেষ্ট আশা আছে।

ফুলের ফসল ;—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি কবিতা গ্রন্থ। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ফুলের ফসলে শতাধিক মৌলিক খণ্ড কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শোভায় সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্যে মাধুর্য্যে 'ফুলের ফসল' যেন সত্যই একখানি ফুলের বাগান। ছন্দে যেমন লীলা-প্রবাহ, সুরে যেমন মধুরতা, ভাবেও তেমনই অভিনবত্ব। আমরা আগাগোড়া সকল কবিতাগুলি পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছি। "ফুলের ফসলের" সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতে হইলে কবিতাগুলি আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া দিতে হয়। ফাল্গুনী দিনে বসন্তের হাওয়ায় কবির চিত্তনন্দনে ভাব-কলিকায় যৌনবিকাশ হইয়াছে—মুকুল আঁখি মেলিয়াছে। স্বর্গসুষমা মাখিয়া সে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কবি গাহিয়াছেন, সে কত শোভা, কত হাসি, কত সৌরভরাশি, অঙ্গ ভরিয়া আনিয়াছে—তাহার 'রূপের মাধুরী, হেরিয়া, কুহরি উঠিছে পাখী'—সে "বন-পল্লব সিন্ধু-সহরে মুকুতার ছবি" আঁকিয়া আসিয়াছে! কবির এ কথা সত্য, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অশোক, মহিয়া, করবী, "বিপদের রক্ত বিশান, বিষবুদ্বুদ্" আফিমের ফুল, চম্পা, বকুল, আকন্দ, শিরীষ—কোন ফুলেরই অনাদর নাই। চম্পা, বকুল, ভুঁই, কেলিকদম্ব প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতাই পাঠ করিবার সময় মনে হয়, যেন শেলি কিম্বা কীটসের রচনা পাঠ করিতেছি—অথচ ফুলের ফসলের কবির মৌলিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা অল্প কৃতিত্বের কথা নহে। কবি ছন্দ গাঁথিয়া গিয়াছেন, যেন ছবির পর ছবি সাজাইয়াছেন। শব্দ চয়নেও অসাধারণ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। সংক্ষেপে, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, "ফুলের ফসল" বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক খানি উৎকৃষ্ট লিরিক।

ছোট্ট রামায়ণ।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, ইউ, রায় এণ্ড সন্স। ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। রামায়ণের মূল গল্পটি গ্রন্থকার ছেলেমেয়েদের জন্য সরল ও বিচিত্র ছন্দে রচনা করিয়াছেন। ছন্দে মাধুর্য্য ও কোমলতা আছে—ভাষাও বেশ সহজ। ছোট ছেলে-মেয়েদের উপযোগী হইয়াছে। কুড়িখানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্রে গ্রন্থের কমনীয়তা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে।

খৃষ্ট।—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। গ্রন্থারম্ভে কবিবর রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ ভূমিকায় খৃষ্টচরিত্রের মহত্ত্ব ও বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কবিবর বলিয়াছেন, "স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন, মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যই সেই সত্য।" গ্রন্থকারও সাম্প্রদায়িকতাহীন নিরপেক্ষতার সহিত যীশুর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বালকবালিকা-গণের জন্য রচিত। গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া এখন আমরা মহতের আদর, মনুষ্যত্বের পূজা করিতে শিখিয়াছি, সুতরাং এ গ্রন্থখানি বালকবালিকাগণের হস্তে অসঙ্কোচে দেওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে,—"একটী গভীর প্রীতিকে তোমরা পরস্পরের প্রতি রক্ষা করিয়া চলিয়ো।" "আরও কত উচিত হইবে পরস্পরের অধীন হওয়া" প্রভৃতি রচনা-ভঙ্গীর আমরা পক্ষপাতী নহি।

Child Marriage. Poems. By A. C. Albers. যে সকল বিদেশী মহিলা আমাদের দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বিদুষী আলবার্স

তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার এই কবিতাগুলি যেন আমাদের দুঃখে সহানুভূতির অশ্রু। "The Dawn" "The child wife" প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে। রচনাগুলি একদিকে যেমন মধুর অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্য পূর্ণ।

নির্ঝর। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছোট গল্পের বই। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস—২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বারোটি মৌলিক গল্প আছে। গল্পগুলি বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ—নির্ঝরের মত স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে প্রবহমান। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"গল্পগুলি যেন ঝরণার মত ছোটে এবং ঝরণার মত ঝিকমিক করে।" সৌরীন্দ্রবাবুর লেখা পড়িতে পড়িতে মনে হয় তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনোরকমে একটা প্লট খাড়া করিয়া গল্প লেখেন না—মানব গৃহ এবং মানব চিত্তের মধ্যে অহর্নিশি যে সুখদুঃখের লীলা চলিতেছে, অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা সেগুলি দেখিয়া অনুভব করিয়া প্রাণ দিয়া গল্পের মধ্যে তাহা পরিস্ফুট করেন। সেইজন্য যেখানে তিনি হাসান সেখানে আমাদের অন্তর হাসে এবং তাঁহার বেদনার সুরে আমাদের হৃদয় সাড়া দিয়া উঠে। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি নির্ঝরের গল্পগুলি সকল শ্রেণীর পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে।

শারদা।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা!
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে?
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নাম না!
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা!

আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি',
তৃণ উঠিবে শিহরি শিহরি';
নাম' তালপল্লব বীজনে
নাম' জলে ছায়াছবি-সৃজনে;
এস সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে!
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থাম না!
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা!

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপমালিকা,
ভরি' নিশীথ তিমির-থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে;
আহা শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে!
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখশয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৪, অক্রূর দত্তের লেন ... রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৮ [৭ম সংখ্যা

আগমনী।

বরষার অবসান, স্নিগ্ধ প্রকৃতির প্রাণ
শরতের মধুর পরশে,
বাদল আসেনা নামি, বজ্রনাদ গেছে থামি
বসুন্ধরা মগন হরষে !
মিঠা কড়া রৌদ্র নিয়া শীতল সমীর দিয়া
অভিনব দৃশ্য অভিনয়,
অগণিত তারকায় অম্বর ভরিয়া যায়
আগমনী নহবতে কয় !
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আসিছে বরষ পরে
মহামায়া শক্তি বিধায়িনী,
সুমঙ্গল শঙ্খ রবে মুখরিত দিক্ সবে
আনন্দের শুভ সম্মিলনী !
আসিছেন বঙ্গমাতা, নাশিতে হৃদয় ব্যথা
সন্তানের চিত্তে অধিষ্ঠান,
দুঃখ দৈন্য করি দূর আশা মন্ত্রে ভরপুর
করেছেন ভকত পরাণ !
দরিদ্র অনাথ জন আজি কত আকিঞ্চন
পূজিবারে অভয়চরণ,
যেই শক্তি আছে যার, সর্ব্বস্ব করিয়া সার
মাতৃপদ করিবে অর্চ্চন।
এস মা এস মা প্রাণে, যেন আত্মবলিদানে
পারি তোমা পূজিতে তারিণি,—
বরষি আশীষ স্নেহ এই তুমি বর দেহ ;
ষড়রিপু বিনাশকারিণী।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শঙ্করের বিচারগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার অদ্বৈত দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্যই আমরা সংক্ষেপে শঙ্করের অদ্বৈতমতের সারমর্ম্ম পাঠকের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

শঙ্করের মতে যাহা কিছু আছে, বা ছিল, বা হইবে, জ্ঞেয় (objects of consciousness) বা জ্ঞানের বিষয় রূপেই আছে, বা ছিল, বা হইবে। জ্ঞানের অবিষয় কোন অচেতন জ্ঞেয়বস্তু, কথাই বিরুদ্ধ। জড় এবং চেতনের পার্থক্য এই যে চেতন-বস্তু সকলকেই আপনার জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় করে, জড় তাহা করিতে অক্ষম। চেতন স্বতঃই নিজেকে নিজে জানে, "সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা", এবং নিজের কথা নিজে স্মরণ করে। জড়ের সে শক্তি নাই। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে জ্ঞানেতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জ্ঞানেতেই স্থিতি, জ্ঞানেতেই লয়। জ্ঞান জ্ঞাতারই উপাধি বা গুণকর্ম্মবিশেষ, এবং জ্ঞাতাতেই অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞেয়, এবং জ্ঞাতার মধ্যে জ্ঞান, অতএব জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, জ্ঞাতা হইতে অভিন্ন—"গুণগুণিনোরভেদাৎ।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিতেছেন:—"ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" —তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"এই সমস্তই আত্মা, এ কথা কিরূপে বলা যায়? যেহেতু সকলের মধ্যেই চিদাত্মা সঙ্গে সঙ্গেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অতএব সকলই চিৎস্বরূপ। যাহা পরিত্যাগ করিলে যাহার গ্রহণ অসম্ভব, তাহা তদাত্মকই।" * যথা, কনক-কুণ্ডলের কনক পরিত্যাগ করিলে, কুণ্ডলের গ্রহণ অসম্ভব, অতএব কুণ্ডল কনকাত্মক। আবার বলিতেছেন: "উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কালে প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে অপর সমস্তেরই অসত্তা, অতএব সমস্তই প্রজ্ঞানরূপী ব্রহ্ম-স্বরূপ বা আত্মস্বরূপ।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"—শঙ্কর তাহার উপরে তদীয় ভাষ্যে বলিতেছেন:—"নাম এবং রূপাদি দ্বারা ব্যাকৃত এই দৃশ্য জগৎ, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা ব্রহ্মই। এ সকলের ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ তেজ, বারি এবং অন্ন প্রভৃতি ক্রমে এ সকল সেই ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। বিনাশকালে সেই জননক্রম অনুসারেই বিপরীতদিকে এ সকল সেই ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মেতেই মিলিয়া যায়। আবার স্থিতিকালে সেই ব্রহ্মেতেই প্রাণ ধারণ করে। তিন কালেই এ সকলের ব্রহ্মাত্মতা একরূপ —ব্রহ্ম ব্যতিরেকে তাহাদের গ্রহণ অসম্ভব। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মই।" † শঙ্করের

---

* চিদাত্মানুগমাৎ সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতৈব। যৎস্বরূপব্যতিরেকেণা গ্রহণং যস্য, তস্য তদাত্মত্বমেব লোকে দৃষ্টং।" "উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়কালেষু প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মবাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।"

† "ইদং জগন্নামরূপব্যাকৃতং প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং ব্রহ্ম।" "ব্রহ্মাত্মতয়া ত্রিষু কালেষু বিশিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণা গ্রহণাৎ। অতস্তদেবেদং জগৎ।"

মতে একই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান্। পাঠক তাঁহার হস্তামলক নামীয় দ্বাদশশ্লোকী কবিতাটি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। একই চুম্বক লৌহ-খণ্ডের উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মশালী কেন্দ্রের ন্যায়, একই জ্ঞাতা বা আত্মার জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব দুইটি কেন্দ্র বা দিক্‌মাত্র। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের যোগই জ্ঞান। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান বেদান্তে এই তিনটির মিলিত নাম 'ত্রিপুটী'। পঞ্চদশী বলিতেছেন "জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ত্রিপুটী-জন্য দ্বৈতভাবের অভাব হেতু, এক ভূমা পুরুষই ছিলেন। প্রলয়কালেও জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীভাব থাকিবে না।" *

শঙ্করের মতে আত্মা এক, এবং নাম রূপাদি সর্ব্ববিধ উপাধির অতীত, কেবল জ্ঞাতৃস্বরূপ। পাঠক, উপাধি শব্দটি বেদান্তে সচরাচরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ কি? "যাবৎকালমবস্থায়ী ভেদহেতুরুপাধিতা।" (পঞ্চদশী)। "সাময়িক পরিবর্ত্তনশীল ভেদ-হেতুর নাম উপাধিতা।" যে ভেদ বা বিশেষত্ব বস্তুর স্বরূপভূত (proprium) নয় তাহাকেই উপাধি (Accident) বলা যায়,—যথা, লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে বলা যায় নেপালের মহারাজার মহারাজত্ব তাঁহার স্বরূপভূত (proprium), কিন্তু গণ্ডগ্রামের মহারাজার মহারাজত্ব তাহার উপাধি (Accident) মাত্র। সেইরূপে তোমার দেহ, যাহার জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না, এবং তোমার মনবুদ্ধি, যাহার জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকে না,—এ সকল তোমার উপাধি (Accident), কিন্তু তোমার চৈতন্য বা সাক্ষিস্বরূপত্ব যাহা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন কালেই সমভাবে বর্ত্তমান (কারণ সুষুপ্তিরও স্মৃতি থাকে), তাহাই তোমার আত্মার স্বরূপভূত (proprium)। যাহা কিছু পরিচ্ছিন্নভাবে ধারণা করা যায়, তাহাই অনাত্মা বা আত্মার উপাধিমাত্র। এজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"—। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা (উপাধি সকল পৃথক করিয়া) সকলের ব্যক্তিগত আত্মা এক প্রত্যগাত্মস্বরূপে উপসংহৃত হইলে, দ্রষ্টার দ্রষ্টৃত্ব, ইহা নয়, উহা নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায় তাহা নয়, এইরূপে তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়। + বস্তুতঃ তুমি যদি তোমার আত্মাকে নামরূপগুণাদি সর্ব্ববিধ পরিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্ত্তনশীল উপাধি হইতে "মুঞ্জাদিবেষিকাং"—মুঞ্জঘাস হইতে তাহার ইষিকার (Flower-stalk) ন্যায় পৃথক্ করিয়া দর্শন কর, তখন দেখিবে 'তোমার আত্মা', আমার 'আত্মা' ইত্যাদি ভেদ তিরোহিত হইয়া যায়। এজন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে:—"যে তুরীয় আত্মা ব্রহ্মাদি দেবগণ মধ্যে প্রকাশমান, তাহাই আবার পতঙ্গাদির মধ্যেও প্রকাশমান।" শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে আত্মার

* ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো॥"১৪-পরিচ্ছেদ ১১। পঞ্চদশী। টীকা, "ত্রয়াণং জ্ঞাতৃ জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপাণাং পুটানাং আকারাণং সমাহারস্ত্রিপুটী॥

\+ "তং সর্ব্বাত্মানং প্রত্যগাত্মন্যুপসংহৃত্য দ্রষ্টুর্হি দ্রষ্টৃভাবং নেতিনেত্যাত্মাত্মানং তুরীয়ং প্রতিপদ্যতে।"

নানাত্ববাদীদিগের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:—"অনেকে বলেন যে ব্রহ্ম বা আত্মার একত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি সকলই পৃথকরূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব ব্রহ্মৈকত্ববাদিরা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। আবার শ্রোত্রাদি দ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি-কর্ত্তা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা, ও প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন সংসারী জীব বলিয়া অনুমিত হয়, অতএব যাহারা এ সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মই বা আত্মাই প্রকাশমান এরূপ বলিয়া থাকেন, তাহারা অনুমান-বিরুদ্ধ কথা বলেন।" শঙ্কর এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন:—"প্রত্যক্ষ অনুভূত শ্রোত্রাদিগম্য শব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব কিরূপে অপ্রমাণিত হয়? শব্দাদির ভেদ দ্বারা কি আকাশের (বায়ুর বলিলেও ক্ষতি নাই—প্রাচীনদিগের মতে শব্দ আকাশের গুণ) একত্ব অপ্রমাণিত হয়? না, তাহা হয় না। তবে শব্দস্পর্শাদির ভেদ দ্বারা ব্রহ্মেরও একত্ব অপ্রমাণিত হয় না। আর যে বলা হয় প্রতি শরীরে শব্দাদির উপলব্ধি-কর্ত্তা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-কর্ত্তা সংসারী জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন এরূপ অনুমান হয়, অতএব ব্রহ্মৈকত্বে অনুমান বিরোধ,—তাহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই, কে এই ভিন্নত্ব অনুমান করে? যদি বল আমরা সকলেই করি। তবে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলিতে কাহাকে লক্ষ্য কর? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ইহাদের প্রত্যেকে কি পৃথক্ পৃথক্ অনুমান করে? তাহা বলিবে না। বোধ হয় বলিবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি সাধনযুক্ত আত্মা সকল অনুমান করিয়া থাকে, কারণ একটি ক্রিয়া অনেক কারক দ্বারা সাধিত হয়। অনুমানও ত একটি ক্রিয়া। তবে তোমাদেরও ত অনেকত্ব প্রসঙ্গ হইল, কারণ 'আমরা' বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এবং আত্মা অনেকগুলি বুঝায়। অহো! অপুচ্ছশৃঙ্গ তার্কিক বলীবর্দ্দদিগের কি অনুমান-কৌশল। যে আপনাকেই জানে না, সেই মূঢ় কিরূপে আত্মা সম্বন্ধীয় ভেদ বা অভেদ বুঝিতে পারিবে? সে কিইবা অনুমান করিবে, আর কি লিঙ্গ বা সাধন দ্বারাই অনুমান করিবে? আত্মার মধ্যে এমন কোন ভেদ প্রতিপাদক লিঙ্গ নাই, যে লিঙ্গ দ্বারা এক আত্মা হইতে অন্য আত্মার পৃথকত্ব সাধিত হইবে। নামরূপ প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ বা ব্যাবর্ত্তক গুণ অবলম্বন করিয়া সচরাচর আত্মভেদ সাধিত হয়, সেই সকল নামরূপাদি নিত্য আত্মার পরিবর্ত্তনশীল উপাধি মাত্র, আকাশের সম্বন্ধে ঘটকমণ্ডলু-ভূচ্ছিদ্র প্রভৃতি যেমন। আকাশের নিজের মধ্যে যেমন কোন ভেদলিঙ্গ নাই, আত্মার মধ্যেও সেইরূপ কোন ভেদলিঙ্গ নাই। যাহারা নিজের আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে ভেদ করিয়া থাকে, তাহাদের শত তার্কিক মিলিয়াও আত্মার ভেদ লিঙ্গ দেখাইতে পারিবে না। আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়, অতএব স্বতঃই তাহাতে ভেদ-লিঙ্গ দর্শন অসম্ভব। যাহা কিছু লোকে একজনে অন্য জনের আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করে, তাহা নামরূপ প্রভৃতি উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। আত্মা নিত্য, অতএব সেই সকল নামরূপাদি অনিত্য উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। নামরূপাদি উপাধিসকলের উৎপত্তি এবং প্রলয় আছে—ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা

হইতে অনুরূপ। অতএব লিঙ্গাভাব হেতু আত্মভেদ যখন অনুমানের বিষয়ই নয়, তখন অনুমান বিরোধ কিরূপে হইতে পারে? *

এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অদ্বৈত-মত নানারূপ—শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এবং দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ। শঙ্কর নিজে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তিনি তাঁহার সূত্রভাষ্যে তিন প্রকার অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়া নিজের মত প্রকাশ করিতেছেন, "আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতে পরমেশ্বরই অবিকৃতভাবে জীবরূপে অবস্থিত। ব্রহ্ম হইতে জীব কোন-রূপ ভিন্ন নয়। আশ্মরথ্যের মতেও পরমেশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধই শ্রুতির অভিপ্রায়, কিন্তু শ্রুতিতে জীবকে ঈশ্বরের আশ্রিত বলা হইয়াছে, এবং এই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির জন্য জীবেশ্বরের মধ্যে এক প্রকার কার্য্যকারণভাবও শ্রুতির অভিপ্রেত। ঔড়ুলোমির মতে জীব এবং ঈশ্বরের অবস্থান্তর—সাপেক্ষ ভেদ এবং অভেদ স্পষ্টই দেখা যায়। এ সকল মতের মধ্যে কাশকৃৎস্নীয় মতই শ্রুত্যনুসারী জানা যায়, কারণ তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য যাহা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছু, এইমত তাহারই অনুসারী। † শঙ্করের এই কথা দ্বারাও দেখা যাইতেছে যে তিনি কাশকৃৎস্নের শুদ্ধাদ্বৈত মতেরই পক্ষপাতী।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

উন্মাদিনীর কাহিনী।

১

আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী।
চাহ ভাগীরথী-পারা, ছুটেছে আনন্দ ধারা;
আবার হাসিয়ে সারা চন্দ্রভাগা যামিনী!
বঙ্গনারী পাশে, আবার মেদিনী হাসে;
পতির আদর আশে পুলকিতা কামিনী।
বসে অতসীর ফুল, কর্ণে কনকের দুল,
নূপুর কিঙ্কিণী সাজে রাজে কুল কামিনী।
আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী।

২

ছুটিছে এয়োর দল, সর্ব্ব-অঙ্গে কোলাহল;
ছুটিছে বালিকা দল, সর্ব্ব অঙ্গে দামিনী।
বাজে শঙ্খ, জ্বলে ধূপ; একি শোভা অপরূপ;
রূপ যে ফাটিয়া পড়ে তোর হর-কামিনী।

৩

হরিবারে নর বলি আবার কি কুতূহলী
হয়েছিস্? একি সাধ, একি সাধ অম্বিকা?
কে আর পূরাবে সাধ? নাহি সে সোণার চাঁদ,
আমার সে, লীলাময়ী, ক্রীড়াময়ী বালিকা।

৪

ভুলিলি কি দশভুজা? হইত গো দুর্গাপূজা
বোধনে ও আমন্ত্রণে আমাদেরো দালানে।
সেই মহা স্নান দ্রব্য, গন্ধ, বাস, পঞ্চ গব্য
আসে না আসেনা আর এই মহা শ্মশানে।

৫

সেই আঙ্গুলের দাগ, বাছার সে রক্তরাগ,
এখনো লাগিয়া আছে সেই পূজা-দালানে।
হো হো হো হো হাসি পায়, এ দাগ কি ধোয়া যায়,
চির রাঙা রক্তজবা, গিরিজার বাগানে।

* চতুর্থস্থ প্রথমং ব্রাহ্মণং। বৃহদারণ্যকভাষ্য।

† ব্রহ্মসূত্র—অ ১—পা ৪—সূ ২২।

৬

মনে নাই, মহামায়া ? তোর ও চরণ ছায়া
পড়েছিল শেষ বারে যবে এই ভবনে,
রূপে গুণে মহা ধন্যা, আমার বালিকা কন্যা,
সাষ্টাঙ্গে নমিয়াছিল তোর রাঙা চরণে।

৭

তোর সেই সিংহাসন, কার্ত্তিকের সে ময়ূর,
হেরি কত হাসি খুসি আমার সে বালিকা।
শুনিয়া সানাই বাঁশী, কচি মুখে উচ্চ হাসি!
কোথায়, কোথায় গেল, সে গোলাপ কলিকা!

৮

তোর পানে চেয়ে চেয়ে, ননীর পুত্তলি মেয়ে
দিল কত করতালি, মহানন্দে মগনা ;—
পাষাণি, পাষাণ মেয়ে, নাহি বুঝি তোর চেয়ে,
তাই তারে কেড়ে নিলি ওলো হর-ললনা।

৯

বাড়িল উৎসব যাগ। এক পাল এল ছাগ ;—
সেই ছাগ মধ্য হতে শিশু ছাগ তুলিয়া,
আমার বালিকা মেয়ে, এক দৃষ্টে রয় চেয়ে,
"ইহারে পালিব আমি" বলে উচ্চে হাসিয়া!

১০

"বলির সামগ্রী ও যে, দশ ছাগ দশ ভুজে
"লইবেন দশভুজা,—যা রে দুষ্ট বালিকা।
"না বধিলে ওর প্রাণ হবে মহা অকল্যাণ
"ছাড়্ ছাড়্ ছাগশিশু,—রুষিবেন অম্বিকা।

১১

"কালি ছাগ বলি হবে। এ দুষ্টামি কেরে স'বে।"
ছাড়ি দিল ছাগশিশু মহা ক্ষোভে বালিকা।
সজল সে আঁখি তারা, আমরি কি মনোহরা,
শিশিরে উজল যেন শতদল কলিকা!

১২

সে রাত্রিতে গৃহ-বাসী, নরনারী, দাসদাসী,
হেরিল, অদ্ভুত স্বপ্ন,—যোগমায়া আসিয়া,
"চাহি না রে ছাগবলি, চাহিনা রে ছাগবলি,
ছাগবলি মহাপাপ"—কহে দেবী রুষিয়া।

১৩

পরদিন শশব্যস্ত, মোরা সবে ভয়ে ত্রস্ত
কহিলাম "ছাগবলি, দাও তবে তুলিয়া।"
"এও কি সম্ভব হয়? মিথ্যা স্বপ্নে এত ভয়?"
কহিলেন গৃহকর্ত্তা সকৌতুকে হাসিয়া।

১৪

বাজিল রে শঙ্খ ঢোল, একি উৎসবের রোল!
একে একে নয় ছাগ বলি হোলো আঘাতে।
হেরি সেই লোহ রাশি, মা হাসিল অট্টহাসি,
রোষাগ্নি উঠিল জ্বলি, লোচনের সীমাতে।

১৫

দশম ছাগেরে যবে, বলি দিতে উচ্চ রবে,
আগ্রহে তুলিল খাঁড়া, দুই ভুজ আস্ফালি।
বালিকা ধাইয়া ছুটে, ঘাতকের পদে লুটে,
কোথা দুর্গা? দুর্গা হোলো, নৃত্য-কালী করালী।

১৬

থাকিতে আমার প্রাণ হবে না এ বলিদান,
আমি ভালবাসি ওরে'—কহিল রে বালিকা,
তবু অসি সর্ব্বনাশী পড়িল কণ্ঠেতে আসি,
আমার বালিকা হ'ল ছিন্ন মস্তা কালিকা।

১৭

হতবুদ্ধি দাঁড়াইয়া, ভয়ে, কম্পে, চীৎকারিয়া
ঘাতক কহিল কাঁদি,—"একি কাণ্ড করিলাম!
আমি কাটা মুণ্ড চুমে, পড়িয়া রহিনু ভূমে,
আগমনী না ফুরাতে কি বিজয়া হেরিলাম!

১৮

তার পর কত বর্ষ, লয়ে দুঃখ, লয়ে হর্ষ,
এল, গেল,—কিন্তু তবু কি জাগ্রতে স্বপনে,
হেরি সেই ভীমা শ্যামা মেচে মেচে কহে বামা,
জীবে দয়া নাহি যথা থাকি নে সে ভবনে।

•

উপাসনা, আরাধনা, সকলিরে বিড়ম্বনা;
সর্ব্ব জীবে বাসে যেই সেই উপাসক রে।
আমার পূজার ছলে, নরনারী দলে দলে,
আজি বাঙ্গালীর ঘরে প্রচণ্ড ঘাতক রে।

২০

হেরিয়া শিশুর মুখ, মা যেমন পায় সুখ,
মন মন দেখে যথা বাছার বদন রে।
মোরো তম দুঃখ নয়, কত হয় সুখোদয়,
ছাগের ও মুখচন্দ্র করিয়া চুম্বন রে।

২১

ছুঁইলে একটি পাতা সর্ব্বাঙ্গেতে বাজে ব্যথা,—
আমি লজ্জাবতী-লতা বিশ্বের জননীরে।
রুধিরে করায় স্নান, সহে না এ অপমান;
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপনী রে।

২২

আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী।
ভাগ্র-ভাগীরথী পারা, ছুটিছে আনন্দ ধারা,
আবার হাসিয়ে সারা চন্দ্রভাগা যামিনী।
রজনীহাসার বাসে আবার ধরণী হাসে,
পতির আসার আশে পুলকিতা কামিনী।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে, কুলের কামিনী রাজে,
আমি কিন্তু একি হেরি কিবা দিবা রজনী
চারি ধারে চারি ধারে রুধিরাক্ত অবনী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

জগন্নাথ।

(প্রাচীন ইতিহাস)

রাজা নাই, প্রজা নাই,—ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডাল নাই—নিখিলের এক-ই আসন! কারণ, তিনি জগন্নাথ,—জগৎ তাঁহারই লীলালয়,—আমরা তাঁহারই সন্তান,—তাঁহার স্নেহ, তাঁহার করুণা, তাঁহার নির্ম্মাল্য আমরা সকলেই পাইব,—ধনী বলিয়া কেহ বেশী না,—গরীব বলিয়া কেহ কম না! আভিজাত্যের ঢক্কা এখানে নীরব, দীনের অভাব ক্রন্দন এখানে মূক! তাই শাক্ত আর বৈষ্ণব আর শৈব এখানে আসিয়া সবাই এক হইয়া গিয়াছে—এক দেবতা, এক পূজা, এক আহার! তাই ভাবি, ভক্তি কি স্বর্গীয়! শুষ্ক বক্তৃতায় যে সাধনার সিদ্ধি স্বপ্ন বৈ কিছু নয়,—এক ভক্তি তাহার স্বপ্ন ঘুচাইয়া দিয়া, সত্যের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিতেছে! এবং এই কারণেই, শিল্প এখানে স্বল্প হইলেও এ প্রেমের পীঠের মাহাত্ম্য অল্প নয়। শুধুই যে আকাশস্পর্শস্পর্দ্ধিত উচ্চ চূড়ার জন্য, জগন্নাথের আদর,—তাহাও বলিতে পারি না। তাহা হইলে তালী-তরু ফেলিয়া লোকে গোলাপ-চারাকে রত্ন-বৎ যত্ন করিত না। মিসেস্ ম্যানিং বলিয়াছেন,—"It is somewhat imposing owing to its size * * * and it is far inferior in point of art." (১) তাই আগেই বলিয়াছি, কিসের জন্য জগন্নাথের এত আদর!

জগন্নাথের অপার মহিমা, শত শাস্ত্রে ও পুরাণে কথিত হইয়াছে। পুরাণের সে 'পুরাণ' কথা এখানে আর তুলিয়া কাজ নাই—

(১) Ancient and Medioeval India, By Mrs. Manning. Vol. 1. p. 427.

কোন হিন্দু তাহা পাঠ করেন নাই? (২) বিষ্ণুর পরিত্যক্ত শঙ্খ এখানেই পড়িয়াছিল, তাই ইহার অপর নাম শঙ্খতীর্থ। শঙ্খতীর্থ কতদূর?

"যৎক্ষেত্রস্পর্শতো বিপ্রাঃ সমুদ্রস্তীর্থরাট স্মৃতঃ।
ক্রোশত্রয়োন্নতিযুতে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
শঙ্খাকারেঽপি তন্মধ্যে রাজতে নীলভূধরঃ॥
নীলাদ্রিমহোদয়।

যে ভূমির পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া সমুদ্র তীর্থশ্রেষ্ঠ; সেই তিন ক্রোশ বিস্তৃত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলভূধর বিরাজিত। মন্দিরের কথা বলিব, আগে ইতিহাসের কথা কিছু বলি।

আমরা বৌদ্ধযুগ হইতে আমাদের কাহিনী আরম্ভ করিলাম।

বৌদ্ধযুগ।—৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে, কুশীনগরে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে, তাঁহার শিষ্য ক্ষেম-কর্ত্তৃক বুদ্ধদন্ত উৎকলে আনীত হয়। ব্রহ্মদত্ত তখন উৎকলের রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল দন্তপুরে। (৩) তিনি আপন রাজধানীতে উৎসব-সমারোহের মধ্যে বুদ্ধদন্তের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর, সম্রাট অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কথিত আছে, কলিঙ্গের যুদ্ধে অসংখ্য নরহত্যা দর্শন করিয়া অশোক সাতিশয় অনুতপ্ত হন। এবং সেই সর্ব্বজন-কাম্য অনুতাপই তাঁহার জীবনে নবভাবের প্রেরণা আনয়ন করে। অশোক হইতে গুপ্তবংশীয় রাজগণের কাল অবধি, উৎকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকে। (খৃ পূঃ ২৫০—৩১৯ খৃষ্টাব্দ)

ব্রহ্মদত্তের বংশধরগণের মধ্যে গুহশিব প্রসিদ্ধ নরপতি। (৩৭০—৩৯০ খৃষ্টাব্দ) তিনি একজন ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিতে লাগিল,—ক্রুদ্ধ হইয়া গুহশিব সমস্ত ব্রাহ্মণ সভাসদকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। গুহশিব স্বাধীন ছিলেন না,—জম্বুপতি পাণ্ডুর অধীনে তিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। পাণ্ডু হিন্দু ছিলেন। নির্ব্বাসিত সভাসদ্‌গণ পাণ্ডুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদের নির্ব্বাসন-কাহিনী প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে উদ্দীপ্তরোষ পাণ্ডু গুহশিবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধের অহিংসা-মন্ত্র যাঁহার কণ্ঠে নিত্য উচ্চারিত হয়,—নরশোণিতে মেদিনীপ্লাবন তাঁহার ধর্ম্ম নয়। গুহশিব, বুদ্ধের বদলে বুদ্ধের দন্ত লইয়া শুদ্ধচিত্তে পাণ্ডুর নিকটে

(২) যাঁহারা প্রাচীন পুস্তকে জগন্নাথের কথা জানিতে চান, তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পড়িতে পারেন:—স্কন্দপুরাণ। কূর্ম্মপুরাণ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র। পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। বংশাবলী। নারদপুরাণ। নীলাদ্রিমহোদয়। ব্রহ্মপুরাণ। কপিল-সংহিতা। ক্ষেত্রমাহাত্ম্য। শঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ও কাশীদাসের মহাভারত।

(৩) এই দন্তপুর এখন কোথায়? কারগুসান বলেন, আধুনিক পুরী, প্রাচীন দন্তপুর। ডাঃ হাণ্টারেরও ঐ মত। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বলেন, বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের মধ্যস্থলে অধুনাপ্রসিদ্ধ দাঁতন নামে যে গ্রাম আছে, তাহাই প্রাচীন দন্তপুর। বুদ্ধদন্ত যখন সিংহলে যায়, তখন তাহা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে জাহাজে তোলা হয়। পুরী হইতে তাম্রলিপ্ত অনেকদূর, কিন্তু বর্ত্তমান দাঁতন হইতে তাম্রলিপ্ত বড় বেশীদূর নয়।

উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধ হইল না,—শত্রু পাণ্ডু মিত্র হইলেন। তৈলের সংস্পর্শে লৌহের মরিচা থাকে না—পাণ্ডুও বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। কিছুদিন যায়। মালব-দেশের রাজকুমার বুদ্ধদন্ত দেখিতে আসিলেন। তিনি গুহশিবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দন্তমন্দিরের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইতিহাসে তিনি দন্তকুমার নামে প্রসিদ্ধ। এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুমানে, তিনিই পুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন।

ইহার পূর্ব্বেই, পাণ্ডু, স্বর্ত্তিপুররাজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আপনিও পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বর্ত্তিপুররাজের আত্মীয়গণ, সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক বুদ্ধদন্তগ্রহণাশায় দন্তপুর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কাজেই অনিচ্ছাবাধ্য গুহশিব, বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত রণ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। এবং নিহত হইলেন।

বিপদ দেখিয়া দন্তরক্ষক দন্তকুমার এবং তাঁহার পত্নী হেমমালা, বুদ্ধদন্ত লইয়া ছদ্মবেশে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইলেন। এবং অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক সিংহলে যাত্রা করিলেন। শ্রীমেঘবাহন তখন সিংহলের রাজা। তাঁহার রাজত্বকাল, ৩২০—৩৩০ খৃষ্টাব্দ। (৪) তাহার পরের কয়েক বৎসরের ঘটনা অনেকটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

তবে, এই অন্ধকার-যুগেই, সেই পবিত্র বুদ্ধদেবের পূতঃ স্মৃতির উপরে সর্ব্বজননমস্য শ্রীজগন্নাথের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে, জগন্নাথের পূজার সহিত বৌদ্ধপদ্ধতি জড়িত ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে, বুদ্ধ-দন্তের গৌরবেই যে জগন্নাথ পুষ্ট,—একথা অবশ্যস্বীকার্য্য! কিন্তু বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু, শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। স্বমতপোষণার্থ, তিনি যে সকল তর্ক-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন,—দৃঢ়তর প্রমাণের মুখে তাহা বায়ু-তাড়িত কার্পাসের মত উড়িয়া যায়। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহা দেখাইব।

ঐতিহাসিক যুগে উৎকলে যে সকল ঘটনা হইয়াছে,—জগন্নাথ তাহার কেন্দ্র। সুতরাং অতঃপর উৎকলের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস না প্রদান করিলে, আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

রক্তবাহুর উৎকল-জয়।—

ইতিহাসে, জগন্নাথের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই, ৩১৮ খৃঃ অব্দে। (৫) সেই সময়ে, রক্তবাহু নামক একজন দুর্দ্দান্ত জলদস্যু পুরী আক্রমণ করে। রক্তবাহু যে কে এবং কোথা হইতে আসিল, তাহা নিশ্চিতরূপে কেহই জানে না। ইতিহাস এখানে নীরব। কেবল জানা যায়, সে যবন। পুরীর কালেক্টার লি সাহেব বলেন, "ইহারা গ্রীসীয় ব্যক্তি। ইহারা জাহাজে করিয়া জার্ম্মেনী বা লোহিত-সমুদ্র বা এসিয়া মাইনরের দিক হইতে আসিত। আগমনকালে, ইহাদের অত্যাচারে তীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই জর্জ্জরিত হইয়া উঠিত।" (৬)

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. vi. p. 858.

(৫) Hunter's Orissa. I.

(৬) W. H. Lee's "A short history of the Town of Puri or Jagannath. p.p. 3 4.

যবন রক্তবাহু, তাহার অসংখ্য সৈন্যের সহিত পুরীর উপকূলে অবতরণ করিল। তাহার আক্রমণ সম্বন্ধে একটী স্থানীয় কাহিনী আছে। তাহাতে কল্পনার অভাব নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা ইতিহাসের বিরোধী নয়। আমরা এখানে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লইলাম।

রক্তবাহু গোপনে পুরীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার অভিপ্রায়, পুরী আক্রমণ। কিন্তু পুরীর রাজা, এই বলবান বিপক্ষের সহিত বলপরীক্ষায় সাহসী না হইয়া জগন্নাথের মূর্ত্তি ও দেবতার অলঙ্কারাদি লইয়া, শোনপুর গোপালীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে, যবনেরা পুরীতে আসিয়া, রাজাকে দেখিতে পাইল না। ফলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণপূর্ব্বক অসংখ্য অধিবাসীকে নিহত করিল। এবং তৎপরে পলায়িত রাজার অনুসন্ধানে তৎপর হইল। উপায়ান্তর অভাবে, আমাদের সাহসী রাজা, দেবমূর্ত্তিকে ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতরে পলায়ন করিলেন।

এদিকে, রক্তবাহু কয়েকজন লোকের মুখে রাজার পলায়নসংবাদ শ্রবণ করিল। তখন সে সমুদ্রের উপরে মহা চটিয়া গিয়া বলিল, "তবে রে পাজী! রাজা তোর সুমুখ দিয়া পলাইয়া গেল, আর তুই কি না সব জানিয়া শুনিয়াও আমাকে কিছু বলিস নাই? দাঁড়া, তোকে আচ্ছা শাস্তি দিব!" ব্যাপার বড় সুবিধার নয় বুঝিয়া, সমুদ্র তাড়াতাড়ি ক্রোশখানেক তফাতে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার পরেই, কি ভাবিয়া আবার পাহাড়ের মত উচ্চ হইয়া তীরের উপরে আসিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের জলে সমস্ত দেশ ভাসিয়া গেল। ইহার ফলেই চিল্কা হ্রদের উৎপত্তি। সমুদ্রের বিক্রমে, রক্তবাহুর অনেক সৈন্য মরিয়া গেল। জঙ্গলের ভিতরে রাজাও প্রাণত্যাগ করিলেন। (৭)

মৃত রাজার পুত্র ইন্দ্রদেব, এই ঘটনার পরে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রক্তবাহু, পুরীর আশা পরিত্যাগ করিল না। সে পুনর্ব্বার পুরী আক্রমণ করিল, রাজাকে নিহত করিল, এবং নিজে পুরীর রাজা হইয়া বসিল। রক্তবাহুর পরে, তাহার বংশধরগণ পরবর্ত্তী দেড়শতাব্দকাল পুরীর সিংহাসন পরিত্যাগ করে নাই।

কেশরী বংশ।—অতঃপর, কেশরী-বংশের অভ্যুদয়। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে মহাবীর যযাতিকেশরী যবনগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও পরাক্রমে যবনগণের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা পলায়ন করিল। এই সময় হইতে, পুরীর মন্দিরে একরূপ রোজনামচা লিখিত হইতে লাগিল। তাহার নাম, মাদলা-পঞ্জী। তাহা তালপত্রে লিখিত। অতএব বলা যাইতে পারে, এখন হইতে উৎকলের প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ।

যযাতিকেশরী বহু অনুসন্ধানের পরে, চিল্কা হ্রদের তটভূমি হইতে জগন্নাথের মূর্ত্তি উদ্ধার করিলেন। মূর্ত্তির জন্য অনতিবিলম্বে দেবমন্দির নির্ম্মিত হইল। দৈনিক পূজার

(৭) Stirlings "An Account of Orissa."

ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্ধারিত হইল। এবং যাহাতে যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হয়, মহানুভব যযাতিকেশরী তাহার কোনও ত্রুটি রাখিলেন না। (৪০৯ শকাব্দার ৫ই শ্রাবণ)। এই সকল পুণ্য কার্য্যের জন্য, যযাতিকেশরী দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন আখ্যালাভ করিলেন। অদ্যাবধি শ্রীমন্দিরের সকল কার্য্য তাঁহারই নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হয়।

যযাতিকেশরীর পরবর্ত্তী রাজগণ, ইতিহাসে কেশরীবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাদ্‌লাপঞ্জীর মতানুসারে যযাতির শাসনকাল ৪৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। যযাতির মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সূর্য্যকেশরী সিংহাসন লাভ করেন। তাহার পর ৪২ জন রাজা উৎকলভূমি শাসন করেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে কেশরীবংশের পতন হয়।

কিন্তু এই বহুশতাব্দস্থায়ী রাজবংশের শাসনকালের মধ্যে পুরীর মন্দিরের কোন শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। কেশরীবংশীয়গণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই, কেবল ভুবনেশ্বরের মন্দিরগঠন লইয়া আপন আপন জীবনকাল সমাপ্ত করিয়া ছিলেন। অনেকে অন্যান্য শিল্পকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন বটে,—কিন্তু সে গুলির সমস্তই শ্মশানপতি গৃহত্যৈরাগী মহাশিবের নামে উৎসর্গিত,—জগন্নাথের তাহা হইতে কিছু লভ্য হয় নাই।

গঙ্গাবংশ।—তাহার পর বৈষ্ণবধর্ম্মী গঙ্গাবংশীয় রাজগণের শাসনকাল। আমরা, এই বংশের কয়েকজন রাজার নামের তালিকা এখানে সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রথম বংশ। ১। ভু-কপিলদেব। (১৪৭৪—১৫১৩)। ২। পুরুষোত্তম দেব। (১৫১৪—১৫৪৩)।

দ্বিতীয় বংশ। ১। গঙ্গামুকুন্দ দেব। ১৫৪৪—১৫—৯১) ইঁহার রাজত্বকালে, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড়, দেবমূর্ত্তি নষ্ট করে। সেই সময়ে ইঁহার মৃত্যু হয়।

২। রামচন্দ্র দেব। (১৫৯২—১৬২৪) ইঁহার রাজত্বকালে, উৎকলে মোগলশাসন আরম্ভ হয়। ৩। বলভদ্র দেব (১৬২৫—১৬৪১) ৪। প্রতাপরুদ্র দেব (৮) (১৬৪২—১৬৭৪) ৫। দ্রবসিংহ দেব (১৬৭৯—১৭০৫) ৬। হরিকিষণ দেব (১৭০৬—১৭১৫) ৭। গোপিনাথ দেব (১৭১৬—১৭২৫) ৮। রামচন্দ্র দেব (১৭২৬—১৭৩৬) ৯। বীরকিশোর দেব (১৭৩৭—১৭৭৯) ইঁহার রাজত্বকালে উৎকলে মহারাষ্ট্রশাসনের আরম্ভ। তাঁহার গুরু শ্রীমন্দিরের পশ্চিম তোরণ প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকর্ত্তৃক মন্দিরের প্রস্তরপ্রাচীর এবং নরেন্দ্র সরোবরের সোপানাবলী নির্ম্মিত হয়। কণারকের অরুণস্তম্ভ উৎকলে আনীত হয়।

১০। দ্রবসিংহ দেব (১৭৮০—১৭৯৭) ১১। মুকুন্দ দেব (১৭৯৪—১৮১৭) ইঁহার

(৮) রাজা প্রতাপরুদ্রই কপিলাশ পর্ব্বতের "কপিলেশ মহাদেবে"র মন্দিরনির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ, গোহত্যার পাপমোচনার্থ তৎকর্ত্তৃক উক্ত পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। Major Kittoe's Account. (J. R. A. S. B. Vol. VII. p. 685.)

রাজত্বকালে উৎকলে, ইংরাজশাসনের আরম্ভ। (৯)

আমার বিবেচনায় এই কালনির্ণয়ে কিছু কিছু গোলমাল আছে। এখানে তাহার সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব। আমরা, স্থানাভাবের জন্য হিন্দু রাজত্বের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারিলাম না। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বহু শিলালিপি প্রভৃতিতে আরও অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। (১০) ঐ সকল রাজার মধ্যে অনেকে বেশ পরাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পাদটীকায় একজন রাজার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইল। (১১)

আফগান-গণের সহিত বিবাদ-আরম্ভ।—১২১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা ঘিয়াস্ উদ্দীন, উৎকল আক্রমণ করিলেন। এই সময় হইতেই উৎকলভূমির সহিত মুসলমানগণের সংশ্রব উপস্থিত হয়। এবং অনেকবারই জগন্নাথের বিগ্রহ লইয়া বিগ্রহ উপস্থিত হয়।

ঘিয়াসউদ্দীনের বিক্রমে উৎকল-রাজ তাঁহাকে করপ্রদান করিতে স্বীকৃত হন। কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। তাহার পর, বঙ্গের আর একজন শাসন-কর্ত্তা, তোঘন খাঁ, সসৈন্যে উৎকলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু উৎকলপতিও তখন দুর্ব্বল-হস্তে অসিধারণ করিতেন না। তাঁহারাও আফগানগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রবল যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, আফগানগণ উৎকল প্রান্ত হইতে বিতাড়িত হইলেন। আফগানেরা এ অপমান ভুলিতে পারিলেন না। দশবৎসর পরে, তাঁহারা পুনর্ব্বার উৎকল আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে সমর উপস্থিত হইল। বিজয়লক্ষ্মী উৎকল ভূমির প্রতি প্রসন্না—আফগানগণ পুনর্ব্বার পরাস্ত হইলেন। উৎকলের সে বীরবাহু আজ কোথায়? (১২)

ইহার পরের ঘটনা, একখানি লিপিপাঠে জানা যায়। কপিলেশ্বর-গজপতি নামে এক পরাক্রান্ত রাজা, উৎকলশাসন করিতেন। তাঁহার বংশের এক ব্যক্তির নাম চন্দ্রদেব। চন্দ্রদেবের পুত্রের নাম, শুহিদেব পাত্র। গণদেব, তাঁহারই পুত্র। তিনি তুরস্কজাতীয় চুজন

(৯) See History of Pooree: By Brij Kishore Ghose.

(১০) যাঁহারা উড়িষ্যার শিলালিপির বিষয় জানিতে চান, তাঁহারা W. H. Lee's "Inscriptions in the District of Puri" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

(১১) নিম্নলিখিত লিপিতে যে রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি তোলঙ্গপতি ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক উৎকল জিত হইয়াছিল। পুরীর ব্রহ্মেশ্বর মন্দির হইতে লিপিখানি পাওয়া যায়।

"He (Janamenjaya) was a celebrated emperor, master of the kingdom of seven limbs of wonderful understanding in power and morals, charitable, most virtuous, a hero, and like Raja Yayati, an ornament of the earth;" প্রভৃতি। Journal of the Asiatic Sosiety of Bengal, Vol. VIII. p. 560.

(১২) Hunter's Orissa.

রাজকুমারকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। (১২) লিপির কালনির্ণয় করিলে বোঝা যায়, উক্ত তুরস্ক রাজকুমারদ্বয়, সম্ভবতঃ বামনীবংশীয় নবাব দ্বিতীয় আলাউদ্দীন সার দুই জন সেনাপতি।

ঐতিহাসিক আলি বীন বলেন, আমেদ সা ১১৩৫ অব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৪৫৭ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে, তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু অন্য একখানি পুস্তকের মতে, আরও চারি বৎসর পরে আমেদসার মৃত্যু হইয়াছিল। (১৩)

হুমায়ুন সা'র পরে (১৪৬১—৩রা ফেব্রুয়ারী) (১৪) উড়িষ্যার একজন রাজা, আফগানরাজত্ব আক্রমণ করেন। বামনী বংশীয় নিজামসা তখন সুলতান। তিনিও সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক উৎকল রাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উৎকলপতির অধীনে দশ হাজার পদাতিক এবং চারি শত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কিন্তু সুলতানের সেনাপতি সা মুহাবুল্লা,—কেবল ঈশ্বরের করুণার প্রতি নির্ভর করিয়া, মাত্র এক শত যাট জন বল্লমধারী অশ্বারোহী লইয়া উৎকলপতিকে আক্রমণ করিলেন। দিবাবসান কালে যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। উৎকলরাজ, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। (১৫)

উপরলিখিত সংগ্রাম-কাহিনী নাম্নী উপকথার প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। সৈন্য সংখ্যার বাহুল্য রণজয়ের কারণ নয়, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু দশ হাজার পদাতিক এবং চারি শত অশ্বারোহী সৈন্যকে যে এক শত যাট জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করি না। ভিতরে, একটু কল্পনা,—একটু গোলমাল,—একটু পক্ষপাতিতা আছে।

কিছুদিন পরে, বাঙ্গলার আর এক

(১২) Indian Antiquary. 1891. Vol. XX, November সংখ্যায় ৩৯০—৯৩ পৃষ্ঠায় এই প্রয়োজনীয় লিপির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা আবশ্যকবোধে কতক অংশ উদ্ধার করিলাম :—

Verse :—Let him be ever victorious the brave and illustrious Kapilesvara Ganapati ; who have worshipped the Lord of three Worlds, the crest jewel of the black-mountain (?) the blessed God Jagannahtha &c.

His capital, the City called kataka on the bank of Mahanadi, &c.

Just as the full moon from the Ocean, the glorious Chandradeva was produced in his race. From him sprang the famons Guhedeva patra, as Guha from Mahesa.

From this favourite of the earth came the victorious King Ganamahipati, who (because) he vanquished with his arms two Turushka princes, was therefore called Rantaraya &c,"

(১৩) Tazkarat-ul-Muluk.

(১৪) ফেরিস্তা বলেন, ২৮শে অক্টোবর।

(১৫) Burhan-i-Maasir ; By Ali Bin Azizullah Tabataba ; এই বইখানি ফেরিস্তারও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

জন শাসনকর্ত্তা,—সলিমান, উৎকল আক্রমণ করেন। আকবর তখন ভারতসম্রাট। এবং মুকুন্দদেব তখন উৎকলের সিংহাসনে। উপস্থিত বিপদে, মুকুন্দ দেব ভীত হইলেন না। তিনি সাতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দুর্গাদিনির্ম্মাণপূর্ব্বক আপনার অবস্থান, দৃঢ়তর করিয়া তুলিলেন। ফলে, বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ হইল। মুসলমানেরা সেবারে প্রস্থান করিল। (১৬)

কালাপাহাড়।—কিন্তু তাহার কিছু দিন পরেই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। স্থলেমানের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সেনাপতি কালাপাহাড়, উৎকল আক্রমণ করিল। (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ) রাজা মুকুন্দ দেবেরও সাহস ও বীরত্বের অভাব ছিল না,—কিন্তু চির-চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী এবারে তাঁহার প্রতি বিরূপা। যাজপরের নিকটে আর একবার হিন্দু ও মুসলমানের বল পরীক্ষা হইল। মুকুন্দদেব পরাস্ত হইলেন এবং সম্মুখযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল মরণকে আলিঙ্গন করিলেন।

বিজয়োল্লাসের সহিত কালাপাহাড়, দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল। এবং পথি মধ্যে ইতস্ততঃ যত হিন্দু দেবালয় তাহার চক্ষুতে পড়িল,—সমস্তই বিনষ্ট হইল। সমগ্রউৎকলব্যাপী বিরাট ধ্বংসস্তূপ অদ্যাপি সেই অত্যাচারের আঘাত বক্ষে লইয়া বিরাজমান,—সে ক্ষতে আর কখনও ঔষধ পড়ে নাই। জনপ্রবাদ বলে, কালাপাহাড়ের গোচর্ম্মনির্ম্মিত ঢক্কার ভীম আরাবে, দেবতাদের পাষাণ অঙ্গ সকল দেহ-বিযুক্ত হইয়া, স্খলিত হইয়া পড়িত। কালাপাহাড়ের আক্রমণের ভীষণতা, ইহাতেই স্বপ্রকাশ।

প্রেমের দেবতা জগন্নাথ,—যুদ্ধে তাঁহার চির-বিতৃষ্ণা! বিপদ দেখিলেই তিনি মন্দির ছাড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছেন,—এমন একবার নয়,—দুই বার নয়,—বহুবার। তখন ভূ-গর্ত্ত বৈ তাঁহার নান্যঃপন্থা! এবারেও তাহা হইল। কিন্তু কালাপাহাড় বড় চতুর। দেবতার পলায়নসংবাদ সে পূর্ব্বাহ্ণেই সংগ্রহ করিয়াছিল; অতএব জগন্নাথ, এবার আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া আসিল এবং তাঁহাকে সর্ব্বভুক্ অগ্নির লোলিহান জিহ্বায় সমর্পণ করিল।—কিন্তু আশ্চর্য্য! সেই দণ্ডেই কালাপাহাড়ের মৃত্যু হইল। অবশ্য, এই মৃত্যুকাহিনীও জনপ্রবাদের নিজস্ব। ইতিহাস এখানে কোন কথা কয় নাই।—আমরাও ইহার সত্যাসত্য লইয়া আর নাড়াচাড়া করিলাম না। যাহা হোক,—কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পরে, জগন্নাথের দগ্ধাবশিষ্ট মূর্ত্তি,—বেসরমহাপাত্রকর্ত্তৃক জাহ্নবীর প্রবহমান স্রোতঃমুখে পুনর্ব্বার স্বদেশে আনীত হইল। ইহাই মাদলা পাঞ্জীর বিবরণ। (১৭)

পরবর্ত্তী বিংশতিবৎসরকালের ইতিহাস, বিশৃঙ্খলতার এক শোচনীয় কাহিনী! দেবালয় ধ্বংস-চূর্ণ,—তাহাতে দেবতা নাই! সমগ্র দেশে প্রজার হাহাকার বাজিয়া উঠিয়াছে,—সিংহাসনে রাজা নাই! তাহার পর, ১৫৮০

(১৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal. XV.

(১৭) Hunter's "Orissa"—Vol. I.

খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র দেব রাজা হইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্ব্বার দেবালয়ের মধ্যে দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু আবার বিপদ আসিল। গোলকুণ্ডা হইতে মুসলমান আক্রমণকারিগণ আবার উৎকলের উপরে পতিত হইল। সে যুদ্ধেও উৎকলপতি পরাজিত হইলেন। (১৮)

দাউদ খাঁ যখন বাঙ্গলায় আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর নিকটে পরাস্ত হন,—তখন তিনি কটকে পলাইয়া আসেন। কিন্তু কটকে আসিয়া, তিনি আত্মরক্ষাতেই অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে, জগন্নাথ ভয়ে ভয়ে থাকিলেও, কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হন নাই। রণক্ষেত্রে দাউদ খাঁর মৃত্যু হইলে, তাহার সেনাপতি কতলু খাঁ, মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু পরাস্ত হইয়া অবশেষে সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন কতলু খাঁই উৎকলের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহার পরে, ঈশা খাঁ নামে একব্যক্তি দাউদের পুত্রগণের ভার-গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য, রাজা মানসিংহ তাহাদিগের হস্তে উড়িষ্যার শাসনভার ন্যস্ত রাখেন। কিন্তু তাহারা শান্ত থাকিবার পাত্র নয়। দুই বৎসর পরে ঈশা খাঁর মৃত্যু হইল। সুযোগ পাইয়া, পাঠানেরা আবার জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করিল। আকবর খাঁ, এই ঘটনায় অত্যন্ত উত্যক্ত হইলেন। সকলেই জানেন, তিনি একজন সাম্যবাদী সম্রাট ছিলেন। তিনি রাজা মানসিংহকে পুনর্ব্বার কটকে প্রেরণ করিলেন। পাঠানেরা চিরদিনের জন্য উৎকল হইতে বিতাড়িত হইলেন। (১৯)

মোগল রাজত্ব। অতঃপর উড়িষ্যায় মোগল রাজত্বের আরম্ভ। তোডরমল্ল আসিয়া উড়িষ্যার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহাদের সময়েও জগন্নাথ দু একবার বিপদে পড়িয়া-ছিলেন।

(১৫৯২ খৃঃ অব্দে) "জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী, এই ৫ সরকার ও ৯৯ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৪২, ৬৮, ৩৩০ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া-ছিল। * * * আকবরের সময় কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী উড়িষ্যার সরকাররূপে গণ্য হইলেও মোগলেরা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে আপনাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। * * সাজাহানের রাজত্বকালে ১৬১৭ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সুবায় পরিণত হয়। * * মুর্শিদকুলীর জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ প্রথমতঃ উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান পরে নায়েব নাজিমও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। * * নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় উড়িষ্যার অধিকাংশ ভূভাগ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়।" (২০) ১৬১২ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নূরজা-হানের ভগ্নীপতি ইব্রাহিম খাঁ, উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তার পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেবের সময়েও" জগন্নাথদেব

(১৮) Stirling's "An Acconnt of Orissa.

(১৯) Elphinstone's "History of India" Vol. II. p.p. 243—244.

(২০) নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড ৬৬৯—৭১ পৃষ্ঠা।

অনেক কষ্টে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। একরাম খাঁ, সম্রাটের আদেশে মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু উৎকলরাজের চাতুর্য্য ও কৌশলে মন্দির ধ্বংস হইতে হইতে হয় নাই। (২১)

নিখিলবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"সুজা খাঁ মুর্শিদাকুলী খাঁ বাহাদুরকে রুস্তমজঙ্গ উপাধিপ্রদান করিয়া, উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। * * * মহম্মদ তকীর শাসনকালে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ লইয়া, উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া চিল্কা হ্রদের পারে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২২) * * মুর্শিদকুলী খাঁ ও মীর হাবিব (তাঁহার দেওয়ান) প্রথমে পুরুষোত্তমের রাজাকে জগন্নাথের মূর্ত্তিসহ পুরী আগমন করিতে ও পুরাতন দেবমন্দিরে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার নিবারণেরও চেষ্টা করেন। ইহাতে ও অন্যান্য বন্দোবস্তে ক্রমে ক্রমে উড়িষ্যা প্রদেশের আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।"

কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব হইয়া কুলী খাঁকে উৎকল শাসন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টায় রহিলেন। ইহার ফলে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। বালেশ্বরের নিকটে একটা যুদ্ধে, সেনাপতি মীর জাফরের বীরত্বে আলিবর্দ্দী খাঁ জয়লাভ করিলেন। (২৩) কুলী খাঁর পরিবর্ত্তে আলিবর্দ্দীর জামাতা শৈয়দ আহম্মদ উৎকলের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন না। আপন অত্যাচারের জন্য আহম্মদ, দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া তুলিলেন। (২৪) বিপক্ষেরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আহম্মদ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন। বিপদ দেখিয়া স্বয়ং আলিবর্দ্দী উৎকলে আসিয়া বিপক্ষপক্ষকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহার নিয়োগে মসুম খাঁ, উৎকলের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

মারহাট্টা শাসন।—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎকল অধিকার করেন। এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর—১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা উৎকলের শাসন-দণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। (২৫)

তাঁহাদিগের রাজত্বকালে, উৎকলবাসিগণের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই 'সাইলক দি যুয়' এক একটী দ্বিতীয় সংস্করণ ছিলেন। বিবিধপ্রকারে প্রজাবর্গের রক্ত-শোষণ করিয়াও, তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না।

কিন্তু সে অত্যাচার কদাপি শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ঠাকুর জগন্নাথ, বেশ নিরাপদ-ব্যবধানে বসিয়াই

(২১) Tabciiat-ul-Nazirin.

(২২) এখানে নিখিলবাবু বোধ করি ভ্রমে পড়িয়াছেন। চিল্কা হ্রদ উৎকল-সীমার বাহিরে নয়—উড়িষ্যারই মধ্যে।

(২৩) Mutakherin.

(২৪) তারিখ ইউসুফী।

(২৫) Orme : p.274. Madras edition. 1861.

দৈনিক নিয়মিত পান-ভোজন উপভোগ করিয়া এবং অবসরকালটীকে সুবেশ নর্ত্তকিগণের নূপুর-শিঞ্জিতের কলগুঞ্জনে মধুমধুর করিয়া তুলিয়া দিনের পর দিনগুলি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরেরও কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধি যে হয় নাই—তাও নয়।

ইংরাজ শাসন।—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেসলি সসৈন্যে উৎকলভূমির দিকে অগ্রসর হন। এবং দুএকটী খণ্ডযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ, তাঁহাদের সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়,—অধিকন্তু, উৎকল রাজলক্ষ্মীও ইংরাজের সেই বিজয়-পতাকার তলে আত্ম-দান করেন। (২৬)

রক্তবাহুর পর পাঠান, পাঠানের পর মোগল, মোগলের পর মারহাট্টা এবং তৎপরে ইংরাজ; তাহার উপর কেশরীবংশ গঙ্গাবংশ (২৭) প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ;—পাষাণ মন্দিরের আঁধারকন্দরে বসিয়া বৃদ্ধ জগন্নাথ, স্তিমিত দীপালোকে এতগুলি জাতির পদাঙ্ক গণনা করিয়াছেন। সাগরের সে বালুকা-বেলায় পদাঙ্ক, পলকপরে সিকতার উপরেই স্বপ্নপ্রতিম মিলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবিধপ্রকারে অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াও,—তিনি যে, হিন্দুর গণনাতীত তীর্থ দেবতার মত, প্রলয়-ঝটিকায় চঞ্চল দীর্ঘশ্বাসবৎ মিশাইয়া যান নাই, ইহাই আশ্চর্য্য এবং সৌভাগ্যের কথা! (২৮)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নিভৃতের প্রয়োজন।

গ্রীষ্ম দুপুরে কোথায় গোপনে
হ'লো উপাদান—আহরণ,
তবেত সহসা নীরদ পুঞ্জে
বরিষার বারি বরিষণ।
ধরার জঠরে নিভৃতে গোপনে
হ'লো কত যুগ আয়োজন,
তবে ত সহসা বিশ্ব আলোকি
মহাপুরুষের আগমন।

অজ্ঞাতবাসে বনে কান্তারে
হ'লো ধীরে বল—উপচয়,
কুরু পাঞ্চাল—বিরাট সমরে
পাণ্ডব তবে লভে জয়।
কাজ হ'বে যত বিকট বিপুল
আগে তাহা তত ঘটাহীন,
তত ধীরে ধীরে নীরবে নিভৃতে
আয়োজন চলে নিশিদিন।

শ্রীকালিদাস রায়।

(২৬) Hunter's Statistical Accounts of Orissa.

(২৭) প্রসিদ্ধি আছে, গঙ্গাবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশীয় ছিলেন। আমরা স্থানাভাবের জন্য সে সকল কথা আলোচনা করিতে পারিলাম না,—তাই উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। Vide "Mackenzie Collection.

(২৮) উৎকলের ইতিহাস সম্বন্ধে, পুরাতন ভারতীতে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে, তাহাও পড়িতে পারেন।

আর্য্যভটীয় সংখ্যালিখন।

(লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে।)

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, কি সাহিত্য, কি গণিত, কি দর্শন সমস্তই প্রায় ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে লিখিত। কদাচিৎ দুই একখানি গদ্যময়। জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে সংখ্যার অঙ্কপাত অপরিহার্য্য; সুতরাং ছন্দের সৌকর্য্যার্থে অক্ষরের দ্বারা সংখ্যার নাম লিখিবার প্রথা বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। সচরাচর দুইটি নিয়ম পাওয়া যায়। প্রথমটিতে এক দুই ইত্যাদি প্রথম দশ বা দ্বাদশ সংখ্যাকে চন্দ্র, পক্ষ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে; যথা, চন্দ্র শশি=১; পক্ষ=২; নেত্র=৩; বেদ=৪; বাণ=৫; ঋতু=৬; সমুদ্র, উদধি, লোক, মুনি, অশ্ব,=৭; পর্ব্বত, নগ, বসু, সর্প, অহি,=৮; গ্রহ=৯; আকাশ, ব্যোম=০ দিক=১০; আদিত্য, সূর্য্য=১২ ইত্যাদি। এই নিয়মে একটি শব্দ যত সংখ্যক বস্তু বুঝায় বা যতগুলি বস্তুর নাম, সেই সংখ্যার জন্য সেই সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নয়টি, সুতরাং গ্রহ এই শব্দ ৯ সংখ্যাবাচক। সেইরূপ প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হয়, তাই সূর্য্য শব্দ দ্বাদশ সংখ্যাবাচক। এই সঙ্কেতের সাহায্যে সমস্ত রাশির নামকরণের একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই সূত্রে একক, দশক প্রভৃতি স্থান হইতে বামদিকের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত সংখ্যার নাম লেখা হয়। ৫৭১ এই রাশি লিখিতে হইলে "শশিবানলোকাঃ" এইরূপ বিপরীত বা বিলোম গতিতে লিখিতে হইবে। শশি=১, বান=৫, লোক=৭—এই তিন সংখ্যা দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিলে ৭৫১ হইল।

উক্ত নিয়মে অনেক সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যেমন এক সংখ্যার জন্য দুই বা ততোধিক শব্দের ব্যবহার হয়, তেমনি এক শব্দে যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার সূচনা হয় তখনই প্রকৃত অর্থবোধ দুরূহ হইয়া উঠে। 'লোক' শব্দ, "ভূঃ ভুবঃ" ইত্যাদি সপ্ত লোক আছে বলিয়া ৭ম এই সংখ্যার সূচক; কিন্তু কেহ কেহ তিন লোক ধরিয়া সেই লোক শব্দে ৩ এই সংখ্যা ধরেন। এইরূপ দ্ব্যর্থ কিন্তু অধিক নাই তাই রক্ষা।

দ্বিতীয় নিয়মটি অতি প্রাচীন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উহা বিধিবদ্ধ আছে;—

একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ॥
বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।
মধ্যং অন্ত্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরং॥

এক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে দশ গুণ করিয়া এক এক স্থান গুণিত হয়, ইহাতে ১ হইতে ৯ এবং ০ এই কয় সংখ্যারই ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং পর পর যুক্ত হইয়া সমস্ত রাশিই বুঝায়। পরার্দ্ধই সংখ্যার শেষ সীমা। বিষ্ণুপুরাণেও ইহাই উক্ত হইয়াছে (৬ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)। একটি প্রাচীন গ্রন্থে পরার্দ্ধের দশগুণ এক স্থান "ভূরি" নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। এক

হইতে পরার্দ্ধ অষ্টদশম স্থান (১০^১৮) সুতরাং ভূরি=১০^১৯। কিন্তু কোন শাস্ত্রে 'ভূরি'র উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরার্দ্ধই গণনার শেষ সীমা।

কোন কোন প্রাচ্যবিরোধী একগ্রামী তথাকথিত মহাপণ্ডিত ভারতের সমস্ত প্রাচীন গৌরব, শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি এমন কি আমাদের তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন পাশ্চাত্য প্রাচীন গ্রীসের অনুসৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদের জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র যে গ্রীস্ হইতে আসিয়াছে তাহার প্রমাণ সংগ্রহই ইহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অধুনা অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়া প্রকৃত তথ্য পাইয়াছেন, এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে সভ্যতায়, বিদ্যাগৌরবে, ধর্ম্মে এবং শিল্প, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানে—এক কথায় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ শিক্ষক এবং গ্রীস্ তাহার ছাত্র। এ বিষয়ে আমাদের ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই দুই মহাত্মার কৃতিত্ব বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এইরূপ কতিপয় মহাপুরুষের যত্নে ও চেষ্টায় ভারতের লুপ্তগৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনঃস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইয়ুরোপে এখনও অনেকে যদিও মুখে তত কিছু বলিতে পারিতেছেন না ও অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দাঁড়াইতেও পারিতেছেন না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে গ্রীসের ঘোর পক্ষপাতী, প্রমাণ ও অবসর খুঁজিতেছেন। কেহ কেহ অবিবেচ্য ঊর্ণনাভধর্ম্মী,—নিজ জালে জড়িত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় অহমিকার নামোল্লেখে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ভারতের রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং ক্ষান্ত রহিলাম; কিন্তু বিচক্ষণ পাঠক স্বল্প আয়াসেই তাঁহাদের পাইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলেন যে উপরিউক্ত সংখ্যা ও তাহার স্থান বিভাগের আদি প্রবর্ত্তক গ্রীস্। এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদের নিরপেক্ষ মত গ্রাহ্য। তাঁহাদের মতে উহা ভারতের নিজস্ব।

উপরিউক্ত সংখ্যালিখন প্রণালী দুইটিই সুপ্রচলিত। দ্বিতীয়টি প্রাচ্য প্রতীচ্য সকল দেশে সকল ভাষায় সমান ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য একটি নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এই তৃতীয় নিয়মটি জ্যোতিষী আর্য্যভটের প্রবর্ত্তিত; ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র (আধুনিক পাটনা) প্রদেশে বহু পূর্ব্ব কাল হইতে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা ও উন্নতি হইতেছিল। সেই দেশের জ্যোতিষের সহিত আর্য্যভটের নাম সংশ্লিষ্ট আছে। তিনি আর্য্যভটীয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাতে নিজ জন্ম বৎসর লিখিয়া গিয়াছেন।

ষষ্টিব্দানাং ষষ্টি, র্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দা, স্তদিহ মম জন্মনোঽতীতাঃ
কালক্রিয়াপাদ, ১০॥

"তিনটি যুগপাদ এবং ষষ্টিগুণিত ষষ্টি (৩৬০০) বৎসর ব্যতীত হইলে আমার জন্ম হইতে ত্র্যধিক বিংশতি (২৩) বৎসর অতীত হইল"।

যুগের চতুর্থাংশ যুগপাদ। সত্য, ত্রেতা,

দ্বাপর ও কলি এই চারি নামে চারি যুগপাদ—প্রত্যেকটি পড়ে ১০৮০০০০ সৌর বৎসরব্যাপী। জ্যোতিষের মতে এক যুগ অর্থাৎ এই চারি যুগপাদের পর ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ অবস্থা বিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমের ন্যায় পুনরাবর্ত্তিত হইবে। এক্ষণে, মহাভারত হইতে আমরা জানিতে পারি যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যত্যাগ ও পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ। শিলালিপি প্রভৃতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ সহযোগে ইহাও জানা গিয়াছে যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১০২ বর্ষে উক্ত ঘটনা হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ৩১০২ হইতে (জ্যোতিষ গণনার মতে) চতুর্থ যুগপাদ কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয় বিশেষরূপে গত মাসের ভারতীতে আলোচিত হইয়াছে। এই স্থলে আর্য্যভটের জন্মাব্দ স্থির করা যায়। চতুর্থ যুগপাদের ৩৬০০ বৎসর 'ব্যতীত' হইলে (৩৬০০—৩১০২) ৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হয়; সেই বৎসর আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং আর্য্যভট খ্রীষ্টিয় ৪৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি যে কুসুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহারই গ্রন্থে আছে :—

ব্রহ্ম কুশশিবুধভৃগুরবি, কুজগুরু কোণভগণান্নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি, কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানং।
গণিতপাদ, ১।

"ব্রহ্ম, ধরিত্রী, (কু), চন্দ্র, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি (কোণ), নক্ষত্রসেনা (ভগণ) ইহাদের নমস্কার করিয়া আর্য্যভট এই পুস্তকে (ইহ) কুসুমপুরে যে বিজ্ঞান (জ্ঞানং) অভ্যর্চ্চিত হয় তাহাই বলিতেছে (নিগদতি)।" ইহাতে কুসুমপুরে জন্মের কথা নাই। ঐ প্রদেশে যে জ্যোতিষমত প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল।

গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের নাম রাখিয়াছিলেন "আর্য্যভটীয়"; কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত উহার নাম "আর্য্যাষ্টশত" বলিয়াছেন, কারণ উহাতে ১০৮টি আর্য্যাবৃত্তের শ্লোক আছে। উহার টীকাকার পরমাদীশ্বর উহাকে সিদ্ধান্তের মধ্যে না ফেলিয়া তন্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন। উহার আধুনিক নাম "আদি আর্য্যসিদ্ধান্ত" বা "লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত"।

আর্য্যভটীয়ে প্রথমে উপক্রমণিকা স্বরূপ দশ শ্লোকাত্মক গীতি ছন্দে সূর্য্যাদি গ্রহের বিবর্ত্তনকাল বর্ণিত হইয়াছে, উহার নাম "দশগীতিকা সূত্র"। এই উপক্রমণিকার পূর্ব্বে ভূমিকা স্বরূপ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক আছে।

প্রণিপত্যৈকমনেকং
কং সত্যাং দেবতাং পরংব্রহ্ম।
আর্য্যভটস্ত্রীণি গদতি
গণিতং কালক্রিয়াং গোলং॥ ১
বর্গাক্ষরাণি বর্গে
ঽবর্গে ঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙ্মৌযঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরানব
বর্গে, ঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥২

প্রথমটিতে পুস্তকের অধ্যায় বিভাগ :—গণিতপাদ, ৩৩ শ্লোক; কালক্রিয়াপাদ, ২৫ শ্লোক; গোলপাদ ৫০ শ্লোক। সকল শ্লোক গুলিরই আর্য্যাবৃত্ত। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সংখ্যার নাম লিখনের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত; ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্লোকটির অর্থ এই :—"ক হইতে বর্গাক্ষরগুলি বর্গস্থানে

এবং অবর্গাক্ষরগুলি অবর্গ স্থানে (বসিবে); ঙ ও ম মিলিয়া য হয়; স্বরবর্ণ নয়টি নবক দ্বয়ের প্রত্যেক বর্গ ও (পরবর্ত্তী) অবর্গ এই স্থান দ্বয়ে একটি করিয়া বসিবে। অথবা, নবমের পর যে বর্গ স্থান তাহাতে বসিবে"। এই শ্লোকের বিশদ ব্যবচ্ছেদ ও ভাবার্থ আবশ্যক। কতক পরমাদীশ্বরের টীকা হইতে এবং কতক পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া উহার অর্থ বুঝিতে হইবে।

দশগুণিত হইয়া এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত ১৮টি স্থান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ ১৮টি স্থানকে দুই দুই করিয়া নয়টি দলে (দ্বিনবকে) বিভক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ স্থান বিভাগের ফলে দেখা যায় যে প্রত্যেক দলের প্রথম স্থানগুলি বর্গরাশি এবং দ্বিতীয় স্থানগুলি অবর্গরাশি; (নোট দেখুন)।*

এ স্থলে ১, $১০^{২}$, $১০^{৪}$, $১০^{৬}$, ইত্যাদি দলের প্রথম স্থানগুলি বর্গসংখ্যক এবং ১০, $১০^{৩}$, $১০^{৫}$ ইত্যাদি দ্বিতীয় স্থানগুলি বর্গসংখ্যা নহে। $১ \times ১ = ১$; $১০ \times ১০ = ১০^{২}$; $১০^{২} \times ১০^{২} = ১০^{৪}$ = ইত্যাদি বর্গ সংখ্যা। সুতরাং একক, শতক, অযুতক, নিযুতক প্রভৃতি স্থান গুলিকে বর্গ স্থান বা ওজ স্থান বলা যায়; এবং দশক, সহস্রক, লক্ষক, কোটি প্রভৃতি স্থানগুলিকে অবর্গ স্থান বা যুগ্ম স্থান বলে। প্রত্যেক দলের প্রথম স্থান বর্গস্থান এবং দ্বিতীয় স্থান অবর্গ স্থান। এক একটি দল এক একটি স্বরবর্ণ দ্বারা সূচিত হয়। অকার বলিলে একক ও দশক এই দুই স্থান বুঝাইবে। ইকারে শতক ও সহস্রক; উকারে অযুত ও লক্ষ; ঋকারে নিযুত ও কোটি, ইত্যাদি। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরে কোন প্রভেদ ধরা হয় না। প্রত্যেক স্বরবর্ণের একটি বর্গস্থান ও তৎপরবর্ত্তী অবর্গ স্থান এই দুইটির অধিকার।

শুদ্ধ স্বরবর্ণে সংখ্যা বুঝায় না। যেমন ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরযুক্ত হইলে তবে শব্দ হয়, সেইরূপ সংখ্যা ও তাহার স্থান যুক্ত হইলে তবে রাশি হয়। ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশ টি ব্যঞ্জন বর্ণের ১, ২, করিয়া ২৫ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকের একটি একটি মান আছে; যথা:—

ক	১	চ	৬	ট	১১	ত	১৬	প	২১
খ	২	ছ	৭	ঠ	১২	থ	১৭	ফ	২২
গ	৩	জ	৮	ড	১৩	দ	১৮	ব	২৩
ঘ	৪	ঝ	৯	ঢ	১৪	ধ	১৯	ভ	২৪
ঙ		ঞ	১০	ণ	১৫	ন	২০	ম	২৫

ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ প্রভৃতি উপরি উক্ত পঁচিশ টি ব্যঞ্জন "বর্গাক্ষর"। ইহারা সকলেই হলন্ত। নিজ নিজ মানের সংখ্যা বুঝাইয়া যে যে স্বরবর্ণে যুক্ত হয়, সেই সেই স্বরবর্ণের "বর্গ স্থান" অধিকার করে। "বর্গাক্ষরাণি বর্গে"। উদাহরণ যথা:—ক = ক্ $\times$ অ। ক্ = ১, অ এই স্বরের বর্গ স্থান একক সুতরাং

* ১, ১০ — অ; $১০^{২}$, $১০^{৩}$ — ই; $১০^{৪}$, $১০^{৫}$ — উ; $১০^{৬}$, $১০^{৭}$ — ঋ; $১০^{৮}$, $১০^{৯}$ — ঌ; $১০^{১০}$, $১০^{১১}$ — এ; $১০^{১২}$, $১০^{১৩}$ — ঐ; $১০^{১৪}$, $১০^{১৫}$ — ও; $১০^{১৬}$, $১০^{১৭}$ — ঔ

ক=১+১=১। কি=ক্+ই। ই কারের বর্গ স্থান শতক (১০²) এবং অবর্গ স্থান (১০³) সহস্র; এস্থলে বর্গস্থান লইতে হইবে, সুতরাং কি=১×১০০=১০০। সেইরূপ খি=খ্×ই=২×১০০=২০০; ঙি=৫০০; মি=২৫০০; দি=১৮০০ কারণ ইকার বর্গাক্ষরে যুক্ত আছে বলিয়া তাহার বর্গস্থান (১০০) লইতে হইবে। সেইরূপ দু=দ্× উ; দ্=১৮ এবং উকারের বর্গস্থান অযুত=১০⁴; সুতরাং দু=১৮০০০০। ধৃ=ধ্ ×ঋ; ধ্=১৯ এবং ঋকারের বর্গস্থান নিযুত=১০⁶; সুতরাং ধৃ=১৯০০০০০০। অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্গাক্ষরের পক্ষে স্বরবর্ণের নিম্নলিখিত স্থান হইবে; নোট দেখুন *

অন্তঃস্থ্য য হইতে হ পর্য্যন্ত আটটি ব্যঞ্জন অবর্গাক্ষর। উহাদের মান "ঙমৌযঃ" এই সূত্রে পাওয়া যায়। ঐ সূত্রের অর্থ এই যে ঙ এবং ম মিলিয়া য হয়। উপরি উক্ত নিয়মে

ঙ = ঙ্ + অ = ৫ × ১ = ৫
ম = ম্ + অ = ২৫ × ১ = ২৫

মিলিয়া হইল ৩০

অপিচ য=য্×অ=য্×১০ (এস্থলে অকারের অবর্গ স্থান (১০) ধরা হইল।)

সুতরাং য্×১০=৩০;

অতএব য্=৩।

ইহার পর ক্রমান্বয়ে পর পর সংখ্যা বসিবে। সুতরাং অবর্গাক্ষর গুলির মান যথা—

য	৩	শ	=	৭
র	৪	ষ	=	৮
ল	৫	স	=	৯
ব	৬	হ	=	১০

অন্তঃস্থ ব দেবনাগর দিলাম, নচেৎ বর্গাক্ষর ব ইহার সহিত একাকৃতি হইয়া পড়ে।

এই অবর্গাক্ষর গুলিও হলন্ত এবং যে যে স্বরবর্ণ যুক্ত হইবে তত্তৎসূচিত অবর্গ স্থানে বসিবে। "অবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি"। উদাহরণ যথা :—রি=র্+ই=৪×১০০০=৪০০০। এইরূপ যৃ=৮×১০০০০০০০ আট কোটি ইত্যাদি। দ্বিতীয় টীকায় স্বরবর্ণের বর্গস্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানের পরবর্ত্তী (দশগুণিত) স্থান গুলি ঐ ঐ স্বরের অবর্গস্থান। এক্ষণে কোন রাশি লিখিতে হইলে তাহার যে কোন সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি বা দুইটি অঙ্ক লইয়া তৎস্থানে উপযুক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বসাইতে হয়। কোন লিখিত রাশির অঙ্কপাত করিতে হইলে যদি যুক্তাক্ষরের পর স্বরবর্ণ থাকে তাহা হইলে ঐ স্বরবর্ণ

---

* বর্গাক্ষরের পক্ষে। (হ্রস্ব দীর্ঘ সমান)

অ = ১	...	...	...	এক	= ১
ই = ১০০	...	...	...	শত	= ১০²
উ = ১০০০০	...	...	...	অযুত	= ১০⁴
ঋ = ১০০০০০০	...	...	...	নিযুত	= ১০⁶
৯ = ১০০০০০০০০	...	..	...	অর্ব্বুদ	= ১০⁸
এ = ১০০০০০০০০০০	...	...	...	খর্ব্ব	= ১০¹⁰
ঐ = ১০০০০০০০০০০০০		...	...	শঙ্খ	= ১০¹²
ও = ১০০০০০০০০০০০০০০		...	...	সাগর	= ১০¹⁴
ঔ = ১০০০০০০০০০০০০০০০০		...	...	মধ্য	= ১০¹⁶

যুক্তাক্ষরের প্রত্যেক অক্ষরে লাগিবে। খ্রি= খি×রি, স্থু=যু×কু ইত্যাদি।

কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। বৃহস্পতির বিবর্ত্তন কাল "খ্রি চ্যু ঙ" ইহার সংখ্যা নিরূপণ যেরূপ হইবে তাহা নীচে নোটে দেওয়া হইল।

২। সৌর বিবর্ত্তন কাল "খ্যুঘৃ"।

এইরূপ সংখ্যাঙ্কের লিখনপ্রণালী বিশিষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহার উদ্দেশ্য কি? আমার বোধ হয় যাহাতে অঙ্কগুলি সহজে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে লিখিতে পারা যায় সেই উদ্দেশেই এইরূপ সংক্ষেপে অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা ও স্থানের সূচনা করা হইয়াছে। ইহাতে অনায়াসে যে কোনও বৃত্তে বা মাত্রায় শব্দ বিন্যাস করিয়া তাবৎ সংখ্যাই ছন্দে লিখিত হইতে পারে।

উপরি বর্ণিত প্রথায় আমরা তিনটি বিষয় দেখিতে পাই। (১) স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই ভেদ রাখা হয় নাই; (২) বর্গীয় অক্ষর গুলিকে অযুগ্ম (ওজ) স্থানে (একক, শতক, অযুত ইত্যাদি) দেওয়া হইয়াছে; (৩) অন্তঃস্থ বর্ণ চারিটি, শ, ষ, স এবং হ ইহাদের কেবল যুগ্ম স্থান (দশ, সহস্র, লক্ষ ইত্যাদি) দেওয়া হইয়াছে এই তিনটি নিয়মই এই প্রথার অঙ্গ। ইহার ফলে সমস্ত রাশিই ছোট ছোট শব্দে অতি সংক্ষেপে লিখিতে পারা যায়। অনেক স্থলে শ্রুতিকঠোরতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; বিকট সন্ধি ও সংযুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে হয়। যথা খ্‌য্‌; হ্‌দ্‌, শ্‌ঘ্‌, চ্‌স্‌গ, শ্‌ঝ্‌ ইত্যাদি। উপরিলিখিত উদাহরণ দুইটি শ্রুতিকটু নহে কিন্তু প্রায়ই দংষ্ট্রাভেদী বিকট শব্দ আসিয়া পড়ে—মাত্রা অনুসারে ছন্দের মধ্যে চলিলেও শুনিতে এবং উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়। কোন সংখ্যাবাচক একটা শব্দ অনেক সময় একটা দুরূহ মন্ত্রের মত শুনায়। এক জ্যোতিষী বলিয়াছেন যে এইরূপ লিখনপ্রণালী তান্ত্রিক মন্ত্র সাধনের জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উপর উপর দেখিলে বাস্তবিক এই ভাবই মনে উদয় হয়; কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে কেবল ছন্দের সৌকর্য্যার্থে ও সংক্ষিপ্ততার অনুরোধেই এই প্রথা কল্পিত হইয়াছিল। আর্য্যভটই যে এই প্রথার আবিষ্কারক তাহাও বলা যায় না। "কুসুমপুরেভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানং" যে কেবল জ্যোতিষমাত্র বা এই লিখন ধারাও নহে তাহা স্থির করা দুষ্কর।

খ্রি = খি + রি; চ্যু = চু + যু;

সুতরাং খি = খ্‌ + ই = ২ × ১০০ (বর্গ ইকার) = ২০০

রি = র্‌ + ই = ৪ × ৪০০০ (অবর্গ ইকার) = ৪০০০

চু = চ্‌ + উ = ৬ × ১০০০০ (বর্গ উকার) = ৬০০০০

যু = য্‌ + উ = ৩ × ১০০০০০ (অবর্গ উকার) = ৩০০০০০

ঙ = ঙ্‌ + অ = ২৪ × ১ (বর্গ অকার) = ২৪

একুনে ৩৬৪২২৪ বৎসর।

খ্যু = খু + যু; খু = খ্‌ + উ = ২ × ১০০০০ (বর্গ উ) = ২০০০০

যু = য্‌ + উ = ৩ + ১০০০০০ (বর্গ ঋ) = ১০০০০০

ঘৃ = ঘ্‌ + ঋ = ৪ + ১০০০০০০ (বর্গ ঋ) = ৪০০০০০০

একুনে ৪৩২০০০০ বৎসর।

এ স্থলে এই প্রথার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে এই মাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে আর্য্যভট ব্যতিরিকে অন্য কোনও গণিতবেত্তা এই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, এবং আর্য্যভটও ইহা অন্য কোথাও ব্যবহার করেন নাই। উদ্ভাবিত হইবার অল্প দিন পরেই ইহার ব্যবহার একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং যত্নরক্ষিত পশুকঙ্কালের ন্যায় ইহা সেই সময়ের নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। ইহার কারণ এই প্রণালীর গুরুত্ব। মনে মনে কোনও রাশিকে এই নিয়মে লেখা এক-প্রকার অসম্ভব। কাগজ কলম বা খড়ি না লইলে কোন একটি বিকট শব্দ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার দ্বারা কি সংখ্যা বুঝায় নিরূপণ করা অসাধ্য। মনে কর ১৫৮২২৩৭৫০০ এই সংখ্যাকে "এক শত আটান্ন কোটি বাইশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত" লিখিলে বেশ বুঝা যায়, এবং ঐরূপ লেখাও সহজসাধ্য। "এক বৃন্দ পঞ্চ অর্ব্বুদ অষ্ট কোটি দ্বাবিংশতি লক্ষ সপ্ত ত্রিংশতি সহস্র পঞ্চ শত" এইরূপ লিখিলে যদিও একটু বেশি লম্বা হয় তথাপি দুষ্কর বা দুর্ব্বোধ্য নহে। অথবা প্রাচীন মতে "বাণানাং শতং জলধির্নেত্রঞ্চ পক্ষদ্বয়ং অহি বাণৌ চন্দ্রশ্চ" এইরূপ লিখিলেও স্বল্প আয়াসেই বোঝা যায় এবং একেবারে সরাসর ঐ অঙ্কটি রাখিতে পারা যায়। কিন্তু বক্ষ্যমান নিয়মে যদি ঐ রাশিটির নাম লিখি "ঙিশিবুনৢখ্‌ৃষৃ", তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে অক্ষর ব্যবচ্ছেদ করিয়া অঙ্কপাত না করিলে মনে মনে ঠিক করা অসম্ভব।

ঙি = ৫ × ১০০ (বর্গ ই) = ৫০০
শি = ৭ × ১০০০ (বর্গ ই) = ৭০০০
বু = ২৩ × ১০০০০ (বর্গ উ) = ২৩০০০০
নৢ = ১৫ × ১০^৮ (বর্গ ৯) = ১৫০০০০০০০০
খৃষৃ = খৃ + ষৃ ;
খৃ = ২ × ১০^৬ (বর্গ ঋ) = ২০০০০০০
ষৃ = ৮ × ১০^৭ (অবর্গ ঋ) = ৮০০০০০০০

মোট ১৫৮২২৩৭৫০০

ব খৃষৃ বু শি ঙি

পাঠক, বিশেষতঃ গণিতাজ্ঞ পাঠক পাঠিকা, বুঝুন ব্যাপার কি দুরূহ! তাই এই বিকট উদ্ভাবনা কেবল পুঁথিগত হইয়াই রহিয়াছে।

আবার একটি গোলযোগ। দেবনাগর অক্ষরে ৯কারের আকৃতি ৢ এবং ঋকারান্ত ল, লৃ, এই বর্ণের আকৃতি ৢ। কোন বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে উভয়ের আকৃতি সমান, ৢ। কিন্তু ৯ যদি বর্গাক্ষরে যুক্ত থাকে তাহা হইলে উহার স্থান অর্ব্বুদ, এবং অবর্গাক্ষরে বৃন্দ; লৃ শব্দে পাঁচ কোটি বুঝায়। সুতরাং প্রকৃত অর্থ বুঝিতে গোল বাধে। একটী উদাহরণ যথা,—"ছ্লৢ"। বাঙলায় লিখিলে উহা ছৢ অথবা ছ্লৃ এই দুই বুঝাইতে পারে। কিন্তু উভয়ের কত পার্থক্য তাহা দেখ। ছৢ = ৭ × ১০^৮ = সাত অর্ব্বুদ; ছ্লৃ = ছ + লৃ নিযুত + ৫ কোটি = সাড়ে পাঁচ কোটি! সুতরাং বুঝা যায় যে আর্য্যভটীয় আধুনিক দেবনাগর অক্ষরে প্রথমে লিখিত হয় নাই; অথবা সেই সময়ের দেবনাগর বর্ণমালায় ৯কার ও লৃ এই দুয়ের আকৃতি এক ৢ না হইয়া কোনরূপ ভিন্ন সঙ্কেত ছিল যাহাতে উভয়ের পার্থক্য প্রতীয়মান হইত। অধুনা প্রচলিত দেব-

নাগর বর্ণমালার ঐ বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়াছে এবং উচ্চারণের সাম্য থাকায় অক্ষরের আকৃতিরও সাম্য দাঁড়াইয়াছে।

আর্য্যভটীয় ধারার একটী বিশেষত্ব দেখা যায়। এই নিয়মে আমরা ১০০০ বা ২০০০ কে এক শব্দে লিখিতে পারি না। লিখিতে হইলে দশ শত বা কুড়ি শত লিখিতে হইবে। ইহার কারণ ১ এবং ২ বর্গাক্ষর ক ও খ দ্বারা সূচিত হয় এবং সহস্র অবর্গ স্থান, কেবল অবর্গাক্ষরের জন্য। দশ ও কুড়ি এই দুইটিই বর্গাক্ষর ঞ এবং ন দ্বারা সূচিত হয়, সুতরাং উহাতে শতদ্যোতক ইকারযুক্ত করিয়া ১০×১০০=ঞি, এবং ২০×১০০=নি এইরূপে বুঝাইয়া এক হাজার ও দুই হাজার লিখিতে হইবে। তিন হাজারের জন্য অবর্গাক্ষর য থাকায় যি হইবে। ঐ স্থলে ইকারের অবর্গস্থান সহস্র লইতে হইবে। সেইরূপ এক লক্ষ বা দুই লক্ষ লিখিতে হইলে দশ অযুত (ঞু) এবং কুড়ি অযুত (নু) লিখিতে হইবে। দশ সখ্যাদ্যোতক বর্গাক্ষর ঞ এবং অবর্গাক্ষর হ উভয় বর্ণই আছে। কিন্তু ঞ এই অক্ষরে কেবল বর্গস্থান অধিকার করে বলিয়া উহাতে দশ, সহস্র, লক্ষ ইত্যাদি ($১০^১$, $১০^৩$, $১০^৫$ ইত্যাদি) সখ্যাই বুঝাইবে, এবং হ অবর্গাক্ষর কেবল অবর্গস্থান অধিকার করে বলিয়া উহাতে শত, অযুত, নিযুত ইত্যাদি ($১০^২$, $১০^৪$, $১০^৬$ ইত্যাদি) সখ্যাই বুঝাইবে। কিন্তু হ দ্বারা যে সব সখ্যা বুঝায় (শত, অযুত ইত্যাদি) সেই সমস্ত সখ্যাই আবার বর্গাক্ষর ক (=১) দ্বারা বুঝাইতে পারে। যথা এক শত=১×১০০ (কি) অথবা ১০×১০ (হ); এক অযুত=১×১০০০০ (কু) অথবা ১০×১০০০ (হি); এক নিযুত=১×১০০০০০০ (কৃ) অথবা ১০×১০০০০০ (হু); ইত্যাদি।

যতই দোষ থাকুক, আর্য্যভটীয় আমাদের নিজস্ব। গ্রীস্ অথবা ইউরোপীয় অন্য কোনও প্রাচীন দেশে এরূপ চমৎকার ও সুমহান্ ব্যাপার দেখা যায় না। ইহা কেবল শাকান্নভোজী একনিষ্ঠ তত্ত্ববিৎ ভারতীয় ঋষির মস্তিষ্কেই সম্ভবে। তথাপি দুই একটী "সভ্য" আছেন যাঁহারা মনে করেন যে এই বিরাট অঙ্ক লিখন প্রথার বীজ প্রাচীন গ্রীসে নিহিত! প্রমাণ নাই— তাহাতে কি হয়? তাঁহাদের এক ধুয়া "Knowing the Greek source of the greater part of the astronomy, ect., which we have in the আর্য্যভটীয় and subsequent works, we naturally think of the possibility of a similar origin for this system of numeration." ওহো! কি সুযুক্তি!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পালিভদ্র কোথায় ?

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পালিভদ্র বা পালিবোথরার নাম শুনিয়াছেন। এই পালিভদ্রের অবস্থান সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

সকলেই জানেন, ভারতের সুখসমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজন্দার নানা দেশ জয় করিয়া ও নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পঞ্চ-নদ-প্লাবিত পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে তৎপূর্ব্বে আর কোন পাশ্চাত্য জাতি ভারতে আসিয়া-ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে বলেন, পারস্যপতি দারায়স্ তৎপূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে মত-দ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আলেক-জন্দারের ভারতাগমন অবিসংবাদী সত্য ঘটনা। তাঁহার পুরুরাজার সহিত সংগ্রামের কথাও কেহ অস্বীকার করেন না।

আলেকজান্দার পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভারতের শস্যশ্যামলক্ষেত্র, ভারতের রত্নাদি, ভারতের পর্ব্বত ও নদী, ভারতের শ্রীসম্পন্ন নগরাদি দর্শন করিয়া আলেকজন্দার বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগিরথী যে সকল প্রদেশ প্লাবিত করিয়া সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে, সে সকল দেশ অধিকতর উর্ব্বর ও সুন্দর। জাহ্নবীর ন্যায় নদী যে জগতে নাই, সে সংবাদ তাহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সুতরাং এই গঙ্গাসন্দর্শনে—যে সকল স্থানের মধ্য দিয়া বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, হরজটা-বিহারিণী জাহ্নবী প্রবাহিতা হইয়াছে, সেই সকল দেশ অধিকারে—তাঁহার প্রবল বাসনা উদ্দীপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণ একবাক্যে আর অগ্রসর হইতে অসম্মত হইল। তখন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই প্রত্যা-বর্ত্তনের পথ আগমনের পথ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইল। স্বদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে—কেবল স্থলপথের উপর নির্ভর না করিয়া, জলপথের আবিষ্কারেও—তিনি মনোনিবেশ করেন। সমুদ্রপথ আবিষ্কারেও তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আলেকজন্দারের অন্যতম সুযোগ্য সেনা-পতি ও প্রতিনিধি সেলুকাস ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সামান্য যত্নবান ছিলেন না। আলেক-জন্দার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার স্থাপিত সুদূর পঞ্চনদ-রাজ্যের মূলভিত্তি অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সে সময়ে প্রাসজী-অধিপতি চন্দ্রগুপ্ত প্রবল পরাক্রমে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন। পঞ্চনদ প্রদেশস্থ যে কয়টী নগরে আলেকজন্দারের বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, সেই নগরগুলি স্বরাজ্যভুক্ত করিবার নিমিত্ত চন্দ্রগুপ্ত সচেষ্ট হন। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বিদেশী ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্য অবস্থান করিবে, ইহা চন্দ্রগুপ্তের সহ্য হইল না। কাজেই তাঁহার বিপুলবাহিনী আলেকজন্দারের অর্জ্জিত রাজ্যাধিকারে উদ্যত হইল। সেলুকসও বলপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত

হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাস্ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় সেলুকসকে ভারতভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

সেলুকাসের ভারতাধিকারের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জষ্টিন যে আভাস প্রদান করিয়াছেন, (১) আমরা তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে অক্ষম। প্লুটার্ক বলেন, আলেকজন্দার অপেক্ষা সেলুকাস ভারতের অধিকতর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্লুটার্ক সেলুকাসের চরিত্রাদি বর্ণনাকালে যেরূপ লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, যদি তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধীয় ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় তদ্রূপ লেখনী চালনা করিতেন, তাহা হইলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যাইত। প্লিনি বলেন, আলেকজন্দার ভারতের যে অংশ জয় করিয়াছিলেন, সেলুকস তদপেক্ষা অধিকদূর প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। প্লিনির মতে, গঙ্গা যেখানে সাগরবক্ষে পতিত হইয়াছে, সেলুকস তদ্দূর পর্যান্ত—গিয়াছিলেন। সেলুকসের এই দেশজয়ে পালিভদ্রের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।(২) মুসো বেয়ার বলেন, প্লিনির কথামত সেলুকস ২২৪৪ রোমান মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার উইলিয়ম রবার্টসন ডি ডি বলেন, সেলুকাসের এই অভিযান অসম্ভব ব্যাপার। সেলুকস সাগরসঙ্গম পর্যান্ত গমন করিলে ঐ সকল প্রদেশের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য বর্ণনা প্রাচীন ইতিহাসে নিশ্চয়ই পরিদৃষ্ট হইত, এবং ঐসকল অধিকৃত প্রদেশের প্রকৃত বৃত্তান্তাদি তদানীন্তন কালের পাশ্চাত্য জাতি অবগত থাকিতেন।

৩২১—২৯৭ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় হয়। সেলুকসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা পঞ্চাবের গ্রীক সাম্রাজ্যের সীমান্তে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। (৩) চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যেশ্বর হইলেও তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের যে বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার পালিভদ্র নগরের অবস্থান সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

সেলুকস যখন ইউফ্রাটিস নদীতীরে প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহার চতুর কর্ম্মচারী ম্যাগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূতস্বরূপ রাখিয়া যান। ম্যাগাস্থিনিস বহুবৎসর যাবৎ পালিভদ্র নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই পালিভদ্র চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল কি না, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে না। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র সে সময়ে কুসুমপুর এবং পুষ্পপুর নামেও অভিহিত হইত। অজাতশত্রু নামক নরপতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮১ অব্দে এইস্থানে রাজত্ব করেন। তিনি পাটলি নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহার প্রসিদ্ধিবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই পাটলিপুত্র

(১) Justin lib XV. c. 4.
(২) Pliny Nat. Hist, lib VI. c. 17.
(৩) Strabo lib XV. p. 1028.

আধুনিক পাটনার কিয়দ্দূরবর্ত্তী স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই গ্রীকেরা পালি-বোথরা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, অনেক ঐতিহাসিক এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এরূপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ দেখিতে পাই না। কারণ পালিভদ্র যাবনিক শব্দ নহে। উহা যদি পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রামাণিক সংস্কৃতাভিধানে উহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। সংস্কৃত অভিধানাদিতে পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর বলিয়া উল্লেখ আছে।

পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা না হইয়া পালিভদ্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা হওয়াই সুসঙ্গত। মেজর রেনেল পালিভদ্রের অবস্থান সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করেন, তৎসম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক মতে পালিভদ্র গঙ্গা ও হিরণ্যবহা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। আরিয়ান বলেন, পালিভদ্র গঙ্গা এবং হিরণ্যবহা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই হিরন্যবহার বর্ণনাকালে তিনি বলিয়াছেন, হিরণ্যবহা নদী যদিও গঙ্গা ও সিন্ধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহত্তর ও প্রবলতর ছিল (৪)। গঙ্গার নিম্নেই যে যমুনা স্থান পাইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আরিয়ানের বর্ণনা পাঠে উপলব্ধি হয় যে, তিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলেই পালিভদ্রের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শোণ নদের অপর নাম হিরণ্যবহা, তাহা সকলেই জানেন। গ্রীক ইতিহাস-বেত্তারা হিরণ্যবহাকে (Eranabois) ইরাণাবয়েস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদিগের এই উক্তির সমীচীনতা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের মনে হয়, উহা যমুনার নামান্তর।

এই পালিভদ্র যে প্রয়াগ (বর্ত্তমান এলাহাবাদ)—পাটনা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান নহে—তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মোগল সম্রাট আকবরসাহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ইহার এলাহাবাদ নামকরণ করেন। এলাহাবাদের হিন্দুনাম প্রয়াগ। প্রয়াগ অতি প্রাচীন নগর —হিন্দুর প্রাচীন পবিত্র তীর্থ। প্রয়াগবাসী-দিগকে প্রয়াগী আখ্যা প্রদান করা হয়। এই প্রয়াগী শব্দের সহিত "প্রাসজী" শব্দের বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, "প্রাসজীর" রাজধানী পালিভদ্র ছিল। (৫) প্রয়াগ দুর্গে এখনও সম্রাট অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে। মগধ রাজ্য যে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উহা এক সময়ে রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা কোনমতে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

মেজর রেণেলের মতে, পাটলিপুত্রের অন্য নাম পালিভদ্র। তাঁহার ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার দুইটী কারণ পরিলক্ষিত হয়। পালিভদ্র যে দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত

(৪) A Arrian Hist. Ind. c. 10.
(৫) P. Tiessenthaler, Bernorilli tom 1'223, D'Amilb P. 36.

ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। বর্ত্তমান পাটনা নগরের কিয়দ্দূরে মৃত্তিকাগর্ভে একটী নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকেই পাটলিপুত্র বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যাঁহারা পাটলিপুত্রকে পালিভদ্র বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে শোণ নদের সহিত গঙ্গা সম্মিলিত হইয়াছিল। কাজেই নদী-সঙ্গমে পালিভদ্র অবস্থিত বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত ইহার বর্ণনার ঐক্য আছে।

এখন তর্কানুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে, এই স্থানে শোণ নদের সহিত গঙ্গা পূর্ব্বে সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহার পর, কালবশে—ভারতীয় নদীর স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে—শোণ ও ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় উভয় নদীই এক্ষণে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বহুক্রোশ হইয়াছে, তথাপি প্রাচীন ইতিহাসে গঙ্গার ও তৎসম্মিলিত নদীর যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত শোণের সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না—বরং বিস্তর পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। শোন কখনই যমুনার ন্যায় প্রবল ছিল না। ইতিহাসবেত্তা আরিয়ান স্পষ্টই বলিয়াছেন, গঙ্গা ও সিন্ধু নিম্নেই যে নদী প্রবলা, সেই নদীর সহিত গঙ্গা যথায় সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলে পালিভদ্র নগর অবস্থিত। কাজেই আমরা পাটলিপুত্র অপেক্ষা প্রয়াগকেই পালিভদ্র নগরের অন্যতম নাম বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য।

মেজর রেণেলের দ্বিতীয় যুক্তি, তক্ষশীলা (বর্ত্তমান এটক নগর) হইতে গঙ্গার মোহনার দূরবর্ত্তিত্ব। এ সম্বন্ধে রেণেল সাহেব প্লিনির বৃত্তান্ত বা তালিকা পাঠে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। (৬) প্লিনিকৃত এই দূরবর্ত্তিতার তালিকা যে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। প্লিনির হিসাব ধরিলে পালিভদ্র নগর গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের ৪২৫ মাইল দূরে অবস্থিত বলিতে হয়। কিন্তু এলাহাবাদ হইতে পাটনা প্রায় দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। এই হিসাবে পাটলীপুত্রকে পালিভদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ সম্মত হইবেন কি? হয় বলিতে হইবে, প্লিনির হিসাব ভ্রমসঙ্কুল, নতুবা স্বীকার করিতে হইবে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল বর্ত্তমান সময়ে যেখানে আছে, তথা হইতে সে সময়ে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। শেষোক্ত তর্ক, কেহই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কারণ, প্রয়াগ আধুনিক নগর নহে—পুরাণেতিহাসেও ইহার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস যখন পঞ্জাব হইতে পালিভদ্রে গমন করেন, তখন যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন, সে দেশগুলি জলাকীর্ণ, শস্যাদিপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। লাহোর হইতে মগধে যাইতে হইলে এলাহাবাদ অতিক্রম করাই সম্ভবপর। বিশেষতঃ গ্রীকেরা পূর্ব্বাপর শুনিয়াছিল যে, যে

(৬) Nat. Hist. lib VI c. 17.

সকল প্রদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে, সেই সকল প্রদেশ ধনধান্যপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী ও বহুজন অধ্যুষিত। জাহ্নবীর বর্ণনায় আকৃষ্ট হইয়া গ্রীকেরা বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অভিযান করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসক ছিল। এরূপ স্থলে, গঙ্গার সৈকতভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেগাস্থিনিসের অন্য পথ অবলম্বন করাও সম্ভবপর নহে। লাহোর হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রদেশগুলির শ্রীসমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া ম্যাগাস্থিনিস মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাহাই শতমুখে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পালিভদ্র সম্বন্ধে ম্যাগাস্থিনিসের বর্ণনা পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি প্রয়াগের বর্ণনাই করিয়াছেন। এই খানেই তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎলাভ করেন। সে সময়ে জাহ্নবীতীরে চন্দ্রগুপ্ত সৈন্যসহ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলেন, পালিভদ্র অতি বৃহন্নগর ছিল। উহা দৈর্ঘ্যে অন্যূন দশ মাইল বা পাঁচ ক্রোশ, প্রস্থে দুই মাইল বা এক ক্রোশ ছিল। পালিভদ্র চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উহাতে ৬৪টী তোরণ-দ্বার ও ৫৭০টী গম্বুজ ছিল। পাটলিপুত্রের যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার ঐরূপ বিস্তৃতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। বরং প্রয়াগকেই ঐরূপ নগর বলিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

যাদবেশ্বর ও মাণিকলাল এক পিতামহের সন্তান এবং সরিকি বিবাদহিসাবে উভয়ে উভয়ের পরম শত্রু!

যেখানে রক্তের যত নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান, শত্রুতার তীব্রতাও সেখানে তত বেশী, প্রবীণেরা এরূপ বলিয়া থাকেন! এ ক্ষেত্রেও ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই!

সামান্য খুঁটীনাটী অবলম্বন করিয়াও উভয় পক্ষের 'লাঠিয়ালগণ' সমান তেজে বীরত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতনা, সুতরাং মীমাংসা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে আসিবার কোনো সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতনা।

যাদবেশ্বর ও মাণিকলাল উভয়েরই ভূসম্পত্তি ও নগদ সম্পত্তি যথেষ্ট! ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে তাহাদের বাস; গ্রামবাসীগণ ক্রমে ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া, কেহ যাদবেশ্বরের, কেহ মাণিকলালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল!

মনোমালিন্যের সূত্রপাতেই মাণিকলালের পিতা পৈতৃক ভদ্রাসনের পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডে নিজের বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন; এবং ছোট একটা রাস্তা বাহির করিয়া পুরাতন বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন!

বাড়ীর সম্মুখেই স্থাপিত দেববিগ্রহ সিদ্ধেশ্বরীমূর্ত্তি; কোনও স্থানে বা কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে প্রণাম করিয়া যাওয়াই এই পরিবারের প্রাচীন রীতি!

এখন মাণিকলালের পিতা তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যে ছোট রাস্তা বাহির করিয়া-

ছিলেন, সে রাস্তা তিনি ঠিক সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর সম্মুখেই পুরাতন ভদ্রাসনের রাস্তার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পূর্ব্বাচরিত রীতি অনুযায়ী সিদ্ধেশ্বরী প্রণাম করিবেন।

বলা বাহুল্য, দেবমন্দির ও মন্দির সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড উভয় পক্ষেরই সাধারণ সম্পত্তি!

কিন্তু ইহাতেও এক গোল উঠিল! প্রতিবৎসর বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যাইবার সময় ও বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিবার পথে, উভয় পক্ষ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির যথারীতি প্রণাম করিতে আসিত! এবং পূজার কয়-দিনও উভয় পক্ষ হইতে দেবালয়ে পূজা দেওয়া হইত! সুতরাং কোন্ পক্ষ আগে পূজা দিবে এবং প্রণাম করিয়া যাইবে, ইহা লইয়া প্রতিবৎসরই একটা অনর্থক বিবাদের সৃষ্টি এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতেই হইত!

তার পর উভয় পক্ষ পালাক্রমে এক এক বৎসর পূজা দিবে এবং প্রণাম করিয়া যাইবে, এমনি একটা সাময়িক মীমাংসাও মধ্যে হইয়াছিল।

(২)

আবার মায়ের পূজা আসিয়াছে! উৎসাহ ও আনন্দে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে!

গত বৎসর যাদবেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে আগে পূজা দিয়াছে, এবং প্রণামও করিয়াছে। এবার মাণিকলালের পালা!

সপ্তমীর প্রভাত! শেফালিকার গন্ধ আর প্রভাতী সানাইয়ের করুণ রাগিণী, একটা অপূর্ব্ব আনন্দ সংবাদ দিকে দিকে প্রচার করিতেছিল!

যাদবেশ্বরের পত্নী সুরমা আসিয়া কহিল, "ওগো, পূজাটা আজ প্রথম দেওয়া যায় না?" —"কোন্ পূজা?"—ধূমপান নিরত যাদবেশ্বর কহিল।

"এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর পূজা"—

"তা' আর কি ক'রে হয়, এবার যে ওদের পালা,"—

"ওগো, আমি যে খোকার ব্যামো'র সময় 'মানত' করেছিলেম্"—

যাদবেশ্বরের ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিল!

"তা' না দিলে অমঙ্গল হবে যে"—কাতর কণ্ঠে সুরমা কহিল!

"বাঃ, এ নিয়ে কি এখন একটা লাঠালাঠি করব?"—বিরক্তির স্বরে যাদবেশ্বর কহিল!

"তা' একবার ঠাকুরপো'কে বলে' পাঠাও না কেন!"

সুন্দরী স্ত্রীর আব্দার; বিশেষ যাদবেশ্বরও একটু"—"ছিলেন! তা' সেটা লোকে বলে! আমরা ততটা বিশ্বাস করিনা!!

যাদবেশ্বর মাণিকলালের নিকট লোক পাঠাইল।

মাণিকলাল উত্তর দিল শুধু ছোট্ট দুটি কথায় -

"তা' অসম্ভব!"

সংবাদবাহী সেটাকে অবশ্য পল্লবিত করিয়া বলিয়া গেল!

যাহারা 'বিবাদ বাধাইয়া' মজা দেখিতে চাহে, তাহাদের এমনি ভাবে একটু আধটু বাড়াইয়া না বলিলে চলে না।

(৩)

যথা সময়ে মাণিকলালের পক্ষ পূজা দিতে

আসিয়া দেখিল, যাদবেশ্বর নিজেই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পূজা দেওয়াইতেছেন! মন্দিরসম্মুখস্থ অপরিসর ভূখণ্ড লাঠিয়ালে পরিপূর্ণ!

মাণিকলালের পক্ষ প্রস্তুত ছিলনা। সহজেই তখন হঠিয়া আসিল! ক্ষুণ্ণমনে মাণিকলাল শেষে যাইয়া পূজা দিয়া আসিল!

অষ্টমী ও নবমী পূজার দিন বিশেষ কোনও গোল হইল না!

তার পর আসিল বিজয়ার দিন! কূটবুদ্ধি যাদবেশ্বর বুঝিয়াছিল, মাণিকলাল চুপ করিয়া থাকিবার 'পাত্র' নহে! বিজয়ার দিন একটা গোল বাধাইবেই!

প্রথমেই মাণিকলালের বাড়ীর প্রতিমা বাহির হইয়া গেল! সঙ্গে দু'চারিজন লোক! তার পর যাদবেশ্বরের বাড়ীর প্রতিমা বাহির হইয়া গেল! যাদবেশ্বর লোকজন সঙ্গে নিয়া সগর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী প্রণাম করিতে গেল! এবার মাণিকলালের লোক বাধা দিল! মাণিকলাল পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী লাঠিয়াল 'জমা' করিয়া রাখিয়াছিল!

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে 'দাঙ্গা' চলিল! যাদবেশ্বরের লাঠিয়ালেরা মাণিকলালের পক্ষের লোকের লাঠির চোট সহ্য করিতে না পারিয়া হঠিয়া আসিল!

এমন সময়ে যাদবেশ্বরের বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়া গেল! প্রায় পঁচিশ জন "যোয়ান্" লাঠিয়াল বাহির হইয়া আসিয়া—মাণিকলালের পরিশ্রান্ত লোকগুলির উপর লাঠি চালাইতে লাগিল! শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া মাণিকলালের লাঠিয়ালগণ পিছে হঠিল—একেবারে মাণিকলালের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল! রোষে, ক্ষোভে মাণিকলাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল!

প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে যাদবেশ্বরের দল যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন সেই ক্ষুদ্র বিজয়ীদলের আনন্দ কলরবে ও ঢক্কা নিনাদে ক্ষুদ্র গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল!

(৪)

দুপুর রাত্রে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া মাণিকলালের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পত্নী পঙ্কজকে ডাকিয়া মাণিক জিজ্ঞাসা করিল—

'কিসের গোল এ?"—

"চল ছাতে গিয়া দেখিব!"—তখন কম্পিত পদে উভয়ে ছাতে গিয়া উঠিল! ছাতের আলিসার উপর বুকে ভর দিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল—যাদবেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে! অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত কতকগুলি ছদ্মবেশী লোক ছুটাছুটি করিতেছে! কি ব্যস্ততা তাহাদের!!

মাণিকলাল অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ, ডাকাত পড়েছে যে!

"ওমা, সেকি?"—কম্পিতকণ্ঠে পঙ্কজ কহিল!

"পঙ্কজ, নেমে যাও মার কাছে!"—উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে মাণিকলাল নামিয়া গেল! বাহিরের শত্রু দেখিয়া ঘরাউ বিবাদ সে ভুলিয়া গেল! এখানে যাদবেশ্বরের স্বার্থ ও তাহার স্বার্থ যে একই,—তাহার অন্তরাত্মা সে কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

চণ্ডীমণ্ডপে লাঠিয়ালেরা ঘুমাইতেছিল।

মাণিকলাল নিঃশব্দে তাহাদের উঠাইল; তারপর তেমনি নিঃশব্দে নিজেও লাঠি হস্তে যাদবেশ্বরের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল!

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে এক তুমুল কোলাহল উঠিল! শুধু চীৎকার, আর লাঠির শব্দ!

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতের দল, বেগতিক দেখিয়া, সুশিক্ষিত সৈন্যের ন্যায় সরিয়া পড়িল!

কিন্তু উভয় দলের লাঠিয়ালে তখন সংগ্রাম বাধিল। যাদবেশ্বর ভাবিলেন—মাণিকলালেরই এ কীর্ত্তি। তিনি সেই আলোকবিরল প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বয়ং উত্তেজিতকণ্ঠে তাঁহার লাঠিয়ালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সেই উত্তেজনাকোলাহলে মাণিকলাল এবং তাহার দলের কথা শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। মাণিকলাল আত্ম-রক্ষা করিতে করিতে সহসা এক দারুণ লাঠির আঘাতে ভূশায়ী হইয়া পড়িলেন। তখন সহসা যেন সকলের নেশা ছুটিয়া গেল—মুহূর্ত্তে লাঠিয়ালগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল,—মাণিকলালের দল হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া কহিল—"বাবুমশায় যে আমাদের নিয়ে এখানে এল, ডাকাতের হাত থেকে তোদের বাঁচাতে—আর তোরা কিনা তাকেই মারলি!"

যাদবেশ্বর তখন সব বুঝিলেন,—মাণিক-লালের কাছে বসিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—মাণিক—

মাণিক বলিল—দাদা—

ভ্রাতাকে জীবিত দেখিয়া যাদবেশ্বর রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিতবক্ষের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইলেন,—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—মাপ কর ভাই, মাপ কর।

মাণিকলাল কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—'দাদা—প্রণাম—আজ এ বিজয়ার মিলন।'

বলিতে বলিতে ভ্রাতার আলিঙ্গন মধ্যে সে মূর্চ্ছিত, নীরব হইয়া পড়িল! এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ-দ্বন্দ্ব বিজয়ার দিনে এই শোক ঘটনায় চির মিলনে পর্য্যবসিত হইল।

প্রেম।

ওরে প্রেম ওরে সঙ্গোপন,
অগাধ সাগর জলে কোথায় আছিস ক'লে
শুক্তি মাঝে মুক্তার মতন
দরিদ্রের আশাতীত ধন!

শুভ লগ্নে দুর্লভ নিমেষে
দূরতম স্বর্গ ছাড়ি স্বাতির অমৃত বারি
অশ্রুর সমুদ্রে পড় এসে
অতুলন সৌন্দর্য্যের বেশে।

বিশ্ব মাঝে ত্রিদিবের সার—
প্রাণপণ সাধনায় যে তোরে খুঁজিয়া পায়
অতলের তল মিলে যার—
মর্ত্ত্য জন্ম সার্থক তাহার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।*

মাতৃপূজক রজনীকান্ত গুপ্ত আশৈশব মাতৃসেবা করিয়াছেন; তাহার ফল এই মহাকাব্য স্বরূপ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। এই ইতিহাস পূর্ব্বে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পূর্ণকলেবরে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের গবেষণা, ভাষা, ও পরীক্ষিত সত্যঘটনা এমন বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় এক অভূতপূর্ব্বভাবে পূর্ণ হয় এবং তাহারি সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের সর্ব্বত্যাগী অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা মনে আসিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুজনিত শোকে ব্যথিত হইতে হয়। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে কাব্য মহাকাব্য, উপন্যাস প্রভৃতির অভাব নাই কিন্তু এ প্রকার ইতিহাস এই প্রথম। ইহা সূচনা হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এরূপ সত্য ঘটনার সমাবেশে জীবন্ত ভাব পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে সব যেন প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হয় এবং অতীত ঘটনার শোচনীয় উপসংহারে হৃদয় নিপীড়িত হইয়া উঠে। ইতিহাসের সত্য নির্ণয় করিতে রজনীকান্ত যে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থ পাঠে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই অত্যধিক পরিশ্রমে গ্রন্থকারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া অকালে মৃত্যু হয় নতুবা আমরা আরও কত ঐতিহাসিক রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতাম এবং তাঁহার সার্থক শ্রমপ্রসূত আরও কত উপাদেয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিত সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে বীরত্ব বা সাহসের যে অভাব নাই, রাজভক্তি প্রভুভক্তিও যে অসাধারণ এই পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহা জাজ্বল্যমান। লেখকের বিচিত্র বর্ণনায় এই সকল ঘটনা উপন্যাস হইতেও মনোমুগ্ধকর, পাঠকালে উৎসাহে দেহ মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, তথাপি আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।—

চতুর্থ ভাগ, ৯১ পৃষ্ঠা। "দিল্লীর যুদ্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষ লিখিয়াছেন,—"একদা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার কামানসমূহ ব্যূহের পার্শ্বভাগে আনীত হইয়াছিল। আমি গোলাবৃষ্টি করিয়া, বিপক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। আমার একজন ভারতবর্ষীয় কামান-পরিচালকের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহার হাঁটুর নীচের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে সকল ঘোড়াদ্বারা কামান পরিচালিত হইতেছিল, এই আহত ব্যক্তি তৎসমুদায়ের একটির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কামান থামাইতে বলিলাম এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইতে চাহিলাম। সে কহিল, "কুচ পরওয়া নেহি সাহিব।" আমি যদি পীড়াপীড়ি করিয়া, তাহাকে ঘোড়া হইতে না নামাইতাম এবং ডুলিতে না তুলিয়া দিতাম, তাহা হইলে সে ঘোড়ার উপরেই থাকিত। আমার যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক ছিল, তাহারা এই ভাবে সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।"

পঞ্চম ভাগ, ৭৪ পৃষ্ঠা। "এই সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দিগের একদেশীয় কৃতজ্ঞ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইল না, তাহারা বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র আনিয়া আপনাদের প্রভুদিগকে দিল। এই সময়ে যদি সিপাহীদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের কেহই তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। * * যখন সিপাহীগণ উত্তেজিত

* ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। বৃহদাকার দুই খণ্ডে সমাপ্ত, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৯৲ টাকা। প্রথম খণ্ডে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ পঞ্চম ভাগ সন্নিবেশিত। ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে প্রকাশিত।

হইয়া ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের রক্তবতী হিংসার তৃপ্তি সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের দলের অনেকেই সেই বিপন্ন ও তাহাদের স্বজাতি কর্তৃক আক্রান্ত ফিরিঙ্গীর জীবন রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। শাহাজানপুরেও এইরূপ প্রায় ১০০ প্রভুভক্ত সিপাহী তাহাদের অফিসারদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

এইরূপে [illegible] ইউরোপীয়দিগের জীবন নিরাপদ হইয়া উঠে।

একটি রমণীর সাহসের ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ ভাগ, ১০৫ পৃষ্ঠা। "পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের একটি কৃষককন্যার পরাক্রমে অর্লিয়েন্স নামক নগরে ইংরেজ সৈন্য যেরূপ বিস্ময়ভক্তি

হইয়াছিল, দিল্লীতে ইংরেজদের শিবিরস্থিত সৈনিকেরা একটি মুসলমানতনয়ার পরাক্রমদর্শনে সেইরূপ ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিল। এই নারী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ও অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। * * * উক্ত মহিলা শেষে অবরুদ্ধ হইলে সেনাপতি উইলসনের আদেশে মুক্তিলাভ করে। তাহার আবির্ভাবে মুসলমানসৈন্য অধিকতর উৎসাহযুক্ত ও উত্তেজিত হইবে ভাবিয়া, কাপ্তান হডসন্ তাহাকে পুনর্ব্বার বন্দী করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে এই নারী পুনর্ব্বার অবরুদ্ধ হইয়া অম্বালায় প্রেরিত হয়। ইংরেজের শিবিরে এইরূপ যোয়ান আর্কের আবির্ভাব উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অল্প বিস্ময়কর ঘটনা নহে।"

ইংরাজ সেনাপতিগণও তাঁহাদের অধীনস্থ সিপাহীগণকে কিরূপ ভালবাসিতেন—নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্থ ভাগ, ৫০ পৃষ্ঠা। "এদিকে সিপাহীদলের অধিনায়কগণ তাঁহাদের অনুরাগভাজন, তাঁহাদের প্রীতির পাত্র, তাঁহাদের বিশ্বাসের অদ্বিতীয় আস্পদ সৈন্যগণ যখন নীরবে, অধোবদনে আপনাদের সামরিক চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে লাগিল, বীরত্বের পরিচয়সূচক গৌরবকর অস্ত্রসকল যখন একস্থানে স্তূপাকার করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রীতিপাত্রদিগের এইরূপ অধোগতিদর্শনে যুদ্ধাভরণে ও যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিলেও তাঁহাদের অশ্রুর আবির্ভাব হইল। গভীর বিরাগে মর্ম্মান্তিক অনুতাপে দুঃসহ দুঃখে, তাঁহাদের কেহ কেহ আপনাদের অস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত সেই স্তূপাকার অস্ত্ররাশির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদিগের প্রতি তাঁহাদের গভীর সমবেদনা এইরূপে প্রদর্শিত হইল, এবং যে কর্তৃপক্ষের আদেশে তাঁহাদের অনুগত জনগণের দুর্গতি ও অবমাননার এক শেষ ঘটিল, সেই কর্তৃপক্ষের প্রতিও তাঁহাদের বিরাগ এইরূপে পরিস্ফুট হইল।"

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য মনে করি এবং যাঁহাদিগের বঙ্গীয় পুস্তকের পাঠাগার আছে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস গ্রন্থখানি তাহাতে রক্ষা না করিলে পাঠাগার যে অঙ্গহীন হইবে অসঙ্কোচে তাহা বলিতে পারি। গ্রন্থের ভূমিকায় রজনীকান্তের প্রিয় সুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার জীবনব্রতের বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়া দিলাম। "বঙ্গ সাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন, সেই ব্রত পালনেই আপনার সমগ্রশক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গ মাতার সেবা ব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকালমরণে বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন সংশয় নাই।" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গ্রন্থকর্ত্তার জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তাকারে পুস্তকের মুখবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশেষে,—পুস্তকখানির একটি সুলভ সংস্করণ করিতে আমরা অনুরোধ করি। তাহা হইলেই ইহা সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আসিতে পারে।

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(২)

আপনারা এমন এক গগনের কল্পনা করিতে পারেন কি,—যাহার উদয়-তোরণে উষার তারা, বক্ষঃদেশে মধ্যাহ্ন-ভানু, অস্ত-শিখরে নির্ব্বাণ-ম্লান সূর্য্যদীপক এবং রজনী-বাসরে তারাকুতমালা চন্দ্রমার শম্ম-শুক্রিমা,—সকলই এককালে পরিদৃশ্যমান? প্রকৃতির আকাশে বিবর্ত্তমান উদয়াস্তলীলা দেখি,—চাঁদ যায়, সূর্য্য আসে, সূর্য্য যায়, চাঁদ আসে,—পরে পরে পরে—একের পতনে অপরের উত্থান। কিন্তু তথাকথিত আকাশের দৃশ্য একটু বিচিত্র,—সেখানে উদয়াস্তের মধ্যে কোন প্রভেদরেখা নাই, পরন্তু মিলন-রেখা বিস্তৃত; এবং সে মিলন যতদূর প্রাণরঞ্জক হইতে হয়!

তাহা আমাদের সাহিত্য গগন। তাহার একদিকে উষাতারকাবৎ রবীন্দ্রনাথ, একদিকে মধ্যাহ্নতপনপ্রতিম বঙ্কিমচন্দ্র, একদিকে অস্তসূর্য্যসঙ্কাশ গুপ্তকবি ও অক্ষয়কুমারাদি এবং অপরদিকে সোমসমতুল মধুসূদন, গ্রহউপগ্রহতুল্য হেম-নবীন দীনবন্ধু প্রভৃতি ও অগুতারকানিভ বহু নবীন তারকা তরুণ—কেহ ফুটিয়াছেন, কেহ ফুটিতেছেন, কেহ ফুটিবেন!

কিন্তু সে দৃশ্য এখন নাই। উদয়াস্ত-লীলার তেমন বৈচিত্র্য, এখন অতীত স্বপ্নের কথা। তখন বঙ্কিমের গন্ধ-গুঞ্জনের আড়ালে প্রাণস্পর্শিনী শিক্ষা, মধুসূদনের মধুচক্রের মধুমধুরা রচনা, হেমচন্দ্রের তুর্য্য-স্তননে প্রবুদ্ধ ভারতের উত্তেজনা, নবীনের পিনাকে পলাসীর সুপ্ত সমর-নির্ঘোষের নবজাগ্রৎ অনুরণন, দীনবন্ধুর অম্লান দর্পণে ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজের স্বরূপ এবং রবীন্দ্রনাথের মুরলীগুঞ্জনে কোমলকম মূর্চ্ছনা—হায় রে, সে দিন গত! সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ অদ্যাপি বিদ্যমান; শতচন্দ্রের কাল চলিয়া গিয়াছে, এক চাঁদেও আকাশ আলো করে—তিনিও বঙ্গ ভবন আলো করিয়া আছেন।

বঙ্গলক্ষ্মীর অন্তঃপুরও এতৎকালে নীরব ছিল না। যেখান হইতে, আমরা কেবল করকঙ্কন কলাপের মৃদু শিঞ্জন-গুঞ্জনের আশা করিতেছিলাম, সেখানে সহসা যে আবার পদ্মাসনার কর-ধৃত বীণার তারে,—তারে তারে তারে বিচিত্র স্বরগ্রাম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তাহার সম্ভাবনা, স্বপ্নসম্ভবা ছিল। আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে আল্পনা-আঁকা ঠাকুরঘরটি অন্তঃপুরেই বিরাজমান এবং সেই ঠাকুরঘরটির ভিতরেই মা সরস্বতীর লীলা-নিকেতন। পরন্তু, ভোরের স্বর্ণরাগ যেমন আলোক-সাগর হইতে ফুটিয়া ওঠে না,—আঁধারের নিকষেই তাহার রম্য বর্ণ-বিকাশ,—তেমনি সাহিত্য-গগনের এই আলোক প্রভাত-বিভা, বাহিরের আলোকাম্বরা কর্ম্মভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই,—তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল অন্তঃপুরের তামসী যবনিকা ভেদ করিয়া! এবং তাহারই প্রসাদাৎ, আজ আমরা বরণীয়া বিদুষী রমণিমণিশিরোমণিস্বরূপা স্বর্ণকুমারী, কামিনী ও গিরীন্দ্রমোহিনীপ্রমুখ "ধন্যি মেয়েদের"

পাইয়াছি। সাহিত্যক্ষেত্রে, আজ তাঁহাদের প্রতিভা ও প্রভাব, সর্ব্বজনমান্ত। বোধ হয়, বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী"র পরে, সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস,—পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর। তাহা "দীপনির্ব্বাণ।" এ কথা লইয়া, বাঙালীর গর্ব্ব প্রকাশ করিবার কারণ, যথেষ্ট আছে। আবার বলি, সেকি যুগ,—যখন সর্ব্ববঙ্গে আত্মভ্রান্ত সমাজে এক অনাহত রব বিসারিত হইয়া গিয়াছিল,—ভারতি! জননি! জাগৃহি, জাগৃহি, জাগৃহি!!

এবারেও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটী জীবনীকথা বলিব। কিন্তু এই সুযোগে বলিয়া রাখি, আমরা একেবারে সকলের কথা গুছাইয়া বলিতে পারিব না। যখন যাহা পাইব, পাঠকগণকে উপহার দিব; সেইজন্ত শৃঙ্খলার সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারিব না। অবস্থা বুঝিয়া, ভরসা করি গুণগ্রাহী পাঠকগণ, অক্ষম লেখককে ক্ষমা করিবেন।

প্রথমে, বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ নন্দিনী"র কথা বলি। সকলেই জানেন, "দুর্গেশ নন্দিনী" তাঁহার প্রথম উপন্যাস। বইখানি বাহির হইলে, "হিন্দু পেটরিয়টে" তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনা, বঙ্কিমের হস্তগত হইল। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখেই তাহা পড়িতে লাগিলেন। এখন, সমালোচক, মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, যে স্কটের আইভ্যান্‌ হো'র ছায়ার 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, সেই জায়গাটা পড়িয়াই চমকিয়া উঠিলেন। এবং পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণ, তুমি কি 'আইভ্যান্‌ হো' পড়েছ? আমি ত পড়ি নি।" পূর্ণবাবু তখন খুব উপন্যাস পড়িতেন। তিনিও বলিলেন "না, আমি ও বই পড়িনি।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু, সেই সমালোচনায় কিছু আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আনন্দের কারণ, তিনি তখন নবীন লেখক। তিনি, 'আইভ্যান হো' না পড়িয়াও যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত যে স্কটের মত বিশ্ববিখ্যাত লেখকের রচনার সাদৃশ্য আছে,—ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র, গানবাজনা বড় ভালবাসিতেন। কাঁটালপাড়ায় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য নামে একটি লোক থাকিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ও সুবাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে পচিশ টাকা মাহিনা দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। মাহিনার সঙ্গে আর একটি চমৎকার বরাদ্দ ছিল—কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা! যদুনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রকে 'হারমোনিয়ম' বাজাইতে শিখাইতেন। বঙ্কিম, নিজে গাহিতে বড় ভাল পারিতেন না। গলা ছিল পূর্ণবাবুর। পূর্ণবাবু গান ধরিতেন, বঙ্কিম বাজাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাল কবিতা রচনা করিতে না পারিলেও, তাঁহার গান রচনায় বেশ শক্তি ছিল। তাঁহার উপন্যাসে, যে গানগুলি আছে—তাহার সঙ্গে সুর সংযোগ করিয়াছিলেন যদুনাথ। যদুনাথ এখন নাই।

কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে তখন গান বাজনায় বড় ধুম হইত। এক একদিন রাত্রি এগারটা, বারটা পর্য্যন্ত আসর জমিয়া থাকিত। কখনও কখনও কবিবর হেমচন্দ্রের বাড়ীতে আসর বসিত। সেখানে

দীনবন্ধু, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, মিত্র (বোধ হয় তখনও ব্যারিষ্টার হন নাই) প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্কিম ত থাকিতেনই। মাঝে মাঝে জগদীশনাথও দেখা দিতেন। সে দিন, গান বাজনা আর শেষ হইতে চাহিত না। কোন কোন দিন কেবল গল্পই চলিত। গল্পগুজবেও একটু বিশেষত্ব ছিল। বঙ্কিম হয়ত একটী হাসির গল্প ধরিতেন এবং বলিতে বলিতে নিজেই হাসিয়া ফেলিতেন। হেমচন্দ্র, আবার আর একটী গল্প বলিয়া তাহার উত্তর দিতেন,—কিন্তু নিজে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তারপর, দীনবন্ধুর পালা। তিনি গল্প বলিতেছেন, আর যতগুলি লোক হাসিয়া, খুন হইবার যোগাড়! কিন্তু দীনবন্ধু নিজে বেজায় গম্ভীর,—হাসিয়া ফেলিয়া তিনি কখনও হাসিকে বাসি করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র, ইলিশ্ মাছের ভারি ভক্ত ছিলেন। আর সে মৎস্য-ভক্তি বড় যে সে রকম ছিল না,—আট, নয় খানা মাছ তাঁর পাতে পড়িতে না পড়িতে যথাস্থানে প্রস্থান করিত! মাংসেও তাঁহার অচলা তৃপ্তি ছিল! এই মাংসপ্রিয়তা, শেষ বয়সে বোধ করি কিছু কমিয়াছিল। বঙ্কিম, শেষে হবিষ্য ধরিয়াছিলেন,—কিন্তু বেশী দিন তাহা চালাইতে পারেন নাই। পত্নীর মিনতিতে, তাঁহাকে হবিষ্য ছাড়িতে হইয়াছিল।

বঙ্কিম, নিজে যেমন খাইতে ভাল বাসিতেন—বন্ধুদের খাওয়াইতেও তেমনি। বন্ধুজনেরা বাড়ীতে আসিলে, অন্ততঃ পক্ষে দুখানা গরম লুচি না খাওয়াইয়া কাহাকেও অমনি ছাড়িয়া দিতেন না। লুচি যোগাইতেন এবং বঙ্কিম-গৃহিণী। রন্ধনে তাঁহার বেশ একটু হাতযশ ছিল।

কাঁটালপাড়ার বাহিরবাটীতে তিনটী ঘর, একটী বড় হল্ ও একটী 'বাথ্‌রুম' ছিল। বন্ধুবান্ধব আসিলে, সেইখানে আদর আপ্যায়ন হইত। সকালবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে বসিতেন। বিকালটা আমোদেই কাটিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়ন-স্পৃহার কথা সকলেই জানেন। কলিকাতায় যখন আসিতেন, তখন রাশি রাশি বই কিনিয়া লইয়া যাইতেন। বইগুলি থাকিত, একটী ব্যাগে। যখন জগদীশ বাবুর বাড়ীতে যাইতেন, জগদীশ বাবুর পুত্র খগেন্দ্রবাবু, ব্যাগের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে লুকাইয়া বই সরাইতেন। বঙ্কিম, জগদীশ বাবুকে এক দিন বলিলেন, "হাঁহে, আমার ব্যাগের ভিতর থেকে বই সরায় কে?"

জগদীশ বলিলেন, "ও আর কার কাজ—খগেন নিশ্চয়!"

বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করাতে খগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমিই বই নি বটে!"

"কেন হে!"

"আজ্ঞে, আমরা পড়ব না বুঝি?"

"বাপু, আমাকেই পড়্‌তে দাও আগে।"

"বাঃ! আগে আমরাই পড়ি,—তারপর আপনি।"

বঙ্কিম, খুব হাসিতে লাগিলেন।

পত্নিপ্রেম, বঙ্কিমের জীবনকে পুষ্পপেলব করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন ক্রোধে অস্থির, কেহ তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিতেছে না, তখন তাঁহার স্ত্রী নিকটে

গিয়া তাঁহার কথা লইয়া এমনি এক হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন, যে বঙ্কিমের রাগ একেবারে জল! হায় সতি, এমন আশুতোষ স্বামীকে অকালে হারাইয়া তোমার যে মনোকষ্ট, তাহা ভাবিয়া আমার চোখে জল আসিতেছে, মা!

বঙ্কিমচন্দ্রের সহৃদয়তার একটী গল্প বলিব।

মহারাণী স্বর্ণময়ী, তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাল দান করিতেছিলেন। যে কর্ম্মচারীর উপরে শাল বিলাইবার ভার, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। একজন পণ্ডিত, সেই সন্ধান পাইয়া জগদীশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া হাজির। সেখানে শ্রীযুত খগেন্দ্র-নাথকে বলিয়া কহিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে তাঁহার অনুরোধপত্র লিখাইয়া লইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, অনুরোধপত্র দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমি কারুকে সুপারিস দিতে ভালবাসি না। তবে, খগেন্দ্র আমার স্নেহ-ভাজন, তার কথা আমি ঠেল্‌তে পার্ব্ব না, কাজেই এবারে আপনার কার্য্যোদ্ধার হ'ল।"

পণ্ডিত মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্রের আলয়ে দু' একদিন থাকিয়া শাল লইয়া ফিরিলেন। ফিরিবার সময়ে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের বাড়ী থেকে শুধু হাতে ফির্‌লে— আপনি আমার প্রতি বড় প্রসন্ন হবেন বলে বোধ হচ্ছে না। তা এই যৎসামান্য কিছু দিলুম, নিন।" বলিয়া ঠাকুরের হাতে একখানি ১০ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চারি ভ্রাতাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ছাড়া সকলেই সাহিত্যসেবী। সঞ্জীবচন্দ্রের কথা পরে বলিব, আগে সর্ব্বকনিষ্ঠ পূর্ণবাবুর কথাই বলিয়া লই।

পূর্ণবাবুই বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যমান শেষ স্মৃতি। তাঁহাকে দেখিলে, বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে পড়ে। সেই প্রতিভাব্যঞ্জক দীর্ঘ নাসিকা, সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি। পূর্ণবাবু, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট।

তিনি বহুদিবস সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছেন বটে,—কিন্তু এদিকে তাঁহারও যশ অল্প নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, নিজেই বলিতেন, "অনেকে আমার মত করে লিখ্‌তে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু চন্দ্রশেখর ও পূর্ণ ছাড়া আর কেউ অবিকল আমার মত লিখ্‌তে পারে না।" বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস "চন্দ্রশেখরে" পূর্ণচন্দ্রের লিখিত একটি পরিচ্ছেদ আছে। তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র তিন চারিটি পরিচ্ছেদ পূর্ণচন্দ্র লিখিয়া দিয়াছেন। আফিংএর নেশায় বুড়া কৃষ্ণকান্ত যখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেই স্থানটি পড়িয়া সকলেই নিশ্চয় হাসিয়াছেন। সেই চমৎকার হাস্যরসোজ্জ্বল স্বপ্নকাহিনীটীও পূর্ণচন্দ্রকর্তৃক লিখিত।

"বঙ্গদর্শন" বাহির করিয়া, বঙ্কিমবাবু, পূর্ণচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি বঙ্গদর্শনে কিছু লেখ; উপস্থিত আমি উপন্যাস চালাতে পার্‌ছি না।"

তাহার ফলে বঙ্গদর্শনে "মধুমতী" এবং "শৈশব সহচরী" নামক উপন্যাসদ্বয় বাহির হয়। উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার স্থান নাই। তবে, এ কথা ঠিক,

যে যিনিই উক্ত উপন্যাস দুখানি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহার ভাষা, ঘটনা-সংস্থান ও বর্ণনপ্রণালীতে নিশ্চয়ই মুগ্ধ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁহার "মধুমতী" নামক উপন্যাসখানি ইংরাজিতে অনুদিত করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ

হইয়াছেন। উক্ত উপন্যাস দুখানি ছাড়া, পূর্ণবাবু বঙ্গদর্শনে মাঝে মাঝে অন্য লেখাও দিতেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পোপ,

করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, অনুবাদ হয় নাই, বলিতে পারি না।

"ভারতী"র প্রতি পূর্ণচন্দ্রের স্নেহ যথেষ্ট। তিনি বলেন, "আজকালকার মাসিক কাগজের ভিতরে 'ভারতী'কেই আমি বেশী ভালবাসি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পুস্তক ইংরাজকর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। এক একখানি অনুবাদ, অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "গোপাল উড়ের যাত্রা।" অনুবাদক দেখিলেন, গোপাল কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম, অতএব অনুবাদেও তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। তার পর, "উড়ে",—কিনা উড্ডীয়মান, অর্থাৎ flying!—যাত্রা কিনা, গমন অর্থাৎ visit! সুতরাং "গোপাল উড়ের যাত্রা" অনুবাদে হইয়া দাঁড়াইল "Gopal's flying visit" এই সকল নানা কারণে বঙ্কিমবাবু, ইংরাজী অনুবাদকে একেবারেই সুনজরে দেখিতেন না। একবার, মিঃ ফিলিপ নামে এক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি "কপালকুণ্ডলা"র ইংরাজী অনুবাদে হাত দেন, তাহা হইলে বঙ্কিম বাবু কোন আপত্তি করিবেন কি না?

পূর্ণবাবু বলিলেন, "আপত্তি করিবেন।" যাহা হোক, ফিলিপ সাহেব, বঙ্কিমের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এবং এ কথাও বলিয়াছিলেন, যে এরূপ অনুবাদে তিনি ইয়োরোপে পরিচিত হইবেন।

বঙ্কিম বাবু, তদুত্তরে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পরন্তু, ইহাও লিখিয়াছিলেন, যে ইয়োরোপে আমি আমার নাম প্রচার করিতে চাহি না। যে দেশের জন্য আমি উপন্যাস লিখিয়াছি, সেই দেশে আমার নাম হইয়াছে। তাহাই যথেষ্ট।

কিন্তু ফিলিপ সাহেব, বঙ্কিমের নিষেধ মানিলেন না। তিনি বিলাতে গিয়া, "কপালকুণ্ডলা"র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিলেন। ফলে, বঙ্কিমবাবু অসন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহার চেষ্টায় বিলাতের একখানি কাগজে উক্ত ইংরাজী অনুবাদের এক প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইল। পরিণামে, উক্ত ইংরাজী অনুবাদের বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। শুনিতেছি, সংপ্রতি উহা পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মতেজঃ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বঙ্কিমের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন 'ইডেনগার্ডেন' বেড়াইতে গিয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনর মিঃ মনরোও তখন বাগানে বেড়াইতেছিলেন। উভয়ে উভয়ের পরিচিত, কিন্তু বঙ্কিম আস্তে আস্তে তাঁহার একপাশ দিয়া চলিয়া গেলেন,—সাহেবকে সেলাম করিলেন না। সাহেব ত' চটিয়া লাল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র, সদর হইতে সুদূর মফঃস্বলে,—বালেশ্বরে বদলী হন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "এটা একটা সেলাম-তোলার ফল।"

যে রোগে তিনি লোকান্তরিত হন, সেই রোগের বীজ তাঁহার দেহে যৌবন হইতেই আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে তিনি একেবারেই দৃষ্টি দিতেন না।

এই কাল রোগ যে তাঁহার পরমায়ু তিলে তিলে ক্ষয় করিতেছে, বহুকাল পর্য্যন্ত কেহ তাহা জানিতেও পারেন নাই—এমন কি তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত না। তাঁহার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ।

তৎপরে, এই রোগের আক্রমণচিহ্ন যখন তাঁহার দেহে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল, আত্মীয় স্বজন তখন শঙ্কিত হইলেন। নাম মনে নাই—একজন কে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, রোগের কথা আপনি বেশী চিন্তা কর্বেন না,—তাতে অনিষ্ট হতে পারে।"

বঙ্কিম বাবু অবহেলার সহিত বলিয়াছিলেন, "হ্যাঃ, কেই বা ওর কথা নিয়ে ভেবে মরে, আর কে-ইবা সে জন্যে ভয় পায়। তুমিও যেমন!"

শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কৃত গীতার বিশদ ব্যাখ্যা ও নবসংস্করণের ধর্ম্মতত্ত্বের পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে। কবে বাহির হইবে?

মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র, বৈদিক বিষয় লইয়া প্রবন্ধরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। রোগের আক্রমণে তখন তাঁহার দেহ জর্জ্জর, —কিন্তু সেদিকে বঙ্কিমের লক্ষ্য নাই,—তিনি জাগিয়া পড়িতেছেন, নোট লইতেছেন,—লিখিতেছেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুপ্রীতির কথা, গতবারে কিছু বলিয়াছি,—এবারেও বলিব। তাঁহাদের ভিতরে যে কতটা খোলাখুলি ভাব ছিল, নিম্নে সমাহৃত ঘটনাটীই তাহার উদাহরণ। দীনবন্ধু মিত্র, একবার রাজকার্য্য বশতঃ আসাম অঞ্চলে গিয়াছিলেন। সেখানে সাহেব ছাঁদের একরূপ নূতন জুতা দেখিয়া, বঙ্কিমের জন্য একযোড়া ক্রয় করিলেন। যথাকালে, বঙ্কিমের কাছে জুতা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র, মোড়ক খুলিয়া এক যোড়া জুতা ও দীনবন্ধুর একখানা চিঠি পাইলেন।

দীনবন্ধু, বঙ্কিমকে চিঠিতে কেবল লিখিয়াছিলেন "কেমন জুতো!"

বঙ্কিমও তখনই চিঠির উল্টাপিঠে উত্তর লিখিয়া, দীনবন্ধুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন, "তোমার মুখের মত!"

নূতন সাহিত্যিকের সৃষ্টি করিতে না পারিলে, সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

রমেশ বাবুকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "রমেশ, তুমি বাঙ্গলা লেখনা কেন?" রমেশবাবু, সবিস্ময়ে কহিলেন "আমি? বলেন কি মশায়! আমি ভালো ক'রে বাঙ্গলায় কথা কইতেই পারি না, তা আর লিখব কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তুমি ত' ইংরেজীতে লিখে থাক, ভাব আর চিন্তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আর বাঙ্গলা ভাষায় তুমি যেমন কথা কও, তেমনি ভাবে সেই ভাব আর চিন্তাগুলিকে লেখায় ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করনা কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই অবশেষে রমেশচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গতবারে, বঙ্কিমের যে আত্মচরিতের কথা বলিয়াছিলাম,—সংপ্রতি তাহার সংবাদ পাইয়াছি। এখন বুঝিতেছি, তাহা প্রকৃত আত্মচরিত' নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কতকগুলি ঘটনার একটী সামান্য স্মৃতিলিখন রাখিয়া গিয়াছেন মাত্র। আকারে তাহা চারি পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। সুতরাং, তাহাকে 'আত্মচরিত' বলা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, বৈষ্ণব ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ,

তাঁহাদের কুলদেবতা। দেবতার প্রতি তাঁহার অসামান্য ভক্তি ছিল। তিনি সাতিশয় কীর্ত্তনানুরাগী ছিলেন। শুধু তিনি বলিয়া নয়—তাঁহার ভ্রাতৃগণও। সংকীর্ত্তনকালে, প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া যাইত এবং তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইত,—তিনি যেন পাগলের মত হইয়া উঠিতেন। দেবপদে এরূপ ভক্তি সচরাচর দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে অদ্বিতীয় প্রতিভাবান পুরুষ, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন প্রথমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তখন তাঁহাকে যে সকল গুরুতর বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভব্য। পরন্তু তৎপরবর্ত্তী আর কাহাকেও সে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

"আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" ও "কথাসরিৎসাগর" প্রভৃতি পুস্তকের ভাষাই, তখন আদর্শ ভাষা। কিন্তু সে ভাষায়, উচ্চাঙ্গসমন্বিত সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব ছিল। সেইজন্য, প্রথমেই তাঁহাকে এমন ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, যাহা লেখকের ইঙ্গিতমাত্র মনঃকল্পিতা কল্পনাকে, উচ্চভাবকে এবং সূক্ষ্মচিন্তাকে আপনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। এ কাজ যে কিরূপ কঠিন কাজ, তাহা এক মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই বুঝিয়াছিলেন,—আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না।

তাহার পর প্রকৃত উপন্যাস কাহাকে বলে, বাঙ্গালী তাহা জানিত না। বঙ্কিমচন্দ্র, সর্ব্বপ্রথমে তাহা দেখাইয়াছেন। পরন্তু, কাব্য আর নাটক আর উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য যথেষ্ট। প্রথম স্রষ্টার পক্ষে, সেই বৈপরীত্যটুকু অনুসরণ করা বড় সাধারণ কার্য্য নয়। তাহার পর রাজনীতি ও সমাজনীতি, ধর্ম্মমর্ম্ম, ও শিল্পগতি, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি যেদিক দিয়াই দেখ, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত।

আমাদের লেখনীমুখে ভাষা দিয়াছিলেন তিনি এবং তৎসৃষ্টা মহিমময়ী ভাষাই অদ্যাপি আমাদের অবলম্বনীয়া;—অতএব তাঁহার নিকটে আমরা যত ঋণী,—এমন আর কাহার কাছে? ফলতঃ, শ্যামলিতা বঙ্গভূমি, তাঁহার পদার্পণে সর্ব্বজননমস্যা হইয়াছেন;—আমরাও তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অশ্রুকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আগামী বারে অন্যান্য কথা হইবে।

ভুলোনা।

(ফার্সী হইতে)

জ্যার আকর্ষণে ধনুঃ হয় যত নত,
শরক্ষেপ হয় তা'র দ্রুত তীব্র তত;
শক্র তব করে যদি নম্রতা স্বীকার,
ভুলোনা ভুলোনা তাকে, নির্ব্বন্ধ আমার।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রাবস্তি।

শ্রবস্তি রাজ্যের পরিধি প্রায় ছয় সহস্র লি। রাজধানী মরুভূমি তুল্য এবং জনশূন্য। রাজধানীর সীমা নির্ণয় করা যায় না। প্রায় ২০ লি স্থান লইয়া রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখনও স্বল্পসংখ্যক অধিবাসী এই স্থানে বাস করে। প্রচুর শাকশবজী পাওয়া যায়। জলবায়ু মনোরম; অধিবাসীরা সচ্চরিত্র ও পবিত্রচেতা। ইহারা বিদ্যাভ্যাসে রত এবং ধার্ম্মিক। শতাধিক সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; মাত্র কয়েকটী যতি থাকেন; ইহারা সম্মতি-সম্প্রদায়-ভুক্ত একশত দেবমন্দিরে বহুসংখ্যক বিধর্ম্মী বাস করে। তথাগত যখন এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, এইস্থানে প্রসেনজিৎ রাজার রাজধানী ছিল। রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রাচীন ভিত্তিমূল দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা প্রসেনজিতের প্রাসাদের ইহাই মাত্র অবশিষ্ট আছে।

পূর্ব্বদিকে নিকটে একটী পুরাতন ভগ্নাবশেষের উপর ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই স্থানে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের জন্য সাধারণ মহাশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার আরও পূর্ব্বে শুভাস্তের গৃহের স্থান নির্দ্দেশের জন্য একটী স্তূপ আছে। শুভাস্তের গৃহের নিকটেই একটী বৃহৎ স্তূপ। এই স্থানেই একজন অঙ্গুলিমাল্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঙ্গুলিমাল্যগণই শ্রাবস্তির অপরাধী শ্রেণী। তাহারা জীব মাত্রকেই হত্যা করে এবং সুযোগ পাইলে নগরের ও জনপদের অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া, ঐ সকল মৃত ব্যক্তির অঙ্গুলি দ্বারা মালা গ্রথিত করিয়া মস্তকে পরিধান করে। পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলিমাল্য অঙ্গুলির সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নিজ গর্ভধারিণীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এই সংবাদে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য গমন করেন। দূরে পৃথিবীপতিকে দেখিয়া অঙ্গুলিমাল্য আহ্লাদিত হইয়া বলিল "এইরূপ আমি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে পারিব; আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, যে বুদ্ধকে বা তাঁহার মাতাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে, সে ব্রহ্মস্বর্গে জন্মলাভ করিবে।" অঙ্গুলিমাল্য নিজ মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বৃদ্ধা! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ঐ শ্রমণকে হত্যা না করিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" যখন অঙ্গুলিমাল্য তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ছুরিকা লইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন তথাগত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। পৃথিবীপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কেন তোমার মন্দ অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছ এবং কেনই বা মন্দকে প্রশ্রয় দিতেছ?" অঙ্গুলিমাল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধদেবকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জানাইল এবং অধ্যবসায় সহকারে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নগরে ৫।৬ লি দক্ষিণে জিতবন। এইস্থানে প্রসেনজিৎ রাজার মন্ত্রী বুদ্ধদেবের জন্য একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী সঙ্ঘারাম ছিল, বর্ত্তমানে ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বারের উভয়পার্শ্বে ৭০ ফুট উচ্চ স্তম্ভদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে; বামপার্শ্বের স্তম্ভের পাদদেশে একটী চক্র খোদিত আছে; দক্ষিণদিকের স্তম্ভোপরি একটি বৃষের মূর্ত্তি অঙ্কিত। উভয় স্তম্ভই রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যতিগণের বাসস্থান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে;

একটী মাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহগুলির ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গৃহে বুদ্ধদেবের একটী মূর্ত্তি আছে।

স্বদত্ত দয়াশীল ও বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং ইহার বিতরণেও মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি আতুর ও অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতেন এবং অনাথ ও বৃদ্ধদিগের প্রতি কৃপা পরবশ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে লোকে অনাথনাথ বলিত। তিনি বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের কথা শ্রুত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান হইয়া তাঁহার নামে একটী বিহার নির্ম্মাণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি বুদ্ধদেবকে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন। পৃথিবীপতি সারিপুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার সহগামী হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সুদুশ্য এবং উচ্চস্থানে স্থাপিত বলিয়া তাঁহারা রাজার জিতবন উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিলেন। রাজা পরিহাস করিলেন; যদি তোমরা সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা ঐ স্থান আচ্ছাদন করিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহা বিক্রয় করিতে পারি।

স্বদত্ত ইহাতে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ঐ স্থান আচ্ছাদিত করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ ধনকোষ উন্মুক্ত করিলেন। সামান্য মাত্র স্থান আচ্ছাদিত হইতে বাকী ছিল। রাজা তাঁহাকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন "বৌদ্ধধর্ম্ম সত্যের উপর নিহিত; আমি এই স্থানে সুবর্ণের বীজ রোপিত করিব।" তৎপরে সেই মুক্ত স্থানে তিনি বিহার নির্ম্মাণ করিলেন।

পৃথিবীপতি আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন উদ্যানের ভূমি ক্রয় করিয়া স্বদত্ত দান করিয়াছেন। এই সময় হইতে এই স্থানকে জিতবন ও অনাথোদ্যান এই উভয় নামেই অভিহিত করা হোক।"

এই উদ্যানের উত্তরপূর্ব্ব দিকে একটি স্তূপ আছে। এই স্থানে তথাগত পীড়িত ভিক্ষুকে জল দ্বারা ধৌত করিয়াছিলেন। পুরাকালে, যখন বুদ্ধ পৃথিবীতে বাস করিতেন, তখন একটী পীড়িত ভিক্ষু দুঃখিত চিত্তে নির্জ্জনে বাস করিত। পৃথিবীপতি তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি কষ্টে তুমি নির্জ্জনে বাস কর? ভিক্ষু উত্তর করিল "আমি স্বভাবতঃ অমনোযোগী ও অলস কোনদিন পীড়িতের শুশ্রূষা করি নাই; এইক্ষণ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় আমাকেওকেহই শুশ্রূষা করে না।" তথাগত ইহাতে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন "বৎস! আমিই তোমার সেবা করিব।" এবং তাহাকে নত হইয়া স্পর্শ করিবামাত্র পীড়া আরোগ্য হইল। পরে তাহাকে বহির্দ্দেশে আনয়ন পূর্ব্বক নূতন মাদুরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিয়া নূতন বস্ত্র দান করিলেন। পরে বুদ্ধ ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন "এই সময় হইতে পরিশ্রমী হইয়া কার্য্য কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভিক্ষু তাহার আলস্যের জন্য অনুতাপ করিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

উদ্যানের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। মুদ্গল্যপুত্র এই স্থানে নিজ ঐশ্বরিক শক্তিবলে সারিপুত্রের কোমরবন্ধ উত্থানে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাকালে বুদ্ধদেব যখন উষ্ণেদো হ্রদ তীরে মনুষ্য ও দেবতাদিগের সংসর্গে বাস করিতেছিলেন, তখন কেবল মাত্র সারিপুত্র অনুপস্থিত ছিলেন তখন বুদ্ধ মুদ্গল্যপুত্রকে সারিপুত্রকে আনয়নের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

সারিপুত্র সেই সময় নিজ ভিক্ষুকের বেশ সংস্কারে নিযুক্ত ছিলেন। মুদ্গল্যপুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভু এইক্ষণ অনঃতপ্ত হ্রদতীরে বাস করিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছেন" সারিপুত্র বলিলেন "এই বেশ সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন; পরে আমি আপনার সঙ্গী হইব।" মুদ্গল্যপুত্র বলিলেন যে "যদি আপনি শীঘ্র না আইসেন, তবে আমি আমার ঐশ্বরিক শক্তিবলে আপনাকে ও আপনার বসনকে সেই স্থলে লইয়া যাইব।" তখন সারিপুত্র নিজ কোমরবন্ধ উন্মুক্ত করিয়া, ও উহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে "যদি আপনি এই কোমরবন্ধ উত্তোলন

করিতে পারেন, তবে আমি আপনার সহগামী হইব।" মুদ্গল্যপুত্র নিজ ঐশ্বরিক শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক কিছুতেই উঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। পরে নিজ ঐশ্বরিক শক্তি বলে হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সারিপুত্র তাঁহার উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া সভায় উপবেশন করিয়াছেন। মুদ্গল্যপুত্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন "এইক্ষণ আমি দেখিতে পাইতেছি যে অলৌকিক ক্ষমতা পরিচালন জ্ঞানের ক্ষমতার সমতুল্য নহে।"

বর্ণিত স্তূপের নিকটেই একটী কূপ। তথাগত পৃথিবী বাসকালীন নিজ ব্যবহারার্থ এই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়াছিলেন। নিকটেই অশোকরাজ নির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে; ইহাতে তথাগতের কয়েকটি শরীর চিহ্ন আছে. এই স্থানে তাঁহার ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ধর্ম্মপ্রচারের চিহ্নও আছে। এই সকল ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাজা একটি স্তম্ভ ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে নি[illegible] জ্য সঞ্চারিত হয়; অনেক দৈব ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। কোন কোন সময় স্বর্গীয় বাদ্য শ্রুত হয়; আবার কোন সময় স্বর্গীয় গন্ধ প্রবাহিত হয়। শুভসূচনা এত দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা বর্ণনাতীত

যে স্থানে ব্রহ্মচারীগণ একটি বেশ্যাকে হত্যা করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি ঐ হত্যা আরোপণের চেষ্টা করিয়াছিল সঙ্ঘারামের পশ্চাদ্দিকেই সেইস্থান। তথাগত ভবপূজ্য, জ্ঞানী, দেবগণের পূজিত এবং ধার্ম্মিক ও সিদ্ধপুরুষগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। অবিশ্বাসীবৃন্দ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে আমরা তথাগতের সম্বন্ধে কোন কুৎসা প্রচার করিব। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা উপরোক্ত বেশ্যাকে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণ করাইবার জন্য তথায় আনয়ন করিল এবং পরে সকলেতে অবগতা তাহার উপস্থিতি জ্ঞাত হইলে তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়া বৃক্ষতলে প্রোথিত করিয়া রাখিল। পরে আন্তরিক অসন্তোষ দেখাইয়া, রাজাকে এ মৃত্যুর কথা জ্ঞাত করিল। রাজা অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন এবং জেতবনে ঐ দেহ পাওয়া গেল। তখন অবিশ্বাসিগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এই শ্রমণ গৌতম লোকের নিকট সৎ নীতি ও তিতিক্ষা প্রচার করে কিন্তু এইক্ষণ এই স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিয়া পরে যাহাতে কুৎসা প্রচার না হয় তজ্জন্য ইহাকে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ ব্যভিচার ও মৃত্যুর স্থলে সুনীতি ও জিতেন্দ্রিয়তা কি প্রকারে শোভা পায়?" আকাশস্থ দেবতাগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন "ইহা ঘৃণিত অবিশ্বাসীগণের মিথ্যা অপবাদ।"

সঙ্ঘারামের একশত পদ পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ-সুগভীর খাল; এই স্থানে দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে হত্যা করিবার চক্রান্ত করাতে নরকে পতিত হইয়াছিল। দেবদত্ত রাজা দ্রোণদানের পুত্র। দ্বাদশ বৎসর একান্ত মনে অধ্যয়ন করিয়া তিনি অশীতি সহস্র শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পরে লোভবশতঃ তিনি ঐশ্বরিক শক্তি উপার্জ্জনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি কুসঙ্গীদিগের সহিত একত্র হইয়া তাহাদের বলিলেন "আমারও বুদ্ধদেবের ন্যায় ৩০টি—চিহ্ন আছে। আমারও অনেক সহচর আছে। আমি তথাগতাপেক্ষা কিসে হীন?" এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মনে দ্বিধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু বুদ্ধের আজ্ঞাবহ এবং বুদ্ধের ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সারিপুত্র ও মুদ্গল্যপুত্র বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সকল শিষ্যগণকে একত্রিত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তথায়, দেবদত্ত নিজ নখমধ্যে বিষস্থাপন করিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিবার সময় হত্যা করিতে মানস করিলেন। পরে স্বকার্য্যসাধনে অনেক দূর হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র পৃথিবী দ্বিধা হইল এবং তিনি জীবন্তে নরক-গামী হইলেন।

ইহারই দক্ষিণে অন্য একটি খালে, কুকালি ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবের কুৎসা প্রচার করিয়া জীবন্তে নরকে গিয়াছিল। ব্রাহ্মণকন্যা চিঁচি বুদ্ধকে নিন্দা করিয়া জীবন্তে নরকে প্রেরিত হইয়াছিল। এক সময়ে

বুদ্ধদেব দেবতা ও মনুষ্যের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে ছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক দূর হইতে সমবেত জনবৃন্দ মধ্যে বুদ্ধদেবকে দেখিয়া স্থির করিল যে, "অদ্যই আমি বুদ্ধের সুযশ বিনষ্ট করিব; তাহা হইলে আমার প্রভুরই যশ দিকদিগন্ত বিস্তৃত হইবে। পরে শরীরের সহিত একখণ্ড কাষ্ঠ বন্ধন করিয়া সে ধর্ম্মমণ্ডলির নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "তোমাদের এই ধর্ম্মপ্রচারক আমার সহিত সহবাস করিয়াছে এবং আমার গর্ভে এইক্ষণ ইহারই সন্তান রহিয়াছে।" অবিশ্বাসীবৃন্দ ইহা বিশ্বাস করিল কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝিলেন যে ইহা কুৎসা মাত্র। এই সময়ে দেবতাধিপতি শক্র এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য, শ্বেত ইন্দুরের রূপ ধারণ করিয়া যে বন্ধন দ্বারা কাষ্ঠখণ্ড আবৃত ছিল, উহা ছেদন করিলেন। ইহাতে শব্দ করিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ড ভূপতিত হইল। এই শব্দে ধর্ম্মমণ্ডলী চমৎকৃত হইলেন। এই দৃশ্যে সমাগত ব্যক্তিগণ আহ্লাদে অভিভূত হইলেন এবং জনতার মধ্য হ এক ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিয়া স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি তোমার পুত্র?" তৎপর পৃথিবী দ্বিধা হইল এবং দুষ্ট স্ত্রীলোকটী সর্ব্বনিম্ন নরকে প্রেরিত হইয়া উপযুক্ত শাস্তি পাইল।

এই তিনটি খাদের গভীরতা নির্ণয় করা যায় না; গ্রীষ্ম ও হেমন্ত কালে যখন অন্যান্য হ্রদ ও পুষ্করিণী জলহীন হয়; তখনও এই তিনটি স্থানে জলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

সঙ্ঘারামের ৬০।৭০ পদ পূর্ব্বে ৬০ ফুট উচ্চ একটী বিহার। ইহাতে পূর্ব্বাভিমুখী উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। তথাগত যখন প্রাচীনকালে এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, তখন তিনি এই স্থানে অবিশ্বাসীদিগের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। আরও পূর্ব্বে বিহারের সমতুল্য একটি দেবমন্দির আছে। সূর্য্যোদয় কালে দেবমন্দিরের ছায়া বিহারের উপর পতিত হয় না কিন্তু সূর্য্যাস্তকালীন বিহারের ছায়া দেবমন্দিরে পতিত হয়।

এই বিহারের ৩।৪ লি পূর্ব্বে একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে সারিপুত্র অবিশ্বাসীদিগের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। যখন সুদত্ত জিতবন বিহার নির্ম্মাণার্থ ক্রয় করিয়াছিলেন, তখন সারিপুত্র স্থান পর্য্যবেক্ষণের জন্য সুদত্তের সহগামী হইয়াছিলেন। এই সময়ে অবিশ্বাসীদিগের ছয় জন পণ্ডিত তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সারিপুত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। নিকটেই একটি বিহার এবং উহার সম্মুখেই একটী স্তূপ। এই স্থানে তথাগত অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত করিয়া বিশাখার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্তূপের দক্ষিণে, যে স্থানে বুদ্ধদেব বিশাখার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন তথায় বিরুদ্ধকরাজ শাক্যবংশ ধ্বংস করিবার জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেখিয়া সৈন্যবাহিনীকে বিদায় দিয়াছিলেন। বিরুদ্ধকরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রাক্তন অপমানের প্রতিশোধ কামনায় একদল সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া, গ্রীষ্মান্তে সৈন্যবিন্যাস পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। জনৈক ভিক্ষু এই সংবাদ অবগত হইয়া বুদ্ধদেবকে নিবেদন করিল। পৃথিবীপতি এই সময় একটী শুষ্ক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা বিরুদ্ধক তাঁহাকে এইভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া কিছু দূরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইস্থানে প্রচুর নবীন ও ছায়াশীল বৃক্ষ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে আপনি এই শুষ্ক বৃক্ষমূলে আসীন আছেন?" পৃথিবীপতি উত্তর করিলেন "আমি যে মাননীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই বংশের শাখা প্রশাখা শুষ্ক হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; সুতরাং সেই বংশীয় লোকের আর ছায়া ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই।" রাজা এই সদুত্তর শুনিয়া বলিলেন "পৃথিবীপতি তাঁহার বংশের প্রতি সম্মান দেখাইয়া আমাকে পরাস্ত করিলেন।" এই বলিয়া রাজা বুদ্ধদেবকে ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিয়া, নিজ সৈন্যদের বিদায় দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার সন্নিকটেই একটি স্তূপ আছে; শাক্য-

কুমারীগণকে এই স্থানেই হত্যা করা হইয়াছিল। রাজা বিরুধক শাক্যবংশ ধ্বংস করিয়া নিজ জয় ঘোষণা করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে ৫০০ শত শাক্য কুমারিকে আনয়ন করেন। কুমারিগণ ঘৃণা ও ক্রোধে রাজা ও রাজপরিবারকে নিন্দা করিতে থাকে। রাজা এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের হত্যার আদেশ দেন। রাজকর্ম্মচারিগণ, রাজাদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইয়া প্রথমতঃ কুমারিগণের হস্ত পদ ছেদন করিয়া পরে তাহাদের কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে। কুমারিগণ দুঃখে বুদ্ধদেবের সাহায্য প্রার্থনা করে। পৃথিবীপতি নিজ সূক্ষ্মদর্শন শক্তি দ্বারা কুমারিদের যন্ত্রণা ও সন্তাপের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একজন ভিক্ষুকে নিজ কৌষেয় বস্ত্রসহ তথায় যাইয়া কুমারিগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ব প্রচার করিতে আদেশ করেন। তদন্তে তাহারা দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর দেবাধিপতি শক্র ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুমারিগণের অস্থিসংগ্রহান্তর দাহ করেন। জনশ্রুতি এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়।

শাক্য কুমারিগণের হত্যার নিদর্শন স্বরূপ স্তূপের সন্নিকটেই একটি শুষ্ক হ্রদ আছে। এই স্থানেই বিরুধকরাজ সশরীরে নরকে গমন করেন। পৃথিবীপতি শাক্যকুমারিগণকে দর্শন করিয়া জিতবনে প্রত্যাগমন করেন এবং তথায় ভিক্ষুগণকে বলেন যে বিরুধক রাজার সময় হইয়াছে; সাতদিবস পরে রাজা অগ্নিতে দগ্ধ হইবেন। রাজা এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হন। সপ্তদিবসেও তাঁহার কোন হানি না ঘটাতে তিনি আনন্দিত চিত্তে পরিবারবর্গসহ এই হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া মদ্যপান ও গীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। কিন্তু তত্রাপি তাঁহার ভয় দূরীভূত হয় নাই। যখন তিনি হ্রদোপরি এইরূপে বিহার করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তরঙ্গ মধ্য হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকাকে দাহ করিল এবং রাজা নিজেও যন্ত্রণাভোগ করিবার জন্য নিম্নতম নরকে গমন করিলেন।

সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি উত্তর পশ্চিমে আমরা আপ্তনেত্রবনে পৌঁছি। এই স্থানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে এবং অনেক ধার্ম্মিক পুরুষ এই স্থানেই সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সকলস্থলেই স্মারকলিপি বা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে এই দেশে ৫০০ শত দস্যু ছিল; উহারা নগর ও গ্রাম মধ্যে বিচরণ ও সীমান্ত প্রদেশ লুণ্ঠন করিত। রাজা প্রসেনজিৎ তাহাদের ধৃত করিয়া প্রত্যেকের চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক, তাহাদের এক নিবিড় বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন। দস্যুগণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। তথাগত এই সময়ে জিতবনের বিহারে ছিলেন এবং তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিবলে দস্যুগণের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আদেশ করিলেন—,"হে তুষার পর্ব্বত ধীর পবন প্রবাহে ঔষধিপত্র বহন করিয়া ইহাদের দৃষ্টিশক্তি দান কর।" এই আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহারা দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়া দেখিল যে, পৃথিবীপতি তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। জ্ঞানলাভ করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে তাহারা বুদ্ধদেবকে পূজা করিল এবং তাহাদের ভ্রমণ যষ্ঠি তথায় প্রোথিত করিয়া প্রস্থান করিল। এইপ্রকারে ঐ সকল যষ্ঠি বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে।

রাজধানীর প্রায় ১৬ লি উত্তর পশ্চিমে একটী প্রাচীন নগর আছে। ভদ্রকল্পে যখন মনুষ্যের বিশ হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল তখন কশ্যপ বুদ্ধ এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণে একটী স্তূপ আছে। শিক্ষালাভ করিয়া তিনি তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নগরের উত্তরে একটী স্তূপে কশ্যপ বুদ্ধের শরীর রক্ষিত আছে। উপরোক্ত দুইটি স্তূপই অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৫০০ লি যাইয়া আমরা কপিলবস্তুতে পৌঁছি।

(ক্রমশ)

সঞ্চিত ধন।

১

তন্দ্রাবসানে বৃদ্ধা যখন নয়ন উন্মীলন করিল, তখন চিম্নির আগুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। সে শাল খানি টানিয়া, তাহার অনাবৃত স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়া, তাহার পুরাতন ঘড়িটির দিকে চাহিল। সে নিজে অত্যন্ত বৃদ্ধা হইলেও ঘড়িটি তাহার অপেক্ষাও বৃদ্ধ। ঘড়িটি আহার বিহারের সময় তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী।

"আজ ওরা বড়ই দেরী করিতেছে,—" বৃদ্ধা মৃদু মৃদু স্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল। "চায়ের সময় হইয়া গিয়াছে,—পিপাসায় আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, উহারা কি আমার কথা ভুলিয়াই গেল?"

এমন সময় কুটির দ্বার ঠেলিয়া যুবক-যুবতী দুইজন প্রবেশ করিল। তাহারা বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধু। আজ পঞ্চদশ বৎসর পতিহীনা, চলৎশক্তিরহিতা বৃদ্ধা ইহাদের গলগ্রহ। তাহাদের দেখিয়া বৃদ্ধা একটু ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আজ এত দেরী যে?"

যুবক কোন উত্তর না দিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল,—যুবতী একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল,—

"তোমার চায়ের সময় হইলেই বুঝি আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে? টমের তো কাজ আছে, আমিও বসিয়া থাই না। আমাদের তো দিন রাত চেয়ার ঠাসিয়া বসিয়া আগুন পোয়াইলেই চলে না!"

করুণকণ্ঠে বৃদ্ধা বলিল,—

"তাহাতো সত্যই বাছা! তোমরাই খাটিয়া সারা হইলে,—আমিতো এখন কোন কাজেই লাগি না। শুধু তোমাদের গলগ্রহ হইয়া আছি।"

পুত্রবধূ আর কিছু বলিল না—উঠিয়া ছোট একটি টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইতে লাগিল। দেওয়ালসংলগ্ন ছোট আলমারী হইতে রুটি ও মাখন বাহির করিল। চা প্রস্তুত হইলে স্বামীকে ডাকিয়া, বৃদ্ধার চেয়ার ঠেলিয়া টেবিলের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে এক পেয়ালা চা ও এক খণ্ড মাখনশূন্য রুটি রাখিয়া দিল। বৃদ্ধা চা খাইতে খাইতে ভীতনয়নে একবার পুত্র ও একবার পুত্রবধূর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার প্রিয়তম ঘড়িটির মত, এই পুত্র ও পুত্রবধুর মুখের প্রত্যেক ভাব তাহার বিশেষ পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তবে সে উভয়ের মধ্যে এইটকু তফাৎ দেখিত যে, ঘড়িটির চেহারা জীবন ভরিয়া সে এক রকমই দেখিয়াছে, কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধুর দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই কঠিন ও স্নেহশূন্য।

চা পান শেষ হইল, টম উঠিয়া পাইপ ধরাইয়া পুনরায় বাগানে গেল। পুত্রবধূ চায়ের বাসন ধুইয়া মুছিয়া যথা সময়ে তুলিয়া রাখিল। তারপর শ্বশ্রূর চেয়ারখানি ঠেলিয়া পুনরায় চিমনির নিকট সরাইয়া দিয়া বাগানে স্বামীর সহিত মিলিত হইল।

বৃদ্ধা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল! আহা! তাহারা যদি দয়া করিয়া একদিনও তাহার চেয়ারখানি বাগানে বাহির করিয়া দিত,—

তাহা হইলে উন্মুক্ত আকাশের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার প্রাণটা বিমল আনন্দে পূর্ণ হইত। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে তাহার শয্যা ও এই চেয়ার খানির উপরই কাটাইয়াছে,—সুদীর্ঘ পাচ বৎসর উদার গগনের স্নিগ্ধ বায়ু তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই।

দিনের আলোক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল,—সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, সে পুনরায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

সহসা বাহিরে পুত্র ও পুত্রবধূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পুত্র বলিতেছে,—

"—যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, টের পাইলে কি হইবে বুঝিতেই পার ন্যান্স্।"

স্ত্রী উত্তর করিল,—

"হ্যা মাকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ঠিক।

কিন্তু এস্থান ত্যাগ করিতে আমার মন সরিতেছে না। গৃহ শূন্য অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান তো বড় সুখের নয়!"

টম বলিল,—

"তা কি করিব বল? চাকরী যখন গিয়াছে তখন উপবাস করিয়া তো মরিতে পারি না। কাজের চেষ্টায় বাহির হইতেই হইবে।" বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল,—সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সে নববধূ রূপে এই কুটিরে প্রবেশ করিয়া ছিল,—ইহার প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক কোণের সহিত তাহার কত সুখদুঃখস্মৃতি বিজড়িত। ইহার একএক খানি ইষ্টক তাহার এক একখানি অস্থিতুল্য। সে আবেগ পূর্ণস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—

"না—না—তাহা হইতে দিব না। বাছারা আমার জন্য অনেক করিয়াছে,—আমি সে জন্য অকৃতজ্ঞ নই। কুটীর ত্যাগ করিতে দিব না। তোদের অকর্ম্মণ্য বুড়ী মা আজ দেখাইবে সে একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়।"

প্রিয়তম ঘড়িটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে মৃদু হাসিল। ঘড়িটির পশ্চাদ্ভাগে, একটি গুপ্ত স্থান ছিল,—সে কথা আর কেহই জানিত না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সে এক পেনী দুই পেনী করিয়া সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সঞ্চিত অর্থ সেই গুপ্ত স্থানে রাখিত।

পেনী হইতে শিলিং, শিলিং হইতে পাউণ্ড, এইরূপে এক শত পাউণ্ড সে যে কি করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামী পর্য্যন্ত কোন দিন টের পান নাই। মৃত্যুর সময় পুত্রকে সেই ধন সমর্পণ করিবে ইহাই প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল। পুত্র ও পুত্রবধূর বাক্যালাপ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থির করিয়া ফেলিল যে,—সেই সঞ্চিত ধন কল্যই তাহাদিগের হস্তে সে সমর্পণ করিবে। বৃদ্ধা কল্পনাচক্ষে দেখিল ন্যান্সির সুন্দর কঠোর মুখখানা বিস্ময়ে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—টমের শ্রান্তদৃষ্টি হর্ষ ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনা চক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সহসা পুনরায় পুত্রের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—

"হাঁ। দেখ ন্যান্স, আমাদের বেশী ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। আমি কোন স্থানে কিছু গুপ্তধনের আবিষ্কার করিয়াছি। তাহা দিয়া আমরা অন্য কোন ভাল স্থানে গিয়া কিছু দিন বেশ সুখে থাকিতে পারিব,—ততদিনে চেষ্টা করিয়া কাজের যোগাড়ও হইবে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ন্যান্সি বলিল,—"তুমি কি বকিতেছ? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

হাসিতে হাসিতে টম বলিল,—"বুঝিবে কি করিয়া? আমি সেদিন মায়ের ঐ পুরাণ ঘড়িটা মেরামত করিতে গিয়া উহার পিছনে একটি গুপ্ত স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। তাহার মধ্যে একটা থলিতে একশো চক্‌চকে সভারিন আছে।" "টম!" সোৎসুক ভাবে ন্যান্সি বলিল,—"টম! সত্যই বলিতেছ?"

"সত্য নয়তো কি মিথ্যা? আজ রাত্রে মা ঘুমাইলে ঐ থলি বাহির করিয়া আমরা দুই জনে এ কুটির ত্যাগ করিয়া যাইব।" বৃদ্ধা দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতে লাগিল।—

ন্যান্সি বলিল,—

"আর মা? তাঁর কি বন্দোবস্ত হইবে?" ঘৃণাপূর্ণ স্বরে টম উত্তর করিল,—

"ও বুড়ীটাকে কে সঙ্গে করিয়া ঘুরিবে? ও বোঝা এখন ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচি। এখানে অনাথ আশ্রম আছে,—তাহারা সংবাদ পাইলেই আসিয়া লইয়া যাইবে।"

একটু ভর্ৎসনার স্বরে ন্যান্সি বলিল,—"অনাথ আশ্রম! ছিঃ টম!"

"আমরা অনেক দিন তাহাকে পালন করিয়াছি, আর পারি না। এখন অনাথ আশ্রম তার কাজ করুক।"

তাহারা দূরে সরিয়া গেল,—তাহার পুত্রের শেষ কথা গুলি বৃদ্ধার বক্ষে আসিয়া শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। সে বলিতেছিল,—

"ও বুড়ীটার কথা ভাবিয়া তুমি মন খারাপ করিও না ন্যান্সি! সে এতদিন আমাদের কথা ভাবে নাই, টাকাগুলি লুকাইয়া রাখিয়া আমাদের ঘাড়ে বসিয়া খাইয়াছে। ভাগ্যে আমি সেদিন ঐ ঘড়িটা মেরামত করিতে গিয়াছিলাম,—না হইলে কি হইত ভাবিয়া দেখতো? বুড়ী মরিয়া গেলেই তো আর জানিতে পারিতামনা,—ওটাকে হয়তো বিক্রী করিয়া ফেলিতাম। আজ রাত্রেই ও টাকাগুলি লইয়া আমরা দুজনে এ কুটির হইতে চলিয়া যাইব।" তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কম্পিতবক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া, বৃদ্ধা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কষ্টে তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার প্রিয়তম পুত্র,—তাহার প্রথম সন্তান আজ তাহাকে ভিখারিণীর ন্যায় অনাথিনী আশ্রমবাসী করিবার কল্পনা করিতেছে! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লজ্জানম্র নববধূরূপে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিতেছে! হায় নিয়তি! এইরূপ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা, এইরূপ অকৃতজ্ঞতা কি সম্ভব? দুর্ব্বল চলৎশক্তিহীনা মাতাকে এইরূপে ত্যাগ করিয়া

যাইতে তাহার পাষাণহৃদয়ে কি মুহূর্ত্তের জন্যও একটু অনুতাপ আসিবে না? হা রে হতভাগ্য সন্তান! যে ধনের লোভে এই নিষ্ঠুরতা করিতে উদ্যত হইয়াছ, মুহূর্ত্তপূর্ব্বে মাতা যে সেই ধনই তোমাকেই সমর্পণ করিবার কল্পনা করিতেছিল!

অশ্রুহীন শ্রান্ত নেত্র তুলিয়া সে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—তার পর পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হস্তে শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিল। এই কুটিরে আর একরাত্রি সে বাস করিতে পারিবে। কত সুন্দর মধুর পবিত্র স্মৃতিতে এই কুটির পরিপূর্ণ—ইহার সহিত তাহার জীবনের সকল সুখদুঃখ বিজড়িত। মৃত্যু কতবার তাহার করাল ছায়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শোকাতুর করিয়াছে—প্রিয়জনকে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিতে কতবার তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে। একটি অবাধ্য কুপথগামী পুত্রকে গৃহতাড়িত হইতে দেখিয়া মাতৃহৃদয় অসহনীয় দুঃখ সহ্য করিয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দুঃখস্মৃতি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল,—সুখ স্মৃতি সকল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছিল। তাহার জীবনের সন্ধ্যা গত হইয়া রাত্রি সমুপস্থিত,—জীবনের অবশিষ্টাংশ সে এই কুটিরেই যাপন করিয়া, সময় হইলে এই সকল পবিত্র স্মৃতির মধ্যেই আপনার মুক্ত আত্মা অনন্তের পানে ছুটাইয়া দিবে, এই আশাই হৃদয়ে সর্ব্বদা পোষণ করিত। কিন্তু হায়! একি হইল? এ পাপ রোধ করিবার শক্তি তো তাহার নাই,—সে যে বড় দুর্ব্বল! সে যে অশক্ত!

চিমনির আগুন নিভিয়া গিয়া গৃহ ক্রমেই শীতল হইতেছিল। টেবিলের উপরিস্থিত ল্যাম্পের তেল ফুরাইয়া গিয়াছিল,—বাতি দু-একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া, একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। বৃদ্ধার সে জ্ঞান ছিল না,—তাহার হৃদয়ে আজ যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার তুলনায় এই অন্ধকার তাহার নিকট কি!

সহসা বাহিরের দ্বারে কে মৃদু করাঘাত করিল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"—কেহই কোন উত্তর দিল না। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল, একটা দীর্ঘাকৃতি লোক প্রবেশ করিয়া, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিল, বৃদ্ধা অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, "তুমি কে? কি চাও?" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক কোন উত্তর না করিয়া, তাহার স্বর লক্ষ্য করিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীতি-বিহ্বল স্বরে বৃদ্ধা বলিল,—

"তুমি যদি অর্থের সন্ধানে আসিয়া থাক তবে ফিরিয়া যাও! আমাদের কিছুই নাই,—আমরা বড় দরিদ্র।"

এই বার আগন্তুক কথা কহিল। বৃদ্ধার চরণতলে বসিয়া, তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল,—

"আমি চোর নহি। আমাকে চিনিতে পারিতেছনা—মা!, আমি যে "ডিক্"! আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,—"ডিক্!"

তাহার প্রিয়তম পুত্র ডিক্! তাহার গৃহতাড়িত পুত্র ডিক্! শৈশবে মাতৃঅঙ্কে স্তন্যপান করিতে করিতে নির্ম্মল চক্ষু দুটি মাতার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া শুভ্র হাসিরাশি যখন মাতার হৃদয় বিমল আনন্দে পূর্ণ করিত,—তখন হতভাগিনী মাতা স্বপ্নেও ভাবে নাই,—সেই ডিক একদিন তাহার হৃদয় চূর্ণ করিবে। যৌবনে স্খলিতচরিত্র হইয়া, যেদিন পিতাকর্তৃক গৃহতাড়িত হয়, সেদিন মাতার পক্ষে কি ভীষণ পরীক্ষার দিন গিয়াছিল!

আজ বিশ বৎসর পরে সেই ডিককে সম্মুখে দেখিয়া মাতার হৃদয় স্নেহসিক্ত হইল। স্নেহবিগলিত স্বরে বৃদ্ধা বলিলেন,—"ডিক! এতদিন পরে এলি বাবা! আজ পোনর বৎসর তোর পিতা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। তুই এতদিন কোথায় ছিলি? কোথা হইতে এতদিন পরে আসিলি?"

"আমি না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাগো! আমি জানি সকলে আমাকে ঘৃণা করিলেও, তুমি কখনই করিবে না। আমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। সারাদিন ঝোপে ঝোপে লুকাইয়া ফিরিয়াছি। আজ দুইদিন কিছু খাই নাই—মা।"

"তুই কোথায় ছিলি? কিসের ভয়ে লুকাইয়াছিলি?"

"আমি জেল হইতে পলাইয়াছি—আজ দুদিন তারা আমার অনুসরণ করিতেছে। পাইলেই ধরিয়া লইয়া যাইবে,—তাহা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ।"

"জেল হইতে!" বেদনাপূর্ণস্বরে মাতা বলিলেন "জেল হইতে?" হায় ডিক্! এ কি কথা শুনাইলি!"

কাতরকণ্ঠে ডিক বলিল,—

"তুমিও বিমুখ হইবে—মা! আজ তিন দিন জঙ্গলে ফিরিয়াছি,—তোমার কাছে আসিতেছি এই আশ্বাসেই সে দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছি। তুমি বাঁচিয়া আছ কিনা জানিতাম না,—তবু একবার না আসিয়া পারিলাম না। তোমার এই অকৃতজ্ঞ সন্তান তোমার অমূল্য ভালবাসার কথা কখনই ভোলে নাই! তুমিও আমাকে তাড়াইয়া দিও না—মাগো! আমি বেশিক্ষণ থাকিতে পারিব না—এই কাপড়গুলি পরিবর্ত্তন করিবার মত কিছু কাপড় চোপড়, ও সামান্য কিছু অর্থ পাইলেই আমি চলিয়া যাইব,—আমার নামও আর তুমি শুনিতে পাইবে না।"

ডিকের কাতর কণ্ঠনিঃসৃত কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মাতৃহৃদয় ব্যথিত হইল,—তাহার এই অকৃতজ্ঞ সন্তানকে বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য—তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল! এ যে তাহারই অধিকার! এ অধিকার হইতে যে সে বহুদিন বঞ্চিত আছে! টম ও তাহার হৃদয়হীনা স্ত্রীতো তাহাকে চায় না,—তাহারা তো তাহার স্নেহ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয় না! সেতো তাহাদিগের নিকট ভার মাত্র! কিন্তু এই পাপী সন্তান মাতার নিকট স্নেহ ও সাহায্যলাভের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে! সে যে বড় অসঙ্কোচে মাতৃহৃদয়ে অধিকার স্থাপন করিতে আসিয়াছে! ডিকের

কাতর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয় স্নেহ ও বেদনায় প্লাবিত হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে তাহার ক্ষীণহস্ত ডিকের মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বলিল,—

"হ্যাঁ বাছা আমি তোমাকে রক্ষা করিব। কিন্তু টম্ তোমাকে দেখিতে পাইলে আর রক্ষা নাই,—ভাগ্যে তাহারা এখন গৃহে নাই। ঐ ঘরে যাও, টমের কাপড় চোপড় যাহা পাও পরিয়া লও—তার পর ঐ আলমারীতে খাদ্যদ্রব্য সামান্য কিছু বোধহয় আছে—কিছু খাইয়া লও বাছা! কতদূর যাইতে হইবে তাহার ঠিক কি?"

ডিক বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধা ভীতিবিহ্বলনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে, এই চিন্তায় আকুল হইল।

সহসা সে চমকিয়া উঠিল! তাহার দৃষ্টি সেই পুরাতন ঘড়িটির উপর পড়িয়াছিল। টম তো আজ তাহার যত্ন সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া এই বিজন কুটিরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। সেতো এই অর্থ ডিককে সমর্পণ করিয়া তাহাকে নিরাপদ করিতে পারে। সে যে ছোট শিশুটির মত তাহার পদতলে বসিয়া তাহাকে সুমধুর "মা" রবে ডাকিয়াছে।

ডিক্ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল,—মাতার নির্দ্দেশমত দেওয়ালের গাত্রস্থিত আল্মারী হইতে কিছু রুটী ও মাংস বাহির করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। মাতা সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এইতো তাহার হারাধন ফিরিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু—কিন্তু এখনই তো সে আবার চলিয়া যাইবে! তাহার কুঞ্চিত কপোল বাহিয়া দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে ত্রস্তে তাহা মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ডিক্! তুমি এখান হইতে কোথায় যাইবে?" ডিকের আহার শেষ হইয়াছিল,—সে টেবিলের নিকট হইতে চেয়ার সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—বহুদূরে! সেখানে দেবী প্রতিমা ও একটি অনিন্দ্য সুন্দর শিশু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মাগো! আমার সেই অসহায় শিশুর কথা স্মরণ করিয়া ক্ষমা কর। আমার নিকট যে অর্থ আছে তাহাদ্বারা আমি বেশী দূর যাইতে পারিব না।—সামান্য কয়েকটি শিলিং হইলেই আমি কোন রকমে চলিয়া যাইতে পারিব বোধহয়। তাহা না হইলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া দৃঢ়স্বরে মাতা বলিল,—

"অর্থ তোমায় আমি দিব। কিন্তু বাবা! আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর আর কখনও অসৎ পথে যাইবে না,—ভদ্র সন্তানের মত জীবন যাপন করিবে।"

ম্লাননেত্রে মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ডিক্ কহিল,—

"তোমার নিকট শপথ করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীপুত্রের নিকট পৌঁছিতে পারিলে আর কখনও মন্দ পথে যাইব না,—ভদ্র সন্তানের মত জীবন যাপন করিব।"

পুরাতন ঘড়িটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মাতা বলিল,—

"বাছা! ঐ ঘড়িটির পিছনে একটি গুপ্ত স্থান আছে, তাহাতে একটি ব্যাগে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। বিবাহের পর হইতে অতি কষ্টে ঐ অর্থ সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু একটি মুদ্রা অদ্যাপি স্পর্শ করি নাই। আজ আমার আশীর্ব্বাদের সহিত উহা তোমায় সমর্পণ করিলাম,—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

"স্বর্ণমুদ্রা!" ডিক্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, স্বর্ণমুদ্রা! কিন্তু মা! উহাতে তোমার প্রয়োজন নাই?"

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধা বলিল,—না বাবা! উহার দ্বারা আমার কি প্রয়োজন? কষ্ট করিয়া সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে নূতন জীবন আরম্ভ করিবার জন্য উহা তোমায় দিলাম। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর আমার কি হইতে পারে?"

ডিক্ মাতার নির্দ্দেশ মত ঘড়ির পশ্চাদ্ভাগস্থিত একটি স্প্রীং টিপিয়া ধরিল,—একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল,—তাহার মধ্যে একটি ব্যাগ! তাহা বাহির করিয়া বিস্মিতনেত্রে মাতার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"এ যে ভয়ানক ভারী,—কত মুদ্রা আছে? "এক শত পাউণ্ড!" গর্ব্বভরে বৃদ্ধা বলিল, "এক শত পাউণ্ড! চল্লিশ বৎসরের সঞ্চয়!"

ডিক বলিল,—

"মা! এ সব অর্থ আমি লইব না,—ইহা হইতেই পারে না। তোমার এত ভালবাসার যোগ্য আমি কোন দিন নই,—তোমাকে চিরকাল কষ্টই দিয়াছি। এই অর্থ লওয়া অপেক্ষা জেলে ফিরিয়া যাওয়া আমি শ্রেয় বিবেচনা করি।" মৃদু হাসিয়া মাতা বলিল,—

"লও বাবা লও ইহাতে কোন দোষ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—আজ আছি কাল নাই, কে কখন উহা চুরি করিয়া লইয়া যাইবে তাহার ঠিক কি? তোমার স্ত্রী পুত্রের জন্য উহা তোমায় দিলাম।"

মাতার পদতলে নতজানু হইয়া দুই হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে ডিক্ বলিল,—

"মাগো! যখন সকলে বিমুখ হইয়াছিল, তখন তোমার অসীম স্নেহের কথা স্মরণ করিয়াই বাঁচিয়া ছিলাম। জেল হইতে বাহির হইয়া তোমার কথা মনে করিয়াই প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তখনও জানিতাম না তুমি এইরূপে তোমার স্নেহ আমাকে জানাইবে। তুমি আজ শুধু আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলে না,—আমাকে পুনর্জ্জন্ম দান করিলে, আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিলে, তোমায় আর কি বলিব, মা! তোমার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়াই আমি সকল বিপদ, সকল প্রলোভন জয় করিব।"

ডিক্ দেখিল, তাহার মাতার মুখ অসীম সুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে পুনরায় বলিল,—"মা! তুমি ঠিক কথা বলিতেছ তো? এ অর্থে তোমার কোন প্রয়োজন নাই?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া মাতা বলিল,—"না বাবা! টম ও তাহার স্ত্রী আমার জন্য সবই করে। আমার কোন কষ্ট নাই।"

অল্পক্ষণ পরে কুটিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া ডিক্ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে বাতাসে মিলাইয়া গেলে, তাহার মাতা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের গায় ঢলিয়া পড়িল। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সে বিসর্জ্জন দিল। ডিকের পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন এ জগতের সহিত তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। নিজের জন্য কোন ভয়, কোন ভাবনা আর তাহার রহিল না, সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

* * *

টম্ ও ন্যান্সি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন রাত্রি গভীর। টম অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছিল, সুতরাং তাহার মেজাজ বড়ই রুক্ষ হইয়াছিল। গৃহ প্রবেশ করিয়া গৃহ অন্ধকার দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বেজায় অন্ধকার! বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বাতিতে একটু বেশী তেল দিয়া গেলে কি দোষ হইত?"

ন্যান্সি বলিল,—"চুপ-চুপ আস্তে কথা বল. একটা দিয়াশালাই দাও এখনই বাতি ধরাইয়া দিতেছি।"

বাতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই ন্যান্সির দৃষ্টি চেয়ারোপবিষ্টা বৃদ্ধার উপর পড়িল, সে একটু দুঃখিতভাবে বলিল,—

"আহা! মাকে বিছানায় দিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বেচারী সেই অবধি চেয়ারে বসিয়া আছে।"

টম একটি সুবৃহৎ হাই তুলিয়া বলিল, তবে দাও ওকে বিছানায়,—তারপর আমাকে কিছু খাইতে দাও। কাল সকালেই চলিয়া যাইতে হইলে হাতে অনেক কাজ আছে।"

বৃদ্ধা দুই হস্ত বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে ন্যান্সি বলিল,—

"মা! ওঠ—শুইতে যাইবে চল। পরক্ষণেই সর্পাহতের ন্যায় চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"টম্—টম্! এ যে মৃতদেহ।"

টম্ নিকটে আসিয়া মাতার স্থির মুখের প্রতি চাহিল। একি! মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সব মিলাইয়া গিয়া একটি শান্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ মুখ যে আনন্দভরা! টম বলিল,—ন্যান্সি! যাহা হয় ভালর জন্যই হয়। এখন আর এই অর্থ আমায় চুরী করিতে হইবে না, উহা এখন ন্যায়তঃ আমারই। আমিই তাহার উত্তরাধিকারী।" টম গৃহ পার হইয়া ঘড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

সহসা মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভীষণ চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল,—ন্যান্সি—ন্যান্সি—সর্ব্বনাশ হইয়াছে সমস্ত অর্থ চুরী গিয়াছে।"

"চুরী?" ন্যান্সি বলিল,—"চুরী! তবেই ঠিক হইয়াছে! চোর দেখিয়া ভয় পাইয়াই তাহা হইলে মার মৃত্যু হইয়াছে।" স্বামীতে স্ত্রীতে মিলিয়া অর্থের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই অর্থের বাস্তব সংবাদ সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকালের জাগ্রৎ অন্তর্য্যামী প্রহরী ও একটি প্রাণভয়ে ভীত পলাতক আসামী ভিন্ন কেহই জানিল না।

মাতৃঋণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আরাম-কুঞ্জ।

"না, জ্যাক্, তোমার কোন ভয় নেই আর তোমাকে জিমনেসে যেতে হবে না—সেখানে কথনো তোমাকে পাঠাব না আমি। তারা তোমার গায় হাত তোলে—এত দূর স্পর্দ্ধা তাদের! বেশ করেছ, তুমি পালিয়ে এসেছ! ছিঃ বাবা—চোখ ছল ছল করছে কেন, এখনও? না, ভয় কি? আর কখনো তোমায় আমি কাছ-ছাড়া করব না। এ বেশ দেশ—কোন গোলমাল নেই—গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানি নেই, লোক জনের ভিড় নেই। বাড়ীতে কত কি পুষেছি দেখবে—পায়রা, খরগোশ, মুরগী, ছাগল, গাধা। ভাল কথা, এখনও আজ তারা খেতে পায় নি। আমি সব ভুলে গেছি। তোমাকে দেখে কিছু মনে ছিল না। তুমি সুরুয়া খেয়ে একটু ঘুমোবে চল। সারা পথ হেঁটে তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। আহা, কাল আমি যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমচ্ছিলাম, তখন বাছা আমার সেই অন্ধকার রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ! কি ভয়ঙ্কর জ্যাক! ঐ শোন, পায়রাগুলো ডাকছে—আমি তাদের খাওয়াইগে—তুমি সুরুয়াটুকু খেয়ে এখন একটু ঘুমোও।"

ইদা ধীরপদে চলিয়া গেল!

জ্যাকের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। একটু বিশ্রাম,—তার পর স্নান শেষ করিয়া রন্ধন-কারিণী আর্কার তৈয়ারী সুরুয়া পান করিয়া তাহার ক্লান্তি অনেকখানি ঘুচিয়া গেল। নূতন দেশের অভিনবত্বে, মাতৃদর্শনলাভে, কিশোর হৃদয়ের সহজ প্রফুল্লতায় নিমেষেই সে গতরাত্রের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া গেল। সে মুগ্ধ নেত্রে দেখিল, কি অপূর্ব্ব শান্তি, অভাবনীয় বিরামে চারিধার ভরিয়া রহিয়াছে!

তাহার ছোট ঘরটি সূর্য্যালোকে জল্ জল্ করিতেছিল। বাহিরে পল্লীর সরল অনাড়ম্বর শোভা, বৃক্ষশ্রেণীর পত্রঘন শাখায় বসিয়া পাখীর ঝাঁক কলকাকলী তুলিয়াছে, ছাদে অসংখ্য পারাবতের কলরব—সর্ব্বোপরি মাতার মিষ্ট কণ্ঠস্বর,—সমস্ত হইতে কি বিপুল মধুরতা নির্ঝরের মত সহস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! যেন চারিধারে কি এক মহা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে! জ্যাকের চিত্ত একটি নিশ্চিন্ত আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ আনন্দে একটু বিঘ্ন ঘটিল। সহসা সে দেখিল, মাতার শয়নকক্ষে দেওয়ালে আর্জেন্তঁর এক সুবৃহৎ তৈলচিত্র ঝুলানো—মুখে দম্ভের একটা বিকটভাব—চোখ দুটাতে হিংসার জলন্ত বহ্নি—শত চেষ্টাতেও চিত্রকর এ ভাব ঢাকিতে পারে নাই।

জ্যাক ভাবিতে লাগিল। কোথায় সে? সে কি এখানেই থাকে? তবে দেখা নাই, কেন? অবশেষে চিত্রখানার সম্মুখে থাকা অসহ্য বোধ হওয়ায় জ্যাক মার নিকট গেল।

ইদা তখন মুরগীগুলাকে আহার দিতে ছিল। অন্নদায়িনী সেবাপরায়ণা নারীর

মুখ কি এক মহিমার আলোকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যাক সগর্ব্বে মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আর্কা আসিয়া কহিল, "এইটিই বুঝি, ছেলে? বেশ ছেলেটি।"

"নয় কি, আর্কা? আমিত বলেও ছিলাম।"

"ছেলেটি ঠিক মার মত হয়েছে—বাপের মত কোনখানাই নয়। যেমন মুখ চোখ, তেমনি গড়ন।"

বাপের মত! কথাটা জ্যাকের বুকে শেলের মত বিঁধিল। বাপ!

"ঘুম হলোনা, বুঝি, জ্যাক—তবে এস, সব দেখবে।" বলিয়া ইদা জ্যাককে লইয়া ঘর দেখাইতে চলিল।

গ্রামের প্রান্তে ছোট বাড়ীখানি,—দেখিতে ছবির মত সুন্দর। চারিধারে ছোটখাট বন—অদূরে একটা নদী বহিয়া চলিয়াছে—জানালা হইতে তাহার ক্ষীণ স্রোত রূপালি সূতার মত দেখা যায়। নদীর পরপারে ঝোপের মধ্য দিয়া সরুপথ জাগিয়া রহিয়াছে—সে যেন কোন্ অজানা স্বপ্নরাজ্যের সীমানায় গিয়া মিশিয়াছে।

একটি সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইদা কহিল, "এই ঘরে উনি কাজকর্ম্ম করেন।"

এই উনিটি কে—তাহার পরিচয় লইবার জন্য জ্যাক এতটুকু ঔৎসুক্য জানাইল না। শুধু তাহার মর্ম্মস্থল হইতে জ্বালাময় একটা তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ইদার অজ্ঞাতে নীরবে বায়ুতে মিলাইয়া গেল।

মৃদুস্বরে ইদা কহিল, "উনি দেশ বেড়াতে গেছেন। শীঘ্রই ফিরবেন। আমি তাঁকে তোমার আসার কথা আজই লিখব। ভারী খুসী হবেন তিনি। তাঁর মেজাজটা একটু রুক্ষ হলেও, বড় ভাল লোক তিনি—তোমায় খুবই ভালবাসেন। তুমিও তাঁকে ভালবেস, জ্যাক। বাসবে ত? তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা না হলে, আমার মনে কখনো আমি সুখ পাব না।"

কথাটা বলিয়া ইদা দেওয়ালে লম্বিত আর্জেণ্টর তৈলচিত্রখানার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তার পর কহিল, "বল, জ্যাক, তুমি তাঁকে ভালবাসবে—বল, তা শুনলে তবে আমি আশ্বস্ত হব।" ইদা জ্যাককে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল।

ইদার কণ্ঠস্বরে একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিল। জ্যাক সরিয়া মার মুখের দিকে চাহিল, ধীর স্বরে কহিল, "বাসব।"

তার পর উভয়েই সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেদিনকার প্রফুল্ল উজ্জ্বল আকাশে এই মেঘের কৃষ্ণবিন্দুটুকু কোনমতে মুছিয়া ফেলা গেল না।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ রিভাল বেড়াইতে আসিল। রিভাল এতিঁয়ো গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার। গ্রামের ভদ্র-ইতর সকল শ্রেণীর লোকই রিভালের সদাশয়তায় তাহার গুণমুগ্ধ। রিভাল আসিয়া জ্যাকের সহিত আলাপ করিল। তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সস্নেহে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্নেহের ভিখারী বালক বৃদ্ধের ব্যবহারে চমৎকৃত হইল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল। তার পর রাত্রি আসিল। ঝিল্লীর

গানে চারিধার ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিল। রাত্রে জ্যাক নিদ্রিত হইলে ইদা আর্জেন্তঁকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল। জ্যাক আসিয়াছে সে সংবাদ দিয়া, জ্যাকের প্রতি আর্জেন্তঁর একটু স্নেহ ও সহানুভূতি, সে কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিল। বেচারা জ্যাক—তাহার জন্য আর কিছু না—শুধু একটু করুণা এতটুকু স্নেহ! সে নিতান্ত অভাগা!

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল।

পত্রে মাতার দুর্ব্বলতার প্রতি বক্র ইঙ্গিত ও তিরস্কার এবং বালকের শিক্ষার অভাবের উল্লেখ ছিল। তবু ইদার মনে হইল—পত্রে তেমন রূঢ়তা নাই! আর্জেন্তঁ লিখিয়াছে, মরোভোঁর স্কুলে অনর্থক ব্যয় হইতেছিল—কারণ স্কুলের দশা আর তেমনটি নাই—তথাপি সেখান হইতে জ্যাকের পলাইয়া আসাটা কোনমতে সমর্থন করা যায় না—তাহা খুবই অন্যায় হইয়াছে। যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরান যায় না—তবে বালকের ভবিষ্যতের ভার আর্জেন্তঁ লইতে প্রস্তুত আছে। এতিঁয়োতে ফিরিয়া—আর একসপ্তাহ পরেই সে ফিরিবে—আর্জেন্তঁ এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে।

এই সাতদিন জ্যাক যে সুখে কাটাইয়া ছিল, তাহার সমগ্র জীবনে—কি শৈশবে কি পরজীবনে—এমন সুখ আর কখনও সে পায় নাই। গৃহে মাতার সঙ্গ, বাহিরে বন, বাগান, নদী,—ঘর বাহিরে সমস্তই যেন তাহার নিজস্ব! গৃহে বাহিরে মুক্ত আনন্দে সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে—ইদাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইতেছে—আদর আবদারে এতটুকু ত্রুটি নাই! প্রাণ খুলিয়া হাসির তুফান তুলিতেছে—যেন জ্যাকেরই জন্য পৃথিবীর যত কিছু আনন্দ উল্লাস বিধাতা উদার হস্তে চারিধারে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন।

আর্জেন্তঁর নিকট হইতে আর একখানি পত্র আসিল—কল্য সে এতিঁয়োতে আসিয়া পৌঁছিবে।

আর্জেন্তঁ জ্যাককে স্নেহ ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবে বলিয়া পত্রে স্বীকার করিলেও ইদার মন সুস্থির ছিল না। ষ্টেশনে ইদা জ্যাককে লইয়া গেল না—পথে কাতর অনুনয়ে একবার সে আর্জেন্তঁর করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করিবে—সহসা জ্যাককে দেখিলে আর্জেন্তঁ যদি রাগিয়া উঠে—এই ভয়েই জ্যাককে গৃহে রাখিয়া আর্জেন্তঁর অভ্যর্থনার জন্য ইদা গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গেল। জ্যাককে বলিয়া গেল,—"জ্যাক তুমি বাগানে থেকো—ফস্ করে ওঁর সামনে এসোনা। আমি ডাকলে তবে এস—কি জানি—" কথাটা শেষ না করিয়াই ইদা ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া জ্যাক দমিয়া গেল। তাহার পর কখন গৃহদ্বারে গাড়ী আসিয়া যে থামিয়াছে, জ্যাক তাহা জানিতেও পারিল না। সহসা সে মার স্বর শুনিল,—মা ডাকিতেছে,—"জ্যাক এ'দিকে এস!"

জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এইবার! কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোনমতে আর্জেন্তঁকে অভিবাদন করিয়া জ্যাক দাঁড়াইল। আর্জেন্তঁ বক্তৃতা সংক্ষেপেই সারিয়া লইল—বক্তৃতায় স্নেহও একটু যে মিশানো না ছিল, এমন নহে।

আর্জেন্তঁ কহিল, "জ্যাক—তোমাকে মানুষের মত হতে হবে, কাজ করতে হবে।

কাজ! কাজ! কাজ ছাড়া থাকা চলবে না। জীবনটা ধুলাখেলা নয়। বেশী কিছু করতে হবে না—শুধু আমি যা বলব, তাই করবে, তাহলে আমিও ভালবাসব—আর সকলেই সুখে থাকতে পারব। আমি এখন এই চাই—আমার নিজের যথেষ্ট কাজ আছে—অবসর খুবই কম—তবু তোমাকে মানুষ করে তোলবার জন্য তোমার দিকে একটু মন দিতেই হবে। ঘণ্টা দুই আমি তোমার জন্য খরচ করব—তোমার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য। যদি আমার মতে চলতে পার—তবেই আমার মত কাজের লোক হতে পারবে—সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি হবে, নাহলে যেমন অপদার্থ আছ, তেমনই থেকে যাবে।"

আর্জেন্ট কহিল, "জীবনটা ধুলাখেলা নয়।"

"শুনছ, জ্যাক?" পুত্র-মঙ্গলার্থিনী মাতা সাগ্রহে সানন্দে কহিল "তোমার জন্য উনি নিজের কত ক্ষতি করছেন, বুঝছ ত জ্যাক?"

"হাঁ, মা।"

"থাম, সালটি," আর্জেন্ট কহিল, "আগে আমি জানতে চাই—আমার কথা থাকবে কিনা—আমি অবশ্য বাধ্য করছি না যে এরকমভাবে চলতেই হবে।"

"বল, জ্যাক, পারবে ত?—"

মাতাকে আর্জেন্ট কর্তৃক সাল টি নামে সম্বোধিত হইতে দেখিয়া জ্যাক কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল! তাই চট্ করিয়া সে কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। সহসা চমক ভাঙিলে, "পারব" বলিয়া জ্যাক

কক্ষ ছাড়িয়া দ্রুত নীচে নামিয়া আসিল। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিতেছিল—মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল—সে নীচে আসিয়া একটা শূন্যকক্ষে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে জ্যাক দেখিল, তাহার কক্ষের দেওয়ালে একটা ফ্রেমে বাঁধা কাগজ ঝুলিতেছে। কাগজে কবির আঁকাবাঁকা অক্ষর ছড়ানো রহিয়াছে—নিকটে আসিয়া জ্যাক দেখিল, মোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

রুটিন।

তাহার পর জীবনের একটা গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—পড়াশুনার ধারা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দিনের মুহূর্ত্তগুলাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করা হইয়াছে—"ছয়টায় শয্যাত্যাগ। ছয়টা হইতে সাতটা—প্রাতর্ভোজনাদি। সাতটা হইতে আটটা—পড়া—আটটা হইতে নয়টা—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য ছিদ্র করিলে যেমন সে ছিদ্রের মধ্য দিয়া যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করেনা, আলোক-প্রবেশেরও তেমন সুবিধা থাকে না—তেমনই ভাবে দিনটাকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—লাটিন, গ্রীক, বীজগণিত জ্যামিতি, দেহতত্ত্ব, ব্যাকরণ সকল বিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তারপর এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলাকে কখন কোন্ সুদূর শুভ মুহূর্ত্তে এক অখণ্ড জ্ঞানের স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এ ধরাবাঁধা নিয়মে চলা বালকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বালকের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত জিনিষ ধরিবার মত স্থান ছিল না। কাজেই তাহার চিত্ত স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিলে সে যখন গ্রন্থের স্তূপের মধ্যে আপনাকে মগ্ন দেখিত, কিম্বা আপনার কপিবুকের দিকে ঝুকিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অক্ষরগুলা ক্রমে তাহার চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন বাহিরের মুক্ত বায়ু ও স্বাধীন আনন্দলাভের জন্য তাহার চিত্ত স্বভাবতই অস্থির হইয়া উঠিত। তাহার মনে হইত একবার যেমন পলাইয়াছিল, আবার তেমনই সে কোথাও পলাইয়া যায়!

মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া বসন্ত অজস্র পুষ্পের স্নিগ্ধ সুরভি বহিয়া আনিত, প্রকৃতি আপনার সবুজ আসন বিছাইয়া বালককে সস্নেহে আহ্বান করিত, জ্যাক তখন বহি বন্ধ করিয়া বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখীর পানে চাহিয়া থাকিত, কখনও সে দেখিত, কাঠবিড়ালী কোমল পুচ্ছ তুলিয়া এগাছে ওগাছে কি আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! বাহিরে সারা বন যখন অজস্র ফুটন্ত গোলাপে ভরিয়া লালেলাল হইয়া গিয়াছে, তখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, "Rosa—the Rose—গোলাপ" মুখস্থ করা কি দারুণ কষ্টকর! আর কোন কথা জ্যাকের মনে আসিত না—সে শুধু ভাবিত, কেমন করিয়া সে মুক্ত রৌদ্রালোকে, মুক্ত বায়ুতে আপনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিবে!

কিছু দিন পরে "অপদার্থ—বোকা" বলিয়া

আর্জেন্ত, জ্যাকের শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দিল। ইদা করুণদৃষ্টিতে শুধু জ্যাকের পানে একবার চাহিল, কোন কথা বলিল না। জ্যাক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতদিন যেন সে কয়েদীর মত বদ্ধ ছিল—আজ ছাড়া পাইয়াছে—সে মুক্ত, স্বাধীন! ছাড়া পাইয়া জ্যাক বনের দিকে ছুটিল। পাখীর গানে আকাশ তখন ভরিয়া গিয়াছে,—ফুলের গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠিয়াছে—নদীতে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে,—প্রজাপতির দল ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে, জ্যাক নৌকা দেখিয়া প্রজাপতি ধরিয়া নিরুদ্বেগে সময় কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলে, গৃহের নিস্তব্ধতার প্রথমটা যেন তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল! ইদা তাড়াতাড়ি আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "চুপ, গোল করোনা। উনি কাজ করছেন—বই লিখছেন।"

জ্যাক তখন অতিরিক্ত সতর্ক হইতে গিয়া, দ্বারটা সশব্দে বন্ধ করিয়া ফেলিল, ছোট টেবিলটা উল্টাইয়া ফেলিল! ইদা আসিয়া আবার বলিল, "শান্ত হয়ে থাক জ্যাক—শব্দ করো না।" আর্জেন্ত বহি লিখিতেছেন—কাজ করিতেছেন।

প্রকাণ্ড খাতা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নাম "কষ্টের কন্যা" আঁকাবাঁকা ছাঁদে লিখিয়া ভাবসংগ্রহের জন্য আর্জেন্ত কক্ষমধ্যে উদ্বেগাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়! তবু এক ছত্র লেখা বাহির হয় না। জানালার ধারে আসিয়া আকাশ, মাঠ, বাগান, নদী দেখিয়া তাহার হৃদয় ভাবের বন্যায় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, কিন্তু কলমটি হাতে লইলেই সে ভাবস্রোত কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। খাতার পৃষ্ঠা যেমন শূন্য তেমনই শূন্য রহিয়া যায়! জীবনের চারি ধারে কি প্রচুর কাব্য—কিন্তু তাহা যেন আর্জেন্তর সহিত শত্রুতা করিয়া বসিয়া আছে—তাহার হস্তে কোনমতে ধরা দিবে না। গ্রামের প্রান্তে লতাপাতাঘেরা এমন কুটিরে থাকিয়াও যদি গ্রন্থ লেখা না যায় ত সে দুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই নাই!

ইদা আসিয়া বলিল, "কি লিখলে?"

আর্জেন্ত বলিল, "এসেছ তুমি—আচ্ছা, বস!"

ইদা কহিল, "আমি জানতে এলাম, "কষ্টের কন্যা" কতদূর লেখা হল?"

"কষ্টের কন্যা? তুমি জান, ফষ্ট লিখতে গেটের কত বছর লেগেছিল! ঠিক দশটি বৎসর! তবু ত তিনি যে যুগে বাস করতেন সেটাকে সত্যযুগ বললেও চলে! লোকের মনে এতটুকু নীচতা ছিল না, হিংসাদ্বেষ ছিল না—সহানুভূতিতে সকলের মন ভরা ছিল! আর এখন—উঃ, চারিধারে সকলে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, প্রতিভাশালী লোককে মাথা তুলতে দেবে না—তাকে যেমন করে হোক, নিষ্ঠুর সমালোচনা করে, উৎসাহ না দিয়ে—দমিয়ে দেবে।"

আর্জেন্ত খাতা খুলিয়া ভাবের সন্ধান না পাইয়া শেষে সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসে। প্রথম ছত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাকরের নামটি অবধি—কোন কথাই সে বাদ দেয় না। সংবাদপত্র খুলিয়া সে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করে যে, দেখিলে মনে হয় যেন সে তাহার অপ্রকাশিত উপন্যাসের

সমালোচনার সন্ধান করিতেছে, কিম্বা কল্পিত নাটকের চরিত্রানুশীলন পাঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে! সংবাদপত্র-পাঠে তাহার অসন্তোষ বাড়ে ভিন্ন কমে না! দেশের লক্ষ্মীছাড়া সংবাদপত্রগুলা এত লোকের সংবাদ দিতে কাতর হয় না, শুধু তাহার সন্ধান লইতে হইলেই সকলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—তাহার সন্ধান রাখিবার জন্য এতটুকু আগ্রহও করে না!

জগতে সকলে সুখী, সকলেই ভাগ্যবান! তাহাদিগের নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে—অথচ কি সব নাটক! তাহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে—কি—বা গ্রন্থ! শুধু তাহার গ্রন্থগুলাই অপ্রকাশিত রহিয়া যায়! আরও দুঃখের কথা ছিল ইহা যে, কোন একটি ভাব তাহার মনের মধ্যে দেখা দিয়া যখন প্রকাশের অবসরটুকু খুঁজিয়া পায় না, তখন অপরে সেই ভাবেরই সহিত কোনমতে পরিচয় স্থাপন করিয়া অবাধে গ্রন্থ ছাপিয়া ফেলে! সে প্রকাশ করিয়া কাহারও নিকট না বলিলেও, লোকগুলা তাহার মন হইতে তাহার ভাবগুলাকে কেমন করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়! প্রতি সপ্তাহেই দেখা যাইত, আর্নেস্টের মনের কথা, নূতন ভাব কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়া কোন না কোন গ্রন্থকার নিতান্ত নির্লজ্জের মত গ্রন্থ ছাপিয়া দিয়াছে!

একদিন আর্নেষ্ট ইদাকে কহিল, "দেখ, কাল ক্লাব থিয়েটারে এক বই দেখে এলাম,—হুবহু আমার ঐ "আতলান্তার আপেল" নাটকখানার সঙ্গে মিলে যায়!"

"কি ভয়ঙ্কর! তোমার বই চুরি করেছে! তোমার বইখানা গেল কোথায়?"

"এখনও লেখা হয় নি—সবেমাত্র লিখব মনে করছিলাম—নাঃ, লিখতে দিলে না আর, দেখছি।"

নিষ্ফল আক্রোশে আর্নেস্ট যখন নির্লজ্জ গ্রন্থকারগণের অসমসাহসিক চৌর্য্যবৃত্তির প্রাবল্য ও ঈর্ষাপরায়ণ সমালোচকগণের কটূক্তির উল্লেখ করিয়া আপনার প্রতিভা-স্ফুরণের সহস্র বিঘ্নের কথায় ভোজনকাল সরগরম করিয়া দেয়, ইদা তখন একান্ত করুণভাবে প্রিয় কবির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, এবং জ্যাক কথাটি না কহিয়া, নত মুখে নিঃশব্দে আপনার ভোজনব্যাপার সমাধা করিয়া যায়। কিন্তু সে সময়ে দৈবাৎ যদি কখনও আর্নেস্টের দৃষ্টির সহিত জ্যাকের দৃষ্টি মিলিত, তখনই জ্যাক ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। নিষ্ফলতার আক্রোশে কবির রোষের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন জ্যাক একদিন স্পষ্ট বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে এ অগ্নি জ্বলিবার বিশেষ আর বিলম্ব নাই, শুধু সামান্য একটু ছল পাইলেই ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া তাহাকে দগ্ধ করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দীপদান

জনৈক ইংরাজ চিত্রকর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধর্ম্ম ও নাট্য

যে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ-লেখ্যটি ভারতীয় নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করে, সেই প্রমাণ-লেখ্যটিতে, নব-নাট্যকলার সহিত কৃষ্ণের কাহিনী সংজড়িত। সম্ভবত এই প্রকার সম্মিলন একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এই সম্মিলনকে অক্লেশে সমর্থন করাও যায়। যে লোকবিশ্রুত তরুণ নায়ক গোপীগণের প্রাণবল্লভ ও দৈত্যগণের বিজেতা, তিনি যেরূপ উদীয়মান ভারতীয় নাট্যের নায়ক-পদের যোগ্য এমন আর কোন্ দেবতা? বহুশতাব্দী হইতে, ভারতীয় নাট্য-ইতিহাসের সহিত কৃষ্ণপূজার ঘনিষ্ঠ সংস্রব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে এই কৃষ্ণপূজাই অবসাদ-ম্রিয়মাণ নাট্যকলাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল এবং আমাদের কালেও এই কৃষ্ণপূজাই ভারতীয় নাট্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মসকল রঙ্গপীঠে অভিনীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উৎসব সমূহ নাট্যাকারে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর অভিনয় আমাদের খৃষ্টমাস-উৎসবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটা মণ্ডপ-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে গো-শালার ধরণে সজ্জিত করা হয়, এবং তাহার মধ্যস্থলে, একটা শয্যায় দেবকীর একটি মূর্ত্তি শুয়াইয়া রাখা হয়। দেবকীর সমীপে শিশু কৃষ্ণ; কৃষ্ণের ওষ্ঠাধর মাতৃস্তনে দৃঢ়লগ্ন। সেখানে যশোদার মূর্ত্তিও আছে; যশোদার ক্রোড়ে একটি নবজাত কন্যা; দেবগণ ও দৈত্যগণ এই মূর্ত্তিদিগকে ঘিরিয়া আছে। বাসুদেব অসিহস্তে দণ্ডায়মান; অপসরারা গান গাহিতেছে; গন্ধর্ব্বেরা নৃত্য করিতেছে; দেবকীর মুক্তিলাভে গোপীগণ উৎসব আমোদ করিতেছে। এই "প্রেক্ষণক" দেখিতে দেখিতে রাত্রি অতিবাহিত হয়। এই কৃষ্ণ-লীলার অভিনয়ে নৃত্য অপরিহার্য্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে ভক্তদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। গোপীদিগের সহিত মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাস-মণ্ডল নামে একপ্রকার মণ্ডলাকার উন্মদ নৃত্যের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন।

নাট্য-সৌভাগ্যে কৃষ্ণ রামেরই সমান; রামকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ভবভূতি, মুরারী, রাজশেখর এবং আরও অন্যান্য নাট্যকার, বাল্মীকির নায়ককে বাছা বাছা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে, আসরে নামাইয়াছেন। উঁহাদের অপেক্ষা কম শিক্ষিত কিন্তু উঁহাদেরই ন্যায় ভক্তিমান কতকগুলি নাট্য-গুণী এই চিরপ্রিয় পুরাতন কাহিনীটিকে নাট্যাকারে পরিণত করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিত। এখনও রামায়ণোক্ত পাত্রগণের রূপ ধারণ করিয়া, রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রামসীতার বিবাহ, সীতাহরণ, রাবণের পরাজয়, এই সমস্ত বৃত্ত,—কুতুহলী ও ভক্ত অসংখ্য

তীর্থযাত্রীর সম্মুখে, খোলা মাঠে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১২ বৎসর বয়সের তিনটি বালক রাম, লক্ষণ ও সীতার ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে পাত্রদিগের কথোপকথন আদৌ নাই। কেননা, এস্থলে কথোপকথন শ্রুত হওয়া অসম্ভব। বিশাল গগনতলে অভিনেতাদিগের কণ্ঠস্বর জনতার কোলাহলে বিলীন হইয়া যায়। তা ছাড়া রামায়ণের গল্প কে না জানে, তাই উহা কথায় ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সজীব সচল অনন্ত চিত্রপরম্পরার দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এখন আবার কালমাহাত্ম্যে, এই নাট্য-দৃশ্যের মধ্যে কতকগুলি অভাবনীয় চিত্তাকর্ষণের উপাদান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে;—বন্দুকের আওয়াজ ও আতসবাজি। যাই হোক, উৎসব-আনন্দের এই সকল আধুনিক উপকরণ সত্ত্বেও, দর্শকবৃন্দের এরূপ অনন্ত উৎসাহ, এরূপ অকপট ভক্তির উচ্ছ্বাস যে, রামলীলা দেখিয়া Jacquemont এইরূপ বলিয়াছিলেন; "একটা ধর্ম্মোৎসবের অভিনয় দেখিব, এই মনে করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম; কিন্তু যাইবার সময় মনে হইল, আমি আসল ধর্ম্মোৎসবই দেখিলাম।"

বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার অভিনেতাদিগের হাতে সহজে ধরা দেন নাই; "দশরূপের" আরম্ভ-ভাগে গ্রন্থকার দশ অবতারের সহিত, নাটকের দশটি বৃহৎ শ্রেণীর যে নৈকট্য ঘটাইয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের গুণপনার নিদর্শন মাত্র। সে যাহাই হউক, Abbe Dubois একদল নাট্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা দাক্ষিণাত্যে "দশ অবতারের" অভিনয় করিয়া বেড়াইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা কিরূপ ধরণের নাটক তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। (১) "দশ অবতার" ছাড়া বিষ্ণুর পৌরাণিক কাহিনী হইতে, অন্যান্য প্রসঙ্গেও নাট্যরচিত হইয়াছে। "বৃহৎ কথা পৈশাচী"র গ্রন্থকার যিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে (সুবন্ধু এই সময়ের কথা বলিয়াছেন)—সম্ভবতঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, রাজা হালের একজন আশ্রিত সভাসদ্ ছিলেন—তিনি লাসবতী নাম্নী একজন নটীর ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, লাসবতী স্বকীয় পিতা লাসকের সহিত মিলিয়া, নারীরূপধারী বিষ্ণুর অমৃত-হরণ এই বিষয়ের একটা নাটক অভিনয় করিতেন। রাজা, লাসবতীকে অমৃতিকার ভূমিকা অভিনয় করিতে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং ঐ বালিকাটিকে তাহার পিতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে স্থাপন করেন।

বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী শিব ভারতীয় প্রাচীন নাট্যের বরণীয় দেবতা। তাঁহাকেই কালীদাস ও শ্রীহর্ষ (নাগানন্দ ছাড়া) শূদ্রক ও ভবভূতি, তাঁহাদের নাটকের আরম্ভেই আহ্বান করিয়াছেন। এই দেবতা যুগপৎ ভয়ঙ্কর ও শুভঙ্কর। শতরুদ্রিয়ের বৈদিক মন্ত্রে, ইনি সূত্রধরদিগের, রথকারদিগের ও কুম্ভকারদিগের এবং আরও অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের রক্ষক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; সুতরাং তিনিই

(১) Mœurs des peuples de l' Inde.

নটদিগেরও স্বাভাবিক রক্ষক। তিনিই তাণ্ডব নামক প্রচণ্ড নৃত্যের উদ্ভাবক; পক্ষান্তরে, পার্ব্বতী লাস্য নামক কোমলকান্ত লঘু নৃত্যের প্রবর্ত্তক। তিনি "নটেশ্বর", তিনি "মহানট", তিনি "নাট্যপ্রিয়"। তিনি মধুরভাবে হাস্য করেন, মধুরভাবে গান করেন, এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া থাকেন। (২)

পশুপত নামক এক শৈবসম্প্রদায় আছে। সেই "পশুপতসূত্রে" শিবের ছয় প্রকার নিত্য নৈবেদ্যের মধ্যে, নৃত্য-গীতও আদিষ্ট হইয়াছে; এবং এই নৃত্য ও গীতের লক্ষণও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৩) গন্ধর্ব্ব-শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে শিবের বিবিধ গুণ ও স্বরূপ কীর্ত্তন করাই গীত। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিয়া, অঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত হস্ত পদের সঞ্চালনই নৃত্য। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" নাট্যাচার্য্য গণদাস নৃত্যের এইরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

"দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্রতৃপ্তিকর যজ্ঞ,
বলে মুনিগণ।
রুদ্র এরে নিজ অঙ্গে, হর-গৌরী দুই ভাগে
করেন স্থাপন।
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব, নানা-রস সমন্বিত
লোকের চরিত্র ইথে হয় প্রদর্শিত।
বহুবিধ প্রকারের, ভিন্ন রুচি মানবের,
সবারি সমান প্রিয়—সর্ব্ব-আরাধিত॥"

শৈবধর্ম্মের যে একটি নিকৃষ্ট রূপ—সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে, গুহ্য ও অশ্লীল অনুষ্ঠানাদির সহিত ধর্ম্মাভিনয়ও যুক্ত হইয়াছে। "বটুক'-দিগের অনুষ্ঠানে, ৫ হইতে ৯ বৎসর বয়সের বালকেরা শিবের ভূমিকা এবং ২ হইতে ৯ বৎসর বয়সের বালিকারা শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করিত; এবং ভক্তেরা উহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা ("দেবতা বুদ্ধ্যা) জ্ঞান করিত।" (৪)

ব্রাহ্মণেরা যাহাকে পোষণ করিত ও আপনাদের কাজে লাগাইত, সেই নাট্যকলার সহিত, নাস্তিক-সম্প্রদায়গণ যুদ্ধ ঘোষণা করে। "বৌদ্ধসূত্রে",—নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কথকতার কোন বৈঠকে ভক্তদিগের উপস্থিত থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। উহাদের এই সনির্ব্বন্ধ নিষেধ হইতেই সপ্রমাণ হয় যে,—যে ব্যাধির প্রতিকারের জন্য উহারা উদ্যত, সেই ব্যাধিটা কতটা ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; নাট্যানুরাগ লোকের মধ্যে এতটা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের আক্রমণে কোন ফল হয় নাই। কোন সজ্জন গৃহস্থ, নাট্যকলার অনুশীলন বর্জ্জন করিতে পারিত না। তাই, বুদ্ধের জীবন-চরিত-লেখকেরা, এই সকল দূষনীয় কলাবিদ্যাও

(২) মহাভারত XIII ১৭৭।

(৩) নকুলীশ, "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" উদ্ধৃত, ৭৭-৭৮। আমার অনুবাদ দ্রষ্টব্য। "Le systeme Paçupata, et le systeme Caiva"—পৃঃ ২৪৭।

(৪) Catalogue Oxford Manuscripts, Analysis of the "Kularnava-tantra" পৃঃ ৯১।

বুদ্ধের উপর আরোপ করিয়াছে। বাল্যকাল অতীত হইলে, বুদ্ধ আচার্য্যগণের সমক্ষে বিশ্ববিদ্যায় পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল, অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে তিনি "বীণা, যন্ত্রবাদ্য, নৃত্য, গীত, কথকথা, আবৃত্তি প্রহসন, লাস্য, নাট্যাভিনয়—এই সকল কলা বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়াছেন।" (৫) এমন কি, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থও নাট্যকলা হইতে একটা উপমা গ্রহণ করিয়াছে; এক স্থলে বুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—"তিনি মহাধর্ম্ম সংক্রান্ত নাট্যদর্শনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" (৬) কঞ্জুরের তিব্বতীয় গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্গত "বিনয় পীঠিকায়", বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা বিম্বিসার কর্ত্তৃক, নাগরাজ গিরিক ও মনোরমকে ভোজ দিবার প্রসঙ্গে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে:—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট হইলে, বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নাট্যাচার্য্যেরা তোটক-ছন্দে গান আরম্ভ করিয়া দিল, এবং অন্যেরা নৃত্য করিতে লাগিল। দুইটী ব্রাহ্মণ-যুবক, উপতিস্য ও মৌদ্‌গলায়ন প্রথমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন······কিন্তু যখন বাদ্য থামিল এবং নৃত্যগীত চলিতে লাগিল, যুবক কলিত উপতিস্যকে বলিল:—"নৃত্য, গীত, বাদ্য তোমার কেমন লাগিল? উহা কি উত্তম? ···" (৭)

স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইলেও, বৌদ্ধেরাও ধর্ম্মপ্রচারের উপায় স্বরূপ নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইত। প্রাচীন কাহিনীর সংগ্রহগ্রন্থ অবদান-শতকে (৮) বর্ণিত হইয়াছে, একজন নটী কিরূপে একটি বৌদ্ধ নাটকের অভিনয় করিয়া বিশুদ্ধ জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কুবলয়া নাম্নী একজন উৎকৃষ্ট নর্ত্তকী ও বাদন-নিপুণা রমণী রমণী-সুলভ সর্ব্বপ্রকার গুণে বিভূষিতা। নাট্য সম্প্রদায় এই মোহিনীর রূপগুণে বিমুগ্ধপ্রায় হইয়াছিল। তখনি বুদ্ধ তাহাকে জরাগ্রস্তা কদাকার বৃদ্ধার আকারে রূপান্তরিত করিলেন। সে এইরূপ অবমানিতা হইয়া সকাতরে মহাপ্রভুর প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিল, তখন বুদ্ধদেব তাহার সম্প্রদায়সমেত তাহাকে অর্হৎপদে উন্নীত করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে, সে শাক্যমুনির প্রসাদে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ শোভাবতী নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

দক্ষিণাপথ হইতে একজন নাট্যাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। নাট্যাচার্য্য ভাগবতের প্রার্থনায় রাজা শোভ, নটসম্প্রদায়কে একটা নাট্যশালা দেখাইয়া দিয়া নাট্যাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন:—"তুমি আমার সমক্ষে একটি বৌদ্ধ নাটক (বৌদ্ধনাটকম্) অভিনয় করিবে? নটেরা বলিল—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমরা অভিনয় করিব। রাজা পরীক্ষা করিয়া একটি বৌদ্ধ নাটক নির্ব্বাচন করিলেন। মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া

(৫) ললিত বিস্তার, XII পৃঃ ১১৫।
(৬) "বিপুল-ধর্ম্মাত্মক-দর্শন-প্রবিষ্ট ইতি উচ্যতে" ঐ XXXVI
(৭) Schrefner Indian Studies III ৪৮০
(৮) VIII দশক, পঞ্চম ইতিহাস।

রাজা উপবিষ্ট হইলে নাট্যাচার্য্য বুদ্ধের ভূমিকা এবং অন্যান্য নট ভিক্ষুদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হইল। রাজা পরিতুষ্ট হইয়া, যারপর নাই আনন্দিত হইয়া, নাট্যাচার্য্যকে ও তাহার সম্প্রদায়কে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন।" এই নট সম্প্রদায়ই কুবলয়ার সমভিব্যাহারে রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর একটি বৌদ্ধকাহিনী ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে নীত হয়, এবং উহা একটি তিব্বতীয় সংগ্রহগ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাও একজন নটের কাহিনী। এই নটও কোন এক মহোৎসব উপলক্ষে নাট্যাকারে পরিণত বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অভিনয় করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথ হইতে রাজগৃহে আগমন করে। ধর্ম্মসাধন ও স্বার্থসাধন এই দুই-ই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহার এতদূর স্পর্দ্ধা যে,সে ভিক্ষুদিগকেও দলে টানিয়া লয় এবং তজ্জন্য সে নিষ্ঠুর শাস্তিও ভোগ করে। ভিক্ষুরা তাহার সহিত মিলিয়া অভিনয় করে এবং এইরূপে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটায়। ভাগ্যক্রমে সে অনুতাপ করে, এবং তাহার পর তাহাকে ক্ষমা করা হয়। হর্ষকৃত নাগানন্দে একটা পুরাতন কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে; সম্ভবত কেবল হর্ষের নামেই নাগানন্দ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নচেৎ অন্যান্য বৌদ্ধ নাটকের ন্যায় ইহাও বিলুপ্ত হইত।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এরূপ বিদ্বেষ ছিল, যে, ঐ ধর্ম্মের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সচেষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয় সেই কারণেই বৌদ্ধ নাটকগুলিতে, সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে চলিত গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করিতে বৌদ্ধদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়।

তিব্বতের বৌদ্ধ বিহারে, বসন্ত উৎসব ও শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে দুই বার প্রকৃত ধর্ম্মনাটক অভিনয় করিবার প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, ভিক্ষুরা ভাল প্রেতযোনি ও গৃহস্থ বৌদ্ধেরা খারাপ প্রেতযোনি ও মানুষ সাজিয়া আইসে। নটেরা বহুমূল্য উদ্ভট পরিচ্ছদ ও অদ্ভুত ধরণের মুখোস্ ধারণ করে। প্রথমে নাট্য সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক একসঙ্গে স্তব-স্তুতি ও আশীর্ব্বচন সুর করিয়া পাঠ করে; পরে, একজন খারাপ প্রেতযোনি একজন মানুষের নিকট আসিয়া বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা, নানাপ্রকার রসিকতার দ্বারা, তাহাকে মন্দ পথে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। যখন সেই প্রেতযোনির জয়লাভের উপক্রম হইয়াছে এমন সময়, কতকগুলি লোক সেই মনুষ্যের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যাহাতে আবার তাহার সুমতি হয় তাহার চেষ্টা করে। উহারা আসিয়া পড়ায়, দুষ্ট প্রেতযোনিরাও সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। এই সময়ে নাট্য সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুই দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। মনুষ্যেরা, সাহায্যের জন্য সৎ প্রেত-যোনিদিগকে ("দ্রাগ্‌শেদ্") আহ্বান করে; তাহারা তখনই আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে আর তুল্য-বলে যুদ্ধ হয় না। দুষ্ট প্রেতযোনিরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করে; এবং দেবতা ও মানুষেরা তাহাদিগের অনুধাবন করিয়া যষ্টির দ্বারা তাহাদিগকে

দারুণ আঘাত করে। মোট কথা,—এই নাট্যাভিনয়ে ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত বাদানুবাদের সহিত খুব স্থূল ধরণের প্রহসন, এবং লৌকিক নাট্যের লক্ষণগুলির সহিত ধর্ম্মনাট্যের লক্ষণগুলি সম্মিলিত হইয়া থাকে। এই সকল নাটকের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভিক্ষুগণ কিছুই অবগত নহে। চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে উহারা এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহের রক্ষণশীলতা যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ তাহাতে আমরা ন্যায্যরূপে অনুমান করিতে পারি যে, ভারতের প্রাচীন বিহার সমূহে ভক্তদিগের সমক্ষে যেরূপ ধর্ম্ম নাট্যের অভিনয় হইত, ইহা তাহারই অবিকল প্রতিরূপ। আবার ব্রহ্মবাসীদিগের সাহিত্যেও বৌদ্ধকাহিনীসকল নাট্যাকারে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সকল নাটকের নাম ছাড়া আর আমরা কিছুই অবগত নহি। নাগানন্দের ন্যায়, এই সকল নাটকের আখ্যানবস্তুও জাতক হইতে গৃহীত।

কি লৌকিক, কি পারমার্থিক—উভয় প্রকার নাটকই চীনবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (১) মৌদ্গলায়ন যাহার নায়ক, এইরূপ একটি নাটকের মূল মর্ম্ম M. Grood বিবৃত করিয়াছেন। সমস্ত চীনীয় নাট্য রচনার যেরূপ ধরণ, এটিও সেই ধরণের একটি গীতিনাট্য। অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের দিনে, ও শ্রাদ্ধ বাসরে এই নাটকটির অভিনয় হইয়া থাকে। মৌদ্গলায়নের জননী, না জানিয়া মাংস ভোজন করেন। তাঁহার পুত্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐবিষয়ে জিজ্ঞাসা বাদ করিলেন। জননী শপথ করিয়া বলিলেন, তিনি এই বিষয়ে নির্দ্দোষ। তখনই চারিদিক্ হইতে কতকগুলি দৈত্য সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেল। মৌদ্গলায়ন কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার জননী সর্ব্বপ্রকার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া তিনি নরকে প্রবেশ করিলেন, পাপীদিগের সমস্ত দণ্ডপ্রকরণ স্বচক্ষে দেখিলেন, দেখিলেন তাঁহার মাতা তুষানলে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার স্থানে তিনি আপনাকে স্থাপন করিতে চাহিলেন, কিন্তু দৈত্যেরা তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। তিনি শাক্যমুনির নিকট সকাতরে যাচ্ঞা করিলেন, তাঁহাকে যেন উলম্বার উপদেশটি প্রদান করা হয়;—"একমাত্র সমবেত পুরোহিতবর্গই, মৃতব্যক্তিকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে।" এইরূপে তিনি তাঁহার জননীকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। সমস্ত নাট্যকার্য্যের মধ্যে, দুই ব্যক্তি—একজন শূকরের রূপ ধারণ করিয়া, আর একজন বানর কিংবা কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া বরাবর মৌদ্গলায়নের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে এবং মৌদগলায়নের তীব্র শোকের সহিত তাহাদের হাস্য-পরিহাস মিশ্রিত করিতেছে।

নাট্যশালার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের যে সংশ্রব ছিল তাহা অন্যান্য প্রমাণ-লেখ্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয়; কোন কোন গ্রন্থকার নাট্য প্রকরণের সহিত যে সুপরিচিত ছিলেন, তাহা

(১) অ্যামেরের প্রসিদ্ধ উৎসব সমূহ,—Annales Guimet, XII, ১৮১৬

তাঁহাদের গ্রন্থের রচনা হইতেই উপলব্ধি হয়। তাহার দৃষ্টান্ত, সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক-নামক গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া M. kern এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; "ললিত বিস্তারের ন্যায়, সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক, মহাকাব্যের আকারে রচিত নহে। ইহা নাট্যলক্ষণাক্রান্ত; ইহা ধর্ম্মনাটকের ধরণে রচিত। ইহার প্রধান নায়ক (একমাত্র নায়ক নহেন) মহাপ্রভু শাক্যসিংহ। ইহাতে ধারাবাহিক কথোপ-কথনের সমাবেশ আছে; এবং অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া ইহাতে একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে। এই সমগ্র নাটকের বিচিত্র দৃশ্যগুলি এমনভাবে দর্শকের সমক্ষে স্থাপিত হয় যে, দর্শক বুদ্ধের শক্তি ও মহিমা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে এবং বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বুদ্ধের অতুল্য জ্ঞানেরও পরিচয় পায়। এই নাটকের প্রস্তাবনায় বা 'নিদানে' ভারতীয় নাট্যরীতির সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

নিদানের শেষভাগে মঞ্জুশ্রী এই মহা-নাটকের মূল-ঘটনার জন্য শ্রোতৃবর্গের মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দেন, যে মহাপ্রভু যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্বকীয় বিজ্ঞান ও অসীম শক্তি প্রকাশ করিবেন।" (১০)

নাট্যের যাহা সহায়ভূত সেই নৃত্যগীত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইলেও, সিংহলে প্রথম বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় হইতে, সমাজ ও ধর্ম্মঘটিত মহোৎসবের উহাই মুখ্য উপাদান। তাহার দৃষ্টান্ত,—তামুলগণ পরাজিত হইলে পর, মহারাজা দুহুগামেণি নর্ত্তকীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব করিলেন; তা ছাড়া, নর্ত্তকী ও বাদকদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তিনি মহাস্তূপ স্থাপন করিলেন। (১১)

তাঁহার ভ্রাতা মহাদাত্তিকো আর একটি স্তূপ স্থাপন করিবার সময় ঐ একই প্রকারে উৎসব করেন। "তিনি নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করিলেন।" (১২) অবশেষে তিনি ডাগোবার (মন্দির) উপর বাদ্যকারী দেবতাদের চিত্র অঙ্কিত করাইলেন। (১৩) ওস্তাদের হাতে আঁকা ঐ ধরণের চিত্র আজিও অজন্তার 'ফ্রেস্কো'-চিত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

চিত্রকর Griffiths, যিনি কেবল সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিতে ঐ সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কঠোর উপদেশ ও মন্দির বিভূষিত মূর্ত্তিগুলির সাংসারি-কতা—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিপরীত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। "অজন্তার চিত্রকর যাহারাই হোক্ না কেন, তাহারা নিশ্চয়ই সংসারী। সচরাচর

(১০) সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক। অনুবাদ। Sacred Books of the East XXI; Introductior—P IX-X

(১১) নাটক; মহাবংশ—পৃঃ ১৫৭।

(১২) নাটকীয়, নাবাতুর্য্য মহাবংশ ১৭০

(১৩) ঐ পৃষ্ঠা ২১৩

জীবনের দৃশ্যসমূহ, সমারোহযাত্রা, গায়ক-গায়িকাবৃন্দ, বাদক-বাদিকাবৃন্দ অনেক স্থলে লালিত্য সহকারে এবং সকলস্থলেই যথাযথ রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। এইরূপ চিত্ররচনা করিতে হইলে, এই সকল দৃশ্যের সহিত চিত্রকরের পরিচিত থাকা আবশ্যক, সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা আবশ্যক, অভ্রান্ত স্মরণশক্তি থাকা আবশ্যক। ইহা নিশ্চিত,—বুদ্ধের দশটি আদেশের মধ্যে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রকাশ্য স্থানের 'তামাসা' প্রভৃতি দর্শন করিতে যে নিষেধ করিয়াছিলেন, এই নিষেধ-আজ্ঞা তাহারা পালন করে নাই। আমি যতগুলি চিত্র পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি, প্রত্যেক চিত্রেই হস্তভঙ্গী অতি চমৎকার; চিত্রকর যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, ঠিক সেই ভাবটি উহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।" (১৪)

নাট্যশালার সহিত জৈনদিগের কিরূপ সংস্রব ছিল তাহা বড় একটা জানা নাই; যে সকল জৈন গ্রন্থের অনুশীলন হইয়াছে তাহার সংখ্যা এত অল্প যে উহা হইতে একটা ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি, জৈন-ধর্ম্মের আচার-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি উহার প্রতিদ্বন্দী বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় একই ভাবে অনুপ্রাণিত।

উভয় ধর্ম্মেই শাস্ত্রীয় আদেশের খুব কড়াকড়, কিন্তু লৌকিক ব্যবহার শিথিল।..."যেখানে ইতিহাস পঠিত হয়, মল্লযুদ্ধ হয়, কথকথা হয়, নাট্যাভিনয় হয়, গীতবাদ্য হয়, বীণা বাদন হয় সেখানে কোন ভিক্ষু যাইবেক না, ইত্যাদি।" (১৫)..তথাপি দেবতারা সুখ সম্ভোগকে অবজ্ঞা করেন না। যখন সূর্য্যাভ নামক দেবতা মহাপ্রভুকে পূজা করিবার নিমিত্ত মহাবীর নগরে উপনীত হন, তখন তাঁহার সমস্ত নাট্যবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া বুদ্ধদেবকে পূজা করেন। যে সকল দেবতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল তাহারা ৩২ প্রকারে নৃত্য করিলেন, চারি প্রকার ধরণে বাদ্য বাজাইলেন, এবং চারি প্রকার গীত গাইলেন; এবং আরও কিছুপরে, গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে, —তাহারা চার প্রকার নৃত্য করিলেন এবং চারি প্রকরণের নাট্যাভিনয় করিলেন। (১৬)

সর্ব্বশেষে,—সংস্কৃতভাষায় জৈনগণকর্তৃক রচিত অনেকগুলি নাটক আছে—যাহার আখ্যানবস্তু জৈন-কাহিনী হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত যথা—যশশ্চন্দ্রের "রাজিমতি-প্রবোধ" যাহার নায়ক অর্হৎ-নেমী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৪) Burgess প্রণীত Archœological Survey of West India এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১৫) আয়ারঙ্গ সুত্তম্ II, ১১, ১৪।

(১৬) রাজপ্রশ্নীয়, "Indian Studies" গ্রন্থে উদ্ধৃত (XVI-৩৮৫)

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপনিবাসী অসভ্যজাতি।

প্রশান্ত মহাসাগরে ওসেনিয়া নামে অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ আছে। উহার মধ্যে টোঙ্গা, তাহিতো, সঁমোয়া ও হবাই আদি দ্বীপপুঞ্জের নাম পালিনেসিয়া এবং ফিজি, নিউ ক্যালিডোনিয়া, সলোমানাদি দ্বীপ সমূহ মেলানেসিয়া নামে অভিহিত। এই কারণে প্রথম দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য জাতিকে পালিনেসিয়ান ও দ্বিতীয় দ্বীপপুঞ্জের অসভ্যদিগকে মেলানেসিয়ান বলা যায়। ইহারাই এখানকার আদিমনিবাসী। প্রথমে ইহারা দারুণ অসভ্য ছিল। যখন হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য জাতিরা এই সকল দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে ইহাদের অসভ্যতার পরিমাণ কিছু কিছু খর্ব্ব হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ইহার সহিত উহাদের ধ্বংসেরও সূচনা হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি সহকারে তাহাদের সংখ্যাও হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

পালিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ প্রথমে জনশূন্য ছিল। এখানকার আদিমনিবাসীগণ তখন অন্যস্থানে বাস করিত। ইহাদের দেহের বর্ণ ও উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কিম্বা সীমান্ত হইতে আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছয় ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ। ইহাদের কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ, সুচিকন ও সুদীর্ঘ। পূর্ব্বে ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী সদাচারী ও নিষ্ঠাবান এবং কৃষিকর্ম্মে বিশেষরূপে দক্ষ ছিল। ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে আসিয়া বলবীর্য্য হারাইয়া এক্ষণে ইহারা অকর্ম্মণ্য ও হীন হইয়া পড়িয়াছে। রুটী ও তরকারি ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের অধিকাংশ লোকেই নিরামিষভোজী। নানারূপ শিল্প কার্য্যে ইহারা সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকে; নৌকাগঠনে ও সন্তরণে ইহারা অত্যন্ত পটু। সহতুত নামক এক প্রকার বৃক্ষের ছালে এখনও এমন সুন্দর কাছি তৈয়ার করে যে দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অপর প্রকার বৃক্ষের ছাল থেঁতো করিয়া উহার মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁইস গুলি বাহির করিয়া লয় ও উহার দ্বারা "মোটাকাপড়" প্রস্তত করে। ধনুর্ব্বাণ ও ভালাই (বর্শা জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র) ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা প্রস্তর কাটিয়া কোদাল নির্ম্মাণ করে এবং কোন কোন অস্ত্র ঝিনুক দ্বারাও প্রস্তত করিয়া থাকে। অধিকাংশ পালিনেসিয়ান এখন খৃষ্টান। প্রথমে ইহারা চন্দ্র ও সূর্য্যের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা ও উপাসনাদি করিত। হবাই দ্বীপনিবাসীরা এখনও দেব পূজা করে। এখানে একটি আলামুখী পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বে ইহারা দেবতাদের সম্মুখে নরবলি পর্য্যন্ত দিত। এখন নরবলি ব্যতীত প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ও মদ্যাদির দ্বারা প্রাচীন রীতি অনুসারে দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের প্রাচীন দেবমূর্ত্তি সকল পাশ্চাত্য সভ্যতার আশীর্ব্বাদে স্থানভ্রষ্ট হইয়া কতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও কতক ইউরোপে যাদুঘরের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এই সকল অসভ্য জাতির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সভ্যতাভিমানীদের মনে জুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদয় হইত। ধর্ম্মোৎসবেই এই তাণ্ডব নৃত্যের বাহুল্য দেখা যাইত। ইহাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রথা এই ছিল যে, দুর্ব্বল লোকদিগকে ইহারা জীবিত

সমোয়া দ্বীপের রমণী।

রাখিত না; বৃদ্ধ ও রুগ্ন বালকদিগের গলায় রজ্জু লাগাইয়া মারিয়া ফেলিত। বলবান লোকই সমাজকলেবর পরিপুষ্ট করিয়া কর্ম্মঠ ও থাকিত।

ইউরোপবাসীর সংসর্গে আসিয়া ইহাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইহারা কোট পেণ্ট পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে ইহারা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকিত; এখনও ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও রমণী

টংগোয়া দ্বীপের কুমারী

উভয়েই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ কেবল কটীদেশে একখণ্ড ছোট বস্ত্র জড়াইয়া রাখে মাত্র। কিন্তু যাহারা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহারা সমস্ত দেহ ঢাকিয়া

রাখে। তাণ্ডব নৃত্য কতক পরিমাণে বন্ধ হইলেও উৎসব সময়ে ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে। সঁমোয়া দ্বীপনিবাসীরা পূর্ব্বে বৃক্ষপত্র দ্বারা অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিত। কিন্তু উৎসবের সময় একপ্রকার লম্বা জামা ব্যবহার করিত। ইহাদের মধ্যে ধার্ম্মিক নর্ত্তকেরা নৃত্যের সময় এমন এক প্রকার দীর্ঘ টুপি ব্যবহার করিত যে তদ্দর্শনে সভ্যজাতিরা হাস্যসম্বরণে অক্ষম হইতেন।

হবাইদ্বীপের আদিম নিবাসীরা পূর্ব্বে পক্ষির পালক দ্বারা এক প্রকার বিচিত্র মূল্যবান কোট প্রস্তুত করিত। উহা তৈয়ার করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিত। কোন পার্ব্বণ উপলক্ষে এই কোট ইহারা পরিধান করিত। কিন্তু এই পুরাতন অঙ্গাচ্ছাদন ইউরোপ ও আমেরিকার হ্যাটকোটের নিকট এখন পরাজিত হইয়া ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পালিনেসিয়া ও মেলিনেসিয়ার আদিমনিবাসীদের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা অনায়াসে ইহাদের সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে। এই সকল দ্বীপে ইংরাজেরা প্রায় একশত বৎসর গমনাগমন করিতেছে।

টোঙ্গা দ্বীপবাসীরা এখনও হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত উল্কি পরিয়া তাহাদের দেহের শ্রীসম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কেবলমাত্র কটিদেশে এক টুকরা বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া লজ্জানিবারণ করে। যুবতীরা পিতা মাতা ও গুরুজনের সম্মুখে ঐ অবস্থায় আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই একই প্রকার অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা পক্ষীর পায়ের হাড় ও মকর মৎস্যের দন্ত-নির্ম্মিত হার পরিধান করিতে বড় ভাল বাসে। ঝিনুক ও বনফলের বীচির দ্বারাও হার নির্ম্মাণ করিয়া পরে। পক্ষীর পঞ্জর ও ঠোঁট কখনও কখনও হারের সঙ্গে গাঁথিয়া দেয়। কূর্ম্মের অস্থিতে প্রস্তুত আংটী ও তাবিজ ইহাদের অতিশয় প্রিয়। প্রত্যেকের কর্ণ ছিদ্রে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কিম্বা সাধারণ হাড়ের মোটা মাকড়ি ঝোলান থাকে। যদিও ইহারা অসভ্য তথাপি শরীরের প্রতি ইহাদের বিশেষ যত্ন। দিবসে ইহারা দুই তিন বার স্নান করে এবং কেশের পারিপাট্য ও শোভাসম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্ব স্ব কেশ পরিষ্কার করিয়া ঝিনুক, পাখীর পালক ও পুষ্পাদির দ্বারা বিভূষিত করে। এই কার্য্যে তাহারা প্রায় এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করে। উহারা কাষ্ঠের বিচিত্র তাকিয়া এরূপ কৌশলে নির্ম্মাণ করে যে তাহাতে মস্তক রাখিলে কেশের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় না। এই কঠিন তাকিয়াতে মস্তক রাখিতে যদিও তাহাদের খুব কষ্ট হয় তথাপি কেশের জন্য তাহারা এ কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে। দ্বীপবাসীরা সকলেই সোমপায়ী। এই সোমরসের নাম "কাবা"। কেহ কেহ ইহাকে আবাও বলে। সঁমোয়া দ্বীপবাসীরা উৎসবের সময় যে কাবা পান করে তাহা একরূপ বৃক্ষের শিকড় হইতে প্রস্তুত। উৎসবের সময় হাজার হাজার লোক একত্রিত হইয়া আপন আপন মর্য্যাদা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে পর 'কাবা' পরিবেষণ আরম্ভ হয়। প্রথমে একটী সুন্দরী যুবতী উহা নারিকেলের

মালাতে পূর্ণ করিয়া সমাগত ব্যক্তির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানভাজন তাঁহার নিকট লইয়া উপস্থিত হয়। তিনি উহা এক নিঃশ্বাসে পান করেন, তার পর যথা নিয়মে সকলে পান করিতে থাকে। কোন কোন দ্বীপে কেবল কুমারীগণই কাবা প্রস্তুত করে।

সঁমোয়া দ্বীপের রাজা—ঝিনুকের মুকুট ও হোয়েল মৎস্যের অস্থিনির্ম্মিত কণ্ঠভূষণ পরিয়াছে।

অতিথিসৎকার বিষয়ে অন্যান্য জাতির অপেক্ষা সঁমোয়া জাতি অতিশয় উদার। প্রত্যেক গ্রামে একটী জমিদার বা রাজা আছেন। তিনি অতিথি সৎকারের জন্য নিজ

কন্যার উপর ভার প্রদান করেন। অতিথির বাসের জন্য একটী পৃথক গৃহের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক কুমারী অতিথি শুশ্রূষার জন্য সেই গৃহে সমাগত হয়। অতিথির আনন্দ বর্দ্ধন ও তাহাকে সুখী করিবার জন্য ইহারা সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করে। উৎকৃষ্ট মাংস ও মৎস আপনারা ব্যবহার না করিয়া অতিথিকে প্রদান করে। বহু পূর্ব্বে টোঙ্গা-দ্বীপ নিবাসীরা রোগীকে রোগ মুক্ত করিবার মানসে দেবতার নিকট সন্তানকে পর্য্যন্ত বলি দিত; কিন্তু এখন উহা বন্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশের সতীদাহ প্রথার ন্যায় গ্রামের কোন প্রধান পুরুষের মৃত্যু হইলে তাহার পত্নীকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে আশু মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইত। কিন্তু বিধবা মাত্রেই এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ইহারা মৃতের সৎকার করে এবং দেড় বৎসর অবধি অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবসে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়। তাহার পর আপনাদের মস্তক মুণ্ডন করে। এমন কি যুবতীরাও তাহাদের সখের কুঞ্চিত কুন্তলরাশিকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। মৃত ব্যক্তির সহিত হার, ফুলের মালা, হাড়, ঝিনুক, কড়ি প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্যগুলি তাহার কবরে দেওয়া হয়।—অশৌচের সময় ইহারা কটিদেশে এক টুকরা চেটাই ব্যবহার করে ও বৃক্ষ বিশেষের পাতার মালা পরিধান করে।

ইহাদের বিবাহ অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে। কখনও কখনও একটী কুমারীর অনেকগুলি প্রণয়ী দেখিতে পাওয়া যায়; তখন তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়—সেই যুদ্ধে এমন কি কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গুপ্ত বিবাহ কিম্বা গন্ধর্ব্ববিবাহ আদৌ বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না।

সলোমন দ্বীপবাসীদের আকৃতি যেমন ভীষণ তাহাদের অন্তরও তেমনি কুটিলতা ও নিষ্ঠুরতায় ভরা। ইহারা অত্যন্ত সাহসী এবং অন্যান্য দ্বীপবাসীর অপেক্ষা শীকারে দক্ষ। লুটপাট করিতেও ইহারা বিশেষ পটু। ইহারা ধনুর্ব্বাণ ও ভালাই লইয়া নৌকা করিয়া নিকটস্থ দ্বীপবাসীদিগকে আক্রমণ করে ও লুটপাট করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আনে। ইহাদের নৌকা অত্যন্ত প্রকাণ্ড ও সুগঠিত। প্রত্যেক নৌকায় ৪০৫০ জন অস্ত্রধারী পুরুষ থাকে। শত্রু সম্মুখীন হইলে ইহারা অস্বাভাবিক বলবিক্রম প্রকাশ করে। ইহাদের বাণদ্বারা যে সমস্ত লোক আহত হয়, ইহারা তাহাদের মস্তক কাটিয়া আনিয়া আপনাদের গ্রামের একস্থানে স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখে। এই স্তূপটী তাহাদের মনে সর্ব্বদাই নিষ্ঠুরভাব একটী ভীষণ দৃশ্য জাগাইয়া রাখে। এই স্তূপের নিকট ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আনন্দে নৃত্য করে। সলোমন দ্বীপবাসীরা আপনাদের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করে এবং ছিদ্র দুইটীকে কৌশলে এত বড় করে যে একখণ্ড কাষ্ঠফলক উহার ভিতর যায়।

এই দ্বীপপুঞ্জের নিকট ওগেনবিলি নামক একটী ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপবাসীদের মনুষ্য না বলিয়া রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা শোণিতপিপাসু

নরখাদক। কোন অপরিচিত ব্যক্তি এখানে আসিলে তাহার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই। এরূপ ব্যক্তি পাইলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তাহাকে ধরিয়া প্রথমে ব্যাঘ্রের মত তাহার উষ্ণ শোণিত পান করে, পরে তাহার

সলোমন দ্বীপের রক্তপিপাসু যোদ্ধা।

মাংস ভক্ষণ করিয়া জঠরানলের শান্তি করে। সেদিন তাহাদের গ্রামে একটা যেন মহোৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। ইহারা এত ক্রূর যে নিকটস্থ দ্বীপবাসীদের সহিত অকারণে কলহ

করিয়া তাহাদের মস্তক কাটিয়া আনে। মনুষ্যহনন ইহাদের একটী প্রমোদ খেলা; এবং নরমাংস প্রিয় ভক্ষ্য বস্তু। ইহাদের গ্রামে কাহারও মৃত্যু হইলে—মৃতব্যক্তি ইহাদের উদরে সমাধি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণার মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের প্রান্তভাগে নির্ম্মলসলিলা নদীটি বহিয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মতাপে ক্ষীণকায়া কিন্তু ক্ষিপ্রগতিশালিনী। তীরে বাবুদের ফলের বাগানে নারিকেল তাল প্রভৃতি বৃক্ষগুলা অতি উচ্চ মস্তক তুলিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রদোষের মৃদু বায়ুস্পর্শে কচিৎ এক আধবার মাথা নাড়িতেছে। বৃক্ষান্তরালে শিব-মন্দিরের শ্বেত গাত্র সম্পূর্ণ লুক্কায়িত, কেবল পিত্তল নির্ম্মিত ত্রিশূলটি পশ্চিমাকাশস্থিত সূর্য্যের ঈষদারক্ত কিরণে উজ্জল শোভা ধারণ করিয়াছে। এখনও লোক সমাগম হয় নাই কেবল বাবুদের বহুব্যয়ে নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত চিক্কণ সোপান বাহিয়া একটী বালিকা ঘাটে নামিতেছিল। তাহার কক্ষে পিত্তল কলসী, স্কন্ধে একখানা বস্ত্র ও গামছা। বালিকা সোপানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিল;—তাহাকে না দেখিয়া শুষ্ক বস্ত্রখানা সোপানে রাখিয়া জলে নামিয়া পড়িল। গা ডুবাইয়া অন্য মনে জল লইয়া কুলি করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সোপানের পরে আর একটী বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমা বালিকাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া একটু শব্দ করিতেই প্রথমা সচকিতে ফিরিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল "উঃ ভয় পেয়েছিলু।" দ্বিতীয়া একটু ঠাট্টার স্বরে বলিল "উঃ কচি খুকী! এমন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছিস যে টেরও পেলি নে! কতক্ষণ এসেছিস্?

"খানিকক্ষণ। তোমার আজ এত দেরী কেন? অন্য দিন তুমিইত আগে এস।"

"বলব এখন। তুই অমন এক মনে কি ভাবছিলি আগে বল।" প্রথমা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল "ভাব্‌ব আবার কি?"

"না বই কি?" এই বলিয়া দ্বিতীয়া সখীর গাত্রে জল ছিটাইয়া দিল। তথাপি প্রথমা নীরবে কাপড় কাচিতে লাগিল। দ্বিতীয়া তখন তাহার কাপড় খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল্‌ন—বল্‌তেই হবে।" প্রথমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল "আঃ কি কর ভাই ছাড়না।" দ্বিতীয়া কাপড় ছাড়িয়া দিয়া অভিমানে মুখ ফিরাইল। প্রথমা তখন অনুতপ্তা হইয়া বলিল "তোমার বড় রাগ করা অভ্যাস ভাই। যাক্ আমারি দোষ হয়েছে—কি বল্‌ব বল?"

"মুখ ভার করে ছিলি কেন?"

"নতুন কথা কিছুই নয়। আমাদের সংসারের কথা কি তুমি জাননা—তাই কেবল লজ্জা দাও!" দ্বিতীয়া একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল "ওঃ সেই দুঃখ। আমি ভাবলুম বুঝি—"

"তোমার মুখে একথা খাটে বইকি!" প্রথমা এই কথা বলিতে না বলিতে দ্বিতীয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমার মত ভাবনায় যদি আজ পড়তিস্ ত না জানি তুই কি করতিস্! ছাখ তবুও ত আমি তোর মত শুক্‌নো মুখে নেই।" প্রথমা দ্বিতীয়ার পানে স্থির আয়ত চক্ষে চাহিল। প্রকৃতির শোভা যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া সুনিপুণ চিত্রকর একখানি চিত্রিত প্রতিমা নদীবক্ষে স্থির ভাবে দাঁড় করাইয়া দিল। মৃদুল বায়ুভরে কবরীভ্রষ্ট দুএকগাছি কেশ মৃদু মৃদু দুলিতেছিল, নদী সুনীল বক্ষ দর্পণে সে মূর্ত্তি যেন তুলিয়া লইতেছে। হীনতেজ রবির আরক্তিম কিরণ সে চিত্রের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিল! প্রকৃতি মমতাময়ী, ভাগ্য দেবতা নিষ্করুণ! বালিকা মৃদু কণ্ঠে বলিল "তোমার কিসের দুঃখ কমলা? তুমি বড় লোকের আদরের মেয়ে, চারিদিকে সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য, ভাই বোন মায় হাসিমুখ; তাঁদের কোন কষ্ট যাতনা তোমায় দেখ্‌তে হয়না, শুন্‌তে হয়না,—তোমার কি দুঃখ? কি কষ্ট?"

"তা কি থাক্‌তে পারে না? গরীব হওয়াই বুঝি সব চেয়ে দুঃখ!" বালিকা একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "তা জানিনা।" তাহারা যে গরীব তাহা লোকের কাছে বলিয়া বেড়ান' বালিকার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সে চুপ করিয়া রহিল। কমলা বলিল, "সত্যি ভেবে ছাখ ওসব কষ্ট ত অতি সহজেই নষ্ট হতে পারে,—কিন্তু যারা মনের কষ্ট পায় তাদের কষ্ট কিসে শেষ হয় বল দেখি?"

"সতী অনিচ্ছাতেও একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার তাহলে সেই রকম কষ্ট কিছু হয়েছে বুঝি?"

"আমি বড় লোকের মেয়ে আমার আবার কষ্ট কি—দুঃখ কি সতি!

"মাপ কর ভাই আমার দোষ হয়েছে। কি হয়েছে বল না?"

জানিস্ আমার বিয়ে!'

"বিয়ে? কবে?

"বোধ হয় মাসখানেকের মধ্যেই। জিজ্ঞাসা করবিনা কার সঙ্গে?"

সতী একটু হাসিয়া বলিল "সে জানা আছে। বিশু দাদার সঙ্গে।"

"না রে— তাহ'লে আর মজা কি—আর একটা কে,—আজ সম্বন্ধ এনেছে।"

"সতী বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া বলিল "তবে তুমি যে বল বিশুদাদা ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবেনা, তোমার বাপ মা বুঝি ওখানে বিয়ে দেবেন না?"

"ওখানে ত কোন দিন কথা হয়নি;—তাঁদের এতে আর দোষ কি।"

"তবে তুমি ও রকম কথা নিজেই বুঝি বল্‌তে? কেউ শুন্‌লে কি লজ্জা!"

"ওঃ লজ্জায় ত মরে গেলাম। আমার যদি ইচ্ছে হয়ত কেন বল্‌বনা।"

"তারপরে এখন? বাপমাকে বুঝি ঐকথা বলবে?"

"তাইত ভাব্‌ছি। কিন্তু তার আগে যাঁর মন জানার দরকার তাঁর মন জানার কি হয়?" দুঃসাহসিকা কমলার পানে চাহিয়া সতী বিস্মিত ভাবে বলিল "কার মন জানবার দরকার—বিশুদাদার? ছিঃ ছি কি লজ্জার কথা! তোমার ভাই খুব সাহস

ত?” কমলা বিস্ময় ও বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল “তা ভিন্ন এতে আর উপায় কি আছে? তুই বুঝি কোন বই কিছু পড়িস্ না?”

সতী একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল “রামায়ণ মহাভারত পড়ি।” কমলা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল “তবেই ত সব পড়। আজ আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌বি? ভাল বই পড়্‌তে চাস্ত’ দিতে পারি।”

সতী সহসা একটু থমকিয়া গেল। তাহার মনে অমনি কমলা ও তাহার অবস্থাভেদের কথা উদয় হইল—একটু জোরের সহিত বলিল “না সে সব বইয়ে আমার দরকার নেই।”

“তা না থাক্ আজ আস্‌বি ত?”

“বল্‌তে পারিনা। জ্যেঠাই মা যদি না বকেন ত’ যাব।”

“আচ্ছা তোর মা অত ভাল মানুষ, আর জ্যেঠাইমা অমন কেন?”

“জানি না। এখন উঠি চল, রাস্তায় লোক হবে।”

উভয়ে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কলসী লইয়া উঠিতে সতীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া কমলা বলিল “অত বড় একটা কলসী না আন্‌লেই নয়?”

“না আন্‌লে চল্‌বে কেন?”

“কেন চল্‌বেনা—তোর মা-রা নিয়ে যান্ না কেন?”

“তাঁরা যদি নিতে পারেন ত’ আমিও কেন পার্‌বনা?”

“তোর বোন্ সাবিত্রীটা সেটা নিয়ে গেলেও ত পারে।”

“আহা সে যে ছেলে মানুষ”!

কমলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল “তারাত ছেলে মানুষ! তোর চেয়ে মোটে ত দু বছরের ছোট।”

“ও রকম কথা ব’লনা ভাই! সে আমার চেয়ে ঢের বেশী সহ্য করে। তোমাদের বড় লোকের ঘরে ও রকম মেয়ে সহজে দেখ্‌তে পাবেনা তা জেনো। ছোট ভাইটির যত আব্‌দার সে সহ্য করে, দাদার দৌরাত্ম্য, জ্যেঠাইমার বকুনি, বাবার ফরমাস্ সে যত মেনে চলে আমি তার একাংশও পারি না। গরীবের ঘর বলে তার অত গুণও তোমাদের চোখে পড়ে না।”

কমলা একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে রহিল। সতীর সঙ্গে তাহার এই এক অদ্ভুত রকমের ভালবাসা। সে অবশ্য সতীকে ব্যথা দিবার জন্য ব্যথা দেয় না, অভ্যাসবশত ঐরূপ অহঙ্কারসূচক বাক্য তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সতীও তাহা নীরবে সহ্য করেনা, বিলক্ষণ দু কথা শুনাইয়া দেয়। সতী অত্যন্ত অভিমানী এবং কেহ অন্যায় কিছু বলিলে সহিতেও প্রস্তুত নয়। কিন্তু তথাপি কেহ কাহারও উপরে বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা অপ্রস্তুত হইল রাগ করিল, কিন্তু বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে পারিল না। বলিল “বেশ ভাই! আমি যেন তাই বল্‌লাম, তুইও কি কথা শোনাতে কম করিস্?” সতী তখন একটু হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল “তুমিও শোনাও না কেন?”

“আমি ভাই তা আর কই পারি! এখন আমাদের বাড়ী কবে যাবি বল?”

“যাব যেদিন হয় একদিন।”

“তা হবেনা, তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে

হবে, তুই নইলে হবেনা—আসিস্ একটু সাগগির ক'রে—বুঝ্‌লি ?"

"আচ্ছা" !

কমলা তারাপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার ঘরের মেয়ে। বড়বাবুর আদরের দুহিতা, সর্ব্বসুখভোগে লালিতপালিতা। তথাপি রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কন্যা সতীর সঙ্গে তাহার যে কেন সখ্য ছিল তাহা বলা কিছু কঠিন। দরিদ্রের সঙ্গে ধনপতির সৌহার্দ্দ্যবন্ধন একটু বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। কমলা যে এজন্য বাটীতে কিছু খোঁটা না সহ্য করিত তাহা নহে, এবং দরিদ্রদের যেমন একটা গূঢ় অভিমান ধনীদের উপরে দেখা যায় তাহারি বশে সতীর অভিভাবিকারাও এজন্য তাহাকে অনুযোগ করিত। উভয় পক্ষ হইতেই এ ঘটনাটা সকলের আলোচনীয় বিষয়েরই অন্তর্ভূত। তথাপি কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিত না। এ ব্যাপারের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে রমণীতে রমণীতে সৌন্দর্য্যে সমবয়সে এবং বালোচিত সঙ্গলিপ্সায় যে আকর্ষণ তাহাতেই এ কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল। কমলা ত্রয়োদশ—সতী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। তাই তাহাদের এখন অসম ভালবাসা এখনো টিকিয়া আছে।

কমলা বাটী গিয়া একখানা খাটের উপরে শুইয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদে সত্যই সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল্। কেননা আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে সে তাহার বিবাহের বিষয় ভাবিয়া রাখিয়াছিল। যেদিন সে ঘাটে সাঁতার দিতে গিয়া কিছুদূর ভাসিয়া গিয়াছিল সেদিন বিশ্বেশ্বরই তাহাকে জল-হইতে উদ্ধার করে। একথা আর কেহ জানে না কেবল সতী মাত্র জানে। কমলা সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে। বিশ্বেশ্বর দেখিতেও মন্দ নয়, নব্য যুবক, স্বশ্রেণী, বিবাহও হয় নাই। সেও সুন্দরী, ধনীর কন্যা এবং অবিবাহিতা, এরূপ স্থলে ভালবাসা এবং তৎপরিণামে বিবাহ ত অবশ্যম্ভাবী। ভালবাসাটার সন্ধান যদিচ এপর্য্যন্ত মুখোমুখী রকমে হয় নাই, কেননা বিশ্বেশ্বরের বাড়ী অন্য পাড়ায়, সে বাড়ীর মধ্যে তাহার গমনাগমনও নাই, সেই ঘটনার পরে বিশ্বেশ্বরের সহিত তাহার ধরিতে গেলে একরকম দেখা সাক্ষাৎই হয় নাই। কিন্তু উপরিউক্ত অনিবার্য্য নীতিঅনুসারে সে তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য, বাসেও, অতএব বিশ্বেশ্বরই বা কেন না বাসিবে ! যদিও তাহার এই বিবাহের সম্বন্ধেও বিশ্বেশ্বরের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছেনা কিন্তু অমন অনেক পুস্তকেই হয় ! শেষ পাতে কিন্তু মিলন ঘটেই। যেখানায় তা না ঘটে সে বইয়ের গ্রন্থকারকে কমলা অভি-সম্পাত দিয়া থাকে, এবং জীবননাটকের সেরূপ শেষাঙ্ক সে দেখিতেও ইচ্ছা করেনা।

কমলা অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়া ভাবিল। একজন খাবার খাইতে ডাকিতে আসিলে তাহাকে তাড়া দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দ্বারে খিল দিল। একখানা নূতন পুস্তক আসিয়া-ছিল, সেইখানা খুলিয়া তাড়াতাড়ি শেষ পৃষ্ঠা দেখিল, দেখিল নায়ক নায়িকা সেখানে অতি আরামে ঘরকন্না করিতেছেন। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা তখন খাটে শুইয়া বই

খানা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে কখন যে মন লাগিয়া গেল এবং পড়িতে পড়িতে আর সব কথা ভুলিয়া গিয়া নায়ক নায়িকার দুঃখে কাঁদিয়া কাটিয়া কখন যে বই বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঝি এবং মাতার দ্বার ঠেলাঠেলিতে জাগিয়া উঠিয়া সে সব কথা স্মরণেও আনিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র প্রভাত হইতেছে! জীর্ণ ক্ষুদ্র বাটীখানির দাওয়াতে বসিয়া অকালবৃদ্ধ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বসিয়া তামাকু টানিতে ছিলেন। নিকটে কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো একটা পিঞ্জরের মধ্যে সদ্য জাগরিত টিয়া পাখীটি কয়েকবার "দুর্গা দুর্গা, তারা ব্রহ্মময়ী, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম পড়িয়া আপাততঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাসি ও তামাকু টানা শব্দের প্রতিধ্বনি করিতেছিল। জীর্ণ খড়ের ছাওয়া রান্নাঘরের পীঁড়ায় একধারে কুকুরটা শুইয়া আরামে নাক ডাকাইতেছিল, প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা আম্রবৃক্ষের নিম্নে খোঁটায় বাঁধা গাভীটি সস্নেহে বৎসকে লেহন করিতেছিল। চারিদিকই স্থির ধীর; বাতাস নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বস্থিত কলাগাছ কটির পাতাগুলি নাড়িতেছে, গাছের তাহাতে তেমন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। ভট্টাচার্য্য বোধ হয় ভাবিতেছিলেন যে, সবই এমন নিশ্চিন্ত এমন স্থির কেবল মানুষই এত উদ্বেগচিত্ত এত চাঞ্চল্যপূর্ণ কেন? পাখীটা আনন্দে পড়িতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, গাভীটা সস্নেহে বৎসকে আদর করিতেছে, কুকুরটা নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে; তাহাদের ত' চিন্তার লেশও নাই। তাহারাও ত খায় কিন্তু সেজন্য ভাবিয়া মরে না। তাহাদের জন্য যে মানুষেরা ভাবিতেছে তাহারা যেন ইহা স্থির নিশ্চিত জানে। তবে মানুষের জন্য কেহ ভাবেনা কেন? মানুষকেই কেন খাটিয়া ভাবিয়া নানা কৌশল করিয়া উদর পুরাইতে, সংসার চালাইতে হয়। পৃথিবীটা এমন পক্ষপাতী কেন? যাহা লইয়া তাহার গৌরব, সেই মানুষের উপর তাহার করুণা এত কম কেন?

ভাবিতে ভাবিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে ধূমের একটা কুণ্ডলী সৃজন করিয়া ফেলিলেন। বহুপুরাতন কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের দরজা খুলিয়া একটী রমণী বাহির হইয়া আসিলেন। সরু লাল পেড়ে একখানি বস্ত্র মাত্র পরিধান, হস্তে দুইগাছি সাদা শঙ্খ, ললাটে সিন্দূর বিন্দু, এই সামান্য বেশেই যেন দাওয়া খানি আলো হইয়া উঠিল। দরিদ্রের বিষাদাচ্ছন্ন অঙ্গন যেন লক্ষ্মীর পবিত্র চরণ স্পর্শে হাসিয়া উঠিল। রমণী কূয়া হইতে জল তুলিয়া দ্বারে চৌকাঠে ছড়াইয়া দিল, পরিষ্কৃত তুলসীতলাটি হস্ত দ্বারা নিকাইয়া ফেলিল। হাত ধুইয়া স্বামীর নিকটে এক ঘটী জল ও একটা দাঁতন রাখিয়া গলবস্ত্রা হইয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মৃদুস্বরে বলিল, "এত সকালে উঠেছ? কাল রাত্রে অত বুকবেদনা করেছিল ঠাণ্ডা কেন লাগাচ্ছ?" হুঁকা দেওয়ালের গাত্রে ঠেস দিয়া রাখিয়া মুখ হইতে একটা ধূমকুণ্ডলী বহির্গত করিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন "চুলোয় যাক্ বুকের ব্যথা, মরণ হ'লেও ত' বুঝ্‌তাম; নিশ্চিন্দি হ'তে

পার্‌তাম। না মলে ত' আর নিস্তার নেইই।" মর্ম্মাহতা সাধ্বী নীরবে ভূমিতে দৃষ্টি করিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আম্রবৃক্ষের প্রতি চাহিলেন। স্ত্রী ধীরে ধীরে বলিল, মুখ ধোও।"

"মুখ ধোব যখন হয়, ঘরে চাল ডাল কিছু আছে ত?"

স্ত্রী নীরবে ঘাড় নাড়িল। স্বামী উদ্ধত স্বরে বলিলেন "জমী বিক্রীর টাকাগুলো সবই ফুরিয়েছে?"

"অতি অল্পই ত দাম হয়েছিল, তিনমাস সেই টাকাতেই ত' চল্‌ল—আর কত দিন চল্‌বে?"

"না চল্‌বে ত আমিই বা আর কি কর্‌ব? চুরী কর্‌ব না ভিক্ষে কর্‌ব?"

স্ত্রী নীরবে চক্ষের জল মুছিল। স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমরা কেবল ঐ জান; কাঁদলে যদি উপায় হত তো আমিও না হয় কাঁদ্‌তাম।" তার পরে ঈষৎ নম্রস্বরে বলিলেন" আজকে আর আমি ঘুরতে পাচ্ছিনা, কোন রকমে আজ চালিয়ে নাও কাল তখন দেখা যাবে।"

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ায় গমন করিলেন। স্ত্রী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একগাছা ঝাঁটা হস্তে লইয়া উঠান ঝাঁট দিতে দিতে দুএক বার ডাকিলেন "সতি সতি"? দ্বার খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একটী কুসুম কলিকা তুল্য বালিকা দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, মাতাকে মার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া আসিয়া বলিল "কি মা?"

"সতী এখনো ওঠেনি? উঠোন্‌টা ঝাঁট দিত, আমি ততক্ষণ জলগুলো তুলে নিতাম", "আমি জল তুল্‌ছি" বলিয়া বালিকা কূপের নিকটে ছুটিল। মাতা নিবারণ করিলেন "অত জল তুল্‌তে পার্‌বিনা, কষ্ট হবে রাখ আমি যাচ্চি।" বালিকা সে কথা না মানিয়া জল তুলিতে আরম্ভ করিল। জাহ্নবী বেশী কথা বলিতে জানিতেন না, কন্যাকে আরও দুএক বার নিবারণ করিয়া নীরবে নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সতীর বিধবা জ্যেঠাইমা 'সুপ্রভাত সুপ্রভাত' বলিতে বলিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাতৃকে গৃহ কার্য্যে নিযুক্তা দেখিয়া সুউচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "মায়ে ঝিয়ে ত কাজ কর্ম্মের খুব ধূম লাগিয়েছ, এদিকে কাল চাল বাড়ন্ত বলেছি তা বুঝি হুঁস্ নেই? ঠাকুর পো গেল কোথায়? বাজার যাবুনা এইবেলা, এখনি কালীপদ উঠে খেতে চাইবে—গয়লা মাগী কাল দুধটুকুও দেয়নি গা। আর দেবেই বা কি যে তোমা দের গতিক, সাত জন্মে দামটি দেবার নাম করবেনা! সে দুঃখী মানুষ দেবে কোথা থেকে?

একটু কাতর কণ্ঠে জাহ্নবী বলিলেন "এখন ওসব কথা থাক্‌না দিদি। এই মাত্র কত দুঃখ করে গেলেন, শুন্‌তে পেলে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, আমাদের ত ও নিত্যকার কথা। আর গয়লার যা বল্‌ছ, গয়লার বেশীত পাওনা নেই, খালি এই মাসেরটা পাওনা।"

জ্যেঠাইমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন "তাই বা কি কম হ'ল, তোমাদের ভাল কথা বলবার যো নেই। আমার এতে কি এত গরজ!

তবে ছেলেটা দুধ না পেলে কষ্ট হয় তাই বলি! তা মরুক গে—"এইরূপে বকিতে বকিতে জ্যেঠাই মা গরুকে বিচালি দিতে গেলেন। আবার তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল, "হতভাগা গরু, অল্পেয়ে গরু, বাছুর বড় হ'ল আর দুধ দেবে না কেবল খাবে। অমন গরু ভাগাড়ে যায় না কেন।" সাবিত্রী ম্লান মুখে একবার বলিল "ভাল করে কই খেতে পায় যে দুধ দেবে?" জ্যেঠাই মা সেকথা কানেও তুলিলেন না। নিদ্রিত কুকুরটাকে গিয়া এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিলেন। বেচারা কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে পলাইল। ব্যাপার দেখিয়া পাখীটা চুপ্ হইয়া গিয়াছিল, জ্যেঠাই মা সম্মুখে আর কাহকেও না দেখিয়া নীরব পক্ষীটার উদ্দেশে "হতভাগা বাড়ীর হতভাগা পাখী, সকালে একটা দেবতার নাম মুখে নেই" "ইত্যাদি কতকগুলা বকিলেন।"

গোলমালে সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া সকলকে উঠিতে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল এত বেলা হয়ে গিয়েছে। কথাটা জ্যেঠাইমার কর্ণে গেল তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "আলো ধর গো, মেয়ে অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছেনা।" সতী নিজেকে দোষী দেখিয়া সেকথার আর কোন উত্তর দিলনা। মাতাকে উঠাইয়া দিয়া আপনি বাসন মাজিতে বসিয়া গেল। জাহ্নবী বলিলেন "তবে আমি নেয়ে আসি?" "যাও"।

ভট্টাচার্য্য মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র হরিশঙ্কর আসিয়া বলিল "টোলে না গেলে কেবল বক্‌তে পার, কিন্তু আর কিছুরি বেলায় আক্কেল দেখতে পাই না। শুধুপায়ে পাঁচটা ছেলের মধ্যে যাওয়া যায় কি? আমার চটী চাই—আজই চাই।" জাহ্নবী আসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "হরি এখন ওসব কথা বলোনা বাবা এখন অমনি যাও, এর পরে—"

"এর পরে কি? ক'দিন এরকম ক'রে যাওয়া যায়! বাবা আজই আমার চটী চাই।"

রামশঙ্কর একটু উগ্রকণ্ঠে বলিলেন "গরীবের ছেলের অত বড়মানুষী কেন? যাদের যেমন অবস্থা তারা তেমনি ভাবে চল্‌বে! আমি তোদের দায়ে চুরী কর্‌তে যাব নাকি?"

জ্যেঠাই মা অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "তা ওরা কি জানে! না দেবে ত বাপ হয়েছিলে কিসের জন্য? বুগ্যি ছেলে অমনি মাথা হেঁট করে থাকে তা লজ্জা হয় না?" তিন বৎসর বয়স্ক কালীশঙ্কর আসিয়া মাতার আঁচল ধরিয়া বলিল" মা ক্ষিদে খেতে দে মা।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্বরিত পদে গৃহের মধ্যে গিয়া আল্‌না হইতে চাদর গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবীও গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "চাদর নিয়ে কোথায় যাবে?"

ভট্টাচার্য্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জাহ্নবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠানে নামিলেন "কোথায় যাচ্চ? কোথায় যাচ্চ?"

"কিছু উপায় কর্‌তে পারি ত' ফিরব নইলে এই শেষ জাহ্নবী।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী ব্যাকুল কণ্ঠে জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিলেন "হরি যা যা,

কোথায় যাচ্ছেন ভাখ্, বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, যা হরি যা"।

"যাবেন আবার কোথায়! আপনি ফিরে আস্‌তে হবে। আমি চাঁদপুরে নরেন বাবুদের বাড়ী চল্‌লাম, তিনি আমায় সেখানে কত থাকতে বলেন আমি তোমাদের কথা মনে করে থাকি না, তা আজ থেকে এই বিদায় হচ্চি এবাড়ীর অন্ন যে ছোঁয় সে চামার।"

জাহ্নবী বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতী বাসন মাজা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রাতাকে বলিল" ছিছি দাদা তুমি হ'লে কি? তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে! যেওনা, ছি, ফেরো। তোমরা যদি আমাদের এমন করে ফেলে যাবে ত' আমাদের গতি কি আছে। ফেরো, বাবাকে ফেরাও।" "তোদের যা খুসী কর্‌গে, আমি নিশ্চয়ই যাব"। বলিতে বলিতে হরিশঙ্কর বাটীর বাহির হইল। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতার দুই হস্ত ধরিল "দাদা তোমার পায়ে পড়ি রাগ করোনা, বাবাকে যেতে দিওনা, বাবাকে ডেকে আন গে।"

বালিকাকে সজোরে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া হরিশঙ্কর চলিয়া গেল।

জাহ্নবী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে উঠানে বসিয়া পড়িলেন, মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবরিত। সতী চিত্রপুত্তলির ন্যায় ছাই-মাখা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল, সাবিত্রী আবার গিয়া ঘর নিকাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু হস্তের কার্য্য সে চক্ষের জলে দেখিতে পাইতেছিল না। কেবল জোঠাইমা উচ্চ চীৎকার ও ক্রন্দনে পাড়াশুদ্ধ লোককে ব্যাপারটা জানাইতে লাগিলেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মনের বেগে গ্রাম প্রান্তের রাস্তা দিয়া একেবারে মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। সত্যই তিনি "যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেইদিকে" যাওয়ার মতই চলিতে লাগিলেন। আলে বাধিয়া হোঁচট খাইতেছেন পদে কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে কিছুই গ্রাহ্য নাই। পার্শ্বের ভূমিতে পরাণ মণ্ডল বসিয়া ভুঁই নিড়াইতেছিল, সে বলিল, "ঠাকুর এদিকে এমন ক'রে কোথায় যাচ্ছেন।" "যমের বাড়ী"। বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিতে লাগিলেন। "ভটচাজ্ মশায়! এদিকে—অমন করে কোথায় যাচ্ছেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া দেখিলেন তাঁহাদের পাড়ার বিশ্বেশ্বর মৈত্র। কোঁচা ও পায়ের কাপড় একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া ঢেলাভূমি ভাঙিতে ভাঙিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণ থামিয়া দাঁড়াইলেন, পাছে কাহারো সঙ্গে দেখা হয় বলিয়া তিনি বিপথ ধরিয়াছিলেন, দেখিলেন তাহাতেও নিস্তার নাই। বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিয়া সসম্মানে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"কোন দিকের প্রতি আমার পক্ষপাত নেই—একদিকে যাহোক যাচ্ছি দেখতেইত পাচ্চ বাপু"।

"কেন কেন? এদিকে ত পথ নেই—মানুষ ত চলেনা—আপনি এদিকে কোথায় যাবেন?"

"কেন বাপু এইত তুমি চলছ, মানুষ চলে না বলছ কি করে।"

"আমার কথা ছেড়ে দেন, সোজা রাস্তায় ফিরতে দেরী হবে বলে এই দিক দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমারও তাই মনে করে নাওনা কেন।"

"আমি তারাপুরের মহাজনদের কুঠীতে গিয়েছিলাম—একটা কারবার করবার চেষ্টায়। ফিরবার সময় রাস্তা কম হবে বলে এই পথ দিয়ে চলছি।"

"আমিও একটা যাহোক কিছু কাজেই চলেছি বাপু, বিনা কাজে কে কবে মাঠ ভাঙে?"

"ভট্‌চায মশায়, আপনি লুকুচ্চেন। যদি বলবার মত হয় অনুগ্রহ করে বলুন না কেন। আমরা আপনার স্নেহের পাত্র, সন্তান তুল্য, আমার কাছে সঙ্কোচ করবেন না।"

"সঙ্কোচ কিসের বাপু, সঙ্কোচ কিসের।"

"আমি যদি আপনার সামান্য উপকারে লাগি ত কৃতার্থ জ্ঞান করব।"

ভট্টাচার্য্য একবার স্থির নেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিলেন। অতি সরল উদার আগ্রহপূর্ণ মুখ,—ব্যঙ্গ বা ছলনার চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত। ভট্টাচার্য্য মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "তুমি যে রকম ছেলে একথা তোমার যোগ্য তা জানি; কিন্তু বল দেখি আমি কেন তোমার উপকার গ্রহণ করব? আমি কার কোন্ উপকার করেছি যে অন্যের উপকার নেব?"

"উপকার নয় স্নেহের বশে—স্নেহের জোরে নেন।"

"ও কথাই নয়। শোন তবে, আমি বাড়ী থেকে একটা কিছু উপায়ের চেষ্টায় বেরিয়েছি। কিছু উপায় না হয় নিজের একটা উপায়ও ত করে নিতে পারব।"

বিশ্বেশ্বর একটু শিহরিয়া উঠিল। ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল "কি উপায় খুঁজতে যাচ্চেন—কাজ কর্ম্মের সন্ধানে কি?"

"প্রথম তাই।"

"আচ্ছা আমার উপকার না নেন তারাপুরের কুঠীতে চলুন, টাকা দশেক মাইনের একটা কর্ম্মচারী চাই, করতে পারবেন?"

"এখনি, কিন্তু মাইনেটা এ মাসে আমায় আগাম—আজকেই দিতে হবে।"

"আচ্ছা, আসুন।"

উভয়ে চলিলেন, বিশ্বেশ্বর একবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিল, অবস্থাটা সে অনুভবে বুঝিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ।

মহারাজা কুচবিহার।

কিছু কাল হইল মহারাজা বাহাদুরের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রবাসে ইংলণ্ডে চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনবার সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার অসাধারণ শারীরিক বলের গুণে সে সকল রোগ কাটাইয়া উঠেন। সকলেরি আশা ছিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় স্বজন এবং তাঁহার ভক্ত প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য ঘটিল না। তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আত্মীয় স্বজন এবং প্রজাবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রজাবৎসল রাজা অল্পই দেখা যায়।

কুচবিহারের ধনী দরিদ্র সকলেই তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ। আপামর সাধারণকে তিনি স্নেহ চক্ষে দেখিতেন, স্বীয় রাজ্যে উন্নতিকল্পে সংস্কার সাধনে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে কখনো কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সৌজন্য ইউরোপীয় এবং স্বদেশীয় বন্ধুবর্গকে চির দিন নির্ব্বিচারে আপ্যায়িত করিয়াছে। এই শিষ্টাচারের গুণে আজ তাঁহার জন্য স্বদেশী বিদেশী উভয়েই মর্ম্মাহত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মহারাজ বাহাদুরের জন্ম হয় এবং অনতিকাল পরে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দশ মাস বয়সে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসন অধিরোহণ করেন। প্রথম হইতেই ইংরাজ বাহাদুর এই রাজশিশুর শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে ইনি বর্দ্ধিত হয়েন। কাশী, বাঁকিপুর পাটনা প্রভৃতি স্থানে কলেজে রাজকুমার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যশাসন ভার প্রাপ্ত হন। তিনি চিরকালই ইংরাজরাজের ভক্ত বন্ধু ছিলেন। যখন সীমান্ত প্রদেশে কিম্বা অন্যত্র যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে তখনই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল উপকারের প্রতিদানস্বরূপ তিনি সম্রাট এডওয়ার্ডের A. D. C পদ লাভে সম্মানিত হন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যদিও রাজনৈতিক কোনও আন্দোলনে কখনও যোগদান করেন নাই তবুও স্বদেশের উন্নতি কল্পে সর্ব্বদাই উৎসাহী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে দান করিতেন। কোনও সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে নাই।

রাজোচিত বদান্যতার জন্য তিনি যেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বীরোচিত দৃঢ়চিত্ততার জন্যও সম্মান যোগ্য। কোনও সৎকার্য্য সমর্থনে প্রস্তুত হইলে তাহা যতই দুরূহ হউক না কেন কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। ইলবার্টবিলের আন্দোলনের ফলে যখন ভারতবাসী ইংরাজবর্গ ভারত-বন্ধু লর্ড রিপনের বিরোধী হন, এমন কি পদস্থ ভারতবাসী অনেকেই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনে যখন ভীত হইয়াছিলেন তখন রাজপ্রতিনিধি রিপনের বিদায়কালে তাঁহাকে বিশেষরূপ সম্মান দেখাইবার জন্য যে মহতী সভা আহূত হয় মহারাজা বাহাদুর তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া দেশের এবং দেশ-বন্ধুর গৌরব রক্ষা করেন। এই বীর নৃপেন্দ্রের মৃত্যুতে যে লক্ষ্মীস্বরূপিনী মহারাণীর জীবন একান্ত শূন্য হইয়া গেল, তাঁহার জন্য আমাদের হৃদয় স্বতই মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হইতেছে। তিনি চিরদিনই স্বামীর সৎকার্য্যের সহায়তা এবং গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। অতিথি সৎকারে তিনি ভারতবর্ষীয় আদর্শ রমণীর ন্যায় মধুরভাষিণী ও প্রিয়কারিণী। রাজোচিত মহার্ঘ সজ্জায় সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণীর ন্যায় উজ্জ্বল শোভায় যাঁহাকে চিরদিন দেখা অভ্যস্ত তাঁহাকে যে বিধবার ম্লান বেশে দেখিতে হইবে এ শোচনীয় কল্পনা কখনও মনে কল্পনাতেও উদয় হয় নাই—ঘটনায় এখন তাহাও ঘটিল! এ দুঃখ রাখিবার যেন স্থান নাই। অনাথের

সাথ করুণাময় বিধাতা তাঁহার এবং পিতৃহীন সন্তানবর্গের মনে সান্ত্বনা বিধান করুন এবং নবীনরাজা পিতৃগুণে বিভূষিত হইয়া দেশের গৌরব এবং পিতার নাম রক্ষা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কুচবেহার অধিপতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

কুচবেহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

আর্য্যা নিবেদিতা।

যে কয়জন সহৃদয়া বিদেশিনী নারী ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিবেদিতা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা, দেহ মন তিনি একান্ত ভাবে এই দুর্ভাগা দেশের মঙ্গলের জন্যই নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার নিবে-

দিতা নাম জীবনে মরণে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ৺স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকগুলি পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষ হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রামকৃষ্ণ প্রচার মঠে আসিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহারি একজন। ইনি আইরিস আমেরিকান বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার ইউরোপীয় নাম কুমারী মেরি নোবল। ভারতবর্ষের কোন দুঃখের ক্রন্দন তাঁহার নিকট ব্যর্থবিলাপ মাত্র ছিল না; সেবা শুশ্রূষা ও সহানুভূতি দানে সর্ব্বদাই নিবেদিতা তাহা দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী এবং স্বদেশী দুর্দ্দিনে তাঁহার কল্যাণ হস্ত, প্রতিভা দীপ্ত হৃদয়, একাগ্র নিষ্ঠা, অশ্রান্ত চেষ্টা কখনই কোন কঠিন কর্ত্তব্য হইতে বিমুখ হয় নাই। হৃদয়ে তিনি যে ভারতবর্ষের উজ্জ্বল প্রশান্ত মহান আদর্শ ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিয়াছিলেন তাহা একদিনের জন্যও ম্লান হইতে দেখি নাই। তাঁহার ভারত প্রীতি, ভারতবাসীর প্রতি মমতা, সহানুভূতি, অতীতের মহিমা জ্ঞান, এবং ভবিষ্যতের উদীয়মান অপূর্ব্ব গৌরব তিনি যে সরল নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য মনে হয় এবং তুলনায় আপনাদিগের হীনতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষীণ বিশ্বাস দেখিয়া হৃদয় হতাশায় জ্বলিয়া উঠে। নিবেদিতার অকাল মৃত্যুতে আজ আমাদের একটি অকৃত্রিম স্নেহশীল উৎসাহী বন্ধু চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। এই অকস্মাৎ বিপদ যথার্থই আমাদিগকে কাতর ও হতবুদ্ধি করিয়াছে। যিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্থান আর কখনো পূর্ণ হইবে কি না কে বলিতে পারে। এই প্রবাসে, আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে তাঁহার মৃত্যু—

আর্য্যা নিবেদিতা।

হইয়াছে—তবু তিনি চরিত্র গুণে এমন অনেক আত্মীয় সদৃশ বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যাহারা আজ তাঁহার শোকে একান্ত কাতর।

নিবেদিতার মাতা এমন কন্যারত্ন হারাইয়া আজ কত শোক কাতর, তাঁহার বন্ধুগণ কত বিষাদময়! তাঁহাদের জন্য আমাদিগের প্রাণ একান্ত ব্যথিত। নিবেদিতা যে আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ভারতের যে উন্নতির জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায় দেখাইয়া গেলেন সেই আদর্শ সেই একাগ্রতা আমাদিগকে কর্ত্তব্যে দৃঢ়তর নিষ্ঠাদান এবং সম্মুখ ভবিষ্যৎ সুন্দর ও উজ্জলতর করুক ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। মঙ্গলের দৃষ্টান্ত কখনই ব্যর্থ হয় না ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিপিনচন্দ্র পাল এবং সরকার বাহাদুর।—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবামাত্র রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হন। বিচারে তাঁহার লঘু পরিশ্রমের সহিত একমাসের কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারালয়ে স্বীয় দোষ এবং অবিবেচনা স্বীকার করিয়া বিপিনবাবু সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং সরকার বাহাদুর যে তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিয়া লঘুদণ্ড বিধান করিয়াছেন ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। রাজা যদি প্রজার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার করেন তাহা হইলে রাজা প্রজা এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। আমাদের বিবেচনায় পুরাতন সিডিসনের কথা জনসাধারণকে একেবারে ভুলিতে দেওয়াই গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রকৃত সমীচীন কাজ।

তুর্ক ইতালিক সমর।—তুর্ক এবং ইটালীর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইতালি তুর্করাজের নিকট ত্রিপলির জন্য অন্যায় দাবী করিয়াছিলেন তাহা তুর্করাজ দিতে অস্বীকার করায় এই অভিযান। এ যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তবে সম্প্রতি কোনই শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। রোমে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—ত্রিপলি বন্দর প্রবেশ কালে একখানি ইতালীয় যুদ্ধ অর্ণবযান জলমগ্ন হওয়ায় সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তুর্কদিগের রসদ বন্ধ হওয়ায় তাহাদিগের অত্যন্ত কষ্ট যাইতেছে। বুষলিয়ানা ওয়েলদের যুদ্ধে তুর্কগণ সম্পূর্ণ পরাজিত এবং তাড়িত হইয়াছেন। ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণ তুর্কইতালির মধ্যস্থতা করিতে বিরত হইয়াছেন—কেননা ইতালী ত্রিপলি সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে না পারিলে যুদ্ধে কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতালীর পক্ষ হইতে যে তার আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়—তুর্ক সৈন্যাধ্যক্ষগণ সন্ধি করিবার জন্য উৎসুক—সুলতানের আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন এইরূপ জনশ্রুতি। উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা করিয়া শীঘ্র শান্তিস্থাপন হইলে সকলদিকেই মঙ্গল।

কুমারী সোরাবজির অভিমত।—কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজি অন্তঃপুরিকা বঙ্গীয় রাণী এবং জমিদার পত্নীদিগের আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের জমিদারীর যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয় সেই তত্ত্বাবধান করাই ইঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের জন্য ইনি সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে প্রভূত বেতন পাইয়া থাকেন। এই সূত্রে বঙ্গীয় অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় খুবই সম্ভব; কিন্তু তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় অভিজাত এবং সাধারণ নারীগণের যেরূপ চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। যে দেশে সীতা সাবিত্রী নারীচরিত্রের আদর্শ, যে দেশে স্বামীভক্তি নারীদিগের ধর্ম,—সেখানে

কোনও নারী যে স্বীয় সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বামীকে হতমান এবং আপনাকে অঙ্গহীন করিয়া থাকে, সামান্য দুচারিটি টাকার জন্য স্বামীর শরীরে সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করাইয়া তবে সন্তুষ্ট হয় এ সংবাদ অত্যধিক নূতন বলিয়া বোধ হইল। ভারতে এরূপ হীন নিকৃষ্ট রমণী যে থাকিতে না পারে এমন আমরা বলি না। তবে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই ভারত ভরিয়া যত্রতত্র বিদ্যমান। দুঃখের বিষয় ভারতমহিলার সেই আদর্শ গুণরাশি মিশ সোরাবজির নয়নে পড়িল না, তিনি কেবল দেখিলেন যাহা সচরাচর অন্য কেহ দেখে না, জানে না, এবং ভারতরমণীর পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে। ভারতবর্ষীয় নারীচরিত্রের এরূপ অবমাননা বিদেশী সমাজে একজন শিক্ষিত ভারতরমণীর দ্বারা হইতে দেখিয়া স্বতঃই আর্য্যা নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। তিনি বিদেশী হইয়াও কি মমতা কি শ্রদ্ধা এবং সম্মানের চক্ষে এদেশবাসীগণকে দেখিয়া গিয়াছেন! সে শ্রদ্ধা যে কেবলমাত্র ভারতবাসীকে সম্মানিত করিয়াছে তাহা নয় তাহা তাঁহার উদার উন্নত হৃদয়কে আমাদের সম্মুখে অবারিত করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। আর ভারতীয় বেশে সজ্জিতা এই ভারতবাসিনী মিশ সোরাবজি ভারতের অন্নপরিপুষ্ট দেহে কেমন করিয়া নির্লজ্জভাবে স্বদেশীয়া নারীগণের অযথা নিন্দাবাদ বিদেশে সাধারণ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিলেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কুমারী সোরাবজি প্রচার করিয়াছেন আরো তিন বংশ পরম্পরায় শিক্ষিত হইলে ভারতরমণী তবে জীবনের কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হইবে। যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, খণা, লীলাবতী, চাঁদবাই, লক্ষ্মীবাই রাণী অহল্যা এবং রাণী ভবানীর দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ভারত-রমণীর হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান আছে সেখানে আদর্শ, শিক্ষা দীক্ষা এবং চেষ্টার জন্য ভবিষ্যতে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না ইহা আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি।

রাখীবন্ধন।—রাখীবন্ধন করিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন যে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া স্মরণ করা হয় ইহাতে যে কোনরূপ রাজদ্রোহিতার পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা গত কল্যই বিশাল রাজধানীবাসীদিগের ব্যবহার দেখিয়া সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়। কোথাও কোনরূপ গোলযোগ কিম্বা শান্তিভঙ্গ হয় নাই। দোকান হাট সব বন্ধ ছিল, কলিকাতাবাসী প্রায় সকলেই অরন্ধন রক্ষা করিয়াছিল। গঙ্গাস্নান, ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তন এবং রাখীবন্ধন ব্যতীত আর কোন বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয় নাই। বেলা চারি ঘটিকার পর অপরাহ্নে শোভাযাত্রা করিয়া অসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে বঙ্গীয় দেশনায়কগণ Federation Hall মাঠে সম্মিলিত হয়েন। সেখানে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। তিনি বক্তৃতায় বলেন; বাঙ্গালীর একতাবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য লর্ড কুর্জ্জন যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন তাহা সাধিত হয় নাই; বিচার সৌকর্য্যার্থে যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা হইল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে—বিচার বিভ্রাট ঘটিয়াছে ভিন্ন সুবিধা কিছুই হয় নাই। মুসলমান হিন্দুর মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব সৃজন করিবার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এখন অনেক মুসলমানই দেখিতেছেন এই ব্যবচ্ছেদের ফলে তাঁহাদিগকে নানা অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে বিশেষতঃ ইহাতে তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা বিস্তারের সমূহ অসুবিধা ঘটিতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান প্রায় সকলেই একমত—তবুও যদি এ বিধানের প্রতিকার হওয়া আর সম্ভব না হয় তবে সাধারণের একান্ত প্রার্থনা যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় High Court প্রতিষ্ঠিত না হয়। তাহাতে যে মহা অকল্যাণের সৃষ্টি হইবে তাহা কিছুতেই নিরাকরণ করা সম্ভব হইবে না। ভারত সম্রাট শীঘ্রই আসিবেন তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন কল্যাণকর অনুষ্ঠান করিয়া যাইবেন যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন অধ্যের মঙ্গল সূচনা হইবে, এখন ইহাই সকলের আশা।

লাঠি নিষেধ। বাঙ্গালী বহুদিন হইতে আত্ম-রক্ষার সমস্ত অস্ত্রবর্জ্জিত কেবলমাত্র একখানি ক্ষীণ

মাত্র তাহার সম্বল ছিল। সম্প্রতি রাজনিয়োগে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া কতপ্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা অধিক বলা বাহুল্য। পথে কুকুরে তাড়া করিলে তাহার প্রতিকার করাও কঠিন। দেশনায়কগণ সকলে একবাক্যে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে রাজপুরুষগণ নিশ্চয়ই প্রজার এ চরম লাঞ্ছনা দূর করিবেন। তাঁহারা যত সামান্য বিষয়ে মিটিং করিয়া সময় নষ্ট করেন আর এই গুরুতর বিষয়ে কেন যে চুপ করিয়া আছেন,—দেশের আপামর লোকের অসুবিধা লাঞ্ছনা দূর করিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন না—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য দেখিয়া স্বতঃই নিজেদের উপর অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়।

সমালোচনা।

যূথিকা। (প্রথমগুচ্ছ) শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ প্রণীত। ঢাকা, দয়াগঞ্জ হইতে শ্রীরাখালদাস ঘোষ, এম, এ কর্তৃক প্রকাশিত। (রাজসংস্করণ) মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে আটটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি ছোট নহে। এগুলিকে সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বলিলেই ঠিক হয়। প্রত্যেকটিও বেশ "শেফালি" গল্পটিতে লেখিকার কৌশল বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপর গল্পগুলির ভাষায় স্থানে স্থানে দোষ ঘটিয়াছে—"হৃদয় আগ্রহে বেরসিয়া উঠিতে লাগিল "সঙ্কট-সঙ্কুল" ইত্যাদি। আর একটি ত্রুটি উল্লেখ করা আমরা কর্তব্য বিবেচনা করি— প্রত্যেক নায়িকাবর্গের মধ্যে শিক্ষিতা হইলেই প্রায় বাঙলা কথায় ইংরাজীর বুকনি মিশাইয়া কথা কহেন —"শেফালি" গল্পের 'বৌদি' এবং "অন্তরঙ্গ" গল্পের "লাবণ্য"- দুইটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অথচ লেখিকা এই চরিত্র দুইটিকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অন্তর্গত করিয়া অঙ্কিত করেন নাই। যাহা হউক, গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি—উপাখ্যানগুলিতে বৈচিত্র্য আছে—এবং প্রতি গল্পেই লেখিকার রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা কাগজ সুন্দর।

ভিখারিণী। নাটক। শ্রীমতী অমলা দেবী প্রণীত। ১নং হেয়ার ষ্ট্রীট, মডার্ণ পাবলিসিং কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত; সখাপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। এখানিও লেখিকার প্রথম প্রয়াস। গল্পটি পড়িতে বেশ লাগে; আগাগোড়া কৌতূহল উদ্রিক্ত থাকে। কিন্তু নাটকের action ইহাতে নাই। নাটকের পরিবর্ত্তে পুস্তকখানি উপন্যাস হইলেই ভাল হইত। আশা করি লেখিকার বিকাশ উন্মুখ শক্তি তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যমে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

চীন ভ্রমণ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম ডি প্রণীত। এস, সি মজুমদার কর্তৃক ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা এ গ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি অসাধারণ। লেখক আগাগোড়া যাহা দেখিয়াছেন, বেশ সহানুভূতির সহিতই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার বহুস্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। নভেলের মত সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য এই ভ্রমণ বৃত্তান্তখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পদ স্বরূপ গণ্য হইবে, সে বিষয়ে আমাদের একটুকু সন্দেহ নাই। বহুচিত্রের সমাবেশে বক্তব্যগুলিও দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে পড়িতে কোথাও বাধে না।

মণিভদ্র।—বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ বিরচিত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, " * * জাতক ও অবদান গ্রন্থগুলিতে যে সকল মহনীয় চরিত্রোৎকর্ষের * * আদর্শ আছে সেগুলিকে সময়োপযোগিভাবে চিত্রিত করিয়া

প্রকাশ করিলে * আমাদের তরুণ বয়স্ক ছাত্রবৃন্দের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইতে পারে, এই আশায় * * উপন্যাসখানি সংকলন করিয়াছি।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপন্যাস হিসাবে 'মণিভদ্র' ব্যর্থ রচনা হইয়াছে। উপন্যাসের আর্ট কোথায়ও এতটুকু লক্ষিত হইল না। উপাখ্যানটিতে রোমান্সের প্রচুর উপাদান ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার মহাশয়ের নির্জীব ভাষার চাপে রোমান্সের রস মারা পড়িয়াছে। ভাষার সুরও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। গ্রাম্যভাষা ও পণ্ডিতী ভাষার মিশ্রণে বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে।

ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ।—(প্রথম খণ্ড) কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ২৮।১নং বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। কৃষিব্যাপারের প্রতি অধুনা বহু শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তির অনুরাগ দেখা যাইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে ভূমি নির্ব্বাচন, ভূমি কর্ষণ, সার, এবং ইক্ষু, কার্পাস, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। গ্রন্থকার নিজে একটি কৃষিশালার পরিচালক সুতরাং তাঁহার আলোচনা ও মতামতের মূল্য আছে। আলোচনার ভাষাটুকুও বেশ সহজ ও সরল কোনরূপ অযথা আড়ম্বরের ভারে নিপীড়িত হয় নাই। কৃষিকার্য্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের মূল্য কিছু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইল। মূল্য হ্রাস করিয়া দিলে গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে সহজ প্রাপ্য হইবে এবং গ্রন্থকারেরও যে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা আমাদিগের মনে হয় না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

খাদ্য। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণিলাল বসু রায়-বাহাদুর প্রণীত। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায় জনসাধারণের নিকট পুস্তকখানি কত আদৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্য খাদ্যসম্বন্ধীয় পুস্তক সকল হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার মধ্যে দুইটী নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে, একটি অধ্যায়ে খাদ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি তথ্যের আলোচনা ও অপরটিতে কতিপয় সাধারণ রোগে পালনীয় স্বাস্থ্যবিধির ও পথ্যাপথ্যের নির্দ্দেশ আছে। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা এই পুস্তক পড়িয়া যারপরনাই উপকৃত হইবেন এবং সাধারণ লোকেও পুস্তকখানি পড়িয়া অনেক আবশ্যকীয় নিয়ম পালন করিতে পারেন।

একটি বিষয়ে আমার সহিত চুণিবাবুর মতের একান্ত অমিল আছে। তিনি আমিষ ভোজনের মোটেই পক্ষপাতী নহেন। ইহার বিপক্ষে তিনি যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাল দুধ আদি সারাল খাদ্যের অভাবে দেহের মাংসপেশী সবল হয় না; মাংস মাছ ডিম ইত্যাদি অল্প আয়তনে সারাল ও সহজপাচ্য খাদ্য ভক্ষণে নিঃসন্দেহ তাহার অনেক প্রতিকার হইতে পারে। আমাদের দৈনিক কাজ আজ-কাল অনেক কঠোর হইয়াছে। পরিমিত পরিমাণে এই শ্রেণীর খাদ্য খাওয়াইতে পারিলে শিশুজীবনে শরীর গড়িবার পক্ষে অনেক উপকার হয়। এবং যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করেন তাঁহারাও সুস্থসবল থাকেন এত শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়েন না। হারবার্ট স্পেন্সরের ও সাবারল্যাণ্ডের খাদ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে এ সম্বন্ধে অনেক সদ্যুক্তি দেখান আছে। আয়তনে বহুল ও সারে কম এমন খাদ্য খান বলিয়াই আমাদের দেশের লোকের এত দুর্ব্বলতা। বিভিন্ন রোগে যেমন বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা আবশ্যক তেমনি আমাদের এদেশের এই দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য মাংসের ন্যায় সারাল খাদ্যই মহৌষধ। বিশেষ বাল্যজীবনে ইহা বড়ই ফলদায়ক।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ২২, স্কট্ লালিসন্ লেন হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

অন্নপূর্ণার মন্দির ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিশ্বেশ্বর নিতান্তই একটি গ্রাম্য যুবক। তাহার পিতা গ্রামের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক কিন্তু বাহিক চালচলনে তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ হইত না। কৃপণ বলিয়া তাঁহার বরঞ্চ অখ্যাতিই ছিল। সামান্য একতালা বড় বাড়ী, অনেক গুলি গরু বাছুর, গাড়ী বলদ প্রভৃতিতে গোয়াল পরিপূর্ণ এবং ধান্য যব গম প্রভৃতির গোলায় গোলাবাড়ীতে পা দিবার ঠাঁই নাই। অথচ তেমন বেশী চাকর চাকরাণী রাঁধুনী খানসামার ধূম নাই, টেবিল চেয়ার আয়না দেয়ালে বৈঠকখানাও সজ্জিত নয়,—নিতান্তই সাধাসিধা গ্রাম্য গৃহস্থের বাটী। লোকে কিন্তু বলিত বুড়া টাকার কুমীর। সংসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বর ও তাহার মাসী অন্নপূর্ণাঠাকুরাণী। তিনিও অতিশয় ধনবতী বলিয়া প্রবাদ আছে। মাতৃহীন বিশ্বেশ্বরকে পালন করিতে যখন তিনি নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের গৃহস্থালীতে প্রবেশ করিলেন তখন লোকের হৃদয়ে একটা ঈর্ষার তুফান উঠিয়াছিল।

একমাত্র পুত্র বলিয়া নারায়ণ মৈত্র বিশ্বেশ্বরকে কখন চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। সেজন্য বিশ্বেশ্বর গ্রাম্য স্কুলে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল মাত্র। কিন্তু লোকে বলাবলি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়িয়াও সে যথার্থ একটী সুশিক্ষিত ছাত্র। সংস্কৃত উপাধিধারী বিদ্যার্ণব বিদ্যাবাগীশ তর্কচঞ্চু সরস্বতীরা তাহার সংস্কৃত জ্ঞানের কাছে পরাজিত হইত। এবং একজন এম এ উপাধিধারী দিগ্‌গজ পণ্ডিতও বাবুদের বাড়ীতে আত্মীয়তা সূত্রে আসিয়া এই গ্রাম্য যুবকটির অসাধারণ ভাষাজ্ঞান দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইত্যাদি নানা প্রকার গুজব বিশ্বেশ্বরের নামে সে গ্রামের পুরুষ মহলে প্রচারিত ছিল কিন্তু মেয়েমহলে এ সব উড়ো কথা স্থান পাইতনা কেননা; তাঁহারা বেশ জানিতেন যে বিশ্বেশ্বর একটী অতি ভালমানুষ মুখ-চোরা ও সুছেলে।

বিশ্বেশ্বরকে বলিতে গেলে গ্রামের লোক কেহ বেশীর ভাগ কখন দেখিতেই পাইত না। দ্বাবিংশ বৎসরের অধিকাংশ কাল তাহার নিজের গৃহকোটরের মধেই কাটিয়া গিয়াছে। সমবয়সী যুবকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বেড়ান, বা লম্বা গল্পগুজব করা জীবনে তাহার কখন ঘটে নাই। ষোড়শ বৎসরে এণ্টেন্স পাশের পর স্কুল ছাড়িয়া সেই যে সে নিজের কক্ষে ঢুকিয়াছে এপর্য্যন্ত স্নানাদি সময়ে ভিন্ন কেহ তাহাকে কখন বাহিরেই দেখে নাই। অন্তঃপুরস্থ সে কক্ষে কাহারো প্রবেশাধিকার

ছিল না, নহিলে দেখিতে পাইত, তক্তার উপরে রাশি রাশি পুস্তক ও মেজের উপর মাদুরে উপবিষ্ট যুবক সম্পূর্ণ ভাবে পাঠনিমগ্ন। তাহার পিতার এ বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠতা ছিলনা এবং পুত্রের এরূপ স্বভাবে তিনি বেশ সুখীই ছিলেন। সংসারের কোন চিন্তা এ পর্য্যন্ত পুত্রকে তিনি দেন নাই। ইচ্ছা করিয়াছিলেন বিবাহ দিয়া পুত্রকে সব বুঝাইয়া দিয়া তিনি শেষাবস্থায় কাশীবাসী হইবেন, কিন্তু কাল সহসা আসিয়া তাহার নোটীস জারি করিল। পুত্রকে এক প্রকার সব বুঝাইয়া দিয়া ও মাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার অভিনয় শেষ করিয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বর প্রথমে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সাহিত্যের নিভৃত কোটর হইতে তাহাকে একেবারে সংসারের মধ্য স্থানে একাকী অসহায় ভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়া পিতা সরিয়া গেলেন! এ যেন নূতন জন্মগ্রহণ! কিন্তু সংসার তাহার পক্ষে জটিল নয়, পিতার শৃঙ্খলাও অতি পরিষ্কার এবং তাঁহারি নির্ম্মিত বিশ্বেশ্বরের মস্তকটি ততোধিক পরিষ্কার। ইতিপূর্ব্বে সে যেমন অবাধে সাহিত্য সাগরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইত সংসারের মধ্যেও সেইরূপ সচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সংসারের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহার বোধ হইল যথেষ্ট সময় আছে; সে সময় সে কিরূপে কাটাইতে পারে তাহার উপায় দেখিতে লাগিল। কারবারটা বাড়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া, কতকগুলা নূতন জমী ও বাগান কিনিয়া তাহার উন্নতি করিয়া সম্প্রতি সে নদীর ধারে অনেক খানি স্থানে কি একটা অভিপ্রায়ে লম্বা একটা বাড়ী নির্ম্মাণের বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইয়াছে। ইতি মধ্যে গ্রাম্য দেবতা ভবানী মন্দিরের সংস্কার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, লুপ্তাবশেষ বৃহৎ 'কালী সাগরের' পঙ্কোদ্ধার হইয়া জলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মহিমাপুরের ভাঙ্গন বাঁধটা প্রতিবার ভাঙ্গিয়া গ্রাম জলে প্লাবিত হইয়া যায় তাহার বিশেষ রূপে সংস্কার হইতেছে। কে এ সব করিয়াছে সকলে জানিত না, কিন্তু কেহ কেহ বলিত যে কৃপণ নারায়ণ মৈত্রের অর্থগুলারই সদ্গতি হই-তেছে। কোন কোন পরহিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বেশ্বরকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিত, বাপু পরের কাজে গোঁজা না দিয়ে নিজের একটা বড় কিছু করনা কেন, নামটাও থাক্‌বে, ভালও হবে। বিশ্বেশ্বর সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিত অত বড় বড় কীর্ত্তি করা কি আমার সাধ্য! দু চার টাকায় যা হয় সেই পর্য্যন্ত"। যিনি একটু বিচক্ষণ তিনি বলিতেন "সেকি বাবু এসব কাজে যে বিস্তর টাকা লাগ্‌ছে বোধ হয়"। বিশ্বেশ্বর তাচ্ছিল্য ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিত "কোথায়! বেশী খরচ কি আমার সাধ্য।"

মাসিমাতা অন্নপূর্ণাঠাকুরাণী এতদিন সচ্ছন্দে গৃহস্থালির সমস্ত গৃহিণীপনাই বহন করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু সহসা তাঁহার একস্থানে যেন একটু বেখাপ্পা ঠেকিল। তাঁহা-দের নিস্তব্ধ অল্প সুখদুঃখে মিশ্রিত সংসারটি একটু নূতনত্বে ভরিয়া উঠে এমন ইচ্ছা জন্মিল। পুত্র স্থানীয় বিশুকে একদিন বলিলেন "দ্যাখরে আমার একটা সাধ হয়েছে।" কি মাসিমা?" "সকলের বাড়ী কেমন ছোট ছোট বউঝিতে আলো করে থাকে আমার ঘর একেবারে

ফাঁকা।" "কি করবে বল মাসিমা—মানুষ ত' ফরমাসে গড়েনা, ভগবান দেন্ নি উপায় কি।"

"তা বলে একটা মানুষকে ত' ফরমাসে পড়েই লোকে সংসারে আনে। আমায় একটি টুক্‌টুকে বউ এনে দেনা কেন।"

মাসিমার সাধ শুনিয়া বিশ্বেশ্বর হাসিয়া আকুল হইল; সে হাসি আর থামে না। মাসী রাগিয়া বলিলেন "এত হাসি কিসের বল দেখি বাপু! এখন যে বউ না আন্‌লে লোকে নিন্দা করবে।" "মাসিমা, আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা মানুষের স্বভাব! পরের মেয়ে ঘরে এনে কেন বলদেখি একটা জঞ্জাল করা! আমরা মায়েপোয়ে কি মন্দ আছি?"

"মন্দ কেন থাক্‌ব! কিন্তু এর মধ্যে আর একটি এলে আরও ভাল থাকব।"

একটি এলে বলবে আর একটি, মানুষের ইচ্ছে কেবল বেড়েই চলে। তার চেয়ে ভগবান যে ক'টিকে জন্মাবচ্ছিন্নে এক জায়গায় দিয়েছেন সেই কটিকে নিয়ে সুখসচ্ছন্দে থাক।" "এমন ক্ষেপাছেলেও ত' দেখিনি। ওসব আর শুন্‌বনা। আমি মেয়ে ঠিক্ করব বলে রাখ্‌ছি। "তা তুমি যত ইচ্ছে মেয়ে ঠিক করনা কেন। আমিও তোমায় চার পাঁচটা দিতে পারি।"

"তা বেশ ত বল্‌না, ওর মধ্যে একটিকে পসন্দ করে নিলেই হবে।"

"বাঃ একটিকে পসন্দ কর্‌বে আর সব গুলি বুঝি ফিরে যাবে! তা হবেনা, সব গুলো নিতে হবে। তাহলে বউয়ে ঝিয়ে তোমার বাড়ী খুব জ্বাকিয়ে উঠ্‌বে।"

"ক্ষেপামী রাখ্। সত্যি করে বল বিয়ে এখন কর্‌বি কিনা!"

"আমার মত নিয়ে কি তুমি মত করছ! তুমি, যত পার বাড়ীতে বউ ঝি আন আমি কিন্তু বলে রাখছি পশ্চিমের সব দেশ একবার দেখতে যাব। তুমি কাশী বৃন্দাবনের গল্প কর আমি কেবল শুনে যাই, এবারে আমি এসে তোমায় ঠকিয়ে দেব। প্রথম বাবার গয়া কর্‌তে হবে। তুমি যদি সঙ্গে না যাও মাসিমা, আমায় না খেয়েই শুকিয়ে মর্‌তে হবে।"

"আমি কি বল্‌ছি তোর সঙ্গে যাব না, না তোকে একা ছেড়ে দেব! কিন্তু বিয়েটা করে গয়া কর্‌তে গেলে হ'ত না বিশু!"

"তা হলে আমি একাই যাই তুমি বিয়ের বন্দোবস্ত কর!"

"তুই না থাকলে কার বিয়ের বন্দোবস্ত করব!"

"সে তুমি জান।"

"এমন ছেলে কখনও দেখিনি বাবু। আচ্ছা চল আগে ঐগুলোই সেরে আসা যাক।

এ সব কথা এই পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। বৈকালে বিশ্বেশ্বর তাঁহার নবনির্ম্মিত কলা বাগানের তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ কলসে জল লইয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। বালিকা তাহাকে রাস্তা দিবার জন্য গ্রাম্য ক্ষুদ্রপথের পার্শ্বস্থ কচলার গায়ে ঘেঁষিয়া যাওয়াতে বিশ্বেশ্বর আস্তে ব্যস্তে বলিল "অত বিপথে কেন যাচ্চ? এ সময়ে সাপ টাপ থাকে রাস্তায় দাঁড়াও না।" বালিকা একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আপনি তবে কেন অত পগারের মধ্যে নাম্‌ছেন?" বিশ্বেশ্বর সে কথার উত্তর না দিয়া "রাস্তা দিয়ে যাও" বলিয়া বালিকার পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া

অগ্রসর হইল। বালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বর রাস্তার বাঁক ফিরিতে গিয়া দেখিল, বালিকা তখনও পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া একটু দাঁড়াইল; দেখিল বালিকা গমনশীল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, চাহিবামাত্র সে দৃষ্টি নামাইল। বিশ্বেশ্বর সহসা মনে করিল হয়ত বালিকার কিছু প্রয়োজন আছে। পরক্ষণেই মনে হইল এ মেয়েটি যেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে। কে, বা কাহার কন্যা তাহা মনে পড়িল না কিন্তু ইহাকে যে সে দুই তিন বার দেখিয়াছে তাহা মনে পড়িল। কৌতূহলী হইয়া বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া বালিকার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাদের মেয়ে?"

"ভট্টাচার্য্যদের।"

"কোন্ ভট্‌চায্? রামশঙ্কর ভট্‌চাযের মেয়ে বুঝি তুমি?"

"হ্যাঁ।" বিশ্বেশ্বর দেখিল বালিকা আর কিছু বলে না অগত্যা সে ফিরিয়া চলিল। নিজে হইতে কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কেহ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে অথচ সঙ্কোচে পারিয়া উঠিতেছে না তাহা বুঝিয়াও সে তাহার কোন সদুপায় করিয়া উঠিতে পারে না। নিজেও এক রাশ সঙ্কোচ লইয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায়। তবে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে যে সেদিন ওরূপে বলিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ সে তাহার বাসীর কাছে তাঁহার দুরবস্থার কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিল এবং তাহার তরুণ কোমল মনে তাহা জাগিয়াই ছিল। মনেও ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে রামশঙ্কর বা তাহার পুত্র কাহাকেও একটা কার্য্য দিতে পারিলেই তাহাদের দুঃখ দূর হইবে। ভদ্রসন্তান কেহ যে তাহার কাছে অর্থ প্রত্যাশা করে বা তাহার কাছে সংসারের লোক যে কেহ কখনও কোন দাবী রাখে তাহা সে স্বপ্নেও মনে আনিত না। সে কথা ভাবিতেও তাহার মনে সঙ্কোচ হইত। ভট্টাচার্য্যের চাকরীর ঠিক করিয়া দিয়া সে আর তাঁহার কোন খোঁজ রাখিত না। দুই দিনের চিন্তা তাহার এক দিনের মধ্যেই মিটিয়া গিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সতী আবার তাহার পানে চাহিল। অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল "আপনাকে—আপনাকে" বিশ্বেশ্বর আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, "আমায় বল্‌ছিলে?" "হ্যাঁ"। "কি বল?"

সতী সঙ্কোচে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, অথচ না বলিলেও নয়, সখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয় এবং হয়ত সখীর পক্ষে অন্যায়ও করা হয়। বিশ্বেশ্বর ব্যাপার বুঝিয়া আর একটু নিকটে আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "বল না, লজ্জা কি?"

সতী অনেক কষ্টে বলিল,—"কমলা আপনাকে বলেছে—"

"কমলা? কমলা কে?"

"সতী একটু বিস্মিত একটু দুঃখিতভাবে বলিল "তাকে চেনেন না? বাবুদের বাড়ীর মেয়ে, যাকে আপনি একবার জল থেকে তুলেছিলেন।" বিস্মিত বিশ্বেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল "ওঃ সেত অনেক দিনের কথা। তা কি?"

কমলা বলেছে—আপনাকে—আপনার না কি বিয়ের কথা হচ্ছে?"

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল, মাসিমার ইচ্ছাটা যে গ্রামে এর মধ্যেই রটিয়া গিয়াছে তাহাতে সে খুব আমোদিত হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল "হ্যাঁ" হচ্ছে বৈকি! তাতে কি হয়েছে?"

সতী মস্তকটা যতদূর সম্ভব নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "কমলা বলেছে আপনাকে বিয়ে করবে।" সতীর এই অদ্ভুত কথায় বিশ্বেশ্বরের বিস্ময়ের অপেক্ষা হাসি বেশী আসিতেছিল, কিন্তু সতীর লজ্জা দেখিয়া বুঝিল তাহার সমক্ষে অত হাসাটা যুক্তিযুক্ত নয়, বলিল "কেন তার কোথাও বিয়ের কথা হচ্ছে না বুঝি?" সতী ঠাট্টাটা না বুঝিয়া সরল ভাষায় বলিল, "হ্যাঁ, চাঁদপুরের জমিদারদের বাড়ী। সে তা করবে না।" "সত্যি নাকি?" 'হ্যাঁ'। বিশ্বেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিল "সেই খানেই বিয়ে করতে বলো। গাঁয়ে খুব ঘটা হবে আমরা কত ভোজফলার খাব আশা কর্‌ছি; তারা খুব বড় লোক।"

সতী লজ্জাস্নিগ্ধনেত্রে বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া বলিল "আপনারাও ত বড়লোক, খুব ঘটা করতে পারবেন।"

"পাগল হয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা।"

"কমলাকে কি বল্‌ব?" আবার বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। অতি কষ্টে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল "বলো যে আমার যদি বর হ'তে হয় তা হলে সে বিয়ের ভোজ ফলার কিছুই খেতে পাব না। উপোস করে করে মর্‌তে হবে খালি! অনেক দিন থেকে আশা করে আছি এ বিয়েতে খুব খাব। কাজেই বর হতে পাচ্ছি না, বুঝেছ?" সতী দুঃখিত হইয়া পড়িল কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিয়া তাহার হাসিও পাইল। বলিল "আপনি ঠাট্টা কচ্চেন।"

"না না সত্যিই বলছি; তার কথা রাখতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিতও হচ্চি। কিন্তু কি করি বল, খাওয়াটার আশাও কোন মতে ত্যাগ কর্‌তে পাচ্চি না।"

সতী তখন গমনোন্মুখী হইল। বিশ্বেশ্বর বলিলেন "তোমার নাম কি?"

"সতী!"

"তোমার দাদা বাড়ী এসেছে? তোমার বাবা সেদিন বলেছিলেন—"

"হ্যাঁ" এই বলিয়া—সতী কিছুদূর চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাবা তারাপুরের কুঠিতে রোজ যান!" চলিতে চলিতে সতী বলিল, "যান।"

বিশ্বেশ্বরের আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাদের কোন অভাব কোন কষ্ট আছে কি না,—কিন্তু সে কথার প্রারম্ভেই সতী চঞ্চলভাবে চলিয়া গেল এবং তাহার নিজেরও সঙ্কোচ কাটিল না, জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সেই দিনের পর আর তাহার সহিত সাক্ষাতাদি করেন নাই এবং পাছে তিনি কিছু মনে করেন বলিয়া সে দু একদিন ইচ্ছা করিয়াও তাঁহার নিকটে যাইতে পারে নাই। শেষে তাঁহার আর কোন উচ্চবাচ্য নাই দেখিয়া বুঝিল যে তাঁহার আর কোন অভাব নাই। সে দিনের

সেই অনাহারী পরিবারকে আসন্ন বিপদ হইতে সে যে একটা উপায়ের পথ দেখাইয়া দিতে পারিয়াছিল তাহা মনে করিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মাসে মাসে দশটী করিয়া টাকা আনিয়া দিয়া ভাবেন যে স্ত্রীপুত্রকন্যাগণের ঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার বা করিবার আর তাঁহার কিছু নাই। তাই তিনি সচ্ছন্দচিত্তে যথাসময়ে স্নানাহারটি করিয়া দুই তিন ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া একটু নিদ্রা যেন, পরে উঠিয়া সযত্নসংস্থাপিত জলে হস্তমুখ প্রক্ষালণ করিয়া কাপড় চাদরটা একটু ঝাড়িয়া পরিয়া কার্য্যে বাহির হন্। রাত্রি আটনয়টার সময় গৃহে ফিরিয়া পুনর্ব্বার সযত্ন সজ্জিত ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন সেবন করিয়া আরামে নিদ্রা দেন। পুত্র হরিশঙ্কর টোল অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে, চাঁদপুরের বাবুদিগের সংসর্গেই তাহাকে বেশী দিন থাকিতে হয়; কেননা তাঁহাদের সখের থিয়েটারের সে একজন প্রধান গৌরবের জিনিষ। স্ত্রীজাতির পার্ট একটু করিতে সে অদ্বিতীয় এবং তাহাকে বেশ মানায়ও। সেজন্য বাবুরা তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না। মাসের মধ্যে যে দুদিন সে বাড়ীতে আসে সে দুই দিন মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া নিজেও ত্যক্তবিরক্ত চিত্তে চলিয়া যায়। এ কদর্য্য গৃহের কদর্য্য অন্নব্যঞ্জন কদর্য্যশয্যা আর তাহার পসন্দ হয় না। ভট্টাচার্য্য সেজন্য বিশেষ দুঃখিতও নন। বড়লোকের নজরে পড়িয়া শেষে ওর হয়ত একটা ভালমত কাজকর্ম্ম জুটিতে পারে ভাবিয়া এবং পুত্রের টেরি ছড়ি ধূতী সার্ট সিগারেট দেখিয়া পরম নিশ্চিন্তচিত্তে তিনি তামাকু টানিতে থাকেন। কেবল জাহ্নবী দেবী বিরলে চক্ষুজল মোছেন, মাতার অশ্রু দেখিয়া মেয়ে দুটাও কাঁদিয়া ফেলে।

কেবল বিশ্রাম ছিল না এই তিনটি প্রাণীর। সাংসারিক কর্ম্মের অবসরে জাহ্নবী অনেক কার্য্য করিতেন। যথা, তুলা পেঁজা, পৈতা কাটা, পাটের দড়ি কাটা প্রভৃতি। কন্যারাও নীরবে মাতার কর্ম্মে সহায়তা করিত। জাহ্নবী সূচের কাজও উৎকৃষ্টরূপে জানিতেন কিন্তু তাহাতে পয়সার কুলায় না, কাজেই এই অল্পব্যয়সাধ্য কার্য্যের দ্বারা সংসারের অভাব কোনরকমে পূরণ করিয়া লইতেন। দশটি টাকায় সকল খরচ সংকুলান হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য, সময় অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করারও দরকার। স্বামীর ত ওই রুগ্ন অবস্থা, তিনি হাঁপের রোগী। কন্যা দুইটী বড় হইল, রূপ থাকিলে কি হইবে, রূপ গুণ যাহাতে ঢাকিয়া যায় গৃহে তাহারই অভাব, কে তাহাদের বিবাহ করিবে আর কেই বা তাহার চেষ্টা করে। জাহ্নবী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে স্মরণ করেন।

শুদ্ধ দ্বিপ্রহর। তাহাদের বাসনমাজা ঘরনিকান' প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য শেষ হইল। বিড়ালটা আরামে তুলসীতলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে, কুকুরটা দাওয়ার নীচে শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানে মাচায়

লাউ কুমড়ার পাতাগুলা রৌদ্রে যেন নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, পরিষ্কার 'নিকানো পোঁছান' উঠানটির একধারে কলাগাছের ঝাড়টি সতেজে রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া শ্যামকান্তিতে দর্শকের চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছে। উঠানের আমগাছে পাকা আমগুলি টুক্‌টুকে হইয়া ঝুলিতেছে; গাছের পত্ররাশির মধ্য হইতে পক্ব আম্রস্বাদে তুষ্ট কোকিল এক একবার সাড়া দিতেছে কু কু কু। জাহ্নবী কতকগুলা পাট বাহির করিয়া আনিয়া জলে নরম করিতে লাগিলেন, সাবিত্রী সেগুলা গুছাইতে লাগিল। সতী একবার মাতার পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল "মা কমলা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, একবার যাব?"

"যাও, কিন্তু বড় রোদ্দুর মা, একটু পরে গেলে হ'ত না?"

"তা হোক্, বেলা গেলে পথে লোক হয়। সাবিত্রী যাবি? সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

"তবে আমি কার সঙ্গে যাই মা? একা যাব?"

মা বলিলেন "সাবিত্রী যা না মা, সতী একা যাবে কি ক'রে?"

সাবিত্রী রৌদ্রতপ্ত রাঙা মুখখানি ফিরাইয়া, ললাট হইতে রুক্ষ চুলের গোছটা পশ্চাতে সরাইয়া ফেলিয়া মিনতি পূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল "তুমি কালীকে নিয়ে যাওনা দিদি। আমি আজ মার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে দেখ্‌ব, পারি কিনা। আমি আজ যাব না।"

ভ্রাতা কালীপদকে অনেক রকম প্রলোভন দিয়াও তাহার মস্তকে একখানা গামছা জড়াইয়া সতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীর বাহির হইল। মা ডাকিয়া বলিলেন, "একখানা গামছা মাথায় দিলি না সতী"—রোদ্দুর লাগ্‌বে।" সতী সে কথায় মনোযোগ না করিয়া চলিয়া গেল।

বড়লোকের বাড়ী। প্রবেশ করিতেই যেন পা কাঁপিয়া যায়। আজ প্রায় দুই বৎসর কমলা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর সে এবাড়ী আসে নাই। তখনকার অপেক্ষা এখন বয়স বেশী হইয়াছে, সঙ্কোচও বাড়িয়াছে। ধনগর্ব্বিতারা সহজে কেহ কথা কহেন না অথচ চাহিয়াও দেখেন। সতী মনে মনে বলিল আর কোনদিন আসা হইবে না। কিন্তু কমলা যখন ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা ধরিল তখন সতীর বিরাগটুকু ভাসিয়া গেল। এই দুই বৎসরে কমলা আরও সুন্দর হইয়াছে, মোটা হইয়াছে, বস্ত্রে আভরণে সৌভাগ্যের দীপ্তি তাহার শরীরে ঝলমল্ করিতেছে। সতী কথা কহিল না কেবল মুগ্ধ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলাও প্রথমটা কথা কহিতে পারিল না, এ যেন সে সতী নয়। দারিদ্র্যের মধ্যেও সে গর্ব্বিত সুন্দর মুখখানি কে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া গড়াইয়াছে। মাথায় খানিকটা লম্বা হইয়াছে কিন্তু যেন একটু কৃশ। রুক্ষ একরাশি চুল তাহার ক্ষীণ সুকুমার সৌন্দর্য্যের ছায়ার ন্যায় তনুখানি বেড়িয়া রহিয়াছে। অধরে শান্ত হাসি কিন্তু উজ্জ্বল আয়তচক্ষু ম্লান বিষাদময়। কমলা তাহার গলা বেড়িয়া ধরিয়া বলিল "এত কঠিন হয়েছিস্ লো,—আজ ৩ দিন এসেছি মোটে ৮ দিনের কড়ারে। আমি

যদি যেতে পেতাম ত' এসেই ছুটে চলে যেতাম, ধন্তি প্রাণ।" সতী একটু হাসিল কমলা আবার বলিল "এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন ভাই?"

"রোগা কোথায়! আজ কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা?"

"প্রায় ছ বছর হ'তে চল্ল আর কি। এমন জায়গায়ও গিয়ে পড়েছি ভাই যে একদিন কোথাও যাবার জো নেই। এই কত সাধ্যসাধনা করে তবে এসেছি।" বলিয়া কমলা একটু হাসিল। হাসি দেখিয়া সতীও একটু হাসিল। বলিল "কার সাধ্য সাধনা করে আসতে পেলি? বাড়ীর লোকের?"

"কার আবার? শ্বশুর শাশুড়ী কি তাঁদের ছেলেদের ওপরে কথা কইতে পারেন? আমার 'যা' কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী যেতে পায় আমার ভাগ্যে কিন্তু তা হয় না। আমার যা-কে আমি বলি তাতে সে কত ঠাট্টা করে, বলে এখন নতুন কিনা এরপরে কিছু থাক্‌বে না, আমাদেরও নতুনে অমন ছিল লো। কি মানুষ ভাই! বাপের বাড়ীও আস্‌তে দেবে না।"

উভয়ের গল্প চলিতে লাগিল। কমলার সুখসৌভাগ্যের বর্ণনা শুনিয়া সতী সত্যই আনন্দিত হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাটা তাহার মনের মধ্যে এক একবার জাগিত, আর না জানি কমলা কেমন আছে ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বিবাহের সময়ে কমলার ম্লানমুখ ও বিরক্তিপূর্ণ ভাবে সতী মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রতি মনে বড় রাগ হইয়াছিল। এত দিনে সে আশঙ্কা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু ভারী একটা কৌতূহল মনের মধ্যে নড়িয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু অনুচিত ভাবিয়া সে ইচ্ছা সে সম্বরণ করিল। অনেক গল্পের পর কমলা বলিল, "নিজের কথাই কেবল বলে যাচ্ছি—তোর কথা কিছু বল।"

"আমার কি কথা?"

"বিয়ের কথা! আর কতদিন আইবুড় থাক্‌বি—বিয়ে হবে না?"

সতী একটু হাসিল। "হাস্‌লে হবে না—বল্‌না, বিয়ের কথা কিছু হচ্চে না?"

"আমি তার কি জানি।"

"কচি খুকী আর কি! বয়সের যে গাছ পাথর নেই।"

"তা কি কর্‌ব! বিয়ে কি অমনি বল্লেই হয় কমলা। বাপ মা আগে পাগল হয়ে উঠ্‌বেন, ঘর দুয়োর সব বিক্রী হবে, সবাই গাছ তলায় দাঁড়াবে তবেত' বিয়ে হবে।"

"আঃ কি বলিস্ তার ঠিক নেই! এত সুন্দর তুই, কতলোকে আদর করে নেবে!"

"তুই নিবি? নিস্‌ত বল"। বলিয়া সতী হাসিল, কিন্তু সে হাসি দেখিয়া কমলার চক্ষে জল আসিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "তাইত ভাই তবে উপায় কি হবে?"

"উপায় কিসের! এম্‌নি থাক্‌ব আর বাপ মার বুকের রক্ত জল কর্‌ব। যেমন আছি তেমনি থাক্‌তে যে আমার বেশী অসাধ তা ভাবিস্ না, কেবল ভাবি এত কষ্টের উপরও তাঁহাদের আবার একি গলগ্রহ।"

"উঠ্‌লি যে?"

"আর বস্‌ব না। পথে লোক হবে এই বেলা যাই ভাই।"

"কাল আবার আস্‌বি ?"

"কাল হয়ত হবেনা, তুই থাক্‌তে থাক্‌তে আর একদিন আস্‌ব।"

"একদিন আস্‌বি! এমন হয়েছিস্ সতী ? আমি কতক্ষণে তোর দেখা পাব ভাবছি আর তুই সচ্ছন্দে বল্‌ছিস্ একদিন আস্‌ব! বেশ ভাই, খুব যাহোক।"

হাসিয়া ভাইটীকে কোলে লইয়া সতী বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া দেখে মহামারী ব্যাপার। অতবড় চোদ্দ বছরের ধাড়ী মেয়েকে বড় লোকের বাড়ী যেতে দিতে লজ্জা করে নাই, এই বলিয়া জ্যেঠাই মা লজ্জায় ঘৃণায় কণ্ঠের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া দিয়াছেন। "আজ আসুক ঠাকুর পো, এর প্রতিকার করে তবে জলগ্রহণ কর্‌ব।"

রাত্রি আটটার পরে রামশঙ্কর বাটী আসিলেন। সাবিত্রী গিয়া তাঁহার পা ধুইবার জল দিল, হাত মুখ মুছিতে গামছা দিল, এবং শেষে একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। জাহ্নবী অন্নব্যঞ্জন বাড়িয়া দিলে, রামশঙ্কর ভোজনে বসিলেন। সতী কালীপদকে এতক্ষণ ঘুম পাড়াইতে যত্ন করিতেছিল এক্ষণে ত্যক্ত হইয়া তাহাকে শয্যার উপরে ফেলিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বসিল। কালীপদ উচ্চ চীৎকার করিল। সতী সাবিত্রীকে বলিল "তুই যা আমি বাবাকে বাতাস করি!" সাবিত্রী তখন ভ্রাতাকে ক্রোড়ে করিয়া চাঁদ দেখাইতে দেখাইতে বাহু দোলাইতে দোলাইতে মৃদুস্বরে ছড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। বালকও দিদির সঙ্গে সঙ্গে আধ আধ যোগ দিতে দিতে ঢুলিতে লাগিল।

জাহ্নবী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতেছিলেন। একবার দীপালোকিত সতীর মুখে দৃষ্টি পড়িল। বাহিরে প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে দরিদ্রের জীর্ণ অঙ্গনে অর্দ্ধস্ফুট কমল কলিকাটির প্রতি দৃষ্টি করিলেন, অজ্ঞাতে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটা নিশ্বাস বহির্গত হইল। সতী শুনিতে পাইয়া একবার মার প্রতি চাহিল।

জ্যেঠাইমা এতক্ষণ নাক ডাকাইয়া দিব্য ঘুমাইতেছিলেন, যথা সময়ে তাঁহার কুক্কুর স্বভাবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গম্ভীর গুরুপদক্ষেপে রন্ধন গৃহের পীঁড়ায় উঠিলেন, সকলে প্রমাদ গণিল। ধীরে ধীরে গিয়া একখানা পীঁড়া পাতিয়া রামশঙ্করের সম্মুখে বসিলেন। রামশঙ্কর মুখ তুলিয়া একবার দেখিয়া পুনশ্চ আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। তখন জ্যেঠাইমার ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইল। কাংস্যকণ্ঠে বাজিয়া উঠিল—

"বলি গিলে ত যাচ্ছ; এদিকে চোদ্দবছরের যার বছরের করে দুই মেয়ে যে গলায় আড় হয়ে লাগ্‌ল তা কি টের পাচ্ছনা ? "হুঁস পবন" কি নেই! চক্ষু কি গিয়েছে ?"

রামশঙ্কর বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তা কি কর্‌ব টাকা না হ'লে মেয়ে কি করে পার কর্‌ব !"

"কেন বাপ হ'তে পেরেছিলে ? মেয়ে দুটো মনমরা হয়ে বেড়ায়, বাছাদের মুখেরদিকে চাইবার কেউ নেই গো। একি কসাই বাপ মা গো! একবার ভাবেনা, সচ্ছন্দে মুখে ভাত তোলে।" জাহ্নবী মৃদুস্বরে বলিলেন

"দিদি এখন ওসব কথা কেন তুলছ, ওকথাত' আছেই, এখন"—এইবার কণ্ঠ গগন ভেদ করিল,—"ঐজন্যেই এসংসারে এক তিল থাকৃতে ইচ্ছে করে না! মরুক গে, আমার এত কি জ্বালা! আমি কেন মরি,যখন বাপ মা নিশ্চিন্ত তখন আমি কোন "হিদের কুটুম বিদে!" আমার কেন এত ঝক্কি। আমারত' জাত যাবেনা গালে চুণ কালি পড়্‌বে না শত্তুর হাস্‌বেনা!" রামশঙ্কর অন্ন ছাড়িয়া উঠিতে গেলেন। সতী দুই হাতে পিতার পা চাপিয়া ধরিল "বাবা বাবা উঠোনা, খাও।" রামশঙ্কর সরোষে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন "হয় তোরা মর্ নয় আমি"—বলিতে বলিতে তাঁহার হাঁপানি উঠিয়া পড়িল, কাসিতে কাসিতে তিনি প্রায় শুইয়া পড়িলেন, জাহ্নবী ত্রস্তে আসিয়া স্বামীকে ধরিলেন, বুক পিঠ ডলিয়া দিতে লাগিলেন, সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ত্রীর বহু অনুনয়ে রামশঙ্কর আহার শেষ করিলেন। জাহ্নবী স্বামীকে পান তামাকু দিতে গেলেন; সতী তখন ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। স্বামীকে সুস্থ করিয়া জাহ্নবী আসিয়া দেখিলেন পাতের কাছে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সাবিত্রী পাখা দ্বারা বিড়াল তাড়াইতেছে। জাহ্নবী বলিলেন "সতী কই?"

"দিদি শুতে গিয়েছে, তুমি ভাত দাও আমি ডেকে আনি।"

সাবিত্রী গিয়া শয়ানা সতীকে ডাকিল "দিদি খেতে এস।" দিদি উত্তর দিল না।

"দিদি খেতে এস, মা বসে আছেন, ওঠো।" দিদি উঠিলনা।

"ওঠো দিদি তোমার পায়ে পড়ি। বাবার কথায় কি রাগ কত্তে আছে—উনি কত কষ্টে অমন করে বলেন তা'ত' আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ। ওঠো দিদি।"

সতী মুখের কাপড় খুলিয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল "তুই যা আমি আজ খাবনা, ক্ষিদে নেই। তোরা খা গে।"

"আমি তাহ'লে আজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। ওঠো দিদি চল।"

"সাবিত্রী লক্ষ্মী আমার! কথা শোন, তুমি গিয়ে খাও গে, আমার অসুখ করেছে।"

"সে কথা আমি শুনবনা, অন্তত দুটীও তোমায় মুখে দিতে হবে।"

জাহ্নবী আসিয়া সতীর হস্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। স্থির কণ্ঠে বলিলেন "তোরা শুদ্ধ যদি এমন অবুঝ হোস্ তাহ'লে আমার মরণই ভাল। খেতে চল্"।

তখন সকলে নীরবে গিয়া আহার কার্য্য সমাধা করিল।

প্রভাতে রামশঙ্কর কয়েক ছিলিম তামাকু টানিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "পাত্র পাত্র খুঁজতে ত' আজ থেকেই আরম্ভ করলেম, কিন্তু সঙ্গতির মধ্যে ত' বাড়ীখানি। যেমন তেমন পাত্রে দিতেও অন্ততঃ চার পাঁচশ টাকার দরকার। বাড়ীখানা বিক্রী বা বন্ধক ছাড়া আর গতি নেই। বাবুদের কাছে যদি বাড়ী খানা বন্ধক দিতে পারা যায় তো চেষ্টা দেখি।" জাহ্নবী বলিলেন "আগে পাত্রের খোঁজ কর তবে টাকার কথা।" রাম শঙ্কর বলিলেন "তুমি তাই বলছ আমি জানি আগে টাকার খোঁজেরই দরকার। যেমন টাকা জোটাতে পারবে তেমনি পাত্রও

পাব। মেয়ের দায়ে ভিটেটুকুও এইবার যাবে।" জাহ্নবী একবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ ক'রিয়া দেখিলেন সতী ঘুমাইতেছে। সে একথা শুনিতে পায় নাই দেখিয়া একটু শান্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর 'সাবিত্রী' ব্রত উদ্‌যাপনের মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীতে বড় বড় জোল কাটিয়া রান্না বান্না হইতেছে, ময়রারা সন্দেশ আনিয়া মহা সোরগোলের সহিত ওজন করিতেছে, গোয়ালারা বাঁকে বাঁকে দই ক্ষীর আনিয়া দালান ভরিয়া ফেলিতেছে; প্রতিবাসীরা বড় বড় কাঠের কেঠো লইয়া ভীম পরাক্রমে ময়দা মাখিতেছে, সুদর্শন চক্রের ন্যায় ঝাঁঝ্‌রা হাতাধারী ব্রাহ্মণ কুল-তিলক রাবণের ভোজের উপযুক্ত কড়ায় লুচি ভাজিতেছে—গন্ধে দিক্‌মণ্ডল পুলকিত। ভাঁড় কটরা ও পাতে উঠান প'রিপূর্ণ; নিস্তব্ধ বাটী খানি আজ পাড়া মাথায় করিয়া তুলি-য়াছে। বিশেশ্বরও নিতান্ত ব্যস্তভাবে মাসিমাতা যখন যা ফরমাইস করিতেছেন তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। অন্নপূর্ণাঠাকুরাণী ব্রত সমাপনান্তে ললাটে যজ্ঞ চিহ্ন তিলক ধারণ করিয়া পট্টবস্ত্রে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবীর ন্যায় কোথায় কিসের অভাব হইতেছে তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত। ক্রমে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল, অন্নপূর্ণার হস্তে তাম্বুল যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্নপূর্ণা স্নেহসজল চক্ষে বিশ্বে-শ্বরকে সেইখানে প্রণত করাইয়া বলিলেন, "ইঁহাকেই সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বহু সমাদরের সহিত সধবাদিগের ভোজন সমাপ্ত হইল। জাহ্নবী সতী ও সাবিত্রীকে লইয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার মুগ্ধ চক্ষু পুনঃ পুনঃ সতীর উপরে নিপতিত হইতেছিল। যখন তাম্বুল ও দক্ষিণা বস্ত্রাদি গ্রহণান্তে সধবারা বিদায় লইতে লাগিলেন তখন অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে মৃদুস্বরে বলিলেন "বৌ একটু ব'সে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও, দুটো কথা আছে।" জাহ্নবী অগত্যা বসিলেন।

গোলযোগ কিছু মিটাইয়া অন্নপূর্ণা আসিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া নিকটে বসিলেন। বলিলেন "বৌ তোমার বড় মেয়েটির বয়স কত হোল? জাহ্নবী ম্লান মুখে বলিলেন "তের চোদ্দ হ'ল বই কি দিদি।"

"বিয়ের কথা কোথাও হচ্চে?"

"চেষ্টা দেখছেন, এখনও ত কোথায় হয়নি।"

"এমন সুন্দর মেয়ে লোকের এত দিনে লুফে নেবার কথা, এত দেরী হচ্চে কেন?" জাহ্নবী নীরবে রহিলেন। "আমি যদি বিশুর এমনি একটি বউ পাই।" সতী নত মস্তকে বসিয়া ধীরে ধীরে ঘামিয়া উঠিতেছিল। জাহ্নবী ক্ষীণস্বরে বলিলেন "বিশুর কনের অভাব কি দিদি! এর চেয়েও কত ভাল ভাল মেয়ে পাবে।"

"তোমার মেয়ে দুটির বড় গুণও শুনতে পাই; বড় হওয়ার পর থেকে ওদের একদিনও আর দেখিনি। তা দেখ বউ আমি একেবারেই কথাটা ফেলছি! তোমার বড় মেয়েটিকে আমায় দাও।"

জাহ্নবী কিছুক্ষণ যেন বাক্‌শূন্যা হইয়া

রহিলেন। অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "দিদি আমার মেয়ের কি এত ভাগ্যি হ'তে পারে যে—"

"ওসব কথা রাখ। এমন মেয়ের ভাগ্যি হবেনা ত' কার হবে! মা আমার সাক্ষাৎ রাজলক্ষী। বড় ঘেমেছ মা, এস একটু বাতাস দি।" অন্নপূর্ণা আঁচল দিয়া সতীকে বাতাস দিতে লাগিলেন এবং সতী দ্বিগুণ ঘামিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহার কাছে একটু ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল এবং হাসি-ভরা মুখে তাহার দিদির পানে এক একবার চাহিতে লাগিল। জাহ্নবী বলিলেন "রাত হল দিদি, তবে উঠি।'

"আমার কথার উত্তর কি দিচ্ছ? সতীকে আমায় দেবে না?"

"দিদি সতী যদি তোমার পায়ে স্থান পায় তো সতীর পরম ভাগ্য। সতী তোমারই এতে আর আমাদের কি কথা থাকৃতে পারে দিদি। তবে বিশুর মত হবে ত?"

"সতীকেও যদি তার পসন্দ না হয় তো জানব বিয়ে তার অদৃষ্টে নেই। কিন্তু শোন বৌ, একথা এখন বাইরে বেশী না ছোটে যেন। যে ছেলে, অন্যের মুখে শুন্‌লে হয়ত কিছু একটা করে বস্‌বে, আমি ক্রমে ক্রমে সব ঠিক করব। কিন্তু কোন আশঙ্কা করনা তোমার মেয়েকে পসন্দ হবেনা এমন ছেলে হতেই পারেনা। মাস দুই একটু সবুর কর, আমি কথা দিয়ে রাখ্‌লাম।"

বাটী আসিয়া জাহ্নবী স্বামী চরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভট্টাচার্য্য শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। স্ফূর্ত্তিতে তিনি ধরাকে সরাজ্ঞান করিলেন। "তবে আর ভাবনা কিসের, বিশেশ্বর যে ছেলে, ও কখন টাকা চাইবেনা, বাড়ী খানা বেঁচে যাবে। যা খরচ হবে তা এখন কারও কাছে হাওলাত করে নিলেই হবে—কি বল? ক্রমশঃ শোধ দেওয়া যাবে" ইত্যাদি। জাহ্নবী একবার বলিলেন "এখনি অত আনন্দ করনা, যদি ভবিতব্য থাকে ত হবে, কিছুত' বলা যায় না।"

"না না ওরা এক কথায় মানুষ, আর বিশু অতি ভাল ছেলে! আর আমার মেয়ের রূপও নিতান্ত কম নয়! গ্রামের মধ্যে আর কার মেয়ে ও রকম আছে বল দেখি?" ইত্যাদি। কন্যার রূপের গর্ব্বে তিনি সহসা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। জাহ্নবী নীরবেই রহিলেন; এ অতর্কিত অসম্ভাবিত উচ্চ আশা তাঁহার অন্তঃকরণ যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

দুই চারি দিন পরে অন্নপূর্ণা একদিন সতী ও সাবিত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সতীর যাইতে অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু না গেলেও নয়। অন্নপূর্ণা দুই জনকে অতি আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দুইজনকে নিকটে বসাইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে শুক বস্ত্র পরিধান করিয়া শুভ্র উপবীত গাছটি মার্জ্জনা করিতে করিতে বিশেশ্বর ভোজনার্থ মাসিমাতার নিকটে আসিল। তাহাদের দেখিয়া একবার পিছাইয়া আবার কি ভাবিয়া একবারে মাসিমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল "মেয়ে দুটী কাদের মাসিমা?" মাসিমা সকৌতুকে বলিলেন, "বল দেখি কাদের?" বিশেশ্বর চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সতী ত' লজ্জায় অধোমুখী। সাবিত্রীরও একটু লজ্জা

করিতেছিল কেননা মাসিমার ইচ্ছা সে জানিত। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া বলিল "এটি ত সতী, না মাসিমা? আর উটি?"

"সতীর বোন, সাবিত্রী। বল দেখি বিশু কেমন মেয়ে দুটি?"

"বেশ! তুমি বুঝি নিমন্ত্রণ করে এনেছ মাসিমা? আজ কি ব্রত?"

"ব্রত না হলে বুঝি আপনাদের লোককে খাওয়ায় না? তুই এদের সঙ্গে গল্প কর আমি ভাত বাড়িগে।" মাসিমা চলিয়া গেলেন, বিশ্বেশ্বর একটা জানালার উপরে উপবেশন করিয়া বলিল "সতি তোমার ছোট ভাইটির নাম কি? তাকে আননি কেন?" সতী লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, তাহার আগণ্ড স্কন্ধ লোহিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল, কপাল বাহিয়া ঘর্ম্ম বারি ঝরিয়া পড়িতেছিল। দিদির বিপদ দেখিয়া সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল "তার নাম কালীপদ, সে ঘুমিয়েছে।"

তোমার নাম বুঝি সাবিত্রী? "হ্যাঁ"।

"তোমাকে আমি খুব ছোট বেলায় দেখেছি, তাতেই চিন্‌তে পারি নি। সতীকে আমি অনেক বার দেখেছি। সতী! তুমি পড়্‌তে পার? কি কি বই পড়েছ? রামায়ণ মহাভারত পড়েছ?" সতী তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। বিশ্বেশ্বর তাহার এত বেশী লজ্জা দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সাবিত্রী সতীর হইয়া উত্তর দিল "দিদি রামায়ণ মহাভারত পড়েছে।" "তুমিও পড়েছ ত?" সাবিত্রী মস্তকটা একটু নত করিল।

আহারাদির পরে তাহারা বাটী চলিয়া গেলে মাসিমা বলিলেন "দুটী মেয়ের মধ্যে কোনটি বেশী সুন্দর বল দেখি?

"বেশী সুন্দর?" বিশ্বেশ্বর একটু বিস্মিত হইয়া বলিল "দুটি-ই ভাল, কে বেশী কে কম আমি অত দেখিনি। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন মাসিমা?"

"তোর একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে কি না পর্‌খ কর্‌তে। সতী মেয়েটির পানে হ'তে চোখ যেন নামাতে ইচ্ছে করে না।

"সত্যি নাকি? তা হবে। মেয়ে দুটি খুব ভাল বটে। ওদের সংসারের আর কোন কষ্ট নেই নয় মাসিমা!"

"না কষ্ট কিসের! তবে মেয়েটি বড় হওয়ায় ভারী ভাবনায় পড়ে গিয়েছে।"

"কেন কেন? ভাবনা কিসের?"

"বিয়ে না দিতে পারলে ভাবনা নয়? টাকা নাই, ভাল পাত্র পাচ্চে না, অমন সুন্দর মেয়ে।" বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া বলিল "তা তুমি টাকা ধার দেওনা কেন মাসিমা আহা বেচারীরা।" মাসীমা রাগ করিয়া বলিলেন "আমারত টাকা ধর্‌ছে না, ভারি উপদেশ দিতে এলে! টাকা হ'লেই ভাল ছেলে মেলে কি না। অমন মেয়ের যুগ্যি ছেলে অমনি সহজে মিল্‌তে পারে?"

"তা সত্যি মাসিমা! আমি তাহ'লে একটু খোঁজে থাক্‌ব কেমন? যদি ভাল ছেলে পাই। তুমি কিন্তু টাকা দেবেত! মাসিমার আর সহ্য হইল না, বলিলেন "যা তোর সঙ্গে আর আমি বকৃতে পারি না, এমনও ছেলে।" ছেলে মাসিমার এ রাগের অর্থ না বুঝিয়া অম্লান প্রফুল্লমুখে আপনার পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিল।

মাসাবধি কাটিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর এক দিন কার্য্যগতিকে ভট্‌চায বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছে; দেখিল শুভ্রসুন্দর নগ্নকায় কালীপদ একটা গোবৎস ধরিয়া খেলা করিতে করিতে এতই উন্মত্ত যে গাভী তাহাকে মারিতে আসিতেছে, তাহা তাহার হুঁস নাই। বিশ্বেশ্বর এক লম্ফে গিয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, গাভী বৎসকে মুক্ত দেখিয়া বালককে ত্যাগ করিয়া বৎসের প্রতি ধাবমান হইল। বিশ্বেশ্বর বালককে আদর করিয়া অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি খোকা?" খোকা গম্ভীরমুখে বলিল "কোকা নয় আমি কালীপদ"। "কালীপদ এখনি যে তোমায় গরুতে শুঁতুত।"

"ইস্! আমি গরুকে এক লাঠি বসিয়ে দিতাম।"

তখন কিন্তু বালক কাঁপিতেছিল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট হইতে কে ডাকিল "কালী!" বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া দেখিল সতী। সতীও থমকিয়া দাঁড়াইল, বিশ্বেশ্বর তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "এখনি একে গরুতে মারত, ছেলেদের একটু সাবধানে রাখ্‌তে হয়।" সতী কথা কহিল না, বিশ্বেশ্বর তাহার ক্রোড়ে বালককে দিতে গেলে সতী একটু পিছাইয়া গেল, পাছে কেহ দেখে বলিয়া সে বিব্রত। কালীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল "ওকে কোলে নাও, এখনও ভয়ে কাঁপ্‌ছে।" সতী ভ্রাতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল কিন্তু লজ্জায় সেও কাঁপিতেছিল, বিশ্বেশ্বর বলিল, "তোমরা আর মাসিমার কাছে যাও না?" উত্তর না দিয়া সতী বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বেশ্বর একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এরূপ স্থলে একটা কথা কওয়া উচিত, নহিলে নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত দেখায়। লজ্জার মাত্রা এত বেশী হওয়াটা মোটেই শোভন নহে।

দুই মাস অতিবাহিত হইল তখন মাসিমা দেখিলেন তাঁহার মূর্খ ছেলেটিকে স্পষ্ট বলার প্রয়োজন, নহিলে সে বুঝিবে না বা বুঝিতে চাহিবে না। একদিন অসময়ে পুত্রকে ডাকিয়া বিনাড়ম্বরে বলিলেন "তোমার বিয়ের আমি সব স্থির করেছি, আস্‌ছে মাসে সতীর সঙ্গে তোমার বিয়ে।"

বিশ্বেশ্বর এইবার একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের প্রথম ধাকা কাটিয়া গেলে বলিল,"সেকি মাসিমা! সতিরা যে আমাদের সম্পর্কে কি হয়।"

"কি আবার হয়, স্বজাতি, একটু দূর সম্পর্কের কুটুম্ব, তাতে বিয়ে আটকায় না।"

"আটকায় বৈকি। আরে ছিঃ ছিঃ ওদের ভাই হরি আমায় দাদা বলে ডাকে; ওরাও হয়ত কত দিন বিশুদাদা বলে ডেকেছে। ছিছি মাসিমা।"

"তবে তুই কি বিয়ে করবিনে? বিয়ে করলে অমন মেয়ে আর কোথায় পাবি।"

"তা নিশ্চয় পাওয়া যাবে মাসিমা, যদি তাই হয় তখন তোমাকে কুৎসিত মেয়ে না এনে দিলেই ত হোল! এখন তুমি আমার বিয়ের কথা বলোনা মাসিমা।"

"আর কবে বিয়ে কর্‌বি শুনি! ২৪ বৎসর পার হ'তে চল্‌লি, নিতান্ত কি ছেলেমানুষ আছিস্ যে এখনও ছেলেমো করবি। আমি এই শেষ বলছি শোন, আমি কথা দিয়েছি,

দু মাস তারা আশা করে বসে আছে। এখন যদি আমার এ রকম অপমান করিস্‌ ত আমি আর তোর সংসারে থাকব না।" বিশ্বেশ্বর কাতর হইয়া পড়িল। "মাসিমা এতদিন আমার মাপ করেছ ত অন্ততঃ আরও বছর খানেক মাপ কর তোমার পায়ে পড়ি মাসিমা! আমি মনটা বেশ করে দুরস্ত করে নিই।"

"আচ্ছা মন কি দুরস্ত করবি বল্‌ত? বিয়ে কি কেউ করে না?"

"করবে না কেন? কিন্তু আমি ত এর পূর্ব্বে আর করিনি। কাজেই ভয় পেয়ে যাচ্চি মাসিমা। আমি মনকে অনেকদিন সাহস দিয়ে রেখেছি তাকে আমি স্বাধীন রাখব। কিন্তু তুমি এমন করে বল্‌লে সে আশা আমায় বিসর্জ্জন দিতেই হবে। তবে একটু সময় দাও অমন করে বেঁধে মেরনা মাসিমা।"

মাসিমা হতাশচিত্তে বলিলেন "তারা এক বছর কিছু মেয়ে রাখতে পারবে না। আমি তাদের কাছে আর মুখ দেখাব না বিশু। আমায় মজুতপুর তাহলে ছাড়তে হবে।"

"তুমি ছাড়লে আমিও ছাড়্‌ব মাসীমা। দ্যাখ আমার চেয়ে অনেক ভাল পাত্র আমি তাদের করে দেব, তাতে যত টাকা লাগে দেওয়া যাবে; তারা তাহ'লে কিছু মনে কর্‌বে না।"

"যা জানিস্‌ কর্‌ বিশু! কিন্তু এমন মেয়ে তুই পায়ে ঠেল্‌লি তোকে শেষে পস্তাতে হবে।" মাসিমা নিরাশচিত্তে থামিলেন, কিন্তু মনে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন, বিশ্বেশ্বর তাহা বুঝিয়াও কিছুতে মন ফিরাইতে পারিল না। বিবাহ না করাই যেন তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল এখন নিজেকে কিছুতেই বিবাহের বেশে সাজাইতে পারিল না। সতীকে কি মতলবে মাসিমা আনিতেন, এখন সে বুঝিতে পারিল। সে না বুঝিয়া নির্লজ্জের মত ব্যবহার করায় সতীর আরক্তলজ্জার স্মৃতি আজ মনে পড়িতেই সে সবেগে বলিয়া উঠিল "ছিঃ ছিঃ! না সে কোনমতেই হবে না।"

পরদিন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকটে গিয়া বহু আত্মীয়তা জ্ঞাপনান্তে বিশ্বেশ্বর বলিল "সে একটি উত্তম পাত্র স্থির করিতেছে এবং ভগিনীর বিবাহে ভ্রাতার যেমন অধিকার সেই অধিকারে সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়।" রামশঙ্কর ক্রোধে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার আত্মসম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তাঁহার কন্যা কি এতই হেয়? গর্ব্বিত বচনে বলিলেন "বাপু, তোমার কাছে অত্যন্ত ঋণী আছি, আর বোঝা বাড়াইব না; আমার কন্যার ভার আমিই বহন কর্‌তে পারব তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" বিশ্বেশ্বর অনেক সাধ্য সাধনা করিল, ব্রাহ্মণ অটল। অগত্যা বিশ্বেশ্বর বিষণ্ণবদনে মাসিমাতাকে সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি দুঃখে লজ্জায় অভিমানে বলিলেন "আমি কিছুদিন গিয়ে কাশী বাস কর্‌ব, এখন এদের মুখ দেখাতে পারব না। তুমি ব্যবস্থা কর।" বিশ্বেশ্বর নীরবে সমস্ত উদ্যোগ করিল। মাসিমা কাশী যাত্রা করিলেন। কথা ছিল বিশ্বেশ্বর পথ হইতে ফিরিবে কিন্তু সেও ট্রেনে উঠিয়া বসিল। মাসী বলিলেন "তুমি কোথা যাবে।"

"যেখানে তুমি যাবে? আমায় আবার মা হারা করবে মাসিমা!" মাসী আর কিছু না বলিয়া তাহার মস্তকটা ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

(ক্রমশ)

পার্ব্বত্য প্রদেশে নারীর প্রভাব।

প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা করিলে পূর্ব্বপ্রান্তে নারীর প্রভাব সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে ভারতের স্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রীহট্ট জেলার

খাসিয়ার রমণী।

উত্তরপূর্ব্বপ্রান্তে মণিপুর, এবং বরবক্র নদী হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য ভূভাগ এক সময়ে নারীর গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। পাণ্ডব সংস্রব ও পীঠস্থান

প্রতিষ্ঠা অনার্য্যদেশে আর্য্যত্ব বিকাশের সূচনা ও প্রথম উদ্যোগ বলিয়া যদি ধরা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ পুরুষ প্রধান প্রবল স্রোতের সম্মুখে নারী আপনার

খৃষ্টান খাসিয়া রমণী।

মহীয়সী মূর্ত্তি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িতেন। নাগকন্যা উলুপী, কচ্ছ প্রদেশবাসিনী হিড়িম্বা, ও মণিপুর-রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা ভীমার্জ্জুনরূপী আর্য্য সভ্যতাকে অঞ্চল প্রান্তে আশ্রয় দিয়া নারীত্বের মহিমায় আপনাদিগকে খর্ব্ব করিয়াছেন। নাগা, কাছাড়ী ও মণিপুরী জাতির

ভিতরে বাস্তব জীবনে যদিও নারীর স্থান বাঙ্গালী রমণীর বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, তবুও মনে হয় পাণ্ডবসংস্রববিহীন পীঠস্থান পরিশূন্য অনার্য্য পরিপূর্ণ দেশের মহিলাবৃন্দের সম্মুখে ইহাঁরাও কৃপার পাত্র।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে একটী কথা আছে,

"পাণ্ পানি নারী।
তিনই জৈন্তা পুরী॥"

খাসিয়া পাহাড়ে উৎপন্ন খাসিয়া পাণ্ তীব্র ঝাল রসে পরিপূর্ণ কিন্তু গুণগ্রাহী জাতির (?) ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বাংলা পাণ্ অপেক্ষা তবুও যেন তাহার অধিকতর সার্থক জন্ম!! বাঙ্গালী সমাজে ভোজনান্তে পাণ্ গ্রহণ একটা উপসর্গ মাত্র, কিন্তু খাসিয়াদিগের ভিতরে অব্যাহত গতিতে পাণ্ চর্ব্বন মানবজীবনের সার সুখ। পিতামাতার মৃত্যু হইলে তাহারা বলে যে, "তিনি ভগবানের গৃহে বসিয়া পাণ্ খাইতেছেন! আর পরিব্রাজকেরা বলিয়া থাকেন, খাসিয়া পাহাড়ের জলের মত স্বচ্ছ-সলিল আর কোথাও নাই। সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশীয় জনৈক পরিব্রাজকও এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই পাণ্ ও 'পানি'র মহিমা তাহাদের নারীর মহিমার নিকটে অতি তুচ্ছ।

কিংবদন্তী আছে যে, পঞ্চপাণ্ডব যখন এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন জয়ন্তিয়া পাহাড় প্রভৃতি "নারীদেশ" নামে অভিহিত ছিল। তথাকার সৈন্য, সেনাপতি ও সম্রাট সকলেই নারী ছিলেন। কলির অধিকারভুক্ত মনে করিয়া পাণ্ডবেরা এই দেশে প্রবেশ করেন নাই। এই নারীপ্রদেশ এক সময়ে নীলাচলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তত্রত্য কামাখ্যা মন্দিরের কুমারী-প্রাধান্য আর্য্যধর্ম্মের উপরে এই মহীয়সী নারীজাতির স্বাধিকার লাভের প্রয়াসফল নহে কি? কালক্রমে সিদ্ধেশ্বর, রূপেশ্বর, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি হিন্দু-তীর্থের প্রভাবে, বিশ্বকর্ম্মার পূজাপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ের পূর্ব্বভাগে নারীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া আসে। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে আজও পর্য্যন্ত সমাজে নারীর যে শ্রেষ্ঠ অধিকার রহিয়াছে তাহা বিলাতের ভোটপ্রার্থী নারীগণেরও কল্পনাতীত।

হিন্দুগণ ব্রহ্মাকে লোকপিতামহ ও মনুকে মানবজাতির আদিপুরুষ ভাবিয়া পুরুষ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। খাসিয়ারা 'কা আই বাই, নামক নারীকে লোকমাতামহীর স্থানে স্থাপন করিয়া নারীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকাংশ খাসিয়া দলপতিরা রমণীর নামে গোত্র পরিচয় দিয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে নারীর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা মেজার গার্ডেন প্রণীত "The Khasis" নামক পুস্তক হইতে কয়েকটী প্রাচীন খাসিয়া কাহিনীর উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে 'কা ইউ শিবাই'এর নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি মিয়েংকো সম্প্রদায়ের লোকমাতা। কথিত আছে যে, এই নারীর পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে জয়ন্তিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পরে রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইলে তাঁহারা কপিলী নদীর পরপারে চলিয়া যান। কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে জ্ঞাতি-কুটুম্বহীনা এই রমণী নানা বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে নংক্রোম গ্রামে

আসিয়া গ্রাম পত্তন করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রত্যেক মজুরকে কুড়িকড়া করিয়া দৈনিক পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন বলিয়া শি-বাই উপাধি প্রাপ্ত হন; এই

খাসিয়া কুটীর।

নারী সর্ব্ব প্রথমে খাসিয়াদিগকে খনিজ পদার্থ হইতে লৌহ নিষ্কাশন ও লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দিয়া খাসিয়া পাহাড়ে লৌহের কারখানা বসাইয়া ছিলেন।

এস্কাইলাস, ইউরিপিডিস্ প্রভৃতি গ্রীক-মনস্বীগণের রচনায় অনুপ্রাণিত ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার Samson agonistes গ্রন্থে দেলিলার চিত্রে নারীত্বকে পশুত্বের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু খাসিয়া সমাজে দেলিলার অনুরূপ আর একটী নারীর নাম কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয় তাহা উল্লেখ যোগ্য। উপাখ্যানটী এইরূপ :—"মলিনিয়াং পরিবারের কিলং রাজা খুব সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সমস্ত সিন্থেং ও শিলং প্রদেশ জয় করিয়া আপন ক্ষুদ্র রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে সক্ষম করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যাইবার সময় সৈন্যসামন্তের তাঁহার বড় একটা প্রয়োজন হইত না। যুদ্ধে তিনি অনেকবার পরাস্ত ও নিহত হইতেন; কিন্তু পর দিবসেই আবার জীবন লাভ করিয়া শত্রুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার হস্তপদ কর্ত্তন করিয়া গিরি গহ্বরে ফেলিয়া দিলেও দৈব-শক্তিতে তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইত। সিন্থেং রাজা এ হেন শত্রুকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিয়া ভয়বিহ্বলিত হইয়া পড়েন। পরে একজন রূপসী নারী কিলং রাজার উপর প্রেমের অধিকার স্থাপন করিয়া, অশ্রুসেকে রাজহৃদয় দ্রবীভূত করিয়া সন্ধান পাইলেন যে কিলং রাজার প্রাণশক্তি তদীয় অন্ত্রের ভিতরে নিহিত ছিল। রাজা প্রত্যহ স্নান করিতেন, এবং অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া ধুইয়া আবার উদরে পুরিয়া রাখিতেন। নিত্যস্নায়ী হইয়া তিনি যতদিন অন্ত্রধৌত করিবেন, ততদিন তাঁহার মৃত্যু নাই! সিন্থেংরাজ এই গূঢ় তথ্য অবগত হইয়া আর একদিন স্নানের সময় কিলং রাজাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার অন্ত্রগুলি সংগ্রহ করতঃ চিরদিনের জন্য তাঁহাকে হত্যা করেন।" কিলং রাজার অন্ত্রের ন্যায় হিব্রু স্যামসনের কেশে সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল। দেলিলা আপন স্বামীকে বিপদগ্রস্ত করিয়া কবির লেখনী মুখে "Hyena" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।—পরন্তু খাসিয়া রমণী দেশের শত্রুকে নিপাত করিতে গিয়া আপনার রূপ, যৌবন ও সতীর সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিতা হন নাই—এই বলিয়া লোকমুখে আজিও তাঁহার গুণগান চলিতেছে। দেলিলা স্বামীহন্ত্রী রমণী, কিন্তু কিলংরাজহন্ত্রী খাসিয়া নারী দেশোদ্ধারিণী!! নারীর শক্তিতে সম্পন্ন এই দেশোদ্ধার ব্যাপারকে মিল্‌টন হইতে খাসিয়ারা কিরূপ ভিন্ন চক্ষে দেখিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

কা-লিকাই আর একজন নারী, তিনি আপন সন্তানের শোকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। আজিও তাঁহার পতন স্থানে "নো-কি-লিকাই" নামক জলপ্রপাত মাতৃহৃদয়ের সেই শোকগাথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া গিরিগহ্বরে মিশিয়া যাইতেছে।

এইরূপ নারী জাতির উপাখ্যানের সহিত খাসিয়াদিগের মাতৃস্নেহ, দেশপ্রেম, নগরপত্তন, শিল্পচর্চ্চা, অন্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি জাতীয় সাধনার প্রথম ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে। এই জাতির ভিতরে নারীর বর্ত্তমান অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যজাতি যেরূপ পিতৃশাসিত সাধনায় বলীয়ান্ হইয়াছে, এই পার্ব্বত্য অনার্য্যজাতি সেইরূপ মাতৃ-শাসিত সাধনায় আপন সমাজ আজিও

পরিপুষ্ট করিয়া চলিতেছে। খাসিয়া জাতিরা হিন্দুধর্ম্মের গৌরবোজ্জ্বল আলোক সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিজ খাসিয়া পাহাড়ে এক মহাদেবের মন্দির ভিন্ন হিন্দুর বিশেষ

খাসিয়া "মনোলিথ" (জাত পাহাড়ের গ্রাম)

কোন দেবস্থান নাই। আধুনিক যুগে একজন শ্রীহট্টবাসী বৈষ্ণবের চেষ্টায় কয়েক বৎসরের জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল বটে, তবে তাহার স্থায়ী ফল

সমাজের উপর প্রতিফলিত হয় নাই। এই সকল কারণে নারীর প্রভুত্ব খাসিয়া পাহাড়ে অনেকটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

পিতৃগৃহেই খাসিয়া কন্যার বিবাহ হয়। স্ত্রী কখনও স্বামীর গৃহে গমন করে না। পিতা সন্তানের জন্মদাতা ও অন্নদাতা, কিন্তু মাতুল স্বয়ং ত্রাণকর্তা, জীবন মরণের প্রশ্ন উঠিলে মাতুলই একমাত্র আশ্রয়। মাতামহীই গৃহের কর্ত্রী। নারী এক সময়ে একাধিক বিবাহ করিতে পারেন না, কারণ দেবতার আশীর্ব্বাদ ও কুলপবিত্রতা রক্ষা করা নারীর একান্ত কর্ত্তব্য। তবে স্বামীর সহিত বিবাহবন্ধন প্রকাশ্যভাবে ছিন্ন করিয়া তিনি পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন। বিবাহের পূর্ব্বে অর্জ্জিত পুরুষের বিত্তে মাতার অধিকার ও বিবাহের পরে পুরুষ যে ধন অর্জ্জন করেন, তাহাতে স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যারই শ্রেষ্ঠ অধিকার; পুত্রেরা সামান্য অংশমাত্র প্রাপ্ত হয়। পুরুষ কখনও স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠা কন্যা, অভাবে কনিষ্ঠা দৌহিত্রী, তদভাবে ভগিনীর কনিষ্ঠা কন্যা, তদভাবে মাতৃস্বসার কনিষ্ঠা কন্যা ইত্যাদি প্রকারে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। যদি নারীকুলে কেহ না থাকে তবে কনিষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। পুরুষ কেহ স্থাবর সম্পত্তি অর্জ্জন করিলে, পত্নী পুনর্ব্বিবাহিতা না হইলে সেই সম্পত্তির অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন, অপরার্দ্ধে মাতার ও মাতার নারী-কুটুম্বের অধিকার জন্মে। কনিষ্ঠা কন্যা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ও কুলদেবতার তৃপ্তিসাধনের একমাত্র অধিকারিণী। জাপানীদিগের "সিন্তো" ধর্ম্মের মত পূর্ব্ব পুরুষের উপাসনা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। "কা-লি সিনসার"—আদ্যাশক্তি সর্ব্বপ্রধান দেবতা; কিন্তু মানবী লোকমাতামহী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের পাত্রী। ধর্ম্মকর্ম্মে পুরোহিতের অধিকার আছে বটে কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে কা-সো ব্রি উপাধিধারিণী নারীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। বস্তুতঃ, লিংদো, সো ব্রির প্রতিনিধি মাত্র। সো ব্রি পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে পুরুষ লিংদো পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। নারী-শাসনের পূর্ণ প্রভাবের সময় পূজা পার্ব্বণে লিংদোর স্থান ছিল না। নোংক্রেম রাজ্যে এখনও লিংদোর প্রাধান্য নাই দলাধিপতি সীমেরও আধিপত্য নাই। মধ্যযুগের রোমীয় পোপের মত ঐহিক ও পারত্রিক উভয় অধিকার দখল করিয়া নারী পুরোহিত বিরাজিত আছেন। তবে রাজকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য তাহার আত্মীয়স্বজনের ভিতরে কাহাকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া 'সীম' উপাধি দিয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির অস্থি মাতৃকুলের সমাধিতেই প্রোথিত হয়। এবং প্রত্যেক সমাধিতেই কুলমাতার নামে কেন্দ্র স্থলে এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হয়। পুরুষের নামীয় কোনও প্রস্তর এই কেন্দ্রফলক হইতে উচ্চতর বা বৃহত্তর হইতে পারে না।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, নারীর প্রভাব ও প্রতাপ প্রাচীন সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ধনাধিকারিণী ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণী নারী, কুললক্ষ্মী ও গৃহ দেবতারূপিণী নারী শ্মশানক্ষেত্রে পর্য্যন্ত

পুরুষের উপরে সগর্ব্বে অধিকার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত থাকিতেন। আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে নারীর শক্তিতেই পূর্ব্বভারত শাসিত হইত। শক্তিশালিনী অনার্য্য কুল-দেবতাগণ কি আর্য্যসংশ্রবে সংস্কৃত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহ কোণে মঙ্গলময়ী গৃহদেবতারূপে আজিও নারীমহলের বেদবহির্ভূত বহুতর ব্রত পার্ব্বণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেছেন ?

সে যাহা হৌক্, আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, খাসিয়া দেশে পূর্ণভাবে এবং মণিপুরী কাছাড়ী, নাগা প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে ও শ্রীহট্টের রায় নামক অর্দ্ধসভ্য জাতির ভিতরে ক্ষীণভাবে নারীর প্রভুত্ব এখনও ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নারী প্রাধান্য সম্বন্ধে বাঙ্গালার লোকতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব।

বঙ্গাব্দ এবং কোলম্ কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ।

বিগত ভাদ্র সংখ্যার "ভারতীতে" শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী মহাশয় "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নামক প্রবন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া—তৎ-সমুদয়ের রহস্যোদ্‌ঘাটন জন্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধের একস্থানে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৎসর গণনা কারবার বিভিন্ন প্রণালীর উল্লেখ পূর্ব্বক ভারতের প্রচলিত কয়েকটী সম্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটী হিন্দু ডাকের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন "কোলম্, কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ কি ? আমাদের পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শোভিত আমাদের বঙ্গাব্দই বা কি ? কোন্ নরপতি বা কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটন হইতে এ বর্ষগণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ? অথচ সন্ বঙ্গাব্দ এবং ফস্‌লী তিনটী বর্ষ গণনার অতীতাব্দ এক"। এ প্রবন্ধে প্রথমে বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

বর্ত্তমানে বঙ্গাব্দ, সন্ এবং ফস্‌লী ১৩০৮, ইংরাজী ১৯১১ এবং ১৩২৯ হিজরী চলিতেছে। ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বৎসর সৌর মাস হিসাবে এবং হিজরী চন্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। ইংরাজি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৮ বাদ দিলে ৫৯৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বৎসরে কোন বিখ্যাত ঘটনা ঘটে নাই; অন্ততঃ প্রচলিত ইতিহাস সমূহে সেরূপ কোন ঘটনার উলেখ নাই এবং বঙ্গাব্দ যে ঐ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ তাহা কোন ইতিহাসেই লিখিত নাই। এই সময়ের কিছু কাল পরেই হর্ষ সম্বতের প্রচলন হইয়াছিল একথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই হর্ষ সম্বৎ সর্ব্ববাদী সম্মতভাবে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই হর্ষ সম্বৎ বঙ্গাব্দ নহে। তদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে যে যে অব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ আছে—কিন্তু এই সময়ে বঙ্গাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন

ইতিহাসেই কোনরূপ বিবরণের উল্লেখ নাই। সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে অথবা ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে যে বঙ্গাব্দের প্রচলন হয় নাই তাহা একপ্রকার নিশ্চিত।

বঙ্গাব্দের সহিত হিজরীর তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে এক্ষণে উভয় অব্দের মধ্যে একাদশ বৎসরের পার্থক্য। মুসলমানেরা তাঁহাদের বৎসর চান্দ্র মাস হিসাবে গণনা করিয়া থাকেন। ঐ চান্দ্র বৎসর হিসাবে গণিত সময় ৩০ বৎসরের এক একটী চক্রে বা যুগে বিভক্ত। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ১৯ বৎসর ৩৫৪ দিন, এবং অবশিষ্ট একাদশ বৎসর, ৩৫৫ দিন হিসাবে গৃহীত হয়। সুতরাং মুসলমানদিগের চান্দ্র বৎসর গড়ে ৩৫৪ দিন, ৮ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিটে গণনা করা হইয়া থাকে। আমাদিগের সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা ৫৫ সেকেণ্ড হিসাবে গণনা করা হয়; সুতরাং সৌর এবং চান্দ্র বৎসরে পার্থক্য ন্যূনাধিক ১০ দিন ২১$\frac{1}{2}$ ঘণ্টা। এই হিসাবে গণনা করিলে দেখা যাইবে যে ন্যূনাধিক ৩৫৪ সৌর বৎসরে হিজরী এবং বঙ্গাব্দে একাদশ বৎসরের প্রভেদ হইবে। সুতরাং অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিজরী এবং বঙ্গাব্দের বৎসর এক ছিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর সাহ ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিসাব মত তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই বঙ্গাব্দ ও হিজরী সম্বতে পার্থক্য হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আকবরের সময় হইতে হিজরী, সৌরমাস হিসাবে গণনা হইয়া বঙ্গাব্দে পরিণত হইয়াছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

আকবর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে ৯৬৩ হিজরী চলিতেছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই ৯৬৩ হিজরীর সহিত সৌর বৎসর যোগ করিলে বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫৫ সৌর বৎসর গত হইয়াছে। ইহার সহিত ৯৬৩ হিজরী যোগ করিলে বঙ্গাব্দ ১৩১৮ হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক উপরোল্লিখিত যুক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। বিখ্যাত "এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" নামক গ্রন্থে (Encyclopadia Britannica, 9th Edition Vol 5. Indian Chronolgy) "ভারতবর্ষের সালের বিবরণ" নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।—

"The Bengalee era is also supposed to be d rived from the Hegira; but the era is measured by solor time and therefore differs entirely from the Mahomedan year, which is purely lunar. The sidereal year exceeds the lunar year by 10 days 21½ hours; consequently, by reckoning backwards, it will be found that the dates of Bengalee era and Hegira coincided about the middle of the 16th century. History is silent on the subject; but it seems probable that though the Hegira was partially

adopted in India, the Hindus pertinaciously resisted all attempts to disturb their ancient methods of reckoning the subdivisions of the year."

উক্ত গ্রন্থের ঐ প্রবন্ধেই ফস্‌লী সন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"The Fuslee era from the near coincidence of its dates with those of Hegira, seems to have been imposed on the natives of India by their Mahomedan conquerors. It is principally used in revenue transactions. There are several eras of the same name but the most common is that which is reckoned from the year 590 A. D." অর্থাৎ ফস্‌লী এবং বঙ্গাব্দ মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং যদিও ভারতে হিজরী সম্বৎ আংশিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রথানুসারে বৎসর গণনা পরিত্যাগ করেন নাই। যদিও এ মন্তব্যের শেষাংশের সহিত অর্থাৎ ফস্‌লী সন ৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত, আমরা একমত নহি, তথাপি এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার এযুক্তি আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল।

"আইনী আকবরী" নামক মূল পারস্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে আকবরসাহ এক নূতন শকের প্রচলন করেন এবং ঐ শক তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ দিন হইতে গণনা হইয়া থাকে। "বসুমতী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ প্রণীত "আইনি আকবরীর" অনুবাদ গ্রন্থের ৭৩পৃষ্ঠায় "হিন্দুদিগের সালের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ আছে। যদি ঐ বিবরণের অর্থ এরূপ হয় যে, আকবর সাহের রাজত্বকাল হইতে ঐ শকের গণনার আরম্ভ, তাহা হইতে আমরা এক্ষণে ইতিহাসে ৩৫৫ আকবর শকের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু কোন ইতিহাসেই এরূপ কোন শকের উল্লেখ নাই এবং ভারতের কুত্রাপি এরূপ শকের প্রচলন কথা—শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, আকবরসাহ, তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ দিন হইতে হিজরী শক সৌর বৎসর হিসাবে গণনা করাতে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ, তিনি এক নূতন শক প্রচলন করিতেছেন, ঐরূপ মনে করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "ভারতের ইতিহাসে" বঙ্গাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ঐ পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন "বাঙ্গলা, ফস্‌লী ও বিলায়তী সন নামে যে কয়েকটী অব্দ প্রচলিত আছে, আকবরের রাজত্বে তৎসমুদয়ের উৎপত্তি হয়। আকবর আপনার আধিপত্য সময়ে হিজরীর চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর বৎসর গণনার নিয়ম করেন।"

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আকবরের সিংহাসনাধিরোহণ কাল হইতে, অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ এবং ৯৬৩ হিজরী হইতে, হিজরী শক, চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর বৎসর হিসাবে গণনা হইয়া, এই বঙ্গাব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

ফস্‌লী সন্‌ও এই সময় হইতে আরম্ভ এবং এ সনের গণনাও সৌর বৎসর হিসাবে করা হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদি সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে বঙ্গাব্দের এবং তৎপরবর্ত্তী ভাদ্র মাসে ফস্‌লী সনের গণনা আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে ফস্‌লী বৎসর ১২ই জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে "কোলম্‌" কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ কি? এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কোলম্‌ সম্বৎ প্রফেসর কিল্‌হর্ণের মতে (Prof. Keilhorn) ৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে সময়ে পালবংশীয় নরপতিগণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুতরাং পালবংশীয় রাজগণের সময় কোলম্‌ সম্বৎ আরম্ভ হইয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। (Imperial Gazetteer of India vol. II. page 64.)

"কলিচুরি" বা "কলাচুরি" সম্বৎ হৈহয় বংশীয় চেদীরাজগণের সময় হইতে গণনা করা হয়। এই চেদীবংশীয় রাজগণ আধুনিক মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে ২৪৯ বা ২৫০ খৃষ্টাব্দে এই "কলাচুরি" বা "কলিচুরি" সম্বতের উৎপত্তি হয়। ভিনসেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ প্রণীত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে, এবং ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার নামক গ্রন্থে (Vincent Smith's Early History of India, Imperial Gazetteer of India) এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

স্মিথ্‌ সাহেবের উক্ত ইতিহাসে "লৌকিক সম্বতের" উল্লেখ আছে; তবে তিনি এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। উক্ত ইতিহাস পাঠে অনুমান হয় যে "লৌকিক সম্বৎ" খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল। লৌকিক সম্বৎ বোধ হয় শালি বাহনের সম্বৎ হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই সম্বৎ তাঁহার রাজত্বকালে ৭৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী মহাশয় তাঁহার হিন্দি ডাকের ছড়া দিয়াছেন,—

সম্বৎ কোই এক ভাতিকো জানো।
ডাক কহে সব শুনো সেয়ানো॥
কলি, কোলম্‌, কলিচুরি সিং।
লৌকিক, বিক্রম্‌ লছিমন্‌ সিং॥
বুদ্ধ নির্ব্বাণ, মৌর্য্যাশক ভাই।
চালুক, বিক্রম গুপ্ত—গণাই॥
গাঙ্গে হর্ষনিবারহুঁ জানত।
পরং ত্রিহুত লছিমন মানত॥

শেষ দুই ছত্রের অর্থ করিয়াছেন যে "গাঙ্গ সম্বৎ হর্ষনিবার লোকদের মধ্যে জানিত অর্থাৎ প্রচলিত" এবং তজ্জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "যদি এ ব্যাখ্যা সমীচীন হয় তবে হর্ষনিবার দেশ কোথা এবং কাহাকে বলে"? আমাদের মতে "গাঙ্গে হর্ষ নিবারহুঁ জানত" এ ছত্রের অর্থ—"গঙ্গাদেশে হর্ষ সম্বৎ প্রচলিত ছিল"। তাহা হইলেই ঐ ছত্রের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে এক সম্বৎ প্রচলন করেন; এই সম্বৎ হর্ষসম্বৎ নামে বিখ্যাত। হর্ষবর্দ্ধন গঙ্গা নদীর মোহনার উত্তর পার্শ্বস্থিত প্রদেশ সমূহের অধীশ্বর ছিলেন; তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং গঙ্গাদেশে অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর

পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহে, হর্ষসম্বৎ প্রচলিত থাকা একান্ত সম্ভব। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথের ইতিহাসে—লিখিত আছে ..."In the latter years of his reign, the sway of Harsha over the whole of the basin of the Ganges (including Nepal) was undisputed." সুতরাং আশা করি ছিন্নি শ্লোকটীর ঐ ছত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। সর্ব্বশেষ ছত্রের "পরং ত্রিহুত লছিমন মানত" "ত্রিহুত দেশে লক্ষণ সম্বৎ প্রচলিত ছিল এরূপ অর্থ সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। ডাকে উল্লিখিত অপরাপর অব্দগুলি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত, সুতরাং সৎসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

শ্রীতুলসিদাস চক্রবর্ত্তী।

জাপানের ধর্ম্ম।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

জাপানের শিন্তো এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, এবার খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিব।

ভারতের পর্ত্তুগীজ সহর গোয়াতে কান-শিরো ছাত্তোমি নামক জনৈক জাপানী বাস করিতেন। তিনি পর্ত্তুগিজদিগের ভিতর আঞ্জিরো নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পাদরী জেভিয়ার এবং কাম্পার জাপানে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিউশিউ দ্বীপের বড় বড় জায়গীরদারগণ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। দেখিতে দেখিতে ৪০ বৎসরের মধ্যে উহাদের প্রযত্নে ২৫০টি গির্জ্জা স্থাপিত হয় এবং তিন লক্ষ লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। নূতন ধর্ম্মে মাতোয়ারা হইয়া উহারা জোরজুলুমে অন্যান্য সকলকে টানিতে থাকে। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির ভিতর উৎপাত আরম্ভ হয় এবং শাসন বিভাগীয় কার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপ করায় উহাদের ভিতর কোনরূপ রাজনৈতিক মতলব লুকায়িত আছে বলিয়া লোকে মনে সন্দেহ করে। এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন কারণে জাপানের ওলন্দাজ বণিকদের সহিত পর্ত্তুগিজদের মনোমালিন্য ঘটে। ওলন্দাজগণ সুযোগ বুঝিয়া ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক প্রধান শাসনকর্ত্তা তোকুগাওয়া সোগুণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় যে খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা লোপ করিবার জন্য এক বিপ্লব উপস্থিত করিবার যোগাড় করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া পাদরীগুলিকে জাপান হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং প্রতিপত্তিশালী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জায়গীর সর্দ্দারদের কাহাকেও নির্ব্বাসনে আবার কাহাকেও বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে কেহ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত

হইলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে বলিয়া আইন প্রচার করা হয়। যেরূপ পরশুরাম এক-বিংশ বার ভারত নিঃক্ষত্রিয় করিবার সময় অনেক ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহণান্তর ভারতের স্থানে স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন সেইরূপ জাপানেও এই সময় অনেক খৃষ্টানের অন্তরে অন্তরে খ্রীষ্টধর্ম্মে আস্থা রহিলেও বাহিরে উহারা আপনাদিগকে শিন্তোধর্ম্মাবলম্বী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সমবেত পঁয়ত্রিশ সহস্র খ্রীষ্টান গোপনে গোপনে মন্ত্রণা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করে। তখন রাজশক্তি শিমাবারা নামক স্থানে উহাদের সম্মুখীন হয়। এবং একে একে সমস্ত খৃষ্টানকে নিহত করে। এইরূপ নির্য্যাতন এবং নিষ্পেষণের পর খৃষ্টধর্ম্ম জাপান ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল খ্রীষ্টধর্ম্মের স্মৃতিতে লোকের মনে ভীতি সঞ্চার হইত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দুই জন ক্যাথলিক পাদরী পুনরায় লুচু দ্বীপে পদার্পণ করেন। কিন্তু চারি বৎসর পর তথা হইতে হঙ্কংয়ে বিতাড়িত হয়েন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হওয়ার পরে পুনরায় কতিপয় ক্যাথলিক পাদরী লুচু, নাগামাকি, কোবে এবং ইয়োকোহামায় আসিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তোকিও সহরের ৎছুকিজি অঞ্চলে উহাদের প্রথম গির্জ্জা স্থাপিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দেশী ও বিদেশী রোমানক্যাথলিক মিশনারি যথাক্রমে ২৬৮ এবং ২৩৬ জন ছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডোর পেরি বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন মানসে আমেরিকা হইতে জাপানে আইসেন। রেভারেণ্ড গোহার নামক জনৈক খ্রীষ্টান পাদরী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সাস্তারো নামক জনৈক জাপানী খ্রীষ্টানের সাহায্যে তিনি প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রয়াস পান। আমেরিকানদের ভিতর সাস্তারো সামুয়েল পাটি নামে পরিচিত ছিলেন। উঁহাদের সংস্পর্শে যাহারা আসিত তাহাদেরই ভিতর উঁহারা ধর্ম্মবীজ বপনে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর ব্রাউন, হেপবারণ, বার্ব্বেক, এবং উইলিয়ামস নামক চারি জন বিখ্যাত পাদরী আমেরিকা হইতে জাপানে প্রেরিত হন। ক্রমে ডাক্তার গ্রিন এবং ডেভিস উহাদের সহিত যোগ দিয়া ওসাকা, কোবে, নাগামাকি এবং কানাগাওয়ায় (ইয়োকোহামা) আড্ডা ফেলেন। ক্রমেই মিশনারি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১ ৬৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড হইতে জাপানে ১৫ জন স্ত্রী ও পুরুষ মিশনারি প্রেরিত হয়। এইরূপে দলে দলে পাদরীগণ আসিয়া যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেও এত কাল পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ বিশেষ কোন ফল দেখা যায় নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ এবং আমেরিকার ১৮টি মিশনবোর্ডের ৬৯ জন পুরুষ এবং ১৩৫জন স্ত্রীলোক মিশনারি জাপানে প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারি স্ত্রীপুরুষ মোট ৮৮২ জন ছিলেন; এতদ্ব্যতীত দেশী প্রচারক ৬৩২ জন।

১৮৫৫খৃষ্টাব্দে মাহোফ্ নামক জনৈক গ্রীক মিশনারি হাকোদাতে সহরস্থ রুষিয়ান কনসালের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আইভান নামক জনৈক ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক ঐ কার্য্যের ভার লইয়া হাকোদাত্তেতে আগমন করেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া তোকিও সহরে গমন করেন। তথায় তাঁহার গির্জ্জা রুষিয়ান চার্চ্চ নামে বিদিত। দেশী ও বিদেশী পাদরী যথাক্রমে ১৫১ এবং একজন। এই রুষিয়ান গির্জ্জা জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গির্জ্জা। ইহার অভ্রভেদী চূড়া বিশাল তোকিও সহরের যে কোন প্রান্ত হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। সুবর্ণ-খচিত অভ্যন্তর প্রদেশ বৈদেশিক পর্য্যটকের মনকেও আকর্ষণ না করিয়া পারে না।

খৃষ্টান মিশনারিগণ কত যে হাঁসপাতাল অনাথাশ্রম, স্কুল, সমিতি, প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধন করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আজও পর্য্যন্ত শতকরা একজনকেও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রায় ৫ কোটি লোকের ভিতর মিশনারিগণের চেষ্টাতে যত লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নব্য জাপান দিন দিন পুরাতন খোলস পরিবর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্যজাতির অনুবর্ত্তী হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে উঁহারা এতই ব্যতিব্যস্ত যে ধর্ম্মবিষয়ে উঁহাদের চিন্তা করিবার

	সংখ্যা প্রোটেষ্টাণ্ট	রোমান ক্যাথলিক	রুষিয়ান চার্চ্চ	মোট
গির্জ্জা	১২৮৭	৫৩০	২৬০	২০৭৭
মিশনারি (স্ত্রী, পুরুষ)	৮৮২	২৩৬	১	১১১৯
জাপানী মিশনারি	৬৭২	২৬৮	১১১	১০৫১
মোট খ্রীষ্টান	৭১০৯৭	৫৮০৭৬	২৮৫৯৭	১৫৭৭৮০
খ্রীষ্টান স্কুল	১৩৯৮	৪৮	৪	১৪৫০
শিক্ষক ও ছাত্র	৭১৫২৬	৬০০৬	১৩৯১	৭৮৯২৩
ওয়াই. এম্. সি. এ.	১১৮৭	১	১	১৮৯
অনাথাশ্রম	২১	২১	—	৪২
ডাক্তারখানা	২০	১৭		৩৭
চিকিৎসিত রোগী	১২১৮৪	৪৯৮৫০		৬২০৩৪

অবসর যেন একেবারেই নাই। ধর্ম্মস্রোত নিতান্তই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দৈনিক জীবনে উহাদের ভিতর প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রক্রিয়াই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কত শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম জগতে কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; কখন প্রলোভনে কখন বা শাণিত অসির ভীতি প্রদর্শনে কত দেশের ধর্ম্মস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে কিন্তু এ কর্ম্মযুগে জড় বিজ্ঞান ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেও আমাদের ভারতের পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মই বীরজাতির অধিবাসস্থল জাপান ক্ষেত্রে রাজত্ব করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মই জাপানীদের জাতীয় শক্তির মূলে। এই সম্বলের উপর নির্ভর করিয়াই আজ তাহারা ধরণীতলে এক প্রথম শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য। দেশের গৌরব রক্ষার জন্য কি ভাবেই তাহাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়াছি! অথচ সেই বিসর্জ্জনে প্রিয় পরিজনের অভাব জনিত ক্লেশে কাহাকে দিনেকের তরেও শোকাভিভূত হইতে দেখি নাই। ইহা কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রক্রিয়া নহে? আজ আমরা ভারতবাসী মায়ামোহে বিজড়িত হইয়া আমাদের দেশীয় সেই পবিত্র ধর্ম্মভাবকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছি; আত্মবিসর্জ্জন দূরের কথা স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে সেই সামান্য স্বার্থটুকুর বিসর্জ্জনেও যেন মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। তা না হইলে একদিকে আমরা কোটি কোটি মুদ্রায় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকি আর অপর দিকে অনশনে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা ভগিনীর প্রাণ বিয়োগ হইতে থাকে? তা না হইলে ভ্রাতা ভগিনীর সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইয়া রাখিতে পারি? আর তা না হইলে জাতীয়ত্ব ভুলিয়া সাম্প্রদায়িক অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য হিন্দু মুসলমানে ঠেলাঠেলি হইতে পারে আর একই ভারতমাতার সন্তানকে ঘৃণিত অস্পৃশ্য বলিয়া পায় ঠেলিতে পারি? আমরা জাপানীদিগকে আমাদের ধর্ম্মের ক্রোড়ে বড় হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, এখন জাপানীদিগের আদর্শ লইয়া এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতবাসীকে বড় হইতে হইবে।

আজ জাপানীদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কয়েকটি দেশাচারের উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জাপানে পর্ব্বে পর্ব্বে মন্দিরে মন্দিরে উপাসনা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়; উপাসকের চেয়ে দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশী। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং তাঁহাদের পৌত্রী এবং দৌহিত্রীদিগকেই উপাসনায় যোগ দিতে বেশী দেখা যায়। স্থানে স্থানে কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানে উপবিষ্ট বৌদ্ধদেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। জাপানীদের নাসিকা চেপটা, প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চ নাসিকার আকাঙ্ক্ষী হইয়া উহারা আপন নাসিকা বুদ্ধদেবের নাসিকার সহিত ঘর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে নাসিকা উন্নত না হউক, বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যুদিনে মন্দিরে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধাদি মন্দিরেই হইয়া থাকে। বৌদ্ধ, শিন্তো এবং খ্রীষ্টান তিন ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্রাদ্ধ দেখিয়াছি। পুষ্প পল্লবে শবসজ্জা, ধূপধুনার

আহুতিদান, এবং বংশীনিনাদ প্রভৃতিতে ইহাদেরই মধ্যে অতি সামান্যই পার্থক্য। মন্দিরে মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক ছাত্র প্রভৃতি শ্রাদ্ধ সময়ে সুন্দর কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত অভিনন্দন পঠনান্তর মৃতের অস্থি, ভস্মাবশেষ অথবা মৃতদেহ কফিনের সম্মুখে রাখিয়া থাকে।

স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ শ্বেতরেশম বস্ত্র পরিহিত হইয়া মন্দিরে যান। অন্যান্য সকলে কালো পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকে। জাপানে হয় মৃতদেহ নয় চিতাভস্ম গোরস্থানে প্রোথিত করা হয়। প্রত্যেক বংশেরই একটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্মৃতি রক্ষার স্থল আছে, সৎকারের পর তথায় বংশের যাবতীয় মৃত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অস্থি কিম্বা ভস্মাবশেষ রাখিয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও পরিবারের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন পৃথক স্থলেও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শবদেহ অবস্থা এবং পদমর্য্যাদানুযায়ী প্রসেশনের (মিছিলের) সহিত সৎকারের জন্য লইয়া যাওয়া হয় এবং সৎকারস্থল হইতে পুনরায় প্রসেশন সহ কিঞ্চিৎ অস্থি কিম্বা ভস্মাবশেষ লইয়া মন্দিরে এবং স্মৃতিরক্ষণ স্থলে যাওয়া হয়। বন্ধুবান্ধব প্রসেশনের জন্য কেহ পারাবত কিম্বা অন্য কোন সুন্দর সুন্দর পক্ষীপূর্ণ পিঞ্জর, কেহ রাংতাদলায় নির্ম্মিত পদ্ম ফুলের গাছ, কেহ গামলায় বিচিত্র ফুলের গাছ পাঠাইয়া থাকে। প্রতি বংশের স্মৃতি চিহ্নের তলদেশে এক ছোট প্রকোষ্ঠ আছে; উহাতে অস্থি কিম্বা ভস্ম সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। স্মৃতিচিহ্ন সাধারণতঃ ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর নির্ম্মিত। অতি দরিদ্রবংশের স্মৃতি-স্থলের ভিত্তি ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও কাষ্ঠ ফলকে বংশবিবরণী লিখিত হইয়া থাকে। সহর এবং গ্রামের প্রান্তদেশেই গোরস্থান অবস্থিত। কোন কোন বিশেষ দিনে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এবং বন্ধুগণ ভক্তি ও প্রীতি জানাইবার জন্য সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্থলে গিয়া অভিবাদন করিয়া আইসে। জেনারল কাউন্ট কোদামার মৃত্যুসময়ে আমি তোকিও-তেই ছিলাম। তাঁহার শবদেহের সহিত যেরূপ মিছিল বাহির হইয়াছিল তৎপূর্ব্বে জাপানে কাহারও জন্য তেমন মিছিল বাহির হয় নাই। জেনারল কোদামার স্মৃতিস্থলে অনেককে নববর্ষদিনে নামের কার্ড রাখিয়া অভিবাদন করিয়া আসিতে দেখিয়াছি।—

প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে মৃত সৈন্যদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারকে ছোকোন্সা বলে। স্বয়ং সম্রাট আরম্ভ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। তিন দিবসে ঐ শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাধা হয়। এই উপলক্ষে তোকিও সহরের কুদান পার্কে মহাধূম দেখিতে পাওয়া যায়। কুদানের শিস্তো মন্দিরেই মৃত সৈন্যদের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। কুদানের বিস্তৃত ময়দানে ঐ তিন দিবসের জন্য অতি সমারোহে মেলা বসিয়া থাকে—কোথাও সারি সারি সার্কাসের দল, কোথাও থিয়েটারের দল, কোথাও নৃত্য গীত রংতামাসা, দোকান পসারী—দিন রাত সমভাবে চলিতে থাকে। রাত্রিতে বিজুলী ও আতস বাজীর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের দিনে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিতে

আমরা অবসন্ন হইয়া পড়ি আর উহারা আমোদ উৎসবে মাতোয়ারা হয়। সৈন্যগণ দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া জীবন উৎসর্গ করে,—কাযেই বীরগণের শ্রাদ্ধে বীরজাতি শোকপ্রকাশ করিবে কেন?

সর্ব্বসাধারণ লোকে প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৪ই ১৫ই এবং ১৬ই তারিখে পূর্ব্ব-পুরুষদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, এই পর্ব্বকে ওবোন পর্ব্ব বলে।

অশন, বসন, ভূষণের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। কত ইউরোপ ও আমেরিকার সাহেবমেম জাপানী পোষাক ও জাপানী গেতা, (খড়ম) ব্যবহার করিতেছে আবার পথের কুলি ভিক্ষুকও কোট, পেণ্টুলেন, হ্যাট লাগাইয়া ফিরিতেছে। বিবাহে একধর্ম্ম আবশ্যক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামী এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং স্ত্রী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীও হইতে পারে। ধর্ম্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতিই উহাদের একমাত্র ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম বজায় রাখিতে উহাদের অকরণীয় কিছুই নাই।

শ্রীহেমন্তনাথ সরকার।

ইন্দিরা।

১

আমার এ কবিচিত্তে নিত্য খোস্‌রোজ;
নিত্য হেথা মহোৎসব, নিত্য হেথা ভোজ!
শুভ্রচিত্রা, প্রফুল্লতা,—রূপময়ী নারী—
এ যজ্ঞশালায় আসি বসে সারি সারি।
রস, রঙ্গ, কলহাসি,—পুরুষ সুন্দর—
এই হেম-হর্ম্ম্য-মাঝে রাজে নিরন্তর।
হেথায় পোলাও, লুচি, খাস্তার কচুরি,
নিত্য এই নারী নরে বিতরে মাধুরী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর পঞ্চাশ মিষ্টান্ন,
সুপক্ব ফলের রাশি, মেওয়া, পরমান্ন।
তার মধ্যে এক নব, অদ্ভুত সামগ্রী,
সর্ব্ব দ্রব্যে হারাইয়া, লভিয়াছে decree!
এ যেন যে দেবভোগ্য পারিজাত-পাঁপড়ি;
ক্ষীর-সাগরের যেন রসে ভরা রাবড়ি!
সোণার পেয়ালা-মাঝে সতত চঞ্চল,
সুধাভরা, সুধারসে সদা টল টল!
আঙ্গুর হারিয়া গেছে; হেরে গেছে মিহরি,
মধুরসে টস্‌ টসে, এ কোন্ সামগ্রী?

২

এমনি মধুর দ্রব্য, রসের ভাণ্ডার,
ভুবনে এমন খাদ্য নাহি বুঝি আর।
যে খেয়েছে সে মজেছে;—জনমের সাধ
মিটে যায়, একি এর রসালো আস্বাদ!
আমার মানসী বধূ,—রসিকা দ্রৌপদী,—
তাহারও রসনায় উছলিছে নদী!
আমি যে এমন বুড়া, সুকেশ ধবল,
আমারো জিহ্বায়, হের, শুকাইছে জল!
শোন্ রে বর্দ্ধমানের রসময় খাজা,
শোন্ কৃষ্ণনগরের সরপুরি ভাজা,
তোরা বাসি হয়ে যাস্—এ যে নিত্য তাজা!
একি রে অদ্ভুত দ্রব্য! অয়ি অপরূপে,
তোর কানে এর নাম বলিব যে চুপে!
শোন্ শোন্, কাছে আয় নবীনা নাতিনী,
আমার প্রিয়তমার নবীনা সতিনী!
স্পর্শে মোর, তুই কেন উঠিন্ ডরাই?
এরি মধ্যে তোর এত সতীত্ব-বড়াই?
এক বছরের অয়ি সুন্দরী ইন্দিরা,
আয় কাছে,—তুই কেন হইলি অধীরা?
মলয়-পরশে কেন সঙ্কোচ-আকুল,
লোভনীয়া মোহনীয়া মাধবিকা-ফুল?
শোন্ বলি,—আঃ মোর জুড়াল জীবন!
রাসোল্লাস-সুধাসিন্ধু,
তারি এযে এক বিন্দু!
কি মধুর!—তুই কেন ফিরাস্ বদন?
এর নাম "ইন্দিরার অতুল চুম্বন"!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কবিকেশরী ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তলিপি

কবিকেশরী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

[আমরা ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতীতে যে মহাত্মার জীবনী প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে সেই প্রথিতনামা স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার মহাশয়ের ইংরাজী ১৮৫৬ সালে (১৭৭৭ শকে) লিখিত দুইটী বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে আমরা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত যতটুকু লাভ করিয়াছি, ভারতীর সহৃদয় পাঠকদিগের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে ভারতচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত একখানি দুষ্প্রাপ্য পত্রসহ তাহা প্রকাশ করিতেছি। অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে রাখালদাস হালদারের লিখিত ভারতচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীন মতের উপর আমাদের বলিবার কিছু নাই।]

"যে সকল মনুষ্য ধর্ম্ম-প্রচার বা বিদ্যানুশীলন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে আমি সাতিশয় সুখী হই। জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহে ইংরাজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বিশেষ যত্ন আছে; আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অন্যান্য দুই শত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। কালিদাস প্রভৃতি স্বদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনচরিত জানিবার উপায় অতি অল্প। যাঁহারা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির সাহায্যে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইতে পারে।

আমি শ্রুত হইয়াছিলাম ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র তারকনাথ রায় মূলাজোড় গ্রামে বাস করেন। ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় মহদ্ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার এমত সহজ উপায় আছে, শুনিয়া আমি আনন্দিত হই; এবং স্বকীয় প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানস করিয়া আমি গত ১২ই কার্ত্তিক (১৭৭৬ শকে) তারকনাথ রায় মহাশয়ের বাটিতে গমন করিলাম। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, ভারতচন্দ্র যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন তাহার এত নিকটে আমরা বসতি করিয়া থাকি। মূলাজোড় আমাদের জগদ্দল হইতে এক ক্রোশের অধিক দূর নহে। ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাস করিয়াছিলেন পূর্ব্বে কাহারও মুখে শুনি নাই। আমি ইহাও জানিতাম না যে, ভারতের পৌত্র রামধন রায়ের সহিত আমার পিতার * সৌহার্দ্দ্য ছিল।—উভয়ে বহুকাল এক স্থানে বাস করিতেন† এবং পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। এ সকল অবগত হইয়া যখন ভারতের বাটীতে পদার্পণ করিলাম, তখন একেবারে কৃতার্থম্মন্য হইলাম। নিজ পরিচয় প্রেরণ করাতে তারকনাথ রায় আমাকে অতি আত্মীয়ের ন্যায় গৃহ মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

* রাখালদাস হালদারের পিতা স্বর্গীয় বেচারাম হালদার বঙ্গের প্রথম একজিকিউটিভ এন্‌জিনিয়ার। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গঙ্গাধর শর্ম্মা" ওরুফে "জটাধারী রোজনামচা" গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে।

† ভারতরায়ের স্বহস্ত লিখিত পত্রটী বোধ হয় শ্রীযুক্ত বেচারাম হালদার ভারতরায়ের পৌত্রের সহিত একত্র অবস্থান কালে তাঁর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষের অতীত হইয়াছে। তিনি বহু দিবসাবধি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত; এবং কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বিজ্ঞতা দর্শনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। আমার আগমন তাৎপর্য্য অবগত করাতে তিনি কহিলেন, কিয়ন্মাস গত হইল জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া সেই সকল বিষয় লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। তৎপর রায় মহাশয়ের সহিত গৃহ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কথাবার্ত্তাতেই অনেক সময় বিগত হইল। আমিও তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলাম না; ভাবিলাম, পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যত্নপূর্ব্বক ভারতচন্দ্র রায় সম্পর্কীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিবেন। রায় মহাশয়ের পুত্রের (ভারতের প্রপৌত্র) নাম বাবু অমরনাথ।"

(রাখালদাস হালদার মহাশয় স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের বিষয় লিখিয়াছিলেন।)

"এই পুস্তকখানির নিমিত্ত আমরা রচয়িতাকে নমস্কার করি। তাঁহার বিবিধ মতের সহিত আমাদের মতের চিরকালই বিভিন্নতা আছে; কোন কালে তাঁহার আস্বাদন বৃত্তিকে আমরা প্রশংসা বোধ করি নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হয় তিনি বিস্তর পরিশ্রমপূর্ব্বক স্বদেশীয় 'কবি কেশরীর" জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন।

ঈশ্বর বাবুর নিজের বিষয়ে কিছু না লিখিয়া আর আমাদের প্রসঙ্গকে উত্তমরূপে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি বহুদিবসাবধি বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করিতেছেন; তাঁহার পাঠকের সংখ্যা বিস্তর। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত অত্যুৎকৃষ্ট রচনা করেন বটে; কিন্তু, তাঁহাদের পাঠকের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে; কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদের রচনার গৌরব বুঝিয়া থাকেন। প্রত্যুত, অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট লেখক হইয়াও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আপামরসাধারণ সকল লোকেরই অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার নিজের আস্বাদনবৃত্তি উৎকৃষ্ট নহে; এ জন্য তিনি পাঠকদিগের আস্বাদনবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট পথে চালিত করিতে পারেন নাই। তিনি কতকগুলিন তাম্রখণ্ডকে রৌপ্য সদৃশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত রৌপ্য করিতে সমর্থ হন নাই; স্পষ্ট কথা, তিনি কতকগুলিন ব্যক্তিকে অপকৃষ্ট লেখক করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সম্ভবতঃ কদাপি লেখক হইতেন না। ঈশ্বরবাবু গদ্যের অপেক্ষা পদ্যরচনা-প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহার পদ্য রচনা প্রায় সুমিষ্ট হইয়া থাকে; তিনি কখন কখন প্রকৃত কবিত্বও প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, তাঁহার গদ্য রচনা প্রশংসাযোগ্য বোধ হয় না। তিনি শব্দের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে করিতে অর্থকে অবজ্ঞা করিয়া বসেন; তিনি মধ্যে মধ্যে এমত শব্দ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহা "সাহিত্য দর্পণকার দেখে পেতো ভয়।"

তাঁহার রচনা যদিও নিতান্ত কর্কশ না হউক, কিন্তু ব্যর্থবহুল বটে; যদিও রসরাজের ন্যায় অপকৃষ্ট না হউক তথাপি মধ্যে মধ্যে

অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তিনি কদাপি উৎকৃষ্ট লেখকদের মধ্যে গণ্য হইবেন না, আমাদের সন্তানসন্ততিরা অবশ্য অনতি-কাল মধ্যে তাঁহার সাধারণ গন্থরচনা বিস্মৃত হইবে। কেহ বলিতে পারেন যে আমরা ঈশ্বরবাবুর সহিত অতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছি, বস্তুতঃ তাঁহার সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র শত্রুতা নাই; তাঁহার খ্যাতি উপার্জ্জনপথে কণ্টকরোপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, ন্যায়ানুগত রূপে তাঁহার বিষয়ে লিখিতে হইলে, আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহার ন্যূনাতিরেক আর কিছুই লিখিতে পারি না।

আমরা সর্ব্বারম্ভে ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন বৃত্তান্তের জন্য ঈশ্বর বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছি; পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করিতেছি। রায়গুণা-করের সমস্ত অনুরাগী ব্যক্তিই ঈশ্বর বাবুর নিকট ঋণী হইয়াছেন। ভারতের পৌত্র তারকনাথ রায় জীবিত আছেন বলিয়া ঈশ্বর বাবু কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু এমত উপায় না থাকিলেই বা কে কোথায় পূর্ব্বপুরুষের সমকালীয় ব্যক্তিদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তারকনাথ রায়ের সহিত আমাদের আলাপ ছিল; আমরাও ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহে চেষ্টা করিয়াছি; কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অশীতিপর বৃদ্ধ, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত তারকনাথ রায়কে বিরক্ত করিতে আমাদের সাহস হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ আহ্লাদের বিষয়, ঈশ্বর বাবু আমাদের ক্ষোভকে অপনয়ন করিয়াছেন। অন্ততঃ তিনি এমত তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে এক উৎকৃষ্টতর পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারিবে।

ভারতচন্দ্র রায় আমাদের যেমন পরিচিত, তদ্রূপ প্রীতিভাজন। তাঁহার বিরচিত সুললিত পদাবলী লোকে সর্ব্বদা দৃষ্টান্ত রূপে ব্যবহার করে। তাঁহার প্রণীত অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর 'যাত্রা' স্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আমাদের দেশের নাটকের স্থানকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় লোকে তাঁহার অসম্মান করে নাই; তাঁহার কবিত্ব প্রকাশাবধি তিনি কদাপি বিজাতীয় কষ্টে পতিত হয়েন নাই। ইহা যথার্থ বটে (যেমন কবি নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন)

"ভূরিশ্রেষ্ঠ পুরে পুরন্দর সমো যজ্জাত
আসীন্নৃপঃ।
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহা গতস্তু নৃপতেঃ পার্শ্বে
বভূবাশ্রিবঃ॥"

কিন্তু তিনি কবি হইয়া আপনার দুর্ভাগ্য আনয়ন করেন নাই; কবি হইয়াছিলেন বলিয়া বরং তিনি এক প্রকারে সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় কত কবি কত প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন! টাসো নামক কবি দুই টাকার নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন; ফরাশীশ দেশীয় বিখ্যাত নাটককর্ত্তা কর্ণীল এমত দরিদ্র ছিলেন যে, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় একদিবস চর্ম্মকারের বিপনিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া একখান পাদুকার জীর্ণ সংস্কার করাইতেছেন, ইহা কোন ব্যক্তির নেত্র গোচর হয়। অট্‌ওয়ে নামক কবি ক্ষুধার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ও চর্চহিল্, ভিক্ষুকাবস্থায় এবং তাঁহার বন্ধু লইড্ কারা-

গারে জীবন শেষ করেন। ইহাদের দারুণ শোকজনক অবস্থার সহিত ভারতচন্দ্রের অবস্থার তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তর উৎকৃষ্ট বোধ হইতে পারে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত প্রণয় হওয়া অবধি ভারতচন্দ্র ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। পরে বাটী নির্ম্মাণ নিমিত্ত ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ২৪ পরগণায় মূলাযোড় গ্রাম 'ইজারা' দিয়া বার্ষিক ৬০০৲ টাকা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ভারতচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ না হউক, তৎকালিক রূপ সুখের সহিত দিনপাত করিবার কোন ব্যাঘাত ছিল না। স্মরণ করিয়া নিশ্চয় আহ্লাদিত হইতে হয় যে, বঙ্গদেশের একজন প্রথমকালীয় কবি সসম্ভ্রমে কালযাপন করিয়াছিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন যে ভারতচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভারতচন্দ্র যৎকালে দেবানন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্রমুন্সীর বাটীতে অবস্থিতি করিয়া পারসীক ভাষা অধ্যয়ন করেন, তখন সত্যনারায়ণের ব্রত কথা বলিয়া দুইটী পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটীতে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে; ঈশ্বর বাবু ইহার দ্বিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন; ১১৩৪ এবং ১১৪৪; প্রথম শক গ্রাহ্য করিলে তৎকালে ভারতচন্দ্রের বয়স ১৫ বৎসর হয়, কারণ তিনি ১১১৯ সনে (১৬৩৪ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় শকানুযায়ী তখন ভারতচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়স্ক হয়েন। ঈশ্বর বাবুকে প্রথম শকের প্রতি অধিকতর অনুকূল বোধ হয়। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় শকই বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হইতেছে। পঞ্চদশ বর্ষে যে ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণ ব্রতকথার ন্যায় রচনা অসম্ভব, ইহা আমাদের মত নহে। কারণ, তদপেক্ষা অল্পতর বয়সে উৎকৃষ্টতর রচনার বিস্তর প্রমাণ আছে। কর্ক হোয়াইট্ নামক কবি চতুর্দ্দশ বর্ষে মনোহর পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ কবি গেটে আট কিম্বা নয় বৎসর বয়সে বারখানি চিত্রের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস্ পাল্‌গ্রেব্ অষ্টম বর্ষে সংবাদ পত্রে নানাবিধ রচনা প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিশক্তিও সামান্য ছিল না। তথাপি একটী বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষেই সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবাবুর অনুমোদিত মত গ্রাহ্য করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভারতচন্দ্র বিংশতিতম বর্ষে বর্দ্ধমানস্থ রাজবাটীতে আপনাদের বিষয় সম্পত্তির পক্ষে 'মোক্তার' স্বরূপে নিযুক্ত হয়েন। আমরা এ বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ করি। তিনি যে পারসীক অধ্যয়ন সমাপনান্তর ত্রিংশ বর্ষে অভিহিত কার্য্যে নিয়োজিত হন, ইহাই আমাদের সঙ্গত বোধ হইতেছে। যিনি আমাদের এই কথায় সম্মত হইবেন তাঁহাকে সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতচন্দ্র পঞ্চবিংশ বর্ষে পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহাকে এক অদ্ভুত পদার্থরূপে প্রতিপন্ন করা যদি ঈশ্বরবাবুর অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি ভারতের পঞ্চদশ বর্ষে পদ্য রচনার কথা উল্লেখ করিতেন না।

তিনি যে কালে সংস্কৃত, পারসীক, হিন্দী, ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন তখন স্বদেশীয় ভাষাভাষিত পুস্তক পাঠে অনুরাগ শূন্য ছিলেন না। সে সময়ে এ দেশে গদ্যগ্রন্থ বিরচিত হয় নাই; কতিপয় পদ্য পুস্তক মাত্র প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ অবশ্য তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে বিরচিত হয়। বোধ হয় কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডী তিনি বাল্যাবস্থায় পাঠ করিয়া থাকিবেন। এই সকল পাঠ দ্বারাই সম্ভবতঃ তাঁহার পদ্য রচনায় প্রবৃত্তি হয়।

দেশ পর্য্যটনের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানসীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি উৎকল দেশে ভ্রমণ করেন; সেই দেশে মহৎভাবোদ্দীপক তাদৃশ কোন পদার্থ নাই বটে; তথাপি পর্য্যবেক্ষণকারী ব্যক্তিরা লোকের রীতি নীতি দেখিয়া বিস্তর জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। এবিষয়ের আবশ্যকতা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল; কারণ তিনি সুন্দরের মুখে বক্ষ্যমাণ বাক্য অর্পণ করিয়াছেন

"দেখিব রাজার সভা সভাসদ্‌গণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন॥"

ভারতচন্দ্র এইরূপে প্রচুর জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ১৬৭৪ শকে সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। আর কতিপয় পণ্ডিত এই পুস্তক রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নির্দ্দোষ না করিয়া অন্নদামঙ্গলকে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। আমরা এই কথার সহিত কোন ক্রমেই একমত হইতে পারি না। অন্নদামঙ্গল নির্দ্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহদ্ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না। ইংরাজের মধ্যে জগন্মান্য সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি কবিরা অভিহিত অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা নিন্দনীয় ব্যতিরেকে প্রশংসা হয়েন নাই। এতদ্দেশীয় একজন লেখক ইউরোপীয় কবিদের দোষ দেখাইয়া ভারতচন্দ্রের দোষ খণ্ডনে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই আমরা একথা উল্লেখ করিতেছি। সেক্‌সপীয়র ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা কবি ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের দোষকে গুণ বলিয়া প্রচার করা উচিত নহে। অপিচ কথিত হইয়াছে যে ভারতচন্দ্র যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন অশ্লীলতা দোষ মধ্যে গণ্য ছিল না; এখনকার রীত্যনুযায়ী পূর্ব্বকালীয় ব্যবহার বিবেচনা করা অনুপযুক্ত। কিন্তু এ কথার দ্বারাও ভারতচন্দ্রের আস্বাদন বৃত্তিকে কলঙ্কহীন রাখা দুরূহ। সে কালেই হউক, আর একালেই হউক, ব্যক্ত অশ্লীলতা কদাপি গুণ মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা; সহৃদয় সাধুব্যক্তিরা তাহা দোষ বলিয়াই বিবেচনা করেন। অশ্লীলতার দ্বারা পৃথিবীর অপকার ভিন্ন কি উপকার হইতে পারে? ভারতচন্দ্র যে প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত দোষ বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্বীকার করি তিনি অশ্লীলপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তোষ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে আদিরস বর্ণনে যাদৃশ কৌশল দেখা যায় নিজে আদিরস ভক্ত কবি না হইলে তাদৃশ রচনা করা সম্ভবে না।

কবি রায়গুণাকরের রচনার আর কতিপয় দোষ আছে। তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার করেন; ইহাতে কেবল ভাবের অভাব মাত্র প্রতীত হয়; কেবল শব্দের উপর নির্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে। মহত্তেরা মহৎ বা ভয়ানক রস উদ্দীপন করিতে হইলে কেবল অর্থের উপর মনোযোগ দিয়া থাকেন।

পারসীক ভাষা শিক্ষা তাঁহার কাব্য রচনায় কি উপকারজনক হইয়াছে? আমাদের বোধ হইতেছে, তিনি হিন্দী ও পারসীক ভাষা না শিখিলে মহত্তর কবি হইতেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতের যে সকল অপ্রকাশিত রচনা সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতিপয় এককালে তিন চারি ভাষায় রচিত হইয়াছে; তাহা কবিত্ব প্রকাশক হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভারতের রচনার একটি দোষরূপে গণ্য হইতে পারে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি যত প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপে রচনায় অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ চণ্ডী নাটক এইরূপে রচিত হইতেছিল।

অন্নদামঙ্গলের মূল প্রবন্ধ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। উহার মূল প্রবন্ধ কোন মতেই উৎকৃষ্ট নহে। যদি তাহা গদ্যরচিত হইত, আমরা কদাপি সানুরাগে পাঠ করিতাম না। অন্নদা মঙ্গলের অদ্ধ-কাব্য অর্দ্ধ পৌত্তলিক ভাব প্রীতিকর বোধ হয় না। বস্তুতঃ অন্নপূর্ণার পূজা প্রচার করা যদি উক্ত কাব্যের উদ্দেশ্য না হইত, তবে গ্রন্থকার উৎকৃষ্টতর কাব্য রচিতে পারিতেন।

আমরা তাঁহার কাব্যের আরও দোষ উল্লেখ করিতে পারি। তিনি রতির প্রতি দৈববাণী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকরূপে রচনা করিয়াছেন, তিনি ভূত প্রেত ডাকিনীদিগকে অনাবশ্যকরূপে একভাবে পুনঃ পুনঃ কাব্য মধ্যে সমাবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্নপূর্ণার অপেক্ষা জয়ার কেমন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে! তিনি ব্যাসকে এক আশ্চর্য্য জন্তু করিয়াছেন:—

দাঁড়াইলে জটাভার—
চরণে লুটায় তাঁর—
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি
পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু।

ব্যাস স্নান করিয়া উঠিলে না জানি তাঁহাকে কেমন অদ্ভুত পদার্থ বোধ হইত! কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ চিত্র নহে;—ইহার আশ্চর্য্যতর অংশ পশ্চাৎ রহিয়াছে;

কপালে চড়ক ফোঁটা
গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা
কালেমৃগ বাঘ থাবা
সারি সারি হরি নাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে
লম্বি মালা করতলে
হাতে কানে থর থর মালা॥

ব্যাসের অতি দুর্ভাগ্যজনক চিত্র! যথার্থতঃ তাঁহার এমত ভাব আমরা কদাপি কল্পনা করি নাই। গুণাকর সহজে ব্যাসদেবকে বিদায় করেন নাই; তাঁহাকে বং-

পরোনাস্তি অবমানিত করিয়া দূর করিয়াছেন।

তাঁহার রচনার দোষ বর্ণন অবশ্য আমরা এই স্থলেই শেষ করিব, এবং তদীয় উজ্জ্বলভাগকে অবলোকন করিব। কৃষ্ণ পক্ষের সন্ধ্যাবসানে সুধাংশু সন্দর্শন যেমন তৃপ্তিকর, এবিষয়ও আমাদের পক্ষে সেইরূপ হইয়াছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল কবি ছিলেন। তিনি স্বীয় রচনার স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মেনকা কন্যার সহিত শিবের বিবাহ, বিদ্যাসুন্দরের মিলন, রাণীর নিকট বিদ্যার অনুনয় প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তত্তদ ব্যাপারকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব না করেন ?

নিম্নলিখিত তৎপ্রণীত রচনাগুলি আমাদের দেশের প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ;—

"নীচে যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।"

"কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই, বন্ধু নাই কড়ি বই,
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
"কড়িতে বুড়ার বিয়ে, কড়ি লোভে মর গিয়ে,
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥"

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥"

"উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম।
কোথায় মিলন [illegible] অধমে উত্তম॥"

"যে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"

"শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না [illegible] প্রত্যয়।"

"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায়! বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

"ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে, ভৃঙ্গ মধু খায়।"

"লোকে বলে পাপ কাজ কদিন লুকায়"।

"সাপের বাসায়, ভেকেরা না চায়।"

"রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।"

(উকীলের প্রতি)

স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সব গুণ মত দোষ মিথ্যা ক'য়ে সারে॥"

"অধমে উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর মাথে॥" ইত্যাদি।

তিনি ইচ্ছামতে এক এক স্থানে এক এক রসকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন বলিলে হয়। বস্তুতঃ আদিরস ও হাস্যরস বর্ণনে তাঁহার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি রৌদ্র ও ভয়ানক রস বর্ণনে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই ; ভাষার দারিদ্র্য জন্য ইহা ঘটিয়া থাকিবে ; বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় মহদ্‌ভাব উদ্দীপন বিষয়ে আমরা বিস্তর সংশয় করি ; অদ্যাপি এরূপ রচনা প্রত্যক্ষ করা যায় নাই।

রচনার যে অংশ নিতান্ত চিত্তাকর্ষণ সমর্থ, লোকে তাহাতে সহজে বিমোহিত হয় ; কিন্তু, যে অংশের দোষগুণ বিচারমার্জ্জিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, লোকে তদ্বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই কাব্যবিষয় বিচার সময়ে সাধারণ লোকে ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হয় ; এই নিমিত্তই রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল নির্দোষ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এখন কবিত্ব বিচারের উপযুক্ত সময় উপস্থিত ; এখন

ভারতের রচনায় দোষ প্রকাশিত হইলেও তাঁহার পক্ষে সুখের বিষয় এই যে তিনি রসজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা যথার্থ কবি পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যে কিয়দ্দিন নব্য পদ্যকারকদের মধ্যে গণ্য হইতেছিলেন; যাহাদের মস্তকে কবিত্বের প্রবাতও কদাপি সংস্পর্শ হয় নাই, তাঁহারাও গুণাকরকে অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালার কবিত্ব প্রস্রবণের মূল বিষাক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ দেশীয় লোকের দোষগুণ বিচারশক্তি অতি অল্প; এইজন্য অকবিদের দূষণীয় রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যশাস্ত্র বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা নিবারণের উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা যথার্থ কবিত্ব ও পদ্যরচনার ইতর বিশেষ বর্ণন করিতাম; আমরা ভারতচন্দ্রের রচনার সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে ব্যাকুলরূপে প্রবৃত্ত হইতাম; কিন্তু অবকাশাভাব প্রযুক্ত আমাদের এ সমুদয় অভিলাষ সম্প্রতি বিফল হইল। আমরা অতি দুঃখের সহিত এই প্রস্তাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি। আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যায় না। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন যে গুণাকরের পৌত্র তারকনাথ রায় মহাশয়ের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নাই; আমরা বলিতেছি তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের সুখও নাই। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আমরা রায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। যদিও গুণাকরের আবাসভূমি বলিয়া আমাদের মন কৃতার্থম্মন্য হইল, কিন্তু রায় মহাশয়ের কষ্ট দেখিয়া আমরা ব্যাকুল হইলাম। ভারতচন্দ্রের অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা প্রিয় কবির উপযুক্ত সম্মান করুন; তাঁহার নিকট যে গুরুতর ঋণে বদ্ধ আছেন তাহা পরিশোধ দিবার চেষ্টা করুন। জীবিতাবস্থায় গুণাকর সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া থাকিলেও তাঁহার সম্পূর্ণ সমাদর হয় নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মানার্থ আমাদের উচিত তারকনাথ রায়ের সাংসারিক কষ্ট দূর করা। তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মানার্থ মূলাযোড় গ্রামে এক সভা আহ্বান করা উচিত; এক উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। ৯৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শতবর্ষের মধ্যেই যেন ইহা সম্পন্ন হয়।

কামনা ও আরাধনা।

একদিন বসন্তের সুন্দর প্রভাতে
পড়েছিনু বড় সুখে তোমাতে আমাতে
মধুর তৃতীয় সর্গ কুমার সম্ভবে;
উমার বাসন্তী সজ্জা বর্ণনা গৌরবে
সাধ গেল সাজিবারে পত্র পুষ্পে যত
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মত।
তারি তরে নিতেছিনু ঘরেতে ঘুরিয়া
সাজান কুসুম গুলি আঁচল ভরিয়া।
বই-হাতে আনমনে ছিলে একধারে,
"ওকি খেলা হেসে তুমি শুধালে আমারে,
"সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা হতে চাই
তাই ফুল করিতেছি জড়"।—"আছ তাই;
বাসী-ফুল গুলো প'রে কাজ নাই আর!
উমা সাজিলেন যবে সে দিন উমার
মহেশ্বর হন নাই হায় হস্তগত,
তোমার মহেশ যে গো চির পদানত"।
তোমারি আসন তলে ফুল ঢেলে দিয়ে
হাসিয়া পায়ের কাছে বসিলাম গিয়ে।

শান্তি।

ভৃত্য বিহারী বড় বাবুর সংসারে একজন "কেও কেটা" নয়; বড় বাবুর "পেয়ারের" চাকর। এইজন্য একটা স্পর্দ্ধিত গৌরব তাহার মুখে সর্ব্বদাই ফুটিয়া থাকিত। সে অন্যান্য ঝি চাকরের উপর অবাধ প্রভুত্ব করিত এবং তাহাদের কাজ কর্ম্মের খুঁটিনাটি লইয়া অবিরত তীব্র সমালোচনায় তাহার দিনটি বেশ আরামেই কাটিয়া যাইত।

কোমলে কঠিনে গঠিত বিহারীর হৃদয় খানির ভিতর কিন্তু মলিনতা ছিল না—সুচারু দর্পণের ন্যায় তাহা পরিষ্কার ঝরঝরে। সম্প্রতি হৃদয়ের অন্তঃপুরে কে যেন গোপনে উঁকি মারিতে লাগিল। গুলি সূতার জটের মত তাহার হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশে একটা জটিল জট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল—সূতা ছিঁড়িবে তথাপি জট খুলিবে না।

বিহারী যখন দিনান্তে কার্য্যাবসানে, অবসন্ন দেহে, তাহার ক্ষুদ্র কুদ্র প্রকোষ্ঠে আসিয়া দীন-শয্যায় শয়ন করিত, তখন তাহার শ্রান্ত যুগলনয়ন চিরপরিচিত বরগাগুলির প্রতি চাহিয়া থাকিত; এবং যখন তাহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইত; তখন বিহারীর নিদ্রালস চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিত। তৎপূর্ব্বে তাহার হৃদয় কুঞ্জ পাতার পাশে ফুলের মত কাহার এক খানি কচি মুখের সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিত। সে মনে ভাবিত, এমন দিন কি হবে, যে দিন সে মথুর মণ্ডলের কন্যা পদ্মমণিকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া আনিবে। পণের টাকা তাহার জোগাড় হইয়াছে; এখন দুই এক খানি স্বর্ণালঙ্কার হইলেই সে বড়বাবুর নিকট এক মাসের ছুটি লইয়া বিবাহ করিয়া আসে। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে ত সহজসাধ্য নয়। কাজেই মথুর মণ্ডলের কন্যা প্রাপ্তির আশা তাহার চক্ষের সাম্‌নে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া নিমিষে নিভিয়া গেল। একটা জমাট অন্ধকার সেই ক্ষুদ্র কক্ষে নীরবে বিরাজ করিতে লাগিল। বিহারী মনে মনে ভগবানের অবিচার সম্বন্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহার অস্তিত্বের বিষয়ে দারুণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

এই জমিদার বাবুর সুদীর্ঘ প্রাসাদের নিকটেই হরিহর বাবুর বাটী। তিনি অল্প বয়সে একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী সরলা ভগবানের আশীর্ব্বাদের ন্যায় পবিত্র এই স্নেহের ধনটীকে বুকে লইয়া স্বামিশোক ভুলিয়াছিল। প্রত্যহ অপরাহ্নে সরলা সুধীরকে সাজাইয়া দিত এবং বিহারী আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইত—সে বড় বাবুর ছেলেদের সহিত খেলা করিত ও বেড়াইতে যাইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিহারী তাহাকে রাখিয়া যাইত। সুধীর বিহারীকে দাদা বলিত—বিহারী সরলাকে মা বলিয়া সম্মানিত করিত। সুধীরের হাতে তুগাছি বালা ও গলায় কয়েকটী মাদুলী সমেত এক ছড়া সোনার হার সর্ব্বদাই থাকিত। এত দিন বিহারীর মনে এই সকল অলঙ্কার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই মনে জাগে নাই। এখন এই স্বর্ণালঙ্কার ক'খানি দেখিলেই তাহার

হৃদয়ে পদ্মমণির মধুর ছবি ফুটিয়া উঠে। হায় আজ যদি এই ক'খানি গহনা তাহার থাকিত তাহা হইলে পদ্মমণি তাহার গৃহ লক্ষ্মী হইত!

২

সে দিন মাহেশের রথ। চারিদিকে বিষম জনতা। এই ভিড়ের মধ্যে এক স্থানে একটী বালক দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। বহুলোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকের অঙ্গে কয়েক খানি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোকে যতই তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে—সে ততই কাঁদিতেছে।

বিহারী রথ দেখিতে আসিয়াছিল। সে মথুর মণ্ডলের কন্যার বিরহ-বেদনায় ব্যথিত অলস স্ফূর্ত্তিহীন প্রাণটাকে আজিকার দিনে একটু সরল ও তাজা করিবার জন্য তাহার এক অপরিচিত সম্পর্কহীন মাতুলের দোকান হইতে স্ফূর্ত্তির ঔষধ সেবন করিয়া বাহির হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ রোরুদ্যমান সুধীরের হাতধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিল এবং স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল" সুধীর, কে তোমাকে এখানে এনেচে?"

সুধীর বিহারীকে দেখিয়া যেন অকূল সাগরে একটা অবলম্বন পাইল। বিহারী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেই, সে বিহারীর বুকের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক সান্ত্বনার পর সুধীর ভগ্নকণ্ঠে শিশুভাষায় বলিল "বিপিন কাকা আমাকে এখানে, এনেচে, আমাকে এখানে ব'সে থাক্‌তে বলে কোথা চলে গেল আর এল না। আমার বড় ভয় করচে দাদা, তুমি আমায় বাড়ী রেখে এস।" বিহারী সুধীরকে কোলে করিয়া বিপিনের অনেক অনুসন্ধান করিল—কিন্তু সেই নরসাগরের তুমুল তরঙ্গের ভিতর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বিপিন ১৬।১৭ বৎসরের বালক—হরিহর বাবুর বাটীর পার্শ্বে থাকে—সুধীর তাহাকে বিপিন কাকা বলিয়া ডাকে।

তখন সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিয়াছে। বিহারী সুধীরকে কোলে লইয়া জনতা ভেদ করিয়া গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। এখন তাহার নেশা বেশ জমিয়াছিল—শিশুর অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার কখানি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। পদ্মমণির মুখশশী তাহার হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল "যদি আজ সে এই অলঙ্কার কয়খানি পায় তাহা হইলে কাল সে বিবাহ করিতে পারে। পরের ছেলের উপর এত মমতা কেন? এ'কে যদি আর নাই পাওয়া যায়—লোকে আমাকে দোষী করিতে পারিবে না। সমস্ত দোষ বিপিনের উপর পড়িবে।" নেশার ঝোঁকে তাহার হৃদয়ের এতটা স্নেহ মমতা যেন বায়ুবিতাড়িত মেঘের ন্যায় নিমেষে ভাসিয়া গেল। বাণবিদ্ধ বরাহের ন্যায় সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতে লাগিল—চুলগুলা মস্তকের উপর সোজা হইয়া উঠিল, হৃদয়টা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া গেল। সে সজোরে সুধীরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সুধীর তখন তাহার দাদার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে; কি সরল বিশ্বাসপ্রবণ বালকের মন! কি গভীর নির্ভরতা! বিহারী সুধীরকে লইয়া

অনেকটা পথ চলিয়া গেল। তখন জ্যোৎস্নাকুল আকাশে দুই একখানি করিয়া কাল মেঘ জমিতেছিল। একটা জঙ্গলের নিকট বিহারী সুধীরকে নামাইয়া তাহার হাত হইতে বালা দুইগাছি সজোরে টানিয়া লইল—গলা হইতে হার ছড়াটি খুলিয়া লইল। বালক সুধীর "মা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর বিহারী বালকের কুসুমপেলব গণ্ডস্থলে সবলে চপেটাঘাত করিল, অমনি সুধীর ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল! তাহার ক্রন্দন সহসা নীরব হইয়া গেল! একি! সে কি তবে নাই! তখন গঙ্গার জল স্ফীত হইয়া কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বিহারী ভীত চকিতচিত্তে তাড়াতাড়ি সুধীরকে নিকটস্থ হোগলা বনের ভিতর ফেলিয়া দিল! কল্লোলিনী তাহাকে আপনার পুত্রবক্ষে ধরিয়া লইল! এ দৃশ্যে যুবস্থ জ্যোৎস্না যেন শিহরিয়া উঠিল!

৩

"কাকিমা সুধীর বাড়ী এয়েচে ?

সরলা বিস্মিতভাবে বলিল "সেকি বাবা! তুমি তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রথ দেখতে নিয়ে গেলে ; সে কার সঙ্গে বাড়ী আসবে ?"

"সর্ব্বনাশ হয়েচে" বলিয়া বিপিন কাঁদিয়া ফেলিল!

সরলা রুদ্ধশ্বাসে বলিল "ওরে আমার মাণিকের কি হয়েচে বলবে—আমার প্রাণটা যে ফেটে যাচ্ছে।"

বিপিন চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "কাকিমা আমি তাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে রথ টান্‌তে গেলুম—ফিরে এসে আর দেখতে পেলুম না। ভাবলুম হয়ত সে কারুর সঙ্গে বাড়ী এসেছে।"

"সেকিরে"—বলিয়া সরলা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

বিপিন সুধীর সুধীর বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রাস্তার আসিয়া রজনীর ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া মাহেশের দিকে ছুটিতে লাগিল—তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তাহার দৃকপাত নাই, তাহার প্রাণের ভিতর যে আগুন জ্বলিতেছিল, বাদলের শত ধারা কি তাহা নিভাইতে পারে ?

৪

এখন বিহারীর নেশা ছুটিয়াছে। তাহার সমস্ত কথা স্মরণ হইল। তাহার প্রাণটা যেন ফাটিয়া শতখান হইয়া গেল। যে শিশু দাদা বলিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া আসিয়াছিল, নিরাপদ ভাবিয়া বালক যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সমস্ত প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া যাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতেছিল—সে কিনা আজ সেই নির্ভরপরায়ণ অসহায় শিশুকে হত্যা করিল—তাহার বিধবা মাতার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল! বিহারী আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল—আর শত ধিক্কার দিল মথুর মণ্ডলের কন্যার সেই চাঁদপানা মুখখানাকে! সে যখন বাড়ী ফিরিয়া সরলার ব্যাকুল হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন শুনিল তখন তাহার বুকের ভিতর কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। সরলার সেই হৃদয়বিদারক বাক্য "ওরে বাবা আমার রে" যেন তাহার হৃদয়টা খান খান করিয়া কাটিয়া হলাহল ঢালিতে লাগিল। কি ভীষণ সে জ্বালা! সে যাতনায় ছটফট করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে কিন্তু আকাশে মেঘ জমাট বাঁধিয়া

অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে।—বিহারী এই ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। কর্দ্দমাক্ত পথে শত আছাড় খাইয়া সে সেই হোগলা বনের ভিতর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল—সমস্ত হোগলা বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল—যদি সে একবার তাহাকে পায়! বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া একটা পেচক বিকট স্বরে ডাকিয়া উঠিল বিহারীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না—সে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য! আত্মহারা!

বিহারী জ্ঞানশূন্য ভাবেই সেই বনের ভিতর আঁতি পাঁতি করিয়া সুধীরকে খুঁজিতে লাগিল! হঠাৎ বিহারীর মনে হইল—সে কি ভুল করিয়াছে—এখানে সে কাহাকে খুঁজিতেছে? তাহাকে যে সে গঙ্গার তরল বক্ষে রাখিয়াছিল! সে উন্মাদের ন্যায় গঙ্গার দিকে ছুটিল—সুধীরকে ফিরাইয়া আনিতে—গঙ্গার কূলে দাঁড়াইয়া সে 'সুধীর' 'সুধীর' বলিয়া আকুলস্বরে ডাকিতে লাগিল—সে শব্দে—স্তব্ধ মৌন নিশীথ-জ্যোৎস্না যেন কাঁপিয়া উঠিল! উন্মত্ত বিহারী ভাবিল সুধীর হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে জাগাইয়া আনিতে হইবে! সেই সময় গঙ্গার বক্ষে দূরে—কি একটা ভাসিয়া যাইতেছিল—বিহারী মনে করিল—ওই বুঝি সুধীর! বিহারী আর বিলম্ব করিতে পারিল না—সুধীর সুধীর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেই জ্যোৎস্নাপ্লুত স্ফীত গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

* * * *

পরদিন পাগলের মত বেশে বিহারী যখন হরিহর বাবুর বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল—তখন আর সুধীরের মাতার হৃদয় বিদারক ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। উঠানে পা দিয়াই সে দেখিল সেখানে লোকারণ্য।

একজন জেলে কিছু পূর্ব্বে নদীতীরে শিশুকে পাইয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। উঠানের মধ্যস্থলে সে শায়িত, মাতা ও চিকিৎসক তাহার সেবা করিতেছেন; লোকজন তাঁহাদের ঘিরিয়া আছে। বিহারী সকলকে ঠেলিয়া শিশুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত রাত্রি সন্তরণে তাহার আর্দ্র চুল, অর্দ্ধ বসন হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে,—চক্ষু জবা-ফুলের মত লাল, মুখ অস্বাভাবিক পাংশু বর্ণ—সে বিকট দৃষ্টিতে শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া "হায় হায় কি হইল, পারিলাম না পারিলাম না—মরিয়া গেল—মারিলাম"—সুভীষণ কাতর কণ্ঠে এই কথা বলিয়া কটিবস্ত্রের অলঙ্কার কয়খানি ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

ভগবানের কৃপায় মুমূর্ষু বালক পুনরায় জীবনলাভ করিল; কিন্তু বিহারী?

নদীতীরে যেখানে মৃতপ্রায় সুধীরকে পাওয়া গিয়াছিল বিহারীর মৃত দেহ দুই দিন পরে ভাসিয়া আসিয়া ঠিক সেই স্থানেই লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন "অনুমানৈস্তবাবিষয়ত্বাৎ"—আত্মা অনুমানের বিষয় নয়। প্রাচ্য দার্শনিক বলিয়াছিলেন "আত্মা সংশয় করে, অতএব আছে" Cogito ergo sum। প্রকৃত পক্ষে যদিও "আত্মা সংশয় করে, অতএব আত্মা আছে" ইত্যাদি বাক্য অনুমানের মতনই দেখায়, বস্তুতঃ তাহাতে ন্যায় যাহাকে অনুমান বলে, অর্থাৎ ধূমলিঙ্গ দর্শনে অগ্নির অনুমানের ন্যায়, কোন লিঙ্গ পরামর্শ জন্য জ্ঞান নাই। "আত্মা সংশয় করে" এই কথার মধ্যেই 'আত্মা আছে,' এই কথাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে পাশ্চাত্য দার্শনিকের উক্ত বাক্যেও দেখা যায় আত্মার সত্তা সাক্ষাৎ অনুভূত, বা মাণ্ডুক্যোপনিষদুক্ত "একাত্ম প্রত্যয়সারং"—একমাত্র আত্মপ্রত্যয়েরই বিষয়। শঙ্করের মতে আত্মা অনুমানগম্য নয়। শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন:—"ব্রহ্ম সকলের আত্মা, অতএব ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্যক্ সিদ্ধ। সকলেরই আপন অস্তিত্ব জ্ঞান আছে। "আমি নাই" এরূপ কেহ অনুভব করে না। আত্মা নাই এ কথা সত্য হইলে সকলেই অনুভব করিত 'আমি নাই।" (১) শুধু তাহা কেন,—"আমি নাই' এরূপ অনুভব করি," অতএব 'আমি আছি' একথা বলাও অসঙ্গত নয়, কারণ আমি না থাকিলে 'আমি নাই' এরূপ অনুভব করিবে কে? জনকের সভায় উষস্তি চাক্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন:—"লোকে যেরূপ চিহ্নিত করিয়া দেখায় এই গো, এই অশ্ব, এইরূপ করিয়াই দেখাইতে হয়। সর্ব্বান্তর্য্যামী আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে এরূপ করিয়া দেখাও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমি ত বলিয়াছি তোমার যে আত্মা তাহাই সকলের আত্মা"। উষস্তি আবার বলিল "কোন্‌টি সকলের আত্মা? কোন্‌টি সকলের আত্মা আমাকে বিশেষ করিয়া দেখাও"। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন:—"দৃষ্টি কার্য্যের দ্রষ্টাকে দৃষ্টিকার্য্য দ্বারা দর্শন করা যায় না, শ্রবণ কার্য্যের শ্রোতাকে শ্রবণ-কার্য্য দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, মননকার্য্যের মন্তাকে মননকার্য্য দ্বারা মনন করা যায় না, বিজ্ঞানকার্য্যের বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞানকার্য্য দ্বারা জানা যায় না। দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ, নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব দর্শন-শ্রবণাদির অতীত বা অবিষয়"। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন; "উষস্তি যখন বলিলেন ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় আত্মাকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া দেখাও। তাহা করা অসম্ভব জানিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাহা করিলেন না। অসম্ভব কেন? আত্মা-বস্তুর স্বভাবই ঐরূপ। কিরূপ? দৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব। দৃষ্টি-ক্রিয়ার দ্রষ্টাই আত্মা। দৃষ্টিই দুই প্রকার; লৌকিকী এবং পারমার্থিকী। তন্মধ্যে লৌকিকী দৃষ্টি চক্ষুঃসংযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষ (mental state)। সে দৃষ্টি করা যায়, তাহার আ ন্ত

(১) সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। সূত্র ভাষ্য অ১—পা১—সূ১।

এবং শেষ আছে। আত্মার যে পারমার্থিকী দৃষ্টি তাহা অগ্নির উষ্ণত্ব, এবং প্রকাশকত্বের ন্যায়। তাহা দ্রষ্টার স্বরূপভূত, তাহার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। ক্রিয়মাণ উপাধিভূত লৌকিকী দৃষ্টির সহিত সেই পারমার্থিকী দৃষ্টি সম্বন্ধ আছে। চক্ষু দ্বারা রূপ বিষয়ে যে লৌকিকী দৃষ্টি-ক্রিয়া করা হয়, তাহা সেই নিত্য পারমার্থিকী আত্মার দৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ, তাহারই ছায়া-স্বরূপ। তাহা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই যেন জন্মে এবং বিনষ্ট হয়। দ্রষ্টার স্বকীয় পারমার্থিকী নিত্য দৃষ্টি দ্বারা লৌকিকী দৃষ্টি ব্যাপ্ত। দ্রষ্টার কর্ম্মভূত সেই লৌকিকী দৃষ্টি দ্বারা দ্রষ্টাকে দেখা যায় না। দ্রষ্টার কর্ম্মভূত লৌকিকী দৃষ্টি রূপ-সম্বন্ধী, রূপেরই প্রকাশক। সেই লৌকিকী দৃষ্টির ব্যাপক, মনোবৃত্তি সকলের ব্যাপক, সর্ব্বগত আত্মাকে লৌকিকী দৃষ্টি ব্যাপন করিতে পারে না, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সেই সর্ব্বগত, দৃষ্টি-কার্য্যের দ্রষ্টা-স্বরূপ আত্মাকে দর্শন করা যায় না। আত্ম-বস্তুর স্বভাবই এইরূপ। এই কারণেই গবাদির ন্যায় আত্মা দেখান যায় না।"

আবার যাজ্ঞবল্ক্য জনককে উপদেশ করিতেছেন:—"পুরুষ বা আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ (২)—অথবা স্বপ্রকাশ। তিনি বলিতেছেন, "আত্মা সুষুপ্তি কালে (৩) যে দেখে না—তখন দেখিয়াও দেখে না (Subconscious)। দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা অবিনাশী। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে ভিন্নরূপে দেখিবে।" ঘ্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা। "সুষুপ্তি কালে আত্মা যে জানে না, তখন সে জানিয়াও জানে না (নতুবা সুষুপ্তির স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হইবে?) বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা অবিনাশী। তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে ভিন্নরূপে জানিবে।"(৩) ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, "স্বয়ং-জ্যোতিঃ অর্থ এই যে চৈতন্য আত্মারই স্বভাব। অগ্নির উষ্ণত্বের ন্যায়, চৈতন্যই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সে এক হইয়াও কিরূপে আত্ম-স্বভাব পরিত্যাগ করে বা অচেতন হয়,—চৈতন্যাত্মস্বভাবতা এবং অজ্ঞানতা দুই বিরুদ্ধ? বাস্তব বিরোধ নাই। সুষুপ্তিকালেও যে দেখে না তাহা নয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে দেখে না, তাহা ত আমরা সকলেই জানি, কারণ চক্ষু মনাদি দর্শনের যে সকল করণ (যন্ত্র) তাহারা কোন কার্য্য করে না। দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য করিলেই আমরা বলি 'দেখে' বা 'শোনে'। অতএব সুষুপ্তিতে দেখে-শোনে না। তাহা নয়, দেখিয়া থাকে। কিরূপে? অগ্নির উষ্ণত্ব যতক্ষণ অগ্নি থাকে ততক্ষণ থাকে, আত্মার দৃষ্টিও সেইরূপ। আত্মা অবিনাশী, অতএব আত্মার দৃষ্টিও অবিনাশী। এ কথাও বিরুদ্ধ কারণ দৃষ্টি দ্রষ্টারই ক্রিয়া। দ্রষ্টা দৃষ্টি করে, অতএব

(২) "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।" ১৪। ব্রাহ্মণ ৩। অধ্যায় ৬। বৃহদারণ্যক।

(৩) "বিশেষ-বিজ্ঞানোপশম-লক্ষণং সুষুপ্তং"। সূত্রভাষ্য অ-৩ পা-২ সূত্র-৭।

(৪) যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্‌বৈ তন্ন পশ্যতি। ইত্যাদি ৩০। ব্রাহ্মণ ৩। অধ্যায় ৬। বৃহদারণ্যক।
Compare "Substance of the soul unknowable" in Herbert Spencer's "Psychology."

দৃষ্টি কূতক। সেই (কূতক) দৃষ্টির বিনাশ হয় না, কিরূপে বলা যায়? সূর্য্যের প্রকাশকত্বের ন্যায়। আদিত্যাদি নিত্য-প্রকাশ স্বভাব হইয়া, যেমন তাহাদের নিজের স্বাভাবিক নিত্য প্রকাশ দ্বারাই সকল বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই আত্মারও অবিপরিলুপ্ত-স্বভাব নিত্য দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়। আদিত্যাদির প্রকাশয়িতৃত্ব যেমন তাহাদের অক্রিয়মান নিত্য স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেই উৎপন্ন, সেইরূপই দ্রষ্টার দৃষ্টিও তাঁহার অবিপরিলুপ্ত দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। ইহাতে বিরুদ্ধ কিছুই নাই। স্বপ্নকালে চক্ষুরাদি উপরত হইলেও আত্মার দৃষ্টির অবিপরিলোপ দেখা যায়। অবিপরিলুপ্ত দৃষ্টি বা স্বয়ং-জ্যোতিঃ স্বভাব হেতু সুষুপ্তিকালেও আত্মা দেখে। তবে দেখে না বলা [illegible] কেন? দৃষ্টি ক্রিয়ার বিষয়ীভূত, দ্রষ্টা হইতে পৃথক্‌রূপে বিভক্ত অন্য দৃষ্টির বিষয় কিছুই নাই, যাহাকে দেখিবে। পরিচ্ছিন্ন-দ্রষ্টার বিশেষ-দর্শনের জন্য পৃথক্‌রূপে করণ সকল স্থাপিত আছে। করণ সকলের অভাবে বিশেষ দর্শন হয় না। বিশেষ-দর্শন করণেরই কার্য্য, কেবল আত্মার কার্য্য নয়। তবে আত্মার কার্য্যের ন্যায়ই দেখায়।"

অনুমানাদি দ্বারা আত্মার সত্তা প্রতিপন্ন করা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শঙ্করের একটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন:—"মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে। এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।" "প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করে যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন,—সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কি? না, ইন্ধন কাষ্ঠে দাহিকা শক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিতে।"

শ্রীবিজনদাস দত্ত।

ভুল।

সাগর তীরে বালুকা ঘিরে
বাঁধিনু যে রে ঘর,
কেমনে তনু রাখিবে অণু
মানিনু নাহি ডর।
উঠিল যবে ভাঙ্গন রবে
চলিয়া ফুলি জল,
নিমেষ পাতে আপন সাথে
লইল মোরে তল।
অতল তলে সাগর জলে
পড়িয়া আজি হায়!
কাতরে স্মরি কেমনে তরি
কেমনে দিন যায়!
সাগর যবে শুকাবে তবে
পাইব আমি কূল,
ফিরিব দ্বারে হেরিব যারে
জানাব মম ভুল।
আজি এ আশা, অকূলে ভাসা
দুকূলে সীমা নাই,
বালুকা পরে কেহ যেন রে
না রচে গৃহ ভাই।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

অমর কবি শেলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে অনেক বড় বড় কবি জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ্‌, সাদে, স্কট্‌, বায়রণ্‌, শেলি ও কীট্‌স্‌ এই সাতজনই প্রধান। ইঁহারা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত এবং ইঁহাদের কবিতায় কতকগুলি সমান ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং ধারণা (theory) লিখিয়া গিয়াছেন। মোটা-মুট বলিতে গেলে ইঁহাদের সময়ের কবিতায় মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে সেইটারই ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

শেলি ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে সাসেক্সের অন্তর্গত ফিল্ড্‌ প্লেস্‌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন। শেলি এবং বায়রণের জীবনে অনেক মিল দেখা যায়। এই দুই বাল্য সুহৃৎ; উভয়েই উচ্চবংশসম্ভূত ছিলেন; উভয়েরই অল্পবয়সে মৃত্যু হয়; কেহই সংসারে সুখী হইতে পারেন নাই; এবং সারাজীবন দুঃখে কাটাইয়া ইতালী দেশে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন। দুই জনেই সারাজীবন প্রজার প্রতি রাজকর্ম্মচারীর নিষ্ঠুর অত্যাচার দমনে সচেষ্ট ছিলেন, এবং এই কারণে ইঁহারা বিদ্রোহী কবি আখ্যা পাইয়া ছিলেন।

বাল্যকালে শেলি অতি কোমল স্বভাব এবং মেধাবী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উগ্র মেজাজের বালক ছিলেন। স্কুলের বালকেরা তাঁহাকে "পাগল শেলি" বলিয়া ডাকিত। ইটনে অধ্যয়ন কালে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার ভগিনীর সাহায্যে একখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। এখানি কোনো কাজের বইই হয় নাই। অল্পদিন হইল এখানি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। এই সময়েই শেলি অতি অসম্ভব রকম ঘটনা বিন্যাস করিয়া জাস্‌ট্রাজি (Zastrozzi) এবং সেণ্ট আরভাইন্‌ নামে দুই খানি উপন্যাস রচনা করেন। ইহা "মঙ্ক" লিউইস্‌ এবং মিসেস্‌ র‍্যাডক্লিফের ভুতুড়ে গল্পের অনুকরণে লিখিত।

১৮১০ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তথায় টমাস্‌ হগ্‌ নামে তাঁহার এক সহপাঠীর সহিত মিলিত হইয়া "নাস্তিকতার প্রয়োজন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার ফলে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। ইহাতে শেলি মনে খুব আঘাত পাইয়াছিলেন।

বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শেলি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডনে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার ভগিনীর সহপাঠী হ্যারিয়েট ওয়েষ্ট্রুক্‌ নামে এক বালিকার ভালবাসায় পতিত হন। হ্যারিয়েট সামান্য এক হোটেল ব্যবসায়ীর কন্যা, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শেলির ন্যায় ব্যক্তির সহিত বিবাহ সৌভাগ্যের বিষয়ই ছিল। শুনা যায় হ্যারিয়েট নাকি একখানি পত্রে তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে তিনি

যে দুর্ব্যবহার পাইতেছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শেলিকে অনুরোধ করেন। শেলি দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন এবং এডিনবর্গে উভয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহে শেলির পিতা আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করেন এবং পুত্রকে গৃহে স্থান দিবেন না এইরূপ বলেন।

বিবাহের পর কিছুদিন উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিলেন এবং আয়ারলণ্ড, ওয়েল্‌স্, ডেভনসায়র, বার্কসায়ার, হ্রদপ্রদেশ ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়ে শেলি রাজনৈতিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় নানা অদ্ভুত খেয়াল প্রকাশ করেন। একখানি বিদ্রোহসূচক পত্র ও একটী কবিতা রচনা করায় ফলে তিনি ওয়েল্‌সে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ বিবাহের পর তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করেন। অনেকে বলেন হ্যারিয়েটের চরিত্রদোষই ইহার কারণ। বাস্তবিক তাঁহার গৃহ অতি নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহার সুখের দিকে হ্যারিয়েটের দৃষ্টি ছিল না। হ্যারিয়েট তাহার সন্তানকে আদর যত্ন করিতেন না, এবং পত্নীর ব্যয়াতিশয্যে শেলির আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত অসচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আসল কথাটি এই যে শেলি ইতমধ্যে মেরি গড্-উইন্‌কে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন।

শেলি

মেরি গড্‌উইনের পিতা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে শেলির গুরু। তিনিই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে স্ত্রীপুরুষ অবারিতভাবে সমাজে মিশিবে ও আলাপ করিবে। তাঁহার

কন্যাকে লইয়া শেলির সুইজারলণ্ডে পলায়ন তাঁহারই শিক্ষার বিষময় ফল। দুই বৎসর পরে হ্যারিয়েট জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলে পর শেলি মেরি গড্উইন্‌কে বিবাহ করেন। শেলি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই হ্যারিয়েট্ যে আত্মহত্যা করিলেন ইহা নাও হইতে পারে। অন্ততঃ হ্যারিয়েটের ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পায় নাই; আর আত্মহত্যার সঙ্কল্প হ্যারিয়েটের মনে বরাবরই ছিল।

এই সময়টিই তাঁহার কবিজীবনের আরম্ভ। মেরি গড্উইনের সহিত বিবাহের পর তাঁহারা কিছু কাল মারলোতে বাস করেন। ১৮১৬খৃঃ অব্দে তিনি "অ্যালাষ্টর বা নির্জ্জনের আত্মা" নামক কবিতায় তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্বের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। "অ্যালাষ্টর" কবিতায় মানব চিত্তের কোনো বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অকপট ও পবিত্রচিত্ত কোন যুবক জগতে যাহা কিছু সুন্দর এবং মহৎ সেইরূপ কল্পনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতির ধ্যানে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার কিরূপ অবস্থা ঘটে, কবি তাহাই দেখাইতেছেন। যতই সে জ্ঞান অর্জ্জন করে ততই তাহার জ্ঞানপিপাসা বাড়ে। বাহ্যিক জগতের সৌন্দর্য্য তাহার কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও কত প্রকার কল্পনা লইয়া আসে। মরীচিকার ন্যায় এই সকল কল্পনার অন্বেষণে দুঃখ নৈরাশ্যে অকালে তাহার জীবনের অবসান হয়।

তৎপরে প্রিন্স এ্যাথেনেস্, রোজালিণ্ড ও হেলেন এবং ইস্লামের বিদ্রোহ কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি জন্মের মত ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। শেষ জীবনটুকু তিনি ইতালীতেই কাটান। বায়রন্ এবং লিহণ্টের ন্যায় সুহৃদের সহিত ফ্লোরেন্স, পিসা ও ইতালীর নানা নগর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এই সময়ে তিনি ছোট বড় অনেক কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করেন।

'এডোনাইস্' সম সাময়িক কবি কীট্সের মৃত্যুতে কবিহৃদয় হইতে উত্থিত একটি শোকের উচ্ছ্বাস। শেলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এডোনাইসের মৃত্যুর সময় কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ কোথায় ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করেন নাই কেন?

"All he had loved, and moulded
in to thought,…
Lamented Adonais."

এডোনাইস্ যে সকল বস্তু ভালবাসিতেন, যাহাদের বিষয় কবিতা লিখিতেন, তাহারা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রভাতের সূর্য্যকিরণে আর সে সৌন্দর্য্য নাই, বনফুলে আর সে সুগন্ধ নাই, মধুর বসন্তকালের আর সে শোভা নাই। বসন্ত ঋতু যেন শোকে উন্মত্ত হইয়া সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের কোরকগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই সময় কোয়াটার্লি রিভিউতে কাট্সের কবিতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। শোক একটু প্রশমিত হইলে শেলি বলিতেছেন,—

"He is made one with nature."

এডোনেইসের আত্মা প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আর শোকের

প্রয়োজন নাই। সংসারে যাহাকে আমরা সুখ মনে করি তাহা অশান্তি মাত্র। এডোনেইস্ এ সকল হইতে বহুদূরে শান্তি ধামে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

শেলি তদানীন্তন ইংরাজ সমাজের যে সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, Ode to the West Wind কবিতাটির শেষে তাহার উল্লেখ আছে।

"If winter comes, can spring be far behind?"

শীতের পরেই বসন্তকাল আসে, এটা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। অধঃপতিত (অবশ্য শেলির মতে) ইংরাজ সমাজেরও যে এই পাপের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে নবযুগের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য সময় আসিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ক্ষুদ্র বীজ যেরূপ বৃক্ষে পরিণত হয়, মেঘ বৃষ্টি যেমন ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তোলে, পবন যেরূপ সমুদ্রসলিলকে আন্দোলিত করে, সেইরূপ শেলির কবিতাও সমগ্র ইংলণ্ডকে সংস্কৃত করিয়া নবযুগের পুণ্য-মন্ত্র প্রচার করিবে—ইহাই সংক্ষেপে কবিতাটির অর্থ।

ইউগেনিয়ন পর্ব্বতে রচিত কবিতাটি ইতালীর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম বর্ণনা। এই দুঃখযাতনাপূর্ণ মানবজীবনে সময়ে সময়ে আমরা প্রাকৃতিক শোভা হইতে আনন্দ পাই এবং তদ্দ্বারাই মানুষের নিষ্ঠুরতা অত্যাচার ভুলিয়া থাকি—এই ভাবই কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

'Hymn to intellectual beauty' বা মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতি কবিতাটিও শেলির ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ। কবি শৈশব হইতে মানসিক সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"Thus let thy power···
...to my onward life supply
Its calm."

"তুমি আমার জীবনে শান্তি আনিয়া দাও; আমি অশৈশব তোমারই পূজা করিতেছি, তোমা হইতেই আপনাকে সম্মান, করিতে এবং সকল মানবকে স্নেহ করিতে শিখিয়াছি।"

"শেলি এবং প্রমিথিঃস্ আনবাউণ্ড"ও বোধ হয় এই সময়ের লেখা। ১৮২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার সকল কবিতা একত্র করিয়া মুদ্রিত করা হয়।

বিধাতা কিন্তু তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে অধিকদিন এ দুঃখক্লেশপূর্ণ জগতে রাখেন না। ঐ বৎসরেই জুলাই মাসে শেলি এক বন্ধুর সহিত নৌকায় 'লেগহর্ণ' যান। হঠাৎ প্রবল বাত্যায় নৌকাটি জলমগ্ন হয় এবং দশ দিন পরে শেলির মৃতদেহ সমুদ্রতীরে পাওয়া যায়। ১৬ই আগষ্ট তারিখে বায়রন্, লি হণ্ট ও, শেলির অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহার দেহ চিতায় ভস্ম করেন।

ইহাই সংক্ষেপে শেলির জীবন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এ কথা বেশ বলা যায় যে সংসারের অভিজ্ঞতা তিনি কখনও লাভ করেন নাই, এবং সংসারের কঠোরতা ও নির্ম্মমতা তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া দিতে পারে নাই। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি শিশুই ছিলেন। জীবনের দায়িত্ব ও গুরুভার কখনও বুঝিতেন না। সমার্দ্রচিত্ত এবং সকলের হিতৈষী হইলেও তিনি সংসারে অনভিজ্ঞতা-

বশতঃ কতকগুলি নিতান্ত নিষ্ঠুর কার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। নবযুগের একজন প্রধান কবি, ধনীসন্তান, সুপুরুষ, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, মধুর কোমল এবং উদারচিত্ত—এ গুণরাজি সত্ত্বেও তিনি নিজেই নিজের জীবনকে দুঃখ শোকে গ্রথিত একগাছি নিরানন্দের মালায় পরিণত করিয়াছিলেন। জন্মাবধি তিনি কোন্ এক পবিত্র সুখ এবং সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিয়াছিলেন তিনি সারা জীবনই সেই স্বপ্নরাজ্যের অন্বেষণে কাটাইয়া ছিলেন। কল্পনা রাজ্যের এই আদর্শ তাহার বাস্তব জীবনের সহিত যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছিল তাহাই তাঁহার জীবনের সাফল্যহীনতার কারণ। তিনি স্বয়ং যে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন সমাজকেও সেইরূপ অত্যাচারে জর্জ্জরিত মনে করিতেন।

"Sceptres, tiaras, swords, and
chains, and tomes
Of reasoned wrong, glozed on by
ignorance."

রাজদণ্ড, রাজমুকুট, সৈন্যসামন্ত, কারাশৃঙ্খল এবং রাজনীতি এ সকল তাঁহার মতে অত্যাচারের কৌশল মাত্র। আইনের দোহাই দিয়া অত্যাচারকে যুক্তিদ্বারা সুবিচার এবং সুশাসন প্রতীয়মান করা হয় ইহাই শেলির বিশ্বাস। কতকগুলি জিনিষ শেলি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন,—

That common, false, cold, hollow,
talk
Which makes the heart deny the
'yes' it breathes."

আমাদের সভ্যজগতে লোকের আচার ব্যবহার সরল বা অকপট নহে। তাহাদের "মুখে মধু, হৃদে শুধু ছলনা।" হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া না চলিলে সভ্য জগতে মেশা যায় না। এই সকল ধারণার ফলে তিনি সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত আকারেই দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সে ব্যাধির একমাত্র ঔষধ, পৃথিবীকে স্বর্গ —তাঁহার কল্পনার আদর্শরাজ্যে—পরিণত করিবার একমাত্র উপায়—প্রচলিত সকল রীতি নীতি উঠাইয়া দেওয়া। তিনি প্রজাতন্ত্র পক্ষপাতী হইয়া ভ্রাতৃভাব, সাধারণ তন্ত্র, সাম্যভাব এবং নাস্তিকতা প্রচার করেন। বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। নিজের সন্তানের ভার গ্রহণে পর্য্যন্ত অক্ষম বিবেচিত হন। কল্পনার উচ্চ আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি এরূপ দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল যে সংসারের আর কোনো দিকে তিনি দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই, প্রতি পদেই তাঁহাকে ঠেকিতে হইয়াছে। মানবজীবন সম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান কবিগণের থাকা উচিত তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার কবিতার চাতকপক্ষীর ন্যায় তাঁহার নিজের চিত্তও সংসারের বাস্তবিকতা হইতে অনেক উচ্চে থাকিত। কাব্যে তিনি যখন চরিত্র বা বাস্তব ঘটনা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন তখন তাহা অবাস্তব এবং অসম্ভব হইয়া পড়িত, যেন সে চরিত্র এ জগতের নহে অন্য কোনো কল্পনা রাজ্যের। শেলির জগৎ এবং আমাদের এই জগত এক নহে; তাঁহার কল্পনারাজ্য এ জগতের সম্পূর্ণ বাহিরে।

প্রকৃতিদেবীই এরূপ চিত্তের এক মাত্র সান্ত্বনা। সমাজবন্ধনের মধ্যে থাকা অপেক্ষা

অরণ্যে বা সমুদ্রতীরে, কোনো বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে শেলি অধিক আনন্দ পাইতেন। পর্ব্বতমালা, মেঘপুঞ্জ বা শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রগুলি তাঁহার নিকট যেন সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইত এবং মানবের সংসর্গ অপেক্ষা এইগুলির সংসর্গে তিনি অধিক সুখী হইতেন। উষার কিরণস্পর্শে জগত পুলকিত হইয়া উঠিয়া কবির মনেও পুলকের সঞ্চার করিত। সমুদ্রের ঢেউগুলি আপনমনে কাঁপিতে কাঁপিতে নাচিত এবং কবির প্রাণকেও নাচাইয়া তুলিত। শেলি জীবনের অনেক অংশ নৌকায় নদীবক্ষে কাটাইয়াছিলেন—। টেম্‌স্ নদীর উপর, জেনেভা হ্রদের উপর এবং ইতালীয় নদীর উপর তাঁহার দিন কাটিত। নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থান তিনি ভাল-বাসিতেন। তাঁহার কবিতায় যে একটা বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয় ইহার সহিত তাহার যোগ আছে। তাঁহার কবিতায় আছে,—"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

শেলির গীতিকাব্য গুলিই তাঁহার রচনার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তাঁহার জীবনটাই গীতের উচ্ছ্বাস। কোন এক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন যে মিষ্টতা বা মধুরতাই কবিতার প্রধান গুণ। আমার বোধ-হয় শেলির কবিতার ন্যায় মধুর কবিতা ইংরাজী সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার কবিতার এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় মাদকতা আছে যাহা আমাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলে। এটি কোল্‌রিজ্ এবং ব্লেক্ ভিন্ন অন্য কোনো ইংরাজ কবিতে বড় পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত শেলির কবিতায় ভাব কিম্বা অর্থসম্পদ তত বেশী নাই মধুরতা যত আছে; কোনো কোনো স্থলে অর্থ অনিশ্চিত ও জটিল। এই বিষয়ে "ফেয়ারি কুইন" রচয়িতা স্পেন্সারই শেলির একমাত্র তুলনা। কবিতাপাঠ আনন্দ এবং সান্ত্বনার নিমিত্ত—ইহা উপভোগ করিবার সামগ্রী। শোকতাপময় সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে যখন আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে তখন কবিতাপাঠে আমরা শান্তিলাভ করি। সে সময়ে শেলি ও স্পেন্সারকে আমাদের অন্তরের বন্ধু বলিয়া মনে হয়। এ হিসাবে স্পেন্সার এবং শেলি যথার্থ কবি। অনেক সমালোচক বলেন যে শিক্ষাদানই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সারগর্ভ নীতি শিক্ষা দিতে গেলে কবিতার সৌন্দর্য্যের প্রতি অর্থাৎ যথার্থ কবিত্বের প্রতি, দৃষ্টি রাখা চলে না। তাহা হইলে নীতিদর্শন এবং কবিত্বে প্রভেদ কি?

কবি সম্বন্ধে শেলির ধারণা তিনি নিজের কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবির সৃষ্টি বাস্তব অপেক্ষাও সত্য। কবি যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করেন সে গুলিকে শেলি বলিয়াছেন,—

"Forms more real than living man,
Nurslings of immortality."

অর্থাৎ প্রকৃত মানব অপেক্ষাও অধিকতর বাস্তব, কারণ সেগুলি অমর। মানুষ মৃত্যুর অধীন; আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু সেক্সপীয়রের নির্ম্মিত হ্যামলেট্ বা ক্লিওপেট্রা অমর; জগতে যতদিন সাহিত্যচর্চ্চা থাকিবে, এ সকল চরিত্রও ততদিন জীবিত থাকিবে।

শেলির কবিতা তাঁহার জীবনের ঘটনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত; কাব্যে তাঁহার

নিজের উচ্চ আশা এবং ভাব সকল ব্যক্ত আছে। কবি শেলি ইংরাজী সাহিত্যে একটি নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিলেন—সেটি আদর্শের ভাব বা কল্পনার ক্ষমতা। কবিতার অঙ্গে সেটি মাখানো থাকে;—যে ধরিতে পারে সেই পায়। অন্তরে শ্রদ্ধা থাকিলে তবেই সেটিকে পাওয়া যায়। সমালোচকেরা সেইজন্য আর সমস্তই দেখেন, কেবল এইটি হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহারা একটী পুষ্পকে খণ্ড খণ্ড ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখার ন্যায় কবিতাকেও ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে সৌন্দর্য্যটুকু তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো ছিল তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

শেলির কবিতায় এমন একটু সৌন্দর্য্য আছে যেটুকু ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে তাহার ভাবটুকু স্মৃতিতে অনেকক্ষণ থাকে।

"Music when soft voices die
Vibrates in the memory"

এই সুন্দর ভাবটি শেলির কবিতায় অনেকবার পাওয়া যায়। শব্দ থামিয়া গেলেও বীণার ঝঙ্কার যেমন স্মৃতি মধ্যে ধ্বনিতে থাকে, শেলির কবিতারও ঠিক সেইরূপ গুণ আছে—যাহাতে কবিতার সৌন্দর্য্যটুকু সহজে নষ্ট হয় না।

আর্ট হিসাবে ধরিতে গেলে শেলির কতকগুলি দোষ পরিলক্ষিত হয়। ভাষার জটিলতা অস্পষ্টতা, বর্ণনাশক্তির অভাব এবং বাস্তবঘটনার প্রতি দৃষ্টিহীনতা—এইগুলিই তন্মধ্যে প্রধান। তাঁহার কল্পনা সুন্দর বটে, কিন্তু ঊষার স্বপ্নের ক্ষণস্থায়ী আভাসমূর্ত্তির ন্যায় তাহা অতি অস্পষ্ট। ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সময়ে সময়ে অনেক লিখিয়া ফেলিতেন এবং এই অধৈর্য্যতাই তাঁহার কবিতার স্থানে স্থানে এক আধটু অপরিপক্কতা আনিয়া ফেলিয়াছে। কবি নিতান্ত যুবা ছিলেন; এবং সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার যুবাহৃদয়ের চিন্তাগুলিও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার কবিতা সমালোচনা করিবার সময় একথাটিও মনে রাখা আবশ্যক।

শেলির সমসাময়িক কবি কীট্‌সের মৃত্যুতে তিনি "এডোনাইস্" নামে যে শোকগাথা রচনা করেন তাহার শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তিতে তিনি নিজের সমুদ্রগর্ভে মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস দিয়া গিয়াছেন,—

"The breath whose might I have invoked in song
Descends on me ; my spirit's bark is driven
Far from the shore." ইত্যাদি

এইটি একটি অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহার কবিতার অনেক স্থলে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যবাণী দেখা যায়। "নেপল্‌সের নিকট বিষণ্ণচিত্তে লিখিত (Written in dejection near Naples) কবিতায় শেলি বলিতেছেন—

"Till death like sleep might steal on me."

তাঁহার মৃত্যু মহানিদ্রার ন্যায় হইবে, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা থাকিবে না—এরূপ একটা ধারণা শেলির মনে বরাবরই ছিল। অ্যালাষ্টর কবিতাতেও এইরূপ ভাব ব্যক্ত আছে।

শেলি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিতেই নিজের কবিত্বের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন।

অ্যারিথিউসা, Invitation, Recollection প্রভৃতি কবিতাগুলি অতি মধুর। 'চাতকের প্রতি' কবিতাটি বর্ণনার চাতুর্য্যে, কল্পনার প্রাচুর্য্যে এবং ভাষার মাধুর্য্যে ইংরাজী গীতিকাব্যের মধ্যে প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। চাতক পক্ষী যখন আকাশে উড়িতে থাকে কবির মনে হয় যেন কোনো অশরীরী আনন্দের উৎস শূন্যের দিকে উঠিতেছে। কবির উপমা কয়টি অতি সুন্দর! —"কবি যেরূপ নিজের কল্পনার মধ্যেই ডুবিয়া থাকে এবং আপন মনে গান রচনা করে, গোলাপ যেমন সবুজ পাতার মধ্যে লুকাইয়া চারিদিকে সৌরভ ছড়াইয়া দেয়, সেইরূপ এই পক্ষী সুদূর নভো কোণায় লুকাইয়া থাকে কেহ দেখিতে পায় না অথচ মধুর গানে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলে।" কবি বলিতেছেন—

"We look before and after
And pine for what is not."

কবির নিজের জীবনেও আমরা এইরূপ একটা অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছি! এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার জীবনের সফলতাহীনতার কারণ।

"Love's philosophy" নামক মধুর কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু অনুবাদ করিয়া সুবাসিত করিয়াছেন।

"প্রমিথিয়াসের মুক্তি" নামক গীতি নাটিকা প্রকাশের পরই কবি শেলি যশস্বী হইয়া উঠেন। ইহা হইতেই লোকে প্রথম বুঝিতে পারে যে ইংলণ্ডে একজন প্রধান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থখানি প্রকাশ হওয়ার পর ইহার সেরূপ আদর হয় নাই। অনেকে বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "আনবাউণ্ড" নামটি ঠিকই দেওয়া হইয়াছে কারণ এরূপ পুস্তক কে বাঁধাইয়া রাখিবে? এইরূপ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় শেলি অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। গ্রীক নাটক হইতে ইহার বর্ণনীয় বিষয়টী লওয়া হইয়াছিল। 'ঈস্কাইলাস্' "প্রমিথিয়াসের বন্ধন" নামক কাব্যের উপসংহার। ইহাতে অত্যাচারী জুপিটারের সহিত প্রমিথিয়সের মিলন দেখাইয়া যান। শেলির কাব্যে জুপিটার মানবের উৎপীড়ক, এবং প্রমিথিয়াস্ মানবের সহায় ও উদ্ধারকর্ত্তা। জুপিটারের সকল অত্যাচারই প্রমিথিয়াস্ নীরবে সহ্য করিলেন; কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল যখন অত্যাচারী জুপিটারের রাজত্ব শেষ হইল, মানবের উন্নতির পথে আর কোন বাধা রহিল না; শান্তি এবং স্বাধীনতার নবযুগ আরম্ভ হইল; শাসকের নিষ্ঠুর দণ্ড কোথায় খসিয়া পড়িল; মানব মানবকে ভ্রাতার চক্ষে দেখিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে সাম্য এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। মানবজাতির সেই পরিপূর্ণ মুক্ত অবস্থার কথাই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়।

শেলি তাঁহার সময়ের কবিগণের সহিত মিলিয়া নবযুগের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের ন্যায় মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিলনা বা টেনিসনের ন্যায় তিনি কবিতায় দার্শনিক মতও প্রচার করিয়া যান নাই, কিন্তু নবযুগের কবিগণের মধ্যে তিনি সাহিত্যকে যে একটি নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহার গতি একটি বিশেষদিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ।)

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

কপিলবস্তু।

এই প্রদেশ প্রায় ৪০০০ লি। প্রায় দশটী জনমানবশূন্য, পরিত্যক্ত নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধানীও জনশূন্য; কেবল ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। রাজধানীর পরিধি নির্দ্ধারণ করা যায় না। নগরাভ্যন্তরস্থ রাজপ্রাসাদ প্রায় ১৪।১৫ লি। রাজপ্রাসাদ ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। প্রাচীরের ভিত্তি সকল বর্ত্তমানেও দৃঢ় ও উচ্চ। অনেকদিন হইতে রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিবাসীপূর্ণ নগরের সংখ্যা অত্যল্প।

এদেশে কোন প্রধান শাসনকর্ত্তা নাই; প্রত্যেক নগর নিজ নিজ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। ভূমি উর্ব্বরা ও আকরাদি পূর্ণ। সময়ানুযায়ী কর্ষণ করা হয়। জলবায়ু সর্ব্বত্রই একবিধ, অধিবাসী কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং দয়ালু। প্রায় সহস্রাধিক সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, রাজপ্রাসাদের সন্নিকটস্থ সঙ্ঘারামে এখনও হীনযান সম্প্রদায়ান্তর্গত তিন সহস্র যতি বাস করেন।

কয়েকটী দেব মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পূজা করে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে কয়েকটী প্রাচীরের ভিত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সকল রাজা শুদ্ধোদনের প্রধান প্রাসাদের চিহ্ন। ইহাদের উর্দ্ধভাগস্থ বিহারে রাজার মূর্ত্তি আছে। অনতিদূরে আর একটী ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—এই স্থানে রাজ্ঞী মহামায়ার শয়নাগার ছিল। এই ভগ্নাবশেষের উপরে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজ্ঞীর মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। নিকটেই একটী বিহার; এই স্থানে বোধিসত্ত্ব নিজ মাতার গর্ভে অশরীরী অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিহারে এই দৃশ্যের একটী চিত্র আছে। 'মহাস্থবির সম্প্রদায়ের মতে বোধিসত্ত্ব উত্তরাষাঢ়মাসের ৩০শে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে ইহা পঞ্চম মাসের পঞ্চদশদিবস। অন্যান্য সম্প্রদায় এমাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে বলেন। তাহা হইলে আমাদের মতানুসারে পঞ্চম মাসের অষ্টমদিবসে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

প্রাসাদের যে স্থানে এই দৈব গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল তাহার উত্তর পূর্ব্বদিকে একটি স্তূপ রহিয়াছে। এই স্থানে অসিত ঋষি রাজপুত্রের কোষ্ঠি বিচার করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যে দিবস জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিবস অনেকগুলি শুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন সকল গণককে একত্রিত করিয়া তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই শিশুর শুভাশুভ আমাকে পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করুন।" তাঁহারা উত্তর করিলেন "পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের সিদ্ধান্তানুসারে এই বালকের চিহ্ন সকল অত্যন্ত শুভ সূচনা করিতেছে। যদি এই শিশু সংসারে থাকেন, তবে ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন; যদি ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে ইনি বুদ্ধ হইবেন।"

এই সময়ে ঋষি অসিত বহুদূর হইতে আগমন করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া রাজদর্শন প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরমানন্দে তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া মূল্যবান সিংহাসনে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বিনা কারণে অবশ্যই মহাঋষি এই স্থানে উপস্থিত হন নাই।" ঋষি উত্তর করিলেন "আমি দেবতাদিগের প্রাসাদে বিশ্রাম করিতেছিলাম; এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে সকল দেবতাগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন। এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য নৃত্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন" মহাভাগ, অদ্য জম্বুদ্বীপে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের প্রধানা মহিষী মায়ার গর্ভে যে রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি সর্ব্ব

বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মহাজ্ঞানী হইবেন।" এই কথা শুনিয়া আমি রাজপুত্রকে দর্শন করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমার বৃদ্ধাবস্থার জন্য আমি ইঁহাকে দেখিতে পাইব না।"

নগরের দক্ষিণ দ্বারদেশে একটী স্তূপ আছে। এইস্থানে রাজপুত্র অন্যান্য শাক্যকুমারগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হস্তীকে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুকুমার ও ব্যায়ামবিদ্যায় রাজকুমারের কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই সময়ে মহারাজ শুদ্ধোদন সমবেত জনবৃন্দের অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, সারথী ঐ হস্তীকে লইয়া নগর বহির্গত হইতেছিল। দেবদত্তও সেই সময়ে নগর প্রবেশ করিতেছিলেন; তিনি সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে কে আরোহণ করিবে?" সারথী উত্তর করিল "রাজপুত্র এখনই প্রত্যাগমন করিবেন এবং তাঁহার জন্যই আমি এই হস্তী লইয়া যাইতেছি। দেবদত্ত উত্তেজিত হইয়া তাহার কপোলদেশে আঘাত ও তাহার উদরে পদাঘাত করিয়া হস্তীকে ভূপাতিত করিয়া রাজপথে গতায়াত বন্ধ করিলেন। হস্তীকে অপসারণে অক্ষম হইয়া পথিকগণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। পরে নন্দ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তীর হত্যাকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিকগণ উত্তর করিল "ইহা দেবদত্ত কর্ত্তৃক হইয়াছে।" নন্দ হস্তীকে পথের এক পার্শ্বে স্থানান্তরিত করিলেন। পরে রাজপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া কে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল "দেবদত্ত ইহাকে হত্যা করিয়া ইহা দ্বারা সিংহদ্বার রোধ করিলেন এবং নন্দ ইহাকে পথিপার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন।" রাজপুত্র হস্তীকে উত্তোলন করিয়া নগর প্রাকারের অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলেন। হস্তীর পতনস্থানে গভীর ও প্রশস্ত খাল হওয়াতে ঐ স্থানের নাম "হস্তীগহ্বর" হইয়াছে।

নিকটস্থ বিহারে রাজপুত্রের মূর্ত্তি আছে। ইহার নিকটেই অন্য একটি বিহার; ইহাই রাজপুত্র ও তাঁহার পত্নীর শয়নাগার ছিল; ইহার অভ্যন্তরে যশোধরা ও রাহুলের প্রতিকৃতি আছে। রাজ্ঞীর কক্ষের নিকটস্থ বিহারে শিষ্যের শিক্ষাগ্রহণের চিত্র আছে। এই স্থানেই রাজপুত্রের পাঠাগার ছিল।

নগরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী বিহারে রাজপুত্রের শ্বেত ও তেজস্বী অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি আছে; এই স্থানেই তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নগরের ৪টী সিংহদ্বারের প্রত্যেকের বহির্ভাগস্থিত বিহারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও শ্রমণের মূর্ত্তি আছে। এই সকল স্থানে রাজপুত্র ভ্রমণ কালে, নানারূপ চিহ্ন দেখিয়া পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাগমনের জন্য নিজ সারথীকে আদেশ দিয়াছিলেন।

নগর হইতে প্রায় পঞ্চাশ লি দক্ষিণে যাইয়া আমরা একটী প্রাচীন নগরস্থ স্তূপে পৌঁছি এই স্থানে কারুকুন্দ বুদ্ধ ভদ্রকল্পে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণ দিকে অন্য একটী স্তূপ আছে; এই স্থানেই, তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী স্তূপে বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন আছে; ইহারই সম্মুখভাগে ৩০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভের উর্দ্ধাংশে একটি সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। নিকটেই তাঁহার নির্ব্বাণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ইহা রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কারুকুন্দ বুদ্ধ যে নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথা হইতে ২০লি উত্তরপূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা একটী প্রাচীন নগরে উপস্থিত হই; এই স্থানে একটী স্তূপ আছে। ভদ্রকল্পে যখন মনুষ্যের পরমায়ু ৪০ সহস্র বৎসর তখন কনকমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন; এই জন্মস্থান চির স্মরণীয় করিবার জন্য স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের উত্তরপূর্ব্বদিকে আর একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ দূরস্থ একটী স্তূপে তাঁহার শরীরের অবশিষ্ট রক্ষিত আছে, ইহার সম্মুখে প্রস্তরস্তম্ভের

উপর একটী সিংহমূর্ত্তি আছে; ইহা প্রায় ২০ ফুট উচ্চ। এই স্তম্ভে তাঁহার নির্ব্বাণ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা রাজা অশোক নির্ম্মিত।

নগরের প্রায় ৪০ লি উত্তর পূর্ব্বে একটী স্তূপ আছে। রাজপুত্র এই স্থানে উপবেশন করিয়া কর্ষণোৎসব দেখিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। রাজা তরুতলে ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট রাজপুত্রকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্য করিলেন যে যদিও সূর্য্যরশ্মি তাঁহার চতুর্দ্দিকে কিরণ বিস্তার করিতেছে, তত্রাপি বৃক্ষের ছায়া স্থির রহিয়াছে; রাজপুত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতা দৃষ্টে, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইলেন।

রাজধানীর উত্তরপশ্চিমাংশে শাক্যবংশীয় ব্যক্তিগণের হত্যার নিদর্শন শত সহস্র স্তূপ। বিরুদ্ধকরাজ শাক্যগণকে পরাজিত করিয়া ঐ বংশীয় ৯৯০০ অযুত ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া, তাহাদের হত্যার আদেশ দিলেন। তাহাদের দেহগুলি স্তূপাকার করা হইয়াছিল এবং হ্রদসমূহে তাহাদের রক্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। দেবতাগণ মনুষ্যের করুণার উদ্রেক করিয়া তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া সমাধি দিয়াছিলেন।

মশানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ৪টী স্তূপ। এই স্থানে চারি জন শাক্য একদল সৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যখন প্রসেনজিৎ সিংহাসনারোহণ করিলেন, তখন তিনি শাক্যবংশের সহিত বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক হইলেন। শাক্যগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া ভৃত্যকন্যার সহিত বিবাহ দিয়া ও তাহাকে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দিয়া প্রসেনজিৎকে প্রতারণা করিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁহাকে পাটরাণী বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং এই রাণীর গর্ভেই বিরুদ্ধকরাজ জন্মগ্রহণ করেন। বিরুদ্ধকরাজ তাঁহার মাতুলগণের উপদেশানুযায়ী পাঠাভ্যাস করিতে তথায় গমন করেন নগরের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইয়া, তিনি তথায় উপাসনা গৃহ দেখিয়া রথের গতি নিবারণ করেন। শাক্যগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া বলে "কি প্রকারে নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুই শাক্যগণের নির্ম্মিত বুদ্ধের আবাস স্থল অধিকারে সাহসী হইয়াছিস্।"

বিরুদ্ধক সিংহাসনারোহণ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইলেন: এই উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া নিজ সৈন্য দ্বারা এই সকল স্থান অধিকার করিলেন। চারি জন শাক্য জল নিষ্কাশণ প্রণালীর মধ্যস্থ স্থান কর্ষণে নিযুক্ত ছিল; তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণের গতিরোধ করিল এবং তাহাদের দূরীভূত করিয়া নগর প্রবেশ করিল। অন্যান্য শাক্যবংশীয়গণ নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া উহারা যে আক্রমণকারীগণকে প্রতিরোধ করিয়াছে, এই অপরাধে উপরোক্ত চারি জন শাক্যকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিল। এই চারিজন শাক্য তুষার পর্ব্বতে গমন করে। একজন বামিয়ান, দ্বিতীয় উদ্যান, তৃতীয় হিমতাল চতুর্থ কৌশম্বীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই বংশধরগণ বংশপরম্পরায় এই সকল রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন।

নগরের ৩,৪ লি দক্ষিণে ন্যাগ্রোধবৃক্ষের কুঞ্জে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। শাক্য তথাগত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজদেশে প্রত্যাগমন করিয়া এই স্থানে পিতার সহিত মিলিত হইয়া নিজধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তথাগত মারকে পরাজিত করিয়াছেন এবং ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন এই সংবাদ অবগত হইয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তথাগতের নিকট দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করেন যে "পূর্ব্বে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে। কিন্তু এইক্ষণও তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর নাই, এইক্ষণ আমাকে দর্শন দেওয়া তোমার উচিত।" বুদ্ধদেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, সাত দিবস পরে তিনি প্রত্যাগমন করিবেন। দূত রাজার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শুদ্ধোদন প্রজাগণকে রাজপথ সুসংস্কৃত করিতে আদেশ দিলেন। পরে নিজ অমাত্যবর্গ সহ, নগর হইতে ৪০ লি অগ্রসর হইয়া রথ

হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তথাগত বহুসংখ্যক লোকসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ৮ জন বজ্রপাণি তাঁহার শরীর রক্ষকস্বরূপ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল; স্বর্গের চারি জন রাজা তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন; ইন্দ্ররাজ বহুসংখ্যক কামলোকের দেবতাসহ তাঁহার বামপার্শ্বে এবং ব্রহ্মরাজ বহুসংখ্যক রূপলোকের দেবতাসহ তাঁহার দক্ষিণে গমন করিতেছিলেন। তারাগণ মধ্যে যেরূপ চন্দ্র শোভা পান, সেইরূপ ভিক্ষুগণমধ্যে বুদ্ধদেব একাকী অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার অনৈসর্গিক ঐশ্বরিক ক্ষমতা ত্রিভুবন কম্পিত করিতেছিল; তাঁহার শারীরিক জ্যোতি সূর্য্য, চন্দ্র ও পঞ্চগ্রহের কিরণকে পরাজিত করিতেছিল। এই প্রকারে তিনি আকাশে বিচরণ করিতে করিতে স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাঁহারা এই ন্যগ্রোধকুঞ্জে বাস করিতে লাগিলেন।

সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই একটী স্তূপ; এইস্থানে তথাগত এক বৃক্ষমূলে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশনাবস্থায় নিজ পিতৃষ্বসার নিকট হইতে সুবর্ণখচিত কষায় বেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটু দূরেই আর একটি স্তূপ; তথাগত এই স্থানে রাজার আট পুত্র ও পাঁচশত শাক্যকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্ব দ্বারের মধ্যে, রাজপথের বামপার্শ্বে একটী স্তূপ আছে; এই স্থানে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ব্যায়ামশিক্ষা করিতেন।

বহির্ভাগে ঈশ্বরদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমন্দির। সদ্যোজাত রাজপুত্রকে এই মন্দিরেই আনয়ন করা হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দর্শনাভিলাষে লুম্বিনী উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। রাজা এই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "এই মন্দিরে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। শাক্যবংশীয় শিশুগণ যাহারাই আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। সুতরাং আমরা রাজপুত্রকে মন্দির মধ্যে লইয়া দেবপূজা করিব।" এই সময়ে ধাত্রী শিশুসহ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে মন্দিরস্থ দেবতা উত্থান করিয়া রাজপুত্রকে প্রণাম করিলেন। রাজপুত্রকে স্থানান্তরিত করিলে, দেবতা পুনরায় উপবেশন করিলেন।

নগরের দক্ষিণ দ্বারের বহির্ভাগে রাজপথের বাম পার্শ্বে একটী স্তূপ। রাজপুত্র এইস্থানে শাক্যগণকে ব্যায়ামক্রীড়ায় পরাস্ত ও লৌহনির্ম্মিত ঢালে তীর বিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ৩০ লি দক্ষিণপূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। এই স্থানে একটী উৎসের জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। রাজপুত্রের তীর ঢালভেদ করিয়া এই স্থানে পতিত ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জলের উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল। লোকপরম্পরা ইহাকে শরকূপ বলে। পীড়িত ব্যক্তিগণ এই জল পান করিয়া আরোগ্য লাভ করে। এবং সেইজন্য দূর দেশাগত ব্যক্তিগণ এই উৎসের কর্দ্দম লেপন করিয়া ব্যাধিমুক্ত হয়। শরকূপের ৮০।৯০ লি উত্তরপূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা লুম্বিনী উদ্যানে পৌঁছি। শাক্যগণের স্নানের পুষ্করিণী এই উদ্যানে অবস্থিত। ইহার জল দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ এবং পুষ্করিণীর উপরিভাগ নানাপ্রকার পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত।

ইহার ২৪।২৫ পদ দূরে একটী মৃত অশোক বৃক্ষ। এইস্থানে বোধিসত্ত্ব বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টম দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থবির সম্প্রদায় বলেন যে বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পঞ্চদশ দিবসে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থান হইতে পূর্ব্ব দিকে যে স্থানে দৈত্যগণ রাজপুত্রের শরীর ধৌত করিয়াছিলেন, তথায় রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ আছে। বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাসাহায্যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই সপ্তপদ করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর আমিই একমাত্র প্রভু; আমি আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিব না।" যে যে স্থানে তাঁহার পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল, সেই সকল স্থানেই পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অধিকন্তু দুই জন দৈত্য আকাশে থাকিয়া একজন উষ্ণ ও অন্য জন শীতল জলে রাজপুত্রকে ধৌত করিয়াছিল।

এই স্তূপের দক্ষিণে দুইটী উৎসের নিকট দুইটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানেই দুই জন দৈত্য ভূগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। বোধিসত্বের জন্মগ্রহণের পরক্ষণেই পরিচারকগণ শিশুর ব্যবহারার্থ জলের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়েই রাণীর সম্মুখেই ভূগর্ভ হইতে উষ্ণ ও শীতল বারি পরিপূর্ণ দুইটি উৎস প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং এই জলধারা রাজপুত্রকে স্নান করান হইল।

ইহারই দক্ষিণে অন্য একটি স্তূপ। এই স্থানে দেবাধিপতি শক্র বোধিসত্বকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বোধিসত্বের জন্মগ্রহণের পরেই, দেবাধিপতি শক্র তাঁহাকে সুন্দর ও স্বর্গীয় বস্ত্রে আবৃত করিয়াছিলেন। যে স্থানে স্বর্গীয় নৃপতি চতুষ্টয় বোধিসত্বকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, সেই স্থানচতুষ্টয় নির্দ্দেশের জন্য ৪টী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধিসত্ব যখন মাতার দক্ষিণ কুক্ষি হইতে জন্মগ্রহণ করেন তখন স্বর্গীয় দেবচতুষ্টয় তাঁহাকে সুবর্ণখচিত কার্পাস বস্ত্রে আবৃত করিয়া সুবর্ণসিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া, তাঁহার মাতার নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন "এই প্রকার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রের জন্মে রাণী অবশ্যই আহ্লাদিত হইতে পারেন।"

এই সকল স্তূপের নিকটেই রাজা অশোক নির্ম্মিত প্রস্তর স্তম্ভের উর্দ্ধদেশে অশ্বের মূর্ত্তি রহিয়াছে। পরে, দুষ্ট দৈত্য কর্ত্তৃক ইহার মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। নিকটে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। অধিবাসীরা ইহাকে তৈল-নদী বলে। বুদ্ধের জন্মের পর রাজ্ঞার স্নানের জন্য দেবতাগণ এই স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া জলপূর্ণ নদী হইলেও, ইহার জল এইক্ষণেও তৈলযুক্ত।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৩০০ শত লি যাইয়া আমরা রামগ্রামে পৌঁছি। (ক্রমশঃ)

মা।

১

মিসেস ম্যাকোহন তাঁহার এক মাত্র সন্তানটিকে জন্ম দিয়া যখনই রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই তাহার পিতৃ-স্নেহবঞ্চিত শিশুটির ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহার দুশ্চিন্তাপীড়িত চিত্ত ভাবনার ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

গুলজান্ শিশুর ধাত্রী। সে তাহার উল্কি রঞ্জিত শ্যামল অনাবৃত বাহুর উপরে তাঁহার শুভ্র মল্লিকা ফুলের মত সুন্দর শিশুটিকে দোলাইয়া ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিতে বলিতে সম্মুখের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

'না রাজা কা পলটন না রাজাকা ঘোড়া,
—মুলুকমে বাবুয়াকা কোই নেই জোড়া।
আগে যায় রোসনাইয়া, পিছে যায় হাতী,
মেরি গদিপর চলে বাবুয়া, মাথে লাল ছাতি।"

মিসেস ম্যাকোহন জ্বরতপ্ত ললাটে উত্তপ্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কত সাধের ধন তাঁহার—তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও অমনি করিয়া কোলে লইয়া আদর করিতে পারিলেন না! এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গুলজান তাহাকে তাহার দোলার বিছানায় শোয়াইয়া সাবধানে নেটের ছোট মসারিটি তাহার উপরে টানিয়া দিয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল।

মিসেস ম্যাকোহন তাঁহার বিবাহিত

[illegible]টি বৎসর এই বিদেশী সঙ্গিনী গুলজানের [illegible] যত্ন ও আন্তরিক হৃদ্যতায় তাহার সহিত প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে যেন তাঁহার এ সংসারের একমাত্র সহায়রূপেই দেখিতেছিলেন। রোগ যতই বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছিল বিদায়ের কাল নিকটতর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী তাঁহার হতভাগ্য সন্তানের জন্য ইহাকেই তত নির্ভর করিয়া ধরিতেছিলেন। ছেলেটি যেন গুলজানের প্রাণ। তাহার বয়সা তাহার নিজের ছেলে ইয়াসিনের চেয়েও সে যেন তাহাকেই অধিকতর ভালবাসে।

গুলজান ভূমে বসিয়া তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল; [illegible] চক্ষু তাঁহার জ্যোতিহীন উৎসুক নেত্রের সহিত মিলিত করিয়া কহিল "মেমসাহেব!"

"প্রতিজ্ঞা করো গুলজান যে আমি মরে গেলে তুমি আমার যাদুকে আমার জেমসনকে ছেড়ে যাবে না? যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে ইয়াসিনের মতন ভালবাসবে?" দুর্বল হস্ত গুলজানের পরিপুষ্ট স্থূল বাহুর উপরে স্থাপন করিয়া স্নেহকাতরা জননী ধাত্রীর মুখের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। যেন এই অনুরোধটি রক্ষিত হইলে তিনি যতটুকু সম্ভব শান্তভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। গুলজান তাহার 'ছোট বাবা'কে তাহার ইয়াসিনের মত ভালবাসা দিতে হৃদয়ের সঙ্গেই প্রস্তুত আছে, তাহার জন্য তাহাকে আর নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না! কিছু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কাতর চিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে গুলজান বলিয়া গেল, "আল্লার নামে শপথ, আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনার ছেলেকে ছেড়ে যাব না। নিজের ছেলের চেয়েও বেশী যত্নে তাকে পালন করব।"

মিসেস ম্যাকোহনের নেত্রজ্যোতি প্রদীপের শেষরশ্মিটুকুর মত পরমউজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

২

মেম সাহেবের মৃত্যুর পর কাপ্তেন সাহেব গুলজানকে ডাকাইয়া বলিলেন "তুমি ছেলেটাকে বড্ড ভালবাসো দেখতে পাই ওটাকে আমি তোমাকে দিলাম। দশ টাকা করে তুমি বেশি পাবে, ওর সব ভার তোমার। আমায় কোন রকম বিরক্ত করো না—ও কি! কেঁদে যে অস্থির হলে! যাও যাও, আমি কান্নাকাটি দেখতে পারিনে যাও—"

কে জানে কেন ছেলেটার জন্মদিন হইতেই ক্যাপ্তেন সাহেবের তাহার প্রতি কেমন একটা অহেতুকী বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। একটা রাস্তার কুড়নো ছেলের উপর লোকের যেটুকু মায়া জন্মায় নিজের সন্তানের উপর সেটুকুও মমতা ছিল না। পত্নীর প্রতি ভালবাসার অভাবই বোধ এ ভাবের মূলগত কারণ।

গুলজান বেতনবৃদ্ধির জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। বাছাকে সে নিজের কাছে পাইয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার।

[illegible] বৎসর ঘুরিয়া গেল। জেমসন ও ইয়াসিন্ দুইটি বিভিন্ন জাতীয় শিশু একখানি স্নেহতপ্ত

অঙ্ক জুড়িয়া এক সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একটি সবল শাখা দুইটি কোমল লতাকে যেমন সমান স্নেহে বক্ষে ধরিয়া থাকে গুলজানের চিত্তও সেইরূপ তাহার দেহসম্ভূত ও প্রতিপালিত শিশু দুটির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বোধ করিত না।

মেজর লরির স্ত্রীর সহিত ছেলে দুটিকে লইয়া গুলজানকে কাপ্তেনসাহেব পাহাড়ে পাঠাইলেন।

পাহাড় হইতে ফিরিবার দিন মিসেস লরি তাহাকে তাহার নূতন প্রভুপত্নীর সংবাদ জানাইয়া কহিলেন "কাপ্তেন সাহেব তোমায় পূর্ব্বে জানাতে নিষেধ করেছিলেন তাই এতদিন বলিনি।"

গুলজানের বর্ণ সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় স্ত্রীলোকের মত কালো ছিল না। তাহার শ্যামবর্ণ মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, গৃহে বিমাতা আসিয়াছে! যদি সে বাছাকে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লয়?

ট্রেণ হইতে নামিবার সময় তাহার পা কাঁপিতেছিল শিশুকে সে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অনিচ্ছুক ভাবেই নামিল!

ষ্টেশনে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না, বাড়ী আসিয়া পৌছিলে বারান্দায় সে কাপ্তেন সাহেবের সহিত তাঁহার নূতন স্ত্রীকে দেখিল। নূতন গৃহিণী সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্না। প্রথমদর্শনেই তাঁহার বেশভূষা ও ধরণধারণে গুলজানের চিত্ত তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হায়! তাহার মেম সাহেব সেই নম্রশান্তকরুণ-হৃদয়া নারী তিনি কখনও এমন দামী পোষাক এমন উজ্জল হীরার আংটি পরিতে পান নাই। নূতন মিসেস ম্যাকোহন ঈষৎ হাসিয়া শিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গুলজানের বুকটা অমনি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। শিশু কিন্তু বিমাতার কোলে গেল না, সে দুই হাতে ধাত্রীর কুর্ত্তাটা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিল। কাপ্তেন সাহেব স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন,

"কোনও দরকার নেই ক্লেরা! ওটাকে আমি আয়ার হাতেই দিয়েছি ছেলের হাঙ্গাম তোমায় বইতে হবে না, চলো আমরা বেড়িয়ে আসি"—

তাহার বুকের দুলালকে পাছে কাড়িয়া লয় এই ভয়ে গুলজানের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—মনিবের কথা শুনিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিশুকে সে চুম্বনের পর চুম্বনে বিব্রত করিয়া তুলিল।

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। গুলজান শীঘ্রই বুঝিতে পারিল পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত তাহার অধিকার এখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই অস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। নূতন গৃহিণী তাহাকে দেখিতে পারেন না।

সপত্নীসন্তান সাধারণতঃ বিমাতার স্নেহভাজন হইতে পারে না, বিশেষ আবার যেখানে স্বয়ং শিশুর পিতাই তাহার প্রতি স্নেহলেশহীন। মেহুন্ তাহার সৌখিন বিমাতার চক্ষুশূল হইতেছিল।

একদিন গুলজান নিজের ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনের শব্দ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মিসেস ম্যাকোহন তাঁহার মেহগ্নি ক্রস্ দিয়া শিশুকে প্রহার করিতেছেন। ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, জ্ঞানশূন্য হইয়া সে প্রভুপত্নীর হস্ত হইতে

জ্রুখানি টানিয়া লইয়া সবেগে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীব্র ভর্ৎসনা সূচক স্বরে উচ্চারণ করিল—"মেম সাহেব!"

তারপর আহতপৃষ্ঠ রোদনকম্পিত শিশুকে কোলে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মিসেস ম্যাকোহন গম্ভীর স্বরে কহিলেন "পাজি ছেলেটাকে তুমি যে রকম নষ্ট করচ তাতে শীঘ্রই সে ডাকাতের দলে ঢুকবে দেখচি! আর না!—আমাকে শোধরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গুলজান সব কথা দাঁড়াইয়া না শুনিয়াই চলিয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনের ভিতরে নিজের ব্যবহারের ফল, আসন্ন বিপদের একটা ছায়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। শিশুকে পুরাতন ভৃত্য ফৈজুর কাছে রাখিয়া একটু মিছরি হাতে দিয়া সে সশঙ্কচিত্তে প্রভুপত্নীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া বলিল "মেম সাহেব! নিজের ব্যবহারের জন্ম আমি নিতান্ত দুঃখিত হচ্ছি, দয়া করে এবার মাপ করুন, আর কখনও আমি এ রকম করবো না। ছেলেটা আমার প্রাণ তাই হঠাৎ বড় রাগ হয়ে গেছলো।"

মিসেস ম্যাকোহন হিন্দি ভাষা ভাল বুঝিতেন না, তথাপি যেটুকু বুঝিলেন তাহাতে তাঁহার সংকল্প শিথিল হইল না। স্থির কণ্ঠে কহিলেন "তোমার মাহিনা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি এখনি যাও, ছেলে তোমার নয়, আমি ওকে সোজা করবার ব্যবস্থা করচি।"

গুলজান মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। আর্তভাবে সে প্রভুপত্নীর পদতলে বসিয়া দুই হাত যুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কহিল "মেম সাহেব আমায় তাড়িয়ে দিবেন না। মৃত মেম সাহেবের কাছে আমি সত্য করেছি কখনও তাঁর ছেলেকে ছেড়ে যাব না। হয় দয়া করে আমাকে রাখুন, না হয় আমার বাচ্চাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন?"

"এ মাগীর তো স্পর্দ্ধাও কম না!" ঘৃণার সহিত গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। কাপ্তেন সাহেব গুলজানের কণ্ঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি ক্লেরা?"

ক্লেরা কহিল "আমি ওকে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে বল্‌চি, কিন্তু উনি বল্‌চেন কিছুতেই যাবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব ভ্রূভঙ্গী করিয়া দ্বারের উপরে মুষ্ট্যাঘাত ও ভূমে পদাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলেন "তুমি যখন যেতে বল্‌ছো তখন নিশ্চয়ই যেতে হবে, যাবে না কি!"

মুহূর্তে গুলজানের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া দুই চক্ষু আগুনের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির কণ্ঠে কহিল,—

"হাঁ সাহেব, আমি যাচ্চি!" তার পর সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিশু তখনও অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছিল, পৃষ্ঠের কোমল চামড়া রাঙা হইয়া রহিয়াছে মিছরি সে স্পর্শও করে নাই। ফৈজু শিশুকে প্রত্যর্পণ করিবার সময় ধাত্রীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল।

কাপ্তেন সাহেব অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নূতন সঙ্গিনীর সহিত ক্লাবে চলিয়া গেলেন। চার ঘণ্টার পূর্ব্বে তাঁহারা ঘরে ফিরিবেন না। গুলজান মনিবপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে আসিল। একবার সে শিশুকে ভূমে নামাইয়া নিজের ছোট সিন্দুকটি খুলিয়া তাহার সঞ্চিত টাকা পয়সাগুলি দড়ির গেঁজের মধ্যে পুরিয়া কোমরের ঘুন্সিতে বাঁধিয়া লইল; তারপর দুটি শিশুকে দুই কোলে লইয়া ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। উর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে কহিল "মেম সাহেব। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—সেই সত্য রাখার জন্য আজ গুলজান এই পাপ করতে বাধ্য হ'ল। তুমি স্বর্গে থেকে সাহায্য কর। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলেকে নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে দিতে পারব না।"

শিশুর সহিত গুলজানের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ প্রচার হইলে কাপ্তেন সাহেব কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়াই স্ত্রীকে কহিলেন "আঃ যেতে দাও না ক্লেরা, কি হবে সেটাকে নিয়ে? তোমার আমার চেয়ে সে স্ত্রীলোকটা বরং ছেলেটাকে পেয়ে ঢের বেশ খুসী থাকবে।"

কথাটা সত্য। তথাপি লোকে কি বলিবে? এই ভাবিয়া মিসেস ম্যাকোহনের বিবেক এই নিষ্ঠুর যুক্তির বিপক্ষে জাগরিত হইয়া উঠিল।

একটা আয়া দুই কাঁধে দুইটা সমবয়স্ক শিশু—তাহার একটি সুন্দর ইউরোপীয় এবং অপরটি পশ্চিমী মুসলমান শিশু—লইয়া পলাতক, ইহাদের ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হইল। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ একটি দুটি তিনটি ছেলে কোলে কাঁখে করা স্ত্রীলোক পথে ঘাটে অনেক দেখা গেল; শুভ্র শিশু সংযুক্ত নারী কোথাও মিলিল না।

৩

গুলজান গোরখপুর হইতে পলাইয়া হাঁটা পথে পশ্চিমবঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া পদ্মাপারে নিজের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতার কাছে আশ্রয় লওয়ার পর ষোল বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইয়াসিন এখন সুশ্রীসবল যুবা-পুরুষ। এখন সে মাতুলের গাড়িঘোড়ার ব্যবসায়ের অংশীদার। গুলজান তাহার জন্য কঠিনতর পরিশ্রম করিতে এখনও শ্রান্তি বোধ করিত না। সে মায়ের চেয়ে দাসীর মতই তাহার সেবা করিত। ছেলেও মা ভিন্ন কাহাকেও চিনে না, এখনও সে মায়ের কোলের শিশু, আদরের দুলাল।

শরীরের শক্তিতে মনের তেজে ইয়াসিন্ নিজের কার্য্যে বেশ একটু উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কি ছিল তাহা সে নিজেই জানিত না কিন্তু এইটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহার মুখে চাহিয়া দেখিলেই তাহার ইংরাজ আরোহীর চোখে একটা বিস্ময়-পূর্ণ স্নেহ-করুণার ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিত এবং সে ভাড়াটা বেশ ভাল রকমই লাভ করিয়া আসিত। আর ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার যে, ঐ সকল সুপরিচ্ছদধারী সুন্দরমূর্ত্তি নর-নারীদের দেখিলে তাহারও প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা আকুলতা উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিত; তাহাদের সান্নিধ্য সে ঐক পাথরেরটু

আকর্ষণের মত কিছুতেই যেন ছাড়াইয়া লইতে পারিত না।

একদিন গুলজান দেখিল, ইয়াসিন নিজের অঙ্গ হইতে দড়ি বাঁধা মিরজাই খুলিয়া রাখিয়া বিস্ময় ব্যাকুলনেত্রে নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে। গুলজানকে দেখিয়া সে ইঙ্গিতে কাছে আসিতে বলিল, কম্পিতপদে গুলজান নিকটে আসিলে সহসা যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "মা এর মানে কি আমায় বলো, কেন আমার গা এত সাদা? আমি শুনেছি আজই শুনেছি—লোকে বলে—ওঃ আমি বল্‌তে পারিনে—সে কী ভয়ানক কথা—বলে আমি তোমার জারজ! আমি সাহেবের ছেলে?"

সর্পাহতের মত গুলজান আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তাহার মুখে বাক্য সরিল না। সুদীর্ঘ দিনে যে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল সহসা তাহা মেঘোম্ভিন্ন সূর্য্যকিরণের মত ফুটিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর সন্দেহে ইয়াসিন্ উন্মাদের মত লাফাইয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিল।

"সত্যি, তবে সত্যি! আমি তবে সাহেবের ছেলে?"

যন্ত্র চালিতের মত গুলজান উত্তর করিল "হ্যাঁ"।

"রাক্ষসি!" ইয়াসিন বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিল "কেন আমায় নুন খাইয়ে মারিসনি?"

গুলজানের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। আত্মপরিচয় জানিয়া লইয়াছে এইখান হইতেই সে তবে নিজের জন্য পথ নির্ব্বাচন করিয়া লউক! সে যে কোন্ পথ বাছিয়া লইবে ইহাও সে জানিত। কম্পিতস্বরে কহিল "বাছা, আমার সব কথা না শুনে তুমি রাগ করো না, আগে সবটা স্থির হয়ে শুনে যাও"—এই বলিয়া সে সমস্ত কাহিনীটা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল। সে বলিল "তুমি সাহেবের ছেলে এ কথা সত্য কিন্তু আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি! আমার গর্ভজাত সন্তান ইয়াসিনের ষোলবৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে; তুমি মেম-সাহেবের পুত্র। তোমার বাপ তোমার মাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না; তোমার প্রতিও তাঁর এতটুকু স্নেহ ছিলনা, তোমার মা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন যে জীবন থাকতে আমি তোমায় ছেড়ে যাবনা।"

তারপর সে অত্যন্ত মৃদু ও হৃদয়ভেদী স্বরে তাহাদের পলায়নের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল, শুনিয়া ইয়াসিন্ কিছুই বলিল না। সে যেন অকস্মাৎ একটা প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

গুলজান্ কহিতে লাগিল—"শুনলুম আমাদের ধরবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ধরা পড়লে যে কি হবে আমার জানাই ছিল, মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। গোরথপুরের শালের জঙ্গলে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন তাঁহারই কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম। তিনি বল্লেন,—দুজন সঙ্গে থাকলে ধরা পড়বে একজনকে ত্যাগ করে যাও। পরামর্শ উচিত মতই কিন্তু করা বড় কঠিন! কাকে ত্যাগ করব? কোথায় রাখব? বিশ্বাস করবার কে আছে যে পুরস্কারের লোভে আমাদের ধরিয়ে দেবেনা? আমি তোমার মাকে স্মরণ করলুম। বল্লুম—"আমার সমস্যা দূর করে দাও, নিজের ছেলের

মায়ায় আমি যেন তোমার ছেলেকে ফেলে না যাই। তার বিমাতা বড়ই নিষ্ঠুর!" বোধহয় তোমার মা সে কথা স্বর্গে থেকে শুনেও ছিলেন। সেই রাত্রেই ফকিরের আশ্রমে আমার নিজের ছেলেকে ফেলে তোমাকে তার কাপড় পরিয়ে ও এক রকম রং মাখিয়ে নিয়ে আবার পথে বার হলুম। ইয়াসিনের ক্ষীণ ক্রন্দন ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে আমার কানে বাজতে লাগল, জ্বরে সে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সত্য যে সবার চেয়ে বড়! ঈশ্বর যে সকলেরই উপরে বাপ! আমি যে তোমার মাকে কথা দিয়েছিলুম! এখানে আসবার পর চিঠি লিখে খপর নিয়েছিলুম, সেই রাত্রেই সে মারা গ্যাছে। আমি মনে করি তুমিই আমার ইয়াসিন।

এখন তুমি বড় হয়েছ তোমার পথ তুমি ঠিক করে নাও,—তবে আমার প্রতি এই টুকু দয়া কোরো যেখানে থাকো আমাকে তোমার বাড়ির দাসী করে রেখো।"

ইয়াসিন্ অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ সে স্বপ্নমুগ্ধের মত এক পা এক পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটিও কথা কহিল না। গুলজানও তাহাকে তাহাতে বাধা দিল না। নিজে সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল।

৪

সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া রাত্রে আবার ইয়াসিন্ গৃহে ফিরিয়া আসিল। গুলজানও জানিত যে সে আর একবার আসিবে। সে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ইংরাজটোলায় আজ ইয়াসিন অনেক ঘণ্টা কাটাইয়াছে। খোলা জানালার নেটের পর্দ্দা বাতাসে কাঁপিয়া সরিয়া যাইতেছিল; ভিতরে শুভ্র আস্তরণবিস্তৃত টেবিল ঘেরিয়া চৌকিগুলি সাজান, হাস্যকৌতুকোচ্ছ্বসিত সুপরিচ্ছদধারীগণ সেই চৌকি দখল করিয়া রহিয়াছে। রৌপ্য চামচের টুন্ টান্ শব্দে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সুপ্রচুর সদ্‌গন্ধে বায়ু পূর্ণকরিয়া মধ্যাহ্নভোজন চলিতেছে। সন্ধ্যায় কোন গৃহে মধুরস্বরে পিয়ানো বাজিয়া উঠিল, কোনও উদ্যানপথে শ্রান্ত প্রণয়ী দুইখানি ব্যগ্রহস্তে বাঁধা পড়িলেন। কোথাও বা ঠেলা গাড়িতে শিশুকে বসাইয়া পার্শ্বে জনকজননী স্নেহহাস্তে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ইয়াসিনের প্রাণের ভিতরে ব্যাকুলতা অসম্বরণীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এই দীনহীন অশ্বপালক—ছিটের মেরজাই গায়ে নাগারা-জুতা-পরা নগণ্য ঘৃণিত ইয়াসিন্; সে কিন্তু উহাদেরই মত ইংরেজসন্তান, ইহারা তাহার আপনার লোক! সেও এইরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই মুহূর্ত্ত হইতেই ক্রয় করিতে সক্ষম! শুধু একবার ছুটিয়া গিয়া ওই যে—ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার আদালত হইতে শতপ্রাণীর মুণ্ডদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া টমটম চড়িয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে সব কথা বলিবার মাত্র অপেক্ষা!

কিন্তু—না না একি সে ভাবিতেছে! সে পাগল হইয়া যাইবে না কি? সে তো গুলজানের কথা ভাবিতেছে না? ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহার কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন? এবং তারপর, পরের ছেলে—ইংরাজের

সন্তানকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে চুরি করিয়া আনার জন্য তাহাকে যখন চালান দিবেন? উঃ না! ঈশ্বর তাহাকে এই দুরন্ত লোভ হইতে রক্ষা করুন!

গভীর অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পল্লীতে ক্বচিৎ কোন ক্ষুদ্র জানালার ভগ্ন কবাটের ফাঁক দিয়া কেরোসিনের প্রচুর ধূমের সহিত ক্ষীণালোক রেখা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভিতরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তীব্রস্বরে ঝিঁঝি ডাকিতেছিল। অস্ফুট নক্ষত্রালোকে গুলজান দাওয়ায় চারপায়ার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইয়াসিন্ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে, গুলজানকে ফাঁসাইয়া সে নিজেকে কাপ্তেন ম্যাকোয়েনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না—কিছুতেই না! পথে দুইজন ইংরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেও কৌতূহলী হইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ তুলিয়া তাহাদের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একজন ইংরাজ অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বাই জোভ! নিশ্চয়ই এ ছেলেটি একজন ছদ্মবেশী ইউরোপিয়ান্!" বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল, গর্জ্জন স্বরে কহিয়া উঠিল "চুপ রও।"

ইংরাজ দুজন উচ্চহাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। রাত্রের বাতাস কেবলি বিলাপের নিশ্বাসের মত ঘরে ও বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দু একটা নিশাচর প্রাণীর ক্ষীণ কণ্ঠশব্দ আর্ত্ত হৃদয়ের যন্ত্রণাধ্বনির মত শূন্যে চকিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মৃদুস্বরে গুলজান ডাকিল—"ইয়াসিন্!—জেমুন বাবা!"

জেমুন তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—"মা!"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

মাতৃঋণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

বন্ধু-লাভ।

সেদিন অপরাহ্নে আর্জেন্ট ও ইদা, অলস অবসর যাপনের অন্য উপায় না দেখিয়া কর্বিল বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। আকাশে তখন অল্প মেঘ জমিতেছিল। ক্রমে সেই মেঘ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঝড় আসন্ন দেখিয়া জ্যাক বনের দিকে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আর্কার নিকট আসিয়া বসিল, বলিল, "একটা গল্প বল না, আর্কা।" আর্কা গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। গল্প বলিতে বলিতে জ্যাকের কৌতূহল-প্রশ্নে আর্কার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্যে আর্কা বলিল, "ওহো, তাইত জ্যাক, এখনো বৃষ্টি নামতে দেরী আছে—তুমি দৌড়ে দোকান থেকে

খরগোসগুলার জন্ত কিছু খাবার কিনে আন ত—আমার মনেই ছিল না—আহা, কাল সকালে বেচারারা কি খাবে তার ঠিক নেই—আমি বুড়ো মানুষ, অত তাড়াতাড়ি আনতে পারব না—পথেই বৃষ্টি এসে পড়বে হয়ত—তুমি যাও, লক্ষ্মীটি!”

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছোট একটি ঝুড়ি লইয়া জ্যাক দোকানে ছুটিল।

ঘন পাতার ছায়ায় ঢাকা শ্যামল পথে তখন আঁধার নামিয়াছে—পথে লোক চলাচল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। আসন্ন ঝড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত গ্রাম্য কৃষকের দল পূর্ব্বাহ্ণেই বাসায় ফিরিয়াছে। জনকোলাহলহীন নির্জ্জন পথ বহিয়া জ্যাক দোকান হইতে গৃহের দিকে চলিয়াছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল,—এমন সময় অদূরে সে শুনিল, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে, “টুপি—ভাল টুপি চাই!”

পশ্চাতে ফিরিয়া জ্যাক দেখিল, অসংখ্য টুপির বোঝা পৃষ্ঠে ফেলিয়া এক ফিরিওয়ালা ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেদিকে আসিতেছে। শ্রান্তিতে বেচারার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—মুখ শুখাইয়া গিয়াছে—দারিদ্র্যের ঘনরেখাপাত তাহার মুখে চোখে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে! জ্যাক থমকিয়া দাঁড়াইল—ফিরিওয়ালা তাহার নিকটে আসিয়া হাঁকিল, “টুপি—ভাল টুপি চাই?”

জ্যাক ভাবিল, সে কোথায় চলিয়াছে! এই দুর্য্যোগের রাত্রে কোথায় তাহার আশ্রয় মিলিবে—কোথায় একটু ঘুমাইয়া বেচারা দিনের ক্লান্তি ঘুচাইবে! এই বোঝা বহিয়া কত পথই না সে ঘুরিয়াছে—কাহার জন্য সে এ নির্জ্জন পথে চীৎকার করিতেছে! কে তাহার টুপি কিনিবে? শুধু গতিহীন প্রাণহীন দূরত্ব-নির্দ্দেশক পাষাণ স্তূপগুলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আর বৃক্ষশাখায় পাখীগুলা নিতান্ত নির্জীবের মত ঝড়ের ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এখানে কে তাহার টুপি কিনিবে?

টুপিওয়ালা একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। জ্যাক নিকটে আসিয়া কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। টুপি-ওয়ালা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কতদূরে গেলে গাঁ মিলবে?”

আকাশের বুক চিরিয়া সশব্দে লোহিত বিদ্যুৎশিখা ছুটিয়া গেল। পথের ধূলি উড়াইয়া একটা কম্পন বহিয়া গেল—গাছগুলা সে শব্দে যেন শিহরিয়া উঠিল।

জ্যাক কহিল, “পনেরো মিনিট লাগবে।”

“পনেরো মিনিট! তবে ত মুস্কিল! বৃষ্টির আগে তবে গাঁয় পৌছুতে পারব না—টুপিগুলা সব ভিজে যাবে—এতগুলা টুপি!” একটা করুণ সহানুভূতিতে জ্যাকের চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, “আমাদের বাড়ী এই কাছেই! সেখানে তুমি থাকতে পার।”

হতভাগ্য টুপিওয়ালা অকূলে কূল পাইল। কৃতজ্ঞতায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উভয়ে দ্রুত চলিল। টুপিওয়ালা কষ্টে পথ চলিতেছিল। জ্যাক কহিল, “তোমার খুব কষ্ট হচ্চে, না?”

“হাঁ—আমার পা বড়—জুতা যা কিনি,

পায়ে একটু কষ্ট হয়—পয়সা ত এমন নেই যে বায়না দিয়ে পায়ের মাপে জুতা তৈয়ার করাব।"

গৃহে পৌঁছিয়া জ্যাক টুপিওয়ালাকে ভোজনকক্ষে বসাইল। কহিল, "বস—একটু কিছু খাও। আরাম পাবে।"

টুপিওয়ালা অসম্মত হইল—কহিল, "না, না—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

জ্যাক কহিল, "তোমাকে অনেক দূর ঘুরতে হয়।"

"হাঁ! আমি নান্তিতে থাকি—আমার বোনের বাড়ী সেখানে—সেইখানেই থাকি। মর্তারগি, অর্লিন, তুরে, আঁজু সব ঘুরতে হয়। বাড়ীতে অনেকগুলি লোক—আমার বুড়ো বাপ, বিধবা বোন, চার পাঁচটি ভাই—সকলের আহার জোগানো—"

কিন্তু জ্যাক ছাড়িবার পাত্র নহে। আর্কা এই অসভ্য লোকটাকে দেখিয়া চটিয়া গিয়াছিল—তথাপি কিছু বলিল না। জ্যাকের আদেশে মদ্য ও কিছু আহার সে লইয়া আসিল।

জ্যাক বলিল, "খানিকটা মাংস দাও, আর্কা।"

আর্কা কহিল, "কিন্তু জান, জ্যাক, মনিব এ সব পছন্দ করেন না—তিনি খুব বকবেন!"

"আচ্ছা, সে যখন বকবেন, তখন বকবেন—এখন ত তুমি দাও।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত আর্কা এক টুকরা মাংস লইয়া আসিল জ্যাক কহিল, "কেমন খাচ্ছ?"

টুপিওয়ালা কহিল, "চমৎকার।"

চারিদিক কাঁপাইয়া বজ্র গর্জিয়া উঠিল। ভীষণ শব্দে ঝড় আসিল—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল।

জ্যাক কহিল "তোমার টুপিগুলো বেচতে পার না কেন ?"

"তোমার বড় কষ্ট, না?"

"হাঁ—ঐ জুতার জন্য! জুতাজোড়া খুলে

ফেললে তবে আরাম পাই! কিন্তু তবু আরাম কৈ? রাত্রে শুয়ে যখন ভাবি, আবার সকালে জুতা পায় দিয়ে বেরুতে হবে, তখন প্রাণটা অস্থির হয়ে ওঠে।"

জ্যাক কহিল "তোমার ভায়েরা বেরোয় না, কেন?"

"তারা যে ছেলেমানুষ! এত ঘুরতে পারবে কেন? আর কিছু কষ্ট না—শুধু যদি পায়ের মাপে একজোড়া জুতা পেতাম?"

এমন সময় বহির্দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। জ্যাক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। টুপিওয়ালা কহিল, "কি হল?"

"তারা এসেছে।"

বাহিরে আর্জেন্তর গলা শুনা গেল। আর্জেন্ত কহিল, "এস লোলি, খাবার ঘরে—আর্কা খাবার দাও।"

আর্জেন্ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "এ কি সব? কি হচ্ছে?"

জ্যাকের মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে যদি তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হয় ত সে কি সুখ! বালক ভয়ে জড়িত অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল, আর্জেন্ত তাহা শুনিয়াও শুনিল না!

আর্জেন্ত কহিল, "লোলি, দেখে যাও! জ্যাক বাহাদুর এখানে আসর জমকে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবকে মজলিস দিচ্ছেন!"

ইদা আসিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কহিল, "জ্যাক—জ্যাক—এ কি!"

টুপিওয়ালা কহিল, "এঁকে কিছু বলবেন না, ঠাকরুণ—আমি নিজে—"

ক্রোধে আর্জেন্ত কাঁপিতেছিল—সশব্দে দ্বার খুলিয়া তীব্র স্বরে কহিল "চুপ করে থাক—বেয়াদব, অসভ্য কোথাকার—লোকের বাড়ী এসে চড়াও হবার মজা টের পাওয়াচ্ছি—বেরোও এখনি এখানথেকে।"

টুপিওয়ালা একটিও কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন ব্যবহার—তাহার নিকট নূতন নহে। আপনার টুপির বোঝা পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া সে জ্যাকের পানে কৃতজ্ঞভাবে একবার চাহিয়া দেখিল—জ্যাক নতমস্তকে বসিয়াছিল—ভয়ে সে সাদা হইয়া গিয়াছিল—তাহার পর বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে টুপিওয়ালা বাহির হইয়া গেল।

জ্যাকের চৈতন্যলোপ হইয়া গিয়াছিল—সহসা সে শুনিল, বাহিরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে কে দূরে হাঁকিতেছে, "টুপি—ভাল টুপি চাই।"

আর্জেন্ত কহিল—"ওঃ—আমি দেখিনি—হাম—হাম খাওয়ান হচ্ছিল বন্ধুকে—"

ইদা কহিল, "কিন্তু ওটা খায়নি বোধ হয়।"

আর্কা কহিল, "আমি তখনি বারণ করেছিলাম—কিন্তু শুনলে না—বললুম মনিব রাগ করবেন—যাই হোক, ছেলেমানুষ না বুঝে—"

"থাম তুমি"—আর্জেন্ত গর্জ্জিয়া উঠিল!

জ্যাক এতক্ষণে বুঝিল, সে কি দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে। সে উঠিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "এবারটি মাপ করুন—আর কখনো করব না—"

"মাপ? বটে!" বলিয়া আর্জেন্ত জ্যাকের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া এমনভাবে তাহাকে নাড়া দিল, "এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! তুমি জান ও জিনিষে তোমার কোন অধিকার নেই! যে বিছানায় তুমি শোও, যে খাবার তুমি খাও, সে সমস্ত তোমাকে অনুগ্রহ করে দেওয়া হয়েছে শুধু। তোমাকে দয়া করা

অন্যায় হয়েছে আমার! কে তুমি আমার? কেউ নও—কোথাকার নোঙ্‌রা পথের কুকুর—তোমার ব্যবহার দেখে আমি ক্রমে অবাক হয়ে যাচ্ছি! ছোটলোক, পাজী—"

ইদার* করুণ দৃষ্টির কাতর অনুনয়ে আর্জেন্ত সেদিন জ্যাককে ছাড়িয়া দিল।

পরদিন আর্জেন্ত জ্বরে পড়িল। কঠিন পীড়া দেখিয়া ইদা অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার রিভালের আরাম কুঞ্জে ডাক পড়িল। প্রত্যহ দুইবেলা ডাক্তার রিভাল আসিয়া রোগী দেখিতে লাগিলেন। ইদা কহিল, "ডাক্তার, তুমি কবিকে শীঘ্র আরাম করে দাও—কবির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে—জগতের কত ক্ষতি হচ্চে এতে, ভাব দেখি।"

"কোন ভয় নেই—মিসেস আর্জেন্ত—দুদিন সময় লাগবে—ওর মন ভালো রাখ—জ্যাক কোথায়? তাকে ডেকে দাও দেখি!"

"না, না—সে গোল করবে।"

"করুক একটু গোল! ছেলেমানুষ—তাদের গোলমালে ত বিরক্তি ধরে না, বরং ভালই লাগে। সে বেচারা মুখখানি শুখিয়ে বেড়াচ্চে—বাপের অসুখ হলে ছেলেপুলের মন ভাল থাকে না ত! তুমি তাকে ডেকে দাও দেখি—বেশ ছেলেটি—আমার সঙ্গে সে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। আমাকে সে দাদা-মশায় বলে ডাকে—কে তাকে শিখিয়ে দিলে, বল? সে জানে, পাকা চুল, পাকা দাড়ী আছে যখন আমার, তখন আমি আর দাদামশায় না হয়ে, যাই কোথা, বল!"

রিভাল তখন আপনার দৌহিত্রী সিসিলের কথা বলিল—জ্যাকের চেয়ে দুই বৎসরের ছোট সে। তাহার দৌরাত্ম্যে বৃদ্ধের মুহূর্ত বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে না—এ দৌরাত্ম্যে বৃদ্ধের এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহা কোন দিন বাদ পড়িলে, বৃদ্ধের মনে একটা প্রবল অস্বস্তি ঘটে! তাহার মন ভিজাইয়া মান ভাঙ্গাইয়া দৌরাত্ম্যের অবতারণা করিতে হয়!

ইদা কহিল, "তাকে একদিন এনো না, ডাক্তার, জ্যাকের সঙ্গে খেলা করবে বেশ।"

"না—সেটি হবার জো নেই! তার দিদিমা তাকে চোখের আড় করতে চায় না। একদণ্ড কাছছাড়া হলে তার দিদিমা অস্থির হয়ে ওঠে। সে দুর্ঘটনার পর থেকে—বুড়ী ওকে নিয়েই কোনমতে আপনাকে খাড়া রেখেছে।"

বালবিধবা কন্যার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বৃদ্ধ দুর্ঘটনার উল্লেখ করিলেন। একমাত্র কন্যা যেদিন শিশু সিসিলকে রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিল, সেদিন বৃদ্ধের জীবন কি ভীষণ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, সে অন্ধকারে আলোকের কণাটুকু পাইবার আশা ছিল না—সিসিল আবার নূতন করিয়া সে অন্ধকারে একটি ছোট দীপ জ্বালিয়াছে! সিসিলকে পাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সে দুঃখ আবার ভুলিতে বসিয়াছে। সে দুঃখের কথা শুধু আর্কা জানে, আর কেহ জানে না।

আর্জেন্তকে আনন্দ দিবার জন্য,আর্জেন্তর সম্মতি লইয়া ইদা এক সম্মিলনীর আয়োজন করিল। আর্জেন্তর পুরাতন বন্ধু লাবাসাঁদ্‌র, ডাক্তার হার্জ্‌ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হইল।

একদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জ্যাক দেখিল, বাড়ী সাজাইবার ধুম পড়িয়া

গিয়াছে! চীনা লণ্ঠন, ফুলের রাশি, কাগজের নিশান আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার কি?

ইদার নিকট আসিয়া সে কহিল, "মা, কি হবে, মা?"

ইদা তখন গৃহসজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত। ইদা কহিল, "চুপ, লক্ষ্মী হয়ে থাকো। দুরন্তপনা করো না—আজ বাড়ীতে অনেক বড় বড় লোক আসবে, ভোজ আছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে দুই একজন করিয়া অতিথি আসিতে লাগিল। নিজের শয়ন কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া তাহার ফাঁক দিয়া জ্যাক দেখিল, মরোভাঁ ও ডাক্তার হারজের দল আসিয়াছে! ভয়ে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। শত্রুগুলা যদি তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়! কি হইবে? তাহা হইলে, সে কি করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যার সময় সখের থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার, অভিনেতা, গ্রন্থ-প্রকাশক, সব দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। রন্ধন-শালা হইতে বিবিধ ভোজ্যের বিচিত্র সুরভি উত্থিত হইয়া ক্ষুধাতুর নিমন্ত্রিতগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। জ্যাক মাতার পার্শ্বে থাকিয়া, কফি, চা, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিল—মাঝে মাঝে লাবার্স্যাদ্‌এ, হারজের বীভৎস চীৎকার ও হাস্যের শব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে ডাক্তার রিভাল আসিলেন। রোগীর উৎসাহিত মূর্ত্তি দেখিয়া রিভাল ইদাকে কহিল, "দেখছ মা, আমোদ আহ্লাদে আর্জেন্তঁর চেহারা অবধি ফিরে গেছে।"

ডাক্তার হার্জ্ কহিল, "আপনি ডাক্তার, মশায়?"

আর্জেন্তঁ উভয়ের পরিচয় করিয়া দিল।

নানা গল্পে, হাস্যকৌতুকে সে রাত্রি আনন্দে কাটিল। ইদার প্রফুল্লতার সীমা ছিল না। আর্জেন্তঁর আনন্দের মধ্যে একটু তীব্রবিষ মিশানো ছিল—আপনার ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে এই দরিদ্র হতভাগ্য প্রতিভাশালীর দলের যে সে বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহা সে স্পষ্ট বুঝিল। মরোভাঁ-হারজের দল একটু ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। আহার্য্যের বৈচিত্র্য ও ঘটা দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল, "আর্জেন্তঁ ত তোফা আছে। অবস্থা একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছে!"

গভীর রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিলে অভ্যাগতের দল গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিলে, মরোভাঁ হারজের দল একটু অস্থিরতা অনুভব করিল। এমন পরিপাটি আরাম ছাড়িয়া কোথায় এ হিম-শীতল পথে বাহির হইবে! তাহার পর জিমনেজের ছিন্ন শয্যায় অপ্রচুর গরম বস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি পোহাইতে হইবে, ভাবিয়া যখন তাহাদের রক্ত জমিবার উপক্রম করিল, তখন আর্জেন্তঁ কহিল, "এত রাত্রে কোথায় সব ফিরবে, আজ! দুদিন এখানে থেকে যাও।" কি অভয়প্রদ নিশ্চিন্ত আশ্বাস! হারজের দল তখন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভূতত্ত্বের এক পৃষ্ঠা।

আমাদের এই ভূমণ্ডল প্রথমে একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডরূপে সৃষ্ট হইয়া শীতল আকাশে ভীষণ বেগে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই আদিম গতি এবং সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের আকর্ষণ এই দুই শক্তির বশে পৃথিবী আজিও সেই একভাবে চলিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া চলিবেও। কিন্তু উহার গঠন এবং আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে। সূর্য্য এবং তন্নিকটবর্ত্তী দুই একটি গ্রহ আজিও অগ্নিময় রহিয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ সকল উত্তপ্ত বস্তুরই তাপ বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। চন্দ্রমণ্ডল যতদূর সম্ভব শীতল হইয়া গিয়াছে; পৃথিবী এখনও ততদূর শীতল হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত্তে উহার তাপ কমিতেছে। জলন্ত ভূপিণ্ডে অনেক বস্তু বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। সমগ্র ধাতু, গন্ধক, লবণ, বালুকা, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই বিশ্লিষ্ট হইয়া অনিলাকারে অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। এত উত্তপ্ত ছিল যে সূর্য্যের ন্যায় উহা স্বতঃ দীপ্তিশালী ছিল। সূর্য্য এবং তারকারাজির আলোক এখন যেরূপ উহাদের নিজস্ব, পৃথিবীরও সেইরূপ ছিল। বলা বাহুল্য, আমরা এখন যেরূপ জীবের অস্তিত্ব জানি সেরূপ জীব ঐ উত্তাপে বাঁচিতে পারে না; সুতরাং ঐ জলন্ত পিণ্ড জীবশূন্যই ছিল।

ক্রমশঃ শীতলতর আকাশে ধরার তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে, এবং ঐ দীপ্তিমান ভূপিণ্ড ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। অবশেষে যখন উহার উজ্জ্বল শ্বেত দীপ্তি একটা রক্তিম আভা মাত্রে পরিণত হয় তখন উহা তরল হইয়া পড়ে ও সেই সময়ে স্থানে স্থানে উহাতে কঠিন আবরণ পড়িতে থাকে। প্রায় দেখা যায় যে উত্তপ্ত মিশ্র তরল বস্তু শীতল হইলে উহাতে একটা সর পড়ে। এইরূপে আমাদের এই ভূপৃষ্ঠের সূত্রপাত হয়। ঐ আবরণ যে একবারে দৃঢ় ও কঠিন হইয়া উঠে তাহা নহে। আদিম অবস্থায় উহা অত্যন্ত উষ্ণ ছিল; তল্‌তলে ও চট্‌চটে—না তরল না কঠিন।

এই নাতিকঠিন আবরণ ভেদ করিয়া নানারূপ বস্তু বাষ্পাকারে বুদ্‌বুদের ন্যায় উঠিয়া একটা বহুদূর বিস্তৃত ঘন বায়ুবর্ম্মের সৃজন করে। ঐ বায়ুবর্ম্মে বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ভূমধ্য হইতে উত্তপ্ত বাষ্প উঠিতে থাকে। ক্রমশঃ যখন উত্তাপ যথেষ্ট কমিয়া যায়, তখন তরল বস্তুকণা আমাদের জলকণার ন্যায় ঐ বায়ুমণ্ডলে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে। ঐ সকল মেঘের প্রধান উপাদান লবণ, গন্ধক ও মৃত্তিকা! দিগন্ত বিস্তৃত ঐ উত্তপ্ত গাঢ় মেঘ ভীষণবেগে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত। যেরূপ বায়ুতে লবণকণা, মৃত্তিকাকণা প্রভৃতি মেঘরূপে ভাসে, সেরূপ বায়ু আমাদের কল্পনার অতীত। জলকণা অপেক্ষা ঐ সকল মেঘকণা বহুগুণ ভারি। বাষ্পাকারে ভাসিতে থাকে তাহার কারণ উহাদের উত্তাপ। ক্রমশঃ তাপের হ্রাস হইতে থাকিলে ঐ বাষ্প সকল জমিয়া তরল হয় ও বৃষ্টিধারার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পড়িতে থাকে এবং তথায় জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। লবণ বাষ্পাকার হইতে তরল অবস্থায় আসিলে উহা যে কত উত্তপ্ত হয় তাহার ধারণা সহজে হয় না। সীসক সে উত্তাপে ফুটিতে থাকে; প্রকাণ্ড

হস্তিদেহ এক সেকেণ্ড মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া, সেই ভস্ম গলিয়া ঢলঢলে হইয়া ফুটিতে ফুটিতে অদৃশ্য বাষ্পময় হইয়া যায়। এই অবস্থান্তর ঘটিবার সময় ভীষণ গর্জ্জন ও প্রচণ্ড অশনিপাত মুহুর্মুহুঃ হইতে থাকে—প্রলয়ের ঝড় অনবরত বহিতে থাকে। আমাদের জল লইয়া এখন যদি বায়ুর মধ্যে এত প্রাকৃতিক বিপ্লব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ঘন লবণ, গন্ধক, মৃত্তিকা প্রভৃতি লইয়া সেই বায়ুতে যে কি ভীষণ উৎপাত হইত তাহা কল্পনাতেও আনা দুষ্কর। এখন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আমরা পাই জল; সে সময়ের মেঘ ছিল অনিলীভূত লবণ, গন্ধকবাষ্প ও মৃত্তিকাবাষ্প প্রভৃতির সমষ্টি। বৃষ্টি হইত গলিত মৃত্তিকা, গলিত লবণ, তরল গন্ধক ও বালুকা। তাহার উপর আবার তেমনই ভীষণ উত্তাপ। এইরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবের মধ্যে আমাদের সর্ব্বংসহা ধরিত্রী ঠাকুরাণীর জন্ম হয়।

যে সকল বাষ্প সহজে তরল হয়, ক্রমশঃ বায়ুবর্ত্ম হইতে সেই সমস্ত পদার্থ একে একে দলে দলে, কখনও মুষলধারে কখনও ঘোর আবর্ত্তে কখনও বা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সহিত ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। জল ইহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। সেই সময় জলে লবণ প্রভৃতি দ্রবণীয় বস্তু গুলিয়া যায় এবং ভূপৃষ্ঠে সমুদ্রের সৃষ্টি করে। সাগরের জল তাই এত লোণা।

উত্তাপ যত কম হইতে থাকে, ধরাবরণ ততই পুরু ও শক্ত হইতে থাকে। জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম—এই যে, উত্তপ্ত অবস্থা হইতে শীতল হইলে আয়তনের সঙ্কোচ হয়। উপরিস্থিত আবরণের এই সঙ্কোচের ফলে ভিতরের তরল বস্তুতে একটা বিষম চাপ পড়ে। ধরায় এই চাপ সময়ে সময়ে এত বেশী হয় যে আভ্যন্তরীণ তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়ারূপ বিপরীত চাপে ঐ আবরণে ফাট ধরে। ভিতরের গলিত পদার্থ ঐ চাপের দারুণ ফাট দিয়া ভীষণ বেগে বাহির হইয়া পড়ে ও জমিয়া যায়। এইরূপে আমাদের মহাদেশ ও পর্ব্বত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। আবরণ যত পুরু হয় চাপও ততই বাড়ে এবং ভিতরের বস্তু ততই বেগে বাহির হইয়া অতি উচ্চ পর্ব্বতের সৃজন করে।

এই সময় উদ্ভিদ্ পদার্থের প্রথম উদ্ভব হয়। অচিরে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থলই ঘন বৃক্ষ পাদপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইহার কারণ তখন বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গারাম্ল অনিল (Carbonic acid gas) ছিল। ঐ বিষাক্ত বাষ্পে কোন ভূচর বা খেচর বাঁচিতে পারে না, কিন্তু উহা উদ্ভিদের প্রাণকরী খাদ্য। তাই সেই প্রাথমিক নিবিড় অরণ্যানীতে একটিও পক্ষীর কাকলী শুনা যাইত না, কোন রাত্রিচর শ্বাপদ আহার অন্বেষণে ঘুরিত না। বৃক্ষগুলি নবীন সসার ভূমিতে উচ্চতা, স্থূলতা ও বিশাল পল্লবশালিতায় অনুপমের রূপ ধারণ করিয়াছিল। নানা আকৃতির পত্র, নানা বিচিত্র চিত্র সমন্বিত বৃক্ষত্বক্ ও পল্লব সেই প্রাণীশূন্য বনের তিলার্দ্ধ স্থানও অনাবৃত রাখিত না। এই সকল তথ্যের প্রমাণ আমরা গভীর কয়লার খনিতে দেখিতে পাই। ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি কালে ভূগর্ভে প্রোথিত হইলে, তাপ ও চাপ সহকারে বহু যুগ পরে কয়লায় পরিণত হয়। খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার চাপড়ার গাত্রে বৃক্ষপত্রের আকৃতি স্পষ্ট দেখা

যায়, কিন্তু একটি জন্তুরও দেহাবশেষ চিহ্ন বা কঙ্কালাদি পাওয়া যায় না। কয়লাতে বৃক্ষ কাণ্ডের আকৃতিও দেখা যায়।

ক্রমে ধীরে ধীরে যখন অঙ্গারাম্ল বাষ্প কমিতে থাকে, দুই একটি করিয়া প্রাণীর উদ্ভব দেখা যায়। যেন প্রকৃতি দেবী অতি সন্তর্পণে প্রাণময় জগতের অবতারণা করিতেছেন—মনে ভাবনা পাছে নূতন জগৎ সেই প্রাণে সহ্য না হয়। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেহবিশিষ্ট প্রাণীর বাসের উপযুক্ত হইলে তখন এমন বৃহৎকায় ও অতিকায় রাক্ষস সৃষ্ট হয়, যে সেগুলি, যুগধর্ম্ম সহকারে একেবারে বিলুপ্ত না হইলে মানবের অভ্যুদয় হইবার নহে। প্রকৃতির খেলায় সেই সব প্রাণীদেরও লোপসাধন ঘটে। জলপ্লাবন তাহার একটি খেলা।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে ভূমধ্যস্থ তরল বস্তুর প্রতিচাপে ভূপৃষ্ঠে ফাট ধরে। কয়েক বার এমন হইয়াছে যে, যে স্থানে ঐরূপ ফাট ধরিয়া একটা পর্ব্বত শ্রেণীর বা মহাদেশের উৎপত্তি আরম্ভ হইল, সেই স্থানের উপর গভীর সমুদ্র রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আভ্যন্তরীণ তরল বস্তু নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল ভীষণ বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এক স্থানের অপরিমিত জলরাশি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যখন এইরূপ ঘটনা একটু বেশী পরিমাণে হয়, তখন এক স্থানের জল পৃথিবীর বাকী সকল স্থানকেই জলমগ্ন করিয়া ফেলে,—তখনই জলপ্লাবন ঘটে। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এইরূপ জলপ্লাবন ও "প্রলয়-পয়োধি"র কথা পাওয়া যায়। উহা অসম্ভব বা অনৈসর্গিক ব্যাপার নহে।

বাইবেল গ্রন্থে যে জলপ্লাবনের কথা আছে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ও কারণ ভূতত্ত্ববিদেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সময়ে পৃথিবীর এক পার্শ্বে ইয়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কিয়দংশ ছিল এবং অবশিষ্ট অংশ গভীর সমুদ্রে আবৃত ছিল। ঐ সমুদ্রের তলদেশে উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড ফাট ধরে এবং ভিতরের গলিত প্রস্তর, মৃত্তিকা, প্রভৃতি সেই বিস্তৃত ফাট দিয়া নির্গত হইতে থাকে। উপরের জলও ক্রমাগত সরিয়া পৃথিবীর সকল অংশের উপর ছড়াইয়া পড়ে। ঐ ঊর্দ্ধ প্রক্ষিপ্ত প্রস্তর ও মৃত্তিকারাশি জমিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রসৃত জলরাশি, এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকার সমগ্র অংশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপেই ঐ জলপ্লাবন ঘটে।

ঐ প্লাবনের এই কারণ নির্দ্দেশ বহু গবেষণার ফল। প্রধানতঃ আমেরিকাদ্বয়ের ভূমধ্যমৃত্তিকার স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে আগাগোড়া গলিত বস্তু জমিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে জলমগ্নতার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। অন্যান্য মহাপ্রদেশেও ঐরূপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বনিম্ন মৃত্তিকা স্তর ঐরূপ গলিত বস্তু জমিয়া প্রস্তর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধ স্তর অপর রূপ মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। এই উপরিতন মৃত্তিকা স্তরে বহু জলজন্তুর দেহাবশিষ্ট কঙ্কাল প্রোথিত দেখা যায়। সামুদ্রিক শম্বুক প্রভৃতির খোলা প্রচুর পাওয়া যায়। অপিচ উহার গঠন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উহা জল হইতে অধঃপতিত বস্তুর সমষ্টি মাত্র।

প্লাবনের জলরাশি সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলে তথাকার সমস্ত জীবই বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ যেমন জল শুখাইতে থাকে, অনেক বস্তু সেই জল হইতে স্থলের উপর "পলি"রূপে পড়ে। জলচর জীবের দেহ ঐ পলিতে সমাহিত হইয়া যায় এবং কালক্রমে শরীর ও কঙ্কাল প্রস্তরীভূত হইয়া ঐ প্রলয়ের পরিচায়করূপে থাকিয়া যায়। আমেরিকাদ্বয় যে ঐরূপে প্লাবিত হয় নাই তাহাও বেশ বুঝা যায়। গলিত বস্তু জমাট বাঁধিয়া যে কঠিন দ্রব্য হয় তাহার কোনরূপ আভ্যন্তরিক স্তর-বিন্যাস লক্ষিত হয় না। পলিপড়া মাটির বা পাথরের চাপড়া ভাঙিলেই উহার ভিতরে স্তরবিন্যাস ও জলজীবের দেহাবশেষ দেখা যায়।

সুতরাং দেখা গেল যে জলপ্লাবন পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের বাহ্য উচ্ছ্বাস মাত্র। সমুদ্রের নিম্নস্থ প্রদেশ হইতে উত্থানশীল গলিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা রাশিই উহার অবান্তর কারণ। জলপ্লাবনে এককালে সমগ্র পৃথিবী যে জলমগ্ন হয় তাহা সত্য নহে। একদিকে যেমন একটা মহাদেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলে, সেই স্থানের জলরাশি সরিয়া গিয়া অপর স্থানসমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে। ইহাতে অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই।

ভূপিণ্ডের অন্তশ্চাপের ফলে যে বহিরাবরণের স্থানে স্থানে কাট ধরিয়া থাকে, তাহা যেখানে সেখানে বা যেমন তেমন ভাবে হয় না। ঐ কাট্ ধরার একটা সুনিয়ম দেখা যায়। হয় এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত লম্বা-ভাবে কিম্বা নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরে ঐ মেরুদ্বয় দুই পার্শ্বে রাখিয়া কাট ধরিয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় পর্ব্বতশ্রেণী ও মহাপ্রদেশের প্রকৃতি ভাল করিয়া দেখিলেই উক্ত [illegible] বুঝা যাইবে। ইউরাল্ প্রভৃতি পর্ব্বতপুঞ্জ, আফ্রিকা ও আমেরিকাদ্বয়, এই প্রথম শ্রেণীর কাটের ফল। হিমালয়, এসিয়া ও ইয়ুরোপ প্রভৃতির উদ্ভব দ্বিতীয় শ্রেণীর কাটের দরুণ হইয়াছে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫টি জলপ্লাবনের চিহ্ন ভূপৃষ্ঠে পরিলক্ষিত হয়। এক এক বারে কোন না কোন উচ্চ পর্ব্বত বা মহাদেশ সৃষ্ট হইয়াছে ও বাকি ধরা জলমগ্ন হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ঘটনা মুহুর্মুহুঃ হইত। পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী প্রথম প্রথম কতই না চাঞ্চল্য দেখায়। ক্রমে যেমন তাহার তেজ ক্ষয় হইতে থাকে, খাঁচার এক কোণে 'গোঁজ' হইয়া পড়িয়া গর্জ্জায়! আমাদের ধরণীদেবীর সেই অবসাদের অবস্থা এখন আসিয়া পড়িয়াছে। তবে তেজ যে এখনও লুপ্ত হয় নাই তাহা প্রতি দীর্ঘশ্বাসেই বুঝা যায়। আগ্নেয়গিরির প্রত্যেক অগ্ন্যুৎপাতে আমরা বুঝিতে পারি যে এখনও ভিতরে আগুন নিভে নাই। তবে এক্ষণে উপরের আবরণ এত পুরু হইয়া পড়িয়াছে যে সহজে ওরূপ কাট ধরিবার সম্ভাবনা নাই। বরং চাপের আধিক্য আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা উপশমিত হইবার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর তেজও তত নাই। সুতরাং ভূতত্ত্ববিদেরা সন্দেহ করেন আর জলপ্লাবন হইবে কি না। অপর-দিকে এখনও ভূপৃষ্ঠে স্থল অপেক্ষা জলের অংশ বহুগুণ বেশী। সুতরাং প্রশান্ত বা আট্লান্টিক মহাসাগরের নিম্নে কাট ধরিলে দুই চারিবার যে জলপ্লাবন না হইতে পারে এমন নহে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্লাবন অপেক্ষা

জলের গভীরতা অল্পই হইবে, কারণ স্থলাংশের পরিমাণ বাড়িয়াছে। ভারতে বিন্ধ্যগিরির চূড়া ডুবে কিনা সন্দেহ। শেষ প্লাবনে (Mosaic deluge) হিমালয়শৃঙ্গও বহু ক্রোশ জলের নিম্নে ছিল!

(শঃ ভঃ)

ব্রহ্মদেশের রমণী।

ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বনশীলতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে দেশের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা এবং অধিকার আমাদের দেশের পুরুষের চেয়ে কোনও বিষয়ে কম নহে। ব্রহ্মমহিলারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে যখন তখন যেখানে সেখানে যাইতে পারেন এবং স্বদেশীয় বা বিদেশীয়, আত্মীয় বা নিঃসম্পর্ক পুরুষের সহিত স্বাধীনভাবে বাক্যালাপ করিতে পারেন। ইহাতে সে দেশের স্ত্রীলোকের কোনরূপ অসম্মান অথবা লজ্জাভয় নাই। দেশীয় প্রথানুসারে তাঁহারা অনেকটা পুরুষেরই মত পোষাক পরিচ্ছদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেণী বিনাইয়া কবরীবন্ধন করেন না। ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশরাশি কুণ্ডলাকারে মস্তকের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র পিরামিডের ন্যায় করিয়া জড়াইয়া রাখেন। তাঁহাদের মস্তকে কোনরূপ আবরণ থাকে না এবং অবগুণ্ঠন কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানেন না। সাধারণ পুরুষের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে উন্মুক্ত-বদন দেখাইতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ কিংবা সরম বোধ হয় না; বরং ইহার বিপরীতভাব, অবগুণ্ঠনবতী বাঙ্গালী মহিলাকে দেখিয়া অনেক ব্রহ্মরমণী ব্যঙ্গ ও হাস্য করিয়াছেন, দেখিয়াছি। বাঙ্গালাদেশের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ মহিলাদিগের যেরূপ অবরোধ আছে, ব্রহ্মদেশের রাজ-মহিষীরও সেরূপ অবরোধ নাই।

ব্রহ্মদেশের মহিলারা হাট বাজারের দোকানে গিয়া সকল প্রকার দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় করেন। কেবল যে দরিদ্রাবস্থার স্ত্রীলোকেরা হাটে বাজারে গিয়া ক্রয় বিক্রয় করেন তাহা নহে। ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও অবাধে হাটেবাজারে দোকান করিয়া থাকেন। সে দেশের "মিউক" আমাদের দেশের ডেপুটী বাবুর সমপদবীর রাজকর্ম্মচারী। জনৈক মিউকের পঁচিশ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাকে বাজারে মুদির দোকান করিতে দেখিয়াছি। তথাকার সাধারণ স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রবয়ন, চুরুট প্রস্তুত, জামা সেলাই, কৃষিকার্য্য, সারথ্য এবং নৌকা-চালন প্রভৃতি কার্য্য করেন। ইহা ছাড়া রন্ধনাদি গৃহকার্য্য ত তাঁহাদিগকে করিতেই হয়। নানাবিধ কারুকার্য্যে ব্রহ্ম-মহিলাদের বিশেষ নৈপুণ্য আছে। লেখাপড়াতেও ব্রহ্মনারীদের অনধিকার নাই। নগরবাসী বড়লোকের মেয়েরা ত লেখাপড়া জানেনই; পল্লীগ্রামের কৃষক কন্যারাও লিখিতে পড়িতে এবং দ্রব্যাদির মূল্য হিসাব করিয়া লইতে পারেন।

স্বামী কিংবা পিতাপুত্রকে সঙ্গে না লইয়াও ব্রহ্মবাসিনীগণ ষ্টীমার বা রেলগাড়ীতে

চড়িয়া যথাইচ্ছা যাতায়াত করেন। অভিভাবকহীন অবস্থায় গ্রামান্তর গমন করিতে তাঁহাদের একটুও আশঙ্কা হয় না। তথাকার কোনও স্ত্রীলোককে একাকিনী অসহায়া দেখিয়া যদি কোনও পুরুষ কোনও অসদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তাহার প্রতিফল দান করেন।

ব্রহ্মদেশের রমণী।

একদিন পেগু হইতে রেলগাড়ীতে গমন-কালে, আমি দেখিয়াছি, একজন বিদেশীয় পুরুষ জনৈক ব্রহ্মমহিলার গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া কি একটি বিদ্রূপ করিয়াছিল। ইহাতে বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া সেই মহিলা পায়ের চটিজুতা খুলিয়া সেই
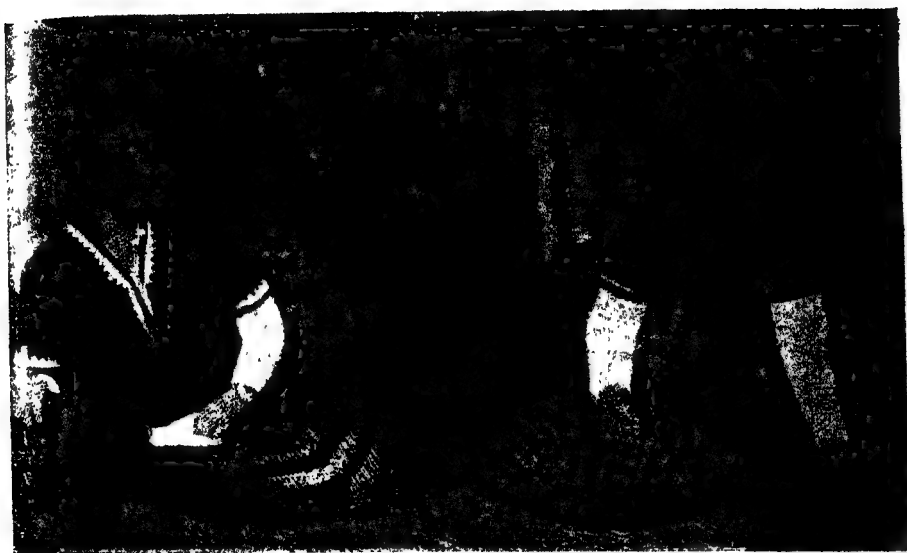
ব্রহ্মদেশের রাজা ও রাণী।

ব্রহ্মদেশের মহিলা।

লোকটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের এইরূপ পুরুষোচিত অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া আমরা একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। এই অযথা অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য যখন সেই ব্যক্তি একটু উত্তেজিত হইল, অমনি গাড়ীর সমুদয় দেশীয় নরনারী উক্ত মহিলার পক্ষ লইলেন। ইহাতে সেই অপমানিত লোকটি নিজ কর্ম্মের ফল পাইয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল। শুনিলাম, সে দেশের সকলেই স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্য্যাদা রক্ষার্থে যথাসাধ্য যত্নবান। সমাজ মধ্যে এ প্রকার অবাধ অধিকারলাভ করাতেই ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরা এরূপ সাহস, স্বাধীনতা স্বাবলম্বন ও আত্মরক্ষার ভাব দেখাইতে সক্ষম।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুতুল-নাচ।

যে সকল মূল-উপাদান নাট্যের সংগঠনে সাহায্য করিয়াছে, তন্মধ্যে এক জাতীয় নাট্যের উল্লেখ করা আবশ্যক—যদিও সে শ্রেণীর নাট্যকলাকে সাহিত্যিক ইতিহাস একেবারেই আমলে আনে নাই :—তাহা পুত্তলী-নাট্য। যাবাদেশীয় পুতুল-নাচের খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত, কিন্তু যবদ্বীপ উহার উৎপত্তিস্থান নহে। ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম ও মহাকাব্যগুলির সহিত পুতুল-নাচ যবদ্বীপে ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছে। বহুকাল হইতে পুতুল-নাচ ভারতবর্ষের নিকট সুপরিচিত। মানবীয় কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া, মহাভারত অনেকস্থলে এই পুত্তলী-নাট্যের উল্লেখ করিয়াছে। "এই সকল কাষ্ঠ পুত্তলী যাহা সূত্রের দ্বারা চালিত হয়।" (সূত্রপ্রোত) (১)

বৃহৎকথা-গ্রন্থে (২) অসুরমায়ার দুহিতা সোমপ্রভা, পিতৃহস্ত গঠিত কতকগুলি পুত্তলীর দ্বারা, স্বকীয় সখী কলিঙ্গসেনার চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। "তন্মধ্যে একটী পুত্তলী উড়িয়া গেল এবং একটা ফুলের মালা কুড়াইয়া কলিঙ্গসেনার নিকট আবার আনিয়া দিল ; একটি পুত্তলী জল আনিল। একটী নৃত্য করিতে লাগিল, আর একটি বাক্যালাপ করিতে লাগিল।" এই কথনশীল পুত্তলী, বালরামায়ণের একটি গর্ভাঙ্কেও পরিলক্ষিত হয়। (পঞ্চমাঙ্ক, গর্ভাঙ্ক)।

---

(১) V ৯৫১, ১৪৪৬, ৫৪০৫ ; III, ১১৩৯।

(২) কথা সরিৎ সাগর— তরঙ্গ ২৯।

সীতার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য রাবণ বারংবার যাচ্ঞা করিয়াও যখন ব্যর্থমনোরথ হইল, তখন তাহার গর্ব্ব ও প্রেমলালসা উভয়ই ক্ষুন্ন হইল; তাহার চিত্ত কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না। তখন তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য, একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন; তিনি বিশারদ নামক একজন শিল্পীকে সূত্রের দ্বারা চালিত হইতে পারে এইরূপ দুইটি কাষ্ঠপুত্তলী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন; আর বলিলেন, একটি ঠিক সীতার মত দেখিতে হইবে, আর একটি সীতার ধাত্রীর কন্যা এবং সেই সম্পর্কে সীতার ভগিনী সিন্দুরিকার মত দেখিতে হইবে। এই পুত্তলী দুটি রাবণের সম্মুখে আনীত হইল। রাবণ মদনোন্মত্ত হইয়া কাষ্ঠময়ী সীতার উপর ঝাঁপিয়া পড়িল, তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল, সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল। একটি শুকপক্ষী পুতুলের মুখে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকে আবৃত্তি করিতে শেখান হইয়াছিল, সেই শুকপক্ষী রাবণের প্রার্থনার উত্তর করিতে লাগিল। যে শিল্পী সূত্র ধরিয়া থাকে তাহাকে সূত্রধার বলে। (V, V, ৬) মারাঠা ও কানারী দেশে আজও পর্য্যটনকারী পুত্তলী-নাট্যসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়; (মারাঠি ভাষায়-কলাসূত্রী-বাহুল্যা) তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করে। কৃষকেরা এই পুত্তলী-নাট্য ছাড়া আর কোন নাট্যের কথা জানে না। পুতুলগুলি কাঠের কিংবা কাগজের এবং উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ নিপুণ ভাবে গঠিত। উহারা নৃত্য করে, যুদ্ধ করে, দাঁড়াইয়া থাকে, নিদ্রা যায়, নাট্যাভিনয়ের সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করে। পরিচালক ও তাহার সহকারী সূত্র ধরিয়া থাকে এবং নাট্যোল্লিখিত পাত্রদিগের উক্তি-গুলি আবৃত্তি করে। (৩)

সম্ভবত পঞ্চাল দেশ হইতে (আধুনিক তির্হুত) এই পুত্তলীনাট্যকলা সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। কেননা, এখনও উহা পাঞ্চালী বা পাঞ্চালিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(৬)

"সাহিত্য" পত্রে, "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" দেখিলাম, লেখক বলিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকটে বলিয়াছিলেন, যে "কমলা-কান্ত"ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা।

এই উক্তিতে যদি ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ঠিক মতপ্রকাশ করিতে পারিতেন না; যে সময়ে যে বইখানি তাঁহার নিকটে অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হইত, সেই সময়ে সেই বইখানিকেই, তিনি ভাল বলিতেন। আমাদের এবংবিধ ধারণার কারণ বলিতেছি।

দীনবন্ধু-পুত্র শ্রীযুত ললিতচন্দ্র মিত্র মহা-

(৩) শঙ্কর পণ্ডিত, বিক্রমোর্ব্বশী; টীকা—পৃ ৪।

পর, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে, তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। কথাপ্রসঙ্গে ললিত বাবু জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কোন্ উপন্যাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ এবং রাজসিংহ।" আনন্দমঠের নাম না করাতে, ললিতবাবু কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, as a patriotic work আনন্দমঠ অতুলনীয়।" •

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "ও 'সেন্সে' খুব ভাল বটে, কিন্তু ইহাতে আর্ট কম।"

কবিবর শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একবার বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, "দেবী চৌধুরাণীই আমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।"

এখন কাহার কথা ঠিক?

অতঃপর, "বন্দেমাতরং" সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবু, "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটী যখন "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ রামবাবু বলেন, "একটা ছোট গানে বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না, আপনি একখানি উপন্যাস ধরুন।"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন "এ গানের মহিমা তোমরা এখন বুঝিবে না। যদি পঁচিশ বছর বাঁচিয়া থাক, তখন দেখিবে এক দিন এই গানে সারা বঙ্গ মাতিয়া উঠিবে।' ললিত বাবু, এই কথাগুলির সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালের ১১ই আষাঢ়ে, কাঁটালপাড়ায়, তাঁহার সহিত পূর্ব্ব কথিত রামবাবুর সাক্ষাৎ হয়। রামবাবুও ঠিক পূর্ণবাবুর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণী দৃষ্টি ও প্রতিভা-প্রসাদাৎ আজ "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের নামে শুধু বাঙ্গালীর কেন——ভারতবাসীর ——ত্রিংশাধিক কোটী মানবের নৃত্যতি মানস শিখী! এবং তাহার ছন্দ আর কবিত্ব আর গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া সকলেই যেন স্বদেশ-লক্ষ্মীর শরীরিণী মূর্ত্তি দেখিতে পায়।

বঙ্কিমচন্দ্র, রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট,—সেই সময়ে স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রও ঐ স্থানের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারি বন্ধ হইয়া গেলে, বঙ্কিমবাবু ও আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ গৌরদাস বাবু দুইখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। ভূদেববাবুর পুত্রও সঙ্গে ছিলেন,—তিনিও একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সেদিন, তাঁহাকে কোন কার্য্যবশতঃ রেভিনিউ বোর্ডে যাইতে হইয়াছিল।

পিতার নিকট হইতে পুত্র যখন গাড়ীর ভাড়া চাহিলেন,—পিতা তখন আপত্তি করিলেন।

পুত্র বলিলেন "অন্যদিনের মত আমি হাঁটিয়া হাওড়ার পুল পার হইয়া, ট্রামে করিয়া রেভিনিউ বোর্ডে যাইতাম, কিন্তু আজ দু' জন ডেপুটী গাড়ী ডাকাতে আমাকেও বাধ্য হইয়া গাড়ী ভাড়া করিতে হইয়াছিল।

ভূদেব বাবু তখন আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর তাঁহাকে একদিন ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া, তিনি পুত্রকে ডাকিলেন। বলিলেন, "দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি,—কিন্তু তবু হাঁটিয়াই পুল পার

ইয়া ট্রামে চাপিয়া কাজে গিয়াছি; গাড়ী

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ডাকিয়া বাজে খরচ করি নাই। বাপু; অপব্যয়টা ভাল নয়।"

এইরূপে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া, উক্ত মহাপুরুষ মৃত্যুকালে স্বজাতির উন্নতিবিধানের নিমিত্ত একলক্ষ বাট্ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, রৌদ্র সহ্য করিতে পারিতেন না বটে—কিন্তু শীতের বেলায় তাঁহার ভিন্ন ব্যবস্থা। 'হাড়ভাঙ্গা' শীতের রজনীতেও, তিনি শয়নকক্ষের দুটি জানালা, সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিতেন। সে জন্য, তাঁহার দেহ অসুস্থ হইত না। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ যে খুব বিচিত্র ছিল,—তা' নয়। বাড়ীতে তাঁহার গায়ে একটী হাত কাটা পাঞ্জাবী থাকিত; কোন কোনদিন গেঞ্জি পরিধান করিতেন। কেবল কাপড়ের বেলায় তিনি একটু সৌখীন ছিলেন। মোটা কাপড় ভালবাসিতেন না,—খুব মিহি দেশী কাপড় পরিতেন।

ললিত বাবুর মুখে একটি হাসির গল্প শুনিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে থাকিতেন। একদিন জগদীশ বাবু হঠাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত।

জগদীশচন্দ্র, বঙ্কিমকে আপনার আগমন-সংবাদ দিলেন না। তাঁহার বাসার সম্মুখে গিয়া গান ধরিলেন "আমি বাগবাজারের মেথরাণী!"

ভিতর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র, চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন "নিকাল্ দেও—নিকাল দেও!"

বলা বাহুল্য, গান শুনিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র, এই অপূর্ব্ব "মেথরাণীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

এইবারে, "নীলদর্পণ" ও দীনবন্ধুর সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। দীনবন্ধু, নদীয়া জেলায় চৌবেড়িয়া গ্রামে, একটী ক্ষুদ্র কুটীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কুটীরের অনতিদূরেই একটী নীলের আড়ৎ ছিল। এবং দীনবন্ধুর জন্মভূমিই নীল-বিপ্লবের কেন্দ্রস্থান। সেইজন্যই, নীলদর্পণ প্রণয়ন-কালে, গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছিল।

দীনবন্ধু, যখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অধীনে সুপারিণ্টেনডেণ্ট,—সেই সময়ে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, নীলদর্পণ, ঢাকার একটী ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

নীলকরগণের অত্যাচারে তখন বঙ্গদেশ জর্জ্জরিত। সে অত্যাচারের বিবরণ, এখন সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিব না। "নীলদর্পণ" যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁহার "হিন্দু পেট্রিয়টে" নীলকরগণের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনীচালনা করিতেছিলেন। একেই ত' তাঁহার শক্তিশালিনী রচনায় সকলের হৃদয়ে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল,—তাহার উপরে "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হইয়া "অনলে ঘৃতাহুতি" প্রদান করিল। সামান্ত উত্তেজনা সহসা প্রবল এবং সার্ব্বত্রিক হইয়া দাঁড়াইল। জনসাধারণ, "নীলদর্পণ"কে সাগ্রহে গ্রহণ করিল।

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে নীলদর্পণ, ঢাকায় মহাসমারোহে অভিনীত হইল। ঐ বৎসরেই বোম্বের গ্রাণ্ট রোড থিয়েটারে, "নীলদর্পণ" অভিনয়ের উদ্যোগ চলিতে থাকে। সুতরাং, বুঝিতেই পারা যাইতেছে, এই প্রসিদ্ধ উত্তেজনার স্রোত, কেবল বঙ্গদেশে আবদ্ধ থাকে নাই; পরন্তু সমগ্র ভারতে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল।

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর, কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণ অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে, জনসাধারণের মন যে কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ্ত নয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, একদিন "নীলদর্পণে"র অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। অভিনয়ের স্বাভাবিকতায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, সহসা এমনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন, যে অত্যাচারোন্মত্ত সাহেবের ভূমিকায় নট-সম্রাট ৺অমৃতলাল মিত্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, আপনার সুপ্রসিদ্ধ "তালতলা"র বৃহৎ চটিজুতা ছুঁড়িয়া বসিলেন। অভিনেতার আহত ললাট হইতে রক্তধারা বহিল। এবং সেই শোণিত, তাঁহারই জয়তিলকে পরিণত হইল!

অবিলম্বে "নীলদর্পণ" ইংরাজীতে অনূদিত হইল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,—কিন্তু লং সাহেবের নামেই

রেভারেণ্ড জেমস্ লং।

তাহা প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়। বিলাতেও, সিম্প্‌কিন্ মার্শেল কোম্পানী,—ইংরেজী নীলদর্পণ বাহির করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, ইয়োরোপের আরও অনেক ভাষাতে "নীলদর্পণে"র একাধিক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

লং সাহেব, ইংরাজী "নীলদর্পণে"র

একটা ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে, সি, এইচ্, ম্যানুয়েলের, "Calcutta Printing and Publishing Press" নামক ছাপাখানায় ১০নং ওয়েলিংটন লেন হইতে "নীলদর্পণ" মুদ্রিত হইল। উপরে লেখা ছিল :—"Nildarpan or The Indigo Planting Mirror, a drama translated from the Bengalee, by a Native।" ৫০০ শত সংখ্যার পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রণব্যয় দিয়াছিলেন,—লং সাহেব নিজে।

অনুবাদ, প্রকাশিত হইলে, ইংরাজ সমাজে লং সাহেবকে যে কত দূর অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নয়। বাস্তবিক, উক্ত অনুবাদ বাহির করিয়া, মহানুভব লং যথেষ্ট সৎসাহস ও দয়াশীলতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, পতিতের দুঃখে এবং দীনের ক্রন্দনে, তিনি নিজের প্রাণ দিয়া কাঁদিতে জানেন। এ দৃশ্য দুর্লভ।

লং সাহেবের উপস্থিত বিপদে, রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, তাঁহার নিকটে সহমর্মিতাসিক্ত পত্র প্রেরণ করিলেন।

অবশেষে, ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১৯শে জুলাই, শুক্রবার, জেম্‌স লং-এর নামে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। অপরাধ, ইংলিশম্যানের সম্পাদক এবং নিম্নবঙ্গের নীলকরগণের মানহানি করা। চারদিন ধরিয়া বিচার চলিল।

বিচারকালে আদালতগৃহ খেতাঙ্গ এবং শ্যামাঙ্গ উভয় শ্রেণীর জনতাতেই পূর্ণ হইয়া যাইত। একেবারে তিলধারণের স্থান থাকিত না। এই জনতার ভিতরে, "নীলদর্পণ"কার দীনবন্ধুও উদ্বিগ্নহৃদয়ে প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। মিঃ জেমস্ রুটলেজ্, তাঁহার English Rule and Native Opinion in India নামক পুস্তকে এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "that he was present in Court and ready to exchange places with Mr. Long if that had been possible."

২৪শে জুলাই, বিচারপতি রায় দিলেন। ফলে, লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। জরিমানার টাকা, জোড়াসাঁকোর মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল। বিচারফল শ্রবণ করিয়া, মহানুভব লং অবিচলিত হৃদয়ে বলিলেন "আমি এখন যাহা করিয়াছি, ভবিষ্যতে আবার তাহা করিব।" ("What I have done now, I will do again.")

বিচারপতি ছিলেন Sir Mordaunt Wells। বিচারকালে—যেখানে পক্ষপাতিত্ব বা জাতিবিদ্বেষ নাই—সেই আসনে বসিয়া, তিনি দেশীয়গণের উপরে এবং লং সাহেব ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির প্রতি অনেক প্রলাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অবিলম্বে, ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২৮শে আগষ্ট, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে, বিচারপতির ঐ সকল উক্তির প্রতিবাদের জন্য এক সভা আহূত হইল। সভাক্ষেত্রে, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালিকৃষ্ণ ঠাকুর,

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (তখনও মহারাজা হন নাই) ও শ্রীযুত রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভার অধিবেশনে, পরে যথেষ্ট ফল হইয়াছিল।

এই সভার দুইদিন পরে, লং সাহেব কারাগার হইতে বাহির হইলেন। তৎকালে, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রায় দুই তিনশত ভদ্রলোক কারাগারের নিকটে উপস্থিত ছিলেন।
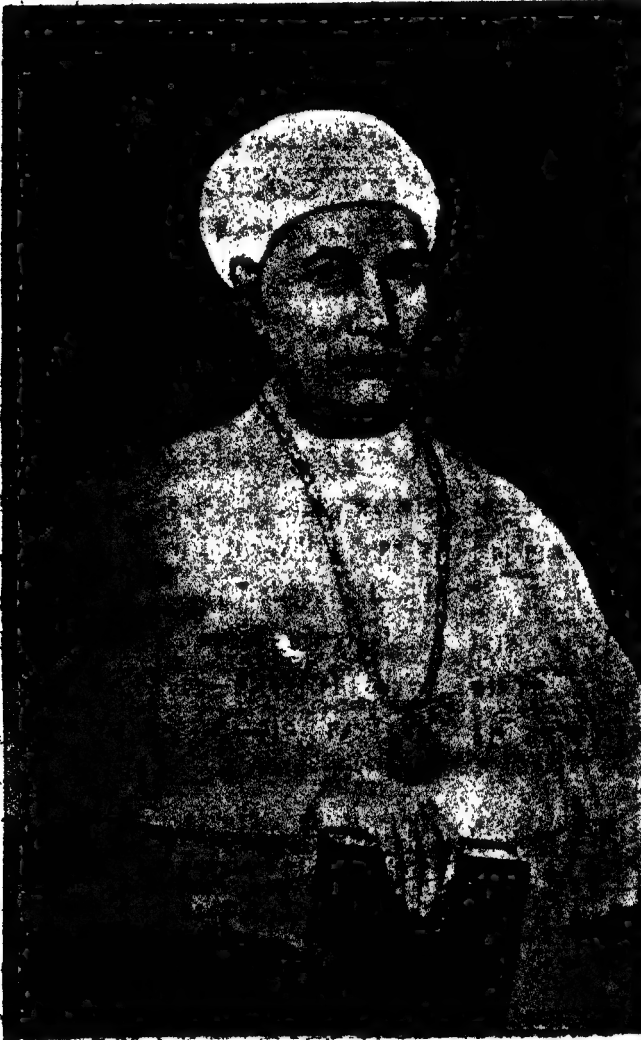
লং সাহেব স্বাধীন হইয়াই উক্ত বিষয় সম্বন্ধেই, আবার এক-খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করিলেন।

এই "নীলদর্পণে"র সংস্রবে আসিয়া মাননীয় মিঃ সিটনকারও কিছু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নীল-দর্পণে'র অনুবাদ করিয়া, একেবারে পরিত্রাণলাভ করেন নাই। গোপনে, তিনিও তিক্তমধুরগোছের কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।*

বাস্তবিক, দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" তৎকালে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে, এক উত্তেজক মত্ত ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালীর চিরবিখ্যাত অত্যাচারসহ হৃদয়ে, তাহা এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নবভাবের

স্বর্গীয় স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

* নীলদর্পণ সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনায়, আমি শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্রের Indigo Disturbance নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিল। নীলদর্পণের প্রকাশে, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। বঙ্গের দীন আর্ত্তগণের কাতর ক্রন্দন নিবারিত হয়। এবং অত্যাচারী নীলকরগণ, আপনাদের মৃত্যুবান পরহস্তগত দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এক 'নীলদর্পণ', এই তিনদিক্ রক্ষা করিয়াছিল।

উপকারিতা হিসাবে যদি নাটকের আসন নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে, কিছু মাত্র অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, অনায়াসে বলা যায়, "যে নীলদর্পণের সহিত সমপদগর্ব্বী নাটক, অদ্যাবধি বঙ্গসাহিত্যে একখানিও প্রণীত হয় নাই। কারণ, আর কাহারও নাটক, "নীলদর্পণে"র মত বাঙ্গালীর অভাব মোচনার্থ এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

"নীলদর্পণ" যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এখন তাহা অচল। বিদ্যমান যুগের রচনাদর্শ ভিন্ন প্রকার। হয়ত আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে "নীলদর্পণে"র দীর্ঘ সমাস কণ্টকিত কথোপকথনের ভাষা, ধৈর্য্যহীন পাঠকের নিকটে অপঠিত থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! অমরত্বের পন্থায় "নীলদর্পণে"র পরিপন্থী কিছু নাই। কারণ, ভাষা-রীতি চিরকালই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, —পরিবর্ত্তিত হইবে। ইংলণ্ডীয় কবি চসারের ভাষা, এখন কেহ পড়িতে পারে না। শেক্‌স্‌পিয়ারের রচনাদর্শের সহিত, ইংরাজি সাহিত্যের বিদ্যমান রচনাদর্শ মিলাইতে গেলে যথেষ্ট বিভেদ দেখা যায়। তবে কি চসার এবং শেক্‌স্‌পীয়ার মরিবেন? অসম্ভব।

অতঃপর, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কথা বলিয়া উপস্থিত অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

যে মহাত্মাগণ, বঙ্গসাহিত্যের বেদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভগবান, তাঁহাকে অল্প কালের জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প পরমায়ু লইয়া, কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাসীকে যেরূপ বিরাট উপহার দান করিয়া গিয়াছেন,—কয় জন তাহা পারেন? তিনি ধনীর সন্তান। প্রবাদ বলে, কমলার সঙ্গে বাক্‌দেবীর চির-বিবাদ। কিন্তু এখানে ঝগড়া-ঝাঁটি মোটেই ছিল না,—মাখামাখি ছিল খুব বেশী রকম।

বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিবার জন্য,—তাহাদের নৈতিক জীবনকে পূর্ণ-গঠন করিবার জন্য তিনি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, বাঙ্গলার সাহিত্যভাণ্ডারে দান করেন। এ 'দান' মহৎ দান। এবং ইহাই তাঁহার অমরত্বের সোপান। এই মহাভারতের অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পরে, তিনি অল্পদিন মাত্র পৃথিবীতে ছিলেন। এই কাজ করিবার জন্যই যেন তাঁহার পৃথিবীতে আগমন।

মহাভারত ছাড়া, আর একটী জিনিষ তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তাহা "হুতোম্ প্যাঁচার নক্‌সা।" টেকচাঁদ ঠাকুরের পদানুসরণে তিনি বই খানি লিখিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজস্ব মৌলিকতার অভাব নাই। তাঁহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ ও পরিহাসপটুতার রসধারায় অভিষিক্ত হওয়াতে, বইখানি সেকালের অনেকের প্রাণরঞ্জক ছিল। হুতোমের

চাবুক যাহার পিঠে পড়িয়াছে, সে জালায় অস্থির হইয়াছে। কেহ কেহ কিছু শিক্ষা-লাভও করিয়াছিল, কিন্তু অনেকেই সে বিষয় জালা ভুলিতে না পারিয়া, তাঁহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ, (যতদূর জানি) সর্ব্বপ্রথমে তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দুর্নীতিদুষ্ট সমাজের প্রতি প্রচ্ছন্নব্যঙ্গ, কেবল তাঁহার পুস্তকেই যে পাওয়া যায় এমন নহে,—তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ভিতরেও তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখকের পূজনীয় পিতামহ মহাশয়, একবার কোন কার্য্যবশতঃ কালীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন প্রভাতকাল,—কালীপ্রসন্ন তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। কাজেই তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বাবু?"

"কি আর চাইব বাপু, তোমার বাবুকে চাই।"

"আজ্ঞে না, বাবুর হুকুম, কোন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস কর্ত্তে হবে, তিনি তামাক চান কি মদ চান?"

পিতামহ মহাশয়, ভৃত্যের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্‌!

তাহার পর, কালী-প্রসন্ন বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে, সকল রহস্য জানা গেল। কালীপ্রসন্ন বলি-লেন "মহাশয়, সেকাল আর নাই, তখন বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত এলে এক বরাদ্দ ছিল,

তামাক ; এখনকার বাবুসাহেবদের শুধু তামাকে আর মন ওঠে না, মদ না হলে আনন্দ জমে না। কাজেই আমাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়েছে ;—আমি তামাক আর মদ দুই বাড়ীতে মজুত রেখেছি, —যিনি যা ইচ্ছে করেন।"

কালীপ্রসন্ন দীনের বন্ধু, কিন্তু ভণ্ডের যম ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটি আলমারি ছিল,—তাহার ভিতরে এক একজন ভণ্ড বামুনের মাথা হইতে কাঁচি দিয়া কাটা নম্বর দেওয়া বহুসংখ্যক টিকি ঝুলানো থাকিত। ঐ সকল "কৰ্ত্তিত-টিকি" ব্রাহ্মণের ভিতরে, কেহ ছিলেন তর্কনিধি, কেহ ছিলেন চূড়ামণি, কেহ ছিলেন বিদ্যানিধি বা বিদ্যাবাগীশ বা শিরোমণি। কাহারও অপরাধ, নারীহরণ, কাহারও অপরাধ যবনীসহবাস, কাহারও অপরাধ মুসলমানের সহিত আহার। নম্বর দেওয়া টিকিগুলির তলায় ঠাকুরদের নাম আর উপাধি আর লীলাখেলার ইতিহাস প্রাঞ্জলভাষায় লেখা থাকিত। এইরূপে কালী-প্রসন্ন রাজ্যের টিকি আলমারির ভিতরে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা প্রাণান্তেও তাঁহার বাড়ীর পথের ত্রিসীমায় পা ফেলিতেন না। যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যাইতেন, তাঁহারা সযত্নে পরিপাটিরূপে আপনাদের তৈলপক্ক টিকিগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতেন,—কি জানি, যদি কালীপ্রসন্ন একবার হঠাৎ টিকি দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আর আস্ত রাখিবেন না,—একেবারেই ধারাল কাঁচি চালাইয়া দিবেন,—তাঁহার দেবতাব্রাহ্মণ জ্ঞান নাই! টিকি উজাড় করিয়া কালীপ্রসন্ন অবশেষে "টিকি-কাটা জমিদার নাম পাইয়াছিলেন।

এখন, কি ঘটনার জন্য টিকি-কাটার সূত্রপাত, তাহাই বলিব।

কালীপ্রসন্নের বাড়ীতে একটী গাভী ছিল। মাতার অনুরোধে, কালীপ্রসন্ন গাভীটিকে আপনাদের গুরুদেবকে দান করেন। এবং গুরুদেব, যাহাতে গাভীটিকে যত্নের সহিত পালন করেন, তাহার জন্য কিছু "মাসোহারা"র বন্দোবস্তও করিয়া দিলেন। গুরুদেব, মহাধার্ম্মিক ব্যক্তি,—মুখে সদাই দেবতার নাম,—সন্ধ্যাহ্নিক, ধ্যানধারণা, ধবধবে পইতা আর দীর্ঘ টিকি প্রভৃতি যেগুলি থাকিলে গুরুদেব হইয়া পড়া যায়,—তাঁহার সে সকলের কিছুই অভাব ছিল না। দেবতুল্য ব্যক্তি!

যাহা হৌক, গুরুদেব অতঃপর কিছু ঘন ঘন শিষ্যের বাড়ী, পদধূলিতে পবিত্র করিতে লাগিলেন। বাবুকে কিছু বলিতে সাহস হয় না, সুতরাং কালীপ্রসন্নের মাতার কাছে গিয়া, কোনবার ঘাসের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া, কোনবার অন্য কিছু বলিয়া, মিথ্যাকথায় ভুলাইয়া লুকাইয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়া যাইতেন। গাভীর জন্য, কালীপ্রসন্ন যে "মাসোহারা" দিতেন, ভক্তিভাজন গুরুদেব তাহার কিরূপ সদ্ব্যয় করিতেন সে কথা জানি না। তবে, সমস্ত টাকাগুলিই যে গাভীর জন্য অপব্যয় করিতেন না,—তাহা নিশ্চয়!

এমনি কিছুদিন যায়। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, গাভীটি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া কালীপ্রসন্নের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত!

তাহার পিছনে পিছনে আর এক মূর্ত্তি,—যমদূতের মত এক কশাই!

বিস্মিত কালীপ্রসন্ন কশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই এখানে কেন?"

কশাই বলিল "বাবু, আম্লার গরু আপনার বাড়ীতে ঢুকেছে—তার পেছনে আমি এসেছি।"

"বটে, এ গরু তুই কোথায় পেলি"?

কশাই বলিল "হুজুর, এক বামুন আমাকে গরুটি বিক্রী করেছে। আমি কশাই।"

কালীপ্রসন্ন, তাহাকে আর কিছু বলিলেন না,—গাভীর দাম দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না।

তাহার পর স্বয়ং গুরুদেব আসিয়া হাজির। কালীপ্রসন্ন, তাঁহাকে আর বেশি কিছু না বলিয়া, তাঁহার মাথার লম্বা টিকিটি চমৎকাররূপে সাফ্ কাটিয়া লইয়া ঠাকুরকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে টিকিকাটা আরম্ভ হয়।

কালীপ্রসন্নের অনেক গুণ ছিল। আমরা সকল কথা, স্বল্পস্থানে বলিতে পারিব না। তিনি সাতিশয় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতচর্চ্চার সুবিধার জন্য, তিনি আপনার বাড়ীতে একটী সঙ্গীত-সভা স্থাপন করেন।

কালীপ্রসন্ন, গতানুগতিক ছিলেন না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, বেশ একটু নূতনত্বের সহিত কাজটিকে সফল করিতেন। কাঠের বা অলাবুর তান্‌পুরার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন, তানপুরার কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আসরে অনেক প্রসিদ্ধ গায়কের সম্মুখে তাহার গুণাগুণের পরীক্ষা হয়। তাহাতে জানা গিয়াছিল, কাগজের তুম্বে তান্‌পুরা দিব্য বাজে,—তাহার স্বাভাবিক স্বরতরঙ্গের মধ্যে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারা যায় না।

(ক্রমশ)

জাঁদরেল কালু।

বাঙ্গালীও একদিন বীরজাতি ছিল। পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী বাহুবলে উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণে লঙ্কা হেলায় জয় করিয়াছিল এবং তাহার অর্ণবপোত ভারত সাগরময় ভ্রমণ করিয়া যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও সুমাত্রার উপকূল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জয়ঘোষণা করিত। সে দূরাতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে,—মুসলমান যুগেও প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, প্রভৃতি বীরগণ তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে যুগে বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্য অতীতকাহিনী মাত্র—সেই আধুনিক যুগে ইংরাজের আমলেও অবসর প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী তাহার বীরগৌরব দেখাইতে ত্রুটি করে নাই তাহারও একাধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গেল।

অধিক দিনের কথা নয়—কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে—ভীষণ সিপাহীবিপ্লবের সময়ে উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশ) দেওয়ানী আদালতে বাঙ্গালী

বিচারপতি প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বীরজনোচিত কৃতিত্ব দেখাইয়া রাজাপ্রজা উভয়ের নিকট হইতে যে উপযুক্ত সম্মানলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয় প্রমাণ করিবার লোক এখনও বোধহয় অনেকে বাঁচিয়া আছেন।*

আজ আমরা আর একজন বাঙ্গালীর বীরত্ব কাহিনী প্রকাশ করিতেছি যিনি এই ইংরাজ আমলেই—ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মান সম্ভ্রম ও প্রেস্‌টিজ রাখিবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অশেষ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানিত "জেনারেল" উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই বাঙ্গালী জেনারেলের নাম কালিচরণ ঘোষ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। পূর্ব্বে ইঁহার বাসস্থান হুগলী জেলার আক্‌না গ্রামে ছিল। পরে ইনি কলিকাতায় সুকীয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া বাস করেন। তখন দেশে স্কুল কলেজ ছিল না। ছেলেদের মোটামুটি শিক্ষার জন্য তখন পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা, মকতব ইত্যাদি ছিল। কালিচরণ কিছুদিন পাঠশালায় বাঙ্গলা ও মকতবে পারসী শিক্ষা করেন এবং পরে একজন সাহেবের নিকট একটু কাজ-চালান গোছের ইংরাজি শিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোনও সওদাগর আফিসে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্মবীর কালিচরণের সওদাগরী আফিসের সেই 'থোড়বড়িখাড়া—খাড়াবড়ি থোড়' গোছের একঘেয়ে চাকরী ভাল লাগিল না। তিনি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া সরকারী পল্টনের রসদ বিভাগে প্রবেশ করিলেন এবং কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমে রসদ বিভাগ হইতে পল্টনের খাস কেরাণীপদে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মাহরাট্টাপ্রধান হোলকারের সহিত এক যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ভারতেতিহাসে ইহাই 'দ্বিতীয় মাহরাট্টা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ভরতপুরের জাঠরাজ এই যুদ্ধে হোলকারের সহিত যোগদান করিয়া তাহার ব্যবহারের জন্য ডিগ্ নামক দুর্গ ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ইংরাজ জেনারেল লেক অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দুর্গ দখল করিয়া লয়েন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত ভরতপুর রাজের পূর্ব্বে কোন শত্রুতাই ছিল না কিন্তু তিনি হোলকারের পক্ষাবলম্বন করায় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট তাঁহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে এক বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিলেন। কালিচরণ এই সৈন্যদলের কেরাণী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকেও এই সঙ্গে যাইতে হইল। ইংরাজবাহিনী, ভীমপরাক্রমে বিপুল আয়োজনে ভরতপুর দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহার ধ্বংসসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু ভগবান এবার ইংরাজের বাদী, দুর্গ রক্ষাকারিগণের ভীষণ আক্রমণে ইংরাজ সৈন্যদল পদে পদে হটিয়া আসিতে লাগিল। একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, চারি চারিবার তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া আসিল। তাহাদের তিন সহস্র সৈন্য হত, বহুসংখ্যক আহত ও স্বয়ং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট রহিল কেবল দুইটি মাত্র

* প্যারিমোহনের বীরত্বকাহিনী আমাদের লিখিত, ঐ ১৩১৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্রে" প্রকাশিত 'সিপাহী বিদ্রোহে ভেতো বাঙ্গালী' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। লেখক

পল্টন। সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে এ পল্টনও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হতাবশিষ্ট পল্টনের সুবেদার, হাবিলদারগণও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালিচরণ এই পল্টনে ছিলেন। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কালিচরণ রণকৌশল অনেকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলেই ইনি হাবিলদার, সুবেদার হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ও কাপ্তেনবর্গকে সময় সময় যুদ্ধ কৌশল, সৈন্যপরিচালনা, কামানস্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি বা পরামর্শ দিতেন তাহাতে অনেক সেনানী অনেক সময় প্রকৃতই সুফল পাইতেন বলিয়া অনেকে ইঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সাধারণ সৈন্যদলের মধ্যেও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কথা—এই কৃতিত্বের বিষয় অপ্রকাশ ছিল না। সুতরাং এই বিষম বিপদের সময় হতাবশিষ্ট হাবিলদার, সুবেদার ও সাধারণ সৈন্যগণ মিলিত হইয়া কালিচরণকে ধরিয়া বসিলেন "কেরাণীবাবু! আর দেখিতেছেন কি, সব গেল—মান সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, ধনপ্রাণ সব গেল। কাপ্তেন লেপ্টেনাণ্ট, কর্ণেল কেহই বাঁচিয়া নাই—কে সৈন্য পরিচালনা করিবেন, কে যুদ্ধের হুকুম দিবেন? আপনি ভিন্ন গতি নাই। আপনি আজ জেনারেলের পোষাক পরিয়া জেনারেল হইয়া আমাদিগকে যুদ্ধ করিবার হুকুম দিন। মৃত্যু ত আজ অনিবার্য্য, তবুও আপনি আমাদিগকে লইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

সৈন্যসামন্তের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া কালিচরণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কি করা কর্ত্তব্য প্রথমে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ভাইগণ! যে গতিক দেখিতেছি তাহাতে আজ কেহ প্রাণে বাঁচিবে এরূপ আশা দুরাশা। কিন্তু যদি মরিতেই হয়, তবে কাপুরুষের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া মরিব কেন? এস, আজ সকলে জীবন পণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হই। আমরা ত মরিবই কিন্তু তবুও শত্রুরা জানুক—শত্রুরা বুঝুক আমরা ভীরু নই; আমরা কাপুরুষ নই—আমরা বীর।" এই বলিয়া কালিচরণ তাঁবুর ভিতর হইতে জেনারেলের পোষাক পরিধান করিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ভীম বেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষ পক্ষ বিষম বিপদ গণিল। তাহরা দেখিল যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ কাপ্তান, কর্ণেল, লেপ্টেনাণ্ট প্রভৃতি অগণন সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া যাহা করিতে পারেন নাই এমন একজন অপব্যবসায়ী দুর্ব্বল বাঙ্গালী প্রাণভয়ে ভীত মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তাহা করিয়া ফেলিলেন। তাহাদিগের পক্ষে দুর্গ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ভরতপুররাজ আর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না। তিনি যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ বিশ লক্ষ টাকা নগদ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজপক্ষ রাজার এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গাবরোধ উঠাইয়া লইলেন। ইংরাজ রাজাকে তাঁহার ডিগ্ দুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজাও হোলকারের পক্ষত্যাগ করিয়া গেলেন।

এখন বিচারের পালা—প্রথম বিচার হইল কালিচরণের অপরাধের। অপরাধ—তিনি সরকারের বিনানুমতিতে জেনারেলের পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং জেনারেল হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। কোর্ট মার্সালের বিচারে কালিচরণের অপরাধ প্রমাণিত হইয়া ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল। পুনরায় বিচার হইল—এবার বিচারে কালিচরণ তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কার পাইলেন। ইংরাজ এবার দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ বাঙ্গালীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অসীম সাহস তাঁহার অসামান্য বীরত্বের জন্য মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিয়া—বীর বলিয়া অভি-নন্দিত করিয়া ৩০০০০ হাজার টাকা উপহার সহ সম্মানিত 'জেনারেল' উপাধি প্রদান করিলেন।

এই জেনারেল শব্দ ইংরাজি অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে জাঁদরেল বলিয়া উচ্চারণ করিত বলিয়াই কালিচরণ সাধারণতঃ 'জাঁদরেল কালু' নামেই পরিচিত ছিলেন।

অর্থসম্পদ ও মানযশ লাভ করিয়া শেষ-জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিবার আশায় কার্য্যে ইস্তফা দিয়া কালিচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক অভিনব বিড়ম্বনায় পড়িলেন। তিনি ইংরাজ জেনারেলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া 'পিরালী' বলিয়া গণ্য হন। স্বজাতীয় লোক ইঁহার সহিত সামাজিক সংস্রব ত্যাগ করেন। এই আকস্মিক বিপদে কালিচরণ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই মুস্কিলের আসান জন্য অবশেষে তিনি গভর্ণ-মেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন, তাঁহাদের জন্যই কালিচরণের এই অন্যায় নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা কালিচরণের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের উপকারক বন্ধু শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণকে ধরিয়া বসিলেন। রাজকৃষ্ণ তখন কলিকাতা কায়স্থসমাজের গোষ্ঠিপতি ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কালিচরণকে সমাজে উঠাইবার জন্য কায়স্থ সমাজের এক 'একজায়ী' করিয়া কালীচরণকে তাহাতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণেই কালিচরণের অপবাদ দূর হইয়া গেল।

জাঁদরেল কালুর কোন বংশধর এদেশে নাই। শুনিয়াছি কাশীতে একজন ছিলেন—তিনিও বর্ত্তমানে জীবিত কি মৃত জানিতে পারি নাই।

বাঙ্গালী প্যারিমোহন, বাঙ্গালী কালিচরণ উভয়েই অন্য বিভাগের কর্ম্মচারী হইয়াও বিপদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যে নির্ভীকতা, যে তেজস্বিতা ও বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ প্রবীণ ও বিচক্ষণ ইংরাজ সেনানায়কগণের পক্ষেও তাহা অতীব প্রশংসার বিষয় হইত সন্দেহ নাই।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

প্রীতি।*

প্রীতি রচয়িত্রী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা। "প্রীতি"ই ইঁহার একমাত্র রচনা নহে, কণিকা এবং শোকগাথা নামে তৎপ্রণীত আর দুইখানি গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাঠ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার শোকগাথার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ত্রিপুরার রাজপরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা। সঙ্গীতে, চিত্রে, কাব্যে রাজপরিবারের সুখ্যাতি বঙ্গদেশব্যাপী। রাজপরিবারের মহিলাগণও যে, উহাতে অনুরাগিণী এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।"

রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা কৃত নিম্নলিখিত সমালোচনায় প্রীতি হইতে যে সকল কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠে পাঠক উপরি উক্ত কথার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন।

রাজকুমারীর সকল রচনাই যে উচ্চ কবিত্বপ্রতিভায় মণ্ডিত এমন কথা আমরা বলি না, একটি করুণ প্রীতিস্নিগ্ধ ভাবই তাঁহার রচনার প্রধান মাধুর্য্য। এই উদার সহৃদয়তার মধ্য দিয়া আমরা যে উচ্চহৃদয়া মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাঁহাকে আজি সাহিত্যের যোগ্যাসনে বসাইয়া ভগিনীরূপে বরণ করিয়া লইলাম। ভারতী সম্পাদিকা।

শ্রীহরির করুণা কোন্ সূত্রে, কি বিচিত্র মধুময়রূপে জীবের উপরে বর্ষিত হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। যিনি করুণা লাভ করিয়াছেন তিনিই সেই বিচিত্রতার মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ত্ব, আনন্দময়ের আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করেন—অন্যের তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য আদৌ থাকে না।

নিদারুণ শোকের মধ্য হইতে পূজনীয়া "প্রীতি" রচয়িত্রী "সুখের" আস্বাদ পাইয়াছেন! করুণাময় ভগবানের কৃপায় তিনি ধ্রুব সত্যে উপনীত হইয়েছেন। তিনি সুখের অমৃতে ও দুঃখের হলাহলে, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ও বিরহের যন্ত্রণায় আর অভিভূত নহেন! সুখ-দুঃখ ও মিলন বিরহ এক্ষণে তাঁহার নিকট এক হইয়া যাইতেছে! সচ্চিদানন্দ তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনা সাফল্য লাভ করিয়াছে। তিনি স্নিগ্ধ, শান্ত অথচ অবিচলিত স্বরে বলিতেছেন,—

চলে গেছে সুখ?—স্বার্থের বোধনে
ফিরাইতে তাই সাধিব না।
আসিয়াছে দুঃখ—ব্যর্থ এ রোদনে
বুকে টেনে তায় বাঁধিব না।

* * *

"বিরহ" এক্ষণে তাঁহার নিকট "ক্ষিপ্ত পিয়াস"রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে—তাহাতে রক্ত-মাংসের সংস্রব আছে!—

ক্ষিপ্ত পিয়াস যাহার জীবনে
বধে সে বিরহে আপনায়;
অধীর বিলাপ, বাসনা-দীপনে
জেগে উঠে ঘোর যাতনায়!

* * *

* রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী প্রণীত নূতন কাব্যগ্রন্থ।

দুই বৈপরীত্যের মধ্যে তিনি ঐক্য স্থাপন করিতে চাহেন। স্বপ্নের অলীকতা হইতে নিদ্বন্দ্বের প্রীতিসরসতা উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত ও আগ্রহান্বিত হইয়া আছে,—তিনি বলিতেছেন,

প্রীতি ও বিরহ করুক উজল
　　হৃদয়ে লগ্ন মলিনতা;
করুক জীবন সবল, সচল,
　　মুছিয়ে স্বপ্ন অলীকতা।

*　　*　　*

প্রীতি-রচয়িত্রী—রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী।

ভগবৎ চরণে প্রীতির জন্ত সম্মানীয়া কবির সনির্ব্বন্ধ সকরুণ প্রার্থনাটি বড়ই মনোরম ;

কি প্রীতি লভিতে আজি আমি
দাঁড়ায়েছি দুয়ারে তোমার,
তুমি জান, হে জগত-স্বামী,
নাহি যাচি তৃপ্তি বাসনার।
প্রীতি নহে সুপ-রস পান
আঁখি মুদে আলস্যেতে লুটে ;
প্রীতি-রসে তাজা মৃত প্রাণ,
প্রীতি-দীপ্ত-বিশ্ব চলে ছুটে।
যে প্রীতির-স্রোত নিরবধি
শুষ্ক চিত্ত রস সিক্ত করে,—
সেই প্রীতি অমরার নদী—
প্রবাহিত কর এ অন্তরে।

শ্রীহরি কবির এই আন্তরিক প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। করুণাময়ের কৃপায় তাঁহার হৃদয় স্বার্থ-দুষ্ট ক্ষুদ্র প্রীতিকে হারাইয়া, বৃহৎ প্রীতির জন্ত জাগরিত হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—

"নারীর ধর্ম্ম নহেক শুদ্ধ মর্ম্মবেদনে মরা ;
প্রীতির ধর্ম্ম নহেক ক্ষুদ্র কারাগারে পড়া ধরা।"
"নারীর ধর্ম্ম নহেত কেবল আপনা লইয়ে থাকা ;
এ নহে পুণ্য, প্রীতির ছলেতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ঢাকা।"
নারীর জীবন বিধাতার দান, তাঁহার আদেশ পালি ;
প্রীতির প্রসার অনন্ত অসীম, পর-তরে তাই ঢালি।"

কবির সত্য-উদ্ভাসিত হৃদয় সত্য প্রচারের জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমশ্রেণীর ক্ষুদ্ধ হৃদয়কে ত্যাগের কামনা, ও ধৈর্য্যের প্রশান্ত তৃপ্তির দ্বারা অভিষিক্ত করিতে চাহেন ;—

পুণ্যের নামে যেই অভাগিনী
পুষি দুখ, প্রাণে তার,
গৃহ-কোণে বসি কাঁদে অনাথিনী,
যাব আমি কাছে তার।
বুঝাব—প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা ;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা।

প্রীতির কবি ক্ষতির দ্বারা কিরূপ অক্ষয় লাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি না পাই দেখিতে নয়নে তোমায়,—
পাবনা দেখিতে কভুও ;
ওগো নয়ন দুটির কোণায় কোণায়—
ফুটিয়া উঠিছ তবুও।
একি ! স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে আসিয়া,
তোমারি পরশ লাগিছে ;
একি ! অরুণ কিরণ নয়নে ভাসিয়া—
তোমারি বরণ জাগিছে ?
কোন্ সুদূর হইতে শ্রবণ রসিয়া
আসে তব প্রেম গীতি গো।
মম হৃদয় ছাপিয়া উথলে অমিয়া,—
এই কি তরল প্রীতি গো ?
একি মিশ্রিত সুখ ? অমৃতে গরল ?
কাঁদি কেন সুখে মাতিয়া ?—
এযে দাহন করিয়া করিছে শীতল ;
করিছে মুক্ত বাঁধিয়া !

দুঃখ, দৈন্ত, যাতনার মধ্যে শান্তি আপনার সত্তাকে বৈপরীত্যে সুমহানরূপে প্রকটিত করিয়াছে। প্রীতির কবিতাগুলি তাই এত মনোহারী।

শ্রীনরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা।

প্রতিবাদ।

মাননীয়া ভারতীসম্পাদিকা মহাশয়া সমীপেষু।

শ্রাবণ মাসের ভারতীতে আমার লিখিত "উদীয়মান ও বিলীয়মান যুগ," শীর্ষক প্রবন্ধের যে সমালোচনা *প্রবাসীতে দেখিলাম, তাহাতে জাতি-ভেদের আমি সমর্থন করিয়াছি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ একটা বিষয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে আরেকটা বিষয় অবতারণা করিয়া ফেলে এবং তাহার চরম মীমাংসা না করিয়াই বিষয়ান্তরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে যে একটা ভুল করা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি সম্মুখে অগ্রসর হইবার সময় আমি যখন পিছনের পূর্ণচ্ছেদ দিয়া যাই নাই, তখন ত্রুটি আমারই। তাই স্পষ্ট করিয়া আজি বলিতেছি জাতিভেদ প্রথার স্বপক্ষীয় হেতু বর্ণনা সত্ত্বেও জাতিভেদপ্রথার সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যুগ অনুসারে শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত হয়, বিধি রচিত হয়, শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের সচেতনত্ব মানুষকে একটা স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অনুশাসনের ভিতর বদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না, বেষ্টনের ভিতর তাহা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, বন্ধনের ভিতর চঞ্চল করিয়া তোলে, চারিদিক দিয়া নিপুণভাবে তাহার সীমা রচনা করিয়া দিলেও তাহাকে সে লঙ্ঘন করিয়া চলে। নদী যেমন আপন প্রবাহবেগে তট সৃষ্টি করিয়া লয়, লোকসমাজ তেমনি উন্নতি ও আকাঙ্ক্ষার বেগে আপনার আভ্যন্তরীণ বিকাশের গতিপথ রচনা করিয়া চলে। জাতিভেদ প্রথা প্রাচীন ভারতের সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-রচনার সঙ্গে যে ভাবে খাপ খাইয়াছিল, আজি যদি সে সামঞ্জস্যের কোনো অভাব ঘটে, প্রাচীন ভারতের ঘরে বাহিরে, আচারে ব্যবহারে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে যদি সে স্রোত তাহার সমাজক্ষেত্রের এই উঁচু আলগুলির কাছে গিয়া পঁহুছায়, তবে তাহাকে রুদ্ধ করিবার কল্পনা কে করিতে পারে।

পরিবর্ত্তন বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গীভূত ধারা। ভাল হোক্ আর মন্দ হোক, সুফল হোক আর কুফল হোক, উন্নতি হোক্ আর অবনতি হোক,—একটা বিশেষ ধারা, বিশেষ পদ্ধতি আবহমান কাল স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। একটা চিরন্তন গতির তরঙ্গোচ্ছ্বাসের প্রবলতায় স্পন্দিত হইয়া বিশ্বজগত ঘূর্ণীতালে নাচিতেছে, সূর্য্য তাই মেঘে ঢাকিতেছে, লোকালয়ের উপর বন্যা বহিতেছে, জাতির আবির্ভাব ও বিলোপ হইতেছে, সমাজ উন্নত ও অবনত হইতেছে, জগতের বিরাট চক্রনেমির সঙ্গে চরাচর বদ্ধ হইয়া অরের মত ঘুরিতেছে; সুতরাং আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি বার্দ্ধক্যের অক্ষমতা বশতঃ তাহার রূপ দুর্ব্বল বাহুতে তাহার যৌবনের রচিত সমাজ-বন্ধনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া না রাখিতে পারে, জীর্ণতার অপরিহার্য্য শক্তিহীনতার বশে যদি আজ তাহা খসিয়া যায়—তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখিকা তাহার কাছে নতশির হইতে কুণ্ঠিত নহে। ইতি

বিনয়াবনতা শ্রীপ্রবোধিনী ঘোষ জায়া।

কুচবিহারের নবীন মহারাজার রাজ্যাভিষেক।

পুরাতন বৎসরের তিরোধান এবং নবীন বর্ষের আবির্ভাব আমাদের মনে একত্রে যে হর্ষবিষাদ, আশা ও আশ্বাসের সৃষ্টি করে, এক রাজার মৃত্যু অপরের রাজ্যাভিষেকে মনে সেই একই ভাবের উদয় হয়—যাহা যায় তাহা স্মৃতিতে মনোহর ছায়াময় অতীত কৃতকর্ম্মে পরিপূর্ণ, যাহা আসে তাহা আশার আলোকে উজ্জ্বল এবং নবীন উদ্যমের আয়োজনে

পরিশোভিত। অতীত আমাদিগের নিকট নবীন মহারাজার রাজ্যাভিষেক উৎসবদিনে ভবিষ্যতের সূচনা। আজ আমরা কুচবিহারের যিনি গিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আশ

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

করিতেছি যিনি রাজ্যাধিকার করিলেন তিনিও সৌজন্যে সকলের প্রিয় হইবেন এবং পিতার ন্যায় দয়াদাক্ষিণ্য, সৌষ্ঠব এবং প্রজারঞ্জন করিয়া মহারাজ নাম সার্থক

করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে নৃপতি কেবল মাত্র নরপতি নহেন তিনি সৃষ্টিরক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ বিষ্ণুর অংশ, অবতারস্বরূপ। প্রার্থনা করি নূতন কুচবিহারাধিরাজের শাসন এবং বিধান দেবতার অনুশাসনের ন্যায় ধর্ম্মানুমোদিত এবং মঙ্গলজনক হউক। নবীন মহারাজা দীর্ঘায়ু হইয়া শাস্ত্রসংযত জীবনে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দীন অনাথের দুঃখ মোচন করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আশ্রিত প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করুন এবং স্বনামধন্য নিত্য প্রশংসিত হইয়া বিদেশের সম্মানভাজন এবং স্বদেশের গৌরব রক্ষা করুন।

সমালোচনা।

প্রকৃতি-পরিচয়। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। ঢাকা, অতুল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। বঙ্গসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব আছে—দুই একখানি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞের চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইলেও জটিলতার ভারে সাধারণ পাঠকের চিত্তে কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের নব নব তত্ত্ব নিত্য প্রচারিত হইতেছে—এদেশবাসী সাধারণ পাঠক তাহার কয়টির পরিচয় পাইয়াছেন? বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের বহু তত্ত্বের সম্ভার লইয়া আসিয়াছেন। মাসিক সাহিত্যের পাঠকের নিকট গ্রন্থকার সুলেখক বলিয়া পরিচিত। জটিল ও দুরূহ বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের অপরিসীম। এই গ্রন্থে পাঠক তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। অবৈজ্ঞানিক ও অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের ভূমিকা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

পাট ও নালিতা। শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত, এম, এ, এ, আর, এ, সি প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। গ্রন্থকার শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি-অধ্যাপক ছিলেন—গ্রন্থখানি তাঁহার গবেষণা ও বহুদর্শিতার ফল। আজকাল পাটের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন। গ্রন্থখানিতে পাটের চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাটের মাটি, পাটের শত্রু, পাট কাটা ও পাট চেনা সম্বন্ধে সন্দর্ভগুলি যেমন উপযোগী তেমনই প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ পাঠে পাট সম্বন্ধে বেশ জ্ঞানলাভ করা যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ব্যবসায় সাহিত্য-বিভাগে বাঙ্গালা ভাষার একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছে।

হেমলতা। শ্রীমতী মনোরমা দেবী প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। হেমলতা একখানি উপন্যাস। লেখিকার ভাষা সরল, কোথাও অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই। উপাখ্যানটি সুন্দর, পড়িতে বেশ ভাল লাগে। তবে চরিত্রগুলি তেমন বিকশিত হইতে পারে নাই। আতিশয্যের ভারে বহু স্থলই প্রপীড়িত হইয়াছে। সুধার চরিত্রটি নিখুঁত হইয়াছে। বোধ হয় ইহাই লেখিকার প্রথম রচনা। চর্চ্চা রাখিলে ভবিষ্যতে লেখিকা উপন্যাস-রচনায় সফলতা লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

গ্রহের ফের। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনরেন্দ্র-মোহন চৌধুরী, ভবানীপুর। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। এখানি কৌতুক-নাট্য। সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বলবান্ জামাতা" শীর্ষক গল্প অবলম্বনে রচিত। প্রভাতকুমারের গল্পে কতকগুলি চরিত্রের নামোল্লেখ ছিল মাত্র—সৌরীন্দ্র-বাবু সেগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কুসুমবালা, নলিনীকান্তের স্ত্রী সরোজিনী প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে। সরোজিনী সরমসঙ্কুচিতা নবোঢ়া বাঙ্গালীর মেয়ে—সৌরীন্দ্রবাবুর চরিত্রাঙ্কণ নিখুঁত হইয়াছে। কুসুমবালার

রকতটুকু যেমন সরস তেমনই সুরুচিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নাটিকার চরিত্রচিত্রণে সৌরীন্দ্রবাবু নিপুণ নাট্যকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কৌতুক নাট্যখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভঃ করিয়াছি। হাসির গানটি সুন্দর হইয়াছে; ছাপা কাগজ ভাল।

চিত্র ব্যাখ্যা।

আলেকজাণ্ডারের জন্ম—হাকিম মহম্মদ খাঁ অঙ্কিত।

প্রবাদ যে ভুবনবিখ্যাত আলেকজাণ্ডারের জননী ওলিম্পিয়াস পেল্লা (pellah) নামক নগরের উপকণ্ঠস্থ বনে রাত্রিকালে হঠাৎ প্রসূতা হন। সদ্যঃ প্রসূত সন্তান আলেকজাণ্ডারকে বক্ষে ধারণ করিয়া ওলিম্পিয়াসের মৃত্যু হয়। বনের শৃগালগণ মাংস ভক্ষণের ইচ্ছায় একএকবার শবের সমীপস্থ হইতেছে কিন্তু মৃতমাতৃবক্ষশায়ী শিশুকে দেখিয়া আবার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতেছে।

এই প্রবাদ বাক্যের উপর উক্ত চিত্রকর ঐ চিত্রখানি আঁকিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পত্র।

অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণো।
নমস্কৃতীনামানন্দ্য সবিশেষনিবেদনং ॥ ১ ॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ স্ফুরদ্বীর্য্য সূর্য্যোল্লসৎ
কীর্ত্তিপদ্মে। স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা
যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তঃ পুরস্তাৎ ॥ ২ ॥
যদবধি তব মুখচন্দ্র-বিলোকন-বিরহিত নয়ন-চকোরৌ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশনপ্রাশন বাসব ঘোরৌ।
আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ চূতদ্রুমা কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে ॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিস্ফল্গুরাঃ ফাল্গুনে ॥
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভক্তোঽপি তণ্ডায়তে ॥

নিবেদনমিতি ১০ ফাল্গুনস্য

ইহার উপরে মোটা অক্ষরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র লিখিত প্রত্যুত্তর। অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় অক্ষরগুলি পড়া যায় না।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শিকারী

(হাকিম মহম্মদ খাঁ অঙ্কিত চিত্র হইতে)

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] পৌষ, ১৩১৮ [৯ম সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বস্বান্তের পর যেমন একটা তীব্র নিশ্চিন্ত ভাব আসে, মৃত্যুর পর যেমন যন্ত্রণা-কাতর মুখে শান্তির পাণ্ডুবর্ণ জাগিয়া উঠে সতীর বিবাহ দিয়া রামশঙ্কর সেইরূপ একটা তীব্র মুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। নবগ্রাম-বাসী স্বনামখ্যাত তিনকড়ি লাহিড়ী নগদ ত্রিংশত টাকা পণ লইয়া তিলকাঞ্চনে শুদ্ধ করিয়া সতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিলেন বলা ঠিক হয়না—পত্নীরূপে আখ্যা দিলেন। কেননা বিবাহের পরে সতীর স্বামীর গৃহে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। ব্রাহ্মণ কেবল নিঃস্বার্থ পরোপকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের জাতিকুল রক্ষার্থ এবম্বিধ কার্য্য করিয়াছেন। যখনই তাঁহার সংসারে অভাবের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে তখন কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিয়া নিজের অভাব নাশ করেন। সম্প্রতি তাঁহার আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে এভাবে বেশীদিন বোধহয় আর তাঁহার ব্যবসা কার্য্য চলিবেনা, সম্প্রতি চিত্রগুপ্ত তাঁহার হিসাব নিকাশ হস্তে বসিয়া ভুলিতেছে, এই কয়টা দিনের মধ্য তিনি যতদূর পরোপকার করিয়া লইতে পারেন।

তাঁহার কথা থাকুক; রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এখন নিশ্চিন্ত। কন্যাদায়ে জাতিনাশের ভয়েও নিশ্চিন্ত, এবং সংসারের মধ্যে বাটী খানিও কুঠিয়ালদিগের নিকট সাড়ে তিনশত টাকায় বন্ধক দিয়া নিশ্চিন্ত, কেননা জানেন যে এজন্মে তাঁহার আর সে বাটী উদ্ধার করিবার সাধ্য নাই। অবশিষ্ট কেবল দশটি টাকা, এবং তাঁহার অকালবৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্নশরীর। সে দিকেও তিনি পাড়ি জমাইয়া আনিয়াছেন বুঝিতেছিলেন। যে কয়টা দিন থাকিতে হইতেছে সেই কয়টা দিনও যেন অসহ্য হইয়াছে, সতী সম্মুখে আসিলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেন। কচিৎ কোনও দিন পুত্র বাটী আসিলে গালি দিয়া, অভিসম্পাত দিয়া তাহাকেও বাটী হইতে চলিয়া যাইতে বলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করেন, সাবিত্রীকে দেখিলে মুখ ঢাকেন; জাহ্নবী ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত বাক্যালাপও করেন না। পুত্রকন্যারা কখনও কাঁদে কখনও রাগ করে, জেঠাইমা চীৎকারে বাড়ী মাথায় করেন, জাহ্নবী কেবল নির্ব্বাকভাবে গোপনে অশ্রু মুছেন। এক এক দিন তাঁহার বুকের বেদনা হাঁপানি এমন বাড়িয়া উঠে যে সমস্ত দিনরাত্রি সশঙ্কিতে কাটিয়া যায়। সে সময়ে যাহারা শুশ্রূষা করে রামশঙ্কর তাহাদের কটূক্তি করেন। নীরবে সে সব তাহারা

সহ্য করে। এইরূপে সতীর বিবাহের পরে ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ তিনি নির্জীব হইয়া পড়িতেছিলেন তথাপি কুঠীর কার্য্যে কামাই করিতেন না।

সেদিন বৈকাল হইতে ঘনঘটা করিয়া মেঘ লাগিয়াছিল। সতী ও সাবিত্রী ত্বরান্বিত হইয়া সংসারের কার্য্য সারিয়া লইতেছিল, জাহ্নবী হস্তের কার্য্য স্থগিদ রাখিয়া পুনঃ পুনঃ উন্মনা ভাবে দ্বারের প্রতি চাহিতে ছিলেন এই দুর্য্যোগ উপস্থিত হইতেছে, স্বামী অন্ত বাটী আসিবেন। জ্যেঠাইমা হরিনামের মালা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি একবার পাড়াটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন, কেননা যেরূপ মেঘ লাগিতেছে তাহাতে কন্যাদের নিন্দার সমালোচনা করিতে হয়ত তাঁহাকে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

হু হু শব্দে ঝড় আসিল। চালের খড় উড়িয়া দিকদিগন্তরে ধাবিত হইতে লাগিল, জীর্ণ গৃহ যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রাঙ্গণ ঘনকজ্জল মেঘছায়ায় অন্ধকার। কলাগাছগুলা মাটিতে শুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। উঠানের গাছ হইতে দুম দাম করিয়া আম পড়িতেছে দেখিয়া জ্যেঠাইমা ধামা মাথায় দিয়া আম কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন ও পবনকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিলেন। কালীপদ আম কুড়াইবার জন্য মহা ধুম ধরায় সতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের মধ্যে গিয়া ভুলাইতে লাগিল, তাহাতেও জ্যেঠাইমা শ্লেষ দিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার তীব্রস্বরও বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল।

দুয়ারে হেলান দিয়া জাহ্নবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি মেঘান্ধকার ভেদ করিয়া বহুদূরে ধাবিত হইয়াছে, সাবিত্রীর ভীতব্যাকুল নেত্র মাতার মুখের দিকে স্থাপিত; তাহার রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, শীর্ণ শুভ্র মুখে বিপন্নের ভয়ার্ত্তভাব। একবার অস্ফুট স্বরে সে কেবল বলিল, 'মা'? মা উত্তর দিলেন না। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। দৌড়িয়া আসিতে জ্যেঠাইমা আবার ধামা লইয়া এক আছাড় খাইলেন। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল, জ্যেঠাইমা শোকে দুঃখে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। জাহ্নবী অচল প্রতিমার মত দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঘরে আলো জ্বালিয়া সতী আসিয়া মাঝে একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল "মা ভিজে কি করবে ঘরে চল বড় ঝাপ্টা আস্‌ছে"। জাহ্নবী নড়িলেন না, তিনজনেই তখন স্তম্ভিত স্তিমিত নেত্রে দ্বারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রকৃতির তুমুল আন্দোলন। নীচের দ্রব্য উপরে তুলিয়া উপরের বস্তু নীচে ফেলিয়া দুর্দ্দান্ত বালকের মহোল্লাস। সেই শব্দের মধ্যেও জাহ্নবী যেন বহির্দ্বারে কিসের একটা পতন শব্দ ও অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলেন। জাহ্নবী তৎক্ষণাৎ রোয়াক হইতে নামিয়া দৌড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সতী ও সাবিত্রী। মুহুর্মুহুঃ তাহাদের পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা প্রাণপণে বাহির্দ্বারাভিমুখে ছুটিল।

বহির্দ্বারের বাহিরে রামশঙ্কর উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। জাহ্নবী গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। সতী ও সাবিত্রী আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"বাবা বাবা"!

"চুপ কর—চুপ্ কর্—ধর্ ধর্ আমি সাম্‌লাতে পাচ্চিনা।" জাহ্নবী তখন বেতস্ পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিলেন, প্রকৃতির ন্যায় তাঁহারও চোখের সম্মুখে যেন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল; সামলাইয়া অতি কষ্টে তিন জনে সংজ্ঞাশূন্য দেহ লইয়া গৃহে তুলিলেন। জ্যেঠাইমা তাঁহার বেদনাপ্রাপ্ত পা লইয়া তখন বিকট গর্জ্জন করিতেছিলেন, এইবারে থামিয়া গেলেন। সতী ডাকিয়া বলিল "জ্যেঠাইমা একটু আগুন কর—শীগগির।" খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া জ্যেঠাইমা ঘুঁটে জ্বালিয়া কড়ায় আগুন করিতে লাগিলেন।

সিক্ত বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মুছাইয়া রামশঙ্করকে শয্যায় শোয়ান হইল। তখনও তিনি হতজ্ঞান। সতী একটা ভাঙা সিন্দুক হইতে একটা ছেঁড়া ফ্লানেলের জামা বাহির করিয়া পিতার হস্তপদ তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিতে লাগিল! এদিকে অগ্নিও প্রস্তুত হইল, হস্ত ও বস্ত্রের পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক দেওয়া হইতে লাগিল। জাহ্নবী ও সতী নীরব নিৰ্ব্বাক, সাবিত্রী একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল 'বাবা, বাবা।" কালীপদ স্তম্ভিতভাবে একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সাবিত্রীর স্বরে সাহস পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সতী বলিল "কালী, চুপ্ কর কাঁদিস্‌নে ভয়কি, বাবা ভাল আছে।" মাতাকে বলিল "মা একটু দুধ গরম করে দাও।" জাহ্নবী ক্ষীণস্বরে বলিলেন" তুই আন্ আমি উঠ্‌তে পাচ্চিনা।" সতী দুধ গরম করিল, ঝিনুকে করিয়া পিতার মুখে অল্প অল্প দিতে লাগিল, ক্রমে তিনি একটু নড়িলেন, দুধ খাইলেন, জোরে কয়েকটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সকলে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, এতক্ষণ যেন অঙ্গ সঞ্চালনেও কাহারো সাহস হইতেছিলনা। ক্রমে রামশঙ্কর চক্ষু মেলিলেন, একটু যেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন। সতী ডাকিল "বাবা!"

রামশঙ্কর কন্যার দিকে চাহিলেন, ক্ষীণস্বরে বলিলেন "কে?" বাবা "আমি সতী।" মুমূর্ষু রামশঙ্কর সহসা যেন কি এক শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সবলে কন্যাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "সরে যা, দূর হয়ে যা সর্ব্বনাশি, আমার আর কি করবি! খাবি? দূর হ!" সতী সরিয়া বসিল। জাহ্নবী মুখ নত করিয়া নীরবে স্বামীর অঙ্গে উত্তাপ দিতে লাগিলেন, সাবিত্রী চোখ নীচু করিল। জ্যেঠাইমা অস্ফুট গুঞ্জনে বলিলেন "মর্ মিন্‌সে—স্বভাব যায়না মলে।"

জাহ্নবী বলিলেন "এখন একটু ভাল বোধ হচ্চে কি! কেমন?"

"আর কেমন আছি, থাকাথাকির আজ শেষ। আর দেখ্‌ছ কি জাহ্নবি, আর পার্‌ছি না।" জাহ্নবী নীরবে রহিলেন। সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল "অমন কথা বল'না বাবা।"

রামশঙ্কর তীব্রদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন "কেন? কিসের কষ্ট? আমি তোমাদের কখনও বাপের উপযুক্ত কাজ করেছি যে তাই তোমাদের কষ্ট হবে? চিরদিন আধপেটা খেয়ে, খেটে, বকুনি খেয়ে মানুষ হচ্চ, আমি অবর্ত্তমানেও তাই হবে, কিসের কষ্ট? আমি থাক্‌লে তোমাকেও হয়ত একটা গঙ্গাযাত্রী ধরে বিয়ে দেব! আমি তোমাদের বাপ? না?" উত্তেজনার

আধিক্যে রামশঙ্কর আবার প্রায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণপরে একটু প্রকৃতস্থ হইয়া সহসা বলিলেন "হরে এসেছে বুঝি? দূর ক'রে দাও—ওটাকে দূর ক'রে দাও।" সাবিত্রী বলিল "কই দাদা ত' আসেনি।"

"আসেনি? যাক্ ওটার হাতে আমি জলপিণ্ডও নেব না—কালী দেবে—ওটা অধঃপাতে যাক্।" জাহ্নবী স্বামীর মুখে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন "একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর দেখি, কষ্ট কম্‌বে, ঘুমাও।"

"কষ্ট আর কমেছে—একেবারে কম্‌বে!"

সতী দ্বারের নিকটে সরিয়া বসিয়াছিল। দ্বার ঈষৎ খোলা ছিল, তখনো অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, অবিশ্রান্ত ভেকের কলরব, আর সূচিভেদ্য অন্ধকার। আর্দ্র বায়ু এক একবার দ্বারের নিকটে আসিয়া হু হু করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে। সতী একদৃষ্টে সেই অন্ধকার দেখিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল "এই অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিলে কি কখনো ঊষার আলোক চোখে পড়ে না?"

রামশঙ্কর একবার একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন, আবার তখনি জাগিয়া বলিলেন "জাহ্নবি।" জাহ্নবী উত্তর দিলেন। "কালী কই?"

"ওই যে তোমার পাশে শুয়ে ঘুমুচ্চে।"

অতি কষ্টে রামশঙ্কর তাহার মস্তকে হস্ত রাখিলেন। জাহ্নবী বলিলেন "ও কি ক'চ্চ?"

"আশীর্ব্বাদ কচ্চি। সাবিত্রী ঘুমুচ্চে?'

'বাবা' বলিয়া সাবিত্রী পিতার মুখের নিকটে আসিল। পিতা বলিলেন "এস, আশীর্ব্বাদ করি।" "বাবা, বাবা অমন কথা বলোনা, বড় কষ্ট হয়।" বলিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল। জাহ্নবী বলিলেন "সাবিত্রী চুপ্ কর কাঁদিস্‌নে ওঁতে আরও কষ্ট পাবেন।" "না না কষ্ট কিসের—কষ্ট কিসের মা, আশীর্ব্বাদ কচ্চি,—হরে—হরেটা নেই, না? তা তাকেও আশীর্ব্বাদ কচ্চি—হাজার হ'লেও ছেলে ত।"

"বাবা তবে দিদিকে আশীর্ব্বাদ কচ্চেন না কেন? দিদিকে করুন।"

একটু একটু করিয়া থামিয়া থামিয়া রামশঙ্কর বলিলেন "তোমার দিদিকে? সতীকে? আশীর্ব্বাদ? না উপহাস? বাপ,—বাপ হয়ে মেয়েকে কি মর্‌বার সময় উপহাস করে যাব?"

জাহ্নবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "তুমি বকেছ দেখো তোমার সতী দোরের কাছে বসে আছে—একবার ডাক।"

রামশঙ্কর সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"সতী মা এস।"—

সতী যথাসম্ভব মুখ নীচু করিয়া বামহস্তে চক্ষু ঢাকিয়া পিতার পদতলে আসিয়া বসিল। পিতা বলিলেন "ওখানে না, কাছে এস—তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। অনেক বকেছি।" সতী মুখ ফিরাইয়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।' রামশঙ্কর তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন "তোমাকে আশীর্ব্বাদ? আশীর্ব্বাদের ত' কোন দরকার নেই! থাক্,—যদি—যদি তোমার বিশ্বেশ্বর—নাঃ সে কথায়—সে কথায় কাজ নেই। কি কর্‌ব? আশীর্ব্বাদ? শোন মা, বাপের পাপেও ছেলেমেয়ে কষ্ট পায়; তাই তোমরা কষ্ট পাচ্চ—পাবে। কি কর্‌ব

ব ? হাত নেই। জানত ত' এমন পাপ কিছু করিনি—তবে—তবে পূর্ব্ব জন্মের ফল। তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার মূলোচ্ছেদ ত' আমি করে দিয়েছি,—আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করব মা? তবে—তবে জেন'—অনেক কষ্ট! নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমি তোমাকে, সন্তানকে হত্যা করেছি,—আমার হাত নেই।"

সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল। জাহ্নবী বলিলেন "এখন ওসব কথা থাক্ একটু ঘুমাও।"

"ঘুম? আর একটু পরেই বেশ ঘুমাবো, গভীর নিদ্রা, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, আঃ সে কি তৃপ্তি! তার আগে দুট' কথা কই। সতী কই মা? উঠে গেলে? নাঃ এই যে, শোন। কি বলব? মনে আসছে না। হাঁ—তোমার আশীর্ব্বাদ? কি বলে আশীর্ব্বাদ করি বল দেখি মা? আমিত' যাচ্ছি; তোমার"—স্থির অবিকৃত কণ্ঠে সতী বলিল "আপনি যাচ্চেন? আপনার ভাল ক'রে সেবা করা আমার ঘটে উঠল না, আশীর্ব্বাদ করুন আপনার কাছে গিয়ে আপনার সেবা করি।"

"আমার কাছে গিয়ে? হাঁ! তৃপ্তিকর স্থান বটে। বিশ্রাম! বিশ্রাম! যাবে সতি? বড় ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েছ মা! এই অল্প বয়সে এই নতুন জীবনে এত শ্রান্ত হয়েছ? তবে এস, তবে এস! আমার কোলে এস—এস মা তোমায় কোলে নিয়ে, সেই ছোটটির মত, এস মা আমরা যাই।"

জাহ্নবী স্বামীকে শান্ত করিবার জন্য মৃদু মুখে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। রামশঙ্কর বলিলেন—"দোষী? হাঁ! আমি দোষী বই কি! কি দোষ জান মা? অশক্ত হয়েও কেন আমি সংসার করেছি, বিয়ে করেছি, সন্তানসন্ততি হয়েছে—দোষী বই কি! বিয়ে? আমি করেছি বটে কিন্তু সে দোষে দোষী আমার বাপ মা। তাঁদের পাপে আমি কষ্ট পেলাম, আমার পাপে তোমরা কষ্ট পেলে—দোষী বই কি মা—তবে হাঁ আশীর্ব্বাদ? কর্—আর একটু পরে একটু পরে—ভেবে দেখি—তার পরে।" শ্রান্ত রোগী ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সাবিত্রী মাতার পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সতীর মধ্যে মধ্যে ঢুল আসিতেছিল, তথাপি সে দেওয়ালের গাত্রে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। জাহ্নবী কেবল অপলক নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সহসা সতীর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলেন, সতী চক্ষু মেলিল, বলিল "কি মা?"

"ভাখ, গলায় কি একটা শব্দ হচ্চে, মুখটা এক একবার যেন কি রকম কচ্চেন—কি করব সতি?"

সতী কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল "মা ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"এখন রাত রয়েছে—কে যাবে?"

সাবিত্রী মাতা ও ভগ্নীর সাবধানতাসূচক কথাতেও জাগিয়া উঠিয়াছিল—দাঁড়াইয়া বলিল "আমি যাই।"

তুই ছেলেমানুষ একলা কি করে যাবি? আমি চল্লেম—মা তুমি একটু আগুন কর। আমি এখনি আসব—হারাণ ডাক্তারের বাড়ী

বেশী দূরও ত' নয়।" সতী চলিয়া গেল।

জাহ্নবী আগুন করিয়া স্বামীর হাত পা সেঁকিতে লাগিলেন আর দ্বারপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার ও সতী আসিল, তখন সকলে জাগিয়া উঠিল। ডাক্তার অবস্থা দেখিয়া কিছু বলিল না, ভিজিটও লইল না, দুই পুরিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া গেল।

রামশঙ্করের প্রণষ্ট জ্ঞান আর ফিরিল না। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। তখন জ্যেঠাইমা উচ্চ রোদনে পাড়ার দু চার জন লোক জুটাইয়া মুমূর্ষকে তুলসীতলায় আনিলেন। জাহ্নবী দুইহস্তে স্বামীর পদ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরবে পড়িয়া রহিলেন, লজ্জাবতী তখন উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে পারিলেন না। সাবিত্রী 'বাবা বাবা' করিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলিল, কালীও তদ্রূপ। সতী নীরবে অশ্রুধারার সহিত গঙ্গাজল লইয়া পিতার মুখে দিতে লাগিল। জ্যোঠাইমা "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন অন্য দিনের মতই চারিদিকে উষার জ্যোতি বিকিরণ হইতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যেমন সর্ব্বস্থানে হইতেছে, সংসারের যাহা নিত্যকার—নিত্যকার কেন প্রত্যেক নিমেষের ঘটনা ভট্টাচার্য্য পরিবারের হাহাকার আর্ত্ত রোদনের মধ্যেও সেই সকল ঘটনা লইয়া দিন কাটিয়া গেল। পাড়ার পরোপকারী যুবাবৃন্দ রামশঙ্করের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার সাহায্য করিল। জাহ্নবীর দ্বারাই মুখাগ্নি করান হইল, কেননা সুপুত্র হরি তখন চাঁদপুরের বাবুদের সঙ্গে কলিকাতায়। অগ্নিক্রিয়ার সময় সহসা জাহ্নবী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেজন্য সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া যথোচিত বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া বাটীতে কন্যাদের নিকটে রাখিয়া গিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিল।

শোকাচ্ছন্ন দীর্ঘ দিনগুলা কাটিতে চলিল, তাহারা ত কাহারও মুখাপেক্ষী নয়; মানুষ কেবল জোর করিয়া তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লয় মাত্র। নির্ব্বাক নিস্পন্দা মাতার পানে চাহিয়া চাহিয়াই সতী ও সাবিত্রীর দিন কাটিয়া যায়, কালীপদ মধ্যে মধ্যে কাঁদে তাহারা সান্ত্বনা করে। শ্রাদ্ধের আর দুই দিন মাত্র দেরী। কুঠিয়ালরা ধর্ম্মজ্ঞানে রামশঙ্করের প্রাপ্য মাহিনার দশটি টাকার মধ্যে দিন হিসাবে পাঁচ আনা এক পয়সা দেড় কড়া এক ক্রান্তি কাটিয়া লইয়া বাকী ৯ টাকা পৌনে এগার আনা তিন কড়া দুই ক্রান্তি পাঠাইয়া দিয়াছে। সতী তাহা রাখিয়া দিয়াছে, কেননা শ্রাদ্ধে ইহার প্রয়োজন। খাইতে না পাইলেও পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করা চাই। প্রত্যহ আশার পথ পানে চাহে, বুঝি ভ্রাতা আসিতেছে, ভ্রাতা আসিল না। চাঁদপুরে একজন লোকও পাঠান হইয়াছিল, বাবুরা বলিলেন "হরি এখানে নাই সে কলিকাতায়।" লোকটি সতীর কথিত মত তাহাকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিয়া আসে। কিন্তু সতী বুঝিল ভ্রাতা সংবাদ পায় নাই। ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন সমাগত হইল। সকলে জাহ্নবীকে লইয়া

কাপস্থানে বসাইতে গেলে তখন জাহ্নবী একটু যেন সচেতন হইলেন ; এ কয়দিন যেন তিনি জড়ের ন্যায় ছিলেন, কন্যারা যাহা বলিয়াছে করিয়া গিয়াছেন, এই মাত্র। অস্ত বলিলেন "আমি কেন একাজ করব সতি ? আমার হরি ?" সতী মুখ নামাইয়া বলিল "দাদা ত' বাড়ী নেই মা।" "বাড়ী নেই! খবর পাঠাসনি ?"

"পাঠিয়েছি। দাদা তা বোধ হচ্চে পায়নি। দাদা কল্‌কাতায়।"

জাহ্নবী চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে কালাকে দিয়ে করাও, সে যা পার্‌বে তাতেই তাঁর তৃপ্তি হবে।" ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক সমস্ত দিন উপবাসান্তে পিতৃকৃত্য সমাপন করিল। প্রায় নির্জীব বালককে মাতার ক্রোড়ে দিয়া সতী বলিল" মা এখন এর পানে একটু চাও নইলে আর বাঁচাতে পার্‌বনা ; একটু সুস্থ হও মা নইলে আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াব ?" জাহ্নবী তখন উঠিয়া বসিলেন। স্বহস্তে বালককে হবিষ্যান্ন আহার করাইয়া ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। গ্রামের কয়েকটি ধনীলোক স্বতঃ উপযাচক হইয়া কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কয়েকটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রামশঙ্করের দারিদ্র্যজীর্ণ আত্মার বুভুক্ষার কথঞ্চিৎ শমতা করিয়া দিলেন বোধ হয়।

হরিশঙ্করকে লইয়া বাবুরা কলিকাতায় "দুর্গেশনন্দিনী" দেখতে গিয়াছিলেন কেননা তাঁহাদের ক্লাবে সম্প্রতি এই নাটকখানির অভিনয় হইবে। আয়েষার অভিনয় উপস্থ করিয়া লইবার জন্ত হরিকে লইয়া যাওয়া। ফিরিয়া আসিয়া যে দিন তাঁহাদের অভিনয়, সেই দিন হরির বাপের শ্রাদ্ধ, পাছে অভিনয় পণ্ড হয় বলিয়া হরিকে তাঁহারা কোন কথা জানান নাই। চাঁদপুর মজুতপুর হইতে ক্রোশ তিনেক ব্যবধান। এ নগণ্য মৃত্যু সেখানে তেমন প্রচারিতও হয় নাই। যাহা হউক অভিনয় হইয়া গেল, আয়েষার খ্যাতিতে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। অত্যন্ত সুখী হইয়া কি জানি কেন সহসা হরি ভাবিলেন একবার বাটী যাওয়া যাউক। বাবুরা কিছু বলিলনা, হরি মহৎপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তখন পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য পরিবারের এই কয় দিনের মধ্যেই শোকোচ্ছ্বাসকে কমাইয়া আনিতে হইয়াছে। তাহাদের শোক করিবার অবসর কোথা। শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাতে এ কয়দিন সংসার এক রকমে চলিতেছে কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যতের করাল ছায়া সতী সাবিত্রীর আননে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা ধীরে ধীরে মাতার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া বাঁশের 'সাঙা' হইতে পাট টানিয়া লইয়া জলে ভিজাইবার উদ্যোগ করিতেছে। কার্পাস হইতে সূতা তুলিবার জন্য চরকা প্রভৃতি চৌকার নিম্ন হইতে বাহির করিয়াছে। সকলে আহারান্তে জাহ্নবীকে দাওয়ায় একখানা মাদুরের উপরে শোয়াইয়া দিয়া নিদ্রিত কালাকে নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। জাহ্নবী পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া শূন্য নয়নে কড়ির পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বহু দিনের গ্রথিত জীবন আজ গ্রন্থিহীন, সঙ্গীহান, বিপর্য্যস্ত। পৃথিবী তেমনি হাসিতেছে, দিন তেমনি গত হইতেছে,

সূর্য্য তেমনি উজ্জ্বল, চন্দ্র তেমনি অংশুমালী, রজনী তেমনি তারায় ভরা,চারিদিকেই নির্দ্দয়তা! ইহারা একদিনও কাহারো জন্য শোক করে না! কিন্তু তাঁহার চিত্ত কি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নয়?

হরি সহসা বাড়ী ঢুকিতে পারিল না। মনে হইল কি যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। বাড়ী যেন শ্রীহীন, বিষাদমলিন, তমসাচ্ছন্ন। মনে হইল হয়ত পিতার ব্যারাম বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। ত্রস্তপদে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল 'বাবা!' সতী ও সাবিত্রীর হস্ত হইতে অর্দ্ধ কর্ম্ম পড়িয়া গেল, জাহ্নবী শিহরিয়া প্রাঙ্গণের প্রতি চাহিলেন, মনে হইল,—তিনি কি ফিরিয়া হরির সঙ্গে আসিয়াছেন! দেখিলেন একা হরি। জাহ্নবী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

হরি আবার ডাকিল "বাবা। নিদ্রা ভাঙ্গা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া জ্যেঠাইমা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন,"ওরে হরিরে বাবা! তোর বাবা আর নেই রে বাবা! আজ ১৬ দিন সে চলে গিয়েছেরে বাবা! এসে আগুন পিণ্ডটাও দিলিনে রে বাবা—এমন কুপুত্তুরও তুই হয়েছিলি রে বাবা—"ইত্যাদি।

হরি সহসা বসিয়া পড়িল। এও কি সম্ভব? সম্মুখে সাবিত্রীকে দেখিয়া বিকলকণ্ঠে বলিল, "সাবি কি হয়েছে বল? বাবা নেই? একি সত্যি সাবি? নানা তাও কি হয়।"

সাবিত্রী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দাওয়ার অভ্যন্তরস্থ মাতার পানে হরির দৃষ্টি প'ড়ল, শ্বেত বস্ত্র! রুক্ষকেশ, শীর্ণ পাণ্ডুর দীন দুঃখী এই কি তাহার লক্ষ্মীস্বরূপা হাস্যময়ী মা। হরির পাষাণ চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। দুই হাতে মুখ লুকাইয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সাবিত্রী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "একবার মার কাছে চল দাদা।" "মার কাছে—না না এখন যেতে পারবনা এখন আমি যাই।"

সতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কঠিন মুখে বলিল "যা করেছ তার ত প্রায়শ্চিত্ত নেই, এখন মাকে একটু ভাল করতে চেষ্টা কর, ছোট ভাইটেকে বাঁচাও। পালিয়ে আর কি করবে, যাও মার কাছে গিয়ে বসো গে।" হরির সে কথা লঙ্ঘন করিতে আর সাহস হইল না, উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র জ্যেঠাই মা চীৎকার করিয়া বলিলেন "ছুঁসনে কারুকে ছুঁসনে, আগে স্নান কর।"

সতী ভাবিয়া বলিল "তবে খিড়কীর পুকুরে চল, ঘাটে এখন আর যেতে হবেনা।" বাটী হইতে বাহির হইলে হয়ত ভ্রাতা পলাইবে ভাবিয়া নিজে সঙ্গে লিয়া খিড়াকর নিকটস্থ পুকুর হইতে স্নান করাইয়া আনিল। তখন হরি গিয়া মাতার নিকটে বসিয়া নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল।

জাহ্নবী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "কেঁদে আর কি করবে, তিনি তোমার ওপর রাগ ত্যাগ ক'রে গেছেন, তোমায় আশীর্ব্বাদ করেই গেছেন, ভাল হও, সুখী হবে।"

হরি বাবুদের উদ্দেশে অনেক গালি দিল। শপথ করিল আর তাঁহাদের সংসর্গে যাইবেনা কয়েক দিন বাটিতেও রহিল, সতী ভাবিল সত্যই বুঝি দুঃখে পড়িয়া সে সুধরাইল। কিন্তু দুই দিনেই বুঝিল যে সে [illegible]

হরি দুই একদিন ইতস্তত করিয়া সতীকে বলিল, "দেখ সতি, বসে থাক্‌লে ত' চলবে না—একটু কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বেরুই। মধ্যে মধ্যে আস্‌ব এই দশটা টাকা আমার কাছে আছে, এই ক'টা নিয়ে আর যে রকম করে চালাচ্চ সেই রকমে সংসার চালাও, আমি শীগ্‌গিরই সব ভার নেব—তোমার কোন ভয় নেই। যদি এর মধ্যে বিশেষ দরকার পড়ে ত চাঁদপুরের বাবুদের বাড়ীর ঠিকানায় আমায় পত্র বা লোক পাঠিও, আমি আসব, বুঝেছ? এখন চল্‌লাম—বসে থাকলে ত চলবে না।"

সতী বুঝিয়া নীরবে কেবল টাকা কয়টি লইল। সাবিত্রী করুণস্বরে বলিল" আর দুদিন থাকনা দাদা, মা তোমায় দেখে একটু ভাল আছেন, এর পরে যেও।"

"পাগল আর কি! বসে থাকলে কি চলে। দাখ্‌ এখন মাকে বলিসনে, কি জানি কাঁদেন কাটেন, আমি যাই তার পরে বলিস।"

সন্ধ্যার পরে জাহ্নবী সাবিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার অদ্ধ জটাযুক্ত রুক্ষ ধূলিময় কেশরাশি লইয়া একটু পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; সাবিত্রীর চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল, মার অজ্ঞাতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "আজ থাক মা, এর পরে একদিন দিও।" জাহ্নবীর শীর্ণ হস্ত দুটীও যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, তথাপি বলিলেন "বড় জটা পড়েচে, এর পরে আর ছাড়ান যাবে না।"

রাত্রের কার্য্য সমাপনান্তে রান্নাঘরে তালা দিয়া গালীর দুধের বাটী হস্তে সতী কক্ষে প্রবেশ করিল। দুগ্ধ টুকু শিকায় রাখিয়া দাঁড়াইতেই মাতা বলিলেন "রান্না ঘরে তালা দিয়ে এলি? হরি খাবে না? তোরা খাবি না?"

"হরি খেয়েছে—রান্না ঘরের আর কাজ নেই।"

"তুই খাবি না? হরি—হরি কোথায়?"

সতী নতমুখে বলিল "চাকরীর চেষ্টায় চাঁদপুরে গিয়েছে।"

"কই আমায় ত বলে গেল না!"

"তুমি কাঁদবে বলে বলেনি। বল্লে দুচার দিনের মধ্যে আসবে, চাকরি না করলে ত চলবে না। খরচের জন্যে দশটা টাকাও দিয়ে গিয়েছে।"

জাহ্নবী ক্ষণেক নীরবে রহিলেন, পরে একটু নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাঁদব কেন—সে যাতে সুখী থাকে থাকুক।" সাবিত্রীর চুলের জটা ছাড়াইতে ক্ষণেক চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন "সতি—সাবির মাথাটা পরিষ্কার করে দেত মা, আমি পারলাম না।"

সতী সাবিত্রীর মাথা লইয়া বসিল, সাবিত্রী আপত্তি করিল, সতী তাহাকে একটু তিরস্কার করিয়া দ্রুত হস্তে মস্তক পরিষ্কার করিয়া দিল। জাহ্নবী শয্যায় শুইয়া পরিলেন। সাবিত্রী তাঁহার বক্ষের নিকটে মস্তক রাখিয়া দক্ষিণ হস্তটি তাহার গাত্রে দিয়া শয়ন করিল। সতী বলিল "মা একটু জল খাও।"

"না মা, আমায় বিরক্ত করনা, আমার একটু ঘুম আসছে।"

সতী বুঝিত মাতার এই নিস্পন্দ নির্ব্বাক চিন্তা ঠিক ঘুমের মতই তন্ময়তা পূর্ণ। মাতা

সে সময়ে কাহারও কথা সহিতে পারেন না। অগত্যা সে উঠিয়া নিদ্রিত ভ্রাতাকে তুলিয়া দুগ্ধ পান করাইয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ঘুম পাড়াইল। গাভীর এই দুগ্ধটুকুই বালকের জীবন—সে জন্য গাভীর যত্নের সে ত্রুটী করিত না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। সেদিন অসহ্য গরম, দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সতী জানালার নিকটে আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। দীর্ঘ জটাসঙ্কুল চুলগুলা শৈবালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে আষাঢ়ের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ, একটিও তারা নাই—কোথাও একটু আলো নাই। স্তম্ভিত পৃথিবী যেন তাহারি মত মলিন অঞ্চল পাতিয়া একধারে পড়িয়া আছে, অবসাদময়, বিষাদগ্রস্ত প্রভাতে আর যেন সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। সতী বুঝিতে পারিতেছিল না বুকের উপর কেন এ পাষাণের মত ভার চাপিয়া বসিয়া আছে। যখন কার্য্যের মধ্যে সে আপনাকে মগ্ন রাখে তখন বেশ থাকে। একটু অবসর লইলেই এ ভার তাহাকে চাপিয়া ধরে। কতকাল আর তার এ ভাবে যাইবে! এ ভার কি কখনও নাবিবে না? যেন কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, অথচ কান্না আসে না। পৃথিবীর পানে চাহিয়া ভাবিল, উঃ এ কি অন্ধকার! এ অন্ধকারের কি বিরাম নাই। আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিল একটা তারা মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, ভাবিল, ঐ কি আমার বাবা, তিনি যে আমায় ডাকিয়া গিয়াছেন। আমায় কি এখনও ডাকিতেছেন?—ভাবিতে ভাবিতে সহসা দেখিল তারাটা যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল বিকট চক্ষে তাহার পানে চাহিল, সতী সভয়ে জানালা রুদ্ধ করিয়া গিয়া মাতার পার্শ্বে আসিয়া শুইয়া পড়িল। একবার নিদ্রিত ভ্রাতা ভগিনী ও মাতাকে স্পর্শ করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "না আমি যেতে চাই না।"

মাস তিনেক কাটিয়া গেল। হরি ইহার মধ্যে আর একবার আসিয়া কয়েকটা টাকা দিয়া গিয়াছিল। তাহাতে এবং তিনজনার পরিশ্রমে একপ্রকারে সংসার চলিতেছিল। প্রভাতে সতী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছে, এখন আর সে বড় নদীর ঘাটে যায় না। সাবিত্রী গরুকে জাব দিতেছিল। দ্বার প্রান্তে পিয়ন আসিয়া বলিল 'চিঠি'। কালী পত্রখানা আনিয়া মাতার হস্তে দিল। মাতা তুলসীতলা নিকাইতে নিকাইতে বাম হস্তে কার্ডখানা পড়িলেন। পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেই সিক্ত কর্দ্দমময় স্থানের মধ্যেই বসিয়া পড়িলেন।

সতী স্নান করিয়া আসিল। কলসী রান্নাঘরে রাখিয়া মাতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মা কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?" মাতা নির্ব্বাক্‌।

কার্ডখানা পড়িয়া রহিয়াছে। সতী তুলিয়া লইয়া পড়িল, নবগ্রামবাসী তিনকড়ি লাহিড়ী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার বিমাতাকে ইহা জ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং সবান্ধবে তাঁহার ভবনে গিয়া শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সতীও অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। পত্রখানা হাতে করিয়া দিদি দাঁড়াইয়া রহিল

দেখিয়া সাবিত্রী বিস্মিত ভাবে নিকটে আসিল। দিদির হস্ত হইতে পত্রখানা টানিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল। একবার দিদির মুখপানে চাহিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "মা ওমা মাগো", জ্যেঠাই মা ছুটিয়া আসিলেন ও রোদননিরতা সাবিত্রীর নিকট হইতে বহু কষ্টে অর্থ জানিয়া লইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার ধরিলেন। পাড়ার লোক আসিয়া জুটিল, সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, বেশ একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। জাহ্নবী কেবল দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন। এ রোদন যেন উপহাস মাত্র! যে দিন সতীর বিবাহ হইয়াছে সেইদিনই ত এ রোদন সাধিয়া রাখা হইয়াছে, আর কেন!

বেলা অনেক হইল। জ্যেঠাইমা বলিলেন "যা হবার তা হ'ল, সতী আয় মা ডুবটা দিয়ে আসবে।" সতী স্থিরকণ্ঠে বলিল "পুকুরে নাইলে হবে?" সকলে বলিল "তাকি হয় নদীতে যেতে হবে।" সতীর ভাব দেখিয়া সকলে মনে মনে নিন্দা করিতেছিল, একি মেয়ে বাপু! নাহয় ঘরই না করেছিস্—স্বামী ত, বিয়ে ত' করেছে। তা কাঁদ্‌লে না মা।" জ্যেঠাইমা সতীর হস্তের শাঁখের চুড়ি ও লোহা ভাঙ্গিতে গিয়া সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিলেন। সতী নিজেই একটা ইটের বাড়ীতে সেগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। স্নানান্তে শুভ্র থান পরিয়া, সিঁদুর ও হস্তের লোহা ও চুড়ি কয়গাছা বিসর্জ্জন দিয়া সতী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সহজ ভাবেই বাটী চলিল। কেবল সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া একটা অব্যক্ত ক্ষোভে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইতেছিল। দ্বারের বাহিরে আসিয়া জ্যেঠাইমা ডাকিলেন "কালী নিমপাতা দিয়ে যা, সতী এখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিস্ না; নিমপাতা দাঁতে কাট্, আগুন ছোঁ, তবে যাবি।" সহিষ্ণু ভাবে সতী যথা কর্ত্তব্য পালন করিল। সাবিত্রী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কে বলিল "সাবি তুই এখন সরে যা—দিদির মুখ দেখিস্ না"—সতী তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিল। সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া "ওগো দিদি তোমায় এমন সাজে কে সাজালে" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সকলে যুগপৎ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, সতী তখন সেইখানে বসিয়া পড়িল, তাহার স্কন্ধে মাথা দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাবিত্রী কাঁদিতেছিল, তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া মৃদু স্বরে প্রবোধ দিতে লাগিল।

জ্যেঠাইমা আসিয়া জাহ্নবীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "এখন ওঠো, যা কপালে ছিল হল। মেয়েটাকে একটু জল খাওয়াও। ভেবে আর কি কর্‌বে।" জাহ্নবী উঠিলেন, সতীর নিকটে যাইতেই সতী উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্যার বৈধব্যমূর্ত্তি দেখিয়া আর যেন তাঁহার সঙ্গুণ তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। আর্ত্তস্বরে একবার চীৎকার করিতে গেলেন, শব্দ বাহির হইল না, কেবল কন্যাকে দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইলেন।

অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন "সতি! চল মা একটু সরবৎ খাবি।" সতী নত মুখে বলিল "না, আমার ত' তেষ্টা পায়নি। তুমি একটু খাও, আমি রান্না চড়াইগে।" "রান্না তোমার জ্যেঠাইমা চড়িয়েছেন তুমি আজ রাঁধ্‌বেনা।" "ওঃ!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দেবীর তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিল।

সেবারে বিশ্বেশ্বর পশ্চিমে যাইব বলিয়াছিল, কিন্তু কার্য্য গতিকে যাওয়া হয় নাই। উভয়ে এবার বহু তীর্থ ঘুরিলেন। সাবিত্রী, গায়ত্রী পুষ্কর, ভাস্কর, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, হরিদ্বার প্রভৃতি কষ্টসাধ্য তীর্থ গুলিও এবারে সারা হইল। মাসিমার এসব তীর্থে এত দিন পর্য্যটন হয় নাই, এবারে বাহির হইয়াছেন ত' সব সারিয়া যাইবেন ভাবিয়াছিলেন। যাবজ্জীবন গৃহ কোটরে নিবদ্ধ বিশ্বেশ্বর যেন এক নূতন জগতের জীব হইয়া পড়িয়াছিল, আজ এখানে, কাল সেখানে, কখনও স্নান কখনও দেবদর্শন কখনও পর্ব্বতারোহণের আনন্দে সে এক প্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ গিয়া বলিল "মাসিমা আর কোথাও গিয়ে কাজ নাই, এস এইখানে একটা ঘর বেঁধে আমরা থাকি।" মাসিমা একটু হাসিলেন মাত্র। সমস্ত পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া সে সুখীও যতদূর হইল, দুঃখিতও ততদূর হইল। সেবারে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি পশ্চিমকে গ্রাস করিয়াছিল। একদিন মাসীকে বলিল "মাসিমা আমাদের দেশে বাস না করে এই সব দেশে বাস করলে ত হয়।" মাসিমা বলিলেন "কেন?"

"দেখদিখি কি গরীব দেশ! হা অন্ন হা অন্ন করে সাধারণ লোকগুলো কি করে বেড়াচ্চে। কার কি করতে পারি বলে কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়না, দরিদ্রতা যে কি তা পশ্চিমে দুর্ভিক্ষের সময় এলে বোঝা যায়।"

মাসিমা একটু দুঃখসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন "আমাদের দেশে কি গরীব নেই ক্ষেপা?"

"কোথায়! যারাও আছে, এদের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। আমাদের দেশ শষ্যশ্যামলা সুজলা সুফলা, কিছু না থাকলে অনাহারে মরতে হয় না।"

"তা সত্য কিন্তু একবার রামশঙ্কর ভট্টচাযদের কথা মনে করে স্থাখ দেখি।"

"তা দেখেছি। কিন্তু এসব দেশ হলে কোন্ দিন তারা মরে যেত, বাঙলার গ্রাম বলেই এখনো ভদ্রতা রেখে দিন কাটাচ্চে। স্থাখ মাসীমা, যে দেশে অভাব নেই সে দেশে কিছু করা যায়না, করতেও লজ্জা হয়। যারা গ্রহণ করবে তারাও লজ্জা পায়, কেননা, তারাত কায়ক্লেশে এক রকমে দিন কাটাচ্চে, সাধারণের চোখে একবারে ভিক্ষুকের বেশ তারা সহজে ধরতে চায় না। যে দেশে সে সঙ্কোচ মাত্র নাই, সাহায্য অভাবে যারা দিন রাত্রি মরে যাচ্চে সেই দেশে এসে বাস করা উচিত। বিনা আয়াসে অনেক কাজ করতে পারা যায়।"

মাসী হাসিয়া বলিলেন "কি কাজ করতে পারা যায়? কি করতে চাস্?"

বিশ্বেশ্বর অধোবদন হইল, লজ্জার আভাসে তাহার আগগুকর্ণমূল ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। মুখে বড় বড় কথা বলা তাহার সাধ্যের অতীত। ভাবের আধিক্যে যেখানে হৃদয় অত্যন্ত আলোড়িত, সেখানে সে একবারে বাক্যহীন হইয়া পড়ে। এইজন্যই দেশে একটা অতিথিমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতে করাইতে সহসা সে কার্য্য সে স্থগিদ রাখিয়াছে। প্রথমতঃ নিজে কি করিয়া লোকের কাছে প্রচার করিবে যে আমি একটা মস্ত দয়ালু ধনবান লোক, যে কেহ সাহায্য চাও আমার আশ্রয়ে আইস, আমি তোমাদের দুঃখ দূর

করিব! একথা ভাবিতে তাহার অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ভাবের উত্তেজনায় কার্য্যটা আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছিল, সহসা সেটা বন্ধ করিয়া দিল। দেশের লোকে ভাবিল রেশমের দর কমিয়া যাওয়াতে বিশ্বেশ্বর তাহার কুঠা নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিদ রাখিল। বিতীয়তঃ সে ভাবিয়াছিল যে এদেশে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম যারা নিঃসঙ্কোচে সাধারণের চক্ষে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত হইয়া লোকের সাহায্য গ্রহণ করে। যাহারা সে সঙ্কোচহীন, তাহারা ভেকধারী বৈষ্ণব। ধর্ম্মশীল বঙ্গের গৃহস্থদিগের কল্যাণে তাহাদের অভাব নাই। অনেক ভাবিয়া বিশ্বেশ্বর সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিল।

পশ্চিমে আসিয়া তথাকার সাধারণ অধিবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সে অশ্রু সামলাইতে পারিল না। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে পশ্চিমে আসিয়া বাস করিয়া তাহার বহুদিনের সেই ইচ্ছা পূরণ করে। মাসিমা কিন্তু একটু ক্ষোভের হাসির সহিত তাহার সে ইচ্ছায় বাধা দিতে লাগিলেন! তিনি স্থির বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলেন যে কুবেরের ভাণ্ডার নহিলে সেদেশের অভাব নিবারিত হয়না। বিশ্বেশ্বরের অজস্র দানে তিনি বাধা দিতেন না কিন্তু বাটী ফিরিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে তাঁহার বিচলিতমস্তিষ্ক পুত্রটি অধিক দিন সে দেশে থাকিলে আরও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে। তাহাকে রিক্তসর্ব্বস্ব দেখিতে তিনি একেবারে ইচ্ছুক নন! মাসীর ব্যস্ততায় বিশ্বেশ্বর অগত্যা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাসিমা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন, বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তিনটা বাজে, বিশৃঙ্খল রুক্ষ মস্তকে, শ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তদেহে, সূর্য্যকিরণদগ্ধ মলিন মুখে বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসিল। সরবৎ খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়া অনেক কষ্টে মাসিমা তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। সে যে এতক্ষণ কি করিতেছিল বেশ বুঝিতে পারিলেন। পঁচিশজন লোক খাইবে বলিয়া সে যখন মাসিমাকে রাঁধিতে অনুরোধ করিত, মাসিমা তখন বুদ্ধি খাটাইয়া একশত জনের উদ্যোগ করিতেন, বিশ্বেশ্বর সে রন্ধনে আসিয়া যোগ দিত। জোল কাটিয়া বড় বড় ভাতের ডোল চাপাইয়া গামছা কোমরে বিশ্বেশ্বর মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, মাসিমা তরকারির ভার লইতেন। শেষে একশত জনের স্থলে দুই শতে মারামারি বাধিয়া যাইত। ভাণ্ডারের চাল বিলাইয়া তখন ভিক্ষুকদলকে শান্ত করিতে হইত।

অত্যধিক পরিশ্রমে বিশ্বেশ্বরের শরীর কৃশ ও মলিন হইয়াছিল। দুই একবার জরও হইল। মাসিমা তখন জোর করিয়া পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এক বৎসর পরে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া চলিলেন। ট্রেণের মধ্যেই মাসিমা একবার বিশ্বেশ্বরকে জানাইলেন "দেশে গিয়ে একমাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।" বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল।

বিবাহের নামে সত্যই তাহার যেন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছিল। প্রথমে কি মনে করিয়া সে যে বিবাহ করিবে না সংকল্প করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন সে সংকল্প যেন বৃহৎকায় অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বহু শাখা

প্রশাখা বিস্তার করিয়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঝড়বাত্যাবৃষ্টি এখন সে সকলি উপেক্ষা করিতে পারে। সামান্য কল্পনার অঙ্কুর এখন সুদৃঢ় পাষাণভেদী মূলে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে যখন সে বিবাহ করিবনা বলিয়াছিল সে সময়ের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে অবিরত শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চাই তাহার কারণ। যদি তাহার মাতা ভগিনী বা স্নেহভালবাসার সম্পর্কীয় কেহ সে সময়ে থাকিত ত বোধ হয় এভাব জন্মিতে পারিত না। মাসিমা তখন নূতন সংসারে আসিয়া কেবল কর্ত্তব্যই পালন করিয়া যাইতেন, পরের ছেলেকে অত বেশী ঘনিষ্ঠ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু এখন বৃদ্ধ বয়সে সে দর্প তাঁহার চূর্ণ হইয়াছে; কেবল বিশ্বেশ্বরই নারীসঙ্গ অসহিষ্ণু হইয়া গঠিত হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে সে যখন কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করিত তখন তাহার মধ্যে নারী জাতির প্রাধান্য দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িত। একজন সামান্য বালিকা বা নারী কিরূপে পুরুষের বিস্তৃত জীবনের সর্ব্বসুখ-সার্থকতার কেন্দ্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; অথচ দেখিত ইহাই কাব্য সাহিত্যের প্রাণ; অতএব জগতেরও প্রাণ। কিরূপে এই মোহময় আত্মবিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইবে সেই চেষ্টায় সে সমস্ত প্রাণমন প্রয়োগ করিত। আপনাকে বিবাহিত কল্পনা করিয়া এক একবার মানস চক্ষে আপনার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিত। সমস্ত সুখ কল্পনা একটি বালিকার সুখে দুঃখে পর্য্যবসিত! চিন্তার শেষ, কাব্যের শেষ, সেই একটী বালিকায়। সমস্ত আগ্রহ সমস্ত স্নেহ ভালবাসা, সৌন্দর্য্য সব সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত। এই কি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত জীবন? এই যদি সুখ শান্তি তৃপ্তি তবে দাসত্ব কাহাকে বলে!

যখন সে গ্রামের নিকটে পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দূরে গ্রামের শ্যামল রেখা ম্লান চন্দ্রকিরণে চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মাঠের চিরপরিচিত বায়ু সাদরে যেন তাহার চুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল, চিবুক ধরিয়া সস্নেহে যেন কুশল প্রশ্ন করিল। সহসা বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, মনে হইতেছিল যেন তাহার শৈশবে অন্তর্হিতা জননী ঐ গ্রামের আম্রবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া স্নেহসজলচক্ষে প্রবাস হইতে আগত পুত্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর ক্ষণেক দাঁড়াইল, যেন তীব্র আনন্দের প্রতিঘাত একটু সম্বরণ করিয়া লইতেছে; সহসা পথের উপর নত হইয়া মাটীতে ললাট স্পর্শ করিয়া সে কাহাকে প্রণাম করিল। মাসিমা গোশকটে ছিলেন, নহিলে হয়ত পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন।

বাটী পৌঁছিয়া মাসিমা আগে গরুগুলি দেখিতে গেলেন। পুরাতন ভৃত্য ঘোষ এবং নিধের মা বাড়ী ঘর যথা সম্ভব পরিষ্কারই রাখিয়াছিল। তথাপি যে সব ঘর তালা দেওয়া ছিল সে ঘরের মূর্ত্তি দেখিয়া মাসিমা প্রবাসে যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করি-লেন। তীর্থ হইতে যে সব তৈজস, বস্ত্র, ও প্রসাদ আদি আনিয়া ছিলেন তাহা প্রতিবেশী বর্গকে বণ্টন করিবার ব্যগ্রতা সম্প্রতি সম্বরণ করিয়া "উপোসী" ছেলের জন্য রন্ধন চাপাইয়া দিলেন। ছেলে কিন্তু তখন পাড়াময় ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিল। কাহারও বাড়ীতে যাওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ কিন্তু অদ্য এক একবার সে ইচ্ছাও হইতেছিল। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া ইচ্ছাটা প্রশমিত করিয়া একবার তাহার কলাবাগানটা দেখিতে গেল, ক্ষীণচন্দ্র তখন অস্তে যাইতেছে, কলা বাগানের সবই অন্ধকার; সস্পৃহনয়নে একবার বৃক্ষগুলার পানে চাহিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রামের প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যেক গৃহ যেন কতই সুন্দর বোধ হইতেছিল। রাস্তায় নাথু মণ্ডল, পরাণ কলু, বিপিন বেনে প্রভৃতি তাহার নিতান্ত অপরিচিত লোকগুলা যখন দাদাঠাকুর কবে এলে গো? বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিল তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। আজ যেন এ গ্রামের সামান্য লোকটার সঙ্গও স্পৃহনীয় বোধ হইতেছে।

দক্ষিণ পার্শ্বে ভট্টাচার্য্যের বাটী, অন্ধকারে কয়েকটা স্তূপের মত দেখাইতেছে, বিশ্বেশ্বর একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা হইল একবার ভট্চায মশায় বলিয়া ডাকে, কিন্তু সহসা সেই বিবাহের প্রস্তাব মনে পড়ায় আর ডাকা হইল না। একটু ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বেশ্বর চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূরে উমেশ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠক ঘর। রোয়াকে গৃহস্বামী স্বয়ং বসিয়া তামাকু টানিতেছেন, বিশ্বেশ্বর একেবারে গিয়া সেখানে উঠিল। গৃহস্বামী বলিলেন "কে?"

"আমি বিশ্বেশ্বর।"

"বিশ্বেশ্বর? এসো বাবা, ব'সো; পশ্চিম থেকে কবে ফিরলে? ভাল আছ ত?"

বহুক্ষণ সেখানে গল্প করিয়া, গ্রামের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনেক রাত্রে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। থালে করিয়া ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া মাসিমা বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, বিশ্বেশ্বর কথা না কহিয়া একেবারে আসনের উপর গিয়া বসিল। সচকিত হইয়া তিনি বকিতে লাগিলেন "দ্যাখদেখি, ভাত কটি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, আজ দুদিন খাওয়া নেই—কোথায় দুটি খেয়ে একটু গিয়ে শোবে—না এখানে এসেও সেই স্বভাব! ভোরে একটা যোগ আছে, নদীতে ডুবটা দিতে যাব, তা কখন বা শোব, কখন বা সকালে উঠব—তোর যদি কোন কালেও"—মাসিমা আরও বলিতেন কিন্তু পুত্রের বিষণ্ণ নতমুখ দেখিয়া থামিয়া গেলেন। সোৎসুকে বলিলেন "এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

"উমেশ মুখুয্যের বৈঠকখানায়।"

"তারা সব ভাল আছে ত? পাড়ার সব ভাল? গাঁয়ের সবাই ভাল আছে?"

"সবারি খবর কিকরে বল্‌ব। আমাদের রামশঙ্কর ভট্‌চায মারা গেছেন।"

মনস্তাপ পাইয়া মাসিমা নীরব হইলেন। একবার মৃদুস্বরে বলিলেন "আহা বৌটা!" তারপরে অনেকগুলা 'আহা' মনে আসিতে লাগিল, তাই নীরব হইলেন। আবার একবার বলিলেন "যে মরে সেত' জুড়োয়, মিন্‌সে কিন্তু জুড়িয়েছে, আর সংসারের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না" বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল।

রাত্রে মাসিমা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলেন না, জাহ্নবীর শান্ত সহিষ্ণু মূর্ত্তিখানি কেবলি তাঁহার চক্ষের উপর আসিতেছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া বস্ত্র ও গামছা লইয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করিলেন। নদীতে অনেকেই স্নান করিতেছিল; মাসিমাকে দেখিয়া

সকলেই কুশলপ্রশ্নে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিল। ভট্‌চাযদের বড়বৌও নাইতেছিলেন তিনি কাংস্যকণ্ঠে বলিলেন "আমরা বলি বা আর দেশেই ফির্‌বেনা।"

"দেশে ফিরবনা কেন দিদি' বলিতে বলিতে তাঁহার পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতা শ্বেতবস্ত্রা জাহ্নবীকে দেখিয়া মাসিমাতা মুখ ফিরাইলেন। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন,—সাবিত্রী ডুব দিতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইল তাহার ম্লানমুখখানি ধরিয়া আদর করেন, কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তাহাদের সহিত তিনি কথা কহিবেন! তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া ফিরিতে গিয়া দেখেন, সাবিত্রীর পার্শ্বে শ্বেতবস্ত্রা আলুলায়িতরুক্ষকেশা ওকি মূর্ত্তি? ওকে? ওই কি সতী? অন্নপূর্ণা নীরব নিশ্চল কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

বিধবা।

প্রজ্বলিত চিতা-ভস্মে সর্ব্ব সুখ করি বিসর্জ্জন,
যবে তুমি এলে ফিরি মুক্তকেশ সিক্ত দুনয়ন,
তখনি দেখিনু তোমা—নহ তুমি আর আগেকার;
আপনার ক্ষুদ্র সীমা চরাচরে করিয়া বিস্তার—
মহীয়সী দেবী সম দাঁড়ায়েছ অঙ্গনের তলে,
বাড়াইয়া দুটি কর, স্নেহ-কণ্ঠে, অনন্ত নিখিলে—
ডাকিতেছ 'আয়' বলি, খুলে দিয়ে অলঙ্কার দল—
বিসর্জ্জিয়া জীবনের আজীবন বাঞ্ছিত সম্বল।—
আজি তুমি মহাধন্যা, কৃষ্ণপ্রেম আজি শত পথে,
সসীমের বন্ধন টুটিয়া, অসীমের অচঞ্চল স্রোতে
পড়িয়াছে ঝর্ঝর রবে, অপগত আকাঙ্ক্ষা নিচয়,
প্রভাতের পদ্ম সম প্রস্ফুটিত কৈশোর হৃদয়—
করুণা শিশির সিক্ত, সকলেরে বলে লয় টানি,
নাহি তথা আত্মপর, নাহি স্বার্থ, নাহি কোন গ্লানি;
আপনার সুখ দুঃখ দুই পদে করিয়া দলন,
পরহিতব্রতে দেবি করিয়াছ আত্ম নিবেদন।
তবু তুমি সঙ্কুচিতা, ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পনে
নিজেরে ঢাকিতে চাহ সংসারের বাহ্য আবরণে
নিষ্ফল বিশ্বাসে বৃথা; নাহি প্রাণে আশার ঝঙ্কার
বাঞ্ছাহীন দীর্ঘ প্রাণে শুচিস্মিতা তুমি মা আমার।
কি অনন্ত ধৈর্য্য ভরে সহিতেছ অলক্ষ্য বেদন,
হৃদয়ে কি তীব্রানল—কি নিষ্ঠুর বৃশ্চিক দংশন
জর্জ্জরিছে নিত্য তোমা, ধৈর্য্যমতী ধরিত্রীর প্রায়,
তুমি কিন্তু অচঞ্চল জগতের স্তুতি বা নিন্দায়।
রাজরাজেশ্বরী বেশে মানবের বহু উর্দ্ধে এবে,
হে কল্যাণি, আছ বসি স্ফুট কান্তি বিপুল গৌরবে—
পবিত্রিয়া সর্ব্ব জীবে, পবিত্রিয়া অখণ্ড অবনী;
নমো নমো অনিন্দিতা হে বরেণ্যা বিশ্বের জননি।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ক্ষুদ্র ও মহৎ।

বিন্দু কহিল, 'সিন্ধু তোমার
চিত্ত মহান্—পরিধি নাই,
তুচ্ছ আমি—এ ক্ষুদ্র পরাণ
তোমারি হৃদয়ে মিশাতে চাই'।

সিন্ধু কহিল, 'আরে ও অবোধ
আয় বুকে আয় রাখিয়ে ঢেকে,
তোদেরি পরশে আমিরে মহান
বিশ্ব আমারে মহান্ দেখে।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পণরক্ষা।

(১)

বংশিবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে ষোলো বছরের ছোট। মাঝে যে কয়টি ভাই বোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতীর ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্প-ফুংকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না —ঠুকঠাক্ ঠুকঠাক্ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চল লক্ষ্মীর মনঃপুত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলেবলেকৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় সৌখীন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সে জন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদি চ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড় বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে ত হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো টাকা পণ এবং অলঙ্কার-বাবদ আর একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার— এখনো অন্তত চার পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোষ্ঠিতে তাহার সঞ্চয়ের স্থানে

দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভগ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোট ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দ্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতাকর্ত্তৃকবঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে—সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের সৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চজাতের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্ব্ব-সংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতে সে বেশি দিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভাল লাগিত না—তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্য সাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল—তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটোবৎসর পাড়ায় কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না—রসিক তখন, চাপকানজোব্বাপরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হার্ম্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতে ছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালী লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার ত কথাই নাই। দাদা কেবলি ভাবিত, এমন আশ্চর্য্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এখন কোনোমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতর ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্য-নূতন সখ মিটাইতে গেলে ভাবীবধূ কেবলি দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্দ্ধান করিতে থাকে অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও পূরিল না এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড় আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বরপ্রথা চলিত থাকিত

তখ রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সু—এমন কত নাম করিব—সবাই রসিককে ভালবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্ত্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সৌরভী, সে বড় শান্ত—সে চুপ করিয়া বসিয়া পুতুল-গড়া দেখিতে ভালবাসিত এবং প্রয়োজনমত রসিককে কাদাকাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা কিছু ফরমাস করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্ত্তি-গুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত, সৈরী, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্‌—তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুসি লইতে পারিত কিন্তু সঙ্কোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমত জিনিষটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুল গড়ার পর্ব্ব শেষ হইলে যখন হার্ম্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলে মেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত—রসিক তাহাদের সকলকেই হুঙ্কার দিয়া খেদাইয়া রাখিত; সৌরভী কোনো উৎপাত করিত না—সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্‌। সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভাল জিনিষ লইবার জন্য তাহাকে কোনদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাস করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতন-গোছের যাহা কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারো আবদার বড় সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়—পাঁচশো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

(২)

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁতবোনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালই লাগিত। রসিক ভাবিত, দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! আমি হইলে ত মরিয়া গেলেও পারি না। তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত।

তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জ্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জ্বালা হইয়াছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্ত্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মত কেবলি জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরো বেশি দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না। বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মত প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে তখনো মিট্‌মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়া আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর একটু হাতে টাকা জমুক, আস্‌চে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে। সুবিধামত বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না তুমি আমার কাজে যোগ দাও। রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভৎর্সনা করিল; কহিল, বাপপিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কি?

কথাটা অসঙ্গত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এত বড় অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড় একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি

পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক আজ গোপালকে ঘাটি-খেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন্ তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল তখন রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল—"সৈরী, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস্?" সৌরভী খুসি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্নে দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্ত্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল ভালরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাতদুরস্ত হইবার দরকার ছিলনা বলিয়াই তাহার হাত দুরস্ত হইতে চাহিল না।' বিশেষত তাহার অনুগত-বর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভাল মানুষটির মত তাহাদের বাপ পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরূপ ফলত দেখা গেল না। "দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!" সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্ত্তন হইল যে সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কি জানি এই ছোট শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্ম্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে ত ঘুচিয়াই গেল—তার পর সর্ব্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাস খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দীঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাট, বাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুসি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছু না কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহু দূরের জন্য তাহার চিত্ত ছটফট করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল,—বংশী তাহাকে খুব বেশীক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ঐ একটুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্য্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল;—এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভাল লাগিল না।

(৩)

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিক্‌ল্ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু কি চমৎকার, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দ! দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্রের মত অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মত মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত—এ যেন সেই রকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিক্‌ল্ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কি বেশি? একশো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা ত সস্তা! বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্য্যের অরুণসারথি ত সৃষ্টিকর্ত্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিক্‌ল্‌টি তাহার পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তব্ধ করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্যে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস্ দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে, চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। কহিল—আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মুহূর্ত্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, দূর হোক্ গে ছাই, এমন করিয়া আর টাকা জমানি করা যায় না—দিয়া ফেলি। কিন্তু বংশ! সে যে একেবারেই

ভেবে। একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকী থাকে কি! ধার! রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে ত বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করিয়া বলিল, সে কি হয়, একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব! রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না। বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, এও ত মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না! এমন দায় ত আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার অসুখ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না—বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতীদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর বাহনের মত সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতীর ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে;—এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলি কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্ম্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্ব্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্তদেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল—তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই তোমার সামর্থ্য যতদূর ঢের দেখিয়াছি। শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবী করিলেই ত হয় না! বলিয়া সে চলিয়া গেল—আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে, যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—এমন সময় সঙ্গীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্য্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতর মর্ম্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সেই সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল—তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী এই কথা কেবলি তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে দাদা শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত সে সমস্তই সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বারকয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই, সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্ম্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মত সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, এই নে ভাই—আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বৌ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না ভাই আমার, গোপাল আমার,—আমার সে শক্তি নাই—তুই চাকার গাড়ি কিনিস তোর যা খুসি তাই করিস্। রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বৌ আনিতে হয় আমার নিজের টাকায় করিব, তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না। বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

(৬)

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায়' আগেকার মত তাহাকে ডাকাডাকি করে না, আর গৌরভীর ত কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মত আড়ি—অথচ সে যে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর আড়ি করিয়াছে

সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া আপন মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি!"

হার্মোনিয়ম! এত বড় দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু যে জিনিষটা তাহার ভাল লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসংকোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল—সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আন ত।

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে তাহার সময় নাই।—রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, চল্ দেখি সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে। রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কোথাও বড়ির নাম গন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, রাগ করেছিস্ সৈরি?—সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাঁধা নক্সা ছিল—কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই সেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত—সে মনে করিত জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য্য কাঁথা আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল—এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায় কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি একবার দেখবি না?

অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া?

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল— সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল, সৈরি, এ কাঁথা তোর জন্যেই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম—তখন এত বড় অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিষ দাবী করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না;—সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিষ লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল এখন হইতে আবার পূর্ব্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে দুটি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলে মেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতই ভাব করিয়া লইল—কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি রান্না হইবে—বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল আমার শরীর ভাল নাই, আজ আমি কিছু খাইবনা— রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো। —স্ত্রীলোকটি বলিল রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না—অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে।—শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টার মাথা পর্য্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন, গরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়-জালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।—রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না তখন রসিকের মনটা

যেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপার্জ্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই, যেমন করিয়া হোক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া নিজের টাকায় কেনা বাইসিক্‌লে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না।—রহিল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট; এখানকার সুখসাগর দীঘি; এখানকার ফাল্গুন মাসে শর্ষে ক্ষেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব এখানকার আমোদ উৎসব,—এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার, এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

(৫)

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল। তাহার মনে হইত আর সকল কাজই ইহার চেয়ে ভাল। সে মনে করিয়াছিল একবার তাহার সঙ্কীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যাপ্ত আছে তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে—যেমন মনে হয় আধঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়—তাহার গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনি সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা নামক পদার্থটাকে খুব কষিয়া দৌড় করানো যায়, সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে; কিন্তু বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা; এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মত দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মত দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিষ যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মত অরুচিকর জিনিষ আর কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ীর স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে, মুহূর্ত্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে দাদা কাছে নাই।

বাড়িতে থাকিতে একএকদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীতশীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে,—দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনই সেই অর্দ্ধরাত্রে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, আমি পণের টাকা ভর্ত্তি করিয়া বাইসিকিলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পুরুষ মানুষ, তবে আমার নাম রসিক।

একদিন দলের কর্ত্তা তাহাকে তাঁতী বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেই দিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালা বাটি, নিজের যে কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন—আর মানুষ বুঝি তাঁর কোন্ সতীনের ছেলে, তাই চারিদিকে এত বড় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে কোথাও রসিকের জন্য এক মুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল দুর্ব্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মুটে মজুরের মত কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুই জনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই

জন্য দেশী কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই—সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল যেন মুক্তি পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মত যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আজ ত আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না—আমি ত ইচ্ছা করিলেই মোট বাহিতে পারিতাম।

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, মোট আমি বহিব। সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, আমি তাঁতীর ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। "আমি তাঁতী" আগে হইলে রসিক একথা কখনই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না—তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ ত লাফাইয়া উঠিল—বলিল, তুমি তাঁতী! আমি ত তাঁতী খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসাখরচ বাদে সে সামান্ত কিছু জমাইতে পারিল কিন্তু বাইসিক্ল্ চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের ত কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয় কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে; তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানাপ্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জ্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সাম্‌নে সে কেবলি আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটি-নাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধ-পাগ্‌লা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিল বর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মত প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিনদিকে আমন ধান, একপাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারি উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্ত্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে

মাঠ পার হইয়া কীর্ত্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে শুদ্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের খুঁটে পান বাঁধা বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ মেলা সৌরভী; এই সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান বাজারের কলের তৈরি জিনিষ হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলের কাজ কাজের বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মত মরণের পথে টানিয়াছিল—কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এই জন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবল তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেই দিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলে মেয়েরা, তোর বর আসিয়াছে বলিয়া সৌরভীকে ক্ষ্যাপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলি বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আট্‌কায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই এইটেই তাহার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড় দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

(৬)

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না;—কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে

দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেই রকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কি একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে তাহার দুই চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দী বাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিসন এজেন্সির মস্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকী বাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সে রকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবারই দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার ত এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে অতএব জানকী বাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকী বাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু। হরমোহন ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিসন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক ব্যবসায়—তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থার নূতন যৌবনে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড় বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায় সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাঁহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়োরাণীর মত তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবীল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল—অল্প বয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলে-

মানুষী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনো-মতে পারিবারিক পূর্ব্ব ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন কিন্তু যখনি তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনি তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক বংশের ছেলে—তাহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে—এখন তাহাদের অবস্থা হীন কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল—স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটির পড়াশুনা কি রকম?—জানকী বাবু বলিলেন, সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—টাকাকড়ি? জানকী বাবু বলিলেন, যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।—গৃহিণী কহিলেন, আত্মীয় স্বজনদের ত ডাকিতে হইবে। জানকীবাবু কহিলেন, পূর্ব্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে—এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কি উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কূল কিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?

রসিক কহিল, না, তাহার কোনো দরকার নাই।—সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে, অকর্ম্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কি রকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকল প্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্‌ল্ দাবী করিল।

(৭)

তখন মাঘের শেষ। সর্ষে এবং তিসির ফুলে ক্ষেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই, গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরুমহিষের দল লইয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল

কমিয়া পায়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম খোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙীন ফুল্‌মোজা ও চক্‌চকে কালো চামড়ার সৌখীন বিলাতীজুতা। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্যলোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্ব্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্ত্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল,—ছেলেরা সেইদিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাইসিক্‌ল্ রসিকদের বাড়ির সাম্‌নে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে—কেহ নাই—কেহ নাই! এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগম্ভীর একটা বিদায়ের বার্ত্তা বাহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সাম্‌নে যাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই জিগের গাছের বেড়া, এই হেলিয়া পড়া খেজুর গাছ—সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশু মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নীচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল —বুঝেছি, বুঝেছি—দাদা নাই! অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, ভাই রসিক দাদা, চল আমাদের বাড়ি চল। রসিক তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সাম্‌নে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া-কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, রোয়াকের উপর দেয়ালে ঠেসান দেওয়া এক নূতন বাইসিক্‌ল্—তাহার চাকাগুলি ব্রাউন্ কাগজে মোড়া। দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুক-ফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে

পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার একমুহূর্ত্ত আর কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্য-স্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায় তেমনিই যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌লটি ভি, পি, ডাকে পাইল সেই দিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল;—গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, আর একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিও—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো, দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে!

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল—বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা সহরে টাকার হাড়কাটে চিরকালের মত সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথহারা।

দিবসের কাজ শেষ হয়ে গেল
ঘনাইয়া এলো রাত্রি,
তাড়াতাড়ি তাই গৃহপানে ধাই
অজানা পথের যাত্রী।
জ্যোৎস্না বিরল বহুদূর পথ
মানুষ না যায় চেনা,
ফিরিবার কথা মনে রাখে নাই
দিবসের বেচাকেনা।
শ্রান্ত চরণ চলিতে চাহেনা
ক্ষীণ হয়ে আসে দৃষ্টি,
প্রলয় বজ্র ধ্বনিছে গগনে
মাথায় ঝরিছে বৃষ্টি।

ঘাটে বাঁধা আছে খেয়া তরীখান্
মাঝি চলে গেছে ঘর,
ঘন গর্জ্জনে নদী কল্লোল
আছাড়ে শ্রবণপর।
পাথের কেবল নয়নের জল
সাথে নাই 'কানা কড়ি,
বাজারের মাঝে অঞ্চল খুলি
সঞ্চয় গেছে পড়ি।
"পথ কোথা" ওগো "পথ কোথা" এর
সীমা কোথা এর আছে,
শ্রান্ত চরণ ক্লান্ত হৃদয়
শুধাব কাহার কাছে!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

রাজা রামমোহন রায়।*

মহৎ লোকের অভাবের সহিত আমরা মাত্রুস বুঝিবার মাপ কাটিটি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছি, তাই আমাদের মধ্যে যাঁহাদের মহত্ত্ব সন্দেহের বহির্ভূত এমন সব মহাপুরুষকে লইয়াও আমরা একদল অপর দলের সহিত অকারণ বিরোধ বাধাইয়া তুলিতেছি।

তাহার কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, আমরা অখণ্ড সম্পূর্ণ মনুষ্যটিকে দেখিবার চেষ্টা করি না। সমুদ্রকে ছোট ছোট খালে পরিণত করিয়া সমুদ্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা যেমন নিষ্ফল বাতুলতা মাত্র, তেমনি একজন সহজ সম্পূর্ণ বিরাট মহাপুরুষকে খণ্ডিত করিয়া উপলব্ধি করার প্রয়াস শুধু ব্যর্থ নহে তাহা হানিকর।

এমনি করিয়া আমরা নানা সম্প্রদায় মিলিয়া যিনি সকল সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, তাঁহাকে পর্য্যন্ত আমাদের ছোট গণ্ডীর ভিতর পুরিয়া, আমাদের গজ-কাটিতে তাঁহাকে মাপিবার চেষ্টা করিয়া, নিজেদের খর্ব্ব করি। নিজেদের খর্ব্ব করি, কেননা তাহাতে মহাপুরুষের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ তিনি সকল গণ্ডীর সকল সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার বাহিরে, বড়কে ছোট করিয়া মহৎকে খণ্ডিত করিয়া আমরাই শুধু সঙ্কীর্ণতার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া মরি।

তাই বাংলাদেশে—যে বাংলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া রামমোহন রায় দেশকে ধন্য করিয়াছেন—আমি অপর দেশের কথা ছাড়িয়া দিই, সেই বাংলাদেশেই রামমোহনকে লইয়া কত না তর্ক, কত না বিবাদ! তাহার কারণ বাংলাদেশ স্বার্থের মধ্য দিয়াই রামমোহনকে দেখিয়াছে, এবং যেখানে তাঁহার বজ্রকঠিন অমোঘ হস্ত পুরাতনের দীর্ণতাকে নূতনের সম্পূর্ণতার মধ্যে সার্থক করিতে গিয়া তাহার দৃঢ়-বদ্ধ সংস্কারকে আঘাত করিয়াছে, সেইখানেই বাংলাদেশ অভিনব বেদনায় চীৎকার করিয়াছে!

কিন্তু এমন করিয়া তাঁহাকে দেখা দেখাই নয়। সম্প্রদায় বিশেষের লাভের ভিতর দিয়া তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা দোকানদারীর যাচাই করা মাত্র, এবং সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষতির মধ্য দিয়া তাঁহার নিষ্ফলতার নিরূপণ করিতে যাওয়াও বাতুলতা।

তাঁহাকে সত্যের মাপকাটির দ্বারা মাপিয়া দেখিতে হইবে, লাভালাভ ক্ষতি অক্ষতির দ্বারা অথবা সম্প্রদায়বিশেষের প্রশংসাবাদ কিংবা অপ্রশংসা দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া চলে না। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহাকে বুঝা যাইবে না, কারণ কর্ম্ম তাঁহাকে ব্যাপ্ত করে নাই, কর্ম্মকে ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার অসাধারণ মনুষ্যত্ব বহু উর্দ্ধে আপনার গর্ব্বিত সমুন্নত শির তুলিয়াছে। সকল কর্ম্মের উর্দ্ধে সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষে আপন মহত্ত্বগৌরবে সমুজ্জল প্রকৃত মানুষটিকে যদি আমরা চিনিতে পারি ত সেই চেনাই সার্থক।

রামমোহনের একটা চিঠির মধ্যে এমন একটা সত্যের বিকাশ পাই, যে সত্যটা আমার বিশ্বাস তাঁহার সর্ব্ব-কর্ম্মের মধ্যেই প্রকাশ

* বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ভাগলপুর শাখায় পঠিত।

লাভের চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং যাহা তাঁহার জীবনের মধ্যে প্রধানতম সত্য ছিল। যখন নেপল্‌স্‌বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে-ছিলেন তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে স্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত শুধু বাংলাদেশের

রাজা রামমোহন রায়।

ছিলনা, তাই সুদূর নেপল্‌স্‌বাসীগণের পরাভবেও তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন,—সে ক্ষোভ মানুষের জয় পরাজয়ের জন্য নহে তাহা ন্যায়ের পরাভবে। বকিংহাম সাহেবের বাড়ীতে সেদিন তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু চিত্ত এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে তিনি সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা

ক্যা্তে যাইতে পারিলেন না—সেই মর্ম্মে বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে দেখিতে পাই :—

Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately succesful.

রামমোহন রায়ের সমগ্র জীবনই এই Enemies to liberty and friends of despotism-এর বিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ! তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের—মধ্যে, সমস্ত তর্কের মধ্যে সমস্ত চেষ্টার মধ্যে এই সত্যের জন্য যুদ্ধ, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধই একমাত্র লক্ষ্যরূপে ফুটিয়া উঠে! যিনি সকল-বন্ধনের উর্দ্ধে, সকল নিয়ম সকল শাস্ত্র সকল অনুশাসনের বাহিরে সেই সর্ব্বময় বিশ্বদেবতার জ্যোতি রামমোহনের মধ্যে প্রচুর-মাত্রায় সঞ্চিত ছিল। তাই তাহা যেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতই প্রকাশ পাইয়া অন্ধকারকে, নীচতাকে, বন্ধনকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে!

এই প্রাচীনতম এবং উদারতম সত্যটাই তাঁহার বুকের মধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া তাঁহাকে চঞ্চল কর্ম্মময় করিয়া তুলিয়াছিল। আগুন যেমন এঞ্জিনের বুকের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া জলকে বাষ্প করিয়া, সমস্ত বাধা বিঘ্নকে দূর করিয়া উল্কাবেগে এঞ্জিনকে ছুটাইয়া চলে, তেমনি এই মহত্তম সত্য রামমোহনকে ষোল-বৎসর বয়সে তুষারময় গিরি উল্লঙ্ঘন করাইয়া তিব্বতে লইয়া গিয়াছিল।—অবাধে প্রধানতম রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে জ্বালাময়ীভাষা লইয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিল—এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়াছিল। রামমোহনের সকল-কার্য্যই যদি একান্ত তাঁহারই নিজস্ব বলিয়া ধরি, তাহা হইলে তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইতে পারে, কিন্তু যখনই দেখি তাহাদের পশ্চাতে তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বদেবতা বসিয়া তাঁহার আগুনকে নিয়তই জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, তখনই তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের অর্থ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মস্তকগঠনবিদ্যাবিদ্‌গণ কহেন তাঁহার মত এত বড় মাথা অল্পই দেখা যায়, এবং ইহাই তাঁহার প্রতিভার কারণ! মহাপণ্ডিতদিগের অভিমত আমার শিরোধার্য্য। —কিন্তু যদি কেহ চিত্তবিদ্যাবিৎ থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই কহিতেন এত বড় অদ্ভুত, বিরাট এবং উদার চিত্তও কম দেখা যায়—এমনধারা চিত্ত যাহাতে চিত্ত-দেবতার আসন পর্য্যন্ত আঁটিয়া যায়।

ভগবান যেন তাঁহাকে অদ্ভুতকর্ম্মশক্তি দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যেখানে দেখিবে অন্ধকার গভীর হইয়া উঠিয়াছে, অন্যায় ন্যায়কে দমন করিয়া আছে, অন্ধ সংস্কার সত্যকে মলিন করিয়া দিতেছে, সেইখানে হে আমার বরপুত্র! সেইখানে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। সেইখানে তোমার বিষাণ বাজিবে, সেইখানে তুমি তোমার অপূর্ব্ব বলশালী হস্তের দ্বারা নূতনকে পুরাতনের মধ্য দিয়া সৃজন করিয়া তুলিবে, ঝড় যদি উঠে, ঝঞ্ঝায় যদি চতুর্দ্দিক ধূলিময় হইয়া যায়, তবুও!

তাই রামমোহনের প্রতিভা এমনি বিশ্ববিস্তৃত, এমনি বেগশীল! রাজারই মত তাহা উদ্দাম, অবাধ! ১৭৯০ সালে—১২০ বৎসর

পূর্ব্বে, একজন ষোল বৎসরের ছেলে ধর্ম্মের তৃষ্ণায় ভারতবর্ষ পার হইয়া : তুষার-মণ্ডিত উচ্চতম পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে গিয়াছিল —এ কথা এই রেলের দিনেও আমাদের বিশ্বাস হয় না, এটা এমনি অসম্ভব—কিন্তু রামমোহনের পক্ষে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন ধর্ম্ম অবনত হইয়া পড়িতেছে,—তাই কোনও দিক লক্ষ্য না করিয়া তাহারই সংস্কারে ধাবমান্ হইলেন,—চিত্তের মধ্যে আগুন তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তিনি কিছুতেই আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না! এমন করিয়া উন্মত্ত না হইতে পারিলে পৃথিবীতে কোন চিরস্থায়ী কাজ হয় না। সমাজের বাধা, তাঁহার পক্ষে তুষার-মণ্ডিত হিমগিরি অপেক্ষা অল্প দুর্জ্জয় ছিল না, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বার হৃদয়কে তাহাও কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

এই দুর্ব্বার হৃদয়ের অপ্রতিহত শক্তির বলে তিনি সতীদাহ-প্রথা নিবারণের উপায় হইয়াছিলেন, দেশে যখন অবিদ্যার বিস্তৃতি তখন হিন্দুস্কুল স্থাপনের কারণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের-সংস্কারের জন্য বেদোপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া ফেলিতে হইয়াছিল।—কিন্তু তাহা শুদ্ধ উপায়-মাত্র; তাহাতেই তাঁহার জীবনের কর্ম্মের অবসান না হইয়া তাঁহার কর্ম্মের পথমাত্র হইয়াছিল। সমাজেও তাঁহার সংস্কার অল্প নহে, এমন কি তিনি হিন্দুর চিরাগত আইনের পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে সুপ্রীমকোর্টের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। বইয়ের পর বই লিখিয়া হিন্দুর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন—আবার যখন পাদরী আসিয়া উপনিষদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছে তখন তিনি তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার উপর সকলের অসীম বিশ্বাস ছিল,—মুসলমান বাদসাহের পক্ষ হইতে তিনি প্রিভি-কাউন্সিলে তাঁহার অধিকার-চ্যুতির বিপক্ষে আবেদন করিতে যান। আবার ইংরাজ গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকিলে তিনি না যাওয়ায় গবর্ণর জেনারেল বলিয়া পাঠান "বলগে লর্ড বেন্টিঙ্ক গবর্ণর-জেনারেল নহে—মিষ্টার বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে ডাকিতেছেন।"

তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষায় কৃতিত্বের ইতিহাসও এইরূপ! বাঙ্গালা সাহিত্য অথবা ভাষাকে বড় করিব বলিয়া তিনি কোন-দিন চেষ্টা করেন নাই, অন্তরের ভাব-বহ্নি যখন প্রকাশোন্মুখ হইল, তখন ভাষা তাঁহার হাতে গড়িয়া উঠিল। ভাষা যদি সকলে না বোঝে, তাই ব্যাকরণ লেখা হইয়া গেল! চিত্তের মধ্যে যে অনির্ব্বাণ আগুন সঞ্চিত ছিল, তাহা এই ভাষার পথে ব্যাকরণের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র "সংবাদ কৌমুদী" ও উর্দ্দু সংবাদ-পত্র এবং তাঁহার লিখিত ভূগোল ও জ্যামিতির প্রকাশেরও ইতিহাস এইরূপই। তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাই তাহারা ফুটিয়া বাহির হইল। উদ্দেশ্য সেই সঞ্চিত আগুনকে অন্ধকারের স্তূপের উপর জীর্ণতার সমষ্টির উপর জ্বালাইয়া তোলা,—ভাষা এবং ভাব, অধ্যয়ন ও বিদ্যা, তর্ক ও বিতর্ক তাহার উপায় মাত্র।

অথচ সংযমের অভাব ছিল না। লোকে যখন তাঁহাকে কুবাক্য বলিত, তিনি শান্ত সংযত হইয়া থাকিতেন, কেননা নিজের জয়কে

কোন দিন তিনি বড় করিয়া দেখেন নাই,—সত্যের জন্যই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার একটা মন-গড়া নূতন-ধর্ম্ম নহে। তাহা উপনিষদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্ম। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন বিষয়ে তাঁহার মতন অগ্রণী আর কেহ ছিলনা, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন কমিটিতে তিনি থাকিলে ক্ষতির সম্ভাবনা, তখন স্বেচ্ছায় কমিটি ত্যাগ করেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল মত ছিল না, তিনি কহিতেন এ বিষয়ে নিজের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে সহজেই উদ্দাম হওয়ার সম্ভাবনা—সুতরাং কোন একটা ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়া উচিত। এবং তাঁহার মৃত্যুতেও এই বিশ্বজনীনতাই পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা দেশে জন্মিয়াও যে তিনি শুধু বাঙ্গালার নহেন, তিনি যে বিশ্বের তাহা মৃত্যুর দ্বারা দেখাইয়াছেন। ব্রিষ্টল নগর তাঁহার শব বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি শুধু ব্রিষ্টল নগরের নহেন, তাই ব্রিষ্টলের মত জার্ম্মনীও ধন্য, ফ্রান্সও ধন্য এবং নিরতিশয় ধন্য আমাদের বাংলা দেশ! বাংলা তাঁহার জল মাটির আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত করিয়া যে এমনি একটি উদার উন্নত মহাপুরুষকে বিশ্বের মাঝখানে অপূর্ব্ব বাণী ও অদ্ভুত বীরতার সহিত পাঠাইতে পারিয়াছে; ইহা অপেক্ষা আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ এই মহাপুরুষের সাম্বৎসরিক মৃত্যু-দিনে সমবেত আমরা সম্ভ্রমের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত বিনয়ের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করি; এবং এই সভায় অলক্ষ্যে সমাগত তাঁহার প্রেমময় মঙ্গলময় আত্মাকে প্রণাম করি।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায় ও ধর্ম্মের আদর্শ।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে ভারতই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এ বিষয়ে একই মত শুনা যাইতেছে। আমাদের এই ধনরত্নপূর্ণ ভারতে অনেক ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চনদের উপকূলে আর্য্যদিগের আগমন অবধি আজ পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মবীর, এদেশে আপনাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মকে এক বিকট আকারে মানবসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকে ত্যাগস্বীকারের কারণ বলিয়া কৃচ্ছ্র-সাধনে শরীরকে নষ্ট করা, ইত্যাদি বিষয়-সকল ধর্ম্মসাধনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মশিক্ষা এ বিষয়ে একই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভারতের বৈদিক যুগের কথা স্বতন্ত্র। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, আমাদের আর্য্যগুরুরা প্রকৃতিকে আনন্দের চক্ষে দর্শন করিতেন। সূর্য্যের নবজ্যোতি, বিকশিত কুসুমরাজি, মেঘমালা দর্শনে ময়ূরের নৃত্য, বর্ষাকালে

ভেকের ডাক, সকলই তাঁহাদিগের নিকট আনন্দকর বলিয়া বোধ হইত।

দার্শনিক যুগে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মানব কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

পুলকিত জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া যেমন চন্দ্রের জ্যোতিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বৈদিক সময়ের পর যখন বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধর্ম্ম যেন বিষাদময়ী হইয়া, ভারতের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিলেন। দুঃখবাদের বার্ত্তা ভারতে প্রচারিত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম বিষাদের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া আমাদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইলেন। ত্যাগই ধর্ম্মের কষ্টি-পাথর,—কৃচ্ছ্রসাধনই ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল।

হায়! আবার কি কুক্ষণেই বেদান্তের মায়াবাদ ঘোষিত হইল,—আমরা এখনও পর্য্যন্ত সে প্রহেলিকা ভেদ করিতে সমর্থ হইলাম না,—সে যাদুমন্ত্রের মোহিনী শক্তি এড়াইতে পারিলাম না। শঙ্করের বেদান্তমত বামহস্তে মানবকে সংসারের সুখ সম্ভোগের বস্তু হইতে ঠেলিয়া দিয়াছেন, এবং "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারোয়ং অতীব বিচিত্র।" এই বৈদান্তিক বচনে বহু লোকের কোমল প্রাণকেও পাষাণ নির্ম্মিত করিয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধ ও শঙ্কর-মতের ধূয়া ধরিয়া, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকেরা ধর্ম্মকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেই প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

বহুকালাবধি ভারতে মায়াবাদ ও ধর্ম্মের কুসংস্কার চলিয়া আসিতেছিল এমন সময়ে এক মহান্ পুরুষ এই ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি যে আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিলেন, তাহা অতি উচ্চ। উহার অনুকরণে জীবনের সকল দিকই বিকশিত হইয়া উঠে। অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রামমোহন রায় বেশ বুঝিয়াছিলেন যে মানব জীবনের সকল দিক যথাযথরূপে উৎকর্ষ লাভ না করিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে মানুষ দূরেই বাস করিয়া থাকে।

রামমোহন রায়ের ন্যায় এত বড় ধর্ম্ম সংস্কারকেও আমরা অবতার বলিয়া স্বীকার করি না। কারণ আমরা প্রচলিত অবতার বাদের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া, যাঁহারা এদেশে অবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন আমরা রামমোহন রায়কে তাঁহাদের অপেক্ষা সামান্য মনে করি না।

পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত রামমোহনের মতের মূলগত পার্থক্য এই যে, রামমোহন রায় আদৌ সন্ন্যাস ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। শরীর উপেক্ষার বস্তু নয়, উহা যে জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের ভিত্তি-স্বরূপ, তাহা রামমোহন রায়ই আমাদিগকে এ যুগে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম শরীর মনের পক্ষে কল্যাণ-কর নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে ধর্ম্মসমাজে এই অস্বাভাবিক প্রথার প্রচলনে ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ভগবান প্রদত্ত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিতে যাওয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতার

কার্য্য! পাশ্চাত্যদেশে রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নরনারী সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চতর ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, ভগবানের সেবায় দেহমন নিয়োগ করিবেন বলিয়া, কৌমার কৌমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই ব্রতের বিষময় ফল সতত দর্শন করিয়া, কোন সুপণ্ডিত চিকিৎসক লিখিয়াছেন "The superhuman is sure to become inhuman sooner or later" অর্থাৎ এই অস্বাভাবিক দেবত্ব বিলম্বে বা অবিলম্বেই হউক সাধারণ মানবের নিম্নতর স্তরেই নিক্ষিপ্ত হইবে।

রামমোহন রায় দেখিলেন, ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যেরা সন্ন্যাসধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল নয় জানিয়া তিনি আমাদিগকে এই সুখদুঃখময় সংসারকাননে বাস করিয়া পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কাননের প্রস্ফুটিত গোলাপে ও শিশুর মিষ্ট হাসিতে পরমেশ্বরের আনন্দজ্যোতি দর্শন করিতে বলিয়াছেন। সংসারে বাস করিয়া যে ব্রহ্মসাধন সম্ভবপর, তাহা রামমোহন রায়ই এ যুগে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান তাঁহাকে যেমন তীক্ষ্ণ ও প্রখর বুদ্ধি দান করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি তাঁহাকে সবল ও সুস্থদেহও প্রদান করিয়াছিলেন, রামমোহনও ভগবানের এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়া শরীররক্ষাকেও ধর্ম্ম বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। ভারতে একেশ্বরবাদ ঘোষণার জন্য, যখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহার প্রাণবিনাশের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "কলিকাতার লোক কি খায় যে আমায় মারিবে?"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাজার বিষয়ে যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিতেন, তাহার একটি এখানে প্রকাশিত হইল। মহর্ষি বলিতেছেন,—

"একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের সময় মধু দিয়া রুটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'বেরাদার আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।'—কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময় তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সকল শক্ত ছিল। তৈলমর্দ্দিত অনাবৃত দেহে, কটিদেশের চতুঃপার্শ্বে একখণ্ড বস্ত্রমাত্র; এই প্রকার মূর্ত্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার ভীতির সঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্ব্বক পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্পপ্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘণ্টারও অধিককাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতা সকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল কবিতার ভাবে মগ্ন হইয়া যাইতেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত যে সকল কবিতা,

উচ্চারণ করিতেন আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমার তখন বোধ হইত যে উহাই তাঁহার উপাসনা ছিল।"

মস্তিষ্ক উত্তমাঙ্গ বলিয়াই ঋষিরা বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ ঐ স্থান হইতেই মানবের চিন্তা প্রসূত হয়। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক উচ্চচিন্তার অধিকারী হইতে পারে না। মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে শরীর যে তাহার প্রধান ভিত্তি, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সমাজের অধিকাংশ দুর্নীতির কার্য্য দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হয়। যাঁহারা লোককে সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিবার প্রয়াসী হন, তাঁহারা অনেকে মনে করেন যে, অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীরকে নির্যাতন না করিলে, মানব ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইতে যে সকল ধর্ম্মচিন্তা প্রসূত হইয়াছে, তাহা অনেক স্থলেই সারবত্তাবিহীন।

শাক্যমুনি বুদ্ধগয়ায় ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, এবং এ অবস্থায় অনশনে, কখন বা যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। অবশেষে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিয়া কোন ফল হয় নাই।

ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিদিগের কথা বাদ দিলে আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা প্রায় কেহই উচ্চজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ঋষিরা জ্ঞানের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহারা পরা ও অপরা বিদ্যা, এই দুইটি পৃথক করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য বিদ্যা যে ব্রহ্ম বিদ্যার সহায়ক সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ আস্থা প্রদান করেন নাই। তৎপরে যে সকল ধর্ম্মসংস্কারকদিগের বাক্য ও জীবনের প্রভাবে ভারতের অসংখ্য নরনারীর জীবনের গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই সাহিত্য বা বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া তদ্বিষয়ের অনুশীলনে আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন নাই। চৈতন্য নিজে ন্যায়শাস্ত্রে, তাৎকালিক নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও, পরে ভক্তির উচ্ছ্বাসে সে বিষয়ের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানকে ভক্তি অপেক্ষা নিম্নতর স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে একবার গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন "জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়?" অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলায়, গৌর ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্বৈতের পৃষ্ঠে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় পরা ও অপরা এই দুয়েরই উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নানা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, যেমন ব্রহ্ম-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তেমনি বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তদ্বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে ভারতের শাসনকর্ত্তা লর্ড আমহার্ষ্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা চিরদিনই ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত থাকিবে। তিনি ভারতের সেই তিমিরাচ্ছন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এত উচ্চ আদর্শ কিরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কেবল মানবের আত্মার রাজা নহেন, তিনি জড়রাজ্যেরও রাজা, জড়বিজ্ঞান ও আত্মার জ্ঞান লাভেই আমরা ক্রমে উচ্চতর ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উপনীত হইতে পারি। একটি বাদ দিলে অপরটি প্রকৃতরূপে আমাদের আত্মাকে উন্নত করিতে সমর্থ হয় না।

অকূল সাগরপথে যাইবার সময় কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে এই বাষ্পীয়যানের দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রটি অথবা ষ্টিম অধিক প্রয়োজনীয়? এ প্রশ্নের উত্তরে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশ্য দুইটিরই আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন। কেন না, ষ্টিম না থাকিলে জাহাজ চলিবে না, কম্পাস না থাকিলে, জাহাজ গন্তব্যস্থানে না যাইয়া হয়ত বিপথগামী হইয়া পড়িবে। সংসার সাগরে জীবন-তরী চালাইতে হইলে, জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন। সকল জ্ঞানই আমাদিগকে সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে, ইহাই রামমোহন রায়ের কথা।

রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণ সাধনের পক্ষে রাজনীতির চর্চ্চাও বিশেষ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি ইংরাজ জাতির জ্ঞানানুরাগ, কার্য্যশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাদর করিতেন এবং ঐ সকল সদ্‌গুণ যাহাতে এ দেশের লোক অবলম্বন করিয়া, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি অন্য জাতির সদ্‌গুণ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সকল জাতিই যাহাতে আপনাপন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাই ইচ্ছা করিতেন।

যখন স্পেনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি কলিকাতা টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাইবার সময় ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে—দেখিয়া,উহাকে অভিবাদন করিবার জন্য আগ্রহের সহিত ডেকে উঠিবার সময় পড়িয়া গিয়া একখানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সে খঞ্জতা তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহন করিতে হইয়াছিল। যখন ফ্রান্সে স্বাধীনতা লাভের জন্য ঘোরতর অনল শিখা জ্বলিয়া উঠিল, যখন সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও স্বাধীনতার (Equality Fraternity and Liberty) রবে ফ্রান্সের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তখন রামমোহন রায় এই সংবাদে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রুধির ধারায় জমি অনুরঞ্জিত হয় সে জন্য নয়, কিন্তু নরনারী যাহাতে স্বাধীনতার সুখভোগ করে তিনি তাহাই দেখিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

তিনি ভারতের প্রধান দার্শনিক ছিলেন। তিনি বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদের প্রচলিত মতের খণ্ডন করেন, এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পরব্রহ্ম মানবের উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনায় মানব অন্তরে আনন্দের উৎস উৎসারিত হয়, তিনি বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সত্য কোন দেশে, কোন ব্যক্তিতে বা শাস্ত্রে যে আবদ্ধ নহে, এই মহাসত্য তিনিই ভারতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। চিকাগোতে যে প্রথম ধর্ম্ম সম্মিলন হয়, তাহাতে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা

ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই সত্য আছে। রামমোহন রায় যে বহুদিন পূর্ব্বে এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, ভারতের কোন প্রসিদ্ধ বক্তা উক্ত সভায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়াছিলেন, তাহা বোধহয়, এখন আর কাহারো অবিদিত নাই। এইজন্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে তাঁহাকে Comparative Theologyর জন্মদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ভারতের ধর্ম্ম নয়, উহা জগতের ধর্ম্ম উহা সার্ব্বভৌমিক। তিনি একবার অশ্রুসিক্ত নয়নে কোন লোককে বলিয়াছিলেন, "Brother, my religion is universal. ভ্রাত, আমার ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক!" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে কত আঘাত পড়িয়াছে, এখনও পড়িতেছে, এবং ভবিষ্যতে কতই না পড়িবে কে জানে? তবে যে ধর্ম্মের প্রাণ সেই জগতের আদিকারণ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত, যে ধর্ম্ম কোন দেশে কোন শাস্ত্রে বা কোন ব্যক্তিতে আবদ্ধ নহে তাহার বিনাশ অসম্ভব। যে ধর্ম্ম উচ্চতর জ্ঞানকে সদাই আপনার সাথী করিয়া আপনার উদারতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত সে ধর্ম্ম চিরদিনই আপনার পরিত্রাণের বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব মনের উচ্চতম চিন্তার ফল স্বরূপ। "It is the science of manhood."

ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে আমরা চিরদিনই রাজা রামমোহন রায়ের হস্ত দেখিতে পাইব। তিনি যে কেবল ভারতের নানাবিধ কল্যাণসাধনে রত ছিলেন তাহা নহে, তিনি মানব জাতির সম্মুখে এক বিশাল আদর্শ ধরিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলারের কথানুসারে তিনি "Prince, Real Raja, First man and the man of the helm. অর্থাৎ, তিনি রাজা, প্রধান পুরুষ ও সমাজের কর্ম্মধারস্বরূপ।" স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান সময়কে রামমোহন রায় যুগ বলিয়াই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

রাজার জীবনী রচয়িত্রী ইংলণ্ডের কুমারী কলেট, রামমোহন রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"There can be little doubt that whatever future the destinies may have in store for India, that future will be largely shaped by life & work of Ram Mohan Roy."

"অর্থাৎ, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই যে ভারতের ভবিষ্যৎ বহুলরূপে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আদর্শেই গঠিত হইবে।"

উপসংহারে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের লেখনী হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। অক্ষয়বাবু, তাঁহার সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে রাজার কীর্ত্তিকাহিনী অবলম্বনে যে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে চিরদিনই অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে। তিনি বলিতেছেন, "তোমার উপাধি রাজা, জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার

মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিতসম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, এতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা পতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।"

শ্রীশশিভূষণ বসু।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

(গ)। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদির প্রামাণ্য বিচার।

অপরদিকে আত্মা বা ব্রহ্ম যদি স্বপ্রকাশই হয়, এবং আত্ম-প্রত্যয় দ্বারাই যদি আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তবে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রয়োজন কি? শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যের প্রথম সূত্রেই বলিতেছেন:—"ব্রহ্ম যদি আত্মরূপে লোক-প্রসিদ্ধই হন, তবে তাহাত সকলেরই জানা আছে। অতএব ব্রহ্ম লোকের জিজ্ঞাসার অযোগ্য। কিন্তু তাহা নয়, তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে লোকের মধ্যে অসংখ্য বিরুদ্ধ মত রহিয়াছে। যথা, অশাস্ত্রজ্ঞ লোক এবং লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাক্) বলে যে 'চৈতন্যযুক্ত দেহমাত্রই আত্মা।' বেদ-বিরোধীরা কেহ বলে 'চেতনাযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা'। কেহ বলে, 'মনই আত্মা'। কেহ বলে, 'ক্ষণিক-বিজ্ঞান-মাত্রই আত্মা।' কেহ বলে, 'শূন্যই আত্মা'। কেহ (নৈয়ায়িকাদি) বলে, 'আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, সংসারী, কর্ত্তা, এবং 'ভোক্তা'। কেহ (সাংখ্য) বলে, 'আত্মা কেবল ভোক্তাই, কর্ত্তা নয়'। কেহ (যোগমত) বলে, 'আত্মা হইতে ভিন্ন, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন।' কেহ কেহ (বেদান্তী) বলে, 'ভোক্তার আত্মাই ঈশ্বর।' এইরূপে নানা প্রকার ভ্রম-সঙ্কুল যুক্তি এবং শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া লোকে আত্মা সম্বন্ধে অসংখ্য বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেছে। বিনা বিচারে এসকল বিরুদ্ধ মতের যে কোন একটা আশ্রয় করিলে পরমার্থ-হানি এবং অনর্থ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।"

শঙ্করের মতে শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বিশেষতঃ বেদান্ত-বাক্যের আলোচনা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়:—"শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যতে।" তিনি এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন:—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং"—"আবেদবিৎ ব্রহ্ম মননে অসমর্থ"—(সূত্রভাষ্য-অ:২-পা:-১-সূ-৩)। তাঁহার মতে বেদ অপৌরুষেয়—

অতএব স্ববিষয়ে তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলিতেছেন:—"নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বেদের প্রামাণ্য প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ, যেমন-রূপ-প্রকাশ বিষয়ে সূর্য্যালোক আলোকান্তর-নিরপেক্ষ। স্মৃতি-প্রভৃতি পুরুষ-বচন শ্রুতি-প্রভৃতি মূলান্তরের অপেক্ষা করে। স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহাদের প্রামাণ্য বক্তার স্মৃতি সাপেক্ষ। এজন্যই স্মৃতি-প্রমাণের দুর্ব্বলতা। বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণের কোন স্থান নাই একথা বলাতে কোন দোষ —হয় না।" (ব্রহ্মসূত্র-অ-২। পা ১।সূ১)। তিনি পুনরায় বলিতেছেন:—প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ, অতএব প্রত্যক্ষ। প্রতিপাদ্য বিষয়ে স্মৃতি আশ্রয় প্রমাণান্তর সাপেক্ষ, অতএব অনুমান মাত্র।' তবে "জন-সাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণে অক্ষম। এজন্য তাহারা বিখ্যাত প্রণেতাদি-কৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে, এবং তদ্বলেই শ্রুতির অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি, তাহা বিশ্বাস করিবে না,—কারণ স্মৃতি-প্রণেতাদিগের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এজন্য স্মৃতি অনুসারেই বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়।" কিন্তু স্মৃতিসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে:—যথা, কপিল ঈশ্বর-কারণ-বাদে আপত্তি করিতেছেন, এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক স্মৃতি ঈশ্বরকেই জগতের কারণ এবং উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য দিকে দেখা যায়, ঈশ্বর-কারণ-বাদই শ্রুতির তাৎপর্য্য। স্মৃতি সকলের মধ্যে যখন এবিষয়ে পরস্পর বিরোধ, তখন আমরা স্মৃতি বিশেষের মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্মৃতি-বিশেষের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য। এরূপ বিরোধ স্থলে শ্রুতির অনুসারী স্মৃতি-সকলই প্রমাণ, এবং অন্য গুলি অগ্রাহ্য। এজন্য প্রমাণ লক্ষণে জৈমিনি বলিতেছেন:—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানমিতি।" (সূত্র-ভাষ্য-অ-১।সূত্র-১।) ইহার অর্থ এই:—"শ্রুতির সহিত বিরোধ দৃষ্ট হইলে স্মৃতির প্রামাণ্য আদর যোগ্য নয়। কিন্তু শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে, মূল শ্রুতির তাৎপর্য্যের অনুমাপকরূপে স্মৃতিও প্রমাণরূপে গণ্য।"

অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার সূত্র-ভাষ্যে বলিতেছেন:—"ব্রহ্ম-সূত্রের উদ্দেশ্য বেদান্ত-বাক্যরূপ কুসুম সকল একত্র গ্রথিত করা। এজন্যই বেদান্ত-সূত্রে বেদান্তবাক্য সকলের উল্লেখ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য বিচার করা হইয়াছে। অর্থ-বিচারণা পূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা ব্রহ্মাবগতি সাধিত হয়। অনুমানাদি প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মাবগতি সাধিত হয় না। তবে জগতের জন্মাদির কারণবাদী বেদান্ত-বাক্য সকল রহিয়াছে। সেই সকল শ্রুতি-বাক্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অর্থ সম্বন্ধে সংশয়-নিবৃত্তি, এবং নিশ্চয়তা সাধন দ্বারা বেদান্ত-বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য অনুমানও বেদান্ত-বাক্যের অবিরোধী প্রমাণ, অতএব অনুমান নিষিদ্ধ নয়। শ্রুতি স্বয়ংই তর্ক করিতে উপদেশ দিতেছে; যথা, "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ।" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি। পুরুষ-বুদ্ধি যে আত্মজ্ঞানের সহায় তাহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন

হইতেছে। ধর্ম্ম বা বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির জ্ঞানলাভ বিষয়ে যেমন শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে সেরূপ নয়। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি এবং অনুভবাদি যেখানে যাহা সম্ভব, উভয়ই প্রমাণ। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ভূতবস্তু বিষয়, এবং অনুভবই তাহার একমাত্র লক্ষ্য"। তিনি আবার বলিতেছেন:— "কোন বস্তু সম্বন্ধে, "ইহা এইরূপ" এবং "এইরূপ নয়" অথবা ইহা 'আছে' এবং 'ইহা নাই' যুগপৎ এইরূপ বিকল্পনা বা বিরুদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয় (Law of contradiction)। কোন বস্তু-বিষয়ক ঈদৃশ বিকল্পনা লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ, কিন্তু সেই বস্তু বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লোকবুদ্ধি সাপেক্ষ নয়। তবে কি? তাহা বস্তু-তন্ত্র, অর্থাৎ বস্তুর উপরেই নির্ভর করে। একটা খোঁটা (স্থানু) দৃষ্টে, যদি একজন মনে করে "ইহা হয় একটি খোঁটা না হয় একজন মানুষ, না হয় অন্য কিছু" তবে এরূপ সংশয়-যুক্ত জ্ঞান লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ। তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। খোঁটা দেখিয়া তাহাকে মানুষ অথবা অন্য কিছু জ্ঞান করা মিথ্যা জ্ঞান। "ইহা একটি খোঁটাই" এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এবং তাহা বস্তুতন্ত্র। এইরূপে ভূতবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান প্রামাণ্য বস্তুর অধীন। অপরাপর সকল বস্তু সম্বন্ধেই এরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানও ভূতবস্তু-বিষয়ক-জ্ঞান, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তু-তন্ত্র।" এখন এরূপ কেহ আপত্তি করিতে পারেন:— ব্রহ্মজ্ঞান যদি বস্তুতন্ত্র ভূতবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণান্তরেরই বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার নিষ্প্রয়োজন।" "তাহা নয়। ব্রহ্ম-ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের বিষয় নয়, অতএব ইন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্রহ্ম, সম্বন্ধে নয়। ব্রহ্ম যদি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হইত, তবে একটি কার্য্য দেখিলেই উপলব্ধি হইত "এই কার্য্য ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ।" কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্থূল কার্য্য মাত্র-গ্রহণেই সক্ষম। সেই কার্য্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি অন্য কাহারও সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র কোন অনুমানকে লক্ষ্য করে না, কিন্তু "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যকেই লক্ষ্য করে।"

যদিও শঙ্কর অনুমান অথবা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি তিনি অনুমান বা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিশেষ সহায় বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের ন্যায় তিনিও বিশ্ব-রচনার কৌশল দৃষ্টে, স্রষ্টার জ্ঞানময় চৈতন্য-স্বরূপের অনুমান করিতেছেন (Teleology)। "রচনানুপপত্তেশ্চানুমানং" (ব্রহ্মসূত্র-অ-২।পা-১।সূ-১)। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"সাংখ্যেরা তর্ক করিয়া থাকেন, সংসারে ঘট এবং শরাবাদির মৃদাত্মতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাহাদের রূপাদি-ভেদের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ বস্তু মৃত্তিকা। সেইরূপে সংসারে বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক যত প্রকার বস্তু-ভেদ আছে—তাহাদের সকলের সাধারণ ধর্ম্ম— সুখ, দুঃখ, এবং মোহাত্মকতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদেরও নিয়ত-পূর্ব্ব-

বর্ত্তী সাধারণ-বস্তু সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ত্রিগুণ 'প্রধান'। মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তেই অনুমিত হয় যে তাহা স্বয়ং অচেতন হইয়া, চেতন জীবের পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত।" সাংখ্যদিগের এই কথার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন, দৃষ্টান্ত-বলে স্থির করিতে হইলে দেখা যায়— কুলাল বা কুম্ভকারাদি চেতন পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে, অচেতন মৃত্তিকাদি পুরুষার্থ-সাধন-যোগ্য কোন পৃথক্ বস্তু-বিশেষ (বিকার) রচনা করে না। সংসারে দেখা যায়—গৃহ, প্রাসাদ, শয্যা, আসন, এবং বিহার-ভূমি প্রভৃতি সকলই প্রজ্ঞাবান্ শিল্পী দ্বারা সময়োচিত সুখ-প্রাপ্তি, এবং দুঃখ-পরিহারের উপযোগিতানুসারে রচিত হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও দেখা যায় নানাকর্ম্মফল ভোগের উপযোগী। এই পৃথিব্যাদি বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল, এবং নানা-জাতীয় শরীরাদি, সকলই যথাস্থানে সন্নিবেশিত বিবিধ অবয়বযুক্ত,—নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী। এই দৃশ্য জগৎ-রচনা যাহা অতি বিখ্যাত প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীরও কল্পনার অগোচর, অচেতন 'প্রধান' দ্বারা কিরূপে ভোগের উপযোগী। এই দৃশ্য জগৎ-রচনা যাহা অতি বিখ্যাত-প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীরও কল্পনার অগোচর, অচেতন 'প্রধান' দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? অচেতন লোষ্ট্র-পাষাণাদিতে কখনও এরূপ রচনা-কৌশল দৃষ্ট হয় না। কুম্ভকারাদি প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীদ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই মাত্র সাংখ্য-কথিত মৃত্তিকাদিতে বিশিষ্ট-আকার-যুক্ত রচনা দৃষ্ট হয়। অতএব সাংখ্যোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারেই অচেতন 'প্রধানের' উপরে চেতন অধিষ্ঠাতা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিচার শ্রুতির বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রুতির অনুকূল। কারণ এইরূপ বিচার দ্বারা (Argument form design and adaptation) জগতের কারণ চৈতন্যময় পুরুষ বা ঈশ্বর বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইজন্যই সূত্র করা হইয়াছে:—"জগৎরচনা অসম্ভব অতএব জগৎকারণ অচেতন'প্রধান', এরূপ অনুমান করা যায় না।"

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

রূপ ও গুণ।

১

গোধূলি সিন্দুর-মেঘ সুন্দর কেমন!
নাই কিন্তু গুণ লেশ তার;—
আঁখি ছলি' মুহূর্ত্তে মিলায়,—
তা'র পর(ই) নিবিড় আঁধার!

২

প্রাবৃটের গাঢ়কৃষ্ণ অভ্র রূপহীন;
হৃদে, কিন্তু, কিবা গুণ ধরে!
বরষিয়া সুশীত সলিল,
নিখিলের দাহ-তৃষা হরে!

আজ।

নয়নের দৃষ্টিমাঝে আছিলে যখন,
সশরীরী মূর্ত্তি তব পূজেছিনু তবে;
দৃষ্টির বাহিরে তুমি গিয়াছ এখন,
অশরীরী তোমা', অয়ি, পূজিতেছি এবে।
দেহের সম্বন্ধ আজ গিয়াছে মুছিয়া;
নিষ্কাম পূজি, গো, তোমা চোখের অশ্রু দিয়া।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

ঝুসি।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ছয়মাসকাল আমরা এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলাম ;—সেই সময়ই ঝুসি দেখিতে যাই।

ঝুসি পুরাতন প্রতিষ্ঠানপুরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত। এক সময়ে এই স্থানেই চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের রাজধানী ছিল,—পুরাণ-

ঝুসির পাহাড় ও এলাহাবাদের কোর্ট।

প্রসিদ্ধ পুরুরবা রাজা নাকি এইখানেই বাস করিতেন। কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে সম্ভবতঃ এই প্রতিষ্ঠানপুরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকদিন নহে মাত্র ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা কুমার গুপ্তের সময়ের ৪০টি মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছিল। কিম্বদন্তি এইরূপ

তেওয়ারিকা মন্দির (ঝুসি)
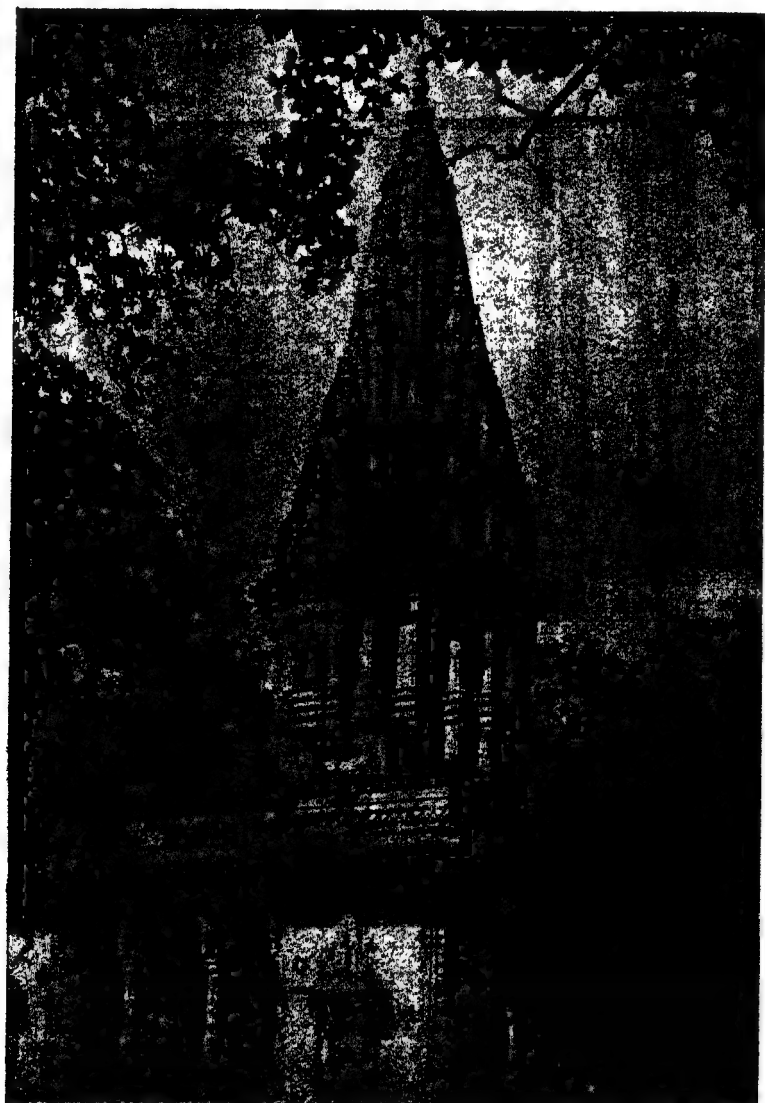
যে, হরবোং নামক একজন মূর্খ রাজার আমল হইতে প্রতিষ্ঠানপুরের অবনতি আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্ব কালে নাকি মুড়িমিছরির সমান দর ছিল। আমরা জানি এ ব্যাপার আমাদের হবুচন্দ্রেরই একচেটিয়া, কিন্তু এ দেশীয় প্রবাদ দেখিতেছি সেকথা মানিতে

চাহে না। সুখের বিষয় এই, এ প্রবাদের বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে ইতিহাস শুধু বলে—প্রতিষ্ঠান-পুরের অবনতিই প্রয়াগের উন্নতির কারণ। একদিকে ভাঙ্গন অন্যদিকে চর—প্রকৃতির নিয়মই এই।
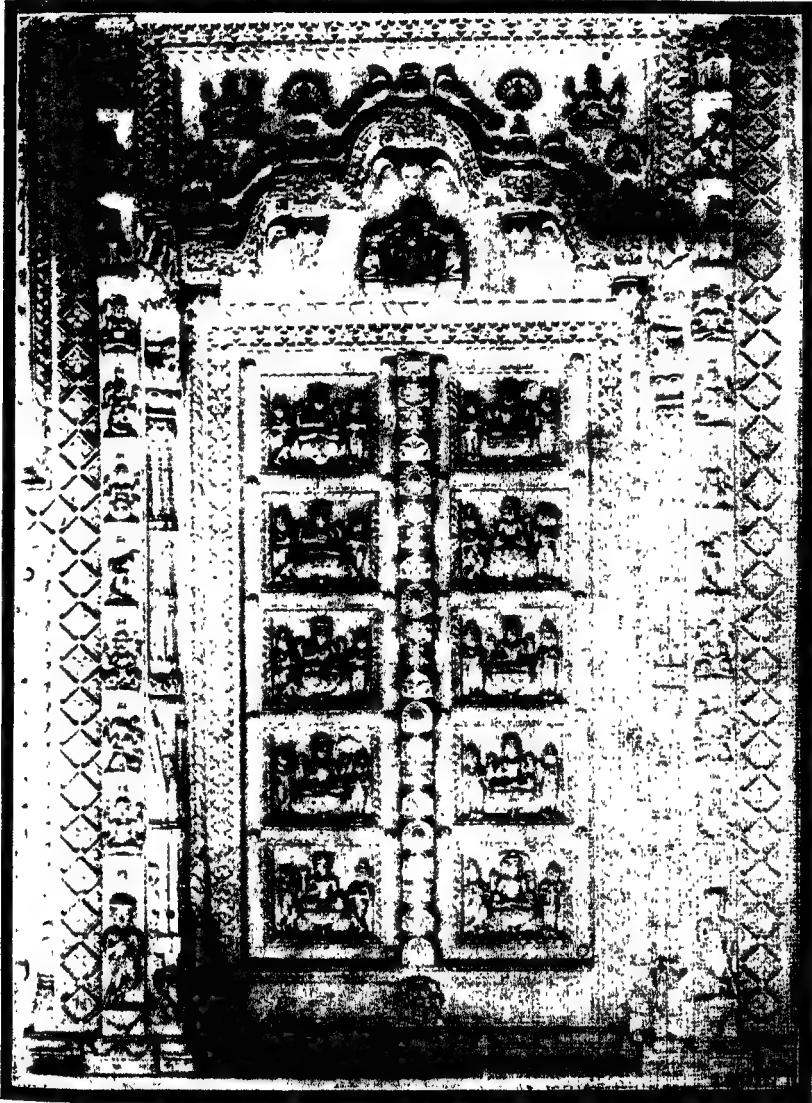
তেওয়ারিকা মন্দিরের দ্বার।

ঝুসি এলাহাবাদ হইতে তিন মাইল দূরে গঙ্গার পর পারে—ফোর্টের ঠিক সম্মুখভাগে অবস্থিত। এলাহাবাদ হইতে নৌকায় ঝুসি যাইতে হয়। নৌকা হইতে ইহার দৃশ্য কিরূপ,

সুন্দর পাঠক ঝুসির চিত্রে তাহার পরিচয় পাইবেন। কোন স্থানে স্মৃতিমাহাত্ম্যপূর্ণ পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কোথাও কয়েকখানি কুটীরের ক্ষুদ্র গ্রাম পল্লী, কোথাও বা গাছপালার মধ্যে একটি সমুচ্চ মন্দির আর পাহাড়ের শিখর দেশে তীরোত্থিত সিঁড়ি-

তেওয়ারিকা মন্দিরে ভীমের মূর্ত্তি।

সংলগ্ন একটি দোতালা ক্ষুদ্র ইমারত অতি দূর হইতে নজরে পড়ে। এখানে তখন একজন পরমহংস বাস করিতেন। আমরা তাঁহারই দর্শনে দুই তিন দিন ঝুসিতে গিয়াছিলাম।

পরমহংসের বাসস্থানের অনতিদূরে

তেওয়ারিকা মন্দির। দেখিলাম বহু যতি সন্ন্যাসী দালানপূর্ণ করিয়া বসিয়া পুঁথি পাঠ

করিতেছেন। পুরাতন বৈদিকযুগ সম্মুখে যেন মূর্ত্তিমন্ত বলিয়া বোধ হইল।

তেওয়ারিকা মন্দিরে অর্জ্জুনের মূর্ত্তি।

ঝুসির সমুদ্র গুপ্ত ও হংসগুপ্তের দুর্গ এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত, কিন্তু

তাঁহাদের নামীয় দুইটি কূপ এখনো এখানে বর্ত্তমান। সমুদ্রকূপের ছবি পূর্ব্বেই ভারতীতে

প্রকাশিত হইয়াছে; হংসকুপের উৎকীর্ণ লিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

ঝুসি দর্শন করিয়া আমরা সদলবলে আবার নৌকায় আসিয়া উঠিলাম। নৌকা হইতে

তেওয়ারিকা মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি।

গঙ্গার দুই পারের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। একদিকে ঝুসির পাহাড় ক্রমশঃ অল্পে অল্পে অবনত হইয়া কিয়দ্দূরের সমতল হরিৎক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে, শ্যামশস্যপূর্ণ গঙ্গার এই সমক্ষেত্র

তীর আবার কিছু দূরে আসিয়া যমুনার তীরের সহিত মিলিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপূর্ণ এই তীরদেশ দেখিলে সুখে দুঃখে উদাসীন নিষ্কাম সন্ন্যাসীর গম্ভীর মূর্ত্তি মনে পড়ে; আর ঝুসির পরপারে গঙ্গার বেণীঘাটের প্রতি চাহিলে তাহাতে লোভ কলহময় একটি সংসার
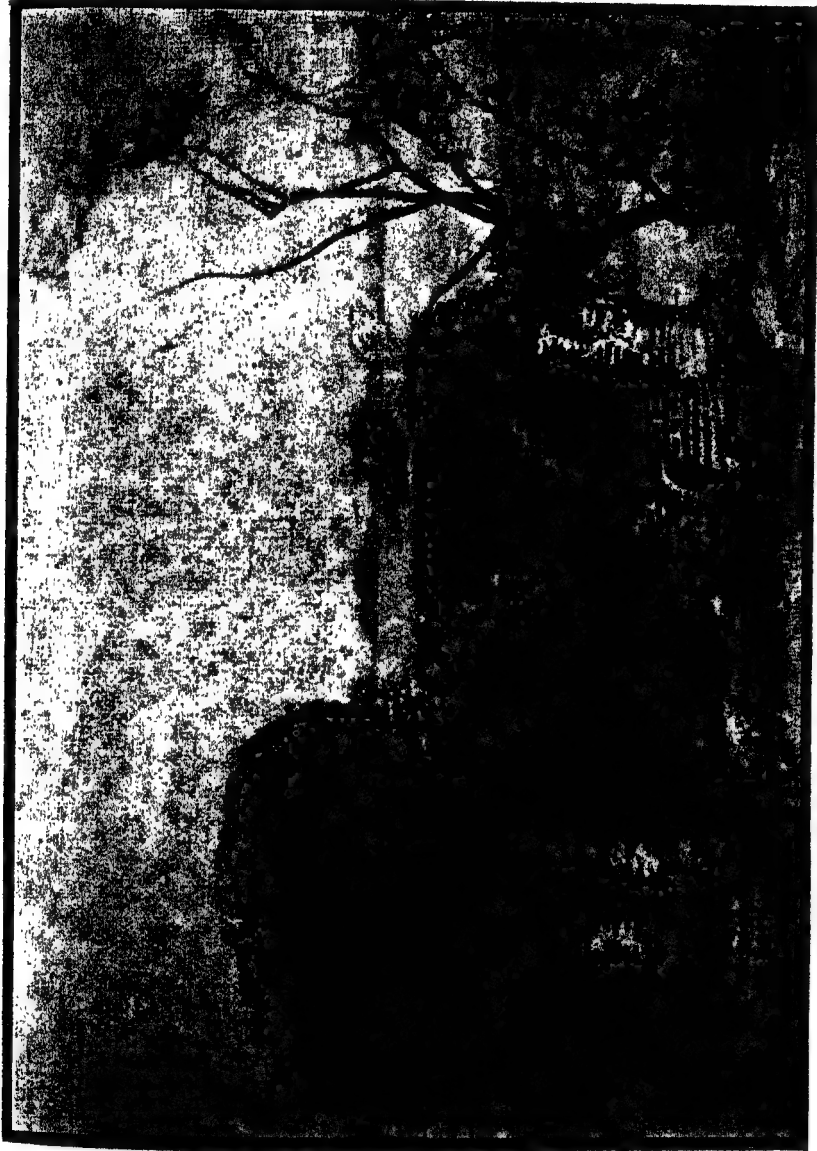
মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহৎ ঘাটতীর ... লোকে নিশানে নিশানে একাকার। ভিন্ন ভিন্ন নিশান দেখিয়া লোকে নিজের নিজের পাণ্ডা ঠিক করিয়া লয়। সেই

নিশানের মাঝে মাঝে ও গঙ্গার জলময় কূলে কূলে সারি সারি তক্তা পাতা। গঙ্গাস্নান করিয়া কেহবা তক্তার উপর বসিয়া ফোঁটা কাটিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছে, কেহবা তক্তাতে বসিয়া নীচের জল তুলিয়া তুলিয়া স্নান করিতেছে;
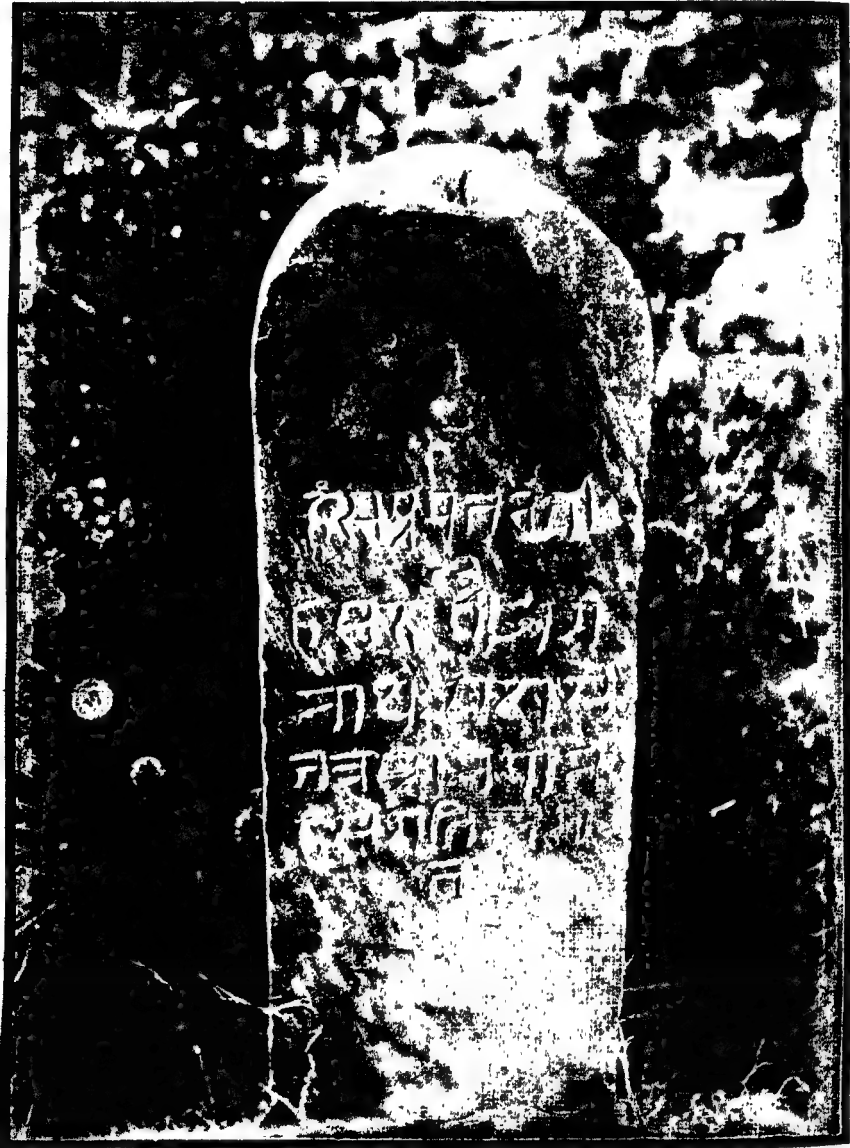
হংসকূপে উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলক।

আর গঙ্গারজলে ত সারবন্দী লোকের কথাই নাই।

গঙ্গার ঠিক ধারে—এমন কি জলের উপরেও মাঝে মাঝে এক একখানা

অস্থায়ী বন্দবস্তের আটচালা দেখিলাম, শুনিলাম তাহার একখানিতে সেরাজপুরের রাণী মকদ্দমা করিতে আসিয়া কল্পবাস করিতেছিলেন।

তীরে নানারকমের দোকান। নিশানের মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় তালপাতার ছাতির নীচে পাণ্ডারা এক একটা মাটীর ঢিবি ও পাথরের ঢিবিকে রংচঙে কাপড়ে ঠাকুর সাজাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। যাত্রীদের এই সমস্ত মূর্ত্তিকেই দক্ষিণা দিয়া যাইতে হয়। ইহা ছাড়া সত্যকার দোকানঘর ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ত অসংখ্য। যখন বর্ষাকালে এই তীর জলে ডুবিয়া যায় তখন পাণ্ডারা উপরে কোর্টে যাইবার উচ্চ রাস্তার ধারে দোকান তুলিয়া আনে। বর্ষাকালে ঠিক এই রাস্তার নীচে পর্য্যন্ত জল আসে। এখন গঙ্গা রাস্তা হইতে অনেক দূরে।

নৌকা হইতে নামিয়া এই রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সম্মুখে নীচে সুদূর প্রসারিত বালির চড়া ধূধূ করিতেছে, আর সেই বিশালচড়ার একপাশে অতি দূরে একটি সূক্ষ্ম রেখার মত গঙ্গা আঁকিয়া বাঁকিয়া যমুনার সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গগঙ্গা দেখিলে তাহাকে গঙ্গা মনে হয় না—সে যেন গঙ্গার একখানি ছায়া আর তার চারিদিকে সন্ধ্যার হেমাভধূসর বর্ণোজ্জ্বল দিক্‌বিদিক্ যেন একটা কাল্পনিক চিত্রার্পিত দৃশ্য বলিয়া বিভ্রম ঘটে।

চয়ন।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাটকের প্রথম উল্লেখ।

ললিতবিস্তার ও অবদান শতকের যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে নাটকের যে উল্লেখ আছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চীনদেশীয় তালিকা-অনুসারে, ললিতবিস্তার চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে, এবং অবদান-শতক খৃষ্টীয়যুগের ২২৩ ও ২৫৩ অব্দের মধ্যে চীনীয় ভাষায় অনুদিত হয়। (১) চীনীয় ঐতিহ্যের প্রামাণিকতা ও মূল্য সন্দেহের বিষয় হইলেও ইহা নিশ্চিত যে উক্ত দুই গ্রন্থ বিক্রমাদিত্য-যুগের ও সংস্কৃত প্রাচীন নাটকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী। যদি M. Weber ও M. Senart-এর নির্দ্ধারিত (২) কাল স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "হালের" সাক্ষ্য অনুসারেও আমরা তৃতীয় শতাব্দীতে উপনীত হই। "প্রাকৃতের সঙ্কলন" যাহা হাল-প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, সেই সঙ্কলন-গ্রন্থের ৩৪৪ শ্লোকে (৩) একটা নাটকে, নাটকীয় পূর্ব্বরঙ্গের সহিত (৪)

(১) Bunyin Nanjio চীনীয় ত্রিপিটক।

(২) Das Saptacakam des Hala, ed. Weber. p. XXIII. Senart, Inscreption de Piyudasi, 11, 527.

(৩) Ed. Weber = 293 of Bhubanpala.

(৪) Bai-Nadaa—Pubbaramgassa; দশরূপক II ৩৯ দ্রষ্টব্য।

প্রেমের তুলনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আর এক গ্রন্থ আমাদিগকে প্রাচীন যুগের প্রবেশ দ্বারে লইয়া যায়। ইহা মহাভারতের অন্তর্গত খিল হরিবংশ। হরিবংশ সুবন্ধু কর্ত্তৃক (ষষ্ঠ শতাব্দী) উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাতে দ্ব্যর্থবাক্যের ছড়াছড়ি,—তাঁহার সেই বাসবদত্তা-গ্রন্থে উক্ত কাব্যের নাম লইয়া একটা দ্ব্যর্থবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কলাপই এই হরিবংশের বিষয়। গ্রন্থকার উহাতে, বিবিধজাতীয় নাট্যাভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। নাট্যকলার ঐতিহাসিকগণকে তজ্জন্ত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে।

অন্ধকের মৃত্যুর পর, কৃষ্ণের প্রজাবৃন্দ সমুদ্রযাত্রা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়; এবং এই উৎসব উপলক্ষে বিবিধ নাট্যাভিনয় (৫) অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য গীতে নিপুণা নাগরীগণ যাদবদিগের চিত্ত হরণ করিল। সুললিত ভাবভঙ্গী ও আতোদ্য সহকৃত উহাদের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উহারা প্রমত্ত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে কুবের ও ইন্দ্রের প্রাসাদ হইতে, পঞ্চচূড়ার ভগিনীদিগকে আনাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "তোমরা যথাসাধ্য নিপুণতার সহিত দর্শকদিকের নিকট নৃত্যগীত বাদ্য ও অভিনয় প্রদর্শন করিবে......" এবং হ্রদের জলরাশি একটি সমগ্র ভূখণ্ডের ন্যায় যাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিল, সেই অপ্সরাগণ গীতবাদ্য করিতে লাগিল, এবং তাহারা স্বর্গে যেরূপ অভিনয় করিত সেই রূপ নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিল।

এই নাট্যাভিনয়ের পর আবার অন্যান্য বিনোদ-ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তাহার পর বলরামের উদ্দেশে অপ্সরাগণ দ্বিতীয়বার উৎসব আমোদ করিবার জন্য আগমন করিল:—"কেহ কেহ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা গান করিতে লাগিল এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া, দর্শকেরা মুগ্ধ হইল......; পরে সেই দেশের ভাষা, ভাবভঙ্গী ও পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়া, রাস-মণ্ডলের ধরণে (কৃষ্ণের উদ্ভাবিত মণ্ডলাকার নৃত্য) নৃত্য করিতে লাগিল...; পরে নৃত্য করিতে করিতে উহারা কংস ও প্রলম্বের মৃত্যু ও চানুরার পতন—এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে লাগিল... (মূল গ্রন্থে এই স্থলে কৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্যপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে।) শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমোদ দিবার ভার নারদমুনি গ্রহণ করিলেন; জটাজাল চূড়াকারে বন্ধন করিয়া, ব্রাহ্মণ একলম্ফে দর্শকদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন; এবং সং-এর মত ভাবভঙ্গী করিয়া, উদ্ভট ধরণে ব্যক্তি বিশেষের নকল করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে খুব হাসাইতে লাগিলেন; তিনি সত্যভামার, কেশবের, অর্জ্জুনের, বলদেবের, রেবত-নন্দিনী রাজকুমারীর নকল করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে লইয়া উপহাস করিতে লাগিলেন; তাহাদের ভাবভঙ্গী, তাহাদের সাজসজ্জা বর্ণনা করিয়া দর্শকবৃন্দের হাস্যোৎপাদন করিলেন।" পরে, যাদবেরা ভোজন-শালায় গিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন; "ভোজনান্তে অপ্সরাগণ আবার নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

কিন্তু এই সকল অভিনয় গীতমিশ্র নৃত্য

(৫) II ৮৮ ed. Bombay.

নাট্যের লক্ষণাক্রান্ত। আর একটি উপাখ্যানে —বজ্রনাভের মৃত্যু সম্বন্ধীয় উপাখ্যানে, আমরা প্রকৃত নাটকাভিনয়ের পরিচয় পাই। তপস্যার পুরস্কারস্বরূপ দানব বজ্রনাভ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া প্রায় অজেয় হইয়াছেন। স্বকীয় পরাক্রমের গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া তিনি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। "এই সময়ে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন, এই যজ্ঞোৎসবে ভদ্র নামক একজন নট্ সভাস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে সুনাট্যের ("সুনাট্যেন") দ্বারা মুগ্ধ করিলেন। মুনিগণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কী বর চাও? ইন্দ্র সদৃশ ভদ্র তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিল; আমি এই বর চাই সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমার অভিনয়ের রসাস্বাদন করেন এবং আমি সপ্তদ্বীপ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হই। আরও আমি ইচ্ছা করি, মৃত কি জীবিত যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, যথাযোগ্য বেশ ধারণ করিয়া আমি ঠিক তাহার অনুরূপ হইতে পারি।" ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন,—"তথাস্তু।" তখন ইন্দ্র স্বর্গের একটি হংসীকে বজ্রনাভের প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। দানব এই অপূর্ব্ব হংসীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। হংসী, নটরাজ ভদ্রের গুণ কীর্ত্তন করিল। বলিল, ত্রিলোক তাহার গুণে মুগ্ধ। বজ্রনাভ দলবল সমেত ভদ্রকে লইয়া আসিবার জন্য হংসীকে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন, দানবের রাজধানীতে প্রবেশ লাভ করিবার উদ্দেশে, ছদ্মবেশে সবান্ধবে যাত্রা করিলেন। প্রদ্যুম্ন নায়ক সাজিবেন; সাম্ব বিদূষক সাজিবেন; গদ পারিপার্শ্বিক সাজিবেন; এবং অন্যান্য ব্যক্তি অন্যান্য ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণা রূপসী বারাঙ্গনাগণ নটী হইবেন। "নটগণের আগমনে, নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উহারা প্রভূত সম্মান ও উপহার প্রাপ্ত হইল।" উহারা ("নাটকীকৃত") মহাকাব্য রামায়ণের উপাখ্যান অভিনয় করিল। রাবণের বধের জন্য ধরাতলে বিষ্ণুর জন্ম এবং যেরূপ লোমপাদ ও দশরথ শান্তার নিমিত্ত গণিকাগণ দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করিয়াছিলেন সেই বিষয়টি অভিনীত হইল। সেই অভিনয়ে নটেরা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার এরূপ অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল যে, তৎকালের বৃদ্ধ দানবগণও বিস্মিত হইয়াছিল এবং রূপ তুল্যতার বিষয় বারংবার বলিয়াছিল। তাহাদের বেশধারণ, অভিনয় প্রস্তাবনা এবং প্রবেশাদি দেখিয়া দানবগণ সকলেই বিস্মিত হইল। সেই অসুরেরা নাট্যের বিশেষ বিশেষ অভিনয় স্থলে পরম প্রীত হইয়া বিস্ময়সহকারে বারংবার উত্থিত হওত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল······এই অভিনয়ের পর নটেরা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রস্তাবিত অন্যান্য নাটকের অভিনয় করিয়া অসুর ও মুনিগণের মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আবার বজ্রনাভও উহাদের অভিনয় দর্শন করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। সেই সময়ে, মহাকালের উৎসব হইতেছিল। বজ্রনাভ একটা নাট্যশালা নির্ম্মাণ করাইয়া, সেইখানে ঐ নট-সম্প্রদায়কে অভিনয় করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন নটবেশধারী যাদবগণ সজ্জিত হইয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা প্রথমত কাংস্যতাল বেণু মুরজ প্রভৃতি আতোদ্য বাদন

করিলেন। তৎপরে যাদবগণআনীত নারীরা বলভাদি রাগসহযোগে রাগান্তরমিশ্র শুভ গান্ধাররাগ সুস্বরে গান করিল। রুক্মিণীনন্দন শোভন অভিনয়ান্বিত গঙ্গাবতরণাশ্রিত শ্লোক সম্যক্ গান করিলেন। তৎপরে রম্ভাভিসার নামক কৌবের নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। শূর রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন; এবং প্রদ্যুম্ন নলকুবর ও শাম্ব তাঁহার বিদূষক হইলেন। যদুনন্দনগণ মায়ার দ্বারা কৈলাস নির্ম্মাণ করিলেন। ক্রুদ্ধ নলকুবর কর্ত্তৃক দুরাত্মা রাবণ যেরূপ প্রতিশপ্ত ও রম্ভা যেরূপ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল তাহা অভিনীত হইল। যদুনন্দনগণ নারদ প্রণীত এই প্রকরণ অভিনয় করিলে দানবেরা যাদবদিগের নৃত্য ও অভিনয়ে পরম পরিতুষ্ট হইল।

মহাভারত ও রামায়ণের যে দুই স্থলে নাটক শব্দের উল্লেখ আছে সেই দুই স্থলের শ্লোক কোন্ সময়ে রচিত তাহা অনিশ্চিত এবং তাহার ভাবার্থও অতীব অস্পষ্ট—সুতরাং নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে উহার দ্বারা সবিশেষ কোন জ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

লানমো (রামগ্রাম)

লানমো রাজ্য অনেক দিন হইতেই পরিত্যক্ত ও জনশূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার সীমা নির্ণয় করা যায় না। নগরগুলির ধ্বংসাবস্থা এবং অল্পলোকই তথায় বাস করে।

প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণ পশ্চিমে একশত ফুটের কিছু কম উচ্চতাবিশিষ্ট একটী ইষ্টক স্তূপ আছে। পুরাকালে, তথাগতের নির্ব্বাণের পর, এই দেশীয় এক রাজা তথাগতের শরীরের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হন ও দেশে প্রত্যাগমন করিয়া এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে অত্যাশ্চর্য্য চিহ্ন দেখা যায় এবং মধ্যে মধ্যে ঐশ্বরিক আলো জ্বলিতে থাকে।

স্তূপের নিকটেই স্বচ্ছ বারিপূর্ণ একটি হ্রদ। কখনও কখনও একটী সর্প হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া এই স্থানে ভ্রমণ করে এবং সর্প দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ করে। বন্য হস্তীযূথ এই স্থানে সমাগত হইয়া পুষ্প সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে বিকীর্ণ করে। অবৈসর্গিক ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা প্রথম হইতেই এইরূপ করিতেছে। পুরাকালে যখন রাজা অশোক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ নির্ম্মিত স্তূপ সকল হইতে বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন লইয়া নূতন স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তখন তিনি এই দেশে আগমন করিয়া এই স্তূপের অভ্যন্তরস্থ চিহ্ন লইবার জন্য প্রস্তুত হন। ইহাতে মন্দির অপবিত্র হইবে মনে করিয়া, সর্প ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া রাজহস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ও রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, মহারাজ; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আপনার যথেষ্ট আসক্তি দেখা যায় এবং আপনি যথেষ্ট ধর্ম্মার্জ্জনও করিয়াছেন। আপনি কিছুক্ষণের জন্য শকটের গতি প্রতিহত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আবাসে আগমন করুন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার আবাস কোথায়? ইহা কি নিকটে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমি এই হ্রদের নাগরাজ। আমি শুনিয়াছি মহারাজ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আরও ধর্ম্মার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, সেই জন্য আমি আমার আবাসস্থল দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি।" রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যাবাসে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ তথায় উপবেশন করিলে পর,

নাগ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল "আমার অপকর্ম্মের জন্য আমি নাগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি; বুদ্ধের এই শরীর চিহ্ন পূজা করিয়া আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দোষ ক্ষালন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। রাজা যেন নিজেই অনুগ্রহ করিয়া শরীর-চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া পূজা করেন।" রাজা অশোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভীত হইয়া বলিলেন, "মনুষ্যের মধ্যে আমি এরূপ পূজোপকরণ কোন দিনও দেখি নাই।" নাগ উত্তর করিলেন "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে রাজা যেন স্তূপ বিনষ্ট করিতে না ইচ্ছা করেন।" রাজা যখন দেখিলেন যে তিনি নাগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না, তখন তিনি স্তূপ উন্মোচনে বিরত হইলেন। যেস্থানে নাগ হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তথায় উপরোক্ত মর্ম্মে এক খোদিত লিপি আছে।

এই স্তূপের অনতিদূরেই একটী সঙ্ঘারামে কয়েকজন যতি বাস করেন। তাঁহারা বিনয়ী ও অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু; একজন শ্রমণই সঙ্ঘের সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কোন যতি আগমন করিলে তাঁহারা বিশেষ ভদ্রতা ও বদান্যতার সহিত তাঁহাকে পরিচর্য্যা করেন; তিন দিবস তাঁহাকে নিকটে রাখেন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন।

প্রাচীন কিম্বদন্তি এইরূপ; পুরাকালে কয়েকজন ভিক্ষু দূরদেশ হইতে এই স্তূপ পূজার্থে এইস্থানে আগমন করিতে অভিলাষী হন। এইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা এক হস্তীযূথ দেখিতে পান। তাহাদের কোনটী দন্তে করিয়া লতাপাতা ও বিভিন্ন প্রকারের ফুল আনিয়াছিল কেহ শুণ্ডদ্বারা জল বিকীর্ণ করিতেছিল; এবং সকলেই স্তূপকে পূজা করিতেছিল। ভিক্ষুরা এই দৃশ্যে অত্যন্ত প্রীত ও মোহিত হইলেন। তাহাদিগের একজন এই স্থানে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অপর ভিক্ষুকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এইস্থানে যে সকল জিনিষ প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার তুলনায় আমার বহুবৎসরের পরিশ্রম অতি সামান্য। এই স্তূপে বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন থাকা প্রযুক্ত ইহার অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে হস্তীযূথ আকৃষ্ট হইয়া এই স্থানে জল বিকীর্ণ করে। এইস্থানে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া হস্তিগণ যে মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, সেই মোক্ষলাভ করিতে পারিলে প্রভূত আনন্দলাভ করিতে পারিব।" তাহারা উত্তর করিল এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন; তবে, আমাদিগের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে; সুতরাং এইস্থানে থাকিয়া তুমি মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে থাক এবং সদুদ্দেশ্য সাধন মানসে কিছুতেই বিরক্ত হইও না।"

তখন তিনি অন্যান্য ভিক্ষুগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ নির্জ্জন বাসে অতিবাহিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং সময়োপযোগী ফুল সংগ্রহ করিয়া ও সেই স্থানের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া মন্দির সুশোভিত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি অনেক দিন ধরিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন।

নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহার ইতিহাস শুনিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন; নিজেদের ধন ও মণিমুক্তা দ্বারা একত্রে ঐ সঙ্ঘারাম স্থাপন করিলেন। পরে, তাঁহারা ঐ ভিক্ষুকে এই সঙ্ঘারামের ভারার্পণ করিলেন। সেই সময় হইতে বিনাপ্রতিবন্ধকে একজন শ্রমণ এই মঠের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

এই মঠ হইতে পূর্ব্বদিকে ২০০ শত লি যাইয়া এক বৃহৎ বন মধ্যে আমরা রাজা অশোক নির্ম্মিত এক বৃহৎ স্তূপে উপস্থিত হই। এই স্থানেই রাজপুত্র নগর পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূল্যবান বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ও কণ্ঠহার দূরীভূত করিয়া সারথিকে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করেন। মধ্য রাত্রিতে নগর পার হইয়া রাজপুত্র উষাকালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধনে কায়মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কারাগার পরিত্যাগ করিয়া আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানে আমি আমার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়াছি।" এই স্থানেই তিনি তাঁহার

রথত্যাগ করিয়া ও মুকুটের মণি উন্মোচন করিয়া সারথিকে আদেশ করিলেন "এই মণি আমার পিতার নিকট লইয়া যাইয়া তাঁহাকে বল যে, আমি তাঁহার অবাধ্য হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিতেছি না কিন্তু আমি কাম রিপু বিসর্জ্জন দিতে ও অনিত্যের ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে সংসার পরিত্যাগ করিতেছি।

তখন ছন্দক উত্তর করিলেন "আরোহীশূন্য অশ্বসহ আমি কি প্রকারে প্রত্যাগমন করিব?" রাজপুত্র সারথিকে প্রবোধ দিলে, সারথি সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

স্তূপের পূর্ব্বদিকে যে স্থান হইতে ছন্দক প্রত্যাগমন করিয়াছিল তথায় একটী জম্বু বৃক্ষ আছে; উহার শাখা প্রশাখা নাই, কেবলমাত্র কাণ্ডই রহিয়াছে। ইহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ। এই স্থানেই রাজপুত্র নিজ কেশ কর্ত্তন পূর্ব্বক মূল্যবান পরিচ্ছদ ও প্রস্তরাদি সম্বলিত মূল্যবান কণ্ঠহার ত্যাগ করিয়া মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন। তত্রাপি তাঁহার পরিধানে একটী মূল্যবান ঐশ্বরিক পরিচ্ছদ ছিল। তিনি ভাবিলেন এই পরিচ্ছদেও আমার আবশ্যক নাই; ইহা কি প্রকারে পরিবর্ত্তন করিব।" এই সময়ে এক শুদ্ধবাস দেব মৃগচর্ম্মপরিধৃত ব্যাধের আকারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ তীর ও ধনু উত্তোলন করিলেন। রাজপুত্র নিজ পরিচ্ছদ উত্তোলন করিয়া বলিলেন "আমি তোমার সহিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে চাই। তুমি পরিবর্ত্তনে সম্মত হইলে বিশেষ সুখী হইব। ব্যাধ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। রাজপুত্র নিজ পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া উহা ব্যাধকে দান করিলেন। ব্যাধ ইহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় দেবদেহ ধারণ পূর্ব্বক পরিচ্ছদ সহ আকাশমার্গে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই স্মারক স্তূপের পার্শ্বেই, রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে রাজপুত্র নিজ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ছন্দকের হস্ত হইতে ছুরিকা লইয়া স্বয়ং চুল কর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবতাধিপতি শক্র পূজার্থ এই কেশ নিজ স্বর্গীয় প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে এক শুদ্ধবাস দেব ক্ষৌরকারের বেশ ধারণ করিয়া ও হস্তে ক্ষুর লইয়া রাজপুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি মস্তক মুণ্ডন করিতে পার? তুমি কি অনুগ্রহ করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিবে?" আদিষ্ট হইয়া ক্ষৌরকারবেশী দেব রাজপুত্রের মস্তক মুণ্ডন করিলেন।

রাজপুত্র কত বয়সে নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেহ কেহ বলেন যে সে সময়ে বোধিসত্ত উনবিংশ বর্ষীয় ছিলেন; কেহ বলেন যে তখন তাঁহার বয়স একবিংশ বৎসর ছিল এবং বৈশাখ মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অষ্টম দিবসে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মস্তকমুণ্ডনের স্মারকস্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এক মরুভূমির মধ্যস্থলে আমরা একটী ন্যগ্রোধ কুঞ্জে উপস্থিত হই। তথায় ৩০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। পুরাকালে তথাগতের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার শরীরচিহ্ন বিভক্ত হইয়াছিল তখন ব্রাহ্মণগণ কোন অংশ না পাইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া কয়লা ও ভস্ম নিজ দেশে লইয়া যায় এবং তাহাদেরই উপরে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। সেই সময় হইতে এই স্থানে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে; রুগ্নব্যক্তিগণ এই স্থানে আসিয়া প্রার্থনা ও পূজা করিয়া আরোগ্য লাভ করে।

চিতাভস্ম স্তূপের নিকটেই একটী প্রাচীন সঙ্ঘারাম আছে; এই স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে। এই মঠের উভয় পার্শ্বেই কয়েক শত স্তূপ আছে; তন্মধ্যে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপটীই বৃহৎ; যদিও এইক্ষণ ভগ্ন হইয়াছে, তত্রাপি ইহা উচ্চে প্রায় ১০০ শত ফুট।

এই স্থান হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া, বৃহৎ বন পার হইয়া বন্যবৃত, হস্তীযুথ ও দস্যুবাধ পূর্ণ রাস্তা দিয়া আমরা কুশীনগরে উপস্থিত হই।

কুশীনগর।

এই দেশের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে; নগর ও গ্রাম জনশূন্য ও পরিত্যক্ত। প্রাচীন রাজধানীর

ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি প্রায় ১০ লি স্থান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং নগরের রাজপথ জনশূন্য। রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সিংহদ্বারে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই ছন্দকের গৃহ ছিল। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবকে পূজা করিবার জন্য যে কূপ খনন করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানেও রহিয়াছে। যদিও বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তত্রাপি ইহার জল মিষ্ট ও পবিত্র।

নগরের ৩।৪ লি উত্তর পশ্চিমে, হিরণ্যবতী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে আমরা শালবনে উপস্থিত হই। এই বনে অত্যুচ্চ ৪টী শাল বৃক্ষ আছে; বুদ্ধদেব এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বৃহৎ বিহার আছে; তথায় বুদ্ধের নির্ব্বাণের একটী চিত্র আছে। মস্তক উত্তর দিকে করিয়া তিনি শায়িত আছেন; দেখিলে বোধ হয় তিনি নিদ্রিত। এই বিহারের নিকটেই রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ; যদিও ভগ্নদশায় তত্রাপি ইহা এক্ষণও প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তর স্তম্ভে তথাগতের নির্ব্বাণের কথা উল্লিখিত আছে; যদিও ইহার উপর খোদিত লিপি আছে, তথাপি ইহাতে কোন মাস বা তারিখ লেখা নাই।

প্রচলিত প্রবাদানুযায়ী তথাগত অশীতিবর্ষ বয়সে বৈশাখ মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধের পঞ্চদশ দিবসে নির্ব্বাণ লাভ করেন। আমাদের হিসাবানুযায়ী ইহা তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবসে পড়ে। কিন্তু সর্ব্বাস্তিবাদিগণ বলেন যে তিনি কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অষ্টম দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা আমাদের নবম মাসের অষ্টম দিনে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গণনা করে। কেহ বলেন যে ইহা দ্বাদশশত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল; কেহ ১৩০০, কেহ ১৫০০; কেহ বলেন যে নির্ব্বাণের পর নবশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে কিন্তু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয় নাই।

বিহারের নিকটেই একটী স্তূপ। এইস্থানে বোধিসত্ব ধর্ম্মাচরণকালীন পক্ষীদের দলাধিপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে এইস্থানে এক ঘন বন ছিল এবং ঐ বনে অনেক জন্তু ও পক্ষী নিজ নিজ কুলায় বা গহ্বরে বাস করিত। অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে একটী পক্ষী করুণাপরবশ হইয়া জলে অবগাহন পূর্ব্বক ও পরে ঊর্দ্ধদেশে উড্ডীয়মান হইয়া নিজ পালকের জল অগ্নির উপর ছিটাইতে লাগিল। ইহাতে দেবাধিপতি শক্র আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন "তুমি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছ কেন? ভীষণ অগ্নিতে বনজাত বৃক্ষাদি দগ্ধ হইতেছে: তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীব এ অগ্নির তেজ কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে?" পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" তিনি উত্তর করিলেন "আমি দেবাধিপতি শক্র"। পক্ষী উত্তর করিল "দেবতাধিপতি শক্র পুণ্যবান ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার প্রত্যেক ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। নিজ হস্ত মুক্ত ও বদ্ধ করিতে যে সময় আবশ্যক, সেই সময়ে তিনি এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অগ্নি ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে; সুতরাং এইক্ষণ বাক্যব্যয়ের সময় নাই।" এই বলিয়া পক্ষী পুনরায় নিজ পক্ষে করিয়া জল আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নির উপর জলবর্ষণ করিতে লাগিল। এই দৃশ্যে মোহিত হইয়া দেবতাধিপতি নিজ হস্তের তালুতে জল গ্রহণ করিয়া ঐ জল অগ্নির উপর বর্ষণ করিলেন এবং তাহাতেই অগ্নি নির্ব্বাপিত ও ধূমরাশি দূরীভূত হইল এবং সকল জন্তু রক্ষা পাইল। সেই সময় হইতে এই স্তূপকে অগ্নিনির্ব্বাপক স্তূপ বলে।

ইহার নিকটেই অন্য একটী স্তূপ। এইস্থানে বোধিসত্ব মৃগাকারে ধর্ম্মাচরণকালীন অনেক জন্তুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে এইস্থানে এক গভীর বন ছিল; সেই সময় তৃণে অগ্নি লাগিয়া এই বনে বাড়বানল হয়। বনস্থ পশু পক্ষী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। সম্মুখে বেগবতী নদী, পশ্চাতে

ভীষণ অগ্নি। এই নদীতে লম্ফ প্রদান করিয়া মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন পথই ছিল না। মৃগরূপধারী বোধিসত্ব নিজ শরীর এই বেগবতী নদীর উপর স্থাপন করিলেন; নদীর প্রবল স্রোতাঘাতে তাঁহার অস্থি ভগ্ন হইতে লাগিল; কিন্তু তত্রাপি তিনি জন্তুর পার হইবার সুবিধা করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে এক ক্লান্ত খরগোস তথায় উপস্থিত হইলে মৃগ অতিকষ্টে তাহাকে পার করিয়া দিল কিন্তু নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিজে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবতাগণ মৃগের অস্থি সংগ্রহ করিয়া এইস্থানে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এই স্থানের পশ্চিমে, নিকটেই একটী স্তূপ। এইস্থানে সুভদ্র নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। সুভদ্র পূর্ব্বে ব্রাহ্মণশিক্ষক ছিলেন। তিনি একশত বিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। বৃদ্ধ হওয়াতে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ মরণোন্মুখ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, শালবৃক্ষদ্বারের নিকট আসিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু মরণোন্মুখ হইয়াছেন; আমার এখনও কিছু সন্দেহ আছে; অনুমতি করুন, আমি তাঁহাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।" আনন্দ উত্তর করিলেন "প্রভুর শেষ দশা; তাঁহাকে আর বিরক্ত করিবেন না। সুভদ্র বলিলেন পৃথিবীতে বুদ্ধের দর্শনলাভ এবং প্রকৃত ধর্ম্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়াও সুকঠিন। আমার কয়েকটী বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে; আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই।" অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সুভদ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অনেক ব্যক্তি নিজেদের প্রভু বলিয়া জ্ঞাপন করে; প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মত এবং প্রত্যেকেই জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া পথপ্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক। গৌতম কি তাহাদের ধর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমি এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছি।" পরে সুভদ্রের হিতার্থে তিনি পুনরায় প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

সুভদ্র ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যরূপে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তথাগত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি এরূপ ভাবে ধর্ম্মগ্রহণে সক্ষম হইবে? অবিশ্বাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোক যাহারা ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণে অভিলাষী হয়, তাহারা চারি বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া পরীক্ষা দেয়; যদি ইহাদের চরিত্র ও ব্যবহারে আপত্তিজনক কিছু না দেখা যায় তবে, তাহারা আমার ধর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তুমি মনুষ্য সহবাসে থাকিয়াও, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ। সুতরাং তোমাকে যতিরূপে গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না।

সুভদ্র উত্তর করিলেন "প্রভু অত্যন্ত দয়ালু এবং নিরপেক্ষ। তিনি কি আমাকে চার বৎসরের শিক্ষানবিশী হইতে অব্যাহতি দিবেন?" বুদ্ধ বলিলেন "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; মনুষ্যসহবাসে থাকিয়াও তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ।" সুভদ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। পরে বিশেষ যত্নসহকারে তিনি নিজ শরীর ও মনকে সংযম শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং ঐ প্রকারে সকল সন্দেহমুক্ত হইয়া শীঘ্রই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে শুদ্ধিলাভ করিয়া, তিনি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না কিন্তু সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এবং নিজ ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তিনিই তথাগতের শেষ শিষ্য এবং শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাণ লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত গল্পে উল্লিখিত খরগোসই সুভদ্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মাতৃঋণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিসিল।

পরদিন গির্জ্জা হইতে জ্যাক যখন মাতার সাথে গৃহে ফিরিতেছিল, তখন গির্জ্জা-ঘরের ফটকের নিকট ডাক্তার রিভালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তার রিভালের পার্শ্বে একটি ছোট মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, মেয়েটির বর্ণ যেমন গোলাপের মত উজ্জ্বল, চক্ষেও তেমনি একটি করুণ শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে! ললাটের উপর প্রভাতের সূর্য্য কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে, বায়ু-স্পর্শে কুঞ্চিত অলকের কয়েকটি গুচ্ছ সেই সূর্য্য কিরণে কখনো লুটাইয়া পড়িতেছে কখনো বা আবার সরিয়া যাইতেছে! মেয়েটিকে দেখিলেই কেমন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

ইদা কহিল, "ডাক্তার, এটি বুঝি তোমার নাতনী?" ডাক্তার রিভাল মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, "হাঁ—এই হচ্ছে সিসিল! জ্যাক, এদিকে এস, সিসিলের সঙ্গে ভাব কর।" তারপর কয়জনে মিলিয়া পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল। গৃহও বেশী দূরে নহে। রিভাল কহিল, "সিসিল আর কোথাও যায় না—বাড়ীতেই থাকে। শুধু এই গির্জ্জায় তার দিদিমার সঙ্গে রবিবার সকালে একবার করে আসে। আজ ওর দিদিমা আসতে পারেন নি কাজেই আমাকে আসতে হয়েছে।"

জ্যাক এখানে আসিয়া অবধি সমবয়সী সাথী না পাইয়া কেমন একটা নিঃসঙ্গ বিজনতা অনুভব করিত। আর্কার সঙ্গে গল্প করিয়া বনে কাঠুরিয়া বা কৃষকদিগের সহিত আলাপ করিয়াও তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিত না, নিতান্ত তৃষিত চিত্তে সে এমন একজন সঙ্গীর অভাব অনুভব করিত, যাহার সহিত দুই দণ্ড প্রাণ খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বাঁচে! কিন্তু এমন সঙ্গী মিলিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কাজেই তাহার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া যাইত।

সিসিলও গৃহের মধ্যে বৃদ্ধ মাতামহ মাতামহী ও বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না। রবিবার প্রভাতে একবার গির্জ্জায় আসিয়া সে বাহিরে বালকবালিকাগণের হাস্য-কৌতুক দেখিয়া এক অজানা স্বপ্নরাজ্যের পরিচয়-লাভে ব্যাকুল হইয়া উঠিত! উহারা কি কথা কহে, কেন হাসে, জানিবার জন্য অনভিজ্ঞা বালিকার মনে যে কৌতূহল জাগিত, তাহার তৃপ্তির কোন আশা না দেখিয়া সে কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তাই আজ জ্যাক ও সিসিল প্রথম যখন মিশিতে পাইল তখন জ্যাকের মনে হইল সে বনে যে পক্ষিশাবক ধরিয়া সানন্দে মুঠি ভরিত—এ হস্তের স্পর্শেও যেন ঠিক তেমনই উষ্ণতা!

ইহার পর হইতে জ্যাককে যখনই বাড়ীতে পাওয়া যাইত না, তখন বনের দিকে আর কেহ তাহার সন্ধান লইতে ছুটিত না; সকলেই জানিত, সে নিঃসন্দেহ ডাক্তার রিভালের গৃহে হয় সিসিলের সহিত বসিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর নিকট গল্প শুনিতেছে, নয় সিসিলের জন্য কাগজের ফুল নৌকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তে ঝোপের পার্শ্বে ডাক্তারের গৃহ। গৃহখানি একতালা, আড়ম্বরহীন ছোট! বাহিরে একটা পিতলের পাতে ডাক্তারের নাম লেখা, লেখাগুলা কতক অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, সেই পিতলের পাতের পার্শ্বেই 'রাত্রি ঘণ্টা' ঝুলানো! গৃহটি পুরাতন, স্থানে স্থানে নূতন কায়দায় গড়িয়া তুলিবার যে এককালে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান! দ্বারের সম্মুখেই একটা গাড়ীবারাণ্ডার থাম খাড়া রহিয়াছে, উপরে ছাদ বসিলেই কাজটুকু সম্পন্ন হইয়া যাইত কিন্তু ছাদ হয় নাই! ফটক হইতে গৃহের প্রবেশদ্বার অবধি পথটায় একসময় কাঁকর ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর অমনোযোগে কাঁকর ফেলা পথের মধ্যে মধ্যে এখন প্রচুর ঘাস জন্মিয়া উঠিয়াছে, তাহা আর তুলিয়া ফেলা হয় নাই স্থানে স্থানে আগাছায় পথের কাঁকর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দুই একটা দেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর,—নূতন সার্শি খড়খড়ি বসাইবার আয়োজন হইতেছিল পরে তাহা আর বসান হয় নাই! যদি কেহ বলিত কাজটুকু শেষ হইয়া থাক্ ত বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিত, দরকার কি?"

গ্রামের লোক গৃহস্বামীর ঔদাসীন্যের কারণ জানিত। বৃদ্ধ ডাক্তার বড় সাধে জীর্ণ বাটির সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিল—বাড়ীখানিও বেশ ছবির মত সজ্জিত সুন্দর হইয়া উঠিত, যদি না' সেই দুর্ঘটনা বৃদ্ধের জীবনটাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিত! একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে বৃদ্ধের সংসারে সকল সাধ মিটিয়া গেল! ডাক্তার গৃহিণী এ শোক জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। সেই দুর্ঘটনার পর হইতে গৃহিণী বাহিরের পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া বসিলেন—সকলে ভাবিল, বৃদ্ধা এ শোকের বেগ সামলাইতে পারিবেন না! তাহাই ঘটিত, যদি সিসিল এ সংসারটিকে নব আশ্বাসের বাণীতে মুখরিত করিয়া না রাখিত!

ডাক্তার বাহিরের কর্ম্ম কোলাহলের সংস্রবে আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন বটে—কিন্তু পূর্ব্বের সে সহজ প্রফুল্লতাটুকু বৃদ্ধের হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। সারাদিন রোগী দেখিয়া পীড়িতের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থাদি করিয়া গৃহে ফিরিয়া বৃদ্ধ আপনাকে সিসিলের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সঁপিয়া দিতেন! সে যাহা করিয়া যেমন করিয়া সুখ পায়, বৃদ্ধ তাহাই করেন! এইরূপে সিসিলের সহিত খেলাধূলা করিয়া কন্যার শোক ভুলিতে বৃদ্ধ চেষ্টা করিলেন।

এই শোকের গৃহে শোকের মধ্যে থাকিয়া সিসিল যেন কি এক দারুণ বিজনতা অনুভব করিত। কবরের মত যেন রুদ্ধ তাহাদের ছোট গৃহখানি—বাহিরের কোন কোলাহল এখানে পৌঁছিতে পারে না—বাহিরের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—ঐ আকাশ, এই, বাতাস, ঐ পাখী, এই ফুল—ইহারাই যেন সর্ব্বস্ব—ইহাদের লইয়াই যেন তাহার সমস্ত পৃথিবী! বাহিরের লোকজন---? যেন কোন্ স্বপ্নের দেশে তাহারা থাকে তাহাদের সহিত সিসিলের কোন সম্পর্ক নাই! এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে অহর্নিশি বাস করায় সিসিলের মুখে এমন একটা রেখাপাত হইয়া গিয়াছিল যে তাহা সহজেই চোখ পড়ে।

জ্যাক ও সিসিলকে লইয়া ব্রিভাল যখন

গৃহে পৌছিল, তখন জ্যাককে দেখিয়া গৃহিণী কহিল, "এ ছেলেটি কে?"

রিভাল কহিল, "আর্জেন্তঁদের ছেলে! বেশ ছেলেটি! সিসিল বেচারী একলাটি থাকে—ও ও একলা থাকে, দুজনে একসঙ্গে খেলা করবে, তাই আমি নিয়ে এলাম!"

গৃহিণী গম্ভীরস্বরে কহিল, "কিন্তু, ওরা—ঐ আর্জেন্তঁরা কেমন লোক তা কে জানে! কোথায় বাড়ী, কেউ জানে না।"

"ওরা বেশ লোক। আমি নিজে জানি যে! কর্ত্তাটি খামখেয়ালি—একটু বদমেজাজী—তা সে লোকটা কবি—কবিটবি হলে মেজাজ অমন হয়! এর মা কিন্তু বড় ভাল মানুষ, নেহাৎ বেচারী। তবে ওরা যে বেশ ভদ্রলোক তার আর পরিচয় নেবার দরকার করে না—ওদের ব্যবহারেই বোঝা যায়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িল। স্বামীর নিশ্চিন্ততায় তাহার কেমন বিশ্বাস ছিল না। গৃহিণী কহিল, "কিন্তু তুমি জান ত—"

নিতান্ত অপরাধীর মত রিভাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—পরে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আহা, কোন ভাবনা নেই, তোমার, জ্যাক ছেলে মানুষ, তোমার সিসিলও তাই, কোন ভয়ের কারণ নেই।"

অবশেষে গৃহিণী নিরাপত্তিতে জ্যাককে দৌহিত্রীর ক্রীড়া-সঙ্গিত্বে গ্রহণ করিল। জ্যাক সিসিলের সঙ্গে খেলিবার অধিকার পাইল!

জীবনে জ্যাকের কি এক পরিবর্ত্তন আসিল! প্রথমটা এই পরিবারে খাপ খাইয়া যাইতে জ্যাকের কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল—পরে আর সে সঙ্কোচ রহিল না। জ্যাক নিত্য এখানে আসিতে লাগিল, ক্রমে এমন হইল, রাত্রে শয়ন ও আহারের সময় ভিন্ন জ্যাক সর্ব্বক্ষণই রিভাল-গৃহে থাকিয়া সিসিলের সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে!

একদিন রিভাল-গৃহিণী কহিল, "জ্যাক, তুমি স্কুলে যাও না?"

"না।"

পরে বালক আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি,—আমি রাত্রে মার কাছে পড়ি।"

বেচারী সালট! ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো কি তাহার কাজ!

রিভালগৃহিণী স্বামীকে কহিল, "ওরা ছেলেটাকে আদপে দেখে না—সারাদিন ও এখানে খেলা করে বেড়ায়!"

ডাক্তার কহিল, "উপায় নেই! পারে না, তারা ছেলেকে এঁটে রাখতে! তা ছাড়া জ্যাকের মাথা নেই তেমন।"

"বুঝেছি—ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ধারালো নয়—আর নিজের বাপ নয় ত! আহা, মার প্রথম পক্ষের ছেলে—এমন জায়গায়, ছেলেদের প্রায়ই কোন যত্ন হয় না!

রিভাল কহিল, "দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"কি?"

"আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার কাছে ওরা দুজনেই একটু-আধটু পড়ে!"

"বেশ ত।" ডাক্তার-গৃহিণী সম্মত হইল।

পরদিন জ্যাকও সিসিলের পাঠের ব্যবস্থা হইল। রিভাল-গৃহিণীর কাছে উভয়েই পড়িতে আরম্ভ করিল। এমন আদর এমন যত্ন করিয়া জ্যাককে কেহ কখনো পড়ায় নাই! পড়িতে বসিলে সে কেমন অন্ত-

মনস্ক হইয়া থাকিত—পঠিত বিষয় মনে থাকিত না—পূর্ব্বে এ দোষের জন্য তিরস্কার ও প্রহারের অন্ত থাকিত না—প্রহার খাইয়া সে আরো অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত—ভয়ে তাহার স্বর ফুটিত না! তিরস্কারের তীব্রতায় তাহার সব গোল হইয়া যাইত—সহজ কথাও মনে থাকিত না! এখানে রিভালগৃহিণীর সস্নেহ অধ্যাপনার গুণে জ্যাকের পড়াশুনা শুধু যে একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা নহে, পড়াশুনার দিকে তাহার মনটা ক্রমে আকৃষ্ট হইল।

রিভালের সহানুভূতি-পূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারে সমস্ত গ্রামের লোক তাহার বশীভূত ছিল। জ্যাক, জ্ঞান হওয়া অবধি কখনও জীবনে বাহিরের লোকের মুখে মিষ্ট কথা শুনে নাই, সুতরাং সে যে রিভালের একান্ত বশীভূত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

বৃদ্ধ ডাক্তার যখন আপনার ছোট ট্যাণ্ডেমখানি জুতিয়া রোগী-পরিদর্শনে বাহির হইত, তখন, জ্যাক ও সিসিল তাহার সঙ্গী হইত। পথে পাখী দেখিয়া সিসিল কহিত, "ওটা কি পাখী বল ত, জ্যাক!—" জ্যাক সঠিক উত্তর দিতে না পারিলে সিসিল তাহার ভ্রমসংশোধন করিয়া দিত। পথের পার্শ্বে সুদূর বিস্তীর্ণক্ষেত্রে সবুজ শস্যের যেন কে শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে,—বায়ুস্পর্শে শস্যশীর্ষ আন্দোলিত হইলে মনে হয় যেন একটা সবুজ ঢেউ ছুটিয়াছে—তাহা দেখিয়া সিসিল জিজ্ঞাসা করিত, "কি গাছ বল দেখি, জ্যাক,—ধান, না যব, না গম?" জ্যাক আবার ভুল করিয়া বসিত,—সিসিল হাসিয়া জ্যাকের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিত। এইরূপ নিত্য সাহচর্য্যে, শৈশবের সরল হাসিখেলার মধ্য দিয়া বালকবালিকা পরস্পরে পরস্পরকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেছিল। শৈশবের সে ভালবাসা যেমন অনাবিল তেমনই স্নিগ্ধ সুন্দর!

বৃদ্ধ রোগীর বাড়ী রোগী দেখিতে যাইত—বালকবালিকা গাড়ীতে বসিয়া থাকে। পল্লীর দুই চারিজন বৃদ্ধেরই অনুগত ব্যক্তি তাহাদিগকে ফুলফল দিয়া যাইত—বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বৃদ্ধের গাড়ী কোন পল্লীতে আসিলে সহজে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিত না। রাজ্যের লোক আসিয়া সেখানে জমায়েৎ হইত—বুঝি কোন সম্রাট আসিলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক ছুটিয়া ঘরের বাহির হয় না! ইহাদিগের অনেকেই নানা অনুযোগ আব্দার লইয়া আসিত, কেহ বলিত, "আমার মেয়েটি আর কতদিনে সেরে উঠবে, ডাক্তার?" কেহ বলিত, "আমার ছেলেটি আজ একটু ভাল আছে—সেই ঔষধই কি আবার দেওয়া হবে? তাহা হইলে বিকালে গিয়া নিয়ে আসিব।" আবার কেহ বা বলিত, "যে গুঁড়োটা দিয়েছেন সেটা খাওয়াতে হবে—না সেটা গায় ঘসতে হবে?"

ডাক্তার সকলেরই কথা আগ্রহের সহিত শুনিতেন, সকলেরই ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, সকলকেই হাসিমুখে আশ্বাস দিতেন,—কেহ কখনও নিরাশ হইত না। পরে ডাক্তার গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে গ্রামের লোক দুই হাত তুলিয়া কহিত, "বেঁচে থাক, বাবা তুমি। দীন দুঃখীর মা বাপ তুমি—ভগবান তোমার ভাল করবেন, বাবা।"

এই সব দেখিয়া শুনিয়া জ্যাকের রুদ্ধ মনের কপাট খুলিয়া গিয়াছিল, কাজেই লেখাপড়ায় তাহার অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। গৃহে মাতার নিকট সে বহিও পাতা খুলিত না—রিভালের গৃহে পাঠের কথাও মাতাকে সে কোন দিন জানিতে দেয় নাই! সে আপন ইচ্ছামত গৃহে আসিত, আর্কার নিকট চাহিয়া লইয়া আহার করিত,—আবার কখন্ চলিয়া যাইত কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না।

ইতিমধ্যে আবার একদিন আরামকুঞ্জে ভোজের ধূম লাগিল। বাড়ী সাজানো দেখিয়া আশপাশের লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। "তারা আবার আসছে?"

সালটি আসিয়া আর্কাকে কহিল, "শীঘ্র আর্কা, অনেক ভদ্রলোক আসছেন রাত্রে—একটা খরগোস আরো মার—একটা, না, দুটো—কতকগুলো অমলেট তৈরি কর।"

বৈকালে আবার লাবাসাঁদের হারজের দল আসিয়া দেখা দিল। আর্জেন্ত বিজয় গর্বে মাতিয়া উঠিল। রীতিমত বড়মানুষি কায়দায় সে সকলকে অভ্যর্থনা করিল। হারজের দল মুগ্ধ হইয়া গেল।

তার পর প্রতি সপ্তাহেই এমন ভোজ চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে নূতন সুখ—নূতন লোক, তবে, লাবাসাঁদার ও হারজ প্রায় ভোজেই থাকিত।

ডাক্তার রিভাল প্রথমটা এই ব্যয়বাহুল্যে ভাবিত, "এত কেন?" পরে তাহার বিরক্তি ধরিল—ভাবিল, "ছেলেটাকে দেখবার এতটুকু অবসর হয় না, দিবারাত্রি ও মাদ আর মজলিস্।"

একদিন বন্ধুর দল জ্যাককে দেখিয়া কহিল, "ছেলেটির পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?" একজন সালটির একটু মন পাইবার আশায় জ্যাককে দুই চারিটা বানান ও গণিতের সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে জ্যাক যখন নির্ভুল উত্তর প্রদান করিল, তখন আর্জেন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। ডাক্তার রিভাল কহিল, "দেখ, আমি কেমন শিখিয়েছি এই কদিনে।" বলিয়া—ডাক্তার ইদার মুখের পানে একবার চাহিল—ইদার মুখে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার একটা ছায়া পড়িল, ডাক্তার তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিল।

দুই চারিজন তারিফ্ দিয়া কহিল, "বেশ ছেলেটিত! বুদ্ধি শুদ্ধি চমৎকার!"

লাবাসাঁদার্ কহিল, "বাগানে দেখলাম ঐ আঁবগাছটার একটা কি কল খাটানো, ওটা কি?"

জ্যাক তাড়াতাড়ি বলিল, "কাঠ-বিড়াল ধরবার জন্য?"

লাবাসাঁদার্ কহিল, "বটে! কে তৈরি করলে ওটা?"

"আমি।" বিরাট উল্লাসে জ্যাকের চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল।

সকলে বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা তুমি? চমৎকার হয়েছে, খাসা মাথা ত।"

লাবাসাঁদার কহিল, "ওকে কলকারখানার কাজ শেখাও কারিগরীতে ওর বেশ মাথা খেলে!"

ডাক্তার রিভাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

আর্জেন্ত কহিল, "ঠিক আমিও আজ এক বছর ওর ভাবগতিক লক্ষ্য কচ্ছিলাম—

পড়াশুনায় মোটে বাধ্য করিনি—ভাবছিলাম ওর কোন্‌দিকে ঝোঁক আছে! তা, ঠিক বলেছ তুমি লাবাস্ত্যাঁদর, কলকব্জা তৈরিতে ওর মাথা চমৎকার খেলে বটে!"

তখন কারখানার মিস্ত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোচনায় লাবাসাঁদরের দল অনেকখানি সময় কাটাইয়া দিল। সমস্ত পৃথিবী যে আর পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মিস্ত্রীদিগের অনুগ্রহের উপর আপনার অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য নির্ভর করিবে, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছে! যদি সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি হয় ত সে উন্নতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য বা ধর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইবে না, সে উন্নতির মূলে কারখানার মিস্ত্রীসমূহের অদ্ভুত কৌশল ও অপূর্ব্ব মস্তিষ্কবল! আর্জেন্ত কহিল, "আমি ওকে কারখানায় কাজ শেখাতে পাঠাব বলেই স্থির করে রেখেছি। তবে তেমন ভাল কারখানার সন্ধান পাইনি, এইজন্যই পাঠাতে পারছি না।"

লাবাস্যাঁদর্‌ কহিল, "তাহলে ছেলেটির উন্নতি আর দেখতে হয় না—ওর এদিকে বেশ প্রতিভা আছে।"

আর্জেন্ত কহিল, "এই! প্রতিভা আছে! প্রতিভা কি সকলের একদিকে থাকে? কারো সাহিত্যে প্রতিভা, কারো বিজ্ঞানে, কারো বা এই সবে!"

লাবাস্যাঁদর্‌ কহিল, "তবে ওকে কারখানাতেই দাও। আমার জানা ভাল কারখানা আছে—আমি সন্ধান নিতে পারি।" "বেশ"—আর্জেন্ত কহিল, "তুমি আজই সেখানে চিঠি লিখে সন্ধান নাও। আর দেরী করা নয়—যত শীঘ্র কাজে লাগে সেই লাভ!"

সার্লটি কহিল, "কিন্তু ওর শরীর মজবুত নয় তেমন, ভারী রোগা ছেলে—আর এই বয়স! সেখানকার কষ্ট, পরিশ্রম সহ্য হবে কেন?"

হারজ্‌ কহিল, "খুব সহ্য হবে! কেন? ওর শরীর ত মন্দ নয়!"

আর্জেন্ত কহিল, "ঐ ত মেয়েদের দোষ! ভারী অবুঝ! কিসে ভাল হয় তা বুঝবে না—তোমার চেয়ে ডাক্তার হারজ্‌ শরীর সম্বন্ধে বেশী বুঝতে পারেন! তোমরাই ত মানুষের উন্নতির পথে বাধা দাও!"

অপ্রতিভ হইয়া সার্লটি জ্যাকের পানে চাহিয়া রহিল! এই বালক এত গুরু পরিশ্রম সহ্য করিবে কি করিয়া? তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। জ্যাক মাতার সকাতর নয়নের দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় জ্যাকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মনটাকে সুস্থির করিবার আশায় সে ডাক্তার রিভালের বাড়ীর দিকে চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

'এ জীবন নহেক স্বপন!'

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় কবি জ্যাককে আপনার নিকট ডাকিল। সার্লটি পার্শ্বে বসিয়া একটা কাগজে কি লিখিতেছিল। আর্জেন্ত বলিল, "জ্যাক, তোমায় অনেকবারই আমি বলেছি, এ জীবনটা ধূলাখেলা নয়। কবিও বলেছেন, 'এ জীবন নহেক স্বপন!'

জীবনটা শুধু সংগ্রাম, শুধু যুদ্ধ! দেখছ ত আমার, কি রকম যুদ্ধ কচ্ছি। কখনো কাবু করতে পারছে না—জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে, এবার! এখন তোমার পালা—তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নও—বড় হয়েছ!"

জ্যাকের বয়স বারো বৎসর মাত্র—হতভাগ্য বালক!

আর্জেন্ত বলিতে লাগিল, "এখন তুমি মানুষ হয়েছ। শুধু মাথায় আর চেহারায় বেড়েছ তা নয়, তোমার ভিতরটাও বেড়েছে—এটা তোমায় এখন কাজে দেখাতে হবে। এতদিন তোমার মনটাকে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠবার জন্য আমি যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি। প্রকৃতির মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রে তুমি শিক্ষা পাবে বলেই আমি পড়াশুনার আঁটাআঁটি করিনি। রুটিন মেনে চললে মানুষের মন স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায় না, কাজেই তার তেমন গড়ে ওঠবার অবকাশ মেলে না। বুঝতে পাচ্ছ, এইজন্যই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম আমি—কোন কথা কইনি, তোমার কোন বাধা দিইনি! তুমি এখন বেশ হয়ে উঠেছ—ঠিক আমার মনের মত হয়েছ! কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার তোমার এই সময়!"

ডাক্তার হার্জ ও লাবাস্যাদর এই সময় কক্ষে প্রবেশ করিল। লাবাস্যাদর কহিল, "আমার সেই বন্ধু রুডিক চিঠি লিখেছে—যে জ্যাককে তার কারখানায় কাজ শেখাবার জন্যে নিতে পারে শুধু আমার অনুরোধে! ওরা কি শেখাতে চায়, বাইরের লোককে! শুধু আমার খাতিরে জ্যাককে নেবে। জ্যাককে কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহলে ইঁদ্রেতে যেতে হবে! ইঁদ্রেতেই রুডিকের কারখানা।"

জ্যাকের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল! এ সকলের অর্থ কি? তাহার মনে পড়িল, সে একবার শৈশবে তাহাদের পুরাতন ভৃত্যের ঘরের সম্মুখে দেখিয়াছিল, তাহার একটি পালিত মেষশাবককে কশাইরা কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য যখন আসিয়াছিল, তখন সে অসহায় মেষশাবক আপনার মাতার পানে কি করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—নিষ্ঠুর কশাই সে দৃষ্টি গ্রাহ্য না করিয়া অকাতরচিত্তে মেষ ও শাবকের মধ্যে একটা বিশাল বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল—জ্যাকের মনে হইল সে আজ সেই মেষ-শাবকের মতই একান্ত অসহায়, একান্ত নিরুপায়!

মার বুক হইতে টানিয়া কাড়িয়া ইহারা তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে! জ্যাক মার দিকে চাহিল, সার্লটি লেখা বন্ধ রাখিয়া কখন জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেখে নাই! মার দৃষ্টিটুকু বাহিরের দিকে নিবদ্ধ,—যেন একান্ত আগ্রহে কি মহাদর্শনীয় পদার্থ লক্ষ্য করিতেছে! জ্যাক বুঝিল, এ চাহিয়া থাকার আর কোন অর্থ নাই, শুধু অন্তরের বিপুল বেদনা কোনমতে চাপিয়া রাখিবার জন্য এ একটা ছলমাত্র! আহা, জগতে কেহ যদি আপনার জন থাকে ত সে মা, কোথাও যদি নিরাপদ স্থান থাকে ত সে মার কোল! সেই মার কাছ হইতে সে কোথা চলিয়া যাইবে। সে কি তাহা হইলে আর একদণ্ড বাঁচিবে? না, না, সে যাইবে না! যাইতে পারিবে না!

আর্জেন্ত কহিল, "শুনছ জ্যাক তোমার ভাগ্য ভাল, তাই রুডিকের কারখানায় ঢুকতে

পাচ্ছ! চার বৎসর পরে তুমি দেখবে এক মস্ত কারিগর হয়ে উঠেছ! কি মহান উচ্চ পদে তুমি প্রতিষ্ঠিত! এই দাসত্ব আর পরনির্ভরতার যুগে স্বাধীন আত্মবলে বলীয়ান এক মহিমাময় মানুষ!"

কারিগর! কারখানা! বজ্রের শব্দেও বালক বুঝি এতটা কম্পিত হইত না! সে পারিতে কারিগর দেখিয়াছে,—কুৎসিত কালি ঝুল মাখা লোকগুলা তৈলসিক্ত ছিন্ন জামা পরিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলিয়াছে, তাহাদের সুরাপান-জনিত জড়িত কর্কশ চীৎকারে চারিধার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে কি কদর্য্য! জ্যাক সেই কারিগর হইবে! কি ভয়ঙ্কর!

লাবাসঁ্যাদ্র কহিল, "সাতদিনের মধ্যেই সেখানে যেতে হবে। সব গোছগাছ কর, আমিই গিয়ে রেখে আসব। বলে কয়ে আসব অমনি, একটু যত্ন করে শেখায় যেন!"

"আমার যেতে হবে?" বালক সভয়ে প্রশ্ন করিল।

আর্জেন্ত কহিল, "হাঁ! সাত দিনের মধ্যেই!" জ্যাকের চক্ষে সমস্ত আলো যেন নিভিয়া গেল। সে আর মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না—একেবারে ছুটিয়া ডাক্তার রিভালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

রিভাল কহিলেন,"কি? ব্যাপার কি জ্যাক? এমন করেও ছুটে আসে? হাঁপাচ্ছ যে, বসো। ছি, যদি পড়ে যেতে, কি হত বল দেখি!"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জ্যাক রিভালের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। আর্জেন্তর উপদেশ, লাবাসঁ্যাদ্রের অনুগ্রহ, কোন কথাই সে গোপন করিল না।

শুনিয়া রিভাল কহিলেন, "কারিগর হবে! তোমায় কারখানায় পাঠাবে? সেদিন শুনেছিলাম বটে, আমি ভেবেছিলাম, তামাসা! তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎটা এমনভাবে মাটি করে দেবে ক'জনে মিলে! কখনো না! আমি এখান গিয়ে এ বিষয়ে কথা কচ্ছি, জ্যাক! কারিগর হবে তুমি? কখনো না।"

ডাক্তার মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আরাম কুঞ্জের দিকে ছুটিলেন। ডাক্তারের গতির ক্ষিপ্রতা দেখিয়া পথের পথিকেরা ভাবিল, বুঝি কাহারো কোন কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন, পথে কোন দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসরটুকু অবধি নাই।

রিভাল আসিয়া আর্জেন্তর কক্ষে যখন দাঁড়াইলেন, তখনও মজলিস ভাঙ্গে নাই। রিভাল কহিলেন, "মস্যু আর্জেন্ত, একটা কথা আমি জানতে চাই—"

আর্জেন্ত কহিল, "বসো, বসো, ডাক্তার, হাঁপাচ্ছ যে, একটু চা খাবে?"

"কিছু খাব না। শোন, তোমরা নাকি ঐ দুখের ছেলেটাকে কারখানায় ছোটলোকগুলোর সঙ্গে কাজ শেখাবার জন্য পাঠাচ্ছ। ভদ্রলোকের ছেলের জন্যে কি সে সব কাজ, সে সব স্থান? যত কুৎসিত সঙ্গ, লক্ষ্মীছাড়া কাজ! এমন বুদ্ধি শুদ্ধি-শুর, সে সব এমন করে নষ্ট করে দিতে হয়!"

আর্জেন্ত কহিল, "এমন কিছু অভদ্র কাজ নয়। এঁরা জানেন সব —"

সার্লটি এবার কথা কহিল। সে কহিল "কিন্তু আর্জেন্ত, জ্যাক—"

"সার্লটি!" আর্জেন্তর মুখে তীব্র স্বর শুনিয়া সার্লটি চুপ করিল—

"বল, ডাক্তার, কি বলতে চাও, বল।"

"জ্যাক আমায় বলছিল, তোমরা ওকে কারখানায় পাঠাতে চাও, কামারের কাজ, ছোট লোকের কাজ, এই সব শেখবার জন্য! এ কি সত্য?"

"হাঁ!"

"সত্য! কি বলছ, আর্জেন্ত! ওর বংশ, ওর শিক্ষা কি ওকে কামারের কাজের জন্য গড়ে তুলেছে? এমন বুদ্ধি—আশ্চর্য বিশেষতঃ ওর স্বাস্থ্য! শরীরে সহ্য হবে কেন ও সব?"

ডাক্তার হারজ কহিল, "শরীর ত বেশ ওর বেশ শক্ত!"

রিভাল তখন ইদার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি জান, মা, তোমার ছেলের শরীর তেমন নয়। এ কষ্ট ওর সহ্য হবে না। ও মারা যাবে—এ আমি বলে রাখছি! শরীরের কষ্ট ছেড়ে দিলেও মনের কষ্ট—ভদ্রলোকের ছেলে সেই সব ছোট লোকের সঙ্গে বেড়াতে হবে, কাজ করতে হবে—এতে ওর মন একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তারপর সেই সংসর্গে তুমি মা তোমার এ জ্যাককে আর ফিরে পাবে না। কিছুদিন তাদের মধ্যে থাকলে জ্যাক যা হবে, তা দেখে, তুমি মা হচ্ছ, লজ্জায়, ঘৃণায় তুমি ছেলের দিকে চাইতে পারবে না। হাত শক্ত, কালো, মুখের কথা নিতান্ত অভদ্র, মনের গতি সে কি নীচ, সে তার মার কাছে এসে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না!"

আর্জেন্ত ক্রোধে ফুলিতেছিল। সে কহিল, "ডাক্তার, তোমার এ অনধিকার-চর্চ্চায় কোন দরকার দেখি না—আমার যা খুসী হয়, তাই করব। তোমার পরামর্শ আমি চাইতে যাইনি, তোমার তবে এ মাথাব্যথা কেন?"

রিভাল তীব্রস্বরে কহিল, "তোমায় আমি কোন কথা বলতে আসিনি, আর্জেন্ত! জ্যাক তোমার কে? কেউ নয়! তার ভালমন্দে তোমার কি এসে যায়? কিছু না? আমি জ্যাকের মাকে বোঝাতে এসেছি, এমনভাবে ছেলেকে হত্যা করো না—সে মা, মাকে আমি ছেলে হারাতে দোব না—তাই তার কাছে আমি এ কথা বলতে এসেছি—"

আর্জেন্ত কহিল, "বটে! এত স্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে এসে আমার দিকে চেয়ে চোখ রাঙ্গাও তুমি! ডাক্তার, এ আমি সহ্য করব না। তুমি এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।"

"চলে যাব।" ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে একবার আর্জেন্তর পানে চাহিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "হাঁ যাচ্ছি—তবে যাবার আগে মাকে আবার বলে যাচ্ছি, সাবধান, এমনভাবে ছেলেটার সর্ব্বনাশ করোনা! ওর এই বুদ্ধি, এমন করে নষ্ট করে দিও না।" রিভাল গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন।

কোন ফল হইল না। জিনিষপত্র গুছানো হইতে লাগিল। জ্যাককে যাইতেই হইবে! যেদিন যাইবার দিন স্থির হইল, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় জ্যাক আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, করুণ-স্বরে কহিল, "আমি কারখানায় যাব না, মা, কারিগর হতে পারব না আমি।"

"জ্যাক!" ইদার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আর কোন কথা বাহির হইল না। "মা" বলিয়া জ্যাক কাঁদিয়া ফেলিল।

ইদা কহিল, "ছি, জ্যাক, কথার অবাধ্য হয়োনা। আমি কি সাধ করে তোমায় পাঠাচ্ছি? দেখ, তুমি মানুষ না হলে আমার সোয়াস্তি নেই, কারিগরের কাজ মন্দ কি, জ্যাক?"

"তবে তুমিও আমায় দূর করে দিচ্ছ মা?"

"ও কি কথা, জ্যাক? আমি তোমায় দূর করে দোব, কেন? এ কি সম্ভব! আমি না মা? তুমি কাজ শিখে মানুষ হবে, তোমার ভাল হবে, জ্যাক, তুমি জানো না—এখনও জানবার সময় হয়নি—ছেলেমানুষ তুমি! পরে এক দিন বুঝতে পারবে সব! তোমার জন্মবৃত্তান্ত সে এক রহস্যময় ব্যাপার! বড় হলে জানতে পারবে! আমার কি দুঃখ, সেই দিন তুমি বুঝবে! কেন, তোমায় প্রাণ ধরে আমার কাছ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর প্রাণ কি রকম কাঁদছে—সেই দিন জানতে পারবে, জ্যাক! আজ আর কিছু বলবনা—শুধু এইটুকু জেনো, যত দিন না তুমি মানুষ হতে পারবে, যত দিন না তুমি আপনার পায় ভর করে দাঁড়াতে পারবে—ততদিন আমার কষ্ট যাবে না! আমার সুখের জন্য কি এ কষ্ট তুমি করবে না, জ্যাক? তুমি মানুষ হলেই আমার দুঃখ ঘুচবে—কারখানায় গেলে চার বৎসরে তুমি মানুষ হতে পারবে, কিন্তু লেখা পড়া শিখলে মানুষ হতে অনেক দেরী! এই চার বৎসর আমার মুখ চেয়ে—তোমার মার দুঃখ ঘোচাবে—এই ভেবে তুমি কাটিয়ে দিতে পারবে না?" ইদার চোখে জল আসিয়াছিল।

জ্যাক মার মুখে মুখ রাখিয়া বলিল, "মা—কেঁদোনা তুমি! তোমার কষ্ট যাবে? কিন্তু বল মা, এর পর আমায় দেখে তুমি ঘৃণা করবে না—এমনি আদর করে আমায় বুকে টেনে নেবে—এমনি ভালবাসবে?"

"জ্যাক—জ্যাক—তোকে ভালবাসব না?—তুই ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কে আছে, জ্যাক?" ইদা জ্যাককে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল!

তবে তুমিও আমায় দূর করে দিচ্ছ মা?

অবশেষে যাইবার দিন

আসিল। যাইবার পূর্ব্বে জ্যাক রিভালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। এ কয়দিন সে সেদিকে যায় নাই। মা বারণ করিয়া দিয়াছিল।

জ্যাক বলিল, "দাদা, আমি যাচ্ছি।"

রিভাল কহিলেন, "যাচ্ছ, দাদা—ওরা শুনলে না! তবে এস ভাই—কিন্তু একটা জিনিস আমি দিচ্ছি—যত্নে রেখো! তোমার পড়বার জন্য একবাক্স বই আমি বেছে রেখেছি, জ্যাক! জেনো, এমন বন্ধু জগতে আর কেউ নেই! দুঃখে শোকে আশ্চর্য্য সান্ত্বনা পাবে, তুমি, এই বইয়ের মধ্যে! এমন সান্ত্বনা মানুষ দিতে পারে না জ্যাক! এ বইগুলি যত্নে রেখো, আর পড়ো। নীচ লোকগুলোর সঙ্গে মিশোনা—তাদের কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিয়ো না—অবসর যা পাবে, তাতে এই বই পড়ো, যদি বুঝতে না পারো সব, ক্ষতি নাই—তবু পড়ো—পড়তে পড়তে একদিন সব বুঝতে পারবে! বল, পড়বে?"

"পড়ব, দাদা!"

"ঐ যে বাক্স—একেবারে ভরা আছে। এগুলি তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্যাক—সিসিলের সঙ্গে যাবার আগে দেখা হল না। সে তার দিদিমার সঙ্গে পাহাড় দেখতে গেছে, আমি তাকে বলব!"

"তবে আসি, দাদা—সিসিলকে বলো, দেখা হল না বলে, সে যেন না রাগ করে!"

রিভাল বালককে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিল। বৃদ্ধের অন্তরের মধ্য হইতে একটা সহানুভূতিমিশ্রিত হাহাকার ঠিকরিয়া বাহির হইল, "আহা, বেচারা জ্যাক!"

জ্যাক চলিয়া গেল। আরামকুঞ্জের সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিনিষপত্র বোঝাই হইতেছে। জ্যাক মার কাছে গেল—ইদা জ্যাককে বুকে চাপিয়া ধরিল—এমন সময় বাহির হইতে ডাক পড়িল, "এসো, জ্যাক।"

জ্যাক বাহিরে আসিল। ইদা লাবাসাঁদরকে কহিল, "তাদের বলে দেবেন, জ্যাককে যেন তারা খুব যত্ন করে!"

"নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে হবে না।"

"জ্যাক!"

"মা!"

সার্লটি কোনমতে অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না। জ্যাকের চক্ষে অশ্রু ছিল না—সে আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল। মার দুঃখ ঘুচাইতে চলিয়াছে সে, ইহাতে কি গৌরব, কি সুখ! এ বিচ্ছেদের কষ্ট ক্ষণিক! তারপর? সে মানুষ হইয়া ফিরিলে মার আর কোন কষ্ট থাকিবে না, ইহাতে কি ক্রন্দন শোভা পায়! জ্যাকের মনে একটা গর্ব্ব হইতেছিল—সে মার জন্য আজ কি ভাবে আপনাকে বলি দিতে চলিয়াছে! ধন্য সে!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইদা কহিল, "জ্যাক চিঠি লিখো আমাকে।" তারপর যখন পথ বাঁকিয়া গাড়ী অন্য পথে পড়িল, তখন জ্যাক পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, দূরে লতাগুল্মের মধ্যে তাহাদের বাটীর জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, এক নারী। জ্যাক নিমেষে চিনিল—সে মা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দেহ-দ্যুতি।

দেহ-দ্যুতি—বিষয়টা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন নহে। বহুদিন হইতে রূপবর্ণনায় ও চিত্রের পরিকল্পনায় দেবদেবীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব-ছটামণ্ডিত হইয়া আসিতেছে। চিত্রশিল্পীর প্রসাদে ঋষিদিগের জটাজুটবিভূষিত মস্তকেও তপশ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে দেখিতে পাই এবং সাধুমহাত্মাদিগের চিত্রেও শিরোভূষণস্বরূপ জ্যোতির্ম্মুকুট প্রকটিত দেখি। চিত্রের কথাই বা বলি কেন? আজও ত আমাদের দেশে রূপলাবণ্যময়ী কুলবালাগণ "ঘর আলো" করিয়া থাকেন। এই অন্তঃপুরাবদ্ধ অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসীদিগের রূপপ্রভায় বুঝি অন্তঃপুর আলোকোদ্ভাসিত হইয়া থাকে, নচেৎ বোধ হয় অন্তঃপুর চিরতমিস্রাচ্ছন্ন থাকিত। কারণ সেখানে যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশের আদৌ নাই! কিন্তু এই জ্যোতি রূপসীদিগের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোচনের দীপ্তি, না সর্ব্বদেহ নিঃসৃত রূপের ছটা? নয়নের জ্যোতি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি না, কারণ অনেকেই ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন না। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই জ্যোতিঃসম্পদের অধিকারী। পুরুষের নয়নের দীপ্তি মধ্যাহ্ন তপনের প্রখর রশ্মির ন্যায় তীব্র ও মর্ম্মভেদী, এবং ইহার যে দাহিকা শক্তি নাই তাহাই বা কেমন করিয়া বলি, কারণ শুনিতে পাই পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের রোষকষায়িত লোচননিঃসৃত তীব্র রশ্মি কাহারও উপর নিপতিত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে হয়। আর রমণীর? এই শশিমুখীদিগের নয়নচ্ছটা সাগর হৃদয়ে নৃত্যশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইলেও সময় বিশেষে ইঁহাদের কটাক্ষক্ষেপণে অনেকেই "চন্দ্রাবিষ্ট" হন। প্রমীলার কথায় বলি,—

> "ভেবে দেখ, বীর; যে বিদ্যুৎ ছটা
> রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।"

এ সম্বন্ধে আমাদের যতই জ্ঞান থাকুক, ইহা কখনও জানা ছিল না যে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি একরূপ আভার দ্বারা সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন এবং এই আভা ইচ্ছা করিলে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি Dr. Walter J. Kilner (ডাক্তার কিলনার) নামক জনৈক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এই দেহনিঃসৃত আভা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং লণ্ডনের Ladbroke grove তাঁহার নিজ ভবনের পরীক্ষাগারে এক অভিনব উপায়ে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এই মানবদেহ নিঃসৃত আভা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত উপায়ের কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে দিলাম।

একটী ক্ষীণালোক বিশিষ্ট ঘরের একটি জানালা হইতে ৮ ফুট দূরে রোগীকে (অর্থাৎ যাহার দেহের আভা পরীক্ষা করা হয়) নগ্নদেহে দাঁড় করান হয়। জানালাটী একখানি কালো পর্দ্দার দ্বারা আবৃত করা হয় এবং রোগীর পশ্চাতেও আর একখানি কালো পর্দ্দা স্থাপিত হয়। ঘরে এত সামান্য পরিমাণে আলোক রাখা হয় যে পরীক্ষক সেই ক্ষীণালোকে কিছুক্ষণ পরে দেখিতে অভ্যস্ত হইবামাত্র সেই রোগীর দেহটী দেখিতে পান। রোগীকে

যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষক গাঢ় নীল-বর্ণের তরল পদার্থ পরিপূর্ণ একটি অভিনব ক্ষুদ্র কাচপাত্রের ভিতর দিয়া অর্দ্ধমিনিট কাল একটি নাতি-উজ্জ্বল আলোকের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করেন, ইহার ফলে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়ে অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ অৰ্দ্ধ মিনিটকাল পরেই রোগীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐরূপ আর একটি অভিনব ক্ষুদ্র কাচ পাত্রের ভিতর দিয়া পরীক্ষক রোগীর দিকে দৃষ্টি নিবেশ করেন। শেষোক্ত কাচ পাত্রটীও নীলবর্ণের তরলপদার্থ পরিপূর্ণ, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা রংটা কিছু ফিকে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই তিনি রোগীর দেহনিঃসৃত আভা দেখিতে পান।

যাহারা এই আভা দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহারা বলেন যে এই আভা বা ছায়া নীলাভ, এই আভা সর্ব্বদা সমস্ত মানবদেহ আবৃত করিয়া থাকে এবং ইহার বিস্তৃতি মানবের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মৃত্যুর পর এই আভা অন্তর্হিত হয়, আর দেখা যায় না।

ডাক্তার কিল্‌নার বলেন যে, পুরুষরমণী নির্ব্বিশেষে সকলের দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কি জাগরিতাবস্থায় কি নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়ই এই আভার দ্বারা আবৃত থাকে। এই আভা কল্পনাপ্রসূত নহে, বাস্তবিকই ইহার অস্তিত্ব আছে, কারণ সময়ে সময়ে এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করেন যাঁহারা সহজ চক্ষুতেই এই দেহের আভা দেখিতে পান।

ডাক্তার কিল্‌নার আরও দেখাইয়াছেন যে দেহের আভা রোগ নির্ণয়েও যথেষ্ট সহায়তা করে। এই আভা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। সুস্থাবস্থায় আভার যেরূপ বিস্তৃতি দেখা যায়, দেহ রোগাক্রান্ত হইলে আভা সেরূপ বিস্তৃত থাকে না। দেহের কোন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে ঠিক সেই অঙ্গনিঃসৃত আভা অনেক সঙ্কুচিত হয়। মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দেহের আভার পরিবর্ত্তন ঘটে। দেহের একাংশের আভা অপরাংশ হইতে বেশী বিস্তৃত দেখা যায়। ডাক্তার কিলনারের মত এইরূপ, চিকিৎসকেরা দেহের আভা দেখিয়া রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইলে, চিকিৎসা শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ।

উল্কাপিণ্ড।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে নির্ম্মল আকাশপটে একটি সুতীব্র উজ্জ্বল আলোক-রেখা অঙ্কিত করিয়া উল্কাপাত হইতেছে। আমাদের দেশে উল্কাপাত বিরল হইলেও অন্যান্য দেশে এককালে এত উল্কাবৃষ্টি হয় যে, আকাশ উল্কালোকে একেবারে আলোকিত হইয়া পড়ে। ইহারা কোথা হইতে আসে, উহাদের গঠনোপাদানই বা কি, এ প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতসমাজে অনেকদিন হইতে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের

আকার নানারকমের দেখা যায় এবং বিভিন্ন উল্কার বিভিন্ন গতিও আছে। নক্ষত্রাকার উল্কাপিণ্ডই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চিরনির্দ্দিষ্ট সৌরজগতের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া, অনির্দ্দিষ্ট এবং সতত ভ্রাম্যমান্ আগ্নেয়পিণ্ডের অপ্রত্যাশিত উদয়, মানুষ চিরকালই একটা দুর্ঘটনা ও দুঃসময়ের সূচনা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে। ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যতটা বোঝা যায় তাহাতে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ ভীতির কোনোই কারণ নাই।

বৎসরের পর বৎসর রাত্রির পর রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আকাশের কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সাধারণতঃ উল্কাবর্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ইহাকে Radiant point অর্থাৎ বিকিরণকেন্দ্র নাম দিয়াছেন। আগষ্ট ও নভেম্বর মাসই উল্কাবর্ষণের প্রকৃষ্ট সময়। সে সময় প্রত্যেক জ্যোতিষীই নিজ নিজ দূরবীণ আঁটিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে একজন জ্যোতিষী প্রচুর উল্কাবর্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে, আবার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বরের প্রারম্ভে পুনর্ব্বার ঐ একই স্থান হইতে উল্কাপাত লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমাগত এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে, Leo নামক নক্ষত্রটির নিকটস্থ স্থান হইতেই এইরূপ উল্কাবর্ষণ হয়।

এ পর্য্যন্ত কত যে উল্কাবর্ষণ লক্ষিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল ছোটোবড় উল্কাবর্ষণের তালিকা লিখিতে গেলে শতাধিক পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হেস্ সাহেব এই উল্কাপিণ্ড-তত্ত্ব লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর তিনি বলেন যে, উল্কাবর্ষণ প্রকৃতির একটি সাধারণ ব্যাপার,—ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনো কারণ নাই। তিনি বলেন যে উহা ফস্ফরাস্জাতীয় (Phosphoric) এক প্রকার তরল পদার্থ দ্বারা গঠিত। উক্ত গ্যাস্ পৃথিবী হইতে ক্রমাগতই উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া বিভিন্ন আকারে উর্দ্ধাকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর সেই বিক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি একত্রিত হইলে, পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণহেতু তাহা ধরাভিমুখে ছুটিতে থাকে। প্রচণ্ডবেগে আসিবার সময় বাতাসে ঘর্ষণ লাগিয়া উক্ত বাষ্পরাশি যখন উত্তপ্ত হইয়া অবশেষে জ্বলিয়া উঠে, তখনই আমরা তাহাকে উল্কাপিণ্ডরূপে দেখিতে পাই।

হেস্ সাহেবের উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত আরও অনেকের অনেক সিদ্ধান্ত আছে। বিজ্ঞানপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এককালে চন্দ্রপৃষ্ঠ শত শত সতেজ আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ ছিল। এখন সেগুলি নিস্তেজ হইলেও তাহার গুহাগহ্বরগুলি এখনও চন্দ্রপৃষ্ঠে, ভূপতিত জলবিন্দুর ন্যায় দেখা যায়। চন্দ্রস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচণ্ডবেগে উর্দ্ধোত্থিত গলিত ধাতুভস্মাদি চন্দ্রমণ্ডলে ছড়াইয়া গিয়াছিল। সেই সকল ধাতুপিণ্ড কোনোক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণের ভিতর আসিয়া পড়ায় আমরা তাহাদিগকে

উল্কারূপে প্রবলবেগে ধরা অভিমুখে পতিত হইতে দেখি। বৈজ্ঞানিকসমাজে এই সিদ্ধান্তেরও সমর্থনকারী একটি দল আছে। অন্য একজন জ্যোতিষী বলেন যে উল্কাপিণ্ডগুলিও গ্রহতারকার ন্যায় সতত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে,—তাহারা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর কক্ষাকে স্পর্শ করে তখন তাহারা এই ধরাচ্ছাদনকারী বিশাল বায়ুমণ্ডলের ভিতর আসিয়া পড়ে। তাহারা এমন কতকগুলি পদার্থ দ্বারা গঠিত যাহা বায়ুস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং আমরা তখন তাহাদিগকে উল্কারূপে দেখিতে পাই। জ্বলিয়া উঠিবার পর তাহারা ভস্ম হইয়া পৃথিবীতে বা অন্য কোনো নক্ষত্র বা গ্রহের আকর্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, উল্কাপিণ্ডগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাষ্পকণা দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের মতে, ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় লঘু ছোট ছোট ধাতুকণাদ্বারা গঠিত। কোনো ধূমকেতু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে পুচ্ছস্থিত উক্ত ধাতুকণাগুলি পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর আসিয়া পড়ে।

উল্কাপিণ্ডের জন্ম সম্বন্ধে আমরা যতগুলি মত শুনিলাম তন্মধ্যে শেষ মতটিই আমাদের যুক্তিপূর্ণ ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ জ্যোতিষীগণের নিকট উল্কাপাতের হিসাব চাহিলে তাঁহারা উল্কাপাতের যে সকল তালিকা দাখিল করেন, তাহাদের অধিকাংশই কোনো না কোনো ধূমকেতুর উদয়ের পরবর্ত্তী কালের।

যেসকল ধূমকেতুর পুচ্ছের ধাতুকণাগুলি অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট, সেই সকল পুচ্ছ হইতে পৃথিবী এককালে অধিক পরিমাণে উল্কাসংগ্রহ করিতে পারে। সেইজন্যই সাধারণতঃ দেখা যায় যে ধূমকেতুর উদয়ের পরে আকাশে উল্কাবর্ষণের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। প্রমাণস্বরূপ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, যথাক্রমে ২৭৯৪, ১৮৩৮ ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিয়ালাসাহেবের আবিষ্কৃত ধূমকেতুর উদয়ের পরেই আকাশে প্রচুর উল্কাবর্ষণ দেখা গিয়াছিল। বৃহস্পতি গ্রহটি আমাদের সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জ্যোতিষীগণ বলেন বৃহদাকার বশত বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা ধূমকেতু-পুচ্ছ হইতে অনেক বেশী উল্কাপিণ্ড বা ধাতুকণা আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে।

পৃথিবীকে, ধূমকেতু-পুচ্ছের অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য, একবারও ধাক্কা খাইতে হয় নাই। অনেকবার অনেক পরীক্ষা আসিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবী তাহা নির্ব্বিঘ্নে খণ্ডাইয়া আসিয়াছে। ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর কেমন করিয়া ধাক্কা লাগে তাহা বোধহয় পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। ধূমকেতুও সূর্য্যের চারিদিকে নিজের কক্ষার উপর ঘুরিতেছে কিন্তু তাহার কক্ষা, পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের কক্ষা হইতে অনেক বড় বলিয়া পৃথিবী যেমন একবৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে আপনার আবর্ত্তন শেষ করে তদ্রূপ কোনো ধূমকেতু ৩৬ বা ৭৫ অথবা ততোধিক বৎসরে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আপনার আবর্ত্তনটি শেষ করে। পৃথিবী ও ধূমকেতুর কক্ষা যেস্থানে পরস্পর কর্ত্তিত হয়, ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা হইলে সেই দুইটি সঙ্গম স্থলের একটিতে সম্ভব। অনেক ধূমকেতুর এইরূপ স্থানে

পৃথিবীর সহিত ধাকা লাগিবার অনেক সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ধরিত্রী দেবী তাঁহার সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া অতি অল্পের জন্যই পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে যখন বেয়ালাসাহেবের ধূমকেতুটির সহিত পৃথিবীর ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা ছিল তখন সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষীগণ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এক মাস কালের জন্য পৃথিবী সেবার ধূমকেতুটির পাশ্ এড়াইয়া যাইবে। অর্থাৎ ধূমকেতু ও পৃথিবীর কক্ষার সন্ধিস্থলটি, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া যাইবার একমাস পরে ধূমকেতুটি ছুটিতে ছুটিতে সেই সন্ধিস্থানটি পার হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এক মাসের ব্যতিক্রমে পৃথিবী যে সেবার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। সেবারও আমাদের পৃথিবী উক্ত ধূমকেতুর পুচ্ছাকর্ষণ দ্বারা প্রচুর উল্কাপিণ্ড টানিয়া আনিয়াছিল। তাহার পর, সেদিন হ্যালির ধূমকেতুটির সহিত আমাদের পৃথিবীর ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকার শুভ সম্মিলনের আশঙ্কা ছিল। এই কেতু-কুগ্রমিলনের ভয়ে ধরণীবাসী একান্ত ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিষীগণ যখন "মা ভৈঃ" বলিয়া পৃথিবী নাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তখন সকলে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেবার আর একমাস নয়, কয়েক ঘণ্টার জন্য ধরণী দেবী ধূমকেতুর আলিঙ্গন এড়াইয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা ব্যতীত ধূমকেতু হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী ধ্বংসের জন্য কোনো কারণ ঘটিয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তীকালে ঘটিবে কি না জানি না।

হ্যালির ধূমকেতুর উদয়ের পরও জ্যোতিষীগণ আকাশে প্রচুর উল্কাবর্ষণ দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। ধূমকেতুর পুচ্ছ যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধাতুকণাদ্বারা গঠিত, সে গুলি এত লঘু যে যোজনব্যাপী ধূমকেতুপুচ্ছের ওজন সের দুই-এর অধিক হইবে না। কয়েক বৎসর ব্যাপী উল্কাবর্ষণ ও তাহাদের ধরাপতিত সামান্য চিহ্ন দ্বারা জ্যোতিষীগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের ওজন ৩০ গ্রেণ হইতে ৭½ পাউণ্ডের অধিক হইতে পারে না।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আমাদের পৃথিবী ছাড়াইয়া কত মাইল দূরে উল্কাপিণ্ডগুলি জলন্তভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং কত মাইলের ভিতরই বা আমরা তাহাদের নির্ব্বাণ দেখিয়া থাকি।" এ পর্য্যন্ত কোনো জ্যোতিষীই এ প্রশ্নের একটা সঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। নানা স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। উল্কাপিণ্ডের জ্বলন ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মোটামুটী যে একটা নিয়ম ঠিক করিয়াছেন তাহা এইরূপ। ধরাতল হইতে শতাধিক মাইলের উপর পর্য্যন্ত বায়ু-মণ্ডল বর্ত্তমান আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় দুই শত উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ দেখা গিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রত্যেক উল্কাটিই ধরাতল হইতে ২৪ হইতে ৭০ মাইলের ভিতর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর ১৮৬৩ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যে উল্কা-বর্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহাতেও প্রত্যেক উল্কার জ্বলন পূর্ব্বোক্ত দূরত্ব অনুসারে দেখা

গিয়াছিল। পৃথিবী ও উল্কার ভিতর ৩৪ মাইল ব্যবধান থাকিতে থাকিতে মোটামুটী প্রত্যেক উল্কারই নির্ব্বাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্কাপিণ্ডগুলি যে কি ভীষণবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। একটি জলন্ত পিণ্ড এত জোরে ছুটিয়া আসে যে তাহার আসল আকারটি আমাদের চোখে না পড়িয়া আকাশ-পথে একটি তীব্রোজ্জ্বল আলোক রেখা দেখিয়া থাকি। বলাবাহুল্য এটি আমাদের দৃষ্টিভ্রম। সকলেরই জানা আছে যে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা প্রথমে আমাদের চক্ষুতে পড়িয়া চক্ষুর মধ্য দিয়া রেটিনা নামক পর্দ্দার উপর পতিত হয়। অতঃপর চক্ষুস্নায়ু (optical nerves) দ্বারা তাহার অস্তিত্বের অনুভূতি মস্তিকে চালিত হওয়ায় আমরা সেই ছবি দেখিতে পাই। এই কাজটি এত দ্রুত হয় যে এ জন্য আমাদের কোনো প্রয়াস পাইতে হয় না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় ইহা অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবেই হইবে যে এই কার্য্যটি সমাধান হইতে কিছু না কিছু সময়ক্ষেপ হয়ই হয়। উল্কাপাতের সময় উল্কাপিণ্ডের আকারটি আমাদের চক্ষুতে মুদ্রিত হইতে না হইতেই তাহা আপনার ভীষণ গতিতে চলিতে থাকে। আমাদের চক্ষু স্থায়ী রূপে উল্কার কোনো ছবি লাভ করিতে পারে না। ইহার সহজ দৃষ্টান্ত,—একখানি কাষ্ঠখণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা অনবরত যদি ঘুরানো যায় তো কাষ্ঠখণ্ডটির জলন্ত অগ্রভাগ আমাদের চোখে একটি আলোক রেখা বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয়। উল্কাপিণ্ড কত বেগে ধরাভিমুখে পতিত হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। মোটামুটি হিসাব দ্বারা বলা যাইতে পারে যে উল্কাপিণ্ডগুলি সাধারণত এক সেকেণ্ডে ৩৪½ মাইল বেগে ধরাভিমুখে ছুটিয়া থাকে। এইরূপ প্রবলবেগে আকাশ পথে আসিতে আসিতে প্রথমে উত্তপ্ত অবশেষে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইয়া আকাশ পথেই তাহারা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কখনো কখনো মাত্র পৃথিবীর উপর উক্ত দগ্ধীভূত উল্কাপিণ্ড পতিত হইতে দেখা যায়। অনেক সময় পণ্ডিতগণ এই ভূপতিত ভস্মরাশি পরীক্ষা করিয়া উল্কাপিণ্ডগুলির উপাদান স্থির করেন। এতদ্ব্যতীত উল্কাপিণ্ডের উপাদান জানিবার অন্য কোনো উপায় নাই।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মিলন।

শীতের অকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে; এমন সময় সে জীর্ণ ভাঙ্গা পান্থশালায় এসে দাঁড়াল'।

কেউ বল্‌ত ভাগ্যহীনা সে, তা' না হ'লে কি সে রাজার অন্তরের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। কেউ বল্‌ত দেবী সে, নইলে নারী হয়ে কি কেউ প্রেমের ডাক অগ্রাহ্য করতে পারে!

ঘরের মধ্যে ঢুকে সে দেখলে;—বৃদ্ধ পান্থশালার মালিক চারিদিকের জানালা বন্ধ করে চোখ বুজে আগুনের সরার উপর

হাত বাড়িয়ে বসে আছে। বাহির থেকে অন্য কোন শব্দ আসছিল না, কেবল মধ্যে মধ্যে বিরহী বাতাসের আর্ত্তনাদ কাচের জানালার উপর আছাড় খেয়ে পড়ছিল।

হিমে ঠাণ্ডায় তার মুখ বরফের মত সাদা দেখাচ্ছিল, শীতের হাওয়ায় শরীরের হাড় কটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল; অবসন্ন পা কিছুতেই যেন বশ মানছিল না। আস্তে আস্তে সে আগুনের সরার কাছে বৃদ্ধের পাশে এসে বসে, ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বার করে আগুনের উপর ধরলে। তার সাদা মুখের উপর আগুনের ম্লান লাল আভা প'ড়ে অস্তে গমনোন্মুখ সূর্য্যের সোনালি রঙের মত আর তার কোঁকড়ান লম্বা চুল গুলো ঠিক সোনালি সুতোর মত দেখাচ্ছিল।

চোখ খুলে, সম্মুখে নারীমূর্ত্তি দেখে বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কিন্তু কোন কথা না বলে ঘরের কোণ হতে একটা কাঠের পিঁড়ি এনে তাকে বসতে দিলে। আজ ২৪ বৎসর এই ঘরে বসে তার চুল সাদা হয়ে গেল কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ নারী কখনও এখানে বিশ্রাম করতে আসেনি। তার মুখের শ্রী, চোখের কমনীয়তা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। চেহারা দেখে মনে হয় কোন কারণে তার শ্রীর উপর ছাইচাপা পড়ে গেছে। কিন্তু মাটীচাপা হীরকের মত কোন দিন সে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে!

বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কোন পথে আসচ্ আর কোন পথে যাবে?"

নারী উত্তর দিলে—"অনেক দূর থেকে তোমাদের রাজার নূতন প্রাসাদ দেখতে এসেছি।"

বিস্ময়ে চক্ষু কুঞ্চিত করে সে জিজ্ঞাসা করলে "এই অন্ধকার হাড়ভাঙ্গা শীতের রাত্রে কেবল প্রাসাদ দেখবার জন্য এসেছ? তোমার মত নারীর সহিত কেউ নাই কেন"?

নিরাশার স্বরে একটু পরে নারী বল্লে, "আকাশের তারা ছাড়া আমার দিকে চাইবার আর কেউ নেই। শোন বৃদ্ধ, মুক্ত বায়ুর মত আমি স্বাধীন।"

একথা বৃদ্ধের হৃদয়ে কাঁটার মত যেন বিঁধে গেল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্লে—"আমারই মতন!" আপনার নিরাশ্রয়তার কথা মনে করে এতদিন সে নারী নিজেকে নিতান্ত দুঃখিনী মনে করত। আজ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় বিহীন এই বৃদ্ধকে দেখে একটু যেন আনন্দ অনুভব করতে লাগল। বৃদ্ধের নিরাশ মুখের দিকে চেয়ে তার জীবনের কাহিনী বায়স্কোপের ছবির মত সাম্‌নে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনের আবেগে সে বল্লে "তবে শোন বৃদ্ধ,—আমার জীবনের দুট কথা শোন।"

রাত্রি তখন গভীর হয়ে এসেছে—বাহির থেকে বাতাসের এবং ঝিল্লির শব্দ আসছিল। অন্য কোন অতিথি আসবার সম্ভাবনা ছিল না। কেবল অন্ধকারে ঢাকা ঘরের এক কোণে এক লক্ষ্মীছাড়া পথিক আপাদমস্তক এক ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ঢেকে অকাতরে ঘুমুচ্ছিল, তার নাকডাকার শব্দে ঘর যেন কেঁপে উঠছিল।

নারী বল্লে "তোমাদের রাজা একবার দেশের চিত্রকরদের জড়ো করলেন—

উদ্দেশ্য—কে সব চেয়ে ভাল চিত্রকর বিচার করা। অনেক দূর দেশ হতে বড় বড় চিত্রকর একত্রিত হয়েছিল। কেউ রাজার চেহারা, কেউ রাজার প্রাসাদ আবার কেউ রাজার ফুলের বাগান কিম্বা পুষ্করিণীর ছবি এঁকে-ছিল। এ ছবিগুলি রাজার পছন্দ হলনা, কিন্তু যখন আমার আঁকা ছবিটী তাঁর সম্মুখে ধরা হল, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজা আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারলেন না; সভাশুদ্ধ নামজাদা চিত্রকরদের মাথা আমার পায়ের কাছে নত হয়ে গেল।

সভা যখন শেষ হ'ল, তখন অন্যান্য চিত্রকরেরা হিংসায় অপমানে সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। সভায় রইলেন কেবল সিংহাসনে বসে একা রাজা! তিনি সিংহাসন থেকে উঠে এসে আমার গলায় বিবাহ মাল্য পরাতে এলেন! কিন্তু আমার মত বন্ধনমুক্ত নারী কি প্রেমের শৃঙ্খল পরতে পারে? হোক না সে রাজা? পৃথিবীর সুদৃঢ় মিলন দৃশ্যকে ভেঙ্গে বিচ্ছেদের দৃশ্য স্থাপন করবার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। তাই বিবাহমাল্য রাজার হাতে রইল আমি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম।

সহর ত্যাগ করে অন্যদেশে নদীর ধারে এক কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিলাম। সেখানে ছবি এঁকে নিজের করুণ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত চেহারা আর জ্যোৎস্নার মত শুভ্র হাত দুখানি দেখে দিন কেটে যেত। কিন্তু সেখানে এক গাছ আর এক গাছের উপর ঠেকে, একলতা আর এক গাছকে জড়িয়ে, এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটে আমার বিচ্ছেদকে যেন উপহাস করত!"

এমনি সময় সেই নিদ্রিত লক্ষ্মীছাড়া অতিথিটা এ পাশ ওপাশ করতে লাগল'।

নারী আবার আরম্ভ করলে, "তার পর এমনি করে ছবি এঁকে এঁকে আমার দিন কাটত। কিন্তু সেই স্যাঁৎসেতে কুঁড়ে ঘর আমার সহ্য হলনা, ক্রমে ক্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়ল্। তবুও এক দিনের জন্যে দুঃখ করিনি। কিন্তু ভয়ঙ্কর জ্বর হল; জ্বর থেকে উঠে দেখি গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির মত যে কেবল সৌন্দর্য্য ঝরে পড়েছে—তা নয়, আর ছবিও আঁকতে পারিনে, আমার যে ছবি দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েছিলেন সেরূপ ছবি আঁকবার সামর্থ্য একেবারেই চলে গেছে!

তার পর থেকে থেকে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন এক বিচ্ছেদের হাহাকার উঠত; সেই হাহাকার আমাকে নিরাশার হিম সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে আমার প্রতিজ্ঞাকে হাল্কা করে দিলে। সেই কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি ভিখারিণী বেশে নানা দেশ ঘুরে আজ এই শীতের অকাল সন্ধ্যায় তোমার এখানে উপস্থিত হয়েছি,—কেন জান? যে ছবি দেখে নামজাদা চিত্রকরদের মাথা নত হয়েছিল, দর্প চূর্ণ হয়েছিল সেই ছবি একবার দেখব,—আর একদিন যিনি সেই ছবি দেখে আমাকে বিবাহমাল্য পরাতে গিয়েছিলেন তাঁকেও।

সে এক নিশ্বাসে কথাগুলি ব'লে উঠে দাঁড়াল; আর বৃদ্ধ নির্ব্বাণোন্মুখ আগুন উস্কে দিতে দিতে আত্মমনেই যেন ব'লে উঠলো, "তাই বুঝি আমাদের রাজা গৃহত্যাগী!" এমনি সময় সেই লক্ষ্মীছাড়া অতিথি উঠে নারীর সামনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু একি? সেদিনকার রাত্রের রাজার সহিত এই অতিথির কি আশ্চর্য্য মিল!

দুজনের আর কোন কথা হইল না। আকাশের ভাসমান মেঘের মত দুটী প্রাণী এক ঠাঁই আসিয়া মিলিল।

* * *

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

শ্রীক্ষেত্র।

কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীক্ষেত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবারে এখানকার বিদেশী ভ্রমণকারী প্রভৃতির বিষয় বলিব। কিন্তু তার আগে, আর দু' একটী কথা বলিতে চাই।

দুঃখের বিষয়, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্বিকের কর্ত্তব্য অপক্ষপাতিতা;—কিন্তু গোঁড়ামী নয়। তাহা সর্ব্বত্র ধ্রুবের পরিপন্থী। গোঁড়ামী, বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। পরিশেষে, তাহা ঐতিহাসিকের সত্যপূত পন্থায় প্রবেশলাভ করিল? হায় গোঁড়ামী!

কি পাশ্চাত্য এবং কি ভারতীয় পণ্ডিত,—যিনিই উৎকলের প্রত্নতত্ব ও ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তাঁহাকেই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে বুদ্ধদন্তের উপরেই জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের আচার আর বিধি আর নিয়ম আত্মসাৎ করিয়াই উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ মহিমময়। অনেকদিন আগে, এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। সংপ্রতি, নবাবিষ্কৃত বহু শিলালিপি ও তাম্রফলক প্রভৃতির দ্বারা আরও অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। নূতন তথ্য, পুরাতনেরই পথ্যকর হইয়াছে। পরন্তু, তাহাতে শ্রীক্ষেত্রের হিন্দুধর্ম্মের উপর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচ্ছাদনী সরিয়া যায় নাই। কেহ কেহ সে চেষ্টা, করিয়াছিলেন বটে,—চেষ্টা মাত্র! তাহা বিফল হইয়াছে।

এই সকল চেষ্টাকারীর মধ্যে, বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু অন্যতম। তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। (১) কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে কেবল "অস্বীকার"ই প্রচুর নয়,—প্রমাণ চাই। সুতরাং নগেন্দ্র বাবু কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে কিছু সপ্রমাণ হইয়াছে,—এমন মনে হয় না। তাঁহার প্রতিবাদ করিবার সাহস রাখি না। তবে স্বল্পবুদ্ধিতে অল্প যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব।

নগেন্দ্র বাবু, বলিতে চান, উৎকলে বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বে পুরাণাদিতে জগন্নাথের মহিমার কথা পাওয়া যায়। রথযাত্রাও আগে ছিল, ইত্যাদি। এ কথা, আমরাও মানি।

তথাপি, রজনী তাহার আঁধারভৃঙ্গার হইতে তমিস্রধারা ঢালিয়া, যেমন দিবার ধবলিত বিভা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, তেমন, বিদ্যমান জগন্নাথ যে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায়

(১) বিশ্বকোষ।

আত্মভরণ করিতেছেন, সে কথা সহস্রচেষ্টায় চাপিয়া রাখা যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বুদ্ধের দন্তযাত্রার অনুকরণে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। নগেন্দ্র বাবু বলেন, বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে রথযাত্রা,—ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বেশ কথা। এখন, আমরা জানিতে চাই, যে বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত ছিল কি না? আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, যে কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক পুস্তকে একথার উল্লেখ নাই। নগেন্দ্র বাবুও, তাহা দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের পরেও আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলাম, যে শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা, বৌদ্ধগণের দন্তযাত্রার অনুকরণ।

দ্বিতীয় কথা। শ্রীক্ষেত্রে সকল জাতিই নির্ব্বিচারে একত্রে পানভোজন করে। এবংবিধ নিয়ম, আর কোন হিন্দুতীর্থে বা হিন্দুশাস্ত্রে দর্শন বা পাঠ করা যায় না। এবং নগেন্দ্র বাবুও দেখাইতে পারিবেন না, যে কোন প্রাচীন পুস্তকে (যাহা শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল) শ্রীক্ষেত্রে এরূপ একত্রভোজনের প্রথার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"কিন্তু শুধু জগন্নাথ বলিয়া নহে—উৎকলভূখণ্ডের সর্ব্বত্র মতবিরোধের মধ্যে একটা নির্ব্বিবাদ, ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়। বৈষ্ণবের পক্ষে শিবের মন্দিরনির্ম্মাণ উড়িষ্যায় একটা মহাপুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য। অথচ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে বৈষ্ণবে শৈবে অনেক সময় মুখ দেখাদেখি নাই। * * * উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে শৈবদেবতা, শিবের মন্দিরে বৈষ্ণব নৃসিংহ। ভুবনেশ্বরে দোলযাত্রা সম্পাদিত হয়। * * * এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের * * ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।" (২)

এই উক্তিতে ভ্রম দেখাইবার আগে, ভরসা করি, নগেন্দ্র বাবু, ভারতবর্ষের অন্যান্য তীর্থে, এইরূপ বিক্ষিপ্তকে একীকরণের চিহ্ন দেখাইবেন। তবে, তিনি যদি বলিয়া বসেন, যে আমাদের কবিগণ, দুর্গা, কালী ও কৃষ্ণকে অভিন্ন বলিয়াছেন, শাস্ত্রে হরিহর মূর্ত্তি আছে এবং বৃন্দাবনে কালীর মন্দির আছে,—তাহা হইলে অবশ্য আমরা নাচার!

তৃতীয় কথা। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, বৌদ্ধগণের উপাস্য। বৌদ্ধমতে, সংঘের স্ত্রীরূপ। আশ্চর্য্য এই, যে শ্রীক্ষেত্রেও বৈষ্ণবগণের উপাস্য মূর্ত্তি তিনটীর বেশী নয়,—এবং তাহার মধ্যেও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি! রাজেন্দ্র বাবু, তাঁহার পুস্তকে বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির যে ছবি দিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তির অনেকটা সারূপ্য আছে। এ কথা উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

চতুর্থ কথা। বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বার, সর্ব্বস্থলেই পূর্ব্বদিকে। ভারতের কোন হিন্দু দেবালয়ের দ্বার পূর্ব্বদিকে নয়,—কেবল উৎকল ছাড়া।

পঞ্চম কথা। শ্রীক্ষেত্রে, মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা সেই ঘরের দরজা সাবধানে

(২) বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। ৫৩১—৩৩।

বন্ধ করিয়া রাখে,—পাছে যাত্রিগণের চোখে সেই মূর্ত্তি পড়িয়া যায়—পাছে ঠাকুর জগন্নাথের পূর্ব্বজন্মের রহস্য বাহির হইয়া পড়ে,—পাছে পাণ্ডাদের উপার্জ্জনে হাত পড়ে। চালাক্ পাণ্ডারা, নগেন্দ্র বাবুর মত লোককেও ফাঁকি দিতে বাকি রাখে নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এ প্রমাণও কি প্রচুর নয়?

হিন্দুরা, সর্ব্বস্থলেই বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের ভিতরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের দশমাবতারের ভিতরে তাই বুদ্ধদেবও অন্যতম। উৎকলের প্রধান ধর্ম্ম, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম। বহুদিন, বহুবৎসর বৌদ্ধমতবাদের ভিতরে আত্মযাপন করিয়া, উৎকলীয়গণ তখন মনেপ্রাণে বৌদ্ধাচারপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহারাজ যযাতিকেশরী, উৎকলের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া বুঝিলেন, যে বৌদ্ধধর্ম্ম মৃত হইয়াছে বটে এবং তাহার ভিতরে নবজীবনের ধারা আর বহিবে না বটে,—কিন্তু মৃতদেহটা এখনও আছে! রোপিতমূল অশ্বত্থকে যেমন মন্দির-ভিত্তি হইতে বিযুক্ত করা কঠিন, তেমনি উৎকলবাসিগের অন্তর কন্দরের গভীরতম প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে টানিয়া বাহির করা বড় কঠিন—বড় কঠিন! তিনি তখন হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা তুলিয়া দিলেন।

সমাজে আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ মানুষের ভিতরে আচারই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তুমি ভিতরে যাহাই হওনা কেন, যতদিন না তুমি হিন্দুআচারভ্রষ্ট হইবে, ততদিন তোমাকে অহিন্দু বলিব না।

এই সকল কথা বুঝিতে পারেন, তখন উৎকলে এমন একজন চতুর ব্যক্তির দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। যযাতিকেশরী, সেই অভাব দূর করিলেন। তাঁহার যত্নে মন্দির বেদীতে পুনর্ব্বার হিন্দুদেবতার প্রতিষ্ঠা হইল বটে,—কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যতটা সম্ভব বৌদ্ধ আচার বজায় রাখা হইল। বৌদ্ধেরা, ভিতরের কথা বুঝিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন, একদিকে বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম্ম এবং অন্যদিকে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম! একদিকে দন্তযাত্রা এবং অন্যদিকে রথযাত্রা! এ'দিকে অহিংসা,—আর ও'দিকেও তাই। জাতিভেদ বড় ঘৃণার কথা! এখানেও ততটা না হোক্—অনেকটা তেমনি! অন্ততঃ, একসঙ্গে পানভোজনটাও ত চলিবে! তবে, আর এ দুটীতে বিশেষ পার্থক্য কোথায়? আগে "জয় বুদ্ধ" বলিতাম, এখন না হয় "জয় জগন্নাথ"টাই বলা যাক্—বুদ্ধের বদলে জগন্নাথ! মন্দ কি?

সুতরাং নবধর্ম্ম কাহারও কাছে বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারা জগন্নাথের পায়ে পূজার ফুল দিলেন; এবং দিনে দিনে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে মিশিয়া গেলেন।

উৎকলে, তখন এবংবিধ পরিবর্ত্তনই স্বাভাবিক। হইয়াওছিল তাই। সুতরাং সেজন্য কষ্টকল্পনার আবশ্যক নাই।

উৎকলে বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ।

অতঃপর, উৎকলের ভ্রমণকারিগণের কথা বলা যাক্।

আজ দু'হাজার বৎসর হইতে উৎকল, ভারতবাসীর বিস্ময়চকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে তাহা বৌদ্ধগণের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ভ্রমণকারিগণ বিদেশ হইতে ভারতে আসিলে

উড়িষ্যাটা একবার না দেখিয়া ফিরিতেন না। তাহার পর হিন্দুতীর্থে পরিণতা হইয়া, উৎকল ভূমি বহুকোটী নরনারীর চক্ষুতে বরণীয়া হইয়া উঠিয়াছেন। শিল্পের প্রাণরঞ্জক সৌন্দর্য্যে গরিমময়ী হইয়া, উৎকলভূমি প্রত্যেক শিল্পরসজ্ঞের নিকটে আদরনীয়া হইয়াছে। বহুবিধ প্রাচীন ধ্বংসচূর্ণ গৌরবাবশেষে পরিপূর্ণা হইয়া এই গরীয়সী ভূমি প্রত্নতাত্বিক গণকেও বড় অল্প আলোচনার বিষয় দান করে নাই! এবংবিধ বিবিধ বৈচিত্র্যের বিচিত্র সমাহার, অন্যত্র দুর্লভ। সুতরাং নানাদিক হইতে নানাভাবে, বহুরূপিনী উৎকলভূমি নিখিলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে কয়েকজন ভ্রমণকারীর বিবরণ প্রদান করিতেছি। তবে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সে জন্য আমার অক্ষমতা নিবেদন করিতেছি। কিন্তু তাহার আগে শ্রীক্ষেত্রের সাধারণ যাত্রিগণের বিষয়ে দু'একটা কথা বলিয়া লওয়া দরকার মনে করি।

জগন্নাথে এখন রেল হইয়াছে,—সুতরাং বিদ্যমান যুগে তথায় যাত্রীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু সেই সেকালের দিনে,—যখন পথকষ্টের অভাব ছিল না—যখন প্রতিপদক্ষেপে দস্যুতস্করের ভয়—যখন দস্যু ছাড়িলে সাংঘাতিক পীড়া আসিয়া যাত্রিগণের ভবযন্ত্রণা নিবারণ করিত,—যখনকার কথা স্মরণ করিলেও এখন আমাদের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে,—তখনও এ পথে যাত্রীর অভাব ছিল না। আমরা এখানে কয়েক বৎসরের তালিকা দিলাম।

বৎসর		যাত্রীসংখ্যা
১৮১৭—১৮	...	৭৫, ৬৪১
১৮১৮—১৯	...	৪১, ১১১
১৮১৯—২০	...	১৩১, ৮৭৪
১৮২০—২১	...	৩৩, ৬৪৬
১৮২১—২২	...	৫২, ১৬০

দেখা যাইতেছে, এক বৎসর—১৮১৯—২০ খৃষ্টাব্দে একলক্ষ একত্রিশ হাজার যাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। ইহা কি সামান্য কথা!

স্মিথসাহেব লিখিয়াছেন:—"রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথে যে সকল যাত্রী আসে, তাহাদের ভিতরে বেশীরভাগই বাঙ্গালী এবং তাহার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক!*** আমি জনতার ভিতরে কয়েকজন পাঞ্জাবীকে দেখিয়া, তাহাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে জানিলাম, তাহারা আসিয়াছে হাজারা হইতে! সে স্থান এখান হইতে ২০০০ সহস্র মাইল!! এই দু'হাজার মাইল পথ, তাহারা অনায়াসে পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিয়াছে!!! আরও শুনিলাম, তাহারা এখানে একদিন কি দু'দিন থাকিয়া আবার আপনাদের জন্মভূমির দিকে ফিরিয়া যাইবে।" (৩) এই বিবরণের উপরে, টীকা অনাবশ্যক।

য়ুয়ন-চুয়াঙ্।—চৈনিক ভ্রমণকারী য়ুয়নচুয়াঙ্ সপ্তম খৃঃ অব্দে ভারতভ্রমণে আগমণ করেন। তিনি পুরীকে চরিত্রপুর নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—ইহার পরিধি ২০ লি। এখানে আসিয়া সমুদ্রযাত্রী দূরদেশবাসী যাত্রী এবং ভ্রমণকারিগণ

(৩) Report on Pilgrimage to Jagannath. By David B. Smith. M. O. p. 10.

বিশ্রাম উপভোগ করেন। এখানে বহুবিধ দুর্লভ বাণিজ্য-দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার অবস্থান, স্বভাবতঃ সুদৃঢ়। ইহার বাহিরে পাঁচটী সংঘারাম আছে। তাহাদের ভিতরে অনেক শিল্পসুন্দর মূর্ত্তি। (৪)

কানিংহামের মতে, যুয়ন-চুয়াঙ্‌, চরিত্র-পুরে যে পাঁচটী সংঘারাম দেখিয়াছিলেন, তাহার একটী জগন্নাথের মন্দির। তিনি আরও বলেন, যে চরিত্রপুরই বিদ্যমান পুরী। কিন্তু ফাগুসান সাহেব বলেন, যে বর্ত্তমান তমলুকই প্রাচীন চরিত্রপুর। (৫)

টলেমী, উড়িষ্যার অনেক স্থানের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে, ননিগইনা অন্যতম। স্থির হইয়াছে ঐ ননিগইনা, বিদ্যমান পুরী। (৬)

ডাঃ ওয়াডেল সাহেব বলেন, "এখনকার যাজপরই আগেকার পুরী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" কিন্তু তাঁহার সন্দেহ না থাকুক,—আমাদের আছে। নানা মুনির নানা মত। আমাদের অত গোলমালের দরকার কি? কানিংহামের কথাই সঙ্গত বলিয়া বোঝা যায়। আমরা তাহাই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলাম।

আবুল ফাজল্‌।—আবুল ফাজলও উৎকলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে কণারকের কথাই বেশী পাওয়া যায়—জগন্নাথের কথা অল্প। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন জগন্নাথের মূর্ত্তিকে ছয়বার ধৌত ও মার্জ্জিত করে। প্রতিবারেই মূর্ত্তির দেহে, তাহারা অমল বসন পরাইয়া দেয়। বেশধারণাদি সমাপ্ত হইলে ছাপ্পান্নজন ব্রাহ্মণ মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া বিবিধ খাদ্য নিবেদন করে। খাদ্যরাশির পরিমাণ এত, যে অনায়াসে বিশ হাজার লোকের উদরপূর্ত্তি হইতে পারে!" (৭)

আবুল ফাজলের বর্ণনা হইতে জানা যায়, কয়েকশত বর্ষ পূর্ব্বেও জগন্নাথের নিমিত্ত যেরূপ বিরাট খাদ্যসম্ভারের আয়োজন করা হইত, তাহা বিদ্যমানকাল অপেক্ষা বড় অল্প নয়।

টাভারনিয়ে।—টাভারনিয়ে জগন্নাথ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন:—"জগন্নাথ মন্দির গঙ্গার মোহনার উপরে অবস্থিত। (!) * * মন্দিরস্থিত বেদীর উপরে যে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার চক্ষুতারকায় দুটী হীরক-খণ্ড বসান আছে। * * এই সুপ্রসিদ্ধ দেব-মূর্ত্তির নাম "রেসোরা" (Resora!) এই দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল ভূসম্পত্তি উৎসর্গী-কৃত হইয়াছে, তাহার আয় হইতে প্রত্যহ ১৫।২০ হাজার তীর্থযাত্রীর আহার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। * * ভারতের মধ্যে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য এত অধিক হওয়ার কারণ, ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত। * * প্রধান পুরোহিত প্রত্যহ যাত্রিগণের মধ্যে অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, রুটি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" (৮)

সম্ভবতঃ, টাভারনিয়ে যখন গঙ্গাতীরে

(৪) On Yuan Chuangs Travels in India. By T. Watters M. R. S. S. P. 194.
(৫) Ancient Geography of India. P. 5. 10.
(৬) Ptolemy's Geography of India: (Mc Krindle.)
(৭) Ayeen Akbery. Translated by Francis Gladwin. P. 309.
(৮) প্রবাসী—৬ষ্ঠ ভাগ, ৯ম সংখ্যা "বৈদেশিকের হস্তে দেশীয় চিত্র" প্রবন্ধে দেখ।

পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবিষ্ট ছিলেন, তখন আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া এক রাত্রিতেই উৎকলে লইয়া গিয়া হাজির করিয়াছিল। টাভারনিয়ে জাগ্রৎ হইয়া বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি সমুদ্রের ধারে না গঙ্গার ঘাটে আছেন! এই সকল ব্যক্তির ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যগণ আমাদের দেশসম্বন্ধে পণ্ডিত বনিয়া যান! হায়রে!

বার্নিয়ার। বার্নিয়ারও টাভারনিয়ের সমসাময়িক ভ্রমণকারী। তিনি লিখিয়াছেন:—"এখানকার দেবমূর্ত্তি, প্রথম যেদিন রাস্তায় বাহির করা হয়, জনতা তখন ভয়ানক হইয়া ওঠে। অনেকে রথচক্রের তলায় পড়িয়া আত্মদান করে! এদেশী লোকের চোখে সে দৃশ্য এমনি সহিয়া গিয়াছে, যে কেহই সেই চক্রতলে নিষ্পেষিত লোকটীকে দেখিয়া বিস্ময়প্রকাশ করে না! তাহাদের ভাবখানা এমনি, যেন কিছুই হয় নাই! * * * জুয়াচোর পুরোহিতেরা একটী কুমারীকে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। তাহাকে তাহারা 'জগন্নাথের স্ত্রী' (bride of Jagannath) বলিয়া ডাকে। রজনীকালে সেই কুমারী একাকিনী মন্দিরের ভিতরে শয়ন করে। তাহার বিশ্বাস, রাত্রিতে জগন্নাথ নিজে আসিয়া তাহার পাশে শয়ন করিবেন!* * * রজনীতে, একটি ছোট পশ্চাৎ দ্বার দিয়া একজন পুরোহিত মন্দিরের ভিতরে আসে!* * রথের সম্মুখে, এমন কি মন্দিরের ভিতরেও উৎসবদিবসে কতকগুলা বারবনিতা কুৎসিত ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করে!" (৯)

বার্নিয়ার যে নৃত্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। এবং উক্ত অন্যায় কাণ্ড অদ্যাবধি দেবালয়ের পবিত্রতা কলঙ্কিত করে। কিন্তু তাঁহার প্রথম কাহিনীর কথা আমরা কখনও শুনি নাই; পরন্তু বার্নিয়ারের তথাকথিত কাহিনীতে সত্যের ছায়াপাতও নাই বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

গুরুনানক।—অতঃপর দুইজন ভক্ত ভ্রমণকারীর কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। শিখ-সম্প্রদায়ের বরেণ্য গুরু নানক, ভারত-ভ্রমণকালে, শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। তিনি ও তাঁহার মুসলমান শিষ্য মর্দ্দানা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া, শ্রীমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। কারণ, তাঁহার সঙ্গে মুসলমান শিষ্য ছিল। "তাহাতে বাবা নানক মর্দ্দানাকে বলিলেন—"চল ভাই মর্দ্দানা, আমরা বাহিরে গিয়া বসি। যদি জগন্নাথ স্বয়ং ডাকেন ত যাইব।" বাবা নানক জগন্নাথের বহির্দ্দেশে আসিয়া পরমানন্দে সমুদ্রসৈকতে গিয়া বসিয়া রহিলেন। * * যখন শ্রীজগন্নাথজীউর ভোগ লাগিবার সময় হইল, তখন পাণ্ডারা স্বর্ণথালিতে করিয়া জগন্নাথের ভোগ রাখিয়া আসিল। সেইদিন কিন্তু জগন্নাথের ভোগ লাগিল না।* * পাণ্ডারা ঠাকুরের ভোগ লাগে নাই দেখিয়া, কত প্রার্থনা, কত মানত করিতে লাগিল।* * তখন জগন্নাথের আদেশ হইল যে * *

(৯) Berneer's "Travels in the Mogul Empire." Constable's Oriental Miscellany Vol. I. p.p. 304-306.

আমার পরমপ্রিয় নানককে এখানে লইয়া আইস, তবে ভোগ লাগিবে।" (১০) নানক আসিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সমুদ্রের একদিকে বৃদ্ধ রবি মরণমলিন,—অপরদিকে শিশু চাঁদ সবে আকাশে উঠিতেছে। নানকের প্রেমাঙ্কিত হৃদয়ের ভক্তিবল্লরী, সঙ্গীত-পুষ্পিত হইয়া চিত্তরঞ্জন মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় ধান-শ্রীরাগে ফুটিয়া উঠিল :—

"গগন্‌মে থালরবি চন্দ্রদীপক বনে।
তারকা মণ্ডল জনক মোতি।
* * *
কেয়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি!"

সেইদিন হইতে শ্রীক্ষেত্র, শিখগণেরও তীর্থ।

চৈতন্য।—প্রতাপরুদ্র যখন উৎকলের রাজা, সেই সময়ে চৈতন্যদেব উৎকলে গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ ভ্রমণকারীর মত, তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান নাই,—জীবনের শেষ কয়বৎসর তিনি সেখানেই বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য, "শ্রীমন্দিরে পৌঁছিয়া যাই সেই সুন্দর বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিলেন, অমনি অনুরাগের আবেশে উন্মত্ত হইয়া ঠাকুরকে কোলে করিবার জন্য সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না, মন্দিরমধ্যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।" (১১)

শুনিয়াছি, চৈতন্যদেব কখনও মূলমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। এখন যেখানে বরুণস্তম্ভ আছে, তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া, হাতদুটী যোড় করিয়া প্রতিদিন সেই দয়াল ঠাকুরকে দেখিতেন। দেখিতে দেখিতে, তাঁহার আরক্ত ভক্তিকোমল কমল নয়ন দিয়া মহাপূজার অর্ঘ্যের মত তরল অশ্রুধারা বুক বহিয়া গড়াইয়া পড়িত,—সেই প্রেমাশ্রু-স্তম্ভিতনেত্রে আর পলক পড়িত না—সেই ভাবগদ্গদ পেলবকণ্ঠে আর স্বর ফুটিত না—সেই দিব্য গৌরাঙ্গে আর চেতনার লক্ষণ থাকিত না! সে কি দৃশ্য!

১৪৫৫ শকে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু হয়। সে রাত্রি পূর্ণিমা,—চন্দ্রের রৌপ্যধারায় মেদিনী ভাসিয়া যাইতেছিল। চৈতন্য, ভাবেভোলা প্রেমিকের মত সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্মুখে, একখানি খোলা কাব্যের মত, স্তনন-মুখর সাগরের আকাশ-নীল স-লীল সলিলরাশি অনিল রাগিণীর সহিত রহিয়া রহিয়া, তালে তালে বিচিত্রছন্দে শঙ্খ-গৌর সিকতা-বিতানে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার উৎসঙ্গে প্রতি তরঙ্গ-ভঙ্গে রঙ্গ-চপলা জ্যোৎস্না মৌনহাস্যে নর্ত্তকীর মত নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। সমুদ্রের বুকে চাঁদের ছায়া কাঁপিতেছে,—সে দৃশ্যে চৈতন্য ভাব-সমাধিতে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন।

"ওগো! ঐ আমার কৃষ্ণ গো, ঐ আমার প্রেমের দুলাল!" বলিতে বলিতে সেই পূর্ণচন্দ্রবিম্বকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য তিনি সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। রত্নাকর, এ রত্নকে অবহেলা করিল না, পরমযত্নে আপনার স্নেহ-শীতল কোলে টানিয়া লইল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

(১০) পুণ্য। ১৩০৭। ৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জগন্নাথ তীর্থে গুরুনানক ও জগন্নাথের আরতি" নামক প্রবন্ধ দেখ।

(১১) চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা"। ২য় খণ্ড। ৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বঙ্কিমযুগের কথা।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা শুনিতে পাই, যে তিনি প্রেতিনী দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী-লেখকও উপন্যাসের মত তরলা ভাষায় এই ভৌতিক-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি লেখক মহাশয়, ইহাও লিখিয়াছেন সেই প্রেতিনী "শুভ্র বসনে সমাচ্ছাদিত ছিল।" আমরা অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, যে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে কখনও প্রেতিনী-দর্শন করেন নাই। তবে নাতি নাতিনীরা যখন গল্প শুনিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিত, তখন দুই একটা কাল্পনিক ভূতের গল্প বলিতেন। এবং তাহার নায়ক হইতেন নিজে! নাতিরা এখন বড় হইয়া সেই গল্প সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন নাকি!

কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্যে" দেখিলাম, বরেণ্য আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাহসী ছিলেন না—বরং "নার্ভাস" ছিলেন। কথাটা অনেকটা ঠিক্। বঙ্কিমচন্দ্র যখন মালদহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ তিনি মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত পীড়ায় কাতর হন। সেই হইতেই এইরূপ দুর্ব্বলতার সূত্রপাত।

এমন কি, কেহ মই দিয়া উপরে উঠিতে গেলেও তিনি ভয় পাইতেন। কুকুর কি গরু দেখিলেও তিনি তাড়াতাড়ি শঙ্কিতভাবে লকলকে সাবধান করিতেন। হয় ত কোনদিন তিনি গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছেন—গাড়ী যেমন মোড় ফিরিতে উদ্যত হইল, তিনি ভয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মালদহ হইতে ফিরিয়া, এমনি সামান্য সামান্য কারণে তাঁহাকে বড়ই বিচলিত হইতে দেখা যাইত।

কিন্তু আগে তিনি এরূপ ছিলেন না। পূর্ণবাবুর মুখে তাঁহার সাহসিকতার যে সকল কাহিনী শুনিয়াছি, এখানে তাহার দু একটী বলিলাম।

সুন্দরবনে "পসর্" নামে এক নদী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বর্গীয় ইঞ্জিনীয়ার রামতারণ চট্টোপাধ্যায় একদা নৌকারোহণে উক্ত নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কি মনে হইল,—তিনি সেই নদী সাঁতার দিয়া পার হইতে গেলেন। নদীর মোহনার নিকটে এরূপ ইচ্ছা বড়ই ভয়ানক সুতরাং রামতারণবাবু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সে নিষেধ কাণে তুলিলেন না। কেবল মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন ভয়ের কারণ আছে?" মাঝি চিরকাল জলের উপরে কাল কাটায়—এরূপ দৃশ্যে সে অভ্যস্ত। সুতরাং সে বলিল "না বাবু, ভয় আর কি? বিনা বাক্যব্যয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। এবং সন্তরণ দিয়া অপর তটে গিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি চিরকালই দুর্ব্বলচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে অপরিচিত নদীবক্ষে এরূপ কার্য্যে কখনও সাহস প্রকাশ করিতেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা। হুগলীতে কাছারী বন্ধ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যোড়ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশ তখন অন্ধকার এবং

সেই অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া মেঘের পরে মেঘ,—এমনি অনন্ত মেঘ-শ্রেণী ক্রুদ্ধ তুরগবৎ ছুটিয়া চলিয়াছে। সহসা ঝড় উঠিল,—তুফান জাগিল,—এবং দুকুলপ্লাবিনী-গঙ্গা ক্ষিপ্তা সর্পীবৎ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পার হইবার জন্য নদীতটে বঙ্কিমচন্দ্র! কিন্তু কেহই তাঁহাকে লইয়া ওপারে যাইতে চাহিল না। অনেক কষ্টে তিনি একখানা তিন দাঁড় ভাউলে ঠিক্ করিলেন। এবং ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ৺শ্যামাধব রায়ের আবাসের নিকটে গিয়া, নিঃশঙ্কহৃদয়ে সেই ঝটিকাচঞ্চলা মৃত্যু-ভীষণা গঙ্গাবক্ষে তরী ভাসাইলেন। নৌকা অনেক কষ্টে ওপারে গিয়া লাগিল।

এই সুযোগে আর একটা ঘটনা বলি। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন হুগলীকলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে, তাঁহার একখানি ছোট ডিঙ্গি ছিল। যখন কলেজে থাকিতেন, ডিঙ্গি তখন তট-রোপিত একটা দণ্ডে বাঁধা থাকিত। ডিঙ্গিখানি তাঁহার বড় আদরের ছিল।

একদিন নদীবক্ষঃ চঞ্চল। স্রোত বড় প্রখর,—তুফান জাগিয়াছে। হঠাৎ এক দুষ্ট বালক, ডিঙ্গির বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিল। এই বালকের সহিত বঙ্কিমের ততটা হৃদ্যতা ছিল না। অতএব, সে সুযোগ বুঝিয়া শত্রুতা সাধন করিল। সে ভাবিয়াছিল, এই প্রকার স্রোতে ডিঙ্গি একবার ভাসিলে আর তাহাকে ফেরানো যাইবে না। হইলও তাই। স্রোতের মুখে ডিঙ্গি কার্ম্মুকমুক্ত শরের মত ছুটিয়া চলিল। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। বঙ্কিমও তখন বালক—বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ। এত সাধের ডিঙ্গি ভাসিয়া যায় দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র তখনই জলে লাফাইয়া পড়িলেন। চারিদিক হইতে সকলে হাঁ হাঁ কর কি কর কি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কার কথা বা কে শোনে! বঙ্কিমচন্দ্র, ফিরিলেন না। ডিঙ্গিও ভাসিল, তিনিও ভাসিলেন। তটস্থ ভীতি-ব্যাকুল জনসংঘ ভাবিল, ডিঙ্গিও গেল— বঙ্কিমও গেলেন! কিন্তু না,—জলে ডুবিবার জন্য বঙ্কিম পৃথিবীতে আসেন নাই। সেই গর্জ্জন-মুখর তরঙ্গদলের অনাহত আলিঙ্গন ছাড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ডিঙ্গি ধরিলেন এবং নিরাপদে অন্য এক স্থলে গিয়া তীরে উঠিলেন।

এই সকল ঘটনা, বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ সাহসিকতার প্রমাণ,—তাঁহার দুর্ব্বলতার প্রমাণ নয়। দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, যৌবনের পরে। কিরূপে আসিয়াছিল, আগেই বলিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন ব্যাধিপ্রসাদাৎ দুর্ব্বলচিত্ত,—তখন বরেণ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়। যুবক বঙ্কিমকে অক্ষয় বাবু দেখেন নাই। অন্ততঃ আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। সাক্ষাৎ-কালনির্ণয়ে আমাদের ধারণা ভ্রমাত্মিকা হইতে পারে,—কিন্তু তিনি যে যৌবনে অসমসাহসী ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা ভ্রমশূন্য। এখানে, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহসী বলিয়া শচীবাবু অত্যুক্তি করেন নাই।

পরন্তু, মনের বলই প্রকৃত বল। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন "বাঙ্গালী শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবারও সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালীর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর

এই যে শারীরিক বল বাহুবল নহে। মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। * * * শারীরিক বলে শিখেরা ইংরেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি শিখ ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে। * * যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে—তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে।" প্রবন্ধপুস্তক। ১২ খৃঃ বাঙ্গালীর বাহুবল।

ছোট কথা হইতে বড় কথা আসিয়া পড়িল। তা আসুক,—এমন আসিয়া থাকে। আসল কথা,—মানসিক বল, শ্রেষ্ঠ বল,—তাহার কাছে সকল বল তুচ্ছ। সেই মানসিক বল, বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট ছিল। আনন্দমঠ যাঁহার দান,—"বন্দে মাতরং" মন্ত্রে যাঁহার আত্মপ্রকাশ,—তাঁহার সাহস এবং তাঁহার মানসিক বলের অন্য প্রমাণ কি আবশ্যক। বঙ্কিম দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না।

একটা কথা উঠিয়াছে। যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার পাণ্ডুলিপি কাহাকেও দেখাইতেন না,—ভ্রাতাকেও না! কিন্তু পূর্ণবাবুর নিকট শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনেক পাণ্ডুলিপি পূর্ণবাবুকে শুনাইয়াছেন।

এখন, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের একটী স্মরণীয় পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। এই পরিবর্ত্তন, তাঁহার আদর্শ ফিরাইয়াছিল। ভবিষ্যতে, যিনি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন—এই পরিবর্ত্তনে লক্ষ্য করিলে, তিনি উপকৃত হইবেন মনে করি।

বঙ্কিমের "দেবী চৌধুরাণী" নূতন আদর্শের উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তিনী রচনায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ছিল, আদর্শ চরিত্র ছিল,—কিন্তু তাহার সহিত একটা উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল কি? সত্য বটে, অনেক পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস, ললিতকলাহিসাবে তেমন প্রশংসনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও বোধহয় এইমত ছিল। গতবারের প্রবন্ধে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যিনি প্রকৃত কলাবিৎ,—তাঁহার কার্য্যে কোন একটা উদ্দেশ্য তেমন প্রখরভাবে প্রকট হইয়া উঠে না,—তাঁহার কার্য্য যেন ইন্দ্রজাল—যেন মোহ! এবং সেই ইন্দ্রজাল,—সেই মোহের ভিতরে পড়িয়া আমরা কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ঠাহর করিতে পারি না—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তথাকথিত উদ্দেশ্য, নীরবে আমাদের মানস-পটের উপরে একটা স্থায়ী রেখাপাত করিয়া যায়! প্রতিভার বিকাশ এইখানে,—তাঁহাদের কার্য্যের গুরুত্ব এইখানে!

যাঁহার নিকটে নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার নামে "দেবী চৌধুরাণীকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরমমান্য শিক্ষাদাতা কে? তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঋষিকল্প যাদবচন্দ্রের ধর্ম্মপরায়ণতা বিখ্যাত। এই মহাপুরুষ মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে পুত্রকে নিষ্কামধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া, তিনি একটী ঘরের ভিতরে গিয়া বসিতেন। ঘরের দরজা, ভিতর হইতে বন্ধ থাকিত,—সেখানে আর কাহারও যাইবার আদেশ ছিল না। সেই রুদ্ধদ্বারকক্ষে বসিয়া পিতা নিষ্কামধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, পুত্র তাহা অবনতশিরে ভক্তিপ্লুতচিত্তে

শ্রবণ করিতেন। যাঁহারা কৌতূহলী হইয়া ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেন,—তাঁহারা বিশেষ কিছু শুনিতে পাইতেন না—কেবল পিতাপুত্রের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতেন,—উভয়ে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিছুদিন পরে যাদবচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মৃত্যুপূর্ব্বে পুত্রের হৃদয়ে তিনি যে অমৃতরস বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন,—তাহা অবিলম্বে বিশালক্রমে পরিণত হইয়া যে ফলপ্রসব করিল,—তাহাই 'দেবী চৌধুরাণী'। এই মহাফল যখন পক্ক হইয়া উঠিয়াছিল,—তখন তাহার আস্বাদ কিরূপ মধুময় হইয়াছিল, সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকগণের নিকটে তাহার আর বিস্তৃত পরিচয় দিবার দরকার নাই। তবে, যাদবচন্দ্র, অপাত্রে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই। তাঁহার বীজ উষর ক্ষেত্রে পড়ে নাই।

সমালোচনা।

পৃথিবীর ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। ভারতবর্ষ। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস, কার্য্যালয়, হাওড়া। গত বৎসর এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব, প্রভৃতির বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম। এরূপ গ্রন্থ-প্রণয়নে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়—গ্রন্থকারের সে শ্রম সফল হইলে অল্প লাভ নহে। পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতার সে শ্রম যে সার্থক হইতেছে, ইহা প্রকৃত পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। বিষয়-সমাবেশ পদ্ধতি সুন্দর হইয়াছে। তথ্য-সংগ্রহ-শক্তিও অসাধারণ। বর্ত্তমান খণ্ডে কোশল, বিদেহ, কাশী, প্রয়াগ, মগধ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যসমূহের পরিচয় বেশ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার কোথাও নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। ভারতের ভাষা, বর্ণমালা প্রভৃতি অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে লেখকের অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের শ্রম সার্থক হউক—বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকারী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা ঐকান্তিক প্রার্থনা। গ্রন্থের বাঁধাই উৎকৃষ্ট। ছাপাও ভাল। প্রতি খণ্ডের মূল্য কত, কোথাও লিখিত দেখিলাম না। বর্ত্তমান খণ্ড প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত যার-বঙ্গেশ্বর গ্রহণ করিয়া আন্তরিক গুণগ্রাহিতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা মাত্র। স্বনামধন্য মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যজীবন ও পর জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা লইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাঁহার সম্বন্ধে এক সময় বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজঃ—যাঁহাতে একত্র মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন, এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান" সেই সুরেন্দ্রনাথের কাহিনী শুনিতে কাহার না আগ্রহ হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই মহাপুরুষের কাহিনী পাঠ করিলে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়—আদর্শের সন্ধান মিলে। গ্রন্থখানি সুলিখিত।

লেখক বেশ হৃদয় দিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভাষা সহজ ও স্বচ্ছ। গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্রের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জীবন শিক্ষা। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত। কাশী, শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম, দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। কি করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়—প্রাচীন শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিয়া এই বিষয়ে গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন—সেই প্রবন্ধই পরিবর্দ্ধিত করিয়া বাঙ্গালাভাষায় বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে আয়ুর লক্ষণ, ধর্ম্ম কি, বিবাহ, স্বাস্থ্য, ও দীর্ঘায়ুষ্কর দৈনিক কৃত্য প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনায় যুক্তি তর্কের সুনিপুণ সমাবেশ আছে। আধুনিক কালে গ্রন্থকারের সহিত সর্ব্বত্র একমত হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠ করিলে জীবনটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সুন্দর নিয়মে পরিচালিত করা যায়। সে নিয়ম-পালনে শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিয়মগুলিও যথারীতি পালিত হইবে—সুতরাং পীড়া প্রভৃতির কষ্টও সমধিক পরিমাণে কমিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ভাষা সহজ, কোথাও জটিলতা নাই।

প্রথম শিক্ষা। শরীর ক্রিয়া ও স্বাস্থ্য বিধি। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল, এম, এস প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-নাথ গোস্বামী, ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সহজ—শরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। মূল্যও সুলভ। ছাপা কাগজ ভালো।

কণা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বরিশাল ন্যাশনাল এজেন্সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। প্রত্যেক কবিতাই চারি ছত্রের গণ্ডীর মধ্যে আপন বক্তব্যটুকু সমাপ্ত করিয়াছে। লেখক নবীন—ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। রচনায় প্রাণ আছে ছন্দে সুর আছে ভাবও সুন্দর। আমরা নবীন কবির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সরল ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র। গ্রন্থকার মূল রামায়ণ সহজ পয়ার ছন্দে রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য রচিত। ছন্দোবন্ধে লেখকের কোন কৃতিত্ব নাই—বর্ণনায় সরসতারও অভাব। গ্রন্থে বহুবর্ণে রঞ্জিত অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

অবকাশ। শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত। কাঁঠালপাড়া সাহিত্যসম্মিলনী হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া মহামায়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র। এখানি কতিপয় দার্শনিক ও সাহিত্যিক সন্দর্ভের সমষ্টি। সন্দর্ভগুলি এমনই জটিল ও দুরূহ যে সহজে দন্তস্ফুট হয় না। লেখক অনেক বড় বড় কথা অনর্গল বকিয়া গিয়াছেন—কোন প্রবন্ধই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, কেবল জটিল ভাষা ও তর্কের জাল বুনিয়াছেন, বক্তব্য কোন স্থলেই ফুটে নাই। ভূমিকায় 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ এক মোটা সার্টিফিকেট আঁটিয়া দিয়াছেন—সার্টিফিকেটে তিনি বলিয়াছেন, গ্রন্থ লিখিয়া যিনি যশের প্রত্যাশী, বা অর্থের প্রয়াসী তিনি হতভাগ্য। সমালোচকের দোদুল্যমান খড়্গতলে সোদ্বেগচিত্তে বিনিদ্র নয়নে তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।" আমরাও বলি, এরূপ গ্রন্থকারের দল সত্যই হতভাগ্য!

তর্কবিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ, বি, এ প্রণীত। গৌহাটী, সাহিত্যানুশীলনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা মাত্র। এখানি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী লজিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার বহু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া ইংরাজী তর্কশাস্ত্রের বঙ্গসংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের

একটি অন্তঃবোচন করিলেন। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি বেশ সরল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রচনায় গ্রন্থকারের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বাঙ্গালা লাইব্রেরীর সম্পদ সমধিক বৃদ্ধি করিবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতিও সুন্দর হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা। (২য় সংস্করণ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। তিনি বহু শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া দৃঢ়তার সহিত যে সকল সামাজিক মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনই সমীচীন। স্ত্রীজাতির অবস্থা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিন্তার সামগ্রী—সযত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য। কুসংস্কারপূর্ণ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে কোন সমাজ কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না—জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—সমাজকে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলে চলিবে না—বিধিব্যবস্থাদির যথারীতি পরিবর্ত্তনাদি করিয়া কালোপযোগী হইতে হইবে, নচেৎ অবসাদে সমাজদেহ শীর্ণ ও বলহীন হইবে, এ কথা শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বুঝাইতে হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান সত্য। সামাজিক সমস্যার দিনে এ গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

চিত্রকাব্যম্। ৺ শ্রীপতিসুন্দর ঠাকুর বিরচিতম্। শক্তিপুর মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র। কাব্যখানিতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকটি খণ্ড কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বেশ কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে। কবির ঋতুবর্ণনা-বিষয়ক কবিতাগুলি বেশ সরস। অলঙ্কারে ও ঝঙ্কারে দিব্য পারিপাট্য আছে।

সতীলক্ষ্মী। শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। নিতান্ত অকর্ম্ম রচনা। উপাখ্যানে নূতনত্ব নাই, সেই মামুলি ব্যাপার—জমিদারের অত্যাচারী নায়েব ও চরিত্রহীন জমিদার-পুত্র। শ্রীশ, চারুশীলা ও মজ... বিবি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত "তরুবালা" নাটকের অখিল, তরুবালা ও পারুল। এমন নির্লজ্জভাবে চুরি করিয়া উপন্যাস না লিখিলেই নহে কি? ছি!

পঙ্কজমালা। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। সেন ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি করুণ, মধুর, হাস্য প্রভৃতি বিচিত্র রসের। অধিকাংশ কবিতাই ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাবের অভিনবত্বে ও ভাষার লালিত্যে উপভোগ্য। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির ছাপ থাকিলেও কবির মৌলিকত্ব স্থানে স্থানে সুন্দর ফুটিয়াছে। কেবল 'মুগ্ধ পঙ্ককে' জটিলতা দোষ রহিয়া গিয়াছে—বক্তব্য তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, অপরগুলি সে দোষ হইতে মুক্ত। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থকার বর্ত্তমান গ্রন্থে রামমোহনের বংশ, বাল্যকাল, শিক্ষা, নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত ও সরল। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়-সমূহে পাঠ্য পুস্তক হইবার যোগ্য।

শান্তি। নির্ব্বাণ-রচয়িত্রী প্রণীত। ঢাকা, শ্রীনাথ প্রেসে মুদ্রিত। অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। রচনায় বিশেষ ভাবুকতা বা লিপিকুশলতার পরিচয় না থাকিলেও ছন্দে মধুরতা আছে। কবিতাগুলি মিষ্ট।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় প্রণীত ও প্রকাশিত, ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১।৷০ বাঁধা ১৸০ আনা মাত্র। গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের চতুর্দ্দশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফল, বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। জ্যোতিষ ও বেদের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়া ভূতত্ত্ব, বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল, ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর এই পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, ইহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসিত ঘটনা লিখিত হয় নাই; প্রত্যেক বিষয় তিনি প্রমাণসহ লিখিয়াছেন, রূপক ভাঙ্গিয়া প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক,—প্রত্নতত্ত্বের নিতান্ত নীরস আলোচনা নহে—অভিনব বিষয়সমূহ যুক্তি-তর্কের সুনিপুণ সমাবেশে ও প্রমাণাদির সংযোগে উপন্যাসের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার নানা গবেষণা ও আলোচনান্তে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স এখন ৫৬৩৩৬ বৎসর। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অদ্ভুত গবেষণা ও অনুশীলন-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার ভূমিকায় আপনার ভাষা সম্বন্ধে একটু সসঙ্কোচ হইয়াছেন, কিন্তু এ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই—তাঁহার ভাষা বেশ সরল ও সরস হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালের সুযুক্তিপূর্ণ ও সুদক্ষ আলোচনা। বিশেষজ্ঞগণ ইহা পাঠ করিয়া এক বিরাট অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।

বীরকুমার বধ কাব্য। শ্রী মানকুমারী প্রণীত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রকাশিত। পটলডাঙ্গা জয়ন্তী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১।৷০ টাকা। অভিমন্যুবধ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে মহিলা কবি মানকুমারীর স্থান উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান কাব্যে তাঁহার সে যশ অম্লান রহিয়াছে। রচনায় কবিত্ব ও ওজস্বিতা আছে, তাহা প্রাণহীন নহে। চরিত্রচিত্রণও সুন্দর। অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, অধর্ম্ম করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায়না, গ্রন্থের উপসংহারে কবি ইহার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই ভালো।

মার্কাস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীলালবিহারী বড়াল কর্তৃক প্রকাশিত। বড়ালপাড়া হুগলী। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। মার্কাস অরিলিয়স প্রাচীন রোমের দেবপূজকদিগের মধ্যে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। তিনি গুরুর নিকট উপদেশলাভ করিয়া এই নিয়মগুলি আজীবন পালন করিয়াছিলেন,—কঠিন পরিশ্রম, ভোগবিলাসবর্জ্জন, নিন্দাবাদে ঘৃণা, বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা স্থাপন, অকপট গাম্ভীর্য্য, কোমলভাবে অন্যের দোষ সংশোধন, স্বকীয় অবকাশাভাব অথবা বিশেষ কার্য্যনিবন্ধন সময়াভাবের আপত্তি প্রচার না করা। মার্কাস অরিলিয়সের এই অমূল্য উপদেশবাণীসমূহ বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রবাবু সাহিত্যে অপূর্ব্ব উপহার প্রদান করিলেন। বিদেশীয় সাহিত্যের বহু অমূল্য সামগ্রী তিনি অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে চয়ন করিয়া বঙ্গভাষার সমধিক পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার এ বাণীপূজার আদর্শসাধনা, সকলের অনুকরণের যোগ্য। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান গ্রন্থখানির অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট। বিষয় হিসাবে যেন সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে।

সতীর পতিভক্তি। মরহুমা খায়রণ নেছা খাতুন প্রণীত। পাবনা, মুন্সীবাড়ী, সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। গ্রন্থের নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা মুসলমান মহিলা। তিনি এক বালিকাবিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীর প্রতি নারীজাতির ঐকান্তিক ভক্তি,—স্বামীর মঙ্গলের জন্য আপনার সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন ও স্বামীর সুখেই আত্মসুখ—প্রাচ্য নারীচরিত্রের এক অপূর্ব্ব গৌরব। লেখিকা সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

করিয়াছেন এবং কয়েকটি আদর্শ মুসলমাননারীর আখ্যায়িকার সাহায্যে আপনার বক্তব্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভাবা ভাল। লেখিকার এ সাধু উদ্যমের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভবিষ্যতে এইরূপ আরও অনেক আখ্যায়িকা সঙ্কলিত করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিবেন বলিয়া আমাদিগের যথেষ্ট আশা আছে।

সোহংগীতা। হিমালয়বাসী সোহংস্বামী প্রণীত। ঢাকা হইতে শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। 'নিবেদনে' প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন, 'বঙ্গবাসী-গণের খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মসংঘর্ষণজনিত "বিশ্বাস" ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রণোদিত সংস্কার সকল দূরীকরণ এবং কৈবল্যপ্রদ আর্য্যধর্ম্মাবগতির জন্য' সোহংগীতা রচিত। রচয়িতা সোহংস্বামী বঙ্গবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—সুবিখ্যাত সার্কাস সমূহে দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধে সুখী অদ্বিতীয় বীর গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া একণে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া হিমালয় প্রদেশে ভগবৎসাধনায় রত আছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, একাত্মবিজ্ঞান বা অদ্বৈতবাদ। গ্রন্থকার, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক সর্ব্বধর্ম্মমত. এমন কি, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের (Personal God) অস্তিত্ব অবধি খণ্ডন করিয়াছেন। মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ, স্মৃতিশাস্ত্র-সুবোদিত বর্ত্তমান সামাজিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি শুধু আত্মযুক্তি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বীয় যুক্তি সমর্থনকল্পে বেদ,বেদান্ত,দর্শন পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার যোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থে মল্লযুদ্ধরত শ্যামাকান্তের ও হিমালয়ে আসীন সোহং স্বামীর আধুনিক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সিন্ধুসংবাদ।

(১)

দিগ্বিজয়ী হে বীরেন্দ্র হে সিন্ধু মহান্,
সমর উদ্যোগ নিত্য মহা অভিযান্
সাজাইয়া লক্ষ তরঙ্গের অক্ষৌহিণী
অহরহ অবিরাম বিপুল বাহিনী
সংগ্রাম সঙ্গীত মত্ত, পড়িছ আছাড়ি
নিরুদ্যম তটবক্ষে; দিগন্ত প্রসারি
অনন্ত আগ্রহ তব ব্যগ্র আয়োজন
ব্যর্থ যেন, কোথা প্রতিপক্ষ যোধগণ,
কোথা যুদ্ধ কোথা সন্ধি কোথা পরিণাম
কোথায় অপার শান্তি, একান্ত বিশ্রাম
যুদ্ধ শেষে, ছুটিয়াছে রণ তুরঙ্গম
ফেণমুখ হ্রেষারবে, জয় শঙ্খসম
একাগ্র গম্ভীর, কোথা বিজয় সংবাদ
কোথা পরাজয় স্তব্ধ প্রশান্ত বিষাদ?

(২)

ওগো শান্ত ধরণীর উন্মত্ত প্রেমিক
আন্দোলিয়া উর্ম্মিকেশ, প্রসারি নির্ভীক
মত্ত তরঙ্গের বাহু আসিছ ছুটিয়া
রাত্রি দিন, চাহিতেছ লইতে লুটিয়া
প্রমত্ত আবেগভরে মিলনবিমুখ
বসুধার আলিঙ্গন, সুপ্রশান্ত সুখ
বক্ষ ভরি, এ মত্ততা'বৃথা দুর্নিবার
এ অশান্তি এ ব্যগ্রতা ক্ষুব্ধ লালসার
নিরন্তর আন্দোলন, নহে অভিনব
সৃজন প্রভাত হতে প্রচণ্ড ভৈরব
এই মত আক্রমণে আগ্রহে উচ্ছ্বাসে
আসিছ ছুটিয়া, বসুন্ধরা ভীত ত্রাসে
পলায় সুদূরে, তাই মাঝে দোঁহাকার
সুবিশাল ব্যবধান তপ্ত বালুকার।

(৩)

অন্ধকার মহাসিন্ধু রুদ্র ভয়ঙ্কর
প্রমত্ত অধীর ভীম দুরন্ত প্রখর,
নিয়ত উদ্যোগ তব দৃপ্ত উদ্দীপনা
নিশিদিন নিরন্তর সংগ্রাম ঘোষণা
শ্রান্তিহীন অশান্ত আবেগে শান্ত আমি,
হে বিপুল হে বিরাট হে অনন্ত গামী,
আশা ছিল অবারিত প্রমুক্ত প্রসার
বিশাল হৃদয়ে তব হৃদয় আমার
নিমগ্ন করিয়া রাত্রিদিন ভরি লব
চিরন্তন সমুদার সাম্য মন্ত্রে তব,
করিব সঞ্চয় অন্তহীন সান্ত্বনার
পূর্ণ পরিতোষ : শান্তি কোথা বেদনার!
মৌন আনন্দের গান হৃদয় নিভৃতে,
ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল বক্ষ বিপ্লব সঙ্গীতে।

(৪)

সিন্ধু তুমি সৃজনের কারণ সাগর
অন্তহীন জীবনের জনম জঠর
তরঙ্গ বিক্ষোভ মত্ত অনন্ত মন্থনে
দ্বীপ পুঞ্জ, শৈলমালা সুন্দর গঠনে
উঠিছে জাগিয়া দিকে দিকে অবিরাম,
তাই শান্তি নাহি তব নাহিক বিশ্রাম।
আন্দোলন, আস্ফালন, নিত্য আয়োজন
চলিয়াছে অহরহ, গম্ভীর গর্জ্জন
ধ্বনিছে নিয়ত, ওগো তুমি সে আবার
সৃজনের পরিণাম স্তব্ধ পারাবার
প্রলয়ের, চিরশান্তি ছোটে রাত্রি দিন
দূর দূরান্তর হতে তাই সংখ্যাহীন
নদনদী তোমাপানে, আজন্ম সঞ্চয়
ঢালি ও বিরাট বক্ষে লভিছে আশ্রয়।

(৫)

বহুদিন যে হৃদয় জড় অচেতন
তার কাছে সিন্ধু তব উত্থান পতন
উদ্দাম উদ্যোগ, নিত্য অস্থির উৎসাহ
নিরন্তর আন্দোলিত এ উর্ম্মি প্রবাহ
নিয়ত কল্লোল মত্ত সঙ্গীত ভৈরব
শ্রান্তিহীন তৃপ্তিহীন অনন্ত বিপ্লব
আনে চেষ্টা আনে শক্তি আনে জাগরণ,
বিস্মৃতি বিলোপ করে, করে প্রসারণ
মুগ্ধ দৃষ্টি অনন্তের পানে। কিন্তু হায়
আপন আবেগে নিত্য উন্মাদের প্রায়
যে হৃদয় জাগ্রত অধীর নিশি দিন
তারে শান্ত কর তুমি সুষুপ্তি নিলীন
একেবারে, শ্রাবণের প্লাবন সঙ্গীতে
নির্ঝর বিলাপ স্তব্ধ যেমন চকিতে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নিবেদন।

জানিব না যবে আমি কি দিব তোমায়—
ফুলের মতন যবে চরণ-তলায়
ঝরিয়া পড়িবে মোর এ জীবন মন,
নিয়ো প্রভু, নিয়ো তবে, এই নিবেদন।

জানিব না যবে আমি কোথা হ'তে ধায়—
অশ্রুর মতন যবে ঝরিয়া ধারায়
ভক্তিরসে ভাসাইবে এ জীবন মন,
নিয়ো প্রভু, নিয়ো তবে, এই নিবেদন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমিত্বের প্রসার।

আমিত্বের প্রসার, যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, বাহাদুর,এম,এ, বি,এল প্রণীতএকখানি সুলিখিত দার্শনিক গ্রন্থ। লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ কথায় জটিল দার্শনিক সমস্যা সমূহের এমন সরল সমাধান করিয়াছেন যে সকল পাঠকেরই তাহা মনোরঞ্জন করে। গ্রন্থ খানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ।

আমিত্বের প্রসারে অহঙ্কারের প্রসার। অহঙ্কার বিনাশ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। আমিত্বের প্রসার ও সংহার একই কথা। আমিত্বের সংহারের প্রণালীই আমিত্বের প্রসার। এ তত্ত্বটি ভারতের পুরাতন সম্পত্তি। যদুনাথ অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে মুক্তির বিভিন্ন উপায়ের আলোচনাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চযজ্ঞ, চতুরাশ্রম, চতুর্ব্বর্ণ বিষয়ক বিধানে আমিত্বের প্রসার যে সন্নিহিত রহিয়াছে, এ গ্রন্থে তাহাই দেখান হইয়াছে।

কেবল এই একখানি গ্রন্থ নহে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু সৎগ্রন্থ রচনা করিয়াও যদুনাথ প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি পূর্ব্বে কিছুকাল, লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'ব্রহ্মচারী' ইংরাজী পত্রিকা ও বাঙ্গালা হিন্দু-পত্রিকা আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সম্পাদন করিতেছেন।

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।

কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি দশের কাজে —সর্ব্বত্রই যদুনাথ আপনার অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার কার্য্যে আড়ম্বর নাই, তিনি কাহারও করতালির প্রত্যাশী নহেন,—যাহাভাল বলিয়া মনে করেন, তাহা পরম নির্ভীকতার সহিত, ঐকান্তিক চিত্তে সাধন করেন —কোন বাধা পড়িলে সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

এই অবসরে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যদুনাথ একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ

উপাধিলাভ করিয়া তিনি নেপালের দরবারে Minister of Education এবং দরবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুকাল ওকালতী করিয়া তিনি সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ৺মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে কার্য্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়—এবং পরে আবার তিনি ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এক্ষণে তিনি যশোহরের একজন সুপ্রতিষ্ঠ উকিল।

ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিলেও দেশের কার্য্য করিতে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগ অপরিসীম। কথায় বলে Law is a jealous mistress. যদুনাথ এ প্রবচনের খণ্ডন করিয়াছেন। যশোহরের উন্নতির মূলে যদুনাথের অকৃত্রিম দেশানুরাগ। যশোহরের ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণার্থে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

তাঁহার "A Noteon the Sanitary Condition of Jessore" গ্রন্থে নদীর মুখে চড়া কাটিয়া অল্পব্যয়ে কিরূপে 'মরাগাঙ্গে' জল যাইতে পারে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি Sanitary Act প্রচলন করাইয়া প্রতিগ্রামে Sanitary Taxএর সৃষ্টি, পথ ও পয়োনালানির্ম্মাণ, পুষ্করিণী সংস্কার ও নূতন পুষ্করিণী খনন, খানাপূরণ, ও অন্যান্য পূর্ত্ত কার্য্য সম্পাদনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শুধু মশক মারিলে ও কূপ খনন করিলেই চলিবে না। নদীগুলির সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী আবার আপনা হইতেই ফিরিবে,—যদুনাথের এ মত গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে এবং বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট এ প্রস্তাব আদরে গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আমাদিগের আশা আছে।

কলিকাতার একখানি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক পত্রে যদুনাথের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশিত হয়। He (Jadunath) has indeed been a public benefactor in the true sense of the expression, having published healthy literature, established schools fot the educatlon of the poor and a charitable dispensary for the relief of suffering, encouraged agriculture and industry and laboured for sanitary improvement. Moral, social, religious, civic and sanitary reform has equally been the subject of his untiring activity. * * He enjoys in a pre-eminent degree, the confidence of both the Government and the people. বস্তুতঃ এ উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। যশোহরে জলের কল যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা যদুনাথেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে কার্য্য করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। নীলবিদ্রোহের সময় তিনি প্রজাদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদিগের কার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ভারতবন্ধু ব্রাড্‌লি দ্বারা বিলাতের পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে তিনি move করেন। ইঁহারই চেষ্টায় যশোহর ও ঝিনাইদহের নীলের চাষ উঠিয়া যায়। যশোহরের 'ব্রহ্মচারী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যচর্চ্চার সুবিধা করিয়া দেওয়া, যশোহরের সদরে একটি এবং স্বগ্রাম লোহাগড়ায় একটি—এই দুইটী এণ্ট্রান্স স্কুল ও স্বগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিয়া তিনি দেশের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে অনুকরণীয়। যদুনাথ পরোপকারী, মিষ্টভাষী ও দানশীল। প্রার্থী তাঁহার দ্বার হইতে কখনও নিরাশ হইয়া ফিরে না। স্বজাতির উন্নতিসাধনকল্পে তিনি সম্প্রতি 'বৈশ্যবারুজীবী সভা' স্থাপন করিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও যদুনাথ সুপ্রতিষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের কার্য্যসম্পাদনেও তাঁহার উদ্যোগের সীমা নাই। ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।"

পুণ্যাহ।

শুভাগমন।

আজ প্রায় বৎসরকাল পূর্ব্বে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ স্বদেশের সিংহাসন-অধিরোহণ করিবার পর ভারতবর্ষে আগমন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রথমে তাঁহার এ প্রস্তাবে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার অভিজ্ঞাত সদস্যবর্গ নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার এ শুভ অভিপ্রায় বিচলিত হইলনা। যে রাজার রাজ্যে সূর্য্যদেব কখনও অস্তগামী হয়েন না তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার স্বদেশীয় প্রজাবর্গের হৃদয় হইতে তাঁহার নিরাপদ যাত্রার জন্য যে একান্ত আগ্রহ পূর্ণ প্রার্থনা বিশ্বরাজার চরণোদ্দেশে উত্থিত হইয়াছিল—এবং এই সুদূর ভারতবর্ষের কোটী কোটী প্রজা তাঁহার নির্ব্বিঘ্ন আগমনের মঙ্গল কামনায় আজ কয়েক মাস ধরিয়া মন্দির মসজিদ এবং ভজনালয়ে ঐকান্তিক ভক্তিভরে যে পূজা নিবেদন করিয়া আসিয়াছে সে ভক্তিপূর্ণ আগ্রহ ব্যর্থ হয় নাই। শুভযাত্রা অনুকূল পবনে মঙ্গল-আগমনে পরিণত হইয়া সার্ব্বজনিক আনন্দ বিধান করিয়াছে। ভারতবাসী সহজেই ধর্ম্মভীরু এবং রাজভক্ত জাতি। এতদিন রাজা তাহাদের পূজ্য হইলেও তাঁহার ধারণা স্বপ্নকল্পনার ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। আজ তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিবার জন্য যে তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা এবং সাধ্যাতীত আয়োজন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বোম্বাই বন্দরে অবতরণ দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সম্রাট সম্রাজ্ঞীর প্রীতির জন্য তাঁহার ভক্ত প্রজাগণ উৎসবআয়োজনের দ্বারা যে শুভ স্বাগত জ্ঞাপন করিয়াছে তাহাতেই তাহাদিগের ভক্তির পরিচয় পাইয়া রাজদম্পতি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। উৎসারিত উৎসধারার ন্যায় এই প্রীতি সহজ, নির্ম্মল এবং সুন্দর; ইহার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা কিম্বা কষ্টচেষ্টার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই।

রাজাপ্রজার জীবনে একটি দিন আসে যেদিন দাবীদেনার কথা ভুলিয়া প্রীতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উভয়ের মিলন হয়, সেদিন উভয় জীবনের পুণ্যাহ। সেদিন প্রজা রাজ দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে—এবং রাজাও প্রজাবর্গের ভক্তি-প্রীতির সাক্ষ্যলাভ করিয়া আপনাকে অধিক-তর গৌরবান্বিত বোধ করেন। আজ ভারতের সেই শুভ পুণ্যাহ। রাজাপ্রজার প্রীতি-সম্মিলনের দিন। ইতি পূর্ব্বে দুইবার প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে আধুনিক দিল্লী নগরীতে রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় আয়োজন করিয়া দরবার হইয়াছিল—প্রথম বারের দরবারে রাজপ্রতিনিধি লর্ডলিটন স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্ঞী-পদগ্রহণ ও তাঁহার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতীয় সমগ্র প্রজাবর্গের প্রতি অভয়বাণীর ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বার লর্ড কর্জ্জন স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন অধিরোহণ সংবাদ

ঘোষণা করিয়াছিলেন। দুই বারই রাজপ্রতিনিধিগণ এই বিরাট ব্যাপার সমাধা করিয়াছিলেন কিন্তু এবার যথার্থই রাজসূয় যজ্ঞ সার্থক। এবার আর রাজপ্রতিনিধি নহেন; স্বয়ং সস্ত্রীক সম্রাট ভক্তপ্রজাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজচক্রবর্ত্তীত্ব ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বাধীনে ভারতবর্ষে এ এক অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা। প্রজার প্রতি রাজপ্রীতির এই অপূর্ব্ব সাক্ষ্য ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। মহাভারতে প্রকাশ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্বাপর যুগে ইন্দ্রপ্রস্থে স্বীয় রাজচক্রবর্ত্তীত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মঙ্গলরাজ্যে প্রজাগণ সন্তান নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া অখণ্ড শান্তিতে বাস করিত। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের রাজত্বেও সেই মত মঙ্গলের অনুশাসনে গুণীর আদর, কৃতির সম্মান এবং বীরের গৌরব রক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ শান্তি স্থাপন করিয়াছে। তিনি নিজ মুখে দুই বঙ্গ এক হইল—এই ঘোষণা দ্বারা ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা লক্ষ লক্ষ নরনারী এই বরাভয়প্রদ ঘোষণায় আনন্দোচ্ছলিত হৃদয়ে তাঁহার জয় গান করিতেছি।

রাজবর।

(১)

সম্রাট ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশবাসীদিগকে কি রাজনৈতিক বর দিবেন এই বিষয় লইয়া আজ এক বৎসরকাল ধরিয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে। ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা লোক রাজ অনুগ্রহের উপর নানা রূপ দাবী করিতেছিলেন এবং প্রার্থিত বরের ফর্দ্দ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছিল। কেবল বাঙ্গালী শুদ্ধ একমাত্র বরের প্রার্থনা করিয়াছিল—রাজার নিকট একটি মাত্র প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিল—বঙ্গভঙ্গের খণ্ডন।—আজ রাজার অনুগ্রহে বাঙ্গালীর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং রাজা নিজমুখে বাঙ্গালী যাহা চাহিয়াছিল—সেই বর দান করিয়াছেন। এই ছয় বৎসর ধরিয়া কায়মনোবাক্যে বাঙ্গালী জাতি যে সাধনা করিয়াছে, আজ রাজার প্রসাদে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর জীবন সার্থক হইল। তাই আজ নগরে নগরে সংকীর্ত্তন, ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় তাই আজ অকৃত্রিম রাজভক্তিতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

(২)

রাজা নিজমুখে ঐ একটি মাত্র বর দান করিয়াছেন,—কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যতরূপ রাজনৈতিক সমস্যা আছে—তাহার মধ্যে এই পার্টিশানই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং "পার্টিসান" খণ্ডনের ফল সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের রাজনৈতিক জীবনে সুদূরব্যাপী। আজিকার এ আনন্দের দিনে—এ সম্বন্ধে তর্ক বিচার করিবার সময় নহে। তা ছাড়া—এ কথা যিনি নিজে না বুঝিতে পারেন—যাঁহাকে তর্ক করিয়া ইহা বুঝাইতে হয়,—তাঁহার রাজনীতির জ্ঞান এতই অল্প যে তাঁহার সহিত তর্ক করাও বৃথা।—এই বিষয় লইয়া

ভারত গভর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মন দিয়া তাহা পাঠ করিলে—পার্টিসানের গুরুত্ব সকলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।—রাজা এই পার্টিসান খণ্ডন করিয়া যে কেবলমাত্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহা নহে সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেরও সমান কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেইজন্যই যাহারা ভারতবাসীর রাজনৈতিক উন্নতির বিরোধী, তাহারা এই ব্যাপারে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অধিকারের প্রসারতা বৃদ্ধি যাঁহাদের অভিপ্রেত নয়,—তাঁহারা এই রাজ ঘোষণায় যে কতদূর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন তাহার প্রমাণ—লর্ড ল্যান্সডাউন এবং লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতা।

(৩)

লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন যে এই সংবাদ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। রাজা যে নিজমুখে ঐ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাই লর্ড কর্জ্জনের বিশেষ আপত্তি এবং বিশেষ আপশোষের কারণ। কেন? লর্ড ল্যান্সডাউনের মুখে তাহার উত্তর শোনা গিয়াছে। তিনি বলেন—"সম্রাটের মুখের কথার আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না"। যাহাতে এই পার্টিসান খণ্ডন লইয়া ভবিষ্যতে আবার নূতন করিয়া বাক্‌বিতণ্ডা না উত্থাপিত হয়,—সেই কারণেই বড়লাট লর্ড হার্ডিংএর পরামর্শ অনুসারে রাজা নিজমুখে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং লর্ড কর্জ্জন ভবিষ্যতে এই বিষয় লইয়া যে কঠিন সমালোচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা নিশ্চিত যে রাজার অনুগ্রহে আমরা যে বরলাভ করিয়াছি তাহা আমাদের চিরদিনের সৌভাগ্যের জন্য হইয়াছে।

(৪)

আর একটি কথা। কলিকাতার পরিবর্ত্তে দিল্লি যে রাজধানী হইল, তাহাতে আমাদের লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিবার এ উপযুক্ত সময় নহে। ইহা নিঃসন্দেহ যে বাঙ্গালীর ইচ্ছামত পার্টিসান রহিতের করিয়া যুক্ত-বঙ্গের গভর্ণর নিয়োগ করা এবং কলিকাতা রাজধানী রাখা একত্রে সম্ভব নয়। "গাছের পাড়ব তলারও কুড়োব"—বালকের মত এই আবদার বাঙ্গালীর মুখে শোভা পায় না।

পুণ্যাহ।

এত দিন ধরে আমীর ওমরা এল কত গেল আর,
সুলতান শাহ গোলাম করিলে আসিয়া একটিবার।
প্রতিদিন ধরে পথের উপরে কেনা বেচা কত কাজ,
শাহানশাহার নকীবের হাঁকে সকলি থামিল আজ।
রাজার মিছিলে পথ ছেড়ে দিলে আমীর ফকীর আর,
একটি নজরে লক্ষ মোহর, নজর চরণে তাঁর।
খাজনা আদায়, নহে আজ তাই শুভ পুণ্যাহ আজি,
প্রজার কুটীরে আসিছেন রাজা বরের মতন সাজি।
ওরে শাঁখ বাজা, কর হুলু রব; বল সবে জয় জয়!
প্রেমের মন্দিরে নিখিল রাজার অভিষেক আজি হয়!

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

কমলাসনা

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] মাঘ, ১৩১৮ [১০ম সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বর আবার তাহার নিভৃত গৃহ কোটরে পুস্তক রাশির মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু এবারে আর ইচ্ছায় ও মনে সামঞ্জস্য নাই। পশ্চিমে গিয়া জীবনের যে আস্বাদ সে পাইয়া আসিয়াছে, সে স্মৃতি আর মন হইতে কিছুতেই উঠিতে চাহেনা। পুস্তকরাশিসজ্জিত কাঠের তাক্‌গুলাকে যেন ভারবাহী গর্দ্দভের মত মনে হইতে লাগিল; কক্ষের সে উন্মাদনা শক্তি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কুঠীর মহাজনদিগের নিকটে গিয়া কারবার নিজে দেখিয়া চালাইতে চেষ্টা করিল, ভাল লাগিলনা; মণ্ডলদের ডাকিয়া ভাগে দেওয়া জমীজমার চাষ আবাদ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা দেখিল, দুই দিনে বিরক্তি ধরিয়া গেল। অগত্যা নিষ্কর্ম্মা বিশ্বেশ্বর গ্রামের নদীর তীরে, আম্রকাননে, কদলীবনে, মাঠের শস্য ক্ষেত্রের আগে আগে উদাসী পথিকের ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সময়ে সময়ে মাসিমার নিকটে আসিয়া বসিত। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও কেমন যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। সকল সময়ে আর তেমন হাসিয়া সস্নেহে গল্প করেন না। তাঁহার মনে সর্ব্বদা কি কষ্ট যে জাগিতেছে তাহা বিশ্বেশ্বর বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সেও মাসিমার কাছে সঙ্কুচিত হইয়া বসিত। একদিন মাসিমা স্পষ্টই বলিলেন, "তুই নিশ্চিন্দি থাক্; আমার এতদিন যদি এমনি কেটে গিয়ে থাকে ত' এ কটা দিনও যাবে। যদি কখন' তোর নিজে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে হয় করিস্ আমি তোকে কখন' আর সে কথা বল্‌ব না।"

বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল কিন্তু দেখিল,—যে কথাটা সে কয়েক দিন হইতে তাঁহাকে বলি বলি করিতেছে তাহার এই সুযোগ উপস্থিত। আশা করিল অন্নপূর্ণা আরও কিছু বলিবেন, কিন্তু সে আশা তাহার সফল হইল না। তিনি নীরবে বসিয়া পূজার জন্য তুলার সলিতা পাকাইতে লাগিলেন।

অগত্যা বিশ্বেশ্বর বলিল "মাসিমা, তুমি ওদের কোন' খবর পাও?"

মাসিমা সলিতা পাকান স্থগিদ রাখিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন "কি খবর?"

"এই এখন ওদের কি ক'রে চল্‌ছে।"

"আমিত আর কেপিনি, যে যাদের সঙ্গে অতি নীচের মত ব্যবহার করেছি, তাদের দুরবস্থায় আমোদ করে তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে আস্‌ব!"

বিশ্বেশ্বর এ তিরস্কার কানে না করিয়া

বলিল "তাদের বাড়ী না যাও, অন্য লোকের মুখেও ত' শোন।"

"তারা কি রকম লোক এক সঙ্গে এতদিন থেকেও তুমি জাননা, কিন্তু আমি খুব জানি তারা মরে গেলেও লোকের সাহায্য নিতে ভিক্ষুকের মত হাত পাত্‌বেনা, বা আপনাদের অবস্থা কারুকে জানাবে না। শুনেছি এখন মধ্যে মধ্যে হরি বাড়ী আসে, সে হয়ত এখন দেখে শোনে।" বিশ্বেশ্বর ভারাক্রান্ত চিত্তে বলিল "হরিটা? ওটাত' জাহান্নমে গিয়েছে। সেদিন দেখি সে আর জমিদার নরেন—ডিপুটী বাবুদের যে জামাই, সেই দুজনে খুব বাহার করে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্চে। হরির সে বাবুগিরীর পোষাক অনেক লোকেরই চোখে পড়েছিল। ছিছি তার লজ্জাও নেই!"

"কি জানি বাছা! তার বাহার দেখেই হয়ত লোকে মনে করে ওদের আর কষ্ট নেই।"

"মাসিমা তুমি ওদের বাড়ী এক্‌ এক দিন গেলেই ত পার।"

অন্নপূর্ণা ক্ষণেক ভাবিয়া সবেগে বলিলেন "না, সে আমার দ্বারা হবে না। সতীর মার কাছে আমি মুখ দেখাতে পার্‌বনা, তুমি পারত' কোন সন্ধান নিও।"

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সহজে কোন' উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা যে কষ্টে আছে তাহাতে কোন' সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কিরূপে তাহাদের সাহায্য করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কালীপদ বালক, তাহার দ্বারা কোন কার্য্য করিলে হয়ত জানাজানি হইয়া পড়িবে। সে তাহাতে নিতান্ত নারাজ। বিশ্বেশ্বর ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে রূপেই হোক্‌, সতী বা সাবিত্রীর নিকটে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে এবং কোন' রূপে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করাইতেই হইবে।

স্থির করা সহজ, কিন্তু কার্য্যে করা বড় কঠিন। একেত' তাহার নিজের সঙ্কোচ এক প্রধান বাধা তাহাতে সতী বা সাবিত্রীর দর্শন তেমন সুলভ নয়। গরীবের মেয়ে এবং ভাগ্যদোষে মন্দভাগিনী বলিয়া তাহারা কোথাও বাহির হয় না। কচিৎ কখন' সাবিত্রীকে নদীর ঘাটে জল আনিবার সময় কাহার' চক্ষে পড়ে, কিন্তু সতী তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতের ডোবা বা পুকুর ভিন্ন আর কোথাও যায় না। পাড়াগ্রামে যদিও ভদ্র কুলাঙ্গনাদের ঘাটে পথে বাহির হওয়ার কোন বাধা নাই কিন্তু এস্থলে তাহাদের নিজের অবস্থা-জ্ঞানই সর্ব্বপ্রধান বাধা। বালিকা সাবিত্রীও এখন ক্রমে ক্রমে লোকের আলোচনীয়া হইয়া উঠিতেছে; "ওমা এমেয়েও ত' মস্ত হয়ে উঠেছে, বছর চোদ্দ বয়স হতে চল্‌ল কি করেই বা বিয়ে হবে, কেবা নেবে।" কোন' সহৃদয়া বলিতেন "আহা ওর দিদির যে রকম বিয়ে হয়েছিল, সে রকম বিয়ের চাইতে ও অমনি থাক, তবুত মনের সুখে থাক্‌বে।" অমনি ন্যায়বুদ্ধিশালিনী সমাজসংরক্ষণীয়া শিহরিয়া বলিতেন "ওমা তাও কি হয়! ওসব কপালের কথা, কপালে যা আছে হবে, তা বলে কি বিয়ে বন্ধ হয়! জাত থাকা চাইত।" ঘাটে পথে বাহির হইলেই এই সব কথা উঠে বলিয়া সাবিত্রীও অতি সাবধানে চলিত। জল আনিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে এমন সময়ে ঘাটে যাইত যে তখন

গ্রামের অধিকাংশ লোকই মাধ্যাহ্নিক বিশ্রাম নিমগ্ন।

বিশ্বেশ্বর একদিন ইহা লক্ষ্য করিল। ভাবিল এই যা সুযোগ হইতেছে। ইহাতেও যে কিছু অন্যায় হয় তাহাও যে সে না বুঝিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহা ভিন্ন উপায় কি! ছোট হইতে অদ্ভুত স্বভাববিশিষ্ট মুখচোরা গোবেচারা, ভাল মানুষ বিশ্বেশ্বর পাড়ার ছেলে হইলেও একটু বড় হওয়ার পর আর কাহারও বাড়ীর মধ্যে কখন যায় নাই। এখন কিরূপে সতীদের বাড়ীতে তাহাদের মাতা প্রভৃতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে! তাঁহারাই বা সহসা তাহার এরূপ কার্য্যে মনে কি করিবেন? বিশেষ তাঁহাদের নিকটে সংকোচেরও যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাদের অপমান এখনও হয়ত তাঁহারা মনে করিয়া আছেন।

শুব্ধ দ্বিপ্রহরে বিশ্বেশ্বর "ষষ্ঠীতলার" নিকট পদচারণা করিতে লাগিল। অন্যমনস্কতা বশতঃ এক এক বার সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নগা ঝুরি ধরিয়া টানিতেছিল। শীতের প্রথম সঞ্চারে প্রকৃতির গাত্রে অল্প অল্প কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল, বকসীদের "বেড়ের" পার্শ্ব দিয়া অগ্রহায়ণের ধান্যক্ষেত্র কমলার স্বর্ণাঞ্চলের ন্যায় শোভা পাইতেছে দেখা যাইতেছিল। বেড়ের মধ্যে সরল উচ্চ নারিকেল তরুশ্রেণী যেন ফল ভারে অবনত। কদলীকুঞ্জে ফললোভী পক্ষীদের মহাকোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণে বাঁশঝাড় বঙ্কিম গ্রাম্যপথের মস্তকের উপরে বাঁকিয়া পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের উদাস বায়ু তাহার রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া এক একবার মধুর ঈষৎ করুণ বাঁশী বাজাইতেছে। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল শ্রীসৌন্দর্য্য আশা আনন্দে স্থানটি চিত্রকরের আদর্শবৎ শোভা পাইতেছে। চারিদিকেই কমলার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কেবল দূরে রুক্ষকেশা মলিনবদনা দরিদ্র-বালিকা বৃহৎ কলসীর ভারে হেলিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিল!

বালিকা নিকটস্থা হইল, বিশ্বেশ্বর মূঢ়ের ন্যায় নীরবে রহিল, এমন সাহস নাই যে তাহাকে ডাকে; ডাকা দূরে থাকুক সে এমনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল যে মনে হইল সাবিত্রী তাহাকে দেখিতে না পায় ত ভাল হয়! সাবিত্রী এ অবস্থায় তাহার সম্মুখে পড়িলে হয়ত লজ্জিত হইবে মনে হওয়ায় সে তাহার দুর্বুদ্ধিতায় লজ্জায় মরিয়া গেল। কিন্তু তাহার সে লজ্জা ঈশ্বর সম্বরণ করিলেন না, বাম পার্শ্বে ষষ্ঠী-তলায় দৃষ্টি পড়িতেই সাবিত্রী তাহাকে দেখিতে পাইল। লজ্জিতা, সঙ্কুচিতা, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া সে একবার থামিবে মনে করিল, আবার তখনি লজ্জা সম্বরণ করিয়া আরও অবনত মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর তখন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বুঝিল এখন সংকোচকে না সরাইলে পরে এরূপ সুযোগ লাভ কঠিন হইবে। অনেক কষ্টে একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "সাবিত্রী!"

বিস্মিতা সাবিত্রী দাঁড়াইল, কিন্তু ফিরিল না। বিশ্বেশ্বর আবার ডাকিলেন "সাবিত্রী আমার একটা কথা আছে, তোমায় শুন্‌তে হবে—একটু দাঁড়াও।"

সাবিত্রী দাঁড়াইয়াছিল, এবারে একটু

ফিরিয়া একবার তাহার পানে চাহিয়া নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল "বলুন।"

বিশ্বেশ্বর দ্বিগুণ বিপদে পড়িল। কি বলিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। সাবিত্রী ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া একটু ত্বরিতকণ্ঠে বলিল "কি বল্‌বেন বলুন।"

বিশ্বেশ্বর অপ্রস্তুত হইয়া নতমুখে বলিল "বলি।" তার পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "তোমার দাদা হরি সে এখন বাড়ীতে আসে?"

"মধ্যে মধ্যে আসেন।"

"সে এখন কিছু করে?

সাবিত্রী তাহার পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি করিয়া বলিল "কি করে?"

"এই কোন কাজকর্ম্ম চাকরী টাকরি।"

"করেন বোধহয়।"

"ঠিক জান না?"

সাবিত্রী নতনেত্রে বলিল "না।"

বিশ্বেশ্বর অনেক কষ্টে আরও মৃদুস্বরে বলিল "তোমাদের সংসার সেই ত চালায়?"

সাবিত্রী নীরবে রহিল। বিশ্বেশ্বর বুঝিল সে অসন্তুষ্ট হইতেছে, তখন আর তাহার সঙ্কোচ রহিল না, তাড়াতাড়ি বলিল "তুমি মনে কিছু ক'রনা,—পাড়াপ্রতিবেশীর খবর সবাই জানতে চায়, তাই একথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এতে কি তুমি অসন্তুষ্ট হবে?"

সাবিত্রী অগত্যা মৃদুকণ্ঠে বলিল "না।"

"তোমার দাদা টাকা দেন্ কি? টাকা না হলে ত সংসার চলে না তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"দেন কখন কখন।"

"তাতে সব খরচ চলে? কোন কষ্ট হয় না?"

সাবিত্রী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। বলিল "না। আমি এইবার যাই।"

"আর একটু দাঁড়াও। তুমি আমার নিশ্চয় বল্‌ছ না! কেন সঙ্কোচ কর্‌ছ, আমি তোমাদের ভাইয়ের মতন আমায় বল্‌বে না?"

সাবিত্রী এবারে একটু মুখ তুলিয়া ঈষৎ ক্রোধসূচককণ্ঠে স্থির বিশালনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "আপনি কি সকলের কাছে আপনাদের ঘরের কথা সব বলে বেড়ান তাই আমাকে বলতে বল্‌ছেন! আপনি ত বোঝেন এ সব কথা কারুকে বল্‌তে নেই!"

বিশ্বেশ্বর অপ্রতিভ হইল কিন্তু নীরব হইল না, বলিল "সবারি কাছে বলা উচিত নয় কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তাকে বল্‌লে ত দোষ হয় না।"

হয় বই কি! আর বলেই বা লাভ কি! আমি এইবারে যাই!"

শোন সাবিত্রি! যদিও আমি পর, কিন্তু সত্যই আমি তোমাদের বোনের মত দেখি। আমি তোমার লজ্জা দিতে বা ঠাট্টা কর্‌বার মতলবে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আপনার লোকে যেমন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে আমি তেমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছি, এতে কি এত দোষ হয় সাবিত্রি? যদিও—যদিও আমি পর—কিন্তু—"

সাবিত্রী এতক্ষণ ঈষৎ বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়াছিল এখন বিশ্বেশ্বরের বেদনাযুক্ত কথা শুনিয়া সে বিরক্তি আর হৃদয়ে স্থান পাইল না। তাহার এখনও বোধ হইল যেন বিশ্বেশ্বরের

বৃহৎ চক্ষু জলে ভরিয়া চক্ চক্ করিতেছে। লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সাবিত্রী অধোমুখে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "আমায় মাপ করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আমাদের কিছু কষ্ট আছে কিনা! সত্যই বলছি আমাদের তেমন কোন কষ্ট নেই। দিন ত বসে থাকে না, কেটে যায়।"

বিশ্বেশ্বর একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল "তা জানি, দিন সকলেরই কাটে তবে সুখে, নয় দুঃখে।"

"আমি, দিদি আমরা অনেকটা কাজ করি, মা এখন বড় পারেন না তাঁর অসুখ। দাদাও কিছু কিছু আনেন, কষ্ট খুব বেশী এমন আমরা পাই না।"

বিশ্বেশ্বর বুঝিল আজন্ম দুঃখে লালিতা বালিকার দুঃখ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন বিচার শক্তি নাই। অগ্রসর হইয়া বলিল "তোমার দাদা দিলে তোমরা তা নাও আর আমি যদি তোমার মাকে প্রণামী বলে বা তোমাদের ছোট বোন্ বলে কিছু দি তা হলে কি পর বলে ফিরিয়ে দাও?"

সাবিত্রী অধিকতর বিস্মিত হইল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "তা আমি বল্‌তে পারি না, দিদি জানে মা জানেন।"

"তা হলে এই কাগজখানা তোমার মার পায়ে আমার প্রণামী বলে দিও।" বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর আসিয়া সাবিত্রীর ছিন্ন অঞ্চলে কি একটা কাগজ বাঁধিয়া দিল। সাবিত্রী উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল "না মা,..আপনি মার কাছে দেবেন তা হলে, আমায় কেন মুস্কিলে ফেলছেন,..আমি পারব না, আপনি নিজে গিয়ে যা বল্‌তে হয় বল্‌বেন"—।

বিশ্বেশ্বর ততক্ষণ নিজ কার্য্য সারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—বলিল "তুমি দিও, তার পরে তিনি আমায় ডাক্‌লে আমি গিয়ে সব বল্‌ব। তুমি আমার নাম করে বলো। বাড়ী যাও, অত বড় কলসী নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্চ আর দাঁড়িও না—যাও।" বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর অদৃশ্য হইল। কয়েক লম্ফে সে বাটী গিয়া উপস্থিত হইল,—ভিতরে গিয়া ডাকিল "মাসিমা।"

মাসিমা তখন আহারান্তে একখানা কম্বল বিছাইয়া শীতের নিস্তেজ রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতে করিতে কাশীদাসের মহাভারত পড়িতেছিলেন—

"সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী
পরম লজ্জিত হইয়া কহে মৃত্যুপতি
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা
পবিত্র হইবে লোক শুনি এই কথা।"

বিশ্বেশ্বর গিয়া তাঁহার শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া পড়িল "কি পড়ছ মাসিমা?"

মাসিমা একটি অঙ্গুলি পুস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া অন্য হস্তে বইখানা বন্ধ করিয়া বলিলেন "সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়ছি,—তুই কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িস নি!"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল "পড়েছি বই কি, খুব ছোটবেলায়; এখন কিন্তু মহাভারতের কিছু মনে নেই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু মনে আছে শুনবে—

"রাবণ বলে বানরা শোন তোরে বলি
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি,
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে,
বনের বানর তুই রাক্ষসের ঘরে!"

আরও বলছি শোন, অস্ত্রের নাম শোন,
"সূচীমুখি শীলিমুখী ঘোর দরশন,
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত, বাণ বিরোচন,
কৃতান্ত ঐষিক বনে, বাণ সপ্তশির—"

মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এই সব মনে আছে, আর ভাল জায়গা কোথাও মনে নেই ?"

"বাঃ ওসব জায়গা বুঝি কম ভাল ? তখন ত ঐ জায়গাই বেশী ভাল লাগ্‌ত। যাক্ মাসিমা তোমার সাবিত্রীর উপাখ্যানটা বেশ লাগ্‌ল, পড়না একটু শুনি।"

পুত্রকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া মাসিমা খুসী হইয়া সাবিত্রীর উপাখ্যানের প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বেশ্বর নিবিষ্ট মনে শুনিল, যখন উঠিয়া যায় মাসিমা বলিলেন কেমন লাগ্‌ল রে ?" "বেশ।"

পরদিন প্রভাতে কি একটা প্রয়োজনে মাসিমাতার নিকটে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী এক সাজি শিউলি ফুল লইয়া মাসিমাকে দিতে আসিয়াছে, মাসিমা সস্নেহবাক্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। বিশ্বেশ্বরের কেমন মনে হইল সাবিত্রী হয়ত তাঁহাকে কিছু বলিতে আসিয়াছে। কি কথা ? হয়ত কোন বিষয়ের অভাবই বা জানাইতে আসিয়াছে। নহিলে আর কি কার্য্য হইতে পারে ? আনন্দোৎফুল্ল বিশ্বেশ্বর নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে দেখিল গুটিকত শেফালি ও কুন্দ লইয়া সাবিত্রী তাহার কক্ষাভিমুখেই আসিতেছে। বুঝিল তাহার পুষ্পানুরক্তির জন্য মাসিমা প্রত্যহ যে ফুল কটি তাহার কাঠাধারে রাখিয়া যান তাহাই সাবিত্রীর হস্ত দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। মাসিমার এ ক্ষুদ্র আদেশ সাবিত্রীর উপকারই করিয়াছে। সাবিত্রী দ্বারে উপস্থিত হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করায় বিশ্বেশ্বর স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "এসো সাবিত্রী !"

সাবিত্রী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, ফুল কটি একখানা পুস্তকের উপর রাখিতে রাখিতে মৃদুস্বরে বলিল—"আপনার মাসিমা এই ফুল কটা ঘরে রেখে যেতে বল্লেন।"

"ওই খানেই থাক্। তুমি কি মাসিমাকে কেবল ফুল দিতেই এসেছ, না কোন কথা আছে ?" বালিকার ঈষৎ পাণ্ডুরাভাযুক্ত গণ্ড রঞ্জিত হইয়া উঠিল, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলিল "হাঁ ! শুধু শুধু কি করে আসি তাই ফুল এনেছিলাম।" বলিতে বলিতে অঞ্চল হইতে পূর্ব্বদিন দত্ত কাগজের টুকরা কয়েকখানা বাহির করিয়া পুষ্পের নিকটে রাখিল। বিশ্বেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া পড়িল,—অপ্রসন্ন হইয়া বলিল ওকি,—ওকি সাবিত্রী ?

"আপনার টাকা। দিদি বল্‌লেন আমাদের এ টাকার কোন দরকার নেই। আমাদের চেয়ে যারা গরীব তাদের দেবেন, তারা কত আশীর্ব্বাদ কর্‌বে। আমাদের কোন কষ্ট নেই।" ক্ষণেক পরে বিশ্বেশ্বর নিতান্ত অপরাধীরভাবে মৃদুস্বরে বলিল "তোমার মা ? তিনি কি বল্‌লেন ?"

"তিনি মনে কষ্ট পাবেন বলে দিদি আমায় বল্‌তেই দেয়নি।"

মনে কষ্ট পাবেন ? না না, তা কেন হবে আমি তাঁকে নিজেই বল্‌ব। তিনি অবশ্য দেবেন।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল "তা করবেন্ না। যখন বলেছেন মা নেবেন না, তখন নিশ্চয়ই নেবেন না, মা দিদির কথামতই চলেন। তাহলে আপনি বেশী কষ্ট পাবেন। টাকা রাখুন, আমি ত বলেছিলাম আমাদের বেশী অভাব নয়!" মহাভারতকথিতা সন্ন্যাসিনী অথচ রাজকন্যার ন্যায় গৌরবিনী সাবিত্রী চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর মুহ্যমান ভাবে বসিয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সম্ভ্রান্ত পরিবার বা ভদ্রগৃহস্থ পরিবার যদি কালবশে দরিদ্র হইয়া যায় ত তাহাদের কষ্টের উপরে অত্যধিক আত্মসম্মানজ্ঞান জনিত অভিমান বেশী কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবস্থা সচ্ছল থাকিলে লোকের যে উপকার সচ্ছন্দে গ্রহণ করা যায়, অবস্থার ব্যতিক্রমে সে উপকার যেন শেলের মত অঙ্গে বিঁধে। যেখানে অত্যন্ত বেদনা মনোযোগ সেইস্থানেই অধিক। লোকে তাহা না বুঝিয়া হয়ত এ ভাবকে অহঙ্কার বলিয়া মনে করে। এ অভিমান, মনুষ্যের উপরে নহে, ভগবানের উপরে।

শীতের ম্লান সায়াহ্ন দরিদ্রের অঙ্গনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। সংস্কার অভাবে রান্নাঘরখানা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে। ইটের ঘরগুলা অস্থিপঞ্জর বাহির করিয়া যেন মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতার সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি অঙ্গনটুকু পরিষ্কার, তুলসীতলাটি নিকানো মুছানো। গাছপালাগুলি সযত্ন রক্ষিত। দরিদ্রতা রাক্ষসীকে ঢাকিবার জন্য অন্তরের অশ্রান্ত চেষ্টার প্রমাণ দিতেছে।

কালীপদ বাহিরে খেলা করিতে গিয়াছে। কয়খানি বস্ত্র ক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া সতী তাহা বাঁশের উপরে টাঙ্গাইয়া দিতেছে, সাবিত্রী [illegible] শুষ্ক গোময় লইয়া গোরুর গৃহে উত্তাপের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিতেছে, ধূমে ক্ষুদ্র অঙ্গনটি পূর্ণ। জাহ্নবী একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ লইয়া তুলসীতলায় দিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ। চিন্তাজ্বরে তিনি অবিশ্রান্ত দগ্ধ হইতেছেন। কন্যারা বুঝিত, আবার ভাবিত মার ব্যারাম হইয়াছে,—তাই ঔষধ পালারও জোগাড় করিত, জাহ্নবী নীরবেই থাকিতেন।

কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল "মা আমার লজঞ্চুস্!" মা হস্ত দ্বারা তাহাকে একটু ঠেলিয়া বলিলেন "তোমার দিদির কাছে যাও; তিনি তখন ঠাকুরপ্রণাম করিতেছিলেন। সাবিত্রী ডাকিল, আয়রে কালি! ক্ষান্ত পিসীকে তোর লজঞ্চুস দিদি আন্‌তে দিয়েছে।" সে এল বলে। ভগ্নীর ক্রোড়ে উঠিয়া বালক বলিল "আজ যদি না পাই ত তোমায় খুব মারব। [illegible] অঙ্গের ধূলা মুছাইয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিল "পাবে বইকি! হাঁরে জামা গায়ে দিস্‌নি?" "যে তোদের ছেঁড়া জামা— ঐ জামা মানুষে পরে। বিপিন বড় ঠাট্টা করে ও আর আমি পরব না।" "এই স্থাখ দিদি শেলাই করে ভাল করে দিয়েছে।" বালক জামা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল "ঐ বুঝি ভাল? ও ত শেলাই করা, ও আমি পরব না।" "লক্ষ্মী ভাইটি আমার! স্থাখ দেখি শীতে তোর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে—

শীতও কি লাগেনা। পর, এখন ত বিপিন এসে ঠাট্টা কর্‌তে পার্‌বে না,—ঘরে পর্‌বি কে দেখবে?" বালক কোনমতেই প্রবোধ-বাক্য মানিল না, হাত পা ছুঁড়িয়া সাবিত্রীকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন জাহ্নবী ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অঞ্চলে ঢাকিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, সাবিত্রী চক্ষু মুছিয়া কার্য্যান্তরে চলিল,—সতী লম্বিত বস্ত্রের অন্তরালে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষ্যান্ত বাগ্‌দির মেয়ে এবং তাঁহাদের অত্যন্ত অনুগত। তাহাদের কাটা পৈতা, দড়ি, ফলটা মূলটা লইয়া সে-ই হাটে যাইত এবং বিনিময়ে চাউলাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া দিত। আপনার দুঃখের ন্যায় ভটচাযদের সুখদুঃখেও সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই ভাবেই চলিত, সেই কারণে তাহাদের দৈন্যের কথা সকলে তেমন প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিত না।

একটা ধামা মস্তকে লইয়া ক্ষ্যান্ত এখানে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "সতী মা।" তাহার কণ্ঠের ধ্বনি পাইয়া কালিপদ ছুটিয়া বাহিরে আসিল—"দিদি আমার নেবেনচুন্?" "এই যে দাদা, তোমার লটনচুসি না এনে কি থাকৃতে পারি এই ন্যাও—বলিয়া কাগজের মোড়ক বালকের হাতে দিল। বালক মহানন্দে "ওমা মা—ত্থাখ্ ত্থাখ্" বলিতে বলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সতী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ধামা রাখিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল "শীতে ঠাউরে মরেছিনু, হ্যাঁরে আগুন করেছিস্?" "না।"

"তা আলোটা আন্‌না বাছা। সাবি কোথা রে আলোটা আন্।" সাবিত্রী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল "তেল এনেছ, দাও প্রদীপ জেলে আনি।" "আমার যেমন দশা! না পারি হাঁটতে, রাত হয়ে গেল; আর হাট কি এখানে বাছা! তা ত্থাখ তোদের এখনো টাটকা চোখ আছে, এইত সন্ধ্যে আমি এখনি আঁধার দেখ্‌ছি। এই ন্যাও বাছা তেলের শিশি! চার পয়সার তেল ত্থাখ, এ রাজ্যিতে কি আর বাস করা চলে, যেমন চাল আক্রা তেমনি তেল আক্রা সব মুখপোড়া মিন্‌সেদের এক হাঁক।"

সতী মৃদুস্বরে বলিল "থালা খানায় কত হল?" ক্ষ্যান্ত প্রায় কাঁদিয়া উঠিল সে কথা আর বোলনি মা বোলনি! অমন বগী থালা খানা কিনা মিন্‌সেরা একটা টাকাতেও নিতে চায় না। কিন্‌বার সময় কোন্ না তিনটে টাকা লেগেছিল। মিন্‌সেরা ডাকাত মা ডাকাত।"

সতী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া মৃদুস্বরে বলিল "পুরানো জিনিবে তাই হয় পিসী। তা কত দিলে?"

"এক টাকার কমে ছাড়িনি মা। আট আনা খোকার এই কাপড় খানায় লাগল আর চালে ডেলে নুনে আট আনা,—হিসেব করে নাও মা। পাট কিনে আনিতে আর পয়সায় কুলোল না। আরবারের দড়ি বিক্রীর আট আনায় সবই চাল কিনে এনেছিনু পাট কিনতে কুলোয়নি, এবারেও হ'ল না। তা হ্যাগা পাট কেনা কুলোকেনায় কি হবে? ঘরকন্নার সব বাসন কখানাই কি এমনি করে যাবে?"

"বাসনই বা আর কই? ও কখানা নইলে সংসারও চল্‌বে না—জানি না কি হবে।"

সাবিত্রী দ্রব্যাদি সব ঘরে তুলিল। গৃহ হইতে দুইটা পক কদলী আনিয়া ক্ষ্যান্তকে দিয়া বলিল "গাছের কলা পিসী খেয়ে দেখিস।" ক্ষান্ত রাগিয়া বলিল "রাখ রাখ তোর দিদি খাবে, মায়েরা খাবে। বামুনের ঘরের "আড়" পৃথিবীর সর্ব্ব জিনিষে বঞ্চিত। ঐ সবই তানাদের রাহার।"

"না পিসী তুমি নাও আরও আছে।" সতীও অনুরোধ করিল। অগত্যা ক্ষ্যান্ত বাক্যে ক্ষান্ত দিয়া কলা দুইটা ও ঘুঁটে করিয়া গোয়াল ঘর হইতে একটু আগুন লইয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতে কালিপদ সঙ্গী বালকদের গৃহে খিচুড়ী দেখিতে পাইয়া গৃহে আসিয়া মহা ধূম ধরিল "আমি খিচুড়ী খাব। সাবিত্রী কাতর-কণ্ঠে মাতাকে বলিল "মা ডাল নেই ত।" সতী বলিল "তুই চুপ কর। আমি তোর খিচুড়ী রেঁধে দেব কালই।" আহারের সময় হরিদ্রাবর্জ্জিত অন্ন দেখিয়া বালক প্রথমে প্রতারিত হইল, শেষে বুঝিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইল। সতী নীরবে একধারে সরিয়া গেল, জাহ্নবী যেখানে স্বামীর শয্যা পাতা থাকিত সেইখানে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলেন। কেবল সাবিত্রী দুর্দ্দান্ত বালককে নানাপ্রকার প্রলোভনে শান্ত করিবার বিফল চেষ্টা পাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া শ্রান্ত বালক ঘুমাইয়া পড়িল। পাছে সে জাগিয়া আবার কাঁদে বলিয়া রোয়াক হইতে কেহ আর তাহাকে তুলিল না। সতী অনেকক্ষণ পরে স্নান করিয়া আসিল। সাবিত্রী উঠানের শাক পাতা তুলিয়া একটা ব্যঞ্জনের জোগাড় করিয়া দিল; জ্যেঠাইমা হরিনাম সারিয়া, গাভীকে অনেক গালাগালি দিয়া দুধটুকু দুহিয়া আনিলেন। সতী বলিল "সাবি দ্যাখ ত গুড়ের ভাঁড়ে কি গুড় আছে, তা হলে দুধে দু'ট ভাত দিয়ে একটু গুড় মেখে পায়েসের মত করে রাখি। কালী যে কেঁদে ঘুমিয়েছে খায়ওনি—পায়েস পেলে খুসী হয়ে খাবে।" জ্যেঠাইমা চেঁচাইয়া উঠিলেন "তোদের সব নবাবী! গরীবের আবার অত বড়মানুষি কেন! খায় খাবে না খায় অমনি থাকবে! পেটে জ্বালা ধর্‌লে আপনি খাবে গুড়ট নষ্ট না করলে নয়!" জ্যেঠাইমার তিরস্কার তাহাদের সহিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রী ভাঁড় দেখিয়া বলিল "না দিদি নেই।"

"থাকবে কি! যে সব অলক্ষ্মী! ঘরে কি জিনিষ দাঁড়াতে পায়। ওমা এমন সংসারও দেখিনি!" একে সংসারের কষ্ট তাহাতে বাক্যযন্ত্রণা, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ! সতী নীরবে রন্ধন সারিয়া মাতাকে ডাকিতে গেল দেখিয়া অগত্যা জ্যেঠাইমা বকিতে বকিতে একটু গুড় বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন "এই নে, ছেলেটা খেতে পাবে না তাই না থাকলেও নেই বল্‌তে পারিনে। সেদিন জলটুকু খেয়ে গুড়টুকু রেখে দিয়েছিলাম। এ সংসারে কিছু কি খাবার জো আছে।"

সতী জাহ্নবীকে গিয়া ডাকিল "মা ওঠো, খেতে চল।" জাহ্নবী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "আমার বোধ হয় জ্বর এসেছে। তোমরা খাওগে, দিদিকে দাওগে—আমি আজ আর খাবনা।"

সতী মাতার গাত্রে হস্ত দিয়া বলিল "এ

এরকম জ্বর ত মা তোমার রোজই হয়! না খেলে ক'দিন বাঁচবে। যা পার খাবে চল!"

"না মা আমি খাবনা।"

সতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এর পরে উপোস ত কপালে আছেই মা, আগে হতেই কেন না খেয়ে শুকুবে।"

জাহ্নবী অগত্যা উঠিয়া গিয়া আহারে বসিলেন। তিনি যদিও কিছু দেখেন না কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত সংবাদই রাখেন। বুঝিতেছিলেন এ ভাবে আর বেশীদিন চলা দুর্ঘট। বিষম চিন্তাভারে সতাই প্রত্যহ তাঁহার জ্বর আসিত।

ঘরের আহারীয় অন্ন দ্রব্য দুই দিনেই ফুরাইয়া গেল সংসারে খাইতে চারিটি লোক অথচ কোন উপায় নাই। সকালে উঠিয়া কালী বলিল "মা কিদে খেতে দে।" মা বলিয়া ডাকিল, কিন্তু দাঁড়াইল গিয়া দিদির নিকটে। সতী নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার হাত পা উঠিতেছিল না; বালক তখন ডাকিল "দিদি ওঠ্ না ভাত চড়াবিনে।" দিদি উঠিল না দেখিয়া বালক মাতার নিকটে নালিশ করিতে গেল। সতী তখন মৃদুস্বরে সাবিত্রীকে বলিল "ভাখ দেখি, টোকায় কি একটুকু তুলো নেই?"

"না দিদি।"

"সাবি—তবে আজ উপোস? কালীকে কি খেতে দি? আজ হাট-বার নয়, নইলে কান্ত পিসীকে দিয়ে ঘটটা পাঠাতাম, কি করি সাবি?"

সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল "ওরকমেই বা আর কদিন চল্‌বে দিদি,—তার চেয়ে বিশু দাদার"—সহসা সতী উঠিয়া দাড়াইল, তীব্রকণ্ঠে বলিল "ছিঃ! তার চেয়ে শুকিয়ে মরাও ভাল।"

সাবিত্রী অধোবদনে রহিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল "শুকিয়ে না হয় তুমি আমি মরলাম কিন্তু কালী আর মা? তাঁদের কি ভিক্ষা করেও বাঁচান উচিত নয় দিদি?"

"ভিক্ষা? হাঁ—কিন্তু আরও দুদিন পরে। যেদিন একেবারে গাছতলায় দাঁড়াব, তখন সকলের কাছেই আঁচল পাততে পারা যাবে। তুই ঘটটা আন্ একবার ক্ষান্ত পিসীর কাছে যাই।"

সহসা সাবিত্রী উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল "দাদা—দিদি—দাদা।"

মস্তকে টেরী, হাতে ছড়ি, সুসজ্জিত বেশে হরি আসিয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া বলিল "তোরা কি করছিস্ রে? "দাদা বলিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল।

"কি হয়েছে কাঁদিস কেন? মা ভাল আছে ত?"

সাবিত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আছেন। তুমি কি তা একবার ভাব দাদা? তোমার কালী আজ খেতে পায় নি। মা আর বেশীদিন ভেবে বাঁচেন কিনা সন্দেহ। আমাদের দশা কি একবার তুমি ভাবনা?"

"তা আমি কি করব। বাবা কি পয়সা খরচ করে আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে গিয়েছেন তাই সকলকে পুষব। আমি নিজের বুদ্ধিতে নিজে করে খাচ্ছি, নইলে আমারও এই দশা হ'ত। এই নে দশটা টাকা আমার কাছে আছে, দিচ্ছি! আমি তোদের তেমন ভাই নই।" সাবিত্রী টাকা কটা কুড়াইয়া লইয়া

মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমার মাপ কর দাদা, আমি বড় দুষ্টু, বড় খারাপ হয়েছি—"বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। ভ্রাতা বলিল "নে নে কাঁদিস্‌নে। আমি এখন চল্লাম। পারি ত ওমাসে আর একবার আসব। এ বাড়ীতে কি দাঁড়ান যায়।"

"মার সঙ্গে দেখা করে যাও।"

"দেখা করে আর কি হবে! এসেছিলাম বলিস্।"

হরি চলিয়া গেল। সাবিত্রী বলিল "দিদি ওঠো! ক্ষ্যান্ত পিসীকে ডেকে আনি, সে বাজার করে এনে দেক।" সতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—হ্যাঁ উঠি! ভাখ সাবি আপনার চেয়ে পরই ভাল, কিন্তু তবু পরের কাছেই লজ্জা, আপনার লোকের কাছে লজ্জা নেই।"

সতী এখন কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত হইল। কষ্টে তাহাদের গ্রাহ্য ছিল না কেবল যখন তাহা প্রাণঘাতী রূপে দাঁড়ায় তখনি কষ্ট অনুভব করে। শাক ভাত, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম তাহারা নিতান্ত সচ্ছন্দতার সহিত গ্রহণ করিত। এক্ষণে টাকা কয়েকটিতে বেশী করিয়া পাট, তুলা প্রভৃতি কিনিয়া লইল, সংসারের যাহা নহিলে নয় তাহাই কেবল ক্রয় করিল। কালীপদের জামার কথা তাহারা ভোলে নাই, তাহাও একটা কিনিতে হইল। পরদিন সকালে ক্ষ্যান্ত আসিয়া সতীকে বলিল আজকে বাবুদের বাড়ী শাক বেচ্‌তে গিয়েছিনুম, তা তেনাদের মেয়ে কোমোলা শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে। তোমায় একবার অবিশ্যি করে যেতে বল্লে; না গেলে বড্ড দুঃখ করবে বল্লে।"

সতী দেখিল কমলা এখন' তাহাকে ভোলে নাই। একটু হাসি আসিল,—তাহা সুখের কি দুঃখের বলা যায় না। দ্বিপ্রহরে গেলে অনেকক্ষণ বসিতে হইবে এবং কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া সতী মাকে বলিল "মা আমি এখনি একবার দেখা করে আসি।" "যাও"।

সতীকে দেখিবামাত্র কমলা পূর্ব্বের মতই আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "সতি! ভাই! আমায় ভুলে যাস্‌নি ত? এক একবার মনে কর্‌তিস্?" সতী তাহার পানে চাহিয়া চমকিত হইল। এই কি সেই কমলা? দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহার অঙ্গে সুখসৌভাগ্য ঝলমল্ করিত! সে এখন এমন শীর্ণকায়া, ম্লানমুখী। এ যেন সে কমলাই নয়! বলিল "কমলা এমন হ'য়ে গেছ ভাই? কোন' কি অসুখ করেছে?"

"অসুখ"? বলিয়া কমলা হাসিল। বলিল "আমার কথা ছেড়ে দে। আমার কথা বলছিস্, তোর দশার কাছে আমার কথা! আমি তোর বিয়েও দেখে যাইনি, একেবারে এই দশা দেখ্‌ছি।"

"আমার আবার দশা কি ভাই? আমি যেমন ছিলাম তেমনিই ত' আছি।"

"ভাবতে পারিস্ বটে, শুনেছি তুই বিয়ের সময় ভিন্ন দেখিস্‌নি; তা হলে কি হয় ভাই!"

বাধা দিয়া সতী বলিল "ওকথা ছেড়ে দাও তোমার কি হয়েছে বল? তোমার তেমন হাসিমুখ নেই কেন?"

"তুই আমারই কথা আন্‌ছিস্ আমি কেবল তোর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি। সতি।

দেখ্‌তে সত্যি তেমনি আছিস্‌ বটে কিন্তু তোর বেশ দেখে আমার চোখ বুজ্‌তে ইচ্ছে করছে। ভাই কি পাপে আমাদের এমন দশা?” কমলা সতির গলা ধরিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল। সতী নীরবে প্রস্তর-পুত্তলির মত বসিয়া রহিল। ক্রমে সুস্থ হইয়া কমলা মুখ তুলিল। সতী বলিল “পৌষ মাসে তারা আস্‌তে দিলে?”

“দুবছর আসিনি, দেখ্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হ’ল, এলাম। এলেই হল, গেলেই হ’ল, কে বারণ কর্‌বে?”

“কেন স্বামী?” কমলা আবার হাসিল। সতীর সে হাসি বড় করুণ বোধ হইল। কমলা হাসিয়া বলিল “স্বামী? আমি তাঁর কে যে বারণ কর্‌বেন বা আমার খোঁজ রাখ্‌বেন। ভাই মেয়েমানুষ আর ফুলের মালা এক, বাসি হলেই মাটীতে গড়াগড়ি! আমাদের আদর কদিন?” সতী নতমুখে বসিয়া রহিল। কমলা বলিতে লাগিল “কিছুরি স্বাদ জানিস্‌ না এক রকম বেশ আছিস, কিন্তু এ বড় জ্বালা সতী। এখন আমি তোর আমার তুলনা করে বুঝেছি, মেয়ে মানুষ কেবল দুঃখের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। সুখ তাদের জন্য নয়! তা’রা যেন সে আশা না করে।”

সতীর মনে পড়িল একদিন সে কি কার্য্যের জন্য বাহিরের দ্বারের নিকটে কালীকে ডাকিতেছিল এমন সময়ে জমিদার নরেন ভাদুড়ীকে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া সরিয়া আসে,—কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কদর্য্য দৃষ্টি দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্য সে কথা মনে পড়িল এবং মনে হইল সত্যই কমলার সুখ জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ গল্পের পর সতী বলিল “তবে এইবার ভাই উঠি?”

“বোস্‌ আর একটু, আবার কবে দেখা হবে কি না হবে তারও ঠিক নেই।” সতী একটু শিহরিয়া বলিল “কেন ভাই অমন অলক্ষণে কথা বল, এলেই দেখা হবে।” কমলা হাসিয়া বলিল “আমি মর্‌ব বলিনি, তত ভাগ্য আর আমার নয়। এইত এসে দেখ্‌ছি তোর বাবা নেই, তুই বিধবা, আবার এসে আরও কিছু দেখ্‌তে পারি।” সতীও একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল।

আর একটু বসিয়াই সতী বিদায় লইল। কমলার দশা চিন্তা করিতে করিতে ভারাক্রান্ত চিত্তে বাটী চলিল। বামে বক্‌সীদের বেড়, দক্ষিণে বাঁশঝাড়, বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। সতী অন্যমনে নত নেত্রে চলিয়াছে, সহসা সম্মুখে কে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল “কে সতী? সতী?”

সতী মাথা তুলিয়া দেখিল বিশ্বেশ্বর।

সঙ্কুচিতভাবে মস্তকের কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া সতী পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা বিশ্বেশ্বর পথ পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেলে সে অগ্রসর হইবে। বিশ্বেশ্বর সরিয়া গেল বটে, কিন্তু অগ্রসর হইল না, অস্পষ্ট ভাবে গলাটা একবার ঝাড়িয়া দুএকবার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল “সতি! আমি তোমার প্রতিবেশী সম্পর্কে ভাই হই, আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা কই সেটা কি দোষের হয়?” সতী উত্তর দিল না, বিরক্তি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অনেক ভাব এক সঙ্গে তাহ’কে

আলোড়িত করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর পুনশ্চ বলিল "বোনের সঙ্গে কথা কইলে কি দোষ হয়?" সতী এইবার চেষ্টা করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "কি বলবেন শীগ্‌গির বলুন"। বিশ্বেশ্বর মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমি তোমার মাকে প্রণাম করেছিলাম, তুমি তা ফেরত পাঠিয়েছ।"

"দরকার হয়নি তাই ফেরত পাঠিয়েছি জানবেন।"

"দরকার না হোক্, তবু কেউ যদি ভক্তি বা স্নেহ জানায় তা কি লোকে ফিরিয়ে দেয় সতী?" সতী একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল, কেবল তীব্র কণ্ঠে বলিল "যারা নেবার উপযুক্ত লোক তারা নিতে পারে কেন না তাদের অভাব নেই। আর তাদের বোধহয় আপনি ওরকম প্রণাম করতেও যান্‌না আমরা গরীব জেনেই ওরকমে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। আমরা গরীব সত্য, কিন্তু ভেবে দেখুন যতক্ষণ আমরা নিজে চালাতে পারব ততক্ষণ কেন পরের ভিক্ষে নেব।"

বিশ্বেশ্বর বহুক্ষণ নীরবে রহিল। সতীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমায় মাপ ক'রো, আমি তোমাদের ভিক্ষা দিতে যাইনি। বিশ্বাস কর আমি—আমি কেবল তোমাদের স্নেহ"—বাধা দিয়া সতী বলিল "আপনিও আমায় মাপ করবেন আমি আপনার মত দয়ালু লোককে কঠিন কথা বলেছি। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। ভগবান এখনো এক রকমে আমাদের দিন চালাচ্ছেন, যেদিন আর চালাবেন না, সেদিন কেবল আপনি কেন সকলের কাছেই আমাদের ভিক্ষা নিতে হবে।"

আমায় মাপ কর সতি! আমি তোমাদের বোনের মত ভেবেই এ কাজ করেছিলাম।"

"তা আমি বুঝেছি।"

তার পরে আরও একটু অগ্রসর হইয়া সতী একবার বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল "আপনি বোধহয় আমাদের অবস্থার কথা মধ্যে মধ্যে ভাবেন কিন্তু তা ভেবে মন খারাপ করবেন না, পরন্তু দাদা এসেছিলেন; তিনি এখন চাকরী করছেন বোধহয়। তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন, সে মানুষ হলে আমাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না।"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্চি সে মানুষের মত হোক্। তোমরা আর না কষ্ট পাও। তার মতিগতি তাহলে এখন ভাল হয়েছে! বড় সুখী হলাম। সতি সরল ভাবেই বলছি তোমার ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর তা মনে থাকবে না! তুমিও রাখবে না?"

"না?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাসটা জাহ্নবী কোনরূপে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলেন কিন্তু ফাল্গুন মাসের প্রথমেই একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন। অসুস্থ দেহে নীরবে দুর্দ্দান্ত শীত উপেক্ষা করিয়া কাটাইয়া দিয়া শেষকালে আর পারিয়া উঠিলেন না। মাতার এই নির্জ্জীব ভাব দেখিয়া সতী চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

দরিদ্রের গৃহে চিকিৎসার তেমন ধূম ধাম নাই তথাপি তাহাদের সাধ্যমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। হারাণ ডাক্তার কষ্টেক

টাকা ভিজিটের এবং ঔষধের বিল পাঠাইল। তাহা পরিশোধ করিতে সতী সংসারে যাহা কিছু সচ্ছলতা আনিতে পারিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। আবার সেই রক্তশোষণকারী অবস্থা আসিয়া তাহাদের ঘিরিল। জাহ্নবী কন্যাদের পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন "আমি ভাল হই ত এমনি ভাল হব, এই অবস্থায় কেন তোরা এত খরচ করছিস্।" সময়ে সময়ে সংসারের খোঁজ লইতেন, তাহারা কোন কষ্ট পাইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। সতী বলিত "মা তুমি অত ভেবনা, তাহলে ভাল হতে পারবে না। আমাদের দিন চিরকাল যে রকমে কাটছে সেই রকমেই কাটবে। দাদা বাড়ী এলেই আর অভাব থাকবে না, এ দুদিন না হয় একটু কষ্ট হ'লই।" জাহ্নবী ভাবিয়া বলিলেন "তবে হরির কাছে একবার খবর পাঠা।" "পাঠিয়েছি, দুদিন পরেই দাদা আসবে।"

সতী মাতার কাছে বলিতে পারিল না যে যাহাকে পাঠাইয়াছিল, তাহাকে কটূক্তি করিয়া হরি ফিরাইয়া দিয়াছে। হরি ক্রমশঃই অধঃপাতে যাইতেছে। তথাপি সে মনে করিল আর একবার দাদাকে ডাকিতে পাঠাইবে। ক্ষ্যান্ত পিসীকে আবার অনেক করুণ কথা শিখাইয়া ও কালিপদকে সঙ্গে দিয়া চাঁদপুরে পাঠাইল। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল হরিবাবু কলিকাতায় গিয়াছেন। সতী নীরবে ঈশ্বর স্মরণ করিল।

সংসারে অবশিষ্ট যাহা তৈজসপত্র ছিল ক্ষ্যান্ত গিয়া একে একে হাটে বেচিয়া আনিতে লাগিল এবং তাহাতেই রোগীর পথ্য এবং সংসার একরূপে চলিতে লাগিল। তথাপি তাহারা কাহার' নিকটে হাত পাতিতে পারিল না দুরবস্থার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। আপনাদের অবস্থাজনিত সঙ্কোচে তাহারা কাহারো বাড়ী যাইত না, কাজেই তাহাদের বাড়ীও বড় কেহ আসিত না। সেই জন্য তাহাদের অবস্থা সকলে বড় একটা জানিত না।

সতী যতদূর সম্ভব টানিয়া সংসার চালাইত। পাছে কালীকে কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া তাহাকে একটু সচ্ছন্দে রাখিয়া গোপনে দুই ভগিনীতে প্রায় অর্দ্ধোপবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি বেশীদিন আর এভাবে চালাইয়া উঠিতে পারিল না।

চৈত্রের শেষ হইয়া আসিতেছে। রোগিনী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। সংসারের এ অবস্থা সত্ত্বেও সতী যেন অন্ধকারে কূল দেখিতে পাইল। আবার ভাবিল রোগের কবল হইতে মুক্ত হইয়া মাতাকে হয়ত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। যুক্ত করে আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সতী শেষ রাত্রে মাতার শয্যাপার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িল। অতি প্রত্যুষে জাহ্নবী সতীকে ডাকিলেন "সতি! সতি! ওঠ্।" ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "কেন মা? কি হয়েছে?" কিছু হয়নি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা ভারী খারাপ হয়েছে, আমার বুকে একটু হাত বুলো।" সতী মাতার বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিল। কন্যার বিশুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জাহ্নবী

বলিলেন "মা বিপদেঁ অধৈর্য্য হয়োনা, ভগবান চিরদিন সমান রাখেন না, বিপদে পড়লে তাঁকে ডেকো, অবিশ্যি কূল দেবেন" সতী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "একথা এখন কেন বলছ মা"?,

"কি জানি প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করছে।"

সাবিত্রী উঠিল। মায়ের পদতলে একটু বসিয়া গৃহকার্য্যে প্রস্থান করিল। কালিপদ উঠিয়া এক চোট খেলা করিয়া আসিয়া বলিল "দিদি কি খাব!" কালিকার শেষ সম্বল দুইটি চাল আপনার অসুখ বলিয়া না খাইয়া ভ্রাতার জন্ত অতি যত্নে সতী বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই চাউল ক'টি ভাজিয়া আনিয়া একটু নুন মাখাইয়া ভ্রাতাকে দিল। ছোট ধামিটি লইয়া খাইতে খাইতে কালিপদ বাহির হইয়া গেল। সতী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা তোমার তেষ্টা পেয়েছে?"

"না।" "হাঁ৷-পেয়েছে! উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আহ্নিক সার। কিছু খাও।" জাহ্নবী একবার কন্তার প্রতি চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন "মা আমি এক রকম করে বাঁচবোই, এ কঠিন প্রাণ সহজে বেরুবে না, কিন্তু আমার সমুখে বাছা, তোমরা যেন অনাহারে শুকিও না। আমি না খেলেও বাঁচবো। সতী সেকথা কানে না করিয়া মাতাকে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়াইয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল। জ্যেঠীমা গরুর দুধটুকু দুহিয়া দিয়া বকিতে বকিতে নদীস্নানে বাহির হইলেন। সতী ভাবিয়াছিল আজ আর সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইবে না; কিন্তু মাতার জন্ত তাহা পারিল না, ভাবিল যতক্ষণ দুধটুকুও আছে ততক্ষণ মাতাকে মরিতে দেওয়া হইবে-না। সাবিত্রীকে বলিল সাবি তুই উনুনটা ধরা আমি চটু করে ডুব দিয়ে আসি।" সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল উনুন ধরিয়ে কি হবে?" "দুধ জাল দেব।" বলিতে বলিতে একটা কলসী লইয়া সতী খিড়কী দ্বার খুলিয়া পুকুরে চলিল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল একটু দড়ী দিয়া একখানা ভাঁজ করা কাগজ কে দ্বারের বাহিরে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এখানা কি? একখানা পত্রের মত দেখাইতেছে, কৌতূহলবশতঃ খুলিয়া লইয়া দেখিল পত্রই বটে! অপরিচিত হস্তের অক্ষরে তাহারি নাম উপরে লেখা রহিয়াছে! বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল, তথাপি মাতা পিপাসিতা স্মরণ করিয়া পত্রখানা ইঁটের পাশে গুঁজিয়া রাখিয়া সে বাহির হইল। বাটী আসিয়া ভিজা কাপড়েই দুধটুকু জাল দিয়া অর্দ্ধেকটুকু ভ্রাতার জন্ত রাখিয়া অর্দ্ধেকটুকু মাতাকে খাওয়াইল। জাহ্নবী বহু আপত্তি করিলেন শেষে কন্তার চক্ষে জল দেখিয়া অগত্যা আর একটু ঢালিয়া রাখিয়া দুধটুকু গ্রহণ করিলেন।

সতী তখন সিক্ত বস্ত্রেই ঘাটের দিকে চলিল। পূর্ব্বদিনের উপবাসে শরীর অত্যন্ত জ্বালা করিতেছিল। তাই সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিলনা। ইঁটের ফাঁক হইতে পত্রখানা লইয়া প্রথম সম্বোধন পাঠ করিয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। শেষে অনেক চেষ্টায় ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্রখানা পড়িয়া লইল। পত্রের লেখক নরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী জমিদার স্বয়ং, তাহার কমলার স্বামী। অতি কদর্য্য ভাষায় কদর্য্য প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছে।

তাহাদের দুঃখে অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে যে তাহার প্রস্তাবে চলিলে তাহাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সতী আবার জলে গিয়া নামিল; পত্রখানা পড়িয়া যেন সে অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছে, তাই পুনঃ পুনঃ ডুব দিয়া অনেকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া বাড়ী গেল। সাবিত্রী বলিল "দিদি আবার নাইলি? কিছুতে পা দিয়েছিলি বুঝি?"

"হাঁা।"

তারপরে সাবিত্রীকে বলিল "আমার বড় অসুখ করছে, আমি একটু শোব।"

সাবিত্রী শুষ্ক মুখে বলিল "কালীকে কি খেতে দেব দিদি?"

"দুধটুকু দিস্। একটু তুই খাস্ একটু তাকে দিস্।" সতী কাপড়খানা নিঙড়াইয়া লইয়া একটা ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহার শরীরে তখন সত্যই অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। পড়িয়া থাকিতে থাকিতে শ্রান্তদেহে ক্লান্ত চক্ষে নিদ্রা আসিল, সতী ঘুমাইয়া ক্ষণেক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, শুনিতে পাইল, ভাতের পরিবর্ত্তে দুধ পাইয়া কালিপদ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। দুধটা ফেলিয়া দিয়া খুব কাঁদিতেছে, সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছে। সতী অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণকুহর রোধ করিয়া প্রস্তর পুত্তলীর মত পড়িয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে দুয়ারে আঘাত পড়িল "দিদি—দিদি উঠে এস।" সতী উত্তর দিল না! "দিদি উঠে এস—বিশু দাদার মাসিমা কি সব পাঠিয়েছেন দ্যাখ।" সতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার খুলিল, দেখিল একজন ভারী একদিকে একটা পুষ্পচন্দনশোভিত জলপূর্ণ কলসী ও অন্যদিকে একটি প্রকাণ্ড সিধা লইয়া ডাকা-ডাকি করিতেছে। সতী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এ সব কিসের?"

"আজকে সংক্রান্তি—মাঠাকরুণের অন্নদানের বেরতো—বামুন বাড়ী দিতে হয় তাই?"

একে একে সব নামাইয়া দিয়া ভারী চলিয়া গেল। সাবিত্রী ভোজ্যের ফল মূল দিয়া কালিদাসকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সতী ধীরে ধীরে আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া রাঁধিতে গেল। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অগ্নির উপরে পড়িল তাহা অগ্নির মতই জ্বালা বিশিষ্ট। তাহা ভগবান বা মনুষ্যের কাহার উদ্দেশে—বলা যায় না।

আবার ধীরে ধীরে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। সতী যথা স্থানে আবার একখানা পত্র পাইল, তাহা নানা প্রলোভন পূর্ণ। চিঠিখানা পূর্ব্বমত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সতী নীরবে রহিল। সাবিত্রীকে একথা বলিতে সাহস পাইল না, পাছে সে ভয় পায়।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এবার বৈশাখ মাসে বোধ হয় অনেক ব্রত লইয়াছিলেন। পাঁচ সাত দিন অন্তরই ভোজ্যাদি, ফলাদি, জলপূর্ণ কলসী নানা ব্রতের নামে তাহাদের বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। সতী বুঝিল দারিদ্র্য অবস্থা মৃগনাভীর মত। সমস্ত বুঝিয়াও সে নীরবে রহিল কেননা এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে অতি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর যুঝিবার সাধ্য নাই। এই

দিন সংসারের ভাবনা একটু দূরে সরাইয়া পাঁচটা অবান্তর চিন্তা ভাবিয়া দেখিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের এ নিরুদ্বেগ ভাব মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ হয় ভাগ্য দেবতা বিধান করেন নাই। সহসা একদিন তারাপুরের কুঠীর মনিব তাঁহার প্রাপ্য তিন শত ও তাহার সুদ তিন শতের তাগাদা করিয়া পাঠাইল। না দিতে পারিলে অবিলম্বে বন্ধকী বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইবে তাহাও বলিয়া পাঠাইল।

সে'দিন জাহ্নবী আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। তিনি না খাইলে কন্যারা কিছু খাইবে না দেখিয়া অগত্যা মুষ্টিমাত্র আহার করিয়া শয্যায় গিয়া পড়িলেন। দুর্ভাবনায় ক্ষীণ দেহে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। সাবিত্রী ম্লান মুখে মাতার নিকটে বসিয়া রহিল সতী একটা জীর্ণ কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ঘুমাইতে কি?

সে ভাবিতেছিল কাহার জন্য অস্ত এ বিড়ম্বনা! তাহাদের উদরের দায়ে ত এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় নাই। কেবল তাহারি জন্য! তাহার সুখ সচ্ছন্দতা কিনিতে গিয়া পিতা মাতা নিজেরা আশ্রয়হীন হইয়াছেন! তাহাকে সুখী করিবার জন্য এ বিড়ম্বনা! সতী আপনি মনে কাতরতার বিকট হাসি হাসিল। কাহার নিকটে এ বিপদে ভরসা পাইতে পারা যায়, কে এমন সময়ে আশ্রয় দিতে পারে! কাহাকে বলা যাইতে পারা যায় ওগো আমাদের মত দীন ভিক্ষুককে তোমার ছয় শত টাকা ঋণ দিতে হইবে! এমন কেহ নাই! যদিও থাকে কে এমন নির্লজ্জ আছে যে তাহার নিকট এমন কথা বলিতে পারে! সতীর আবার মনে হইল হয়ত বলিতে হইবে না, আপনিই সে সাহায্য করিতে আসিবে। ছি ছি কি হেয় জীবন! কেবল কি ভিখারীর মত তাহার দয়া আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! আর কি কোন উপায় নাই?

সাবিত্রী ডাকিল "দিদি ঝড় এল, কাপড় কখানা তুলে আন, আমি ছোঁবনা।" সতী দ্বার খুলিয়া দেখিল তাহার অন্তরের ভাব অনুকরণ করিয়া প্রকৃতিও তুমুল বিপ্লব বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছে। কাপড় কখানা তুলিয়া মনে পড়িল; ঘরে জল তোলা নাই, সমস্ত রাত্রি দুর্যোগ থামিবে না, সংস্কার অভাবে শুষ্ক কূপ বারিহীন। সতীকে কলসী কক্ষে লইতে দেখিয়া সাবিত্রী বলিল "জল নেই বুঝি? আনি না দিদি!"

"তুই মার কাছে বস্ আমি এক দৌড়ে জলটা নিয়ে আসি।" জলে নামিয়া কলসী ডুবাইয়া কক্ষে তুলিতে গিয়াই সতী সহসা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; পাড়ের উপরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন লোক! কে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল নরেন্দ্র।

ভয়ে চীৎকার করিতে গেল, কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না, জলে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁপিতে লাগিল। নরেন হাসিয়া বলিল "ভয় কি সুন্দরি! আমি বাঘও নই ভালুকও নই, দু দুখানা পত্রের একখানারও জবাব দিলেনা যে?"

সতী সাহস সঞ্চয় করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "ভাল চান্ তো সরে যান্, নইলে আমি চেঁচাব।"

"এমন বোকার মত কথা বল্‌ছ? তুমি না খুব বুদ্ধিমতী! হাতের লক্ষ্মী পায়ে

লেছ! এই দশায় আছ, রাণীর মত থাক্‌বে। আমি শুনেছি তোমাদের বাড়ী শীগগিরই ক্রোক করবে। তখন তোমরা কোথায় দাঁড়াবে? আমার কথায় রাজি হও, তোমার মা ভাই বোনেরও আর কষ্ট থাক্‌বে না।"

সতী জলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইতেছিল যেন সাক্ষাৎ যম নরেন্দ্রের রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। পাপিষ্ঠ আবার বলিল "কি বল? রাস্তায় রাস্তায় মা ভাই বোন নিয়ে ভিক্ষে করা ভাল,—অনাহারে তাদের মৃত্যু দেখা ভাল—না আমার কথায় রাজি হওয়া ভাল?"

সতী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেন্দ্র দেখিল তাহার ঔষধ ক্রমে ধরিতেছে, সোৎসাহে আবার বলিল "আমি হরির কাছে হ'তে তোমাদের সব খবর রাখি। যেদিন অবধি তোমায় দেখেছি সেই দিন হ'তে তোমার কথা আমার জপমালা হয়ে আছে। ভাল অবস্থায় থাকলে তোমরা কিছু গ্রাহ্য করনা, তাই এতদিন সাহস পাইনি। তুমি যদি আমার হতে চাও, তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না, যা চাবে তখনি তা পাবে। এই বিপদে পড়েছ, বল, এখনি তোমার টাকার দরকার কত?"

সতী আর্ত্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল "তুমি যাও, যাও, শীগগির যাও, নইলে এখনি জলে ঝাঁপ দেব।"

"আচ্ছা আচ্ছা—তা এখন যাচ্চি,—কাল এই সময়ে আসব কি? আসব—কি বল? ঝড় আসছে তুমি বাড়ী যাও।"

সতী বলিল "তুমি আগে যাও তবে উঠব।"

"কেন আমি কি সাপ যে কাছ দিয়ে গেলে ছোবল দেব? আজ তবে বিদায়।"

পাপিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আর সতী কাঁপিতে কাঁপিতে সেই জলের মধ্যেই বসিয়া পড়িল। মানুষের সর্ব্বনাশী কুপ্রবৃত্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার চারিদিকে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিল। সতীর আর সাধ্য নাই যে তাহাদের নিবারণ করে। যেন আশে পাশে অন্ধকারময় দেহধারীরা তাহার চারিপাশে আসিয়া তাণ্ডবনৃত্য বাধাইয়াছে। ভয়ে সতী নিষ্পন্দ হইয়া পড়িল, এমন সাহস নাই যে অঙ্গুলীটি নাড়িতে পারে।

সহসা দেখিল পুকুরের দক্ষিণপার্শ্বে কে একজন ছুটিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল, তীক্ষ্ণনয়নে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপরে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সতী চিনিল, বিশ্বেশ্বর! বুঝিল নরেন্দ্রকে সে নিশ্চয় পুকুরের পাড় হইতে নামিতে দেখিয়াছে। সতীর এক একবার মনে হইতেছিল এখনই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে কে রক্ষা করে! কিন্তু সবলে মনকে ফিরাইয়া অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া সে উঠিয়া বাড়ী চলিল। আর এখন সে কাঁপিতেছে না, তাহার সঙ্কল্প পর্ব্বতের মত দৃঢ়। তাহাকে দেখিয়া সাবিত্রী উৎকণ্ঠিত মুখে বলিল "দিদি এত দেরী হল?

"আমি ঘাটে যাচ্ছিলাম।"

"কাপড় ভিজেছে, পড়ে গেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।" জাহ্নবী শুনিতে পাইয়া অন্তর্ভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রভাতে জাহ্নবী সাবিত্রীকে বলিলেন, "ঝড়ে সব আমগুলো পড়ে গেছে, এই কাঁচা আম চারিটে আর বেল ফুল ক'টা বিশুর মাসীকে দিয়ে আয়ত মা।"

আম দিয়া ফিরিয়া সাবিত্রী বলিল "মা তিনি অক্ষয়তৃতীয়ায় গঙ্গাস্নান করতে নবদ্বীপ যাচ্চেন। বল্লেন, তোর মা ভাল থাকলে তোর মা কি দিদি যেতে পারতেন। মা! উনি বড্ড আদর করেন, ভারী লজ্জা করে।" জাহ্নবী একবার নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন সঙ্গে কে যাচ্চে?" "বিশু দাদাই যাচ্চেন।"

সেদিন অমাবস্যার ব্রতের প্রকাণ্ড একটা উৎসর্গীকৃত সিধা, পৈতা, সাদা একখানা কাপড় প্রভৃতি আসিল। জাহ্নবী নীরবেই রহিলেন; সতী একবার ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিল। ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানাদির প্রামাণ্য বিষয়।

শঙ্করের মতে অনুমানাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় মাত্র। শুধু তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। "নৈষা তর্কেন মতির আপনেয়া"। আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ"। তিনি বলিতেছেন :—লৌকিক মণিমন্ত্র-ঔষধাদির মধ্যে ও দেশ কালের বৈচিত্র্য অনুসারে পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক প্রকার কার্য্য-সাধক শক্তি দৃষ্ট হয়। বিনা উপদেশে কেবল তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া জানিতে পারা যায় না যে, এসকলের মধ্যে এই বস্তুর শক্তি এই পরিমাণ, অমুক বস্তুর সাহচর্য্যে অমুক বিষয়ে বা অমুক প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার শক্তি প্রকাশ হয়। অতি সামান্য বিষয় সম্বন্ধেই যখন এরূপ, তখন অচিন্ত্য প্রভাবশালী ব্রহ্মের স্বরূপাদি শ্রুতির উপদেশের সাহায্য ভিন্ন জানা যায় না, তাহা আর বিচিত্র কি? এই সকল কারণে শঙ্কর বলিতেছেন—"শ্রুতি বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল, শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ নয়। অতএব শ্রুতি যেরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বলে, সেই রূপেই লাভ করিতে হইবে। অ-২। পা-১। সূ-২৭॥

আমরা দেখিতেছি যে শঙ্করের মতে শ্রুতি "অপৌরুষেয়," "স্ববিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ" প্রমাণ, বা "প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ," এবং "প্রত্যক্ষ" স্থানীয়। শ্রুতির সংজ্ঞা কি? শতাধিক উপনিষদ্ আছে—সকলই কি শ্রুতি? অথচ শঙ্কর সে সকলের মধ্যে মাত্র বারখানা প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ কেন? শ্রুতির "স্ববিষয়ের" বিস্তারই বা কতদূর? শ্রুতি অপৌরুষেয়, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণ-যোগ্য কেন? স্ববিষয় সম্বন্ধে যদি শ্রুতি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষবৎ হইল, তবে বিষয়ান্তর সম্বন্ধে সেরূপ নয় কেন? শ্রুতিকে প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া আবার তাহাকে শব্দ প্রমাণের মধ্যে গণ্য করার অর্থ কি? শ্রুতি যদি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধই হইবে

তবে বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী হয় কেন? চার্ব্বাক্ বেদকর্ত্তাদিগকে ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচর বলিবার কারণ কি? শঙ্কর এই সকল প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। বোধ হয় যেন তিনি অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেছেন "জন-সাধারণের জ্ঞান পরের অধীন"। বিনা বিচারে শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্বাদি স্বীকার করাতে, তাঁহার নিজের প্রতিও কি কতক পরিমাণে সে দোষ আরোপ হইতে পারে না? শ্রুতি নিজেকে অপৌরুষেয় বা স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে এমন শ্রুতিপ্রমাণেরও শঙ্কর উল্লেখ করিতেছেন না। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বেদের স্বতঃসিদ্ধত্বের আলোচনা করিতে গিয়া বেদের 'স্বতঃ প্রামাণ্যের' বিরুদ্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেনঃ "অতি সুশিক্ষিত নটও নিজের স্কন্ধে নিজে আরোহণ করিতে পারে না।" শ্রুতির প্রামাণ্য বিচার করিতে গেলেই তর্ক বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতির পবিত্রক্ষেত্রে উদ্দাম তর্ককে একবার প্রবেশ করিতে দিলে কি আর রক্ষা আছে? তর্কের স্রোতে পড়িয়া মানব সমাজ কোন্ অপরিজ্ঞাত অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইবে, কে বলিবে? হয়ত বেদের প্রামাণ্যের বিচার করিতে গেলে বেদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে, হয়ত চার্ব্বাকের সঙ্গে মিলিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে—'ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ'! বিচারে হয়ত বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা অসাধ্য হইতে পারে; তাহার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমূলে উন্মূলিত হইয়া গিয়া, হৈতুক বৌদ্ধমত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বা চার্ব্বাকের প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হইয়া যাইবে। "ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনাং" 'অজ্ঞানী কর্ম্মাসক্তদিগের মনে সংশয় উৎপাদন করিবে না' গীতার এই নিষেধবচন কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হইলে,' তাহা সত্যের বিভীষিকাব্যঞ্জক, অথবা মানব প্রকৃতির এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব-ব্যঞ্জক কি না পাঠক চিন্তা করিবেন। অপরদিকে শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্ব বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিতে না দিলে পরিণামে "সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো"ই দাঁড়ায়। আরিষ্টটল্ বলিয়াছিলেন—"তর্ক করা যদি ভাল হয় তবে তর্ক করিতেই হইবে, আর তর্ক করা যদি ভাল না হয় তবেও তর্ক দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। অতএব উভয়থা তর্ক করিতেই হইবে।" ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে শঙ্করের মতন সিদ্ধ-হস্ত তার্কিকও শ্রুতির প্রামাণ্য বিষয়ক তর্কের বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মুক্তভাবে বিচার দ্বারা বৌদ্ধ এবং চার্ব্বাকমত খণ্ডন করিয়া শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। একথা সত্য যে 'তর্ক' বলিতে আমরা সচরাচর জিগীষামূলক কুতর্কই বুঝিয়া থাকি, ন্যায় যাহাকে 'বিতণ্ডা' এবং 'জল্প' নামে অভিহিত করিয়াছে। বস্তুতঃ সত্যানুরাগ প্রণোদিত জিগীষাশূন্য তর্ক বা বিচার, ন্যায় যাহাকে 'বাদ' নামে অভিহিত করিয়াছে, তাহাই আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক প্রদীপস্বরূপ। বিভীষিকা দর্শনে সেই বাদ কথার গতি রোধ করা আর মানব সমাজের জীবন প্রবাহ রোধ করিয়া মৃত্যুর

দ্বার উন্মুক্ত করা একই কথা। শঙ্কর নিজেই দুঃখ করিতেছেন যে "জনসাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণে অক্ষম। এজন্য তাহারা বিখ্যাত প্রণেতাদিকৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে এবং তদ্বলেই শ্রুতির অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি তাহা বিশ্বাস করিবে না।" স্বাধীন চিন্তার অভাবই লোক-সমাজের রোগ। কোনরূপ বিভীষিকার ভয়ে লোকের স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করিলে, লোকের জ্ঞান যে আরও অধিকতর পরাধীন হইয়া পড়িবে! স্বাধীনভাবে তর্ক করা এবং সকলকে তর্ক করিতে দেওয়াই সেই পরাধীনতা মোচনের একমাত্র উপায়। সত্যই মানবের একমাত্র লক্ষ্য। "লোকে বিশ্বাস করিবে না" এই ভয়ে সত্য যাহা বুঝিয়াছ তাহা গোপন করা অথবা "স্মৃতি প্রণেতাদিগের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অতএব সত্য হউক আর না হউক স্মৃতি অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়"—এরূপ কথা শঙ্করের পক্ষে শোভা পায় না। তাহাতে সত্যের প্রতি সমুচিত আস্থা প্রদর্শন করা হয় না। তর্কের উদ্দেশ্য সত্য নির্দ্ধারণ, তর্কদ্বারা সত্যপথ স্থির করিয়া সেই পথে চলিতে হয়। তর্কে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই ভ্রমও তর্ক দ্বারাই সংশোধন হয়, কোনরূপ কল্পিত বিভীষিকা বা লোক-বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন দ্বারা নয়। সত্য-পথের জ্ঞান লাভ হইলেই তর্কের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। সে পথে চলা না চলা মানবের প্রযত্ন এবং পুরুষকার সাপেক্ষ। তর্ক পুরুষকারের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। গম্য পথ জানিয়াও অনেকে সে পথে চলে না, বা বিপথে চলে, বা বিতণ্ডা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। কিন্তু সে দোষের জন্য বাদ বা তর্ক দায়ী হইতে পারে না। আমেরিকা-যাত্রী তর্ক দ্বারাই তাহার গম্যপথ নির্ণয় করিবে, কিন্তু তর্ক তাহাকে আমেরিকা লইয়া যাইবে না। আমেরিকাগমন পুরুষকার এবং প্রযত্নসাপেক্ষ। নির্ম্মুক্তভাবে সত্যের জন্যই সত্য নির্দ্ধারণ মানসে তর্ক করিলে যদি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা স্বতঃসিদ্ধত্ব চলিয়া যায় যাউক। ভয় কি? বরং তাহাতে সত্যের পথই কণ্টকমুক্ত হইবে। সত্যই মানবাত্মার অন্নজল। শ্রুতি স্বয়ংই সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, সত্য জিজ্ঞাসুকে উৎসাহিত করিতেছে:—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনা ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা, যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানং"॥ মুণ্ডক॥ 'সত্যেরই জয় মিথ্যার নয়—সত্যের ভিত্তিতেই দেবলোকের পথ প্রতিষ্ঠিত, যে পথ আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম ঋষিগণ সত্যের পরমাশ্রয় সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।" তর্কদ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্য সম্যক প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান শ্রুতি-মূলক, শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত দোষশূন্য হইতে পারে না। জরাসন্ধের দেহ-সন্ধির ন্যায় ইহাতেই শঙ্করের দার্শনিক সিদ্ধান্তের দুর্ব্বলতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(৫)

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বঙ্কিম-যুগের একজন প্রধান কবি।

বাঙ্গালার বিস্তমান সাহিত্য যখন সবে ভোরের আলো দেখিয়াছে—তখনই বিহারীলালের আগমন। সাহিত্যক্ষেত্রের সর্ব্ববিভাগেই তখন এক একজন প্রতিভাবান্ বিচরণ করিতেছিলেন। বিহারীলালের সমাদর কাব্যক্ষেত্রে। এ'যুগের গীতিকবিতায় যে নূতন রাগিণী শুনিতে পাই,—বিহারীলালের বীণার তন্ত্রীতে সর্ব্বপ্রথমে তাহা বাজিয়া ওঠে। আগেই বলিয়াছি, তেমন গৌরবোজ্জ্বল যুগ আর নাই,—আর হইবে কিনা, কে জানে!

প্রথমবয়সে বিহারীলাল, গস্ত পস্ত—দুই লিখিতেন। "পূর্ণিমা" নামে তখন একখানি মাসিক ছিল। কবিবর হেমচন্দ্র, ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি উক্ত মাসিকে রচনাপ্রকাশ করিতেন। (১২৬৮—৬৬) বিহারীলাল, তাহার পর "অবোধবন্ধু" নামে একখানি মাসিকপত্র, নিজেই পরিচালন করিতে থাকেন। "স্বপ্নদর্শন" নামে বিহারীলালের একখানি ছোট গস্তের বই ছিল। সে বই এখন পাওয়া যায় না। বিহারীলালের কবিতা অনেকেই দেখিয়াছেন, এখানে তাঁহার গস্তের একটু পরিচয় দিতেছি।—

"হা আমার জন্মভূমি! তোমার একি দশা হইয়াছে! হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ! যে আমি তোমাদের সহিত লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি; হা! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে। হা কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না? হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা অধিদেবতে! তোমরা কোথায়? হে সূর্য্য! দেখ দেখ! তুমি যে দেশের প্রান্তরে কিরণদান করিতে, যে দেশের ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল করিতে, যে দেশের শস্য সতেজ রাখিতে, যে দেশের কমলিনী প্রফুল্ল হইয়া তোমার প্রতি কতই আনন্দপ্রকাশ করিত, সে দেশের কি বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে!"

৺দীননাথ চক্রবর্ত্তী, বিহারীলালের পিতা। তিনি পৌরহিত্য করিতেন; অনেক ধনী, তাঁহার যজমান ছিলেন। বিহারীলাল, তাঁহার একমাত্র পুত্র। শুনিতে পাই, ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। কাশ্মীররাজের অধীনে তিনি একবার চাকরী করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার মত সৎলোক কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমাল ও শঠতার ভিতরে বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারেন না। দু'বৎসর কাজ করিয়াই তিনি ইস্তফা দেন!

বিহারীলালের অনেকগুলি অধুনাপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের ভিতরে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি নাম উল্লেখ্য। এ'যুগের দুইজন প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার শিষ্যস্থানীয় ছিলেন।

তাঁহারা, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার। সেকালকার অনেকের রচনায় বিহারী-লালের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার পাঠকদের নিকটে তিনি আশানুরূপ সম্মান পান নাই।

বিহারীলাল নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। ১। বঙ্গসুন্দরী। ২। সারদামঙ্গল। ৩। সাধের আসন। ৪। সঙ্গীতশতক। ৫। প্রেম-প্রবাহিনী। ৬। বন্ধুবিয়োগ। ৭। নিসর্গ-সন্দর্শন। ৮। বাউল-বিংশতি। ৯। স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি। কার্ত্তিক মাসের "আর্য্যাবর্ত্তে"র "পুরাতন প্রসঙ্গে" দেখিলাম, বিহারীলালের "সুরবালা" নামে একখানি কাব্য ছিল। "সুরবালা" নামে বিহারীলালের একখানি কাব্য ছিল বটে,—কিন্তু কোন অপ্রকাশ্য কারণবশতঃ বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে তাহা আর মুদ্রিত হয় নাই। বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী"তে "সুরবালা" মিশাইয়া যায়। "বঙ্গসুন্দরী"তে "সুরবালা"র নিম্নলিখিত সর্গগুলি আছে। ১। চির-পরাধিনী। ২। সুরবালা। ৩। করুণাসুন্দরী। ৪। বিষাদিনী। অভাগিনী। ৬। বিরহিনী। দ্বিতীয় সংস্করণে "বিরহিনী"তে কতকগুলি নূতন গান দেওয়া হয়।

"বঙ্গসুন্দরী" বিহারীলালের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকটে উপহারস্বরূপ সমর্পিত হয়। পুস্তকে তাঁহার নাম নাই বটে,—কিন্তু আমরা যতদূর জানি, বিহারীলালের উক্ত বন্ধু, শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। "বঙ্গসুন্দরী"তে প্রধানতঃ যে ছন্দঃ অনুসৃত হইয়াছে, বাঙ্গালায় আগে তাহা ছিল না; "রঘুবংশ" হইতে বিহারীলাল সর্ব্বপ্রথমে সেই ছন্দঃ বাঙ্গালায় গ্রহণ করেন। এই নূতন ছন্দের মাধুর্য্য, আমরা এখানে দেখাইতেছি :—

"বিকশিত নীলকমল আনন,
বিলোচন নীলকমল হাসে;
আলো করে নীল কমল বরণ,
পুরেছে ভুবন কমল বাসে।

* * * *

শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
সীতার মত সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা;
কালরূপে আলো করি চরাচর
কে গো এ বিরাজে মুগুধা বামা!"

বঙ্গসুন্দরী। তৃতীয় সর্গ। সুরবালা।

"বঙ্গসুন্দরী" প্রভৃতি পুস্তক, বিহারীলাল যেরূপ সুন্দর কাগজে সুন্দরভাবে ছাপাইয়া-ছিলেন—সেকালে তাহা দুর্লভ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদামঙ্গল" পাঠকগণের কৃপাদৃষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে, একদিন মহা চটিয়া গিয়া, কবিবর, বইগুলি বটতলায় বিক্রয় করিয়া দিলেন!

বিহারীলালের রচনা-প্রসাধন বড় বেশী রকম ছিল। একবার যাহা লিখিলাম—তাহা আর দেখিব না,—বিহারীলালের এ নীতি ছিল না। যতক্ষণ না একটী শব্দ, তাঁহার মনের মতন হইত,—ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। "সারদামঙ্গল" প্রথমে "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাব্যখানি যখন পুস্তকাকারে বাহির হইল,—তখন তাহার ভিন্ন মূর্ত্তি! এই কাট্ ছাঁটের

ভিতরে পড়িয়া সময়ে সময়ে বিহারীলাল অনেক ভাল অংশ বাদ দিয়া বসিতেন। কবির একখানি দপ্তর ছিল। তাহার ভিতরে কবিতাগুলি থাকিত। একবার তাঁহার একখানি কাব্য-পুস্তক ছাপা হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ এক যায়গায়, একটী শব্দের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়িল। শব্দটি, তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তখনই সেই অংশের ফর্ম্মাটি দ্বিতীয়বার প্রেসে দিলেন,—আগেকার ফর্ম্মা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর ইচ্ছামত একটী নূতন শব্দ পূর্ব্ব শব্দের স্থানে বসাইয়া দিলেন।

বিহারীলালের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহে সন্তানাদি কিছু হয় নাই। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে, বিহারীলাল অনেকগুলি সন্তানসন্ততি লাভ করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল, যেমন বন্ধুবৎসল, তেমনি সদানন্দ ছিলেন। তাঁহার চিত্ত উদার ছিল—তিনি কদাপি সংকীর্ণতার দিক্ মাড়াইতেন না। তিনি দু'জন কবিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদিগের ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা বাল্মিকি ও কীট্স। তাঁহার মুখে প্রায়ই কীট্সের প্রশংসা শোনা যাইত। তিনি নিজেই গান বাঁধিতেন, নিজেই তাহাতে সুরসংযোগ করিতেন এবং নিজেই গান ধরিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না বটে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! গান, আনন্দের ভাষা—আনন্দে তাহার অভিব্যক্তি। কবিবর অক্ষয়-কুমারের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার দাঁত ছিল না,—কিন্তু সেই দন্তবিরল মুখেই ভাবে-ভোলা বৃদ্ধ কবি, গলা ছাড়িয়া গান ধরিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তবলার অভাবে দু'হাতে তক্তাপোষ পিটিয়া চমৎকার গাজনা চলিত।

এখন যেমন বন্ধুজনের বিবাহে প্রীতি-উপহার দিবার চলন হইয়াছে,—তখন তাহা ছিল না। তখন, স্কুল-কলেজের মাষ্টার ও পণ্ডিতগণ যখন অবসর বা বিদায় লইতেন, ছাত্রেরা কবিতায় একটী অভিনন্দন দিত। "বিহারীলাল এরূপ অনুরোধের কবিতা লিখিতে চাহিতেন না! সুতরাং এই মৎলোব মাথায় লইয়া যদি কেহ বিহারীলালকে অনুরোধ করিতে আসিত, তাহা হইলে বৃদ্ধ কবি রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে যাইতেন! ছোক্রারা তখন পলাইবার পথ পাইত না।

বিহারীলালের ভিতরে কতটা কবি-প্রাণ ছিল, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে। এখন যেমন বেলা একটা ও রাত্রি নয়টার সময়ে তোপ পড়ে; তখন তেমন ছিল না। তখন রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে একবার ও ভোর ছয়টার সময় (বোধ হয়) আর একবার তোপ পড়িত।

বিহারীলাল ছাদে বসিয়া আছেন। ছাদের উপরে তাঁহার এক সাধের বাগান ছিল। কতকগুলি ফুলগাছের টবে, ফুলের গাছে অনেক ফুল ফুটিয়া থাকিত। সেদিন, পরিষ্কার পূর্ণিমার রাত্রি—নীলাজ্জ্বল আকাশে চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিহারীলাল, কলিকায় আগুন দিয়া ধূমপানের আশায় ছাদের উপরে বসিয়া, চাঁদের দিকে চাহিলেন। সেই সময়ে রাত্রি ৯॥ টার তোপ পড়িল। এদিকে চাঁদ দেখিতে দেখিতে কবির প্রাণ-বিহগ, মনঃকল্পিত কল্পনা-নন্দনে দুপাখা মেলিয়া উড়িয়া গেল। এবং নিখিল বিশ্বের উপরে যেন একটা বিস্মৃতির

আবরণ, যেন একটা স্বপ্ন-যবনিকা বিস্তৃত হইয়া গেল। কবিবর, তখন স্বভাবের শোভার ভিতরে—প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভিতরে, ধ্যানমগ্ন যোগীর মতন বসিয়া!—হাতে কিন্তু হুকা আছে, কারণ বাতাসে তামাক ধরিতেছিল!

হঠাৎ আবার তোপ পড়িল। কবির ভাব-সমাধি টুটিয়া গেল! তামাক ধরিয়াছে ভাবিয়া, বিহারীলাল হুকায় একটী টান দিলেন —কিন্তু রাত্রি ৯৷৷০টা হইতে ভোর ৬৷৷০টা পর্য্যন্ত তামাক ধরিতেছিল, সুতরাং আগুন তখন নিবিয়া গিয়'ছে। অতএব, দশ ঘণ্টা ধরিয়া, কবিবর, কেবল চাঁদের 'জোছনা' পান করিয়াই কাটাইয়া দিলেন—তামাক খাওয়া আর হইল না!

এই ছাদটি, নিশ্চয়ই বিহারীলালের কাছে অতি প্রিয়স্থান ছিল। কবির "শরৎকাল" পড়িয়া জানিতে পারি, একদা "শারদ্ পূর্ণিমা"য়, তিনি প্রিয়ার সহিত এই ছাদে "যামিনী-যাপন" করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাটী তিনি ভাবময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত দশদিশি।
জ্যোস্নায় ঘুমায় তরুলতা,
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাই কোন সাড়া শব্দ,
পাপিয়ার মুখে নাই কথা।
ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে
জ্যো'স্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে।
* * *
আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই;"

* * * *

তারপর,—নিশান্তে।

"আহা স্নিগ্ধ সমীরণ!
কোথা ছিলে এতক্ষণ,
এস মোর আদরের চির-সহচর।
আলুথালু হ'য়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া,
আলুথালু কুন্তলে সুখে খেলা কর।
* * * *
উঠ প্রেয়সী আমার—
উঠ প্রেয়সী আমার—
হৃদয় ভূষণ কত যতনের হার!
হেরে তব চন্দ্রানন
যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার।
উঠ প্রেয়সী আমার।
* * * *
ওই চাঁদ অস্ত যায়;
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান;
হিমেল্ হিমেল্ বায়,
হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির মুকুতা জালে ভিজেছে বয়ান;
উঠ প্রেয়সী আমার, মেল নলিন নয়ান।"

কবির কি প্রাণ! কি প্রেম!

আমার অনুমান ঠিক কিনা, তাহা বলিতে পারি না,—কিন্তু আমার মনে হয়, এ যুগের কাব্য সাহিত্যে একটা কৃত্রিমতা প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। যে কথা, সোজা-সুজি বলা যায়, সে কথাটী অকারণে এমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হয়, যে তাহার ভিতর হইতে কাব্য-লক্ষ্মীর একটী অখণ্ড, পরিপূর্ণ মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। সকল কবির কবিতাই যে এই দোষে দুষ্ট, এমন মিথ্যাকথা বলিবার সাহস আমার নাই—তবে, সাধারণতঃ

অনেকের প্রতিই আমার কথা খাটে। এ যুগের কবিতা, জ্যোৎস্নার মত অস্পষ্ট, স্বপ্নময়। সে যুগের কবিতা,—সবিতারই মত স্বপ্রকাশ—স্বপ্নচ্ছায়াশূন্য। বিহারীলাল, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার কবিতা, সবল ভাষায় যখন যে ভাব পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে,—তাহা করিয়াছে,—কিন্তু তাহার জন্য কদাপি বক্র পন্থা অবলম্বন করে নাই। ইহা তাঁহারই বিশেষত্ব,—কি সে যুগের বিশেষত্ব, পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।

নারীর দেবীত্বে, বিহারীলালের অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁহার মতে, রমণী কেবল শয্যা-সঙ্গিনী নন,—পরন্তু, তিনি দেবী, তিনি মহিমময়ী, তিনি বিশ্বদেবের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। বলিতে কি, এই নারীবন্দনাই যেন বিহারীলালের কবিতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছে—তৎপূজিত কাব্য-পীঠে ধ্রুবের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া দেখিলে, বিহারীলালকে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিয়া এবারকার মত বিদায় লইব। কেবল, কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসরচনায় হাত দেন নাই। নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ গোবিন্দলাল ও হরলাল প্রভৃতি সকলেই এক একজন জীবন্ত মানব,—যে মানবকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে,—আমাদের সংসারে, আমাদের সমাজে, আমাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতরে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। তাঁহার হৃদয়ের ঘোষালে, স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়ের চরিত্র নিপুণতুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার ছায়াপাত অধিক প্রকট হইয়া উঠিলেও, তাহাদের ভিতরে হঠাৎ এমন এক একটী বাস্তব চরিত্রের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন হইয়া যায়,—যাহাদের সহিত কল্পনার লীলাখেলা বড় অল্প। যেমন, দুর্গেশনন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজ। আমরা শুনিয়াছি, কাঁটাল-পাড়ায় বিদ্যাদিগ্‌গজের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম জানি না। তবে, তিনি সর্ব্বদাই বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি একজন নির্ব্বোধ রসিক ছিলেন। রসিক বলিলে তাঁহার প্রকৃত চরিত্রের কথা বলা হয় না। কারণ, তিনি নিজে রসিকতা করিতেছি ভাবিয়া রস ছড়াইতেন না—শ্রোতৃগণ তাঁহার ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তার ভিতর হইতে প্রচুর হাস্যরস আবিষ্কার করিতেন। অর্থাৎ তিনি হাস্যার্ণব নন,—হাস্যাস্পদ বটে।

মানবের বহিঃপ্রকৃতির অবিকল প্রতিরূপ দীনবন্ধুর নাটকেও দেখা যায়। আমরা এই বিষয়ে দু'একটী গল্প বলিব। দীনবন্ধু যে কাঁটালপাড়ায় মাঝে মাঝে যাইতেন,—এ কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। সেবারেও দীনবন্ধু ও স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েক জনে কাঁটালপাড়ায় যাইতেছিলেন। কার্ত্তিকেয় বাবু, কবি শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় বাবুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদ্যতা ছিল এবং তিনিও মাঝে মাঝে কাঁটালপাড়ায় যাইতেন।

যাহা হউক, সকলে যখন নৈহাটীতে

নামিলেন, তখন রাত্রিকাল। পূর্ণবাবু সকলকে লইতে যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ণবাবুর সঙ্গে সকলে বঙ্কিমের আলয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যাইতে যাইতে সকলের দৃষ্টি একদিকে গেল। পথের ধারে অন্ধকারে যেন কি একটা অচল পদার্থ পড়িয়াছিল! একটু পরেই বোঝা গেল, তাহা আর কিছু নয়,—একজন লোক। সুরাদেবীর দয়ায় ভূমিশয্যায় তিনি বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। দীনবন্ধু অগ্রসর হইলেন এবং লণ্ঠনের আলোকে মহাপুরুষটা কে, তাহাই চিনিতে চেষ্টা করিলেন। চিনিতে বড় দেরি হইল না। এখানে তাঁহার নামটী ছাপাইয়া দিয়া লাভ নাই। তবে এইটুকু বলিলেই চলিবে, যে তিনি একজন গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দীনবন্ধু, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের এখন কোথায় যাওয়া হবে?"

"শ্বশুরবাড়ী।"

"শ্বশুর কে?

"অমুক।"

"এঁ! তাকে যে আমি চিনি!"

এই কথা শুনিবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি দীনবন্ধুকে বলিলেন "ইউ নো মাই ফাদার ইন্-ল সার্? দেন্ ইউ মাই ফাদার ইন্ ল সার্—আই সান্ ইন্-লা সার!" পথের ভিতরে অকস্মাৎ এমন একজন উদার "সন্-ইন্-ল" সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু আর কি করিয়াছিলেন জানি না,—তবে এইটুকু জানি যে, এই নব "সন্-ইন্-ল"কে, তাঁহার পুরাতন ও আইন সঙ্গত "ফাদার-ইন্-ল"র বাড়ীতে নিরাপদে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাস্তার ধারে তাঁহাকে আর একজন "ফাদার-ইন্-ল" হস্তগত করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অনেকেই জানেন, উক্ত রসালো উক্তিগুলি, দীনবন্ধু তাঁহার "সধবার একাদশী"তে ভোলানাথের মুখে অবিকল বসাইয়া দিয়াছেন।

আমি আর একজনের কথা জানি,—তিনি দীনবন্ধুকে দেখিলে ভারি ভয় পাইতেন। আসরে সবাই বসিয়া আছে, দিব্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে দীনবন্ধু আসিয়া উপস্থিত, আর অমনি তাঁহারও মুখ বন্ধ। মৌনব্রতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—"হাঁ, আমি তোমাদের কাছে হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলি,—আর অমনি সেটা দীনবন্ধুর নাটকে গিয়ে উঠ্‌ক! বাবা, উনি কি সহজ লোক!"

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। "বিষবৃক্ষে", নগেন্দ্র দত্তের অন্তঃপুরের যে চমৎকার চিত্র আছে,—তাহা বঙ্কিমের তীক্ষ্ণদৃষ্টির ফল। কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায়গণের পরিবার, খুব বড় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহাদের "পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয় কুটুম্বকন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী * * * ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাক সমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি-দিবা কল কল করিত এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য-পরিহাস কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন্", "কাপড় দে" "ভাত রাঁধ্‌লে না" "খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।"

বঙ্কিমচন্দ্র, বসিয়া বসিয়া সে সব দেখিতেন, শুনিতেন ও লিখিতেন। ক্রমশঃ

রামটেক।

১

মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে পাঠ করিয়াছিলাম ঃ—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

নাগপুরে গিয়া যখন বন্ধুদের মুখে শুনিলাম যে এই রামগিরিই বর্ত্তমান রামটেক, ও তাহা নাগপুর হইতে কেবলমাত্র সাত ক্রোশ, তখন রামটেক দেখিবার কৌতূহল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

যাত্রার সময় স্থির হইয়াছিল ভোর সাড়ে চারটা। সবলে আলস্যপরিহার করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম। শুনিলাম পাঁচটার ট্রেণ ছাড়িবে। তবে ষ্টেশন দূরে নহে, আর সহিসও বলিয়াছে যথাসময়ে টাঙ্গা লইয়া আসিবে। আমরা ধীরে ধীরে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। তীর্থদর্শনে যাইতেছি; সঙ্গে লোটা লইলাম। সেই শারদ প্রত্যূষে শীতের পূর্ব্বাভাস স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছিল এবং কম্বল লইলে একেবারে অসঙ্গত হইত না। তবে সেটা আর লওয়া হইল না; ফ্লানেলের সার্টেই সে অভাব ঘুচান গেল। তীর্থযাত্রার অন্যান্য সরঞ্জামের মধ্যে কোঁচান ধুতি, তোয়ালে ও ন্যাশনাল ফ্যাক্টরীর সুগন্ধ সাবান। এইরূপে পনর মিনিট কাল সহজেই অতিবাহিত হইল। এমন সময়ে ভৃত্য আস্তাবল হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে ঘোড়ার পায়ে ব্যথা, টাঙ্গা আসিতে পারিবে না। বন্ধু কানে কানে সংক্ষেপে কহিয়া দিলেন—"পনর মিনিট! হাঁটিয়া পৌছান অসম্ভব।" এই টেলিগ্রাফিক উক্তি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলাম।

ঘোড়ার পায়ে যে পরিমাণে দরদ, আমাদের পা সেই পরিমাণে 'জলদ' চলিতে লাগিল। মনে হইতেছিল "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে," ট্রেণ বুঝি ছাড়িয়া যায়।

কিন্তু যথাসময়েই ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্ল্যাটফর্ম্ম গ্যাসালোকে উজ্জ্বল। ট্রেণ ছাড়ে নাই; শুনিলাম "থোড়া" দেরী আছে। ইতিমধ্যে আমাদের যাত্রীদলের একটু পরিচয় লওয়া যাক্। সর্ব্বসমেত আমরা সাত জন। প্রথম ছিলেন বন্ধু চিত্তরঞ্জন বাবু। ইনিই যাত্রার পূর্ব্বে কানে কানে সেই নিরাশার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইনি বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট হইলেও দর্শনশাস্ত্রকে বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছেন। অধুনা ভারতের অতীত গৌরবের ধ্যানে মগ্ন; প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নের স্বপ্ন দেখিতেছেন। হিন্দু সভ্যতার বিশুদ্ধ আদর্শটিকে কোন প্রকারে খর্ব্ব করিতে সম্মত নহেন। শান্তস্বভাব সরলপ্রকৃতির লোক।

আর ছিলেন তদীয় বন্ধু পণ্ডিতজি। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ; এখন নাগপুরের প্রবাসী। স্মৃতি-শাসিত প্রচলিত হিন্দুত্বে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা। সংস্কৃতে গ্র্যাজুয়েট ও মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ব্রাহ্মণ্যের

গর্ব্ব সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে তিনি ব্যস্ত। কোন্ কারণে কুত্রাপি তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন না। হিন্দুর আদর্শে ও হিন্দুর সভ্যতায় বিপুল বিশ্বাস। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ইহাদের রক্ষা করিতে তর্কচ্ছলে প্রায়ই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। স্বভাবতঃ অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন।

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন পান্নু বাবু। তাঁহারই ছাঁচে গঠিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণযুবা। সুন্দর সুগঠিত দেহ মাথায় ঈষৎ শিখা।

ইঁহাদের অপর সঙ্গী সূর্য্য রাও। দেশ কাশীধাম; নাগপুরে থাকেন। তাঁহার গায়ে কোর্ত্তা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; পায়ে খড়ম। পণ্ডিতজির আহ্নিকের উপাদানে পূর্ণ নাতি-বৃহৎ ঝোলা তাঁহার স্কন্ধে ঝুলিতেছে। অতি সজ্জন ও হাস্যরসিক ব্রাহ্মণ। হিন্দীতে কথা বলিতেছিলেন। হিন্দুস্থানী টিকেট কলেক্টর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাকে বলিলেন—"আমরা যখন রাত্রে ফিরিব, তখনও তুমি থাকিও ও আমাদের টিকেট লইও।" তিনি উত্তর করিলেন—"আপনারা উত্তরে যাইতেছেন। রাত্রে হয়ত দক্ষিণ হইতে যে সকল গাড়ী আসিবে, তাহাতে আমার কাজ পড়িবে।" সূর্য্যরাও তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আমরাও না হয় দক্ষিণ দিকের গাড়ীতেই আসিব।"

আর দুইজন যাঁহারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের বয়স অল্প। বিজয়কুমার কলেজের ছাত্র। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতেছেন। তিনি বেশ কষ্টসহিষ্ণু। নীতিরঞ্জন দ্বাদশবর্ষীয় বুদ্ধিমান বালক।

২

আলাপ পরিচয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; কিন্তু এখনও ট্রেণ ছাড়িবার নামটি নাই। আমরা আসিবার প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে, সাড়ে ছয়টার সময়ে ট্রেণের বৃহৎ কলেবর ঈষৎ আন্দোলিত হইল। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল।

আমরা যে ট্রেনের আরোহী ছিলাম, রামটেকই তাহার শেষ গন্তব্যস্থান। কারণ একটি শাখালাইন রামটেক পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক গাড়ীর প্রান্তস্থিত দেওয়ালে খোলা জানালা আছে। এক গাড়ীর আরোহীগণ পশ্চাতের গাড়ীর আরোহী-দিগকে বেশ দেখিতে পায়। ট্রেণে উঠিয়াই পণ্ডিতজি ধীরে ধীরে তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের তর্কনিনাদ ক্রমে ট্রেণের গম্ভীর নির্ঘোষকে বোধ হয় পরাস্ত করিল। আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিতেছিল; কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এঞ্জিন তখনও সতেজে চলিতেছে; কণ্ঠযন্ত্রেরও বিরাম নাই। পাশের গাড়ীর লোকে সকৌতুকে আমাদের দেখিতেছিল।

বঙ্গদেশে তামাকটা যেমন সাধারণ নেশা, এখানে দেখিলাম সেইরূপ গঞ্জিকাদেবী হাতে হাতে মুখে মুখে ফিরিতেছেন।

নাগপুর হইতে উঠিয়া মেল লাইনে আমরা কাম্পটি পর্য্যন্ত আসিলাম। কাম্পটি ছাড়িয়া মেল লাইনে আরও প্রায় তিন মাইল আসিয়া শাখা লাইনে ট্রেন রামটেক আসে। কাম্পটির নিকটে সুপ্রশস্ত কান্‌হান্ নদীর উপরে সুন্দর পুল আছে। রেলওয়ে পুলের পার্শ্বেই পাবলিক

ওয়ার্কস্ বিভাগের দ্বারা নির্ম্মিত সুদৃঢ় লৌহ সেতু রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার ও গো যান প্রভৃতি চালাইবার রাস্তা আছে।

৩

বেলা আটটার পর রামটেক ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে রামটেক নগর ও পর্ব্বত প্রায় তিন মাইল হইবে। বেশ পাকা রাস্তা আছে; রাস্তার দুইধারে উচ্চ বৃক্ষ-শ্রেণী ও তাহার পরে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র। ষ্টেশন হইতে নগরে যাইবার জন্য গো-শকট ভাড়া পাওয়া যায়। শকটগুলি দিব্যদর্শন। ভূমি হইতে প্রায় এক হস্ত উচ্চে তাহার কাষ্ঠ-মঞ্চ স্থাপিত, এই মঞ্চ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হস্ত ও প্রস্থে পৌনে এক হস্ত; তাহার উপরে দেড় হস্ত ধূসরবর্ণ উচ্চ চটাচ্ছাদন। দুটি মাঝারি রকমের বলদ তাহাকে লইয়া ছুটিয়াছে। উক্ত মঞ্চের প্রান্তভাগে শকটচালক বিবিধ স্বরতাল-সহযোগে তাহার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে চলিয়াছে। গাড়ী ছুটিতেছে; আর বিজ্ঞানের "শিরোহীন ভেকের" দেহ তাড়িৎ সঞ্চালনে যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, আরোহী বেচারীদের শরীরও সেইরূপ গাড়ীর তালে তালে সবেগে নাচিয়া উঠিতেছে।

সুতরাং আমরা এই শকট-বিলাসের আশা ত্যাগ করিলাম। সকলে হাঁটিয়া রামটেক নগরের মধ্য দিয়া রামটেক পর্ব্বতের পাদমূলে গিয়া উপনীত হইলাম।

রামটেক বেশ বড় নগর। ইহা একটি তহশিল। অনেকটা বঙ্গের মহকুমার মত। এখানকার মিউনিসিপালিটি খুব পুরাতন। পথগুলি সুনির্ম্মিত ও সুরক্ষিত। পথের দুই পার্শ্বে কৃষক গৃহস্থের গৃহ দেখিতে পাইলাম। বেশ পরিষ্কার, মার্জ্জিত ও শুষ্ক। বঙ্গের কৃষকপল্লীর ন্যায় অপরিষ্কার নহে। গৃহ-প্রাঙ্গণেও সেরূপ গোময়স্তূপ দেখিতে পাইলাম না। বঙ্গদেশ স্যাঁৎসেতে বলিয়া বোধ হয় অতিরিক্ত লতাগুল্মে জঙ্গল হইয়া উঠে।

নগরের প্রান্তভাগে বসিয়া আমরা পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিলাম। গগন-স্পর্শী তরুলতাচ্ছাদিত ভীমকায় পর্ব্বত শ্বেতবর্ণের মন্দিরগুলিকে শিরোমণি করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। শরৎকালের নির্ম্মল নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। প্রভাতসূর্য্যের কিরণে মন্দিরচূড়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সবুজবর্ণের পর্ব্বতগাত্রের উপরে শ্বেতকায় মন্দিরগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। পর্ব্বত নিম্নে রামটেক নগরখানি দীর্ঘাকৃতি পিতার চরণ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র শিশুর মত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন কত যুগ ধরিয়া এই পর্ব্বতের ছায়ায় নগরখানি আশ্রয় পাইয়াছে। নগরের শিশুগণ এই পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; বিশালতাকে উপলব্ধি করিয়া উদার ও মহৎ হইয়া উঠিয়াছে।

নগরের পশ্চিমে ও পাহাড়ের ঠিক সম্মুখে আর একটি পাহাড়। ইহার বর্ণ ধূসর; আকৃতি উগ্র; তরুলতার সম্পর্ক নাই। সূর্য্যকিরণে ইহার শিলাময় গাত্র প্রচণ্ড রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছিল। ইহার শিরো-দেশে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে দেখিলাম। কেবল একটি মাত্র বৃক্ষ পশ্চাদ্দিক হইতে ইহাকে ছায়াদান করিতেছে ও হিন্দু মন্দিরের দৃষ্টি হইতে ইহাকে অর্দ্ধাবৃত রাখিয়াছে।

৪

যাত্রার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে রামটেক পর্ব্বতে উঠিবার জন্য সুপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া সিড়ির কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম আমরা পশ্চাৎ দিকে আসিয়াছি। অপর দিকে সিঁড়ি আছে। সেখানে যাইতে হইলে পর্ব্বত ঘুরিয়া যাইতে হয় ও অনেক বিলম্ব হয়। যাহা হউক, পশ্চাৎ হইতে উঠিবার জন্য অপ্রশস্ত পথ আছে। কিয়ৎ দূর উঠিয়া আমরা পথ ছাড়িয়া দিলাম ও পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। মধ্যে এক স্থলে দেখিলাম একটি মন্দির ও তাহার নীচে একটি পাথরে বাঁধান ক্ষুদ্র জলাশয়। ইহার জল কৃষ্ণবর্ণ। পানু বাবু গত বৎসর একবার এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন এই জলে গন্ধকের গন্ধ স্পষ্ট অনুভূত হয়। আমরা কিন্তু পরীক্ষা করি নাই।

কিছুক্ষণ পাহাড়ে চড়িয়া আমরা আবার সেই পথ ধরিলাম। পথের দুই ধারে অনেক সীতাফল (আতা) দেখিলাম। বিজয় বাবু সোৎসাহে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু একটি ফলও পাকে নাই, পাকিবার বোধ হয় প্রয়োজনও ছিল না; একটু নরম হইলেই চলিত। কিন্তু সে আশাও মিটিল না।

আমরা এই ছায়াশীতল পথ দিয়া উঠিতে লাগিলাম। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরে, তাহার প্রান্তদেশে, নীলবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। তাহার উপরে এক স্থলে ধূম নির্গত হইতেছিল। নীতি কৌতূহলসহকারে জিজ্ঞাসা করিল —"ওটা কি আগ্নেয়গিরি?" চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিতজি সমস্বরে উত্তর করিলেন —"না, ম্যাংগানিসের খনি। প্রায় তিন মাইল দূরে।" শুনিলাম এখানে বহুপরিমাণে ম্যাংগানিস পাওয়া যায়। কয়েকটি খনি দেশীয় মূলধনে চলিতেছে।

পথের এক পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্র ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে; অপর পার্শ্বে পর্ব্বত প্রাচীর গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যতই উঠিতে লাগিলাম উত্তরের উপত্যকা ভূমি ততই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পথের দুই ধারে বিবিধ বর্ণের বনফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম বানবকুল এই নির্জ্জন পর্ব্বতকাননে নিশ্চিন্ত-ভাবে সংসার পাতিয়াছে।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটী লোক বলিল যে, ঐ পথ দিয়া ডাক বাঙ্গলায় যাইতে হয়, মন্দিরে যাইবার পথ ডান দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি এই প্রথম শুনিলাম যে এই পর্ব্বতের চূড়ায়, হিন্দুর সনাতন পবিত্র মন্দির শ্রেণীর অনতিদূরে ডাক বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কথাটা ভাল লাগিল না। এই পথ হইতে আমরা ডানদিকে একটি অপ্রশস্ত বৃক্ষলতাচ্ছাদিত পথে চলিতে লাগিলাম, ইহা এত অপ্রশস্ত যে দুইজন পাশাপাশি যাইতে পারে না। স্থানে স্থানে নীচু গাছের ডাল পথ পার হইয়া গিয়াছে; চলিবার সময় মাথা নত করিয়া যাইতে হয়।

৫

এই পথটি গিয়া পূর্ব্বোক্ত সোপানশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই মিলন-

স্থানে পাহাড়ের উপরে একটি পাথরে বাঁধান পুষ্করিণী আছে। তাহার চারিদিকে পাথরের প্রাচীর ও উত্তরদিকে ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা। জল দেখিলেই বুঝা যায় যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। পুষ্করিণীতটে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার পাতা পচিয়া জলটি আরও খারাপ করিয়াছে। শুনা যায় এই পর্ব্বতের উপর বিষ্ণু নরসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া এরূপ বেগে আপনার গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে পর্ব্বতগাত্রে এক বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই এই পুষ্করিণীর উৎপত্তি। নিকটেই দুইটি মন্দির; তাহাতে নরসিংহ অবতারের দুইটি বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। রামগিরির অন্যতম নাম তপোগিরি; অপর নাম সিন্দূরগিরি। এই পর্ব্বতের প্রস্তর ভেদ করিলে ইহার অভ্যন্তর রক্তবর্ণ দেখায়। সূর্য্যের আলোকে এই বর্ণ বিশেষ ফুটিয়া উঠে। কথিত আছে হিরণ্যকশিপুর রক্তে পর্ব্বতের সমগ্র প্রস্তর লোহিত হইয়া গিয়াছে।

বটবৃক্ষের নিম্নে অনেক সাধু ধুনী জ্বালিয়া কৌপীন পরিয়া বসিয়া আছেন। আর দেখিলাম তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অনেক মুসলমান ফকির রহিয়াছেন। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে রামনাম বলিতেছেন। ইহার কারণ অচিরেই বোধগম্য হইল। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মন্দির দ্বারে এক মসজিদ দেখা যায়। এই সকল ফকির তাহারই সম্পর্কে এ স্থানে বাস করেন। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীগণের সহিত তাঁহাদের অপূর্ব্ব সৌহার্দ্দ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। হিন্দু মুসলমানে প্রভেদনীতির চরম আয়োজন সহরে নিরন্তরই দেখিয়া থাকি। বঙ্গের গ্রাম্য জীবনে এ দৃশ্য বিরল না হইলেও আমার চক্ষে ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল। ফকিরগণ একই নিশ্বাসে রাম ও রহিমের নাম গ্রহণ করিতেছেন। শুনিয়া আমার সেই গান মনে পড়িয়া গেল :—

রাম রহিমে না জুদা কর ভাই,
দিল্‌কো সাচ্চা রাখ জি।"

বেলা অনেক হইয়াছিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত স্নানাহারের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছিলাম না। ইহাতে কাহার মন না উতলা হইয়া উঠে? শুনিলাম মারহাট্টাদের মধ্যে paying guest system প্রচলিত আছে; অর্থাৎ কোন সচ্ছল পরিবারে অতিথি গিয়া আশ্রয় লইলে, তাঁহার আহার্য্য মিলে, তিনি তৎপরে মূল্যাদি মিটাইয়া দেন। পণ্ডিতজি আহারের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সূর্য্যরাওকে রামটেক নগরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু মালগুজারের (জমিদার) বাটী পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন যেন তিনজনের অন্ন ও চারি জনের "পুড়ী" (আটার লুচী) প্রস্তুত থাকে। সূর্য্যরাও সোপান শ্রেণী অবতরণ করিয়া মঠা অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমার তৃষ্ণা তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুধাও যে হয় নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে অদূর ভবিষ্যতে মালগুজার মহাশয়ের অতিথিসৎকারের একটি মোহন চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়কেই সংযত করিলাম।

৬

ধীরে ধীরে মন্দির অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিতেই মন্দিরের বিশাল দুর্গপ্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইল। শুনিলাম এই পর্ব্বত এক সময়ে পিণ্ডারী দস্যুযোদ্ধাগণের আবাসস্থল ছিল, ও মন্দিরটিকে তাহারা দুর্গরূপে ব্যবহার করিত। পর্ব্বতচূড়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক পরিখার ন্যায় খাড়া থাকায় প্রকৃতি স্বয়ং এই দুই দিক রক্ষা করিতেছেন। উত্তর দিকে দুই প্রস্থ প্রাচীর। ভিতরের প্রাচীরটি মন্দিরসংলগ্ন। বাহিরের প্রাচীর মন্দিরের ঠিক নিম্ন দিয়া পশ্চিমে গিয়াছে; এবং অপর দিকে এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকা পার হইয়া আম্বালা সরোবরের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পর্ব্বতের দক্ষিণ কিনারে রামটেক নগরকে সম্মুখে রাখিয়া এই প্রাচীর গিয়াছে। এখন ইহার ভগ্নাবশেষমাত্র বিদ্যমান। গাওলিগণ (Goalia) ইহার নির্ম্মাতা বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার মধ্যে এক সময়ে একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল; ভগ্নমন্দির ও গৃহাদি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরগুলি পর্ব্বতের পশ্চিমপ্রান্তে সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত। রামটেক নগর হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় পাঁচশত ফুট।

দুর্গপ্রাচীরের গাত্রলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ দেখিলাম। একটি মুসলমান বালক রামদর্শনের পূর্ব্বে আমাদিগকে রহিম দর্শন করিয়া যাইতে আহ্বান করিল। কিন্তু আমরা তখন পথশ্রমে একান্ত কাতর; রাম রহিম কিছুই দেখিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না। মন্দিরের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে উপরে উঠিতেছিলাম। আরও কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলাম। অপরাহ্ণে আবার যখন এখানে আসিয়াছিলাম তখন এই দরজার ভিতরে একটি মুসলমান বালক বিড়ি তৈয়ার করিতেছিল, ও আর একটি ফকিরবেশী যুবক তাহার কাছে বসিয়াছিল। সে রহিমের নামে আমাদের কাছে সেলামী চাহিল। সূর্য্যরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামকা রহিম কোন থে? অর্থাৎ রহিম রামের কে ছিলেন? ফকির প্রশ্ন বুঝিলেন না। বিড়িওয়ালা বুঝাইয়া দিল। তখন উত্তর হইল—"সব একই হ্যায়।" সূর্য্যরাও বলিলেন—"বস্, তব্ কেয়া?"

এই দরজার নাম বরাহ দরজা। ইহার নিকটেই একটি গোলাকার ঘরে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ এক বরাহমূর্ত্তি—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহা বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্ত্তি। একটি গহ্বরের উপরে ইহা দাঁড়াইয়া আছে। যাত্রীরা বরাহের পেটের তলা দিয়া ইহার ভিতরে নামিয়া থাকেন। শুনিলাম যে সকল স্থূলকায় ব্যক্তি তাঁহাদের পরিধির আধিক্য-বশতঃ গুহার ভিতরে নামিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক উচ্চোদর ভক্ত ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া মধ্যপথে বিপদগ্রস্ত হন। তাঁহাদের বরবপুর উত্তমার্দ্ধ বাহিরে, আর অধমার্দ্ধ ভিতরে, এইরূপে "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় থাকিতে হয়। এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা দেখিয়াই বোধ হয় দুষ্ট লোকে "পাপী"

দুর্ণামের সৃষ্টি করিয়াছে। যীশু বলিয়াছেন পাপীকে সহানুভূতি দেখাইবে। এরূপ অবস্থা দেখিলে কোন নিষ্ঠুরের প্রাণে না সহানুভূতির উদয় হয় ?

আমরা মন্দিরাভিমুখে উঠিতে লাগিলাম। এখানে সিঁড়িগুলি খুব প্রশস্ত। দরজার ভিতরেও এখানে দেখিলাম আর একটি মস্‌জিদ। উত্তর দক্ষিণে প্রাচীরে বেষ্টিত এই স্থানটি বিশেষ প্রশস্ত নহে। ইহার দুই পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের আবাসকুটীর রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্বারের নাম সিংহপুর দরজা। এই দরজা পার হইয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে পড়িলাম। বহির্প্রাচীরের অপেক্ষা এই অংশটি অধিকতর পুরাতন। প্রাঙ্গণের প্রান্তে, তৃতীয় দরজার সম্মুখে দুই দিকে দুটি কামান পাতা রহিয়াছে। এই তৃতীয় দরজার নাম ভৈরব দরজা। মারহাট্টাগণ ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন; এবং ইহা এখনও বেশ কলিফেরানো ও নূতনের মত দেখাইতেছিল। এই প্রাচীরের উপরিভাগ (battlement) কতকটা প্রাচীন পাশ্চাত্য দুর্গসমূহের প্রাচীরের মত। পণ্ডিতজি বলিলেন ইহা Saracen স্থাপত্যপ্রণালী অনুযায়ী গঠিত। কারণ বহু পুরাকালে এই মন্দির হিন্দুদের দ্বারা নির্ম্মিত ও তাঁহাদের অধীন হইলেও, ইহা পরে মুসলমানদিগের করতলগত হয়। শিবাজির পরে আবার মারহাট্টাদিগের হাতে ফিরিয়া আসে। এখানে মারহাট্টাদের একটি অস্ত্রশালা স্থাপিত ছিল। ইহার দরজা দুটি কাঠের ও তাহাতে বড় বড় ছুঁচালো পেরেক বসানো।

দরজা পার হইয়া ভিতরে গিয়া দেখি যে প্রাচীরের দুইপ্রান্তে, পাহাড়ের ঠিক ধারের উপর, দুইটি নাতিপ্রশস্ত দাঁড়াইবার স্থান (platform) আছে। যেটি দক্ষিণ দিকে সেটি একটি গোল ঘরের মত; ছোট ছোট জানালা দেওয়া। উত্তরের স্থানটির উপরে ছাদ নাই। দুইদিকে উঠিবার জন্য প্রাচীরগাত্র দিয়া দুটি খুব সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

দক্ষিণের ঘরের জানালা দিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম রামটেক নগরখানি আমাদের ঠিক নীচেই খেলাঘরের মত ছোট দেখাইতেছে। ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট রাস্তা, তাহার উপর দিয়া পুতুলের মত লোক যাতায়াত করিতেছে। Gulliver's Travels এ বর্ণিত Liliput রাজ্যের একটা ধারণা জন্মিল। বন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"এখান হইতে দেখিলে, নীচের ছোট বড় সব এক হইয়া যায়। কার্লাইল তাই বলিতেন যে "পাহাড়ে উঠিয়া দেখ, সকলকে সমান দেখাইবে।" আমার তখন মনে হইল যে ঋষি টয়ফেল্‌স্‌ড্রক (Tefelsdroch) এই জন্যই ওয়েস্‌নিক্‌টো (Wesnichto) নগরের সর্ব্বোচ্চ গৃহে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিকট উচ্চ নীচ বলিয়া কোন পার্থিব প্রভেদ ছিল না, এবং তাঁহার নিম্নে, নরলোকের সকলকে তিনি সমচক্ষে দেখিতে পারিতেন।

এই স্থান হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নিকটস্থ আর একটি পর্ব্বত লতাগুল্মে কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া প্রভাতসূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছিল।

আমরা জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই ঘরে দুই তিনটি অতি বৃহৎ ঢাক রহিয়াছে। মন্দিরে আরতির সময়ে বাজান হয়।

এই ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রাচীর সংলগ্ন অপ্রশস্ত বারান্দা দিয়া উত্তরের মঞ্চে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। রামটেক পর্ব্বত ঢালু হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। তাহার পরে একটি গভীর খাদ। এই খাদের পরেই একটি অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের উপর সবুজবর্ণ গাছে ঢাকা কৃষকদের কুটীর, ও নিকটেই হরিদ্বর্ণ শষ্যক্ষেত্র। এই পাহাড়ের পরেই সুবিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমি উত্তরে ও পশ্চিমে বহুদূর প্রসারিত হইয়া অস্পষ্ট গিরিশ্রেণীর চরণমূলে গিয়া মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গিরিমালা অপেক্ষাকৃত নিকটে স্থাপিত। তথা হইতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জল আনিয়া পূর্ত্ত-বিভাগ চাষের সুবিধার জন্য এই উপত্যকাকে উর্ব্বর করিতেছেন। সেই জলরাশি রামটেক পর্ব্বতের নিম্নে অনতিদূরে এক বিশাল হ্রদের ন্যায় দেখাইতেছিল।

এই প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইয়া সম্মুখে মন্দিরগুলি দেখা যায়। পশ্চিমে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আর একটি দরজা পার হইলেই মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ইহার নাম গোকুল দরজা। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া পণ্ডিতজি বলিলেন যে ইহা ভৈরবীচক্র। তখন তিনি সুর করিয়া এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন :—

"প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

অর্থাৎ ভৈরবীচক্রে প্রবেশ করিলে বর্ণভেদ লুপ্ত হয় ও সকল বর্ণ দ্বিজরূপে গণ্য হয়। ভৈরবী চক্রের বাহিরে আসিলে তাহারা বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শুনিয়া আমার মনে হইল যে শুধু মানব নির্ম্মিত এই মন্দির কেন, সমস্ত বিশ্বজগৎকেই বিধাতা এক বিশাল ভৈরবীচক্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই তৃতীয় প্রাঙ্গণে মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত দাস দাসীদের বাসভবন রহিয়াছে। শুনিলাম দেড়শতের অধিক দাস দাসী আছে।

৭

বেলা অনেক হইয়াছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলেই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া তখন প্রত্যাবর্ত্তন করা গেল। বহির্দ্বার পার হইয়া মন্দিরের ঠিক বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময়ে দার্শনিক চিত্তরঞ্জন তাঁহার গাত্রবস্ত্রের খোঁজ করিলেন। বলা বাহুল্য দলের কেহই তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারিলেন না। সাব্যস্ত হইল যে মন্দিরের নিকটে সেই গোল ঘরে প্রকৃতিশোভায় নিমগ্ন হইয়া বন্ধু যখন উচ্চ পাহাড়ের দার্শনিকতা আলোচনা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে বস্ত্রখানি তাঁহার স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে। পণ্ডিতজি, পানুবাবু ও চিত্তরঞ্জন আবার অন্বেষণে ফিরিয়া গেলেন ; আমরা তিনজনে মসজিদের ছায়ায় মস্তক রক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমাদের সম্মুখেই একখানি মিঠাইয়ের দোকান ছিল। একখানি মাঝারি রকমের খোলার ঘর, কিন্তু তাহাতে অধিবাসী অনেক। দোকানী, তাহার স্ত্রী, তাহাদের সন্তান ; একটি মহিষী, তাহার সন্তান ও

তাহাদের খাদ্যাধার; এবং মানবের খাদ্যরূপে প্রসিদ্ধ পেঁড়ানামধারী কোন বস্তু, ও তাহাদের আধার কয়েকটি বাক্স পেঁড়া। দেখিলাম একটি গাভী আসিয়া নিঃসঙ্কোচে জিহ্বা-সংযোগে পেঁড়ার আস্বাদন লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুরা যখন গাত্রবস্ত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন ও আমাদিগকে ঐ পেঁড়া খাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন মনে হইল যে কিয়ৎপূর্ব্বেই আর একটি প্রাণী আসিয়া ঐ পেঁড়ার রসঃ গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, এবং যেহেতু আপনার সহিত উক্ত প্রাণীর প্রভেদ আছে বলিয়া স্পর্দ্ধা রাখি, সেহেতু ঐ প্রস্তাবে আমি কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলাম না।

দেখিলাম আমাদের ঠিক সম্মুখে পাহাড়ের উপর গাছপালার মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই পথে ধূম্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কথিত আছে যে রামায়ণপ্রসিদ্ধ শূদ্র শম্বুক এই স্থানেই তপস্যা করিতেন। শূদ্রের তপস্যার ফলে একটি ব্রাহ্মণসন্তান হত হইলে যখন রামচন্দ্র আসিয়া শম্বুকের শিরশ্ছেদন করেন, তখন শম্বুক এই সম্মানে প্রীত হইয়া প্রার্থনা করেন যেন রামচন্দ্র চিরদিন এই পর্ব্বতে অবস্থান করেন; এবং শম্বুক নিজেও যেন এখানে পূজিত হন। তখন রাম এই পর্ব্বতে বাস করিতে আরম্ভ করেন ও শম্বুকও একটি শিবলিঙ্গে পরিণত হন। এই শিবলিঙ্গের উপরেই ধূম্রেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনা যায় রামচন্দ্র যে শম্বুকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, ও এই মন্দিরে বসবাস করিতেছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি মাঝে মাঝে আলোকশিখার আকার ধারণ করিয়া মন্দিরচূড়ার ত্রিশূলের কাছে ঘুরিয়া বেড়ান। মেঘ হইলে এই ব্যাপার দেখা যায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে উহা তাড়িতক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই মন্দিরে একটি সাধু বাস করেন। তিনি নাকি সকল প্রকার ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন। ইনি স্পর্শমণির সন্ধান ঠিক কোথায় পাইলেন বলিতে পারি না; তবে ইঁহার নাম ফক্কড়নাথ। নাম শুনিয়া মনে হইল ইঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

৮

এইবার আমরা সোপানশ্রেণী ধরিয়া আম্বালা সরোবরের দিকে নামিতে লাগিলাম। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম; মনে হইতেছিল সোপানশ্রেণীর বুঝি আর শেষ নাই। আমরা সরোবরে চলিয়াছি এই চিন্তা যেন তৃষ্ণা আরও বাড়াইয়া দিতেছিল। সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়া দেখিলাম কয়েকখানি কুটীর রহিয়াছে। কয়েকটি সাধু একখানি ক্ষুদ্র আশ্রম করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি ইঁদারা ছিল। তাহার শীতল জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আম্বালা সরোবরের তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ভাবিয়াছিলাম সরোবরে স্নান করিয়া অবিলম্বে মালগুজার মহাশয়ের আতিথ্যগ্রহণ করিব। দেখিলাম সূর্য্য রাও স্নান সমাপন করিয়া জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেছেন। তাঁহাকে স্নান করিতে দেখিয়া আশা হইল; ভাবিলাম ইহা আহারের পূর্ব্বাভাষ। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই শুনিলাম যে আহারের কোন আয়োজনই হয় নাই। সূর্য্যরাও মালগুজারের

বাটীতে সংবাদ লইয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাঁহাদের আহারাদি সমাপ্ত হইয়াছে। তখন শুনিলাম আহার সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অতিথির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা মারহাট্টাদিগের রীতির শেষাংশ। এইরূপে কল্পনার রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়া গেল। তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সহৃদয় পাঠক নিজেই বুঝিয়া লউন।

যাহা হউক, পণ্ডিতজি উদ্ধার করিলেন। তিনি স্বয়ং তখন রন্ধনে মনোযোগ দিলেন। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যরাওএর সহিত সমস্ত আয়োজন আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণ সকলে মিলিয়া কাজ ভাগ করিয়া লইলেন। আমিও স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হইলাম, এবং দূরে শয্যা পাতিয়া শুইয়া নির্লিপ্তভাবে রন্ধন কার্য্য দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—"আপনি নিদ্রা যান। উঠিয়াই দেখিবেন যে আহার প্রস্তুত।" উঠিয়া দেখিলাম যে ভাত ফুটিতেছে, এবং ভবিষ্যতেও ফুটিতে থাকিবে। ডাল মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। সূর্য্য রাও উনানে ফুঁ দিতে দিতে চক্ষু লাল করিয়া তুলিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"এরই মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল? দশ মিনিটও হয় নাই।" পরে শুনিলাম যে প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলাম। এক ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে শুনিলে পাছে আমার ক্ষুধা বাড়িয়া যায়, তাই তিনি মনস্তত্ত্বের (Psychology) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- ছিলেন। দেখিলাম তিনিও এ মন্ত্র চিনিয়াছেন। উপায়টি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও আমার ক্ষুধা তাহাতে সান্ত্বনা মানিল না।

আমরা সুবিস্তীর্ণ আম্বালা সরোবরের তীরে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। সরোবরের দক্ষিণ তীরে একটি পাকা রাস্তা এক বিশাল ঘনবনাচ্ছাদিত পর্ব্বত ঘুরিয়া রামটেক ষ্টেশনের রাস্তায় গিয়া মিলিয়াছে। মন্দিরের যাত্রীগণ গো-শকটে এই পথে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠে। এই রাস্তার ধারে, সরোবরের নিকটে দুই একটি মুদীর দোকান আছে। ইহাদেরই একজন আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিল; এমন কি রন্ধনের বাসন পর্য্যন্ত দিল। নিদ্রাভঙ্গে যখন দেখিলাম যে কেবল ভাত ডালের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং শুনিলাম যে কোন তরকারী পাওয়া গেল না, তখন আমি সশব্যস্তে মুদীর শরণাপন্ন হইলাম। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষের প্রতি প্রসন্ন হন। মুদীর নিকট কুমড়া ও নারিকেল পাওয়া গেল। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বিজয়বাবু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলি কুটিয়া ফেলিলেন।

ভাত ডাল প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলাম। পণ্ডিতজি স্নান করিয়া আহ্নিক সমাপ্ত করিলেন ও গীতাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। একাদশ সর্গের বিশ্বরূপ বর্ণনা সুর করিয়া পাঠ করিলেন। সকলে মিলিয়া শুনিলাম। আহ্নিকান্তে তিনি কয়েকটি রসগোল্লা উৎসর্গ করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিলেন। সেই সুদূর মধ্যপ্রদেশে এই বাঙ্গালার আদরের ধনকে সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম।

ডাল নামিলে দেখিলাম যে যাহা প্রকৃত ডাল তাহা বন্যায় ডুবিয়া আছে। গল্পে শুনিয়াছিলাম যে বিলাতে কোন হোটেলে

একবার একটি ভদ্রলোক অতিথি হন। তাঁহাকে মাংসের ঝোল আনিয়া দিলে, তিনি দেখিলেন যে পাত্রের মধ্যস্থলে ঝোলে পরিবেষ্টিত হইয়া একখণ্ডমাত্র মাংস রহিয়াছে। দেখিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে কোট প্রভৃতি খুলিতে লাগিলেন। হোটেলকর্ত্রী পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মশায়! ব্যাপার কি?" ভদ্রলোক বলিলেন—"ঐ মাংসখণ্ড লইতেই হইবে। ঝোলে সাঁতার দিয়া মাঝ-খানে গিয়া উহাকে ধরিব।" আমারও ডাল দেখিয়া মনে হইল যে ডুবারী ডাকিয়া সেই রত্ন উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম সূর্য্যরাও সের তিনেক জল ফেলিয়া দিতেই কাঞ্চনবর্ণের ডাল স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিল।

বেলা চারটার সময় আহারে বসিলাম। সমস্তই পরম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। সূর্য্যরাও রন্ধন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। পণ্ডিত জি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; তাঁহাকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাইলাম। নীতি অতি সুন্দর দধি আনিয়াছিল। তিনি সংযোগে অন্ন মধুরে সমাপ্ত করা গেল।

হাত ধুইবার জন্য আম্বালা সরোবরে গিয়া দেখি ঝাঁক ঝাঁক মাছ পাথর বাঁধান ঘাটের কাছে খেলা করিতেছে। কিঞ্চিৎ ছোলাভাজা ফেলিয়া দিল। বড় বড় রোহিত মৎস্য আসিয়া খাইতে লাগিল। মনে হইল, হাত দিয়া ধরা যায়। শুনিলাম এ মাছ কেহ ধরে না; তাহার কারণ মারহাট্টারা নিরামিষ-ভোজী। পানু বাবু মৎস্য ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া আমার সাহায্য চাহিলেন। একখানি তোয়ালে লইয়া দুই জনে দুই কোণ ধরিয়া তুলিতেই একটি মাছ ডাঙ্গায় গিয়া লাফাইতে লাগিল। একটি মারহাট্টা ভদ্রলোক কাতরভাবে বলিলেন —"আহা কেন মাছটাকে মারবেন? জলে ছেড়ে দিন্।" কিন্তু আমাদের দুজনেরই সহসা তখন ভয় হইল পাছে মাছটির গায়ে হাত দিলে কামড়াইয়া লয় বা ডানা ফুটাইয়া দেয়। আমরা ভয়ে একেবারে অবশাঙ্গ, অগ্রসর হইতেই পারিলাম না। তখন মারহাট্টা মহাশয় স্বয়ং মাছটিকে উদ্ধার করিলেন।

ইতিমধ্যে এক কনষ্টেবল আসিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইয়া গেলেন। একটি নিরীহ সাধু আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকেও খাতায় গিয়া নাম লিখাইয়া আসিতে বলিলেন। শুনিলাম সকল সাধুর পক্ষেই এই নিয়ম হইয়াছে।

৯

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আমরা পাহাড়ের উপর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিবার আশায় তাড়াতাড়ি পশ্চিমে সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের বামে সেই অত্যুচ্চ পর্ব্বতটি দাঁড়াইয়া আছে। নিবিড় বন তাহার গাত্র সবুজ বর্ণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এমন বৃক্ষলতাচ্ছন্ন পর্ব্বত সেখানে আর অল্পই দেখিলাম। টেনিসনের Enoch Arden এর সেই লাইনটি মনে পড়িয়া গেল:—

"The mountain wooded to the
peak, * *"

পর্ব্বত পথে চলিতে চলিতে বেলা পড়িয়া আসিল। দেখিলাম সেই পথ হইতে আরও কয়েকটি সঙ্কীর্ণ পথ বাহির হইয়া পর্ব্বত-মালার পাদদেশ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। চারিদিক তখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা আপনাদের পদশব্দে আপনারাই চমকিয়া উঠিতেছিলাম। মনে হইতেছিল আমরা জনতার জীব বুঝি এই নির্জ্জনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বুঝি আমাদের সহাস্য চীৎকারে সুপ্তা বনদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে। জানি না কেন আপনা হইতেই আমাদের বাক্যালাপ থামিয়া গেল। সেই শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে দূরে কোন বৃক্ষ শাখায় বসিয়া একটি ঘুঘু করুণস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছিল। আমরা নীরবে চলিতে চলিতে তাহাই শুনিতে লাগিলাম।

পর্ব্বতমালার সানুদেশে শ্যামায়মান বনরাজি; শিখরদেশে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিধারা। উভয়ের সংমিশ্রণে এক ছায়া-লোকময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন এই শান্তি-স্বর্গ হইতে দ্বন্দ্বকোলাহলময় লোকালয়ে আর যেন ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া বনভূমির সেই স্নিগ্ধশ্যাম শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিলাম। অতি সুন্দর, সুনির্ম্মিত, অত্যুচ্চ সোপানাবলী। দুই পার্শ্বে সুরক্ষিত। শুনা যায় পুরাকালে অম্বা নামে এক কুষ্ঠগ্রস্ত, সূর্য্যবংশীয় রাজপুত নরপতি মৃগয়ার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক গিরিনির্ঝরে জলপান করিতে আসিয়া তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালণ করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দেখিলেন যে তাঁহার শরীরের যে যে অংশ ঐ জলস্পর্শ করিয়াছে, তথা হইতেই কুষ্ঠ ব্যাধির সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। তিনি তখন সেই নির্ঝর খনন করিয়া আম্বালা সরোবরের সৃষ্টি করেন। আর অমনি পাতাল হইতে ভোগবতী উত্থিত হইয়া সরোবরকে জলপূর্ণ করেন। এই কারণে মৃত ব্যক্তি গঙ্গালাভ করিবে এই আশায় নাকি ইহাতে তাহার অস্থি ফেলিয়া দেওয়া হয়। রাজা অম্বা এই সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

উঠিতে উঠিতে এক স্থলে দেখিলাম একটি সোপানের প্রান্তে এক অপরিসর প্রকোষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। উহা পুরাতন ভারতীয় ভাস্কর্য্যপ্রণালী অনুসারে গঠিত। একটি মূর্ত্তি মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে; এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার হাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের প্রতি উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছে। এই স্ত্রীমূর্ত্তি দুটির মুখে স্নেহ, নির্ভরতা, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব। স্ত্রীমূর্ত্তির ভাব দেখিয়া বোধ হইল এখনই যেন মুখ ফুটিয়া কথা কহিবে। চিত্তরঞ্জন প্রাচীন ভারতীয় কলা বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি ললিত-কলার ডাক্তার কুমারস্বামীর পরম ভক্ত।

তিনি মুগ্ধনেত্রে এই মূর্ত্তিগুলি দেখিতে লাগিলেন। বাস্তবিক সজীব ও নির্জীব প্রতিমায় কি প্রভেদ, প্রকৃত কলানৈপুণ্য ও শিল্প চাতুর্য্য কাহাকে বলে, তাহা এই মূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

সোপানশ্রেণীর মধ্যপথে বিশ্রামের জন্য একটু বসিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। নীতিসিঁড়ি গুনিবার ভার লইয়াছিল। আমরা যখন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন সে বলিল যে আমরা সর্ব্বসমেত সাড়ে ছয় শত সিঁড়ি উঠিয়া আসিয়াছি।

১০

জুতা খুলিয়া গোকুল দরজা পার হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। দরজার দেউড়িতে ঢাল তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। প্রথমেই লক্ষ্মণের মন্দির। ইহার সম্মুখভাগে, ইহার গাত্রসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র বারান্দা। আটটি বৃহৎ থামের উপর তাহার ছাদ রহিয়াছে। বারান্দার পরে একটি ক্ষুদ্র দালান। সেখানে তখন ঈষৎ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর অতি সঙ্কীর্ণ। তাহার ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণের নাতিবৃহৎ মূর্ত্তি সিংহাসনের উপর স্থাপিত। শুনা যায় আদি মূর্ত্তিগুলি মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া দিলে সুধালা সরোবর হইতে বর্ত্তমান মূর্ত্তিগুলি উদ্ধার করা হয়। মন্দির-দ্বারের চৌকাঠের বাহিরের দিক পিতলে বাঁধান; ভিতরদিক রূপার। মূর্ত্তির সমক্ষে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুইটি নর্ত্তকী বন্দনা গাহিতেছিল; পার্শ্বে একটি লোক দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইতেছিল। এ স্থানে এ ব্যাপার প্রত্যাশা করি নাই। এই সনাতন দেবালয়ে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নর্ত্তকী ভিন্ন কি বন্দনা গাহিবার লোক ছিল না? শুনিলাম ইহারা মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। মাসে চারি দিন এই নর্ত্তকীর নৃত্যগীত হয়। আমরা অবিলম্বে এই মন্দির ত্যাগ করিয়া তাহার ঠিক পশ্চাতে রামের মন্দিরে * গেলাম।

এই মন্দিরটিও পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুযায়ী গঠিত। তবে ইহার দালানটি আরও প্রশস্ত। দেখিলাম অষ্ট্রিয়ায় প্রস্তুত ডিট্‌মারের ল্যাম্প এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই মন্দিরের দালানে একটি প্রকৃত ভক্তির দৃশ্য দেখিলাম। কয়েকজন লোক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—একটি প্রৌঢ় ব্যক্তিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং সকলে মিলিয়া খোল, করতাল ও অন্যান্য যন্ত্রসংযোগে ভজন গাহিতেছেন। সন্ধ্যার প্রাকালে সেই মৃদু-গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করিতেছিল।

* প্রতি বৎসর কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইয়া পনর দিন ধরিয়া রামটেকে একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। মেলার প্রধান দিনে রামের মন্দিরের চূড়ায় "পীতাম্বর" নামে এক খণ্ড পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র পোড়ান হয়। শিব ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারই স্মরণ চিহ্নস্বরূপ এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নাগপুর অঞ্চলে রামটেক মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। সেইজন্য মেলায় প্রায় ষাট সত্তর হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় হয়; এবং মন্দিরেরও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা আয় হইয়া থাকে। এ বৎসরও মেলার জন্য রেল কোম্পানী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; এবং রেলের উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীরা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।
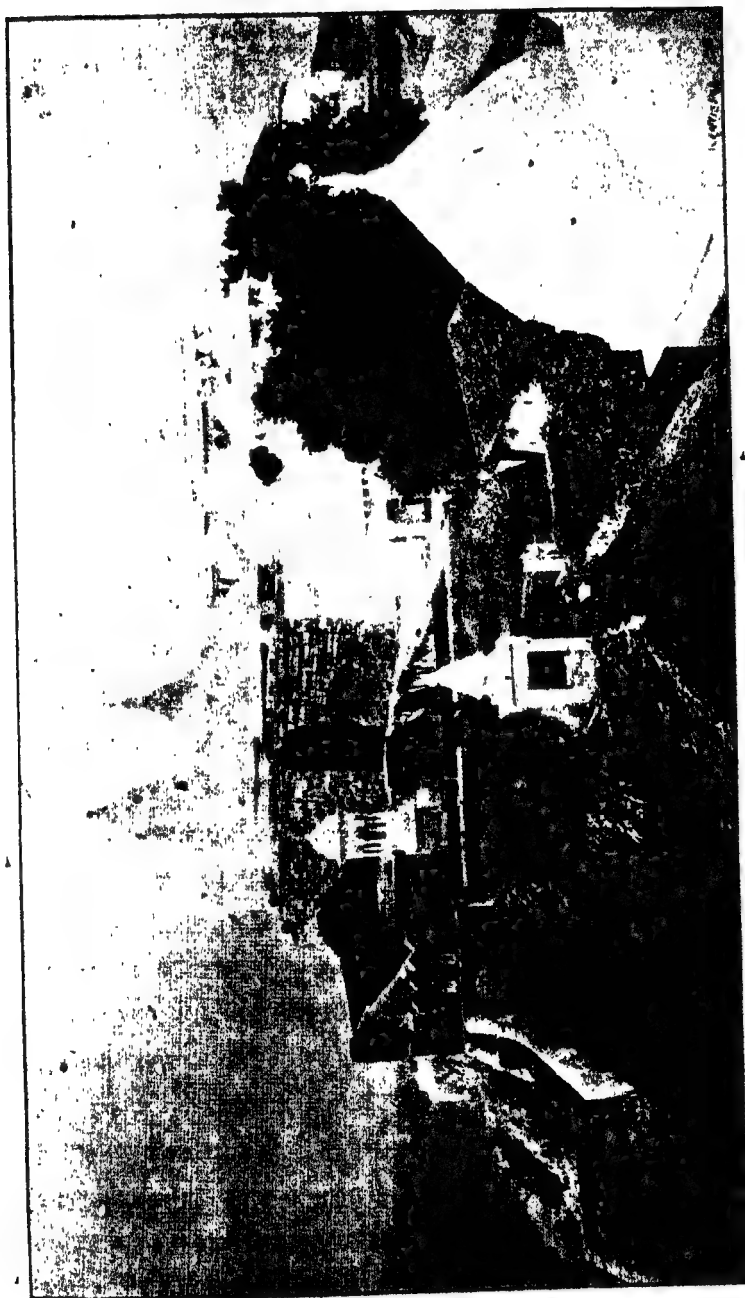
রামটেক মন্দির।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এই তুইটি মন্দির। ইহাদের পশ্চিমে ও দক্ষিণে, শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিয়া, প্রাঙ্গণের পশ্চিম সীমায় কয়েকটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি বাহিয়া, অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি

মঞ্চে গিয়া বসিলাম। প্রাচীরের পশ্চিমে পর্ব্বতটি আরও অল্প কিছুদূর বিস্তৃত ছিল। সে স্থানটি প্রায় সমতল; এক সময়ে প্রস্তরে বাঁধান ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে সূর্য্যদেব অস্তাচলগত। সম্মুখের একটী পর্ব্বতের অন্তরালে তিনি কলেবর লুক্কায়িত করিয়াছেন। আকাশের ক্রোড়ে পীত, লোহিত, নীল, বেগুনী প্রভৃতি সপ্তবর্ণ স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। আর পর্ব্বতশিখর উদ্ভাসিত করিয়া, মন্দির-চূড়া অনুরঞ্জিত করিয়া, সপ্তবর্ণে বিমণ্ডিত সুদীর্ঘ কিরণরেখা পশ্চিম হইতে আকাশের শিরোদেশে উঠিয়া অর্দ্ধগগন শোভিত করিয়াছে। মনে হইল দূরে, অনন্তলোকে, বিশ্বনিয়ন্তার চরণসমীপে, সুমহান্ জ্যোতিঃ সমুদ্র পরম পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই মহা মুহূর্ত্তে, দিবসরজনীর মিলন সময়ে, ধরণী যখন দিবসের কর্ম্ম সারিয়া, শুচি হইয়া বিধাতার চরণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সেই আলোকসাগরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি তাহার মস্তকোপরি আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিতেছে।

উর্দ্ধে অনন্তের এই মনোমোহন চিত্র, গগনব্যাপী মহালীলা। নিম্নে তিমিরময়ী উপত্যকাভূমির অসীম প্রসার। দূরে, বহুদূরে, অস্পষ্ট পর্ব্বতশ্রেণী প্রকৃতিদেবীর ভীমকায় প্রহরীর ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে যথায় বৃক্ষলতার একত্র সমাবেশে উপত্যকাবক্ষে কুঞ্জ কাননের সৃষ্টি হইয়াছে, সেস্থানে পুঞ্জীভূত অন্ধকারে মসীরেখা গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুবিপুল সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্ব চরাচর ডুবিয়া গিয়াছিল। কেবল রামটেক নগরের দীপমালা কৃষ্ণ পটভূমির উপরে খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিতেছিল। আকাশে, পর্ব্বতে, কাননে, উপত্যকায়, সন্ধ্যাদেবীর সেই শান্তগম্ভীর চরণক্ষেপের মধ্যে আমরা মন্দির প্রাচীর ত্যাগ করিলাম।

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখি যে শান্ বাঁধান রকের উপর বসিয়া মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা মহাশয় কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রৌঢ় বয়স; বেশ জমিদারের মত সুগোল মসৃণ আকৃতি, শিখাযুক্ত মুণ্ডিত মস্তক। শুনিলাম এই মন্দির বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন-ভোগী নাগপুরের ভোঁস্‌লা রাজার অধীন। পাণ্ডা ঠাকুর নাকি তাঁহার নিকট মাসিক ছয় টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহার দুই হাতে সোনার বালা; রূপাবাঁধান ফর্সির নলে তামাকু সেবন করিতেছেন। তিনি নীতিকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে সংস্কৃত পড়িতেছে কি না। নীতি বলিল পড়ে। ইহা শুনিয়া আমরা ভাবিলাম পাণ্ডাঠাকুরের সংস্কৃতে অত্যন্ত অনুরাগ। পণ্ডিতজি সংস্কৃতে সুন্দর কথোপকথন করিতে পারেন। আমাদের অনুরোধে তিনি পাণ্ডা মহাশয়ের সঙ্গে সংস্কৃতে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডাজি কিন্তু একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া হিন্দীতে বলিলেন,—"নেই, নেই", অর্থাৎ না না। আমরা হতাশ হইলাম।

মন্দিরের পশ্চাৎ দিক হইতে একটি সিঁড়ি নামিয়া রামটেক নগরের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। আমরা এই সিঁড়ি দিয়া নামিব স্থির করিলাম। ঐ দিকে যাইতে মন্দির

প্রাঙ্গণে, পাথরে বাঁধান ও রেলিং দিয়া ঘেরা একটি ছোট জলাশয় দেখিলাম। জল অতি বিশ্রী; প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহা হইতে একটি অতি উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। জানি না কি কারণে এই পচা জল এখানে ধরিয়া রাখা হইয়াছে।

পশ্চাৎদিকে পাহাড়ের গা খুব খাড়া হওয়ায় সিঁড়িগুলি বড় উঁচু উঁচু। নামিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। ইহার দুই পার্শ্বে নিবিড় বন। বৃক্ষের শাখায় ইহা দিবসেও প্রায় অন্ধকার হইয়া থাকে। আমরা নামিতে নামিতে শুনিলাম উপরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেখিলাম নগর হইতে কত লোক ব্যাকুলহৃদয়ে মন্দিরে উঠিতেছে। নীচে আসিয়া রামটেক নগরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক বাড়ীতে কথকথা হইতেছিল। কত ভক্ত নরনারী নিস্পন্দভাবে শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতজি আমাকে বলিলেন —"ইহাই ভারতের প্রকৃত লোকশিক্ষার উপায়।"

ট্রেণে গিয়া একেবারে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিস্তার করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে শুইয়া পড়িলাম। যাত্রাসময়ের অভিজ্ঞতাফলে বুঝিয়াছিলাম যে ট্রেণ এখন বহুক্ষণ নড়িবে না। গৃহে ফিরিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেও, নিরুপায় হইয়া মনকে এবিষয়ে দৃঢ় করিয়াছিলাম। ঘড়ি খুলিয়াও দেখিলাম যে ট্রেণ ছাড়িবার ঠিক সময় আরও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে; তার পরে অবশ্য প্রথামতে আরও কিছু বিলম্ব হইবে। কিন্তু একটু পরেই ট্রেণ যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ভাবিলাম পাহাড়ে উঠার ফলে আমিই বুঝি নড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। তারপর যখন দেখিলাম সত্যই ট্রেণ চলিতেছে, তখন বক্ষ হইতে ঘড়িটিকে তুলিয়া দেখি তিনি অনেকক্ষণ অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার পর নাগপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সূর্য্যরাওয়ের সেই টিকেট কলেক্টর আসিয়া আমাদের টিকেট লইলেন। সূর্য্যরাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

'আয় ঘুম আয়।'

আঁধার ঘনায়ে আসে, তন্দ্রার মতন,
পুষ্পবাসে নিঃশ্বসে ধরণী;
আকুল কুন্তল-জালে আবার গগন,
নামে নিশি তিমির-বরণী।
করুণ-মধুর স্বর ফিরে, দিশি দিশি,
ডেকে, ডেকে, "আয় ঘুম আয়",
"ঘুমের পশরা লয়ে, এস মাসি পিসি,
ঘনশ্যাম আম্রবনচ্ছায়।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক নাই, শুভ আলিম্পনে,
নাই পিঁড়ি, চিত্রিত, সুন্দর;
অপূর্ব্ব আসন কোথা, খচিত রতনে?
এস সুপ্তি, বস আঁখিপর।

নিশি অবসান হলে, ক্লান্ততনু দেহে,
শিরে বহি স্বপন বেশাতি,
ফিরিবে যখন তব বহুদূর গেহে
অঞ্চলে বাঁধিয়া যূথি, জাতি;
অশোক বকুল দিয়ে রচিব যতনে
ছায়াপথ, হলে নিশিভোর;
পাছে বাজে তৃণাঙ্কুর কোমল চরণে,
ব্যথা পেলে টুটে ঘুম ঘোর!
অধরে তাম্বুল-রাগ, অলক্ত চরণ,
রঞ্জিব গো অরুণ-আভায়;
হৃদিপদ্মে লক্ষ্মীরূপা, করিব বরণ,
শ্রান্ত চোখে আয় ঘুম আয়।"

শ্রীমতী স্বর্ণলতা কাঞ্জিলাল।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সুভদ্র যে স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্নিকটেই একটী স্তূপ আছে; এইস্থানেই বজ্রপাণি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দয়ালু পৃথিবী-পতি পৃথিবীর কার্য্য শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটী শাল-বৃক্ষের মধ্যস্থলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর দিকে নিজ মস্তক ন্যস্ত করিয়া তিনি নিদ্রাভিভূত হন। মণিমুক্তা খচিত দণ্ডধারী, ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মল্লগণ বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিলেন "তথাগত আমাদের পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন; আমরা আশ্রয়শূন্য হইলাম ও আমাদের রক্ষা করিবার কেহই থাকিলেন না; বিষাক্ত তীর আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছে এবং দুঃখাগ্নি আমাদিগকে দাহ করিতেছে; ইহার কোন প্রতিকারও নাই।' পরে তাহাদিগের দণ্ড ত্যাগ করিয়া তাহারা ভূমিতে পতিত হইল এবং অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় কালাতিপাত করিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া তাহারা একবাক্যে বলিল" এইরূপ জন্মমৃত্যুরূপ দুস্তর সমুদ্র পার হইতে আমাদের কে নৌকা যোগা-ইবে? দীর্ঘ অজ্ঞতান্ধকারে প্রদীপ লইয়া কে আমাদের পথ প্রদর্শন করিবে?"

যে স্থানে দণ্ডগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তথায় একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে সাত দিবস পূজা করা হইয়াছিল। তথাগতের মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইয়া-ছিল; দেবতা ও মনুষ্যগণ একত্রিত হইয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন "এইরূপ পৃথিবীপতি প্রধান বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিবেন; মনুষ্যের সুখের অবসান হইল; পৃথিবীতে আস্থা স্থাপনের আর কেহই রহিলেন না।" তথাগত তখন সঙ্ঘকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করি-লেন "তথাগতের মৃত্যু হইতেছে বলিয়া মনে করিও না যে তথাগতের চিরদিনের জন্য তিরোধান হইতেছে; ধর্ম্ম চিরদিনেরই জন্য রহিল; ইহা অবিনশ্বর। আলস্য ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে মুক্তির অনুসন্ধান কর।"

তখন ভিক্ষুগণ ক্রন্দন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এ প্রকারে দুঃখ প্রকাশ করিলে দেবতাগণ উপহাস করিবেন।" তখন মল্লগণ নিজ নিজ উপহার প্রদান করিয়া, সুবর্ণনির্ম্মিত শবাধার উত্তোলন পূর্ব্বক শ্মশানে লইবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিল। ইহাতে অনিরুদ্ধ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন; কেননা দেবগণ সাতদিবস পূজা করিবেন এইরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন।

পরে, দেবগণ অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গীয় পুষ্প ধারণ করিয়া প্রত্যেকে যথাযথ ভাবে তাঁহাকে পূজা করিলেন। যে স্থানে অনিরুদ্ধের আদেশে মল্লগণ শবাধার উত্তোলন স্থগিত করিয়াছিলেন, তথায় একটী স্তূপ আছে; রাজ্ঞী —মহামায়া এই স্থানেই বুদ্ধদেবের জন্য ক্রন্দন করিয়া-ছিলেন।

তথাগত পৃথিবী ত্যাগ করিলে এবং তাঁহার শব শবাগারে স্থাপন করিলে অনিরুদ্ধ স্বর্গীয় আবাসে আরোহণ করিয়া রাজ্ঞী মায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অত্যুত্তম প্রভু এইরূপ প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন।" মায়া এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবগণসহ শালবৃক্ষ তলে উপনীতা হইলেন। সঙ্ঘাতি, পাত্র ও ধর্ম্ম যষ্টি দর্শন করিয়া প্রত্যেকটীকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "মনুষ্য ও দেবগণের সুখ অন্তর্হিত হইল; পৃথিবী চক্ষুহীন হইল; পথপ্রদর্শকবিহীন হইয়া সমস্ত পৃথিবী মরুভূমি হইল।' তখন তথাগতের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় শবাধার উন্মুক্ত হইল; চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল; উপবেশন

করিয়া যুক্ত করে, তিনি তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আপনি অনেক দূর হইতে আগমন করিয়াছেন ; আপনি ধর্ম্মাচরণে কালাতিপাত করিতেছেন, সুতরাং আপনি বিমর্ষ হইবেন না।" আনন্দ নিজ দুঃখ দমন করিয়া পৃথিবীপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর করিব ?" এতদুত্তরে তিনি বলিলেন "বুদ্ধের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্নেহময়ী জননী স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যুগ্ম শাল বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বুদ্ধ অবিশ্বাসী মানবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সুবর্ণের শবাধার হইতে তাঁহার মাতার জন্য যুক্তকরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ উত্তর দিবে।"

নদী পার হইয়া ৩০০।৪০০ শত হস্ত দূরে নগরের উত্তরে একটি স্তূপ আছে। এই স্থানে তাহারা তথাগতের শব দাহন করিয়াছিলেন। এই স্থানের মৃত্তিকা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। ধর্ম্মবিশ্বাসী যে কোনব্যক্তি এই স্থানে অনুসন্ধান করিলে বুদ্ধের কোন না কোন শরীর চিহ্ন পাইবেন।

তথাগতের মৃত্যু হইলে দেবতা ও মনুষ্যগণ স্নেহপ্রণোদিত হইয়া সাতটী মূল্যবান দ্রব্য দ্বারা তাঁহার শবাধার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সহস্রখানি গাত্রাচ্ছাদন দ্বারা তাঁহার শব আবৃত করিয়াছিলেন ; তাঁহারা শবাধারের উপরে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য এবং তদুপরি আবরণ ও চাঁদোয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে মল্লগণ শবাধার উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং শবাধারের অগ্রপশ্চাৎ সকলে যাইতে লাগিলেন। সুবর্ণ নদী পার হইয়া, তাঁহারা গন্ধ তৈল দ্বারা শবাধার পূর্ণ করিয়া, চতুপার্শ্বে সুগন্ধি কাষ্ঠস্থাপনা করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। মাত্র দুইখানি আবরণ ব্যতীত সমস্তই ভস্মীভূত হইল। পরে, পৃথিবীর হিতার্থে তাঁহারা বুদ্ধদেবের কেশ ও নখগুলি গ্রহণ করিয়া লইলেন। বুদ্ধদেবের শরীরের কেবল এই দুই দ্রব্যই অগ্নি গ্রহণ করে নাই। যে স্থানে তাঁহার দেহ দাহ করা হয়; তাহার নিকটেই একটি স্তূপ আছে, এই স্থানে বুদ্ধদেব কশ্যপের প্রীত্যর্থে নিজ পদযুগল শবাধারের বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তথাগতকে শবাধারের মধ্যে স্থাপিত করিয়া উহা তৈলপূর্ণ করা হইলে চতুস্পার্শ্বে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি দেওয়া হইল কিন্তু অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল না। এতদ্দৃষ্টে সমাগত জনবৃন্দ ভীত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে অনিরুদ্ধ বলিলেন "আমাদের কশ্যপের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই সময়ে পাঁচশত শিষ্য সমভিব্যাহারে কশ্যপ বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুশীনগরে আসিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি বুদ্ধদেবের শব দর্শন করিতে পারি ?" আনন্দ বলিলেন "সহস্র গাত্রাবরণী দ্বারা আবৃত করিয়া আমরা তাঁহার শবকে শবাধারে স্থাপিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি কাষ্ঠ স্তূপীকৃত করিয়া উহাতে অগ্নি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।" ঠিক এই সময়ে বুদ্ধদেব শবাধারের মধ্য হইতে নিজ পদযুগল বহির্দ্দেশে স্থাপন করিলেন। চক্র চিহ্নের ঊর্দ্ধদেশে বিচিত্র বর্ণের চিহ্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। আনন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সকল কি ?" আনন্দ উত্তর করিলেন "তিনি যখন প্রথম দেহত্যাগ করেন, তখন দেবতা ও মনুষ্যের চক্ষের জল তাঁহার পদযুগলের উপর পতিত হওয়ায় এই সকল চিহ্ন হইয়াছে।

তখন কশ্যপ শবাধার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বুদ্ধদেবের উপাসনা ও তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন। সুগন্ধি কাষ্ঠ আপনা হইতেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমস্তই ভস্মীভূত হইল।

তথাগতের মৃত্যু হইলে তিনি তিনবার শবাধারের বহির্দ্দেশে আগমন করেন। প্রথমবার—তিনি নিজ হস্ত উত্তোলন করিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি পথ প্রস্তুত করিয়াছ ?" দ্বিতীয়বার—তিনি উপবেশন করিয়া তাঁহার মাতার প্রীত্যর্থে ধর্ম্ম প্রচার করেন ; তৃতীয়বার তিনি মহাকশ্যপকে নিজ পদযুগল দেখাইয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনা যে স্থানে ঘটে, তথায় রাজা অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই আটজন রাজা বুদ্ধের শরীর চিহ্ন বিভক্ত করিয়াছিলেন। হইয়াই

সম্মুখভাগে প্রস্তর স্তম্ভে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর এবং তাঁহার শবদাহ হইলে আটজন নরপতি স্ব স্ব চতুর্ব্বর্গ সৈন্যসহ এক একজন অপক্ষপাতী ব্রাহ্মণকে কুশীনগরের মল্লগণকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিতে প্রেরণ করেন "দেব ও মনুষ্যের পথপ্রদর্শক এই দেশে দেহত্যাগ করিয়াছেন; আমরা বহুদূর হইতে তাঁহার শরীরের অবশিষ্টাংশ লইতে আগমন করিয়াছি।" মল্লগণ উত্তর করিলেন "তথাগত এই দেশে অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুভাগমন করিয়াছেন; পৃথিবীর উপদেশক দেহত্যাগ করিয়াছেন; সমগ্র জীবিতের স্নেহশীল পিতা প্রস্থান করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শেষ চিহ্নের সম্মান আমাদের করা একান্ত কর্ত্তব্য। আপনাদের পথক্লেশ বৃথা হইয়াছে, কেননা আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।" তখন এসকল পরাক্রান্ত রাজা পুনরায় প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বলিলেন "আপনারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; আমাদের সৈন্যগণ সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছে।" তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দয়ালু প্রভু কি প্রকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, আপনারা সেই বিষয় চিন্তা করুন। চিরদিনের জন্য তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আপনারা যে যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন, উহা সমীচীন নহে। বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন আট অংশে বিভক্ত করুন; তাহা হইলে সকলেই উহা পূজা করিতে সমর্থ হইবেন। যুদ্ধের কি আবশ্যক আছে?" মল্লগণ এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া শরীর চিহ্নগুলি আট অংশে বিভক্ত করিলেন। তখন দেবতাধিপতি শক্রও বলিলেন যে দেবগণেরও এক অংশ প্রাপ্য; সেই অংশ লইয়া কেহ বিবাদ করিও না।" নাগ অনবতপ্ত এবং মুচিলিন্দ ও ইলাপত্রও বিবেচনা করিয়া বলিলেন "উহাদিগকে অংশ গ্রহণে বাধা দেওয়া আমাদের উচিত নহে; আমরা বলপূর্ব্বক গ্রহণে উদ্যত হইলে, ইহা আমাদের মঙ্গলজনক হইবে না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন 'এরূপ বিবাদ করিও না।' পরে তিনি চিহ্নগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ দেবগণের জন্য, একভাগ নাগগণের জন্য এবং তৃতীয়াংশ মনুষ্যগণের জন্য রাখিলেন। দেবতা ও নাগগণের এই অংশ গ্রহণে নরপতিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

এই স্তূপের দক্ষিণে আন্দাজ ২০০লি যাইয়া আমরা একটী বৃহৎ গ্রামে উপস্থিত হই; এই স্থানে ধনাঢ্য সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ, পঞ্চবেদজ্ঞ, ত্রিপিটকপারদর্শী এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার গৃহের সন্নিকটে তিনি পুরোহিতগণের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং এই গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য তাঁহার অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে কোন পর্য্যটক পর্য্যটনকালে এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি পর্য্যটককে এই স্থানে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। পর্য্যটকগণ একরাত্রি বা ক্রমাগতঃ ৭ দিবস এই স্থানে অপেক্ষা করিতে পারিতেন।

পরে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে সঙ্ঘের যতিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন এবং বহুকালের জন্য দূরীভূত হন। কিন্তু উপরোক্ত ব্রাহ্মণ যতিগণের প্রতি চিরকালই ভক্তিমান থাকেন। একদিবস ভ্রমণকালে তিনি মুণ্ডিতমস্তক ও যষ্টিধারী শ্রমণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তিনি কোন স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং যতিগণের জন্য নির্ম্মিত গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। প্রাতঃকালে উক্ত শ্রমণকে তিনি পরমান্ন প্রদান করিলেন। শ্রমণ একগ্রাস মাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিলেন "কি কারণে আপনি আমার সহিত এক রাত্রিও অতিবাহিত করিবেন না? আহার কি আপনার প্রীতিকর হইতেছে না?' শ্রমণ অনুগ্রহ করিয়া উত্তর করিলেন "অগ্রে আহার সমাপন করিয়া পরে আপনার প্রশ্নোত্তর দিব।" আহার সমাপনান্তে তিনি তাঁহার বস্ত্রাদি একত্রিত করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনি আমার সহিত

বাক্যালাপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; এইরূপ কি কারণে মৌনাবলম্বন করিলেন?" শ্রমণ উত্তর করিলেন "আমি বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু তোমার সহিত বাক্যালাপ বিরক্তিকর; এবং আমি যাহা বলিব তাহাও সন্দেহজনক; তত্রাপি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। তোমার প্রদত্ত আহারে আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই; কেন না বহুশতাব্দী ধরিয়া আমি আহার গ্রহণ করি নাই। যখন তথাগত এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, এবং বেণুবন বিহারে কালাতিপাত করিতেন, তখন আমি তাঁহার শিষ্যরূপে নদীর পবিত্র জলে তাঁহার পাত্রপূর্ণ করিতাম; তাঁহার মুখপ্রক্ষালনের জন্য জল দিতাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি যে দুগ্ধ প্রদান করিয়াছ, তাহা পুরাকালের সেই জলের ন্যায়ও সুস্বাদু নহে। ইহার কারণ এই যে দেব ও মনুষ্যগণের পুণ্য হ্রাস হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ তখন উত্তর করিলেন "আপনি যে স্বচক্ষে বুদ্ধদেবকে দেখিয়াছেন ইহা কি সম্ভবপর?" শ্রমণ উত্তর করিলেন "তুমি কি কোনদিন বুদ্ধের পুত্র রাহুলের নাম শ্রবণ কর নাই? আমিই সেই রাহুল। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই আমি এতদিন নির্ব্বাণ লাভ করি নাই।" শ্রমণ এই বলিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ গৃহ পরিষ্কার করিয়া ঐ কক্ষে রাহুলের মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক রাহুল তথায় সশরীরে বর্ত্তমান এই মনে করিয়া, সেই মূর্ত্তিকে পূজা করিতেন।

মহাবনের মধ্য দিয়া ৫০০ লি যাইয়া আমরা বারাণসীরাজ্যে পৌঁছি।

(ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত)

সপ্তম খণ্ড

বারাণসী।

এই প্রদেশ প্রায় ৪ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। রাজধানী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮।১৯ লি এবং ৫।৬ বিস্তৃত; রাজধানীর মধ্যস্থ দ্বারগুলি চিরুণীর ন্যায়; লোকসংখ্যা যথেষ্ট। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী, এবং বাসগৃহে অনেক বহুমূল্যবান দ্রব্যাদি আছে। অধিবাসীরা দয়ালু ও কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অধ্যয়নশালী। বিধর্ম্মীর সংখ্যাই অধিক; মাত্র কয়েকটী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছে। জলবায়ু মনোরম; প্রচুর শস্য জন্মে; ফলবান বৃক্ষের অন্ত নাই। প্রায় ৩০টী সঙ্ঘারামে ৩০০০ সহস্র যতি বাস করেন। ইহারা সম্মতি-সম্প্রদায়ভুক্ত হীনযানমতাবলম্বী। প্রায় একশত দেবমন্দির আছে; ইহাতে প্রায় ১০০০০ সহস্র সম্প্রদায় বাস করে। ইহারা প্রধানতঃ মহেশ্বরকে পূজা করে। কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডন করে; কেহ তাহাদের কেশ একত্র বন্ধন করে এবং উলঙ্গ হইয়া গমনাগমন করে ইহারা অঙ্গে বিভূতি মাখে এবং সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে।

রাজধানীতে বিংশতিটি দেবমন্দির আছে; এই সকল মন্দিরের কক্ষ ও স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যশোভিত প্রস্তর ও কাষ্ঠের নির্ম্মিত। বৃক্ষের পল্লবসমূহে ছায়া এবং মন্দিরগুলির চতুর্দ্দিকে সুমিষ্ট জলপূর্ণ নদী বিরাজিত। তাম্রনির্ম্মিত মহেশ্বরের মন্দিরটি এক শত ফুটের কিছু কম উচ্চ। মহেশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে গম্ভীর ও মহিমাময় এবং দেখিলে জীবিত বলিয়া বোধ হয়।

রাজধানীর উত্তর পূর্ব্বদিকে, বরণা নদীর পশ্চিমে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। ইহা উচ্চে প্রায় এক শত ফুট: ইহার সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ; ইহা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়; ইহার উপরিভাগ বরফের ন্যায় মসৃণ এবং বুদ্ধের প্রতিবিম্ব ইহাতে সকল সময়ই প্রতিফলিত হয়।

বরুণা নদীর প্রায় ১০ লি উত্তর পূর্ব্বে আমরা মৃগদাব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং ইহা আট অংশে বিভক্ত। প্রাসাদ, ঘরের ছাদ ও অলিন্দগুলি সুচারুকার্য্য সমন্বিত। এই মঠে সম্মতি-সম্প্রদায়ভুক্ত হীনযান মতাবলম্বী পঞ্চদশ শত যতি বাস করে। প্রাচীর মধ্যে ২০০ ফুট উচ্চ একটি বিহার আছে; ছাদের উপরিভাগে সুবর্ণাবৃত আম্র বৃক্ষের মূর্ত্তি। প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত কিন্তু মন্দির ও কোলঙ্গাগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত। কোলঙ্গাগুলি প্রত্যেক দিকে এক এক শত করিয়া চারিদিকে চারিশত

কোলঙ্গা আছে এবং প্রত্যেক কোলঙ্গাতে সুবর্ণের বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত। বিহারের মধ্যস্থলে তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধের মূর্ত্তি। ইহা মানবাকৃতি এবং ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে।

বিহারের দক্ষিণ পশ্চিমে রাজা অশোকনির্ম্মিত প্রস্তর স্তূপ। ভিত্তিমূল নষ্ট হইয়া গেলেও, বর্ত্তমানেও প্রাচীরের প্রায় ১০০ ফুট অবশিষ্ট রহিয়াছে। স্তূপের সম্মুখ ৭০ ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ। স্তম্ভের 'প্রস্থল' আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং যাহারা ভক্তিসহকারে ইহার সম্মুখে প্রার্থনা করে, তাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী সু বা কু চিহ্ন দর্শন করে। তথাগত জ্ঞান লাভ করিয়া এই স্থানেই ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন।

এই স্তূপের সন্নিকটেই অন্য একটি স্তূপ। অজ্ঞাত-কৌণ্ডিন্য এবং অন্যান্য সকলে বোধিসত্ত্বকে কঠোর তপস্যা হইতে বিরত হইতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে আসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। ইহার নিকটে একটি স্তূপ আছে; এই স্থানে পাঁচ শত বুদ্ধ একই সময়ে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, আরও তিনটি স্তূপ আছে, যথায় পূর্ব্বোক্ত তিন জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে।

এই শেষোক্ত স্থানের নিকটেই অন্য একটি স্তূপ। এই স্থানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশ্বাস পাইয়াছিলেন। পুরাকালে যখন তথাগত রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষুগণকে নিম্নোক্ত প্রকারে সম্বোধন করিয়াছিলেন। "ভবিষ্যতে যখন জম্বুদ্বীপে শান্তি বিরাজ করিবে এবং মনুষ্যের অশীতি সহস্র বৎসর পরমায়ু হইবে, তখন মৈত্রেয় নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার অবয়ব সুবর্ণবর্ণ এবং চাকচিক্যশালী হইবে। গৃহত্যাগ করিয়া তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং সকল জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি ত্রিপিটক প্রচার করিবেন। যাহাদের অন্তঃকরণে আমার প্রচারিত ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহারাই রক্ষা পাইবে। মৈত্রেয়ের দ্বারা অনেকে দীক্ষিত হইবে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পারিভাষিক শব্দ—প্রাকৃত

নাট্যকলার শব্দকোষে এমন অনেকগুলি মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়—যাহা শ্রেণী-বিভাগ-কার্য্যের প্রয়োজনবশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে, ধার করা হইয়াছে, বা রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সকল শব্দের ইতিহাস অনেকস্থলেই তমসাচ্ছন্ন; উহাদের বুৎপত্তি ও মূলধাতু হইতেও উহাদের যথোচিত ব্যাখ্যা হয় না। উহাদের নামের সহিত ভাবার্থের যে সম্বন্ধ তাহা সাধারণতঃ যদৃচ্ছাসম্ভূত বলিয়া মনে হয়, এবং টীকাকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাতে বুদ্ধির চাতুর্য্যমাত্র প্রকাশ পায়। এই সকল পারিভাষিক শব্দের মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা প্রথম দৃষ্টিতেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।—অর্থাৎ উহাদের গঠনে অনুনাসিক বর্ণের সমধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত পরিবেষ্টনের মধ্যে এই সকল শব্দের প্রাকৃত-অলঙ্কার কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। যদি নাট্যশাস্ত্র গোড়ায় সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার বাহিরে, শব্দ উদ্ভাবন করিবার

প্রয়োজন হইত না। কেননা সংস্কৃত ভাষা এত সমৃদ্ধ যে সর্ব্বপ্রকার রচনাতেই অতি-সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারদিগেরও প্রয়োজনসাধনে অনায়াসে সমর্থ। তাই আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, এই সকল অ-সংস্কৃত শব্দ,—সংস্কৃত নাটকের যুগ অপেক্ষা আরও কোন প্রাচীন সাহিত্যিক যুগের সাক্ষ্য দেয় কি না। সম্ভবতঃ ঐ সকল শব্দ সেই যুগের ভগ্নাবশেষমাত্র। ভাস ও কালিদাসের যুগের পূর্ব্বে এক সময় নিশ্চয়ই প্রাকৃতভাষায় রচিত নাট্যাবলীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সকল নাটক সাহিত্যিক আকার প্রাপ্ত হইলেও উহাদের ভাষা ব্রাহ্মণ্যিক দেবভাষা অপেক্ষা তখনকার লৌকিক ভাষারই অনেকটা কাছাকাছি। এই সকল নাট্যাবলীকে পত্তনভূমি করিয়া সম্ভবতঃ একটা অলঙ্কারশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল; উহা "নাট্যশাস্ত্রের" আগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। ভরত, প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে যথাবৎ সংকলন করিয়া স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কতকগুলি প্রাকৃভাষিক শব্দকে তিনি সংস্কৃত আকার প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যে সকল শব্দ সংস্কৃতে পরিণত হইবার নহে, তাহাদিগের লৌকিক রূপ বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সকল-স্থলে যথাযথ হয় নাই; প্রাচীন প্রাকৃতের সবিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কতকগুলি শব্দের ঠিক অর্থ বুঝা যায় না।

সাহিত্যিক প্রাকৃতের ব্যবহার ও শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়মাবলী আলঙ্কারিক গ্রন্থসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অভিনব তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাকৃত নাটক সংস্কৃত নাটকের পূর্ব্ববর্ত্তী, এই যে আমাদের অনুমান—উক্ত তথ্য এই অনুমানটিকে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যদর্পণে প্রাকৃত ভাষার যে দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহাদের প্রয়োগসম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম দৃষ্ট হয় যাহা সর্ব্ববাদাসম্মত। সেই নিয়মটি এই:—নিম্নশ্রেণীর পাত্রগণ "স্বস্ব দেশের প্রচলিত ভাষায় কথা কহিবে।" (১) কিন্তু নাটকের প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে, প্রাকৃত ভাষা চারিটিমাত্র আদর্শ-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।—যথা, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী ও মহারাষ্ট্রী। এই প্রাকৃতগুলির মধ্যে তিনটি, ভারতের তিনটি প্রদেশের নাম গ্রহণ করিয়াছে। (২) কিন্তু ঐ তিন প্রাদেশিক চলিত ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে উহাদের সুস্পষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ প্রাকৃত যাহা পিশাচদিগের ভাষা, উহা স্পষ্টই দেখা যায় ভূগোলের বাহিরে—এমন কি, প্রচলিত ব্যবহারেরও বাহিরে। নাটকের প্রাকৃতিগুলি কৃত্রিম ধরণের ও নিছক সাহিত্যিক ভাষা। সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের পূর্ব্বেও মহারাষ্ট্রী ও পৈশাচী বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

(১) দশরূপ II, ৬১।

(২) মথুরার চারিধারে যে শূরসেনদিগের দেশ সেই দেশের ভাষা শৌরসেনী। মগধের ভাষা মাগধী। পাটলীপুত্র পালিবোত্রা পাটনার চারিধারে মগধ দেশ। মহারাষ্ট্রদিগের দেশ যে মহারাষ্ট্র সেই মহারাষ্ট্রের ভাষা মহারাষ্ট্রী।

মহারাষ্ট্রীই বিশেষরূপে 'প্রাকৃত'-নামে পরিচিত। হালের যুগে (খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দী) যে সকল ভাষা বিশেষরূপে অনুশীলনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, মহারাষ্ট্রী তাহার অন্তর্ভুক্ত। "যে ব্যক্তি প্রেম লইয়া ব্যাপৃত, অথচ প্রাকৃতভাষায় কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কি লজ্জা হয় না?(৩) যে কাব্যের প্রতি লোকের বিশেষ আদর থাকায় তাহার রচনা কালিদাসের প্রতি আরোপিত হয়, সেই "সেতুবন্ধ" কাব্যটি মহারাষ্ট্রী ভাষার দীর্ঘ জীবনসম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। পৈশাচী ভাষায় গুণাঢ্য বৃহৎ কথা লিখিয়াছিলেন। স্বকীয় সাহিত্যিক সৌভাগ্যের জন্য মাগধী ভাষা জৈন ও বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী। জৈন ও বৌদ্ধগণ স্বকীয় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নে ঐ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, মাগধী ভাষা, প্রাচীন মাগধগণের ভাষা। এই মাগধেরা সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজদরবারে উহারা নৃপগণের প্রসাদ লাভ করিত, উহারা রাজাদিগের গুণকীর্ত্তন করিত। উহারা অতীত মহাকাব্যের ও পৌরাণিক গাথাসমূহের গায়ক ছিল। পাটলীপুত্র বা পাটনার চতুষ্পার্শ্বে (এখনকার বিহার) তাহারা বাস করিত। সম্ভবতঃ নাটকের মাগধী সেই প্রাচীন কথকথার ভাষারই অনুবৃত্তি। কেবল শৌরসেনীর কোন সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে ঐ শৌরসেনী ভাষায় কৃষ্ণধর্ম্মের প্রাচীন ঐতিহ্য চলিয়া আসিয়াছে।

শূরসেনদিগের যে দেশ সেই দেশের রাজধানী মথুরা। ঐ মথুরাই কৃষ্ণধর্ম্মের পীঠস্থান। ঐখানেই কৃষ্ণের জন্ম হয়, ঐ খানেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়; তাঁহার প্রাথমিক অদ্ভুত কর্ম্মসমূহের জন্য ঐ স্থানই প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রেমে আত্মহারা গোপীদিগের উপর তাঁহার অজস্র প্রসাদ ঐখানেই তিনি বর্ষণ করেন। এই সকল পুণ্য-স্মৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া, শৌরসেনী ভাষা কৃষ্ণধর্ম্মের উৎসবাদিতে ও কৃষ্ণধর্ম্মসংক্রান্ত কাব্যে একটা ধর্ম্মের মর্য্যাদা ও শ্লাঘ্য আসন লাভ করে। এবং তদবধি কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রণয়িনী গণ, রাধা ও তাঁহার গোপী সখিবৃন্দ শৌরসেনীভাষায় কথা কহিয়া আসিতেছে। এইরূপে কৃষ্ণধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর হইতেই প্রাচীন শৌরসেনীদেশের কথিত ব্রজভাষা ধর্ম্মের পবিত্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়। বৈষ্ণব কবিগণ (৪) ব্রজভাষায় কিংবা ইহার কাছাকাছি কোন ভাষায় কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার সাক্ষী বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস এবং অন্যান্য বাঙ্গালী গীতিকাব্যের কবিগণ। এই প্রথা যাত্রাতেও রক্ষিত হইয়াছে। "দিব্যোন্মাদে" নন্দগোপ ব্রজভাষায় একটা ধর্ম্মগীত গান করিলেন। (৫) কৃষ্ণকাহিনীর সহিত শৌরসেনীর একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকায় Lassen পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়াছিলেন উহা প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম-

(৩) হাল, V, ২।

(৪) 'ব্রজ—মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থান।

(৫) Nisikantas, Essay 23.

সংক্রান্ত নাট্যাভিনয়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন। (৬) হরিবংশে দ্বারবতীর উৎসবের যে বর্ণনা আছে, তাহা এই মতটিকে আরও দৃঢ় করে। যাদবদের উৎসব-আমোদে যোগ দিবার জন্য অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল, গোপীদিগের সহিত একযোগে কৃষ্ণ যে মণ্ডলাকার নৃত্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহারা সেই রাশ-নৃত্য করিতে লাগিল, এবং তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, দেশভাষায় দেবতাদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। দ্বারবতী শূরসেনদিগের একটি উপনিবেশ। তাই সেখানে শৌরসেনী ভাষা সংরক্ষিত হয়।

সাহিত্যিক ইতিহাসে যে প্রাকৃত সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত, নাটকে তাহার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না। যে সকল শ্লোক প্রধান পাত্রগণ কর্তৃক গীত হইয়া থাকে শুধু সেই সকল শ্লোকই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। কোন জ্ঞাত নাটকে পৈশাচীর ব্যবহার দেখা যায় না। মাগধীর ব্যবহারও অতীব সংযত। নাটকের যাহা প্রকৃত প্রাকৃত-ভাষা, যাহা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—সাহিত্যিক ইতিহাসে তাহারই শুধু কোন বংশাবলী নির্ণয় করা যায় না। (৭) এই বিষয়ে শৌরসেনীর অপূর্ব্ব সৌভাগ্য। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রচনায় শৌরসেনীর প্রভাব যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ ছিল তাহা উক্ত সাহিত্যিক সৌভাগ্যই তাহার সাক্ষী। তা ছাড়া, শূরসেনদিগের উপনিবেশে,—কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারবতীর রমণীরাই লাস্যনামক নাট্যনৃত্য প্রচার করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। শূরসেনদিগের দেশেই যে কৃষ্ণধর্ম্মের প্রভাব বলবৎ ছিল তাহা তখনকার প্রচলিত ব্যবহার ও ঐতিহ্য উভয়ই সাক্ষ্য দেয়।

কৃষ্ণকাহিনীর সহিত নাটকের চারিটি বৃত্তিও সংযুক্ত। এই বৃত্তিগুলি "অভিনয়ের মাতৃস্বরূপ।" সাত্বতী, কৈশিকী ও ভারতী, এই বৃত্তিত্রয়ের, নিরুক্তকারগণ যেরূপ ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতে বেশ গুণপনা প্রকাশ পাইলেও উহা যথাযথ বলিয়া মনে হয় না। উহাদের নাম রূপই ঐ অলীক ব্যুৎপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং উহাদের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। কৃষ্ণ যে যাদববংশের নায়ক ও অধিপতি,—সেই যাদববংশেরই দুই প্রধান শাখার নাম সাত্বত ও কৈশিক। এমন কি, অনেক স্থলেই কৃষ্ণ কেবল সাত্বত নামেই নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। মহাভারতে কৃষ্ণের গৃহীত ভূমিকা, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার সখ্য—ভরত হইতে ব্যুৎপন্ন "ভারতী বৃত্তি" নামের সার্থকতা ও ব্যাখ্যা সম্যক্‌রূপে সমর্থন করে। কেবল, আরভটী বৃত্তির ব্যুৎপত্তি কি তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। ইহার ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে কোন প্রমাণলেখ্য পরে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কথোপকথনের (সংবাদ) আকারে রচিত ঋগ্‌বেদের মন্ত্র হইতে জানা যায়, ভারত ইতিহাসের আরম্ভেই নাট্য জাতীয় রচনার সৃষ্টি

Md. Alt., II 507.—তথা Md. Stud IV, 269, IX 380 দ্রষ্টব্য।
Garrez Journ. Asiat. 1872, XX., p. 208 দ্রষ্টব্য।

হয়। আখ্যান-বিনির্ম্মুক্ত এই যে কথোপকথন যাহাতে একজন আখ্যানকারীর মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত উত্তর প্রত্যুত্তর পর-পর চলিয়াছে, ইহা আসলে লেখকের একটা রচনাকৌশল মাত্র নহে। প্রচলিত ব্যবহার হইতেই ইহা সাহিত্যে গৃহীত হয়। দুই তিন জন পাত্র লইয়া বৈদিক কবিরা যে প্রকৃত নাট্য রচনা করিয়াছিলেন—তাহার কারণ, তাহারা বাস্তব নাট্যাভিনয় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বৈদিক আর্য্যদিগের গীত বাদ্য নৃত্য ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যেরূপ অনুরাগ ও রুচি লক্ষিত হয়, তাহাতে এইরূপ প্রতীতি হয় যে সেই প্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতীয় নাট্যকলা শৈশবাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে এই সকল বিনোদ-ব্যাপার গ্রহণ না করিলেও প্রকারান্তরে উহাদিগকে আপনার কাজে লাগাইয়াছিল। দেবতাদের মহিমা ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পুরোহিত,সম্প্রদায় উহার সাহায্য গ্রহণ করিত। তখন কথোপকথন তিনজন পাত্রের মধ্যে বদ্ধ ছিল; কিন্তু উহার মধ্যে (মানব বা দৈব, বাস্তব বা অতিলৌকিক) "কোরস" (chorus) পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় নাট্যের প্রসর ও গৌরব বর্দ্ধিত হয়। বৈদিক সংবাদগুলি এক প্রকার অঙ্কুরাকারে নাটক বলিলেই হয়। উহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া তখনই শেষ হইয়া যায়। উহাতে নাটকের উদ্‌ঘাটন,গ্রন্থি, উপসংহার—সমস্তই একত্র মিশ্রিত। পাত্রগুলির চরিত্র, তেমন স্পষ্টরূপে চিত্রিত নহে। কিন্তু নাটকের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইয়া ঐখানেই প্রকৃত নাটকের জন্ম আরম্ভ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃঋণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইঁন্দ্রে।

অদূরে কলকারখানার গগনস্পর্শী চূড়া দেখিয়া দুই বাহু উচ্ছ্বাসভরে বিস্তার করিয়া দিয়া লাবার্স্যাদ্‌র্ জ্যাককে ডাকিয়া কহিল, "দেখ জ্যাক—কি চমৎকার দেখাচ্ছে চারিধার।"

উভয়ে তখন নৌকারোহণে লয়ার নদী অতিক্রম করিতেছিল। লাবার্স্যাদরের স্বরে কৃত্রিমতা থাকিলেও সম্মুখে ইঁন্দ্রের কর্ম্ম-কোলাহলের অস্ফুট চীৎকারের সহিত জ্যাকের চক্ষে সত্যই এক নূতন জগৎ ফুটিয়া উঠিতেছিল!

তখন অপরাহ্ণ বেলা। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে হেলিতেছিল—তাহার ক্ষীণ রশ্মি গলিত রজতধারার মত নদী বক্ষে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বায়ুতে একটা কম্পন লাগিয়াছিল। সেই কম্পিত বায়ুতরঙ্গ ভেদ করিয়া সম্মুখস্থ নগরী কুহেলিকাচ্ছন্ন মায়াপুরীর মত মনে হইতেছিল।

নদীবক্ষে অসংখ্য ষ্টীমার নৌকা—কোন ষ্টীমার ময়দার বস্তা বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তীরের নিকট জেটিতে বাঁধা কোন ষ্টীমারে লবণ বোঝাই হইতেছে, পুরুষ ও রমণী কুলি-

দিগের বিচিত্র পোষাকে লবণের টুকরা লাগিয়াছে, তাহাতে রৌদ্রকিরণ পড়ায় সেগুলা চুমকির মত ঝিকমিক করিতেছে। বাঁশি বাজাইয়া জ্যাকদিগের নৌকার পাশ দিয়া কোন ষ্টীমার চলিয়া যাইতেছে—চারিধারে একটা ব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

জ্যাক কহিল, "আর কতদূর—ইন্দ্রে ?"

"ইন্দ্রে! কেন, এই ত ইন্দ্রে।"

নৌকা তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অস্পষ্ট তীর স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল। জ্যাক দেখিল, সম্মুখে বড় বড় বাড়ী তাহাতে চিমনির সারি—চিমনিগুলা হইতে কয়লার ধূম নির্গত হইয়া সারা আকাশ কালো করিয়া দিয়াছে। লোহাপেটার শব্দ, কলের ঘড় ঘড় শব্দ, লোকের চীৎকার, ষ্টীমারের বাঁশি, সমস্ত মিলিয়া একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। তীরে ঘাটে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাবাসঁ্যাদ্র্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে, রুডিক যে!"

"এই যে, লাবাসঁ্যাদ্র্ এসেছ!"

লাবাসঁ্যাদ্র্ ও রুডিক দুই ভাই। দুই-জনের মুখে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, রুডিকের দেহ পরুষ ও বলিষ্ঠ, লাবাসঁ্যাদ্র্ সুশ্রী না হইলেও তাহার অবয়ব কতকটা কোমল ধরণের।

লাবাসঁ্যাদ্র্ কহিল, "বাড়ীর খপর কি? জারিসা, জেনেদা সকলে ভাল আছে ত!"

"সবাই ভাল আছে। এটি বুঝি সেই ছোকরা—কাজ শিখতে এসেছে! এর শরীর তেমন শক্ত নয়ত!"

"কে বললে নয়! দেখতে এমন রোগা হলে হবে কি—পারির ডাক্তাররা অবধি বলেছে, ওর শরীর বেশ মজবুত।"

"তা হলেই ভাল! নইলে আমাদের কাজ কর্ম্ম যা—তাতে শরীর বেশ মজবুত না হলে চলবেই না! এস এখন—তোমার নাম কি, ছোকরা?"

জ্যাক কহিল, "আমার নাম, জ্যাক!"

"জ্যাক! বাঃ, বেশ নাম! এস জ্যাক —লাবাসঁ্যাদ্র্ও এস—এখুনই কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নিই, তারপর বাড়ী যাওয়া যাবে।"

সকলে কারখানার দিকে চলিল। দুই ধারে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের গাছ —তাহারই মধ্য দিয়া সরু পথ—দুই ধারে কারখানাবাড়ীর বিভিন্ন ঘর, মাঝে মাঝে দূরে অদূরে কোথাও জানালায় জামা শুখাইতেছে —কোথাও শিশুর ক্রন্দন বা মাতার ঘুমপাড়ানী গান শুনা যাইতেছে—এইগুলা না থাকিলে জ্যাকের মনে হইত, যেন এক পরিত্যক্ত জনমানবহীন গ্রামপ্রান্তে সে আসিয়া পড়িয়াছে; —তখন পথে একটিও লোক চলিতেছিল না।

লাবাসঁ্যাদ্র্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ যে নিশান নামানো রয়েছে! ওঃ, আগে নামানো নিশেন দেখলে কি ভয়ই না লাগত!"

জ্যাককে তখন নিশান নামাইয়া রাখার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। কারখানা খুলিবার পর পাঁচ মিনিট অবধি নিশান তোলা থাকে তার পর নামাইয়া রাখা হয়। নিশান নামানো হইলে আর কোন কারিকরকে কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

কারিকরদিগের বিলম্ব হইলেই বিপদ—প্রথম অপরাধে, সেদিনকার হাজিরা লওয়া হয় না, পরে আর দুই একবার কারখানায় আসিতে বিলম্ব ঘটিলে কারখানা হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সকলে কারখানার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যাক দেখিল, এ যেন এক লৌহনির্ম্মিত নগর! কত লোক কাজ করিতেছে। বড় বড় লোহার গম্বুজ পড়িয়া রহিয়াছে,—কোথাও একটা এঞ্জিনের চারি ধারে বসিয়া অসংখ্য কারিকর এঞ্জিনের গায় পেরেক আঁটিতেছে। অসংখ্য পুরাতন মরিচাধরা মৃত্যুর দূত কামানের সারি মেরামতের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে!

জ্যাক এই সকল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এ কি বিরাট ব্যাপার! অমানুষিক কাণ্ড! যেন কোন্ গল্প-শ্রুত দৈত্য মহাসমারোহে নরমেধ যজ্ঞ সাধনোদ্দেশ্যে লৌহকটাহ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে অসংখ্য কারিকর নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে! জ্যাক দেখিল, পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘর—ভিতরে মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, আর সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলা ছোট ছোট দৈত্য কি এক মহা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিয়া গিয়াছে। রুডিক কহিল, "এই ঘরে লোহা পেটা হচ্ছে।"

অবশেষে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া রুডিক কহিল, "এইটে ম্যানেজারের ঘর—যাওয়া যাক"—পরে লাবাসাঁদ্রেকে কহিল, "তুমি আসছ নাকি?"

"আমি? আচ্ছা, চল—একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করা যাক—সে ত আমাকে বলেছিল, আমার দ্বারা কারখানা কাজকর্ম্ম চলবে না! এখন শুধু গান গেয়েই আমার অবস্থাটা কেমন হয়েছে, একবার তাকে দেখিয়ে খাতির আদায় করতে দোষ কি!" গর্ব্বে লাবাসাঁদরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

তিনজনে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল, "কে—রুডিক যে!"

রুডিক কহিল, "এই সেই ছেলেটি—এখানে কাজ শিখতে চায়!"

"বটে!" বলিয়া ম্যানেজার জ্যাকের দিকে চাহিয়া দেখিল, কহিল, "এর শরীর তেমন মজবুত নয় ত! এস—কি—তুমি কারখানায় কাজ শিখবে—বেশ!"

রুডিক কহিল, "না—ও বেশ শক্ত আছে।"

লাবাসাঁদ্র্ কহিল, "বেশ শক্ত!"

ম্যানেজার তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এই যে, তোমায় না চিনি"—

লাবাসাঁদ্র্ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—ভাবিল, এবার সে পরিচয় দিবে, ছয় বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে অযোগ্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলে সে এই ছয় বৎসরে গান গাহিয়া কেমন প্রভূত যশের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতিভার কেমন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে! কিন্তু ম্যানেজার তাহার প্রতি আর লক্ষ্যই করিল না। একি অবজ্ঞা?

ম্যানেজার কহিল, "তোমার ছাত্রকে তাহলে আজ নিবে যাও, রুডিক! তোমার হাতে ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওকে মানুষ করে তোল!"

তিনজনে গমনোদ্যত হইলে ম্যানেজার রুডিককে আহ্বান করিল। নিভৃতে দুইজনে কি কথাবার্ত্তা হইল। পরে রুডিক বাহিরে আসিলে লাবার্স্যাদ্র্ কহিল, "কি বললেন, ম্যানেজার? আমার সম্বন্ধে কোন কথা কি? লোকটার ভারী অহঙ্কার হয়েছে!"

রুডিক কহিল, "না, তোমার কথা নয়—ও আমাদের চালির কথা বলছিল চার্লি ভারী কষ্ট দিচ্ছে, সবাইকে!" চালি রুডিকের খুড়তুত ভাই।

লাবার্স্যাদ্র্ কহিল, "চালি কষ্ট দিচ্ছে! কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতরই। খুড়িমা মারা যাবার পর সে একেবারে উৎসন্ন গেছে। জুয়া-খেলে, মদ খেয়ে বিস্তর দেনা করে ফেলেছে। ডিজাইনের কাজ বেশ জানে! দু পয়সা পায়ও তাতে! ডিজাইনের কাজে এ সহরে ওর সমতুল্য লোক পাবে না আর একটি! তা দু পয়সা আনলে হবে কি—যা পায় সবই উড়িয়ে দেয়। তাকে শোধরাবার জন্ম ম্যানেজার, আমি, আমার স্ত্রী কম চেষ্টা কচ্ছি! ও কাঁদে, কেঁদে বলে আর কোন রকম বদখেয়ালি করবেনা—তার পর যেমন মাইনেটি পাওয়া অমনি আবার যে-কে সেই! ওর বিস্তর দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি! কিন্তু কাঁহাতক আর পেরে উঠি বল! আবার মেয়ে জেনেদাটা রয়েছে, বড় হয়েছে—ওর বিয়ের জোগাড় করতে হবে—সে,বেশ মোটা রকম ব্যয় আছে! এক সময় আমি ভেবেছিলাম, চালির সঙ্গে ওর বিয়ে দোব কিন্তু এখনই চার্লিকে দিয়ে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারিনে ত! তাই আমরা স্থির করেছি—কোনমতে এদেশ থেকে এই বদ সঙ্গীগুলোর কাছ থেকে ওকে দূরে পাঠাতে পারি ত ওর শোধরাবার কিছু আশা হয়! তাই ম্যানেজার আমাকে ডেকে বললেন, নিভারে ওর জন্ম ভাল একটা কাজের জোগাড় করেছেন—উপার্জ্জনও এখানকার চেয়ে বেশী হবে। আমরা ত নাচার এখন তুমিও বুঝিও দেখি; তোমার কথা শুনলে শুনতে পারে!"

লাবার্স্যাদ্র্ সগর্ব্বে উত্তর দিল, "বেশ, বোঝাব! তার জন্যে ভাবনা কি!"

সকলে মিলিয়া রুডিকের গৃহের দিকে চলিল। পথে বিস্তর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল! লাবার্স্যাদরের পুরাতন সঙ্গীর দল পরিচয় পাইয়া একান্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সহিত তাহার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল—সে ইহাদেরই দলের লোক ছিল! এখান হইতে ছিটকাইয়া গিয়া শুধু প্রতিভার জোরে কেমন অবস্থা ফিরাইয়া তুলিয়াছে—আর তাহারা—! হায়, বেচারা কারিকরের দল, তাহারা জানে না, লাবার্স্যাদরের প্রকৃত মূল্য কি—তাহার অবস্থা যে এই কারিকরগুলার অবস্থা হইতে কোনমতে উৎকৃষ্ট নহে,—কারিকরদিগের অন্নচিন্তা নাই—কিন্তু লাবার্স্যাদরের তাহা বিলক্ষণ আছে! তাহার এই পরিচ্ছন্ন কায়েমী পরিচ্ছদের ভিতর কি ভীষণ দৈন্য রি-রি করিতেছে, লাবার্স্যাদররের সৌভাগ্য যে তাহা লক্ষ্য করিতে কারিকর-গুলার তেমন দিব্যদৃষ্টি ছিল না!

লাবার্স্যাদর ও জ্যাককে আনিয়া রুডিক আপনার গৃহসংলগ্ন ছোট উদ্যানে বসাইল! উদ্যানটি ছোট হইলেও পরিচ্ছন্ন! উদ্যানের মধ্যে একটি টেবিল তাহারে

চতুষ্পার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ার। একটি চেয়ার ধরিয়া এক সুশ্রী তরুণী দাঁড়াইয়া—রুডিক কহিল, "ঐ আমার স্ত্রী ক্লারিসা দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

পথে রুডিক লাবার্স্যাদরকে বলিয়াছিল, তাহার প্রথমা পত্নী জেনেদার মাতার মৃত্যু হইলে ক্লারিসাকে সে আবার বিবাহ করিয়াছে। ক্লারিসাকে দেখিয়া জ্যাকের সে কথা মনে পড়িল।

ক্লারিসা সুন্দরী। তাহার মুখে এমন একটি কমনীয়তা বিরাজ করিতেছিল, যাহা এই পল্লীতে একান্ত বিরল। জ্যাকের মনে হইল, এই নিরানন্দময় বীভৎস দৈত্যপুরীর মধ্যে সে যেন কাহিনী-বর্ণিত-দৈত্য বন্দিনী কোন রূপসী পরীকন্যা! আকাশে সন্ধ্যাসমাগমে এই যে দিব্য আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে যেন এই পরীকন্যারই রূপচ্ছটার বৃক্ষপত্র দুলাইয়া এই যে স্নিগ্ধ ধীর বায়ু বহিয়া চলিয়াছে, সে যেন এই রূপসী পরীকন্যারই মৃদু নিশ্বাস! রুডিক কহিল,"ক্লারিসাকে দেখতে খাসা নয়!"

"চমৎকার—তোমার স্ত্রীভাগ্যটা এবার ভাল দেখছি।"

রুডিক স্ত্রীর সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিলে যথারীতি অভ্যর্থনাদি হইল! পরে লাবার্স্যাদ্‌র্ গান ধরিল,—"ওগো, পূত-শান্তিভরা চারু নিবাস—"সঙ্গীত থামিবার পূর্ব্বেই কে কহিল, "এই যে দাদা—তুমি কখন এলে!" সে চার্লি।

পরে চার্লি ও লাবার্স্যাদরে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ক্লারিসা আসিয়া জ্যাককে কোলের কাছে টানিয়া কহিল, "তোমার নামটি কি?"

"জ্যাক।"

রুডিক কহিল, "জেনেদা—জেনেদা কোথায়? জান, লাবার্স্যাদ্‌র্, জেনেদা এক দর্জ্জীর দোকানে কাজ করছে! জামা ফ্রক এ সব তৈরি করতে পারে বেশ—মাহিনাও বেশ পাচ্ছে!"

"বটে!" মৃদু হাস্যের সহিত লাবার্স্যাদ্‌র্ কহিল, "কোথায় সে?

ক্লারিসা কহিল, "ঐ যে আসছে!"

ক্লারিসার কথার সহিত উদ্যানমধ্যে এক নারীমূর্ত্তি দেখা দিল। এই নারী জেনেদা। জেনেদার শরীরখানি কিঞ্চিৎস্থূল—মুখে কমনীয়তা নাই! গড়নটাও সুশ্রী নহে! চোখে একটা পরুষভাব! বাহু ও পেশীগুলা পুরুষোচিত কাঠিন্যে মণ্ডিত—জেনেদাকে দেখিলে মনে হয় তাহার নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে! কর্ম্মজীবনের বজ্র ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে বৃক্ষের মত সবলভাবে দাঁড়াইতে সে সমর্থ, তাহার পার্শ্বে তাহার বিমাতা ক্লারিসাকে দেখিলে মনে হয়, ক্লারিসা যেন একান্ত পরমুখাপেক্ষিনী! লতার মত সে বৃক্ষের আশ্রয় চাহে!

জেনেদা আসিয়াই তাহার ছুঁচ সুতা লেস ও কাঁচিভরা ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিল। পরে চার্লিকে দেখিয়া কহিল, "এই চার্লি! তোমার ম্যানেজার বলছিল তোমায় নিয়ে সে ভারী জ্বালাতন হয়ে উঠেছে তোমার বদখেয়ালি ত ছাড়বে না।"

চার্লি কহিল, "না না, চার্লি, ম্যানেজারের দোষ দিওনা! ম্যানেজার তোমায় যথেষ্ট ভালবাসেন! তোমার জন্যে নিভায়ে একটা ভালো চাকরি তিনি জোগাড় করেছেন, জানো না?"

"নিভার ?"

"হ্যাঁ—নিভার! সেখানে তোমার সবদিকে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।"

বেশ—যাব! আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে তোমাদের সকলের যখন এত সাধ্যসাধনা, তখন আমি যাব।"

রুডিক কহিল, "রাত হয়ে আসচে, চল ভিতরে যাই। ক্ল্যারিসা খাবার তৈরি ?"

"হ্যাঁ।"

রাত্রে আহারে বসিয়া লাবাস্যাঁদর কারিকরদিগের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করিয়া দিল।

লাবাস্যাঁদর কহিল, "জ্যাক, এখন তুমি একজন নগণ্য লোক কেউ তোমায় জানে না, চেনে না—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখবে, তুমি জগতের একজন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

রুডিক কহিল, "সর্ব্বেসর্ব্বা! দুবেলা পেটভরে খেয়ে বুড়ো বয়সে মরবার সময় কিছু জায়গা জমি করে যেতে পারে যে সে আপনাকে মস্ত ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারে! সর্ব্বেসর্ব্বা—কি বল তুমি ল্যাবস্যাদর! ক্লারিসা খাওয়া হলে জেনেদার ঘরের পাশের ঘরটায় তুমি জ্যাকের বিছানা করে দিও—কাল ভোরে পাঁচটার সময় ডেকে দিও—ওর জন্যে একটা ছোটখাট পোষাক জোগাড় করে দিতে হবে—আছে, বোধ হয়, একটা দেখে শুনে ঠিক করে রেখো—কাল ভোরে ওকে কারখানায় যেতে হবে।"

আহারের পর নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া জ্যাকের মনে হইতে লাগিল, ঐ যে পথে অসংখ্য কুশ্রী কুৎসিত কারিকর গুলাকে সে দেখিল, সেও তাহাদেরই একজন হইবে! এই নির্ব্বাসনে থাকিয়া তাহাকে দুঃসহ জীবন বহন করিতে হইবে! ইহা অপেক্ষা মরোঙ্গার স্কুলও যে লক্ষগুণে ছিল ভাল। সেখানে সঙ্গীর দল ছিল! মাডু, আহা সে যদি এখানে থাকিত। জ্যাক আরও ভাবিল উন্নতি! তাহারই বা আশা কোথায়! এ কোথায় সে আসিয়া পড়িল! গৃহ হইতে কত দূরে? কত নদনদী ছাড়াইয়া কোন্ অপরিচিত রাজ্যে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! মা—কোথায় মা! না, জ্যাকের মার কথা মনে পড়িল! সে কারিকর হইলে মার দুঃখ ঘুচিবে, মার আনন্দ হইবে। মার সুখের জন্য এ কষ্টটুকু আর সহ্য করিতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে! এ দুঃখ এ কষ্ট সে গ্রাহ্যই করিবে না! নিজের সুখের কথা সে আর ভাবিবে না।

বিছানায় পড়িয়া কিন্তু সেই কথাই তাহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল—মার মুখ, মার হাসি, মার স্নেহ! এ জীবনে আর কি সে সব সে ফিরিয়া পাইবে!

বাহিরে তখন লাবাস্যাঁদর উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছে,—

"চল মৃদু বায়ে ধীরে তরী বেয়ে,
চল গো ফ্রান্সে, গান গেয়ে গেয়ে—"

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

যোগাভ্যা।

(তরুদত্ত)

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ'লে
ক্ষীরের জন্ম বিখ্যাত ক্ষীর-গাঁয়ে;
দুই পাশে তার গোচর-ভূমির কোলে
ঘন ঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে।
গরু ও বাছুর ঘন কুয়াসায় ঢাকা
ভাল ক'রে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর;
সহসা রৌদ্র ফুটিল আবীর মাখা,—
রামধনু রঙ,—শোভার নাহিক ওর।

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভ'রে গেছে যত শাখা;
চড়ুই নাচিয়া খাস্ত খুঁজিছে খড়ে।
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে;
দু'একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মন্থরগতি চলে,
ড্যাবা ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট;
ফলন্ত গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
তিন দিকে গাছ একদিকে শুধু ঘাট।
বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ধবধব করে চাঁদ্‌নি ঘাটের পাকা,
চাঁদনির তলে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি,
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা।
বসেছিল সেথা আয়ত-লোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে;
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে।

(৪)

"শাঁখা চাই! ভাল শাখা নেবে? ওগো মেয়ে!
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
ভারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।—
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে;
অক্ষয় হ'য়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীশঙ্খ এ,—নানান্ গুণ এ রাখে;
হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত"—
কৌতুক ভরে হস্ত বাড়াল নারী;
"ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথ!
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।"

(৫)

সোনালি রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারী!

সুন্দরী বটে!—তবু সে রূপের পানে
চাহতে আপনি আঁখি নত হ'য়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে,—
প্রাণ ভয়ে আধ বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!
গ্রীবার হেলনে সামালি' চুলের রাশি,
"শাঁখার মূল্য?" পুছে শাঁখারিরে নারী;
দাম শুনি' শেষে, খুসী হ'য়ে কহে হাসি'
"পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ী!"

(৬)

"বাড়ী? কোন্ পাড়া? দাম নেব বাড়ী যেয়ে?
না, না,—সন্দেহ তোমারে আমি না করি;
মা লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে হয় রাণী রাজেশ্বরী।"
"না বাছা, পড়েছি আমি গরীবের হাতে,
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী;
বাপের ভিটায় রয়েছি বাপের ভাতে,
এ গাঁয়েতে বাপু আমার বাপের বাড়ী।
সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ?—ওই আমাদের ঘর;
বাবা ঘরে আছে, বল গিয়ে তুমি তাঁকে,—
কড়ি পাবে, দেরী হবে না, নাহিক ডর।"

(৭)

"ও যে দেউল গো" "দেউলেই মোরা থাকি,
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা;
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো হাঁকি'
জোরে না ডাকিলে তাঁরে বাপু ডাকা বৃথা।
দেখা হ'লে পরে, ব'ল,—'ধামসেবা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে দ্যায়নি কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা।'...
দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,
কভু কেউ ফেরেনা মোদের বাড়ী;
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে ত্যান না ছাড়ি'।

(৮)

"হ্যাদে ত্যাখ, যদি শোনো, ঘরে নেই কড়ি,
তা' হ'লে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,—
প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা' আছে পড়ি',
—সে টাকা আমার, তাই যেন ত্যান্ ধরে;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে;
এস বাছা, তবে,—বেলা হ'ল নাহিবার।"
মুগ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
'মধু মাখা কথা—জনমে সে ভোলা ভার।'
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী;
নিরমল জল করিল আলিঙ্গন
পদ্মের মত চরণ দু'খানি তারি।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার;
তরবারি সম প্রখরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ-সার।
কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-গুরু প্রদ্যোত দ্যুতি-হার!
শান্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?
রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ভয় বাসে,
পথের ভিখারী শাঁখারী সে কোন্ ছার?

(১০)

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথখানি ধ'রে,
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা;

সোনার কলস ঝলসে দেউল 'পরে,
পূজারীর ঘর পাশে তার যায় দেখা।
খাসা ঘরখানি! দুয়ার রয়েছে খোলা;
ডাহিনে গোহাল, বাঁয়ে পোয়ালের গাদা।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
রাঙা জবা গাছ, করবী—রাঙা ও শাদা।
'টুং টাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
মরা'য়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে;
অতিথি-পথিকে মিলি' সবে যেন বলে
'সুখ এই খানে,—শান্তি সে হেথা আছে।'

(১১)

"শাঁখা চাই,—শাঁখা!" হাঁকিল শঙ্খ-বেনে,
স্বর শুনি' দ্বারে পূজারি এলেন ছুটে;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অভুক্ত জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে!
ডাকেন বিপ্র "শাঁখারি দাঁড়া রে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,—
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দু'পহরে?
ঠাকুরের ভোগ,—তা'তে বামুনের বাড়ী,
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড় পাত পেতে;
বেলাও দু' প'র,—ঠাণ্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্ গাঁয়ে যাবি,—কতদূর হ'বে যেতে!"

(১২)

কহিল শাঁখারি "ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে;—
তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটা পথ,—
বামুন বাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে।
পাঁচ খানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা;
পাঁচ খানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত?
তোমার জন্যে স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু' গাছি শাঁখা;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি'—আছে তো নগদ টাকা?

(১৩)

"খুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনার কাজে,—
তাই অত দাম।" "সে কিরে আমার মেয়ে?
কি বলিস্ তুই? কি বকিস্ তুই বাজে?"
"তোমারি তো মেয়ে, চল না দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-বাঁধানো ঘাটে,—
ডাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা।"
হাসিয়া পূজারি কহে "তাই নাকি? বটে!
বাপু হে! তোমার সকল কথাই ফাঁকা।
কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয়;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনোজনে;—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয়।"

(১৪)

"বল কি ঠাকুর? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে?
ঠকাবার মত চেহারা তো তার নয়;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে গেছে,
বলিস্ বাবাকে, টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুর ঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা," "দাঁড়া, বাপু, দাঁড়া,দেখি।"
ঘরে গেল দ্বিজ,—শাঁখারীরে, দ্বারে রেখে;
ফিরে এসে, বলে, "তাই ত! তাই ত! এ কি!
শাঁখার যে দাম বলেছিস্ তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই!
ঠিক পূরাপূরি, কম বেশী নাই, ওরে!
কম বেশী নাই একটা পয়সা নাই!

(১৫)

"বাক! অবাক! বিস্ময় মানি মনে!
ধন্য শাঁখারি! জনম ধন্য তোর!
ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যায় শ্রীচরণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর!
বুড়া হ'য়ে গেনু পূজা অর্চ্চনা করি,—
তবু দরশন পাই নাই আজো আমি;
ব্রত উপবাস করিনু জনম ভরি,
ঝাপ্‌সা দু' চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী;
দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চোখে!
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে!

(১৬)

"অবাক! অবাক! দেখা যদি পেলি তার
বর মাগি' কোন্ পুরালি মনস্কাম?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দাম?
বুঝেছি, বুঝেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
হ'য়ে গিয়েছিলি বুদ্ধি বচন-হারা।"
চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বুকে,—
নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া।
হাত হ'তে তার খসিল শাঁখার পেটি,
যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি'
তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি',
আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী!

(১৭)

শ্রাবণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেণে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্খলিত-গতি;
ঘাটে পৌঁছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে,
ধাসেরা ঘাটে নাই লাবণ্যবতী!

নীরব পাখীরা নাহিক কলধ্বনি,
নির্জ্জন দীঘি সারস ঝিমায় একা;
সুপ্ত বাতাসে উঠে মৃদু রণরণি'
পদ্ম-ফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা!
হাঁকিল শাঁখারি পূজারি ডাকিল কত,
নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই!
স্থলজল মূক—মুগুধ—মূর্চ্ছাগত
ঘুমায়ে বুঝিবা পড়েছে প্রতিধ্বনি।

(১৮)

দিন দু'পহরে নিশীথের নীরবতা!
নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে;
আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
করে নিবেদন দেবল মৃদুল স্বরে,—
"জননী! জননী! দেখা দে মা একবার,
নম্র হৃদয়ে রয়েছি মা পথ চেয়ে;
শূন্য ফিরিব? দয়া কি হ'বে না আর?
দয়া কি হবে না? ওগো পাষাণের মেয়ে!
অযাচিত দেখা দিছিস্ যেমন আজি
আরেকটিবার দেখা দে তেমনি ক'রে;
স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—
না যদি হয় গো, দেখা দে মুরতি ধ'রে।

(১৯)

"দৈববাণীতে বিদ্যুৎরূপে কিবা
জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব;
সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা
পরাণে বিথারি' অনুপম পরভাব!"
সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
জাগিয়া উঠিল পদ্মদীঘির বুকে!
তার পরে ধীরে নধর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত;—চক্ষেরি সম্মুখে!
শাঁখারি পূজারি—অবাক হইয়া রহে
বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে;

ধামসেরা ঘাটে পদ্ম আহরি' দোঁহে
নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিনশেষে।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত
আজো ক্ষীরগাঁয়ে হাজারো যাত্রী মেলে,
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্ব্বের মত
সেই শাঁখারির বংশের কোনো ছেলে;
হরষে তাহারা দেবীরে জোগায় শাঁখা
বরষে বরষে আসি' দেউলের দ্বারে,
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
ধনী তারা শাঁখা পরায়ে যোগাদ্যারে!
ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে!
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি';
দুধে ভাতে আছে শাঁখারির ছেলে মেয়ে
আঁচলে বেঁধেছে পরশ মণির কুচি!

* *

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
মিলে না এ মোটে নব্যযুগের সাথে;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মরি' এরে রেখেছি খাতার পাতে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।*

ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁ রচিত দার্শনিক গ্রন্থখানি সম্প্রতি বঙ্গভাষায় অনুদিত করিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অপূর্ব্ব রত্ন উপহার দিলেন।

ইউরোপীয় জাতিগণের স্বদেশপ্রীতি দেখাইবার একটী প্রধান উপায় তাঁহারা বিদেশীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেন। মাতৃভাষা অলঙ্কৃত করিতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর এই যে বৈদেশিক সঞ্চয় প্রয়াস ইহা তাঁহাকে একজন একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক আখ্যা প্রদান করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিবেন যে অনুবাদকালে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কি কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসার এবং প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।

কুজ্যাঁর রচনার বিশেষত্ব প্রাঞ্জলতা, সুললিত রচনবিন্যাস ও মনোরম তর্কপ্রণালী। জ্যোতিবাবু অনুবাদকালে বিশেষ যত্নসহকারে যাহাতে তাঁহার বক্তব্য অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য-প্রকাশের আস্ফালনে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল, এই তত্ত্বগুলি পর্য্যায়ক্রমে খণ্ডত্রয়ে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড যুক্তি তর্কের সমাবেশে অপেক্ষাকৃত নীরস বোধ হইলেও, ধৈর্য্যসহকারে যাঁহারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পাঠ সমাপ্ত করিবেন, তাঁহারা

* ভিক্টর কুজ্যাঁর ফরাসী হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করিবেন। দার্শনিক গ্রন্থের বিশেষতঃ কুর্জ্যার ন্যায় একজন মৌলিক চিন্তাশীল মনীষীর মতবাদ সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। কিন্তু যাঁহারা এই অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ লেখকের চিন্তাপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা কুর্জ্যার মত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আত্মা ও বাহ্য জগৎ এই অসীম কারণ-দ্বয়ের পার্থক্য এবং উভয়ের সহিত অসীম কারণের পার্থক্য কুর্জ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই সসীম কারণ—অসীম কারণের প্রকারভেদমাত্র স্পাইনোজার ঐরূপ (Spinoza) মত। কিন্তু কুর্জ্যার মত তাহা নহে। তিনি বলেন উহারা স্বাধীন শক্তি। উহাদের ক্রিয়াশক্তি উহাদের আয়ত্ত। স্বাধীন 'অসীম সত্তার' সম্বন্ধে এইটুকু ধারণাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে, তাঁহার মতে, এই সসীম সত্তা সেই পরম কারণপ্রসূত। উহারা পরম কারণের সহিত কার্য্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। কুর্জ্যা যে ঈশ্বরের কথা বলেন, তিনি সেই ঈশ্বর—বিশ্ব-ব্রহ্মবাদীগণের ঈশ্বর নহেন, অথবা Eleacties সম্প্রদায়ের ঈশ্বর নহেন। তিনি যে ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন, সে ঈশ্বর ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল, ও তাঁহার সৃজনশীলতা অবশ্যম্ভাবী হইলে তিনি সেই অবশ্যম্ভাবিতার অধিকারী হন—এই যুক্তির উত্তরে কুর্জ্যা বলেন যে প্রকৃত পক্ষে এই অধীনতা অধীনতাই নহে। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতার উচ্চতম রূপ।

আমাদিগের উপনিষদোক্ত উপদেশের সহিত তাঁহার এই মতের সামঞ্জস্য আছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কুর্জ্যার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা তাহা আমরা জানিনা।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এই বিরাট যুক্তিতর্কপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শুধু এই গ্রন্থ নহে, বহু বিদেশীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। প্রায় সমুদয় নাটকেরই সে অনুবাদ গ্রন্থগুলি রচনা-ভঙ্গীতে মৌলিকের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। এই অক্লান্ত সাহিত্যসেবী যে পরিমাণে বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবর্দ্ধনে আপনার সমস্ত-শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার যোগ্য সম্যক সমাদর বাঙ্গালী তাঁহাকে প্রদান করে নাই, ইহা

আমাদিগের জাতিগত দুর্ব্বলতার আর একটি নির্লজ্জ পরিচয়। কিন্তু এ দুঃখ কি ঘুচিবে না? গুণের আদর করিতে এখনও আমাদিগের ত্রুটি থাকিবে?

এই অবসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দু এক কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যে বয়সে লোকে অবসরের সন্ধান করেন,—শুধু সন্ধান নহে যে বয়সে জীবন রক্ষার পক্ষে অবসর একান্ত প্রয়োজনীয়—সেই বার্দ্ধক্যের সীমায় ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই জ্যোতিবাবু যে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত বিদেশীয় ও সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য রত্নাদি বঙ্গসাহিত্যের জন্য সঞ্চয় করিতেছেন—সে অধ্যবসায় আদর্শস্থানীয়। সাহিত্য-সাধনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনন্দ নহে—সাহিত্য-সাধনা তাঁহার জীবনের আরাম। বহুদিন হইতে তিনি বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান—সমগ্র জীবন যেন তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র, অথচ ভোগ নাই, বিলাস নাই, অত্যন্ত সাদা সিধা চাল—সহৃদয়, কলাকুশলী, মিষ্টভাষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থপাঠ ও রচনাতেই নিমগ্ন আছেন! তাঁহার জীবন পুণ্যময় সাধনার জীবন। বাঙ্গালী সাধারণ—শুধু বাঙ্গালী কেন—শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে অনুকরণীয়। তাঁহার জীবনের আর একটি শিক্ষণীয় গুণ—অপূর্ব্ব বিনয় ও অকপট সরলতা। অনাড়ম্বর জীবনপ্রথা বাঙ্গালার মাটিতে একান্ত বিরল। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই কলা-বিদ্যার প্রতি অনুরাগী। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "পুরুবিক্রম" নাটক শৈশবেরই রচনা,—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক তাৎকালীন "বঙ্গদর্শনে" সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "সরোজিনী" "অশ্রুমতী", প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ। বঙ্গসাহিত্যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচিত "অলীক বাবু" "দায়পড়ে দায়গ্রহ" প্রভৃতি প্রহসন বিশেষ আদৃত গ্রন্থ। শুনিয়াছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্য-সেবায় অনুপ্রাণিত হন। "ভারতী" সম্পাদিকা রচিত প্রথম উপন্যাস "দীপ-নির্ব্বাণ" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই রচিত বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাদি কিম্বা অন্য সদ্গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা গৃহের মহিলাগণের নিকট সাগ্রহে পাঠ করিয়া শুনাইয়া পরিবারে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিতেন।

চিত্রবিদ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ দক্ষতা আছে। তিনি একবার যাঁহাকে মনোনিবেশসহকারে দেখেন, কয়েকটি রেখাপাতেই তাহার মুখের একটা মোটামুটি চিত্র আঁকিয়া দিতে পারেন। ইহারই ফলে কবি ৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রেখাচিত্র পাইতে আমরা সমর্থ হইয়াছি, বিহারীলালের অন্য চিত্র নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতপারদর্শিতা দেশ-প্রসিদ্ধ। তাঁহারই প্রচেষ্টায় "ভারত সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সঙ্গীত-চর্চ্চা যাহাতে দেশব্যাপী হয়, সে বিষয় তিনি যথেষ্ট

আয়াস করিয়াছেন। শুধু যে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে পারদর্শী তাহা নহে, বৈদেশিক সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ অধিকার আছে। তাহারই ফলে আমরা "ইটালিয়ান রিঝিট" শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রাচ্য সুর পাশ্চাত্য 'ঢংও' গীত হইলে কি সুমধুর হয়, তাহা তাঁহারই সুর দেওয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের গানগুলি শুনিলে স্পষ্ট বুঝা যায়—সেগুলি তাঁহার অসামান্য সুরজ্ঞানের পরিচায়ক।

অধুনাপ্রচলিত সাঙ্কেতিক স্বরলিপির প্রথম প্রবর্ত্তক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও রাজা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। প্রাচীনকালে কবির কাব্য যেমন শ্রুতির সাহায্যেই বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিত সঙ্গীতও তেমনিভাবে চলিয়া আসিত। আমাদের গায়কেরা গানের

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাবে তন্ময় হইয়া গান গাহিতেন—সেই গান শুনিয়া শ্রোতা সুর আয়ত্ত করিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বরলিপি প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সরল ও আধুনিক স্বরলিপি প্রথার সৃষ্টি করেন।

সৌরীন্দ্রমোহনের পদ্ধতিকে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। যথা সা´ রা´ গা´। মাথায় দণ্ড দিয়া মাত্রার চিহ্ন দেওয়া হইত। পরে শূন্যমাত্রিক স্বরলিপিপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ। যথা স • • • র • গ •। সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি প্রথা-প্রবর্ত্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যথা—স৩ র২ গ৩। এই প্রথা বেশ সরল, শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য। জ্যোতিরিন্দ্র-

মার্থের পর শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এবং পরে অনেকেই এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন।

দেশের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অপরিসীম। সে অনুরাগ শুধু রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। নানাকার্য্যের মধ্যে তাহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথপ্রমু-

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তদানীন্তন কৃতবিদ্য উদ্যোগী যুবকগণ হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার ও শিক্ষাবিস্তারের উপায় করিয়া দেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই চেষ্টায় বরিশাল অঞ্চলে দেশীয় পরিচালিত প্রথম ষ্টীম লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে লাইন বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্য অকালে উঠিয়া যায়—ইহাতে তাঁহাকে বহু

অর্থকষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু উদ্যোগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত বা নিরুদ্যম হইয়া পড়েন নাই।

দেশের প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে তৎকালে তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্বদেশী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধুসমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত করেন। শুনিয়াছি, ভারতী সম্পাদিকা রচিত "স্নেহলতা" উপন্যাসে নব্যযুবকবৃন্দের পরিচালিত যে সভার উল্লেখ আছে, সে সভার চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশীসভার আদর্শ অবলম্বনে রচিত। ইহা হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৈশোরজীবনের একটা মোটামুটি পরিচয়ও আমরা পাইতে পারি।

এক্ষণে আমরা তাঁহার বিস্তারিত জীবন-চরিত লিখিতে বসি নাই—এবং এখন তাহা সঙ্গতও নহে—তাই অল্প কথায় তাঁহার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র দিলাম। তাঁহার শরীর নীরোগ হউক এবং এখনও বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎ সুললিত রচনায় অলঙ্কৃত করিতে থাকুন, তাঁহার মিষ্ট সুরে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ভরিয়া থাকুক, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কন্‌গ্রেস।

এবার পাঁচ বৎসর পরে আবার কলিকাতা মহানগরীতে ইহার ষড়বিংশতিতম অধিবেশন হইল। বৎসর বৎসর বিশাল ভারতবর্ষের নির্ব্বাচিত স্থানে এই জাতীয় সভার অধিবেশন আজ পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। তিন দিনের অধিবেশন, তাহাতেই দেশের মঙ্গল, অমঙ্গল, সংস্কার, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব এবং প্রভাব, রাজার ন্যায়ান্যায়, প্রজার দাবী দাওয়া, শিল্প বাণিজ্য, রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজসংস্কার সকল বিষয়েরই আলোচনা আন্দোলন হয়—স্বতঃই মনে প্রশ্নের উদয় হয়—ইহাতে কার্য্যতঃ ফলতঃ কোন উপকার হইতেছে কিনা, জাতীয়তার বন্ধন আত্মীয়তার বন্ধনের ন্যায় দৃঢ় হইতেছে কি, না কেবলি বক্তৃতার উত্তেজনা ক্ষণিকের জন্য হৃৎপিণ্ডের দ্রুত রক্ত সঞ্চালন সঞ্চার করিয়া চির অবসান লাভ করিতেছে? তিনদিনের এ দুর্গোৎসব, প্রবাসীর প্রত্যাগমন আনন্দের এই মিলন মন্দির, শক্তি সঞ্চয়ের উদ্বোধন জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যখন অহংগর্ব্বিত রাজপ্রতিনিধির নিষ্ঠুর আজ্ঞায় বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল তখন সে বেদনা কেবল মাত্র বাঙ্গালীর বক্ষে বাজে নাই, তাহা আমাদের পাঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী মান্দ্রাজী ভ্রাতার বক্ষেও বেদনার সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে ভারত-বর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ বঙ্গের সাহায্য করিয়াছিল! আজ প্রজাবৎসল রাজার অনুশাসনে-আবার দ্বিখণ্ডিত বঙ্গ একত্র হইয়াছে তাই আজ বঙ্গের আনন্দে প্রত্যেক ভারত-বর্ষীয় আনন্দিত। যখন দেখিতে পাই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে হাইদ্রাবাদের জল প্লাবনে পঞ্জাবের মহামারীতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক

প্রদেশে বেদনা সঞ্চারিত হয়, আর্ত্ত আতুরের সাহায্যের জন্য স্নেহ হস্ত প্রসারিত হয়, মঙ্গল সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার-চেষ্টায় সকলেই এক প্রাণ এক মন হইয়া সমর্থন করে, তখনি এই জাতীয় সম্মিলনের সার্থকতা বুঝিতে পারি।

যখন দেখিতে পাই সুদূর আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্ত, আমেরিকা, কেনেডা হইতে প্রবাসী ভারতবর্ষীয় এই সম্মিলনে স্বীয় দুঃখ জ্ঞাপন করিতে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া যান না তখন আর এ জাতীয় সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে সর্ব্ব প্রথমে যে কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইত ক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা নিতান্ত আবশ্যক ছিল আজ তাহার আর সার্থকতা নাই। আবেদন নিবেদনের দিন গিয়াছে, আন্দোলন উত্তেজনার আবশ্যক হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এখন নিয়ত চেষ্টা, অক্লান্ত অধ্যবসায়, নিশ্চল নিষ্ঠার সহিত জীবনের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে আমাদের মনে স্বদেশ প্রীতির যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহাকে সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে আর রাজ দ্বারে আবেদনের ডালি বহিয়া সময় ক্ষেপ করিলে চলিবে না। তাহার জীবন সিঞ্চন দেশের অন্তরতম অমৃতকূপ হইতে সঞ্চয় করিতে হইবে; আমাদের পিতৃপিতামহ আমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠতম বিষয়ে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন তাহারি ঐশ্বর্য্য বলে সবল দৃঢ় এক প্রাণ হইয়া দেশের কাজে জীবন নিয়োজিত করিতে হইবে। রাজাদেশ যতদূর অনুকম্পা প্রকাশ করিতে পারে তাহাও করিয়াছে এখন আত্মচেষ্টা কি করিতে পারে তাহারি পরীক্ষা। যে স্বদেশ ভক্ত জননায়কগণ এই সম্মিলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরি যৌবনকাল অতীত হইয়াছে এখন ক্রমে নব্য যুবাদিগকে দেশের কার্য্যে দীক্ষা দান করিয়া সহায় করিয়া লওয়া আবশ্যক। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে নীতি যে নিয়ম নূতন ছিল আজ পঁচিশ বৎসর পরে তাহা প্রায় তামাদি হইতে চলিল, সে নজির এখনও চালাইতে গেলে ক্রমে দেশের কাজের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, তাই যোগ্য শিক্ষিত, দেশনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ নব্যদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া লওয়া আবশ্যক; দেশনায়কগণ কখনই এ কর্ত্তব্যে বিমুখ হইবেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের বেদনা দূরীভূত হইবার পর এই প্রথম জাতীয় সম্মিলনে সকলেই আশা করিয়াছিলেন প্রাদেশিক প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা আরো অধিক হইবে, কিন্তু সুবৃহৎ মণ্ডপের অনেকাংশের শূন্যতায় এই প্রত্যাশার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইয়াছিল; সেই জন্যই আমরা এ কথা বলিতেছি।

গত ২৬, ২৭, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিদিনই জননী জন্মভূমির গৌরব গাথা গীত হইত। প্রথম দিন ভারতবর্ষের সুজলা শ্যামলা মাতৃমূর্ত্তির, দ্বিতীয় দিন মানব জাতির অদৃষ্ট বিধাতা যিনি—

পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায়চদুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়"—

যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন সেই ত্রিলোকনাথের; এবং তৃতীয় দিন অতীত

গৌরবস্মৃতি ঐশ্বর্য্যের চিরন্তন খনি হিন্দুস্থানের বন্দনা গান হইয়াছিল। সুমধুর বালিকা কণ্ঠের সহিত যুবকদিগের সুগম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তবগান সকল ধ্বনিত হইত তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপসুগন্ধ যেমন মনকে পূজার অনুকূল অবস্থা দান করে এই সকল বন্দনা-গান তরুণ যুবক ও বালিকাদিগের কণ্ঠে সমতানে গীত হইয়া অন্তরে সেই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।

বর্ত্তমান বৎসরে জাতীয় সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষাণনারায়ণ ধর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একজন সুপণ্ডিত জন-মান্য ব্যক্তি। সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত না হইলেও তাঁহাকে জানিবার সুবিধা যাহার ঘটিয়াছে তিনিই আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি বিশেষ অর্জ্জন স্বরূপ। ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গী চমৎকার। ইহারি সহযোগে গবেষণা, সূক্ষ্মবিচার, অপক্ষপাত, সমদৃষ্টি, ভাবের ওজস্বিতা, গভীর স্বদেশপ্রীতি, মণি-কাঞ্চন সংযোগ। ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষীণ শরীর লইয়া সুদূর স্বাস্থ্যনিবাস ত্যাগ করিয়া জাতীয় সম্মিলনীর আহ্বানে তিনি যে তাহার সভাপতিত্বের দুরূহ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কেবল তাঁহার স্বদেশ ভক্তির প্রমাণ নয় ইহা জাতীয় সম্মিলনীর কার্য্যকারিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রাজধানী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি মনে করেন কলিকাতার বিশেষ কোনই ক্ষতি হইবে না, কলিকাতার প্রাধান্য, তাহার ঐশ্বর্য্য এবং মার্জ্জিত শিক্ষা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে, ইহার কোনটিই বড় লাটের দিল্লী অবস্থানের দ্বারা নষ্ট কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কলিকাতার যাহা ছিল তাহাত থাকিবেই দেশের লাভের মধ্যে আবার দিল্লীতে নূতন করিয়া জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইবে।

তাঁহার মতে উত্তরপশ্চিম ভারতবাসীগণ বুদ্ধিমত্তা কিম্বা চরিত্র বলে কোন অংশেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিকগণের অপেক্ষা হীন নহে তবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুরবস্থাদোষে তাহাদের উন্নতি স্থগিত ছিল—এখনও কিছুকাল আরো অতীত না হইলে বিশেষ উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে না। এখনও কিছু দিন নূতন রাজধানী রাজনৈতিক কার্য্যকুশলতায় কলিকাতার সমকক্ষ হইবে না সত্য, কলিকাতার জনসাধারণের মত যে গৌরব বহন করে নূতন রাজধানীনিবাসীগণের মতামত সে সম্মান লাভ করিতে আরো কিছু কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে সন্দেহ নাই তবুও যখন নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে নূতন সভা সমিতির অধিষ্ঠান হইবে, ঐশ্বর্য্য বাণিজ্য এবং বিলাসের আকর্ষণে, দেশদেশান্তরের বহু জনসংখ্যা সেখানে উপস্থিত হইবে, যখন তাহা গৌরব-জনক রাজনৈতিক আন্দোলনের রঙ্গভূমি হইবে, তখন ইহার অধিবাসীগণের হৃদয়ের সবলসদ্য উদ্বুদ্ধ চেতনা, স্বীয় সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া একদিকে পঞ্জাব অপর দিকে যুক্তপ্রদেশকে উৎসাহে সংক্রামিত করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের দূরতম প্রদেশের শিরা উপশিরায় নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইবে। দিল্লীর সম্মুখে মহৎ গৌরবময় ভবিষ্যৎ—দিল্লীর মহত্ব সমগ্র উত্তর

ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, ভারতবর্ষের জাতীয়তার প্রসার যদিও চিরদিনই বঙ্গদেশের নিকট ঋণী থাকিবে—তবুও বঙ্গদেশ হইতে দূরতায় কোন ক্ষতি না হইয়া নূতন অবস্থার গুণে সমগ্র দেশ আরো লাভবান হইবে। পাঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী বহুদিনের অভ্যস্ত জড়তা পরিহার করিয়া নূতন বলে নূতন উৎসাহে প্রশস্ততর, উদারতর, বৃহত্তর, অধিকতর উত্তেজক জীবনে এবং কালে প্রবেশ লাভ করিবে।

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীনগরীতে পরিবর্ত্তিত হইলে বঙ্গদেশের কিয়দংশে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু যদি দিল্লীতে পরিবর্ত্তনে সমগ্র ভারতবর্ষের উপকার সাধিত হয় যদি প্রান্ত ও সীমান্তবাসীগণের সহিত মধ্য ও দক্ষিণ ভারত লাভবান হয় তবে বঙ্গদেশের সামান্য ক্ষতি গণনীয় নহে; কেন না সমগ্র ভারতের উপকারে প্রত্যেক ভারতবাসীর লাভ; তিনি পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী মান্দ্রাজী বোম্বাইনিবাসী কিম্বা বাঙ্গালী হউক না কেন, একই কথা!

বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিতপ্রসঙ্গে পণ্ডিত বিষাণ [illegible] আজ [illegible] করিয়াছিল তাহা কেবল [illegible], [illegible] দশ [illegible] নয় তাহা সমগ্র ভারতের—[illegible] তাহার প্রার্থনা পূরণে, তাহার সিদ্ধিলাভে, ন্যায়ের জয় ঘোষণা করিয়াছে—পদ মানের বহু উর্দ্ধেই যে ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই ঘটনায় আবার নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল।

"বিপুল সৈন্য বলের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অবিচলিত সাহস এবং প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল—আজ মহৎ গৌরব পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় এবং ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাবে এই জয় সম্ভব হইয়াছে সত্য কিন্তু দেশভক্ত জননায়কগণের বীরোচিত সাহস, আত্মত্যাগ, স্বার্থশূন্যতা যে অন্যতম কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই—তাঁহারা ঝটিকাসঙ্কুল মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার পথে যাত্রা করিয়াও সুদূর নন্দনের সমুজ্জ্বল দিব্য তোরণ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই, কখনো তাহাকে অলীক স্বপ্ন জ্ঞান করেন নাই।

দিল্লী।

প্রাচীন দিল্লী।—দিল্লীর প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। ইহা যমুনাতীরে অবস্থিত। মহাভারত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর হইতে আসিয়া এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পর ঐ বংশের ৩০ জন রাজা এখানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর অন্যান্য রাজারা ঐ স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দির প্রারম্ভে রাজা ধব্ একটী পঞ্চাশ ফুট উচ্চ লৌহ স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া নিজের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লৌহ মিনার (স্তম্ভ) কহে। ইহার পর কিছুকাল অবধি দিল্লীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা অনঙ্গ পাল আবার দিল্লী স্থাপিত

কুরেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজকে থানেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার সেনাপতি কুতুবুদ্দিনকে ভারতবর্ষে রাখিয়া যান। সেই অবধি দিল্লী মুসলমানের রাজধানী। দিল্লীতে কুতুবুদ্দিন অনেক বড় বড় অট্টালিকা ও মিনারাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তন্মধ্যে কুতুবমিনার এখনও বর্ত্তমান। ইহা নবীন দিল্লীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহার মস্তকের চূড়াটী ভগ্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আশপাশের লোকেরা এই স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আসিয়া থাকে। এই স্থানটী পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক। ছোট ছোট পাহাড়গুলি হরিৎ সুন্দর বৃক্ষ লতাদি বক্ষে লইয়া বহুদূর অবধি চলিয়া গিয়াছে। শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াবহুল বৃক্ষশাখায় নানা বর্ণের বিহঙ্গমের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার আর সেই সুরে সুর মিলাইয়া ছোট ছোট নির্ঝরগুলি ঝর ঝর রবে আঁকিয়া বাঁকিয়া রজত রেখার ন্যায় কোন্ দূর বনে মিলাইয়া যাইতেছে। এই ছায়াস্নিগ্ধ শান্ত মধুর স্থানটী বাস্তবিকই প্রাণে একটা নব আনন্দ ঢালিয়া দেয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ইহা 'ফুল ওয়ালুকি স্যার' নামে অভিহিত। ধনী লোকেরা এই সময় কুতুব মিনারের নিকট গৃহাদি ভাড়া করিয়া বাস করে ও পুষ্প পত্রে গৃহ সাজাইয়া রাখে। দিল্লীর ফুলওয়ালাদের ফুল বিক্রয়ের ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই সময় এখানে নৃত্য গীত প্রভৃতি অনেক কৌতুকাদি হইয়া থাকে। ঘোরি বংশের গিয়াসুদ্দিন তুগলক ইহার চারি মাইল দূরে এক নব দিল্লী স্থাপন করিয়া উহার নাম তুগলকাবাদ রাখিয়া ছিলেন—ইহা এখন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। হিন্দুনগর ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থাও তদনুরূপ। ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তাইমুরলঙ্গের আক্রমণে তুগলক বংশ ধ্বংস হইয়া যায়; ইনি মহম্মদ তুগলককে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে অমানুষিক উপদ্রব করিয়াছিলেন। পাঁচ দিন অবধি নগর লুণ্ঠন ও প্রজাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। তখন দিল্লীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। তাইমুরের পর লোডি বংশ রাজা হইল। পানিপতের যুদ্ধে বাবর বাদশা ইব্রাহিম লোডিকে পরাস্ত করিয়া মোগলবংশ স্থাপিত করিলেন। বাবর আগ্রাতেই থাকিতেন। কিন্তু উহার পুত্র হুমাউন দিল্লীতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবীন দিল্লী।—হুমাউনের পৌত্র সাজাহান দিল্লীর জীর্ণসংস্কার করিয়া সাজাহানাবাদ নাম রাখিলেন। ইহাই বর্ত্তমান দিল্লী, এবং ২৭৮ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লীর তিনদিক প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহা সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ, ৪ গজ প্রস্থ ও ৯ গজ উচ্চ। ইহাতে বারটী ফটক চারটী খিড়কি (ক্ষুদ্রদ্বার) ও ৬৪টী স্তম্ভ আছে। সহর পরিষ্কার—জনসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। বাটীগুলি অধিকাংশই ইষ্টক নির্ম্মিত। বাজার অত্যন্ত প্রশস্ত, গলির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সাজাহাননির্ম্মিত সাহিমহল দুর্গ ও জুমামসজিদ দর্শনযোগ্য।

সাজাহানের খাস মহলের সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার এক স্থানে ফারসি অক্ষরে একটী কবিতা খোদিত আছে যথা :—

অগর ফিরদৌস বররূয়ে জমিনস্ত।
হমীনস্ত, হমীনস্ত, হমিনস্ত!

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে ইহাই! ইহাই!! ইহাই!! কিন্তু হায়, এই স্বর্গ অল্প দিনই ছিল। সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর সুখ কালচক্রের মত সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে। মোগল বাদসাহেরা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। পাঠান ও আফ্গানেরা তাঁহাদিগকে অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিল। অবশেষে মারাট্টারা শেষ মোগল বাদসাহকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজদের আগমন কাল পর্য্যন্ত বন্দীকরিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহের পর ইংরাজেরা তখনকার নামমাত্র মোগল বাদসাহকে রেঙ্গুনে প্রেরণ করেন, তিনি তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি দিল্লীতে ইংরাজের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান। ইহার ২০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন দিল্লীতে প্রথম দরবার করেন। সে সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে রাজরাজেশ্বরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জন অতিশয় জাঁক জমকের সহিত দরবার করিয়া সপ্তম এডোয়ার্ডকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার মহিষী সাম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত এইখানে অভিষিক্ত হইলেন।

প্রাচীন কীর্ত্তি।—প্রাচীনকালের কীর্ত্তির মধ্যে রাজা ধবের লৌহ স্তম্ভের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমানদের সময়ের প্রধান কীর্ত্তি কুতবমিনার, কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে উহা পৃথীরাজের নির্ম্মিত। তাঁহার কন্যা প্রতিদিন উহার উপর হইতে গঙ্গা দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। পরে মুসলমানেরা উহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিল। ইহার নিকট বহুমন্দির ও অনেক মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কুতব মিনারের উপর এত উচ্চ যে তাহার উপর হইতে নিম্নে চাহিলে, প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়, এবং নিম্নস্থ লোকদিগকে ছোট ছোট পুতুলের ন্যায় দেখায়। ইহা ব্যতীত ফিরোজ-সাহের স্তম্ভ দর্শনযোগ্য। কথিত আছে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী প্রস্তর স্তম্ভকে ভগ্ন করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন কবরের মধ্যে হুমাউন বাদশাহের কবর অতিশয় সুন্দর—ইহা আগ্রার তাজের অনুরূপ কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র।

জুমামসজিদ।—ইহা সাজাহান নির্ম্মিত। লালকেল্লার সম্মুখে একটী উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত। ইহা ২০০ শত ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ। প্রত্যেক শুক্রবার সমস্ত মুসলমান একত্র হইয়া এই স্থানে নিমাজ পড়িয়া থাকে। ইহার ভিতর মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর গৃহ আছে; উহার দুই পার্শ্বে দুইটী মিনার সংলগ্ন; উহাদের উচ্চতা প্রায় ১৩০ ফুট। ইহারই সম্মুখ দিয়া সম্রাটের মিছিল গিয়াছিল।

লাল কেল্লা।—ইহাও সাজাহান
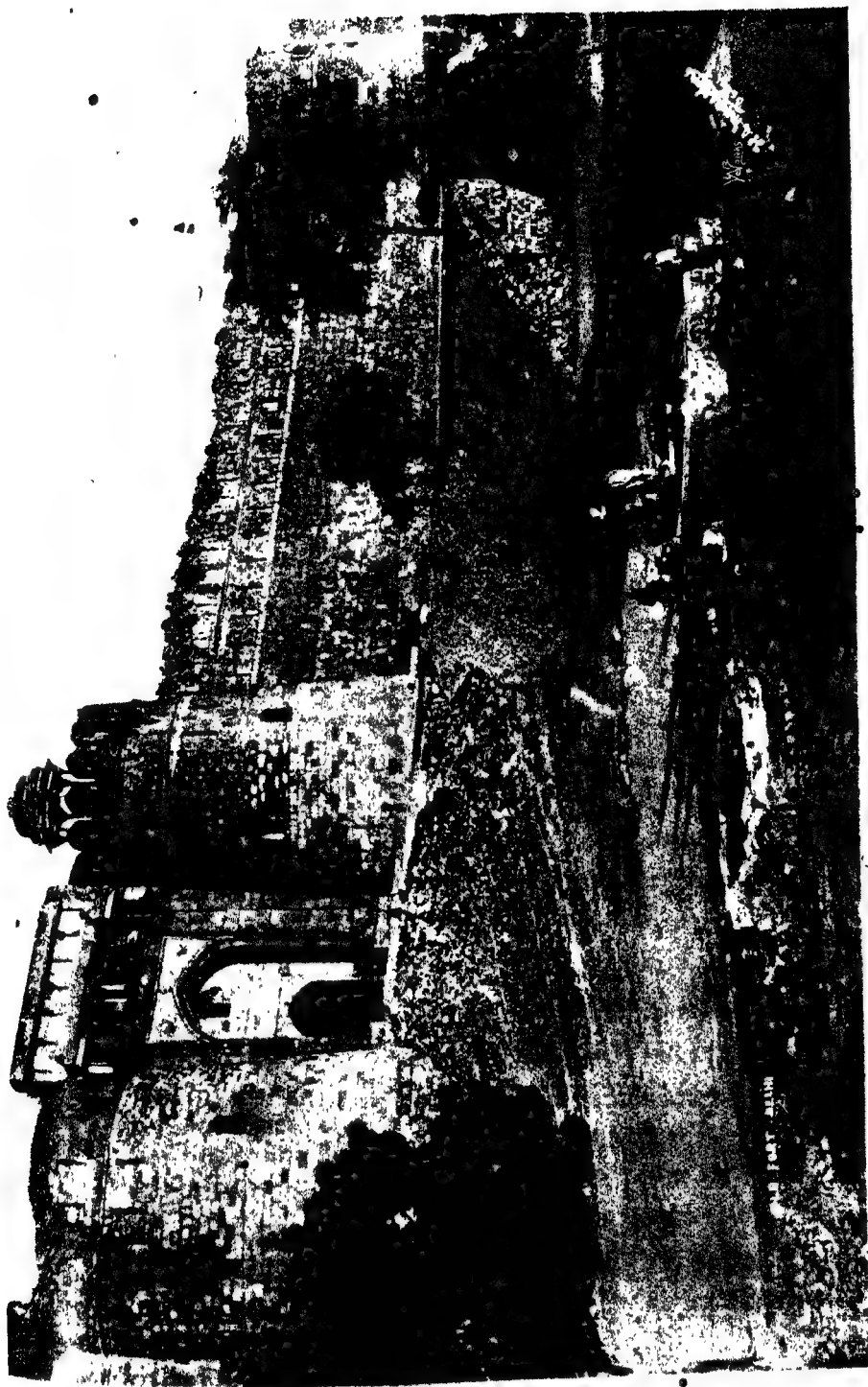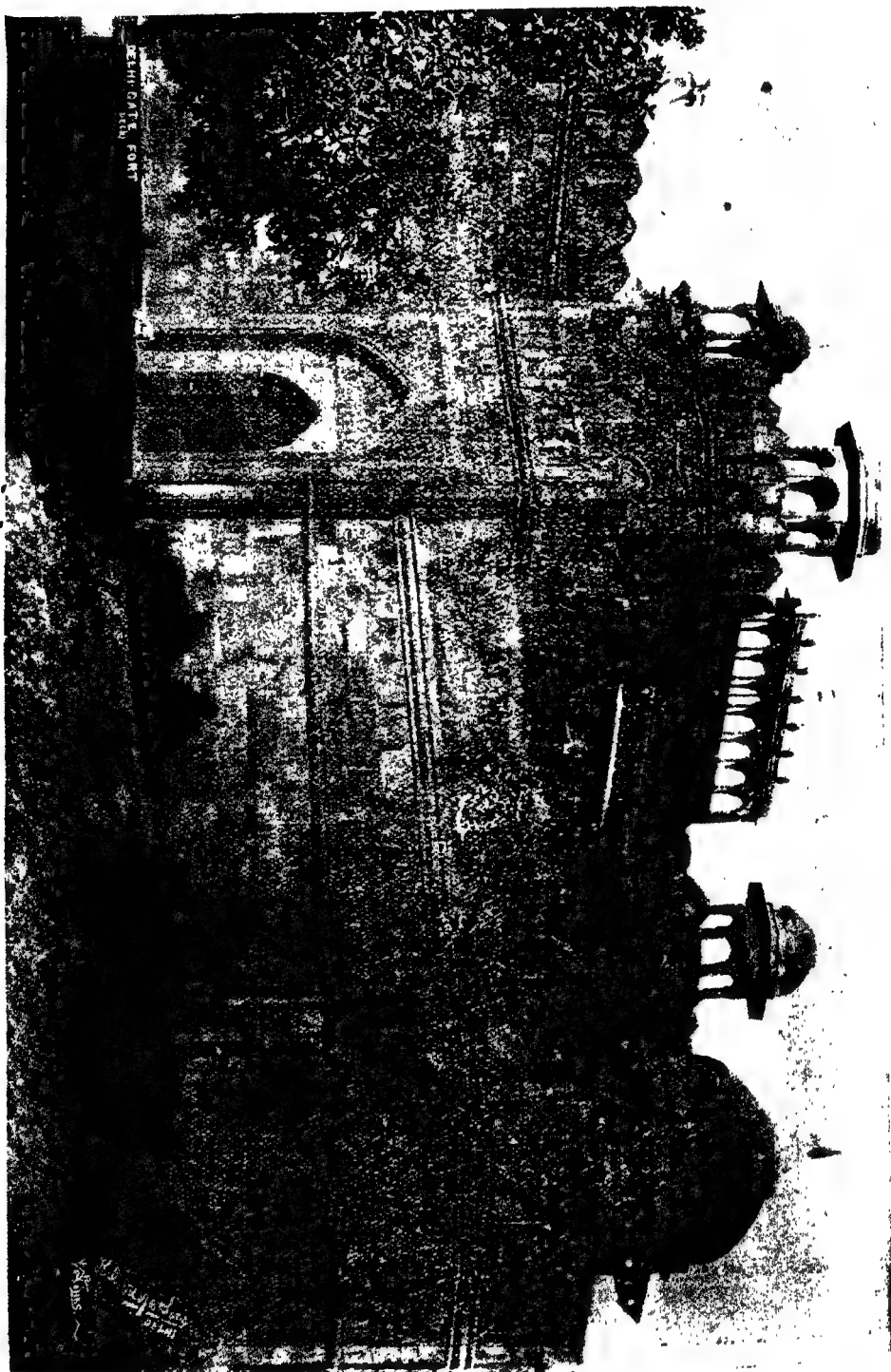
দিল্লী

DELHI GATE FORT
DELHI

PEARL MOSQUE FORT.
DELHI

VIEW OF THE
SULTAN NIZAM UDDEEN
JAHANARA

KING PALACE FROM RIVER DELHI

কুতব মিনার।

ক্লক টাওয়ার।

দিল্লী সহরের দৃশ্য।

লৌহ মিনার।

পুরাণ কেল্লার ভিতরকার মসজিদ।
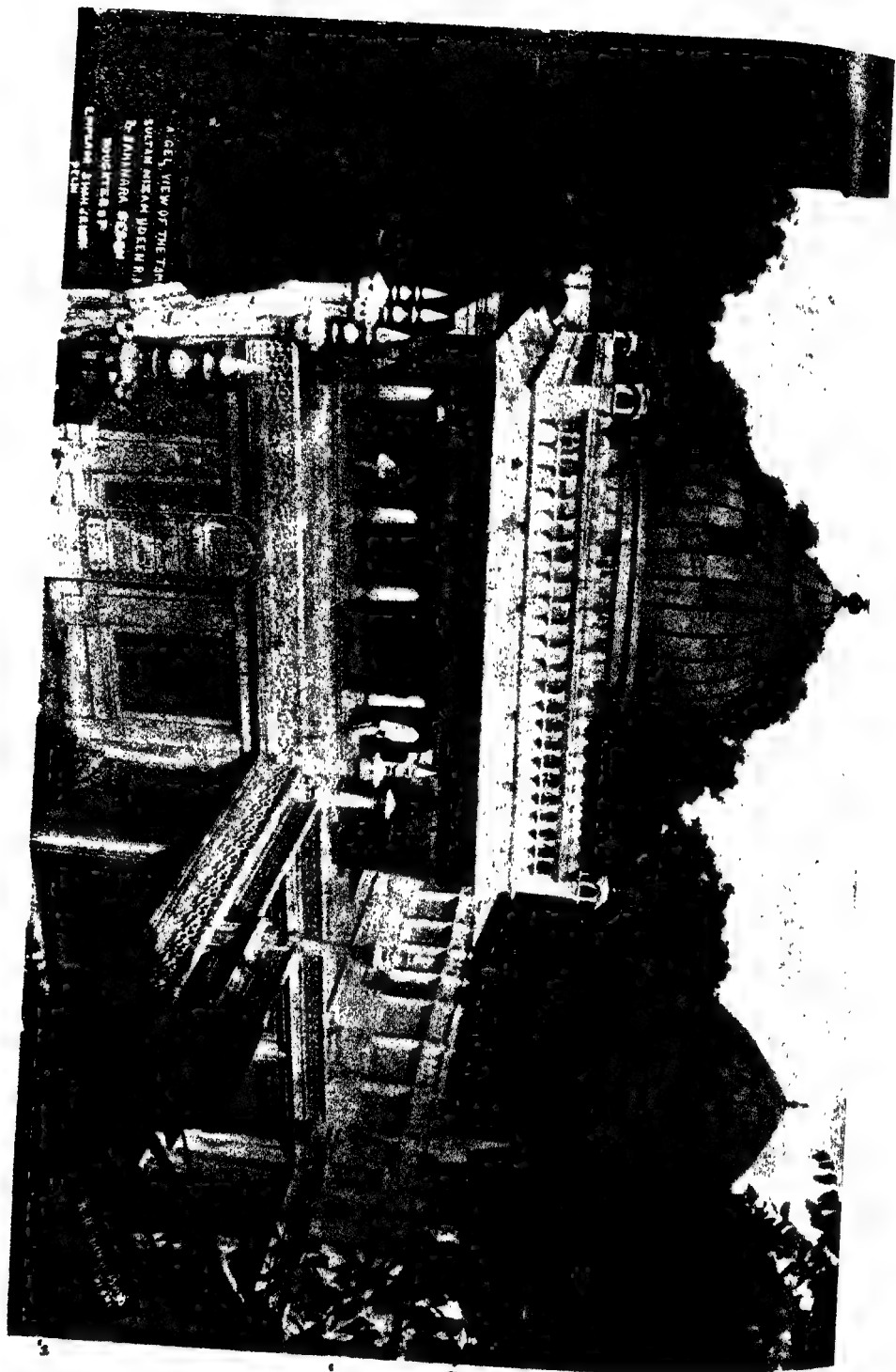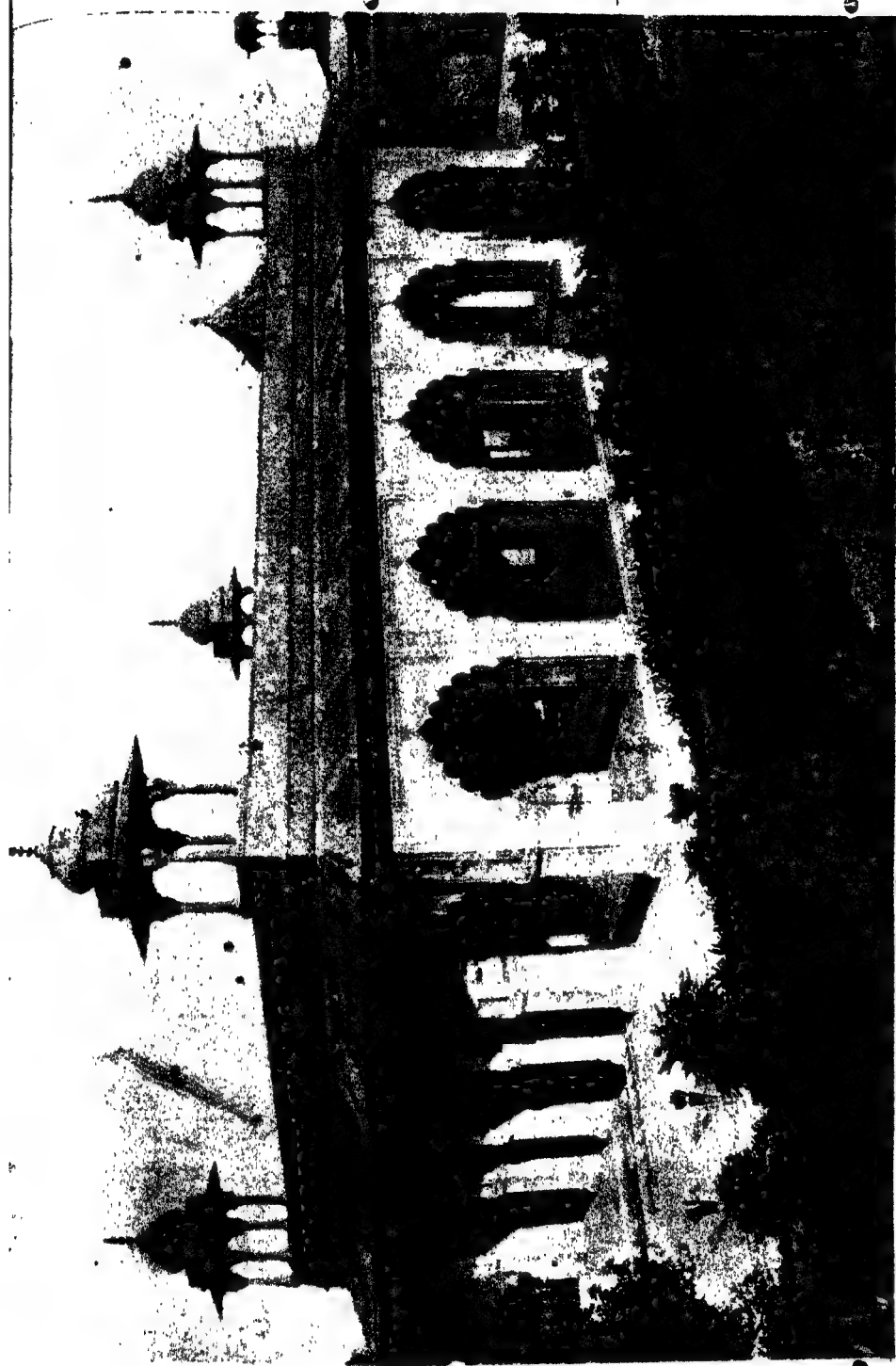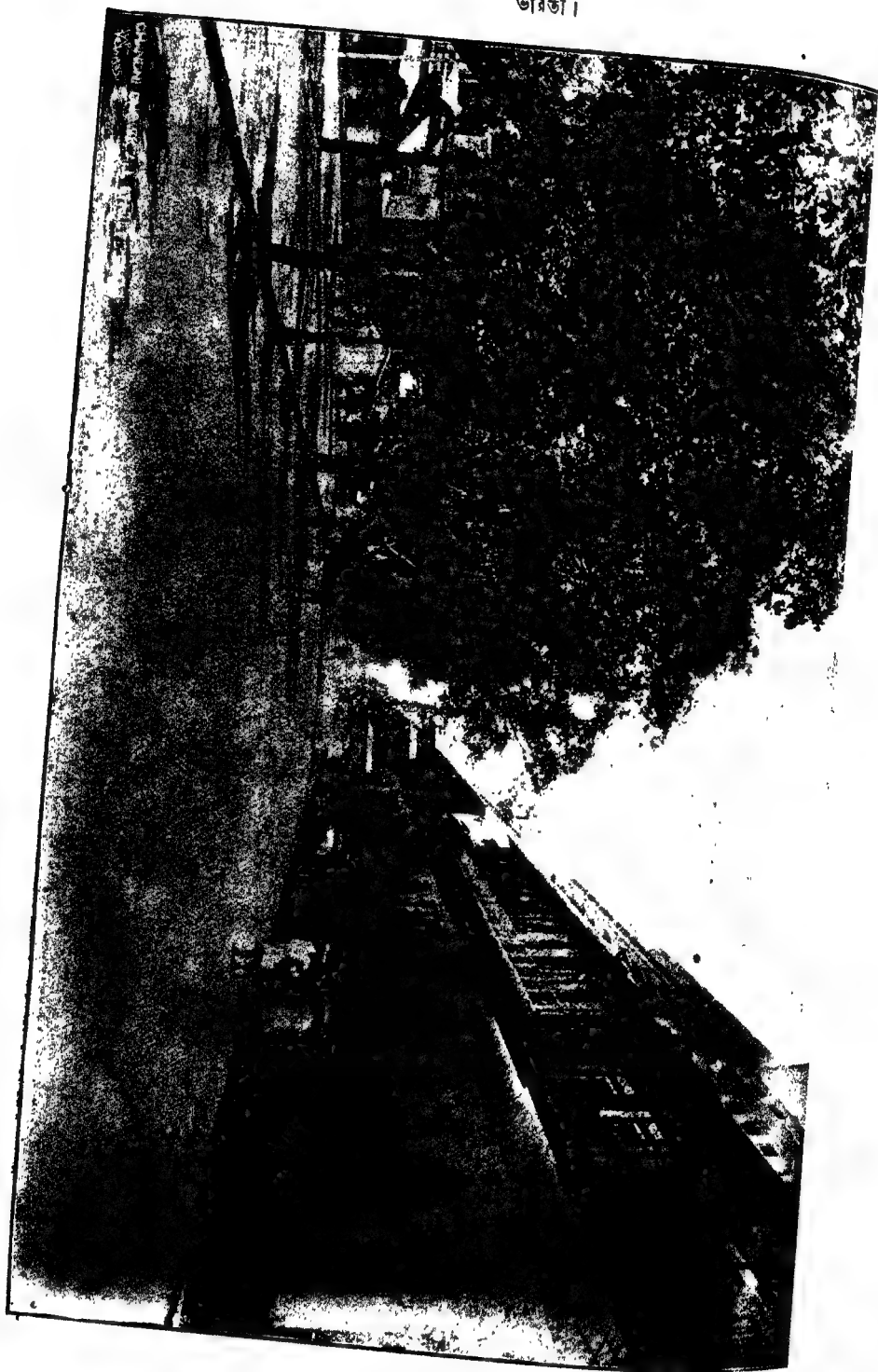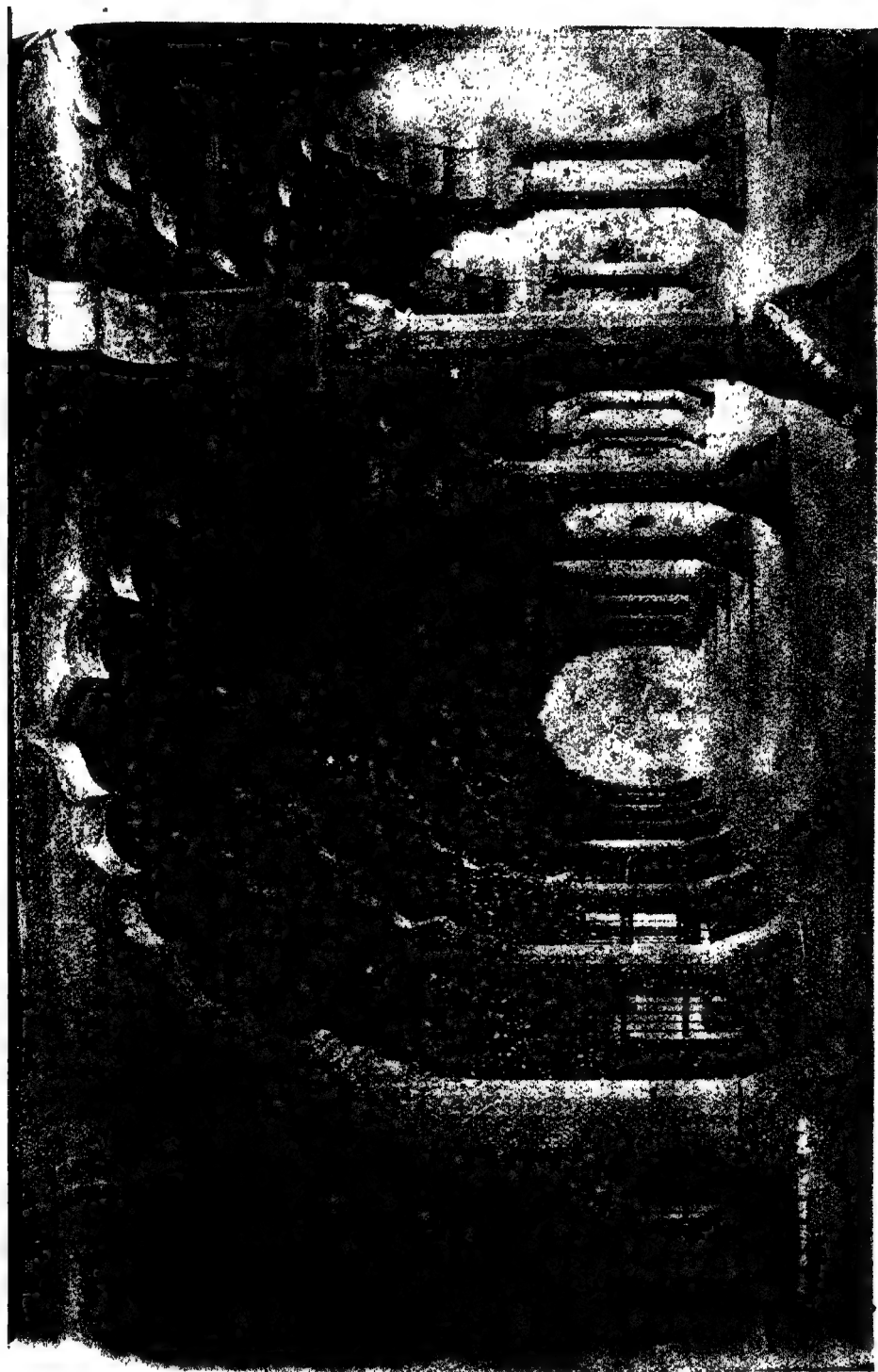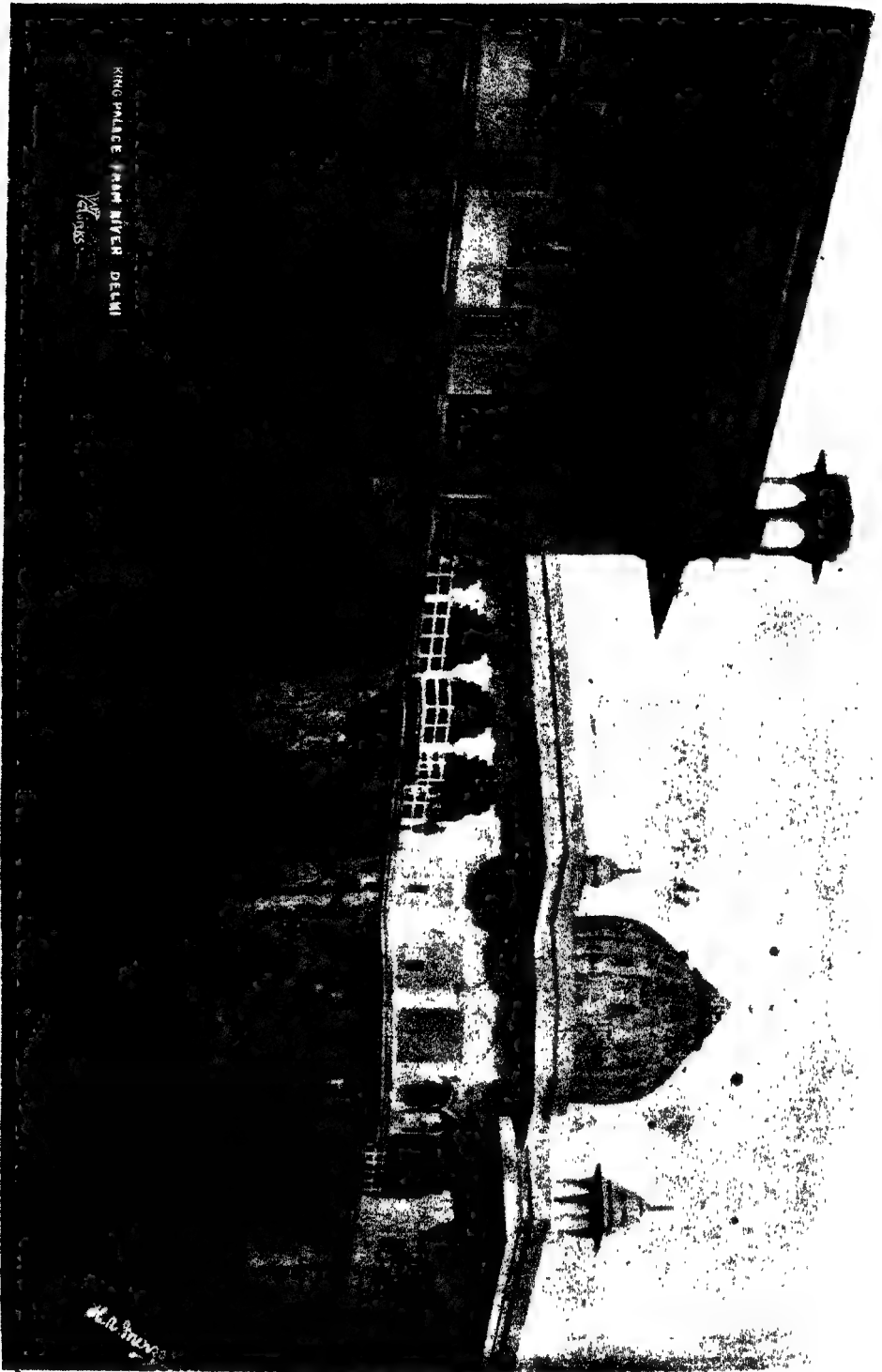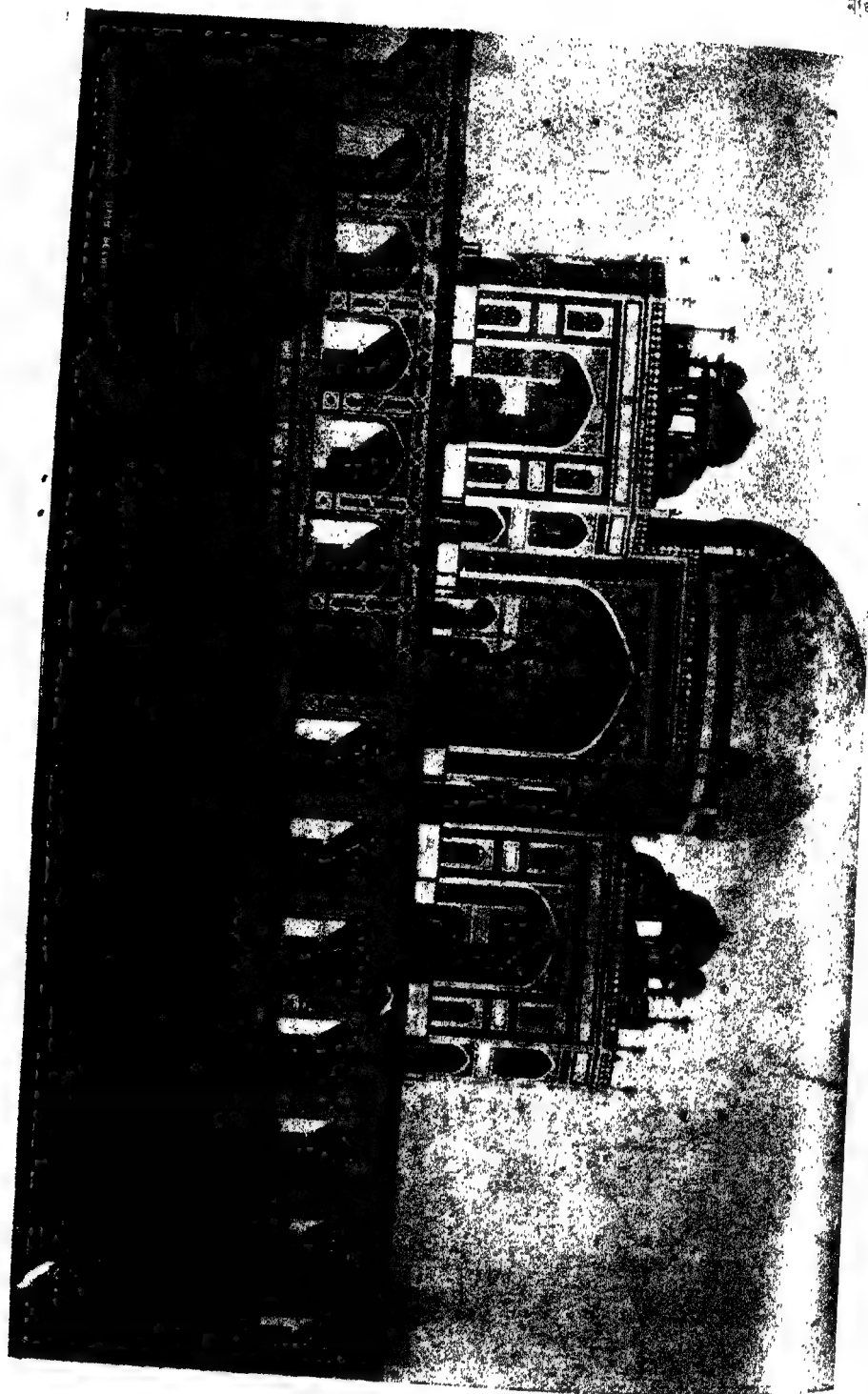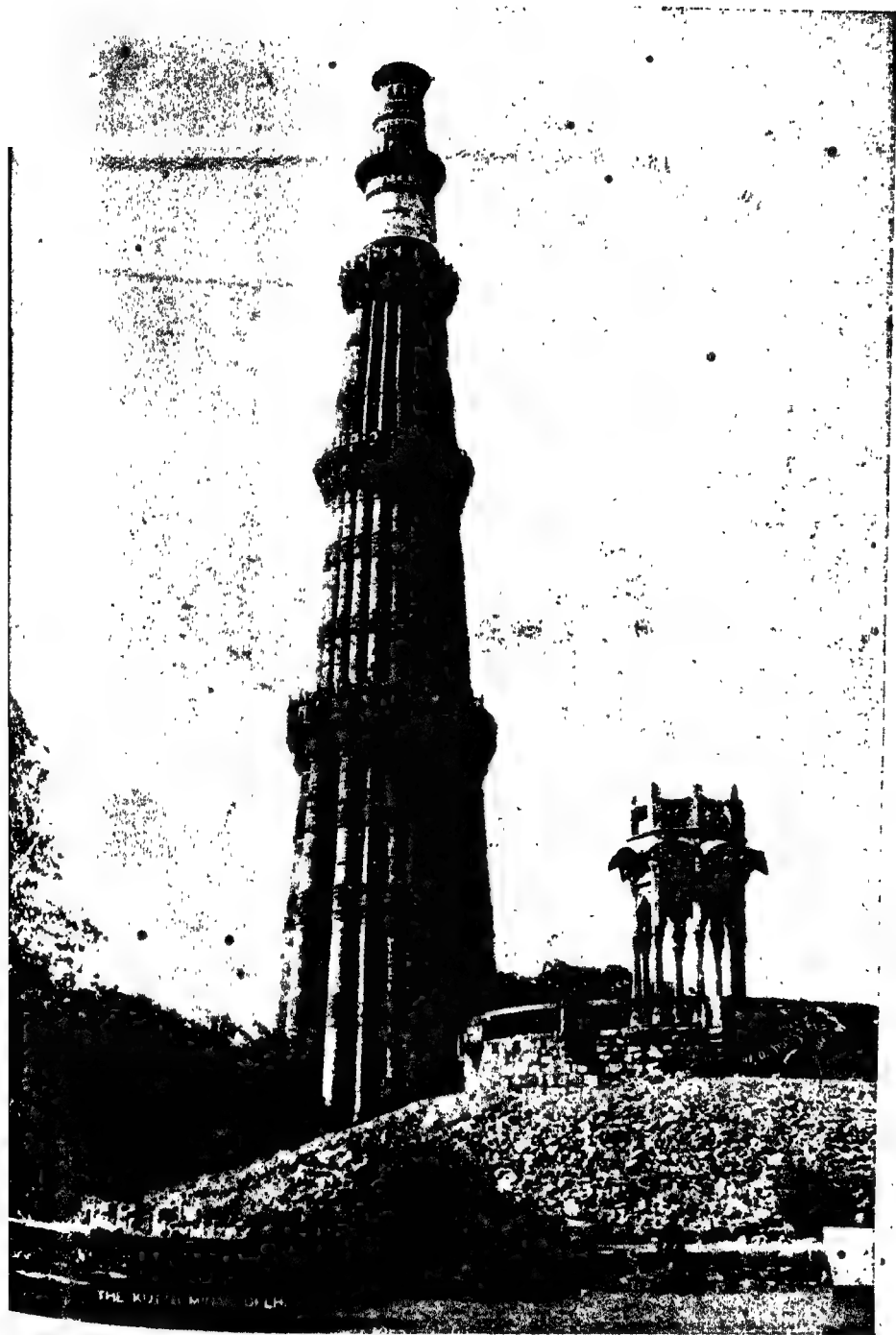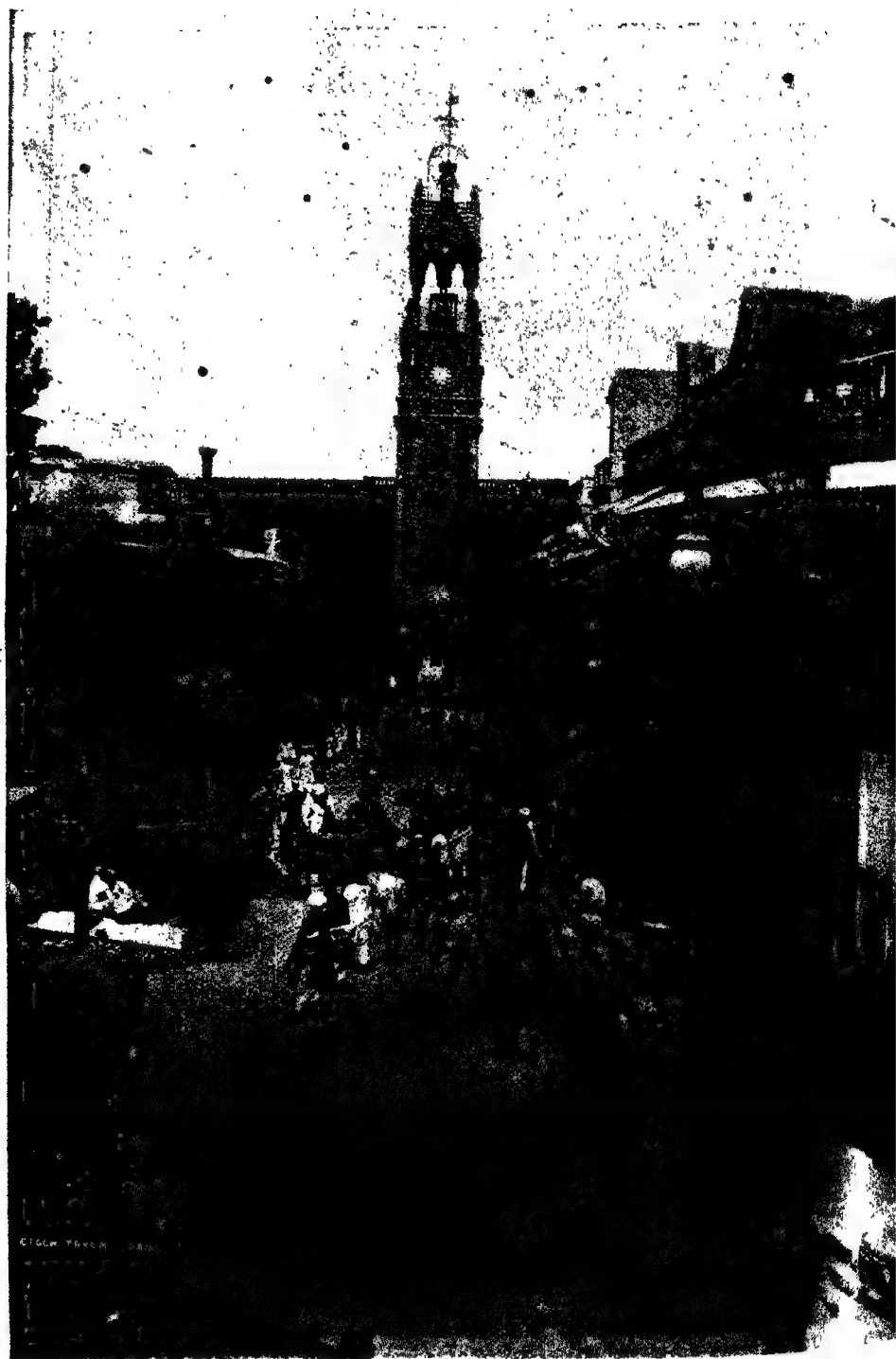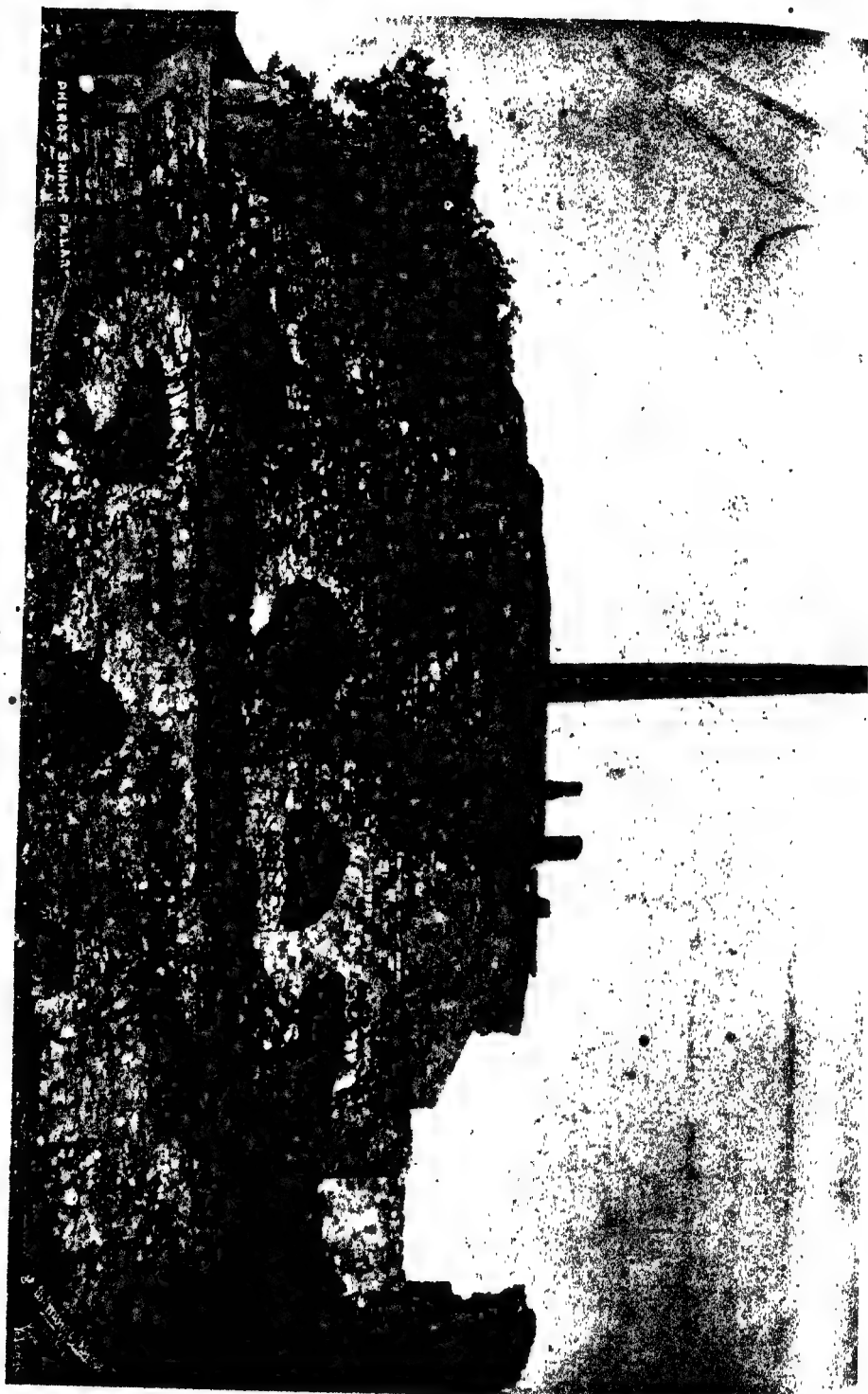
নির্ম্মিত। ইহা লাল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া লোকে ইহাকে লালকেল্লা বলে। ইহার পরিধি দেড়মাইল। পূর্ব্বে মোগল বাদশাহ এই স্থানে বাস করিতেন। এখন গোরা পল্টন থাকে। যে স্থানে বাদশাহ বসিয়া দরবার করিতেন, তাহাকে দেওয়ানী খাস কহে। ইহা এখনও পূর্ব্ববৎ আছে। উহার প্রাচীরগাত্রে নানাবর্ণের প্রস্তরের বৃক্ষ লতা ফল ফুল, পশুপক্ষী প্রভৃতির শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বাদশাহ যে স্থানে বসিয়া নিমাজ পড়িতেন উহাকে মতিমসজিদ বলে। উহা বহুমূল্য মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত। বাদশাহের স্নানাগার ও বেগমদিগের নিমাজ পড়িবার স্থান এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং যে স্থানে বসিয়া উঁহারা যমুনা দর্শন করিতেন তাহাও ঠিক আছে—দরবারের সময় এই দুর্গের যে স্থানে সাহিমজলিস হইত—সেই স্থানে সম্রাটকে লইয়া এবার একটি গার্ডেন পার্টি হইয়াছিল। এইখানে পঞ্জাবের ছোটলাট একটী প্রদর্শনী খুলিয়া ছিলেন, উহাতে মোগলদের সময়ের বস্ত্র, অলঙ্কার, পুস্তক ইত্যাদি দেখান হইয়াছিল।

জাহানারার কবর।——প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে সাহাজানের কন্যা জাহানারার কবর দেখিবার যোগ্য। ইহার আকার প্রায় হুমাউনের কবরের অনুরূপ। ইহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর একটী অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হয়। যখন পাষাণহৃদয় আওরেনজেব তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সাহাজানকে বন্দী রাখিয়া ছিলেন; তখন তাঁহার এই পিতৃবৎসলা কন্যা জাহানারাও আপনার দুর্দ্দশাপন্ন পিতাকে সেবা করিবার জন্ত কারাগারে ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সুশীলা ও দয়াবতী সাহাজাদি ছিলেন। জাহানারার আদেশানুযায়ী তাঁহার কবরের উপর এই কবিতাটী পারস্য অক্ষরে লেখা ছিল। যথাঃ—

বগৈর সব্জানঃ পোশব কসে মজারে মরা,
কি কবর্ পোশে গরীবা হাঁমি গয়হে বস্ অস্ত।

অর্থাৎ আমার সমাধির উপরে শ্যামল তৃণ ব্যতীত আর যেন কিছু না থাকে; কারণ গরীবের পক্ষে এই হরিৎবর্ণ তৃণই কবর শোভায় যথেষ্ট।

জাহানারার হৃদয় উদার ছিল। ইনি দীন দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন ও যথেষ্ট দানধ্যানাদি করিতেন।

চাঁদনীচক।—চাঁদনীচক দিল্লীর একটী প্রসিদ্ধ বাজার।

সুনহরি মসজিদ ও ঘণ্টাঘর — চাঁদনীচকের মধ্যে কোতোয়ালীর নিকট অবস্থিত। এই মসজিদের নিকট ঘণ্টাঘর লাল প্রস্তর নির্ম্মিত একটি সুন্দর মিনার— উহার উপর একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। উহার শব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই Municipal Office ও Town Hall এবং ইহার উত্তরে রেলওয়ে ষ্টেসন। নিকটেই প্রায় অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ যমুনার পুল। ভাদ্র মাসে যমুনার তীরে একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত দিল্লীতে আরো অনেক দ্রষ্টব্য প্রাসাদাদি আছে। তাহার কতকগুলি চিত্র প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দিল্লীর দরবার।

প্রতীক্ষা।

সম্রাটের দিল্লী পৌছতে এখনও কিছুদিন বাকি আছে। এই এডেন পর্য্যন্ত জাহাজ পৌছল, এই বম্বেতে এলেন, সেখানকার ধুমধাম আরম্ভ হল—এই সব শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দিল্লীতে শোভা ও আমোদের লহরী প্রতিদিনই ফেণায়িত হয়ে উঠছে।

রাজাদের শিবিরনিবাসের যে বাহার আহা মরি মরি! কর্জ্জনের দরবারকে অন্তত এই একটা বিষয়ে সম্রাটের দরবার টেক্কা দিয়েছে। সেবার ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজারা দিল্লীসহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাড়ী ভাড়া করে বাস কচ্ছিলেন। এবার সমস্ত ভারতবর্ষ এক জায়গায় পাশাপাশি একত্র হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিবির নিবাসে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের এলাকা নির্দ্দেশ করে বিরাজ করেছে। নিজাম, মাইশোর, বরদা, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, ধর, দেবাস, সিকিম, ভুটান, কোলাপুর উদয়পুর, ভাওয়ালপুর, রামপুর, ঝালাওয়ার, মেবার, জয়পুর, ভাটলপুর, গোন্দল, নবনগর, রাজপিপলা, কনৌলি, শাপুরা, কাম্বে, জম্বিরা, পাতিয়ালা, কর্পূরতালা, সোলন, জুব্বল, জুনুগা, কোটা, বুন্দি, কুচবেহার, ত্রিপুরা, নাহান, চম্বা, সুকেৎ মণ্ডি—এবং আরও অসংখ্য রাজার বস্ত্রনিবাস প্রাচীরে, তোরণে, ভূষণে, বাদ্যে, আলোকে ও লোকে সজ্জিত হয়ে দিল্লীবাসী নরনারীর নয়ন ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন একটা বস্ত্রনগরী ইন্দ্রজালে গড়ে উঠেছে—তাতে যেন সোনার গাছে রূপোর পাতায় হীরের ফুল ফুটে উঠছে। যা—অসম্ভব তা যেন এখানে সম্ভব হতে পারে। কলিকাতার এক রাত্রির দীপাবলী দেখতে লোকে যেমন যাত্রায় বাহির হয়েছিল দিল্লীতে সেই রকম পনের দিন ধরে রাজাদের ক্যাম্পের আলো দেখার জন্যে প্রতি সন্ধ্যে বেলায় সহর শুদ্ধ গাড়ীঘোড়া, জুড়ি, ল্যাণ্ডো, ফিটন, ছকর, পাল্কী মোটর ও পদাতিক ভেঙ্গে পড়ত। প্রসিদ্ধ পরদাপ্রিয় দিল্লী পরদা একেবারেই উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল। বড় বড় ঘরের, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সব রকমের মেয়েরা খোলা গাড়ীতে বা পায়ে হেঁটে রাজাদের ক্যাম্পের শোভা দেখতে বাহির হত। যে সব পরিবারের গৃহিণীরা ইতিপূর্ব্বেই পরদা ভাঙ্গাব বদনামে দোষান্বিত ছিলেন—তাঁদের বড় আনন্দ। তাঁরা বলতে লাগলেন—"এবার! এখন কেনা পরদা খুলে 'ক্যাম্পো কি সযের' করছেন।"

শুধু গাড়ীতে বসে আলো দেখে আসা নয়! যতদিন রাজা রাণীরা এসে না পৌছিয়েছিলেন—ততদিন ক্যাম্পে ক্যাম্পে নেবে প্রত্যেক ক্যাম্পের আভ্যন্তরিক সজ্জাও সকলে দেখে আসছিল। সুতরাং পরদা ঘেরাটোপ, আব্রু আবরণ দিনকতক দিল্লী ছেড়ে বহুদূরে গিয়ে বাসা নিতে বাধ্য হয়েছিল। সোশাল রিফর্ম্মারদের বিনা বক্তৃতায় দুর্গজয় হয়ে গিয়েছিল। তার প্রবাহ এখন পর্য্যন্ত বহমান। অনেকে স্ত্রীকে সেই সময় পরদা থেকে বাহিরে আনবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন আর সেটা হাতছাড়া করতে চান না। এখনও মধ্যে মধ্যে তার রেশ চালাচ্ছেন।

নানা শিবির নানা ভাবে সজ্জিত। কিন্তু কাশ্মীররাজের শিবিরের সঙ্গে আর কারও তুলনা হতে পারে না। তার বাইরের প্রাচীর ও তোরণ হচ্ছে কাশ্মীরের অত্যুত্তম কাঠের জালিকাজ, আর ভিতরের তাম্বুটার দুষ্প্রাপ্য শাল দোশালা ও জামিয়ারের কানাৎ আর গালিচার ফরাস! কাশ্মীর শিবিরের দুর্মূল্য প্রাচীর ও তোরণ সম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়েছে—তিনি নাকি সেটা দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উপহার গ্রহণ করেছেন।

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর আসবার কদিন আগে থাকতেই রিহার্সালের বিভ্রাট পড়ে গেল। হঠাৎ কোন কোন দিন শুনা যায় কাল অমুক বিষয়ের রিহার্সাল হবে, ভোর থেকে বেলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত অমুক অমুক রাস্তাঘাট সব বন্ধ থাকবে। যদি কোন বিভ্রান্ত পথিক অশ্বারোহী বা মোটরারোহী বিজ্ঞাপিত সময়ের মধ্যে কোন একটা নিষিদ্ধ রাস্তায় এসে পড়ে ত ভিড় ঠেলে পিছে পালাবারও পথ পায় না—সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা। ইংরেজ শান্ত্রী অতি ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দেয়—"Very sorry cant let you pass. We are in possession."

৫ই ডিসেম্বর ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডলের দিল্লী-শাখা থেকে দিল্লীতে সমাগত ভারতবর্ষের রাণীবেগম ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাদের একটি পার্টি দেওয়া হল। তার ভিতর পঞ্জাবের লাটসাহেবের মেম ও অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় মেমেরাও ছিলেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে সবাই বলতে লাগলেন—৫ই থেকেই তাহলে দরবার ফংশন্‌স্ আরম্ভ হল।

কোন কোন রাণী নিজেরা আগ্রহ প্রকাশ করে অনুরোধ করলেন "অমুক অমুককেও যেন নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁদের কখন দেখিনি, দেখবার বড় সাধ আছে।"

যে বেচারীরা পার্টির উদ্যোগ করেছিলেন তাঁদের কিন্তু সেদিন যে দুর্গতি। তার আগের রাত্রে খবর পাওয়া গেল সেদিন সম্রাটের দিল্লী প্রবেশের রিহার্সাল হবে, ভোর ছটা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে। তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। যদি ১২টা পর্য্যন্তই রাস্তা বন্ধ তবে তাঁরা পার্টির জায়গায় নিজেরা কখন উপস্থিত হবেন, কখন সাজাবেন, তিনটের মধ্যে সকলের অভ্যর্থনার জন্যে কি করে প্রস্তুত হবেন। যাহোক নিরুপায়। যে হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে পার্টি হবে সেখানকার শিক্ষয়িত্রীরা কাজ অনেকটা অগ্রসর করে রাখবেন এই আশা করা গেল। তার পরদিন ১২টার সময় উদ্যোগিনীরা স্কুল অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাস্তা খোলার তখনও কোন নামগন্ধ নেই। পল্টনে পল্টনে ঠাসা। ১২টা থেকে ৩টে পর্য্যন্ত ঠায় গাড়ীতে একই জায়গায় অপেক্ষা করতে হল। এদিকে যত মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাচ্ছে ঘড়ি খুলছেন আর দেখছেন, তাঁদের বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। "আজ কি লজ্জাই পেতে হবে।" গাড়ীভরা বৌ ঝি সবাই ডাকছে—হে রঘুনাথ হে কিষণজি হে পরমাত্মন্ আজ আমাদের লজ্জা রাখো—আজ আমাদের এ দায় থেকে উদ্ধার করো, আজকের পার্টি মানে মানে উৎরে দাও।

ঠিক তিনটের সময়—নিমন্ত্রিতদের আসবার

সময়—নিমন্ত্রণকারিণীরা স্কুলগৃহে গিয়ে পৌঁছলেন। ভোর পাঁচটার সময় কুলিদের কাঁধে যে সব ভাল ভাল কৌচ চৌকি পাঠান হয়েছিল—সে সবও তখনি পৌঁছল। যে উঠান সাজাবার কথা ছিল তা আর হলনা——অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসর জায়গাতেই তাড়া তাড়ি সব গোছান গাছান হল। "ফুলের মালা এসেছে ?—"না—লোক গেছে ফেরেনি, সেদিকের রাস্তা এখনও বন্ধ, বটনহোল এসে পৌঁছেছে।" "সোনালি পাতা মোড়ান পান ?" "এখনও না"—"তবে এই পাশের দোকান থেকে এখনই সাদা খিলিই আনিয়ে রাখ।" "গোলাব পাশ ? গোলাব ?" "গোলাব পাশ আছে, গোলাব এখনও আসেনি।"—এই রকম প্রশ্নোত্তর হতে হতে একটা কলরব উঠল—"দেবীজী কোথায়, শীঘ্র পাঠাও তাঁকে, একটা মোটর এসেছে, কেউ এসেছেন! লাটসাহেবের মেম্।" আসুন আসুন শীঘ্র অভ্যর্থনা করুন। ইংরেজের চিরন্তন প্রথামত ঠিক সময়টিতে পঞ্জাবের লাটমেমের গাড়ী দরজায় উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা ও একজন পঞ্জাবী রাণী। এর পর থেকেই মোটরের স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হতে লাগল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুবালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গের অসূর্য্যম্পশ্যা রাণী ও বেগমদের নয়নহারী সমাবেশ হল। সেদিন সহর শুদ্ধ রমণীরা এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাবার জন্যে লালায়িত হয়েছিলেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থানাভাব বশতঃ বেছে ভিন্ন বেছে বেছে আর অল্প দুচার ঘরের মেয়েদেরই এতে আহ্বান করা গিয়েছিল।

থেকে থেকে রাস্তাঘাট বন্ধের বিভ্রাটে সকলেই এমন কি ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের লাট-সাহেবের মেমেদেরও অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়েছিল। একদিন এক বেগমের বাড়ী আহূত পার্টিতে লেডি হিউয়েট এই কারণে উপস্থিত হতে না পেরে—এন্‌গেজমেণ্ট ভাঙ্গার লজ্জায় বিশেষ লজ্জান্বিতা হয়ে ছিলেন।

আগমন।

৭ই ডিসেম্বর সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী দিল্লীতে পদার্পণ করলেন। কলিকাতায় যেমন রাজ-দর্শনের জন্যে রাজপথের স্থানে স্থানে স্থাপিত ষ্টাণ্ডের টিকিট কিনে লোকের রাজাকে দর্শন করতে যান দিল্লীতেও সেই রকম হয়েছিল। তা ছাড়া দিল্লীতে আর এক সুবিধা ছিল। সেখানে সম্রাট সহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়াতে—পথের দুধারের অসংখ্য বাড়ীর বারান্দা ও ছাদের থেকে তাঁকে দেখার সুবিধা হয়েছিল। সেদিন রাজপথবর্ত্তী গৃহ-পতি ও গৃহপত্নীদের কাছে হাজার হাজার অনাহূত অতিথি অতিথিনী এসে উপস্থিত। অনেকেই সেদিন রাত তিনটে চারটের থেকে উঠে যাবার আয়োজন করেছেন। কেউ কেউ আগের রাত্রি থেকেই পুরীতরকারী মিষ্টান্ন তৈরি করে গাঁটরী বেঁধে বেঁধে ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। একজনেরা পাঁচটার সময় একজন গৃহস্থের বাড়ীর সামনে গাড়ী করে উপস্থিত। কিন্তু শীতের দিনে অত ভোরে গৃহস্থদের জাগাননি, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চুপ করে গাড়ীর ভিতর বসে ছিলেন। ফরসা হতে, গৃহস্থরা আপনি দরজা খুলতে

ওঁদের বাড়ীতে উঠে গিয়ে বারান্দার অনেকটা অংশ সব প্রথমেই দখল করে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে মাটিতে পেতে বসার জন্যে কম্বল, সতরঞ্চি এমন কি মোড়া চৌকি পর্য্যন্ত ছিল। তাছাড়া তিন চারজন চাকর সর্ব্বদা কাছাকাছি হাজির, যখনই যা দরকার হচ্ছে, পান লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন, ফল—সারাদিনের জীবন নির্ব্বাহের উপায় তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করছে। তাঁরা একশ টাকা দিয়ে একটা ষ্ট্যাণ্ডে টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে এখান থেকে ভাল দেখা যাবে শুনে সে টিকিট নষ্ট করে এখানে এসেছেন।

দিল্লীতে যাঁদের অতিথি ছিলেম তাঁরা অপেক্ষাকৃত কষ্টদর্শনীয় স্থানে নিজেরা গিয়ে আমাকে এইখানে পাঠিয়ে দেন—গৃহস্বামিনী তাঁদের আত্মীয়া। আমি নিরায়োজনে রিক্তহস্তে সেখানে উপস্থিত হতেই আমার অপরিচিত ও স্বল্পপরিচিত সকলেরই অতিথি হয়ে পড়লুম। যাঁরা সব প্রথমে এসে সব চেয়ে ভাল জায়গাটা দখল করেছিলেন—তাঁরা আমায় বহুদিন পরে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কেউ 'মাতাজি', কেউ 'বহিন্‌জি', কেউ 'বহুজি', কেউ 'ভাবিজি', বলে সম্বোধন করে তাঁদের সেরা জায়গাটার মধ্যে যেটুকু আরও সেরা সেটুকুতে আমাকে টেনে বসালেন—দুখানা চৌকির মধ্যে একখানা আমার ভাগ্যে পড়ল,—চৌকির উপর আবার দুচার প্রস্থ কম্বল পড়ল—নরম ও গরম স্পর্শের জন্যে। আমার পুত্রটি তাঁদের আলাপের ঘরে দুলাল হয়ে পড়লেন।

পথের ওপাশে একখানা বাড়ী আপাদ মস্তক লোকে ভরা। আমাদেরও বাড়ীখানা তাই ছিল—ছাদের উপরে পুরুষ, দোতলায় মেয়ে, একতলায় আবার পুরুষ। এ বাড়ীর লোকবিন্যাস আমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু সামনের বাড়ীর গ্রুপিং বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেখানকার মেয়েদের মধ্যে চেনা মুখও অনেক ছিল। তাঁরা নমস্কারে স্মিতহাস্যে আমায় অভিবাদন করতে লাগলেন। ওখানে দোতলায় শুধু মেয়ে বটে কিন্তু ছাদের উপর মেয়ে পুরুষ দুই ছিল। কারো সঙ্গে পানের ডিবে, কারো ডাবায় ভরা লাড্ডু, পুরী—থেকে থেকে ছেলেদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে।

আমি যখন পৌঁছই তখনও রাস্তা বন্ধ হয় নি। তার একটু পরেই প্রায় আটটার সময় দু দল শিখ পল্টনে আমাদের সাম্‌নের রাস্তার দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিলে। তাদের লাল পোষাক, হলদে পেটি, পাগড়ীর উপরে একটা করে মস্ত লোহার চক্র। প্রথমে দুএকটা বড় বড় কুপো ফুটপাথের এক পাশে ধরাধরি করে রেখে সেপাইরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেই রঙেরই কাপড় পরা দুজনমাত্র ইংরেজ অফিসার কতকটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে রইল—বাকি সব অফিসারই শিখ। কিছুক্ষণ পরে একটা নড়াচড়ার ভাব দেখা গেল। একটা কিছু হুকুমজারি হল। শব্দটা ধরতে পারা গেল না, ফলে দেখা গেল, সেপাইরা সব আপনার আপনার পিঠে ঝোলা ব্যাগের ভিতর থেকে এক একটা ডিবে বের করে তার থেকে তাদের প্রাতরাশ

বের করলে—শুক্‌নো রুটি আর কাঁচা পেঁয়াজ কারও বা একটু তরকারী। চটাপট চর্ব্বণ ও ভক্ষণের কাজ চলতে লাগল। তার পরেই সেই পূর্ব্ব রক্ষিত কুপোগুলা থেকে জল টিপে টিপে বের করে জল খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে ডিবের ভুক্তাবশেষ রাস্তায় ঝাড়া মেথরদের দান করে, ডিবে ধুয়ে ব্যাগের ভিতর পূরে, একখানা অশ্বতরের গাড়ীতে একটা সিপাইয়ের জিম্মায় সব ব্যাগগুলি পূরে দিয়ে, ফিটফাট হয়ে সিপাহীরা আবার যে যার স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা কর্ত্তে লাগল। আমার বোধ হয় মাইল ছয় সাত ধরে যতদূর পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে সেপাইয়ের শ্রেণী ছিল ততদূর একই সময় এই একই রকমের প্রক্রিয়া চলেছিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। গবর্ণর জেনেরলের গাড়ী সোয়ারী নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে, এক আধটা ছুটো ছাটা রাজাও এই দিক দিয়ে গেছেন, ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোরের অশ্বারোহী দল আসমানী পাগড়ী ও সাদা জরির পোষাকে দিগন্ত শোভান্বিত করে অদৃশ্য হয়েছে, এখনও সম্রাটাগমনের কোন খবর নাই। হঠাৎ তোপ পড়ল—গুড়ুম গুড়ুম—সেই যে আরম্ভ হল আর শেষ নেই, একশ একবার গুড়ুম। সম্রাট ষ্টেশনে এসে পৌঁচেছেন। সামনের সেপাইরা হুকুমের অনুবর্ত্তী হয়ে বন্দুক খাড়া করলে—শত শত বন্দুক এক সঙ্গে খাড়া হল। শত শত পেটি থেকে এক সঙ্গে ছুরা বেরোল, শত শত বন্দুকে এক সঙ্গে ছুরা ভরল, শত শত ছুরাভরা বন্দুক আকাশমুখী হয়ে এক সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠল, মেঘ গর্জ্জনের মত অনেকক্ষণ ধরে তার শব্দ প্রবাহ গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। তার পরেই জলুস অর্থাৎ Procession আরম্ভ হল। প্রথমে লাল, হলদে, কালো সবুজ নানা বেশধারী নানা পল্টনের ফৌজ সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হল। প্রত্যেক পল্টনের কি দেশী কি গোরা ড্রামার বাঘছালে শোভিত, প্রত্যেক পল্টনের ইংরেজ অফিসর সেপাইদের রঙে রঙ মেলান পোষাক পরা, শালের রুমালের পেটি বাঁধা, আর কাল জড়ির লুঙ্গির পাগড়ী পরা। সাদা মুখে কাল পাগড়ী বড়ই মানান সই হয়েছিল। ইংরেজদের নিজের পোষাকের চেয়ে যে কত বেশী ভাল দেখাচ্ছিল তা বলা যায় না। তার পরে ভাইসরয়ের বডি গার্ডস দেখা দিলে, তার পরে ভারতের রাজা ও রাজকুমারগণে গঠিত শ্বেতহস্তারোহী ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোরের মনোহারী দৃশ্যপট আবার উদ্‌ঘাটিত হল। এর পরে heraldsদের জমকালো সাজ ও বুক কোনান ভঙ্গিতে নাকের সমরেখায় ঠিক সম্মুখে দৃষ্টিপাতী চেহারা আবার দেখা গেল, তারপরে হেল্মেটের উপর পালকধারী কতিপয় অশ্বারোহী ইংরেজ অফিসার—তৎপশ্চাতেই সাম্রাজ্ঞীর গাড়ী—তার উপর রাজছত্র ধৃত হয়ে রয়েছে। ব্যাণ্ডে God save the King ধ্বনিত হয়ে উঠল, রাজপথে সিপাইয়ের হস্তধৃত নিশান মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ল, সাম্রাজ্ঞীর গাড়ী এগিয়ে গেল—সবাই খুঁজতে লাগল—সম্রাট কোথায়? সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করে সম্রাট এখনও এলেন না? আশা রৈল পিছনে এখনও আসছেন। কিন্তু লেডি হার্ডিং চলে গেলেন, সম্রাট-অতিথিরা সব

চলে গেলেন—নিজাম চলে গেলেন, গাইকোয়াড় গেলেন, মহীশূর গেলেন—কাশ্মীর রাজেন্দ্র সহস্র সহস্র উৎসুক দর্শকবৃন্দের চোখের সামনে গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে, এত কলরব এত জনতা, এত আগ্রহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, চোখ বুজে এক পাশে মাথা কাৎ হয়ে চলে গেলেন—অথচ সম্রাট এলেন না, সম্রাটকে কেউ দেখতে পেলে না। নীরবে নিঃশব্দে যেন একটা শোকার্ত্ত মৌন প্রোসেশন চলে গেল। বাদশা নেই, সম্রাট নেই—সাম্র জ্ঞী আছেন। এ কি হল? তার পরে রাজা রাজড়াদের সোয়ারীর স্রোত চল্‌ল। সোনা রূপার গাড়ী, অনুযাত্রিকদের নানা রকমের পোষাক, ঘোড়ার নানা রকম আভরণ, নানা সুরের বাদ্য। সিকিমরাজের অনুচরদের একরকম পোষাক, ভুটানের আর একটু রকমারী ধরণের, বম্মিজরাজের অতি অদ্ভুত, এক মধ্যদেশরাজার আরও কিম্ভূত। এর মধ্যে ভূপালের বেগম এলেন। খোলা গাড়ী, মুখে পরদা, দুধারে ঝুঁকে ঝুঁকে প্রত্যভিবাদনে রত, বাম পাশে রেসিডেন্ট সাহেব সমাসীন, সম্মুখে পৌত্র। দর্শক মেয়ে মহলে একটা মস্ত আনচান পড়ে গেল। "ছি—ছি—এদিকে পরদা, এদিকে পরপুরুষ পাশে বসে।" একজন বেগমের পক্ষ নিয়ে বল্লেন "তা কি করবেন—গবর্ণমেণ্টের হুকুম—রেসিডেন্টকে পাশে বসাতেই হবে।" সে সাফাই কারো মনে ধর্‌ল না। সবাই তারস্বরে বলাবলি করতে লাগলেন "হ্যাঃ গবর্ণমেণ্ট যদি হুকুম দিতেন যে মুখের পরদা খুলে তোমার যেতে হবে, তা কি উনি মানতেন? তবে পর্দানসীন বেগম হয়ে পরপুরুষকে পাশে বসিয়ে যেতে কেমন করে রাজী হলেন? তিনি যদি বলতেন এতে পর্দানসীন স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমের হানি হবে—তবে গবর্ণমেণ্ট কখনই জোর করে রেসিডেণ্টকে পাশে বসাতেন না।" নানা রকম টীকা টীপ্পনী চলতে লাগল। উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বেগমসাহেবের সমানধর্ম্মিণী মুসলমান রমণীও অনেক ছিল।

যখন প্রোসেশনের শেষ কণাটুকুও মিলিয়ে গেল—গৃহাভিমুখী দর্শকের ভিড় ঠেলে যে যার আপনাপন ঘরে ফিরে এল তখনও পরস্পরের মধ্যে সেই প্রশ্ন চলতে লাগল—"সম্রাটকে দেখেছ? সম্রাটকে চিনতে পেরেছিলে?" কেউই দেখেনি, কেউই চেনেনি। সহরে একটা জনরব উঠল যে সম্রাট প্রোসেশনে যাননি—তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ বল্লে—না তিনি ঘোড়ার উপর ছিলেন কিন্তু কোন্ ঘোড়াটা তা কেউ চিন্তে পারে নি। কেউ বল্লে তিনি আজ দাড়ি কামিয়ে এসেছেন যেন কেউ চিনতে না পারে—দুষ্টলোকে দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণ করতে না পারে। ফল কথা সকলেই বড় নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হয়ে রৈল—রাজদর্শন হল না—যাঁর জন্যে রাত থাকতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় সকলে এত কষ্ট স্বীকার করলে, যাঁর জন্যে এত উদ্যোগ এত হাঙ্গাম তাঁকেই কেউ দেখতে পেলে না—তিনিই নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন।

প্রজারা সেদিন রাজদর্শন পেলে না কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাজাগণ, তাঁদের বড় বড় অনুচরেরাও ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের লাটেরা সম্রাটের দিল্লী পদার্পণের ক্ষণবিলম্বেই একটা পাহাড়ের উপর

সমবেত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। প্রোসেশনের পর সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী সেইখানে গিয়ে অভ্যর্থনা গ্রহণ করে পশ্চাৎ স্বীয় শিবির আবাসে যান। পরদিন সম্রাট এডওয়ার্ড মেমোরিয়ালের প্রস্তর স্থাপনের জন্যে সহরের এক অংশ দিয়ে যাত্রা করবেন বলে রাস্তার দুধারে আবার জন সমারোহ হ'ল। প্রতিদিনই এই রকম চলতে লাগল। সেই প্রথম দিন ছাড়া বাকী সব দিনই সম্রাট সাম্রাজ্ঞীর পাশে গাড়ীতে বসে গিয়েছিলেন—তাঁর উপর রাজছত্র ছিল, সুতরাং তাঁকে অভিজ্ঞানের আর অসুবিধা হয়নি।

দরবার।

দরবারের দিন এল। দরবারের ampitheatre কলিকাতার ampitheatre এর ধরণে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুদৃশ্য আর অনেক প্রকাণ্ড। চোদ্দ হাজার স্ত্রী পুরুষ এতে বসেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্লকে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের লোকেদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে থাকলে কেউ কারো দর্শন পাননি। Ampitheatre এর সামনে ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের মত একটা গোলাকার উচ্চ গৃহ। তার সব উপরের থাকে দুখানি সিংহাসন পাতা রয়েছে। নীচে ও আশেপাশে চৌকি রয়েছে। হাত কতক দূরে আর একটা গোলঘর, সেটা আর এক দল দর্শকমুখী। তার উপর শুধু দুটি সিংহাসন। Ampitheatre এর সামনাসামনি বহু যোজন পর্য্যন্ত অর্দ্ধগোলাকারে Mound—অর্থাৎ উচ্চাকার স্থান—সেখানে সহস্র সহস্র সাধারণ লোকে বসবার স্থান পেয়েছে। সেই লোকময় অর্দ্ধচন্দ্রের প্রসারটিকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন একটা প্রকাণ্ড উদ্যানে নানাজাতীয় ফুল ফুটে রয়েছে। দূরের থেকে মানুষের মুখ দেখাই হচ্ছে না—শুধু এক জায়গায় খানিকটা হলদে দেখা যাচ্ছে,—একটা জায়গায় সবই নীল—এক জায়গায় সবই লাল, আর মধ্যে মধ্যে শাদা কালো সবুজ গোলাপী ও যতগুল রঙের যত রকম মিশ্রণ সম্ভব তাই। একটা প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া ঢালু বাগানে যেন নানা রঙের দোপাটি ফুটে রয়েছে মনে হচ্ছে। এমন রঙের খেলা কখনো দেখিনি।

God save the King বেজে উঠ্‌ল, হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। Viceroy ও তাঁর পত্নীর গাড়ী সামনের মণ্ডপে এসে দাঁড়াল। তাঁরা দুজনে সিংহাসনের নীচের তলার বিস্তৃত দুখানি চৌকিতে বসলেন। একটি ছোট্ট রাজকুমার লেডি হার্ডিংয়ের page হবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাকে অগ্রসর করে আনতে তিনি তাঁকে আদর করে যত্ন করে কাছে বসালেন। আবার God save the King বাজল, আবার লোকেরা উঠে দাঁড়ালে। এবার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এলেন। অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় রাজকুমার তাঁদের page হয়ে তাঁদের বিলম্বিত বহুমূল্য পরিচ্ছদের প্রান্ত ধরে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগল। তাঁরা সিংহাসনে আসীন হলে, রাজকুমারেরা সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে পড়ল। একটা নাট্যশালায় যেন যবনিকা উদ্ঘাটিত হল; এবার সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর মাথায় মুকুট পরা। খেলার তাসে, গল্পের বইয়ে, ইংরিজি রূপকথার ছবিতে

সম্রাট পঞ্চম ও সম্রাজ্ঞী মেরী

যেমন রাজা রাণী দেখা যায় ঠিক তেমনি। এ কি সত্যি ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী এত দূর থেকে এত সমুদ্র নদী পাহাড় ও মরুভূমি অতিক্রম করে আজ ভারতবর্ষে দিল্লীতে এসেছেন দরবার করার জন্য! উইণ্ডসর কাসেলে, পার্লামেণ্টে, য়ুরোপের বড় বড় নগরীতে যাঁদের গতিবিধি ক্রিয়াকলাপের কাহিনী কাগজে পড়া যায়, তাঁরা আজ সত্যিই ভারতীয় প্রজার চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত? ঐ যে কিছু দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যাচ্ছে, যেখানে মহারাজা যুধিষ্ঠির এক দিন রাজচক্রবর্ত্তী রাজা হয়েছিলেন, রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। পৃথ্বীরাজও একদিন যেখানে রাজত্ব করে গেছেন। তারপরে মোগল বাদশাহদের স্মরণ চিহ্নাবলী তার পাশেই বর্ত্তমান। আজ ব্রিটন বাদসাহের রাজসূয় যজ্ঞ সেই ইন্দ্রপ্রস্থ সেই দিল্লীর বুকের উপর। সেকালের ছবি ও আজকের ছবিতে কত তফাৎ। সেকালে শুধু সেকালই ছিল। আজ সেকাল ও একালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে নূতন রঙের খেলা বেরিয়েছে। এই যে এত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এখানে উপস্থিত রয়েছে যুধিষ্ঠির বা পৃথ্বীরাজ বা আকবরের দরবারে তাদের অস্তিত্ব কল্পনারও অগোচর ছিল। আর এই যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় লোককে নিয়ে ব্রিটিশরাজের দরবার আর কোন King George এর কালে তা স্বপ্নেরও অগোচর হত। আজ এত ইংরেজকে এত ভারতীয় লোকের সঙ্গে একত্রে দরবারে বসতে দেখে বারবার এই উপলব্ধি হতে লাগল—এ রাজা আমাদেরও বটে, তোমাদের একলার নয়,—তা যদি হত তোমাদের রাজা তোমাদে[র] দেশেই থাকতেন, রাজদর্শন কর্ত্তে হত [ত] তোমরাই সেখানে যেতে। রাজা আমাদে[র] ভারতবর্ষীয়দের; তাই রাজা স্বয়ং প্রজা[র] দেশে এসে প্রজাকে রাজদর্শন দিতে এসেছেন, প্রজার ভক্তি নিতে এসেছেন; তোমরা আমাদের fellow subjects মাত্র তার বেশী আর কিছুর ভড়ং আর মানছিনে। এবার আসল দেখেছি, নকলে আর ঠকছিনে।

সম্রাটের কাছে গিয়ে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজারা একে একে অভিবাদন করে এলেন। নানা রাজা নানা ঢঙে করলেন। যিনি যত মাটির সঙ্গে নত হয়ে পড়লেন ইংরেজ দর্শকেরা তাঁকে তত হাততালি দিতে লাগল—যেন সম্রাট-ভক্তি আর আত্ম-অবনতির মাপ কাঠিটা একই। ইংরেজ লাটেরা যে ভঙ্গিতে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে ছিলেন আমার বোধ হয় তার চেয়ে সুন্দর ভঙ্গি আর কিছু হতে পারে না। সকলেরই সেইটের অনুকরণ করা উচিত। Military salute এর ভিতর আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে যে রাজভক্তি বিকশিত হয় তাতেই পৌরুষ ও নম্রতার শ্রেষ্ঠ সম্মিলন।

দরবারের পূর্ব্ব থেকে ভারতবর্ষীয় শত শত রাজার শিবিরনিবাসে পর্য্যটন করতে করতে আর রাজারাণী নবাব বেগমদের সঙ্গে দেখাশুনা কথাবার্ত্তা হতে হতে মনে হয়েছিল আর আজ দরবারেও অনুভব করলুম—ভারতবর্ষ একটি সুবৃহৎ গুলিস্তান বা কুসুমকানন—তাতে শত শত ফুল ফুটে রয়েছে। এমন বিরাট ফুলবাগানের পর[্য]-

[illegible]রির জন্যে একজন সর্দার মালির নিতান্তই প্রয়োজন। যে দেশে ছোট বড় এত রাজা, যে দেশে ধর্ম্মের ঐক্য নেই, বর্ণের ঐক্য নেই, জাতির ঐক্য নেই, যেখানে দণ্ডের ভয় না থাকলেই রাজায় রাজায় কাড়াকাড়ি মারামারি অবশ্যম্ভাবী—সেখানে একজন পরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী রাজার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দিগ্ধ। আর চক্রবর্ত্তী রাজা যদি থাকতেই হয় তবে ইংলণ্ডের মত এমন constitutional রাজ্যের রাজাকে আমাদের মাথার উপর সম্রাট করে রাখবার সৌভাগ্য কৃতজ্ঞমনে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের ধর্ম্ম। রাজাদের অভিবাদন শেষ হলে সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন। হাতের কাগজ থেকে পড়তে লাগলেন, সব কথা শুনা গেল না, কোন কোন শব্দ কাণে পৌঁছল মাত্র। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মর্ম্ম একখানা ছাপান কাগজে তখনই দেখলাম। বঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়েছে আর রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে! বুকের ভিতর রক্ত চনচনিয়ে উঠল। এক মিনিট পার্শ্ববর্ত্তী লোকেদের সঙ্গে কথা কইবার শক্তি রইল না। মনে হল এক হাতে কে স্বর্গ দিলে, আর এক হাতে ঠাস্ করে সভার মাঝে চাপড় মেরে চলে গেল। সুখী হব কি দুঃখী? ত্রিশ সেকেণ্ড মন টলমল করে স্থির হল। বুক বেঁধে নিলুম, মুখে আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেখাব না। পার্শ্ববর্ত্তী পশ্চাৎবর্ত্তী ও সম্মুখবর্ত্তী ইংরেজ সাহেব মেম ও ভারতবর্ষের বঙ্গেতর প্রদেশীয় স্ত্রী পুরুষদের বল্লুম "জয় বঙ্গের জয়। সম্রাটের জয়! ভারতের জয়! লোকবাণী যে ঈশ্বরের বাণী প্রজার আবেগ যে ঈশ্বরাদেশ এ কথা সম্রাট আজ মানলেন (People's voice is Gods voice), এর চেয়ে বড় কথা এ দেশের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। এত বড় Magna charta কোন পরাধীন জাত পায়নি। আজ জানলুম আমরা পরাধীন নই, আমরা স্বাধীন—আমাদের স্বরাজ, সেই স্বরাজের সম্রাট ইনি কিং জর্জ।"

"আর রাজধানী হরণ? তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না?" "কিছু হবে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মামলা। তার সঙ্গে বঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে কোন যোগ নেই। আমরা যে বিষয়ে আপত্তি করেছিলুম, আন্দোলন করেছিলুম সম্রাটের দরবারে সে মকদ্দমায় আমাদের জিৎ হয়েছে। —bureaucracyর উপর peoples victory—এইটেই একমাত্র আমাদের দেখবার জিনিষ আর দিল্লী হোকনা রাজধানী, বাস্তবিকই দিল্লীর তাতে চিরন্তন অধিকার আছে। দিল্লী রাজধানী হলে তাতে আশপাশের বাসিন্দাদের যদি উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তারা যদি বাঙ্গালীদের সমান সব বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠে তাতে বাঙ্গালীরা সুখী হবে। রাজধানী সরে গেল বলে বাঙ্গালীর পতন হবেনা, তারা যেখানে উঠে বসেছে সেখান থেকে হুড়কে পড়বেনা—আরও উচ্চে আরও উচ্চে উঠতে থাকবে।"

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী সেখান থেকে নেমে দ্বিতীয় গৃহটাতে উঠলেন। এবার আমাদের দিকে পিঠ করে Moundএর দিকে লক্ষ লক্ষ প্রজার সম্মুখীন হয়ে সিংহাসনে বসলেন। রাজা মৌন রৈলেন, ভেরী নিনাদে রাজার আজ্ঞা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হতে লাগল। ইত্যবসরে সাহেব মেমেরা, কেউ কাগজের বাক্স থেকে কেউ থলির থেকে, কেউ পকেট

থেকে স্যাণ্ডউইচ, বিস্কুট, চকোলেট, কেক প্রভৃতি বার করে খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সম্রাট প্রস্থানোদ্যত হলেন। রাজকুমারেরা আবার তাঁদের বস্ত্রপ্রান্ত ধরলে, ধীরে ধীরে মরাল গমনে সম্রাট সাম্রাজ্ঞী—গাড়ীর উপর গিয়ে উঠলেন। হাততালি ও হিপ্ হিপ্ হুরেের গর্‌রা চল্‌তে লাগল। আবার God Save the King বাজল।

এই God Save the King আজ কত বৎসর ধরে ভারতবর্ষীয় প্রজারা শুনে আসছে, শিখে আসছে, গেয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন এটা একটা রূপকমাত্র ছিল, একটা প্রাণহীন দস্তুর, সব সাধারণ অনুষ্ঠানের শেষে অবশ্য-পালনীয় একটা শুষ্ক প্রথামাত্র। কিন্তু আজ সেটা কত সরস হয়ে উঠেছে, কত সজীব, কত প্রাণময়। আজ তার বাক্যে বাক্যে পদে পদে যথার্থ সার্থকতা আছে। ব্যাণ্ডে বাজল—

God save our gracious King

আমাদের মনে প্রতিধ্বনি হল—

হে ঈশ্বর, হে ভারতের ভাগ্যবিধাতা, এ হৃদয়বান প্রজারঞ্জক রাজাকে রক্ষা কর!

Long live our noble King

এই মহদাশয় রাজাকে দীর্ঘায়ু কর

Send him Victorious, happy and glorious

Long to reign over us

একে জয়শালী, গৌরবশালী ও সুখী করে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এস— এমন রাজা শতায়ু হয়ে আমাদের উপর রাজত্ব করুন।

God Save the King.

আহা যিনি আমাদের ক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ লাগাতে এত দূরের থেকে এসেছেন, তিনি যেন অক্ষত হয়ে ফিরে যান, যেন কোন দুরভিসন্ধির গুপ্ত সন্ধান তাঁর পিছনে পিছনে ফিরে না বেড়ায়।

God Save the King

ভগবান এঁকে রক্ষা করুন।

ব্যাণ্ডের প্রার্থনা শুনতে শুনতে আজ প্রথম আমার চোখের কোণে একফোঁটা জল এল। সম্রাটের গাড়ী দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় শেষ হয়ে গেল। একখানি দৃশ্যপট এখনও উঠতে বাকী ছিল। লর্ড হার্ডিং ও লেডি হার্ডিংয়ের গাড়ী এল। তাঁরা উভয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাসিমুখে দুধারে নমস্কার করতে করতে অদৃশ্য হলেন। রাজ-প্রতিনিধি স্বরূপ লর্ড হার্ডিংএর জন্যও—God Save the King বাজতে লাগল। সে বাজনা মনে করিয়া দিলে সত্যি ত, প্রজার এমন চিত্ত বিনোদন করলে কে? এই রাজপ্রতিনিধিই ত তা করেছেন। এই রাজ প্রতিনিধির ভারত রাজক্ষেত্র বিচরণের পথ প্রতি পদক্ষেপে প্রজার সঙ্গে সহানুভূতিতে মণ্ডিত। তাঁরই পরামর্শে তাঁরই উদ্যোগে, তাঁরই চেষ্টায় আজ প্রজার কণ্ঠ বিধাতার কণ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন, ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন হে বিধাতা এমন রাজ-প্রতিনিধি জন্ম জন্ম আমাদের উপর রাজত্ব করুন।

ভরত বাক্য—

"এখন আমার যদি আর কিছু প্রার্থনা থাকে তবে সে এই :

ভী হোক দুগ্ধবতী, শস্তপূর্ণা বসুমতী
মেঘ কালে করুক বর্ষণ।
সকল জনের চিত কবিয়া গো হরষিত
বহে যেন মধুর পবন।

বৈধ অনুষ্ঠানে রত, বিপ্র হোন অবিরত
দীর্ঘজীবন্ত হোন সাধুগণ।
রিপু ক'রে প্রশমন, নৃপ ধর্মপরায়ণ
পৃথিবীরে করুন পালন!—

শ্রীসরলা দেবী।

হিজলী কাঁথির একটী প্রাচীন কাহিনী।

নিম্নবঙ্গের প্রান্তবর্ত্তিনী হিজলী প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যিনি অবলোকন করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। একদিকে ধবল শিখরমালা শোভিত বহুযোজন পথব্যাপী বন্ধুর বালুকা স্তূপশ্রেণী, অন্যদিকে 'ধারা নিবদ্ধের কলঙ্করেখা লবণাম্বুবেলার' সুন্দর দৃশ্যই ইহাকে এত মনোরম করিয়াছে। বঙ্গের অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 'কপালকুণ্ডলা'র পাঠক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। এই হিজলীতেই আমরা—তাঁহার কাব্যের চরমসৃষ্টি —নিছক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সৌন্দর্য্য সুষমা-মণ্ডিতা, প্রকৃতিপালিতা, সরলতাময়ী বালিকা মৃন্ময়ীর প্রথম সাক্ষা পাই; আবার —এই হিজলীই তাঁহার সেই নর-রাক্ষস কাপালিকের লীলাভূমি। কোমল ও কঠোরের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র।

কপালকুণ্ডলার পাঠকগণের মনে কাপালিকের স্মৃতি এরূপভাবে জড়িত যে হিজলীর নাম শুনিলেই কাপালিকের কথা মনে পড়ে। মনে হয়—যেন এখনও 'ঐ অরণ্যগর্ভে বুভুক্ষু অজগর সর্পের ন্যায় সেই কাপালিক মুখ ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে, পথভ্রষ্ট অসহায় পথিক পাইলেই গ্রাস করিয়া বসিবে।'

এক সময় এই হিজলীর সহিত 'মসন্দরী সা' বা তাজ খাঁ—মসনদ্ আলি নামক একজন মুসলমান সিদ্ধ পুরুষের নাম সমস্ত নিম্নবঙ্গে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ত্তমান এ প্রদেশের লোক ব্যতীত অন্যের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক সময় তাঁহার নামে কি হিন্দু, কি মুসলমান, নিম্নবঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মস্তক ভক্তিতে অবনত হইত। এখনও এ প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে সমভাবে পূজা করিয়া থাকেন। মসন্দরী সার নাম এ প্রদেশের ধনী দরিদ্র সকলের নিকটেই সুপরিচিত। হিজলীর কাপালিকের অস্তিত্ব কবি-কল্পনা-প্রসূত;—মসন্দরী সা ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

পৃথিবীতে কাহারও চিরদিন সমান যায় নাই। হিজলীরও এক সময় গৌরবের দিন আসিয়াছিল। যে নবাববংশ হিজলীর সিংহাসনে বসিয়া এ প্রদেশের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, যে বংশীয় নবাব ঈশা খাঁ মসন্দরী বঙ্গগৌরব মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এই তাজ খাঁ মসন্দরীও সেই বংশীয়। তাজ খাঁ মসন্দরী ১৫৪৫ খৃঃ অব্দ

হইতে ১৫৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ প্রদেশের রাজা ছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অটল ধর্ম্ম বিশ্বাস, মহাপ্রাণতা ও ত্যাগস্বীকারের বৃত্তান্ত দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। তিনি নিজে রাজ কার্য্যাদি কিছুই দেখিতেন না—সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার ভ্রাতা সিকান্দর আলিই রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেন। সিকান্দর একজন রাজকার্য্যনিপুণ বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বীরত্বের অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশে তিনি "সিকান্দর পাল্‌ওয়ান," নামেই পরিচিত। কথিত আছে যে তিনি এক সময়—তৎকালীন সুবাদার বাহিনীকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়াছিলেন।

১৫৫৪ খৃঃ অব্দে সিকান্দর পরলোক গমন করেন। যতদিন সিকান্দর জীবিত ছিলেন ততদিন তাজর্খা মসন্দরীকে রাজকার্য্যাদি কিছুই দেখিতে হইত না—কিন্তু সিকান্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার হস্তেই সমস্ত কার্য্যের ভার পড়ে। এইরূপ কিম্বদন্তী যে তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে অনুভব করিয়া তিনি পর বৎসর ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে স্বেচ্ছায় জীবিতাবস্থায় 'কবরস্থ' হয়েন। তাজ খাঁর লোকান্তর হইলে তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন যাবৎ এ প্রদেশের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। পরে এই বংশের—শেষ নবাব ঈশা খাঁর রাজত্বকালে মহারাজা প্রতাপাদিত্য হিজলী আক্রমণ করিলে জলে ও স্থলে অষ্টাদশ দিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁর কৃষ্ণ পাণ্ডা ও ঈশ্বর পট্টনায়েক নামক দুইজন হিন্দু কর্ম্মচারীর হস্তে হিজলীর রাজস্ব আদায় ও বিচার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইলে ঐ দুইজন কর্ম্মচারী তৎকালীন দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া হিজলীর শাসনে যথাক্রমে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

হিজলীর এখন আর সেকালের শ্রী-সৌভাগ্য কিছুই নাই। চারিদিক বন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নবাব বংশের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের অধিকাংশই বঙ্গোপসাগর ও রসুলপুর নদী গ্রাস করিয়াছেন। এখন কেবল কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ ও তাজ খাঁ মসন্দরীর মস্‌জিদটী পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। তাহাই লইয়া স্বদেশ বিদেশের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ ও দর্শকগণ মধ্যে মধ্যে অতীত গৌরবের বিলুপ্ত কাহিনীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যাহা আছে কালে তাহাও ধ্বংস হইয়া যাইবে—থাকিবে কেবল তাজ খাঁ মসন্দরীর পবিত্র নাম আর তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের কাহিনী। সেইজন্য বঙ্গের একজন খ্যাতনামা লেখক বলিয়াছেন —"ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ প্রস্তর খণ্ড বা ইষ্টক স্তূপ।" হিজলীর নবাব-তাজ খাঁ মসন্দরীকে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিজলীর সেই সর্ব্বত্যাগী—"ফকির মসন্দরী" বলিলে আজও সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারে!

রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে—তাহার পূর্ব্ব তটে মসন্দরী সার মস্‌জিদটী অবস্থিত। এই

স্থানটি 'কসরা হিজলী' নামেই পরিচিত। মসজিদটী সমুদ্রের এত নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইলেও এইরূপ কিম্বদন্তী যে, সমুদ্রের জল কথনও কোন সময়ে মসজিদের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এমন কি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ভীষণ সাইক্লোনের সময় যখন এদেশের সমস্ত ভূমিই প্রায় জলে ডুবিয়া গিয়াছিল তখনও ইহা নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া অনেক নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিল। মসজিদটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ৫০+২৫ হাত। ইহার উপরে তিনটী গুম্বজ আছে, এবং সম্মুখে ও পার্শ্বে মসন্দরী সার ও সিকান্দরের এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্ত্রী পুরুষের অনেকগুলি সমাধি আছে। সমাধিগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে মেরামত করা হয়। সিকান্দরের সমাধি পার্শ্বে একটী লৌহদণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ওজনে প্রায় এক মণ হইবে। কেহ কেহ ইহাকে সিকান্দরের যষ্টি বলিয়া থাকেন।

মসজিদটীর প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী সমস্ত কূপ ও পুষ্করিণীর জলই ঈষৎ লবণাক্ত; কিন্তু ইহার জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুস্বাদু। জনপ্রবাদ যাহাই থাকুক না কেন, লবণ-সমুদ্রের পার্শ্বে থাকিয়াও কিরূপে যে ইহার জল এরূপ সুমিষ্ট হইল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পুষ্করিণীতে নামিবার সিঁড়ি ও তল পর্য্যন্ত চারিদিকে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। কিন্তু ইহার গাত্রে ও পার্শ্বে বড় বড় গাছ জন্মিয়া ইহাকে ধ্বংসের পথেই আনিয়াছে।

মসজিদের অনতিদূরে রসুলপুর নদীর মোহনায়—একটী তালবৃক্ষ আছে—এরূপ উচ্চ বৃক্ষ প্রায় দেখা যায় না। যাঁহারা জাহাজে বঙ্গোপসাগর বক্ষে—কলিকাতা হইতে চাঁদবালী কিম্বা পুরী প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা অনেক দূর হইতেই এই বৃক্ষটীকে দেখিয়া থাকিবেন। শুনিলাম এই কারণে Marine Department কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে ইহার গোড়ায় মাটি দেওয়া হইয়া থাকে, এবং ঝড় ও বন্যা ইত্যাদি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখিলে ইহার উপর নিশান বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কথাটি কতদূর সত্য জানি না, তবে বর্ত্তমানে বৃক্ষটির অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর যে ইহাকে বহুদিন এরূপ উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে দেখা যাইবে তাহা ত বোধ হয় না। হিজলীর অবশিষ্ট কাত্তিরাশির সঙ্গে ইহাকেও আর কিছু দিন পরেই চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইতে হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব। ২য় ও ৩য় ভাগ। শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ এম, ডি, প্রণীত। আমি যত্নের সহিত এই পুস্তক দুখানি পাঠ করিয়াছি। বই দুখানি ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের নিজের পোষাকে ও কথাবার্ত্তায় অনেক ইংরাজী ভাব থাকিলেও এই পুস্তকখানি সহজ ও সুন্দর বাঙ্গালাতেই রচিত। বক্তব্য বিষয়গুলির মূলতত্ত্ব সবই অতি সহজ কথায় বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িতে বা বুঝিতে কষ্ট হয় না, অনেক জটিল তত্ত্ব স্ফুট

নোটে ভাল করিয়া বুঝান আছে। ছবিগুলির নির্ব্বাচনও সুসঙ্গত হইয়াছে, সেগুলি দেখিলেই তাহার প্রকৃত ভাব ও তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

পুস্তকখানি শুধু বালকবালিকা নয় আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষ ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়া উচিত। কারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের আধুনিক তত্ত্বগুলি এমন কি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও অনেকেই জানেন না।

পুস্তকখানি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেই ভাল হয়। এ গ্রন্থে কোনরূপ মিষ্ট কথা লিখিয়া লোক তুষ্ট করিবার প্রয়াস নাই। ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকগুলি ভ্রান্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ আছে।

আমাদের এখন এমন অবস্থা যে শিক্ষিত লোকেও হিতাহিত বুঝিয়াও কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারেন না। জ্ঞান আসিলেও সহজে কার্য্য আসে না। এইরূপ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিশু বয়স হইতে শিখাইলে ক্রমে অনেক সুফল হইবে।

পুস্তক দুখানি বিদ্যালয় এবং সাধারণ এই উভয়বিধ পাঠ্য হইবারই উপযোগী হইয়াছে।

(ডাক্তার) শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

গোধূলি। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুচরণ চৌধুরী বি, এল, বসিরহাট। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। একখানি কবিতাগ্রন্থ। 'গোধূলির' কবি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত 'মঞ্জীর' পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভাষার লালিত্যে, ভাবের মৌলিকতায় ও অভিনবত্বে এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ঝঙ্কারে 'গোধূলি'র কবিতাগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। 'মঞ্জীরে' কবি যে প্রেমের গান গাহিয়াছিলেন—যৌবনের মোহস্বপ্ন, মদির-বিহ্বল হৃদয়ের চপলতার উচ্ছ্বাস সে। 'গোধূলিতে' শান্ত সংযত হৃদয়ের আনন্দ-সঙ্গীত। আসন্ন সন্ধ্যার গম্ভীর রাগিণী কবিতাগুলির সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে—ধ্যানমগ্ন এক বিচিত্র ভাবের সে ঐক্যতান। কবি গাহিয়াছেন, "হে রূপসি! খুলে লও বাবেক, তোমার এ মোহন রূপবো... স্বপনবিকার—মানস নয়ন হতে; মায়া-অভিনয় ক... সাঙ্গ; এ উদ্দাম বাসনানিচয় কর রোধ; চিত্ত পুন কর নির্ব্বিকার; নির্ব্বাণ লভুক আত্মা ফেরার মাঝার।" 'ঋতু সম্মিলন', 'বিবর্জ্জিতা', 'সিন্ধু' 'কাল-বৈশাখী' প্রভৃতি কবিতাগুলি কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কবির 'শিশির' ও 'ছায়াপথ' পাঠ করিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। যাঁহারা প্রকৃত কাব্যরস পিপাসু, তাঁহারা 'গোধূলি' পাঠে সুখী হইবেন, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইয়াছে।

অশোক। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী, সিটিবুক সোসাইটি কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১॥০ টাকা। গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি, লিপির সাহায্যে তিন বৎসরের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমে গ্রন্থকার অশোকযুগের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য ও অশোকের জীবনী সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাদির বিভিন্ন মতাদি আলোচনা করিয়া যুক্তিতর্কে যে মত তিনি খাড়া করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। লিপিকুশলতার গুণে গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহে গ্রন্থকার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন মগধ, চন্দ্রগুপ্ত, আলেকজাণ্ডার, ও মৌর্য্যরাজ্য স্থাপনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অশোকের মৃত্যুকাল অবধি বেশ একটি ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থকার সঙ্কলন করিয়াছেন। পাঠে কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, বর্ণনা এমনই সরস হইয়াছে। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই পরিপাটি হইয়াছে। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা-লাইব্রেরীর শোভা সমধিক বৃদ্ধি করিবে, সে বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০, ৩১১ কর্ণওয়ালিস রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ডাকহরকরা

শ্রীযুত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৮ [১১শ সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বর কুঠীর সহিত কারবার অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের সহিত মতের মিল না হওয়াই তাহার কারণ। সে কারবার ছাড়িয়া দিয়া রবি শস্যের ও ধান্যের আড়ত করিয়া এবং অনেক জমী জমা কিনিয়া বেশ একটা ফলাও কারবার করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসডাঙ্গা অঞ্চল হইতে কয়েকজন তাঁতী আনাইয়া নিজের জমীতে তাহাদের ঘরদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দেশে স্থাপিত করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারা তাঁত বুনাইয়া অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া কলিকাতায় তাহার দোকানে চালান দিত। এই সব নানাকার্য্যে বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। অর্থের উন্নতি করিতে তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কেননা অধিক অর্থ না হইলে পশ্চিমে গিয়া মনোচিত কার্য্য আরম্ভ করা হইবে না।

বিশ্বেশ্বর গ্রামের লোকের দারিদ্র্যের জন্য যে একেবারে ভাবিত না তাহা নয়। তবে পাড়াগ্রামে সকলেরই একরূপ সচ্ছন্দে চলে দেখিয়া এবং অযাচিত ভাবে সাহায্য করিতে গেলে কিরূপ লজ্জা পাইতে হয় তাহা সতীদের নিকটে শিক্ষা পাইয়া আর সে গ্রামের লোকের দিকে বড় ঘেঁসিত না। আপনার কার্য্য ও কল্পনা লইয়াই মত্ত থাকিত।

নবদ্বীপে মাসিমাতাকে গঙ্গাস্নান ও ঠাকুর দর্শন করাইয়া পাঁচদিন পরে তাহারা বাটী ফিরিল। বাটী পৌঁছিতে সন্ধ্যা লাগিল। মাসিমা রন্ধনে নিযুক্ত হইলেন, বিশ্বেশ্বর এই অবকাশে আড়ত ও তাঁতশালা ঘুরিয়া আসিল, দেখিল কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই। আহারে বসিয়া বিশ্বেশ্বর দেখিলেন অন্নপূর্ণার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর অথচ ঈষৎ করুণার আভাযুক্ত। বুঝিল কোন কারণে তিনি নূতন কোন মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে মাসিমা?"

"কই কিছুই ত হয়নি বিশু" বলিয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাসটা অত্যন্ত পুরাতন; বিশ্বেশ্বর আহার করিয়া যাইতে লাগিল। মাসিমা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে যেন আপনাকে বলিলেন "আহা দেখলেও দুঃখ হয়।"

"কাকে দেখলে দুঃখ হয় মাসিমা?"

এই ভটচাযদের মেয়ে দুটোকে। এই খানিক আগে সতী আমাকে নমস্কার করতে এসেছিল।"

"সতী? তোমাকে নমস্কার করতে? কেন?"

বিশ্বেশ্বর সহসা ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মাসিমাতার পানে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা এলে দোষ কি? নবদ্বীপ থেকে এঁসেছি

তাই বোধ হয় দেখতে তার মা পাঠিয়েছিল।” বিশ্বেশ্বর আর কিছু বলিল না। একটু অন্য-মনা ভাবে আহার সমাধা করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। কি একটা সমস্যার মীমাংসায় মন চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক করিতেছিল। অন্নপূর্ণা ডাকিয়া বলিলেন “প্রদীপে তেল নেই হয় ত,—হাতে করে আন্‌ত বাবা, জেলে দি।”

“আমি এখনি শোব, আলোর দরকার নেই।” বলিয়া বিশ্বেশ্বর শুইয়া পড়িল। কুটিল তর্কটাকে ‘অসম্ভব’ বলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া পাশ বালিশটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইল।

প্রত্যুষে উঠিয়া মুখে চোখে জল দিয়া প্রথমে কি করিবে ভাবিয়া লইল। একবার তৃষিত লোচনে ইদানিং তাহার হস্তস্পর্শশূন্য পুস্তক রাশির প্রতি দৃক্‌পাত করিল। শয্যায় বসিয়া একবার অন্যমনস্কভাবে মস্তকের নিকটস্থ তাকের প্রথম পুস্তকখানা টানিয়া লইয়াই বিস্মিত হইয়া দেখিল, এখানা ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের উপর কে আনিয়া রাখিয়াছে। এ কার্য্য কখনই তাহার কৃত নয়, মাসিমাও এ ঘরে কখনও আসেন না। পুস্তকের উপরের মলাটখানাও একটু উঁচু,—যেন তাহার ভিতরে কিছু লুক্কায়িত আছে। বিশ্বেশ্বর মলাট খানা উল্টাইতেই দেখিল একখানা চিঠি। উপরে মেয়েলি অক্ষরে লেখা “শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মৈত্রেয় শ্রীচরণেষু।” একি? এ পত্র কে লিখিবে? ত্বরিত হস্তে পত্রের আবরণ খানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল। কয়েক ছত্র পড়িয়াই অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িল, হস্ত ও মস্তিষ্ক নানা ভাবনায় চঞ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল, চেষ্টা দ্বারা ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল “শতকোটী প্রণামান্তর নিবেদন!

আপনি এই পত্র খানা পড়িতে গিয়া প্রথমেই বিস্ময়ের সহিত ভাবিবেন কে লিখিয়াছে, হয়ত নামও অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। সেই জন্য পত্রের প্রথমেই আপনাকে জানাইতেছি, আমি সতী।

অনেক কথা লিখিব বলিয়া পত্রখানা লিখিতে বসিয়াছি কিন্তু এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কি লিখি! লিখিবার অনেক আছে” বটে কিন্তু প্রথমে কি কথা বলিয়া আরম্ভ করি। প্রথমেই কি লিখিতে কি লিখিব বলিয়া ভয়ে প্রাণ অবসন্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার আর এমন কিসের লজ্জা! যাহা কলমে আসিবে তাহাই লিখিয়া যাই; কোনটা গোড়ায় কোনটা শেষে বলিলে ভাল হয় তাহার বিচারের চেষ্টা কেন করি!

আপনাকে আমি এ পত্র লিখিতাম না, আমি যে কার্য্য আজ করিব তাহার সাফাই গাহিয়া রাখিবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য আমি কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলাম না; আপনিও আমার সুখ দুঃখের এমন কোন অংশী নন যে আপনাকে এ কথা না বলিলে চলিত না। সংসারের চক্ষে আমি দোষী, অপরাধীর বেশেই গেলাম, কিন্তু আপনার কাছে এ কথাগুলা না বলিয়া কেন যাইতে পারিতেছি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

পাঁচ দিন পূর্ব্বে ঝড়ের দিন বৈকালে আমাদের খিড়কীর পুকুর ঘাটের কথা আপ-

নার মনে আছে কি? সে দিন আপনি যাহাকে ঘাটে দেখিয়াছিলেন সে চাঁদপুরের জমিদার নরেন্দ্র ভাদুড়ী। আর পুকুর ঘাটে জলে যে বসিয়াছিল সে আমি। ইহা আপনি অবশ্য বুঝিয়াছেন,—কিন্তু কেন তাহা বোধহয় ভাবিয়া দেখেন নাই, অথবা সকলে এরূপ দৃশ্য দেখিয়ে যেরূপ অর্থ ভাবিয়া লয় তাহাই ভাবিয়া লইয়াছেন। ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ভদ্র লোকের মেয়ের এ কার্য্য সম্ভব কি না?

আমি নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ পত্র লিখিতেছি না। আমি দোষী! সত্যই আমি সেই পাপিষ্ঠের প্রলোভনে পতিত হইয়াছি। আমার আর সাধ্য নাই যে এ প্রলোভন হইতে আপনাকে ফিরাই। কিন্তু শুনুন আমি তাহাকে প্রতারণা করিয়াছি। প্রতারণা কেন বলি—সে যাহা চাহিয়াছিল আমি তাহার অনেক বেশী তাহাকে দিতে সম্মত হইয়াছি। সে দেহ চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে আত্মা দান করিয়াছি। সে আমার এক জন্ম না হয় অপবিত্র করিত, নষ্ট করিত, আমি সেই মূর্ত্তিমান নরকের দ্বারপালের পায়ে আমার জন্ম জন্মান্তর ইহকাল পরকাল স্বর্গ মর্ত্ত্য সব দান করিয়া বসিলাম। আমি কি তাহাকে প্রতারণা করিলাম?

স্পষ্ট কথায় বলি সে আমায় অনেক টাকা দিতে চাহে। যেদিন তুমি তাহাকে দেখিয়াছ তারপর আর একদিন, গত পরশ্ব যেদিন চাঁদপুরের কুঠির মহাজনেরা আমাদের বাড়ীর দ্বারে ঢেঁড়রা দিয়া যায় যে, তিন দিনের মধ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে, সেইদিন দুপুর বেলা আবার সে আসে। আমার পায়ের গোড়ায় হাজার টাকার নোট ফেলিয়া দেয়; আমি সে টাকা গ্রহণ করিয়াছি। অদ্য রাত্রে সে আসিয়া ঘাটের ধারে দাঁড়াইবে, আমি তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইব;—এই কথা। আমি চলিলাম,—আজ আমি নিশ্চয়ই যাইব,—কিন্তু তাহার কাছে নয়,—আর এক জনার কাছে।

জানিনা তিনি সংসারের লোক অপেক্ষা সদয় কি নির্দ্দয়! জানি না তিনি আমায় কি শাস্তি বিধান করিবেন। যাহাই করুন আমি তাঁহার হস্ত হইতেই সে দণ্ড গ্রহণ করিব, সংসারের লোকের হস্ত হইতে আর নয়। আজ যদি পাপিষ্ঠ নরেন্দ্র আমায় এমন করিয়া প্রলোভিত না করিত! এমন করিয়া আমায় নরকের মুখে টানিয়া লইয়া না যাইত, সংসারের কষ্টে, আঘাতে জ্ঞানশূন্যা আমাকে এ সুযোগ না দান করিত তাহা হইলে কি আমি মরিতে সাহস পাইতাম! কখনো না!

কাল আমার মা ভাইবোন পথে দাঁড়াইবে! ভিক্ষা করিয়া খাইবে, লোকের উপহাস সহ্য করিবে হয়ত অনাহারে মরিবে আমি আজ কি তুচ্ছ নিজের মায়ায় এ লোভ সম্বরণ করিতে পারি! আমার আত্মা চিরকাল যন্ত্রণা পাইবে এই ভয়ে আমি আত্মহত্যা হইতে বিরত হইব? যন্ত্রণা বা কষ্টকে ত আমি চিরকালের সাথীর মত জানি। সে কষ্ট কি ইহাপেক্ষাও বেশী? হয় হউক আমি তাহাতে ভীত নই। লোকে আমার নিন্দা করিবে? করিলই বা! আমার মা ভাই বোন ত' কাল বিপদ হইতে মুক্ত হইবেন, এখন কিছুকাল ত তাঁদের সুখে চলিবে! তাহার পর, ভগবান হয়ত তাহাদের উপরে প্রসন্নও হইতে

পারেন ; আমি তাঁর সে প্রসাদের যোগ্য নই বুঝিয়াছি, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া অনেক দিন পরে প্রাণে একটু সুখ অনুভব করিয়া বিদায় লইতেছি। সরলা সাবিত্রীকে এটাকা কুড়াইয়া পাইয়াছি বলিয়াছি,—এ টাকা লইতে দোষ নাই বলিয়া বুঝাইয়াছি, সে আমার উপর একান্ত নির্ভরশীল তাই কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আসন্ন বিপদের পরিত্রাণ লাভের আশায় তাহার মুখ আনন্দোৎফুল্ল! এমন মুখ তার অনেকদিন দেখি নাই। সে ত জানে না যে এ টাকা তাহার দিদির শোণিত। ভগবান তাকে তার দিদির শোক ভুলাইয়া রাখিবেন।

তুমি হয়ত বলিবে তোমাকে একবার এ বিপদের কথা জানাইলাম না কেন! একথা তুমি বলিতে পার কেননা তোমার দয়ার শরীর। অনাথাদের তুমি অনেক বার দয়া করিতে আসিয়াছ, দয়া করিয়াছ, কিন্তু আর না। সেই যথেষ্ট! সেই অন্নই আমার বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে! আর ঋণের ভার বাড়াইতে চাহি না।

তোমাকে অনেক কথা বলিব বলিয়াছি—লিখিলামও কিন্তু গোটাকত আরও কথা আছে। তাহা হইলে আমার বক্তব্য শেষ হয়। মনে আছে কি? একবার টাকা দিয়া দয়া করিতে আসিয়াছিলে? আমি সে টাকা লই নাই। মনে কর কি সত্য তখন আমাদের কোন অভাব ছিল না? তাহা নয়। তুমি আমাদের কে যে তোমার দয়া আমরা লইব? তোমার কি মনে পড়িবে তুমি আমায় সব দিতে পারিতে। আজ তুমি ভিক্ষুক দেখিয়া আমায় দয়া করিতে আসিয়াছ? তোমার ও দয়া আমি কেন লইব! আমি এখন অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, এই আজ প্রথম এবং শেষ,—আমি তোমার দাসী হওয়ার নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম না। তবু তুমি আমায় গ্রহণ কর নাই! যদি আর কাহাকেও করিতে বুঝিতাম তোমার স্নেহের অভাব নাই,—কেবল যোগ্যপাত্র পাও নাই বলিয়া গ্রহণ কর নাই—কিন্তু তাহাও কর নাই। আমি বুঝিতেছি তুমি স্ত্রী জাতিকেই ঘৃণা কর। তাই আজ মরিবার সময় অভিশাপ দিয়া যাইতেছি এই অধমা জাতিকেই একদিন তুমি ভাল বাসিবে! অধমা জাতি কতখানি সমুদ্র বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে। স্বীকার করিবে সংসারে সেই স্নেহের আদান প্রদানই শ্রেষ্ঠ সুখ।

তবে এইবার পত্রের এবং জন্মের মত বিদায়ের শেষ করি। তুমি হয়ত বিরক্ত হইতেছ, আমায় ব্যাপিকা ভাবিতেছ। তাহা ভাবিওনা। স্ত্রীলোকে যাহা সহিতে পারে তাহাতে আমি পশ্চাদ্‌পদ হই নাই, সকল দুঃখ অম্লান বদনে মাথায় লইয়াছি, কিন্তু দেখিলাম আমার এ দুর্ভাগ্যের কূল কিনারা নাই, তাই এ জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছি। না মরিয়া আমার আর উপায় কি? অদৃষ্টের বশে সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে মুখের কথাতেও আমাকে সম্মত হইতে হইয়াছে, ভদ্রলোকের মেয়েরা যে কথা শুনিলে কানে আঙ্গুল দেয় সেকথা আমি দাঁড়াইয়া শুনিয়াছি, শেষে এই চাতুরীও খেলিলাম। সবই পারিলাম—কি আর বলিব! তাহাপেক্ষা আত্মহত্যার ভয়াবহ স্মৃতিও আমার আদরনীয় মনে হইতেছে। সকলে আমার নিন্দা করিবে

বিশ্ব তুমি করিওনা। একবার মনে করিও তোমার পায়ে স্থান পাইলে আমার আজ এদশা হইত না। আত্ম বিনিময়ে আমাকে মা ভাই বোনকে বিপদ মুক্ত করিতে হইত না।

মনে ভাবিওনা যে অন্যের পরিগৃহীতা হইয়াও, বিধবা হইয়াও কেবল পরপুরুষকে চিন্তা করিতাম। আমরা বাঙ্গালী হিন্দুকন্যা কষ্ট হইলেও আমরা দুদিনেই নিজের অবস্থার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া লই! তোমার মা'সমার কথায় আমার হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য বালিকা মনে যে আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল কয়েকমাসেই আবার তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছিলাম। হয়ত কমলার মত (সেকথা তোমার মনে আছে কি?) সুখ সৌভাগ্যের মধ্যে পড়িলে ত তাহারি মত সব ভুলিয়া যাইতাম। আমার অদৃষ্টে তাহা হইলনা। দারিদ্র্য অবস্থার পাষাণফলকে তোমার দয়ার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে চাহিত। আমি চিরদিন তাহা অন্ধকারের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তোমার সাক্ষাতে সত্য করিয়া বলিতেছি নিজেও কোন' দিন সে মূর্ত্তি বাহির করিয়া দেখি নাই! দেখিবার অবসরও ছিলনা। আজ একান্ত অবসর! আজ আর কোন' কাজ নাই—আজ আমার বিশ্রাম। তাই বোধহয় তুমি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ।

মনে করিয়াছিলাম তোমায় অনেক কঠিন কথা লিখিব, অনেক রাগ প্রকাশ করিব কিন্তু এখন ক্রমশঃ আমার মন হইতে যেন সব সরিয়া যাইতেছে। সংসারে কাহারো উপরে কোন দাবী বা ক্ষোভ রাখি নাই কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কেন এ অভিমান আমার মনে উদয় হইয়াছিল বলিতে পারিনা। আজ আর আমার মনে কোন' অভিমান নাই। আমি বুঝিতেছি আমি অন্যায় করিয়াছি, কেন তোমার নিকটে সাহায্য চাহিলাম না! তোমার উপরে কি রাগ সাজে! কিন্তু যাহা করিয়াছি আর তাহা ফিরিবার নয়। এখন বলিতেছি আমার মা বোনকে কালীকে দেখো তারা যেন কোন' বিপদে না পড়ে। পারত—দাদাকে সুমতি দিয়ে'। আমার যেন মনে হচ্চে আমি গেলেই এদের সব বিপদ কেটে যাবে। তুমি মনে কিছু কষ্ট ক'রনা, সুখী হও, পার ত' একটা ভাল পাত্রে সাবির বিয়ে দিও। তবে আমি আসি! প্রণাম জেনো ইতি।

সতী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেল, তথাপি বিশ্বেশ্বর স্পন্দহীন প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তা করিবার ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ পত্রখানা পড়িতেছিল, যেন অগাধ জলে সন্তরণহীন মূঢ়ের ন্যায় হাবুডুবু খাইতেছিল। এখন যেন সে তলাইয়া গিয়াছে, অতল সলিলে যেন তাহার এখন সমাধি হইতেছে। হস্তপদ স্থির, বলহীন, ঈষৎ সঞ্চালনের ক্ষমতাও রহিত, চক্ষু বিস্ফারিত অথচ দৃষ্টি হীন, মনও চাঞ্চল্য শূন্য, নিস্পন্দ।

সহসা কক্ষের বাহিরে অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি যেন আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিতেছেন "বিশু! বিশ্বেশ্বর!" বিশ্বেশ্বরের উত্তর দিবার সাধ্য নাই।

অন্নপূর্ণা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ঘরে আছিস্? গাঁয়ের খবর কিছু শুনেছিস ?"

"শুনেছি"।

"এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? শীগ্‌গির যা —এখনো উপায় আছে।"

"কিসের উপায় ?"

"তবে কি শুনেছিস্ বল্‌ছিস্? রামশঙ্কর ভট্‌চায্‌দের বাড়ী মহাজনেরা দখল করেছে। আজ তিন দিন নাকি নোটিস্ দিয়েছিল। আমার কপাল, আমি বাড়ী ছিলেম না। এক গাঁয়ে হ'লেও ওদের বাড়ী এত দূর যে কাল সন্ধ্যেবেলায় এসেও খবর পাইনি। নিধের মা এখনি দেখে এল মহাজন আর পেয়াদা এসে বাড়ী ঘিরেছে। এখনি হাত ধরে পথে বসাবে। যা শীগ্‌গির যা, আমিও এখনি যাচ্চি—তুই আগে গিয়ে বাধা দে গে।" বিশ্ব চাহিয়া দেখিল মাসিমাতার চক্ষু হইতে গর্ গর্ করিয়া জল পড়িতেছে। তখন তাহার চক্ষে জল আসিল। মনে হইল হয়ত এখনো কোন উপায় আছে। সতী হয়ত এখনো আছে এখনো তাকে বাঁচাইতে পারা যায়,—বিশ্বেশ্বর উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

গিয়া দেখিল ভট্‌চায্‌দের ভদ্রাসনের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশীবর্গ দিব্য জটলা বাধাইয়াছেন। মহাজন এবং পেয়াদারা বাটীতে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর হইতে রোদন ধ্বনি উঠিয়াছে, অসহায় প্রতিবেশীর আশ্রয়হীন ক্রন্দনে প্রতিবেশীরা দিব্য আমোদ পাইয়াছেন, বলিতেছেন "এত যাদের অহঙ্কার, তাদের ত এ অবস্থা ঘটবেই! —কেন আমরা পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের একথা একবার জানাতে নেই, কিছু চাইতে নেই! গরীবের এত তেজ কেন! কিন্তু তাঁহারা যদিও সমস্তই জানেন। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া একজন বলিলেন "কি বল ছোক্‌রা? আমাদের এখন আর হাত কি বল? আর এ ভদ্র লোকই বা নিজের পাওনা গণ্ডা ছাড়বে কেন? এতে কান্নাকাটি না করে বেরিয়ে আসাই ভাল।" বিশ্বেশ্বর সেকথার উত্তর দিলনা। এ রোদন ধ্বনি যেন তাহার অন্তরূপ বোধ হইল, তাহাকে সবেগে দ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিয়া মহাজন একটু সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদারাও সরিল।

অঙ্গন পার হইয়া যে কক্ষ হইতে রোদন ধ্বনি নির্গত হইতেছে বিশ্বেশ্বর সেই কক্ষাভিমুখে ছুটিল। দেখিল জ্যেঠাইমা দ্বারের নিকটে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন, কক্ষের মধ্যে সাবিত্রী ও কালী মাটীতে লুটাইয়া লুটাইয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিতেছে; জাহ্নবী নীরবে কাহাকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, আৰ্ত্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল 'সতি!' কেহ কেহ চাহিয়া দেখিল। বালক কালী চেঁচাইয়া উঠিল—

"ও বিশুবাবু আমার দিদি—আমার দিদি"। বিশ্বেশ্বর বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—

"কি হয়েছে কালী? তোমার দিদির কি হয়েছে?"

"জানিনে বিশুবাবু দিদি কথা কচ্চেনা। জ্যেঠাই মা বল্‌ছে দিদি মরে গিয়েছে।" বিশ্বেশ্বর সেই খানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, একটু জোরের সহিত জাহ্নবীকে সরাইয়া দিতে যাইবা মাত্র জাহ্নবীর কণ্ঠে স্বর ফুটিল, আৰ্ত্তকণ্ঠে বলিলেন

"কেরে পাষাণ সর্ সর্ এখন নয়। আর একটু পরে। আমি আপনিই ছেড়ে দেব, এখন আমায় খানিকটে বুকে নিতে দে।"

"মা, আমি; আমি বিশু। আমায় একবার দেখ্‌তে দেন। যদি এখনো বাঁচাতে পারা যায়"—জাহ্নবী চোখ মেলিয়া চাহিলেন। দ্বিগুণ আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন "কে এসেছ বাবা? বিশ্বেশ্বর? আমার সতীকে কি পায়ে স্থান দিতে এসেছ? আমার সতীর কি আজ বিয়ে? ম শাপন্ন বুড়োর সঙ্গে তার কি আমি বিয়ে দিই নি? সতী কি আমাব বিষ খেয়ে মবেনি? আমি কি স্বপন দেখ্‌ছিলাম! এসো বাবা, এসো।"

বিশ্বেশ্বর অতি কষ্টে জাহ্নবীকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া দেখিল সতী উবুড় হইয়া শুইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ খানা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে স্পর্শ করিতে সহসা বিশ্বেশ্বরের সাহস হইল না। যেন সে কি মহা চিন্তায় আচ্ছন্ন, কি যোগে নিমগ্ন, সে যোগ ভঙ্গ করিতে গেলে অপরাধীকে তখনি যেন ভস্মীভূত হইতে হইবে। বিশ্বেশ্বরের সঙ্কোচ দেখিয়া, সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল, দুই হাতে সতীকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তিত করাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "দেখুন, দেখ্‌বার কিছু আব নেই! দিদি অনেকক্ষণ চলে গেছে।"

তথাপি বিশ্বেশ্বরের মনে হইতেছিল হয়ত এখনো সতী বাঁচিয়া আছে। শীতল নাসারন্ধ্রে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া দেখিল, কালিমাবেষ্টিত নিমীলিত চক্ষু টানিয়া টানিয়া দেখিল, মুখে মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া জিহ্বার উত্তাপ অনুভব করিতে চেষ্টা করিল। কিছু না কিছু না!

"সব ঠাণ্ডা! কিছু নেই—"

"বিশ্বেশ্বর! কেন বাবা মিথ্যে চেষ্টা করছ! আমার সতী' ঢলাঢলি কর্‌বার মেয়ে নয়। সে যতদিন কষ্ট সয়ে বেঁচেছিল, কারুকে একবারও জান্‌তে দেয়নি। আজ আর না সইতে পেরে চলে গেল, তাও তাকে একবার থাকৃতে বল্‌বারও কাউকে সময় দিলে না। এখন আমায় খানিকটা ছেড়ে দাও! মা আমার জ্বলে জ্বলে এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, সতীর আমার ঠাণ্ডা শরীর, ঠাণ্ডা বুকটা আমি এখন খানিকক্ষণ বুকে কবে নিয়ে থাকি,—দাও। সতী আমাব এমন নিশ্চিন্দি হয়েত' একদিনও একদণ্ডও ঘুমুতে পায়নি! সুস্থ, শরীবে সুস্থ মনে সতী আমাব ঘুমুচ্ছে, আমি খানিক তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।"

ক্রমে লোকে ঘর পুরিয়া গেল। 'একি সর্ব্বনাশ!' "কেন এমন হ'ল?" "কিসে ম'ল?" "কি খেয়ে?" বিষ কোথায় পেলে?" "কি দুঃখে বিষ খেলে?" "কেউ কিছু বলেছিল?" ইত্যাদি শব্দে বাটী মুখরিত হইতে লাগিল। লোকের কোলাহলে ও উৎসাহসূচক আন্দোলনে জ্যোঠিমা পর্য্যন্ত থামিয়া গেলেন। অনুসন্ধিৎসু পরোপকারী মাতব্বরগণ নানারূপ ঘোঁট করিতে লাগিলেন। সন্ধান করিয়া সতীর মাথার শিয়রের নিকট হইতে একটা মালিশের, ঔষধের শিশি, একটা অহিফেন গন্ধযুক্ত পাতা ও এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজে লেখা—"আমি স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম। আমার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। ইতি সতী"

বাহির হইতে মহাজনের লোক আসিয়া

বলিল "তবে বাবু আপনারা সব সাক্ষী রইলেন, বাড়ীতে আজ বিপদ, আমরা যাচ্চি কাল আমরা কিন্তু ফিরবনা।"

কেহ কোন কথা কহিলনা। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা বসিয়া নীরবে জাহ্নবীকে শুশ্রূষা করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে এক একবার সতীর ললাট বক্ষ স্পর্শ করিয়া দেখিতেছেন। তিনি বিশ্বেশ্বরকে নিকটে ডাকিয়া আঁচল হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "ওদের বিদেয় করে দাও। কাল আর ওরা না আসে।"

বিশ্বেশ্বর বাহিরে গিয়া নিভৃতে মহাজনের সঙ্গে সমস্ত মিটাইয়া ফেলিল। মহাজন একে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ, তাহাতে তাহার খরচা সমেত সাতশত টাকার উপরেও লভ্য হইয়াছে, নীরবে মর্টগেজ কাগজ খানা ফিরাইয়া দিয়া সদলবলে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। বিশ্বেশ্বর সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহাকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সকলে প্রশ্নবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। লোকটা ভদ্র—এখন কিছুদিন স্থগিদ বেখে চলে গেল—এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর তাহাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিলেন। নিরাশ হইয়া অগত্যা সকলে বলিল "এখন এদিকের কি হয়? দারোগাকে খবর না দিলে ত চল্‌বে না, আমরা অনেকক্ষণ খবর পাঠিয়েছি—তিনি এলেন বলে। তারাপুরের বড় ডাক্তারও এল বলে।" বিশ্বেশ্বর নীরবে রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ও দারোগা একসঙ্গে আসিলেন। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, বিশ্বেশ্বরও শুষ্ক মুখে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার নীরবে মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল, দারোগা মালিশের শিশি, অহিফেণের পাত্র ও কাগজ টুক্‌রা লইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল সতীর শান্ত, নিদ্রাচ্ছন্ন শুভ্র মুখ যেন লজ্জায় ঘৃণায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, প্রশান্ত শুভ্র ক্ষুদ্র ললাটে আশঙ্কার নীলবর্ণ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে, লজ্জা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত যেন সতী অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডাকিতেছে। বিশ্বেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে অনেক কথা বলিলেন। বিশ্বেশ্বর কেবল শুনিয়া যাইতে লাগিল, কথা কহিতে বা কোন যুক্তি করিতে তাহার যেন সাধ্য নাই। ডাক্তার ডাকিল "বিশ্বেশ্বর বাবু" বিশ্বেশ্বর নিকটে গেল।

"রোগী অনেকক্ষণ মরিয়াছে। দেখিতেছি অহিফেণ ও বেলেডোনাযুক্ত মালিশে এ মৃত্যু ঘটাইয়াছে। দেখা যাইতেছে ইহা আত্মহত্যা।"

দারোগা বলিলেন—"এ মালিশ কাহার ডিস্পেন্সারীর! দেখিতেছি তারাণচন্দ্র নাগের ডিস্পেন্সারীর। কিরূপে ইহা সে প্রাপ্ত হইল? এবং আফিংই বা কোথায় পাইল?"

জ্যেঠাই মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বৌয়ের মাজার বেদনার জন্যে ওটা আনা হয়েছিল। ব্যথা ভাল হ'য়ে যাওয়ায় বেশী খরচ হয়নি—প্রায় সবটাই ছিল।

ক্যাত্ত বাগ্‌দী প্রমাণ দিল, পায়ে ব্যথা হয়েছে বলে ধুতুরো পাতা আর একটু আফিং আমার কাছ হতে কাল চেয়ে নিয়েছিল। সেত' বেশী নয়। আমি কি জানি ছাই যে তার মনে এত ছিল।"

বিশ্বেশ্বর বুঝিল যে পাছে মালিশেও মৃত্যু না হয় সেজন্য সতী এত সতর্কত অবলম্বন করিয়াছে। ডাক্তার তখন বিশ্বেশ্বরের পরামর্শ চাহিল। বলিল "হস্‌পিটালে লইয়া যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য এখন আপনি কি বলেন?" বিশ্বেশ্বর শিহরিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল "যদি অন্য কিছু উপায় থাকে বলুন, আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সন্তুষ্ট করব। আমার নিজের বাড়ীর ব্যাপার বলেই জানবেন্। আপনি কি আমার সাহায্য করবেন না?"

"আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এখনি সর্পাঘাতে মৃত্যু বলে রিপোর্ট লিখ্‌ব। আপনি দারোগাকে হস্তগত করুন।"

দারোগাকে হস্তগত করিতে বিশ্বেশ্বরের অধিকক্ষণ লাগিল না। তখন ডাক্তার ও দারোগা "সর্পাঘাতে মৃত্যু" লিখিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রামের লোক তখন নিরাশচিত্তে নানাপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে গৃহে চলিল। কেহ কেহ বা নিতান্ত নাচাব হইয়া আপনার সাধুতা দেখাইবার জন্য বিশ্বেশ্বরের অনেক প্রশংসার সঙ্গে নিজের হাতে এখন কিছু না থাকার যথেষ্ট প্রমাণ দিতে লাগিল। হাতে কিছু থাকিলে কি তিনি এতক্ষণ নীরবে থাকিতেন? ডাক্তার ও দারোগাকে নজর পাঠাইয়া দিয়া সমস্তই পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন, লোকে এ কেলেঙ্কারীটা জানিতেও পারিত না। কেহ বা বলিল "ওর মাসীরই এসব খরচ—ও কঞ্জু বেটার এত আর করতে হয় না, মাসী মাগী লোক ভাল'। কেহ বা আরও কিছু ভাবিয়া লইয়া পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিল। সকলকেই এখন গৃহাভিমুখে ছুটিতে হইল; কেননা এইবার মড়া ফেলা।

বিশ্বেশ্বর তাহার কর্ম্মচারী নিবারণ চাটুয্যে, হরীশ গাঙ্গুলী, চির উপকৃত বন্ধু রামতনু সান্যাল এই তিন জনকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। তাহাদিগকে অঙ্গনে দাঁড় করাইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণার মুখ পানে চাহিয়া একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বুঝিলেন—গম্ভীর খেদপূর্ণস্বরে জাহ্নবীকে বলিলেন "বৌ, তোমার সতীকে যে তার বাপের কোলে দিয়ে আস্‌তে হবে। আমরা ত' তার কষ্ট একদিনও ঘুচুতে পারিনি, তাই সে বাপের কাছে যাচ্চে। মেয়ে ত' চিরদিনই পরের ঘরে যায় বৌ! সতীকে তার স্বামীর কাছে—"

"ওকথা বলোনা দিদি, ওকথা ব'লোনা। সতী আমার কুমারী। আমি কি তার বিয়ে দিয়েছি? সেই ঘাটের মড়া কি তার বর? আমার কুমারী মেয়ে তার বাপের কোলে যাচ্চে। এ থান কাপড় সতীর ছাড়িয়ে দাও, দি! ছোটবেলার সেই নীলাম্বরী খানি পরিয়ে দাও, যে কাপড়খানা পরে তার বাপের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াত। কাঁচের কাল চুড়ি কগাছি পরিয়ে দাও, বিধবার বেশে আমার সতীকে যেতে দিতে পারব না, তার বাপ আমায় কিবল্‌বে—"

অন্নপূর্ণা দেখিলেন প্রবোধ দেওয়া মিথ্যা। সাবিত্রীকে বলিলেন "সাবিত্রী মাকে এসে ধর্", সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া সতীর মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল। আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "এমন কথা বলোনা পিসিমা। আমার দিদি কোথায় যাবে? আমার দিদি ত' কোথাও যায় না। আজ কেন সে যাবে, আমাদের ফেলে সে কথ্খোনো যাবে না।"

অনেকক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন "বিশু কি কর্‌ছিস্! যে গেছে সেত' গেছেই, এদের ত' বাঁচাতে হবে! ওদের ডাক্।"

জাহ্নবী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সাবিত্রীকে একদিকে সরাইয়া দিলেন। সতীর মৃতদেহ কোলে টানিয়া লইয়া, একবার স্থির চক্ষে কন্যার মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিলেন, শীতল গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা! সতী! তবে এস মা, আমার কাছে বড় কষ্ট পেয়েছ। তোমার বাপের কোলে গিয়ে সেই ছোট সতী হয়ে ঘুমোওগে। যদি একবার মা বলে শেষবার ডেকে যেতে মা! কাল রাত্রে যখন পায়ের তলায় শুয়ে পায়ে হাত বুলিয়েছিলে তখন জানিনি যে তুমি বিদায় নিচ্ছ; তাহলে একবার মা বলে ডাক্‌তে বলতাম। মা! তবে নিতান্তই চল্লে? এস মা এসো। বিশ্বেশ্বর! সতীকে এই নাও।" জাহ্নবী যেন যথার্থ বিশ্বেশ্বরের চরণে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া সবলে দুই হস্তে তাহার ক্ষীণ দেহ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন। তিনজন ব্রাহ্মণ অমনি তাঁহার হস্ত হইতে সতীর দেহ টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিল। বিশ্বেশ্বরও নীরবে অনুসরণ করিল। সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া পাগলিনীর মত তাহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল "বিশু দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি, আমার দিদিকে নিয়ে যেও না, ফিরিয়ে দিতে বল, ওগো তোমার কি দয়া নেই? দাও আমার দিদিকে, ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।" বিশ্বেশ্বর আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "মাসিমা।"

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া সাবিত্রীকে জোর করিয়া গৃহ মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন। জোর করিয়া জাহ্নবীর ক্রোড়ে তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন "বৌ, এটাকে ধর, ওর সঙ্গে এটাও যায় যে। মুখ দিয়ে ফেণা উঠ্‌ছে যে—বড় বৌ একটু জল দে, পাখা খানা আমায় দে কালী।" জাহ্নবী সাবিত্রীকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন "সাবি—সাবি।"

মা—দিদি—দিদি—দিদি!

কালীপদকে লইয়া বিশ্বেশ্বর নীরবে শব-বাহীদের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে গেল। সতীর ক্ষীণ দেহ দুইজন ব্রাহ্মণেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিল। সেখানে চিতা সাজাইয়া শবকে স্নানান্তে নব বস্ত্র পরাইয়া, কালিপদর দ্বারা মুখাগ্নি করাইয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করান হইল। বৃদ্ধ রামতনু কালীকে দূরে লইয়া নানা প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর নীরবে একটা বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া বসিয়া দেখিতেছিল সতীর বক্ষপঞ্জর হইতে অগ্নি শিখা উত্থিত হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে। হু হু হু! ধূ ধূ ধূ!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পীড়া-

পীড়ি করিলেন। জাহ্নবী শুনিলেন না, বলিলেন, "দিদি ওকথা বলোনা, এই বাড়ীতে তিনি গেছেন, সতী গেছে, সতী আমার ঘরে পড়ে একা মা বলে কাঁদ্‌বে, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব! আমি কোথাও যাব না।" অগত্যা অন্নপূর্ণাকে কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রে তাহাদের নিকটে থাকিতে হইল, কেন না জ্যেঠাইমা তাঁহার বহুদিনলুপ্তসম্বন্ধীয় এক ভগিনীপুত্রের বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন। প্রাণের কাছে মান অপমান কিছুই নাই! তাঁহার বিশ্বাস তিনি ঘুমাইলেই সতী তাঁহার ঘাড় মটকাইবে। সতী যে বাড়ীতে প্রেতিনী হইয়া ঘুরিতেছে না একথা ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এসে বল্লেও তাঁর পেত্যয় হবে না। চিরানুগত ক্ষান্ত বাগদীও তাহাদের আগ্‌লাইবার জন্য সেই বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত।

চতুর্থ দিবসে কালীপদ যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিল। জাহ্নবীর অনুরোধে সতীর সপত্নী-পুত্রকে সংবাদ ও অর্থ প্রেরণ করিয়া বিশ্বেশ্বর কাশীর দ্বারা সতীর শ্রাদ্ধ করাইলেন। জাহ্নবীর বিশ্বাস, নহিলে সতীর তৃপ্তি হইবে না।

এ কয়দিন বিশ্বেশ্বর যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কাটাইতেছিল। দারুণ দুর্ঘটনায় অপ্রত্যাশিত বিপদে লোকের হৃদয় যেরূপ বিকল হইয়া যায়, তাহারও সেইরূপ হইয়াছিল। সহসা একদিন মনে পড়িল সাবিত্রীর নিকট হইতে সতীর শোণিতাপ্লুত সেই নোটগুলা চাহিয়া লইয়া সেই পাপিষ্ঠকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। সেই ঘৃণিত অর্থ, সাবিত্রীর নিকটে বেশী দিন না থাকে। সাবিত্রী জানে না, সে অর্থের মূল্য কি! বিশ্বেশ্বর নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিল; দুরস্থিত শ্মশানের দিকে একবার চকিতের মত চাহিল, বোধ হইল যেন সেই অনির্ব্বাণ বৈশ্বানর নিষ্করুণ জগৎকে শুনাইয়া এখনও হুঙ্কার ছাড়িতেছে, এখনো সতী যেন সেই দারিদ্র্য অনলে পুড়িতে পুড়িতে নিশ্বাস ফেলিতেছে, হু হু হু!

সভয়ে বিশ্বেশ্বর নদীতীর ত্যাগ করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। অনেকক্ষণ গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাবুদের বাড়ীর উদ্যানে সেদিন বিষম বৈঠক বসিয়াছে। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত চত্বরে বসিয়া তাঁহারা দশমীর চন্দ্রালোক ও পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত বায়ু উপভোগ করিতে করিতে বাঁয়া তবলা হারমোনিয়ম্ বেহালা লইয়া গান বাজনা করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, পৃথিবী এমন সৌন্দর্য্যময়ী, তবু মানুষের এত দুঃখ কেন? কেহ সুখের সপ্তসমুদ্রে সাঁতার দিতেছে, কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে কেন! কেহ কাহারো পানে চাহে না কেন! দুঃখ বোঝে না কেন? তবে পৃথিবীর এ আনন্দ উল্লাস শোভা ঐশ্বর্য্য সবই পৈশাচিক হাসি, অন্তরস্থ দৈন্য ঢাকিবার জন্য ধরণীর এ কৃত্রিম শোভা নিষ্ফল নিষ্ফল। বাদ্যের ঝঙ্কার ভাল লাগিল না, বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া চলিল। দূরে—যেখানে বাদ্যের উৎকট ধ্বনি মস্তকে পীড়া না দেয় এরূপ স্থলে উপস্থিত হইতেই দূরাগত বেহালার সুরের সঙ্গে একটা করুণ সুর বড় মিষ্ট লাগিল। দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে চেষ্টা করিল—ক্ষণেক চেষ্টার পরে গান বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল—কে গাহিতেছে

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।

জনমের শেষ ডাকি মা তোমায়,

কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

বিশ্বেশ্বরের মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। কে এমন গান গাহিতেছে! এমন উৎসবের রাত্রে এমন খেদের গান কে গায়? যে গাহিতেছে সে কি বুঝিতেছে—যে তাহার গীতের মধ্যে কত অশরীরী আত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবীকে শুনাইতেছে

"এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,

এ পৃথিবী ভাল বাসিতে চাহে না,

যেথা আছে শুধু ভাল বাসা বাসি

সেথা যেতে প্রাণ চায় না।"

এতক্ষণে বিশ্বেশ্বরের চক্ষে জল আসিল। সত্যই এ নিষ্করুণা পৃথিবীতে ভালবাসা আছে কি? কে কাহার পায়ে জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে কে তাহার সংবাদ রাখে! সতী যে এমন করিয়া নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিল সে কি তাহার কোন খবর রাখিত! আবার এই যে তাহাকে নমস্কার করিয়া নীরবেই পৃথিবী হইতে সরিয়া গেল! তথাপি তাহার আত্মা কি সেই বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়াছে? এই যে করুণার সমবেদনায় তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে, সে কি ইহাই চাহিয়াছিল? এই কি সেই ভালবাসা? যদি এমনি সুশীলা ধৈর্য্যময়ী সুন্দরী, অনাহারে, কষ্টে, ভাবনায়, পৃথিবীর কুৎসিৎ ব্যবহারে, অন্য একজনকে নীরবে ভালবাসিয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ করিত তবে সেও কি এইরূপে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত? দারুণ ব্যথা কি হৃদয় মধ্যে অনুভব করিত না? সামান্য একখানা পুস্তক পড়িয়া হৃদয় ব্যথায় আকুল হইয়া উঠে; আর এমন বাস্তব করুণ দৃশ্যে কাঁদিবে না এমন নির্দ্দয় কে আছে? তবে? এই কি পৃথিবীর ভালবাসা!' সত্যই কি পৃথিবীতে ভালবাসা নাই?

গান চলিতেছিল

"বড় জ্বালা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি, বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি, অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা।

স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

বিশ্বেশ্বর অস্ফুটস্বরে একবার বলিল "বেশ করেছ সতি! এজগৎ ত' এড়াইয়াছ।" গান থামিয়া গেল। তথাপি সেই করুণ সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমশঃ অসহ্য হওয়াতে বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সহসা দেখিল সম্মুখে ভট্টাচার্য্যের ভগ্নদ্বারপথে শ্রীহীন অঙ্গন অম্লান চন্দ্রকরে যেন বিধবার মত পড়িয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সে অঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া কে সেইখানে নতজানু হইয়া যোড়হাতে বসিয়া রহিয়াছে। এ কে! সতী কি? সেই রকমই ত! সেই রুক্ষ চুলের রাশি সেই ক্ষীণ তনুযষ্টি, অর্দ্ধ মলিন ছিন্ন বাস, সেই অবনত ম্লান পাণ্ডুর আতাম্রক মুখ! বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা হইল একবার "সতি" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে কিন্তু কণ্ঠ দিয়া স্বর বাহির হইল না। কেবল নীরবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

যে তুলসীতলায় বসিয়াছিল সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বিশ্বেশ্বরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বিস্মিত মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে

বলিল, "কে?" বিশ্বেশ্বর বুঝিল "সতী নয় সাবিত্রী।

"কে, বিশু দাদা? আপনি এসেছেন? মাকে কি ডাকব?"

সাবিত্রীর করুণ ক্ষীণস্বরে আবার বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিল। মৃদু স্বরে বলিল "না, তোমার সঙ্গেই একটা কথা আছে, শোন।"

সাবিত্রী নীরবে চাহিয়া রহিল।

"তোমার দিদি কি তোমাকে কিছু দিয়ে গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ! অনেকগুলো নোট! তিনি নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

"সেগুলো সব আছে? খরচ করনি?"

"না।"

"সেগুলো সব আমায় এনে দাও।"

সাবিত্রী কক্ষ মধ্যে চলিয়া গেল অল্পক্ষণ পরে এক তাড়া নোট আনিয়া নীরবে বিশ্বেশ্বরের হস্তে দিল। সে নোট হস্তে লইতেও বিশ্বেশ্বরের হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, কিন্তু পাছে সাবিত্রী কিছু মনে করে ভাবিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল "এ নোটের কথা তোমার মা কিছু জানেন?"

"না, একদিন বলব ভেবেছিলাম।"

"না বলেছ ত' আর বলোনা। যার নোট তোমার দিদি কুড়িয়ে পেয়েছিল তাকে আমি ফিরিয়ে দেব।" সাবিত্রী নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিশ্বেশ্বর তাহার মাসিমাতার নিকটে শুনিয়াছিল সাবিত্রী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে উঠেনা, খায়না, কাহারও সহিত কথা কয়না, জাহ্নবীও তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। বিশ্বেশ্বরের তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিতে ইচ্ছা হইল, মনোগত ভাব তাহাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া। জিজ্ঞাসা করিল "তুমি ওখানে বসে কি করছিলে সাবিত্রি?"

"তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলাম।"

"আমি দেখ্‌লাম জোড় হাতে যেন কি বল্‌ছিলে।"

সাবিত্রী নতমস্তকে মৃদু স্বরে বলিল "শুনেছি, আত্মহত্যা করলে, অগতি হয়, তাই ঠাকুর তলায় প্রদীপ দিয়ে"—বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠে সাবিত্রী থামিল।

বিশ্বেশ্বরের চক্ষেও বালিকার ন্যায় অশ্রু প্রবাহ ছুটিল। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল—

"তোমার দিদি স্বর্গে গিয়েছে সাবিত্রি। তার মত পুণ্যবতীর কি অগতি হতে পারে? তোমার কি একথা বিশ্বাস হয়?"

আপনি বল্‌ছেন দিদি স্বর্গে গিয়েছে? স্বস্তিতে আছে, ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।

সাবিত্রী নতজানু হইয়া বিশ্বেশ্বরের পদতলে প্রণাম করিল। তার পরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল "আর আমি তবে কাঁদ্‌বনা। আমাদের ছেড়ে গেছে, ভুলে গেছে তাতে বেশী দুঃখ কি! সে ত' ভাল আছে, স্বস্তিতে আছে।"

সাবিত্রীর চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে ঝর ঝর করিয়া মুক্তা বিন্দুর ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যথিত বিশ্বেশ্বর তাহাকে সে অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ করিল। হয়ত সে এখন পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিবে। দিদি

দিদি বলিয়া ডাকিবে! জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মা কই! কালী কই?"

"কালীকে মা ঘুম পাড়াচ্ছেন—সে কেবল দিদি দিদি করে কাঁদে, থামাতে পারা যায় না।"

"তুমিও যে বড় কাঁদ সাবিত্রী। কাঁদলে কি আর তাকে ফিরে পাবে! ওতে কেবল মাকে কষ্ট দেওয়া হয়।" সাবিত্রী নতমস্তকে ফুকরিয়া উঠিল "আমি দিদিকে ছেড়ে যে কখনও থাকিনি।"

"চিরদিনের সঙ্গীকেও লোকে ভুলে যায়, জগতের নিয়মই এই।"

"আমি এত শীগ্‌গির কি করে ভুল্‌ব? দিদির সঙ্গী কমলা দিদি আজ এসেছিল, কতদিন সে দিদির সঙ্গছাড়া—তবু দিদির নাম করে কেঁদে কেঁদে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে গিয়েছে। সেও আর বেশী দিন বাঁচ্‌বেনা। তাবা দিদিকে ভুল্‌তে পারেনি, আমি কি করে ভুল্‌ব?

"কে এসেছিল! নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী? তার বুঝি খুব কষ্ট হয়েছে? নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী না সে?"

"আপনি জানেন বুঝি, তাঁর স্বামী শুনেছি ভাল লোক নন—কমলা দিদিকে খুব কষ্ট দেন্‌। দিদি কেবল কমলা দিদির নাম করে চোখের জল ফেল্‌তেন, কমলা দিদিকে তিনি বড্ড ভাল বাসতেন।"

বিশ্বেশ্বরের অনেক দিনের কথা মনে পড়িল। কমলার সহিত বিবাহের জন্য সতীর সেই দৌত্য কার্য্য। আবার হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল।

জাহ্নবী কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন "সাবিত্রী! কার সঙ্গে কথা ক'চ্চিস্‌ মা?"

সাবিত্রী ফিরিয়া বলিল "বিশু দাদা।"

"বিশ্বেশ্বর! এস বাবা"।

বিশ্বেশ্বর নীরবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু বসিল। জাহ্নবীর সমক্ষে তাহার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না। বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িল।

অতি প্রত্যূষে চাঁদপুর অভিমুখে চলিল। প্রাতর্ভ্রমণের পূর্ব্বেই নরেন্দ্রকে ধরিতে হইবে। অচিরে জমিদারের হৃদয়হীন পাষাণময় অট্টালিকা চক্ষের সম্মুখে পড়িল। বিশ্বেশ্বর চক্ষু নত করিয়া গেটের নিকটে পৌঁছিল। বাহিরের উদ্যানেই একখানা বেঞ্চের উপরে নরেন্দ্র ভাদুড়ী বসিয়া প্রাতঃসমীর সেবন করিতেছেন। মুখখানা অতি বিষণ্ণ যেন পীড়িত। বিশ্বেশ্বর গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। জমিদার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কে আপনি মশায়?"

"আমার নাম বিশ্বেশ্বর মৈত্রেয়। মহৎ পুরে আমার বাড়ী।"

"মশায়কে দেখেছি দেখেছি বোধহচ্চে, বসুন।"

"দেখ্‌বেন তার আর আশ্চর্য্য কি—আপনি মহৎপুরে প্রায়ই হাওয়া খেতে যেতেন আমি অতি সামান্য লোক কখনও চোখে পড়েছি বোধহয়।" নরেন্দ্র একটু চঞ্চল ভাবে নড়িয়া বসিল। বলিল "মশায়ের কি প্রয়োজন?

"প্রয়োজন আছে একটু নির্জ্জনে বলতে চাই।"

"এ ত নির্জ্জন স্থানই। কি বল্‌তে চান্‌ বল্‌তে পারেন।"

বিশ্বেশ্বর ভূমিকা মাত্র না করিয়া

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিল "আপনার নোট! গুনে নেন্, হাজার টাকাই আছে"।

নরেন্দ্র স্তম্ভিত ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, বিশ্বেশ্বরও নীরবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে নরেন্দ্র বলিল যদি কিছু মনে না করেন, ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"করুন"।

"আপনি এ নোট কোথায় পেলেন?"

"যাকে দিয়েছিলেন তিনিই আমায় দিয়েছিলেন—তিনি আমার মাতৃস্বরূপা"।

"তিনি? আপনাকে দিয়েছেন! মশায় শুনেছি তিনি নাকি মারা গেছেন?"

"মারা যাওয়া ঠিক নয়, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই রকমই শুনেছি—তা সে আত্মহত্যার কারণ কিছু জানেন?"

"জানি বই কি! এই যে আপনার হাতের নোটগুলি! এই গুলিই তাঁর মৃত্যুর কারণ। এই গুলি তাঁকে নিতে হয়েছিল বলেই মরে আপনার হাত এড়িয়েছেন।"

"মশায় তবে অনেক কথা জানেন দেখছি; তবে আর লুকোছাপা কর্‌ছি না। কিন্তু আমার প্রতি আপনি অন্যায় দোষারোপ কচ্চেন। তিনি নোট না নিলে কি আমার জোর চল্‌ত? আমিত-আমিত—জোর করিনি, স্বইচ্ছায়—

"চুপ্ কর্ চুপ্ কর পাপিষ্ঠ! বল্‌তে তোর জিভ কাঁপ্‌ছেনা? কে পুনঃ পুনঃ তাকে প্রলোভিত কর্‌তে যেত? তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে? ঘৃণ্য স্ত্রীলোক নিয়ে দিন কাটাও—বলে কি মা বোন স্ত্রীর মুখও দেখনি? বোঝনি ভদ্রকুলের স্ত্রী কি এ পৈশাচিক কাজে সম্মত হতে পারে? যেহয় সে বড় কষ্টেই হয়। সে মাভাইবোনদের রক্ষা কর্‌বার জন্যই পাপিষ্ঠ তোমারও অর্থ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কুলটা হতে তার জন্ম নয়। সে স্বর্গে চলে গিয়েছে। এই লও তোমার সে অর্থ, যে অর্থে লোকে দুঃখীর দুঃখ মোচন করে, আর্ত্তের প্রাণদান দেয়, সেই অর্থ তোমার হাতে পড়ে একটা সাধ্বী দুঃখিনী বালিকার প্রাণ অকালে নষ্ট করে গেল। তোমার ধন, তোমার প্রবৃত্তিকে ধন্য! কিন্তু মনে জেনে রেখ' কুপ্রবৃত্তির বশে একটী নারী হত্যার পাপে পাপী হয়েছ! এ জীবনে আর কখনও শান্তি পাবে না। চিরদিন তার নষ্ট আত্মা তোমার পেছনে ফির্‌বে। তোমায় অধঃপাতিত করে নরকের পথে নিয়ে যাবে! তুমি মানুষ খুণ করেছ তোমার পেছনে আত্মহত্যার প্রেতাত্মা ঘুর্‌ছে।"

নরেন্দ্র স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। সর্ব্বাঙ্গে তাহার ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল। ভীরু পাপী সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল "আমার এমন দোষ কি পেলেন? আমায় কি করতে বলেন? এ কাণ্ড হবে আমি ত' আগে জানিনি। জান্‌লে কি এমন করি?"

"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যদি ভদ্রলোকের মেয়ের স্বভাব না বোঝ তবেত তুমি পশু। যে মাভাইকে মুক্ত কর্‌বার জন্য নিজের প্রাণ এমন ভাবে নষ্ট কর্‌লে, মনে কর দেখি সে কত উচ্চপ্রাণ! নরেন্দ্র! তোমার কি এ জন্মে উদ্ধার হবার আশা আছে?

কুপ্রবৃত্তিতে তুমি সাধ্বীর প্রাণ নষ্ট করেছ! কি পাপিষ্ঠ তুমি।"

নরেন্দ্র নীরবে রহিল। এ কয়দিন সে প্রতারিত হইয়া পরে সতীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া নীরবে কিছু কিছু অনুতাপ ভোগ করিতেছিল। অনুতাপের মাত্রা এইবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর আবার বলিল,

"শুনেছি হরি তোমার আশ্রয়ে বাবুগিরি করে বেড়ায়। তাকে ডাকাও দেখি"।

কলের পুত্তলির মত নরেন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করিল। বাটীর দুর্ঘটনা সেও গুজবে শুনিয়াছিল, ভীত বিষণ্নমুখে সে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বেশ্বর তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে বলিল "এটা বুঝি তোমার অভিনয়ের নায়িকা সাজে? এটাকে তোমার ত্যাগ করতে হবে? এর মা বোন এখনো এর জন্যে চখের জল ফেল্‌ছে, সেই চখের জলে আরও তোমাকে পুড়িয়ে মারবে। এটাকে তোমার বাড়ী থেকে দূর করতে হবে"।

"নিয়ে যান্‌ নিয়ে যান্‌, আমি আর থিয়েটার রাখ্‌ছিনে। ঐ থিয়েটারই আমার দশা এমন করেছে, নইলে মশায় আমি লোক মন্দ ছিলাম না।"

"তা আমি জানি। তোমার স্ত্রী কমলা, সতী এরা আমার—বোনের মত ছিল, সকলের কাছে শুনি তোমার ব্যবহারে তোমার সাধ্বী পতিপ্রাণা স্ত্রী মৃতপ্রায়,—সেও কোন দিন আত্মহত্যা করে তোমার পাপের নৌকা' ভুনো বোঝাই করে দেবে। তোমার ভরাডুবির আর দেরী নেই।"

নরেন্দ্র অধোবদনে রহিল। বিশ্বেশ্বর হরির পানে চাহিয়া বলিল "আমার সঙ্গে তোমায় বাড়ী যেতে হবে।" হরি একবার দীন নয়নে নরেন্দ্রের পানে চাহিল, করুণ বচনে বলিল "নরেন বাবু আমায় আপনি"—

নরেন্দ্র বাধা দিয়া সবেগে বলিল "যাও যাও তোমরাইত আমার মাথা আরও খেয়েছ; যা করেছ খু। করেছ,—আমি আর থিয়েটার রাখ্‌ছিনা — আমার বাড়ী থেকে চলে যাও বল্‌ছি"।

অপমানে হরির মুখ লোহিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর উঠিয়া বলিল, নগেনবাবু আমি চলিলাম। বেশী আর কি বল্‌বো; যে সতীকে তুমি নাশ করেছ, সেই সতী কমলার অভিন্ন-হৃদয় ছিল, যদি তার কাছে ক্ষমা পেতে চাও তবে কমলাকে সুখী করো।"

"বিশ্বেশ্বর পথে আসিয়া হরিকে বলিল, কোথায় যাচ্ছ হরি?"

"কোথায় যাব? বড়লোকের আশ্রয়ে আর নয়—ওঁর থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধিতে আমি এত করলাম, আর উনি কিনা আজ আমায় অপমান করলেন। একবার বাড়ী গিয়ে মাকে দেখে, অন্য কোথা'ও যাব।"

"অন্য কোথাও যেতে হবে না। মাকে সুখী করে গ্রামেই মানুষের মত থাকতে পারবে। মোসাহেবি ছেড়ে দিয়ে ভদ্র-লোকের মতনই কাজকর্ম্ম করলে অনেক সাধারণ লোকেরও সাহায্য পাবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

(ঘ) শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার বিচার।

যদিও শঙ্করাচার্য্য বিচারে অনেক স্থলে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, কোন কোন বিষয়ের আলোচনায় তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। যে সকল স্থলে নির্ম্মুক্তভাবে বিচার করিলে আবহমান কালের বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেই সকল স্থলে প্রায়ই তিনি প্রচলিত সংস্কারের পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রুতিমূলক। সমাজের প্রচলিত সংস্কার এই যে, স্ত্রী-শূদ্রাদি বেদ-পাঠে অনধিকারী। এখন প্রশ্ন এই, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার আছে কি নাই? ব্রহ্মজ্ঞানে স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনীগণই জলন্ত নিদর্শন। এজন্তই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। তিনি শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া দেশের প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করিয়া শূদ্রের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি প্রথমে প্রতিপক্ষের যুক্তির উল্লেখ করিতেছেন :—"শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকার আছে স্বীকার করা যাউক, কারণ অর্থিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা, এবং সামর্থ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপযোগী মেধা-শক্তি শূদ্রেরও থাকা সম্ভবপর। যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রের কোন অধিকার নাই, এরূপ কোন নিষেধ শ্রুতি নাই"। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক শূদ্র ঋষি কবষ ঐলুষকে যজ্ঞে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞেও শূদ্রের অধিকার নাই বলা যায় না। বল প্রয়োগেই কবষকে অধিকার চ্যুত করা হইয়াছিল। শুধু তাহা নয় ঋগ্বেদ সংহিতাতে দেখা যায় যে, দশম মণ্ডলের ৩০, হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত পাঁচটী সূক্তেরই স্রষ্টা বা ঋষি এই কবষ। এই কারণেও এই শূদ্র ঋষি কবষের প্রতি ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতির মনে কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব থাকাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যাহা হউক, শঙ্কর বলিতেছেন :—"অনগ্নিত্বই শূদ্রের কর্ম্মে অনধিকারের কারণ। ব্রহ্ম-বিদ্যা-লাভ সম্বন্ধে অনগ্নিত্ব অনধিকারের কারণ হইতে পারে না। আহবনীয়াদি অগ্নিস্থাপন করে না বলিয়া কেহ ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অসমর্থ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভে শূদ্রের অধিকারের সমর্থনকারী নিদর্শন সকলও বর্ত্তমান। সম্বর্গ-বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-শ্রবণার্থী রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিদুর প্রভৃতি শূদ্র-যোনিজাত হইলেও স্মৃতিতে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান লাভের উল্লেখ আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রেরও অধিকার আছে। এরূপ মীমাংসার বিরুদ্ধে আমরা বলিতেছি :—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ তাহার পক্ষে, বেদাধ্যয়নের অভাব।" প্রতিপক্ষের মত ও

যুক্তি অতি বিশদরূপে প্রকাশ করাই শঙ্করের বিচারের প্রধান গৌরব। প্রতিপক্ষের উক্তি বলিয়া শঙ্কর যে অকাট্য যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে শঙ্করেরও তাহাই মত। তাহা হইলেই আমরা তাঁহার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করিতাম। তাহা নয় শঙ্করের মত শূদ্রের প্রতিকূল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অভাব কেন? শঙ্কর তদুত্তরে বলিতেছেন:—"উপনয়ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, এবং উপনয়ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই জন্য।" শঙ্করের কথার সারমর্ম্ম এই:—উপনয়ন ভিন্ন বেদপাঠ হয় না, বেদপাঠ ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। শূদ্রের উপনয়নের ব্যবস্থা নাই। যদি প্রশ্ন কর:—শূদ্রের উপনয়ন নাই কেন? তাহার উত্তর:—যেহেতু সে শূদ্র। হেতুর নামে এরূপ চক্রক হেত্বাভাসের (arguing in a circle) সদুত্তর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াই প্রদান করিয়াছেন। শূদ্রের উপনয়ন শ্রুতি-নিষিদ্ধ, শঙ্কর এরূপও বলিতেছেন না। উপনয়ন লোকের কার্য্য। শূদ্রের উপনয়ন করিলেই ত শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার বলিবার আর কোন ভিত্তি থাকে না। শ্রুতিতে জাবালের উপনয়ন সম্বন্ধে গৌতম যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই প্রণালী মতে, যে কেহ সত্যবাদী সেই ব্রাহ্মণ, এবং তাহারই উপনয়ন হইতে পারে। জাবাল সত্যকামের গোত্র, এমন কি তাহার পিতার নামও অপরিজ্ঞাত ছিল, কারণ তাহার মাতা যৌবনকালে বহুচারিণী দাসী ছিলেন। তখনই সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণার্থে হারিদ্রুম গৌতমের নিকটে উপস্থিত হইলে পর, গৌতম তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম বলিল:—"আমি কোন্ গোত্র জানি না। আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি বলিয়াছেন যে যৌবনকালে তিনি বহুচারিণী পরিচারিকা ছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়। আমার গোত্র তিনিও জানেন না। তাঁহার নাম জবালা, আমার নাম জাবাল।" ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণার্থ উপনয়নের অধিকার বিচার সম্বন্ধে গৌতম এইমাত্রই যথেষ্ট মনে করিয়া, সত্যকামের সত্য-পরায়ণতা দৃষ্টেই তাহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইহাতে কি মনেহয় না যে চরিত্র দৃষ্টে উপনয়নের অধিকার অনধিকার স্থির করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, জন্মদৃষ্টে নয়! বিনা উপনয়নে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান না করাও নিষিদ্ধ শ্রুতির অভিপ্রায় নয়। বরং ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখিতেছি (৫ম প্রপাঠক—৫ম অধ্যায়):—উপমন্যব প্রভৃতি ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য উদ্দালক আরুণির নিকট গমন করেন। পরে তথা হইতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে যাইয়া বৈশ্বানর ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হন, এবং সমিৎ-হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পর, রাজা তাঁহাদের উপনয়ন না করিয়াই ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন—"তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ"। স্ত্রীলোকেরও উপনয়নে অধিকার নাই—শূদ্রেরই তুল্য। তথাপি গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী। "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ" "দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ" —"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" ইত্যাদি অসংখ্য স্মৃতিবচন শূদ্রের অনুকূলে

রহিয়াছে। তাহা জানিয়াও শঙ্কর "শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের" অভাব হেতু শূদ্রকে ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী স্থির করিতেছেন।

শঙ্কর নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রের অনধিকার, এরূপ নিষেধ শ্রুতি নাই," তথাপি তিনি বলিতেছেন:—"সামর্থ্য না থাকিলে শুধু অর্থিত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা, অধিকারের কারণ হয় না। কেবল 'লৌকিক সামর্থ্য' ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারের কারণ হয় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য' থাকা আবশ্যক। যখন শূদ্রের জন্য বেদাধ্যয়ন নিরাকৃত হইয়াছে সেই সঙ্গেই 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য'ও নিরাকৃত হইয়াছে। যে ন্যায়ের বলে শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী, সেই ন্যায়ের বলেই তাহার ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকার প্রমাণিত হয়, কারণ সেই ন্যায় উভয়তঃই সাধারণ। স্বর্গীয় রমেশদত্ত কিম্বা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র শীলের মত লোকের বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণের সামর্থ্য নাই, একথা বলা বাহুলতা। তবে বলিতে হয়, এ সামর্থ্য 'লৌকিক। শাস্ত্রীয় সামর্থ্য" নয়। রৈক্ব প্রযুক্ত "হা রে ত্বা শূদ্র" এই বাক্যে জানশ্রুতি যে সত্য সত্যই শূদ্র ছিলেন, ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্য কিছু ছিলেন না, এইরূপ কোন লিঙ্গ বা ব্যাবর্ত্তক গুণের উল্লেখ নাই। শঙ্করের এ আপত্তি অমূলক। 'শূদ্র' নামে সম্বোধনই তাহার শূদ্রত্বের লিঙ্গ। গুহ যেমন চণ্ডাল রাজা ছিলেন, জানশ্রুতিও সেইরূপ একজন শূদ্র রাজা ছিলেন—এরূপ অনুমানই যুক্তি-যুক্ত। আবার শঙ্কর বলিতেছেন:—"জানশ্রুতির শূদ্রত্ব স্বীকার করিলেও একমাত্র সম্বর্গ (জগতের লয় বিষয়ক) ব্রহ্মবিদ্যাতেই শূদ্রের অধিকার, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় নয়।" আধখানা নৌকা, আধখানা কুমীর কখনও হয় না। শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্করের মতন শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর এইরূপ শিরঃপীড়া অতিশয় বিস্ময়কর। 'সম্বর্গ বিদ্যায় শূদ্র রাজা জানশ্রুতির অধিকার দৃষ্টে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যায় সমগ্র শূদ্র জাতির অধিকার অনুমান করাই সঙ্গত। শঙ্কর আবার বলিতেছেন:—"শূদ্র শব্দ এস্থলে অর্থবাদ বা নিন্দাবাক্য মাত্র, এতদ্দ্বারা কোন ব্রহ্মবিদ্যাতেই শূদ্রের অধিকার প্রমাণিত হয় না।" নিন্দার্থে দ্বিজাতির প্রতি শূদ্র শব্দের প্রয়োগ, অথবা প্রশংসার্থে শূদ্রের প্রতি দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ, শ্রুতিতে অন্য কোথাও আছে, শঙ্করও এরূপ বলেন না। অতএব জানশ্রুতির প্রতি প্রযুক্ত শূদ্র শব্দকে অর্থবাদ মাত্র মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শঙ্কর কোন মতেই নিরস্ত হইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন:-"এ স্থলে শূদ্র শব্দের অন্য অর্থও করা যায়। হংস-বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি শোক-যুক্ত মনে রৈক্বের নিকট গমন করিয়াছিলেন (শুক্+দ্রু), এজন্যই পরোক্ষজ্ঞ রৈক্ব তাঁহাকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা জাতিতে শূদ্র তাহাদেরই অনধিকার।" রৈক্ব যে পরোক্ষজ্ঞ ছিলেন, অথবা জানশ্রুতি যে জাতিতে শূদ্র ছিলেন না শঙ্কর তাহার কোন প্রমাণ দিতে চান না। এরূপ স্থলে দীর্ঘ উকারান্ত শূদ্র শব্দের সহজ রূঢ় অর্থ শূদ্র-জাতিত্ব, গ্রহণ না করিয়া ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া হ্রস্ব উকারান্ত শুক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া, তাহার অন্যরূপ অর্থকরা শঙ্করের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত, শুধু অসঙ্গত

তাহা নয়, নিতান্তই অনুদারতার পরিচায়ক। অপরদিকে ছান্দোগ্য-উপনিষদে রৈকের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাকেও শূদ্রভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। তিনি 'সযুগ্বান্' বা শকটবান্ ছিলেন; তাঁহার শকটের নিম্নে তিনি বসিয়াছিলেন—"অধস্তাচ্ছকটস্য!" তিনি শূদ্র ছিলেন বলিয়াই বোধহয়, বিনা বাক্যব্যয়ে শূদ্র রাজা জানশ্রুতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন:—"ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ে উপনয়নাদি সংস্কারের উল্লেখ আছে।" উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু উপনয়নের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত-নৈমিত্তিক কোন সম্বন্ধ আছে, শঙ্করও তাহা বলেন না। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে ঔপমন্যব প্রভৃতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে শ্রুতিতে উপনয়ন ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে শ্রুতি-বচন দ্বারা শূদ্রের বেদে বা ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়া শঙ্কর মন্বাদি স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর বলিতেছেন:—"স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে শূদ্র চতুর্থবর্ণ, একজাতি, এবং সংস্কারের অযোগ্য। তাহার পক্ষে বেদশ্রবণ নিষিদ্ধ, শ্রবণ করিলে সীসা বা লাক্ষা দ্বারা তাহার কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। শূদ্র চলন্ত শ্মশানস্বরূপ, তাহার নিকট শ্রুতি পাঠ করিবে না। যাহার নিকটে বেদ-পাঠই নিষিদ্ধ সে কিরূপে বেদ পাঠ করিবে? শূদ্রকে জ্ঞান দান করিবে না, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা দ্বিজাতির জন্যই অধ্যয়ন, ইজ্যা এবং দানাদি কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।" ইহা সাতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, যিনি স্বীয় জীবনে চণ্ডাল বা পুক্কসকেও গুরুমান্য দান করিতে প্রস্তুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাদী শঙ্করও এই সকল জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ একদেশদর্শী শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচন প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। তপস্যা করিবার অপরাধে রাম কর্তৃক নিহত রামায়ণোক্ত শম্বুকনামা শূদ্রের বধও কি তিনি শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারের প্রমাণরূপে গণ্য করিতে প্রস্তুত? শঙ্কর নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি প্রমাণ, আদরের অযোগ্য।" শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বহুচারিণী দাসী জবালার অজ্ঞাত গোত্র পুত্র সত্যকাম অথবা শূদ্র রাজা জানশ্রুতি, অথবা ঐলুষ কবষ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে যে উপনয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকিলেও, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনীগণ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারিণী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রুতি-প্রমাণের সহিত বিরোধ হেতু, ব্রহ্মবিদ্যার শূদ্রের অনধিকার-সূচক স্মৃতি বচন সকল শঙ্করের নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই দুর্ব্বল এবং আদরের অযোগ্য। কিন্তু শঙ্কর যেন প্রচলিত সংস্কারের উপরে আঘাত করিবার ভয়ে ভীত হইয়াই এ স্থলে শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচন অগ্রাহ্য করেন নাই। বরং তিনি মহাভারতোক্ত শূদ্র-প্রবর ব্রহ্মজ্ঞানী বিদুর এবং ধর্ম্মব্যাধ যিনি গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-কুমারকেও ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন অথবা ধীবরী-পুত্র ব্যাস, এবং দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এক অপূর্ব্ব প্রমাণ-

শূদ্র কারণ কল্পনা করিতেছেন :—"বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি যাহাদের পূর্ব্বকৃত সংস্কার হেতু জ্ঞানোদয় হয়, তাহাদের জ্ঞানের ফল-প্রাপ্তি বারণ করা যায় না, কারণ জ্ঞানের ফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী।" প্রচলিত সংস্কারের দাসত্ব কি শঙ্করের মনে এতই প্রবল ছিল যে বিদুরাদি শূদ্র মহাপুরুষগণের স্বার্জ্জিত জ্ঞান ফল-লাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইতেও তিনি অসম্মত নহেন। যাহার অন্তরে শূদ্র-বিদ্বেষ এতদূর প্রবল, তাহার পক্ষে শূদ্রের অধিকার বিচারভার গ্রহণ করা কখনও নিরাপদ হইতে পারে না। যে বিদ্বেষ শূদ্রের মোক্ষপথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাহা আমেরিকাবাসী গোরাদের কালাবিদ্বেষ অপেক্ষাও ঘৃণ্য। পূর্ব্বকৃত সংস্কার কাহার আছে, কাহার নাই, কে বলিবে? তাহা জানিবার যদি কাহারও অকপট আগ্রহ থাকে, তবে শূদ্রজাতির জন্য বেদ-পাঠের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া, ফল দৃষ্টে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, কাহার পূর্ব্ব সংস্কার আছে, এবং কাহার নাই। পূর্ব্বকৃত সংস্কার সম্বন্ধে সকল জাতিই সমান। দ্বিজাতিরও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্ব সংস্করণ জনিত নয়, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সে যাহা হউক, উল্লিখিত একদেশদর্শী যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—"অতএব বেদ-পাঠ-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রের অধিকার নাই।" ব্রহ্মসূত্র অ-১। পা-৩। সূ-৩৪, ৩৮॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

কবীর।

উত্তর ও মধ্য-ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভিতর অন্যান্য হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারকগণের মধ্যে কবীরই অধিকতর পরিচিত ও সমাদৃত। সুপ্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব কবীরকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতীয় লুথার নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কবীরকে যাঁহারা ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করেন তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চনদ প্রদেশের শিখ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা মহাবীর নানক এবং আহ্মেদাবাদের "দাদু-পন্থ"—প্রচলকর্ত্তা দাদুই প্রধান। শিখদিগের ধর্ম্মপুস্তক "আদিগ্রন্থ" হইতে কবীরের জীবন ও ধর্ম্মদীক্ষার সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। মহাবীর নানকের কবীরের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হেতু তিনি তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও ধর্ম্ম মতাদি সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন।

কবীরের ধর্ম্মমতাবলম্বীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইংরাজী ১৯০১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবে কবীরপন্থির সংখ্যা ৮.৪৩১১৭ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক। কারণ প্রথমতঃ যুক্ত প্রদেশের কবীরপন্থিগণকে রামানন্দী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চনদ প্রদেশের কবীরপন্থীদিগকে ধরা হয় নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ সমস্ত স্তোত্রাকারে নিবদ্ধ। সেইগুলি এত সরল সুমিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য যে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের নিকট

কবীর।

তাহা সমভাবে আদৃত হইয়া থাকে। কবীরের জন্মসম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত তাঁহার কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। যেটুকু জানা যায়, তাহা এত আশ্চর্য্য ও অলৌকিক যে তাহা বিশ্বাস যোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বত্রই মহাপুরুষদিগের জন্মবৃত্তান্তের সহিত যেমন কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত থাকে এস্থানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কবীরেরও জন্মবৃত্তান্ত অতি রহস্যময়। যাহা হউক অনুমান তিনি ১৪২১ খৃঃ অব্দে* জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৭ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে নশ্বর দেহ ত্যাগ। বেভারেণ্ড জি, এইচ, ওয়েষ্টকোট, এম্ এ, "কবীর ও কবীর পন্থা" গ্রন্থে কবীরের জন্ম ১৪৪০ খৃঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবীর হিন্দু কি মুসলমান তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এসম্বন্ধে তিনিই তাঁহার নিজের স্তোত্র গ্রন্থে দুই তিন স্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এইটুক স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি মুসলমান তন্তুবায় নিরুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও অন্তরে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। স্তোত্র গ্রন্থের এক স্থানে, তিনি বলিয়াছেন আমি তাঁত বুনা একবারে ত্যাগ করিয়া হরিগুণ গান গাহিয়া জীবন অতিবাহিত করিব। আবার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন পূর্ব্ব জন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, বোধ হয় রামের পূজায় অবহেলা করিয়া ছিলাম বলিয়া এজন্মে জোলার গৃহে জন্ম লইতে হইয়াছে।

কবীরের জন্মরহস্য যেমন আশ্চর্য্য তাঁহার নামকরণ রহস্যও তদ্রূপ। নিরু এই শিশু পুত্রের নামকরণের জন্য একটী কাজীর নিকট গমন করেন। কাজী সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শিশুর নাম কবীর হওয়া উচিত। কিন্তু কবীর এই শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'আকবর,' 'কুবরা,' প্রভৃতি শব্দও সেই ধাতু হইতে সাধিত। নিরুর ন্যায় নীচ ব্যক্তির পুত্রের ঐ উচ্চ ও পবিত্র নামকরণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। তখন অন্যান্য কয়েকজন কাজীকে এই পুত্রের নাম করণের জন্য অনুরোধ করা হইলে তাঁহারাও সকলে পূর্ব্বোক্ত কাজীর ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া নিরুকে বলিলেন—"তুমি যে কোন উপায়ে এই শিশুর প্রাণ সংহার কর নচেৎ দেশে ঘোর বিপদ আশঙ্কা।" তাঁহাদের উপদেশ মতে নিরু শিশুর জীবন সংহার মানসে তাহাকে গৃহের প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। এমন সময় সেই শিশু কথা কহিয়া বলিল "মায়া সমস্ত জগৎকে ঢাকিয়া আছে, সেই জন্য কেহ আমায় চিনিতে পারিতেছে, না। আমি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি মহাপুরুষের অংশ মাত্র আমায় কেহ ধ্বংস করিতে পারিবে না।"

ইহাতে বিস্মিত হইয়া নিরু তাহার প্রাণ সংহারের কোন চেষ্টা না করিয়া, সেই শিশুকে কবীর নামেই অভিহিত করিলেন। শৈশব-কাল হইতে কবীর ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা সহ্য করিতে

* কবীরের জন্ম সম্বন্ধে একটা প্রবাদ:—

রামানন্দ নামক কোন মহাপুরুষের যোগ প্রভাবে কবীর তাহার মাতার (ব্রাহ্মণকন্যা) হস্তের তালু হইতে অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার মাতা একটি সহরের মধ্যে পদ্মের উপর তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া যান। দৈবাৎ নিরুর স্ত্রী নীমার চক্ষে পড়াতে নীমা তাহাকে গৃহে লইয়া যায়।

পারিতেন না। বাল্যে তিনি হিন্দু মুসলমান সঙ্গীগণকে তাহাদের গোড়ামীর দরুণ বড়ই উত্যক্ত করিতেন—মুসলমান বালকদের নিকট কেবল "রাম রাম ও "হরি হরি" উচ্চারণ করিতেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করিত। কবীর বলিত যাঁহারা অন্যায় করে তাহারা কাফের। একদিন কবীর তাঁহার ললাটে তিলক শোভিত করিয়া গলায় উপবীত ধারণ করিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ব্রাহ্মণদের সম্মুখ দিয়া যাইতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন "এই আমার ধর্ম্ম, আমার জিহ্বায় বিষ্ণু, চক্ষে নারায়ণ, হৃদয়ে গোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন। আপনারা মৃত্যুর পর আপনাদের কার্য্যের কি হিসাব নিকাশ দিবেন। তন্তুবায়ের পুত্র হইয়া আমি উপবীত ধারণ করিয়াছি বলিয়া আপনাদের গাত্রদাহ হইয়াছে। আপনারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া নাম মাত্র গায়ত্রী জপ ও গীতা পাঠ করেন। আমি মেষ, আপনারা মেষপালক, আমাদের প্রতি হিংসা ভাব পোষণ না করিয়া আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করাই আপনাদের কর্ত্তব্য। আপনারা নশ্বর পার্থিব সুখ ও উন্নতির জন্য সতত লালায়িত, আমি সেই হরিপদ পাইবার জন্য সতত ব্যগ্র।"

কবীরের গুরু নাই বলিয়া লোকে উপহাস করিত। এই জন্য তিনি রামানন্দের শিষ্য হইবেন বলিয়া মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি মুসলমান বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা সফল হওয়া অসম্ভব জানিতেন, সেই জন্য তিনি কৌশলে তাঁহার শিষত্ব গ্রহণ করিলেন। কবীর অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন রামানন্দ কোন নির্দ্দিষ্ট ঘাটে স্নানের জন্য গমন করেন। ইহা শুনিয়া কবীর একদিন প্রাতঃকালে সেই ঘাটের একটী সোপানের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রামানন্দ নির্দ্দিষ্টকালে সোপান অবতরণ করিতে গিয়া সহসা তাহার উপর পদার্পণ করিয়া 'রাম রাম' বলিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কবীর —তখন মনে করিলেন এই মহাপুরুষের মুখে রামনাম যত সহজে উচ্চারিত হয় অন্য কথা তেমন হয় না। সেই হইতে রামনাম মন্ত্রের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবীর সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে, কবীর রামানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া মুসলমান বালক কবীরকে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানন্দ সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে তোমাকে আমি মন্ত্রদান করিয়াছি?" কবীর বলিলেন "গুরু নানারূপে শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া থাকেন, আপনিও আমাকে আমার মাথায় পদস্পর্শ করিয়া রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি সেই দিবসের ঘাটের ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেন। ইহাতে রামানন্দ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন "শত বাধাবিঘ্ন সত্বেও তুমি আমার শিষ্য।"

কবীর গৃহে তাঁতের কর্ম্ম করিতেন এবং যখন কোন সাধু সন্ন্যাসী বা কোন অতিথি আসিতেন তখন তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করি-

তেন। তাঁহার প্রকাশ্য দীক্ষার দিন হইতে নিয়মিতরূপে তিনি গুরুপদ দর্শনে যাইতেন এবং সময় সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রালোচনায় ও তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতেন।

কেহ বলেন লুইয়া নাম্নী স্ত্রীলোককে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কমল নামে এক পুত্র ও কমলী নামে এক কন্যা ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন লুইয়া তাঁহার স্ত্রী নহে তাঁহার শিষ্যা এবং উল্লিখিত বালকবালিকা দুইটি তাঁহাদের সন্তানও নহে। তাহাদিগকে মৃতাবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া লুইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

কবীর জাতিভেদ মানিতেন না। একদা কন্যা কমলী একটী কূপ হইতে জল তুলিতেছিল এমন সময় একটী তৃষিত ব্রাহ্মণ তাহার নিকট জল চাহিলেন এবং তৃষা নিবারণ করিয়া বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলী তন্তুবায়ের কন্যা শুনিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "তুমি আমার জাতি নষ্ট করিয়া দিলে?"

কমলী তাঁহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং ইহার মীমাংসার জন্য তাঁহাকে লইয়া স্বামিজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কবীরকে কমলী স্বামিজী বলিয়া ডাকিত। এই ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিবার বহুকাল পূর্ব্বে কবীর তাঁহার যোগবলে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতকে বলিলেন "জল পান করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা উচিত, অশুচি কি নয়। জলে কি না—মিশিতেছে। আমাদের কার্য্যে ও অন্তরে কত অপবিত্রতা আছে। আপনারা কেবল বাহ্য বস্তু লইয়া ব্যস্ত। প্রথমে নিজ অন্তর শুদ্ধ করুন তাহা হইলে জগৎ শুদ্ধ হইবে।" এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং কমলীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

কবীর হিন্দী সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা। তিনি হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন কিন্তু উহা জনসাধারণের উপযোগী নহে বলিয়া তিনি জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁহার শিক্ষাসমূহ হিন্দী ভাষায় লিখিলেন। কবীর একজন সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্ম বিষয়ের শিক্ষা যদি পদ্যে প্রচার করা হয় তাহা হইলে শীঘ্র সকলের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে।"

দয়া নম্রতা সাম্যজ্ঞান সংস্বভাব তাঁহার শিষ্যদের বিশেষ গুণ। তাঁহার শিষ্যেরা বাহ্যানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। কবীরের শিষ্যগণের মধ্যে আমিষ ভোজন এবং পরিণীতা পত্নীত্যাগ নিষিদ্ধ।

গোরক্ষপুরের অন্তর্গত মাঘরে কবীর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার হিন্দু শিষ্যদের ইচ্ছা ছিল তিনি কাশীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে পুনর্মুক্তি লাভ ঘটে। কবীর তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন "ভগবানের ক্ষমতা কি এতই সীমাবদ্ধ যে কাশী ব্যতীত অন্য স্থানে কেহ দেহত্যাগ করিলে তাহার উদ্ধার হয় না?"

তাঁহার মৃতদেহ সংস্কারের সম্বন্ধে একটী বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুরা তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য এবং

মুসলমানেরা তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে ব্যস্ত।

এইরূপ যখন দুই দলের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলিতেছিল তখন সকলে দেখিল কবীরের বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের স্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উহার অর্দ্ধেক গুলি ফুল লইয়া হিন্দুরা কাশীতে দাহ করিল এবং অপরার্দ্ধ মুসলমানেরা লইয়া মাঘরে সমাধিস্থ করিল!

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

চিন্তামণির বিপদ।

চিন্তামণি সরকার, নামেও সরকার—কাযেও তাই। লোকটা আধা বয়সী শক্ত সমর্থ কাযের লোক। জীবনের ১৬ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিক্টার পিন কোং'র বাড়ী সরকারী করিতেছে। সাহেবেরা তাহাকে বিশ্বাস করেন। তাহার হাতে টাকা আদায়ের ভার থাকিলেও এ পর্য্যন্ত তাহার নামে কেহ কখনও কোনরূপ দোষ দিতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও অর্থ ই অনর্থের মুল এই নীতি বাক্য তাহার জীবনে সে যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় বরানগরের এক মহাজনের বাড়ী হইতে অনেক দিনের প্রাপ্য ২৫০০৲ টাকার মধ্যে প্রায় ২০০০৲ টাকার নোট কোম্পানির তহবিলের জন্য ও রকার বকসীসস্বরূপ নিজ তহবিলের জন্য ১ খানি ১০০ টাকার নোট লইয়া চিন্তামণি দ্রুতপদে আফিসের দিকে ফিরিতেছিল। অনেক টাকা সঙ্গে, সন্ধ্যাও হয় হয়; চিন্তামণির যে একটু ভয় হইতেছিল না এমন নয়। অথচ থোক্ ১০০ টাকার এক কেতা নোট নিজের লভ্য হইয়াছে বলিয়া কতকটা—কতকটাই বা কেন বেশ প্রফুল্ল ভাবেই চলিতেছিল।

চলিতে চলিতে সহসা তাহার মনে হইল যে নিজের ১০০ টাকার নোটখানি সে সঙ্গে লইয়া আসে নাই—কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে। যেমন মনে হওয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্বেষণ। পকেট, বই, ব্যাগ, কাগজ পত্র সব দেখা হইল কৈ নোট ত নাই? বাঃ এত কষ্টের উপায় পাঠে ম'রা গেল। পুনরায় সব পকেট কাগজ পত্র ব্যাগ হাতড়াইল, নোট খানা আফিসের জমা দিবার নোটের সহিত রাখে নাই তো? রাস্তার ধারে বসিয়া আফিসের টাকাগুলা চার পাঁচবার করিয়া গণিয়া দেখিল। অবশেষে নোট প্রাপ্তির আশায় একপ্রকার হতাশ হইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম চিন্তামণি বুকের পকেট হইতে রুমাল খানা টানিয়া বাহির করিতেই নোটখানি রুমালের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। বুকের পকেটে যে নোট ছিল তাহা তাহার বিন্দুমাত্র স্মরণ ছিল না।

সহসা হারানিধি পাইয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। সে একবার নোটখানি খুলিয়া চক্ষুর সমুখে ধরিয়া দেখিতে লাগিল। আগে হইতেই মেঘ করিয়া অল্প অল্প বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল—ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়া চিন্তামণির হাত

হইতে নোটখানি উড়াইয়া লইয়া গেল। নোটখানি হাওয়ার জোরে প্রথমে খুব খানিকটা উঁচুতে উঠিয়া ধীরে ধীরে একটা চাবিবন্ধ বাড়ীর কার্ণিষে গিয়া পড়িল। চিন্তামণি ভাবিল এখনি সেখানা উড়িয়া মাটিতে পড়িবে। কিন্তু তখনি বাতাসের জোর বন্ধ হইয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও চিন্তামণি দেখিল নোটখানা উড়িয়া পড়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। দুএকটা ঢিল ছুড়িয়া মারিল, নোটের উপর লাগিল না। চিন্তামণি দেখিল মহাবিপদ। কার্ণিষের উপর নোট রহিয়াছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে অথচ উড়িয়া পড়ে না। এখানে মই বা আকুশীও নাই যে নোটখানি উদ্ধার করিবে। চিন্তামণি উৎকণ্ঠিতচিত্তে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল রাস্তায় লোক জন বড় বেশী নাই। সে দৌড়িয়া বাড়ীর পাশের বাগানে ঢুকিয়া এক-খানা মইয়ের সন্ধান করিতে লাগিল। তখনও তত অন্ধকার হয় নাই। চিন্তামণি দেখিল একখানি অর্দ্ধ ভগ্ন মই প্রাচীরের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে তাহার উপর একটা লতাগাছ উঠিয়াছে। মইটা কোন রকমে টানিয়া হিঁচড়াইয়া অনেক কষ্টে বাহিরে লইয়া আসিল। লতা গাছটা ছিঁড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু ততক্ষণ অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিতেছিল, সেই অল্প আলোকে কার্ণিষে নোটখানি আর ভাল দেখা যায় না। তাড়া-তাড়ি মইখানা কার্ণিষে লাগাইয়া চিন্তামণি উঠিতে আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়িতে মই খানার দুটা পা যথাস্থানে পড়িল না, উৎকণ্ঠিত চিন্তামণির সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। যেখানে নোট খানা ছিল তাহার ঠিক সম্মুখেই একটা জানালা, তাহাতে খড়খড়ি নাই কেবল সার্শি আঁটা। মইখানা কার্ণিষের চেয়ে অনেক বড়, ঠিক করিয়া বসানোও হয় নাই, তাই মইখানা বক্রভাবে সার্শির গায়ে লাগিয়াছিল। চিন্তামণি তাহা দেখে নাই। পাঁচ সাত ধাপ উঠিতেই চিন্তামণি ও মইয়ের ভারে সার্শির কাচ সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। চিন্তামণিও আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া উপর হইতে পড়িয়া গেল। সার্শির ভাঙ্গা কাঁচে গাত্রের দু একস্থান কাটিয়া রক্তপাত হইল। চিন্তামণি অতিকষ্টে উঠিয়া মইখান ঠিক করিয়া বসাইল। বসাইয়া সবে মাত্র দুই চারি ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় দেখিল তাহার সেই নোটখানি সহসা ঈষৎ বায়ু সংযোগে ভাঙ্গা সার্শি খানার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর গিয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ, নোটখানি আর দেখাও যায় না। চিন্তামণির ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়ে নাই। চিন্তামণি সাহসে বুক বাঁধিয়া একবার এধার ওধার চাহিয়া দেখিয়া কার্ণিষে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর অতি কষ্টে সেই ভাঙ্গা সার্শির ভিতর দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। বিপদ বিপদেরই অনুসরণ করে, অন্ধকারে অসতর্ক অবস্থায় কাচে তাহার হাতের একস্থান অত্যন্ত গভীর ভাবে কাটিয়া রক্তধারা ঝরিতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তখন মনোযোগ দিবার সময় নাই। অন্ধকারটা চোখে সহিয়া গেলে চিন্তা-মণি দেখিল তাহার নোটখানি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি নোটখানি কুড়া-ইয়া লইয়া রাগে তাহাকে দুই একবার খুব জোরে নাড়া দিয়া দিল। এমন রাগ হইয়াছিল যে ছিঁড়িয়া ফেলিলেও রাগ যায় না, তথাপি

না ছিঁড়িয়াই চিন্তামণি সাবধানে নোটখানা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া সেটাকে বেশ করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। তারপর কাটা হাতের উপর নজর পড়িল তখন সেখানটা দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল ও ঘরের মেজের মধ্যে স্থানে স্থানে যথেষ্ট রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। বস্ত্রাদিও রক্ত রঞ্জিত। চাদর ছিঁড়িয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া চিন্তামণি বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। জানালার নিকট আসিয়া চিন্তামণির সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। চিন্তামণি দেখিল একজন পাহারাওয়ালা ও দুইজন ভদ্রলোক মইখানার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। ভদ্রলোকেরা বলিতে-ছিলেন "এই দেখ মই! চোরটাকে এই মই দিয়ে আমরা উপরে উঠিতে দেখিয়াছি।" পাহারা-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল "এ বাড়ী কাহার।" বাড়ীর অধিকারীর নাম বলিয়া ভদ্রলোকটী বলিল "এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয় ভাড়াটিয়াদের দুইটী ছেলে এখানে থাকিয়া কলেজে পড়ে। আমি জানিতাম তাহারা দুজনই দেশে গিয়াছে জিনিষ পত্র এখানেই সব আছে। তখন পাহারাওয়ালা ভদ্রলোকদের মধ্যে একজনকে খিড়কীর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া একজনকে লইয়া মই দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল।

চিন্তামণি সব শুনিয়া নিজের বিপদ বুঝিল। তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া সন্তর্পণে বাড়ীর ভিতরের সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। এদিকে পাহারাওয়ালা ও ভদ্র লোকটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। চিন্তামণি শুনিল পাহারাওয়ালা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিতেছে 'এতো শুধু চুরী নয় এযে দেখ্‌চি খুন্। রক্ত দেখ্‌চনা। বাড়ির মধ্যে খুনী আসামী কোথায় লুকিয়ে আছে, সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র নিশ্চয় আছে আমি এখানেই থাকি, আপনি নেমে গিয়ে লোক ডাকুন দুচার জন কনেষ্টবল।" এইরূপ গোলমালে খিড়কীর দরজায় যে ভদ্রলোক পাহারা দিতেছিলেন অন্ধকারে একাকী থাকিতে সাহস না করিয়া তিনিও সরিয়া পড়িলেন। চিন্তামণি সন্তর্পণে খিড়কী দরজা খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া একবারে দে ছুট্। যে ভদ্র লোক দরজায় পাহারা দিতেছিলেন—তিনি রাস্তায় চিন্তা-মণিকে দৌড়িতে দেখিয়া চোর চোর করিয়া সঙ্গে ছুটিলেন; এবং অতি শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া—দুজনে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ভদ্রলোকটির অঙ্গেও রক্ত মাখামাখি হইল। অনেক কষ্টে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চিন্তামণি আবার ছুটিয়া পড়িল; ভদ্র লোকটিও অনুসরণ করিলেন,—রাস্তার লোক ও চোর চোর করিয়া তাহাদের সঙ্গ ধরিল,—অবিলম্বে পুলিস কনষ্টেবল আসিয়া জুটিল—তাহাদের প্রশ্নে—উভয়ে উভয়কে চোর প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস চলিতে লাগিল। তখন উভয়কেই তাহারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। এইরূপে একরাত্রি কারাবাসের পর পরদিন চিন্তামণির বড়সাহেব এই সংবাদ পাইয়া থানায় আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। আর সেই ভদ্রলোকটি কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, সে খবরটি আমরা জানিতে পারি নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাপানের সেনা এবং নৌবিভাগ।

জাপানের অসাধারণ কৃতিত্বে অনেকে উঁহাদের সেনা এবং নৌবিভাগ সম্বন্ধে অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আজ সংক্ষেপে উহার বিবরণ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত বৎসর ব্যাপিয়া জাপানে জায়গীর প্রথা (Feudal system) প্রচলন ছিল। ঐ সময় সৈনিক বিভাগে সামুরাই জাতির একাধিপত্য ছিল। কিন্তু জায়গীর প্রথা উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে প্রত্যেক শ্রেণীর বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই সেনা বিভাগে সমধিকার জন্মিয়াছে। প্রায় এই সময় হইতেই পাশ্চাত্য সৈনিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্শ্যাল ওইয়ামা, জেনারেল কাওয়াকামি এবং জেনারল কাউন্ট কাৎসুরা ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তির সৈনিকপ্রথা অধ্যয়নে বাহির হন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহারা প্রুশিয়া প্রথানুযায়ী সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। এই সময় (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রুশিয়ান আর্ম্মির বিখ্যাত জেনারেল মেকেল জাপানসেনা বিভাগের উপদেষ্টা হইয়া আসিয়াছিলেন। যে সকল জেনারল চীনজাপান এবং রুষজাপান সমরে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই জেনারেল মেকেলের ছাত্র।

সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সেনাবিভাগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা হয়। যথা (১) ওয়ার অফিষ; (২) জেনারল ষ্টাফ; (৩) মিলিটারি এডুকেশন।

প্রাইমারী স্কুল হইতে কলেজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাঠাগারে মিলিটারি ড্রিল, তলোয়ার খেলা, বন্দুক চালনা প্রভৃতি শিক্ষা দিলেও শুধু মিলিটারি শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক রকম স্কুল কলেজ আছে। যাঁহারা সেনাবিভাগে অফিসার হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তাঁহারা প্রথমতঃ মিলিটারি প্রিপারেটরী স্কুলে যোগ দেন। এরূপ স্কুল তোকিও, ছেনদাই, ওসাকা, নাগোইয়া, হিরোশিমা এবং কুমামতো সহরে এক একটি আছে। এই সকল স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্র তোকিও সেণ্ট্রাল মিলিটারী প্রিপারেটারী স্কুলে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন; এখানকার অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তোকিওস্থ অফিসার স্কুলে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। তোকিওস্থ ষ্টাফ কলেজে দক্ষ এবং সুচতুর লেপ্টেনাণ্ট এবং ক্যাপটেনদিগকে ষ্টাফ অফিসারশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

উল্লিখিত স্কুল কলেজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরও অনেক রকম কলেজ আছে।

আর্টিলারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে সবলেপ্টেনাণ্টদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; তৈয়ামা স্কুলে নন্-কমিশণ্ড অফিসারদিগকে নানারূপ কৌশল, বন্দুকচালনা, লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। রাইডিং স্কুল অশ্বারোহী সৈন্যের শিক্ষাস্থল। এতদ্ব্যতীত ফোর্ট আর্টিলারি শুটিং স্কুল, পেমাষ্টার স্কুল, সার্জ্জারি স্কুল, ভেটেরিনারি স্কুল, গানারি স্কুল, মেকানিক্যাল্ ওয়ার্ক স্কুল, এবং ব্যাণ্ড স্কুল প্রভৃতি আছে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর

বয়স্ক সুস্থকায় পুরুষমাত্রকেই যে কোনমুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জাতীয় শক্তিতে যোগ দান করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। আজকাল বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে একুশ বৎসরের প্রারম্ভে প্রত্যেক যুবককে সেনাবিভাগে যোগ দিতে হয়, যাহারা সৈনিকবিভাগে চাকুরি করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে তাহারা আইনানুমোদিত অনিবার্য্য (compulsory) দুই বৎসর কাল কায করার পরও ঐ বিভাগেই রহিয়া যায়। অন্যান্য সকলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে যে কোন মুহূর্ত্তে রাজসরকার তাহাদিগকে ডাকিয়া লয়। সৈনিকবিভাগে ১৭ বৎসর ৪ মাসে কার্য্যকাল পূর্ণ হয়—উহার তিন বছর য়্যাকৃটিভ্ সার্ব্বিস, চারি বছর চারি মাস রিজার্ভ সার্ব্বিস, এবং অবশিষ্ট দশ বছর ডিপো-সার্ব্বিস।

৬০ বৎসর বয়সের উপর যে পিতার বয়স এবং যিনি জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম তাঁহার একমাত্র পুত্রকে উপরোক্ত আইনের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পাঠ্যাবস্থায় যুবকদিগকে পাঠ সমাপ্তির জন্য অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের কেহই ২৪ বৎসর বয়স না হইলে সৈনিক হইতে পারে না, কাজেই গ্রাজুয়েটগণকে প্রায়ই ভলান্টিয়ার অর্থাৎ সেচ্ছাসেবী হইয়া ২৫ বৎসর বয়সে সেনাবিভাগে কায করিতে হয়। মধ্য-স্কুলের পাঠ সমাপ্তির পর ভলেণ্টিয়ার হইবার অধিকার [illegible] হওয়া যায়—এক বৎসর ভলেণ্টিয়ার হইয়া কাজ করিলে সব্‌লেফটেনাণ্ট লিষ্টে রিজার্ভ শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। ভলান্টিয়ারদিগকে আর পূর্ব্বোল্লিখিত ১৭ বৎসর ৪ মাস কাল বাধ্য হইয়া সেনাবিভাগে খাটিতে হয় না। তবে গবর্ণমেণ্টের হুকুম মাত্র আবশ্যকীয় কাযে যোগ দিতে হয়। গত যুদ্ধে আমাদের কলেজের ৪৭ জন ছাত্র মাঞ্চুরিয়া ক্ষেত্রে রুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। উহার ১৯ জনকে দেশের কাযে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। উহারা বলিয়া কেন সাধারণ সৈন্যগুলিও অর্থলোভে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হয় না। সৈনিকবিভাগের কাযকেই উহারা সব চেয়ে সম্মানের বলিয়া মনে করে। যেহেতু ঐ বিভাগে থাকিলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারা যায়। আজকাল শিক্ষিত নব্য মেয়েদেরও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দক্ষ সৈনিক পুরুষকে বিবাহ করা। সাধারণ সৈন্যগণ কেল্লা বা ব্যারাকে খোরাকী পায় এবং সিগারেট অন্যান্য পকেট খরচ বাবদ এক আনা মাত্র মাহিয়ানা পাইয়া থাকে, অনেককেই বাড়ী হইতে প্রতি মাসে কিছু কিছু পকেট-খরচ আনিতে হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম মিলিটারি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট ঐ কাউন্সিলের পরামর্শে সেনা এবং নৌবিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত ছয় জন প্রথম কাউন্সিলর নিযুক্ত হয়েন—মার্শ্যাল ইয়ানাগাতা প্রিন্স কোনাৎস্ মার্শেল ওইয়ামা, য়্যাড্‌মিরাল মার্কুইশ সাইগোঁ, জেনারল কাউণ্ট নুজু, এবং য়্যাড্‌মিরাল ভাইকাউণ্ট ইতো।

সুপ্রীম কাউন্সিল অব ওয়ার নামক যুদ্ধের জন্য আর একটি কাউন্সিল আছে। উপরোক্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছাড়া, যুদ্ধের

মনিষ্টারগণ, জেনারেল এবং ন্যাভাল ষ্টাফের প্রধান অফিষারগণ ইহার মেম্বর হইবার অধিকারী। বর্ত্তমানে যে সমস্ত নায়কগণ এই কাউন্সিলের মেম্বর তাঁহারা অনেকেই শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট অনেকটা সুপরিচিত।

সম্প্রতি জাপানে সৈনিকবিভাগে ১৮ জন জেনারেল আছেন। যুদ্ধের কতিপয় মাস পরই সুবিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ, এবং মাঞ্চুরিয়া ক্ষেত্রের প্রধান সেনানায়ক ফিল্ড মার্শ্যাল প্রিন্স্ ওইয়ামার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ জেনারল ভাইকাউণ্ট্ কোদামা প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের আপামর সাধারণ সকলকেই যেরূপ ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়াছি এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে অন্য কোন জাতির ভিতর তেমন দেখি নাই।

জাপানের স্থলসৈন্যের ১৬টি প্রধান প্রধান স্থানে হেডকোয়াটার আছে। উহার দুইটি হেডকোয়াটার কোরিয়ায় এবং দুইটি মাঞ্চুরিয়ায়। প্রত্যেক হেডকোয়াটারেই ইন্‌ফ্যান্ট্রি, ক্যাভালরি, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটা-লিয়ন, কমিসরিয়ট ব্যাটালিয়ন প্রভৃতি আছে।

জাপান ক্ষুদ্র দেশ হইলেও শক্তিতে অসাধারণ, সকলেই যোদ্ধা; যুদ্ধের সময় মেয়েগুলি পর্য্যন্ত বলিত "পুরুষগণ নিঃশেষিত হইলে মেয়েদের পালা আরম্ভ হইবে।" প্রত্যেকের যেমন সাহস তেমনি কার্য্যকুশলতা। সৈনিকবিভা-গের কার্য্যে অতি সামান্য বেতন গ্রহণ এবং মহাশক্তির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গুরু ব্যয়ভার বহনে উহাদের আপত্তি নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যে বজেট হয় উহাতে এক বৎসরের জন্য আট কোটী এগার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার তিন শত তেইশ টাকা শুধু স্থল সৈন্য (মিলিটারী) বিভাগের খরচ ধার্য্য হয়। আর ঐ বৎসর নৌবিভাগের (নেভি) জন্য ছয় কোটী একাত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারি শত নয় টাকা [illegible] হয়। ঐ বৎসরে মোট প্রায় পনর কোটি টাকা মিলিটারী এবং নেভি খরচ।

প্রধান সেনাপতি ওইয়ামা।

নেভি সম্বন্ধে ইহাদের ইতিহাস অদ্ভুত। আমাদের বিজয়সেনানী যখন হেলায় লঙ্কা জয় করেন তখন কেন—তাহার অনেক পরেও জাপানীদের রণতরী আদৌ ছিল না। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গেঁন এবং হেই জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দান্নোউরো নামক স্থানের জলযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ঐ সময়েই কোরিয়ার সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে জাপানিদের সহিত কোরিয়ানদের এক জলযুদ্ধ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানী জলদস্যুর জাঙ্ক, নৌকা দক্ষিণ চীনের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। উহার কতিপয় বৎসর পর হইতেই কোরিয়া, চীন, যাবা, ফিলিপ্পাইনস্, শ্যাম এবং ভারতবর্ষের সহিত পরস্পর ব্যবসাবাণিজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তোকুগাওয়া সোগুণের রাজত্বকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য কয়েকখানা রণতরী ক্রীত হয়। ছাৎসুমা এবং তোমাবংশের প্রিন্সগণও এই সময় কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল নেভিতে কেবল মাত্র ১৭ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ছিল এবং উহার মোট টনেজ মাত্র ছয় হাজার ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন চীন জাপ যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন জাপানীদের ৬১ হাজার টনেজের তেত্রিশখানা জাহাজ ছিল। ঐ সময়ে চীনের তাৎকালিক নব্য এবং বৈজ্ঞানিক রণতরী ছিল। ওয়েই-হাই-ওয়েই নামক স্থানে জাপানীরা চীনের ঐ সকল জাহাজ [illegible] করিয়া দেয় এবং জয় লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর উৎসাহের সহিত নব্য নেভির প্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করে। জাপানের বর্ত্তমান ইতিহাসে দেখিয়াছি যে চীন যুদ্ধের পর নৌবিভাগে জাপানের যত উন্নতি হইয়াছে অন্য কোন বিভাগে তেমন হয় নাই। ঐ যুদ্ধের পরই নৌশক্তির বৃদ্ধির জন্য পার্লিয়ামেণ্ট নূতন নৌবাহিনীর জন্য তেত্রিশ কোটী দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল জাহাজ প্রস্তুত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জাপানিদের মোট দুলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টনেজের ৭৬ খানি রণতরী ছিল। পুনরায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের মধ্যে আরও কতিপয় নব্যধরণের রণতরীর জন্য সতের কোটী সাতাত্তর লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এই সময়ের মধ্যে সে সকল জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ড্রেডনট টাইপের যুদ্ধ জাহাজ আজকাল জাপানীরা নিজেদের দেশেই প্রস্তুত করিতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৮৭ টনের রণতরী "ছেইকি" জাপানে সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। সেই সময় হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৭ খানা যুদ্ধ জাহাজ জাপানের ডকে প্রস্তুত হয়। জাপানীদিগকে দেশে জাহাজ প্রস্তুত কালে অনেক দিন পর্য্যন্ত বৈদেশিক সাজসরঞ্জামের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর জাপানী ডকে "আকি" এবং "ছাৎসুমা" এক একখানা প্রায় বিশ হাজার টনেজের ড্রেড্নট টাইপের জাহাজও একেবারে বহির্দ্দেশের বিনা সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তাই এক জাপানী লেখক লিখিয়াছেন "আত্মরক্ষার যথাসম্ভব উপায় নিজেরা উদ্ভাবন করিতে শিখিয়াছি; এতদিনে আমাদের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।"

সম্প্রতি য়্যাকটিভ য়্যাডমিরালের পদে আট

জন নৌসেনানী নিয়োজিত আছেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অফিসার ও নৌসেনা মোট ৩৪৪৬৩ জন এবং ভলান্টিয়ার চারি হাজারের উপর ছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানীদের যে নৌবাহিনী ছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রেণী	সংখ্যা	টন
যুদ্ধ জাহাজ (Battle Ship)	১১ খানা	১৫৩২৩৪
ক্রুজার (Cruiser)	২৯ "	১৭৪৫০৪
তট রক্ষক (Coast defence ship)	১২ খানা	৩২১৯১
কামান বাহক (Gunboat)	৭ "	৩২৯৯
ডাক বাহক (Despatch boat)	৩ "	৩৭১৯
টর্পেডো ডিপোবোট	১ "	৪১২০

মোট টনেজ ৩৮৫০৬৭

এতদ্ব্যতীত টর্পেডো ধ্বংসকারী (destroyer) যুদ্ধজাহাজ ২৯ খানা, এবং টর্পেডো বোট ৮৫ খানা।

রাজকীয় যুদ্ধবিদ্যালয়—টোকিও।

গত রুষজাপান যুদ্ধের পর মোট ৯৭৫০০ টনেজের ২ খানা ড্রেড্‌নট টাইপের যুদ্ধ জাহাজ, ৪ খানা প্রথম শ্রেণীর আর্ম্মার্ড ক্রুজার এবং ৪ খানা তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার জাপানী ডকে প্রস্তুত হইয়াছে।

গত রুষজাপান যুদ্ধে জাপান ছোট বড় মোট ৪৬০০০ টনের ১২ খানা জাহাজ হারাইয়াছে; পক্ষান্তরে রুষিয়ার নিকট হইতে মোট ১৪৪০০০ টনের ১৬ খানা বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ অধিকার করিয়াছে।

সামরিক নৌ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল কলেজ রহিয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান। (১) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তোকিও ন্যাভাল ষ্টাফ কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে উপযুক্ত এবং দক্ষ অফিসার যুবকদিগকে এবং ইঞ্জিনিয়ারদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) হিরোশিমার অন্তর্গত এদাজিমা নামক স্থানের ন্যাভাল একাডেমিও বিখ্যাত। এখানে ভাবী নৌবিভাগীয় কর্ম্মপ্রার্থী যুবকগণ চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া থাকে। (৩) দি ন্যাভাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল; এখানে চারি বৎসরকাল নৌ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত ন্যাভাল সার্জ্জারি স্কুল, পে মাষ্টার ট্রেনিং স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাকটিস্ ট্রেনিং স্কুল, গানারি ট্রেনিং স্কুল, টর্পেডো প্রাকটিস্ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতিতে নৌবিভাগীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইয়োকুছুকা, কুরে, ছাছেবো, মাইজুরু, পোর্ট আর্থার, তাকেশিকি, মেকং এবং ওমিমাতো এই আটটি ন্যাভাল ষ্টেশন বিখ্যাত।

যুদ্ধ জাহাজের ন্যায় বাণিজ্যজাহাজেরও অতি দ্রুত প্রসারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিৎসুবিশি মেল ষ্টিমশিপ কোম্পানি খোলা হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ম শিপিং কোম্পানী এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ওসাকা মার্চ্চাণ্ট ষ্টিমশিপ কোম্পানী খোলা [illegible] প্রথমোক্ত দুই কোম্পানীর মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে, অবশেষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় কোম্পানী মিলিত হওয়ায় নিপ্পন ইউছেন কাইসা নামক অতি বিশাল কোম্পানী গঠিত হয়। উহাই বর্ত্তমান জাপান মেল ষ্টিমশিপ কোম্পানী।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণের এবং নেভিগেশনের প্রসারণ জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করিতে জাপান গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন এবং সেই আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীসমূহকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে এখন কত ষ্টিমশিপ কোম্পানী, কত ডক, আর কত সারি সারি জাহাজ জাপানিদের কৃতিত্ব শুধু জাপানে নহে সমগ্র ভূখণ্ডে কীর্ত্তন করিতেছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ১৪২৩ খানা ষ্টিমার, ৩৭৫২ খানা সেলিং ভেসেল রেজেষ্টারী করা হইয়াছিল। জাঙ্কের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পূর্ণ আইনে ভিন্ন ভিন্ন ডকে ডাক, আরোহী এবং ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বড় বড় জাহাজ প্রস্তুত হইতে থাকে। জাপানে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০৫টি শিপ ইয়ার্ড ছিল এবং ঐ বৎসর দেশে ২০০ খানা ষ্টিমার প্রস্তুত হয় এবং বিদেশ হইতে ৭২ খানা ক্রীত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানিগণ যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকায় ঐ বৎসর দেশে মাত্র ১০৩ খানা জাহাজ প্রস্তুত হয় এবং বিদেশ হইতে ৯৫ খানা ক্রয় করা হয়। জাহাজ প্রস্তুতের ডকের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক একশত। নগাসাকি সহরস্থ মিৎছুবিশির তিনটি, কোরে সহরস্থ কাওয়াছাকির তিনটি এবং ইয়োকোহামার দুইটি ডকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওসাকা আয়রণ ওয়ার্কসের ডকে ইদানীং অনেক জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে।

প্রায় ২৫০ খানা জাপানী জাহাজ রেগুলার

সার্ব্বিসে এবং ৩০০ খানা ইরেগুলার সার্ব্বিসে নিয়োজিত আছে। ছয়-সাতটি কোম্পানী এবং কতকগুলি ক্রোরপতি কর্তৃক জাপানের সমুদয় জাহাজ পরিচালিত হইয়া থাকে। নিপ্পন ইউছেন কাইসা, তোয়োকিছেন কাইসা, নিংসুইবুন'ন কাইসা এবং ওসাকা সোছেন কাইসা বিখ্যাত। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা-বাণিজ্যে ৪১০৫২ টনেজের জাহাজ চলিত।

জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিপ্পন ইউসেন কাইসা শৈশব অবস্থায় আমাদের টিইটিকরিন বা রেঙ্গুন লাইনের ন্যায় অতি ক্ষুদ্রই ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে দুইটি ক্ষুদ্র নূতন প্রতিযোগী কোম্পানী মিলিত হইয়া এই কোম্পানীর গঠন হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনজাপান যুদ্ধে এই কোম্পানী মোট ১৩০০০০ টনেজের ৫৭ খানা জাহাজ দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করে। গত যুদ্ধের সময় উহাদের ২৫২০০০ টনেজের মোট

যুদ্ধ শিখিবার জাহাজ।

৭১ খানা জাহাজ চলিতেছিল। এখন ঐ সংখ্যা একশতে পরিণত হইয়াছে। জাপান উপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইনের সংখ্যা অনেক বেশী। বিদেশের সহিত অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, সাইবিরিয়া, ভারত এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে ৩২টি লাইনে উহাদের জাহাজ চলিতেছে। নিপ্পন ইউসেন কাইসা ইহার ১৩টি লাইন চালাইতেছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানী জাহাজে প্রথম শ্রেণী ৭০৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫০১ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১২ জন কাপ্তান ছিল। প্রথম শ্রেণীর প্রধান অফিসার (chief mates) ৩৩৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬২৫ জন এবং দ্বিতীয় অফিসারের (second mates) সংখ্যা ৯৬০৭ জন ছিল। ঐ বৎসরের তালিকায় দেখা যায় যে জাহাজে মোট চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ৫১২ জন, প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার

৯৬২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার ৫৯৮ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার ১৮৫৬ জন ছিল। জাহাজের মোট ইঞ্জিনিয়ার সংখ্যা ৩৯২৮। এখনও জাপানিদের বৈদেশিক কোন কোন লাইনে দুই চারিজন বিদেশী কাপ্তান, ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিসার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ক্রমেই উহাদের সংখ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

গত রুষ জাপান যুদ্ধে ৬৪ খানা বৈদেশিক জাহাজ জাপান কর্ত্তৃক ধৃত এবং অধিকারভুক্ত হইয়াছে—উহার ২৩ খানা ইংরাজদের, ১৬ খানা রুষিয়ার ১০ খানা জার্ম্মান, ৫ খানা আমেরিকান, ৪ খানা নরওয়েজিয়ান, ২ খানা ফরাসী, ২ খানা অষ্ট্রিয়ান, ১ খানা ওলন্দাজ এবং ১ খানা সুইডিশ। ঐ যুদ্ধে জাপানিদের প্রায় ২০ খানা জাহাজ নিমজ্জিত, ধৃত এবং বৈদেশিক অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

জাহাজের বিবরণীতে আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতা এই স্থলে উল্লেখ করিয়াই অদ্য এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একদা গ্রীষ্মাবকাশে সমুদ্রতীরস্থ কোন এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমরা তিন চারিজন ভারতীয় ছাত্র কয়েকদিনের জন্য গিয়াছিলাম। তথায় এক হোটেলে জনৈক নৌবিভাগের অফিসারের সঙ্গে বেশ একটু বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি য়্যাড্‌মিরাল তোগোর বিখ্যাত ফ্ল্যাগ শিপ "মিকাছাও" জাহাজের লেফ্‌টেনান্ট। তিনি আমাদিগকে তাঁহার ন্যাভাল ষ্টেশন এবং ফ্ল্যাগশিপ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা এ সুযোগ ছাড়িলাম না। তথা হইতে তাঁহার সঙ্গেই এক আরোহীজাহাজে পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া তাঁহাদের ইয়োকুছুকা ন্যাভাল ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। এক হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলে এক সঙ্গেই ন্যাভাল ষ্টেশনে ঢুকিলাম। দ্বারদেশের অফিসার আমাদের নাম ধাম, কলেজের নাম এবং ঐ অফিসার বন্ধুর নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন।

কলেজের ডায়রেক্‌টারের স্বাক্ষরিত পরিচয় পত্র আমার সঙ্গেই ছিল, তাহাও দেখাইলাম। স্থানে স্থানে কলকারখানা স্কুল কলেজ প্রভৃতি দেখিবার জন্য নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষের পরিচয় পত্র অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বারদেশের অফিসারের অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে সাধারণ লোকের বিশেষতঃ বৈদেশিকদের পক্ষে তথায় প্রবেশ অসম্ভব। ক্যালিবোটের সাহায্যে আমরা ফ্ল্যাগশিপের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে দুই ধারে অনেক নূতন জাহাজ প্রস্তুত করিতে এবং রুষিয়াগণ হইতে ধৃত অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজগুলি মেরামত করিতে দেখিলাম। কতকদূর গিয়া আমরা মিকাছা ফ্ল্যাগশিপে গিয়া পঁহুছিলাম। লেফটেনান্ট বন্ধু প্রথমতঃ আমাদিগকে অফিসারদের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া কতিপয় অফিসারের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তথায় বন্ধুটি জলযোগেরও বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই বৈঠকখানার দেওয়ালে শত শত কোষবদ্ধ শাণিত কৃপাণ ঝুলান রহিয়াছে। উহার কতকগুলি উন্মুক্ত করিয়া আমাদের হাতে দিলেন এবং তরবারিগুলির ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। কোন্ তরওয়াল কাহার হাতে

ছিল, কোন্ তরওয়ালে কতজন বিপক্ষীয় লোক হত ও আহত হইয়াছে, কোন তরওয়ালের কত বয়স এবং কোন্ তরয়াল কোন্ কোন্ যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে ইত্যাদি তরওয়ালের ইতিহাস।

তার পর আমরা বৈঠকখানার বাহিরে আসিলাম। বন্ধু ক্রমে ক্রমে তুই ধারে সজ্জিত ছোটবড় নানা ধরণের কামানগুলি দেখাইয়া উহার কার্য্যপ্রণালী বুঝাইতে লাগিলেন। গোলা বারুদ প্রভৃতির ভাণ্ডার দেখাইলেন। জাহাজ খানা উচ্চে ছয়তালা; লম্বাতেও নেহাৎ কম নয়; টনেজ ১৫২০০। ক্রমে সক্লোচ্চ ডাঙায় উঠিলাম! সম্মুখ দেশে যেখানে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের নেলসন্ য়্যাড্‌মিরাল তোগো সমগ্র নৌবাহিনী পরিচালনা করিয়া ভুবনবিখ্যাত বিশাল রুষ আর্ম্মাডাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া জাপানের ইতিহাসের এক অধ্যায়কে জ্বলন্ত সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন সেইখানে দাঁড়াইয়া আমরাও আমাদিগকে কথঞ্চিৎ গর্ব্বিত মনে করিলাম। সম্মুখভাগের তুই পাশে তুই মেশিন-কামান রহিয়াছে, লেপ্টেনাণ্ট কি ভাবে মেশিন কামানে প্রতি মিনিটে ছয় শত গোলা বর্ষিত হয় দেখাইলেন। সার্চ্চলাইট বুঝাইয়া দিলেন। এবং ডকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনারা সহবে বাস করেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের দালান, লোকজনের যাতায়াত এবং দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি দেখিয়া থাকেন। তাহাতে অন্যান্য জাতির সহিত তুলনা করিয়া জাপানীদের বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না, যদি জাপানী সভ্যতার পরিচয় কিঞ্চিৎ লইতে চাহেন তবে এই প্রকাণ্ড ডকের দিকে তাকাইয়া দেখুন; আজ আমরা দম্ভের সহিত বলিতে পারি যে আমরা আমাদের দেশের পরিচালক, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদে রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম; কিছুর জন্যই আমরা আজ পরমুখাপেক্ষী নহি। এই প্রকাণ্ড ডকে যে সহস্র সহস্র লোক—জাহাজ, গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে, ব্যবহার করিতেছে এবং সময় বিশেষে উহার সাহায্যে বৈদেশিক

অ্যাডমিরাল টোগো।

শত্রুকে নিস্তেজ করিতেছে উহারা সকলেই জাপানী, উহার মধ্যে একটিও বিদেশী খুঁজিয়া পাইবেন না।" অবনতমস্তকে তাঁহার সমস্ত কথাই অনুমোদন করিতে করিতে তাঁহার সহিত পশ্চাৎ তালায় নামিলাম। সেখানে তিনি এক ফুট পুরু লৌহ নির্ম্মিত দেওয়ালে প্রায় চতুর্দ্দিক বেষ্টিত এক ছোট প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন জাহাজ খানা ইংলণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রকোষ্ঠ য়্যাড্‌মিরালের স্থান। ইউরোপীয় য়্যাড্‌মিরালগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত প্রকোষ্ঠে থাকিয়া বাহিনী চালাইয়া থাকেন। কিন্তু জাপানী য়্যাড্‌মিরালগণ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মরক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন। তাঁহারা জাহাজের সম্মুখভাগের খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়াই রণতরী পরিচালনা করিয়া থাকেন। কাযেই এ প্রকোষ্ঠ আমদের একেবারে অব্যবহার্য্য। তারপর প্রত্যেক কামানের পশ্চাদ্দেশে ও পরিচালকদের আত্মরক্ষার জন্য এক লৌহ আবরণ আছে; উহাও আমাদের ব্যবহারে আইসে না। যেহেতু সাহসে ভর করিয়া প্রকাশ্যভাবে কামান চালাইলে বিপদ পাতের আশঙ্কা সত্বেও লক্ষ্য ঠিক করিয়া বিপক্ষের অধিকতর ক্ষতি করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে অন্তরালে থাকিয়াও লক্ষ্য স্থির না করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে গোলা চালাইলে কোনই ফল হয় না।" লেপ্টেনাণ্ট বলিলেন "জাপানী ও রুষিয়ানদের মধ্যে এই একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইত।

আদ্যন্ত জাহাজের সমস্ত বিভাগ দেখিয়া বন্ধুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদানান্তর পরস্পর অভিবাদন করিয়া জালিবোটের সাহায্যে তীরে চলিয়া আসিলাম। লেপ্টেনাণ্টটির নাম মিঃ টি তার্গামি। তার পরে মাঝে মাঝে তাঁহার পত্রও পাইতাম।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

খাদ্যের অভিব্যক্তি।

এজীবনে খাদ্যের কথা একটা খুবই বড় কথা। সেইজন্য মানুষের খাদ্যের ক্রম-অভিব্যক্তির কথাও মূল্যবান। সেই পর্য্যায় অনুসরণ করিয়াই আমাদের খাদ্যের অনেক হিতাহিত কথা বুঝা যায়। মনুষ্যদেহের অনেক রোগেরই কারণ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই অভিব্যক্তির জ্ঞান হইতে আলো পাওয়া যায়।

এই অভিব্যক্তির কথা বুঝিতে হইলে প্রথমেই আধুনিক সভ্যজাতির খাদ্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানা উচিত। তাহা মোটামুটি এই।—

১। তাহারা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উভয় রকম খাদ্যই খায়।

২। সেই সকল খাদ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তারা চাষ করে ও পশুপালন করে।

৩। খাদ্য বাঁটিয়া খায়।

৪। চিনি ও শ্বেতসার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।

৫। ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করে।

৬। কৃত্রিম নানা উপায়ে খাদ্যের নানা রকম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অভীষ্টমত ব্যবহার করে।

এইরূপে তাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে নানা কার্য্য করিবার কিরূপে জ্ঞান ও শক্তি ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে—এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

স্তন্যপায়ী জীবের খাদ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

Carnivora বা মাংসাশী জীব—যথা কুকুর ইত্যাদি। ইহাদের মাংস ভিন্ন চলে না। আর এমন অল্প আয়তনে এত সারাল দ্রব্য আহার করে বলিয়া ইহাদের দেহ বলিষ্ঠ ও মাংসপেশীপূর্ণ ও মনে সাহসও বেশী। ইহাদের পাকস্থালী ইত্যাদি খাদ্যযন্ত্র তুলনায় শরীরের ওজন ও আয়তন হইতে অনেক কম।

2. Hebivora বা উদ্ভিজ্জভোজী জীব—যথা,—গরু ভেড়া ইত্যাদি। ইহারা উদ্ভিদের উপর একান্ত নির্ভর করে। উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যগুলি আয়তনে এত বেশী বলিয়া ইহাদের পাকযন্ত্র অত্যন্ত বৃহৎ। ইহাদের গায়ে তত বল নাই মনে তত সাহস নাই; বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষিপ্রতাতেও ইহারা প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে নিকৃষ্ট।

3. Frugivora বা ফলভুক জীব, যথা—কাঠবিড়ালী, বানর ইত্যাদি। ইহারা উদ্ভিদের শুধু সারাল অংশ মাত্র খায়—যথা ফল, বীচি কচি ডগা ইত্যাদি। সেগুলিতে অল্প আয়তনে অনেক বেশী সার আছে। তাই এই শ্রেণীর জন্তরা মাংসল ক্ষিপ্র চতুর। ইহাদের পাকযন্ত্র মাংসাশীর তুলনায় বড়, কিন্তু উদ্ভিদভোজী প্রাণী গরু ভেড়া অপেক্ষা অনেক ছোট।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে প্রাণী যত সারাল ও পরিমাণে কম আহার্য্য দ্রব্য খায়—তাহারা তত মাংসল বলিষ্ঠ ও চতুর, ও তাহাদের স্থান অন্য প্রাণী হইতে উন্নত।

এইবার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও মানবের নিকটসম্বন্ধীয় তাহাদের কথা বলা যাক।—অর্থাৎ বানরজাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে তাহাদের খাদ্যের কিরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহাই দেখা যাক।

অভিব্যক্তিবাদে বানর হইতে ক্রমে ক্রমে মানুষের অভিব্যক্তির সম্বন্ধে যে সকল অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে তাহার সিঁড়ি পনেরটি ধাপে পূর্ণ হইয়াছে। সাবার্লাণ্ড সাহেবের খাদ্য প্রণালীতে (Southerland System of Diet) এসম্বন্ধে যে তালিকাগুলি ছাপা আছে সেইগুলি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইলে এই বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

একটি লম্বমান রেখা—পনের ভাগে বিভক্ত। তার প্রতি ভাগ এক একটি ধাপ। অন্ততঃ ৩০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তার প্রথম ধাপটিতে অভিব্যক্তির স্রোত আসে। সেই অবস্থাতেই বানর জাতির আদি পুরুষের অভিব্যক্ত। এইরূপে তিনটি শ্রেণীতে অভিব্যক্ত হইয়া সেই স্রোত ক্রমে নরজন্ম আনিয়াছে। মানুষ ও নররূপী বানরেরা মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ। আর নরের নিম্নতর স্তরে বানররূপী নর অবস্থিত। অর্থাৎ

ক্রমবিকাশের স্রোত অন্নে অন্নে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে বানর হইতে নরের অভিব্যক্তি হইয়াছে"।

উপরিউক্ত Evolutionary ladder বা ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ের তালিকা হইতে অনেক কথা শিখা যায়।—যথা,

১। মানুষ ফলভোজী বানর হইতে উৎপন্ন।

২। মানুষের অভিব্যক্তির পর তার আহারের নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মনুষ্যযুগে আহারের পরিবর্ত্তনের এইরূপ ক্রম চলিয়াছে।

১ম। Hunting or Fishing age অর্থাৎ কৌশল অবলম্বনে শীকার ও মাছধরার যুগ।

২য়। খাদ্যদ্রব্য আহারের পূর্ব্বে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা, বা রন্ধনের যুগ।

৩য়। পরিশেষে কৃত্রিম উপায়ে শস্য উৎপাদন ও পশুপালনের যুগ। কৃষিকার্য্য ও পশুপালন।

শেষোক্তটির মধ্যে দুটি খণ্ড যুগের কথা আছে।

প্রথম—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন পূর্ব্বক কৃষি কর্ম্ম ও পশুপালন। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসতি নাই।

দ্বিতীয়—এক স্থানে বসবাস করিয়া বছর বছর সেই স্থানেই চাষবাস ও পশুপালন।

এই দ্বিতীয় অবস্থাটিই জাতীয় উন্নতির অনুকূল অবস্থা। এই দিন হইতেই শরীর মনের প্রকৃত উন্নতির যুগ আসিয়াছে।

উপরিউক্ত খাদ্যের অভিব্যক্তির সম্বন্ধে দেখা গেল যে ফলভুক্ বানর হইতে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যযুগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ শীকার যুগে (Hunting and Fishing age) তাহারা প্রধানত প্রাণীভুক্ ছিল। সেরূপ খাদ্য রাঁধার বা চিবানর বড় আবশ্যক ছিল না। কিন্তু কাঁচা উদ্ভিজ্জ খাদ্যগুলি, যথা, গাছের পাতা ফলমূল বা বীচিগুলি বিশিষ্টরূপে চিবান অথবা রন্ধন দ্বারা নরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই কারণে "রন্ধনযুগের" আবির্ভাব। পরে শস্যগুলিকে আবশ্যকমত উৎপন্ন করিতে বৃক্ষ গুলিকে সুবৃক্ষ ও ফলবান করিতে চাষবাসের আরম্ভ হয়,—পশু উৎপাদনের চেষ্টা জন্মে। এই সময়েই কৃষি ও পশুপালনযুগের আবির্ভাব।

মনুষ্যযুগে ক্রমে ক্রমে খাদ্যের এইরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

প্রথম।—খাদ্যের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই আয়তনে কম ও সারে বেশী এইরূপভাবে হইয়াছে। শাকপাতা অপেক্ষা ফলমূল অনেক সারাল ও বীচ সর্ব্বাপেক্ষা সারাল অংশ। কারণ তাহাতেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য সঞ্চিত থাকে। তাই আমরা ভাত ডাল আহার করি।

দ্বিতীয়।—মিষ্টতার দিকেও মানুষের স্বভাবত বেশী ঝোঁক। অসভ্যজাতিরাও মৌচাক হইতে মধু, ও গাছের ছাল হইতে নির্য্যাস প্রভৃতি সংগ্রহ করে।

আহারের অভিব্যক্তির মধ্যে আর একটি কথা অনেকেই জানেন না। সেটি এই যে ;—

গরু ভেড়া প্রভৃতি উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের অসার আহারের তুলনায় বানরের ফলমূল

বা বীজ আহার অধিকতর সারাল। কিন্তু তাহারা ইহাপেক্ষা আরও সারাল দ্রব্যের আহার লাভ জন্য—পাখীর ডিম, পোকা মাকড় ও কখনও কখনও বা ছোট ইঁদুর ইত্যাদি, ছোট প্রাণী ধরিয়াও খায়। পশুশালায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের মাংসজাতীয় খাদ্য আহার করিতে সহজেই শিখান যাইতে পারে—কিন্তু প্রাণীভুক্ জীবদের সহজে উদ্ভিদভুক করা যায় না। অল্প আয়তনে সারাল খাদ্য আহারে শরীরের সহজেই উন্নতি হয় বলিয়া সকল প্রাণীরই ভিতর ওরূপ অভ্যাস পরিবর্ত্তন সহজ। কিন্তু শরীর মনের অবস্থা অক্ষুন্ন রাখিয়া উল্টাদিকে পরিবর্ত্তন তত সহজ নহে।

পুনরাবৃত্তি করিতে গেলে খাদ্যের অভিব্যক্তির এই সকল ঘটনাগুলি একত্রে এইরূপ দাঁড়াইবে।

মানুষের খাদ্য বানরের আহার হইতেই ক্রমশঃ উন্নত পর্য্যায়ে পরিবর্ত্তিত। বানরেরা উদ্ভিদভোজী নয়—গরু ভেড়ার মত ফলভোক্তা। অর্থাৎ অল্প আয়তনে সারাল খাদ্য খায়। তাই তাহাদের শরীরে এত ক্ষিপ্রতা এবং বুদ্ধিও অপেক্ষাকৃত উন্নত। শুধু তাই নহে তাহারাও সুবিধা পাইলে ফল মূল ত্যাগ করিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া বা পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়া খায়।* একেবারেই প্রাণীভুক্ নয় তা বলা যায় না। পরে প্রস্তরযুগে মানুষ প্রথমে শিকার করিয়া মাছ ধরিয়া খাইত। তখন সে বেশী ভাগ প্রাণীভোজীই ছিল। খাদ্য রাঁধিতও না ভাল করিয়া চিবাইতও না।

পরে কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন উদ্ভিজ্জজাতীয় খাদ্য যথা ফলমূল ইত্যাদি আহার করিতে লাগিল তখন সেগুলিকে নরম করিবার জন্য রান্নার প্রথাও আসিল। আর চাষবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সেই সকল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ও মনের মত এবং সুতার ও সারাল করিয়া উৎপন্ন করা। মানুষ মিষ্টতার পক্ষপাতী এবং সারাল খাদ্যের দিকে সকল জীবেরই সহজ ঝোঁক আছে কারণ তাহাতে অভিব্যক্তির সহায়তা করে তাই সকল উন্নতিশীল সভ্যদেশের লোকের খাদ্য মিশ্রিত খাদ্য। আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা আছে—বহুদিন উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া কোনও জাতি আপনার জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষসাধন করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম হিসাবে যাহাই হোক না কেন, শরীরের উৎকর্ষের জন্য মিশ্রিত খাদ্যই প্রশস্ত। যৌবনে বিশেষতঃ বাল্যজীবনে ইহার উপকারিতা অশেষ।

আমাদের জাতির আহার সম্বন্ধে এই কয়টি কথা এই প্রসঙ্গে বলিবার আছে।

১। আমাদের আহার অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ হওয়াতে আকৃতিতে বড় বেশী, ও সারে বড়ই কম।

২। তাহা মাংসপেশী গড়িবার পক্ষে বড়ই অল্প বলিয়া আমাদের দেশে মাংসপেশী এত কম ও সহজে ক্লান্তি আসে।

৩। আহারে রন্ধনে ও অন্যান্য প্রকারে আমরা প্রায় খাদ্যের অর্দ্ধেক অংশ অপচয় করি।

৪। ভাত চাল হইতে চার গুণ ফাঁপে মানে চার গুণ স্থান লয় অথচ সারে

পোষায় না। ভাত অপেক্ষা রুটী তিন গুণ সারাল।

৫। ডালে মাংসপেশী গড়িবার উপযুক্ত দ্রব্য আছে সত্য কিন্তু হজম করা শক্ত, প্রায় ২৫ পারসেণ্ট বাহির হইয়া যায়।

৬। উদ্ভিজ্জ খাদ্যসামগ্রী শতকরা ২৫ ভাগ বাহির হইয়া যায়—মাংস জাতীয় খাদ্য কেবলমাত্র শতকরা ৩ ভাগ অপচয় হয়।

৭। মাংস জাতীয় আহার রাঁধিবার পর চার ভাগের এক ভাগ কমে, উদ্ভিজ্জজাতীয় খাদ্য চার ভাগের এক ভাগ বাড়ে।

৮। আমাদের শরীরে মাংসপেশীর ওজন প্রায় অর্দ্ধেক; স্নায়ুমণ্ডলের ওজন আবার ইহার অর্দ্ধেক। মস্তিষ্কের তিন ভাগের ভিতর দুইভাগ মাংসপেশীর সহিত সংশ্লিষ্ট। শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি মাংসপেশীর সাহায্যে কাজ করে ও মনের সনাতন জ্ঞানগুলি যথা, "সময়ের" ও "বিস্মৃতির"—সে সব গুলির ভিত্তিতে মাংসপেশীর চালনা সংলিপ্ত। সেইজন্য যেরূপ খাদ্যে মাংসপেশী গঠনের উপকরণ অধিক পরিমাণে আছে তাহাই আমাদের প্রশস্ত আহার। আমাদের জাতীয় খাদ্যে তাহা বড়ই কম। তাই দেশের লোকেরা এত দুর্ব্বল ও অসুস্থ। বিশেষ বাল্যজীবনে ইহার অভাব বড়ই ক্ষতিকর। দেশের উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে আমাদের একথাটি স্মরণ রাখা চাই।

ডাক্তার—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কুড়ানী।

পোষের বিষম কনকনে শীত তখনো হয়না ভোর,
পূবের আকাশ হয়নাক লাল মাঠ ঘাট ঘোর ঘোর,
মাদুর ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠেতে বেরুই কুড়াইতে ধান ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি, শামুকে করিয়া খুঁটে খুঁটে তুলি ধান;
গোটা শীষ যদি দেখি ভূঁয়ে পড়ে উথলিয়া উঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা।
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা রাশি রাশি বোঁঝা বোঝা,—
পিছু পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি ভূঁয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি।
ঠোঁট মুখ গাল শীতে জর জর পা-দুটা গিয়াছে কাটি!
ছুটে আসি যাই—কি করিবে বল—মাঠের কুচল মাটি।
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর, ভরে যায় মোর ঝোলা,
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা কুড়ানী বাঁধিবে গোলা'।

শীত যায় যায় ক্ষেতে নাহি ধান ধূ ধূ করে সারা মাঠ,
গাছের তলায় শুকনো পাতায় ভরে যায় পথঘাট।

ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়িগুলি কাঁখে,
শুকনো পাতায় উঠানে আমার ঠাঁইটুকু নাহি থাকে।
দুপুরে গোবর ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা কয়ে' ঘুরি ফিরি গরু বাছুরের কাছে কাছে।
গোবর ঝুড়িটা ভরে' গেলে পরে গাছের তলায় বসে,
জিরেন লইয়া ঘরে ফিরে আসি কোমর বাঁধিয়া কসে'।
বিকালে বেরুই কুড়াইতে কাঠ বনে বনে ঘাটে-মাঠে,
পড়সীরা কয়—"ধন্যি কুড়ানী সারাদিনটাই খাটে।"

বর্ষা পড়িলে পথে ঘাটে কাদা নিভে আসে খর তাপ,
তালের পাতায় বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠখড় কিছু মিলে না কোথাও, জ্বলেনা কাহারো আখা।
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি ঝাঁকা,
নালার জলেতে জালিটী পাতিয়া বসে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুঁটী দুটা আঁচলে বাঁধিয়া, ফিরি কাদামাখা গায়।
বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে',
পুকুরে পুকুরে কল্‌মী শুশুনী, ভরে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায়! মাছ খুঁজে মরা মিছে,
গুগুলি শামুক কুড়ায়ে বেড়াই রাখালের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁহাঁ করে আসে ছুটে,
আমার কপালে, লোকে যা না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতেতে পেটটি পুরিয়া হইয়াছি এত বড়।
খোঁড়ামা আমার ঘরে পড়ে আছে, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া পড়সীরা, দেয়নিক কেহ ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দেইনা পা আমি, মনে মনে তেজ আছে,
চাকরী করিনা ভিক্ষে করিনা, ধারিনা কাহারো কাছে।
বাছুর, ছাগল, হাঁস, ভুলো, পুষি আমার খেলার সাথী,
তাদেরে মারিলে বলিলে কিছু বা ফেটে যায় মোর ছাতি।
অনেক বকেছি, কুড়ানী বলিয়া ডাকিওনা মিছে পিছু,
মাঠেতে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে খুঁজিলে মিলিবে কিছু।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্কিমযুগের কথা।*

(৬)

"স্বাধীনতা এবং আত্মমর্য্যাদার ভাব বঙ্কিমবাবুর চরিত্রে যেরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, রাজকর্ম্মচারীদের ভিতর তাহা সচরাচর সুলভ নহে। স্বর্গীয় শ্যামাধব বাবু বলিতেন, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত বঙ্কিমবাবুর বাক্যে এবং ব্যবহারে সর্ব্বদা তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন। হুগলীতে নূতন নূতন আসিয়া শ্যামাধব বাবু একদিন ১১টার সময় কোন বড় সাহেব সন্দর্শনে চলিয়াছেন। ছুটীর দিনে ধড়াচূড়া আঁটিয়া প্রখর রোদে তিনি ছুটিয়াছেন, বঙ্কিম বাবুর বারান্দার সম্মুখে তাঁহার সাম্নে পড়িয়া গেলেন। "এত রৌদ্রে ব্যস্ত হয়ে কোথা যাও শ্যামাধব?" ব্যাপার বুঝিয়াও বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তর শুনিয়া হাসিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে গলদঘর্ম্মাবস্থায় শ্যামাধব বাবু গৃহে ফিরিতেছেন, আবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "শ্যামাধব, আমার ইচ্ছা তোমার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আর একটু বাড়ে।"

সাহেবসুবার ছায়া তিনি কখন বড় ইচ্ছা করিয়া মাড়াইতেন না, জামাতৃস্নেহের আধিক্যবশতঃ ইদানীং দুই একবার সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। * * * একবার কোন গেরুয়াবসনধারী, পূর্ব্ব-পরিচিত আগন্তুক নিজের কোন আত্মীয়ের জন্য সাহেবসুবার কাছে একখানি অনুরোধ-পত্রের প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমবাবু ঔদাস্যসহকারে অথচ মিষ্টভাবে বলিলেন, "ওসবে আমি আর নাই। তুমি গেরুয়া ধরেছ, মনে মনে আমারও তাই জেনো।" (৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার)

তথাকথিত "স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদার ভাব," বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে। এ বিষয়ে আমি দু'একটী গল্প জানি'।

হুগলী কলেজের প্রফেসর ৺ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, অনেকেরই কাছে

* পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত "বঙ্কিমযুগের কথা"য় অনবধানবশতঃ কয়েকটি বিষম ভ্রম রহিয়া গিয়াছে পাঠকগণ, ক্ষমা করিবেন। আমি লিখিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু সাঁতার জানিতেন। একবার ডিঙ্গি ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পাণ্ডুলিপি কেবল পূর্ণবাবুই দেখিতেন। পরে জানিয়াছি, কথাগুলি ঠিক নয়। সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে:—

১। বঙ্কিমচন্দ্র, সাঁতার জানিতেন না। "পদ্মা" নদীর মোহানায়, তুফানের সময়ে, তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া 'পাড়ি' দিয়াছিলেন। যিনি সাঁতার জানেন না, তাঁর পক্ষে এটি বড় সাহসের কাজ বলিতে হইবে।'

২য়। গঙ্গাবক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন শত্রু বালক, যখন তাঁর ডিঙ্গির কাছি কাটিয়া দিয়াছিল, তিনি তখন ডিঙ্গিতেই নির্ভয়ে বসিয়াছিলেন। ভয় পান নাই এই জন্য, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, চারিদিকে এত নৌকা থাকিতে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই। শেষটা, তাই দাঁড়াইয়াছিল।"

৩য়। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি যে পূর্ণবাবুই দেখিতেন, তা নয়; সঞ্জীবচন্দ্রও দেখিবার সুযোগ পাইতেন। তবে, পূর্ণবাবুর সুবিধা ছিল বেশী। কারণ, তিনি বঙ্গদর্শনের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর হাত দিয়াই পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাইত।—

সুপরিচিত। বঙ্গদেশের এক সুপ্রসিদ্ধ মহারাজের পুত্রকে তিনি পড়াইতেন। হুগলী কলেজে, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ছাত্র প্রতিভাবান্ হইলে শিক্ষক মাত্রেরই প্রীতিভাজন হন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মেধাবী বালক তৎকালে দুর্লভ ছিল। অতএব ঈশানবাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। এবং কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ ও মহারাজকুমারের কাছে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সুখ্যাতি করিতেন। ফলে, কুমার ও মহারাজ, দুজনেই বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, তখন বালকমাত্র। সুতরাং এ সম্মান তাঁর পক্ষে লোভনীয় হইবার কথা।

কাঁটালপাড়ায় রাসের বড় ঘটা হইত। সে উৎসব-সমারোহ দেখিবার জন্য দূরদেশ হইতে প্রতি বৎসর ধনী ও দরিদ্র বহুশত লোক আসিতেন। পূর্ব্ব-কথিত মহারাজও বজরা ভাসাইয়া সেই সময়ে কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন; যে বারের কথা বলিতেছি, সেবারেও আসিয়াছিলেন। আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে আনিবার জন্য দুজন প্রধান কর্ম্মচারীকে চট্টোপাধ্যায়-বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মচারীরা, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে মহারাজের উদ্দেশ্য বলিলেন। শুনিয়া, যাদববাবু বলিলেন, "আমার ভাগ্য, আমার ভাগ্য!" তিনি ছেলের স্বভাব জানিতেন। অতএব, বঙ্কিম যাইবেন কি যাইবেন না, সে সব কথা কিছু না বলিয়া কর্ম্মচারী দুজনকে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, তখন পড়িবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। কর্ম্মচারীরা, তাঁহার কাছে গিয়া মহারাজের কথা তুলিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, সমস্ত শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন:—"আমরা গৃহস্থমানুষ, রাজারাজড়ার খবরে আমাদের দরকার কি? আমি যাব না। দরকার থাকে যদি, তাঁরা আসুন।"

তাঁহার বাল্যকালের একটা অভ্যাসের কথা আমরা শুনিয়াছি। রোজ স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আগে বইগুলি তিনি একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তার পর গা হইতে জামাটি খুলিয়া আর একদিকে নিক্ষেপ করিতেন। তৎপরে, আদুড় গায়ে, মাথার বাব্‌রি-কাটা কেশ দুলাইয়া, এক ছুটে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন। এবং যতক্ষণ না জলখাবার পাইতেন, ততক্ষণ অস্থির হইয়া বেড়াইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, একদা বলিয়াছিলেন, "চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ।" কারুর দাসত্ব করা, তাঁর স্বভাবসম্মত ছিল না। কিন্তু এদেশের সাহিত্যিকের জীবন, উদর-চিন্তায় কণ্টকিত। বিলাতের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন লেখিকার, সাহিত্য হইতে বাৎসরিক আয় ৩৫০০০ হাজার পাউণ্ড! আর একজন লেখকের ৩২০০০ পাউণ্ড!! এদেশে এ কথা স্বপ্নসম্ভবও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের—বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাটের,—পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের বাৎসরিক পরিমাণ ৬০০০ হাজার টাকার অধিক ছিল না। এক্ষেত্রে, অন্য সকলের অবস্থা বিবেচ্য। বাঙ্গালার সাহিত্য, দেহের রক্তশোষণ করে—কিন্তু প্রাণ ত বাঁচায় না! অতএব, সাহিত্যিকগণকে প্রাণধারণের জন্য ভিন্ন উপায় দেখিতে হয়। পেটে কিংবা দাস্তে, ঠিক স্মরণ নাই—

একবার কহিয়াছিলেন, "সাহিত্যিকের বসিয়া থাকা উচিত নয়,—তাঁহার পক্ষে কোন কাজ করা ভাল।"—কিন্তু তিনি দাসত্ব করিতে বলেন নাই।

এই দাসত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র বড় ঘৃণা করিতেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি চাকুরিতে ঢুকিয়াছিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার কর্ম্মকাল পূর্ণ হইবার আগেই—বোধ হয় ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন। এ কাজে তাঁহার সুনাম হইয়াছিল যথেষ্ট। ইচ্ছা করিলে, আরও কিছুদিন তিনি থাকিতে পারিতেন। কিন্তু দাসত্বে তাঁর বড় ঘৃণা। অতএব তিনি থাকেন নাই।

পেন্‌সন্ লইবার পরে, একবার কোন দেশবিখ্যাত জমিদার, তাঁহার নিকটে এক লোক পাঠান। বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়াছিলেন। প্রেরিত ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন "আপনি দয়া ক'রে যদি আমার প্রভুর কোন উপকার করেন।"

"কি উপকার বাপু?"

"আজ্ঞে, তাঁর বিষয় দেখাশোনার ভারটি যদি আপনি নেন।"

"না বাপু, আমাকে দিয়ে আর তা হবে না।"

"তিনি আপনাকে মোটা-মাইনে দেবেন।"

"না। অনুরোধ সত্ত্বেও কোম্পানীর চাকরি আমি ছেড়েছি। আর সামান্য লোকের দাসত্ব কর্ত্তে আমার ইচ্ছে নাই।"

"আজ্ঞে, তিনিই আপনার অধীন হয়ে থাক্‌বেন।"

"দেখ, তাঁর মত লোক আমার অধীন হয়ে থাকেন। আমার তা ইচ্ছে নয়।"

কেবল এই একবার নয়। আর একবার আর একজন জমিদারের কাছ হইতে এমনি ধরণের অনুরোধ আসিয়াছিল। কিন্তু সেবারেও বঙ্কিমবাবু সম্মত হন নাই।

বিচারাসনে বসিয়া, বঙ্কিমবাবু যে সকল রায় লিখিতেন—তা অপূর্ব্ব। তাতে যে খুব বড় বড় কথা থাকিত, তা'ও নয়। কিন্তু অতি সাধারণ কথাগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনি গুছাইয়া, সাজাইয়া লিখিতেন, যে, যিনি পড়িতেন,—তিনিই মুগ্ধ হইতেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বেকার সাহেব, তখন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত রায় পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন:—"এ রকম রায় আমি আর কখনও দেখি নি।"

ইডন সাহেব যখন এখানকার ছোটলাট, বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁহার সেক্রেটারী মেকলের সহকারী ছিলেন। অনেকে মনে করেন, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে অবনিবনাও হওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্রকে এ কর্ম্ম হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। এই পৃথিবীটি গুজবে ভরা। এ কথাটাও গুজবমাত্র—মূলে সত্য নাই আদোপে! সহকারী সেক্রেটারীর পদ aboiish হওয়াতেই,—বঙ্কিমচন্দ্র বেশীদিন পূর্ব্বকথিত কাজটি করিতে পারেন নাই। যতদিন করিয়াছিলেন—যথেষ্ট সুখ্যাতি কিনিয়াছিলেন। কিন্তু মেকলের সঙ্গে প্রায়ই তিনি মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিতেন না। এর কারণ আর কিছু না—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনচিত্ত, পরের ভালমন্দ সকল কথার তলেই ঢ্যারা সই দিবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। সে মন,

আপনার পথ আপনিই চিনিয়া লইত—কারুর মুখ তাকাইত না। কাজেই, অন্যের সঙ্গে মত-ভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু ইভেঁম সাহেব, স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, যে মেকলে ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে মত বিভেদ হইলে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সাবধান্‌ বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতৃদেব, স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর ভিতরে, বোধ হয়—দুটি মাত্র পরিবার ভিন্ন আর কোন পরিবারেই সাহিত্যিকের পরে সাহিত্যিকের উদয় দেখা যায় নাই। তন্মধ্যে, একটি আমাদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী এবং আর একটি রামবাগানের দত্তবাড়ী। দত্তবাড়ীর রমেশচন্দ্র ও তরুদত্ত পৃথিবী-যোড়া নাম কিনিয়াছেন। তদ্ভিন্ন Lotus Leaves-প্রণেতা হরচন্দ্র, Cherry Blossoms প্রণেতা গিরীশচন্দ্র ও Indian Pilgrim প্রণেতা যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নামও উল্লেখ্য। S. C. Dutt—যিনি লিখিয়াছিলেন—

"My native land, I love thee still!
There's beauty yet upon thy
lonely shore;
And not a tree, and not a rill,
But can my soul with rapture thrill
Though glory dwells no more—"

তাঁহারও নাম করা যায়। এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশানচন্দ্রও সাহিত্য-রসিক হইয়াছিলেন।

বোধহয়, যখনকার কথা বলিতে যাইতেছি, ঈশানবাবু, তখন খুলনা মহকুমার Survey Deputy Collector। আর বঙ্কিমচন্দ্রও তখন সেইখানেই কার্য্যভার পাইয়াছিলেন। ঈশানবাবু, একবার আপনার কাজের খাতিরে কুষ্টিয়ার নিকটে কোন স্থানে জলপথে যাত্রা করিলেন। নৌকা, একটি পঙ্কিল খালের ভিতরে ঢুকিল। তারপর কিরূপে বলিতে পারি না, ঈশানবাবু হঠাৎ জলে পড়িয়া গেলেন। এবং আর উঠিতে পারিলেন না। নিয়তির এরূপ কঠোর পরিহাস সচরাচর দেখা যায় না।

ঈশানবাবুর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ মাত্র। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম হয়। সখ্যপ্রীত বঙ্কিমচন্দ্র, এই কথা শুনিলেন। ঈশানবাবু, বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও, দুজনের ভিতরে ভালবাসা হইয়াছিল খুব। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ লোকজন সংগ্রহ করিয়া অকালমৃত ঈশানচন্দ্রের মৃতদেহ সলিল-সমাধি হইতে উদ্ধার করাইয়া আনিলেন। এদিকে ঈশানবাবুর আত্মীয়েরাও তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সকল ঘটনায় এবং তাহার উপরে বঙ্গসাহিত্যগুরু বলিয়া, রমেশচন্দ্র চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালবাসিতেন। প্রথমে যিনি মন্ত্র দেন, তিনিই গুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশেই রমেশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হন। সেকথা আগেই বলিয়াছি। অতএব, বঙ্কিমচন্দ্রকে, রমেশচন্দ্রের গুরু বলিতে হইবে।

রমেশচন্দ্র যখন বর্দ্ধমানের কমিশনর,

বঙ্কিমচন্দ্রের তখন মৃত্যু হয়। বঙ্কিমের পীড়ার সংবাদ পাইয়া, রমেশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তিমশয়নের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সাহিত্য-সম্রাটের জ্ঞানসূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়। কিন্তু রমেশচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে চোখদুটি খুলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, রমেশচন্দ্রও যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে, বর্দ্ধমানে এক শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায়, রমেশচন্দ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং সভাস্থলে বর্দ্ধমানের মহারাজ স্বয়ং ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ আর দেশীয় কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রসম্বন্ধে, রমেশচন্দ্র বঙ্গভাষায় একটী প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন।

বন্ধুগণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর স্নেহশীল। সুলেরী কমিশনে বঙ্কিম যখন সেক্রেটারী,—তখন তাঁহার সহিত একজনের আলাপ হয়। ভদ্রলোকের দুটি ছেলে, কলিকাতার মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিত।

হঠাৎ একটি ছেলে, কঠিন কলেরা-রোগে পড়িল। অবিলম্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কাণে সে কথা উঠিল। অমনি তাঁর প্রেমালু প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল—তিনি তখনি ছেলেদুটি যে মেসে থাকিত, -তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলেরা শুনিয়া ভয় পাইলেন না, পীড়িত বালকটির পাশে বসিয়া তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া তবে ফিরিলেন।

শেষ জীবনে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পীড়া হইল। তাঁর দাঁত দিয়া মাঝে মাঝে রক্ত বাহির হইত। কিন্তু সে সকল উপসর্গ গ্রাহ্য না করিয়া তিনি লিখিতে বসিতেন। শুনিয়া, ডাক্তার, লেখা বন্ধ করিতে বলিলেন। লেখা ত' বন্ধ হইল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ত' চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না! তিনি, দাবা ও পাশা খেলিতে জানিতেন। অতএব, সন্ধ্যার সময়ে রোজ দাবা বা পাশা লইয়া বসিতেন। কিন্তু, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে খেলার সাথী পাওয়া দায়। তখন, বঙ্কিমচন্দ্র আপনার স্ত্রীকে সতরঞ্চ বা ঐ শ্রেণীর কোন একটা খেলা শিখাইলেন। তারপর, স্বামী ও স্ত্রী দুজনে বসিয়া বসিয়া অবসররঞ্জন করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সত্যই তাঁর ধর্ম্মে সহায়, সেবায় দাসী, যত্নে ভগ্নী এবং ক্রীড়ায় সখী ছিলেন। সূর্য্যনন্দিনীর অনেক গুণ বঙ্কিম-গৃহিণীতে দেখি। আদর্শ চরিত্র, বঙ্কিমের গৃহান্তেই ছিল,—তাই তৎলিখিত কাব্যপটেও আমরা সেই মোহনীয় চরিত্রের দীপ্তমঙ্গলশ্রী,—এবং মহান্ ছায়াপাত দেখিতে পাই।

ক্রমশঃ

বিবেক।

প্রহরী, ধনীর গৃহে, আলোক জ্বালিয়া,
সতর্ক পাহারা দেয় শর্ব্বরী জাগিয়া;
অজ্ঞান-তমিস্রা-মগ্ন অন্তর ভবন
বিবেক বর্ত্তিকা জ্বালি' জাগে অনুক্ষণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

ল রবীন্দ্রন

১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ

বিভিন্ন বয়সে

ধর্ম্মের নবযুগ।

১

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোট ছোট সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এই জন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃস্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিষের মত আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্ম্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্ম্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলি তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম্ম, আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্ম্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্ম্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্ম্মের উপরেই আমাদের নিজের সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে

সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় একথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল, যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি —অন্য জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না।" স্বধর্ম্মে এবং পরধর্ম্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল, যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনি দেখিনা কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণুপরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনি ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড় কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন, গোত্র সকলেরই এক। এই জন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সব কটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটিই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্য্যায়ে যেমনি হোকনা কেন, জীবপর্য্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটেনা; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূরবর্ত্তী কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়াছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা প্রশাখায় উজান বাহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়েজীবে সর্ব্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে, যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল করিয়া দেখিবার উদ্যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, প্রথার তুলনা, কাহিনীর তুলনা, ধর্ম্মের তুলনা— সমস্তই তুলনা। সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎজুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে; আজ

একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানীতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারো ধার ধারি না,—তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে সে খাঁচার পাখী, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখী। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ঐ খাঁচার লোহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মত ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসঙ্গতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতেই পারে না, নিজের শক্তিতে ত নহেই;—সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্যপানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মত নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দ্দিষ্ট খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং এই সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্ম্মের সহিত নূতনবোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্ম্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতি দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্ম্মকে না পাইলে তাহার জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবলি উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলি সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য্য নিত্যবহমান প্রকাশ ব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলি আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলি "শঙ্খের বদলে মুক্তা", স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না, যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম্ম। বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সব কটা পাল তুলিয়া দে,—ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় তর্জ্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে ওরে দ্বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক! আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে যিনি তাহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্ম্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্ম্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তিনি মূর্ত্তি-পূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্ত্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে

বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে;—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না; "তবে বাহিরের লোকের কি গতি হইবে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যখন মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যায় মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্ম্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক; মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক; আর সর্ব্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে; এমন কি, নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ মূর্ত্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষরূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্য ফলের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে, বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া, প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই; মূর্ত্তিপূজা সেই সময়েরই যখন পাঁচসাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম্ম আপন ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সঙ্কীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয়;—যাহারা অলঙ্কারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের সেই অলঙ্কার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জ্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্ম্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্ম্মের সংস্কারকে সঙ্কীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মত মানুষকে চাপিয়া ধরে,—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বুলিয়া

কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্ম্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্ব্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন, যে, যে দেবতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণসত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্ম্মের সত্য।

আমাদের একটি পরমসৌভাগ্য এই ছিল, যে, মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়া ছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশের সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্য্যের মত অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্ত্তা এমন সুগভীর রহস্যময়বাণীতে অথচ এমন শিশুর মত অকৃত্রিম সরলভাষায় উপনিষৎ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহা অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্ম্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সঙ্কোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম ত কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন —রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং এষাস্য পরম আনন্দঃ ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে পারি না তবে ব্রহ্ম-জ্ঞানকে ত আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী ত ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া ত আর কিছুই মিলাইতে পারে না, ভক্তি ছাড়া ত আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি

যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজা অর্চ্চনা ক্রিয়া কর্ম্মের মহা সমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতিবিপদকে তিনি লক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকালপর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দ কুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মত প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াইত আমাদের নবযুগের এবং চিরযুগের ধর্ম্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহযুক্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুতঃ পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য;—সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিলন। আর সর্ব্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচারবিচারঅনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুলসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিনা।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একইকালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা! হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা,—একথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যতকিছু পাপ যতকিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড় মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য;—তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্যাকেই ম্লান করিয়া দিতেছে।

হে ধর্ম্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্ব্বমানবের ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে, মানবের অন্তরাত্মার। অন্তর্গূঢ় এই চিরসঙ্কল্পটিকে তুমি বীর্য্যের দ্বারা প্রবল কর, পুণ্যের দ্বারা নির্ম্মল কর, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়-সঙ্কোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধ কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না! অনেক দিন মানুষের ধর্ম্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্চ্ছিত; গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্য্যন্ত কাঁপে নাই;—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক্। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড় কুটার মত শূন্যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্ম্মের উপাধিধারী প্রাচীন অধর্ম্মের সঙ্গে, আজ লড়াই করিতে হইবে সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক্! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা, আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মত নিরানন্দ হইলে চলিবে না; আজ ত্যাগের দিন আসিল কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলি পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে—আজ কৃপণের মত রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্য্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকভয়কেই ধর্ম্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে;—আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে! আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে;—নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দ্দা, সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর, সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই, অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্য্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব;—মানুষের চিত্ত-সাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে ধর্ম্মে কত কত অত্যাশ্চর্য্য অজেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসঙ্কোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্ত শক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে,

—তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে যখন তুমি উদ্বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিলমানবের বিজয়-যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানব-ভাগ্যবিধাতা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

মৈত্রেয় বোধিসত্ব, এই সময়ে বুদ্ধদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া, নিজ আসন পরিত্যাগ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি সত্যই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইব?" তখন তথাগত নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে বলিলেন "তাহাই হইবে; তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং আমি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছি, তোমার সেইরূপ ক্ষমতা হইবে।"

এই স্থানের পশ্চিমে একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই শাক্য বোধিসত্ব বুদ্ধত্বলাভের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভদ্রকল্পযুগে, যখন মনুষ্যের পরমায়ু দশসহস্র বৎসর ছিল, তখন কশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মচক্র পরিচালনপূর্ব্বক, জনসাধারণের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং প্রভাপাল বোধিসত্বের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। "এই বোধিসত্ব, যখন মানবের পরমায়ু শতবর্ষে পরিণত হইবে, তখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন এবং শাক্যমুনি নামে কথিত হইবেন।"

এই স্থানের নিকটেই, পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বুদ্ধের ব্যায়ামার্থ ভ্রমণের চিহ্ন আছে। এই বিহার স্থান দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশপদ এবং উর্দ্ধে উঠিবার সোপানগুলি প্রায় সাত ফুট উচ্চ। ইহা পুঞ্জীকৃত নীলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার উর্দ্ধদেশে ভ্রাম্যমান বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি অপরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। মস্তকে অত্যাশ্চর্য্য দীর্ঘ বেণী রহিয়াছে। ঐশ্বরিক ঘটনাবলী স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়।

সঙ্ঘারামের মধ্যে বহুসংখ্যক পবিত্র চিহ্ন আছে এবং কয়েকশত বিহার ও স্তূপ আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা মাত্র দুই তিনটী উল্লেখ করিয়াছি।

সঙ্ঘারামের সীমার পশ্চিমে দুইশত হস্ত পরিধিবিশিষ্ট স্বচ্ছবারিপূর্ণ একটী হ্রদ আছে; তথাগত সময় সময় এইস্থানে অবগাহন করিতেন। এই হ্রদের পশ্চিমে ১৮০ হস্ত পরিধিবিশিষ্ট একটী বৃহৎ পুষ্করিণী; তথাগত নিজ ভিক্ষাপাত্র এই পুষ্করিণীতে প্রক্ষালন করিতেন ইহার উত্তরে দেড়শত হস্ত পরিধিবিশিষ্ট একটী হ্রদ; তথাগত এই হ্রদে নিজ বস্ত্র ধৌত করিতেন। প্রত্যেক জলাশয়ের অভ্যন্তরেই একটী করিয়া দৈত্য বাস করে। এই সকল হ্রদের জল অত্যন্ত সুমিষ্ট এবং হ্রদগুলি গভীর। হ্রদের জল অত্যন্ত পবিত্র এবং উজ্জ্বল এবং ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কুচরিত্র ব্যক্তিগণ ইহাতে অবগাহনার্থে অবতরণ করিলে, কুম্ভীরগণ বহির্গত হইয়া, উহাদের অনেককে হত্যা করে। যে সকল পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ এই স্থানে অবগাহন করেন, তাঁহাদের কোনই শঙ্কা নাই। তথাগত, যে জলাশয়ে নিজ বস্ত্রাদি ধৌত করিতেন, তাহার

নিকটেই একটি চতুষ্কোণ প্রস্তর খণ্ডে তাঁহার কষায় বস্ত্রের চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। এরূপ বোধ হয়, যে বস্ত্রের সূত্রগুলি প্রস্তরখণ্ডের উপর পরিষ্কাররূপে খোদিত করা হইয়াছে। বিশ্বাসী এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সদাসর্ব্বদাই এইস্থানে পূজার্থ আগমন করেন; কিন্তু বিধর্ম্মিগণ বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ এই প্রস্তরখণ্ডকে হেয়জ্ঞান বা অপমান করিলে, জলাশয়স্থ দৈত্যরাজ বায়ু উৎপাদন করিয়া বৃষ্টি আনয়ন করেন।

হ্রদের পার্শ্বে এবং নিকটেই একটী স্তূপ। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে এইস্থানে হস্তীরাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার ছয়টী দন্ত ছিল। দন্তসংগ্রহকামনায় এক শিকারী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এবং ধনুক হস্তে হস্তীরাজের অপেক্ষা করিতে লাগিল। হস্তীরাজ কষায় বসনের প্রতি সম্মান পরবশ হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দন্তগুলি ভগ্ন করিয়া শিকারীকে প্রদান করিলেন।

এই স্থানের পার্শ্বে এবং নিকটেই অন্য একটী স্তূপ। এই স্থানে, বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে মনুষ্যগণের মধ্যে শীলতার অভাব দেখিয়া পক্ষিরূপধারণ করতঃ, এক বানর ও শ্বেতহস্তীকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের মধ্যে প্রথম কে এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দর্শন করিয়াছে?" উভয়ে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী উত্তর করাতে, বুদ্ধদেব বয়সানুযায়ী তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। সর্ব্বত্রই এই কথা প্রচারিত হওয়াতে, মনুষ্যগণ উচ্চ ও নীচের প্রভেদ বুঝিতে পারিল এবং ধার্ম্মিক ও সর্ব্বসাধারণ এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিল।

এই স্থানের অনতিদূরেই বৃহৎ অরণ্যমধ্যে একটী স্তূপ আছে। বহুপূর্ব্বে, এইস্থানে দেবদত্ত ও বোধিসত্ত্ব মৃগরাজ অবস্থায় একটী বিষয় স্থির করিয়াছিলেন। পুরাকালে, এইস্থানে এক অরণ্য মধ্যে দুইটী মৃগযূথ ছিল; প্রত্যেক দলে পাঁচশত মৃগ ছিল। এই সময়ে, তদ্দেশীয় রাজা মৃগয়ার্থ যত্রতত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মৃগরাজ বোধিসত্ত্ব, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ, আপনি প্রত্যহ আপনার মৃগয়াবনে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক এবং তীর নিক্ষেপ করিয়া আমার অনুচরগণকে হত্যা করিতেছেন। সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এইস্থানে রাখাতে, তাহারা খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়। আমি প্রার্থনা করি যে, আমরা প্রত্যহ আপনার আহারার্থ পর্য্যায়ক্রমে একটী করিয়া মৃগ দিব; তাহা হইলে আপনিও সদ্য মাংস পাইবেন, আমাদেরও আয়ু বৃদ্ধি হইবে।" রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, নিজ রথের গতি প্রতিহত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যহ, এইরূপে একটী করিয়া মৃগ হত্যা করা হইতে লাগিল।

দেবদত্তের দলের মধ্যে আসন্নপ্রসবা একটী কুরঙ্গী ছিল; যখন তাহার সময় আসিল, তখন সে দেবদত্তকে নিবেদন করিল "প্রভু, যদিও আমি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তথাপি আমার গর্ভস্থ সন্তানের সময় হয় নাই।" দেবদত্ত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বাঁচিয়া থাকিতে কাহার না সাধ হয়?" কুরঙ্গী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল "প্রভু, যে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাকে হত্যা করা নিষ্ঠুরতা মাত্র।" পরে, কুরঙ্গী বোধিসত্ত্বের নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিল বোধিসত্ত্ব বলিলেন "দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; গর্ভস্থ সন্তানের জন্য মাতা দুঃখিতা হইয়াছেন। অদ্য আমিই তোমার স্থান অধিকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

রাজধানীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজপথে যে সকল লোক গমনাগমন করিতেছিল, তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "মৃগরাজ রাজধানীতে গমন করিতেছেন।" রাজধানীর অধিবাসীবৃন্দ, নগররক্ষক এবং অন্যান্য সকলে এই দৃশ্য দেখিতে তৎপর হইল। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক হইলেন; কিন্তু যখন দ্বাররক্ষক স্বয়ং এই সংবাদ নিবেদন করিল, তখন তিনি বিশ্বাস করিলেন। পরে মৃগরাজকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রয়োজনে তুমি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছ?"

মৃগরাজ উত্তর করিলেন "মৃগযূথের মধ্যে আসন্নপ্রসবা একটী কুরঙ্গীর পালা পড়িয়াছে;

কিন্তু ইহাতে তাহার গর্ভস্থ সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেইজন্য আমিই তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছি।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি মনুষ্যশরীর ধারণ করি বটে, কিন্তু আমি বস্তুতঃ মৃগ। তোমার শরীর ধারণ করিলেও, তুমি মনুষ্য।" পরে, করুণাপরবশ হইয়া, তিনি মৃগকে মুক্ত করিলেন এবং প্রত্যহ মৃগহত্যা হইতে বিরত হইলেন। এ বনও তিনি মৃগদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিলেন এবং সেইজন্য ঐ অরণ্য মৃগদাব নামে কথিত হইতেছে।

এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া এবং সঙ্ঘারামের দক্ষিণপশ্চিম দিকে, ৩০০ শত ফুট উচ্চ একটী স্তূপে উপস্থিত হই। স্তূপের ভিত্তিমূল প্রশস্ত এবং মানবটীও উচ্চ। মন্দিরটী মূল্যবান দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরটী একতল এবং গম্বুজের উপরাংশে দণ্ড থাকিলেও, উহাতে ঘূর্ণায়মান ঘণ্টা নাই। উহার সন্নিকটেই অন্য একটী ক্ষুদ্র স্তূপ। এই স্থানেই অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য এবং অন্যান্য পাঁচজন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সর্ব্বার্থসিদ্ধ যখন সর্ব্বপ্রথম নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতমধ্যে বাস করিতে ও গুহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ধর্মচর্য্যা করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধোধনরাজ তিনজন জ্ঞাতি ও দুইজন মাতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধ জ্ঞানশিক্ষাভিলাষে গৃহপরিত্যাগ করিয়াছেন; তিনি একাকী পর্ব্বতে এবং প্রান্তরে ভ্রমণ করেন এবং সঙ্গিহীন হইয়া অরণ্যে বাস করেন। আমি সেইজন্য আপনাদের আদেশ করিতেছি যে আপনারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া, তিনি কোথায় বাস করিতেছেন তাহা অনুসন্ধান করুন। তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন, আপনারা তৎপর হইয়া তাহা নির্দ্ধারণ করুন।" উপরোক্ত পাঁচজন, এই আদেশানুযায়ী দেশের বহির্ভাগে একত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তখন তাঁহাদিগের মনেও গৃহপরিত্যাগের বাসনা উদিত হইল এবং সেইজন্য তাঁহারা পরস্পরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া জ্ঞানলাভ হয় কিম্বা সুখে কালাতিপাত করিলে হয়?" দুইজন উত্তর করিলেন "বিশ্রাম এবং সুখকর আজ্ঞাধীনত্ব দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়।" অপর তিনজন উত্তর করিলেন, ক্লেশ দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়।" এই প্রকারে, যখন তাহাদের বাগবিতণ্ডা চলিতেছিল, তৎপূর্ব্বেই রাজপুত্র, বিধর্ম্মিদিগের কষ্টকর আজ্ঞাধীনত্ব দ্বারা দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইবেন মনে করিয়া, তাহাদের ন্যায়, শরীরধারণের জন্য যৎসামান্য চাউল গ্রহণ করিতেছিলেন মাত্র।

উপরোক্ত দুই জন রাজপুত্রকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে বলিল যে, রাজপুত্রের এইরূপ ক্লেশ স্বীকার শাস্ত্র "বিগর্হিত; প্রীতিকর পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়; কিন্তু যখন তিনি ক্লেশকর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তিনি কদাচ আমাদের সঙ্গী হইতে পারিবেন না।" তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করিল। ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর ক্লেশস্বীকার করিয়াও বোধিলাভ না হওয়ায় রাজপুত্র তখন তাহাদের কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই মোক্ষলাভ হইবে, এই মনে করিয়া এই প্রকার ক্লেশকর তপস্যা হইতে বিরত হইতে ইচ্ছুক হইলেন, পরে, তিনি বালিকা দত্ত পরমান্ন গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন ও এই প্রকারে মোক্ষ লাভ হইবে, বিবেচনা করিলেন। ইহাতে যে তিন জন অনুসন্ধানকারী, ক্লেশ ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয়না মনে করিতেন, তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "রাজপুত্র কেবলমাত্র পুণ্যার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণ সকলই বিনষ্ট হইল। ছয় বৎসর গভীর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এক দিনেই তিনি তাঁহার সকল পুণ্য নষ্ট করিলেন।" তাঁহারা অপর দুই জনকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। সকলে একত্রিত হইলে, তাহারা উপবেশন করিয়া উত্তেজিত স্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন

"পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বার্থসিদ্ধকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য প্রান্তরে যাইতে দেখিয়াছি; তিনি তাঁহার বসন ও মণিমুক্তা পরিত্যাগ করিয়া বল্কল গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং, পরে, স্থিরচিত্তে ও একাগ্র মনে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ফল লাভের জন্য অসীম ক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ, সকল পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষক-কন্যাদত্ত পরমান্ন গ্রহণ করিয়া, সকল বিনষ্ট করিয়াছেন। আমরা বুঝিতেছি, তিনি আর কোন কর্ম্মেই সক্ষম হইবেন না।"

অপর দুই জন উত্তর করিলেন "আপনারা কি প্রকারে, এতক্ষণে এই ব্যক্তি যে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করে, বুঝিতে পারিলেন? যখন তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, তখন সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সম্মান করিতেন এবং তিনি ক্ষমতাশালী ছিলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য, তিনি চক্রবর্ত্তী রাজার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে ও অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কি বিবেচনা করিব? তাঁহার কথা স্মরণ হইলে দুঃখের উপর আরও দুঃখ হয়।"

এইক্ষণ, বোধিসত্ত্ব, নৈরঞ্জন নদীতে স্নান করিয়া, বোধি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিয়া "দেবতা ও মনুষ্যাধিপতি" নামে আখ্যাত হইলেন। পরে, নির্জ্জনে কে মোক্ষলাভ করিবার উপযুক্ত, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "রামের পুত্র উদ্রই ইহার উপযুক্তপাত্র, কেননা তিনি সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন," এই কথা শ্রবণ করা মাত্র, আকাশ-স্থিত দেবতাগণ, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "রামপুত্র উদ্র অদ্য সপ্তাহকাল দেহত্যাগ করিয়াছেন।" তথাগত এই সংবাদ শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "উদ্র ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতে এবং দীক্ষা গ্রহণে অত্যন্ত অভিলাষী ছিলেন; কেন আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল না?" পরে, পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কাহাকে দীক্ষা দিবেন, এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া কালামকে দীক্ষিত করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেই আকাশস্থিত দেবতাগণ বলিলেন, তিনি পাঁচদিবস দেহত্যাগ করিয়াছেন। তথাগত পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নিজ অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন পুনর্ব্বার কাহাকে দীক্ষা দিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃগদাব-স্থিত পূর্ব্বোক্ত পাঁচব্যক্তির কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তখন, তথাগত বোধিবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে এবং গম্ভীর ভাবে, প্রদীপ্ত জ্যোতিঃসহ মৃগদাবে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কেশ হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অবয়ব সুবর্ণনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই পাঁচ জনকে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রসন্ন চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে কথোপকথন করিতে লাগিলেন "এই স্থানে, সেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ আসিতেছেন; তিনি বহুবৎসর ধরিয়া মোক্ষলাভের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন; এইক্ষণ তাঁহার শিথিলতা আসিয়াছে এবং আমাদিগকে শিষ্য করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইতেছেন; আমরা উঁহাকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইবনা বা সম্মান করিবনা। আমরা নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া থাকি।"

তথাগত, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, তাঁহার দর্শনে সকল জীব অভিভূত হইল এবং উপরোক্ত ব্যক্তিগণ, নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং ভক্তিভাবে অনুরক্ত হইল। তথাগত, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন; বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলেই তাহারা বোধিবৃক্ষের ফল লাভ করিল।

মৃগদাবের ২.৩ লি পূর্ব্বে, আমরা একটী স্তূপে উপস্থিত হইলাম। ইহার সন্নিকটে ৮০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটী শুষ্ক জলাশয় আছে; এই জলাশয়ের এক নাম "মৃত সঞ্জীবনী"; অপর নাম "অনুরাগী প্রভু।" এ সম্বন্ধে প্রাচীন কিংবদন্তী এইরূপ। বহু-বৎসর পূর্ব্বে, এই জলাশয়ের সন্নিকটে, এক বৃদ্ধ তপস্বী লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে বাস করিতেন। তিনি যাদুবিদ্যা আচরণ করিতেন এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ডকে মূল্যবান প্রস্তরে এবং মনুষ্য ও পশুজাত জন্তুকে ভিন্নাকারে পরিণত করিতে পারিতেন।

কিন্তু তিনি আকাশমার্গে গমনাগমনে বা ঋষিদিগের ন্যায় উর্দ্ধে আরোহণে সক্ষম ছিলেন না। পরে, নানারূপ গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, যে সকল ঋষিগণ দীর্ঘজীবন লাভের প্রক্রিয়া জানেন, তাঁহারাই উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারেন। এবিষয় শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দশফুট পরিধি বিশিষ্ট একটী বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; পরে কোন বিশ্বাসী ও সাহসী বীর, দীর্ঘ তরবারি হস্তে, বেদীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া স্থগিত রাখিবেন। যিনি ঋষি হইবার ইচ্ছা করেন, তিনি বেদীর মধ্যস্থলে বৃহৎ ছুরিকা হস্তে উপবেশন করিয়া মন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সকলদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। অরুণোদয়ে, তাঁহার হস্তস্থিত ছুরিকা, রত্নখচিত তরবারিতে পরিণত হইবে এবং তিনি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতে থাকিবেন এবং ঋষিগণের উপর আধিপত্য করিবেন। হস্তস্থিত তরবারি ঘুরাইয়া, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পূর্ণ হইবে এবং তিনি জরা,বৃদ্ধত্ব এবং মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবেন। পূর্ব্বোক্ত যাদুকর, এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, "অমরত্বের প্রভু"র অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। বহুবৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানেও তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে, কোন নগরে একব্যক্তি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে দেখিতে পাইলেন। যাদুকর, এই ব্যক্তির শরীর-চিহ্ন দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য ক্রন্দন করিতেছ এবং কি জন্য তুমি এত ব্যথিত হইয়াছ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত এবং ভরণপোষণের জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া এবং আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী জানিয়া, আমার পরিশ্রমানুযায়ী বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পাঁচবৎসরের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে আমি ধৈর্য্যসহকারে কার্য্য করিতে থাকি। পাঁচবৎসরান্তে, এক দিবস প্রাতঃকালে, আমার সামান্য ত্রুটীর জন্য আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া এবং বেতন স্বরূপ এক পয়সাও না দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এই কারণে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। অহো! কে আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবে?"

যাদুকর, উহাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং নিজ কুটীরে উপস্থিত হইয়া, যাদুবিদ্যা দ্বারা তিনি সুস্বাদু খাদ্য আনয়ন করিয়া তাহাকে জলাশয়ে অবগাহন করিতে আদেশ দিলেন। পরে তিনি তাহাকে নূতন বসন প্রদান করিলেন এবং পাঁচশত সুবর্ণ মুদ্রা দান করিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিয়া বিদায় দিলেন,—"যখন ইহা নিঃশেষিত হইবে তখন এই স্থানে আগমন করিয়া, দ্বিধাশূন্য হইয়া পুনরায় প্রার্থনা করিবে।" অতঃপর, তিনি তাহাকে সদাসর্ব্বদাই উপহার দিতে লাগিলেন এবং গোপনে নানা প্রকার উপকার করিতে লাগিলেন; ইহাতে সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইল এবং এই সকল উপকারের জন্য প্রাণদিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। এই বিষয় বুঝিতে পারিয়া যাদুকর তাহাকে বলিলেন "আমি একজন উৎসাহী ব্যক্তি চাই। বহুবৎসর ধরিয়া আমি এইরূপ ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়াছি; অবশেষে সৌভাগ্য বশতঃ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; তুমি দেখিতে সুন্দর এবং অপরের তুল্য নও। এইক্ষণ, আমি প্রার্থনা করি, যে তুমি নিস্তব্ধ থাকিয়া এক রাত্রি প্রহরীর কার্য্য কর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

দৃশ্য কাব্যের সাহিত্যিক উৎপত্তি।

ভারতীয় নাট্যকলার সাহিত্যিক লক্ষণসমূহ কিরূপে প্রকাশ পাইল—ভারতীয় নাট্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাহার ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য জাতীয় রচনাসমূহের ন্যায় নাট্য জাতীয় রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলি বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়াছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিক ইতিহাস যে বিষয়ে নিস্তব্ধ, আমাদের সংগৃহীত কতকগুলি প্রমাণ-লেখ্য ও সাক্ষ্য সেই শূন্য নিস্তব্ধতাকে পূরণ করিতে সমর্থ।

গোড়া ধরিতে গেলে ভারতীয় দৃশ্যকাব্য মহাকাব্যের খুব কাছাকাছি। সম্ভবত ভারতীয় দৃশ্যকাব্য মহাকাব্য হইতে প্রসূত;—অন্তত মহাকাব্য হইতে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাটদিগের বর্ণিত পুরাতন ইতিহাস, দুই জাতীয় রচনায় পর্য্যবসিত —এক—মহাকাব্য, দ্বিতীয়—নাটক।

কালিদাসের রঘুবংশ—বাল্মীকির রামায়ণের অনুরূপ, এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলা পুরাতন কুশীলবদিগের অভিনয়ের অনুরূপ। সাহিত্য-দর্পণে মহাকাব্যের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—"মহাকাব্য সর্গবদ্ধ হইবে; উহার একটি নায়ক দেব-বিশেষ হইবে; অথবা ধীরোদাত্তগুণান্বিত সদ্বংশ ক্ষত্রিয় হইবে। একবংশপ্রসূত অনেক নৃপতি উহার নায়ক হইবে। শৃঙ্গার, বীর, শান্ত—এই রসগুলি উহার অঙ্গী হইবে এবং অন্য সমস্ত রস উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে নাটক-সন্ধিগুলি সমস্তই থাকিবে। উহার বৃত্তান্ত, ইতিহাস বা সজ্জনাশ্রয় অন্য কোন বিষয় হইতে উৎপন্ন হওয়া চাই। উহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ থাকিবে, উহার মধ্যে একটি ফলস্বরূপ হইবে। আদিতে নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা বস্তুনির্দ্দেশ হওয়া চাই। কখন বা খলের নিন্দা কখন বা সজ্জনের গুণকীর্ত্তন থাকিবে। পদ্য এক ছন্দবিশিষ্ট হইবে, অবসানে অন্য ছন্দবিশিষ্ট হইবে। নাতিস্বল্প, নাতিদীর্ঘ এইরূপ অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে।... সর্গান্তে ভাবি সর্গের কথা সূচিত হইবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, ইন্দু, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিবস, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, ভুবন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, পুত্রের জন্ম ইত্যাদি বিষয় সকল যথাযোগ্যরূপে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্ণিত হইবে।"

মহাকাব্যের এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আমরা দুইটি মহাকাব্যগত বিষয়ের নির্ঘণ্ট নিম্নে দিতেছি। এই দুইটি মহাকাব্য দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত—এমন কি দুই প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ভুক্ত কবির রচিত। উহার মধ্যে একটী "শ্রীকণ্ঠ চরিত"—দ্বাদশ শতাব্দীতে, কাশ্মীর প্রদেশে, মঙ্খ কর্ত্তৃক রচিত; অন্যটি "ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়", কোন এক অজ্ঞাত যুগে হরিচন্দ্র নামক একজন জৈন কর্ত্তৃক রচিত।

শ্রীকণ্ঠ রচিত।—১। আশীর্ব্বাদ।—২। ধনশালী ও দুষ্ট লোকদিগের বর্ণনা।—৩। দেশ ও জাতি প্রভৃতির বর্ণনা।—৪। কৈলাস-পর্ব্বতের বর্ণনা।—৫। মহাপ্রভুর বর্ণনা।—

৬। বসন্তকালের সাধারণ বর্ণনা। ৭। বাঁশ বাজির বর্ণনা।—৮। পুষ্পচয়নের বর্ণনা। —৯। জলক্রীড়ার বর্ণনা।—১০। প্রদোষ বর্ণনা।—১১। চন্দ্রের বর্ণনা। ১২। চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা।—১৩। প্রসাধনের বর্ণনা। —১৪। পান-বিনোদের বর্ণনা।—১৫। বিবিধ ক্রীড়ার বর্ণনা।—১৬। উষা বর্ণনা। —১৭। পরমেশ্বরের সহিত পুনর্মিলনের বর্ণনা।—১৮। গণদিগের সংমিশ্রনের বর্ণনা। —১৯। গণদিগের সমুত্থানের বর্ণনা। —২০। রথসজ্জার বর্ণনা। —২১। গণদিগের বনযাত্রার বর্ণনা।—২২। দৈত্য-পুরীর বিভ্রাট বর্ণনা।—২৩। যুদ্ধ বর্ণনা।—২৪। ত্রিপুরদহনের বর্ণনা। -২৫। গ্রন্থকার ও তাঁহার মিত্রমণ্ডলীর বর্ণনা।

ধর্ম্মচর্মাভ্যুদয়।—১। আশীর্ব্বাদ। ধনাঢ্য ও দুষ্টলোকদিগের বর্ণনা। জম্বুদ্বীপের বর্ণনা। মেরুবর্ণনা। ভারতবর্ষের বর্ণনা। আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণনা। উত্তর কোশল রাজ্যের বর্ণনা। রত্নপুরের বর্ণনা।—২। রাজার, রাজবংশের, ও রাজমহিষীর বর্ণনা। রাজা পুত্রলাভের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। একজন মুনির আগমন। বর্ণনা।—৩। রাজা মুনির অন্বেষণে গেলেন। বন, উপবন ও মুনির বর্ণনা। মুনি রাজাকে জানাইলেন শীঘ্রই তাঁহার একটি পুত্র জন্মিবে। —৪। ধর্ম্মনাথের পূর্ব্বজন্ম। বংসদেশের, সুসীমা-নগরের ও রাজা দশরথের বর্ণনা। দশরথ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। একজন সচিব কর্ত্তৃক চার্ব্বাক্ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। রাজার তপস্যার বর্ণনা।—৫। রাজা মহাসেনের রাজসভায় অপ্সরাদিগের অবতরণ; বর্ণনা। উহারা স্বপ্নযোগে রাণীকে দর্শন দিলেন; স্বপ্নের বর্ণনা। ধর্ম্মনাথ রাণীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।—৬। রাজকুমারের জন্ম। এই উপলক্ষে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের বর্ণনা।—৭। জন্মিবামাত্রই দেবগণ ধর্ম্মনাথকে তুলিয়া সুমেরু পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। পর্ব্বতের বর্ণনা। দেবগণ সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অথ গঙ্গাদির বর্ণনা।—৮। ধর্ম্মনাথের সংস্কারক্রিয়া। পরে দেবগণ ধর্ম্মনাথকে স্বকীয় জননীর নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন।—৯। ধর্ম্মনাথের বাল্য ও যৌবনের বর্ণনা। স্বয়ম্বর ঘোষণা। অনুচরবর্গ লইয়া রাজকুমার তথায় গমন করিলেন; প্রয়াণের বর্ণনা। গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎকার বর্ণনা।—১০। বিন্ধ্যাচলের বর্ণনা। ১১। ঋতু বর্ণনা। ১২। পুষ্পচয়নের বর্ণনা।—১৩। নর্ম্মদা নদীতে জলক্রীড়া। ১৪। সন্ধ্যা বর্ণনা; ক্রীড়াকলাপ ও রাত্রির বর্ণনা। ১৫। উষা বর্ণনা। ধর্ম্মনাথের বিদর্ভদেশে গমন। বিদর্ভ দেশের বর্ণনা।—১৬। স্বয়ম্বর বর্ণনা; রাজকুমারী ধর্ম্মনাথকে বরণ করিলেন। সমারোহসহকারে রাজধানীতে প্রবেশ। রমণীদিগের গতিভঙ্গীর বর্ণনা; বিবাহের বর্ণনা; বিমানারোহণে রাজকুমারের পিত্রালয়ে যাত্রা, যাত্রাপথের বর্ণনা। ১৮। রত্নপুরে উৎসবাদির বর্ণনা। রাজা মহাসেন সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। পুত্রের নিকট নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন। ধর্ম্মনাথের যৌবরাজ্যাভিষেকের বর্ণনা। স্বকীয় পিতার সন্ন্যাস গ্রহণ বর্ণনা। ১৯। ধর্ম্মনাথের সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রবৃত্ত যুদ্ধাদির বর্ণনা।—২০। উল্কা বর্ণনা। ধর্ম্মনাথও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন;

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, দেবগণের মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত করিবার জন্য গমন করিলেন, দেব-সভার বর্ণনা।—২১। জৈন মতের ব্যাখ্যা।

আমরা ইচ্ছা করিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি মহাকাব্য দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছি; কেন না, ঐ দুইটি মহাকাব্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রচলিত উপাদানগুলি স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট আছে; কোন প্রতিভাবান গ্রন্থকার আপনার মানস-ভাণ্ডার হইতে নূতন রত্ন বাহির করিয়া যেরূপ মৌলিকতার পরিচয় দেন—উহাতে সেরূপ কোন মৌলিকতা নাই। বাস্তবপক্ষে যদি আমরা কালিদাসের রঘুবংশ, ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয়, তাহার সমসাময়িক মাঘের শিশুপালবধ প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি তো দেখিতে পাইব, উহাদের সকলের মধ্যেই একই ধরণের প্রাসঙ্গিক বর্ণনার বাহুল্য এবং বিষয়-সম্বন্ধে একই প্রকার দৈন্য। নাট্যগ্রন্থগুলিতে আখ্যানবস্তু ও বর্ণনা এই উভয়ের মধ্যে পরিমাণ-বৈষম্য দেখিয়া-দেখিয়া ক্লান্ত হইতে হয়। যে সকল বিষয় মহাকাব্যের আলোচ্য সেই বিষয়গুলির তালিকা প্রায় অবিকল, নাট্য সাহিত্যের উপদেশের মধ্যেও ভুক্ত করা যাইতে পারে। তা ছাড়া, সেই একই রকমের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উক্ত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কথা ও, আখ্যায়িকায়, একটা বর্ণনামালা ন্যূনাধিক নিপুণতা সহকারে আখ্যানবস্তুর সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয়। বাণ-কবি যাহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং অনুকরণ করিয়াছেন সেই সুবন্ধুপ্রণীত গ্রন্থ বাসবদত্তাকে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে সহজে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে;—উহাতে কতকগুলি উপাখ্যান ও কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ আছে মাত্র। ঋতু ও ঋতুর পরিবর্ত্তনের বর্ণনা করিয়া এই আখ্যায়িকাটিকে যদৃচ্ছাক্রমে বাড়ান হইয়াছে। বর্ষঘটিত পরিবর্ত্তন, আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, দিবারাত্রি, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত—এই সমস্ত বিষয় লইয়া রাশিরাশি কৃত্রিম গুণবাচক সংজ্ঞা ও উদ্ভট উপমার দ্বারা উহাকে ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। সাধারণ ধরণের প্রসঙ্গাদি একবার নিঃশেষিত হইয়া গেলে, আখ্যায়িকাটি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বর্ণনার মধ্যে বিন্ধ্যাচল, নর্ম্মদা এবং উহাদের চিত্রবৎ শোভা সৌন্দর্য্য অবশ্যই একটা গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু সুবন্ধু ঐ সমস্ত বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই।" (১) বাণ যে গ্রন্থে স্বীয় আশ্রয়দাতা কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের চরিতাখ্যান লিখিয়াছেন সেই হর্ষচরিত গ্রন্থের দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে, ইতিহাস দশ পৃষ্ঠাও অধিকার করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সকল অবস্থা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে সেই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত প্রেমিকদিগের বর্ণনা নাট্য-কবিদিগের একটা সাধারণ বর্ণনীয় বিষয়—এই বিষয়টি উত্তরাধিকারসূত্রে নাটকে আসিয়া বর্ত্তিয়াছে। স্বয়ং কালিদাস হইতেও আমরা উহার উৎপত্তির আভাস পাই। শকুন্তলার সখীগণ প্রতিদিন দেখিতেছেন,—দৈহিক তাপের বৃদ্ধি হইতেছে, শকুন্তলা দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, কষ্ট পাইতেছেন। শকুন্তলা গুপ্ত প্রেমের

(১) Hall—বাসবদত্তার ভূমিকা, পৃ ২৭—২৮

কথা সখিগণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছেন না। কিন্তু অনুসূয়া প্রকৃত ব্যাপারটা আবিষ্কার করিল; "দেখ শকুন্তলে, মদন-ব্যাপারের রহস্য আমরা কিছুই বুঝিনে, কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহীজনের অবস্থা যেরূপ শুন্‌তে পাই, তোমার যেন সেইরূপ হয়েছে। (২) নাটক ও মহাকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে, আর একজাতীয় রচনা আছে যাহাকে বিলাপ-কাব্য (Elegy) বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যে, কালিদাসের একটি উৎকৃষ্ট কাব্য মেঘদূতই, এই জাতীয় রচনার আরম্ভ। একজন নির্ব্বাসিত ও বিরহী যক্ষ একটি মেঘখণ্ডের নিকট তাহার জ্বলন্ত ও বিষাদময় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া দূতস্বরূপ তাহাকে তাহার প্রিয়তমার নিকট প্রেরণ করিতেছে। এই জাতীয় একটি পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা প্রাকৃত-ভাষায় সংরক্ষিত আছে।—"সপ্তশতক" নামক হাল কর্ত্তৃক সংকলিত একটি কবিতা-মালা। ইহা ৭০০ শ্লোকে বদ্ধ। ইহাতে পাত্রগুলির প্রণয়ব্যাপার অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণানুরূপ। নায়ক, নায়িকা, বন্ধু, সখী, দূতী ইত্যাদি সকলেই এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আদিরসের বিবিধ ভাব প্রকাশ করিতেছে যে ভরতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিষ্যদিগেরও বিলক্ষণ ঈর্ষা হইতে পারে।

যাহা অন্যান্য সমস্ত জাতীয় রচনার উত্তরাধিকারী অথবা জনক সেই নাটককে আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যিক রচনার যে আদর্শ-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন—নাটক সেই আদর্শ-উপাধির যোগ্য সন্দেহ নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ—বামন-প্রণীত "কাব্যালঙ্কার-সূত্র-বৃত্তি", এই সম্বন্ধীয় সাধারণ মতটিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছে; "সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মধ্যে নাট্যের দশরূপই শ্রেষ্ঠ (রূপক, নাটক ইত্যাদি)। একটি বহুবর্ণ চিত্রের ন্যায়, উহাতে অন্যান্য জাতীয় রচনার সমস্ত লক্ষণগুলি সম্মিলিত হইয়াছে।"

(সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃঋণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রডিক-গৃহে।

কারখানায় কাজ শিখিতে আসিয়া জ্যাক অস্থির* হইয়া পড়িল। চারিধারে অবিরাম ভীষণ কোলাহল,—পার্শ্বের লোকের কথা শুনা যায় না। তিন শত বড় মুগুরের ঘা পড়িতেছে, তাহার সহিত তিনশত ব্যক্তির উৎসাহ-প্রযোজক উচ্চ চীৎকারধ্বনি উঠিতেছে। তদ্ভিন্ন কোন ধারে অবিশ্রাম-গতিতে বড় বড় চাকা ঘুরিতেছে—কোন খানে বা বাষ্প-নির্গমনের সুভীষণ শব্দ—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই!

কারখানার মধ্যে রুক্ষকেশ মলিনবেশ কুৎসিত কারিকরের দল—কেহ হাপরে কাজ করিতেছে—কেহ চাকায় তৈল প্রদান করিতেছে—কেহ চাকা ঘুরাইতেছে—কেহ বা

* শকুন্তলা—তৃতীয় অঙ্ক।

হাতুড়ি পিটিতেছে। ইহাদের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া জ্যাক নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে! তাহার মস্তক বহিয়া ললাট বহিয়া ঘর্ম্মবারি ঝরিয়া পড়িতেছে—হাতে মুখে কালি লাগিয়াছে—বেশভূষাও নিতান্ত বিশ্রী! এই দূরত্ব ভেদ করিয়া সার্লটির দৃষ্টি যদি জ্যাকের উপর নিক্ষিপ্ত হইত ত সে আপনার পুত্রকে চিনিতে পারিত না! এই কি জ্যাক? শীর্ণ, মলিন, এক বালক, হাতের উপর ছিন্ন জামার আস্তিন গুটান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, চোখ দুইটা লাল, গণ্ড ও গলদেশের ভাঁজে ভাঁজে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া পড়িয়া মনে হইতেছে, কে কালির দাগ কাটিয়া দিয়াছে! জ্যাকের এ মূর্ত্তি দেখিলে সার্লটি নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই!

জ্যাকের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল, লিবসাম নামে এক সর্দ্দার কারিকরের উপর। লিবসামের প্রকৃতি ছিল উগ্র, কর্কশ। জ্যাকের এই শান্ত নিরীহভাব, কারখানার কঠোর কার্য্যের পক্ষে তাহার এই অপটুতা লিবসামের প্রাণে এতটুকু করুণতার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক করিত! তাহার কঠিন পরুষ দৃষ্টির সম্মুখে বালক আরও থতমত খাইয়া যাইত। তথাপি সে সাধ্যমত আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে চেষ্টা করিত। হাতে ফোস্কা পড়িয়া, যন্ত্রণা হইলেও সে আদেশমত কার্য্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। সে আপনাকে এই কারখানার প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলারই একটা অংশবিশিষ্ট মনে ভাবিয়া কাজ করিত। এই যন্ত্রগুলার যেমন সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ নাই, মানুষের আদেশমত চলাফেরা করিয়া মানুষের কাজটুকু সম্পন্ন করিয়া দেওয়াই তাহাদিগের কর্ত্তব্য, কখনও কোন অনুযোগ-অভিযোগের ধার ধারে না, ধারিলেও তাহা কেহ গ্রাহ্য করিবে না, তাহার অবস্থাও তেমনই! তাহারও সুখ নাই,—দুঃখ নাই, সর্দ্দারের আদেশমত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যই সমাধা করিয়া দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য! তাহার আবার অনুযোগ কি? অভিযোগই বা কি থাকিতে পারে?

কি দুর্ব্বিসহ এ জীবন! বিশেষতঃ গত দুই বৎসরের মুক্ত স্বাধীন জীবন-প্রবাহের পর এ কি কঠোর বন্ধন! এ যে নিতান্ত অসহ্য! হউক অসহ্য, তবু মুক্তি নাই—উপায়ান্তর নাই!

প্রত্যূষে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে রুডিক তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিত, "জ্যাক, কারখানার সময় হল—উঠে পড়।" নিদ্রিত নিস্তব্ধ গৃহের দেওয়ালে-দেওয়ালে সে স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। এক টুকরা রুটি দ্রুত নিঃশেষ করিয়া, ক্লারিসার প্রদত্ত জলে গলা ভিজাইয়া রুডিকের সহিত জ্যাক পথে বাহির হইয়া পড়িত। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়া তখন সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা জগতে নামিবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে—ভোরের পাখী বাসা হইতে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছে, চারিধারে আকাশ নদী ও বন্দরের বক্ষে জীবনের স্পন্দন আবার অল্প সূচিত হইবার উপক্রমে করিতেছে এবং কারিকরের শান্তি ভাঙ্গাইয়া প্রাণ কাঁপাইয়া কারখানার ঘণ্টা অবিশ্রাম ঢং ঢং শব্দ করিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্যে সচকিত করিয়া দিতেছে!

কারখানার নির্দ্দিষ্ট হাজিরার সময়ের দশমিনিট পরে প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়—ঘণ্টাও থামিয়া যায়! এই সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে না পারিলে প্রথম অপরাধে জরিমানা, দ্বিতীয়বারে মাহিনা কাটিয়া লওয়া হয়—তৃতীয়বার এ অপরাধ করিলে কারখানা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়! জ্যাকের মনে হইত, আর্জেন্তর নিয়ম যতই কঠিন ও নির্দ্দয় হউক না কেন, ইহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে!

একটা বিষয়ে জ্যাকের বড় ভয় ছিল—পাছে কোনদিন ঠিক সময়ে কারখানায় হাজিরা দিতে সে না পারে! সেইজন্য সময়ের কিছু পূর্ব্বে—অপর কারিকরদিগের পৌঁছিবার প্রাক্কালেই কারখানার প্রবেশদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত! একদিন শুধু কয়েকটা কারিকরের দুষ্টামিতে তাহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেদিন ভোরে বেশ একটু জোরে বায়ু বহিতেছিল—পথে জ্যাকের টুপি হঠাৎ বায়ুর বেগে উড়িয়া যায়। পশ্চাতে কয়েকটা কারিকর আসিতেছিল—তাহারা উল্লাসে চীৎকার করিয়া টুপিটাকে লোফালুফি করিতে করিতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল—বেচারা জ্যাক বহুকষ্টে টুপি, উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, কারখানার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেদিন তাহার কষ্টের সীমা ছিল না। বেচারা ফটকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। চোখের জল বাধা মানিল না। সে ভাবিল, সে কি করিয়াছে—এই কারিকরগুলার কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, চিন্তাতেও সে কাহারও অনিষ্ট করে না, তথাপি ইহারা জ্যাককে এত জ্বালাতন করে কেন? চারিধার হইতে অজস্র ঘৃণা, দ্বেষ হিংসা, কেন তাহার শিরে বর্ষিত হয়? সে নিতান্তই অভাগা, পরিত্যক্ত, ভাগ্যলক্ষ্মীর একান্ত উপেক্ষিত, কাহারও অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না—কাহারও সুখের মাত্রা হইতে তিল অংশও সে কামনা করে না—তবু কেন হা! ভগবান ইহাদিগের বক্রদৃষ্টি হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই? এক শ্রেণীর তরুলতা যেমন আপন জীবনধারণের জন্য একান্তভাবে উত্তাপের মুখাপেক্ষা করে, জ্যাকও তেমনই আপনার জন্য এতটুকু স্নেহ, একটি মিষ্টকথা বা আদর-বচনের মুখ চাহিয়া থাকে, সেটুকু না হইলে জ্যাকের চলে না! কিন্তু এখানে না আছে ভালবাসা, না আছে স্নেহ! একটি বিন্দুও নাই!

আসল কথা, কারখানার লোকগুলা জ্যাককে বড় পছন্দ করিত না। এই নিরীহ নম্র শান্ত বালক,—নারীসুলভ মুখশ্রী লইয়া কারখানায় কি করিবে? এখানে চাই পরুষ বলিষ্ঠ দেহ, অশান্ত উগ্র প্রকৃতি! কিন্তু জ্যাকের তাহা কিছুই ছিল না, কাজেই তাহার পক্ষে কারখানার সহিত খাপ খাইয়া যাওয়া একান্ত অসম্ভব! প্রত্যহই তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ শ্লেষ চলিত। অত্যাচার নির্য্যাতনও কি অল্প ছিল? একদিন একটা তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া এক সঙ্গী কারিকর আসিয়া তাহাকে কহিল, "এইটে একবার ধরত, জ্যাক, আমায় সর্দ্দার ডাকছে, শুনে আসি, শীগগির!" বেচারা জ্যাক সরলভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এমন হাত পুড়াইয়া ফেলিল যে তাহার ফলে একসপ্তাহ তাহাকে হাঁসপাতালে বাস

করিতে হইল! তাহার উপর, এমন দিন ছিল না, যেদিন ঘুসি চড় জ্যাকের অঙ্গে বর্ষণ করিতে কেহ ক্ষান্ত থাকিত!

কিন্তু সপ্তাহে একদিন ছিল, যেদিন জ্যাকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিত, যেদিন তাহার ভাগ্যে আনন্দ ও বিশ্রাম মিলিত, —সেদিনটি রবিবার। এই রবিবারে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া ডাক্তার রিভালের প্রদত্ত গ্রন্থরাজি হইতে দুই একখানি গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া সে নদীর ধারে নিরালায় বসিয়া এক নূতন জগতের পরিচয় লাভ করিত! ভগ্ন জনহীন ঘাটের প্রান্তে সে বহি খুলিয়া বসিত, অদূরে ঘাটের পদতলে নদীর ঢেউ আসিয়া উছলিয়া পড়িত—যেন কোন্ অমরীর ললিত, সান্ত্বনা-বাণী ধীরে ধীরে জ্যাকের প্রাণ শীতল আশ্বাসে ভরিয়া তুলিত। সে বহির পাতা উল্টাইয়া যাইত, কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না —তথাপি এই অজানা জগতে অস্ফুট রহস্যা-লোকে সে কিসের সন্ধান পাইত, তাহা সেই জানিত! ইহার মধ্যেই সে মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, বন্ধুর অমল সৌহার্দ্দের পরিচয় লাভ করিত। বহি দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্ত আবেশে ভরিয়া আসিত, মানসচক্ষের সম্মুখে বাহ্যজগৎ মিলাইয়া যাইত—মার মুখের বাণী, ডাক্তার রিভালের আদরের স্বর, সসিলের সুমধুর কলহাস্য, সমস্ত মিলিয়া জ্যাকের হৃদয়ে আনন্দ-নির্ঝরের সৃষ্টি করিত! বালক সেই দুর্লভ সুধাস্পর্শে সপ্তাহের অতীত ছয়টা দিনের সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। আপনাকে অপূর্ব্ব সুখী ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইত!

অবশেষে বর্ষা নামিল। হিমশীতল বায়ুর বেগ বাড়িল—তখন নদীতীরস্থ শান্তি-কুঞ্জে এই মহাতীর্থে আসিবার জ্যাকের আর কোন উপায় রহিল না। রবিবারের অবসর-মুহূর্ত্ত-গুলা নিরানন্দে কাটাইতে হইবে ভাবিয়া সে রুডিক গৃহেই অগত্যা বহি খুলিয়া বসিল।

বালকের শান্তপ্রকৃতিতে রুডিক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্লারিসা জেনেদাও তাহাকে ভালবাসিত। সকল রকম ফরমাস খাটিয়া সে জেনেদার হৃদয়টিকে ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। এই নিরীহ বালকটির উপর রুডিক পরিবারের প্রকৃতই মায়া পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। জ্যাকের কর্ম্মসঙ্গীগুলা তাহার অসমতা লইয়া যখন রুডিকের নিকট অনুযোগ করিতে আসিত, রুডিক তখন মৃদু হাসিয়া জ্যাকের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিত, "বড় ভালমানুষ বেচারা!"

রুডিক ভাবিত, লেখাপড়া লইয়াই বালক থাকিতে ভালবাসে—এ সব কঠিন কাজ উহার শক্তিতে কুলাইবে কেন? কারখানায় না আসিয়া যদি স্কুলের শিক্ষক বা পাদ্রী হইবার সে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে লেখা-পড়া ভাল ছিল—কিন্তু কারখানায় কাজ করিয়া যখন তাহাকে জীবিকায় সংস্থাপন করিতে হইবে, তখন ঐ লেখাপড়ার অনুরাগটা কিছু কমাইলেই ভাল হয়! জ্যাককে একবার সে এই বিষয়টার আভাসও দিয়াছিল, তাহাতে জ্যাক তাহার পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া করুণ স্বরে বলিয়াছিল, "আমি ত আর কখন বই পড়ি না, শুধু ছুটির দিন একটু পড়ি—মার জন্যে মন কেমন—" জ্যাকের স্বরটুকু ভাঙিয়া গিয়া তাহার বক্তব্যটিকে

সম্পূর্ণ করিতে দিল না। রুডিকের প্রাণে সেই কাতর দৃষ্টি, সেই করুণ সুর, তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিঁধিয়াছিল, তাহার পর সে জ্যাককে দ্বিতীয় বার আর গ্রন্থ পাঠ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পায় নাই।

সেদিন বর্ষার রবিবার যখন ম্লানভাবে আসিয়া দেখা দিল—বারিধারে নিরানন্দ অবসাদে আচ্ছন্ন হইল, তখন ক্লারিসা আসিয়া জ্যাককে কহিল, "ও কি বই পড়ছ, জ্যাক?"

জ্যাক বলিল, "একটা গল্প!"

"চেঁচিয়ে পড় না—আমি শুনি।"

জ্যাক তখন তাহার এই নবাগতা শ্রোত্রীর চিত্তবিনোদনার্থ গল্প পড়িয়া যাইতে লাগিল। কত বিচিত্র সে বেদনাহর্ষের কাহিনী—কত আশা নিরাশার মধ্য দিয়া কত প্রমোদ-স্বপ্ন যৌবনগীতির উন্মাদ বহিয়া চলিয়াছে—গল্প শেষ হইলে জ্যাক দেখিল, তাহার শ্রোত্রী কাহিনী-বর্ণিত নরনারীর দুঃখে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে!

ইহার পর হইতে যখনই জ্যাক বহি পড়িত তখনই ক্লারিসা আসিয়া সাগ্রহে তাহার বহি শুনিত। এই মুগ্ধা অনুরক্তা শ্রোত্রীটির উপর জ্যাকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বে সে বহি পড়িত, আপনার সুখের জন্য—এখন হইতে ক্লারিসাকে গল্প পড়িয়া শুনাইয়া তাহার যে সুখ হইতে লাগিল, তাহা অননুভূতপূর্ব্ব!

ক্লারিসার প্রকৃতিতে কেমন একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল! রুডিকগৃহ যেন তাহার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত স্থান নহে। সে যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে এই রুক্ষলোকে ছায়ার মত ঝরিয়া পড়িয়াছে! এখানকার এই পরুষতার মধ্যে তাহার কান্ত কোমলশ্রী দেখিলে মনে হইত—সে যেন এখানকার কেহই নহে! তাহার পরিচ্ছন্ন সুশ্রী বেশ, কমনীয় হাবভাব, কেমন এক বিশেষত্বে মণ্ডিত। ইহা লইয়া পল্লীতে কাণাঘুষা চলিত—নিন্দুকের দল রুডিককে একটু করুণার চক্ষে দেখিত—ভাবিত, আহা বেচারা রুডিক! যে স্ত্রীকে সে একান্তভাবে বিশ্বাস করিয়া আপনারই ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে—!

নিন্দুকের কথাগুলায় কি কিছু সত্য নিহিত, ছিল না? কে জানে! নিন্দুকের নিন্দায় ক্লারিসার সহিত শেষে নান্তেঁর নামটাও জড়িত হইয়া গিয়াছিল! এ নিন্দা রুডিকের শ্রুতিকেও আঘাত করিয়াছিল—কিন্তু সে সরল বিশ্বাসীর চিত্তকে এতটুকু নাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই!

ক্লারিসার স্বপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে, সে নান্তেঁকে বিবাহের পূর্ব্ব হইতে চিনিত। পরস্পরের মধ্যে বন্ধনটুকু প্রীতিমধুরও ছিল! ক্লারিসার পিতৃগৃহে নান্তেঁ নিত্য অতিথি ছিল—তাহার বহু অলস অবসর এক-কাল ক্লারিসার সহিত সুখদুঃখের গল্পে কাটিয়াছিল; এবং রুডিক যদি তাহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না করিত, তাহা হইলে নান্তেঁর সহিত তাহার পরিণয় হইয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রুডিকের সহিত ক্লারিসার বিবাহের পূর্ব্বে নান্তেঁ বুঝিতে পারে নাই, ক্লারিসা এমন! নান্তেঁ পূর্ব্বে দেখে নাই, ক্লারিসা এত সুন্দরী তাহার সজ্জিত সুন্দর সুঠাম দেহে এমন লাবণ্যের রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে! কি অন্ধ, নির্ব্বোধ অভাগা সে!

বিবাহের পর ক্লারিসা ও নান্তেঁর বন্ধুত্ব

হ্রাস না হইয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল! রুডিক নিদ্রিত হইলে কত অম্লান জ্যোৎস্নারাত্রি উভয়ে গল্প করিয়া কাটাইয়াছে। পাড়ার লোক রুডিকের কাণে এ কথা তুলিলে রুডিক বলিত, "দোষ কি? নাস্তেঁত আমার ভাই!" পাড়ার লোক হাসিয়া মুখ ফিরাইত, পরস্পরকে ডাকিয়া বলিত, "আহা বেচারা বেচারা, রুডিক!"

নিন্দুকের নিন্দায় একজন বিচলিত হইয়াছিল, সে জেনেদা! জেনেদা প্রসঙ্গে উভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত—জেনেদার সমস্ত প্রাণ দানবী হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত—নিষ্ফল আক্রোশে প্রাণের জ্বালা প্রাণের মধ্যেই সে চাপিয়া রাখিত, ভাবিত, "এ কি গ্রহ—এ কি পাপ!" তাই যখন ম্যানেজারের চেষ্টায় নাস্তেঁ এ গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরে চাকরি করিতে গেল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইল, জেনেদার! বিজয়ীর গর্ব্ব অনুভব করিয়া জেনেদা তখন মনে মনে ভাবিল, "চমৎকার!" তাহার পিতার গৃহ এ দুর্বৃত্তের পাপ হইতে এবার নিস্তার পাইল! এ কি জয়! কি আনন্দ!

সেদিন রবিবার। জ্যাক কাব্য পাঠ করিতেছিল। এবার ক্লারিসা একেলাই শুধু তাহার শ্রোত্রী ছিল না—রুডিক ও জেনেদাও বসিয়া কাব্য শুনিতেছিল। দুই এক ছত্র শুনিতে না শুনিতেই রুডিক ঘুমে ঢুলিয়া পড়িয়াছিল। ক্লারিসা ও জেনেদা একান্ত আগ্রহে নিস্পন্দ মনোযোগ সহকারে কাব্য শুনিতেছিল! ফ্রান্সেসকা রিমির করুণ গাথা! জ্যাক যখন পড়িতেছিল,—

"দুঃখ এল বক্ষ চেপে ধরে,
প্রতি শিরা-গ্রন্থি উঠে দহি—
তবু, অতীত সে সুখের স্মৃতি চিত্তে
মর্ম্মর এ দুঃখ কিসে সহি!"

তখন ক্লারিসার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—সত্য, দুঃখ কোনমতে সহ্য হয়, কিন্তু দুঃখের দিনে অতীত সুখের স্মৃতি যখন প্রাণের মধ্যে গুমরিয়া সাড়া দিয়া উঠে, তখন সে দুঃখ—কি করিয়া রুধিয়া রাখি—সে যে একান্ত অসহ্য!

জ্যাক পড়িয়া যাইতেছিল! কবির ছত্র হইতে যেন অগ্নি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল—এই যে বাসনার তীব্র উচ্ছ্বাস, নিরাশার ভগ্নতান, জ্যাকের কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল, ক্লারিসার মনে হইতেছিল, সেগুলা শুধু কথা নহে—সেগুলা যেন জীবন্ত—যেন জ্বলন্ত অগ্নি-কণা,—গৃহের চারিধারে ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে!

ক্লারিসার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। প্রেমের এই করুণ কাহিনী তাহার চিত্তকে একেবারে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। কাহিনী সমাপ্ত হইলে, জেনেদা কহিল, "কি দুষ্ট ঐ মেয়ে মানুষটা—এমন ভাবে আপনার পাপের কথা প্রকাশ করতে তার এতটুকু লজ্জা হল না—এমন সতেজে বলে গেল।"

ক্লারিসা কহিল, "দুষ্ট হোক, যাই হোক, বড় দুঃখী সে!"

জেনেদা কহিল, "দুঃখী! ওকথা বলোনা মা—এই ফ্রান্সেস্কার জন্য তোমার দুঃখ হয়? —আপনার স্বামীর ভাইকে ভাল বাসে সে—এত বড় পাপ।"

"কি করবে বল সে! কোন উপায়

ছিলনা বেচারীর! বিয়ের আগে হতেই দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল যে, —জোর করে শুধু আর একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলে বইত না— অত ভালবাসা—"

"চুপ কর, জোর করে হোক, যে করেই হোক—যখন বিয়ে হয়ে গেল—তখন সেই মুহূর্ত থেকে, মেয়েমানুষ স্বামীর দাসী—স্বামীকেই ভালবাসবে সে! বইয়ে আছে, তার স্বামী বুড়ো,—বুড়ো বলেই ত স্ত্রীর উচিত স্বামীকে আরো বেশী ভক্তিকরা, ভালবাসা, যাতে অপরে তার জন্যে তার স্বামীকে কোন কুৎসিৎ কথা বলতে না পারে। তার জন্য তার স্বামীর মাথা না হেঁট হয়! বুড়ো স্বামী দুজনকে মেরে ফেলে খুব ভাল কাজ করেছে—তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে—ব্যভিচারিণী স্ত্রী, বিশ্বাসঘাতক ভাই! স্ত্রীর কর্ত্তব্য, প্রেম, ভালবাসা, এমনভাবে দলিত করবে, কি ভীষণ প্রবৃত্তি! শুধু রূপ, শুধু যৌবনের মোহে এমন নির্লজ্জ পাপাচরণ করবে! কি ভয়ঙ্কর কথা!

ক্লারিসা কোন উত্তর দিল না। সে জানলার পানে চাহিয়া রহিল। রুডিকের সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সে বলিয়া উঠিল, "খাসা গল্প—চমৎকার!"

জ্যাক একবিচিত্রমোহে বিভোর ছিল! তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবির গাথার একি সুর আজ জাগিয়া উঠিল পৃথিবীর এই নিভৃত এক প্রান্তে অবস্থিত এক দরিদ্রের কুটিরের কোণে সহসা এ কি সত্য আজ সাড়া পাইয়া উঠিয়াছে! ধন্য কবির নিপুণতা, রচনার সার্থকতার কি অপূর্ব্ব প্রমাণ! কোন্ বহু অতীতের অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিয়া কবি এক সত্যের অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন! নির্ম্মল রাত্রে সুদূর আকাশের গায় বসিয়া চন্দ্র যেমন নিম্নে চরাচরস্থ প্রতি নরনারী প্রতি পথঘাট গৃহ-কোণটি আপনার অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জলিত করিয়া তুলে, কবিও তেমনই কোন্ গোপন রহস্যান্তরালে বসিয়া আপন তুলিকারেখাপাতে নরনারীর গোপন অন্তস্তলের হর্ষবেদনা ও ভাবরাশি কি বিচিত্র উজ্জলবর্ণে সূচিত স্ফুটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উন্মাদস্পর্শে এতগুলি প্রাণী আজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে!

সহসা জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। "নিশ্চয় সে।" বলিয়া দ্রুত সে রাস্তায় চলিল, তখন বাহিরে পথে কে হাঁকিতেছিল, "টুপি—ভাল টুপি চাই—।"

জ্যাক পথে আসিতে দেখিল, ক্লারিসা গৃহ মধ্যে আসিতেছে! ইহার মধ্যে ক্লারিসা বাহিরেই বা আসিল, কখন? আশ্চর্য্য!

টুপিওয়ালা কিছুদূর চলিয়া গিয়াছিল—জ্যাক দৌড়িয়া গিয়া ডাকিল,—বেলিসার, ও বেলিসার।"

টুপিওয়ালা জ্যাকের পূর্ব্বপরিচিত—তাহার নাম, বেলিসার।

"আমি এই টুপি বেচে দিনগুজরাণ করি! এখানে কিছুকাল এসেছি। ভগ্নীপতির অসুখ হল—দেশে রোজগারও তেমন সুবিধামত হচ্ছিল না, তাই এখানে চলে এলুম! এখানে দুপয়সা হচ্ছে, মন্দ নয়! যোদ্ধা তুমি এখানে যে—!"

জ্যাক তখন আপনার কথা খুলিয়া বলিল। বেলিসার কহিল, "তুমি কারখানায় কাজ

কচ্ছ! অমন সুন্দর বাড়ী তোমাদের, অত পয়সা আছে, তুমি কারিকর হবে?"

জ্যাক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল,—বেলিসার তাহা লক্ষ্য করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার মানসে বলিল, "সে রাত্রে হ্যামটা বেশ ছিল—আর তিনি, সেই মেয়েমানুষটি তোমার মা? তোমার মুখে তাঁর মুখে কেমন মিল আছে, তাই আন্দাজ করছি! ঠিক না?"

মার কথা শুনিয়া জ্যাকের চিত্ত বিষণ্ণ হইল। জ্যাকের ইচ্ছা হইল, বেলিসারকে লইয়া কিছুক্ষণ সে গল্প করে, কিন্তু বেলিসার কহিল, "আজ আসি, কাজ আছে আর একদিন এসে গল্প-স্বল্প করব। এখন তুমি ওখানে আছ ত। প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হবে, ভাবনা কি?"

উভয়ে করকম্পন করিয়া বিদায় লইল। বেলিসার চলিয়া গেলে জ্যাক গৃহে ফিরিল।

দ্বারের নিকট ক্লারিসা উদ্বেগাকুল হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছিল। জ্যাক ফিরিতেই ক্লারিসা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করিল, "ও কি বলছিল, তোমার জ্যাক?"

ক্লারিসার স্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল, সত্ত আনন্দোজ্জ্বাসে জ্যাক্ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

জ্যাক কহিল, "আমার সঙ্গে ওর এতিলেঁাতে জানাশুনা হয়েছিল, অনেকদিন পরে দেখা হল—তাই কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল!"

জ্যাকের দুই হাত আপন হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্লারিসা জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোন কথা বলেননি? কোন কথা না? আমার সম্বন্ধে—?"

জ্যাক সরল ভাবে উত্তর দিল, "না, আর কোন কথা হয়নি!"

পরম আশ্বাসে ক্লারিসা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে নিশ্চিন্ত হইল।

নিশ্চিন্ত হইল বটে, তথাপি সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া সে যেন কেমন স্বপ্নাবিষ্টবৎ রহিল। কি যেন এক নূতন অজানা ভাবনা পাষাণের মত তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা চাপিয়া রহিল—শত চেষ্টাতে বুকের সে পাষাণভার ক্লারিসা ঠেলিয়া ফেলিতে সক্ষম হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাসন্তিকা।

(একটি জাপানী কবিতা অবলম্বনে)

বাসন্তিকা! বাসন্তিকা!
দু'খানি তোর রঙীন্ পাখা
দুলিয়ে দে!
হাস্নু-হানার গন্ধেতে তোর
প্রাণের 'পরে স্বপ্নেরি ঘোর
বুলিয়ে দে!

আয় ক্ষণিকের সহচরী
পুষ্পাবলী আয় গো পরী,
আয় গো আয়;
সোনালি তোর ছায়াখানি
মেঘের বুকে পড়ুক রাণী
গগন-গায়।

উঁকি দিয়ে লুকিয়ে ফেরা,—
এই খেলা কি খেলার সেরা?—
মর্ত্ত্যে আয়!
ধরতে তোরে হারিয়ে ফেলি,
চোখের জলে চক্ষু মেলি,
হায় রে হায়!

এবার ফাগুন ফিরলে পরে,—
ছাড়ব নারে,—রাখ্‌ব ধ'রে;
ভাব্‌ছি তাই!'
হায় গরবী! হায় সোহাগী!
আমরা যে তোর পরশ মাগি'
ধরতে চাই!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

"পালিভদ্র কোথায়?"

এই প্রবন্ধটি কয়েকমাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে—কিন্তু স্থানাভাবে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই। ভাঃ সঃ।

(আলোচনা)

বিগত কার্ত্তিক মাসের—"ভারতী"তে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "পালিভদ্র কোথায়" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গ্রীক্ বর্ণিত 'পালিবথ্রো' নগরের সংস্থান বর্ত্তমান পাটনায় নহে পরন্তু প্রয়াগে বা এলাহাবাদে। তিনি প্রবন্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

(১) 'পালিভদ্র' যাবানিক শব্দ নহে। উহা যদি পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম হইত, তাহা হইলে প্রামাণিক অভিধানে উহার উল্লেখ থাকিত। অভিধানে পাটলিপুত্রের অপর নাম কুসুম-পুর বা পুষ্পপুর। পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা হওয়াই সুসঙ্গত।

(২) আরিয়ান বলেন, 'পালিভদ্র' গঙ্গা এবং হিরণ্যবহা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। হিরণ্যবহা গঙ্গা ও সিন্ধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহত্তর। গঙ্গার নিম্নেই যে যমুনা স্থান পাইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ হিরণ্যবহাকে 'ইরাণাবয়েস' বলিয়াছেন। লেখকের মনে হয়, উহা যমুনার নামান্তর।

(৩) প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে "প্রাসজী"র রাজধানী পালিভদ্র ছিল। "প্রয়াগী" শব্দের সহিত "প্রাসজী" শব্দের বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(৪) প্লিনের হিসাব ধরিলে 'পালিভদ্র' নগর গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমের ৪২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু এলাহাবাদ হইতে পাটনা প্রায় দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী হইবে।

(৫) 'পালিভদ্র' দৈর্ঘ্যে অন্যূন দশ মাইল প্রস্থে দুই মাইল ছিল। পাটলিপুত্রের যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উহার ঐরূপ বিস্তৃতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না বরং প্রয়াগকেই ঐরূপ নগর বলিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হয়।

লেখকের এই সকল যুক্তি ভ্রম-প্রমাদ শূন্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাঁহার প্রত্যেকটী যুক্তির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে তাহা যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইরূপ আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলাম।

(১) প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক লিখিয়াছেন, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পালিভদ্র বা

পালিবোথরার নাম শুনিয়াছেন।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে লেখকের মতে পালিভদ্র ও পালিবোথরা এক নাম। গ্রীক্ গ্রন্থকারগণের পুস্তকে পালিবোথ বা লেখকলিখিত পালিবোথরার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'পালিভদ্র' নাম বোধ হয় লেখকের স্বকপোলকল্পিত। কোন কোন লেখক অবশ্য পালিবোথ্রর স্থানে 'পালিমবোথ্র' লিখিয়াছেন। তথাপি যখন তিনি পালিভদ্র ও পালিবোথর এই দুই নাম অভিন্ন বলিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে পালিভদ্র থাকিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। লেখকের কথার ন্যায় আমরাও বলিতে পারি যে পালিভদ্র যদি প্রয়াগের নাম হইত তাহা হইলে অভিধানে প্রয়াগের নামের সহিত উহার উল্লেখও আমরা দেখিতে পাইতাম। প্রয়াগের অপভ্রংশ পালিবোথরা না হইয়া পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা বা পালিবোথ্র হওয়াই সম্ভবপর। শব্দতত্ত্ব ইহাই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছে। 'পাটলিপুত্রে'র 'ট' এর লোপ করিলে 'পালিবো'থ্রর সহিত যথেষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত 'ব' বা 'প' স্থলে গ্রীক্ 'বিটা' বা 'পি'র আগম হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত 'বাহু'—গ্রীক্ 'পেগুস'।(১) এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

(২) আরিয়ান তাঁহার পুস্তকে 'হিরণ্যবহার উল্লেখ করেন নাই; ইরাণবোয়াস নামের উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ লেখক 'ইরাণবোয়াস'কে মনে মনে 'হিরণ্যবহা' মানিয়া ইহা অবলীলা ক্রমে আরিয়ানের উপর ইহা' আরোপ করিয়াছেন! 'হিরণ্যবহা' নামই বা লেখক কোন্ পুস্তকে পাইলেন? ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহই শোণকে হিরণ্যবহা বলেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ অমর-কোষ-অনুসারে শোণকে 'হিরণ্যবাহ' বলিয়াছেন।(২) গঙ্গার নিম্নেই যে যমুনার স্থান একথা সকলে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা লেখক কিরূপে জানিলেন? তিনি কি পৌরাণিক মাহাত্ম্যে যমুনায় এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিলেন? তাহা হইলে লেখকের অনুমান বোধ হয় কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে। গ্রীকগণ যে কয়েকটী নদ নদী দেখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বড় গণ্ডককেই অনেক প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণ ভারতের তৃতীয় নদ বা নদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।(৩) বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণও বহু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। বাহুল্য ভবে তাঁহাদের প্রত্যেকের মত সংকলন করিতে পারিলাম না। প্লিনি এবং আরিয়ান 'যোমানিস' বা যমুনা নামে স্বতন্ত্র নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে যমুনা ও 'ইরাণবোয়াস' এক নদী নহে। টলেমিও 'ডিয়ামানা,' বা 'যমুনা'র পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে যমুনা ও 'ইরাণ বোয়াস' এক নদী

(১) Mulvany's "our common Inheritence", p. 15

(২) "শোণো হিরণ্যবাহঃ স্যাৎ"—অমর।

(৩) "The Physical characteristic of size of the great Gandak agrees with the Greek accounts which make it the third river in India, inferior only to the Indus and the Ganges."—Archaeological Survey Reports vol. VIII., p. 26.

নহে। (৪) প্লিনি ও আরিয়ান শোণ ও ইরাণ বোয়াসকেও দুইটী পৃথক নদী বলিয়া লিখিয়াছেন। এই দুইটী নদী যে এক নহে তাহা সুবিখ্যাত উইলসন সাহেবও বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (৫) এরূপ ক্ষেত্রে গঙ্গার উপনদী গুলির মধ্যে বড় গণ্ডককেই ইরাণ বোয়াস বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। গঙ্গা ও বড় গণ্ডকের সঙ্গমস্থল পাটনা হইতে অধিক দূর নহে। সঙ্গম স্থলেই যে প্রাচীন 'পালিবোথ্ নগর অবস্থিত ছিল তাহাও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আবার কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে কুশীই গ্রীক বর্ণিত ইরাণ বোয়াস। কারণ গঙ্গার সহিত ইহার সঙ্গমস্থলও পাটনা হইতে দূরবর্ত্তী নহে এবং ইহার একটি পতিত-প্রবাহ এখনও পাটনার সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একণে স্থানীয় নাম, 'পুরাণবাহ'। (৬) রবার্টসন সাহেব প্রভৃতি সকলেই এইরূপ পাটনাকেই প্রাচীন পালিবোথ্ প্রতিপন্ন করিতে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার যাঁহারা শোণকে 'ইরাণবোয়াস' সপ্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহারা বলেন যে শোণেরও একটি ক্ষীণ প্রবাহ পাটনার নিকট দিয়া বহিয়াছে। তাহাকে এখন সাধারণে "মরা নদী" বলিয়া থাকে। (৭)

(৩) "প্রাসজী"র রাজধানী 'পালিভদ্র' হইলেও হইতে পারে; কিন্তু 'পালিভদ্র' যে 'পালিবোথ্' তাহা লেখক কিরূপে অবধারণ করিলেন? 'প্রয়াগী' ত দেশবাসীর সাধারণ নাম তাহা রাজার নাম কি করিয়া হইবে? এইরূপ সাদৃশ্য থাকিলেই যে উভয় নাম এক তাহাই বা কি করিয়া নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায়। "প্রাসজী"র (?) রাজধানী যে পালিভদ্র, ইহা আমরা কোনও ইতিহাসে দেখিতে পাই না। লেখক কি তবে "প্রাসিয়াই" শব্দ দেখিয়াই তাহাকে "প্রাসজী" স্থির করিলেন? পালিবোথ্‌র অধিবাসীগণকে 'প্রাসিয়াই' বলা হইত, ষ্ট্রাবো এই কথাই লিখিয়াছেন। প্লিনি ও আরিয়ানের মতেও পালিবোথ্‌র অধিবাসিগণ 'প্রাসিয়াই' বলিয়া কথিত হইতেন। এই শব্দটী সংস্কৃত 'প্রাচ্য' শব্দেরই বিকৃত উচ্চারণ। প্রকৃত-প্রস্তাবেও পঞ্চনদের অধিবাসীগণ বিহারীগণকে 'প্রাচ্য' নামে অভিহিত করিতে পারিতেন। (৮)

(৪) প্লিনি যে পালিবোথ্ নগর এলাহাবাদ হইতে ৪২৫ মাইল দূরবর্ত্তী লিখিয়াছেন

(৪) "Ptolemy—Diamonna—it is easy to recognise the Yamuna' which after passing Delhi, Mathura, Agra and other places joins the Ganges at Allahabad."—Indian Antiquary, 1884.

(৫) Wilson's "Hindu Theatre" vol. II. (Preface to the Mudra Rakshasa)

(৬) "The Erannoboas, now the Coosy has greatly altered its course for Several Centuries passed * * * the old bed is still visible and is called now 'পুরাণবাহ' or the Old Channel..'—Asiatic Researches Vol. v., p. 272.

(৭) Imperial Gazetteer, Vol. VXX., p. 66.

(৮) "Pliny and Arnian agree with our author (Strabo) in calling the inhabitants

তাহা যে রোমান মাইল লেখক বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। প্রত্যেক রোমান মাইল সাধারণ ইংলিস মাইল অপেক্ষা ১৪৬ গজ কম। যাহা হউক এই দূরত্ব ধরিলে পাটনা, পালিবোথ্ হউক বা না হউক, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম বা প্রয়াগকে তো আর পালিবোথ্র কথনই বলা যায় না। কারণ, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পালিবোথ্র বা 'পালিভদ্র' (?) প্রয়াগ হইতে ৪২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

লেখক কিরূপে জানিলেন যে পাটলিপুত্রের ভগ্নাবশেষ খনন শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কার্য্য সমাপ্ত না হইবার পূর্ব্বে (অন্ততঃ ঐতিহাসিক আলোচনায়) এইরূপ ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। এলাহাবাদের প্রাচীন অবস্থানও কি সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে? ভিটা প্রভৃতি এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে খননকার্য্য চলিতেছে তাহার সহিত ত ইহার কোন সম্বন্ধই আমরা দেখিতে পাই না। (৯) বরং পাটলিপুত্রের ভগ্নাবশেষ খননেই সেই গ্রীক বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাচীর বহির্গত হইয়াছে। (১০) ফাহিয়ানও এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীর দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পালিবোথ্রকে 'পালিয়েন-ফু' বলিয়াছেন।

প্রবন্ধের অনেক স্থলে লেখক কোনরূপ যুক্তি না দেখাইয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যথা, "শোণ কখনই যমুনার ন্যায় প্রবল ছিল না।" "আমাদের মনে হয়, উহা যমুনার নামান্তর।" ইত্যাদি। এগুলির আলোচনা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমাদের দেশে কোন বিষয়ের মীমাংসায় একপক্ষের যুক্তি অপর পক্ষের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইলে, সে পক্ষ নিজ ভ্রম মনে মনে স্বীকার করিয়াও অপর পক্ষের নিকট নিজমত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। ইহাতে বিচার বিতর্কের অবসান হয় না এবং বিচার ক্রমশঃই কলহের নামান্তর হইয়া উঠে। ইংরাজী পত্রিকাদিতে বিদেশীয়গণের সহিত বিচারে কিন্তু আমরা চিরকালই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আসিতেছি। তবে বাঙ্গালা সাহিত্যেই বা কেন এ সত্যের অযোগ্যতা প্রমাণ করিব? আমরা আশা করি অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় এ দেশে, বাঙ্গালা ভাষাতেও ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের আলোচনায় আমাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে আমরা প্রকাশ্য-স্বীকার করিতে কখনই ইতস্ততঃ করিব না।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বারাণসী।

---

of Palibothra, Prasii, a name which transliterates Sanskrit Prachya i.e, Eastern"—M'Crindle's "Ancient India." p. 43, Foot-note.

(৯) J. R. A. S., Part I.

(১০) "Remains of the wooden wall by which the city, as we learn from strabo was defended, we discovered a few years ago in Patna by workmen engaged in digging a tank."—Indian antiquary, 1884 এই সঙ্গে "Report on the Excavation at Patna" (Calcutta, 1803) নামক গ্রন্থ অনুসন্ধেয়।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক
চিত্রাঙ্গদা কাব্যের চিত্র পরিকল্পনা

রবীন্দ্রনাথের গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
স্বর সংযোজনা

বিভিন্ন বয়সে রবীন্দ্রনাথ

অভিভাষণ।*

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি, সে একটি অকালের ফল—এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সেবকদের মত সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকী এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছু কিছু যশের খোরাকী প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ্‌-খোরাকী বন্দোবস্ত—তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই ত গেল দিনের খোরাক—ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে ত মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম-শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিষ ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিষটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে সে দালালী আদায় করিয়া লয়। কবি যত বড় কবিই হউক তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকলতাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই; এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভর্ত্তি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং-পুরুষটার বালাই থাকে না—তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই ত ঐ দুর্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এই জন্যই ত মনু বলিয়াছেন—সম্মানকে বিষের মত জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানেই লোভনীয়

* ২০শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনন্দ সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভাল।

আমার ত বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে ত কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব সে কেবল ত্যাগশিক্ষারই জন্য। এ সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেইখানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন, তাহাকে আমার অহঙ্কারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায় প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য ত ঘোড়া আর প্রবীনতাই সারথী। সারথীহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি ত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরম রহস্যময়ী—তখনি কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্য্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু অবসানের দিনান্তকালেও অনন্ত জীবনের পরমরহস্যের জ্যোতির্ম্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের শুব্ধ গাম্ভীর্য্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কি?

অতএব বার্দ্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীন বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এবয়সেও তরুণের প্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাবকিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেকখান বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি—তবে আমার আর সঙ্কোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো

প্রয়োজন নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই—যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কত বড় আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা শস্তা জিনিষ নহে। আমরা ভৃত্যকে যে বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে জিনিষটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না—কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—ভুল চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে, সেখানে মরেও বেশি—তাহার মধ্য হইতে কিছু টি কিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিষ্ট, তাঁহারা মানসিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে কাছে ঘেঁসিতে দেন না। তাঁহারা যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান-বেশি নাই, এই জন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্ব রথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠী, মাণিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মত সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা সেই কষ্টম্ হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্তগুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না।

যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক কেলছিড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান্ দেওয়া গেছে, তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোন ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল ত এই দেখিতেছি, অন্ততঃ প্রাচুর্য্যের দ্বারাতেও বর্ত্তমানকালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব-চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে ক্ষণকালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে;—অন্তকার সম্বৰ্দ্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর বার্থতা দিয়া ওজন ভারি করিয়া তোলা যায়—যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি,—দর অপেক্ষা দস্তুরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য কারবারে সেই সকল ফাঁকি জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সেকথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে—সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মত করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মত করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক্ সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না। আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে ছন্দে যে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুসি করা যায়—কিন্তু সেই খুসিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে—সেই সুলভ খুসির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ বিদায় তাহাও আমাকে বারবার

পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনো দিন স্থায়ী কল্যাণলাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরিউপরি অনেকবারই ঘটল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই;—এইজন্য দুর্গতির দিনের যে কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চির-সাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই,—এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এইজন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে, যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন;—যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধূলা দেয় তবে সেই ধূলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্দ্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ যেখানে সত্য সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

১

এ মোহনী বীণা কোথায় পাইলে ?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে !
হেন স্বর্ণবীণা নাইরে নিখিলে,
সুধাভরা ক্ষুধাহরা !
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উছলিছে সুর
পদ্মমধু জিনি' মধুর, মধুর ;
এ যেন রতির চরণ-নূপুর,
পরশে শিহরে ধরা !

২

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ;
উর্ব্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী !
সৌন্দর্য্য-নন্দনে সুধা-প্রবাহিনী
লীলায় উছলে চলে !
এ যেন গোলাপে শিশির পতন,
পূর্ণিমা রাত্রির উছল কিরণ !
শেফালির যেন নিশান্ত-স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল ছলে !

৩

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা !
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা !
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা
দিয়া আজি দীপ্তিময়ী !
সীতাসতী সমা হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে কাঞ্চন-বরণী,
কাঞ্চনের সমা ! সূর্য্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী !

৪

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী ;
রামচন্দ্র আসি, চরণ দুখানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরাণী
চমকিলা নিদ্রা ভঙ্গে।
পাষাণের সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা ! বহুদিন পর
তোমার পরশে কাঁপি থর থর
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে !

৫

ভাগবতে যার অপূর্ব্ব ভারতী
ত্রিবক্রা কুবুজা পাইলা যেমতি
অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব সম্পতি,
গোবিন্দের আগমনে ;
ওহে যাদুকর, তেমতি, তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি,
কুবুজা হয়েছে অতি রূপবতী,
তব কর-পরশনে !

৬

পূর্ব্বকালে যথা, সঙ্গীতে সঙ্গীতে
দৌধময়ী উর্ব্ব উর্ব্বি আচম্বিতে
রাজিল সহসা, কিরণরাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী ;
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
স্বর্ণহর্ম্যময়ী হাসিতে, হাসিতে
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে
কিরণে কিরণময়ী ?

৭

পূর্ব্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে,
কল্লোলে, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ ভঙ্গে
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ সঙ্গে
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে!
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কলকল-প্রবাহিনী!

৮

এ জাহ্নবী-তটে এ কি গো নেহারি!
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,
যেন হাস্যময়ী রূপসী এ নারী
নব হরিদ্বার, কাশী!
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে,
পড়ে সুধানদী অতুল বিক্রমে,
ক্ষীর-সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,
হাসিয়া ফেনিল হাসি!

৯

বাণী-বরপুত্র! সুধামকরন্দ
বিভোর হইয়ে বাণীবক্ষে পিয়ে
হইয়া অমর, আনন্দের কন্দ
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি!
ভগবানে আজি করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা,—হয়ে আয়ুষ্মান,
থাক জননীর দুলাল সন্তান,
মহিমা-ছটায় বালার্ক সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বরণ।

তোমারে বরি হে কবিসম্রাট
কবিস্থয় মহাযজ্ঞে কবি!
বঙ্গবাণীর হে বরপুত্র!
প্রতিভা-প্রতিমা অনুপ রবি!
কবি হোতা কবি-উদ্গাতা হেথা
মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জ ধামে;
যজ্ঞ-নিপুণ বুধমণ্ডলী
আজি একত্র তোমার নামে।
বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
হে কবি! তোমায় বরি হে আজি,—
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।
অযুত আঁখির উজল আলোকে
হে কবি! তোমায় আরতি করি;
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার
শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি।
গান গেয়ে তুমি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে;
পঞ্চাশতের পান্থশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।
বঙ্গের কবি-মনীষীরা আজি
ব্যাপৃত নূতন সবন-কাজে,
কবি-নৃপমণি! তব আগমনী
ধ্বনিছে লক্ষ হৃদয় মাঝে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজপ্রসঙ্গ।

যাঁহারা দিল্লির দরবার দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন কলিকাতার রাজ-অভ্যর্থনা-সমারোহ তাহার তুলনায় নগণ্য। আমরা দিল্লির দরবার দেখি নাই—মানিয়া লইলাম বাহিক অনুষ্ঠানে দিল্লিরই জয়,—সৈন্যগণের বিশাল সমাবেশ—বা নগর সাজসজ্জার আড়ম্বর সম্ভবত এখানে ততদূর ছিল না, ক্যাডেট কোর—বা রাজরাজড়ার শোভাযাত্রার বৈচিত্র্যেও কলিকাতা নগরী শোভান্বিতা হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উৎসবের প্রাণ যে জনসঙ্ঘের হর্ষোচ্ছ্বাস তাহা কি দিল্লি হইতে এখানে কিছুমাত্র কম ছিল! তাহা হইতেই পারে না।

রাজা রাণীর শুভাগমন কাল হইতে বিদায় কাল পর্য্যন্ত এই যে পুণ্যময় নয়টি দিন ইহার প্রতিদিনকার মহোৎসবক্ষনতা—জনগণের হৃদয়োত্থিত প্রীতিভক্তি উথলিত আনন্দ প্রবাহ এবং তদ্দর্শনে প্রীতিমুগ্ধ সম্রাটসম্রাজ্ঞীর প্রফুল্ল অভিবাদন—সে কি অপূর্ব্ব হৃদয়মনোহারী সুন্দর দৃশ্য। সে দৃশ্য একবার যে দেখিয়াছে একটি চিরন্তন আনন্দ দৃশ্য তাহার হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে!

রাজারাণী কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে পৌঁছিবামাত্র সেই যে চতুর্দ্দিক জয় জয় রবে পরিপূরিত হইয়া স্বর্গমর্ত্তাপাতাল যেন একাকার করিয়া তুলিল তাঁহারা যে কয়দিন এখানে ছিলেন—সে আনন্দধ্বনির আর বিরাম বিশ্রাম ছিল না—কেবলই জয় জয় রাজ রাজেশ্বরের জয়, জয় জয় রাজরাজেশ্বরীর জয়; রাজভক্ত প্রজাগণের সহাস্য মুখ ও উন্নত মস্তক ছাড়া সেকয়দিন আর কিছু দেখা যায় নাই—অসংখ্য জনস্রোতের বিশাল বাহিনী আর সেই দৃশ্য অবলোকনে রাজা রাণীর প্রীতিদ্রব প্রশান্ত অভিবাদন—ইহাতেই কলিকাতার মহোৎসব সার্থক ও মহাপ্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল! কোন্ সমারোহের তুলনায় ইহা কম—তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যেদিন কোন শোভাযাত্রা বা অনুষ্ঠান-উৎসবে রাজা রাণীকে দেখিবার আশা ছিল না—সেদিনও শত শত নরনারী বড়লাট ভবনের সম্মুখে ও ময়দানে জনতা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; তাহাদের মনের আশা যদি বায়ু-সেবনে বা ভজনালয়ে যাইবার পথে রাজারাণীর দর্শন পায়।

বঙ্গনরনারীর মন রাজভক্তিতে কিরূপ উথলিত হইয়াছিল, পেজেন্ট অথবা শোভা-যাত্রার দিনে পরদার মধ্যে উপবিষ্ট রমণীগণের আচরণ তাহার আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অসূর্য্যম্পশ্যাগণ রাজভক্তিতে উৎসাহিত হইয়া নেটের পর্দ্দার সূক্ষ্ম আবরণও রাখেন নাই। রাজা রাণী অবরোধবাসিনীগণের সম্মুখ দিয়া যাইবেন এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা স্বহস্তে সেই নেটের পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া মুখ বাহির করিয়া দিলেন এবং আনন্দ উৎফুল্ল মুখে দাঁড়াইয়া হুলুধ্বনি এবং জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। যে রাজভক্তির উৎসাহে তাঁহারা সহসা আজন্ম সংস্কার বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা যে একান্ত অকৃত্রিম তাহাতে আর কাহারো সন্দেহ হইতে পারে না। বৃদ্ধা অন্তঃপুরমহিলাগণের

মধ্যে অনেকের রাজভক্তি বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাজদম্পতির শকট যে সময় পর্দ্দার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল ও আমাদের রাজা দুই হাত তুলিয়া সেলাম ও রাণী মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিতেছিলেন তখন এই সকল প্রবীণমহিলা আনন্দাশ্রু অভিষিক্ত নেত্রে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া জয় জয় রবে ও বন্দেমাতরং ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

নিশীথে দিবাগমের ন্যায় আলোক মালায় প্রোজ্জ্বলিতা মহানগরী যেদিন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; সে রাত্রে নিদ্রাদেবীকে কেহ ডাকে নাই। রাত্রে অসংখ্য লোককে পদব্রজে এবং "শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া" যাইতে দেখিয়া মনে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাব হইয়াছিল। কতবার মনে হইয়াছিল আমাদের দয়ালু রাজারাণী এই অসংখ্য দীপালোকে তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের দিব্য ভক্তির আলোক দেখিতেছেন এবং এই অনুরাগ না জানি তাঁহাদের কত গৌরবকর বোধ হইতেছে।

অনেক সময় বেশী আশা করিয়া নিরাশ হইতে হয়। কিন্তু রাজারাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়ের এই স্বতঃ উৎসারিত ভক্তি তাঁহাদের মধুর ব্যবহারে আরও শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে রাজারাণীর দয়া করুণা সহৃদয়তার যেরূপ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়—আমাদের রাজারাণীর ব্যবহারে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহাদের উদারতা প্রজাবাৎসল্য ও সহৃদয়তার কত শত কাহিনী আমাদের হৃদয়ে আজ চিরমুদ্রিত এবং আমাদের ইতিহাসে চিরলিপিবদ্ধ হইয়া রহিল।

রাজকর্ম্মচারীগণ যখনই সম্রাট দর্শনলোলুপ প্রজাদিগের দর্শনপথ রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে—তখনই সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছেন,—তোমাদের বেষ্টন দূরে রাখ, বাধা অপসারিত করিয়া দাও—আমার প্রজাপুঞ্জ আমাকে অবাধে দর্শন করুক।

মহারাণী আলিপুরের পশুশালায় গিয়া সেখানে জনতা না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "পশুশালা এমন জনহীন কেন?" যখন উত্তরে শুনিলেন তাঁহাদের আগমন জন্যই অন্য সকলের আগমন বন্ধ করা হইয়াছে তখন সাম্রাজ্ঞী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন,—তোমরা আমার অদ্যকার সুখই নষ্ট করিয়াছ—"you have spoilt my day."

ইহা রাণীর মতই মহৎ হৃদয়ের উক্তি! এমন রাজারাণীর দর্শনলাভ করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। ঈশ্বর তাঁহাদের নিরাপদ করুন।

সাহিত্য-পরিষদে শিল্প-প্রদর্শনী।

সাহিত্য-পরিষদগৃহে সেদিন যে ঐতিহাসিক প্রদর্শনী দেখিলাম অন্যত্র আর কোথাও তাহা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রেমের অবতার, চৈতন্যদেবের, রাজর্ষিতুল্য রাজা রামমোহন রায়ের এবং প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী রাণী ভবানীর হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের

সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ইতিহাস অতীতকে মানবহৃদয়ে চিরদিন সঞ্জীবিত করিয়া রাখে; এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনী আমাদের গৌরবপূর্ণ অতীতকে যে কয়দিনের জন্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে এবং অন্তর নিভৃতে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছিল তাহার ফল বর্ত্তমান হইতে ক্রমে ভবিষ্যতে সঞ্চারিত হইবে। যাহা ছিল অথচ আজ যাহা আর নাই তাহাকে দেশের জীবনে পুনরায় জাগ্রত জীবন্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস ক্রমে সাধনায় পরিণত হইবে সে বিষয় সন্দেহমাত্র নাই। সাহিত্য-পরিষদ যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহা কিরূপ অনন্যনিষ্ঠ, তপস্যা-প্রধান তাহা তাঁহাদিগের সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। গৌড়ের নিবিড় অরণ্য, যশোহরের শৈবালাচ্ছাদিত দীর্ঘিকার প্রান্ত হইতে খোদিত এবং মীণার কাজে অলঙ্কৃত ইষ্টকখণ্ড সকল, পুরাকালের অলঙ্কারের প্রতিলিপি, সিন্দূর-মণ্ডিত সতীপ্রস্তর, বঙ্গগৌরব প্রতাপাদিত্যের ব্যবহৃত লৌহ আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রস্তর গোলক; প্রাচীন কত শত হস্তলিখিত পুঁথি তাহার কোন কোনখানি একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বেকার অথচ এখনও তাহার অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট তাহার মসী এখনও কাকচক্ষুর ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণ এবং উজ্জ্বল, গ্রন্থের কাষ্ঠখোদিত আবরণগুলি এখনও সুন্দর এবং অক্ষত। ফরাসী লিখিত একখানি শাহনামা দেখিলাম তাহা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লালগোলা হইতে প্রাপ্ত; শুনিলাম পুস্তকখানি প্রাচীন কিন্তু তাহার সুস্পষ্ট কৃষ্ণঅক্ষর শ্রেণী এবং উজ্জ্বলবর্ণ চিত্র সকল দেখিলে সহসা একথা যেন বিশ্বাস হয় না। আমাদের তখনকার লিপিকার এবং চিত্রকরগণ কোন্ উপাদানে এরূপ মসী এবং বর্ণ সকল প্রস্তুত করিতেন আমাদের এখনকার রাসায়নিকগণের তাহা আবিষ্কার করা একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। আজকালকার ব্যবহৃত মসী অল্পদিনের মধ্যেই অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ হইয়া আসে। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদান্তভাষ্য অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত তাহা Magnifying Glassএর সাহায্য ব্যতীত পড়িতে পারা যায় না—তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। বুদ্ধদেবের অনেকগুলি প্রস্তর এবং পিত্তলমূর্ত্তি দেখিলাম। ইহার কতক মালদহ মেদিনীপুর এবং কতক নেপাল ও তিব্বত হইতে সংগৃহীত। এ মূর্ত্তিগুলির অনুপম সুন্দর প্রশান্ত মুখশ্রী। অভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন এরূপ সুন্দর পিত্তল বুদ্ধমূর্ত্তি কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই মূর্ত্তিগুলি অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের হইবে। ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিলাম, হিন্দুকুলকলঙ্ক কালা-পাহাড়ের অত্যাচারে, অধিকাংশই নষ্টশ্রী। দুইখানি পুরাতন চিত্র দেখিলাম একখানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা, অপরখানি যুগলরূপ! ছবি দুইখানির অঙ্কনরীতি প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শের। ভাবের মাধুর্য্যে এবং বর্ণসুষমার মনোহর। ছবিদুইখানির অনেকাংশ কীট-দষ্ট তবুও বর্ণলালিত্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। শুনিলাম এ দুখানি অতি অযত্নে দিল্লীর কোনও পুরাতন গৃহে পড়িয়াছিল, এলাহাবাদ প্রদর্শনীর সময় আবিষ্কৃত হইয়া তথায় নীত হয়, সাহিত্য

পরিষৎ সেখান হইতে ক্রয় করিয়াছেন। অনেকগুলি স্বুবর্ণ এবং তাম্রমুদ্রা দেখিলাম তাহার কোনটি চন্দ্রগুপ্ত, কোনটি কনিষ্ক রাজার রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল, সেগুলি কত শত বৎসরের পুরাতন তাহা পাঠক অনুমান করিবেন। শুনিলাম স্থানাভাবে প্রদর্শনীর এই সকল অমূল্য দ্রব্যাদি ইহার পর গুদামজাত হইয়া থাকিবে। দেশে যাঁহাদিগের সাহিত্য এবং ইতিহাসের প্রতি সম্মান আছে যাঁহারা অতীতের গৌরবমর্য্যাদা বুঝিয়া থাকেন, আশা করি তাঁহারা সকলেই এই মহামূল্য সামগ্রীগুলি যাহাতে সুন্দরভাবে, সর্ব্বদা সংরক্ষিত হইতে পারে এমন গৃহনির্ম্মাণের জন্য সাহিত্য পরিষদকে অর্থ সাহায্য করিয়া সমগ্র দেশকে উপকৃত এবং আপনাকে গৌরবান্বিত করিবেন।

প্রাচ্য চারু-শিল্প-প্রদর্শনী।

গত ২০শে জানুয়ারি হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত চৌরঙ্গীতে এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। ইহাতে প্রাচীনকালের চিত্রাবলীর সহিত বিবিধ প্রাচ্য আদর্শে অঙ্কিত অনেকগুলি আধুনিক চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনী-গৃহ এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে তাহাতে যে কেবলমাত্র গৃহখানির শোভাবৰ্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রদর্শিত প্রত্যেক চিত্র এবং অন্যসামগ্রী যেন সুন্দরতররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি পিত্তল বুদ্ধমূর্ত্তি; সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, শাল শাড়ী, পুরাতন গঠনের তৈজসপত্রও সজ্জিত ছিল। এ প্রদর্শনী একবার দেখিয়া মনের তৃপ্তি হয় না—প্রদর্শিত চিত্রাবলীর সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য সম্পূর্ণ উপভোগ কিম্বা উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের একবারের অধিক দেখিবার সুবিধা ঘটে নাই, তবুও যে সকল চারুচিত্র প্রথম দর্শনেই মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত মনে যাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি ক্ষীণ হয় নাই সেগুলির উল্লেখ করিব। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমুদ্র দুহিতা' এবং "পদ্মপর্ণ" সুকুমার বর্ণসুষমায়, গঠনলালিত্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অজন্তাগুহার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি বড়ই সুন্দর; তাঁহার অঙ্কিত রামায়ণ দৃশ্যাবলি অতীব মনোহর। আমাদের মনে হয়, সমস্ত পৌরাণিক চিত্র এইভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত। এ চিত্রগুলি যেন সত্যই পৌরাণিক যুগের—ইহার মধ্যে একালের এতটুকু আভাষ নাই—দেখিতে দেখিতে আমরা যেন রামায়ণের কালের মধ্যে গিয়া পড়ি। ইহাই ইহার বিশেষত্ব। দুঃখের বিষয় আরো অনেক দৃশ্য অঙ্কিত না হইলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ হইবে না, আশা করি নিপুণ চিত্রকর এ অসম্পূর্ণতা রাখিবেন না। শ্রীযুক্ত নন্দলালের আর একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র—রাধাকৃষ্ণ।

শ্রীমান অসিতকুমার হালদারের "বাতায়ন পার্শ্বে" নামক ছবিতে অঙ্কিত রমণীমুখখানি বড় রমণীয়, তাহা প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায় এবং প্রেমের করুণায় পরিপূর্ণ; এখানি দেখিলে

কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত মায়ার খেলায় "সেই মধুর মুখ জাগে মনে কি শয়নে কি স্বপনে" গানটি আপনা হইতেই মনে আসে।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষ আনন্দদায়ক। মাত্র দুএকটি নিপুণ রেখাপাতে চিত্রকর কেমন অবলীলাক্রমে সুন্দর ভাব ও গঠন একত্রে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় সন্দেহ নাই। তাঁহার 'পুরীর মন্দির' দৃশ্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

পুরাতন চিত্রাবলীর মধ্যে অমরনাথ তীর্থের সোপান রচনা এবং পার্ব্বতী কর্তৃক মহাদেবকে ভাঙ ঢালিয়া দিবার চিত্র দুইখানি বড় সুন্দর। অমরনাথ তীর্থে যাইবার সোপানাবলী প্রতি বৎসরই গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাঙিয়া যায়, প্রতি বৎসরই প্রভূত পরিশ্রমে আবার তাহা গঠন করা হয়। প্রথম ছবিখানিতে সেই দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে; একদিকে প্রবল স্রোতের মুখে সুসজ্জিত তরণীতে অনেকগুলি যাত্রী গীতবাদ্যভাণ্ডসহকারে ভাসিয়া চলিয়াছেন, অপর দিকে আবার অনেকে বহুপরিশ্রমে প্রস্তর সংগ্রহ, বহন ও স্থাপন করিয়া দিবা তীর্থের আরোহণ সোপানসকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। যাঁহারা ভাসিয়া চলিয়াছেন তাঁহারা বিলাসমুগ্ধ নরনারীর মত ভাসিয়াই যাইবেন, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যাহাই হউক অমরনাথে গিয়া পৌঁছান তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিবে কিনা সন্দেহ কিন্তু যাঁহারা প্রাণপণ শ্রমে ঊর্দ্ধমুখে সোপান রচনা করিয়াই চলিয়াছেন তাঁহাদের এত কষ্টের মধ্যে নিশ্চিত সান্ত্বনা এই যে অমরনাথের চরণ দর্শন সৌভাগ্য হইতে কেহই তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না; দ্বিতীয় চিত্রে ভাবেভোলা মহাদেব আনন্দে, আত্মবিস্মৃত, ভাঙের পাত্রটী বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পার্ব্বতী হাসিমুখে অতি সুন্দর ভঙ্গীতে উন্মাদক পানীয় ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার মুখের ভাবে আনন্দের হাসির সঙ্গে সঙ্গে পতি সোহাগিনী সতীর গর্ব্বটুকু বেশ ফুটিয়াছে; ভাবটা, বিশ্বেশ্বর তুমি, ত্রিলোক তোমার দ্বারে প্রার্থী; তবু আমারই সম্মুখে তৃষ্ণারপাত্রটি বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছ।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী লেডি হার্ডিং এই শিল্পপ্রদর্শনী একদিন দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণ উপস্থিত ছিলেন। লর্ড হার্ডিং এর নিকট তাঁহাদের সকলেরই পরিচয় প্রদান করা হয়। বড়লাট বাহাদুর এই সকল তরুণ শিল্পীদিগকে সুমধুর ভাষায় উৎসাহ প্রদান করেন। লেডি হার্ডিং এই প্রদর্শনীর চিত্রাবলী বিশেষ যত্নের সহিত পরিদর্শন করিতে থাকেন এবং ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

দেখিলাম, অজন্তার চিত্রসমূহের আদর্শে গবর্মেণ্ট-আর্ট স্কুলের কয়েকটি ছাত্র কতকগুলি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এইগুলি মুদ্রিত হইয়া রেখাচিত্রের আদর্শরূপে প্রচারিত হইবে শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এই রেখাচিত্রগুলি অভ্যাস করিলে আমাদের দেশের ভাবীচিত্রকরগণ অতি সহজে প্রাচ্য আদর্শে অভ্যস্ত হইতে পারিবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের প্রাচীন চিত্র-

কলা নবীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া সুন্দর অতীতকে সুন্দরতর ভবিষ্যতে পরিণত করিতে পারিবে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

আজকালকার দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐতিহাসিক প্রদর্শনী এবং প্রাচ্য চিত্র প্রদর্শনী যে কত উপকার করিতেছে ও করিবে তাহা অধিক করিয়া বলাই বাহুল্য। বিরাট সভাসমিতির ন্যায় এগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না সত্য কিন্তু এ সকল বিষয় জনসাধারণ অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষেরই সাধনার সামগ্রী। যে সকল নিভৃত সাধক আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া তুলিতেছেন যাঁহাদের বহির্দৃষ্টি ভবিষ্যতে, অন্তর্দৃষ্টি অতীতে নিহিত তাঁহারাই এই সকল প্রদর্শনী হইতে সাধনার উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা সঞ্চয় করিয়া আমাদের দেশ ও কালকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিবেন এই আশার আলোক আমাদের মনে নূতন আনন্দ সঞ্চার করিতেছে।

কবি-সম্বর্দ্ধনা।

ঘরের বস্তু পরের কাছে দেখা বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের এক উপায়। ছেলেবেলায় যাহা আমরা সহস্রবার গাহিয়াছি, সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াছি, সহস্রবার নকল করিয়াছি —তাই দেখি সেদিন একটি বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকারা অভ্যাস করিতেছে, লেডি হার্ডিং আসিবেন, প্রাইজ দিবেন, তাঁকে শুনাইবে। "বাল্মীকি-প্রতিভা" রবীন্দ্রনাথের একখানি আদিকাব্য। বোধ হয় ত্রিংশদধিক বর্ষ পূর্ব্বে কোন শ্রীপঞ্চমীতে 'পূজনীয় কবিবরের অগ্রজগণ প্রবর্ত্তিত সারস্বত সম্মিলন উপলক্ষ্যে রচিত ও অভিনীত। বাড়ীর উৎসব, বাড়ীর লোকেই অভিনেতা, বাড়ীর দুটী মেয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, এবং কবি নিজেই বাল্মীকি। বড়রা যাহা করে ছোটরা তাহার অনুকরণ করিয়াই থাকে। বড়দের অভিনয় হইয়া গেলে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা বাল্মীকি প্রতিভা লইয়া পড়িল। কেহ বাল্মীকি, কেহ ব্যাধ, কেহ সরস্বতী, কেহ লক্ষ্মী—কেহ গেরুয়া পরা, কেহ স্বর্ণমাণিক্যে ঝলমল করা—সেই সুর, সেই ভঙ্গি, সেই সব—তোতার মত অবিকল অনুকরণ। তাই তোতার মত বোধশক্তি শূন্যতায় উহার যথার্থ মর্ম্মটি উপলব্ধি করিতেও অসমর্থ। যাহা আশৈশবের লীলায় খেলায় জড়িত মিশ্রিত তাহার অন্তর্নিহিত সত্য রসটুকু আয়ত্তগম্য নয়। কখন হয়ও না বুঝি—যদি না কিছুকালের ব্যবধানে একদিন সে হঠাৎ ধরা দেয়! জন্মাবধি নিত্য আয়নায় মুখ দেখিলে নিজের প্রতিবিম্বদর্শনে আর কোন বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না, কিন্তু যে মানুষ বহু বর্ষান্তে আপনাকে পুনরায় আদর্শে দেখে সে একটু নূতন রসে অভিভূত হয়, সেটি সত্য উপলব্ধির রস। রবীন্দ্র-জীবনের যে সত্যটুকু তাহা সেদিন এইরূপে হঠাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে বাল্মীকি সাজিয়াছে। স্বাভাবিক প্রতিভাশালিনী

বালিকা বক্ষে দুটী হাত রাখিয়া শির আনত করিয়া শিশু-বনদেবীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া যখন গাহিল,—

> নমি নমি ভারতী তব চরণ কমলে
> পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ!
> পূর্ণ হল বাসনা দেবি কমলাসনা,
> ধন্য হল দস্যুপতি গলিল পাষাণ।
> কঠিন ধরাভূমি এ কমলালয়া তুমি যে
> হৃদয় কমলে চরণ কমল কর দান
> তব কমল পরিমলে রাখ হৃদি ভরিয়ে
> চির দিবস করিব তব চরণ সুধা পান।

তখন তাহার ভক্তিরসধারায় ধরণী যেন প্লাবিত হইল। আর চকিতে সত্য দর্শন করাইয়া দিল যে, এ দস্যুপতিরূপী কবি রবির

"যাও লক্ষ্মী অলকায় যাও লক্ষ্মী অমরায়"—বাল্মীকি-প্রতিভা।

বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ।

নিজের মর্ম্মের কথা। লক্ষ্মীপ্রতিম একটি মেয়ে লক্ষ্মী সাজিয়া রত্নাদি দিয়াও যখন বাল্মীকি-রূপী বালিকাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলনা—সে লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উদাস ভাবে দিশায় দিশায় দৃকপাত করিয়া গাহিতে লাগিল—

> কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা
> তুমি ত নহ সে দেবী কমলাসনা
> কোরোনা আমারে ছলনা।

তখন মনে হইল বুঝি বাল্মীকির আত্মা ক্ষণকালের জন্য এই কন্যার দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

> কি এনেছ ধনমান, তাহা যে চাহে না প্রাণ
> দেবি গো চাহিনা চাহিনা
> মণিময় ধূলারাশি চাহি না,
> তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক হয় হোক
> আমি দেখি সে সুখ চাহিনা।
> যাও লক্ষ্মি অলকায় যাও লক্ষ্মি অমরায়

এ বনে এসনা এসনা—এসনা এ দীনজন কুটীরে।
যে বীণা শুনেছি কাণে মনপ্রাণ আছে ভোর
আর কিছু চাহি না চাহি না!

কার বীণা শুনিয়া কার মনপ্রাণ ভোর আছে? প্রশ্নটা আবার অকস্মাৎ মনের প্রান্তে জাগিয়া উঠিল। এ যে কবিরই নিজের আত্মকথা। এ কথা এতদিন কেন বুঝি নাই! শেষ দৃশ্যে বীণাপাণির নিকট হইতে নতজানু বালিকা-বাল্মীকি বরলাভ করিল।

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারিদিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণরসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম রবে
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া,
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর,
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

অনুভব করিলাম এ ভারতবর্ষের আদি কবি বাল্মীকির অতীত ইতিহাস নহে, এ বঙ্গের নবীনকবি রবীন্দ্রের ভবিষ্যপুরাণ। এবং সেদিন টাউন হলের বিপুল জনতার মহোৎসবে সে পুরাণ ফলিত দেখিলাম।

যাঁহারা পুরীতে সমুদ্র দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সাগরতরঙ্গ যখন বেলাভিমুখে ধাবিত হয় তখন কেমন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত স্থলাংশটুকু আচ্ছন্ন করে, প্লাবিত করে, তিরোহিত করে। এক একটা উত্তালতরঙ্গ উত্থিত হয় আর তখন এ পিঠের ও পিঠের কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিনকার সভার কার্য্যারম্ভকালে জনতরঙ্গ সেইরূপ উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছিল। লোকপুঞ্জের পর লোকপুঞ্জ অগ্রসর হইতেছে ও বেদীর সম্মুখভাগ ও দুই পার্শ্ব স্ফীত করিতেছে। ক্রমে সেই প্রকাণ্ড হলের সমস্তটা লোকে লোকময় হইয়া গেল, আর ন স্থানং তিলধারয়েৎ। কিন্তু এখনও দূরাগত তরঙ্গগর্জ্জনের ন্যায় সিঁড়ির উপর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। যখন সভার কার্য্য-সূচী, অভিনন্দন, বা আর কোনরূপ কাগজ সভাসীনগণের মধ্যে বিতরণের প্রয়াস হইল তখন তাহা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ অধৈর্য্য ও কলকলা এক মহা ঝঞ্ঝাবায়ুর সৃজন করিল। সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ লোকসমুদ্র আর প্রশান্ত হইবে কিনা সন্দেহ হইতে লাগিল।

রবীন্দ্র আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে নানা প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সেবিকার হলে পদার্পণ বা বেদীতে আরোহণের সমকালেই তাঁহাদের অভিজ্ঞান ও সম্মানদানসূচক করতালি ধ্বনিত হইতেছিল। লোকবিশ্রুতির বা উপস্থিত ভক্তজনের অল্পাধিক্যানুসারে শব্দের প্রগাঢ়তার তারতম্য উপলব্ধি হইতেছিল। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য পরিবৃত রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি যখন লোকের নয়নপথে উদীয়মান হইল তখন একটা মত্ত আবেগে

সেই বৃহতী সভা বিলোল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে সাহিত্য-সম্রাট আসিলেন। যাঁহাকে পূজাদান করিয়া আজ বাঙ্গালী জগৎবাসীর নিকট আপনাকে এক পূজার্হ জাতি প্রতিপন্ন করিতে চায় এতক্ষণে তাঁর শুভাগমন হইয়াছে। করতালি আর থামে না, হর্ষকাকলীর আর অবসান নাই। ভারতবর্ষীয় কবি সম্রাট, সুতরাং তাঁহার চেহারাখানাও রাজর্ষি তুল্যই। ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মানুষের হাতে পড়িয়া যতদূর অবহেলিত হইতে পারে তা হইয়াছে। জীবাত্মার প্রভাটি অসম ও অসংযত দাড়ির ঝোপে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ভস্মঢাকা অগ্নির ন্যায় প্রতিভার তেজ কিছুতেই আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ
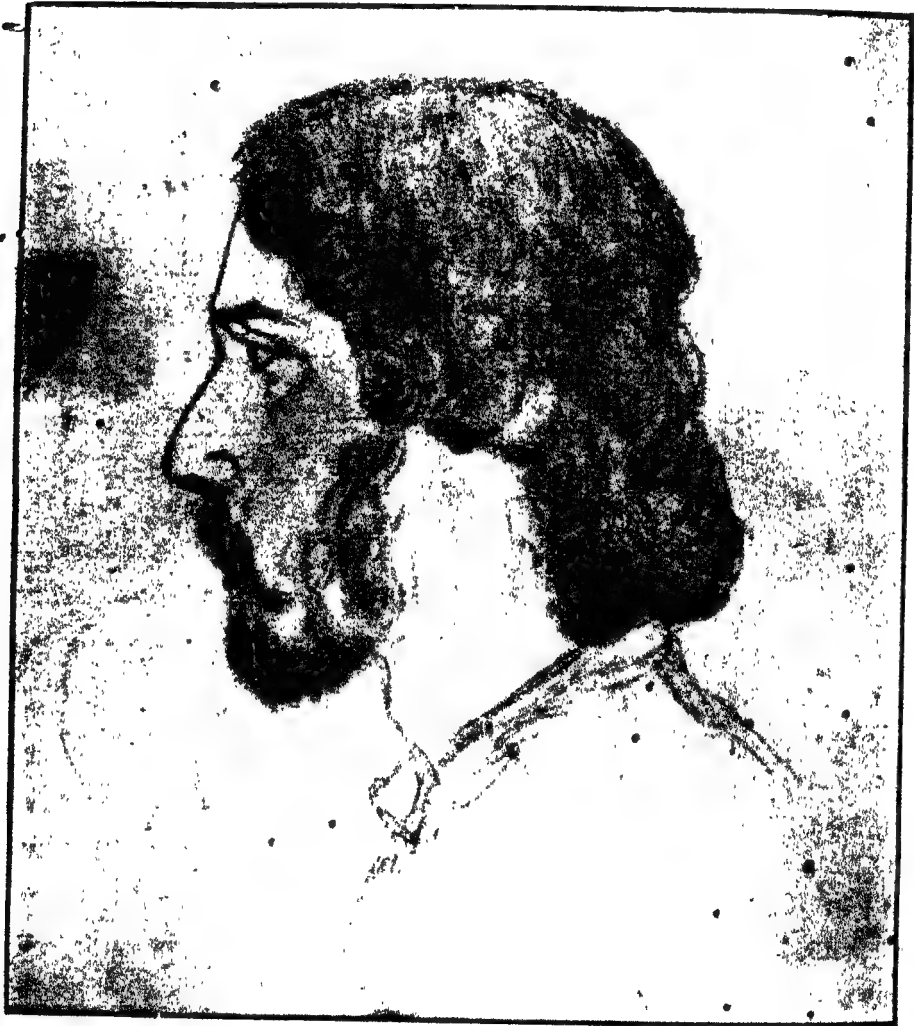
১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রেখা চিত্রিত

আসন গ্রহণ করিলে বেদীর নীচে তাঁহার সম্মুখেই একটা লোকময় প্রাচীর উঠিয়া গেল, লম্বা সারিতে বসা দর্শকবৃন্দ তার আড়ে পড়িয়া গেলেন, তাঁরা বেদীস্থগণের অদৃশ্য হইলেন—এবং বেদীস্থ সকলে তাঁদের অদৃশ্য হইলেন। কখন কখন প্রাচীরের মধ্যে ফাটল ঘটিলে আবার পরস্পরকে দেখা যায় ও পরস্পরের উৎসাহপূর্ণ মুখচ্ছবিতে আনন্দপ্রাপ্তি হয়।

কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলেন। প্রসন্ন হাস্যময়, ব্যাধি ও জরার কবলে পতনোন্মুখ হইলেও দেশের মঙ্গলজনক সকল অনুষ্ঠানে অনলসভাবে উৎসাহশীল, মতদ্বৈধের মধ্যে ঐক্য অন্বেষী, বিসম্বাদের মধ্যেও প্রীতিবর্ষী, রক্তের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে দেশানুরাগে ভরা সজ্জন দ্বিজোত্তম গুটিকত প্রীতিপূর্ণ সুসঙ্গত কথায় কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন। তৎপশ্চাৎ আচার্য্যকৃত মঙ্গলাচরণ হইল। আমার মতে এইখানটায় কার্য্যসূচী প্রণয়নকারীগণের অগ্রপশ্চাৎ বিভ্রম হইয়া গিয়াছে।

প্রতীচ্য দেশের কানুন অনুসারে সভাপতির প্রারম্ভিক বক্তৃতার পূর্ব্বে সভায় আর কোন কার্য্যই হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্য কানুনে মঙ্গলাচরণ সভাপতির উদ্বোধনার অপেক্ষা রাখে না—তাহা সর্ব্বাগ্রেই উচ্চার্য্য। কি নাটকে, কি উপন্যাসে, কি ইতিহাসে কি পুরাণে কি সভায় কি পরিষদে মঙ্গলাচরণ সর্ব্বদাই অগ্রাসন পাইয়া থাকে।

যে কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসং
সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্য রূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং।

বিশ্বতশ্চক্ষুঃকে মনন করিয়া শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত হইতে হইবে তাঁহার আবাহন প্রথমে না রাখা নিতান্ত ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ তন্ত্রীযন্ত্রের একতানবাদন যখন পূর্ব্বেই হইয়াছিল তখন মঙ্গলাচরণ তৎপূর্ব্বেও হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। সভাপতির উদ্বোধনার পর নবীন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি বিরচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল। তাহার প্রথম দুইটি চরণেই সভার মর্ম্মটিতে একেবারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভা মাঝে
অযুত-চিত-কমলে যেথা আসন তব রাজে।

কিন্তু গীতটি ভাল হইলে কি হইবে সুরটি দরবারী হওয়ায় একদিন মাত্র গাহিয়া শেলফে উঠাইয়া রাখিবার যোগ্য হইয়াছে—নিত্য ব্যবহারের প্রলোভন বর্জ্জিত। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে সুললিতছন্দে কবিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার শব্দ বিন্যাসনৈপুণ্য এমন সুন্দর যে জানা না থাকিলে তাঁহার শ্লোকগুলিকে অনায়াসে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কোন সংস্কৃত কবির রচনা বলিয়া চালান যাইতে পারিত। পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য্যের উপনিষদ গাথা পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের আশীর্ব্বচনে বিংশশতাব্দীর রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা সভা এক অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যে ও সম্ভ্রমে ভরিত হইল।

তদনন্তর কবিসখা নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্র-

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রন

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রেখা চিত্রিত

নাথ অর্ঘ্যদান করিতে উঠিলেন। অনেকদিন ইঁহাকে কোন সভাসমিতিতে দেখা যায় নাই। ইঁহার বঙ্গসাহিত্যপ্রেম, ভালমন্দ নির্ণয়ের বিচক্ষণতা ও স্বাভাবিক কতকগুলি উচ্চ মনোবৃত্তির সংস্পর্শ হইতে বঙ্গের মনীষী সমাজ কিছুকাল হইতে বঞ্চিত এবং সে বঞ্চনা তাঁহার আত্মপ্রবঞ্চনাও বটে। তাই আজ তাঁহাকে অনপেক্ষিত ভাবে বেদীর উপর অর্ঘ্য হস্তে দেখিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের ন্যায় নির্ভীক সত্যসন্ধ মহারাজ আজিকার কবিযজ্ঞে শিশুপালধর্ম্মী যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল বড় নিপুণতার সহিত প্রথমে তাহাদের খবর লইলেন। সভামধ্যে একটা বৈচিত্র্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। তিক্ত স্বাদের সম্ভাবনার আভাসটুকু দিয়া মধুরস্বাদকে আরও তিনি ঘনীভূত করিয়া দিলেন। বক্তব্যের পরিশেষে মহারাজ কবিসখাকে অর্ঘ্যদান করিলেন। একটি রৌপ্যপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ধান্য দূর্ব্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, দধি, মধু, ঘৃত পুষ্প ও গোরচনা। মাল্যদান করিলেন সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়—একটি স্বর্ণসূত্রমাল্য ও একটি পুষ্পমাল্য। তৎপরে একটি স্বর্ণপদ্ম উপায়ন প্রদত্ত হইল। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় প্রস্ফুটিত শতদল। ইচ্ছামত তাহাকে মুদিত করা যায়। তাহার আধারটিও অত্যন্ত মনোহারী! জিনিষটি সংগৃহীত হইয়াছে প্রাচ্যশিল্প প্রদর্শনী হইতে—অনুমান হয় এটি কাশ্মীর অঞ্চলের একটি বহু পুরাতন দুর্লভ কারুকার্য্য।

সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন পুঁথির আকারে হস্তীদন্তের পত্রে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পাঠ করিতে উঠিলেন—তখন স্পষ্টই দেখা গেল বৃদ্ধ সাহিত্যরথী নিতান্তই অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার অভিনন্দনের ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে সত্যের স্পষ্ট চিহ্ন দেখাইতে দেখাইতেই যেন তাঁর কণ্ঠস্বর বিগলিত হইতে লাগিল—দেহ কম্পায়মান হইল। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণজীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর কর নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্রজ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানাপ্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃতকণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর

তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার জ্ঞায়া জননী তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবন-মনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব্বে শুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু বলিয়াছিলেন। বাণী যে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে শৈশবেই উদ্বোধিত করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—

যে করুণ স্বর্গে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া—

গুরুদাস বাবু সেই বাক্যের সার্থকতা দেখাইলেন। তাঁহার ন্যায় আইন ও গণিত-ব্যবসায়ীর শুষ্ক হৃদয় মরুকেও রবীন্দ্রের কাব্য জাহ্নবী কিরূপে সিক্ত ও উর্ব্বরিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিলেন—প্রমাণ স্বরূপ স্বরচিত এই গীতটি শুনাইলেন—

"উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকোনা আর
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা,' দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি', খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবেনা আর।

তাঁহার বক্তব্যে গুণগ্রাহী তীক্ষ্ণদর্শী মনীষী বৃদ্ধ এই কবি-সম্বর্দ্ধনা সভাকে যে বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিলেন—'এই আবালবৃদ্ধবনিতা শোভিতা সভা!' বাস্তবিকই এই সভার অপূর্ব্বতা তিনি একটি বিশেষণেই পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। কল্পনা কর টাউনহলের মত স্থানে এমন বিরাট সভা, তার প্রায় অর্দ্ধেক বঙ্গদুহিতৃগণে ভরা। ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—"বাণী মন্দিরের রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে।" সে আনন্দসুধা এত প্রগাঢ়, তজ্জনিত কৃতজ্ঞতানুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে আজ বঙ্গজননীর অঙ্কশোভাবর্দ্ধনকারিণী কন্যারাও পুত্রগণের সহিত একক্ষেত্রে সমবেত না হইয়া পারিলেন না। যে সকল মেয়েরা জন্মে কখনও টাউনহল দেখেন নাই তাঁহারাও আজ কর্ত্তব্যবোধে কেবলমাত্র দেশ-পূজ্য কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাতে আজিকার সভার মান কত বাড়িয়া গিয়াছে—আর তাহার কি সুন্দর শোভাই হইয়াছে। অগণিত পুরুষরাজির মধ্যে বিদ্যুজ্জ্যোতিবৎ একএকটি বঙ্গললনার মুখ যখন নয়নে প্রতিভাত হইতেছে তখন মনে হইতেছে আজি এ সভা ধন্যা, কবি ধন্য, মাতা বঙ্গভূমি ধন্যা।—কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ—এ মুনি বাক্য বঙ্গদেশ পালন করিয়াছে ও করিতেছে সুতরাং বঙ্গমঙ্গল বিধাতার নিয়ত।

এ সভার সমাপ্তি উদীয়মান নবীন কবিগণের ও বঙ্গ দুহিতাগণের কবিকে পুষ্প গুচ্ছোপহার দানে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে বাঙ্গালী গুণীর আদর যথেষ্টভাবে করিতে শেখে নাই। জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গুণগ্রাহিত

শক্তিও পুষ্টিলাভ করিয়াছে—আজিকার সভা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। মাইকেল, হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমকে যে সম্মান দিতে পারা যায় নাই—সে ত্রুটি যেন আজ রবীন্দ্র সম্মানে বঙ্গবাসী পূরা করিয়া লইতেছে। রবীন্দ্রের প্রতিভা যেমন সাগরাভিমুখী বিশালনদের ন্যায় বহুনদীকে অন্তর্লীন করিয়াছে, রবীন্দ্রের প্রাপ্যও যেন সেইরূপ হইল। বুঝি অগ্রগামী-গণকে দেয় কড়িও তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিয়া বঙ্গবাসী আপনাকে ঋণমুক্ত করিল। এমন মহান উপলক্ষ পাইয়া সকলে বাঁচিল। শুধু কবিগণ নয়, শুধু যুবকগণ নয়, শুধু নারীগণ নয় —শতমুখে প্রবাহিত আধুনিক বঙ্গজীবনের সকল ধারাগুলি আজ আসিয়া প্রতিভাসম্মানে মিলিত হইয়াছে,—উকীল ব্যারিষ্টার জজ ডাক্তার রাজা জমিদার মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাপারী ব্যবসায়ী, কবি চিত্রকর মন্ত্রীসভার সদস্য বা সংবাদপত্রের সম্পাদক সকলেই এখানে সাগ্রহে উপস্থিত।

কেননা

"বাজাও তুমি সোনার বীণা, হে কবি। নবরঙ্গে,
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে
তোমার গানে—তোমার সুরে—
উঠিছে ধ্বনি বঙ্গ জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।"

কেননা

"কীর্ত্তি গগন-সূর্য্য হে।
বঙ্গভুবন-পূজ্য হে।
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে।
পূজ্য হে!
যা ছিল অজানা তুচ্ছ হে
কর কটাক্ষে উচ্চ সে
জগতের কবি
সভামাঝে রবি।
বাজাও বঙ্গ তূর্য্য হে।
পূজ্য হে।"

"ভগবানে আজি করিয়া আহ্বান
তাই এ প্রার্থনা—হয়ে আয়ুষ্মান
থাক জননীর দুলাল সন্তান
মহিমা ছটায় বালার্ক সমান
উজলিয়া বঙ্গভূমি।"

'বাল্মীকি-প্রতিভার' শেষ দৃশ্য পটখানি আর একবার উঠাইয়া দেখ, এবং তাহার সঙ্গে আজিকার দৃশ্য মিলাইয়া লও।

সমালোচনা।

কৃষি-রসায়ন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। গ্রন্থকার কৃষিবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ডে কৃষি-রসায়ন-পরিচয় ও দ্বিতীয়খণ্ডে কৃষি বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। রসায়ন পরিচয়ে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন অম্ল, বায়ুবর্ত্তী, গন্ধক, পোটাসিয়ম, সোডিয়াম, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, দস্তা, পারদ, টিন প্রভৃতির গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। কৃষি বিজ্ঞানে, খাদ্য, মাটি, সার প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে—বিশেষত 'শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমিতে কৃষির এই দারুণ দুর্দ্দিনে গ্রন্থকারপ্রমুখ

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কৃষির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে শুধু বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি হইবে, এমন নহে—অন্নকষ্টের কারণ নিরূপণ ও তন্নিবারণের উপায়ও নির্দ্ধারণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের পক্ষে ইহা মহা কল্যাণের সূচনা করিতেছে। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের সহিত আমরাও একমত হইয়া বলিতেছি, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগেরও অন্ন সংস্থান নিমিত্ত কৃষি অবলম্বন করিতে হইবে। প্রচলিত পুরাতন প্রণালী দ্বারা তাঁহাদের কৃষি লাভজনক হইবে না।' বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে নবকৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন উপায় নাই। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সেই কারণে যে সময়ক কালোপযোগী হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় নাই। গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মন বুলবুল। শ্রীসুশীলমালতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমকুমার সরকার, গড়পার, কলিকাতা। গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি কবিতাগ্রন্থ। দুই খণ্ড কবিতায় পরিপূর্ণ। প্রথম খণ্ডের কবিতাগুলিতে রচনার কোন বিশেষত্ব নাই। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে 'স্বপ্নজীবন' শীর্ষক অধ্যায়ভুক্ত কবিতাগুলি আন্তরিকতার গুণে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। সেগুলি সরল ও অকপট, ছন্দে মধুর, ভাবে করুণ, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। যেন শোকের সঙ্গীত বেদনার তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস। সেগুলির রচনায় কোন চেষ্টা নাই; স্বতঃ উৎসারিত নির্ঝরিণীর ধারার মত সেগুলি স্বচ্ছ।

সর্ব্বানন্দ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য আট আনা। পূর্ব্ববঙ্গীয় অন্তর্গত সিংহজনী গ্রামের জনৈক সাধুর উপাখ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। চরিত্রটি মহৎ, সন্দেহ নাই। তবে আখ্যানটি ভালো ফুটে নাই। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি নানাবর্ণের কালিতে মুদ্রিত। বাঁধানোটুকুও বেশ তকতকে। ছাপা কাগজ চমৎকার।

ফোয়ারা। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। গরুর গাড়ী, সুখের প্রবাস, পত্নীতত্ত্ব, পান, কেশোদয়ের ব্যাখ্যা প্রভৃতি ষোলটি হাস্যরসাশ্রিত প্রবন্ধের সমষ্টি। হাস্যরসের অবতারণায় লেখকের দক্ষতা অসাধারণ। এ হাস্যরসধারায় এতটুকু পঙ্কিলতা নাই। ফোয়ারার ধারার ন্যায়ই তাহা শুভ্র, অনাবিল ও উপভোগ্য। পাঠে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষালাভ হয়। বঙ্গসাহিত্যে 'ফোয়ারা' এক নূতন সামগ্রী, অবকাশ-যাপনের পক্ষে অতুলনীয়। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ প্রভৃতি সুন্দর। আকারও ছোট পকেটে রাখা যায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। কলিকাতা ২০।১ নং স্কট্‌স্ লেনে, ও ১০নং অখিল মিস্ত্রীর গলিতে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য চারি আনা। অধুনা, বঙ্গসাহিত্যে ভাষা ও বানান প্রভৃতি লইয়া রীতিমত যথেচ্ছাচার চলিয়াছে। লেখকগণের মধ্যে কেহ ব্যাকরণ জানিয়াও তাহার বিধি-নিষেধাদি মানিতে চাহেন না, কেহ বা ব্যাকরণ না জানিয়াই আসরে নামিয়াছেন। এই দুঃসময়ে অসাধারণ গবেষণা ও চিন্তার ফলস্বরূপ, গ্রন্থকারের অমূল্য 'ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ' পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের আরম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন, "আমার বোধ হয়, লেখ্য সাধু গদ্যভাষাই আপনার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য; পদ্য নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতির রচনা উহার লক্ষ্য নহে।" আমাদিগের ধারণাও এইরূপ। কারণ, 'পদ্য নাটক উপন্যাস' প্রভৃতি কলাসাহিত্য-রচনায় ব্যাকরণের কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হইলে, বহুস্থলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। তবে ব্যাকরণের নিয়ম কতটা মানিয়া চলিতে হইবে ইহাই আলোচ্য। এ

বিষয়ে রীতিমত আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার নিরপেক্ষভাবে সুবিধা অসুবিধাদির আলোচনা করিয়াছেন,—অনেক ব্যাকরণ-অশুদ্ধ পদ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলার সম্বন্ধে এখন কি ব্যবস্থা হইবে,তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। সেই গুলির দোহাই দিয়া নব্য লেখকবৃন্দ যদি আরও নূতন কথা গড়িয়া চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদিগকেই বা থামাইবেন কি বলিয়া? এ সকল বিষয়ে চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। গ্রন্থকারের এই আলোচনা পাঠ করিয়া দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সাহিত্যসেবী মাত্রেই আপন-আপন মত লিপিবদ্ধ করুন, পরে সেই সকল মতের সম্যক্ আলোচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই কি? এই গ্রন্থ লইয়াই সে আলোচনা আরম্ভ হউক,—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পালি-প্রকাশ।—অর্থাৎ পালি-পাঠাবলী ও শব্দকোষসহ পালিব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য ২৸৹ বাঁধান ৩৲ তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। পালি-শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এতকাল একখানিও ব্যাকরণ ছিল না। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় একটি গুরুতর অভাব মোচন করিলেন। সংস্কৃতের সহিত পালিভাষার বেশ সাদৃশ্য আছে—সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞের পক্ষে এই ব্যাকরণ সাহায্যে পালিভাষা শিক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। বৌদ্ধযুগের ইতিবৃত্তাদি সংগ্রহ করিতে হইলে পালি শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—এক্ষণে সেই পালিশিক্ষার উপায়টুকু অনায়াসলভ্য করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় প্রকৃতই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের বিপুল অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় পাইয়াছি। ইহাতে এমন সহজভাবে নিয়মাবলী ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে যিনি মোটামুটি সংস্কৃত জানেন, এই গ্রন্থ সাহায্যে তাঁহার পক্ষেও পালি শিক্ষা করা সুকঠিন হইবে না।

জাপান-প্রবাস।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই (জাপান) প্রণীত। উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত। কলেজ ষ্ট্রীট, এম্পায়ার লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।৹ এক টাকা চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকার প্রায় তিন বৎসরকাল শিল্প শিক্ষার্থে জাপানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় জাপানীগণের সহিত একত্র বাস করিয়া জাপানবাসীর বিবিধ সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তদ্দেশ ও তদ্দেশবাসীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল, মার্জ্জিত ও সুন্দর—পড়িতে কোথাও বাধে না। নানা তথ্য সমাবেশে গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। বাক্যচ্ছটায় অনাবশ্যক কাব্যের অবতারণা করিলে এ শ্রেণীর গ্রন্থ নিরর্থক হইয়া পড়ে, জাপান সম্বন্ধে দুই একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতে এই দোষটির প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে "জাপান-প্রবাসে"র গ্রন্থকার সে পথের পথিক হন নাই। বাক্যের ধূম্রজালে তিনি পাঠকের দৃষ্টি ধাঁধাইবার চেষ্টা না করিয়া জাপানের গৃহকোণটি অবধি যাহাতে পাঠকের চক্ষে সমুজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। জাপানের ও জাপানের অধিবাসীগণের একটি পরিপূর্ণ চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে ফাঁকি নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়—আমরা যেন কখনও জাপানের কোন পথে ভ্রমণ করিয়াছি কখনও বা কোন জাপানীর গৃহে অতিথি হইয়াছি। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। ছাপা কাগজ বাঁধাইও মনোরম।

ভারত-উচ্ছ্বাস বা রাজভক্তি।—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত।

রাজ-আবাহন।—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ, প্রণীত। ভবানীপুর ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত।

রাজ-পূজা।—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, কোন্নগর। কলিকাতা প্রেসে মুদ্রিত।

তিনখানি গ্রন্থই সম্রাট ও তৎপত্নীর ভারত আগমন উপলক্ষে রচিত। তিনখানিরই রচনা ছন্দে গ্রথিত।

Bangabasi College Magazine. vol. x. No. 1. January, 1912.— এই পত্রিকাখানি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে প্রকাশিত। ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষাতেই প্রবন্ধ থাকে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ নানা কলেজ হইতে এক্ষণে পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতেছে— কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজই এতদ্দেশসমূহে এবিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। ছাত্রগণকে সাহিত্যচর্চ্চায় দীক্ষিত করিবার জন্য এই পত্রিকার স্থাপনা। সাধারণতঃ শিক্ষকদিগের রচনা অল্পই প্রকাশিত হয়। অপর কলেজের রচনা গৃহীত হয় না। বর্ত্তমান সংখ্যায় সম্রাট-সংবর্দ্ধনা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি কৌতুক প্রবন্ধ "অন্নপ্রাশনের অবসর" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সাত ভাই চম্পা।—কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র 'সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনে'র চিরপরিচিত রূপকথা অবলম্বনে নাট্যাকারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। নাটাখানিতে কাব্যরস বেশ ফুটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিক্ষাও আছে। শিশুগণের অভিনয়ের পক্ষে গ্রন্থখানি সমধিক উপযোগীও হইয়াছে। করুণ, হাস্য প্রভৃতি নানা রস অবতারিত হওয়ায় শিশুহৃদয় বিচিত্রভাবে সাড়া দিয়া উঠিবে। গ্রন্থে তিনখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

বিশ্ব-স্বয়ম্বরা।

বাসবের দীপ্ত সহস্রলোচন
নিমেষ-বিহীন তারা,
ধরণীর শ্যাম রূপের ধেয়ানে
সারানিশি জেগে সারা!

বরুণ কাঁদিছে করুণ রোদনে
নিরত সাগর জলে,
শ্যামা বসুধার প্রেমের লাগিয়া
পড়িয়া চরণ তলে!

করিতেছে বায়ু ক্ষয় পরমায়ু
নিশিদিন হাহাকার,
শ্যামল তনুর পরশ লালসে
ছুটে আসে বার বার!

অন্তহীন ব্যোম সুধাভরা সোম
তোমারে মিনতি করে,
দিগন্তে লুটায়, জ্যোৎস্নাধারায়
সোহাগে বেড়িয়া ধরে!

একব্রতা তুমি ওগো মর্ত্ত্যভূমি,
সতী পার্ব্বতীর মত;—
শিবের মতন শুভ্র কিরণ
সবিতায় ধ্যানরত!

তুষ্ট আরাধনে অক্ষয় যৌবনে
সাজালেন কলেবর,
পুষ্পধনুর কুসুমমাধুরী
চিরদিন সহচর,

প্রচ্ছন্ন গভীর নিবিড় তিমির
খনির বুকের তলে
অচপল জ্যোতি মাণিকের আলো
তাঁহারি প্রসাদে জ্বলে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৩, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
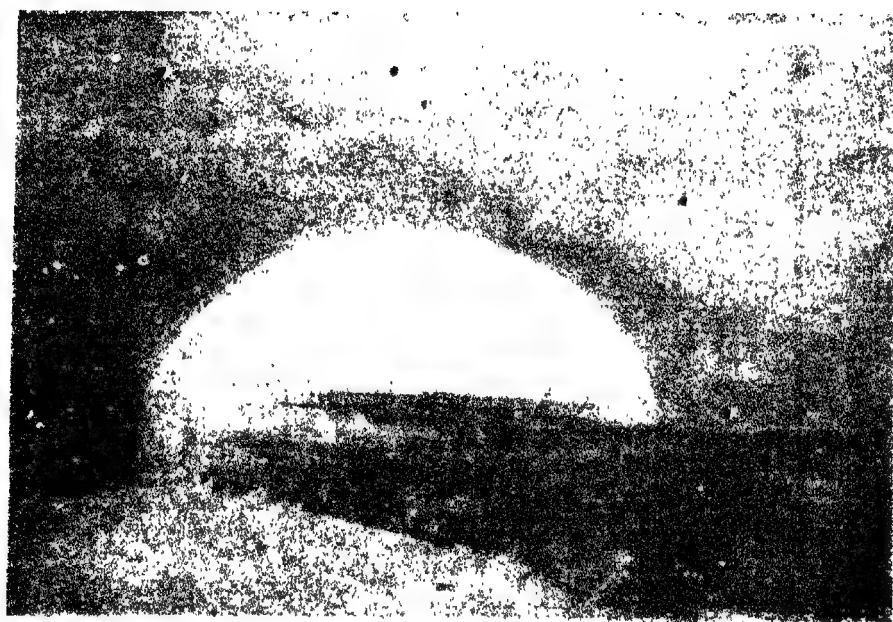
অন্নপূর্ণার মন্দির।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভট্টাচার্য্যের পুরাতন বাড়ীর ধীরে ধীরে সংস্কার হইয়া গেল। বাটীর বাটীজন্মের পর রামশঙ্করের পিতা একবার কলিচূণ ফিরাইয়া ছিলেন। বহুদিন পরে তাই বুভুক্ষিত বাড়ীটাও অনেক মাল মসলা গিলিল। জাহ্নবী বিশ্বেশ্বরকে নিষেধ করিলেন। বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল, অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন তবে আর এ বাড়ীতে থেকে কাজ নাই, কোন্‌দিন ঘর চাপা পড়ে যাবে ও বাড়ী চল"। অগত্যা জাহ্নবী নীরবে রহিলেন।

ভট্টাচার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া পাড়া প্রতিবেশীরা নীরবে মনের আগুনে পুড়িতে লাগিলেন। "একে বাড়ী ঘর নূতন হ'ল, তাতে দিনও বেশ যাচ্ছে, আবার হরিটাও দিব্যি বাড়ী এসে শান্ত শিষ্ট ছেলেটি হয়েছে, বিস্তর কাজকর্ম্ম দেখে শোনে। তার নাম ক'রেও যে কেহ জাহ্নবীকে খোঁটা দিবে সে উপায়ও আর নাই।" এক উপায় মৃতা সতীর নামে কিছু জল্পনা করা, নয়ত জীবিতা সাবিত্রীর নামে কিছু অপবাদ সৃষ্টি করা! কেহ কেহ বলিল, "বিশ্বেশ্বর বুঝি ভটচাযদের জামাই হবে লো, তাই এত টান।" অন্য একজন চোখ ঠারিয়া বলিল "ঢাক ঢোল বাজিয়ে জামাই হলে ত ভাল কথাই,—গোপনের জামাই হলেই লেঠা। কিন্তু যখন সকলে শুনিল সাবিত্রীর জন্য বিশ্বেশ্বর পাত্রানুসন্ধান করিতেছে, সম্মুখে শ্রাবণ মাসে তাহার বিবাহ; তখন সকলে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা দেবী বিশ্বেশ্বরের উৎসাহহীন মনকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আর দেরী ক'রনা বিশু দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ে পনের বছরের হ'তে চল্‌ল; মাগী মুখে কিছু বলে না কিন্তু হাঁপ্‌সে পড়েছে। পাত্রের জন্য ভাল ক'রে চেষ্টা কর।"

"আমি কি চেষ্টা করছি না মাসিমা? কিন্তু ভাল পাত্র চাইত! অনেক খোঁজার পর আজ একখানা পত্র পেয়েছি। পাত্রটি বিদ্বান, দু তিনটি পাস করা, অবস্থা ঘর সবই ভাল। পাত্রের বাপ আছে। কেমন মাসিমা পাত্রটি কেমন হবে?"

"শুন্‌তে ত' মন্দ বোধ হচ্ছে না, তবে বিশেষ করে খোঁজ নিয়ে কাজ ক'রো বাপু, না পস্তাতে হয়।"

"তা তুমি নিশ্চিন্দি থাক মাসিমা।"

"হ্যাঁরে তা পাত্র পণ কত টাকা নেবে?

বিশ্বেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল,

"অমন পাত্রটি কি বিনে পয়সায় পেতে চাও? টাকা কিছু লাগ্‌বে বই কি! তার জন্যে ভেবো না, বিয়ের দিন তখন শুনো। তোমার ক্যাস বাক্সটা আমার হাতে দিও।" মাসিমা রাগিয়া বলিলেন "যা, যা, সকল তাতে খোকামী। আর দেরী যেন না হয়।"

নিকটে বসিয়া নিধের মা পাকা আমগুলা সারি দিয়ে সাজাইতেছিল। কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিল "হ্যাঁ মা তা দাদা বাবুর কবে বিয়ে হবে? দাদা কি বিয়ে করবেই না।

মাসিমা একবার বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া আবার অধোমুখে বলিলেন "আমি তার কি জানি মা, ভগবান আর বিশুই জানে; নিধের মা বলিল "ওমা বয়েস হ'লো, হোক্ গ্যানে, ভদ্দরদের ধরণই ভেন্ন।" বিশ্বেশ্বর নিধের মাকে পরিহাস করিত, কিন্তু সহসা মাসীর কাতর দৃষ্টি দেখিয়া থামিয়া গেল। পূর্ব্বে বিবাহের সম্বন্ধে কোন করুণাসূচক বাক্যে বা দৃষ্টিতে তাহার মন কিছুতেই দমিত না, কিন্তু এখন দেখিল তাহার মন অতিশয় কোমল হইয়া গিয়াছে। মাসিমার বেদনা অনুভব করিয়া সহসা আজ যে তাহার প্রাণে ব্যথা বাজিয়া উঠিল। ভাবিল কি এক সামান্য খেয়ালে মাতৃসমা স্নেহশীলার অন্তঃকরণে সে কি বিষম আঘাত দিয়াছে, ও দিতেছে। এই খেয়ালে সেও কি বিশেষ সুখী হইয়াছে? মাসিমাতাকে দুঃখ দিয়াছে বলিয়া মনে ক্ষোভ জন্মে নাই? সেই অবিমৃষ্যতার পরিণাম কি শোচনীয় হইয়াছে! বিশ্বেশ্বর সহসা যেন বুঝিল সংসার যে নিয়মে চলিতেছে তার সঙ্গে সেই নিয়মেই চলিতে হইবে, এক চুল এদিক ওদিক করিলে তাহার চক্রনেমিতে পেষিত হইবে"।

কিন্তু তাহা ভাবিয়া আর এখন কার্য্য নাই। হস্তচ্যুত পাশা হস্তে কখনো ফিরিয়া আসেনা! এখন কেবল সেই পাশার চালেই চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে হইবে। সে চাল আরত্ত ফিরিবে না! এখন আর বিদ্রোহিতায় কোন' ফল নাই। বিশ্বেশ্বরের সতীর অভিশাপ মনে পড়িল। সে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর তাহার অন্তরে মুদ্রিত আছে। সে একজনকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ভাল বাসিবে, সুখী হইয়া বুঝিবে সংসারে এই আদান প্রদানই শ্রেষ্ঠ সুখ!" না না, তাহা হইবে না! সতীর এ অভিশাপ কখন' সফল হইতে দেওয়া হইবে না। সংসারে যতই অশান্তি জাগিয়া উঠুক, দুঃখ বেদনা প্রকাশ পাক্, এ প্রতিজ্ঞা অটল রাখিতেই হইবে। তাহার কাপুরুষতায় সতী যেন পরলোক হইতে ব্যঙ্গের তীব্র হাসি না হাসে। তাহার অভিশাপ ব্যর্থ করিতেই হইবে।"

কয়েক দিনের মধ্যেই বরপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইল! অন্নপূর্ণা বলিলেন "আর দেরী না করা হয়, সম্মুখে ১৫ই শ্রাবণ ভাল দিন আছে, ঐদিন স্থির কর"।

বিশ্বেশ্বর বলিল "আজ ৭ই—মধ্যে কেবল সাতটা দিন—এর মধ্যে সব জোগাড় হবে মাসিমা?"

"খুব হবে। আমি যেমন বলি এখনি সব আনাতে আরম্ভ কর দেখি, আলিস্যি করিস্‌নে।" বিশ্বেশ্বর কোমর বাঁধিয়া লাগিল! ভট্টাচার্য্যদের বাটীতে মস্ত একখানা চালা ঘর উঠিল,—সেই খানা বাহিরের ঘরের কার্য্য

করিবে। ভিতরের অঙ্গন পরিষ্কার হইয়া তিন চারখানা চালাঘর উঠিল! অঙ্গনে বাঁশ, পোঁতা হইল, পাছে বৃষ্টি হয়,, সেই জন্য সামিয়ানা টাঙ্গাইতে হইবে। অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণার মত ভাণ্ডার সাজাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। জাহ্নবী কেবল নীরবে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত চাহিয়া দেখিতেন, কেবল অন্নপূর্ণা যাহা আদেশ করিতেন তাহাই পালন করিয়া যাইতেন। সাবিত্রী অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার তুলসীতলাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহার তলায় প্রদীপটি দিয়া, মাতাকে ও ভ্রাতাদের যথা সময়ে খাওয়াইয়া, সাবিত্রী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার বিবাহের খাটুনি খাটিত। কেহ পরিহাস করিলে গ্রাহ্য করিত না। বাড়ীতে এখন লোকের অভাব নাই, অনেক লোক খাটিতেছে। পাড়া প্রতিবেশীরাও সর্ব্বদা সংবাদ লইতেছে, আসিতেছে যাইতেছে, কুটুম্বিতা পাতাইতেছে। জ্যেঠাইমাও আসিয়াছেন।

সাবিত্রীর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইল। মধ্যে বিবাহের আর একদিন মাত্র দেরী, সাবিত্রীকে আদর করিয়া পাড়া প্রতিবেশীরা "আইবড়-ভাত" খাওয়াইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে একবার নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া উভয়ে মিলিয়া রন্ধনাদি করিলেন। বিশ্বেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তোমরা যে আজ এবাড়ীতে মাসিমা?"

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন,—

"আজ যে সাবিকে আইবড়-ভাত দেব। দেখদেখি বারাণসী কাপড় খানা পরিয়ে দুল দুটো কানে দিয়ে সাবিত্রীকে কেমন দেখিয়েছে?" বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল এ যেন খাপ খাইতেছে না, তাহার রুক্ষ চুলে মলিন ছিন্নবাসে ইহাপেক্ষা ভাল দেখায়! এ যেন বিলাসিতার মধ্যে আত্মসমাহিতা, উদাসিনীর মূর্ত্তি! বিশ্বেশ্বর সুখী হইল না, ভাবিতে ভাবিতে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল।

আহারের ডাক পড়িল। বিশ্বেশ্বর খাইতে বসিলে মাসী বলিলেন "সাবিত্রী আজ নিজের আইবড়-ভাত নিজে রেঁধেছে! এমন পাগ্‌লা মেয়েও দেখিনি। কেমন হয়েছে?"

"বেশ! বিশ্বেশ্বর নীরবে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল। সাবিত্রীকে খাওয়াইয়া মাসিমা বলিলেন "মা একটু শোও গে! আমি ও ভাত কটা সেদ্ধ করে সেবেনি।"

সাবিত্রী পাখা হাতে লইয়া মাসিমার রন্ধনের নিকটে বসিল। মাসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

"আজ এসব খাওয়া দেখ্‌তে নেই মা, আমার ঘরে একটু গড়াওগে, একা ত্ত বাড়ী যেতে দেবেনা আমার বেশী দেরী হবে না। তুমি যাও মা, যাও।" অগত্যা সাবিত্রী উঠিয়া গেল। অন্নপূর্ণার কক্ষে গিয়া পরিহিত বস্ত্রখানা খুলিয়া ফেলিয়া নিজের সাধারণ বস্ত্রখানা পরিয়া লইল। ইয়ারিং দুটা খুলিয়া বালিশের উপরে রাখিয়া দিল। তাহার পরে অনন্যোপায় হইয়া মাসিমার শয্যাপার্শ্ব হইতে মহাভারত খানা টানিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিল, শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল "কি দেখ্‌ছিলে? মহাভারত?"

সাবিত্রী তখন শয্যা হইতে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাথা নাড়িল, হাঁ।

"তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে সাবিত্রী! জিজ্ঞাসা করব বল্‌বে?"

সাবিত্রী নীরবে পুনর্ব্বার মস্তকান্দোলন করিল, বলিবে।

আমার কাছে কিছু লজ্জা ক'রনা, আমি তোমার লজ্জার উপযুক্ত কেউ নই। কথাটা বলি; যে পাত্র তোমার জন্য স্থির করেছি, অতি সুপাত্র। তোমার কোন' অমত নেই ত?"

সাবিত্রী নীরবে নত মস্তকে রহিল, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। বিশ্বেশ্বর পুনর্ব্বার বলিল,— "বল, নইলে আমি অন্য কিছু ভেবে নিতে পারি। তোমার অমত আছে?"

সাবিত্রী এবারে কথা কহিল, মৃদু স্বরে বলিল "আমার অমত? একথা কেন বল্‌ছেন?"

"কি জানি আমার কেমন মনে হ'ল যে তোমায় একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমার বিশ্বাস এ বিয়েতে তুমি ভবিষ্যতে খুব সুখী হবে। হবেনা কি?"

"আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন। আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই তাই হবে"।

"আমি বল্‌ছি বলে কেন বল্‌ছ সাবিত্রী? তোমারও কি সে বিশ্বাস নয়?"

"হ্যাঁ! আপনি যখন সব করেছেন তখন আমার ভালর জন্যেই কর্‌ছেন'!"

"সত্যই তাই সাবিত্রী! আমি কেবল কিসে ভাল হবে, সেই চিন্তাই কচ্চি— সেই"—

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল "তাত' আমি জানি। আমি জানি আপনি দেবতা।" বলিতে বলিতে সাবিত্রী নতজানু হইয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিল। অপ্রতিভ হইয়া "কিকর সাবিত্রী', বলিয়া বিশ্বেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর মুখে বলিল "আমায় তুমি চেননা, তাই ওকথা বল্‌লে—যা বল্লে আমি ঠিক তার উল্‌টো! দেবতা নয় দুর্ব্বল মানুষ"—বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ হাসি হাসিল। ক্ষণেক পরে নতমুখী সাবিত্রীকে বলিল "আমায় কি কিছু বল্‌বে সাবিত্রী? যদি বলবার হয় বল।"

সাবিত্রী একবার তাহার দিকে চাহিয়া আবার তখনি নিম্নদৃষ্টি হইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল "একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাচ্চি। আমায়,—বিয়ের পর তারা কি নিয়ে যাবে?"

"তা নিয়ে যাবে বই কি! একথা কেন বল্‌ছ? সবাই ত স্বামীর ঘর করে।"

"এই জন্যে বল্‌ছি, আমার মার কাছে কে থাকবে? দিদি নেই, আমিও থাকব না, মাকে কাকে কে দেখবে! আমায় কি বিয়ের পর এখানে রাখতে পারেন না? অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য?"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল,—বোধ হয় সাবিত্রীর লজ্জাহীনতার জন্য একটু, ক্ষোভের নিমিত্ত একটু। হাসিয়া বলিল, "তা কি হয় সাবিত্রী! এ অনুরোধ কি করা যায়?"

সাবিত্রী একটু ভাবিল। ক্ষুদ্র একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তবে থাক আপনি ত এখানে থাকবেন। দাদাও এখন মার কথা শোনে। আপনারাই মাকে দেখবেন—আমার বলা বেশীর ভাগ।"

বিশ্বেশ্বর আবার হাসিয়া বলিল "বিয়ের কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হয়না বুঝি?"

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িল, না! বিশ্বেশ্বর আবার বলিল "সকলের ত হয়, তোমার হয় না, কেন?"

"যাদের হয় তারা কি আমার মত আত্মীয় বন্ধুর, মায়ের, বুকের রক্ত ভাবনায় ভাবনায় জমাট বাঁধিয়ে দিয়ে সকলের ভার স্বরূপ, দুর্ভাবনাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিশুদাদা?"

"সাবিত্রী অমন কথা বলো না, তুমি কি আমাদের ভারস্বরূপ?"

"নই কিসে? আমার জন্য কি আপনার কম কষ্ট পেতে হচ্চে। কম খোঁজা খুঁজি কম চেষ্টা করছেন।"

"এতে ত কষ্ট নয় সাবিত্রী! তোমাকে কিসে সুখী করব সেই আমার ভাবনা; তোমাদের সুখেই আমি সুখী হব। এই যে পাত্র আমি স্থির করেছি, তোমার অমত হয় বল আমি এখনি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে এর অপেক্ষাও ভাল পাত্র ঠিক করব। বল তোমার কি অমত আছে?"

"এমন কথা একতিলও ভাববেন না। আপনারা সবচেয়ে যাকে মন্দ মনে করেন এমন কারু সঙ্গেও যদি বিয়ে দেন, তবু জানবেন আমি সুখী হব। তবুও জানব আপনি দেবতা, আপনি আমার মাকে, আমাদের মহা বিপদে রক্ষা করছেন। দিদি আমাদের আপনাকে দিয়ে গেছেন।"

সাবিত্রী ভক্তিভরে নতমস্তকে মৃদুপদে চলিয়া গেল। আত্মহারা স্তম্ভিত বিশ্বেশ্বর ভাবিতেছিল এ দেবীরা মর্ত্ত্যভূমিতে কেন আসিয়াছে? কেবল কি দুঃখ ভোগ করিতে? সংসারের পাষাণ চরণে কেবল কি আত্মবলি দিতে? এ কথা বলিলে বিধাতার অপমান করা হয়! সতীর আশীর্ব্বাদ সাবিত্রীর মস্তকে আছে, নিশ্চয়—নিশ্চয় সে সুখী হইবে।

বিশ্বেশ্বর আবার কোমর বাঁধিয়া বিবাহ বাটীতে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রে বাটী গিয়া শুইল। পর দিন বৈকালে বর ও বরযাত্রীরা আসিয়া পৌঁছিল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; সমাদরে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দিল। বরের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইল কিন্তু বরকর্ত্তার আত্মম্ভরী স্বভাবে ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় কিছু অসন্তুষ্ট হইল। যাহা হউক আদর আপ্যায়িত ভোজনে ঘুমে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে বিশ্বেশ্বর দুই হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিবাহ বাটী ছুটিল। সানাইওয়ালা চালার মধ্য হইতেই তান ধরিয়াছে।"

তুলসীতলায় নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বাটীতে কেহ উঠে নাই, বিশ্বেশ্বর একটু পরিহাস করিতে গেল কেন না সকলের অগ্রেই সাবিত্রী উঠিয়াছে। পরিহাস মুখে আসিল না, সে অচঞ্চলা স্থির মূর্ত্তি উদাসিনীর পানে নীরবে চাহিয়া থাকিতে হয়; না জানি সে যোগিনী কোন যোগে নিমগ্না! বাহিরের চঞ্চল স্রোত তাহাকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই! না জানি সে দেবী কোন আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাটী লোকজনে পূর্ণ, চারিদিকে গোলমাল চেঁচামেচি। গ্রামস্থ সকল লোকই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া নিজ

নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যার পর চারিদিকে আলো জ্বলিল, অল্প রাত্রেই লগ্ন। বিশ্বেশ্বর একা চারিদিকে তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। অন্তঃপুরে অন্নপূর্ণা গৃহিণী। জাহ্নবী আজ সকলের চক্ষে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। যেখানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানে গিয়া নীরবে শুইয়া আছেন। ক্ষণেক পরে সাবিত্রী আসিয়া নিকটে বসিল, তাহার নববধূর বেশ, মস্তকে কন্যাপত্রিকা। জাহ্নবী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন "তুমি এখানে কেন মা—এখন যে পীঁড়ির ওপর বসতে হয়, যাও মা যাও।"

যা"চ্চি মা, একটু তোমার কাছে বসে থাকি।"

"না না যাও যাও—দিদি—দিদি কোথায় গেলে ?"

সাবিত্রীকে কন্যাপীঁড়িতে না দেখিতে পাইয়া অন্নপূর্ণা ছুটিয়া সেই কক্ষে আসিলেন। জাহ্নবীকে তিরস্কার করিলেন। জাহ্নবী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া কন্যাকে লইয়া যথাস্থানে গিয়া কন্যাপীঁড়িতে বসাইয়া দিলেন। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার নিকট হইতে তখন বরের জোড়, হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি লইতে আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরে বাদ্যের তুমুল কোলাহল ও হুলুধ্বনি উঠিল—একজন ভদ্র লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ওহে বাপু বর যে দ্বারে উপস্থিত,—এরপরে ও সব নিলে চলবে,—যত সব ছেলে মানুষের কাজ, চল চল"

"যাই" বলিয়া বিশ্বেশ্বর একবার কক্ষের মধ্যে চাহিল! সাবিত্রী তখন চণ্ডী কোলে লইয়া কাঠায় করিয়া জল লইয়া তোলাপাড়া করিতেছে; বস্ত্রে, সোলার মুকুটে তাহার মুখ আচ্ছন্ন। বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে সভাভিমুখে চলিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে সত্যই তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল।

বর সভাস্থ হইল। বরপক্ষে কন্যাপক্ষে তুমুল বাদানুবাদ তর্ক রসিকতা গোলমাল চলিতে লাগিল। পাত্র গম্ভীর মুখে দর্পণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, বিশ্বেশ্বর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক এক বার তাহার পানে চাহিল। বরকর্ত্তা এক পার্শ্বে বসিয়া অতি অল্প পাওনায় যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিতেছেন,—উৎসুক পরোপকারী গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তারা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে নানাপ্রকার ভরসা দিতেছে।

নরসুন্দর আসিয়া বলিল "বাবু আর দেরি কেন ভেতরে সব ঠিক হয়েছে।" বিশ্বেশ্বর হরিকে ডাকাইয়া যাহা বলিতে হইবে শিখাইয়া দিলেন। হরি গলবস্ত্রে যোড়হস্তে বলিল "তবে সকলে অনুমতি করুন কন্যা পাত্রস্থ করা যাক।"

"হাঁ হাঁ! অবশ্য অবশ্য"র সঙ্গে সঙ্গে বরকর্ত্তার জয় ঢক্কার ন্যায় নিনাদ উঠিল "অগ্রে পণের টাকা আসুন—তবে সে কাজ।" "হাঁ হাঁ তার আর কথা আছে!" এই নিন তোড়া এখন পাত্র উঠাতে পারি ?"

বরকর্ত্তা টাকা গুণিতে গুণিতে বামহস্ত উত্তোলন করিয়া নিবারণ করিলেন। বিরক্ত হৃদয়ে হরি ও বিশ্বেশ্বর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। টাকা গুণিয়া মহিষাসুর কান্তি বরকর্ত্তা বলিলেন 'হাঁ, এ ত তিন হাজার পাওয়া গেল এখন বরাভরণ কন্যাভরণ সব দেখার দরকার!

শেষে যে "গোলে হরি বোল" হবে তাতে আমি নেই। কন্যা সভায় আনয়ন করুন। এখন কার বিবাহের এই প্রকার নিয়ম।"

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়া বলিল "আমাদের এত ছোটলোক ভাববেন না। কন্যা সভায় টভায় আনা হবে না। ভেতরে চলুন, সেইখানে গিয়ে দেখে নেবেন।

"এ ত রাগারাগির কথা নয় বাপু! লেহ্ন দেনা পাওনার কথা! সভায় কন্যা আনার দোষ কি? আমাদের দেশে এই রকম নিয়ম। অনেকে বরকর্ত্তার বাক্যের অনুমোদন করিল। বিশ্বেশ্বর স্থিরকণ্ঠে বলিল "আপনাদের নিয়ম এখানে চলবে না—কন্যা সভায় আনা হবে না।" অগত্যা মন্ত্রণাপক্ষীয় দুই জন লোক বরকর্ত্তাকে চুপি চুপি বলিল "একে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না—ভেতরেই চলুন। সেখানে সব হবে।"

বর, বরকর্ত্তা ও কন্যাপক্ষীয় বরপক্ষীয় কয়েক জন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বরাভরণাদি দেখিয়া বরকর্ত্তার রাসভ নিন্দিতকণ্ঠে বলিলেন "কন্যা আন, কন্যা নিয়ে এসো।

স্ত্রী মহলে রব উঠিল "ওমা আগে স্ত্রী-আচার হবে তবে ত বিয়ে।"

হরি রোয়াকে উঠিয়া তাহাদের তাড়া দিয়া বলিল "রাখ তোমাদের স্ত্রী-আচার! আগে বরকর্ত্তার পছন্দই হোক; এ বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্চি না, এ মাল যাচাই করা।"

অবগুণ্ঠনবতী সাবিত্রীকে হাঁটাইয়া লইয়া আসিয়া হরি বরকর্ত্তার নিকটে বসাইয়া দিল। বরকর্ত্তা একে একে অলঙ্কারাদি দেখিয়া ঈষৎ প্রসন্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "হাঁ তা কন্যাকে আর ঘরে নিয়ে যেওনা তোমরা স্ত্রী-আচার আরম্ভ কর। "হ্যাঁ—হ্যাঁ—কন্যাকর্ত্তা কই?" হরি বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিতেই বিশ্বেশ্বর হরিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল "উনিই কন্যাকর্ত্তা। কন্যার জেষ্ঠ ভ্রাতা।"

"তা গিয়ে, তা বেশ! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটা কথা! একথা তোমাদের আগে স্বীকার করা উচিত ছিল, তাহলে কি আমি এ কার্য্য কর্‌তে আসি? যাহোক আর এক হাজার টাকা পেলেই আমি রাজি হ'তে পারি, ভদ্রলোক তোমাদের জাত মারতে চাইনে!"

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল "আবার কিসের টাকা মশায়? আপনি যে নানান্ ফেঁকড়া তুলছেন? বিবাহ কি হতে দেবেন না!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কেহে বাপু? মধ্যে থেকে কথা কও? হচ্চে কন্যাকর্ত্তার সঙ্গে কথা—"

বিপন্ন হরি বাধা দিয়া বলিল "উনিই কর্ত্তা, মশায়! যা বল্‌তে হয় ওঁকেই বলুন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা দেখছি জুয়োচ্চোর হ্যা? কে কন্যাকর্ত্তার ঠিক নেই যেমন পবিত্র কুল তেমনি জোচ্চোরি এমন জায়গাতেও মানুষে বে দিতে আসে?"

বিশ্বেশ্বর অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিল "বলুন কি বল্‌তে চান, আমিই কন্যাকর্ত্তা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তা এতক্ষণ জোচ্চরি হচ্ছেল কেন? আর হাজার টাকা না হলে আমি বে দিতে দেব না।"

"কেন? কিসের জন্যে? আপনার সব টাকা ত গুণে পেয়েছেন।"

তোমাদের কুল এমন পবিত্র তাকি জানি?

কন্যার বড় ভগ্নী নষ্ট চরিত্র বিষ খেয়ে মরেছে শুন্‌ছি।”

বিশ্বেশ্বর গর্জ্জন করিয়া উঠিল “সাবধান! কার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মুখ সাম্‌লে কথা কন্।”

কিসের মুখ সাম্‌লাব? দিলুম না ত বে! দেখি তোমরা কি করতে পার, চল্ বরেন্দ্র ওঠ!” বর বরাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া গিয়া বরকে ধরিল, কেহ গিয়া বরকর্ত্তাকে ধরিল ‘মশায় করেন কি—করেন কি থামুন আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি—এমন কাজ করবেন না।’

মেয়ে দিতে এসে এত জোর জবুরি? দেখি কি করে মেয়ে পার করিস্?”

“থামুন থামুন আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি।” পরশুভাকাঙ্ক্ষী মণ্ডলেরা দুএকজন আসিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় রুদ্ধহস্তপদ বিশ্বেশ্বরের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিল “ওহে এত কর্‌লে ত এ সামান্যর জন্যে আর কেন! একটা হাজার টাকা বইত নয়, দিয়ে ফেল, আমরা এর পরে না হয় চাঁদা তুলে ও টাকাটা তোমায় দিয়ে দেব, যাও টাকা এনে মিটিয়ে ফেল, লগ্ন ভষ্ম হয়।”

নারীমণ্ডলী চিত্রপুত্তলির ন্যায় রোয়াকের উপরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের হাতের শঙ্খ হাতে; মুখের হুলুধ্বনি মুখে নিরুদ্ধ। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল কে একজন পার্শ্বে মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া পড়িয়াছে; অন্নপূর্ণা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে হস্ত নাড়িয়া বলিলেন “টাকা এনে দিয়ে যাও—লগ্ন ভষ্ম হয়, দেরী ক’রোনা।

বিশ্বেশ্বর বুঝিল মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোক জাহ্নবী। নিকটে দাঁড়াইয়া হরি ভয়ার্ত্তভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। নিমেষে একবার সাবিত্রীকে দেখিয়া লইল, সে তেমনি অবগুণ্ঠনমুখী মৃত্তিকার মত নীরব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বর স্থিরকণ্ঠে বলিল “শুনুন আমার শেষ কথা! কন্যার ভগিনী দেবীতুল্যা, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। আমি আর কোনোমতেই টাকা দিব না। এতে আপনার যা ইচ্ছা করুন।”

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, কর কি বিশ্বেশ্বর! কর কি! হরি আর্ত্তকণ্ঠে বলিল “বিশু বাবু কি বল্‌ছেন।” স্থিরকণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিল,“হরি থাম। আপনারা মনেও কর্ব্বেন না যে আর আমি টাকা দেব। তবে বরকে এই কথা বলছি! মশায় যে রত্ন আপনাকে আজ দিতে এসেছি তার মূল্য যদি আপনি বুঝতে পারেন ত বুঝবেন, আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি! দেখুন দেখি এ দ্রব্য কি মূল্য দিয়ে বিক্রী হয়?”

বিশ্বেশ্বর সাবিত্রীর নিকটে আসিয়া তাহার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া সোনার মযূর টানিয়া ফেলিয়া দিল। সাবিত্রীকে বরের মুখের পানে ফিরাইয়া বলিল “দেখুন এ রত্নের কি মূল্য হয়?”

বর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল “পিতা বর্ত্তমানে আমাকে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।”

বরকর্ত্তা ডাকিলেন, “এস হে বাপু উঠে এস—এদের বে দেওয়া নয়—ধাষ্টামো—চল আমরা যাই।” যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলিল,—“বিশু করছ কি? এখনও বোঝো।”

“আমি বেশ বুঝেছি।”

বরপক্ষেরা বলিল—আচ্ছা হাজার না দাও ত পাঁচশো দাও।"

"এক পয়সাও নয়।"

বিচক্ষণেরা গিয়া বরকর্ত্তাকে চোখ টিপিল বলিল "আর কাজ নাই, এ দাঁও ফসকাইল, এখন যথালাভ করিয়া আগের সর্ত্ত মতই রাজি হোন্।" তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল "আচ্ছা এস আমরা মিটিয়ে দিচ্চি; মশায় ভদ্র লোকের জাতমারা ধর্ম্ম সয় না। আপনি না হয় একটু ক্ষতি স্বীকার করে আগের সর্ত্ত মতই রাজি হন্। যাওহে হরি কন্যাকে পাঁড়িতে বসিয়ে এসো; বর বাবাজী পাঁড়িতে গিয়ে বসুন। চলহে বিশ্বেশ্বর,—আর কেন! বিশ্বেশ্বর নড়িল না। অটল কাষ্ঠের মত দাঁড়াইয়া অটল কণ্ঠে বলিল "আপনারা আর আমায় অনুরোধ করবেন না। পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যান্, এমন ঘটনার পরেও যে এরূপ চণ্ডালদের হস্তে একটী বালিকাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে সে চণ্ডালেরও অধম। আপনারা যান্ আমরা বিয়ে দেবনা।"

সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, বিশ্বেশ্বরের যে কথা সেই কাজ তাহা সকলেই জানে। নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া বরপক্ষেরা আস্ফালন করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। হিতাকাঙ্ক্ষী রামতনু সান্যাল বলিলেন, "বিশ্বেশ্বর কি করলে! এখনো বল, ফিরিয়ে আনি—নইলে ব্রাহ্মণ কন্যার জাত যাবে।"

"জাত কেন যাবে? অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন"

"আর পাত্র কই? এত রাত্রে পাত্র কোথায় পাবে?"

"বেশী দূরে খুঁজতে যেতে হবেনা, নিকটেই আছে। সান্যাল মহাশয়! আপনার ওপরে নিমন্ত্রিতদের ভার দিলাম, সব দেখুন শুনুন, নিবারণ, হরীশ! তোমরাও যাও যাও! আমিই এ বিবাহের পাত্র।"

সহসা সেখানে বজ্র পতিত হইলেও কেহ এতদূর আশ্চর্য্য হইতনা! মণ্ডপদের আমোদ করা ঘুরিয়া গেল। সকলে সেখানে সমবেত হইয়া ব্যাপার কি ব্যাপার কি বলিয়া গোলমাল বাধাইল।

বিশ্বেশ্বর বলিল "ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমার পিতা নেই, কাজেই আমাকেই আপনাদের অভ্যর্থনা করতে হচ্চে, আপনারা শুভকার্য্যে যোগ দেন।" সকলে ক্ষণেক নীরব রহিল। দুএকজন মাতব্বর, অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বরকে অনেক সাধুবাদ দান করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর তাঁহাদের সংক্ষেপে প্রণাম করিয়া মাসিমার নিকটে আসিয়া ডাকিল "মাসিমা"!

অন্নপূর্ণা ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বরের মস্তকটা শিশুর মস্তকের মতন বক্ষে লইয়া চুম্বন করিলেন। দুই হস্তে নীরবে মস্তকোপরি স্নেহাশীষ বর্ষণ করিলেন। বিশ্বেশ্বর একবার জাহ্নবীর পদতলে মস্তক অবনত করিয়া ছান্‌লাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। সান্যালকে বলিল "তবে আমি বস্‌তে পারি! সব ভার আপনার"।

"সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। আমরা সব ভার নিচ্চি—তুমি যা ভাল বোঝ কর।"

বিশ্বেশ্বর বরের যোড় তুলিয়া নীরবে পরিয়া লইল। বরাসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলে,

পুরোহিত বলিলেন "উহুঁ উহুঁ অগ্রে স্ত্রী আচার সাত পাক, শুভ দৃষ্টি পরে দান।" বিশ্বেশ্বর এইবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুদ্যম যুবকবৃন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বরকে শিলের উপরে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল। তুমুল হুলু শঙ্খ ধ্বনি করিয়া নারীগণ আসিয়া বরকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। বরের নাসিকা ও কর্ণের উপরে কেহই কোন মায়া দেখাইল না, যুবকেরা কেহ কেহ হাসিয়া বিশ্বেশ্বরকে বলিল "শুধু বর হওয়া নয়, এখন বোঝ।"

কন্যাকে পীঁড়িতে করিয়া আনিয়া সাত পাক আরম্ভ হইল। অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে টানিয়া তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"হতভাগী ছাখ্ একবার—একবার চেয়ে ছাখ।"

সাত পাক শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। বর-কন্যাকে সম্প্রদানের স্থানে বসান হইল, হরি দক্ষিণে বসিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল। বিশ্বেশ্বর দক্ষিণ হস্তে কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া নীরবে হরির প্রতি ইঙ্গিত করিল। সে অনেকক্ষণ হইতে সাবিত্রীর নিস্পন্দাবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিল। হরি তখন একবার সাবিত্রীর মুখস্পর্শ করিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল,—

"তাইত—এখন উপায়!"

পুরোহিত বলিল,—

"কি উপায়? কি হয়েছে?"

"আজ্ঞে কন্যা অসুস্থা হয়ে পড়েছেন"।

"তাত' হওয়াই সম্ভব! যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এই হ'ল আর কি, বলত বাবা শীগ্‌গির মন্ত্র কথা"।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল। হরি ভীতি-কণ্ঠে ডাকিল "পিসিমা, এদিকে কেউ আসুন"। জাহ্নবী আসিয়া সাবিত্রীর লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। অন্নপূর্ণা নীরবে ব্যজন ও জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে সাবিত্রী একটু যেন সুস্থা হইল। জাহ্নবী ডাকিলেন "সাবি কেন মা অমন কর্‌ছ? আজ যে আমি সাগর ছেঁচা মাণিক পেয়েছি মা"। সাবিত্রী দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল "মা আমার দিদি কই মা! দিদিকে ডাক মা"।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কাল ধীরে ধীরে আপনার সাম্বৎসরিক আবর্ত্তনের অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিবৎসরের মতন এবারও বিশ্বেশ্বরের বহির্বাটীর পার্শ্বস্থিত উদ্যানের আম্র-বৃক্ষগুলা গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুরে তাম্রবর্ণ কিশলয়ে ভরিয়া উঠিয়াছে; মৌমাছি গুলার তিলার্দ্ধ অবসর নাই। সরল উন্নতশীর্ষ নারিকেল তরু শীতের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া হরিৎ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নবীন বায়ু ভরে মস্তক দুলাইতেছে। বাতাবি লেবুগাছ দুটী নববধূর মত রক্তাম্বর পরিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অর্দ্ধস্ফুট ফুলগুলা লইয়া বাতাসের বড়ই আমোদ, দুলাইতেছে, ঝরাইতেছে, গন্ধ হরণ করিয়া এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। ক্ষুদ্র বালিকার মত বেলা যুঁই মল্লিকারা আপনার শোভা সুগন্ধ লইয়া বড়ই বিব্রত। যথাসাধ্য গুপ্ত হইয়া বায়ুর দৃষ্টিপথ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সবই প্রতি বৎসরের মত, কিন্তু বিশ্বেশ্বর প্রভাতে পুস্তক হস্তে নারিকেল বৃক্ষের নিম্নে ভ্রমণ

করিতে করিতে দেখিতেছিল এবারে সমস্ত ঋতুরই সাজ সম্পূর্ণ নূতন।

কতকগুলা খাতাপত্র হস্তে কর্ম্মচারী নিবারণ আসিয়া বলিল,—

"এই হিসাব গুলো আপনাকে দেখে নিতে হবে। মন্দিরের জন্য যে টাকা এষ্টিমেট্ করা হয়েছিল তার কিছু বেশীই খরচ পড়্‌বে বোধ হচ্চে।" বিশ্বেশ্বর হস্তের পুস্তক খানা মুড়িয়া ধরিয়া বলিল,—

"এষ্টিমেটের অপেক্ষা কিছু বেশী হয়েই থাকে। চলুন ঘরে গিয়ে বসে দেখা যাক্।" এমন মনোহারী শৃঙ্খলাহীন প্রকৃতির মধ্যে এসব সাংসারিক ব্যাপারের আলোচনা করা তাহার পসন্দ হইলনা। হস্তস্থিত কাব্য খানা বেঞ্চের উপরে ফেলিয়া রাখিয়া উভয়ে বৈষয়িক হিসাব নিকাশের কক্ষে গিয়া বসিল। খাতা পত্র দেখিতে দেখিতে বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মন্দিরটা তৈরি হ'তে আর কতদিন লাগ্‌বে মনে করেন?

"বাড়ীটাত শেষ হয়েছে এখন মন্দির, আর যাযা বাকী আছে সারতে দুমাসের উপরও সময় লাগবে মনে হচ্চে। হ্যাঁ হরীশ বল্লে যে, যে হিসাবের কাগজ তৈরি করতে বলে ছিলেন, সেগুলোর কতক হয়েছে—একবার দেখবেন।

"আচ্ছা। মাসিমা আসছে বছর সংক্রান্তির দিনে মন্দির আর ঠাকুর প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করেছেন।"

"তার আগে সব শেষ হয়ে যাবে।"

যথা কর্ত্তব্য সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর স্নানার্থে উঠিল। বাটির মধ্যে গিয়া ডাকিল "মাসিমা তেল।"

মাসিমা তখন রন্ধনে ব্যস্ত, নিকটে বধূ বসিয়া হলুদ বাঁটিতে ছিল, আদেশ করিলেন,—

"বিশুকে তেল দিয়ে আয়ত' মা।"

বধূ একবার ইতঃস্তত করিয়া অগত্যা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া তেল লইয়া বাহির হইল। নিধুর'মা উঠানে বসিয়া মাছ কুটিতে ছিল, বিশ্বেশ্বর তাহার চক্ষু এড়াইবার জন্য সরিয়া গিয়া বারান্দার থামের পাশে দাঁড়াইল। বধূ অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া দেখিল যিনি তৈল চাহিয়া গেলেন তিনি সেখানে উপস্থিত নাই। সেইখানে বাটি রাখিয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিতেই মাসিমা বলিলেন,—

"বিশু ওখানে আছে?" বধূ নত মুখে বলিল,—"না"।

"কোথায় গেল গিয়ে দেখে দিয়ে এস, যে ছেলে, হয়ত এখনি কুখুই নাইতে চলে যাবে একটু ত' তর সয়না। এত দিনেও ওর স্বভাব বুঝ্‌তে পারনি মা?"

বধূ কিন্তু মাসিমাতা অপেক্ষা স্বভাবটা আরও একটু পরিষ্কার বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই কুণ্ঠিত হইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া অগত্যা তৈলের বাটী লইয়া প্রাঙ্গণে নামিল। মৃদু স্বরে নিধুর মাকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল, নিধুর মা নিজ কার্য্যে ব্যস্ত বলিল,—"কি জানি, ঘরে রয়েছেন হয়ত।" প্রাঙ্গণ পার হইয়া শয়ন কক্ষের বারান্দায় উঠিয়া কয়েক পদ যাইতেই থামের পার্শ্ব হইতে বধূর অঞ্চল ধরিয়া কে একটু টান দিল। বিব্রত মুখে সাবিত্রী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল অন্য কাহাকেও দেখা যাইতেছে কিনা! তার পর স্বামীর পায়ের নিকটে বাটী রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল "তেল"।

"তা দেখেছি, একটা মজার কথা আছে শোন"।

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বধূ মিনতি চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"এখন কাজ আছে, আমি যা'ব"।

"যাওনা কেন, কে তোমায় ডাকৃতে গেছ্‌ল! অত কম ঘোমটা মানুষ দেয়! আর একটু!"

বলিয়া বিশ্বেশ্বর বধূর ঘোমটা সুদীর্ঘতর করিয়া টানিয়া দিল। বধূ বিপদ দেখিয়া দ্রুতপদে পলাইল।

শোন, শোন, আচ্ছা বেশ! এর শোধ দেব।"

নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বর খাইতে বসিল। মাসিমাতা পরিবেশন করিতে করিতে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

"হরির জন্যে যে মেয়েটি দেখ্‌তে গেলি, কেমন মেয়েটি! তোর খাশুড়ী কাল তোদের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে; বৌমাকে এখন দু'দিন তার মার কাছে পাঠাব, বাছা এখানে একটি সমবয়সী পায়না, মুখটি বুজে থাকে, তা আমারও তাকে বেশীদিন ওখানে রাখ্‌লে চল্‌বেনা, দিন চারেক রাখ্‌ব। তোর দোকানে এখন নাকি খুব লাভ হচ্চে, হরীশ বল্‌ছিল!" ইত্যাদি প্রশ্নে বিশ্বেশ্বর "হ্যাঁ" "বেশ" ইত্যাদিতে উত্তর দিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে একবার চকিত নেত্রে রন্ধনগৃহে, দ্বারের ফাঁকে, জানালার পাশে চাহিতে ছিল, আশা, অবশ্য তাহার রাগ রাগ ভাব কাহারও লক্ষীভূত হইবে।

আহারান্তে শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী বিছানার পার্শ্বে টুলের উপরে জলের গ্লাশ, পানের ডিবে, গামছা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভয়ানক রাগ হইল,—রাগ করিয়া পান না খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে মনে পড়িল একদিন এইরূপ রাগ করিয়া পান না খাওয়াতে সাবিত্রী কিরূপ বিষণ্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়াছিল। ডিবা খুলিয়া পান মুখে দিয়া বিশ্বেশ্বর স্বগতঃ সাবিত্রীকে শাসাইল, ভবিষ্যতে এরূপ দোষ সে আর ক্ষমা করিবেনা।

ঘণ্টাদ্বয়েক নিদ্রা দিয়া উঠিয়া বিশ্বেশ্বর বিষয়কার্য্যাদি তত্ত্বাবধানের জন্য জুতা জামা পরিয়া লইয়া বাহির হইল। তখন আর খেলাধূলার সময় নয়, অনেকক্ষণ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন। তথাপি মাসিমার শয়নকক্ষের নিকট দিয়া নিঃশব্দপদে যাইতে যাইতে কান পাতিয়া শুনিয়া গেল, সেখানে মাসিমার মহাভারত শ্রবণ কার্য্য চলিতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। সন্ধানে জানিল অন্নপূর্ণা জাহ্নবীর নিকটে গিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল এরূপ সময়টা কলহে কাটান অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। নিঃশব্দপদে এঘর ওঘর খুঁজিয়া ঠাকুরঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল সাবিত্রী পট্টবস্ত্র পরিয়া একখানা তামার পাত্রে ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। বিশ্বেশ্বর একবার প্রেমের যুগলমূর্ত্তি বিগ্রহের পানে চাহিয়া দেখিল, আবার তখনি নতবদনা সাবিত্রীর পানে চাহিল, নিপুণ শিল্পীদেবীর মুখে প্রেমের যে একটা বিশ্বভাব ফুটাইয়া তুলাইয়াছে, সিংহাসন নিম্নে মানবীর মুখেও সেই মধুর ছায়া। ধীরপদে নিকটে গিয়া

দাঁড়াইয়া বলিল "কার জন্যে মালা গাঁথা হচ্চে ?"

চমকিত হইয়া সাবিত্রী একবার চাহিয়া দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া লইল। মৃদুস্বরে বলিল "ঠাকুরের জন্যে ?"

"কোন্ ঠাকুরের জন্যে ?"

সাবিত্রী একবার মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল। বিশ্বেশ্বর পরম গম্ভীর মুখে বলিল "তোমার ঠাকুর কদিন অন্তর বদলি হয়ে থাকে ? দেবত্ব পদ দিতে নিতে, তোমার দেখ্‌ছি, বেশীক্ষণ লাগে না।" সাবিত্রী এইবার মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিল, বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা হইল মুখটা তুলিয়া ধরিয়া সেই লুকায়িত হাসিটুকু দেখিয়া লয়। একেবারে তাহার নিকট গিয়া বসিয়া হস্ত হইতে অর্দ্ধ গ্রথিত মালাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল "আমি তা বলে সহজে পদ ছাড়ছি না, এ মালা আমার।" অর্দ্ধ শঙ্কিত মুখে সাবিত্রী বলিল "ওকি কর্‌লে ? ওতে যে অপরাধ হয়। ঠাকুরের জন্যে মাসিমা—" "কেন, বল্লেনা কোন্ ঠাকুরের জন্যে ? তখনকার পাণ্ডিত্য কথাগুলো বুঝি আর মনে নেই ?"

সাবিত্রী শঙ্কিত বুঝিয়া ফুলের ডালাটা তাড়াতাড়ি সরাইয়া রাখিল, ঠাকুরের সম্মুখে স্বামীর এই কার্য্যে মনে বুঝি একটু ভয় পাইয়াছিল, গলায় অঞ্চল দিয়া তাড়াতাড়ি বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করিল। তৎক্ষণ বিশ্বেশ্বর মালা গাছটা আপনার কণ্ঠে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। প্রণতা সাবিত্রী মুখ তুলিলেই বলিল—

"এদিকে আর একজন দেবতা হাঁ করে দাঁড়িয়ে, এমনি ভক্তি যে একটা প্রণামও করে না, হা পোড়া অদৃষ্ট !" সাবিত্রী অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, বুঝি অনেক কথা তাহার মনে আসিতেছিল, বুঝি মনে হইতেছিল সত্যই বিশ্বের ঈশ্বর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সহসা উচ্ছ্বাস ভরে সাবিত্রী নত জানু হইতে না হইতে একটা সুদৃঢ় বাহুপাশ তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "ওকি ওকি ?" লজ্জিতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল "কেন নমস্কার কর্‌লে কি দোষ হয় ?"

"তা বই কি ! গুরু শিষ্যের কেবলই নমস্কার আর আশীর্ব্বাদ কেমন ? লজ্জা বোধ হয় না।"

"লজ্জা কেন হবে ! ঠাকুরকে নমস্কার কর্‌তে কি লজ্জা হয় ?"

বিশ্বেশ্বর অপলকদৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের প্রতি চাহিল, তিরস্কার, অভিমান, বেদনা সে দৃষ্টিতে যেন মাখামাখি। সাবিত্রী সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ অবনত করিল। বিশ্বেশ্বর গভীরকণ্ঠে বলিল "সাবিত্রী ! এখনও কি তোমার সেই কথা ? তোমার মনের কথা আমি এখনও বুঝ্‌তে পারি না। এখনও কি তুমি আমায় এত দূর, এত পর ভাব ?"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে সাবিত্রীও ব্যথা পাইল, ম্লানমুখে বলিল "এতে কি পর ভাবা হয় ?"

"নয় কিসে ? ঠাকুর দেবতা কাকে বলে ?"

"যে অনাথাদের আশ্রয় দেয়, দুঃখীর দুঃখ দূর করে, পথের কাঙালকে সিংহাসনে বসায়।" সাবিত্রীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর ধীরস্বরে বলিল "আর যে ভালবাসে,

যে শুধু ভালবাসাই চায় তাকে, বলে মানুষ। অন্যে যে যা বলে বলুক তুমি এ কথা ব'লো না। এত কাছে রয়েছ তবু তুমি আজও কি আমার কিছু জান? এত কাছে থেকেও কি আমরা দুজনে এত দূরে আছি সাবিত্রী?" সাবিত্রী এইবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। একবার বলিতে গেল "তুমি আমায় যা দিয়াছ একি কখনও আমি আশা করিতে পারিয়াছিলাম। আমি কি এখন নিজেকে তোমার যোগ্য ভাবিতে পারি? ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় আমরা কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, তুমি আশ্রয় দিয়াছ, আশার অধিক পায়েও স্থান দিয়াছ 'ইহার বেশী আর অধিক কথা তুলিও না, আমার তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই।

বাহির হইতে বালকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল "ছোট্‌দি"। কালী এসেচে বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর অন্য দ্বার দিয়া নিজ কর্ম্মে পলাইল, কেননা প্রাঙ্গণে মাসিমা। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী আসিয়া দীপ জ্বালিল। বিশ্বেশ্বর পানের ডিবা হস্তে লইয়া দেখাইয়া বলিল "ঝগড়াটা এখন ধামা চাপা দেওয়া থাকুক, আমি ভুলে গেছি মনে ক'রনা।" সাবিত্রী পলাইল।

বিশ্বেশ্বর পুস্তকের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। কিছু পড়িতেছে না, অথচ দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে। চক্ষে কেবল একটা আনন্দের রশ্মি, প্রাণে কেবল কতকগুলা কল্পনার ক্রীড়া, শরীরে কেবল একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। সহসা হস্তে একখানা পত্র উঠিয়া আসিল! সেই পত্র, সতীর সেই অন্তিম অভিব্যক্তি। বিশ্বেশ্বর একবার নিজ মনে পত্রখানা পড়িয়া লইল। অনেক দিনের কথা মনে হইল, তখন সতীর এই কথাগুলা মর্ম্মাহত হৃদয়ের অভিশাপ বাণী বলিয়া মনে হইত, এখন মনে হইল তাহাত নয়। ঈষৎ বেদনাচ্ছন্ন অথচ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের অজস্র আশীর্ব্বাদ। এই যে সতী লিখিয়াছে এই "অধমা জাতিকেই স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ভালবাসিবে। অধমাজাতি বক্ষের মধ্যে কত সমুদ্র লুকাইয়া রাখে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে। স্বীকার করিবে এই স্নেহের আদান প্রদানই শ্রেষ্ঠ সুখ। একি অভিশাপ? এ যেন ভবিষ্যৎবক্তার দৈব বাণী। সত্যইত' সে মূঢ়ের মত ইহার মর্ম্ম বোঝে নাই। আবার পড়িল "তুমি সুখী হও, অন্যকে সুখী ক'রো।" বিশ্বেশ্বর পত্রখানা লইয়া মস্তকে ঠেকাইল।

ভাবিয়া দেখিল পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। কি জানি কখন যদি সাবিত্রী দেখিতে পায়। এ পত্র পড়িলে সে যে বিগুণ ব্যথা পাইবে তাহা নিশ্চয়। সে তাহার দিদির জন্য একেই কাতর তাহাতে এ পত্র ঘৃতাহুতির কার্য্য করিবে। সাবিত্রীকে লুকাইতে হইবে এ চিন্তায় বিশ্বেশ্বর ক্লিষ্ট হইল, কিন্তু নহিলে নয়। অগত্যা বিশ্বেশ্বর পত্রখানা প্রদীপের শিখায় অর্পণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা দেবীর ইচ্ছা ছিল বৎসরান্তে চৈত্র মাসে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু সাংসারিক নানা ঘটনায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

বিশ্বেশ্বরের বিবাহের দুই বৎসর পরে শ্রাবণ মাসে ঘটনাক্রমে যেদিন তাহার বিবাহ হইয়াছিল সেই দিনেই অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন পড়িল।

ইতিমধ্যে সাবিত্রীর আর একটা আঘাত পাইল। জাহ্নবী দেবী পৃথিবীতে যেন কোন অবস্থাতেই শান্তি প্রাপ্ত হইতে ছিলেন না, এক্ষণে তিনি চির শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবিত্রী প্রথমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, শেষে মনে ভাবিয়া লইল তাহার দিদির কাছে গিয়া মা ভালই আছেন। তাঁহাদের সুখী করিয়া রাখিয়া মাতা তাহার অভাগিনী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়াছেন, সাবিত্রী চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। হরি এখন বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে, বালক কালী দিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কাজেই ভট্টাচার্য্যবাড়ী এখন নূতন লোক লইয়া নূতন সুখ দুঃখে আবর্ত্তিত।

মন্দির ও বিগ্রহ 'অন্নপূর্ণা' মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। উৎসবে গ্রাম তুমুল আন্দোলিত হইল। সকলে ভাবিয়াছিল অন্নপূর্ণাদেবীর নিজ সম্পত্তিতে নিশ্চয় প্রকাণ্ড অতিথিশালার সদাব্রত প্রভৃতি বসিবে। বিশ্বেশ্বরও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিলেন "বিশু, ভগবানের রাজ্যে আহার একরকমে তিনি জুটিয়ে দেন কিন্তু যারা মানুষের, সমাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয় তাহাদেরি কষ্ট সব চেয়ে বেশী। এই সম্পত্তিতে এই ব্যবস্থা কর যাতে নিঃস্ব ব্রাহ্মণেরা কন্যাদায় হতে উদ্ধার পায়। অন্য কোন পুণ্যলাভের আমার কামনা নেই, কেবল আমাদের দেশের দুখের মেয়েরা যেন বাপমায়ের অর্থের অভাবে জন্মের মত জলন্ত আগুনে না পড়ে এই আমার কামনা। এই সামান্য অর্থে যদি একটী মেয়েরও চখের জল মোছে তাতেই আমার এ অর্থ সার্থক হবে।' বিশ্বেশ্বর নীরবে মাতৃআজ্ঞা পালন করিল। 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার' এই উদ্দেশ্যেই উৎসর্গিত হইল। এইরূপ নামকরণে মাসিমাতা বহু আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহা শোনে নাই।

"অন্নপূর্ণার মন্দিরে" সেদিন বিষম ব্যাপার। বস্ত্রাদি দান, বিদেশ হইতে আগত পণ্ডিতদিগকে যথাযোগ্য সম্মানে বিদায় প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে গ্রামবাসীরাও অদ্য সকলে নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। সকলে এখন বিশ্বেশ্বরের অত্যন্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, নিতান্ত বিশ্বস্ত।

সাবিত্রীও সেদিন কোমরে কাপড় জড়াইয়া মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে অন্ন পরিবেশনে নিযুক্তা। অন্নপূর্ণা অনেক বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু সে তাহা শোনে নাই। বেলা ক্রমশ ঢলিয়া আসিল, অন্নপূর্ণা তখন তাহার হস্ত ধরিয়া অন্ন ব্যঞ্জন স্তূপের মধ্য হইতে টানিয়া আনিলেন। বলিলেন পাগলীর মেয়ে! আজকে মারা গেলি যে দেখ্‌চি।' একটু ব'স্, ঠাণ্ডা হ', একটু জল মুখে দে।" চারিদিকে লোকের গতায়তে,—অন্নপূর্ণা দেবী উজ্জ্বল শোভায় হাসিতেছেন। সাবিত্রী কোমরের কাপড় খুলিয়া ঘর্ম্মবারি মুছিয়া লইল, অঞ্চল দিয়া একটু বাতাস খাইতেছে, এমন সময়

দ্বারপ্রান্তে আসিয়া কে বলিল "ভেতরে কে আছ একটু মার চরণামৃত দাও ত',—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" সাবিত্রী মুখ বাড়াইয়া দেখিল সর্ব্বাঙ্গে অন্নব্যঞ্জন মাখিয়া বিশ্বেশ্বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, অন্য কেহ নাই দেখিয়া বিশ্বেশ্বর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী অঞ্চল দিয়া স্বামীর গাত্রে ব্যজন করিতে করিতে বলিল "তুমি কেন এত পরিবেশন কত্তে গিয়েছ?" "আর তুমি?" বলিয়া বিশ্বেশ্বর হাসিল। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি দেবীর চরণামৃত এক গ্লাশ সরবৎ স্বামীর হস্তে দিল। পান করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিল "সাবিত্রী আজ কোন্ তারিখ মনে পড়ে?" 'পড়ে' বলিয়া সাবিত্রী হাসিল।

"আজ এত কাজের মধ্যে রয়েছি তবু ঘুরে ঘুরে সেই কথাই মনে আস্‌ছে। আচ্ছা সাবিত্রী যদি তারা বিয়ের সময় সে রকম কাণ্ড না বাধাত, ত কি হত?"

"ওকথা আর কতবার শুনব! বেশ হ'ত, খুব হ'ত।

"আমারি বুঝি একা খুব হ'ত, মশায় কি সাধু!"

সাবিত্রী স্নিগ্ধনেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল "এখন তাই মনে হয় বটে কিন্তু তখন সত্যি আমি যেন জড়ের মত ছিলাম। তখন যদি সে কাণ্ডটা হয়ে যেত বোধহয় আমি কিছুই ভালমন্দ জ্ঞান কর্‌তে পার্‌তাম না। মা ভাবনা থেকে যে উদ্ধার পাচ্চেন সেই যেন আমার পরম লাভ বোধ হচ্চিল। কোন আশা বা বাসনা তখন যেন কর্‌বারও ক্ষমতা ছিল না।" বিশ্বেশ্বর অনিমেষলোচনে সেই ভাবময়ী প্রেমময়ী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল, মনে মনে বলিল "তুমি এমনি সন্ন্যাসিনী সাবিত্রী ছিলে বটে, নহিলে কি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মৃত স্বামীর নবজীবন দিতে পার।"

সৌম্যা ক্ষৌমবস্ত্রা অন্নপূর্ণা একটী অতি ক্ষুদ্র কুন্দকলিকা তুল্য শিশু আনিয়া সাবিত্রীর অঙ্কে দিয়া বলিলেন "এটা যে গলা শুকিয়ে মারা গেল, এমন মা দেখিনি কিন্তু।" বিশ্বেশ্বর ত্রস্তে অন্য দ্বার দিয়া পলাইতে পলাইতে একবার লুব্ধ নয়নে মন্দিরের ভিতর চাহিয়া লইল, দেখিল 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র প্রেমময়ী-প্রতিমা মাতৃত্বের পূর্ণমূর্ত্তিতে জগতে অজস্র স্নেহধারা বর্ষণ করিতেছেন। সমাপ্ত

শ্রীনিরুপমা দেবী।

অন্বেষণ।

[বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণি]

আমারে খুঁজিছ কিগো ওগো প্রিয়তম!
পলক-বিহীন নেত্রে সারা অঙ্গে মম
অখণ্ডিত কৌতুহলে? ঘন কৃষ্ণালকে
অরুণাক্ত বন-বীথি, ললাট-ফলকে
উষা-জ্যোতি, মুকুলিত বসন্ত-যৌবন
হৃদি-কুঞ্জে, রূপ-জ্যো'স্না করিয়া দর্শন
সর্ব্বদেহে, ক্ষণ-মোহে হ'য়ে আত্মহারা
তনুর অতনু রূপে বিহ্বলের পারা
নিমজ্জিত কেন সখে?

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু রমণী

[কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির হইতে প্রাপ্ত]

আপনা সম্বরি'
চেয়ে দেখ,—যে মাধুরী পড়িছে ঝর্ঝরি'
অঙ্গে মম, অফুরন্ত নহে সে নির্ঝর ;
লুকায় শিশির গর্ভে বসন্ত সুন্দর ;
ঝরে ফুল, নিভে ঊষা, নিকুঞ্জ শ্মশান ;—
এ দেহ ভিতরে মোর না পা'বে সন্ধান।

২

নীল স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় নীলিমার মত
নেত্রে মোর কি দেখিছ চাহি' অবিরত
ওগো চির-মিত্র মম ? দেখিছ কি তথা
কামনার সৌর-চক্র ঘুরিছে সর্ব্বদা
শব্দ-হীন ? বাসনার কুব্ধ ধরা প'রে
নীরবে নিরাশা-সন্ধ্যা স্নিগ্ধ ছায়া ধরে ?
আশা-শশী উদি' ধীরে, ধীরে অস্তে যায়
বিষাদের অন্ধকারে ?

পা'বে না তথায়
আমার সন্ধান কভু—রচে যথা মায়া
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু দীপ্তালোক ছায়া
অহরহ।

তার সীমা করি' অতিক্রম
গাহন করিতে বুঝি চাহ প্রিয়তম,
অগাধ এ হৃদয়ের অসীম অতলে,—
রবি চন্দ্র গ্রহ তারা যথা নাহি জ্বলে ?

৩

ওগো অনন্তের পান্থ ! সাধনার বলে
পার যদি প্রবেশিতে সে অতল-তলে,
মুক্ত-কাম হইবে তখনি !

নাহি তথা
সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, চিত্ত-চপলতা,
দেহ-রতি, ভেদ-মতি, বিরহ-মিলন,
কামনা বাসনা আশা, জনম-মরণ,
ভঙ্গুর লহর-লীলা ; অন্ধ মমতার
ঘন ঝঞ্ঝা, নাহি তথা জড় চেতনার
ঘোর দ্বন্দ্ব।

সে চিন্ময় নিত্য নিকেতনে
আত্ম পর বিসর্জ্জিয়া সে মাহেন্দ্র ক্ষণে
বুঝিবে—তোমারি আমি, তুমি যে আমার
বুঝিবে—না রহে তথা তুমি আমি আর ;
নাহি কাল, নাহি দেশ, নাহি রূপ নাম ;
আনন্দ ! আনন্দ শুধু !—সেইত সন্ধান !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

ডাকঘর।*

"We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift. Some are born near it, as it were, and pass their lives striving to peer through its web, catching now and again visions of inexplicable things; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existence but delight in mocking those who perceive what we cannot."

Laurance Alma Tadema.

(১)

উপরের কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা লিখিতে আর ভরসা হয় না,

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

কারণ 'veil' এর কাছাকাছি আছি এমন কথাতো বলিতে সাহস হয় না। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথাতো কিছুই জানি না। তবে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের পরিহাস করিতে আনন্দ পাই, এত বড় বর্ব্বরতার অপবাদ ঘাড়ে করিতে রাজি নই।

যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাঁহারা ফুলকে ছিঁড়িয়া তাহার অংশপ্রত্যংশের কোন্‌টার কি কাজ তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সাহিত্যের বাগানে যে ভাবের ফুলটি ফোটে তাহার সম্বন্ধে কি সেই একই প্রণালীতে তত্ত্বখবর লওয়া যায়? সে বাগানে যাহারা যায় তাহারা কি তত্ত্বের জন্য যায়, না আনন্দের জন্য যায়? অনেকগুলি দল যে একটি বাঁধনে ধরা দিয়া অখণ্ড একটি ফুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতেই তো আনন্দ, আবার যদি ছুরি ধরিয়া সেই অখণ্ডতাকে খণ্ড খণ্ড করা যায়, তবে আনন্দ থাকে কেমন করিয়া?

আমার মনে হয় যে ভাল কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকু বলাই পর্য্যাপ্ত যে ইহা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, বা ইহা পড়িয়া আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি! কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজিত করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল ফোটান সমালোচক ঠিক তারি পাশে তারি অনুরূপ আরেকটি ফুল ফোটান, ভাল সমালোচনা সেই জন্যই এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনার শক্তি কিম্বা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু জ্ঞাপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকেরা স্থান পায় না,—কবি থাকেন "hidden in the light of his thought" আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকদের আড্ডায় দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাহাকে সম্বাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়। যদি লেখকে পাঠকে কোন ব্যবধান না থাকিত, তবে সমালোচকও আপনার কাজ সহজে করিতে পারিতেন! অনেক কথার জঞ্জাল জড়ো করিবার উপদ্রব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না।

'ডাকঘর' ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'রাজা' যে ধরণের নাটক এ ধরণের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বলা বাহুল্য এ দুইটিই "হেঁয়ালী" শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় "সোনার তরী" এবং "পরশপাথর" ধরণের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে দুর্ব্বোধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।

অথচ সেই পূর্ব্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি ভারি একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয় ইহাদের মূলভাব একই, কেবল রূপ স্বতন্ত্র। কত গুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত

আছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত ইমোশন্ অর্থাৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয়, তাহা নহে। প্রেম ভক্তি করুণা সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায়, তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইসারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।

'সোনার তরী' মানেই কোন বিশেষ রূপ নয়, কিন্তু অপরূপ। কালিদাস বলিয়াছেন যে, রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্—রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন যখন পর্য্যুৎসুক হয়, তখন জননান্তরসৌহৃদানি, জন্মজন্মান্তরের ভালবাসার কথা মনে পড়ে। এই যে একটি রস, ইহাকে কি নাম দিব? উপলক্ষ্যটা হয়ত কোন বিশেষ রূপ বা বিশেষ ধ্বনি—কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া মন যে উতলা হয়, সে এমন একটি অপরূপ সুদূরের জন্য যাহার কোন নাম নাই, রূপ নাই। বর্ষার ভরানদী হয়ত 'সোনার তরী'র উপলক্ষ্য, কিন্তু সে যে বিরহকে জাগায়, তাহা আর তাহাকে আশ্রয় করিয়া তো থাকে না।

কিন্তু কেনই বা symbol লইয়া এত বকাবকি করিতেছি? আমাদের দেশে এটা-তো অপরিচিত জিনিষ নহে? হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান, শিল্প সমস্তই ভাবের বিগ্রহে আগাগোড়া মণ্ডিত। হিন্দু তো একথা বলে না যে ভাবকে কোন দিন কেহ জানিয়া, ব্যবহার করিয়া, বলিয়া শেষ করিয়া দিতে পারে? সেইজন্যই তো সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে—সে জানে যে ভাব অসংখ্যরূপে আপনাকে ক্রমাগত লীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত রূপরূপান্তরকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করে। হিন্দুর চিত্ত কেননা বলিবে যে 'সোনারতরী' বল, 'চিঠি' বল, 'পরশপাথর' বল, 'রাজা' বল, ও সমস্তই ছল;—অনন্ত সৌন্দর্য্যকে একটি মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষণকালের মত বাঁধিবার আয়োজন;—ওযে ভুল এইটুকু উহাকে দিয়া বলানোই উহার চরম সার্থকতা?

আসল কথা, অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কি করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাবকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে, খানিকটা আল্‌গা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার, যে তাহার আবরণ সরাইয়া ভাবকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

আশা করি, আমি কেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন কবিতা এবং আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছি তাহা পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়াছে। আমি বলিতে চাই এই যে,

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপের ভিতরে অপরূপকে দেখিবার জন্য একটা বেদনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে অপরূপের ভাবটিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে যাহাতে সে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া উঠে। অর্থাৎ তাঁহাকে 'symbol আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

Symbol লইয়া এত ব্যাখ্যাবাহুল্য করিবার আর একটু কারণ আছে। symbol এর ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তবে সোনার তরীটা কি, তাহার উদ্দিষ্ট মানুষটি কে? সোনার ধানটা কি? অমল কি তবে মানবাত্মা? চিঠি মানে কি মুক্তি? অর্থাৎ তাঁহারা সমস্ত একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে চান্! আধ্যাত্মিক সত্যকে এই সকল লোকই বৈজ্ঞানিক সত্যের মত পরিষ্কার না দেখিতে পারিলে অধীর হইয়া উঠেন এবং ধর্ম্মকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে উদ্যত হন্। ইঁহারা একটা কথা মনে রাখেন না যে বুদ্ধির উপরেও মানুষের একটা Intuition —একটা সহজ প্রত্যয় আছে, বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না, সেইখানে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়।

(২)

'ডাকঘর'কে symbol অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক্ নাম নয়, কিন্তু নির্দ্দেশ মাত্র। এখন দ্বিতীয় কথা এই যে ইহা নাটিকা বটে, অথচ ইহার মধ্যে নাটকত্ব কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন গল্পও নাই, ঘটনাও বড় নাই। তবে ইহাকে সোনারতরী-গোছের কবিতার মত করিয়া লিখিলেই হইত? নাটিকা বলিয়া আড়ম্বর করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

একটি রুগ্ন বালকের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কল্পনা-পীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল, শুধু এই ভাবটুকু যদি থাকিত তবে তাহা গীতে ব্যক্ত করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধবদত্ত, ঠাকুর্দ্দা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকূল কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূলভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফাটিকব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাট্যরস। শুধু একটি মাত্র ভাবের রস হইলে গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এ নাটিকার শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে পূরা রসাস্বাদন হয় না, ইহা মাঝখানে পড়িয়া থামিবার জো নাই।

ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমারতো মনে হয় ভিতরের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যেমন ধর 'গোরা' উপন্যাসটি। তাহার উপাখ্যান-অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানবহৃদয়ের কি বেগবান্ প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে—অধ্যায়ে, অধ্যায়ে, এমন কি ছত্রে ছত্রে

যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে—এমন কোন্ ঘটনাবহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানিনা।

এই নাটিকাটিতেও কবিজীবনের যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের যে সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক্ যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।

(৩)

মাধবদত্ত সংসারী লোক, সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ন,—শরতের রৌদ্র আর হাওয়া যাহাতে ছেলেটি না লাগায়, সে বিষয়ে কবিরাজ মাধব দত্তকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। অমলের মন বাহিরে যাইতে না পারিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। সে তাহার বাড়ীর জানালার নিকটে বসিয়া থাকে—দূরে পাহাড় দেখা যায়—পাহাড়ের নীচে ঝরণা, ঝরণাতলায় ডুমুর গাছ—জানালার সাম্‌নেই রাজপথ, ফিরিওয়ালা সুর করিয়া ফিরি করে, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দূর পাহাড়, ঐ ঝরণা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর, ঘণ্টার ঢং ঢং তাহাকে আন্‌মনা করিয়া দেয়—কোন্ সুদূরের একটি ডাক তাহার বুকের মধ্যে বহন করিয়া আনে।

'জীবনস্মৃতি' এবং 'ডাকঘর' প্রায় একই সময়ে বাহির হইতেছে, সুতরাং ঐ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি নাকি? সেই ফিরিওলার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন—এতো কোনমতেই আমাদের অপরিচিত নয়?

'ক্ষণিকা'য় 'কবির বয়স' নামক কবিতায় কবি তাঁহার কেশে পাক ধরিয়াছে শুনিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি সকলের সঙ্গে একবয়সী।

প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন,

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে!—

তাহার সুরের সঙ্গে বাল্যজীবনস্মৃতির সুর মেলে এবং ডাকঘরেরও সুর মেলে! কবির বয়স্ যে চিরকাল সমানই থাকিয়া যায়, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে!

বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূলভাব।

কবির মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে তিনি অনেক সময় এই পৃথিবীর পরিচিত দৃশ্যশব্দগন্ধকে এমন ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যেন এই পৃথিবীতে তিনি সদ্য আসিয়াছেন। এখানে সমস্তই যেন নূতন, কিছুই যেন তাঁহার পরিচিত নহে। এই যে নিকটতম, অভ্যস্ততম, পরিচিততম জিনিসকে বহুদূরের একটি বিরলব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছাড়া দিয়া দেখা—ইহাতেই

অভ্যাসের ও পরিচয়ের জড় আবরণ তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া যায়—সে আশ্চর্য্য সুন্দর হইয়া উঠে!

এমনি করিয়া দেখিলে সমস্তই কি রহস্যময়! দইওয়ালা যে রাস্তা দিয়া দই হাঁকিয়া চলিয়াছে সেতো একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়, তাহার চারিদিকে কত দূরদূরান্তরের কত সৌন্দর্য্য ঘিরিয়া আছে! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলার সৌন্দর্য্য, সেই শাম্লীনদীর সৌন্দর্য্য, সেখানকার সেই লাল মাটির রাস্তাটি, বড় বড় গাছের ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গরু চরিতেছে তাহাদের সৌন্দর্য্য, সেই যে গোপবধূরা ডুরে সাড়ী পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের সৌন্দর্য্য, সেই গ্রামের সমস্ত স্নেহপ্রেমমাধুর্য্যের কত সৌন্দর্য্য—এই সব সেই দইওয়ালাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাইতো সে এমন রমণীয়! তাই তাহার ঝিঝির সুরটিকে বিশ্ব-বাঁশীর মত সকরুণ করিয়া দিয়াছে—বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মাহাত্ম্যই নাই।

তেম্নি ঐ যে সমুখের পথটি, তাহারো রহস্য ঐখানে—সে যে বহুদূরের যাত্রীকে ক্ষণিকের মত চকিতের মত একবার ঐ একটি জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেখাইতেছে—বলিতেছে, অনন্তপ্রবাহের একটিমাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তের ছবিখানি দেখ! অনন্ত সমুদ্রকে একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যে দেখ—ইহার পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র—ইহার সমুখে অনন্ত সমুদ্র—সেই সমস্ত প্রবাহ যেন এই একটি তরঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তার মানে কি? তার মানে এই যে আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা ক্রমাগতই চলিবার মুখে, সরিবার মুখে। আমরা তাহার আদিও জানিনা, তাহার অন্তও জানিনা, জানি শুধু তার মাঝখানের খণ্ড একটুখানি কালের কথা। সেই খণ্ডকালে যেটুকু যাহা দেখিতেছি, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া সত্য বলিয়া যে আমরা চাপিয়া ধরি, তাহাতেই তাহাকে হারাই, তাহার যথার্থ সত্তাকে পাই না। যদি সেই খণ্ডকালের খণ্ড জিনিসের উপর তাহার অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সেই খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই তবেই সেই জিনিস আশ্চর্য্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহা তখন একদিকে ব্যক্ত, অন্যদিকে অব্যক্ত, একদিকে সসীম, অন্যদিকে অসীম, একদিকে রূপ, অন্যদিকে অপরূপ। তখন সে কি বিস্ময়—কে তাহা বর্ণনা করিবে?

এ তত্ত্বের কথা নয়, কিন্তু দৃষ্টির কথা। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি যে মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে যে কেবল বহির্বিষয়মাত্রের যোগ, মানুষের অধ্যাত্ম-প্রকৃতির গভীরতা পরিমাপ করিতে বুদ্ধি যে অক্ষম,—এ সকল কথা আধুনিক যুগে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞানীদল স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হাঁরি ব্যার্গস (Henri Bergson) বলেন "আমাদের বুদ্ধি এবং বাহিরের বিষয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে; (Creative Evolution ১৯৭পৃঃ) চৈতন্যকে যদি বুদ্ধির গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখ তবে তাহা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে

জড়িত হইয়া পড়িবে।” সুতরাং বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার নাই। কিন্তু যাঁহারা মানবচিন্তা যে কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা সকল বড় জিনিসকেই পরিহাস করিতেই থাকিবেন। ইহাদেরি জন্ম কি ম্যাথিউ আর্নল্ডকে ‘ফিলিস্টাইন’ কথাটা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল?

(৪)

ডাকঘরের মূলভাব না হয় বুঝা গেল, কিন্তু ‘ডাকঘর,’ ‘চিঠি,’ ‘রাজা’ প্রভৃতি ব্যাপার কি? এই যে কল্পনাব্যাকুল সৌন্দর্য্যানুভূতিময় চিত্ত ইহাকে রুগ্ন করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই বা তাৎপর্য্য কি এবং রাজার চিঠির জন্ম উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবারই বা অর্থ কি?

আমরা যে রুগ্ন এবং বদ্ধ কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন আছে? আমরা বাহির হইতে চাই, একথাটা যতখানি সত্য, ততখানি সত্য এই কথাটাও যে আমাদের অন্তরে বাহিরে নানা বাধা জড়াইয়া আছে। বারবার কি আমাদের বদ্ধ ঘরে অভিসারের বাঁশীর ডাক আসে না? কিন্তু হায়, বাঁধন কি একটি, নিষেধ কি সামান্ত?

মাধবদত্ত-কবিরাজরূপী সংসারতো আছেই, সুধাও আসিয়া যে আধখানা দরজা খোলা আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চায়!

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সেকথা যে যাই পাশরি!

কিন্তু কল্পনা তো বাঁধ মানে না, সে যে পাখা মেলিয়া সর্ব্বত্র উড়িতে চায়! তার পণ, সে সব দেখিবে, সব কিছুর আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেও কুলায়ে ফিরিতে হয়! তখন বলিতে হয়:—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।—
খেয়া।

এইরূপে কবির জীবন যখন গিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায়, তখন ঐ একটি মাত্র ইচ্ছা প্রাণ জুড়িয়া বাজে, যে তাঁর চিঠি চাই,—তিনি কবে আসিবেন? সেইখানেই যে সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সেইখানেই সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি!

নাটিকার মধ্যে এই যে এক ভাব হইতে আর এক ভাবে গিয়া পড়িতেছি, (progression of thought) ইহাতেই তাহার মধ্যে একটি গতিসঞ্চার হইয়াছে। এখন আর পথের ধারে ‘অনেকের সনে দেখা’ নয়, এখন ঘরের মধ্যে চিঠির জন্ম অপেক্ষা করিয়া থাকা, এখন আর বহু বিচিত্রতাময় দিন নয়, এখন শীতল অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি!

নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠক মাত্রেই জানেন যে তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না, তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। ‘সিন্ধুপারে’ কবিতাটিতে এই

ভাব, 'ঝরণাতলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব—যে জীবনে যেটা ঝরণারূপে সাত-পাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।

শুধু তাই নয়। পূর্ব্বের কোন কোন কবিতাতে কবি মৃত্যু-মাধুরীর কথাও বলিয়াছেন।

পরাণ কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর
এই নীলাম্বর একি তব অন্তঃপুর ?—চৈতালী

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর—সমস্তই তাহাতে বিলম্বিত হইয়া সীমা-আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুর হইয়া উঠে। আমরা একটু আগে ডাকঘরের যে মূল ভাবটির কথা আলোচনা করিয়াছি, মৃত্যুকে এমন পরিপূর্ণ ও মাধুর্য্যময় করিয়া দেখিলে সে ভাব মৃত্যুর সঙ্গে দিব্য সঙ্গত হয়।

কারণ, কিছুই যে থাকিবে না, সেই জন্যই তো বাস্তবিক সমস্তই এমন সকরুণ, এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই জগতের কোথাও কোন ভার নাই। সমস্তই একটি সুদূরের ব্যাপ্ত বিষাদে বেদনার মত বাজিতেছে! সুতরাং এখানে মৃত্যু যদি পরিণাম হয়, তবে তাহাকে কোন মতেই খাপ্‌ছাড়া বা আকস্মিক বলা চলেনা। কবি যে বলিয়াছেন,

সে এলে সব আসন যাবে ছুটে
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে—

মৃত্যু যেন সেই একটি বন্ধনমোচনের আনন্দ হইয়া উঠিবে।

তবে কি রাজার চিঠির জন্য অমলের যে ব্যাকুলতা সে এই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা ? না। সে কথা বলিলে রাজার চিঠিকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখা হইবে।

রাজা যে অমলের মত ছোট মানুষের কাছে আসিতে পারেন এই কথাই তো মোড়ল-জাতীয় লোক বিশ্বাস করেনা—তাহারা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে তিনি রাজা—তিনি কেবল বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন্। কিন্তু তাঁহার যে একটি আনন্দ ঐ ছোট বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে সেই লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে,—তাহা কি মোড়লজাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসীরা জানে? না মাধবদত্তের মত ঘোর সংসারীরা জানে? একমাত্র লোক যে সেই বার্ত্তা জানে সে ঠাকুর্দ্দা।

'শারদোৎসব' নাটকের সময় হইতেই এই ঠাকুর্দ্দাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ—যে সকলের সঙ্গে সব হইয়া আছে, যে পরিপূর্ণ আনন্দকে জানে—ইঁহাকে নহিলে কবির কল্পনাগুলি সমর্থন পাইবে কেমন করিয়া? সোনার তরী, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, হাব্বা দেশ প্রভৃতি ব্যাপার যে সত্য সত্যই আছে—সে কথার সাক্ষ্য ঠাকুর্দ্দা ভিন্ন দিবে কে? ফিলিষ্টাইন্ দলকে শাসাইয়া সংযত করিয়াই বা রাখিবে কে?

ঠাকুর্দ্দা বলিতেছেন—শুনেছি ত তাঁর চিঠি রওনা হ'য়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু কবে?

আমার মিলন লাগি তুমি
আস্‌ছ কবে থেকে ?

* * *

অমল উত্তর করিতেছে—তা আমি জানিনে! আমি যেন চোখের সাম্নে দেখ্‌তে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেচি—সে অনেক দিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্‌চে—বা হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধ'রে সে কেবলি নেমে আস্‌চে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলি চলে আস্‌চে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আস্‌চে—তার পরে আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চ'লে গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চ'লে আস্‌চে—রাতদিন একলাটি চ'লে আস্‌চে; * * * যতই সে আস্‌চে দেখ্‌চি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হয়ে হয়ে উঠ্‌চে।"

সুতরাং এ চিঠি কখনই সে চিঠি নয়, যে অমুক দিন অমুক সময়ে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এ চিঠি সেই চিঠি যে আমি তোমাকে বড় আদর করিয়া আমার এই আহ্বান লিপি পাঠাইলাম। তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।

আমি এই জায়গায় আমার পাঠকদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি' কবিতাটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি! সে চিঠিখানিও বিশ্বচিঠি, তাহার লিখন কবি জানেননা, কে লিখিয়াছে তাহাও জানেননা—কিন্তু পাইয়াছেন এই সুখেই তিনি খুসি, তাঁহার বুকের ভিতরটা আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে!

অমল তাই ঠাকুর্দ্দাকে বলিতেছে যে প্রথমে যখন তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, এখন ডাকঘর দেখিয়া অবধি প্রত্যহই তাহার ভাল লাগে, "ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়াই ভাল লাগে।" "একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে কর্‌লেই আমি খুসি হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি।"

(৫)

এইবার পরিণামে আসা গিয়াছে। চিঠি পাইবার ভরসার পর পরিণাম সত্যই পরিণাম, পরিণাম পরিপূর্ণতা।

প্রথমে আমরা বিশ্বে বাহির হইবার ব্যাকুলতা দেখিলাম, তারপর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ঘরে চুপ করিয়া থাকিতেও ভাল লাগে দেখিলাম।

এখন দেখি * * "চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আস্‌চে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করচে না। রাজার চিঠি কি আস্‌বে না?"

বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই—জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝের বয়সের কবিতায় জীবন ছিল বালিকা-বধূ, তখন তাহার বরকে ভয় করিত—'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় তাই তিনি আরও কিছু দিনের মত খেলাধূলার ঘরের মধ্যে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ

বয়সের কবিতায় ক্রমাগতই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ
পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও
আমারে কথা!

সুতরাং রাজদূতকে তিনি যদি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উপস্থিত করেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই!

তবু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংশয় যায় না। বাহির হইতে মোড়লের অবিশ্বাসের পরিহাসের খোঁচাও আছে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে সত্যকেই অবিশ্বাস করে কিনা, সে হঁ কেই না বলিতে চায় কিনা, তাই তাহার অবিশ্বাসই তাহার বিশ্বাসকে যথার্থরূপে পাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে সে যত আঘাত করে, ততই তাহার নিজের প্রাচীর একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যায়, শেষে সে দেখে যে সে পরিহাস-চ্ছলে যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য সত্যই ঘটে। সে জানেনা যে, অক্ষরশূন্য কাগজেই রাজার চিঠি আসে। কারণ তাঁহার চিঠির তো বাহ্যিক কোন নিদর্শন নাই, সে চিঠি আমাদের আশা এবং নির্ভরের ভিতরে আসিয়া যে পৌঁছায়। মুড়িমুড়কি খাইতেও তিনি সামান্য লোকের ঘরেই আসেন—কারণ, তাঁহার আসা যে নিঃশব্দ গোপন—তিনি তো আগে-ভাগে জানাইয়া কাহাকেও দেখা দেননা। সে একেবারেই আচমকা হঠাৎ আবির্ভাব, তাহার জন্য কেহই কখনই প্রস্তুত থাকে না।

মোড়লের পরিহাসের মধ্যে ঠাকুর্দ্দা এই সত্যটিকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি অমলকে ইহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতেই দিলেন না। রাজারই চিঠি আসিয়াছে! রাজাই স্বয়ং আসিতেছেন! হাঁ এই কথাই সত্য!

তার পর রাজদূতের প্রবেশ এবং রাজ-কবিরাজের আগমন। দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিভিয়া গেল, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা এক নিমেষে খুলিয়া গেল! অর্দ্ধরাত্রে রাজা আসিবেন শুনা গেল। অমল স্থির করিল যে সে তাঁহার ডাকহরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিক কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার প্রধান কাজ!

নাটিকা সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য্য কৃতিত্ব যে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবননাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্য্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন,—কোথাও বা সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন সুধার কথা। সে অমলের আধখানা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল;—তাহার সেই ক্ষণিক মোহটুকু সে অমলের মৃত্যুর পরেও রাখিয়া গেল,—সে বলিল—"ও যখন জাগবে তখন বোলো যে সুধা, তোমাকে ভোলেনি।" এই এতটুকুর মধ্যে সমস্ত নারীপ্রকৃতির একটি রহস্য কবি কৌশলে ছুঁইয়া গিয়াছেন। শেষ ক'টি কথা ব্রাউনিংএর Evelyn Hopeএর শেষ ছত্রগুলি মনে

করাইয়া দেয়;—মৃত Evelyn এর প্রণয়ী বলিতেছে—"এই একটি পল্লব আমি তোমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম, ঘুমাও, যখন জাগিবে তখন তোমার মনে পড়িবে, তখন সব বুঝিতে পারিবে!"

এমন ইঙ্গিত কতই আছে!

ইউরোপেও Symbolical নাটকের যুগ সুরু হইয়াছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি মেটরলিঙ্কের নাট্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স এল্‌মাটেডেমা প্রভৃতি মেটরলিঙ্কের সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্ম্মের জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন। অন্তবারে মেটরলিঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়ে কথা কহিবার ইচ্ছা রহিল।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না—স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

৬। ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ।

শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদ কেবল মাত্র পারমার্থিকেই (Absolute) নিবদ্ধ। ব্যবহারিক (Relative) দ্বৈতবাদ তিনিও সম্পূর্ণই স্বীকার করেন। শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণনা করিতেছেন (ব্রহ্ম সূত্র অ-২।পা-১।সূ-১৩)—"যদিও শ্রুতি স্ববিষয়ে প্রমাণরূপে গণ্য, তথাপি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর দ্বারা অপহৃত বিষয় (অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধ বস্তু) সম্বন্ধে শ্রুতি বাক্য প্রত্যক্ষাদি বিরুদ্ধ হইলে তাহার অন্যরূপ অর্থ করা উচিত। তর্কও সেইরূপ স্ববিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে নির্ভরের অযোগ্য,—যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান। অতএব ইহা অযুক্ত যে যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ, শ্রুতি দ্বারা তাহা বাধিত হইবে।" "প্রমাণান্তর দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ বিষয় কিরূপে শ্রুতি দ্বারা বাধিত হইতে পারে?" তাহার উত্তর এই:—"ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগ লোকপ্রসিদ্ধ, ভোক্তা—চেতনশরীরী জীব, এবং ভোগ্য—শব্দাদি বিষয়, যথা—ভোক্তা দেবদত্ত, ভোগ্য ওদন (ভাত)। ভোক্তা যদি ভোগ্য ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা ভোগ্য যদি ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তবে সেই লোকপ্রসিদ্ধ বিভাগের অভাব প্রতি-পাদিত হয়। পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে তাহাদের অভিন্নত্ব স্বীকার করিলে, তাহারা পরস্পরের ভাব

প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা এই লোক-প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগের বাধা অসঙ্গত। অতএব অদ্বৈত-ব্রহ্ম-কারণতারূপ সিদ্ধান্ত অযুক্ত"।৮ (আপত্তি খণ্ডন) ইহার উত্তরে বলিতেছি:—"আমাদের মতেও সেই ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগসঙ্গত, কারণ লোকেও তাহা দেখা যায়:—যেমন সমুদ্র জলাত্মক, এবং ফেণবীচি-তরঙ্গ বুদ্বুদাদি তাহারই বিকার মাত্র, সমুদ্র হইতে অভিন্ন। ফেণবীচি প্রভৃতির পরস্পর বিভাগ, এবং পরস্পর সংযোগ দৃষ্ট হয়।' উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন বলিয়া ফেণ-তরঙ্গাদি উদকের বিকার, একটীর মধ্যে আর একটী মিলিয়া যায় না, অথবা তাহারা একটির মধ্যে অন্যটি মিলিয়া যায় না বলিয়া, তাহারা সমুদ্র হইতে ভিন্ন হয় না। সেইরূপে এই স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না, অথবা একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না বলিয়া, পরব্রহ্ম হইতে তাহাদের ভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যদিও ভোক্তা (জীব) ব্রহ্মের বিকার না হউক, কারণ শ্রুতি বলিতেছে "তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন" অর্থাৎ স্রষ্টা নিজে অবিকৃত ভাবেই তাহার কার্য্যমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, এবং তাহাতেই তাঁহার ভোক্তৃত্ব, তথাপি কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, সেই কার্য্যোপাধি নিমিত্ত বিভাগ রহিয়াছে, যেমন ঘটাদি-নিমিত্ত আকাশের বিভাগ। অতএব পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তৃভোগ্য লক্ষণ ব্যবহারিক বিভাগ, সমুদ্র-তরঙ্গাদির ন্যায় উৎপন্ন হয়।"

পরের সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন:—"কিন্তু ব্যবহারিক বিভাগের পারমার্থিক সত্তা নাই —কারণ কার্য্যকারণের অনন্যত্ব *।' 'কার্য্য এই বহু বিস্তীর্ণ জগৎ, কারণ পরব্রহ্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব,—যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব দেখা যায়। এইরূপে এই ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অভাব। আপত্তি:—"তবে বস্তুতঃ ব্রহ্মও অনেকাত্মক হইল। বৃক্ষ যেমন অনেক শাখাযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্মও অনেক শক্তি এবং প্রবৃত্তিযুক্ত। অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এই অর্থে একত্ব, শাখা এই অর্থে নানাত্ব;—সমুদ্ররূপে একত্ব, ফেণ তরঙ্গাদি রূপে নানাত্ব,—মাটি রূপে একত্ব, ঘটসরাদিরূপে নানাত্ব। সেই একত্ব অংশের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি, এবং নানাত্বের জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধি। এরূপ হইলে মৃদাদির দৃষ্টান্ত ও অনুরূপই হয়।" উত্তর:—"তাহাও বলা যায় না, কারণ মৃত্তিকা ইহাই সত্য। বিকারজাতকে শ্রুতিতে মিথ্যা বলা হইয়াছে। শ্রুতি 'তৎ সত্যং' বলিয়া পরম কারণ এক ব্রহ্মকেই সত্য বলিতেছে, এবং 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের ব্রহ্মাত্মত্ব স্বয়ং সিদ্ধ, যত্নান্তরসাধ্য নয়। শাস্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মাত্মত্ব-জ্ঞানলাভ, জীবের স্বাভাবিক শারীরাত্মত্বের বাধক হয়। রজ্জু আদি জ্ঞান যেরূপ সর্পাদি বুদ্ধির বাধক সেইরূপ শারীরাত্মত্ব বাধিত হইলে তদাশ্রিত সমস্ত

* পরে (ছ) দ্রষ্টব্য,—'কারণ' শব্দে এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিতেছে।

স্বাভাবিক ব্যবহারও বাধিত হয়। সেই সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সিদ্ধির জন্যই ব্রহ্মের নানাত্ব-রূপ অপর এক অংশ কল্পিত হইয়া থাকে। একত্বই পারমার্থিক। নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত মাত্র। একত্ব এবং নানাত্ব উভয় সত্য হইলে, একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব জ্ঞান কিরূপে দূর হইবে।" আপত্তিঃ—"কিন্তু যদি একত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায়, তবে নানাত্বের অভাব-জনিত বিষয়-শূন্যত্ব হেতু প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ সকলের ব্যাঘাত হয়,—খুঁটি প্রভৃতিতে পুরুষ বুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়ে। আর বিধি নিষেধ শাস্ত্রও ভেদাপেক্ষী, ভেদ না থাকিলে তাহাও মিথ্যা হয়। এমন কি মোক্ষশাস্ত্রও গুরু শিষ্য ইত্যাদি ভেদাপেক্ষী। ভেদ না থাকিলে, তাহাও মিথ্যা হয়। তবে মিথ্যা-ভূত মোক্ষ-শাস্ত্র-সিদ্ধ একত্বের সত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে।" তাহার উত্তর এই:—"এরূপ কোন দোষ নাই। ব্রহ্মাত্মত্ব-বিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সকল লৌকিক ব্যবহারেরই সত্যত্ব যুক্তি-সঙ্গত, জাগরণের পূর্ব্বে স্বপ্ন ব্যবহারের ন্যায় যতক্ষণ না পারমার্থিক একাত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় এবং ফলাদি-যুক্ত ব্যবহারে কাহারও মিথ্যাত্ব বুদ্ধি হয় না। ততক্ষণ অবিদ্যা বশতঃ স্বাভাবিক ব্রহ্মাত্মতা পরিত্যাগ করিয়া বিকার সকলকেই 'আমি' 'আমার' এইরূপ আত্মা-আত্মীয় ভাবে সকল জন্তুই গ্রহণ করে। অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে, সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকোক্ত 'বখ্যাত ইন্দ্র-বিরোচনাখ্যায়িকার ভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মলোকে মুক্তাত্মাদিগের দ্রষ্টব্য অর্ণব-বৃক্ষ-পুর-স্বর্ণমণ্ডপাদির মানস সত্তার আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন:—(ব্রহ্মলোকে দ্রষ্টব্য) "মূর্ত্তি সকল মানস-আকার যুক্ত হইলেই (মুক্তাত্মাদিগের) মানস দেহের অনুরূপ সম্বন্ধ যোগ্য হয়। স্বপ্নেও মানস আকার যুক্ত পুংস্ত্রী আদিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আপত্তি হইতে পারে যে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি সকল মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছে:—"সত্যাঃ কামাঃ।" অতএব ইহাতে শ্রুতি-বিরোধ হয় তাহা নয়। মানস প্রত্যয়েরও সত্ত্ব যুক্তিসঙ্গত। স্ত্রীপুরুষাদ্যাকার মানস প্রত্যয় সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। যদি বলা যায় স্বপ্ন-দৃশ্য বস্তু সকল জাগ্রদ্বাসনানুরূপ, বস্তুতঃ স্বপ্নে স্ত্র্যাদি থাকে না। এ কথা কিছুই নয়। জাগ্রদ্বিষয় সকলও মানসপ্রত্যয় হইতে উৎপন্ন—কারণ জাগ্রদ্বিষয় সকলও সৎস্বরূপের ইচ্ছা (বা জ্ঞান) জনিত, তেজ-অপ্-অন্নময়। শ্রুতি বলিতেছে "সংকল্পই লোক সকলের মূল"—প্রত্যগাত্মা বা সর্ব্বাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই আকাশ পৃথিবীর উৎপত্তি, তাহাতেই তাহাদের লয় ও স্থিতি। রথনাভি-প্রোথিত রথ-চক্রের পাখির (অর) ন্যায়। অতএব মানস এবং বাহ্য বিষয়সকল বীজাঙ্কুরের ন্যায়—পরস্পরের কার্য্যকারণ। যদিও বাহ্যই মানস, এবং মানসই বাহ্য, তাহাদের নিজের সম্বন্ধে তাহাদের কোনটিই মিথ্যা নয়। তবে স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় সকল জাগরিতের সম্বন্ধে মিথ্যা, এ কথা সত্য। জাগ্রদ্বোধের তুলনাতেই তাহাদের মিথ্যাত্ব—তাহাদের নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। সেইরূপই আবার স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের তুলনায় জাগ্রদ্দৃষ্ট বিষয়ের

মিথ্যাত্ব! তাহার নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। তবে স্বপ্নেরই হউক, আর জাগ্রদাবস্থারই হউক, বিশেষ-আকারতা মাত্রই মিথ্যা প্রত্যয় জনিত। কিন্তু তাহাও কেবল আকার বিশেষ সম্বন্ধেই মিথ্যা। বস্তুতঃ নিজের সম্বন্ধে সন্মাত্র-রূপতা হেতু সত্য। সদাত্ম-প্রতিবোধের পূর্ব্বে, স্ব স্ব বিষয়ে, সকলই সত্য। অতএব ব্রহ্মলোকের মূর্ত্তিসকল স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় বলিলে, শ্রুতি-বিরোধ-দোষ হয় না। ব্রহ্মলোকের সাগর এবং সঙ্কল্প-মাত্র উত্থিত পিত্রাদি কামজাত ও মানসই। অষ্টম প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যে মুক্তাত্মা সম্বন্ধে শঙ্কর আবার বলিতেছেন:—"যেখানে অন্য কাহাকেও দেখে না, অন্য কিছুই শোনে না, তাহাই ভূমা"—তবে এক হইয়া মুক্তাত্মা কিরূপে ব্রহ্মলোকে 'পিতৃ-মাতৃ-লোকাদি' দর্শন করিয়া, অথবা স্ত্রীর সহিত' বা 'জ্ঞাতিদিগের সহিত' বিহার করিয়া, আনন্দিত হয়েন? ইহা বিরুদ্ধ, কারণ একই ব্যক্তি যে সময়ে (ব্রাহ্মলৌকিক কর্ম্ম সকল) দর্শন করে, সেই সময়েই বলা হইতেছে যে অন্য কাহাকেও সে দেখে না, "নান্যৎপশ্যতি" ইহাতে দোষ হয় না। ভূমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দেখে না। শ্রুত্যন্তরেও সে দোষ পরিহৃত হইয়াছে,—দ্রষ্টার 'দৃষ্টির অবিপরিলোপ হেতু সে দেখেই। তবে দ্রষ্টা হইতে পৃথক কোন কাম্যবস্তুর অভাব হেতু, দেখে না বলা যায়। যদিও শ্রুতিতে সুষুপ্ত সম্বন্ধেই ঐরূপ বলা হইয়াছে, মুক্ত ব্যক্তিরও সর্ব্বৈকত্ব হেতু, দ্বিতীয়াভাব সমান। "কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?" তাহাও বলা হইয়াছে। মোক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে শঙ্কর মুক্তাত্মার অবস্থা আমদের রোগ মুক্তাবস্থার সহিত তুলনা করিতেছেন:—"যথা রোগনিবৃত্তাবরোগোঽভিনিষ্পদ্যতে।" (ব্রহ্মসূত্র। অ-৪।পা-৪। সূ-২।) তিনি আবার বলিতেছেন যে মুক্তাত্মাদিগের "অনিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যও" সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন,—"নিত্য-সিদ্ধেশ্বরায়ত্তমিতরেষামৈশ্বর্য্যং" (সূত্র ১৭, ১৮।) এতদ্বারা পাঠক দেখিবেন যে ব্যবহারিক দ্বৈতভাব শঙ্করাচার্য্যের মতে মুক্তাবস্থাতেও থাকে,—মুক্তাত্মা নিয়ম্য এবং ঈশ্বর নিয়ামক।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

গিলগিটবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ।

শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমাংশে ২২৮ মাইল দূরে গিলগিট অবস্থিত। এই স্থানটী সমুদ্র বক্ষ হইতে প্রায় ৫৪০০ ফুট উচ্চে। গ্রীষ্মকালে তাপযন্ত্রে উত্তাপ ১১৫০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত হয় কিন্তু শীতকালে ১৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। গিলগিটের উত্তরে "হুন্জা" (Hunza) এবং নাগীর নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। পশ্চিমে পুনিয়াল (Punial) ও ইয়াসীন, দক্ষিণে চিলাস ও কাশ্মীর এবং পূর্ব্বে "স্কারডু" অবস্থিত।

এই স্থানটী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের মহারাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারী সৈয়দ নথিসা

খুস্‌ওয়াকতি সেনাপতি ইয়াসিনের শাসন কর্ত্তা গৌহর্‌আমনকে (Gauharaman) পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। গৌহর আমন আবার ইহার প্রকৃত অধিকারী সিকান্দর খাঁ ও তাহার ভ্রাতা করিম খাঁর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক দেশটী কাড়িয়া লয় নাথি সা গিলগিট আক্রমণ করিলে পর করিম খাঁ পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের মহারাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নাথি সার অধীনে কাশ্মীর মহারাজের প্রচুর সৈন্য লইয়া গিলগিটে উপস্থিত হয়। ইহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৌহর আমন ইয়াসীনে পলায়ন করে এবং বিনা রক্তপাতে তাহারা স্থানটীকে পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। কাশ্মীর মহারাজ প্রথমে ইহার যথার্থ অধিকারী করিম খাঁকেই তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দেন কিন্তু পরবর্ত্তী কতিপয় ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া তিনি দেশটীকে প্রকৃতরূপে আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তথায় বৃটীশ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন রাজনৈতিক কর্ম্মচারী এবং ওয়াজীরই ওয়াজ্‌রাত নামক কাশ্মীর মহারাজের একজন কর্ম্মচারী গিলগিটে অবস্থান করিতেছেন। কাশ্মীর মহারাজের কর্ম্মচারী কেবলমাত্র জেলা সংক্রান্ত বিচার কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু ব্রিটীশ কর্ম্মচারী গিলগিটের শাসন ও তৎসঙ্গে নিকটবর্ত্তী হুন্‌জা, নাগীর, পুনিয়াল, ইনকুমান্‌ ইয়াসীন, দিজির ও প্রজাতন্ত্রশাসন চিলাসের সহিত রাজনৈতিক সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই কাশ্মীর মহারাজকেই প্রধান ভূস্বামী বলিয়া সম্মান করে। কাশ্মীর মহারাজের সৈন্যসামন্তই গিলগিটের শাসন কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে, দুর্গটী কাশ্মীর মহারাজের এবং তাহারই নিযুক্ত সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির দ্বারা শাসিত। সৈন্যগণকে দুই বৎসরান্তর ছুটী দেওয়া হয়।

শ্রীনগর, গিলগিট, চিত্রল এবং হুন্‌জা প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রাস্তা আছে কিন্তু এই সকল রাস্তায় জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত যাতায়াত চলিতে পারে। নবেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত অত্যধিক তুষার পাতে ত্রাগ্‌বল্‌ এবং ব্রাজিল গিরিপথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তবে সাধারণতঃ ডাকবিভাগের কার্য্যাদি সুযোগানুসারে স্থানীয় ডাকহরকরা দ্বারা কোন প্রকারে নির্ব্বাহ করা হয়। কাশ্মীর, গিলগিট, এবং চিত্রল এই স্থান কয়টীর মধ্যে তারে সংবাদ প্রেরণের বন্দোবস্ত আছে।

এই স্থানের বর্ত্তমান অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান এবং প্রায় সকলেই "সিয়া" শ্রেণীয়। "সুন্নি" ও মৌলেইস্‌দের সংখ্যা অতি অল্প। রোনো, সিন্‌, যেশাকুন, কাশ্মীর, ক্রামিন, ডুম এবং গুজরাস ইহারাই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহারাও আবার বংশানুক্রমে বিভক্ত হইয়াছে এবং বংশের একজন খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে এক একটী বংশের নামকরণ হইয়াছে। বোধহয় ক্রামিন্‌রাই গিলগিটের আদিম অধিবাসী, তৎপর যেশাকুন, সিন্‌, রোনো প্রভৃতিরা অপরাপর অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সেই স্থানে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। সম্ভবত যেশাকুনরা হিন্দুকুশ দিয়া মধ্য এসিয়া হইতে

আসিয়াছে এবং তাহারা আর্য্যবংশোদ্ভব। তাহারা বলপূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত স্থানগুলি অধিকার করিয়া লয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের দাসত্ব করিতে বাধ্য করে ও ক্রমিন্‌ অর্থাৎ অনুচর এই আখ্যা প্রদান করে।

"সিন্"রা বলে যে তাহারা আরব বংশোদ্ভব। বোধহয় তাহারা ইহুদী। আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া পারস্য ও তুর্কীস্থান হইতে আসিয়াছে। তাহারা স্বায়ত্বশাসনের, পক্ষপাতী এবং তাহারা যে যে স্থানে গিয়াছে সেই সেই স্থানে এই শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সিনেরা মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত (গোদুগ্ধ হইতে প্রাপ্ত হয় বলিয়া) গ্রহণ করিত না। কুক্কুট পোষাকেও ঘৃণা করিত এবং মৎস্যকেও অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

যদি কোন 'সিন্' নিজ বংশে বিবাহ করিয়া পুনরায় যেশাকুন বংশে দার পরিগ্রহ করিত তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বস্ত্রীর সন্তানগণ সিন্ ও শেষোক্ত স্ত্রীর সন্তানগণ যেশাকুন আখ্যা প্রাপ্ত হইত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মাতৃবংশই পুত্রগণের বংশ নির্দ্দেশক।

'রোনো'রা বলে যে তাহারা কাশ্মীরের রাজিঔরী হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা তথাকার রাজবংশোদ্ভব।

গুজরাসগণ অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছে এবং তাহারা ভারতবর্ষে যেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত এখানেও সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন এই স্থানের পূর্ব্বাধিপতি মুসলমানদিগের 'রা' নামক একটী বংশ আছে। তাহারা এলেক্‌সেণ্ডারের (Alexander) বংশোদ্ভূত এবং প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্কারডু (Skardu) হইতে আসিয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে যে "রা" বংশ পরীর (Fairy) বংশ। এই জন্য তাহারা মনে করে যে তাহাদের অধিপতিরাই সর্ব্বপ্রধান জাতি এবং দেবতাদেরও অত্যন্ত নিকটাত্মীয়। সুতরাং এই বংশকে সম্মান করা ও তাহাদের আজ্ঞাধীন হওয়া অত্যন্ত সম্মানজনক।

ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ প্রণালীও অত্যন্ত আড়ম্বরহীন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সাদাসিধে রকমের, অতি অল্পেই ইহারা সুখী, এক জনেই কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, ছুতারের কার্য্যাদি করিয়া থাকে।

পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহারা নিজের হাতে বোনা ভেড়া ও ছাগলের লোমের মোটা জামা, পেণ্টুলন, কামিজ এবং একটি ভাঁজকরা টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা একটী ঢিলা পায়জামা, কামিজ টুপি এবং রূপার গহনা, শঙ্খের মালা ইত্যাদি ব্যবহার করে। ছাগল কিম্বা গরুর চর্ম্মে নির্ম্মিত পাবু (pabboo) নামক এক প্রকার মোজার ন্যায় নরম জুতা ইহারা ব্যবহার করে, এবং পর্ব্বতে উঠানামা করিতে হইলে এক খানা প্রকাণ্ড ছাগলের চামড়া পায়ে জড়াইয়া লয়। তাহাকে ইহারা তাউতি বলে।

ইহারা পলো খেলিতে বড়ই ভালবাসে এবং ইহাই তাদের প্রধান আমোদ। ক্রীড়ার সময় তাহাদিগকে যারপর নাই উৎফুল্ল ও উৎসাহিত দেখা যায়। যেন সংসারের সকল বিষয়ই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। শীকার কার্য্যেও তাহারা বিশেষ পটু। সময়ে সময়ে

ক্রীড়াস্থলে এবং মাংস চর্ম্ম ও পশমের নিমিত্ত-মার্কহোর নামক (Morkhor) পার্ব্বত্য ছাগল এবং উড়িয়াল প্রভৃতি পশু হনন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইহারা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত কিন্তু এক্ষণে তাহারা যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে তাহাকে সিন্‌হা (Shianha) বলে এবং চিত্রলগণ ইহাকে ডানগ্রিক্ (Danghrik) বলিয়া থাকে। ইহাতে সংস্কৃত ও পারসী শব্দ বহুল পরিমাণে মিশ্রিত।

বহুকাল বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগের অধীনে থাকায় এই জাতির প্রত্যেক শাখার আচার পদ্ধতি ও চলিত গল্প প্রসঙ্গাদির মূল নির্ণয় এবং উৎসবাদির কোনটী কখন্ কোন শাখা দ্বারা প্রচারিত ও নির্ব্বাহিত হইয়াছিল এই সত্যোদ্‌ঘাটন করা অতীব কঠিন। নিম্নে তাহাদের উৎসবের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সিন্ বাজনো উৎসব।

বসন্তের প্রারম্ভে গিলগিট নগরে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। ইংরেজী 'মে'ডের (Mayday) সঙ্গে এই উৎসবের সাদৃশ্য আছে। এই উৎসব প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে আরম্ভ হইয়া মার্চ্চের প্রথমে সমাপ্ত হয়। উৎসবের উদ্দেশ্য এই যে যন্ত্রণাদায়ক দুরন্ত শীত অনুচর তুষার রাশি লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে এবং মধুর বসন্তকাল তরুবল্লরী নব পত্রমুকুলে সজ্জিত করিয়া মনুষ্যের জীবনীশক্তিকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার সূচনা করিয়াছে। এ নিমিত্তই তাহাদের এই অপূর্ব্ব উৎসব। গিলগিটের অধিবাসীগণ এই উৎসব সাতিশয় আনন্দের সহিত সম্পাদন করিয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল ইহার আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া থাকে। এই উৎসব যথারীতি সম্পাদন করিবার অভিলাষে তাহারা উৎসবারম্ভের দ্বাদশ দিবস পূর্ব্বে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে ১০ সের পরিমাণ গোধূম ৫ দিবস পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখে। তৎপর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই গুলি উঠাইয়া মাটীতে খোদিত একটী গর্ত্তে ঢালিয়া পাথর চাপা দিয়া রাখে। এইরূপে ৪।৫দিন অতিবাহিত হইলে যখন গোধূম অঙ্কুরিত হয় তখন্ সেইগুলি উঠাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর গিলগিটের স্রোতে চালিত যন্ত্রে চূর্ণ করা হয়। এই গোধূম চূর্ণকে ইহারা 'ডিরাম' বলে এবং ইহাতে মাসের ঠিক প্রথম দিনে খানিকটা জল, খুবানি ও আখরোটের তৈল মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইহাতে বিন্দুমাত্রও চিনি দেয় না। এই অপূর্ব্ব জিনিসটীকে "ওয়েইদৈই ডিরেম" বলে। চিনি বর্জ্জিত হইলেও ইহাতে বেশ একটা মিষ্টগন্ধ পাওয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস যে কোন এক অশরীরি অমানুষিক জীবের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই এইরূপ অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অবশিষ্ট গোধূম চূর্ণে "ডিরাম পিঠি" নামক এক প্রকার চ্যাপটা সমতল পাউরুটী প্রস্তুত করিয়া তৈল ও কিস্‌মিস্ সংযোগে মহোল্লাসে তাহা উদরস্থ করে। এই ডিরাম পিঠিরূপ অপূর্ব্ব জিনিষটীর সহিত তৈল ও কিস্‌মিস্ যুক্ত হইলেই ইহার নাম বদ্‌লাইয়া যায়। তখন ইহাকে "ড্রাচা ভাত" বলে।

এই উৎসবে তাহারা কেবলমাত্র উদ্ভিদের কল্যাণ সাধন করিয়া ক্ষান্ত হয় না। নস্যাজে

অর্থাৎ নবেম্বরের কোন সময়ে একটি [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক পরিবারের প্রধানেরা কতকগুলি ভেড়া হত্যা এবং তাহাদের মাংস সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া এই উৎসবের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ভেড়াগুলির মধ্যে ১টী ভেড়ার লেজ ও একখানি পা যত্ন পূর্ব্বক ভিন্ন করিয়া রাখা হয় এবং "সিনৃহো বাজনো" উৎসবে ডুাচা 'ভাতের" সঙ্গে তাহা একত্র সুসিদ্ধ করা হয়। উৎসবের সময় সকলেই আহারাদি করিয়া থাকে। আহারান্তে তাহাদের অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ হয় এবং নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হয়—

ঐদিন যেন আবার আসে হে ভাই সকল
এ দিন যেন আসে আবার;
পূর্ণ হবে শস্যে ভাণ্ডার,—এ দিন যেন আসে আবার;
প্রচুর 'ঘি' উৎপন্ন হবে; পরের বছর যেন এমন হয়;
মাংস রাখব সঞ্চয় করে, পরের বছর যেন এমন হয়;
মধু রাখব ভাণ্ডার ভরে, এ দিন যেন আসে আবার;
শুভ দিনত আজ এসেছে, ঐদিন যেন আসে আবার।

দ্বিপ্রহরে খেলোয়ারগণ একত্রিত হয় এবং সকলেই পলোখেলার আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। ক্রীড়া স্থানে গমন কালে তাহারা সেই দিন একটী বিশেষ শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহের চালে, ছাদের উপরে এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে থাকিয়া এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা আনন্দের সহিত দর্শন করে। কেবল তাহাই নহে, স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেকের হস্তে সেদিন এক একটী করিয়া লম্বালাঠি থাকে এবং সেই লম্বালাঠির দ্বারা পুরুষগণকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে থাকে। কলিওয়ালারা গিলাগটের ব্যবসায়ী জাতি, তাহারাই প্রধানত প্রহারটা অধিক খাইয়া থাকে। এবং এই উপলক্ষ্যে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বাকী পাওনার শোধ অনেকটা তুলিয়া লয়। কোন নূতন ব্যবসায়ী তাহাদের হাতে পড়িলে ত কথাই নাই। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণচূর্ণ প্রদান করিয়া নিস্তার লাভ করিতে হয়। তৎপর "রা" অর্থাৎ প্রধান শাসনকর্ত্তার উপর প্রহার বর্ষণ হয়। তিনি ঘোড়ার উপর চড়িয়া দুই হাতে সুন্দরীদিগকে সেলাম করিতে করিতে দ্রুতগতিতে চলিয়া কোন প্রকারে তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পান। কিন্তু তাঁহাকেও বিশেষ রকম অর্থ দণ্ড দিতে হয়। তবে তাঁহার প্রতি ব্যবস্থাটা একটু লঘু হইয়া থাকে কারণ তাঁহার কোপে পড়িলে অনেক লাঞ্ছনা ও অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা এইরূপে ক্রিয়াভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র একদিকের সীমা-স্তম্ভে প্রস্তরের (goal) উপর একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই উৎসর্গকে "বাজনো আইকরাই" বলে। ছাগমুণ্ডটি এক গাছি রজ্জুতে আবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক খেলোয়াড় তাহার পলো খেলিবার দণ্ড দ্বারা এক একবার তাহা স্পর্শ করে। তৎপর একজন বাজনদার সেই রজ্জুটি ধরিয়া দৌড়াইতে থাকে ছাগমুণ্ডটিও ভূমিতে অদ্ভুতভাবে বিলুণ্ঠিত হয়। তৎপশ্চাৎ রাজা বা তাহাদের প্রধানমণ্ডল একখানি প্রকাণ্ড লাঠি হস্তে অশ্বারোহণ করিয়া বাজনদারের মস্তকে প্রহার করিতে করিতে অন্য সীমান্তে উপস্থিত হয়। ইহাই উৎসবের শেষ অঙ্গ। তৎপর 'পলো' খেলা আরম্ভ হয় এবং শুভদিনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ক্রীড়া চলিতে থাকে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিস্তী।

চোর।

১

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্ত্রী বলিলেন, "ওগো শুন্‌চো, নীচে যেন কে ঘুরে বেড়াচ্চে, বোধ হয় চোর!"

"ক্ষেপেছ! স্বপন দেখছিলে তুমি!" এই বলিয়া পাশ বালিসটাকে আলিঙ্গন করিয়া নূতন করিয়া নিদ্রার জোগাড় করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যাপেক্ষা বাসন কোশনের সিন্দুকটার উপরেই একেলে গৃহধর্ম্মিণীটির প্রখর স্নেহ। তিনি কেবলি বলিতে লাগিলেন "হাাঁগা জেগে থেকে সর্ব্বস্ব চোরের হাতে দেবে? একবারটি উঠে দেখবেওনা?" বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমার নীচের ঘরের ঘড়িতে ঢং করিয়া সজোরে একটা বাজিয়া উঠিল। আমার স্ত্রীও বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া সেই কাল্পনিক শব্দের উদ্দেশে কান পাতিয়া বলিলেন, "ঐগো বড় ঘরে ঢুকলো, যাবে যদি শিগ্‌গির যাও। রূপোর বাসন কোশন সাল বেনারসী সবই ঐঘরের আলমারিটাতে রয়েছে।"

মিথ্যা বলিয়া লাভ কি,—সাধারণ লোকের চেয়ে যে আমি কিছু অধিক সাহসী ছিলাম তা নয়। চোর ধরিবার উৎসাহের চেয়ে জিনিষ পত্রগুলার প্রতি কতকটা মায়ার ও তাহাদের অধিকারিণীর অত্যন্ত কাতর অনুরোধেই আমাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে দায়ে পড়িয়া প্রবৃত্ত করিল! কটক হইতে মনের মতন করিয়া কতকগুলি সৌখীন রূপার বাসন এই সেদিন মাত্র গড়াইয়া আনিয়াছি। তাহাদের চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য ও চাকচিক্য সর্ব্বদা চোখে পড়িবে বলিয়া গৃহিণী সেগুলিকে নিজের বসিবার ঘরে কাঁচের আলমারিতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমি তখনি তাঁহাকে একার্য্য করিতে বারণ করিয়াছিলাম। ঘরের কোণে একগাছা বেতের ছড়ি ছিল, আলো জ্বালিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু ছেলেদের দয়ায় তাহার কোন অস্তিত্বই পাওয়া গেল না। অগত্যা প্রাণটুকুই হাতে করিয়া চলিলাম। অস্ত্র আইনের কর্ত্তাদের চাপাচাপিতে পাটাকাটা ভোজালেখানা শুদ্ধ খিড়কির পুখুরে ফেলিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছিল। চারু তখন হাঁফ্ ছাড়িয়া উঠিয়া চুপিচুপি সাবধান করিয়া দিল "ওগো দেখো যেন মারে টারে না!"

তাহার দয়ায় একটু হাসিও আসিল; সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় সত্য কথা বলিতে কি আমার গাটা কেমন যেন ছম ছম করিতেছিল। নাজানি আমার জন্য সিঁড়ির নীচেতেই কি একটা রহস্য অপেক্ষা করিয়া আছে। অন্ধকার রাত্রি, কোথাও আলোর ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই, বাড়িতেও দ্বিতীয় কেহ সাহায্যকারী ছিল না। আমার হাতেরি হারিকেনের মিটমিটে আলোতে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম চারুর কথাই সত্য! বড় ঘরের দরজাখোলা ও ভিতর হইতে মানুষের চলাফেরার সাবধনতাপূর্ণ মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে! এইবার আমার বুকের মধ্যে চলন্ত রক্ত যেন কোন অদৃশ্য হিমহস্তস্পর্শে জমিয়া আসিতে লাগিল। হয়ত ঘরের মধ্যের লোকটা বা লোকগুলা অস্ত্রধারী! কিন্তু পরক্ষণেই আমার

নিজের কাপুরুষতা নিজেরই কাছে সুপ্রচুর লজ্জার আঘাতে উত্তেজনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নাঃ, হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো! যেতে হবে, হয়ত ভয় পেয়েও তারা পালাতে পারে। ভাবিতেছি লাণ্ঠনটা তেজ করিয়া দিব কিনা, এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে কে একজন বজ্র হস্তে আমার গলা টিপিয়া ধরিল। লাণ্ঠনটা আচমকা হস্ত চ্যুত হল বটে কিন্তু সৌভাগ্য যে সেটা ভাঙ্গে নাই বা নিবিয়া যায় নাই। আমিও প্রাণপণে তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য তাহার সহিত ধস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার আততায়ী আমাকে মাটিতে ফেলিয়া আমার বুকের উপরে হাঁটু দিতে গিয়া আমায় ছাড়িয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"ও হরি! তুমি!" আমি এই কথায় নিজের অবস্থা ভুলিয়া গিয়া পূর্ণ কৌতূহলে চোরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া সে যেমন বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়াছিল আমিও ঠিক তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিলাম "নীলরতন!"

হাঁ সে নীলরতনই বটে! এবং এতদূর অধঃপতন তার হওয়া সম্ভব না ভাবিলেও সে যে কোনখানে একটা সমাজ বিগর্হিত দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতেছে আমারও এই রকমই একটা ধারণা ছিল। নীলরতন কটক কলেজে আমার সহিত কিছুদিন পড়িয়াছিল। সেই সময়েই তাহার সহিত আমার আলাপ হয়, একটু বন্ধুত্বও হইয়াছিল। তার পর দুজনের জীবনের গতি দুইদিকে বহিয়া গেল। পৈতৃক বৃথা সর্ব্বস্ব পান ভোজন এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয় করিয়া বড় লোকের ছেলে শীঘ্রই একদিন আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল এবং 'কাল দিব' বলিয়া কুড়িটি টাকা ধার লইয়া সেই যে সে সরিয়াছিল আজ সাত বৎসর পরে আবার এই সাক্ষাৎ!

"আমার বাড়ি বলে জান্তেনা বোধ হয়? না জেনে শুনেই এসেছিলে, নীলরতন?"

নীলরতন মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল "ঈশ্বর জানেন মণি, তা জান্‌লে কখনই আজ আমাকে এত বড় লজ্জায় ও পাপে লিপ্ত হতে হোত না! হা ভগবান! মণি ভাই, আমায় একটু জল দেবে? উঃ—"

এক মুহূর্ত্তেই সব ভুলিয়া গেলাম। স্ত্রী যে উপরের ঘরে ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইতেছে সে কথাও মনে রহিল না। চোরের দিকে চাহিয়া বলিলাম "এসো।" বলিয়া তাহাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া তাহার হাতে দিলাম। তাহার জল পান করা হইয়া গেলে নিজেও এক গ্লাস জল মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িলাম এবং তাহাকে অন্যখানাতে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সঙ্গে আর কেউ আছে?" সে বিষম লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া বলিল, "আমায় অতটা পাপিষ্ঠ ভেবো না মণি! কেউ না। এই আমার প্রথম অপরাধ, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই শেষ! উঃ প্রাণের ভয়ে শেষে তোমাকেই হত্যা করে ফেলছিলুম! ধিক্কার হয়ে গেছে জীবনে!"

একটু ভর্ৎসনার সঙ্গে বলিলাম "এই কি এখন তোমার জীবিকার উপায়! এর চেয়ে কি কোন রকম ভাল কাজ এত বড় জগতের

মধ্যে তুমি খুঁজে পেলেনা নীলরতন? আমার কাছে আসনি কেন, আমি তোমায় কাজ দেখিয়ে দিতুম!"

নীলরতন কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তবে আমার সমুদয় দুঃখের কথা তোমায় বলি শোন মণি, শুনলে তখন তুমি আমার উপরে রাগ করতে পারবেনা বরং দয়া হবে। তুমি জানো ত মণি বড় লোকের ছেলে ছিলুম, বাবা মরতেই পাঁচটা বয়াটে বন্ধু জুটে আমার সর্ব্বনাশ করলে! তারপর যখন সর্ব্বস্বান্ত হলুম তখন তারা আমার ফেলে সরে দাঁড়ালো। চাকরী অনেকবার জুটেছিল, কিন্তু অভ্যাস নেই খাটতে পারিনে; তাতে হাতের লেখা ভাল নয়, দুচার মাস কেউ রাখে না। তার উপর নানা রকম কঠিন কঠিন রোগে ধরেচে! এই তো অবস্থা এর পর আবার মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের অনুরোধ না ঠেলতে পেরে তরঙ্গিনীকে বিয়ে করতে হোল! তখন আমার দশা কি রকম হয়ে দাঁড়াল ভেবে দেখো! স্ত্রী চূড়ান্ত দুঃখের অবস্থাতেও কখনও মুখফুটে আমায় কিছু বলে না। খেটে খেটে না খেয়ে তার হাড়গুলি গোণা যাচ্ছে তবু কথাটী নেই! তার ওপোর ছেলেমেয়ে! উঃ আমার যে কি কষ্ট মণি—"

হঠাৎ আমার হৃদয়ে করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "কটি ছেলেমেয়ে?" "চারটি" বলিয়া হঠাৎ নীলরতন নেত্র মার্জ্জনা করিল। তাহার কঠোর কণ্ঠ রুদ্ধবাষ্পে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছিল, পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিল "চটি-ছেলে দুটি মেয়ে, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ কঙ্কাল কখানা। খেতে পায়না মণি, দিনের পর দিন উপবাসে কেটে যায় তাদের! এ কথা তুমি কল্পনা করতে পারো—তোমারও তো ছেলে আছে?" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। "আমার সন্তান সব না খেয়ে মৃত্যু মুখে পতিত আর রাস্তার দুধারে দোকান ভরা খাবার! ঘরে ঘরে সিন্দুক ভরা টাকা—সুখাদ্য পুষ্ট ছেলেমেয়ে—মণি ভেবে দেখোদেখি একি প্রলোভন!" সে আমার মুখে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুই চক্ষু স্থির করিল, তাহার মধ্য হইতে বুভুক্ষিত অগ্নি সহস্র ধারায় ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। "কথাটা ঠিক! আমার অজিত, আমার নীহার! না অসহ্য!" উঠিয়া চোরের হাত বন্ধুর হাতের মতন করিয়াই ধরিলাম।

"নীলরতন! তুমি বলেছ এই তোমার প্রথম চেষ্টা, এখনও তোমার হাত কলঙ্কিত হয়নি। তুমি তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য সাধুপথে উপার্জ্জন করবে? বেশ! আমি তোমায় আমার ভগ্নীপতির আফিবে কালই ঢুকিয়ে দেব। এখনই কুড়ি টাকা করে তুমি পেতে পারবে।" নীলরতন রুদ্ধবাক্ হইয়া নীরবে কৃতজ্ঞনেত্রে চাহিয়া দেখিল। বলিলাম "তবে আজ যাও—কাল আমি নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো এখন, তুমি কোথায় থাক?" "দীঘির পশ্চিম পাড়ে একটা খোলার ঘরে। আমি নিজেই আসবো, কি জানি যদি তুমি ভুলে যাও, দেরি হলে আমার বড় ছেলেটি মারা পড়বে; তার জীবনক জর কাল বিকেল থেকে খেতে পায়নি।" আমি পকেটটা খুঁজিলাম, ভাগ্য ক্রমে একখানা দশ টাকার নোট কোটের পকেটে ছিল এবং তাড়াতাড়িতে কামিজ না পুড়িয়া

কোটটাই পরিয়া আসিয়াছি। তাহার হাতে গুঁজিয়া তাহার সলজ্জ আপত্তি না শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেও আমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে বিদায় লইল।

হাত ধরাধরি করিয়া দুজনে ঘর হইতে বাহির হইতেছি এমন সময়ে কে একজন ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল "একি তুমি! কার সঙ্গে কথা কচ্ছ তবে?" বিস্ময়ে সে সেইখানেই যেন জমিয়া গেল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নীলরতন তাহাকে নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "বৌদিদি অভাগা আপনাদের বড় কষ্ট দিয়েছে, মাপ কর্ব্বেন। মণিকে সব বলেছি তার কাছে আপনি জগতের একটি সবচেয়ে দুঃখের কাহিনী একুণি শুনতে পাবেন এখন। নীলরতনের নাম শোনেন্ নি? আমি সেই দুর্ভাগা নীলরতন।"

চারু তেমনি আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। আমি বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলাম। দ্বার খোলাই ছিল, হতভাগা চাকরটা বন্ধন করিতে ভুলিয়াছে। এ অবস্থায় কে এই মুক্ত দ্বার প্রত্যাখান করিতে পারে? আহা বেচারা! "দেখো ভাই ভুলে যেওনা যেন। তোমার উপরে দুটি জীবনের সমস্তটাই নির্ভর। আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই রাতটা স্মরণ থাকবে।" গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহে বন্ধুকে প্রথম জীবনের মতই সানন্দে আলিঙ্গন করিলাম, বলিলাম "কাল সকালেই তুমি আমার দেখতে পাবে।"

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়া চারু বসিয়া আছে, আমাকে দেখিয়া বলিল "আমার জন্মে এমন আশ্চর্য্য আমি কখনও হইনি!" "আমিও না" এই বলিয়া আমি তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা তাহার নিকটে বর্ণনা করিলাম।

কাহিনীর গোড়ারদিকটাতেই চারু একবার শিহরিয়া বাধা দিয়া উঠিয়াছিল "মাগো! কি ভয়ানক লোক? তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে পর্য্যন্তই কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, ছাই জিনিষের জন্যে তোমাকে কোথায় বিপদের মধ্যে পাঠালুম। তাই আর থাকতে না পেরে নিজেই এলুম।" তার পর সমস্তটা শুনিয়া সে হঠাৎ বেদনার সহিত কহিয়া উঠিল "আহাহা বেচারা! আহা তুমি যদি আমায় একটু বল্‌তে ছেলেগুলোর জন্য কিছু খাবার দিয়ে দিতুম। ঘরে অনেক সন্দেশ আর গজা রয়েছে।" আমি সপ্রেমে তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলাম "আমি তাকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়েছি। চারু, চলো উপরে যাই এখনও বিস্তর রাত রয়েছে। যদিও ঘুম আর হচ্চে না"—চারু উঠিতে গিয়া হঠাৎ কি কথা স্মরণ করিয়া আবার বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওর সঙ্গের লোকটা কেগো?"

"সঙ্গের লোক? না সঙ্গে কেউ ছিল না তো?"

স্ত্রী মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন "সেকি আমি স্বচক্ষে একটা লোককে বড় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি!" হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা চট করিয়া দুজনকারই মনে জাগিয়া উঠিল। চারু হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রথমেই বড় ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। আমিও হতবুদ্ধির মত

তাহার অনুসরণ করিলাম। আলমারির দুইটা দরজাই খোলা, তাহার মধ্যকার সমস্ত রৌপ্য মায় তাহাদের গঠন সৌকুমার্য্য ঔজ্জ্বল্য নিশ্চিহ্নরূপে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য পরদিন দীঘির চতুষ্পার্শ্বের ত্রিসীমানার মধ্যেও নীলরতনের কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

হিজলীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থান সমূহ।

বাহিরী।

হিজলীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থান সমূহের উল্লেখ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে বাহিরীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাহিরীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কথিত আছে মহাভারতীয় যুগে এখানেও মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার একটী গোগৃহ ছিল। সাধারণের বিশ্বাস এক্ষণে বাহিরীর চতুষ্কোণে "পাদ টিক্‌রী," "শাপ টিক্‌রী," "ধন টিক্‌রী" ও "গোধন টিক্‌রী" নামে যে চারিটী জঙ্গলাবৃত সুরম্য মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় সে গুলা ঐ সকল গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ। স্তূপ এক একটী উচ্চে প্রায় ৭০।৮০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ২০০।২৫০ ফুট হইবে।

সাধারণের বিশ্বাস যাহাই থাকুক, আমাদের কিন্তু ঐ গুলিকে বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান যুগের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে রাজপুতানার মধ্যেই মৎস্যদেশের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ উত্তরে রঙ্গপুর জেলার গাইবাঁধা মহকুমা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নানা স্থানেই কেন যে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন। অনুমান হয়, কালসহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি স্থানে স্থানে যেরূপে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, এই স্থানগুলিও সেই কারণেই এই সকল পৌরাণিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আর যেখানে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই সে সকল স্থান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া হিন্দুদিগের পরিত্যাজ্য হইয়াই রহিয়াছে। উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যের কথা দূরে থাক্‌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যান তখন পথে যে সকল তীর্থ পাইয়াছিলেন তাহাই দেখিয়া ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উপর উঠিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় তাঁহার "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "উদয় গিরি ও খণ্ড গিরি তখন পৌরাণিকদিগের প্রায়ই ত্যাজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় আমাদের তীর্থ নহে।"

মহাভারতীয় যুগে এ প্রদেশ তাম্রলিপ্ত,

রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল এবং তাম্রলিপ্তের রাজারাই এ প্রদেশের উপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। তাম্রলিপ্তের রাজাগণও অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাম্রলিপ্তাধিপতি তাম্রধ্বজ-রাজার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাম্রলিপ্তের রাজাদিগের অধিকৃত ভূভাগের মধ্যে মৎস্য-দেশাধিপতির অধিকৃত কেবল যে একটী গোগৃহই অবস্থিত ছিল এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কারণ তাম্রলিপ্তাধিপতি বা মৎস্যাদেশাধিপতির মধ্যে কেহই বোধ হয় সেরূপ হীনবল ছিলেন না যে একজন অন্যজনকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে নির্ব্বিবাদে অধিকার স্থাপন করিতে দিবেন বা একজন অপর একজনের অধীনে নিরীহ প্রজার ন্যায় বাস করিতেও স্বীকৃত হইবেন। এই সকল কারণে বিরাট রাজার সহিত বাহিরীর যে কোন সম্বন্ধ ছিল তাহা মনে হয় না।

মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী "গোপ-গিরি" নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর যে স্থান বিরাট রাজার গোগৃহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহারও কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। গোপগিরির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি বিরাট রাজার গোগৃহ অপেক্ষা বৌদ্ধ "গুম্ফা"র কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "গোপ" শব্দ "গুম্ফা" শব্দ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। উত্তর কালে পৌরাণিকদিগের হাতে পড়িয়া "গোপ শব্দ "গোতে আসিয়া "গোপগিরি"কে "গোগৃহ"তে পরিণত করিয়া থাকিবে।* এইরূপে যেখানেই বৌদ্ধদিগের কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহারই সহিত একটা না একটা পৌরাণিক আখ্যান জুড়িয়া দিয়া বৌদ্ধচিহ্ন লোপ করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক সুবিখ্যাত হয়েন-থ্-সঙ্গ তাম্রলিপ্ত এবং সমুদ্রোপকূলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে দশটী বৌদ্ধ মঠ, একটী দুই শত ফুট উচ্চ অশোক স্তম্ভ এবং সহস্রাধিক বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন।—উক্ত সংখ্যক পুরোহিতের অন্যূন দশ সহস্র শিষ্য ছিল। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম্ম ও তাঁহাদের কীর্ত্তিরাশি যে চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মপূজার ভিতরে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে বলিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের অসংখ্য কীর্ত্তিরাশিও এইরূপ এক একটী পৌরাণিক আখ্যার অন্তরালে পড়িয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুরূহ।

বাহিরীর প্রাচীন কীর্ত্তিরাশির মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন। বাহিরী

* বৌদ্ধ যুগের রচনায় অনেক স্থলে "গিরি" শব্দ "গৃহ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানিক চাঁদের গানে ইহার ব্যবহার আছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দ্বিতীয় সংস্করণ ৭৭ পৃঃ।

নামটীও বৌদ্ধ "বিহার" শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। বাহিরীতে একটী অতি প্রাচীন মঠ আছে—কতদিনের তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কে জানে ইহা সেই সকল কোন প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল কিনা? মঠটীর চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর এবং মধ্যস্থলে সন্ন্যাসীদিগের বাসোপযোগী গৃহ ও দালানাদি আছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম; মনোহর তপোবনের ন্যায় পরম রমণীয়। সেখানে উপস্থিত হইলে মনে স্বভাবতঃ একটা পবিত্র ভাবের উদয় হয়। দুদণ্ড বসিয়া প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভা অবলোকন করিলে মনোপ্রাণ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়।

মঠটীতে এখন রামচন্দ্র প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। কিন্তু চিরদিন হয়ত সেরূপ হইত না। একদিন সেখানে হয়ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিই বিদ্যমান ছিল। শ্রমণগণ তাঁহার ধ্যানেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কালের কঠোর হস্ত আজ সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। এক্ষণে সেখানে সেই মহাযোগী রাজপুত্রের লোকমধুর চরিত্রকাহিনীর বা তাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্মসংযমের কোন আলোচনা দূরে থাক্ বাহিরীর ত্রিসীমার মধ্যে তাঁহার কোন মূর্ত্তিই দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে বর্ত্তমান কাঁথির সবডিভিজনাল আফিসের সম্মুখে যে প্রস্তরমূর্ত্তিটী স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় উহা বাহিরীর নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সল্ট ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ বাটী নির্ম্মিত হয় তখন মূর্ত্তিটি বাহিরী হইতে আনীত হইয়া ঐ স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটীর নাসিকা এবং হস্ত দুই খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; মুখের নিম্নভাগের কিয়দংশও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ফুট। কেহ কেহ উহাকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মুখের সহিত ইহার মুখের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সেই কারণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতামতের জন্য আমরা এই সঙ্গে এই মূর্ত্তিটীরও একখানি ছবি দিলাম। তাঁহারা যদি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে তাঁহারা যদি আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিলে আমরা আহ্লাদের সহিত তাহা জানাইব।

বাহিরীতে একটী পুরাতন মন্দিরও আছে। তাহার কিয়দংশ ইষ্টক ও কিয়দংশ প্রস্তর নির্ম্মিত। গঠন প্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরাদির ন্যায় এবং অনেকাংশে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুরূপ। মন্দিরটীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যে খোদিত লিপিটী রহিয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর ফলকটীতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী রহিয়াছে।

শকাব্দে রস শূন্য-বাণ-ধরণী-মানে তৃতীয়াং
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ সিতে।
শ্রীযুক্তাঃ গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে
দত্তঃ গ্রাম বরোচিতং আত্তদিনং তদ্দুহিন বাড়া
খ্যাতঃ।

(১৫০৬ শকাব্দার বৈশাখ মাসের ৭ই তারিখে বুধবার শুক্লপক্ষের যুগাদ্যাদিনে শ্রীযুক্ত গদাধর নামক গুরুর হস্তে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্র দেবতাগণকে সমর্পণ করা হয় এবং তাঁহাদের প্রীতি কামনা করিয়া উক্ত গুরু দেবতাকে নেউলবাড় নামক গ্রাম দান করা হইয়াছিল।)

এই প্রস্তরফলকখানি ব্যতীত মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ শিলাপটে ও মন্দিরের সম্মুখস্থ দ্বারের উপর আরও দুই খানি খোদিত লিপি আছে।

বাহিরের অঙ্গন হইতে প্রাপ্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি।

উহার দ্বারা জানা যায় যে কাশীদাসের কুলে শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ দাসের পুত্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন মিশ্র নামক আচার্য্য চূড়ামণির পৌত্র ভগবান নামক কোন ব্যক্তির পুত্র শ্রীযুক্ত হরণীসুত নামক এক ব্যক্তি এবং উক্ত আচার্য্য-চূড়ামণির চক্রধর নামক এক পুত্র, ইহারা উভয়েই উক্ত

জাহিরার মন্দির।
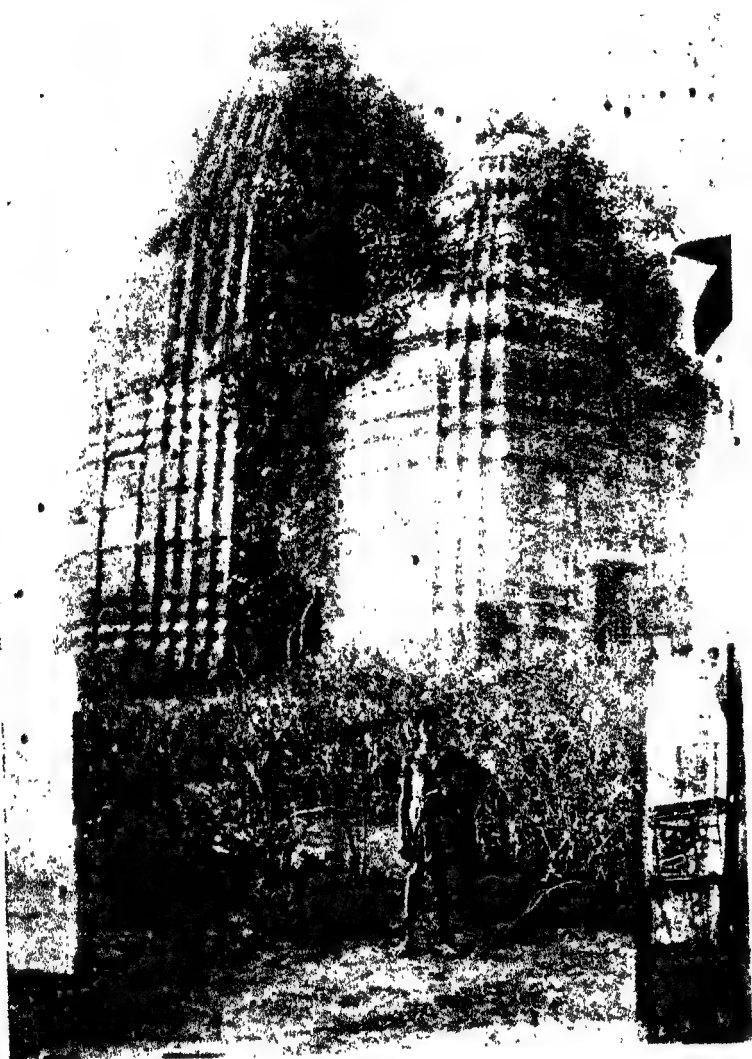
প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাবিধি যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া পরলোক গমন করেন।*

মন্দিরটীতে একণে জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রার কোন মূর্ত্তিই নাই। তাঁহারা বহুদিন হইল স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন তাহারও কোন নিদর্শন নাই। এতদিন মন্দিরটী ভিতর ও বাহির পার্শ্বের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত থাকিয়া নানা প্রকার হিংস্রজন্তুর আবাসরূপেই ব্যবহৃত হইতেছিল, সম্প্রতি এক ব্যক্তি দেবীর স্বপ্নাদেশ হইয়াছে বলিয়া মন্দিরটীর জঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ তথায় এক কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন।

কাশীদাসের বংশে একণে কেহই বর্ত্তমান নাই। বাহিরীর মধ্যে একটী স্থান অদ্যাপি "বিভীষণের ভিটা" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিভীষণ দাস হিজলীর নবাব তাজখাঁ মসন্দরীর দেওয়ান ভীমসেনের পিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ভীমসেন কোন পারিবারিক দুর্ঘটনায় মনঃকষ্টে সপরিবারে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার বংশের চিহ্নমাত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভীমসেন যে পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি ভীমসাগর নামে পরিচিত।

বাহিরীতে ভীমসাগর ব্যতীত হেমসাগর, কৃষ্ণসাগর, লোই (লোহিত) সাগর প্রভৃতি নামে আরও অনেকগুলি বৃহৎ সরোবর বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। এই সকল পুষ্করিণী যে কতদিন পূর্ব্বে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা একণে জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহাদের অবস্থা দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে অন্যূন ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে এগুলি খাত হইয়াছিল এবং হিন্দু কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমানদিগের হইলে পুষ্করিণীগুলি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইত। পূর্ব্বে এদেশে এইরূপ জলাশয়াদি খনন করা জীবনের শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য বলিয়া লোকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে এ বিষয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সেই ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়াতে, একণে সংস্করণাভাবে ওই সকল সরোবর ক্রমশঃই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। ২১টীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। শীঘ্রই উহাদিগকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে হইবে।

বাহিরী গ্রামে একণে একটীও কূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পুষ্করিণী আদি খনন করিতে গেলে ৭।৮ ফুট মাটীর নীচে প্রায়ই এক একটী কূপ বাহির হইতে দেখা যায়। কূপগুলি সাধারণতঃ ১৩।১৪ ইঞ্চ লম্বা, ৭ ইঞ্চি চওড়া ও দুই ইঞ্চি পুরু অর্দ্ধ বৃত্তাকার ইষ্টকখণ্ডের দ্বারা নির্ম্মিত দেখা যায়। বাহিরীর ভূগর্ভে এবং ভূ-পৃষ্ঠেও স্থানে স্থানে এখনও যথেষ্ট প্রাচীন ইষ্টক

* (১) কাশীদাস কুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাভাত্মজ; শ্রীমানাবিব ভুদটীকর দশো প্রাসাদ মুচ্চৈঃরিমম্। গোপাল প্রতিমাংচ সম্যগণায়ৎ সন্তঃ প্রতিষ্ঠাং বিবৈঃ; রামংচেহ সুভদ্রয়া সহ জগন্নাথং ব্যধাসীদপি॥ (২) পৌত্রঃ শ্রীধরণীসুতো ভগবতঃ সুহৃদ্বিজন্মাগ্রণীঃ; শ্রীমানর্জ্জুন মিশ্র ইত্যভিহিত আচার্য্য চূড়ামণেঃ। পত্রশ্চক্রধরঃ কবীন্দ্র ইতি যত্যাসিং প্রতিষ্ঠাবিধিং; প্রাসাদস্য বিভীষণস্য বিধিনা কৃত্যা দিয়াযংচাস্ত॥

ও প্রস্তরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যে মৃত্তিকা স্তরে ওই সমস্ত প্রাচীন গৃহ বা মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকাস্তর সঞ্চিত হইয়া প্রায় ৭।৮ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরীতে "ধন টিকরী" নামক যে একটি স্তূপ আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে সেই স্থানে বিরাট রাজার কোষাগার ছিল। প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে যে অদ্যাপিও লোকে কোন কোন সময়ে উক্ত স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যাহা পায়, তাহা অতি সংগোপনে আত্মসাৎ করে। শুনা যায় পূর্ব্বকালে বাহিরীর চতুর্দ্দিকে একটী পরিখা ছিল এবং গ্রামে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার ছিল।

বাহিরীতে একটী অতি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ আছে; ওরূপ বড় বৃক্ষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষটী সম্বন্ধে ওই অঞ্চলে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। উহা ঐ অঞ্চলে "জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ" নামে পরিচিত। নৌকাদি দড়ী বা চেনের দ্বারা কোন বৃক্ষাদিতে বাঁধিয়া রাখিলে ক্রমাগত দড়ীর ঘর্ষণে বৃক্ষাদির গাত্রে যেরূপ দাগ পড়িয়া যায় সেই বৃক্ষটীর গায়েও সেই রূপ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কিম্বদন্তী, প্রাচীন কালে এখান হইতে একটী নদী প্রবাহিত হইয়া বরাবর বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেই সময় যে সকল বড় বড় নৌকা ও 'ছালতি' আদি লবণ ব্যবসার জন্য এ প্রদেশে আসিত তাহা ঐ তেঁতুল গাছেই বাঁধা হইত। এক্ষণে ঐ স্থান দিয়া কোন নদী প্রবাহিত দেখা দূরের কথা উহার ত্রিসীমার মধ্যে কোন ক্ষুদ্র খালের অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বাহিরীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচন করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে এক সময় এই স্থান কোন নদী সৈকতেই অবস্থিত ছিল। বাহিরীর নিকটবর্ত্তী লাউদা, কুমিরদা, ঝাপরদা, অমরদা, মারিসদা প্রভৃতি 'দা' অনুযুক্ত গ্রাম গুলির দা শব্দ "দহ" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ নদীটী ঐ সকল স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দহগড়া নামক গ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই কারণেই ওই স্থান দহগড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার অনতিদূরেই এই দহগড়া গ্রাম অবস্থিত।

বাহিরীতে এক্ষণে একটী থানা একটী পোষ্টাপিস ও একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় আছে। কাঁথি মহকুমার সদর ষ্টেশন কাঁথি সহর হইতে বাহিরী অন্যূন আট মাইল উত্তরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বাহিরীতে একটী আউট পোষ্ট ছিল এবং উহা কাঁথি থানারই অন্তর্গত ছিল; মাত্র ৫।৭ বৎসর হইল বাহিরীকে একটী পৃথক থানায় পরিণত করা হইয়াছে। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদম্ সুমারীতে বাহিরীর লোকসংখ্যা ২৪,৪৪৩ জন ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

সহধর্ম্মিণী

আমরা নারীজাতির সহিত পুরুষজাতির তুলনা করিয়া দেখিলে এইটাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করি যে, নারীজাতি সাধারণতঃ হৃদয়শক্তিতে এবং পুরুষজাতি বুদ্ধিশক্তিতে অধিকতর পরিমাণে শক্তিমান। সংসারে এই উভয় শক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন।

মানুষের জীবন সংগ্রামের জীবন, আমাদিগকে আজীবন কেবল সংগ্রাম করিয়াই কাটাইতে হয়। বুদ্ধি এই জীবন-সংগ্রামের কেবল উপায় বলিয়াই দেয়, কিন্তু সংগ্রামে শক্তি ও সংসারে তৃপ্তিদান করিতে হৃদয় ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নাই। তাই মানুষের পক্ষে এই উভয়-শক্তির সম্মিলনসাধন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। আমাদের যে দাম্পত্যজীবনবন্ধন, তাহার মূলে উক্ত শক্তি দ্বয়ের মিলনসাধনের চেষ্টা ব্যতীত, আর কিছুই নাই। সুতরাং মানুষের দাম্পত্যজীবন তখনই সার্থক হয়, যখন দম্পতির জীবনে উক্ত উভয় শক্তি মিলিত বা সামঞ্জস্যীভূত হয়।

কিন্তু ইহাকে এইরূপে সার্থক করিতে গেলে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গভীর প্রেম থাকার একান্ত প্রয়োজন। নতুবা এই অপেক্ষাকৃত পরস্পরবিরোধী চিত্তবৃত্তিসমূহের মিলন-সাধনের চেষ্টা কেবল ব্যর্থতার মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ দাম্পত্য-জীবনের এই সূক্ষ্মতত্ত্বটী বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলেন; প্রাচীন আর্য্য সাহিত্যেতিহাসের দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এদেশে এমন লোকও অনেক আছেন যে যাঁহারা এই কথাটার বিপরীত কথাই বলিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন—

"প্রাচীন হিন্দু সমাজকর্ত্তৃগণ দাম্পত্য-জীবনের মহত্ত্ব ও দায়িত্ব যে বিশেষ গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। বরং তখনকার সামাজিক ইতিহাস এবং শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থাদি পাঠ করিয়া দেখিলে এইটাই মনে হয় যে, মানবচরিত্রের স্বাভাবিক গতি ও প্রেরণা অনেক সময়েই তাঁহারা বুঝিতেন না। তাহা যদি বুঝিতেন, তবে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদের পক্ষে স্বামীর প্রতি সকল অবস্থাতেই একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যবস্থা দিয়া পুরুষজাতিকে ইচ্ছানুসারে বা সামান্য কারণে বিবাহ করিবার অধিকার দিতেন না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, স্বামীর মৃত্যু হইলেও তাঁহার যুবতী স্ত্রী যদি মনে মনেও অন্য পুরুষ কামনা করেন, তবে সেই আর্য্য স্ত্রীর পক্ষে নরকভোগ অনিবার্য্য। আর পুরুষ—তিনি যদি পত্নীসত্ত্বেও অন্য পত্নী গ্রহণ করেন, তবুও তাঁহার স্বর্গ গমনের কিছুমাত্র বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

"ইহা মানুষের হৃদয়শক্তি ও বুদ্ধিশক্তি মিলনের বা ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল নহে। হিন্দু স্ত্রীর উপর হিন্দু স্বামীর যে প্রেম, তাহা সাধারণতঃ দয়ামাত্র। হিন্দু স্ত্রীও নামে মাত্র স্বামীর সহধর্ম্মিণী, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি স্বামীর দাসী। তাঁহার পাতিব্রত্য কেবল অপরিহার্য্যনীয়, চির দাসীত্ব

ছিন্ন অন্য কিছুই নহে। হিন্দুর প্রকৃতি নারীজাতির এই দাসীত্বের এত অনুকূল যে, যে নারী যখন দাসীত্বে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া উঠিয়াছেন তখনই তাঁহার প্রশংসা হিন্দুর সাহিত্য ইতিহাসে আর ধরে নাই। হিন্দু কবির লেখনীও এই দাসীত্বের আদর্শ-চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা চিরকাল করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। সুতরাং দাসীত্বের মধ্যে নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা না থাকলেও ইহার উপর একটা লোভ এবং দাসীত্ব সাধনের একটা প্রবল চেষ্টা, সাধারণ হিন্দু রমণীর একেবারে প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে স্বামীর উন্নত ধর্ম্মজীবনের সঙ্গিনী হইবার এবং তাঁহার শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইতে তাঁহারা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই পুরুষ জাতি শক্তিহীন হইয়া আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে লইয়াই সমাজ শরীরের পূর্ণতা, এক অঙ্গ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া থাকিলে অন্য অঙ্গ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন থাকে না।" ইত্যাদি।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, এই অপরিণামদর্শিতা ও ভ্রান্তির জন্য প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ দায়ী নহেন। তাঁহাদের কালে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য দাসীত্বমাত্র ছিল না। ভদ্রা দ্রৌপদী, সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শ রমণীগণ পুরুষের দাসী মাত্রই ছিলেন না। যাঁহারা সম্পদে এবং রণক্ষেত্রে গৃহে এবং অরণ্যে, গার্হস্থ্য জীবনে এবং সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে স্বামীর চিরসঙ্গিনী রহিয়া তাঁহাদের বাহুতে শক্তি, মনে সাহস এবং হৃদয়ে বল ও বিবেকবুদ্ধি যোগাইতেন তাঁহাদের সকল শক্তিই শুধু স্বামীর প্রেম সাধনের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত, তাহা কদাপি মনে করা যাইতে পারে না। বাস্তবিক তাঁহাদের শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা ছিল স্বামীর প্রেম সাধনে। পতির ধর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র উচ্চ লক্ষ্য ছিল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগ হইতে পুরুষকর্ত্তৃক নারীর অধিকার—নারীর সম্মান লোপ হইতে আরম্ভ হইয়া, বর্ত্তমান যুগে তাহা প্রকৃতরূপেই দাসীত্বে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক যুগে বহুসংখ্যক বাঙ্গালা উপন্যাস ও নাটকাদির চিত্রে স্বামীর এক মাত্র প্রেম সাধনের চেষ্টাতেই সতীত্বের চরম বিকাশ দেখিতে পাই। এই সকল অপূর্ব্ব কাব্যের অপূর্ব্ব চিত্রজ্ঞ শিল্পীরা জগতে প্রকাশ করিতে চান যে, কেবলমাত্র স্বামীর প্রেম সাধনের চেষ্টাতেই হিন্দু নারীর সতীধর্ম্মের চরম পরিচয়। ইহারা এই কথাটাই লোককে বুঝাইতে ইচ্ছুক যে, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার সুখের জন্য—তা সে সুখ যতই আপাত মনোরম যতই জঘন্য হউক না কেন—যে নারী অম্লানবদনে আত্মসুখবিসর্জ্জন করিতে পারিল, সেই নারীই সতীকুলের বরণীয়া। এই আদর্শ নিরবচ্ছিন্ন দাসীত্বের আদর্শ। কিন্তু এখনি কথা হইতেছে এই যে, এই আদর্শ যদি আর্য্যনারীর বা আর্য্য সাহিত্যের আদর্শ না হয়, তবে এ আদর্শ কোথা হইতে? ইহাত প্রতীচ্য জগতের আদর্শ নয়।

ইহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে,

এই আদর্শ প্রাচ্য জগতেরই বিকৃত আদর্শ। এ কথা অসত্য নহে যে, আর্য্য সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী একদিন সমগ্র পৃথিবীর শিরোদেশে উড্ডীয়মান হইয়া তাহার অখণ্ড প্রতাপের অতুল মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে পৃথিবীর গুরুতর আসন তখন ভারতেরই একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের তপঃপরায়ণ পূতাত্মা আর্য্য ঋষির অপূর্ব্ব ধীশক্তি হইতে যে জ্ঞানের প্রতিভা রাশি বিকীর্ণ হইত, এবং ক্ষত্রিয় রাজার বাহুবল হইতে যে অভাবনীয় ক্ষাত্রতেজ নিঃসৃত হইত সেই একীভূত বিরাট শক্তি জগৎকে একদিন বিস্ময়স্তম্ভিত করিয়াছিল। তখনকার সেই ভারতবর্ষ হইতে সেই জ্ঞান কর্ম্মের, ভক্তিপ্রীতির সাধনাক্ষেত্র হইতে, নারী শক্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টাও করা হয় নাই। তাঁহাদের শক্তিবিকাশের সংস্র ক্ষেত্রকে তখন উন্মুক্ত করিয়াই রাখা হইয়াছিল। এইজন্যই আর্য্য নারী তখন যে, শুধু আর্য্যের গৃহক্ষেত্রকেই অতুল মহিমায় উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্রকেও অপূর্ব্ব প্রভাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু হিন্দু-সভ্যতার এই গৌরব-রশ্মি বহুদিন ধরিয়া সমভাবে প্রভা বিকিরণ করিতে পারে নাই। নানা ম্লেচ্ছ-জাতির সংস্পর্শে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক প্রাতকূলতায় সে মহারশ্মি ক্রমে ক্রমে ম্লানপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল। ক্রমে আলস্য, অবসাদ ও বিলাসিতায় আর্য্যগণ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তখন উন্নতি অপেক্ষা লোকে শান্তি ও সন্তোষেরই অধিক প্রার্থী হইয়া উঠিল। সমাজের মুকুটমণিস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ কালপ্রভাবে স্বার্থপর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় আর তীব্র রহিল না। আত্মপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহৎ অংশের আশ্রয় হইতে সাধারণ জনদিগকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া ফেলিলেন। শাস্ত্রানুশাসনের নানাবিধ জটিল বন্ধনের দ্বারা জনসাধারণকে নিজেদের চরণতলে এরূপভাবে বাঁধিয়া ফেলিলেন যে আপনাদের গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার সুযোগ ও প্রবৃত্তিমাত্রও তাঁহাদের রহিল না।

এই সময় হইতে ভারতের প্রকৃত অবনতির সূত্রপাত! ভারতের আর্য্য নারীও এই সময় হইতে তাঁহাদের মর্য্যাদার আসন হইতে বিচ্যুত হইলেন। বেদাদি উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার সংরুদ্ধ হইল এবং উন্নত ধর্ম্মজীবনের যে একটি সূক্ষ্ম যোগবন্ধন ছিল, তাহা উপেক্ষিত হইয়া স্বামীর সেবাধর্ম্মই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি ও বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া, পুরুষগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, স্বামী যেমন চরিত্রেরই হউন; স্ত্রী তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিবে। তিনি পানাসক্ত ব্যভিচারী হউন, নরহন্তা দস্যু হউন, স্ত্রীকে তিনি যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দিন, প্রহারের উপর প্রহার করুন, তবুও স্ত্রী যদি তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবে, মনে মনেও যদি তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য নিন্দা করে তবে পরকালে অনন্ত নরক ভোগ ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই?

নারীজাতিকে এই শোচনীয় দাসীত্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত কেবলমাত্র স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয় দেখাইয়াই তাঁহারা লেখনী সংযত করেন নাই। এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্ত পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহারা বহুসংখ্যক অদ্ভুত পৌরাণিক আখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বহুস্থলে প্রাচীন সাহিত্যেতিহাসের সতীধর্ম্মের বহু আদর্শ চিত্রের উপর এই নবীন আদর্শের স্তর নির্ম্মাণ করিয়া সে সকলকে একেবারে বিকৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর ভারতে মুসলমান অধিকারের পর এই সকল বিকৃত আদর্শের অনুকরণে যে সকল আখ্যান, সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আরও বিকৃত।

আধুনিক বহুসংখ্যক বাঙ্গালা নাটক ও উপন্যাসে হিন্দুনারীর আদর্শরূপে সৃষ্ট যে সকল নারী চরিত্রের চিত্র আমরা দেখিতে পাই, এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালা মণ্ডিত, রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র দৃশ্যপটের মধ্যে, যে সকল চিত্রের অভিনয় দর্শনে, অসংপ্রাপ্ত শ্মশ্রুবর্ণা যুবক বৃন্দ বিস্ময়ে স্তম্ভিত এবং পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন, সে সকল চিত্র, পরম্পরাক্রমে উপরোক্ত পৌরাণিক আখ্যানের ও তদনুকারী অন্যান্য আখ্যান সাহিত্যের আদর্শ চিত্রের অনুকরণেই সৃষ্ট।

বলা বাহুল্য সাহিত্যে নারীজাতির এই একান্ত স্বাতন্ত্র্য মাত্র বর্জ্জিত আদর্শ, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না; এবং সমাজেরও তাহাতে মঙ্গল হয় না। নিজে ভক্তির যোগ্য না হইয়া স্ত্রীর কাছে ভক্তি পাইবার যে চেষ্টা, সাহিত্যে এই প্রকারের আদর্শ-চিত্র অঙ্কন সামাজিক কৌশল মাত্র। কিন্তু আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত ইহাতে আমাদের লাভ কি! ইহাতে যেমন নিজেদের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়, তেমনি নারীগণকেও ক্ষুদ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়।

ফলতঃ নারীর নিকট হইতে ভক্তি যদি আমরা পাইতে চাই, তবে, সর্ব্বাগ্রে সেই ভক্তির যোগ্য আমাদিগকে হইতে হইবে। এবং নারীও যাহাতে মহত্ত্ব চেনে তজ্জন্য তাহাদের তদুপযোগী চিত্তবিকাশের উপায় করিতে হইবে। নারীকে দাসী মনে করিয়া কেবল মাত্র তাহাকে দাসীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলে চলিবে না। কারণ বস্তুতঃ নারী দাসী নহে।

নারী দাসী নহে, কিন্তু এ কথায় এমন বুঝাইতেছে না যে নারী পুরুষের সেবাধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। সেবা আমরা নারীর নিকট হইতেই চাই। কারণ সেবায় স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিদান করিতে নারী ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তিই যদি এই সেবাধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তবে আমরা সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইব কাহার অবলম্বনে। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী যেমন দাসীর ন্যায় সেবা করিবেন, সেইরূপ আমাদের সামাজিক জীবনেও তিনি সখার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায়, উপদেষ্টার ন্যায়, আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে অটল রাখিতে চেষ্টা করিবেন। এ বিঘ্ন সঙ্কুল সংসারে মানুষ সকল সময়ে লক্ষ্যের পথ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না। এইরূপে পুরুষের লক্ষ্যচ্যুতির সম্ভাবনা যখন প্রবল হইবে, স্ত্রী তখন আত্ম-শক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আত্মজ্ঞান ও সংযমের মধ্যে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবেন। ইহাই সহধর্ম্মিণীর কাজ। সুতরাং স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে।

কিন্তু সহধর্ম্মিণী হইতে গেলে নারীকে সর্ব্বদা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সচেতন হইয়া থাকিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে সর্ব্বদা জাগ্রৎ করিয়া না রাখিলে তাঁহার চলিবে না। যে স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাসের মধ্যে নিজের বিশ্বাস এবং স্বামীর জ্ঞানের মধ্যে নিজের জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন অথবা যাঁহার স্বতন্ত্র জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিকাশই হয় নাই, তিনি স্বামীর প্রেয় সাধন করিতে পারেন কিন্তু স্বামীর অধঃপতনের প্রাক্কালে তাঁহার বিবেকবুদ্ধিতে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন না, তাঁহার শ্রেয় সাধনের পথ তিনি দেখিতেই পান না। এরূপ পত্নী অন্ধভক্তিমতী বা সঙ্কীর্ণ গভীর প্রেমিকা হইতে পারেন কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না। যিনি সহধর্ম্মিণী হইবেন, স্বামীর উপর তাঁহার গভীর প্রেম থাকিবে বটে কিন্তু সেই প্রেমের মধ্যে তাঁহার অন্য সকল বৃত্তির সমাধি হইয়া যাইবে না।

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর্শ পত্নী-চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই যে, এই সহধর্ম্মিণী আঁকিবার চেষ্টা করেন নাই, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। বটতলার উপন্যাস লেখক হইতে সুবিখ্যাত বহুসংখ্যক উপন্যাস লেখক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই দাসীর আদর্শ আঁকিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল এই লেখকগণই দোষী তাহা নহে, ইহাতে সাধারণ পাঠক সমাজেরও দোষের সীমা নাই। তাঁহাদের মানব চরিত্রজ্ঞান ও কাব্যরসজ্ঞতার এমন নিদারুণ অধঃপতন না ঘটিলে এই সকল উপন্যাসের এমন প্রচারবাহুল্য কদাপি ঘটিতে পারিত না।

কিন্তু উন্নত সাহিত্যের দ্বারাও আমরা ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু লাভবান হইতে পারিব না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার উচ্চশিক্ষা হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত করিয়া রাখিব। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা এবং সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া মানব জাতির একটা চিরন্তন আদর্শকে আকার দেওয়াই যখন উন্নত সাহিত্যের একমাত্র কাজ, তখন এটা বোধ হয় কাহাকেও কষ্ট পাইয়া বুঝিতে হইবে না যে, সাহিত্যের সৃষ্টি তখনই সার্থক হয় যখন পুরুষ ও নারী উভয়েই তাহার আদর্শের অনুসরণ এবং তাহার রসে তৃপ্তি ও শক্তিলাভ করে।

সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য প্রচারকে যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে চাই তবে তাহার উন্নত শিক্ষা হইতে নারীগণকে বঞ্চিত রাখিতে পারি না।

শুধু সাহিত্যের শিক্ষা বলিয়া নহে, প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতেই নারীগণকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস গণিত কোন বিষয়ের শিক্ষাতেই তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। অবশ্য আজকাল এ দেশের কতক লোকের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে; এবং কতকগুলি স্ত্রীলোকও যে, উচ্চশিক্ষা না পাইতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র হিন্দুনারীর তুলনায় তাঁহাদের পরিমাণ, সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ সদৃশ। সাধারণ হিন্দুসমাজ নারীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট। এ নিশ্চেষ্টতার কারণ নারীর পক্ষে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞানের অভাব। সাধারণ-হিন্দুগণের বিশ্বাস, নারী সাধারণতঃ

শক্তিহীন, সে কেবল পতিপুত্রের সেবা করিবে, গৃহস্থালীর কার্য্য করিবে, উচ্চশিক্ষার তাহার আবশ্যকতা কি! যে দাসী, উচ্চ দর্শন সাহিত্য শিখিয়া সে কি করিবে! ইহাতে তাহার স্বধর্ম্ম-পালনের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই!

তাই আমাদের পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে নারীর জীবন দাসীর জীবন নহে, প্রাচীন হিন্দু সমাজে আর্য্যনারী দাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহধর্ম্মিণী; আমরাও চাই সহধর্ম্মিণী। অন্ধকারনিশায় মহৎধর্ম্ম-মন্দিরের প্রোজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকাধারিণী পথ প্রদর্শিকা সহচরী আমরা চাই; স্বামীর ধর্ম্ম ধর্ম্মে চির অবিকৃত চিত্তা, তাহাতে চির উপেক্ষাশালিনী আত্মগৌরব জ্ঞানশূন্যা, একান্ত অন্ধভক্তিমতী সেবিকা আমরা চাই না। যিনি দাসীমাত্র, কোনও প্রকার উচ্চশিক্ষার তাঁহার প্রয়োজন না থাকিলেও না থাকিতে পারে; কিন্তু যিনি সহধর্ম্মিণী, স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যের যিনি সহায়, শিক্ষাব্যতীত তাঁহার স্বধর্ম্ম পালনের উপায়ান্তর নাই। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ব্যতীত যখন আমরা কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পরিবারিক বা সামাজিক জীবনে পূর্ণরূপে শ্রেয় লাভ করিতে পারিব না, এবং যখন সমাজমধ্যে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ভিন্ন যথার্থ সহধর্ম্মিণী লাভ করিবার আমাদের আশা নাই, তখন পুরুষগণেরই ন্যায়, স্ত্রীলোকগণেরও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই হইবে। কারণ বর্ত্তমান যুগের এই উত্তিষ্ঠমান জগতে জড়তা অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। আমাদিগকে উঠিতেই হইবে, চলিতেই হইবে।

শ্রীসুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

বালির গৃহ।

সকাল বেলা করছে খেলা
　ভাই বোনে ঐ নদীর চরে;
সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণ কিরীট
　জ্বলছে তা'দের মাথার পরে।

ধূসর রঙের বালির রাশি—
　অরুণ করে সোনার ভার;
দৃষ্টি কভু পায় না নাগাল্—
　কূল কিনারা কোথায় তার!

স্বচ্ছ শীতল ছুটছে সলিল
　হীরক চূর্ণ বুকে ল'য়ে;
দুই পাশে তা'র ঝুরু ঝুরু
　খস্‌ছে বালি ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

ভাই বোনে সেই বালির উপর
　জলের ধারে খেলে বেড়ায়;
সিক্ত সমীর এসে তাদের
　রক্ত কপোল চুমিয়ে যায়।

ওপারে ওই শালের বনে
　প্রভাত পাখীর মধুর স্বর
বীণার তানে আস্‌ছে ভেসে
　শ্রবণ-মানস মোহকর।

গড়ছে তা'রা বালির গৃহ
　ভাঙ্গন ধরা নদীর চরে;
ভাঙ্‌ছে যত, নাই নিরাশা,
　গড়্‌ছে তত যত্ন ভরে।

হয়ত ক্বচিৎ হচ্ছে স্থায়ী
যত্নে গড়া বালির ঘর;—
কুন্দনিভ মুখ দু'খানি
হাসির প্রভায় উজলতর।

একটু জোরে বইল বাতাস—
খসে পড়ল বালির ভার;
সাধের গৃহ গেল ভেঙ্গে
কষ্ট কেবল হ'ল সার।

মর্ম্মে বড়ই ব্যাকুল ব্যথা;
চেষ্টা তবু অবিশ্রাম;
ননির মত কোমল গায়ে
ঝর্ ঝরিয়ে ঝর্ছে ঘাম।

শেষে যখন রক্ত রবি
শেষ আকাশে বর্ষে কর;—
অসম্পূর্ণ গৃহ ফেলে
ফিরল তা'রা আপন ঘর।

রইল পড়ে বালির গৃহ
অনন্ত সেই নদীর চরে;
বর্ষা এসে মুছিয়ে দিবে
চিহ্নটা তা'র দু'দিন পরে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(৭)

আশ্বিন মাসের প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, বারান্তরে জগদীশনাথ রায়ের জীবনের কয়েকটি গল্প বলিব। অতঃপর, সেই চেষ্টাই করিতেছি।

যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি জগদীশনাথ তখন, উড়িষ্যায় ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। নর্ম্ম্যাল্ সাহেব সেখানকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব ডিঃ সিনিয়র জজ। এই ম্যাক্‌ফার্সন, পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন।

শোভান্ সিংহ নামক এক ব্যক্তি, সেখানকার পুলিশে কাজ করিত। শোভান সিংহ, কোন্ দেশীয় লোক ছিল, আমার তা ঠিক স্মরণ নাই—কিন্তু দেখিতে সে অতি সুপুরুষ ছিল। গৌরবর্ণ, শোভন মুখ-শ্রী, দীর্ঘ বপু এবং বীরোচিত গাম্ভীর্য্যে সে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ ছিল।

এই শোভান সিংহকে লইয়া হঠাৎ এমন একটা ঘটনা হইল—যাহা উপন্যাসের মত বিচিত্র। মীন-কেতনের গতি, সর্ব্বত্র অনাহত। তাই চৌকিদারীর কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রেও, বেচারা শোভান সিংহ এক দুষ্টানারীর প্রেমজালে বাঁধা পড়িল। জগদীশনাথ, যে বাংলোয় নিশাযাপন করিতেন, শোভান সিংহও রাত্রিতে তাহার ভিতরে থাকিত। বাংলোর বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী, পাহারা দিত। কিন্তু শোভান সিংহ, প্রায়ই প্রহরীর চোখে ধুলা দিয়া পূর্ব্বকথিতা বনিতার আলয়ে গমন করিত।

এমনি কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে শোভান সিংহের প্রাণরঙ্গিনী, দ্বিতীয় এক নায়কের সন্ধান পাইল। এমন অবস্থায়, শোভান সিংহ কখনও আনন্দিত হইতে পারে না। অতএব, সে উক্ত রমণীকে নানা প্রকারে বুঝাইল। কিন্তু পণে ধর্ম্মবিক্রয় যাহার ব্যবসায়, তাহার কাছে কথার দাম কোথায়? রমণী

'বোঝ্' মানিল না। তখন বিয়োগান্ত দৃশ্যে এই প্রণয় বিপ্লবের অবসান সূচিত হইল।" এক রাত্রিতে রমণীর দ্বিতীয় প্রণয়ী হঠাৎ শোভান সিংহের সম্মুখে পড়িয়া গেল। উদ্দীপ্তক্রোধ শোভান সিংহ, তৎক্ষণাৎ উলঙ্গ করবাল উদ্যত করিল এবং চকিতের মধ্যে সেই হতভাগ্যের প্রাণ দেহ কারা ত্যাগ করিল। হত্যাকারী শোভান সিংহ, তাহার পর সকলের অগোচরে আবার আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরদিন এই হত্যাকাণ্ড লইয়া চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শোভান সিংহ সকলের অলক্ষিতে রমণীর নিকটে যাইত বটে, কিন্তু তাহার প্রণয়কাহিনী অনেকেই জানিত। সুতরাং তাহার উপরেই সন্দেহ হইতে বিলম্ব হইল না। ভোরবেলা শোভান সিংহ প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; এমন সময়ে প্রহরীরা আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইল। শোভান সিংহ, সিংহেরই মত গর্জ্জন করিয়া বলিল "খবর্দ্দার! তোরা কেউ আমার কাছে আসিস্ না! আমি স্বীকার কর্‌চি, খুন করেচি আমিই!" বলিয়াই সে তরবারি খুলিয়া, সেখানে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং এক একবার সম্মুখস্থ গাছের উপরে তরবারি দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। প্রহরীরাও সকলে সশস্ত্র ছিল। গোলমাল শুনিয়া আরও অনেকে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু শোভান সিংহের সেই উন্নত ও রোষদীপ্ত দীর্ঘদেহ দেখিয়া, অতগুলি অস্ত্রধারী লোকের ভিতরে কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাহাকে গিয়া বন্দী করে। সকলে কেবল, শোভান সিংহের, চারিদিকে দূর হইতে, ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

জগদীশ নাথ, তখন চা পানের পরে বাংলোয় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, "শোভান্ সিংহ খুন ক'রে পাগল হয়ে গেছে। কেউ তাকে ধর্ত্তে পারছে না।" শুনিবামাত্র, জগদীশনাথ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তদ্দণ্ডে ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিয়া রাখি, তিনি নিরস্ত্র। তাঁহাকে দেখিয়া ভিড় সরিয়া গেল। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই শোভান সিংহ উন্মত্ত। সে তেমনি ভাবেই সদর্পে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে,—তরবারি আস্ফালন করিতেছে! কাহার সাধ্য তার কাছে গিয়া দাঁড়ায়!

কিন্তু জগদীশনাথ একবারও দাঁড়াইলেন না—তিনি বরাবর চলিয়া গিয়া একেবারে শোভান সিংহের সম্মুখে দাড়াইলেন। পূর্ব্ব-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি, তাঁহার দৃষ্টি সাতিশয় তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী ছিল—সে দৃষ্টির সম্মুখে কেহ মুখ তুলিতে পারিত না। তাঁহার সেই অন্তর্ভেদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি শোভান সিংহের দিকে প্রসারিত করিয়া গম্ভীরস্বরে আজ্ঞা দিলেন, "তরোয়াল ফেল্!"

শোভান সিংহ, একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল এবং কুঞ্চিতফণ সর্পবৎ অবনত হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে সেলাম করিল, ও অস্ত্র ফেলিয়া দিল।

বিচারে, হতভাগ্য শোভান সিংহের প্রাণদণ্ড হয়। মরণকালেও বেচারার রূপের ঘোর কাটে নাই। ফাঁসির আগে তাকে

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার কি প্রার্থনা আছে, তখন সে সেই রমণীর উদ্দেশে বলিয়াছিল, "যখন সে আমার কাছে এসে বস্‌ত, তখন তার দুকাণে দুটি দুল্‌ দুলে দুলে উঠ্‌ত—সেই দুলপরা মুখ দেখ্‌লে আমি সব ভুলে যেতাম। আমি আর একবার ওকে দেখ্‌তে চাই।"

আর একদিনের ঘটনা বলি। ঘটনাটি, মেদিনীপুরে ঘটিয়াছিল। এই জেলার ময়না নামক স্থানের রাজা ছিলেন তখন—শ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র। জগদীশনাথের, সঙ্গে, রাজা, একবার তমলুকের দিকে শিকারে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার মহীন্দ্রনাথ মল্লিক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন।

তাঁহারা সকলে অনেকখানি পথ ঘুরিয়া একটী ঝোপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ, অতর্কিতভাবে একটী ভীষণ বন্য বরাহ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

বরাহের সেই বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিকারীদের চক্ষুস্থির! কেহ পলায়নে দক্ষতা দেখাইলেন, কেহ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর অন্য বুদ্ধি জুটিল না,—তিনি চট্‌ করিয়া বন্দুক ফেলিয়া দিয়া নিকটস্থ একটী গাছের ডালে চড়িয়া বসিলেন। সকলে যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, জগদীশনাথ তখন অটলভাবে দাঁড়াইয়া বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করিতেছেন। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যে বরাহ পলকের ভিতরেই আহত হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

বিষাক্ত সাপের কবল হইতে জগদীশনাথ একবার আশ্চর্য্যরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। বসিরহাটে রাজকর্ম্মোপলক্ষে একবার তিনি পুলিশ-বোটে করিয়া যাইতে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন, মেজর পার্সন। বোটের ভিতরে বসিয়া, জগদীশনাথ স্নান করিতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে, মেজর পার্সন বোটের ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটী বৃহৎ গোখুরা সাপ, জগদীশনাথের পিছনে ফণা তুলিয়াছে। সাহেব, তখনি আপনার বুট দিয়া সাপের ফণা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

জগদীশনাথ, এক রাত্রিতে যানে আরোহণ করিয়া নোয়াখালি হইতে সদরে আসিতে ছিলেন। পথের মাঝখানে হঠাৎ এক জেলখালাস কয়েদী তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু জগদীশনাথ, তাহাকে এক ধমকেই ম্রিয়মাণ করিয়া দেন। তাঁহার উপরে উক্ত কয়েদীর আক্রোশ ছিল। তাই সে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পুলিশের কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, জগদীশনাথ লোকচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখিয়াই বুঝিলেন, এ মন্ত্রমুগ্ধ সর্প, অভ্যাসবশতঃ ফোঁস্‌ করে বটে, কিন্তু দংশন করিবে না। তিনি তাহাকে আপনার যানে বসাইয়া বাসায় লইয়া গেলেন। এবং নিজেরই আর্দ্দালির কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। বলিয়া রাখি, পরে এই ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে চিরকাল তাঁর শরণাগত ছিল।

জগদীশনাথ যে কাজ করিতেন—তাহাতে নির্দ্দিষ্ট মাহিনা ছাড়া উপরি রোজগারের সুযোগযথেষ্ট ছিল। সেকালে, পুলিশের একজন সামান্য দারোগাও যে রকম উপরি লাভ

করিত, একালের বেশ মোটা মাহিনার উচ্চ কর্ম্মচারীর কাছেও তাহা লোভনীয়। কিন্তু জগদীশনাথ ভিন্ন ধাতুর লোক ছিলেন। একটী ঘটনায় আমরা তার প্রমাণ পাই। একবার কোন ধনী ব্যবসায়ী বিপাকে প'ড়য়া তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে। জগদীশনাথের স্বজাতীয় ও তৎকর্তৃক পালিত কোন ব্যক্তি, এই সংবাদ লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। সমস্ত শুনিয়া, জগদীশনাথ সংবাদদাতাকে কহিলেন, "কেন বাপু, তার চেয়ে আমরা আর এক কাজ করি না কেন! এস, তুমি আমি ডাকাত হই; হয়ে, লোকের ঘরবাড়ী লুট করি,—তা হলে ত' আমরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে পড়তে পার্ব্ব।"

প্রস্তাবকারী, অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

বাস্তবিক পুলিশের কাজে, এইরূপ সাধু-প্রকৃতিরই দরকার। কারণ, লোকের ধন-প্রাণ তাঁহাদের হাতে। রাজকর্ম্মের দুর্লভ অবসরে, জগদীশনাথ মুক্তপ্রাণে আনন্দোৎসবে মাতিতেন। এক একদিন তাঁহার কলিকাতার ভবনে তাৎকালিক বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাগম হইত। তন্মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ দেব, দ্বারকানাথ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিও থাকিতেন। জগদীশনাথ গান ধরিতেন, দ্বারকানাথ মিত্র তব্‌লা বাজাইতেন এবং ডাঃ জগবন্ধু বসু এম ডি মহাশয়, স্ত্রীলোক সাজিয়া, কোমরে চাদর বাঁধিয়া, অপূর্ব্ববেশে নৃত্য করিতেন। এই প্রমোদতরঙ্গে ভাসিয়া, সকলেই যেন শিশুরই মতন সরল হইয়া পড়িতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, বেশভূষায় খুব যে জমকালো ছিলেন, তা নয়। তিনি সাদাসিধা ভাষার* যেমন পক্ষপাতী ছিলেন—বেশভূষাতেও তেমনি। একবার তিনি কলেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ জগদীশনাথের সামনে পড়িয়া গেলেন। জগদীশ দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার চুলগুলি এলোমেলো। দেখিয়া, বলিলেন, "বঙ্কিম, এরকম উস্কোখুস্কো চুলে কলেক্টরের কাছে যেওনা; মাথাটা একবার আঁচ্‌ড়ে নাও।"

"হ্যাঁ, ঠিক্ কথা।" বলিয়া বঙ্কিম তখন আর্সি-চিরুণি লইয়া কেশ-প্রসাধনে মনোযোগী হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, সকল বিষয়েই যেমন সাদাসিধা, তেমনি চিন্তাশীলও ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীলতা বাল্যকাল হইতে। এখানে, তাঁহার একটী অভ্যাসের কথা বলিলে, আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে পারিব।

বঙ্কিমচন্দ্র, ঢালা-বিছানায় শুইয়া ডানহাতে

---

* বঙ্কিমচন্দ্র, সরল ভাষার কতটা পক্ষপাতী ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা জানা যায়। একবার তাঁহারা কোন বাজারের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। সেই সময়ে কেহ তাঁহাকে বাজারের বর্ণনা করিতে বলেন। সকলে যখন আশা করিতেছিলেন, শ্রেণীবদ্ধ বিপণি দেখিয়া বঙ্কিম গুরুগম্ভীর ভাষায় কিছু বলিবেন, তখন সোজা কথায় বর্ণনা করিলেন, "সারি সারি দোকান।" এই সরলতার প্রসঙ্গে, বঙ্কিম, জগদীশনাথকে কোন পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন:

"ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—সরলতা'। অনেক কষ্টের পরে, আমি সরলতাকে পাইয়াছি।"

মস্তকরক্ষা করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া চা দিয়া গেল। বঙ্কিম, মাঝে মাঝে চা পান করিয়া আবার পুঁথিতে মন দিতেছেন। ক্রমে তাঁহার পাঠ-তন্ময়তা এতদূর বাড়িয়া উঠিল, যে হাতের পেয়ালা হইতে চা পড়িয়া গিয়া বিছানা ভাসিয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তখন তাঁহার লক্ষ্য নাই—তিনি তখন ধ্যানের রাজ্যে। এমন সময়ে, হয়ত' অন্য কেহ আসিয়া বলিলেন, "এ কি, চা পড়ে যে সব নষ্ট হচ্চে!" তখন, বঙ্কিমের চৈতন্য হইত। শুনিয়াছি ইহা একদিনের ঘটনা নয়—এমনি ধারা ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া যাইত।

কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই নাকি বঙ্কিমকে চা ধরাইয়াছিলেন। গুপ্তকবি, তখন মাঝে মাঝে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন।

আমরা, এইখানেই আমাদের কথা সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু এখনও আমাদের অনেক বক্তব্য রহিল; ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রবন্ধে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।†

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সুন্দর।

তোমরা, তোরে কুরূপ বলে? হলেই বা তুই কালো,
তোর রূপেতে সুন্দরেরই পূজার দেউল আলো।
সুন্দরেরই পূজার লাগি;
ফুলের বনে আছিস্ জাগি',
বাহির দেখে কে বোঝে তোর? সুন্দর তুই প্রাণে।
রূপের ভোগে মধুর যাহা
পানটি করিস্ নিত্য তাহা,
ঢালিস্ পুনঃ রসধারায় গুঞ্জনে আর গানে।
হলেই বা তুই কালো,—
সুন্দর তুই; সুন্দরেরে বাসিস্ যে রে ভালো।

ও কালো মেঘ, সুন্দর তুই যদিও তুই কালো,
বুক ভরে' তুই ফুটাস্ যে রে সুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্র-ধনুর স্বপন দেখিস্,
চন্দ্র রেণু গায়ে মাখিস্।
সুরূপ শিখী নেচে উঠে প্রেমের পরশনে,
সুন্দরেরে বার্ত্তা কহিস্
রূপের হাটে পশরা বহিস্,
অধরে তোর সুধার ধারা বর্ষিবে আর বনে।
কে বলে তোর কালো?
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্ যে রে ভালো।

† এই প্রবন্ধ রচনা করিতে, আমি বঙ্কিম-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় ও কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সাহায্য পাইয়াছি। আংশিকভাবে আরও অনেকে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩

ওরে গভীর কালো দীঘি, হলিই বা তুই কালো,
তোর বুকেতে উঠ্‌লো ফুটে সবার রূপের আলো।
রূপের মোহে মরাল ছুটে,
রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
চন্দ্র তারা,—সব সুষমা আঁকয়ে তোরে ধরে,
রূপসীরা স্নানের ছলে,
নোয়ায় মাথা তোর ও জলে।
রূপটি তাদের আপন রূপে দিস্‌ রে উজল করে'।
কে বলে তোয় কালো?
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাস্‌তে পারিস্‌ ভালো।

ওরে আঁখি কালো বরণ, যদিও তুই কালো,
জগতে তুই ফুটিয়ে দিলি সবার রূপের আলো।
রূপে রে তুই দিলি জীবন,
রূপের বুকে তোর যে ভবন,
সব সুষমা লুটিয়ে পড়ে তোর ও পায়ের কাছে।
রূপসায়রে নিত্যস্নানে,
মুদে থাকিস্‌ রূপের ধ্যানে,
রূপ সে তো'র ও মর্ম্মস্থানে, তোর মাঝে কি আছে
যদিও তুই কালো,
সুন্দর তুই. সুন্দরে তুই বাসিস্‌ যে রে ভালো।

শ্রীকালিদাস রায়

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সেই ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, একরাত্রি বাক্যব্যয় না করিয়া অতিবাহিত করা ত সামান্য ব্যাপার।" এই উত্তরে প্রীত হইয়া প্রভু একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। উপবিষ্ট হইয়া তিনি রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি সমাগত হইলে, উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রভু তাঁহার মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন এবং বীরপুরুষ হস্তে তীক্ষধার তরবারিসহ দণ্ডায়মান রহিলেন। অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বীরপুরুষ একটী অস্ফুট ধ্বনি করাতে, তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে অগ্নি পতিত হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে ধূম ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রভু নিমেষ মধ্যে বীরপুরুষকে লইয়া হ্রদমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ দিয়াছিলাম; কি জন্য তুমি চীৎকার করিলে?"

বীরপুরুষ উত্তর করিল "আপনার আদেশে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কোন উপদ্রব হয় নাই। দ্বিপ্রহরে আমার বোধ হইল যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি আমার পূর্ব্বতন প্রভু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইলেও আমি বাক্যব্যয় করি নাই। পরে, আর এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ক্রোধে আমাকে বধ করিল এবং আমি আমার মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিলাম। আমি নিজেকে মৃত বোধ করিলাম এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে আমি জন্মজন্মান্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিব স্থির করিলাম। পরে আমি দেখিলাম যে আমি দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মলাভ করিব এবং জন্মগ্রহণও করিলাম! যদিও, গর্ভমধ্যে যথেষ্ট ক্লেশভোগ করিতেছিলাম, তত্রাপি আমি কোনরূপ বাক্যব্যয় করি নাই। কিছুদিন পরে, আমি বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিলাম; মাতাপিতার মৃত্যু হইল এবং আমি একটী সন্তানলাভ করিলাম। প্রত্যহ আমি আপনার অপার করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া—মৌনাবলম্বন করিয়া

থাকিতাম। আমার আত্মীয় কুটুম্ববর্গ এই দুঃখে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিত। ৬০ বৎসরের অধিক কাল আমি জীবিত ছিলাম। অবশেষে আমার স্ত্রী আমাকে বলিল যে, তুমি অবশ্য কথা কহিবে, অন্যথা আমি তোমার পুত্রকে বধ করিব। "তখন আমার মনে হইল যে এই পুত্র মৃত হইলে, আমি আর পুত্র লাভ করিতে পারিবনা, কেন না আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়াছি।" আমার স্ত্রীকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই আমি এইরূপ চীৎকার করিয়াছি।

প্রভু উত্তর করিলেন "সকলই আমার দোষ; ইহা পিশাচেরই মোহ।" বীরপুরুষ কার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই, এই চিন্তায় বিরক্ত হইয়া ক্রমে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি অগ্নিদাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন বলিয়া এই হ্রদের পূর্ব্বোক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে এবং যেহেতু কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সেই জন্য ইহাকে "বীর-পুরুষের হ্রদও বলে।"

এই হ্রদের পশ্চিমে একটী স্তূপ আছে। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে এই স্থানেই নিজ শরীর দাহ করিয়াছিলেন। কল্পারম্ভে, এই নিবিড় অরণ্যে একটী শৃগাল, একটী শশক ও একটী বানর বন্ধুভাবে বাস করিত। এই সময়ে যাঁহারা বোধিসত্ত্বের ন্যায় জীবনাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ জন্য বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া দেবতাধিপতি শক্র, ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ঐ তিনটী জন্তুকে নিম্নলিখিত ভাবে সম্বোধন করিলেন "বৎসগণ। তোমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে এবং নির্ভয়ে বাস করিতেছ ত?" তাহারা উত্তর করিল "আমরা তৃণের উপর শয়ন করি, নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করি এবং যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, তত্রাপি আমরা একমত হইয়া সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছি।" বৃদ্ধ বলিলেন "বৎসগণ। তোমরা সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছ জানিতে পারিয়া, আমি আমার বার্দ্ধক্য বিস্মৃত হইয়া তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, এখন কি আহার করিব?" তাহারা উত্তর করিল "কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমরা আহার অন্বেষণে বহির্গত হইতেছি।" এই বলিয়া তাহারা একাগ্রচিত্তে চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধের জন্য আহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শৃগাল নদীগর্ভে অন্বেষণ করিয়া জীবন্ত কর্কট আনয়ন করিল। বানর বনমধ্যে নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল সংগ্রহ করিল, কেবল শশকই বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করিল। বৃদ্ধ শশককে বলিলেন "আমার বোধ হইতেছে, শৃগাল ও বানরের সহিত তুমি একমত নও; ইহারা আমার সুখোৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তুমি শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করিয়াছ।" শশক এই কথা শ্রবণ করিয়া শৃগাল ও বানরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমরা কাষ্ঠসংগ্রহ কর; তাহা হইলে আমি কিছু করিতে পারিব।" শৃগাল ও বানর কাষ্ঠ আনিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলে, শশক বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; আপনার আহার সংগ্রহ আমার পক্ষে অসম্ভব কিন্তু আমার দেহ আপনার খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।" এই বলিয়া শশক প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিল। তখন, বৃদ্ধ স্বদেহ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক অস্থি সংগ্রহ করিয়া শৃগাল ও বানরকে কাতর স্বরে নিবেদন করিলেন; আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি; পশ্চাৎ শশকের এই ত্যাগ স্বীকারের কথা যাহাতে সকলে বিস্মৃত না হয়, এইজন্য আমি চন্দ্রের চক্র-মধ্যে উহাকে স্থাপনা করিব।" এই জন্যই সকলে বলিয়া থাকেন যে চন্দ্রে শশক আছেন। পরে, জনসাধারণ এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।

এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং আন্দাজ ৩০০ শত লি যাইয়া আমরা চেন-চু রাজ্যে পৌঁছি।

চেন্-চু (গাজীপুর)

এই রাজ্যের পরিধি প্রায় দ্বিসহস্র লি; গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজধানীর পরিধি ১০ লি। অধিবাসীরা ধনবান ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; নগর ও গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। ভূমি উর্ব্বরা এবং রীতিমত কর্ষিত হয়। জলবায়ু মনোরম ও নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসীরা সাধু

ও পবিত্রচেতা। দেশে বিধর্মী ও সত্যধর্ম্মাবলম্বী উভয় প্রকার লোকই আছে। দশটী সঙ্ঘারামে হীনযান মতাবলম্বী প্রায় এক সহস্র যতি আছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বিধর্ম্মীগণের দশটী দেব মন্দির আছে।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম কোণে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপ যে, এইস্থানে তথাগতের শরীরের অংশবিশেষ রক্ষিত আছে। পুরাকালে যখন পৃথিবীপতি এই স্থানে বাস করিতেন, তখন দেবতাদিগের প্রীত্যর্থে তিনি সাত দিবস ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী অপর তিন জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটেই মৈত্রেয় বোধিসত্বের মূর্ত্তি; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার অপার ঐশ্বরিক ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য্যরূপে মধ্যে মধ্যে প্রকটিত হয়।

রাজধানী হইতে প্রায় দুই শত লি পূর্ব্বে যাইয়া, আমরা ওপিটোকিলানা (অবিদ্ধকর্ণ) সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। সঙ্ঘারামের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর বৃহৎ না হইলেও, মন্দিরের কারুকার্য্য অত্যন্ত প্রীতিকর। হ্রদের জলে পুষ্পগুলির প্রতিবিম্ব সুন্দর দেখায়। পুরোহিতগণ ভদ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং নিয়মাবলী যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন। কিংবদন্তী এইরূপ পূর্ব্বে বিদ্যানুরক্ত ২।৩ জন শ্রমণ তুষার পর্ব্বতের উত্তরাংশস্থ পশারা দেশে এক মত হইয়া বাস করিতেন। পূজা ও শাস্ত্রপাঠের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রত্যহ তাঁহারা এবম্প্রকারে কথোপকথন করিতেন। "ধর্ম্মের তত্ত্ব নিগূঢ় এবং বৃথা বাক্যব্যয়ে শিক্ষা করা অসম্ভব। পবিত্র চিহ্নগুলি তাঁহাদের স্বধর্ম্মোচিত গুণে উজ্জ্বল; চলুন, আমরা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া আমাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আমরা যে সকল চিহ্ন দর্শন করিয়াছি তাহাই বর্ণনা করি।'

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণ-যষ্টি সহ বহির্গত হইলেন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা যে মঠে গমন করিতে লাগিলেন, সেইখানেই বৈদেশিক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে উপেক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং কেহই তাঁহাদের মঠের মধ্যে স্থান দিলেন না। তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর ও আশ্রয়শূন্য হইয়া, অশেষ ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তদ্দেশীয় নরপতি রাজধানীর উপকণ্ঠে, ভ্রমণ করিতে করিতে এই বৈদেশিক যতিগণকে দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ভিক্ষুগণ, আপনারা কোন্ দেশবাসী? আপনাদের কর্ণ অবিদ্ধ কেন এবং আপনাদের কৌষেয় মলিন কেন?" শ্রমণগণ উত্তর করিলেন "আমরা তুহোলো দেশবাসী; আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সংসার সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া পবিত্র চিহ্নগুলি দর্শন এবং পূজার্থ বহির্গত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের স্বল্পপুণ্য হেতু, সকলেই আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন; ভারতীয় শ্রমণগণ কেহই আমাদের আশ্রয় দিতেছেন না এবং আমরা স্বদেশ প্রত্যাগমনে অভিলাষী হইয়াছি কিন্তু আমরা আমাদের অভীপ্সিত কার্য্য সমাধা করি নাই। সেইজন্য শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ সত্বেও, যতদিন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, ততদিন আমরা গন্তব্যপথে চলিতে থাকিব।"

রাজা এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই স্থানে একটী সুদৃশ্য সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া বস্ত্র খণ্ডে নিম্নোক্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। "বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের অনুগ্রহেই আমি পৃথিবীপতি হইয়াছি এবং সকল মনুষ্যের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছি। রাজত্ব লাভ করিয়া কৌষেয় বস্ত্রধারী ব্যক্তিকে রক্ষা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি এই সঙ্ঘারাম বৈদেশিকের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছি। বিদ্ধ-কর্ণ-বিশিষ্ট কোন যতিই যেন এই মঠে বাস না করেন।" এই ঘটনার জন্যই এই স্থানের এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এই মঠ হইতে প্রায় একশত লি দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যাইয়া এবং গঙ্গাপার হইয়া আমরা মোহোশালো নগরে পৌঁছি। এই নগরের অধিবাসীবর্গ ব্রাহ্মণজাতীয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্মান করে না। আমাকে দেখিয়া তাহারা প্রথমতঃ আমার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল; পরে, সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সম্মান করিতে লাগিল।

গঙ্গার উত্তর পার্শ্বে নারায়ণ দেবের মন্দির। ইহার অলিন্দ ও উচ্চ প্রাসাদ গুলি অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যে

শোভিত। প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি গুলি মনুষ্যের অদ্ভুত শিল্প চাতুর্য্যের প্রমাণ।

এই মন্দির হইতে ৩০ লি পূর্ব্বে রাজা অশোক নির্ম্মিত এক স্তূপ। অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখে, বিশফুট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ; তাহার শীর্ষদেশে সিংহমূর্ত্তি। স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি আছে। পূর্ব্বকালে এইস্থানে বলবান নরভুক দৈত্যগণ বাস করিত। তাহারা মনুষ্যের অত্যন্ত ক্ষতি করিত। মনুষ্যের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তথাগত স্বকীয় ঐশ্বরিক শক্তি বলে দৈত্যগণকে তাঁহার শরণ লইতে বাধ্য করিলেন। দৈত্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল। পরন্তু, তাহারা এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া, তথাগতকে তদুপরি আসন গ্রহণে অনুরোধ করিল। সেই সময় হইতে বিধর্ম্মীগণ এই প্রস্তরখানি স্থানচ্যুত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু দশ সহস্র বিধর্ম্মীর চেষ্টাতেও তাহা নড়ে নাই। স্তূপের চতুষ্পার্শ্বেই নিবিড় অরণ্য ও স্বচ্ছসলিলা হ্রদ,—সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ে তাহা স্বতঃই ভয় উদ্রেক করে।

যেস্থানে দৈত্যগণ বশীভূত হইয়াছিল, তাহার সন্নিকটেই অনেকগুলি সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ আছে; মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত কয়েকটী মাত্র যতি এই সকল প্রাচীন সঙ্ঘারামে বাস করেন।

এই স্থান হইতে প্রায় একশত লি দক্ষিণ পূর্ব্বে যাইয়া আমরা একটী স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই; এখনও স্তূপটি দশফুট উচ্চ। পূর্ব্বকালে, তথাগতের নির্ব্বাণান্তে আটজন পরাক্রান্ত নরপতি তাঁহার শরীর চিহ্ন বিভক্ত করিয়া, একএক নরপতি, এক এক অংশ গ্রহণ করেন। যে ব্রাহ্মণ এই অংশ সকল বিতরণ করিয়াছিলেন, তিনি নিজ জলাধার মধু প্রলিপ্ত করিয়া, সকলকে অংশ বিতরণ করিয়া, জলাধার সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে, জলাধার মধ্য হইতে চিহ্ন বহির্গত করিয়া তদুপরি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্তূপ মধ্যে জলাধার স্থাপিত করিলেন। এইজন্য উহা দ্রোণ স্তূপ বলিয়া কথিত হয়। পরে রাজা অশোক পুরাতন স্তূপের স্থানে নূতন বৃহদাকার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। উপবাস দিবসে, বর্ত্তমানেও এই স্তূপ হইতে আলোক রশ্মি নির্গত হয়। এই স্থান হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে ১৪০।১৫০ লি পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাপার হইয়া আমরা বৈশিলি [বৈশালী] রাজ্যে উপস্থিত হই।

বৈশালী।

বৈশালী রাজ্যের পরিধি পাঁচসহস্র লি। ভূমি উর্ব্বরা, প্রচুর পরিমাণে ফলপুষ্প উৎপাদিত হয়। আম্র ও কদলীর অন্ত নাই এবং বিশেষ আদরের দ্রব্য। জলবায়ু মনোরম ও নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসীরা সাধু প্রকৃতিবিশিষ্ট। উহারা ধার্ম্মিক ও বিদ্যানুরক্ত। বিধর্ম্মী ও ধার্ম্মিক একত্রেই বাস করে। কয়েকশত প্রাচীন সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্ত্তমান যে ২।৩টী সঙ্ঘারাম আছে, উহাতে অত্যল্প সংখ্যক যতিই বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ কয়েকটী দেবমন্দির আছে। নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ান্তর্গত অনেক ব্যক্তি এদেশে বাস করে।

রাজধানী বৈশালীর ধ্বংসপ্রায় অবস্থা। ইহার প্রাচীন ভিত্তি প্রায় ৬০।৭০লি। ৪।৫লি স্থান লইয়া রাজপ্রাসাদ বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানে অত্যল্প সংখ্যক লোকেই এখানে বাস করে। রাজপ্রাসাদের ৬লি উত্তর পশ্চিমে একটী সঙ্ঘারাম আছে; ইহাতে মাত্র কয়েকটি শিষ্য বাস করে। উহারা সম্মতি সম্প্রদায়ভুক্ত হীনযানান্তর্গত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

নিকটেই একটী স্তূপ। তথাগত, এইস্থানে বিমালকীর্ত্তিসূত্র প্রচার করেন এবং এইস্থানেই গৃহস্থ রত্নাকর এবং অন্যান্য সকলে বুদ্ধদেবকে মূল্যবান ছত্র উপহার প্রদান করে। এই স্থানের পূর্ব্বে অন্য একটী স্তূপ। সারীপুত্র এবং অন্যান্য কয়েক জন এই স্থানেই অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শেষোক্ত স্থানের উত্তর পূর্ব্বে একটী স্তূপ, এইস্তূপ বৈশালীরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর, এই দেশের একরাজা শরীর চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উহার সম্মানার্থ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় কিংবদন্তীতে এইরূপ অব-

গত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে এই স্তূপে দশ 'হো' পরিমিত চিহ্ন ছিল। রাজা অশোক উহার নয় দশমাংশ লইয়া, মাত্র এক দশমাংশ রাখিয়াছিলেন। পরে, এতদ্দেশীয় রাজা পুনর্ব্বার স্তূপ উন্মোচনে ইচ্ছুক হইয়া, কার্য্যারম্ভ করিলেই পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি আর স্তূপ উন্মোচনে সাহসী হইলেন না।

ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে রাজা অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ। সন্নিকটে ৫০।৬০ ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ; শীর্ষদেশে এক সিংহমূর্ত্তি। প্রস্তর স্তম্ভের দক্ষিণে একটী হ্রদ। বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য একদল মর্কট এই হ্রদ খনন করে। পৃথিবী বাসকালীন কয়েকজন বুদ্ধদেব এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। হ্রদের অনতিদূরেই একটী স্তূপ। এই স্থানেই মর্কটগণ বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র সহ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মধু আহরণ করিয়াছিল।

দক্ষিণেই অন্য একটী স্তূপ; এই স্থানেই মর্কট বুদ্ধদেবকে মধু প্রদান করিয়াছিল। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে বর্ত্তমানেও একটী মর্কট মূর্ত্তি আছে। সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি উত্তর-পূর্ব্বে একটী স্তূপ: এই স্থানেই পূর্ব্বে বিমলকীর্ত্তির গৃহ ছিল; অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ঘটনা এই স্থানে সম্পাদিত হয়। অনতিদূরেই ইষ্টকস্তূপ। কিংবদন্তী এইরূপ যে গৃহী বিমলকীর্ত্তি পীড়িত হইয়া এই স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

অনতিদূরেই আর একটী স্তূপ; রত্নাকরের গৃহ এইস্থানেই অবস্থিত ছিল। সন্নিকটেই আর একটী স্তূপ, এই স্থানেই বুদ্ধদেবের পিতৃস্বসা ও অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি উত্তরে একটী স্তূপ; সে সময়ে তথাগত মনুষ্য ও কিন্নর পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর জন্য কুশীনগরাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন তিনি এই স্থানেই বিশ্রাম করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে অনতিদূরেই অন্য একটী স্তূপ; বুদ্ধদেব এই স্থান হইতেই বৈশালীর প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণেই একটী বিহার; বিহারের সম্মুখভাগে আর একটী স্তূপ। 'আম্র-বালিকা' বুদ্ধ দেবকে যে উদ্যান দান করিয়াছিলেন, এই স্তূপ, তাহারই স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

এই উদ্যানের পার্শ্বেই অন্য একটী স্তূপ; তথাগত এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যুঘোষণা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পুরাকালে যখন এই স্থানে বাস করিতেন। তখন আনন্দকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—"যাহারা চতুর্ব্বর্গফল লাভ করিতে পারে, তাহারা কল্পান্ত পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহা হইলে, তথাগত কতকাল জীবিত থাকিবেন?" তিনি, তিনবার আনন্দকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন কিন্তু মারের প্রলোভনে আনন্দ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। আনন্দ, নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্য মধ্যে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মার, বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তথাগত বহুকাল যাবৎ পৃথিবীতে বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও দীক্ষিত করিতেছেন। যাহাদের তিনি পুনর্জ্জন্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা বালুকণার ন্যায় অগণ্য। নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ লাভের এই প্রশস্ত সময়।" তথাগত নখাগ্রভাগে কয়েকটী বালুকণা লইয়া মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নখাগ্রস্থিত বালুকণাগুলি পৃথিবীস্থ বালুকণার সমান কিনা?" মার উত্তর করিলেন, "পৃথিবীর বালুকণার সংখ্যা অধিক।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা আমার হস্তস্থিত বালুকণার ন্যায়; যাহাদের উদ্ধার হয় নাই, তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীস্থ বালুকণার ন্যায়। যাহা হউক তিন মাস পরে আমি নির্ব্বাণ লাভ করিব।

ইতিমধ্যে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণরত আনন্দ অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখিয়া বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া এইরূপ বিবৃত করিলেন "আমি যখন বনমধ্যে ছিলাম, তখন স্বপ্নে এক বৃহৎ বৃক্ষ দর্শন করিলাম। বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে ছায়া প্রদান করিতেছে; অকস্মাৎ এক ঝটিকা বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া, বৃক্ষের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিল। ভগবান করুন, যেন আপনার মৃত্যু না হয়। আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে, তাহাতেই আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। (ক্রমশঃ)

মাতৃঋণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌতুক।

কারখানার লোকগুলা যখন রুডিক পরিবার সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিয়া কৌতুক-হাস্যে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিত, জ্যাক তখন নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ কুৎসিত রঙ্গ-রহস্য তাহার নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইত। নিষ্ফলরোষে তাহার ক্ষুদ্রদেহ জ্বলিতে থাকিত। নার্স্তে ও ক্লারিসার অবৈধ প্রণয় ব্যাপার কাহারও অগোচর ছিল না। ম্যানেজার এই কুৎসার মূল উৎপাটন করিবার মানসেই নার্স্তেকে লরারে কর্ম্ম দিয়াছিল। কিন্তু ইহাই ক্রমে ক্লারিসার দ্রুত পতনের কারণ হইয়া উঠিল।

নার্স্তে যতদিন ইন্দ্রেতে অবস্থান করিতেছিল, ক্লারিসার মোহ ততদিন একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নার্স্তের প্রতি আকর্ষণটা তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। প্রত্যহ দুই চারিটা গল্প ও কৌতুক পরিহাস করিয়া ক্লারিসা প্রাণে কেমন একটা তৃপ্তি অনুভব করিত—সেটা নিত্যকার, অপ্রার্থিত—বায়ু ও আলোকের মতই সহজলভ্য ছিল, প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে হইত। সে সম্বন্ধে যে কোথাও কোনরূপ অনুযোগাদি উঠিতে পারে—এ কল্পনাও তাহার মনে স্থান পাইবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই দূরত্বের ব্যবধান তাহার প্রাণে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ অবসরগুলা কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। নার্স্তের সহিত সেই কত গল্প, ক্ষণিকের কত মনি-অভিমান, কলহ প্রণয়ের সে কত খেলা—বিচিত্র স্মৃতির তরঙ্গ তুলিয়া এখন তাহার অলস চিত্তটিকে একান্ত ক্ষুব্ধ বিচলিত করিয়া তুলিত! আজ কোথায় নার্স্তে? ক্লারিসার কর্ম্মহীন সমস্ত অলস অবসরটুকু সে জুড়িয়া বসিয়াছিল! তাই আজ জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া ক্লারিসা যখন হৃদয়মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে, অদূরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে নাইটিংগেল মধুর সঙ্গীতে চারিধার ভরাইয়া তুলে, তখন ক্লারিসা নার্স্তের অভাব অনুভব করিয়া একান্ত কাতর হইয়া উঠে! কোথায় নার্স্তে—কোথায়? এ অভাব আজ কে মিটাইবে? এ শূন্যতা কে পূর্ণ করিবে?

অবশেষে এ বিচ্ছেদ ক্লারিসার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে নার্স্তেকে পত্র লিখিতে বসিল। নার্স্তেও সে পত্রের বেশ গুছাইয়া বানাইয়া উত্তর দিল। তাহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহার নিয়মিত চলিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পক্ষেও বিশেষ বিঘ্ন রহিল না।

বাসিদাঁরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। বাসিদাঁর ইন্দ্রের অপর পারে অবস্থিত—মধ্যে নদীমাত্র ব্যবধান। বাসিদাঁর হইতে লরার দুই ঘণ্টার পথ। নার্স্তে ইচ্ছা করিলেই এক বেলার ছুটি লইতে পারিত—সে বিষয়ে নিয়মের কোনরূপ কঠিন বাঁধাবাঁধি ছিল না।

ক্লারিসাও জিনিষপত্র কিনিবার ছল করিয়া মধ্যাহ্ণে নদী পার হইয়া বাসিদাঁরে আসিত।

ইত্রেঁক্তে এ সংবাদ ক্রমে কাহারও জানিতে বাকী রহিল না—এ বিষয় লইয়া স্পষ্টই তাহারা আলোচনা করিত। মধ্যাহ্ণে রুডিক জ্যাক প্রভৃতি সকলে কারখানায় থাকিত এবং সেই অবসরে ক্লারিসা যখন পথ দিয়া ষ্টীমারঘাটের অভিমুখে চলিত, তখন রাস্তায় লোকের মধ্যে ইঙ্গিতের ধূম পড়িয়া যাইত! তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই একটু বক্র হাসি হাসিয়া লইত! গৃহবাসিনী রমণীরাও পরস্পরের গা ঠেলিয়া অবজ্ঞার সুরে বলিত—লজ্জাও নেই গা, মাগীর!

সত্যই তাহার এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না! পথে রাজ্যের লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার মধ্য দিয়া সে অবাধে চলিয়া যাইত! কি এক দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির পরিচালনায় সে চলিত, কোনমতে আত্মদমন করিতে পারিত না—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শঙ্কিত ত্রস্ত চরণে সে ধীরে ধীরে ষ্টীমারে উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সুগন্ধি রুমালে ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া থাকিত! রৌদ্র মাখিয়া রূপালি ঢেউ তুলিয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে—বহু ঊর্দ্ধে গগনে দুই চারিটা পাখী ছোট কৃষ্ণ বিন্দুর মত উড়িয়া বেড়াইতেছে—তীরবর্ত্তী কারখানার চিমনি হইতে ঘনকৃষ্ণ ধূমরাশি উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যের প্রতি ক্লারিসার লক্ষ্য থাকিত না—সে অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে শুধু পরপারে তীররেখার পানে চাহিয়া থাকিত। শুধু মধ্যে মধ্যে একটা অজানা শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত, তথাপি বাসিদাঁয় যাইতে হইবেই। মুক্তি নাই—দুর্ব্বল চিত্তবে দমন করিবার শক্তিও নাই!

জ্যাক এ সকল ব্যাপারই জানিত। এই গোপন অভিসার-যাত্রা তাহার নিকট গোপন ছিল না। কারখানায় প্রবেশ করিয়া তাহার চোখ ফুটিয়া ছিল। তাহার সম্মুখেই কারখানার লোকগুলা রুডিকের দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মাতিত! এ সকল ব্যাপার লইয়া রঙ্গরহস্য তাহাদিগের নিকট পরম উপভোগ্য ছিল!

জ্যাক এ রঙ্গরহস্যে যোগ দিত না। এই নির্ভরশীল সরল-হৃদয় পত্নীপ্রেমিক বৃদ্ধের দুঃখে তাহার প্রাণে সমবেদনার উদ্রেক হইত। আর এই বুদ্ধিহীনা নারীর দুর্ব্বলতায় সে একান্ত ব্যথা পাইত। তাহার মনে হইত, একবার সে ক্লারিসাকে সতর্ক করিয়া দিবে,—সাবধান, সাবধান নারী, যে পথে চলিয়াছ, সে পথ ত্যাগ কর—সে তোমায় কোথায় কোন নরকের অন্ধকারময় গহ্বর-তলে নিক্ষেপ করিবে! আর নাস্তে—একবার নাস্তেকে পাইলে, তাহাকে সে রীতিমত শিক্ষা দেয়—তাহার চুলের গুচ্ছ ধরিয়া প্রবলভাবে নাড়া দিয়া বলে—দূর হ, পামর—এই দুর্ব্বলা অভাগিনী নারীর সম্মুখে তোর এ কুহক-জাল বিস্তার করিস নে—তাহার সর্ব্বনাশ করিস নে!

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ক্ষোভ হইত যখন সে দেখিত তাহার বন্ধু বেলিসার এই পৈশাচিক লীলা-অভিনয়ে একটি প্রধান ভূমিকা লইয়া বসিয়া আছে! এই ফিরিওয়ালা নাস্তে ও ক্লারিসার পত্রবাহকের কার্য্য করিত। বেলিসারকে সে গোপনে বহুবার রুডিকগৃহে

আসিতে দেখিয়াছে—মাদাম রুডিকের হাতে সে পত্র দিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ রৌপ্যমূল্য পাইয়াই সে পরম আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধু যে এই সর্ব্বনাশী পাপাচরণে কোনমতে সহায়তা করিবে,—ইহা ভাবিয়াই জ্যাক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আতিথ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া বেলিসার জ্যাকের মাতার প্রশংসায় প্রায়ই মুখর হইয়া উঠিত, জ্যাক কিন্তু সে প্রশংসায় তৃপ্তি পাইত না—সে ভাবিত একবার বেলিসারকে স্পষ্ট শুনাইয়া দিবে যে এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রীতি-আকর্ষণ করিবার চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস! কিন্তু তাহার মুখ দিয়া সে কথাটা বাহির হইতে পারিত না—কেমন বাধিয়া যাইত।

একদিন রুডিকের গৃহের সম্মুখে ক্লারিসাকে দেখিতে না পাইয়া বেলিসার জ্যাককে চুপি চুপি ডাকিয়া নিভৃতে তাহার হস্তে একখানি নীল মোড়কের আবরণে এক পত্র দিয়া বলিল "মাদাম রুডিককে এখানি দিও—সাবধান, কেহ যেন জানিতে না পারে, আর কাহারও হাতে দিওনা যেন!"

জ্যাক পত্র-মোড়কের উপর চাহিয়া দেখিল,—মোড়কের উপর মাদাম রুডিকের নাম—আর সে নামের হস্তাক্ষর। দেখিয়া সে রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বেলিসারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শাণিত বচনে কহিল, "খবরদার! আমাকে এমন নীচ মনে করোনা যে, তোমার এই হীন কাজে আমি কোন রকম সহায়তা করব? আমি যদি তুমি হতাম—তাহলে এই হীন কাজ করে পয়সা উপার্জ্জন করার কথা আমার মনে একদণ্ডের জন্যও উদয় হতোনা—এতে আমায় অনাহারে থাকতে হত যদি, তবুও—।" বেলিসার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

জ্যাক কহিল, "তুমি জান বেলিসার, এ পত্র কোথা থেকে আসছে—কে দিয়েছে—আর এ পত্রের মর্ম্মই বা কি! আমিও যে জানিনা তা ভেবো না—আমি কেন, এ কথা দেশশুদ্ধ লোকের অবিদিত নয়! এই সরল-হৃদয় বৃদ্ধের সঙ্গে এরকম প্রতারণা করতে তোমার একটু লজ্জা বোধ হয় না?"

বেলিসার জ্যাকের দিকে চাহিল। অবিচলিতভাবেই উত্তর করিল, "এটা অন্যায় অপবাদ হচ্ছে, মাষ্টার জ্যাক! বেলিসারকে যারা ভাল জানে, তারা হলপ করে বলতে পারে যে সে কখনো কারো সঙ্গে জীবনে প্রতারণা করে না—সে কল্পনাও তার মনে কখনো স্থান পায় না! আমার হাতে কতকগুলো কাগজ দেয়—আমি সেগুলো পৌঁছে দিই—ব্যস্ খালাস! কি বৃত্তান্ত তাতে আছে তা কি জানি! তুমি জান আমার অবস্থা—তোমায় কতবার বলেছি! বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য আছে—আমার রোজগারই তাদের একমাত্র নির্ভর। তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে ত আমি খেতে পারিনে। তার উপর আমার ভগ্নীপতির অসুখ—তার আর একটি পয়সা রোজগার করবার সামর্থ্য নেই! টাকার বাজার কেমন, জান ত! নিজের পায়ের জুতো এক জোড়া এ পর্য্যন্ত করাতে পারলেম না! যদি প্রতারণা করবার ইচ্ছে থাকত ত এতদিন মস্ত লোক হয়ে যেতাম!"

বেলিসারের স্বরে একটুকু কম্পন ছিল

না—দৃষ্টিতে এতটুকু চাঞ্চল্য ছিল না। জ্যাক তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এরূপভাবে পত্র বহন করা অত্যন্ত গর্হিতকর্ম্ম। রুডিকের স্ত্রী ও নার্ষের মধ্যে এই গোপন পত্র-ব্যবহার একান্ত অনুচিত—তাহা পাপ! স্ত্রীর উপর বৃদ্ধ রুডিকের অগাধ বিশ্বাস—সে বেচারা তাহার স্ত্রীকে এতটুকু সন্দেহ করে না, এক্ষেত্রে ইত্যাদি। কিন্তু সকলই বিফল হইল! বেলিসার কিছুতেই এ সরল কথাটা বুঝিবে না! টাকার বাজার অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, গৃহে তাহার পোষ্য অনেকগুলি, ভগ্নীপতির কঠিন ব্যারাম—তাহার উপার্জ্জনের উপরই সকলের অন্ন নির্ভর করিতেছে, এ যুক্তির বিরুদ্ধে জ্যাকের কোন কথা খাটিতেই পারে না! সে কাহারও সহিত প্রতারণা করিতেছে না, কোন পাপের সহায়তা করিতেছে না,—সৎপথে থাকিয়া সদুপায়েই সে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে! জ্যাকের চেষ্টা বিফল হইল।

জ্যাক তখন অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সে আজ রুডিক পরিবারের এক জন! তাহার চোখে জল আসিল। সে বেলিসারকে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

রুডিক যে এই ভীষণ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিত না, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না! তাহার সারা জীবনটাই কারখানায় কাটিয়া আসিতেছে। কারখানার সঙ্গীবর্গ সকলেই এই বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধানুরক্ত ছিল। এমন স্নেহসরল আত্মভোলা লোক,—তাহার সম্ভ্রমটুকু বাঁচাইয়া তাহার অগোচরেই সকলে কানাঘুষা করিত। কিন্তু জেনেদা—? জেনেদা ত সমস্তই জানে! সে কেন ইহার প্রতিকারে মনোযোগ অর্পণ করে না! সে কি এখন কিছু দেখিতে পায় না? কোন ইঙ্গিত, কোন আভাষ? সে কি সহসা অন্ধ হইয়া গিয়াছে? কোথায় সে—রুডিক-গৃহ কি সে ত্যাগ করিয়াছে?

না। জেনেদা রুডিক-গৃহ ত্যাগ করে নাই। আজ এক মাসকাল সে কর্ম্মস্থল হইতে অবসর লইয়াছে! তাহার দৃষ্টিও বেশ তীক্ষ্ণ ছিল বরং সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এক্ষণে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে—একটা বিপুল সুখ-সম্ভাবনায় সে দৃষ্টি সম্প্রতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। কষ্টমহাউসের এক তরুণ কর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। পাত্রের নাম মঙ্গিন। ঈষৎ সবুজ বর্ণের পোষাক, সৈনিকের মত সুগঠিত দেহ ও দীর্ঘ গুম্ফে মঙ্গিনের রূপ যেন উছলিয়া উঠিত। কষ্টমহাউসে এমন সুশ্রী যুবক আর দুইটি দেখা যায় না—জেনেদার চক্ষে অন্ততঃ! তাহাকে স্বামী-রূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য মিলিয়াছে জেনেদার! ধন্য সে, সার্থক তার জীবন! বিবাহে পণের মাত্রা অত্যন্ত অধিক—তাহা রুডিকের সঞ্চিত অর্থের সর্ব্বস্বই প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিবে। নগদ চারি হাজার দুই শত মুদ্রা। পণ কমাইতে গেলে মঙ্গিনকে মিলিবে না, দুর্ম্মূল্য হইলেও মঙ্গিনকে চাই, নহিলে জেনেদা সুখী হইবে না। নগদ মূল্য পাইলেই মঙ্গিনের চক্ষে জেনেদার কুৎসিৎ দেহ অপরূপ লাবণ্যে ভরিয়া উঠিবে, শ্যাম বর্ণ পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইবে, গঠন দিব্য লালিত্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। এই পণের জন্যই শুধু সে অপরিণীতা সহস্র কিশোরীর পাণি পরিত্যাগ করিয়া

জেনেদার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। কারণ, সারা ইক্রে ও নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের কোন কন্যারই এ মূল্য প্রদানে সামর্থ্য ছিলনা। ক্রুডিক যখন এ পণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "এত টাকা দিবার আমার ক্ষমতা নাই। বৃদ্ধ বয়সে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কিসে? আমার অবর্ত্তমানে ক্লারিসারই বা উপায় কি হইবে? ক্লারিসার যদি পুত্র কন্যা হয় তাহাদের জন্য সংস্থান থাকিবে কি?" তখন জেনেদার ছল ছল মুখ দেখিয়া ক্লারিসাই সাগ্রহে বলিয়াছিল, "আমাদের জন্য ভাবতে হবে না! এখনও তোমার যে শক্তি আছে, রোজগার কর, বুঝে সংসার করলে টাকা আবার হতে কত দিন? মঁসিনের সঙ্গেই জেনেদার বিয়ে দাও। দেওয়া চাইই। জেনেদা ওকে অত ভালবাসে, না হলে ও বেচারীর মনের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে!"

ভালবাসা! কি কুহক জান তুমি! এই ভালবাসার নামেই ক্লারিসা আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছিল!

মাদাম মঁসিন হইবার আশা যখন জেনেদার পক্ষে আর দুরাশা রহিল না, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে সহস্র সুখের কল্পনা করিত,—মঁসিনের হাত ধরিয়া নদীতীরে বেড়াইতেছে, কত সুন্দরী কিশোরীর লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে! নিভৃতকুঞ্জে বসিয়া মঁসিনের বুকে শির রাখিয়া সে কত দেশের গল্প শুনিতেছে,—সন্ধ্যার পাখী বাসায় ফিরিতেছে! ক্রমে সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল, মাথার উপর চাঁদ উঠিল, চারিধার স্তব্ধ হইয়া আসিল, সেই নির্জ্জনতার মধ্যে তাহারা দুই জনে বসিয়া,—জগতে যেন আর কেহ নাই, শুধু দুইটি নরনারী—তাহাদিগের প্রাণের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে! ভাবের রাশ ছাড়া পাইয়া আজ সাড়া দিয়া উঠিয়াছে,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই! একি সুগভীর পরিতৃপ্তি, কি বিশ্বপ্লাবী সুখ! জেনেদা ভাবিত, সে কুরূপা। এই তুচ্ছ অর্থগুলার জন্যই শুধু সে মঁসিনের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—নহিলে সে কোথায় থাকিত! মঁসিন তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না! তুচ্ছ অর্থগুলাই সর্ব্বস্ব হইল? এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিবিড় প্রেম,—ইহার কোন মূল্য নাই? ইহার দিকে মঁসিন চাহিয়া দেখিবে না? নাই দেখিল—একবার মঁসিন শুধু তাহাকে গ্রহণ করুক, তার পর সে মঁসিনকে, তাহার প্রেমের মহিমা কি, তাহা বুঝাইবে! তখন মঁসিনও বুঝিবে, মণিমাণিক্যের জ্যোতি ম্লান করিয়া, কি রত্ন তাহার বক্ষে সঞ্চিত,—সে দিন জেনেদার কি সুখ হইবে!

ক্লারিসার প্রতি জেনেদার শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সে যদি ক্রুডিককে বুঝাইয়া এই পণে সম্মত না করাইত, তাহা হইলে—তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত! আর নাস্তে ইক্রে ছাড়িয়াছে, নিজের বিবাহের সম্ভাবনা লইয়া সেও সমধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণেই ক্লারিসার প্রতি জেনেদার পূর্ব্বকার সতর্ক দৃষ্টি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। ক্লারিসা আবার স্বহস্তে জেনেদার বিবাহ-পরিচ্ছদ তৈয়ার করিতেছিল। কৃতজ্ঞতায় জেনেদা কাজেই ইদানীং ক্লারিসার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

আর পনের দিন পরে বিবাহ হইবে।

আসন্ন সমারোহের একটা আভাস ইতিমধ্যেই রুডিক গৃহটিকে আঘাত করিয়াছিল। আত্মীয় বন্ধু ও অনুগতবর্গের নিকট হইতে প্রত্যহ কিছু না কিছু পরিণয়োপহার আসিতেছিল। চারিদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আত্মীয়বন্ধুর আনাগোনায় পরামর্শাদির ধুম লাগিয়াছিল। কুরূপা হইলেও জেনেদা অনেকের আদরলাভে সমর্থ হইয়াছিল কাজেই উপহারেও ঘটা ছিল। জেনেদাকে তাহার এই শুভপরিণয় উপলক্ষে কি উপহার দিবে, তাহা ভাবিয়া জ্যাক একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইদা তাহাকে এজন্য আপনার সঞ্চয় হইতে গোপনে ষাট টাকা পাঠাইয়াছিল। কবি আর্জেন্ট এ সংবাদ জানিত না।

ইদা জ্যাককে লিখিয়াছিল, "তোমাকে আজ ষাট টাকা পাঠাচ্ছি, জ্যাক! এই টাকায় জেনেদার জন্য কিছু উপহার কিনে তুমি তার বিয়েতে দিও। কোন ভাল পোষাক একটা কিনতে পার যদি ত ভাল হয়। তোমাকেও বিয়েতে একটু সাজগোজ করতে হবে, নিশ্চয়। তার জন্য তোমার নূতন পোষাক চাই বোধ হয়? অনেক দিন তুমি পোষাক টোষাক কিছু কেননি, যা ছিল সেগুলোও এতদিনে পুরন হয়ে গেছে। নিজের জন্য একটা ভাল পোষাকও কিনো! এ টাকা সম্বন্ধে আমার চিঠিতে কোন কথা লিখো না! রুডিকদের কারো কাছেও এ টাকা পাঠানোর কথা বলো না। এ টাকাটা তোমাকে আমি লুকিয়ে পাঠাচ্ছি। ইনি এ টাকার কথা জানেন না, জানলে রাগ করবেন। এখানে এঁর শরীর ভাল নয়, টাকার টানাটানি যাচ্ছে, কাজেই ওঁর মেজাজটাও কিছু রুক্ষ। সেই জন্যই ভয় হয় পাছে এ টাকার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হন, বলেন বা 'এত নবাবি কেন?' তাই তোমায় এত করে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে, ত বলো, ও টাকা তুমি জমিয়েছিলে।

আর পৃথিবীর লোকগুলোও এমন হিংসুকে! এঁর বিরুদ্ধে সবাই এমন ষড়যন্ত্র করে বসে আছে। এঁকে কিছুতেই মাথা তুলে সাহিত্যসমাজে দাঁড়াতে দেবে না অথচ এঁর লেখবার শক্তি কত!"

আজ দুইদিন জ্যাক এই টাকা কয়টি পাইয়াছে। পাইয়া সে মনে মনে যথেষ্ট আনন্দগর্ব্ব উপভোগ করিতেছিল। এ বিবাহে সে যে নিতান্ত উপহারহীন রিক্ত হস্তে দাঁড়াইবে, সেটা কেমন যেন তাহার মনঃপূত হইতেছিল না। এখন সে ভাবনা দূর হইয়াছে। আবেগে মার পত্রখানা সে বুকে চাপিয়া ধরিল।

উপহারের জন্য এখন কি কিনিবে, সে ও কাহার সহিতই বা সে পরামর্শ করিবে? সন্ধ্যার পর বাগানে বসিয়া সেদিন সে এই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিয়া সে স্থির করিল, জেনেদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে, তাহার কি পছন্দ। তখন সে জেনেদার উদ্দেশ্যে চলিল। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। কক্ষে আলোক ছিল না, যেমন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, অমনই কাহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। জ্যাক চকিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" অপর ব্যক্তি উত্তর দিল না। সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল,

লোকটি কটকের নিকট আসিতে বাহিরের ক্ষীণ আলোকে জ্যাক দেখিল, সে আর কেহই নহে, তাহার পুরাতন বন্ধু বেলিসার।

জ্যাক ডাকিল, "বেলিসার—"

কেহ উত্তর দিল না। জ্যাক ফিরিয়া দেখিল, অদূরে দাঁড়াইয়া ক্লারিসা। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে তখন একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল—সেই ক্ষীণ আলোকে জ্যাক স্পষ্ট লক্ষ্য করিল, ক্লারিসা দাঁড়াইয়া একখানা পত্রপাঠ করিতেছে। তাহার মুখে কি উত্তেজনা! জ্যাকের মনে পড়িল, নাস্তের কথা! কারখানায় সেই দিনই সে শুনিয়াছিল, জুয়াখেলায় নাস্তে বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি বা উপায় নাই। বোধ হয় এ পত্রে ক্লারিসাকে নাস্তে সেই সংবাদই জানাইয়াছে।

ভিতর কক্ষে মজিন ও জেনেদা বসিয়া সান্ধ্য অবসরটুকু নানা কথায় গল্পে আরও উপভোগ্য করিয়া লইয়াছিল। কর্ত্তার জন্য সার্টিফিকেট আনিবার জন্য রুডিক সেদিন সহরে গিয়াছিল—পরদিন ফিরিবে। কাজেই এমন সুন্দর সঙ্কোচহীন অবসরটুকু নবীন প্রণয়ীযুগলের পক্ষে নিতান্তই অনায়াসলভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মজিন বসিয়া গল্প করিতেছিল, গোধূম, কয়লা, নীল, কডলিভার প্রভৃতি আমদানী রপ্তানীর মাশুলের হারই ছিল প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কথাগুলা, জেনেদা ভাল না বুঝিলেও, তাহার সুনিবিড় মনঃসংযোগদানে বঞ্চিত ছিল না।

ইহার কারণ আর কিছু নহে। সেই হৃদয়ের সুমহান্ শক্তি, প্রেম—সেই সুচতুর কুহকীর সুমোহন কুহকের ফাঁদে যে ধরা দিয়াছে, সেই জানে প্রেমের নিকট সকল শক্তি সকল তেজ কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে! স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া লোক প্রেমের পায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসে, তাহা বিশ্বের ইতিহাসে যুগযুগান্তর হইতে অমর অক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া আসিতেছে! এই তুচ্ছ গল্পও তাই আজ জেনেদার নিকট এত তৃপ্তিদায়ক।

এমন সময় জ্যাক আসিয়া দেখা দিল। ক্লারিসাও তৎপশ্চাতে আসিয়া কহিল, "বেশী দেরি করে কাজ কি মজিন? নটা বাজে, আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। মেঘ করে আসছে। ঝড় বৃষ্টি হয় যদি!"

জ্যাক স্থিরদৃষ্টিতে ক্লারিসার দিকে চাহিল, মনে মনে ভাবিল, 'হায়! দুর্ভাগিনী নারী!'

রাত্রে ভোজনান্তে মজিন বিদায় লইলে ক্লারিসা কহিল, "তোমরা শুয়ে পড—বেশী রাত্রি জাগা ঠিক নয়, জেনেদা, অসুখ হতে পারে! জ্যাক সারাদিন খাটে খোটে, রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে একটু ঘুমোও—না হলে শরীর থাকবে কেন?"

তাহাদিগকে বিদায় করিতে পারিলে ক্লারিসা যেন বাঁচে—এই ভাবখানা ক্লারিসার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে জ্যাক লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, এ অধীরতার অর্থ কি!

জেনেদা বসিয়া মজিনের কথা ভাবিতেছিল। সে এখন কতদূর গিয়াছে? বোধ হয়, নদীর তীরে নৌকার সন্ধান করিতেছে—ঐ মজিন নৌকায় উঠিতেছে! নাচিয়া নাচিয়া নৌকা তীর ছাড়িয়া চলিল। মজিন কি

ভাবিতেছে, এখন? বোধ হয় জেনেদারই কথা,—জেনেদার এত প্রেম, এত ভালবাসা—জেনেদা কি মজিনের সমস্ত হৃদয়খানি এতদিনে জুড়িয়া বসে নাই? কে জানে? কেন বসিবে না? জেনেদার হৃদয়ে ত এখন আর কোন চিন্তা নাই—সে শুধু মজিনের কথাই ভাবে! শয়নে স্বপনে মজিন ত জেনেদার সমস্ত হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়া আছে! তবে, জেনেদা কেন মজিনের হৃদয়ে এমন স্থানটি করিয়া লইতে পারিবে না! সে রূপহীনা? ছাই রূপ! এত প্রেম—তাহার পার্শ্বে রূপ,—সে ত অতি তুচ্ছ! জেনেদা আবার ভাবিল, কত রাত্রি হইয়া গিয়াছে—বাহিরে কনকনে শীত! এ শীতে তাঁহার না জানি কত কষ্ট হইতেছে! ঘড়িতে দশটা বাজিল।

ক্লারিসা ডাকিল "জেনেদা এস শুইগে আমরা।"

জ্যাক অভ্যাসমত সদরদ্বার বন্ধ করিবার জন্ত উঠিলে ক্লারিসা ব্যস্তভাবে তাহাকে নিবারণ করিল, কহিল, "দোর আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি। সব ঠিক আছে—কোন ভয় নাই—চল উপরে চল—শুইগে সকলে।"

জেনেদা তখন মজিনের চিন্তায় বিভোর ছিল, জ্যাককে কহিল, "মজিনকে কেমন দেখলে জ্যাক? বেশ সুপুরুষ না? চায়ের মাশুল কত পড়ে, মনে আছে তোমার? শুনলে ত সব?"

মাদাম রুডিক পরুষকণ্ঠে কহিল, "জেনেদা, শোবে? না এমনভাবে পাগলামি করবে বসে?" ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জেনেদা উঠিল। ক্লারিসা কহিল, "উঃ, এমন ঘুম পেয়েছে আমার, যে মাথাটা অবধি ধরে উঠেছে!"

জেনেদা আপনার কক্ষে আসিল। জ্যাক ভাবিল, পরামর্শ করিবার উপযুক্ত অবসর, ইহাই! দিনের বেলা সময় অল্প, যেটুকু বা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পরামর্শ করা যায় না—বন্ধুবান্ধবের ভিড়ে সুবিধা হইয়া উঠে না। জ্যাকও জেনেদার কক্ষে আসিল। টেবিলের উপর অজস্র উপহার সম্ভার ছড়ানো রহিয়াছে! ফটো, স্বর্ণনির্ম্মিত কাঁটা-চামচ, চাদানি, পুষ্পাধার, রঙ্গীন ও চিত্রবিচিত্র করা চিঠির কাগজ, ইয়ারিং, অঙ্গুরীয়, ঘড়ি, ব্রেসলেট, কড়ির খেলানা, কত রকমের অসংখ্য সামগ্রী! জ্যাক আসিয়া টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

জেনেদা কহিল, "কি? সব দেখছ জ্যাক? এ ত বাইরে যা আছে—যা তুলে রেখেছি তা ও তোমায় দেখাচ্ছি! দেখ।"

জেনেদা তখন আলমারি খুলিয়া পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। এই বহুমূল্য ফুলশয্যার পোষাক, তাহার দূরসম্পর্কীয়া মাতুলানী উপহার পাঠাইয়াছে—এই 'ট্রসো' তাহার সখী মেরির স্বহস্ত রচিত প্রীতি-উপহার! এই স্বর্ণহার তাহার পিতার আশীর্ব্বাদী!

পরে একটি ক্যাস বাক্স বাহির করিয়া জ্যাকের সম্মুখে জেনেদা তাহা খুলিল, ভিতরে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রায় চারি হাজার দুই শত টাকা—ইহাই তাহার যৌতুক! এ যৌতুক মজিনকে উপহার না দিতে পারিলে তাহার পায় জেনেদার স্থান হইত না! জেনেদা কহিল, "এই আমার বিয়ের যৌতুক! আমার সর্ব্বস্ব—আমার পুণ্য! এর সাহায্যেই

মর্গ্যানকে পেয়েছি! নগদ্ চার হাজার দু'শ টাকা। বাবা আমাকে একেবারে বড়লোক করে দিচ্ছেন—এ যৌতুকের কথা মনে হলে আমার কি আহ্লাদ হয়—"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। বাহির হইতে কে কহিল, "জেনেদা, ছেলেটাকে কি ঘুমোতে দেবেনা তুমি? এ কি বুদ্ধি হচ্চে তোমার! দিনের বেলা কথাবার্ত্তা হয় না কি?"

এ স্বর ক্লারিসার—কিন্তু ঈষৎ কম্পিত। ক্লারিসা কক্ষে প্রবেশ করিল।

লজ্জিত হইয়া জেনেদা জ্যাককে বিদায় দিল। জ্যাকও শয্যার আশ্রয় লইল।

ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত গৃহ নীরব হইল। বাহিরে তখন মৃদু তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে অন্য গৃহগুলির মত রুডিক-গৃহও নিদ্রায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু বাহিরের ছদ্মাবরণে মানুষ যেমন আত্মগোপন করিয়া অপরকে প্রতারণা করে, গৃহও সেইরূপ প্রতারণা করিতে পারে! রুডিক-গৃহ অন্যান্য গৃহগুলির মত রুদ্ধদ্বার ও রুদ্ধ বাতায়ন লইয়া বাহির হইতে নিদ্রাতুরের মত বোধ হইলেও আজ সে আপনার বক্ষে এক দারুণ শোচনীয় ও মর্ম্মভেদী নাটকের অভিনয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল!

নিম্নতলে এক আলোকহীন ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইজনে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। সম্মুখস্থ চিমনির প্রজ্জলিত কয়লা-স্তূপ হইতে অস্পষ্ট আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল—সেই আলোকে বেশ বুঝা যায়, একজন পুরুষ, অপরটি নারী।

নারীর কপোল লজ্জায় একাধিকবার রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। নারী দাঁড়াইয়াছিল,—পুরুষ তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত আপনার হাতে ধরিয়াছিল।

পুরুষ বলিতেছিল, "তোমায় মিনতি কচ্চি,—যদি আমায় ভালবাস তুমি—এক বিন্দু ভালবাস—"

মিনতি! কি চাহে সে? ক্লারিসার দিবার আর আছেই বা কি? সে ত তাহার সর্ব্বস্বই নাস্তের হাতে তুলিয়া দিয়াছে! কিছুই রাখে নাই! সে ত তাহারই—কায়মনোবাক্যে নাস্তেরই! একটি জিনিস সে শুধু ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে তাহার স্বামীর গৃহ! সে আশ্রয়টুকু ছাড়িতে তাহাকে বলিও না, নাস্তে! বেচারা রুডিক—আহা, সে কি অপরাধ করিয়াছে?

নাস্তে সেদিন সন্ধ্যার সময় পত্র পাঠাইয়াছিল, "দ্বার যেন বন্ধ না থাকে, আজ রাত্রে আমি যাইব—বিশেষ প্রয়োজন আছে।" সে জানিত, রুডিক সে রাত্রে গৃহে থাকিবে না।

ক্লারিসা শুধু দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না। গৃহের পরিজনবর্গকে ঘুম পাড়াইয়া অবধি রাখিয়াছে সে! সকলে নিদ্রা গেলে ক্লারিসা আপনাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিল! যে পরিচ্ছদটি নাস্তের চক্ষে শোভন দেখায়, সেইটি পরিল। যেমন করিয়া কেশবিন্যাস করিলে নাস্তের ভাল লাগিবে তেমনভাবেই কেশবিন্যাস করিল। কোথাও কোন ত্রুটি নাই! আজ সে নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া নায়িকার মত বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া নাস্তের সম্মুখে আসিয়াছে!

নাস্তে আবার কহিল, "এত করে মিনতি কচ্ছি, ক্লারিসা তবু তোমার দয়া হচ্ছে না? শোন ক্লারিসা—শুধু দু'দিনের জন্য। সাড়ে তিন হাজার টাকার দরকার আমার। দু হাজার দেনা আছে, সেইটে শুধে ফেলব—তার পর বাকীটা দিয়ে আমার ভাগ্য শেষবার পরীক্ষা করব—এই শেষ! দু-চার বাজি খেললেই একেবারে সব ফিরে পাব।"

ক্লারিসার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছিল,—সে নাস্তের হাত ছাড়াইয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, নাস্তে—এ আমি পারব না।

"কিছুতে পারবে না? আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যায় যে ক্লারিসা—"

"না—ও হবে না। অন্য উপায় কিছু ঠিক করা যাক বরং।"

"আর কোন উপায় দেখছিনে আমি!"

"শোন। সাতুর্ব্রায় আমার এক বন্ধু আছে—বেশ বড়লোকের মেয়ে সে! স্কুলে আমরা এক সঙ্গে পড়তুম। আমি তাকে লিখছি আমার দরকার বলে,—সাড়ে তিন হাজার টাকা এখনই ধার চাই—"

নাস্তে কহিল, "অসম্ভব—এ হতেই পারে না—কাল আমার টাকা চাই-ই—"

ক্লারিসা কহিল, "তবে বরং ম্যানেজারের সঙ্গে তুমি দেখা কর। তোমায় ভালবাসেন তিনি—সাহায্য করতে পারেন—"

"ম্যানেজার? ম্যানেজার একথা জান্তে পারলে সেই দণ্ডেই আমার চাকরিটুকু শেষ করে দেবে। এইটুকু লাভ হবে! আর আমি যা বলছি, তা কত সহজ, বল দেখি। কেউ জানতেও পারবে না। দুদিন পরে আমি নিশ্চয় টাকা দিয়ে যাব। তার অন্যথা কোনমতে হবে না।"

"তুমি বল কি নাস্তে—দুদিন পরে তুমি যে"

"হাঁ—টাকা দোবই। এর নড়চড় হবে না—এ আমি শপথ করে বলতে পারি।"

নাস্তে কহিল, "কিছুতে পারবে না? আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যায় যে ক্লারিসা—"

ক্লারিসা কোন কথা বলিল না—দুই হাতে সে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের মধ্যে একটা ঝড় বহিতেছিল—সে ঝড় তাহার চেতনা লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল।

নাস্তে কহিল, "আমি গর্দ্দভ, তাই তোমার কাছে এত ভূমিকা করতে এসেছিলুম! তোমায় না বলে, নিজেই টাকাটা যদি বার করে নিয়ে যেতুম, তাহলে আর এত গোল হত না—"

ক্লারিসা নাস্তের হাত ধরিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "কিন্তু তুমি জান না, নাস্তে, জেনেদা নিজে এখন তার বাক্স খুলে রোজই যৌতুকের টাকা নাড়াচাড়া করছে—একে তাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, কতবার করে গণে রাখছে—আজ রাত্রেই ত জ্যাককে সে বাক্স দেখাচ্ছিল—"

"তাই নাকি? জ্যাককে দেখাচ্ছিল?"

"হাঁ। আহ্লাদে একেবারে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে মরে যাবে—একদণ্ড বাঁচবে না। তাছাড়া চাবি সে কোথায় রাখে, আমি জানি না।"

কথার বাহুল্যে ক্লারিসার যুক্তিগুলা ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সে নিজেও বুঝিতেছিল। ক্রমে সে স্থির হইল। দুঃখ আরও ছিল ইহাই যে, ক্লারিসা নাস্তেকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এই বাক্-যুদ্ধের অন্তরালে উভয়ের অধরে অধরে নয়নে নয়নে যে ইঙ্গিত চলিতেছিল, তাহা রোধ করিবার শক্তি ক্লারিসার ছিল না!

"তবে আমার আর কোন আশা নাই! কোন উপায় নাই।" বলিয়া নাস্তে অবোধ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

ক্লারিসার চিত্তে করুণার বাণ ডাকিল। উপায় কি? উপায় কি? কি করিবে সে? কেমন করিয়া নাস্তেকে এ বিপদে সে রক্ষা করিবে! দুর্ব্বলা নারী সে—তাহার কি শক্তি আছে? সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া নাস্তে কহিল, "তা হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে না! বেশ! আমি জানি আমার এখন এক পথ আছে—তবে বিদায় ক্লারিসা—এক উপায় আছে, দেখি—"

"কি সে উপায়?"

"মৃত্যু! এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে লোকের সামনে মুখ দেখাবে—নাস্তে তা পারবে না!"

নাস্তে ভাবিল, এবার ক্লারিসাকে বিচলিত করিয়াছে সে—এবার—। কিন্তু ক্লারিসা তেমনই অটল স্থির রহিল। সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। পর মুহূর্ত্তেই ক্লারিসা নাস্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তুমি আত্মহত্যা করবে? বেশ, আমারও এখন সেই পথ! এ জীবনে আমার আর সাধ নাই! এই কলঙ্ক, এই মিথ্যা, এই পাপ, এই গোপনতা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে! আর না—আমিও এ সমস্ত শেষ করে দিতে চাই।" ক্লারিসা কাঁপিতেছিল।

নাস্তে ক্লারিসার হাত ধরিল, কহিল, "সে কি? তুমি আত্মহত্যা করবে! কি ভয়ঙ্কর! এ দুর্ব্বুদ্ধি হঠাৎ তোমার মাথায় উঠল কেন? না, ক্লারিসা—তুমি আত্মহত্যা করতে পাবে না।"

নারীর দুর্ব্বলচিত্ত সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নাস্তের পক্ষে আত্মসম্বরণ

করা দুরূহ হইয়া পড়িল। একটা পাপ বাসনা তাহার মস্তিষ্ককে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

"অসম্ভব!" বলিয়া ন্যান্সে সিঁড়ির দিকে চলিল।

ক্লারিসা তদ্দণ্ডেই ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, তুমি?"

"যেখানেই যাই, বাধা দিওনা, ক্লারিসা, টাকা আমার চাইই!"

ক্লারিসা সজোরে নান্সের হাত ধরিয়া কহিল, "না—না—আমার কথা রাখ,—"

কি এক উন্মাদনা তখন নান্সেকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সে ক্লারিসার হাত ছাড়াইয়া লইল।

ক্লারিসা কহিল, "সাবধান নান্সে—তুমি যদি আর এক পা উপরে ওঠ, তাহলে এখনই আমি চীৎকার করে সকলকে জাগাব।"

"জাগাবে? জাগাও তুমি। সকলে স্পষ্ট আজ জানুক, তোমার দেবর নান্সে তোমার প্রণয়ী—আর সেই প্রণয়ী চোর, চুরি করতে এসেছে।"

কথাগুলা নান্সে ক্লারিসার কাণে কাণে কহিল। উভয়ে এতক্ষণ মৃদু স্বরেই কথা কহিতেছিল—পাছে, কাহারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে উভয়েই সতর্ক ছিল।

চিমনির আলো নিভিয়া আসিতেছিল—সেই উজ্জল রক্তিম আলোকে আজ নান্সের প্রকৃত মূর্ত্তি সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ক্লারিসার চোখে ধরা পড়িয়াছে! এই দুর্বৃত্ত দস্যুর জন্য ক্লারিসা ইহজগতের সমস্ত ধর্ম্ম, পুণ্য, স্বামী সব ত্যাগ করিয়াছে! হারে বুদ্ধিহীনা দুর্ভাগিনী,—এই পাপিষ্ঠকে তুই কাহার আসনে বসাইয়াছিলি? রুডিক, বেচারা, সরলহৃদয়, প্রেমানুরক্ত রুডিক—কি বলিয়া ক্লারিসা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? তাহার মত অভাগিনী কে আছে?

বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছিল—দুর্য্যোগ নামিয়াছিল। এ প্রাণের পক্ষে প্রলয়-রাত্রিই উপযুক্ত বটে!

সহসা দারুণ অনুতাপে ক্লারিসার সমগ্র চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কি করিয়াছে—কি হারাইয়াছে? নান্সে যখন সিঁড়ি বহিয়া সতর্কপদে উপরে উঠিতেছিল, চিরপরিচিত গৃহে চোরের মত নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছিল, ক্লারিসা তখন হলঘরের সোফায় ঝটিকাহতা ছিন্ন লতার মত লুটাইয়া পড়িল। তাহার চোখ বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল। বাধা ঠেলিয়া সঙ্কোচ ঠেলিয়া সে প্রাণ ভরিয়া আজ কাঁদিয়া বাঁচিল। পাছে উপরকার পাপ-অভিনয়ের কোন সাড়া তাহার শ্রুতির মূলে লাগিয়া এ ক্রন্দনে বাধা দেয়, অন্তরের এই আকুল অনুতাপকে কালিমা জর্জ্জরিত করে, এই ভয়ে এ দারুণ দুঃখেও দুই হাত দিয়া আপনার শ্রুতিরোধ করিতে ক্লারিসা ভুলিয়া যায় নাই! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীসীয় প্রভাব।

(Sylvain Leviর ফরাসী হইতে)

আমরা ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি। নাট্যের প্রথম উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শকুন্তলা পর্য্যন্ত ভারতীয় নাট্য কিরূপে ঠিক্‌ ধাপে-ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্য-ইতিহাস হইতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হই নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তটি কি অবশ্যম্ভাবী যে ভারতীয় নাট্য আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, পরন্তু পার্শ্ববর্ত্তী কোন দেশের পূর্ণপরিণত নাট্য-পাদপ আস্ত উঠাইয়া আনিয়া ভারতভূমিতে রোপণ করা হইয়াছে? প্রাচীনকালে যে সকল জাতি ভারতের সংস্রবে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল গ্রীকজাতিরই একটি নাট্য-সাহিত্য ছিল। অতএব গ্রীস হইতেই কি ভারত নাট্যকলা লাভ করিয়াছে? Mr. Weber যিনি ব্রাহ্মণ্যিক সভ্যতার উপর গ্রীসীয় প্রভাবের নিদর্শন দেখাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে, এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন।

"আমরা যে সকল ভারতীয় নাট্য-রচনার কথা অবগত আছি তাহারা সকলেই পরিণত রচনা। অবশ্য অধিকাংশ নাটকের প্রস্তাবনায়, উপস্থাপিত নাটকটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনার তুলনায় নূতন রচনা বলা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা কিছুই রক্ষিত হয় নাই। অতএব স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বাহ্লিক, পঞ্জাব ও গুজরাটে (কেননা, গ্রীক্‌ আধিপত্য ঐ সকল প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল) গ্রীক্‌ রাজার দরবারে গ্রীক নাট্যের অভিনয় দেখিয়া ভারতবাসীর অনুকরণ-স্পৃহা উদ্বোধিত হইয়াছিল কি না এবং উহাই ভারতীয় নট্যোৎপত্তির মূলীভূত কারণ কি না? অবশ্য ইহার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিক কতকগুলি তথ্য, এই সিদ্ধান্তটি সম্ভব বলিয়া নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করে। আর একটা কথা এই—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় নাটকগুলি ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রচিত হয়। তা ছাড়া, এই দুই জাতির নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে কোন আন্তরিক যোগ নাই।" (১)

এই সিদ্ধান্তের কথা এইরূপ সংযতভাবে ব্যক্ত করিয়াও তবু Weber সাহেবের মনে হইয়াছে তিনি যেন এ সম্বন্ধে একটু বেশী একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহার উত্তরবর্ত্তী গ্রন্থে তাঁহার উক্তির একটু সংশোধন করিয়াছেন। "মূলীভূত কারণ" এই বাক্যটির পরিবর্ত্তে তিনি এই বাক্যটি বসাইয়াছেন :— "ভারতীয় নাট্য-বিকাশের উপর একটা বিশেষ প্রভাব প্রকটিত হয়।" M. Pischel যিনি বোধ হয় পাশ্চাত্য সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের মধ্যে, ভারতীয় অলঙ্কার ও কাব্যসাহিত্যের

---

(১) Ind. Lit., 224 এবং টীকা।

সহিত সমধিক পরিচিত—তিনি সংক্ষেপে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন:—"গ্রীসীয় নাট্য-সাহিত্য,—ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যসংগঠনে একটা বিশেষ প্রভাব প্রকটিত করিয়াছিল,—যে ব্যক্তি এইরূপ কল্পনা করে, সে কি গ্রীক্, কি ভারতীয়—উভয় নাট্য-সাহিত্যসম্বন্ধেই সমান অজ্ঞতার পরিচয় দেয়।"

তাঁহার এই উক্তি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। এই প্রকার পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিগত অভিরুচির বিনিময়ে জ্ঞানের পরিসর কিছুমাত্র, বৃদ্ধি পায় না। M. Windischকে এইজন্য প্রশংসা করিতে হয় যে তিনি এই প্রশ্নটকে একটি সুনির্দিষ্ট, ও সারবান ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি গোড়ায় মানিয়া লইয়াছেন যে, ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের] সংগঠনে গ্রীক প্রভাবের হয় ত একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, এবং তাহার পর উভয় নাট্য-সাহিত্যের খুঁটিনাটি তুলনা করিয়া তিনি এই সম্ভাবনাকে বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার সন্দর্ভ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বর্লিনের প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তাদিগের বিচার-সভায় পাঠাইয়াছিলেন; ঐ বিচারসভার বিবরণ-পুস্তিকায় সন্দর্ভটি ছাপা হয়। পরে গ্রন্থাকারে পৃথকভাবেও প্রকাশিত হয়।

অ্যালেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ের পরে, প্রাচ্যভূভাগে যে সকল গ্রীক নাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সকল অভিনয়ের প্রমাণ-স্বরূপ কতকগুলি বচন M. Windisch প্রথমতঃ সংগ্রহ করিলেন; গ্রীস ও ভারত—এই উভয়ের মধ্যে কিরূপ যোগাযোগ ছিল সেই সম্বন্ধে Bohlen, Reinaud, Benfrey, Weber প্রভৃতি কর্তৃক যে সকল প্রমাণ লেখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও তিনি একত্র করিলেন। তিনি দেখাইলেন, যে, অ্যালেকজাণ্ডারের শিবিরে অনেকগুলি অভিনেতা ছিল, তাহারা অ্যালেকজাণ্ডারের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং তাহারা বড় বড় উৎসবে নাট্যাভিনয় করিত। কিন্তু এই সমস্ত প্রমাণ-লেখ্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিছুই সপ্রমাণ হয় না।

অ্যালেকজাণ্ডার ভারতের কেবল 'গা ছুঁইয়া' গিয়াছিলেন মাত্র। ঐতিহাসিকেরা যে গ্রীক্‌নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে উক্তি সুসিয়ানার সম্বন্ধে, পারস্যের সম্বন্ধে, পার্থিয়ার সম্বন্ধে আর্মিনিয়ার সম্বন্ধে,এবং গ্রীসীয় আধিপত্য-কেন্দ্রের অভিমুখী যে সকল প্রদেশ, সেই সকল প্রদেশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু বিনা প্রমাণেও একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, বাক্ত্রিয়ানায় গ্রীক্ রাজারা তাঁহাদের রাজদরবারে একটি গ্রীকনাট্য-সম্প্রদায়কে পোষণ করিতেন। কিন্তু ভারতীয় নাটকের আবির্ভাবের সহিত এই সকল নাট্যাভিনয়ের সম্বন্ধ কিরূপ নিবদ্ধ হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। ডেমেট্রিয়স ও মিনান্দরের ক্ষণস্থায়ী ভারত বিজয়ের কথা ছাড়িয়া দাও —সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে গ্রীক্ আধিপত্য রীতিমত স্থাপিত হইয়াছিল তাহা খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্ববর্তী প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই ভারত হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হয়; পাঁচ কিম্বা ছয় সাত বৎসর আরও পরে, কালিদাস স্বকীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইহা কি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া,ব্রাহ্মণিক কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে

গ্রীক্ আদর্শের অনুশীলন চলিয়া আসিয়াছে? এই অনুমানটি বিনা তর্কে স্বতই খণ্ডিত হইয়া যায়।

তবে কি এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে ৭০০ বৎসরের নাট্য-সাহিত্য, কোন চিহ্ন না রাখিয়াই একেবারে অন্তর্হিত হইল? উৎকৃষ্ট রচনা আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, একটা নাট্যকলা যে ধীরে ধীরে বিকসিত হইতেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। একথা যদি সত্য হয় যে গ্রীক্ নাট্যাভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে ভারত নাট্যকলা সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল,—তাহা হইলে ভারত অবশ্য নিজ রুচির উপযোগী করিয়া লইবার পূর্ব্বে, বিদেশীয় আদর্শের নকল করিয়া নাট্য-কলার অনুশীলন আরম্ভ করে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিদেশীয় সাহিত্য হইতে ধার করিবার সময়, গোড়ায় দাসবৎ অনুকরণ আরম্ভ হয় এবং এই অনুকরণ হইতে যে সাহিত্য প্রসূত হয় তাহাতে বরাবর একটা কৃত্রিমভাব, একটা 'টুলো-পণ্ডিতী' ভাব থাকিয়া যায়, এবং তাহার ফলে ঐ সাহিত্যের বিকাশ আড়ষ্ট হইয়া পড়ে—স্থগিত হইয়া যায়। ভাল পরিপাক না হওয়ায়, রক্তের সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়ায়, উহার উৎপাদিকাশক্তি চলিয়া যায়—উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। গ্রীক্‌নাট্য, ভারত-সাহিত্যে-মধ্যে অবিকল উঠাইয়া আনিলেও কখনই ভারতীয় নাট্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। যদি গ্রীক্ আদর্শ, ভারতীয় কবিদিগকে কেবল অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, যদি জীবন্ত ভারতীয় নাট্যকলার উপর একটা প্রভাব মাত্র প্রকটিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রভাবের সীমা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? ছয় বা সাত শতাব্দীব্যাপী ক্রমবিকাশের পর শেষ পত্রাঙ্কচিহ্নগুলি কিরূপে যথাযথরূপে নির্ণয় করা যাইবে?

এ কথা সত্য, Windisch একটা অপ্রচলিত কালগণনার পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া উপরি-উক্ত কাল-ব্যবধানকে আরও খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন:—"ভবভূতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ শতাব্দীতে, শ্রীহর্ষ ৬০০ শতাব্দীতে, কালিদাস আরও নিকটবর্ত্তী শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; নাটকের মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।" আপেক্ষিক কালগণনার দ্বারা সমর্থিত এই অস্পষ্ট উক্তিগুলিতে প্রকৃত কাল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হওয়া দূরে থাকুক, গবেষণার কার্য্য আরও বিপথে যাইবারই সম্ভাবনা। কালিদাস ও শূদ্রকের নাম, এইরূপ কুয়াসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট সুদূরবর্ত্তী কালে মিশিয়া গিয়াছে। M. Windisch ভবভূতিকে ছাড়াইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই; তিনি অবশিষ্ট ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যকে একেবারেই আমলে আনেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক রচনাগুলিই তিনি ধরিয়াছেন; কোন্‌টি কবির ব্যক্তিগত উদ্ভাবনা ও কোন্‌টি গতানুগতিক সাধারণ রচনামাত্র—তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে যে তুলনা অপরিহার্য্য, এইরূপে তিনি সেই তুলনা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহার ফলে নিত্যের স্থানে আগন্তুককে, নিয়মের স্থানে ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করিবার পক্ষে বিলক্ষণ সম্ভাবনা ও আশঙ্কা আছে।

আমরা শুধু পদ্ধতিটির দুর্ব্বলতা নির্দ্দেশ

করিলাম। এক্ষণে ঐ পদ্ধতি-নিঃসৃত সিদ্ধান্তের মূল্য কিরূপ তাহা বিচার করিয়া দেখিব।

M. Windisch স্বীকার করেন যে, এই ভারতীয় নাটকগুলির সহিত এস্কাইলস্ ও সফোক্লিসের ট্র্যাজেডির অল্পই সাদৃশ্য আছে। তাই তিনি "নূতন গ্রীক্ কমেডি"র উপরেই তাঁর তুলনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। "কি রোম, কি উজ্জয়িনী, সর্ব্বত্রই এই নূতন কমেডির প্রতিধ্বনি পৌঁছিতে পারে। কেননা, এই নূতন-কমেডি, মানব জীবনের সচরাচর ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত এবং উহাতে একটা স্থানীয় সুর থাকিলেও উহার মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি।"

নিজ পদ্ধতি সমর্থনের জন্য,—প্রাচ্যখণ্ডে গ্রীক্ অভিনয় সম্বন্ধে তিনি প্লুটার্ক হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল বাক্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হয় না। প্রথম উদ্ধৃত বাক্যটি সফোক্লিস ও য়ুরিপিডিস সম্বন্ধে, য়ুরিপিডিসের Bacchantes সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তাহাতে কমেডির কোন উল্লেখ নাই। M. Windisch যে কমেডিকেই তুলনার ভিত্তি-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। গ্রীক্ কমেডিতে বিশ্বমানবের সাধারণ লক্ষণ ও সাধারণ স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও, গ্রীক্ কমেডি অ্যাথেন্স্ হইতে রোমে স্থানান্তরিত হইবার সময়, অনেকটা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গ্রীসীয় সভ্যতা রোমীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। Plautus ও Terrance তাঁহাদের ছায়া-রচনাগুলি (adaption) লোকগ্রাহ্য করিবার জন্য দুইটি নাটক ও দুইটি আখ্যানবস্তু একত্র মিশ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে ইটালি গ্রীসের প্রতিবেশী ও আত্মীয় সেই ইটালির নিকট যদি গ্রীসীয় ভাব ও গ্রীসীয় রীতিনীতি সহজ-বোধ্য না হইল তবে যে ভারত,—কি প্রকৃতি, কি রুচি, কি মতবাদ, কি অনুষ্ঠান—সকল বিষয়েই গ্রীস হইতে এত তফাৎ, সেই ভারতের পক্ষে সেসমস্ত ত আরও দুর্ব্বোধ হইবার কথা। ঐ সকল গ্রীক্ নাটকে যে সামাজিক অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীর বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনা নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে। উহাদের আখ্যানবস্তু, শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার ও আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা ভারতবাসীর কৌতূহল উৎপাদন করিতেও অসমর্থ। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, উইনডিস সাহেবের সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন অনুমানই অনুকূল নহে। কিন্তু এ কথা সত্য, হৃদয়ের ভাবে রঞ্জিত কোন কথাই বাস্তব তথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। যদি উভয় নাট্য-সাহিত্যের রচনাপদ্ধতি ও পারিভাষিক খুঁটিনাটি তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কি উহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সুস্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে? আচ্ছা, ঐরূপ তুলনা করিয়াই দেখা যাক্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারিকেল।

অতি অল্প দিনের মধ্যে নারিকেল পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অতি নগণ্য অবস্থা হইতে এই ফল যেরূপ একটী অত্যাবশ্যক পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়োদ্দীপক। শুষ্ক নারিকেল শাঁসের রপ্তানি গত চারি বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার মূল্য টন প্রতি ১৯ পাউণ্ড হইতে ক্রমে ক্রমে ২৮ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নারিকেল বৃক্ষ সমূহের ফলোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি এবং নারিকেল-জাত-দ্রব্য-নিচয়ের ব্যবহারের পথ সুবিস্তৃত হওয়াতেই যে নারিকেলের এই অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, কোন সন্দেহ নাই।

অনেক দিন হইতেই নারিকেল তৈল সাবান নির্ম্মাণ কার্য্যে একটী অত্যাবশ্যক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মূল্যের সুলভতা ইহাকে এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়াছে। অন্যান্য অধিকাংশ তৈলাপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্টতর ফেণোৎপাদন করিতে সমর্থ এবং স্নানাগারের ব্যবহারোপযোগী সৌখিন গাত্রপরিষ্কারকর-সুলভ সূক্ষ্ম বিচিত্র বর্ণও ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক নারিকেল বহুল পরিমাণে রন্ধনশালে এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বহুদিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়েই নারিকেলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। নারিকেলের কতকগুলি বিশেষ দোষ ইহাকে বিস্তৃততর ব্যবহারের অনুপযোগী করিয়াছিল। আহারোপযোগী হইলেও নারিকেল তৈলের তীব্র নারিকেলগন্ধ ঘুচিত না। বিশেষতঃ, নারিকেল শাঁস কতিপয় জীবাণুবিস্তারের একটী উৎকৃষ্ট পরিচালক হওয়ায়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া উঠিত; এবং নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি সুকৌশলে নির্ব্বাহিত হইলেও জীবাণুসমূহকে পৃথক করা যাইত না।

সময়ক্রমে কতিপয় বিচক্ষণ রসায়নতত্ত্ববিদ্ আবির্ভূত হইয়া নারিকেলদ্রব্যজাতের পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা সমূল দূর করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নারিকেল তৈলের সুপ্রাবশিষ্ট গন্ধ দূরীভূত এবং উহার অম্লোৎপাদনপ্রবণতা নিরাকৃত হইল। ফলে নারিকেল ব্যবহার সহস্র পথে উন্মুক্ত হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত নগণ্য অবস্থার তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে ইহা সহসা সভ্যজগতের তাড়িতালোকিত বিপণিনিচয়ের পণ্যবীথিকার মধ্যে একটী বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া লইল। অধুনা ইহার ব্যবহার প্রণালী সহস্রবিধ। সাবান নির্ম্মাণকার্য্যে ইহা এখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই উপযোগী। নারিকেল শাঁস এখনও শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার রন্ধনশালায় ও মিষ্টান্নবিপণিসমূহের ব্যবহারার্থ বহুল পরিমাণে প্রেরিত হয়। লণ্ডনস্থিত একটী কারখানাতেই দৈনিক নব্বই সহস্র নারিকেল ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, বহুতর নূতন বিষয়ে নারিকেল বিশেষরূপ উপযোগী। ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে নানারূপ

মলম ও পমেটম প্রস্তুত করিতে ইহা প্রাণীজাত চর্ব্বির স্থান প্রভূত-পরিমাণে অধিকার করিয়াছে। ক্ষয়কাশ ও তৎসদৃশ রোগে ইহা কডলিভার তৈলের ন্যায় ফল-প্রদ, অথচ অধিকতর সুস্বাদু। অন্যান্য বহুবিধ চর্ব্বি অপেক্ষা বহু পরিমাণে ও অল্পায়াসে জলশোষণ করে বলিয়া ইহা মার্গেরিণ নির্ম্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের এই শেষোক্ত গুণ প্রকাশ পাওয়ার অতি অল্প দিনের মধ্যে, পরীক্ষার ফলে, ইহা হইতে একপ্রকার মাখন প্রস্তুত হইতেছে, যাহা কি গুণে, কি পুষ্টিকারিতায়, গোদুগ্ধোৎপন্ন নবনীত অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। অতি বড় ভোজন-বিলাসীও জীবদেহোৎপন্ন মাখন হইতে ফলজাত এই মাখনের পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হন না। নারিকেলের চর্ব্বি আকারে এবং সাধারণ ধর্ম্মে জীবজাত চর্ব্বির এতই অনুরূপ যে, তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা সুকঠিন এবং পাশ্চাত্যদেশের কোন গৃহকর্ত্রীই পিষ্টকনির্ম্মাণে একবার এই নারিকেলোৎপন্ন চর্ব্বির ব্যবহার করিয়া পুনরায় জীবজাত চর্ব্বি ব্যবহার করিতে সম্মত হন না।

নারিকেলের চর্ব্বি বিস্ফোটক, ক্যান্সার অথবা অন্য কোন আশঙ্কাজনক রোগোৎপাদন করে না, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। শ্বেতবর্ণ ক্রিম-প্রস্তুত কার্য্যেও নারিকেল তৈল ব্যবহৃত হয়। এইরূপে, দৃষ্ট হইবে যে, নারিকেল তৈলের ব্যবহারপ্রণালী বহুবিধ। এমন কি, যখন কারখানায় শুষ্ক নারিকেলশাঁসের সমুদায় ব্যবহার নিঃশেষ করিয়া ইহার সমস্ত সার নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হইয়াছে মনে হয়, তখনও ইহার ত্যক্তাবশেষ অব্যবহার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, গবাদির পুষ্টিকর ও মূল্যবান্ খাদ্যে পরিণত হয়।

নারিকেল তৈলের শারীরিক পুষ্টিকারিতা, ইউরোপে আবিষ্কৃত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। আমেরিকাও ইহার গুণ সম্বন্ধে অধিক-দিন অজ্ঞান থাকে নাই। আজ সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ ব্যাপিয়া নারিকেল-তৈলের ব্যবহার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে তথায় নারিকেল তৈলের প্রয়োজন এতই অধিক যে, এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কলকারখানা কেবল তিসি, কার্পাস বীজ প্রভৃতি লইয়াই কারবার করিতেছিল, তাহাদিগকে এক প্রকার বাধ্য হইয়াই নারিকেলের শরণ লইতে হইয়াছে।

জার্ম্মানীতেও এই তেলের ব্যবহার আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবলমাত্র নারিকেল উৎপন্ন মাখনের দৈনিক পরিমাণই ১২০ টনের অধিক এবং নারিকেলের সর্ব্ব সমেত আমদানী বৎসরে এক লক্ষ টন! ফ্রান্সের ন্যায় নারিকেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমদানীর স্থানেও নারিকেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই নারিকেলের অভাব অনুভূত হইতেছে। কতিপয় বৎসর পরে এ বিষয়ে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে যে নারিকেলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে এবং কালক্রমে, ইহার প্রসার এমন সুবিস্তৃত হইবে যে, সর্ব্ব দেশের নারিকেল-উদ্যান-অধিকারীই তখন আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রয়োজনীয় বৃক্ষের আদিম উৎপত্তি স্থান এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ইহা দক্ষিণ সাগরস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ অথবা ভারতীয় উপকূলভাগ হইতে প্রথম রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। কিন্তু কোন্ আদি জন্মস্থান হইতে ইহা প্রথম প্রসারলাভ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। নারিকেলের নির্ম্মাণকৌশল—ইহার আকৃতি, কঠিন ত্বক, অভ্যন্তরে জলপূর্ণ বাহিরাবরণ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এইরূপ অনুমিত হয় যে, প্রকৃতিদেবী ইহাকে ৬০.৭০ ফুট উচ্চ হইতে পতন-জনিত আঘাত এবং দীর্ঘকালব্যাপী নিমজ্জনঘটিত অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নারিকেল বৃক্ষের আদিম বাসস্থান যেখানেই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, ইহার ফলসমূহ—বৃক্ষশির হইতে স্খলিত হইয়া বালুময় তীর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে সমুদ্রজলে পতিত হইত। এবং তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে সৈকত-ভূমির যে যে স্থানে নীত হইয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তথায় অঙ্কুরোৎপাদন করিয়াছিল। এইরূপে, কালক্রমে, নৈসর্গিক নিয়মে, নারিকেল বৃক্ষ ভূভাগের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অবশিষ্ট কার্য্য মানবহস্ত দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ফলস্বরূপ, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নারিকেল বৃক্ষ সমগ্র গ্রীষ্মমণ্ডলের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান, যাবা, সিংহল, বর্ণিয়ো, সিঙ্গাপুর, মানিলা, পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অন্যান্য নানা প্রদেশই স্ব স্ব অংশ দানে পৃথিবীর পণ্যশালায় নারিকেলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

শ্রীদীনবন্ধু সেন বি, এল।

কৃষকের কাহিনী।

উত্তর এলবামার রেল সেতুর উপর দাঁড়াইয়া একজন লোক নিম্নস্থিত জল প্রবাহ দেখিতেছিল। উষার ক্ষীণালোক তখন চারিদিকের কুয়াশা ভেদ করিয়া দেখা দিয়াছে। তরুণ সূর্য্যের অরুণ আভায়, নদীর জল ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছিল। লোকটীর হস্ত দুইটী পশ্চাৎদিকে শক্ত করিয়া বাঁধা; এবং কোমরে বেষ্টিত মোটা দড়িটী সম্মুখে একটী লম্বা বাঁশে আবদ্ধ। একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে দুইজন সৈনিকবেশী ঘাতকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সে রেলের লাইনের উপর অসংলগ্নভাবে রক্ষিত কাঠের তক্তার উপর দাঁড়াইয়াছিল। সেতুর অপর পার্শ্বে এই সৈন্যদলের কাপ্তেন মুক্ত তরবারি হস্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। রেলসেতুর দুইদিকে প্রথমে ও শেষে বন্দুক-হস্তে দুইজন প্রহরী পাহারা দিতেছিল। তাহাদের স্থির ও সোজা ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দুইটী প্রস্তরমূর্ত্তি সেতুকে পরিশোভিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা জানিত না আজ এই সেতুর মাঝে কি ভীষণ দৃশ্য সংঘটিত হইবে। তাহারা

মনে করিয়াছিল কেবল পথ রুদ্ধ করিয়া রাখাই তাহাদের কাজ। তাহারা জানিত না এই সঙ্কীর্ণ উচ্চ সেতুর মাঝে একটী পুণ্য আত্মার উপর অনন্তকালের জন্য অবিচ্ছিন্ন যবনিকা পতিত হইবে!

নদীর দুই ধারে জনহীন ও অন্তহীন প্রান্তর পড়িয়া আছে। রেললাইন সেতু অতিক্রম করিয়া সেই জনহীন প্রান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু প্রান্তরের মধ্যে বক্রগতি অবলম্বন করায় সেতুর উপর দাঁড়াইয়া বেশীদূর আর লাইন দেখিতে পাওয়া যায় না; লোক চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া যায়। নদীর ধারে একটু উচ্চস্থানে কামানের গোলার দ্বারা ছিদ্রিত কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে এবং সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট কামানের মুখ সেতুর দিকে তাকাইয়া আছে। অদূরে নদীতীরে একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে একদল পদাতিক সৈন্য বন্দুকের উপর ভর দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেনাধ্যক্ষের উন্মুক্ত তরবারি তরুণ সূর্য্যের আলোকে চকচক্ করিয়া উঠিতেছিল। তাহারা আগ্রহে ও ভয়পূর্ণনেত্রে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ সেতুর মধ্যস্থিত সৈন্যদের কার্য্য দেখিতেছিল। সেতুর চারিধারে তখন পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছিল। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত যেন অবিচলিত। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যেন আজ কোন ভয়াল রুদ্র অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় শান্তশিষ্টের মত ধীরস্থিরভাবে চাহিয়া আছে। মৃত্যু যখন আপনার আগমনকে চারিদিকে বিজ্ঞাপিত করিয়া উপস্থিত হয় তখন বুদ্ধিমানেরা এই রুদ্র অতিথিকে প্রেমাস্পদের মত অত্যন্ত আনন্দের ও স্থিরতার সহিত আলিঙ্গন করিয়া লয়। তাই আজ এখানে এত শান্তি ও নীরবতা!

যে মানুষের উপর আজ মৃত্যু যবনিকা পতিত হইবে তাহার বয়স ৩৫ বৎসর। তাহার মুখের কমনীয়তা, অবিচলিতভাব, প্রসারিত কপাল, চক্ষের করুণদৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে একজন ভদ্রলোক। তাহার কোঁকড়ান চুল সমস্ত মস্তক আবৃত করিয়া পিঠ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে একজন উচ্চশ্রেণীর কৃষক। তাহার স্নেহের, বিনয়ের ও মহত্বের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল কোনরূপ হীন কার্য্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সৈন্য দুইজন ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তিকে তক্তার একধারে দাঁড় করাইয়া অন্যধারে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহারা কাপ্তেনের সাঙ্কেতিক আদেশে তক্তা হইতে সরিয়া পড়িবে, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে হতভাগ্য ব্যক্তি তক্তার সহিত লাফাইয়া উঠিয়া, হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায়, সেতুর মধ্য দিয়া অতল জলস্রোতের মধ্যে ডুবাইয়া যাইবে! এই সকল দৃশ্য ও আয়োজন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে একবার সেতুর নীচে চাহিয়া দেখিল, উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত দুকূল ভাসাইয়া প্রলয় গর্জ্জনে দূরে এই জলপ্রবাহের উপর প্রবাহিত একটী কাঠের টুকরার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়! আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এই কাঠের মতই প্রাণহীন বাক্যহীন অবস্থায় সে কোন

অপরিমিত কালের কোন্ সীমাহীন, অন্তহীন পারাবারের মধ্যে ভাসিয়া চলিবে কে জানে! এক অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ হৃদয়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আনিয়া দিল। একবার চক্ষু বন্ধ করিবা-মাত্র সে দেখিল তাহার সেই তরুচ্ছায়া নীরব গৃহপ্রাঙ্গণ; আর গৃহপ্রাঙ্গণে তাহার স্ত্রীর করুণ মুখচ্ছবি সন্ধ্যাতারকার মতই সমুজ্জ্বল! তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ অনন্ত অন্ধকার রাত্রিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে একবার তাহার তরুণীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসে, এবং চুম্বনদ্বারা তাহার একমাত্র শিশুর হৃদয়ে, বিদায়ের শেষ ছবি অঙ্কিত করিয়া দেয়! হায়! মূর্খ মানব, যে পর্য্যন্ত না শেষ আশা তোমার সমস্ত ভ্রান্তিকে চূর্ণ করিয়া ছায়ার মত অদৃশ্য হইয়া পড়ে সে পর্য্যন্ত কুহকিনী আশাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়!

এই বিচ্ছেদ বেদনার সহিত খুব মিশাইয়া আর একটা শব্দ তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে। একবার মনে হইল খুব নিকটে—তাহার হৃদয়ের মধ্যে, আবার মনে হইল যেন একটা ক্ষীণ শব্দ অনেক দূর হইতে আসিতেছে। ক্রমশ তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহার বুকের উপর হাতুড়ির আঘাত করিয়া হাড়গুলকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে স্থির থাকিতে পারিল না। একবার কাঁদিবার উপক্রম করিল। আবার একটু স্থির হইয়া দেখিল ইহা পকেটে রক্ষিত ঘড়ির টিক্ টিক্ ধ্বনি ব্যতীত কিছুই নয়। তখন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত তাহার মুখে হাসি দেখা দিয়া চিরান্ধকারে মিশাইয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া আবার সেই উন্মত্ত জলস্রোত দেখিবা মাত্র বেতসলতার মত তাহার হাড়গুলি কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল "আজ যদি আমি এই শক্র এবং এই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে জলপ্রবাহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এবং জলমগ্ন অবস্থায় সাঁতার দিয়া ইহাদের বন্দুকের গুলি হইতে নিশ্চয় রক্ষা পাইব, তার পর তীরে উঠিয়া এই শক্রদের অপরিচিত—আমার কুটীরে অনায়াসে যাইয়া দেখিব আমার স্ত্রী ভালবাসাপূর্ণ করুণনেত্রে আমার জন্য বসিয়া আছে এবং আমার শিশুর হাসির তরঙ্গে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত!" তাহার এই ভাবের উচ্ছ্বাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাপ্তেনের আদেশে সেই দুইটী সৈন্য তক্তা হইতে অলক্ষিতে সরিয়া পড়িল!

(২)

পেটন্ ফার্কার একজন উচ্চশ্রেণীর সদ্বংশজাত কৃষক; কৃষক বলিয়া সর্ব্বদা আপনার জমাজমা লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত না; দেশের উন্নতির জন্য একজন স্বদেশপ্রেমিকের মত সর্ব্বদা চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিত। স্বদেশপ্রেমিক হইয়াও সে যে কেন এখনও আপনার দেশের সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিয়া ফেডারেল (federal) সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে নাই তাহা আজও পর্য্যন্ত কেহ উত্তমরূপে মীমাংসা করিতে

পারে নাই। কিন্তু পত্নীপ্রেমে ও শিশুর ভালবাসায় আবদ্ধ একজন গৃহস্থের নিকট ইহার জীবন অবিদিত নাই। ফেডারেল সৈন্যগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেশের স্বাধীনতা এক প্রকার বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এবং যেটুক অবশিষ্ট আছে নানা উপায় অবলম্বনে তাহা নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বদেশের উপকারের জন্য দেশের সৈন্যদের সহিত যোগ দিতে না পারায় ফার্কার তুষের আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সৈনিকের মুক্ত জীবনলাভের জন্য সে এখনও লালায়িত। আত্মসম্মান নষ্ট না করিয়া স্বদেশের জন্য সর্ব্বপ্রকার হেয় ও ঘৃণিত কার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে তরুচ্ছায়াতলে একটী উচ্চ বেঞ্চে বসিয়া ফার্কার ও তাহার স্ত্রী গল্পে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে এক তৃষ্ণার্ত্ত অশ্বারোহী সৈনিক তাহার নিকটে আসিয়া জল প্রার্থনা করিল। মিসেস ফার্কার জল আনিবার জন্য গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলে, ফার্কার উহাকে নির্জ্জনে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে বলিল "ফেডারেল সৈন্যগণ এই দেশে প্রবেশ করিয়া আউলক্রিক সেতু পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এখন তাহারা রেল লাইন মেরামত করিতে ব্যস্ত। তাহাদের সেনাধ্যক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যদি কেহ সেতুর উপর, রেলরাস্তায় বা রেলগাড়ীর নিকট আসিয়া এই মেরামত কার্য্যে বাধা প্রদান করে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাবিচারে ফাঁসি দেওয়া হইবে। আমি নিজ চক্ষে এই ঘোষণা পত্র দেখিয়া আসিয়াছি।"

সে জিজ্ঞাসা করিল "এখান হইতে আউলক্রীক সেতু কত দূর?"

"প্রায় ৩০ মাইল।"

সেতুর পার্শ্বে এখনও কি বিপক্ষ সৈন্যেরা পাহারা দিতেছে?"

"হাঁ, একটী ক্ষুদ্র সৈন্যশ্রেণী এবং সেতুর উপর কয়েকটী সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত আছে।"

তারপর সে একটু হাসিয়া নির্জ্জনে সৈনিককে কহিল "মনে কর আমার মতন একজন সামান্য কৃষক যদি ঐ ক্ষুদ্র সেনাশ্রেণী পার হইয়া এবং প্রহরীদের চক্ষে ধুলা দিয়া আউলক্রীক সেতুর মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে দেশের জন্য কি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে?"

একটু চিন্তার পর সৈনিক ফার্কারের প্রতি, তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া গোপনে কহিল, "আমি দুই মাস পূর্ব্বে সেই সেতুর নিকট ছিলাম এবং দেখিয়াছি সেতুটী সম্পূর্ণরূপে কাঠ দ্বারা প্রস্তুত, গত বৎসরের জলপ্লাবনে অনেক শুষ্ক কাঠের গুঁড়ি ভাসিয়া আসিয়া সেতুর দুই পার্শ্বে সমবেত হইয়াছে। সাহস করিয়া এই শুষ্ক কাঠে আগুন দিতে পারিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত সেতুটী ভস্মে পরিণত হইয়া শত্রু আগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিবে।" এমন সময়ে মিসেস ফার্কার জল লইয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল এবং জলপান শেষ হইলে মিসেস ফার্কারকে ধন্যবাদ দিয়া সৈনিক বিদায় গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য এই ছদ্মবেশী অশ্বারোহী বিপক্ষ ফেডারেল সৈন্যদের গুপ্তচর।

(৩)

অজ্ঞান ও অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় সেই সেতুর মধ্য দিয়া কার্কার ভীষণ জলস্রোতের উপর পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহার একটু জ্ঞান হইল। কত যুগ যুগান্তর পরে যেন আজ তাহার মোহ-নিদ্রা কাটিয়া গিয়াছে; কত কাল পরে যেন আজ সুখদুঃখ বর্জ্জিত অন্ধকার ও আলোকের সম্মিলন স্থানে এক নব জগতের মায়ায় মধ্যে চির নিমজ্জিত হইয়া আছে।

সে সমস্ত দেহে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল এবং বেদনায় কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল আজ যেন কে দেহের মধ্যে তরল অনলপ্রবাহ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রক্তবর্ণ লৌহ শলাকার মত উত্তপ্ত ও জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। বহির্জগতে সুখদুঃখ, আনন্দ আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের কথা, কি এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক মায়াবলে তাহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে এই অন্ধকার জলপ্রবাহের মধ্যে তরুণ সূর্য্যের আলোকছটা পুরাতন জগৎকে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিল। তখন সহসা তাহার সেই সেতুর মধ্য দিয়া অজ্ঞান অবস্থায় জল পতনের কথা মনে পড়িল এখনও সেই মোটা দড়ি দ্বারা তাহার হাত ও গলা সম্পূর্ণরূপে বাঁধা।

বেদনাকাতর কার্কার আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্রমে তরুণ সূর্য্যের আলোকছটা ক্ষীণ হইয়া আসিল। কত দেশ দেশান্তরের মধ্য দিয়া, কত নদী পর্ব্বত মাঠ অতিক্রম করিয়া যে আলোক তাহাকে বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছিল তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল।

একটু জ্ঞান হইলে সে দেখিল যে, সে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহার হাত বাঁধা। এতক্ষণ সে হস্ত চালনা না করিয়া কেবলমাত্র স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিয়াছে। এখন হস্তকে মুক্ত না করিলে আর চলে না; তাহার সমস্ত দেহ অবশপ্রায়। সে জলের মধ্যে প্রাণপণ করিয়া বাহুকরের মত সমস্ত শক্তি দ্বারা ঝাঁক মারিল। আজ এই জলের মাঝখানে কে তাহাকে এত সাহস, এত অদম্য শক্তি দিয়াছে? মুহূর্ত্ত মধ্যে হাতের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। তার পর মুক্তহস্ত দ্বারা গলার দড়ি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবামাত্র জল সর্পের মত কাঁপিতে কাঁপিতে সেই গুলি অতল জলে ডুবিয়া গেল। বেদনায় কাতর হইয়াও সে উৎসাহের সহিত তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সম্মুখে বনের মধ্যে অসংখ্য গাছের শ্রেণী, গাছের প্রত্যেক পাতা, ডাল বায়ু হিল্লোলে কম্পমান; বড় বড় মাকড়সা জাল বিস্তীর্ণ করিয়া আহারের আশায় বসিয়া আছে। শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর তরুণ সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হইয়া নানা বর্ণ বিকীর্ণ হইতেছে। বড় বড় জলফড়িঙের গুণগুণধ্বনি পাখীর সঙ্গীতের সহিত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব বিশ্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানাবর্ণে চিত্রিত প্রজাপতির শ্রেণী তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য সে এক প্রকার

ভয় তাহার মন হইতে দূরীভূত হইয়া গেল। কিন্তু অন্য দিকে চোখ ফিরাইবামাত্র সেই ভয়ঙ্কর সেতু সে পুনরায় দেখিতে পাইল। সেই সৈন্যেরা নীল আকাশের গায় প্রস্তর মূর্ত্তির মত তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া তাহারা গুলি করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের দ্রুতপদবিক্ষেপ এবং চীৎকার শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন একদল ভূতের তাণ্ডব নৃত্য।

অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে কি যেন তীব্রবেগে ছুটিয়া তাহার মস্তকের সম্মুখে জল ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল। তখন আর তাহার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল সৈন্তেরা তাহাকে গুলি করিতেছে। সে আবার স্রোতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। নায়াগ্রার জল প্রপাতের মত জলস্রোত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিয়া সে পুনরায় তীরে উঠিয়া দেখিল তাহার সমস্ত হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছে। চোখের পাতা ফুলিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বিশ্রাম করিতে করিতে পুনরায় তাহার সম্মুখে একটী গুলি আসিয়া সমস্ত জলকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তখন সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; পাগলের মত দৌড়াইয়া দূরে একটি মাটির স্তূপের অপর পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল। সেখানকার সুন্দর ফুলের গন্ধে পাখীর গানে তাহাকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার পক্ষে বিশ্রাম কোথায়? শান্তি কোথায়? কিছুক্ষণ পরেই সশব্দে কয়েকটী কামানের গুলি আসিয়া তাহার মস্তকের উপরে স্থিত গাছের ডাল ভগ্ন করিয়া তাহার গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। অন্য উপায় না থাকায় সে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর সমস্ত দিন এই বনের মধ্যে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় একটী প্রকাণ্ড নির্জ্জন রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রাস্তার ধারে কোন মানুষের বাসস্থান ছিল না। দুধারে কেবল অন্তহীন নির্জ্জন মাঠ। মধ্যে মধ্যে মাঠের ধারে নানাপ্রকার বৃক্ষশ্রেণী ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভ শ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। গাছের মধ্য দিয়া সে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল আকাশ তারায় আচ্ছন্ন; আর অনন্ত গগনব্যাপ্ত নিঃশব্দতাকে ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে পাখীর ক্ষীণ সঙ্গীত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নাসুপ্ত পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া তাহার বোধ হইতেছিল যেন প্রকৃতিদেবী দুঃখের পর তাহাকে শান্তি ও আনন্দ দিবার জন্য অন্ধকার নিশীথিনীকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার সম্মুখে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ও বিহগসঙ্গীতপূর্ণ পৃথিবীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে চলিতে চলিতে সে গলায় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল; চক্ষু ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। পা এত ফুলিয়া গিয়াছে যে আর সে চালনা করিতে পারিল না। তাহার বোধ হইল যেন তাহার চারিদিকে পৃথিবী অবিশ্রান্ত ভাবে ঘুরিতেছে। সে অবসন্ন হইয়া বৃক্ষছায়াতলে শুইয়া পড়িল।

তখন জ্যোৎস্নার আলোক একটু ম্লান হইয়া আসিয়াছে; সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া বাতাস বহিতেছে। ফার্কার ঘুমাইয়া পড়িল; এখন সে অনন্ত নিদ্রার মধ্যে প্রবেশ

করিতে প্রস্তুত! এই অনন্তরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিল অনেক পথ অতিক্রম করিয়া সে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বারান্দায় তাহার অপেক্ষায় মিসেস্ ফার্কার দাঁড়াইয়া আছে। আজ সে কত সুন্দরী! কত লাবণ্যময়ী! সৌন্দর্য্য যেন তাহার চারিদিকে পদ্মফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! ফার্কার গৃহ ছুটিয়া তাহার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিতে গেল। কিন্তু এই সময় কি এক তীব্র বেদনায়, স্ত্রী গৃহ, সমস্তই মুহূর্ত্তের মধ্যে মায়ার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী সাদা হইয়া ক্রমে কালো হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে হিমানীসিক্ত চির অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

* * * *

কয়েক দিন পরে ফার্কারের মৃতদেহ দড়ীবাঁধা অবস্থায় আউল ক্রীক সেতুর নীচে ভাসিতে দেখা গিয়াছিল।

শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সন ও দিন।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণলে, স্বনামখ্যাত ডাক্তার ফ্লিট বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডক্তার মহাশয় বলিতেছেন যে, যে সময় বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রচলিত কোন অব্দ ছিল না। এবং সেই জন্য আমরা এ বিষয়ে সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। ভারতীয় ইতিহাসের তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাধিরোহণের তারিখ হইতে তাহা গণনা করিতে হয়। গ্রীকদিগের বর্ণিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত ৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ ও ৩১১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনারোহণ করেন এবং সকল দিক বিবেচনা করিলে ৩২১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দই তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ কাল বলিয়া বোধ হয়। দীপবংশ ও মহাবংশ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজ্যাভিষেকের মধ্যে ৫৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশ্য ঠিক যে ৩৬৫ দিনের ৫৬ বৎসর অতীত হইয়াছিল তাহা নহে; অর্থাৎ ৫৬ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টের জন্মের ২৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অশোক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এ দুই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের অভিষেক সম্পাদিত হইয়াছিল। এ স্থলেও, আমরা ঠিক ২১৮ বৎসর ধরিতে পারি না। অর্থাৎ ২১৭ বৎসর অতীত হইলে এই অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সে হিসাবে খৃষ্টের জন্মের ৪৮৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ফ্লিটের মতে এই তারিখ একেবারেই ঠিক তাহা নহে; তবে সকল দিক বিবেচনা করিলে ইহাই একপ্রকার স্থির বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

দিন সম্বন্ধেও দুইটী মত আছে। প্রথম

কিংবদন্তী এইরূপ যে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কিংবদন্তী মতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম দিবসে এই চিরস্মরণীয় ঘটনা সম্পাদিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, শেষোক্তটীই অধিক বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু অধিকাংশ লোকে প্রথমোক্তটীই গ্রাহ্য করেন।

লঙ্কা, ব্রহ্ম ও শ্যাম রাজ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী মতে ৫৪৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্লিটের মতে, ইহা আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নহে। এই তারিখ অনুসারে গণনা করিলে অশোকের রাজ্যাভিষেক উৎসব ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিতে হয়। ডাক্তার ফ্লিটের মতে ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের যোগ্য। কেননা, অশোকের পিতামহ চন্দ্র গুপ্তের রাজ্যারম্ভ এই সময়ে হইয়াছিল।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে এ সময়ে অশোকই মগধের রাজা এবং আলেকজান্দারের অভিযান সেই সময়েই ঘটিয়াছিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সত্যবালা দেবী।

সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই নিঃসন্দেহ সত্যবালা দেবীর নাম অবগত আছেন। এই বঙ্গরমণী স্বামীসহ সুদূর প্রবাসে বীণাবাদন এবং রাগরাগিণী গান করিয়া, সে দেশে হিন্দুসঙ্গীত প্রচার করিতেছেন।

তরুণবয়স্কা বঙ্গরমণীর পক্ষে এরূপ চেষ্টা ও সাধনা—একদিকে যেমন অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার পরিচায়ক—অন্যদিকে সেইরূপ যে দেশগৌরববৃদ্ধিকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিনী পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সত্যবালা দেবীর এই মঙ্গলকার্য্যে আকৃষ্টা হইয়া, তাঁহাকে সহানুভূতিপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহার ছবি ও বিজ্ঞাপনাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ছবিখানি ভারতীতে প্রকাশিত হইল।

সঙ্গীত-বিদ্যায় তিনি বাস্তবিক কতদূর পারদর্শী স্বকর্ণে তাঁহার গীতবাদ্য না শুনিলে

সম্যক্ বুঝিবার উপায় নাই। তবে বঙ্গনারী প্রবাসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে স্বদেশীয় সঙ্গীতের মহিমা প্রচার করিতেছেন শুনলে সকলেরি আনন্দ হয়। শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর স্বামী ডাক্তার দেশাই চিকিৎসা ব্যবসায়ী একজন শিক্ষিত গুজরটী ভদ্রলোক। ইনিও নিউইয়র্কে হিন্দুধর্ম্ম এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

শিবরাত্রি।

জীবন্ অরণ্যে মন লুব্ধকের বেশে
ছিল মত্ত মৃগয়ায়, এবে লক্ষ্য তার
স্কন্ধে মৃতবৎ সম; দুঃখ নিশা এসে
তৃষ্ণা রক্ত যুগ্ম চক্ষে ঢালে অন্ধকার।
আশ্রয় সংসার তরু আঁকড়ি দুহাতে
ধরি আছে ভীত মনা, আর্ত্ত বিকম্পিত,
ব্যথিত নয়ন হ'তে শুষ্ক পত্র সাথে
মুহুঃ মোহ অশ্রু ধারা হয় বিগলিত।
সে কণ্টকী বৃক্ষতলে ওগো মহেশ্বর,!—
তুমি যে জাগিয়া আছ জানে না অজ্ঞান!
সে শুষ্ক পল্লব দল সে অশ্রু নির্ঝর
তোমার পূজার আজ শ্রেষ্ঠ উপাদান!
শুভ্রা এই রাত্রি বাহে শোক মোহ তার
পূজা রূপে পরশিছে চরণ তোমার!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

চৈত্র

আজ এসেছে ফিরিয়া চৈত্র,
বহি স্নিগ্ধ, মধুর হাস;
তার মদির পুলকে, নেত্র,
হের মেলিছে কুসুম রাশি।
পড়ে ক্লান্ত পবন লুটায়ে,
ভাঙ্গ বিকশিত কলিকায়
মম অন্তর মাঝে ফুটায়ে
শত ভাব নব সুষমায়।
ওগো এসেছে বরষ অন্তে,
চির পুরাণো প্রেমের অতিথি;
ধরা মুরছে চরণ প্রান্তে,
উঠে শিহরিয়া কুঞ্জবীথি।
যত বসন্ত আসে জীবনে,
তার ফুলগুলি অবচয়ি,
কত বাসনা যে জাগে প্রাণে
মালা গেঁথে নিতে শোভাময়ী।
সেষে আসে শুধু যেতে ফিরে;
দিয়ে চকিতের মত দেখা;
শেষে নয়ন ভরিয়ে নীরে
রবে বিদায়ের ব্যথা লেখা।
তার স্মরণে গাঁথিব মালা,
যবে স্মৃতি রবে একাকিনী;
শুধু নিভৃতে কাটিবে বেলা,
জেগে কেটে যাবে নিশীথিনী।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা কাঞ্জিলাল।

বিভ্রম।

প্রথম চাকরি পাইলাম শিমলা পাহাড়ে। বিবেচনা এবং পরামর্শ উভয়েই উপদেশ দিল যে অজ্ঞাত বিদেশে একেবারে প্রথমেই স্ত্রীটিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। সুন্দরী অল্পবয়স্কা স্ত্রী আজকালকার দিনে বিপজ্জনক না হইলেও সুবিধাজনকও নহে। কারণ, তাঁহার সমস্ত ভার আমাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু আমার কোনও ভার তাঁহাকে বহন করিতে দেওয়া আজকালকার সভ্যযুগে ভদ্রোচিত হইবে না। বহুযুগের কুসংস্কারের প্রভাবে অদ্যাবধি আমাদের স্ত্রীগণ আমাদিগের দ্বারা জুতার লেস বাঁধাইয়া লইতে একটু ইতস্ততঃ করেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণহস্ত হইতে দৈবাৎ রুমালখানি পড়িয়া যাইলে আমরা তাহা উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা হইতে আশা হয় যে অচিরাৎ আমাদের জাতির পরিচ্ছদ হ্যাট্-কোট এবং আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ মেম হইয়া উঠিবেন।

আমার স্ত্রী ততোধিক সভ্য না হইলেও বর্ত্তমান যুগের প্রভাব তাঁহাতে কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছেই। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তা'হলে হ্যাট্‌কোট প'রে আমি বাবু-ওয়ালা সাজি আর তুমিও যা হয় একটা জড়িয়ে নিয়ে মেম হয়ে পড়—নাহ'লে এমন বেশে সেখানে গিয়ে ত' আর হোটেলে উঠ্‌তে পারব না।"

অগত্যা স্ত্রী বলিলেন "তবে শিমলায় গিয়ে একটা বাড়ি ঠিক করে মাস খানেকের মধ্যেই কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

"তথাস্তু!"

(২)

তখন এপ্রিল মাসের প্রথম। দুর্জ্জয় শীত। আফিসের পরিশ্রম হইতে যেটুকু অবসর পাইতাম সেটুকু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং বাড়িতে পত্র লিখিয়া কাটাইতাম। শিমলার প্রশান্ত এবং বিরাট সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে ঠিক ভাল লাগিত না; তাহার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য্য যেন আমার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া থাকিত। বক্রগতিতে পার্ব্বত্য পথ চলিয়া গিয়াছে তাহার উপর দিয়া উটের শ্রেণী এবং 'বয়েল' গাড়ি চলিয়াছে; চালকদের গম্ভীর বদন এবং বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমার মনে হইত যেন কোন রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া প্রবাস দৃশ্য দেখিতেছি। আমিও যে সেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাণী তাহারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছি তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম না। ধূমাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন দেখিতাম পর্ব্বত এবং উপত্যকা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতার একটী জনাকীর্ণ পল্লী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; সেই পল্লীর মধ্যদিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলি এবং তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার গবাক্ষে দুইটি উৎসুক নয়ন। কিন্তু সে ক্ষণেকের মোহ। রিক্সার শব্দে চমকিত হইয়া দেখিতাম সেই পর্ব্বত এবং সেই উপত্যকা তাহাদের

গাম্ভীর্য্য এবং নির্জ্জনতা লইয়া প্রকাশ রহিয়াছে! কোথায়ই বা কলিকাতার গলি এবং কোথায়ই বা উৎসুক নয়ন! একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শিমলার শীতবায়ুতে মিশিয়া মিলাইয়া যাইত।

সেদিন রবিবার; আফিসের উপদ্রব ছিল না। ভৃত্য টেবিলের উপর চা'এর পেয়ালা রাখিয়া গেল। সেই তপ্ত তরল পদার্থ টুকু নিঃশেষ করিবার পর কি করিয়া সময় নষ্ট করিব মনে মনে চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম—"বাবুজি, ফুল!"

চাহিয়া দেখিলাম ফুলের গুচ্ছ হস্তে লইয়া একটি পাহাড়ী বালিকা আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পরণে নীল বর্ণের পায়জামা এবং কুর্ত্তা, এবং গাত্রে একখানি পীতবর্ণের অঙ্গাবরণ। বিসদৃশ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে সবল সুগঠিত দেহ এবং সরল সপ্রতিভ মুখখানি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার বয়স অনুমানিক পঞ্চদশ বৎসর হইবে।

তাহার হস্ত হইতে ফুলের গুচ্ছটি লইয়া দেখিলাম পাহাড়ী গোলাপ এবং ফার্ণ দিয়া সেটি প্রস্তুত। টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া মনিব্যাগ হইতে একটি দুয়ানী লইয়া বালিকাটিকে দিলাম। বালিকাটি দুয়ানী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—"বাবুজী, ইহার মূল্য একপয়সা মাত্র। আপনি আট পয়সা দিতেছেন!"

তাইত! দরদস্তুর না করিয়া একেবারে আট পয়সা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু একবার দিয়া ফিরাইয়া লওয়াও ভাল হয় না। বলিলাম—"তা'হক তুমি আট পয়সাই লও।"

কিন্তু সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অন্যায় মূল্য সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অগত্যা একটা রফা করিতে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি দুয়ানীটিই লইয়া যাও তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে আটদিন ফুল দিয়া যাইও।"

আমার প্রস্তাব তাহার মনঃপূত হইল। "আচ্ছী বাৎ" বলিয়া দুয়ানীটি লইয়া সে চলিয়া গেল।

(৩)

পরদিন হইতে প্রত্যহ সকাল বেলা বালিকাটি ফুল দিতে আসিত। আমাকে যেদিন সম্মুখে পাইত আমার হস্তে দিয়া যাইত যেদিন আমাকে দেখিতে পাইত না টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গী, তেমনি অবাধ গতি। সে যেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা কহিত তেমনি অবলীলা ক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিত।

সেরূপ সহজ সপ্রতিভতার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি বাঙ্গলা-দেশের হিন্দিতে তাহার সহিত কথা কহিতাম সে পাহাড়ী হিন্দিতে তাহার উত্তর দিত। কতকটা সেও আমার প্রশ্ন বুঝিত না এবং কতকটা আমিও তাহার উত্তর ভুল বুঝিতাম। কিন্তু মোটের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা এক-রকম চলিয়া যাইত।

তাহার নাম জানকী। খড্ এর অর্দ্ধপথে তাহাদের বাড়ি। তাহার পিতা 'জঙ্গল দফ্তরের (Forest Office) জমাদার। তাহারা তিনটী ভগিনী এবং চারিটি ভাই।

তাহার বড় ভাই তিন মাস হইল 'সরকারে' চাকরি পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আপাদ মস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতাম দেখিয়া জান্‌কী বলিত "বাবুজী তোমার এখনই এত ঠাণ্ডা বোধ হয় বরফে তুমি কি করিয়া থাকিবে?"

'বরফ' অর্থাৎ শীতকাল। শীতকালে শিমলায় তুষারপাত হয় বলিয়া সহজ কথায় শীতকালকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

আমি বলিতাম—"বরফ পড়িবার দুইমাস পূর্ব্বেই আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।

জান্‌কী আশ্চর্য্য হইয়া বলিত—'বাবুজী, তুমি বরফে থাকিবে না?"

বলিয়া বরফের গল্প আরম্ভ করিত। সে কি সুন্দর! যখন পাহাড় পর্ব্বত গাছ পালা সমস্ত বরফে একেবারে সাদা হইয়া যায় তাহার উপর সূর্য্য কিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে তখন তাহারা কি আনন্দের সহিত বরফের উপর বেড়াইয়া বেড়ায়—বরফ লইয়া খেলা করে! সেই বরফকে বাবুজীর এত ভয়!

তাহার উত্তরে আমি কলিকাতার গল্প করিতাম। শিমলার মত ত্রিশটা সহর একত্র করিলেও, কলিকাতার মত বড় হয় না—সেখানে কত লোক কত গাড়ি কত আনন্দ। যে 'হাওয়াগাড়ি' শিমলায় একটা দেখিলে জান্‌কী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—সে 'হাওয়াগাড়ি' কলিকাতার পথে গণিয়া শেষ করা যায় না। মাঠে মনুমেণ্ট, পথে ট্রামগাড়ি, গঙ্গায় জাহাজ!

সমস্ত শুনিয়া জান্‌কী বিস্মিতহৃদয়ে কলিকাতার ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিত। সকলের চেয়ে তাহার আশ্চর্য্য লাগিত হাওয়াগাড়ির কথা। এখানে যত রিক্স আছে কলিকাতায় তাহার অধিক সংখ্যক হাওয়া-গাড়ি আছে একি পরমাশ্চর্য্য! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কলিকাতায় শীতকালে বরফ পড়ে না! জান্‌কী মাথা নাড়িয়া বলিত—"বাবুজী শিমলাই ভাল।"

এমনি করিয়া দিনে দিনে জান্‌কীর সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ ফুলের তোড়া উপলক্ষ মাত্র হইল—গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যূষে উঠিয়া বারান্দায় নিস্তেজ রৌদ্র কিরণে বসিয়া সম্মুখের পর্ব্বত-গুলির দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কালো কালো পাহাড় গুলা দেখিয়া মনে হইত যেন আরব্যোপন্যাসের দৈত্যগণ তাহাদের বিরাট দেহ লইয়া অলসভাবে লেজ গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। মনের মধ্যে কেমন একটা পীড়া অনুভব করিতাম। প্রভাতসূর্য্যোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের তলায় হিমজর্জ্জর পর্ব্বতগুলা কেমন খাপছাড়া বলিয়া মনে হইত—এমন সময়ে একমুখ হাস্য এবং একতোড়া ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইত—"বাবুজী, ফুল!"

ফুলের প্রসঙ্গ সেই পর্য্যন্ত শেষ—তাহার পর জান্‌কী গল্প করিতে বসিয়া যাইত।

এই সরলহৃদয় সপ্রতিভ পাহাড়ী বালিকাটিকে আমার কেমন অতিরিক্ত ভাবে ভাল লাগিত। কঠিন বন্ধুর পর্ব্বতের মধ্যে চতুর্দ্দিকের গাঢ়নিবদ্ধ গাম্ভীর্য্য এবং কঠোরতার সহিত তাহাকে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইত। তাহার মধ্যে যে প্রফুল্লতা এবং

চাপল্য তাহাকে নিরন্তর উদ্বেলিত করিয়া রাখিত—তাহার উপমা পর্ব্বতের মধ্যে আমি আর কোনও পদার্থে পাইতাম না—একমাত্র গিরি নির্ঝর ছাড়া! মনে হইত সে যেন নির্ম্মম পাহাড় ভেদ করিয়া তরল প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া উপায় নাই—গল্প বলিতে সে যেমন মজবুত—গল্প শুনিতেও তাহার তেমনি আগ্রহ। তাহার কথা শ্রবণ করা এবং তাহার সহিত কথা কওয়া—এই দুই প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণতি হইতেছে দ্যুতা।

দু-আনীর হিসাব যেদিন শেষ হইল তাহার পরদিন ফুল লইয়া আসিলে আমি জানকীকে বলিলাম—"জানকী তোমার দু আনার ফুল দেওয়া হয়ে গেছে—আজ থেকে আবার নূতন হিসাব।" বলিয়া তাহাকে পুনরায় একটি দু-আনী প্রদান করিলাম।

জানকী দু-আনীটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল আর তাহাকে পয়সা দিতে হইবে না আজ হইতে সে বিনামূল্যেই ফুল দিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম—"তাও কি হয়—।"

কিন্তু তাহাই হইল। সে বলিল—ফুল বিক্রী করা তাহার ব্যবসায় নহে—ফুল এবং পাতা বিনামূল্যেই সে পর্ব্বতগাত্র হইতে লইয়া আসে অতএব পয়সা না লইলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই। ফুলের পরিবর্ত্তে 'বাবুজীর' অনুগ্রহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলাম ফুলের মূল্য প্রদান করিলে জানকীকে ক্ষুণ্ণ করাই হইবে এবং পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাকে রাজি করিতে পারিবার ক্ষমতাও ছিল না সম্ভাবনাও ছিল না। অগত্যা বিনামূল্যেই ফুল লাভ করিতে লাগিলাম।

(৪)

দিনের পর দিন শেষ হইয়া তিন মাস কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিনও জানকী আমাকে ফুল দিয়া যাইতে ভুলে নাই। যেদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই সেদিন বৈকালে আসিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে এই তিন মাসের মধ্যে সে আমার সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে—তাহার মাত্রা, আমার মনে হয়, ক্রমশঃ সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে শুধু ফুল দিতে আসেনা—সে আমার জন্য আসে, ফুল তাহার উপলক্ষ—আমিই তাহার লক্ষ্য!

কি আশ্চর্য্য এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও সেই প্রেম স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ শুধু হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াই ক্লান্ত হয় না—এ আবার ভালও বাসে! ক্ষুধার সময় আহার এবং শয়নের সময় নিদ্রালাভ করিয়াই ইহার বাসনা সমাপ্তি লাভ করে না—তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলে।

কিন্তু আমিত এই পর্ব্বতবালিকাকে ভালবাসি নাই—শুধু অমিশ্র সহৃদয়তা ভিন্ন আমি আর কিছু ত ইহাকে দান করি নাই। আমার নিকট হইতে এমন কি পদার্থ সে লাভ করিয়াছে যাহার বিনিময়ে তাহার হৃদয় লইয়া সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম সে ফুল লইয়া আমার উপাসনা করিতে আসিত।

আমি এই হৃদয়ের খেলা দেখিয়া

মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতাম। কেমন ধীরে ধীরে অথচ অনন্তগতিকে এই উদ্দাম এবং চঞ্চল হৃদয়খানি আমার নিকটে আসিয়া ধরা দিল। কিসের প্রভাবে? কিসের আকর্ষণে! আমার মধ্যে এমন কি শক্তি আমার অগোচরে বিরাজ করিতেছে যাহার অদৃশ্য প্রভাব হইতে এই বালিকা কোন ক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিল না। সময়ে সময়ে আত্মমহিমায় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু তাহা হউক—ইহাকে রোধ করিতে হইবে—ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই অপরিণতবুদ্ধি বালিকা যে মিথ্যা আশাকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন নিজেকে বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে আমার কর্ত্তব্য তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করা। এই হৃদয়সংঘাতের মধ্যে আমার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ কিছু নাই—কিন্তু বেচারা জানকী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে তখন তাহাকে এই অপরিণামদর্শিতার ফলভোগ করিতে হইবে। আমার নিকট হইতে সহৃদয়তার অধিক যতটুকু সে আশা করিবে—ততটুকুর জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে।

স্থির করিলাম জানকীকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কি তাহাকে বলিব—কেমন করিয়া তাহাকে সাবধান করিব! সে ত একদিনও প্রকাশ করিয়া আমাকে বলে নাই যে আমাকে ভালবাসে; এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলি যে আমাকে ভালবাসিয়ো না—ভুল করিয়ো না। বিশেষতঃ সে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সহজ এবং সরলভাবে গল্প করিতে থাকে, তখন নির্ব্বিবাদে তাহার গল্প শুনা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে এবং তাহার অকৃত্রিম সারল্যে বাধা দিয়া তাহাকে পীড়ন করা নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা মনে হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে একটা কোনও প্রতিকার না করিলেই নয়। দুই একজন বন্ধু বান্ধব জানকীর বিষয় লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। এবং তদুপলক্ষে আমাকে পরিহাস করিতে ছাড়িল না। ভৃত্য এবং পাচকও যেন জানকীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে কি কথা বলাবলি করে। আমার সন্দেহ হয় তাহারা আমারই বিষয়ে আলোচনা করে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি জানকীকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে কোনও ক্রমেই উচিত নহে।

অবশ্য একথা বলিলে জানকীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হইবে। কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনস্থলে আঘাত না করাই অন্যায়, কষ্ট না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা।

স্থির করিলাম জানকীকে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করিতে হইবে। ফুলের মূল্য গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে ফুল লওয়া হইবে না। বিনামূল্যে ফুলগ্রহণের সুযোগে তাহার সহিত যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে মূল্য দিয়া ফুল গ্রহণ করিলে তাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৫)

সেদিন প্রভাতে একপসলা শ্রাবণের বর্ষা

খাইয়া কেলুগাছগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছিন্ন মেঘের অবকাশ দিয়া সূর্য্যের কিরণ আকাশ এবং পর্ব্বতকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার পশ্চাতে একজন পাহাড়ী যুবক পৃষ্ঠে মস্তবড় বোঁচ্‌কা লইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম আজিকার ফুলের তোড়াটি সবদিনাপেক্ষা বৃহৎ—নানাবিধ পুষ্পলতায় গ্রথিত। নিমেষের মধ্যে আমার মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বিশেষভাবে সচেষ্ট করিয়া তুলিলাম।

বলিলাম—জান্‌কী ফুলের দাম তুমি যদি না লও ত আর আমি ফুল লইব না।

জান্‌কীর প্রফুল্লমুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। "কেন বাবুজী?"

আমি কহিলাম—"তা বলিতে পারি না কিন্তু দাম তোমাকে লইতে হইবে।"

জান্‌কী একটু দুঃখিতস্বরে কহিল—"বাবুজী আমি যদি অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন—আপনাকে আর বিনামূল্যে ফুল লইতে হইবে না—আপনাকে আমি আজ শেষ ফুল দিতে আসিয়াছি!

অন্তরের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিলাম, তাড়াতাড়ি কহিলাম—"কেন?"

জান্‌কী কহিল—"আমি আজ বিদেশ যাইতেছি—এখান হইতে একবেলার পথ—ইনি আমার স্বামী।"

জান্‌কীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম—"জান্‌কী তোমার বিবাহ হইয়াছে একদিনও বল নাই ত। কতদিন তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

জান্‌কী কহিল—"পাঁচ বৎসর।"

দেখিলাম বর্ষার অনুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের মধ্যে জান্‌কীর মুখখানি অম্লান পবিত্রতায় নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জান্‌কী নীরবে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে পাহাড়ী যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় আমাকে অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল—"বাবুজীর যদি অনুগ্রহ হয় একবার আমাদের গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন—পথ ভাল—আমি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইব।"

আমি কহিলাম—"ছুটি পাইলে আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরের দ্বারা সংবাদ দিব।"

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী সকৃতজ্ঞনেত্রে আমার দিকে চাহিল।

বিদায়কালে জান্‌কী বলিল—"বাবুজী আপনার দয়া এবং ভালবাসার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে—আপনি আমাকে যে দো-আনীটি দিয়াছিলেন—সেটি আমি আপনার দয়ার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছি—খরচ করি নাই।" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে দো আনীটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী খডের পথে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল আমি তাহাদের দেখিতে লাগিলাম।

তখন আকাশ আরও মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক রৌদ্রপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

জানকীর সরল স্নেহপূর্ণ আচরণকে আমি যে বিকৃত আকার দিয়া মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল কাল হইতে আর "বাবুজী ফুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না তখন একটা অদৃশ্য বেদনায় মনটা নিপীড়িত হইয়া উঠিল।

সেইদিন অফিসে গিয়া বলিলাম—"সাহেব, আমাকে ১০ দিনের ছুটী দাও—স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"

সাহেব বলিলেন—তথাস্তু!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্ষবিদায়।

গত বৎসর ঠিক এই দিনে সম্মুখের যে নূতন বৎসরের প্রতীক্ষায় আমাদের মন যুগপৎ আশায় আশঙ্কায়, আনন্দে বিস্ময়ে আন্দোলিত হইয়াছিল; যাহার আবাহনের জন্য উৎসব আয়োজন করিয়াছিলাম আজ তাহার বিদায়ের দিন সমুপস্থিত। একদিন আসন্ন যাহাকে সুখের আকাঙ্ক্ষায় নিগূঢ় সুগন্ধ সুকুমার পুষ্প-কোরকের ন্যায় মনোহর এবং দুঃখের আশঙ্কায় ভীষণ বজ্রবিদ্যুৎপোষণকারী বৈশাখের সান্ধ্যমেঘ সঞ্চারের ন্যায় ভয়ঙ্কর মনে হইয়াছিল, সেই অজানিত নূতন রহস্যময় বৎসর, আজ দীর্ঘ পরিচয় সুযোগে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত পুরাতন। দৃষ্টিরোধকারী কালের আবরণ আজ নিঃশেষে অপসারিত, কুন্দকোরক সৌরভে সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; নিবিড় গম্ভীর মেঘপুঞ্জ বর্ষণে, ঝঞ্ঝাবজ্রপাতে আমাদিগকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। তাই আজ পুরাতনের হিসাবের খাতা খুলিয়া লাভালাভ গণনা করিতে বসিয়াছি, কি পাইলাম আর কি হারাইলাম।

এবৎসরে জীবনে অনেক গুলি আনন্দের আয়োজন হইয়াছিল, আবার অনেক গুলি শোকের ঘটনাও ঘটিয়াছে। রাজ আগমনের সমারোহ, সম্রাটের বদান্যতা, বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিবারণ আমাদের জীবনে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। সম্রাট স্বয়ং আমাদিগকে আশার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, এই মন্ত্র সাধনায়, হৃদয়ে নূতন বলের সঞ্জীবনী উপলব্ধি করিয়া অখণ্ড বঙ্গের সম্মিলিত উৎসাহে হিন্দু মুসলমানকে একত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ বেদনা দূরীভূত হইল, কিন্তু আমরা রাজধানী হারাইলাম, পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থে ভারতের মহানগরীর নূতন প্রতিষ্ঠা! ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে! রাজধানী পরিবর্ত্তনে বঙ্গদেশের ক্ষতি কিম্বা সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা এবিষয় আলোচনার সময় এখনও আসে নাই, তবে যতদূর বুঝা যায় বঙ্গ বিশেষ কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিহারে নূতন প্রদেশ সংগঠন আশা-আনন্দজনক। সমগ্রকে মহৎ এবং সম্পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের সমন্বয় এবং সুগঠন আবশ্যক, বঙ্গ বিহার উৎকল দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর রাজপুতানা সিন্ধু আর্য্যাবর্ত্ত প্রত্যেক প্রদেশকেই অগ্রসর এবং

উন্নতিশীল হইতে হইবে, সমগ্রের উপকারস্থলে কোন অংশের সামান্য ক্ষতি গণনা করিলে চলিবে না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম, গতপ্রায় বৎসরের একটি গৌরবজনক ব্যাপার। বিকানীর এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা এই কার্য্যে কেবল মাত্র উৎসাহ এবং অর্থ সাহায্য দান করিয়া বিরত হয়েন নাই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইয়া এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে পরিভ্রমণ এবং সভাসমিতি আহ্বান করিয়া জন সাধারণে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সমুন্নতভাবে প্রচার করিয়াছেন। জন সাধারণের কার্য্যে অভিজাতবর্গের সহানুভূতি এবং সাহায্য দেশের উজ্জল এবং সুমঙ্গল ভবিষ্যতের সূচনা।

পাঁচবৎসর পরে এবার আবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয়। কংগ্রেস সম্বন্ধে জন সাধারণের উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ দূর হওয়া সত্বেও এবার প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হয় নাই, কংগ্রেস যে জনসাধারণের সম্মিলনভূমি এ ধারণা যেন ক্ষীণ হইয়াছে, ইহা যেন দল বিশেষের স্বেচ্ছাচালিত ব্যাপার, ইহার অনেক ব্যাপার রহস্যময়, ইহাতে দেশের এবং দশের হাত নাই এই বিশ্বাস অনেকেরি মনে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে এবং প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে যে উৎসাহ এবং আনন্দ দেশের সকলের মন অধিকার করিয়াছিল এখন আর তাহা দেখা যায় না। এই নিরুৎসাহ যাহাতে দূর হয় এবং ভবিষ্যতের আশাউন্নতির স্থল নবীনযুবকগণ যাহাতে বহুসংখ্যায় ইহাতে যোগদান করিয়া ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন তাহার জন্য দেশনায়কগণের বিশেষ রূপে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। কংগ্রেস সর্ব্ব সাধারণের এমনি আশ্রয় ভূমি যে আজ পর্য্যন্ত সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার উপনিবেশ হইতে অত্যাচারপীড়িত ভারতবাসী আপন আপন দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিয়া সাহায্যের চেষ্টায় এবং বল সঞ্চারের আশায় এখানে সমাগত হইতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইহা কি স্বদেশের প্রতি কম সম্মান, স্বদেশীর প্রতি কম প্রীতির নিদর্শন? দেশনায়কগণ তাঁহাদের কার্য্যগুণে এবং আদর্শবলে এই মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখুন এবং সমগ্র ভারতবাসীকে দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করুন ইহাই আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদর্শনী, কবি সম্বর্দ্ধনা, চারুশিল্প প্রদর্শনী এবং সাহিত্য সম্মিলনী এবৎসরের আরও কয়েকটি মঙ্গল অনুষ্ঠান। সাহিত্যপ্রদর্শনী অতীতকে বর্ত্তমানে আবাহন করিয়া পুরাতন গৌরবকে চিরন্তন করিবার সাধনায় অতীতের মহিমালোকে বর্ত্তমানকে উদ্ভাসিত করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ সুন্দর ও উজ্জল করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই প্রদর্শনী বৎসরে বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত এবং দেশের আদর্শ দিনদিন সম্মানিত এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করুক এই আমাদের প্রার্থনা। কবিসম্বর্দ্ধনায় বহুদিনের একটি অকৃত কর্ত্তব্যের ত্রুটি আমরা এতদিনে সংশোধন করিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র

আমাদের কত না উপকার করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিদানে আমরা কিছুই করি নাই, এবার যে বহুবাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল তাহার মূলে বঙ্গের নূতন চেতনা ও ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতি এবং বঙ্গবাসীর ঐক্যবন্ধন। যিনি দেশের গৌরব তাঁহাকে সম্মান না করিলে মাতৃভূমিকে মাতৃভাষাকে অমান্য করা হয়। এই অবহেলা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে পীড়া দান করিয়াছিল তাই এ মঙ্গল কার্য্যের উদ্যোগে এত সহানুভূতি, এমন উৎসাহ, ইহার অনুষ্ঠানে এমন আনন্দ দেখা গিয়াছিল। সাহিত্য প্রদর্শনীর ন্যায় চারুশিল্পপ্রদর্শনীও আমাদের অতীত গৌরবকে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়াস। তবে পার্থক্য এই যে শেষোক্ত প্রদর্শনী কেবল মাত্র অতীতকে আমাদের মানস পটে উদ্ভাসিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; বর্ত্তমানে তাহাকে আবার লাভ করিবার জন্য দেশে কি অক্লান্ত সাধনা চলিয়াছে তাহাও দেখাইয়াছে। অতীত মহিমায় অনুপ্রাণিত বর্ত্তমান আমাদিগকে ক্রমে কোন্ ঐশ্বর্য্যময় ভবিষ্যতে অগ্রসর করিবে ইহা হইতে তাহারও উজ্জ্বল চিত্র নেত্রপথে বিকশিত হইয়া উঠে। এ যেন প্রত্যুষের অরুণরাগ স্মরণে প্রভাতের পরিকল্পনা।

গত ১৯শে ফাল্গুন চুঁচুড়ায় সাহিত্যসম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—সাহিত্য সম্মিলনের এই পঞ্চম বর্ষ; বিস্তারম্ভের কাল, জীবনের গতি নির্ণয় করিবার শুভ অবসর। এখন হইতে সাহিত্যসম্মিলনী কোন কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক। তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক চুঁচুড়া—প্রাচীন সপ্তগ্রামের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অভ্যাগতদিগকে স্বাগত জ্ঞাপন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, যে বঙ্কিমযুগে যেরূপ ভাষায় বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহার মতে এই পরিবর্ত্তন অবনতিজনক। এ কথার আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না—৺বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু সন্দেহ নাই; তবে ভাষা যদি চিরকাল তাঁহারি অনুকরণে লিখিত হয় তাহা হইলে তাহার উন্নতির আশা কোথায়! উন্নতি অর্থে গতি, তাহা কখনো স্থির স্থবির হইয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই অতীতের শ্রেষ্ঠ আদর্শে, বর্ত্তমানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ভাষা নদীর ধারার মত, তাহা যদি চিরকালই গঙ্গোত্রীতে আবদ্ধ থাকে, যদি বিচিত্র প্রবাহে, অবিরত ধারায়, আবর্ত্তে উচ্ছ্বাসে, প্লাবনে, তরঙ্গে, সঙ্গীতে সাগরাভিমুখে যাত্রা না করে তবে তাহা জীবনহীন পল্বলে পরিণত হইয়া দেশকালের জীবন নাশ করে। অতীতের আদর্শ আমাদের মনে চিরদিন উজ্জ্বল থাকুক আমরা যেন তাহার অবমাননা না করি,—আবার যেন কেবলি অনুকরণ করিয়া তাহাকে হীন না করি। ঐকান্তিক অনুকরণ হীনতার পরিচায়ক, যাহা শ্রেষ্ঠ যদি যথার্থ তাহার উপলব্ধি থাকে তবে তাহারি প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করি বটে কিন্তু তাহার ভঙ্গী আমরা অনুকরণ করি না। জননী ভারতী আমাদের প্রাণে সেই সঞ্জীবনী রস সঞ্চার করুন। আমরা

যেন মাতৃভাষার পূজা জীবনের সান্ত্বনা করিতে পারি।

এবৎসর আমাদিগকে অনেকগুলি কঠোর শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। মনোমোহন বসু এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রের দুইজন অক্লান্ত কর্ম্মী চলিয়া গিয়াছেন। মনোমোহন বসু ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসেবকগণের সমসাময়িক। বঙ্কিমযুগেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কম ক্ষমতার পরিচয় নহে।

মনোমোহন বসু।

মনোমোহন অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ রঙ্গালয়সমূহে এগুলি সমাদরে অভিনীত হয়। বিচিত্র চরিত্র চিত্রণে তিনি নিপুণহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত "দিনের দিন সবে দীন," প্রভৃতি সঙ্গীত তাঁহার দীপ্ত স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

তিনি সুদীর্ঘ জীবনে অনেক শোকতাপ সহ করিয়াছিলেন—কিন্তু রোগশোকের যন্ত্রণা তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য, বীর্য্য এবং ধৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে প্রাচীন সমাজের সৌজন্য এবং উদার অমায়িকতার একটি নিদর্শন বঙ্গের বক্ষ হইতে অন্তর্ধান হইল।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গীয় রঙ্গালয়গুলির জন্য প্রায় শতাধিক নাটক এবং প্রহসন রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি! কোন একটি রচনা অন্যের অনুরূপ নহে—প্রত্যেকটির মৌলিকতা এবং অভিনবত্ব তাঁহার গৌরব এবং অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। কেবল নাটক রচনা নহে, নাটক অভিনয়েও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এবিষয়ে নাট্যকুশলী ৺অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফির পরেই অনেকে তাঁহার কৃতিত্বের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গিরীশচন্দ্রের নাটকগুলি প্রধানতঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পৌরাণিক রচনায় যে শক্তির উন্মেষ, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তিনি বহু চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু প্রায়ই কোন একটির ছায়া অন্যটিতে পড়িতে দেখা যায় না। গান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাঁহার রচিত কবিতাসমূহ সামান্য সমাদর লাভ করে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের দারুণ ক্ষতি হইল। আবার কতদিনে এ ক্ষতি পূরণ হইবে কে বলিতে পারে?

মহারাজ কুচবিহারের নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ-বাহাদুরের মৃত্যু কেবল মাত্র তাঁহার ক্ষতি নয়, সমগ্রবঙ্গভূমির ক্ষতি; তিনি [illegible]র্য্যের উৎসাহদাতা, এবং দীনের সহায় সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহার নিকট উপস্থি[illegible] কেহ কখনো রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আ[illegible] দেশের মঙ্গল কার্য্যে যোগদান করিয়[illegible] চেষ্টায় যত্ন এবং উৎসাহ দেখাইয়া নি[illegible] সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহা[illegible] উদার মনুষ্যত্ব এবং রাজযোগ্য গু[illegible] আকর ছিল। তাঁহার স্থান পূর্ণ হওয়া[illegible]

ময়ূরভঞ্জ মহারাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যু যে দেশবা[illegible] আত্মীয়স্বজন, এবং বন্ধুবান্ধবের [illegible]কি দারুণ বজ্রাঘাত তাহা বলিয়া ব্য[illegible] যায় না। তাঁহার ন্যায় উদার, সংযত প্রজাবৎসল নিষ্কলঙ্কচরিত্র কদাচ কচি[illegible] যায়। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যা[illegible] করিলে ত্রেতার সত্যসন্ধ নির্ম্ম[illegible] শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে পড়ে।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী [illegible] বনবাসী রামচন্দ্রের ন্যায় তিনি [illegible] নিষ্ঠা এবং তপস্যায় জীবনযাপন [illegible]ছেন। প্রজার কল্যাণ এবং রাজ্যের[illegible] সাধন ভিন্ন তাঁহার আর অন্য চেষ্টা, চিন্তা ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible] ইংলণ্ড, আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া স[illegible] প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ [illegible] আসিয়া, নিজের রাজ্যে তাহা [illegible] করে অনেক নূতন এবং উদার অনু[illegible] সূচনা করিয়াছিলেন। প্রভৃত [illegible] ময়ূরভঞ্জেও রেলপথের স্থাপনা করিয়া[illegible] খনিজ এবং বনজাত দ্রব্যসমূহের নূতন

বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। —প্রাবিষ্ট হইয়া আছেন অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা
—শায় একবার … বাহির করিয়াছিলেন

& COOKING.—By I. M. M.D. Published by the Record Office, Calcutta. গ্রন্থখানি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে … মতে গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালের … বিধি ও আহার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে … ন। গ্রন্থকার একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন … ন কালে খাদ্যাদি নিকৃষ্টতর হইয়া … তে নানারূপ ভেজাল মিশিতেছে … ণ করিয়া বাঙ্গালীর বিশেষতঃ … হইতেছে। অজীর্ণ মন্দাগ্নি প্রভৃতি … র ঘরে রীতিমত শিকড় গাড়িয়া … রও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রধানতঃ … । কলিকাতা প্রবাসী মফস্বলস্থ … এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। … কল রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া- … অবলম্বন করিলে রোগের হাত … য়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ … নকালে যক্ষ্মারোগ কলিকাতায় … ছে। ইংলণ্ডে কিন্তু ঠিক ইহার … —সেখানে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা … গ্রন্থকারের মতে, অপ্রচুর ও … প্রধান কারণ। তাহার সহিত … জন্য দারুণ দুর্ভাবনা ও গুরু … ভার—এগুলিও বিশেষ ক্ষতি … আহার সম্বন্ধে কয়েকটি … দিয়া দিয়াছেন—সেগুলি বড় … । গ্রন্থকারের মতে বর্ত্তমান … একান্ত প্রয়োজন আছে। দুগ্ধ … বিশেষ বলকারক নহে—তবে … মাখন প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে … শে, ছানার পায়স, পান্তুয়া, … ই খাদ্য। দধি ও ঘোল সকল … নাশ করে। ডাল বিশেষ … মতে খাদ্যের এই কয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন,—তাহা সহজে হজম হইবে এবং বলকারক, সুস্বাদু, সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হইবে। তৎপরে তিনি কয়েকটি খাদ্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহার সন্ধান পাঠক মূল গ্রন্থে গ্রহণ করুন। গ্রন্থখানি কালোপযোগী হইয়াছে। ইংরাজীতে রচিত হইলেও ভাষাটুকু বেশ সহজ—এবং কোথাও দুর্ব্বোধ্য যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। দরিদ্র দেশ সকলের নিকট এগ্রন্থ সহজপ্রাপ্য হইবার পক্ষে একটি ক্ষুদ্র অন্তরায় আছে—গ্রন্থের মূল্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের ধারণা। মূল্য কিছু কমাইয়া এক টাকা করিলে, বোধ হয়, সাধারণে এ গ্রন্থপাঠের সুযোগ পান। ছাপা কাগজ বাঁধাই মনোজ্ঞ হইয়াছে।

সমবায় বিভাগ। কাশিমবাজার রাজবাড়ী। সাময়িক কার্য্যবিবরণ। ১লা মাঘ ১৩১৮ সাল। কাশিমবাজার সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। সমবায়ের উদ্দেশ্য,—দশে মিলিয়া কার্য্য করা এবং তাহার ফল পরিশ্রম যোগ্যতা ও সহায়তা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথাযোগ্যরূপে বণ্টন করিয়া লওয়া। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য কিন্তু বর্ত্তমানকালে আয়ের অল্পতা হেতু অধিকাংশ স্থলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন না, তাহার ফলে দারিদ্র্য, অশান্তি ও দুঃখ ক্রমেই দেশব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সমাবস্থাপন্ন কয়েকজন গৃহস্থ মিলিয়া পল্লীতে পল্লীতে বা গ্রামে গ্রামে এক একটি Co-operative Store বা 'সমবায় পণ্যভাণ্ডার' খুলিলে আয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের উপায় হইতে পারে। এই ক্ষুদ্র কার্য্যবিবরণীটিতে এইরূপ পণ্যভাণ্ডারের উপযোগিতা ও উপকারিতা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে সমবায় ব্যাঙ্কও পল্লীগ্রামে বিনা মূলধনে স্থাপন করা যাইতে পারে এবং অধমর্ণের দল নানা অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, অথচ উত্তমর্ণগণেরও বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমরা

তিনি সুদীর্ঘ জীবনে অনেক শোক ... মহা বাহাদুরের মৃত্যু কেবল মাত্র ...
করিয়াছিলেন।... কিন্তু ...কামনা করি। ইহার ...

মহৎ," পরিচালনাও কার্য্যবিবরণ-পাঠে সুশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়।

Speeches of His Majesty George the Fifth, delivered in India and the Official Despatches. On the Removal of the Imperial city to Delhi and the Modification of the Partition of Bengal, with an Introduction by Mr. Surendranath Banerjea. Calcutta. Price Four Annas. এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্নেহবাৎসল্য পূর্ণ বক্তৃতার সংগ্রহ। সম্রাটের এই আশ্বাসবাণীগুলি এতদ্দেশবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয় রাজ-ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত রাখিবে সন্দেহ নাই।

শৈলজা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল প্রামাণিক প্রণীত ও প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ... এখানি নাটক। উপাখ্যানটি চলনসই, তবে লেখকের কাঁচা হাতে নাটকত্ব ঠিক পরিস্ফুট হয় নাই। প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটকগুলির কয়েকটি চরিত্রের ছায়া অনেকগুলি নিকাশোন্মুখ চরিত্রে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, সরযূ, সরস্বতী সুধা, সত্য, কোরিম, শিবদাস, পদ্মলোচন জীবন্ত ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। নাটকখানির ভাষা ম... নহে।

উৎসবে উপহার। শ্রীমতী ... গুপ্ত ...ণীত ও প্রকাশিত। শ্রীহট্ট তোপখানা।

পূজার নির্ম্মাল্য। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রন ভট্টাচার্য্য রচিত। কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীনবর... ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উপর্যুক্ত দুইখানি গ্রন্থ রাজভক্তির উচ্ছ্বাসময় কবিতাগ্রন্থ।

বর্ষশেষ।

গেল বর্ষ গেল পুরাতন,
হিমবায়ু তিরোধান, স্বপ্ন সম অবসান
বসন্তের সুখের স্বপন,
রাঙায়ে ধরণীতল ঝরিল অশোক দল
হোরি খেলা হ'ল সমাপন।
ফুটায়ে আমের গুটি মুকুল পড়িল টুটি
মধু তার সার্থক জীবন।

যাবে বর্ষ আসিবে নূতন,
দীক্ষার আদেশ দিয়ে চলিল বিদায় নি
চৈত্র শেষ সন্ধ্যার তপন,
শঙ্খ নাদে বাজে ঢাক বলে আজ পড়ে ...
ক্ষণিকের তুচ্ছ আয়োজন,
সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর বিষাণে পূরিয়া
ডাক আজি দেন ঘন ঘন!

অস্ত গেল বর্ষ পুরাতন,
চৈতালি শস্যের ভার ক্ষীণ প্রাণ সুকুমার
গোধূলির কিরণ যেমন,
ধরার বুকের পরে ...িকে লুটায়ে প'ড়ে
বিছাইল গ্রীষ্ম শয়ন,
শূন্য মাঠ শস্যহীন সুদূর দিগন্তে লীন
ঝঞ্ঝার শেষে নিস্তব্ধ মরণ!

বসুন্ধরা করি যোগাসন,
বসিতে হইবে ধ্যানে রুদ্ধ করি দুন
উন্মীলিয়া ললাট নয়ন,
অলোক আলোক বলে কমল ফুটিবে
ফলে হবে অমৃত সিঞ্চন,
দূরতর দিগন্তরে দেখা দিবে স্তরে
নব মেঘে নবীন জীবন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৩, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বিদ্যুৎের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। মহারাজার তরুণ বয়সে পঠদ্দশায় একবার ৺কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা সুচারুদেবীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় কিন্তু রাজপরিবারের অমত এবং তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন না করায় তাহা তখন ভাঙ্গিয়া যায়, মহারাজা বাধ্য হইয়া বামড়ারাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সুচারুদেবী সংযতচিত্তে চতুর্দ্দশ বৎসর একাগ্র নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া কুমারী ছিলেন। অদৃষ্টবিধানে দুই পুত্র এবং এক কন্যার জন্ম হইবার পর ময়ূরভঞ্জ মহারাণীর মৃত্যু হয় এবং তাহার কিছুকাল পরে মহারাজা আবার পূর্ব্ববাঞ্ছিত সুচারুদেবীকেই বিবাহ করেন। জীবনের এই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত মিলনে উভয়েই সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিলেন—এবং চরিত্রগুণে সুচারুদেবী সর্ব্বতোভাবে মহারাজার যোগ্যপত্নী হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যলালসা কোনদিন তাঁহাকে বিচলিত করে নাই বিলাস প্রমোদ কখনো তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। এই দুই আদর্শচরিত্র পুরুষরমণীর মিলন যে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন! হায় সুখ ক্ষণভঙ্গুর, নিয়তি রহস্যময়! মাঘমাসের শেষে মহারাজা স্বীয়রাজ্যে ভল্লুক শীকার করিতে গিয়া, সঙ্গীদিগের মধ্যে একজনের গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হন। প্রথমে এ আঘাত গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া x আলোক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, গুলির ভগ্ন অংশসকল শরীরের নানা স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসকগণ অনেক বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষিণ করপ্রকোষ্ঠের উপরিভাগে যাহা নিবদ্ধ ছিল তাহা বাহির করা অত্যন্ত কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক হওয়ায়, তাহা বাহির করা হয় নাই। ফলে রক্ত দূষিত হইয়া গত ২২শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে মহারাজার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। সবে চল্লিশ বৎসর বয়সে, পুরুষের পূর্ণ যৌবনকালে মহারাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার আরব্ধ কত সদনুষ্ঠান অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল কত মহৎ কার্য্যের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল না। তবে নিষ্কলঙ্ক জীবনের যে অক্ষুণ্ণ গৌরব যে নির্ম্মল শুভ্র যশোদীপ্তি তিনি রাখিয়া গেলেন তাহা দেবতা-দুর্লভ। দেশের এমন সন্তান, রাজ্যের এমন রাজা, পুত্রের এমন পিতা, পত্নীর এমন স্বামীরত্ন হারান যে কি দারুণ শোক তাহা হৃদয় যাঁহার আছে তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন—আর সান্ত্বনা সঞ্চয় করা যদি কখনো সম্ভব হয় তবে যিনি ছাড়িয়া গিয়াছেন তাঁহারই কীর্ত্তি তাঁরই গুণাবলী স্মরণ করিয়া সান্ত্বনালাভ করিতে হইবে। অক্ষম এবং হীনের জন্য শোক চিরদিনই ব্যর্থ তাহা কেবলি অনুশোচনা, কিন্তু মহতের জন্য শোক নিষ্ফল হয় না, বিচ্ছেদের অন্ধকার তাঁহার মহত্বের স্মৃতিগৌরবে উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে পরমা শান্তির প্রতিষ্ঠা করে।

যে রহস্যময় মহাপুরুষ এই অভাবনীয় শোক বিধান করিয়াছেন তিনিই [illegible] করুণাবলে সান্ত্বনা সৃজন করুন এই প্রার্থনা।